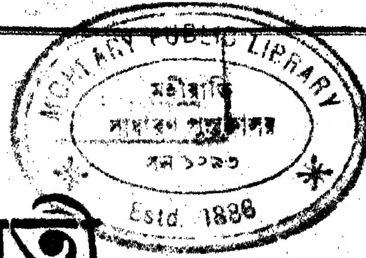
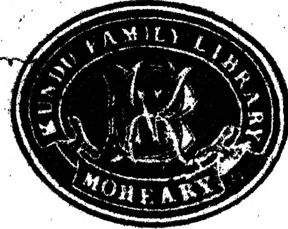


ভারতী



ভূমিকা।

ভারতীর উদ্দেশ্য যে কি, তাহা তাঁহার নামেই স্বপ্রকাশ। ভারতীর এক অর্থ বাণী, আর এক অর্থ বিদ্যা, আর এক অর্থ ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। বাণীস্থলে স্বদেশীয় ভাষার আলোচনাই আমাদের উদ্দেশ্য। বিদ্যাস্থলে বক্তব্য এই যে, বিদ্যার দুই অঙ্গ, জ্ঞানোপার্জ্জন এবং ভাবস্ফূর্ত্তি। উভয়েরই সাধ্যানুসারে সহায়তা করা আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাস্থলে বক্তব্য এই যে, জ্ঞানালোচনার সময় আমরা স্বদেশ-বিদেশ নিরপেক্ষ হইয়া যেখান হইতে যে জ্ঞান পাওয়া যায় তাহাই নত-মস্তকে গ্রহণ করিব। কিন্তু ভাবালোচনার সময় আমরা স্বদেশীয় ভাবকেই বিশেষ স্নেহ-দৃষ্টিতে দেখিব। পক্ষপাত-মানসে যে আমরা এরূপ করিব, তাহা নহে। যে সকল বস্তু উপার্জ্জন করিয়া পাওয়া যাইতে পারে, বিজ্ঞান তাহার মধ্যে একটি; কিন্তু ভাব তাহার মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভাবের উদয় সম্ভবে, ভাবের উদ্রেক সম্ভবে, ভাবের স্ফূর্ত্তি সম্ভবে, কিন্তু উপার্জ্জন সম্ভবে না। যাঁহারা মনে করেন যে, আমরা আর এক জাতি হইতে তাঁহাদের ভাব উপার্জ্জন করিয়া ঠিক সেই জাতির পদবীতে আরূঢ় হইয়াছি, তাঁহারদের মনে করা মাত্রই সার। পাদ্‌রী সাহেবেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক বাঙ্গালীর মত বাঙ্গলা লিখি, এবং ইঙ্গ-বঙ্গেরা যদি মনে করেন যে, আমরা ঠিক ইংরাজের মত ইংরাজি লিখি, তবে তাঁহারদের সে সুখস্বপ্নে আমরা ব্যাঘাত দিতে চাহি না। কালিদাস শকুন্তলার একস্থলে বলিয়াছেন "স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বং" স্ত্রীলোকদিগের অশিক্ষিত পটুত্ব; এই যে একটি কথা ইহা ভাবের পক্ষে খুব খাটে। ভাব বাহির হইতে শিক্ষা করিয়া পটুত্ব লাভ করে না, পরন্তু ভিতর হইতে স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। ইংরাজী মহাকবি শেক্‌স্‌পিয়র বলিয়াছেন, "Our poesy is a gum which oozes from whence 'tis nourished" কবিত্বরূপ নির্যাস ভিতরে যেখানে যত্নপূর্ব্বক পোষিত হয় সেই স্থান হইতে চুঁয়াইয়া

পড়ে। আমাদের দেশের সেদিনকার উপস্থিত-ভাষী কবি হরুঠাকুর বলিয়াছেন,

'প্রেম কি যাচ্‌লে মেলে খুঁজ্‌লে মেলে?
সে আপনি উদয় হয় শুভযোগ পেলে॥

স্বদেশ হইতে যে ভাব আপনি উদয় হয়, অযাচিত ভাবে উদয় হয়, তাহাই ঠিক; যে ভাব অন্যত্র হইতে যাচিয়া আনা হয় তাহা কৃত্রিম, তাহা কোন কার্য্যেরই নহে। বীণাপাণির হস্তে বীণাই শোভা পায়; হার্প কি শোভা পায়? এই সকল কারণে ভাবের আলোচনা আমরা স্বদেশীয় ভাবেই করিতে ইচ্ছুক।

অতঃপর আমরা বলিতে চাই যে, যে কারণে ব্রিটানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রিটানিয়া নাম ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহার বহু পূর্ব্বে এথেন্স্ নগরের অধীষ্ঠাত্রীদেবতা মিনর্বা—এথেনিয়া নাম ধারণ করিয়াছিলেন, সেই কারণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা সরস্বতী—ভারতী নাম ধারণ করিতে পারেন। সে কারণ কি? না নামের সহিত ধামের সহিত অকাট্য সম্বন্ধ। আর্য্য-ভাষা মূলসমেত অদ্যাপি কোথায় বিরাজ করিতেছেন? ভারতে! আর্য্য ভাষার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। পুনশ্চ, যত প্রকার বিদ্যা আছে, ভারতভূমি তাবতেরই জন্মভূমি। গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ণ, চিকিৎসা, দর্শন, সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি বিদ্যা-সমূহের বীজ প্রথমে ভারত ভূমিতেই অঙ্কুরিত হয়; পরে তাহার ফল দূর দূর দেশে বিকীর্ণ হইয়া, এতদিন পরে তবে তাহা সাধারণ জনগণের ভোগায়ত্ত হইয়াছে। ভারতভূমি বিদ্যার জন্মভূমি, বিদ্যার অধিদেবতাকে তাই আমরা ভারতী নামে সম্বোধন করিতে পারি। এইরূপ যে দিকে দেখা যায় সেই দিকেই ভারতী এবং ভারতের মধ্যে ভাবের প্রগাঢ় মিল দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব ইহা মুক্তকণ্ঠে উক্ত হইতে পারে যে, হংসের যেমন পদ্মবন, মহাদেবের যেমন কৈলাস-শিখর, ভারতীর তেমনি ভারতভূমি। কিম্বা পদ্মের যেমন সৌরভ, নক্ষত্রের যেমন জ্যোতি, ভারতের তেমনি ভারতী। ভারত-ভূমিতে যদি জাগ্রত দেবতা অদ্যাপি কেহ বিরাজমান থাকেন, তবে তিনি ভারতী। ভারতের প্রতি ভারতীর এমনি কৃপাদৃষ্টি যে তাঁহাকে লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিলেও তিনি পরিত্যাগ করেন না। সেই শ্বেতবর্ণা শ্বেতাম্বরা দেবী আমাদের এই দুরবস্থার সময় যদি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তবে কাহার চরণ সেবা করিয়া আমরা দুঃসহ কারাবাস-যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকিব? তাই আমরা ভারতী দেবীকে বলি যে "হে মাতর্ভারতি! তুমিই আমাদের আঁধারের প্রদীপ, তোমার আলোকেই আমাদের আলোক, তোমার অধিষ্ঠানেই আমারদের জীবন, তোমার অন্তর্ধানেই আমাদের মৃত্যু। তোমার শুভ্র বদন-জ্যোতি কাল-যবনিকার সহস্র সহস্র ভাঁজের মধ্য দিয়া এখনো যখন আমাদের নয়ন আকর্ষণ করিতেছে, তখন ইহা নিশ্চয় যে, প্রলয়-কালেও

তাহা অন্তর্হিত হইবে না। তোমার প্রসাদাৎ আমরা দুর্ব্বল হইয়াও সবল, গতশ্রী হইয়াও নবশ্রী, নির্জীব হইয়াও সজীব। আমাদের প্রতি এই যে তোমার অনিমেষ কৃপাদৃষ্টি, আমরা আমাদের নিজ দোষে যেন তাহা না হারাই, এই আমাদের প্রার্থনা।”

আমরা ভাই বন্ধু একত্র হইয়া ভারতীকে আবাহন পূর্ব্বক এই ত প্রতিষ্ঠা করিলাম। এক্ষণে ভারতীর বরপুত্রগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার যাহাতে রীতিমত সেবা চলে, তাহার ব্যবস্থা করুন; ভারতীর আশীর্ব্বাদে তাহারদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

ভারতী।

শুধাই অয়ি গো ভারতী তোমায়
　তোমার ওবীণা নীরব কেন?
কবির বিজন মরমে লুকায়ে
　নীরবে কেন গো কাঁদিছ হেন?
অযতনে আহা সাধের বীণাটি
　ঘুমায়ে রয়েছে কোলের কাছে,
অযতনে আহা এলোথেলো চুল
　এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে।
কেন গো আজিকে এ ভাব তোমার
　কমলবাসিনী ভারতী রাণী
মলিন মলিন বসন ভূষণ
　মলিন বদনে নাহিক বাণী!
তবে কি জননি অমৃতভাষিণি
　তোমার ও বীণা নীরব হবে?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
　ও বীণা আর না বাজিবে তবে?
দেখ তবে মাতা দেখ গো চাহিয়া
　তোমার ভারত শ্মশান পারা!
ঘুমায়ে দেখিছে সুখের স্বপন
　নরনারী সব চেতন-হারা!
যাহা কিছু ছিল সকলি গিয়াছে
　সেদিনের আর কিছুই নাই,
বিশাল ভারত গভীর নীরব
　গভীর আঁধার যেদিকে চাই।
তোমারো কি বীণা ভারতী জননি
　তোমারো কি বীণা নীরব হবে?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
　ও বীণা আর না বাজিবে তবে?
না না গো ভারতী নিবেদি চরণে
　কোলে তুলে-লও মোহিনী বীণা!
বিলাপের ধ্বনি উঠাও জননি,
　দেখিব ভারত জাগিবে কি না?
অযুত অযুত ভারতনিবাসী
　কাঁদিয়া উঠিবে দারুণ শোকে
সেরোদনধ্বনি পৃথিবী ভরিয়া
　উঠিবে জননি দেবতা লোকে।
তা যদি না হয় তাহলে ভারতি
　তুলিয়া লওগো বিজয়-ভেরী!
বাজাও জলদ গভীর গরজে
　অসীম আকাশ ধ্বনিত করি!
গাওগো হুতাশ পূরিত গান
　জ্বলিয়া উঠুক অযুত প্রাণ
উথলি উঠুক ভারত-জলধি
　কাঁপিয়া উঠুক অচলা ধরা।

দেখিব তখন প্রতিভা-হীনা
এ ভারতভূমি জাগিবে কি না
ঢাকিয়া বয়ান আছে যে শয়ান
শরমে হইয়া মরমে মরা!
এই ভারতের আসনে বসিয়া
তুমিই ভারতী গেয়েছ গান
ছেয়েছে ধরার আঁধার গগন
তোমারি বীণার মোহন তান।
আজো তুমি মাতা বীণাটি লইয়া
মরম বিঁধিয়া গাওগো গান
হীনবল সেও হইবে সবল,
মৃত দেহ সেও পাইবে প্রাণ ॥

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বিরচিত—সৃষ্টি।

(২) শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ বিরচিত—সাংখ্য দর্শন।

গ্রীকদেশের প্রধানতম তত্ত্ববিৎ প্লেটো এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে বহির্জগতের রহস্য ভেদ করা মনুষ্যের ক্ষমতাতীত, কেবল তত্ত্বজ্ঞানেই মনুষ্যের অধিকার আছে এবং জ্ঞানী ব্যক্তির প্রয়োজনও তাহাই। কিন্তু এরূপ কথায় কাহার উদ্যম ভঙ্গ হয়? যাহার হয়, সে কি আর মনুষ্য? মনুষ্য কখন কথায় ভুলিবার পাত্র নহে। মনুষ্যের মন যাহা চায় মনুষ্য তাহা না পাইলেই নয়। মনুষ্যের নিকট দুর্গম পর্ব্বত তৃণতুল্য, সমুদ্র গোষ্পদতুল্য, পৃথিবী মৃৎপিণ্ডতুল্য। আর্কিমীডীস্ অকুতোভয়ে বলিলেন যে, পৃথিবীর বাহিরে যদি আমি কেবল একটু দাঁড়াইবার স্থান পাই তবে আমি পৃথিবীকে স্থানভ্রষ্ট করিতে পারি। নিউটন ক্ষুদ্র একটা ফলপতনের সঙ্গে অসীম জগতের অনন্ত গতির সঙ্গে, অনায়াসে ভ্রাতৃসম্বন্ধ বাঁধিয়া দিলেন। নিউটনের জ্ঞানে অসীম জগৎ একটা আপেল্ ফলের সহোদর! ধরাকে সরাজ্ঞান করা আর কাহাকে বলে! কিন্তু বাস্তবিক নিউটনের আর এক প্রকার জ্ঞান ছিল! তিনি জানিতেন যে বিজ্ঞান রত্না-কর বিশেষ, তিনি কেবল উপকূলের কতিপয় উপলখণ্ড মাত্র সঙ্কলন করিয়াছেন! সে যাহা হউক, প্লেটোর সময়ে বাহ্য জগতের বিজ্ঞান গোকুলে বাড়িতেছিল, প্লেটো তাহা স্বপ্নেও জানিতেন না। প্লেটোর ভুল কোন্‌খানে সেটি একবার মনঃসংযোগ করিয়া দেখা যাউক। তিনি তত্ত্বজ্ঞানেরই অনুশীলন করিয়াছেন, বিজ্ঞানের অনুশীলন করেন নাই। এ যদি হইল, তবে তত্ত্বজ্ঞানে মনুষ্যের অধিকার কি পর্য্যন্ত, ক্ষমতা কিপর্য্যন্ত, উপকার কিপর্য্যন্ত, তাহাই তিনি আমাদিগকে বলুন যে, তাঁহার কথা আমরা আগ্রহের সহিত শুনি এবং নতমস্তকে গ্রহণ করি। বহির্জগতের বিজ্ঞান

তাঁহার নিকট নিতান্তই অপরিচিত প্রদেশ; তাহাতে মনুষ্যের অধিকার আছে কি না, ক্ষমতা আছে কি না, উপকার আছে কি না, ইহার সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট প্রত্যাশা করা বিফল। হয় ত তিনি বাহ্য জগতের রহস্য ভেদ করিবার জন্য এক সময়ে বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কৃতকার্য্য না হওয়া প্রযুক্ত পরিশেষে ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না, বা তাঁহার পূর্ব্বে কেহ তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, এইমাত্র কারণে তিনি যে একেবারে এই নির্ঘাত কথাটি কহিয়া দিলেন যে, অনন্ত ভবিষ্যৎ কালেও কোন ব্যক্তি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, ইহা তাঁহার সদৃশ ব্যক্তির মুখে কখনই শোভা পায় না।

অধুনাতন প্রামাণিক সম্প্রদায়* যদিও প্লেটোর সঙ্গে কোন বিষয়েই কোন সম্পর্ক রাখেন না, তথাপি প্লেটোর ঐ ভ্রমটিতে প্রকারান্তরে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বহির্জগতের বিজ্ঞানকে প্লেটো যে চক্ষে দেখিতেন, তত্ত্বজ্ঞানকে ইহাঁরাও সেই চক্ষে দেখেন। ইঁহারা বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান মনুষ্যের সাধনাতীত, অতএব তাহার আলোচনা নিষ্ফল। বিজ্ঞানের প্রতি প্লেটোর ঐ যে বিরাগ এবং তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি ইহাঁদের এই যে বিরাগ, উভয়েরই প্রতি আমাদের অবিকল একই প্রকার বক্তব্য, এজন্য পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহাই এখানে পুনরুল্লেখ করি। প্রামাণিক পণ্ডিত বিজ্ঞানেরই অনুশীলন করিয়াথাকেন, তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন করেন না। এ যদি হইল তবে বিজ্ঞানে মনুষ্যের অধিকার কি পর্য্যন্ত, ক্ষমতা কিপর্য্যন্ত, উপকার কি পর্য্যন্ত তাহাই তিনি আমাদিগকে বলুন যে, তাঁহার কথা আমরা আগ্রহের সহিত শুনি এবং নতমস্তকে গ্রহণ করি। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার নিকটে নিতান্তই অপরিচিত প্রদেশ, তাহাতে মনুষ্যের অধিকার আছে কি না, ক্ষমতা আছে কি না, উপকার আছে কি না, তিনি তাহার কি জানিবেন? হয়ত তিনি তত্ত্বজ্ঞানের রহস্য ভেদ করিবার জন্য পূর্ব্বে এক সময়ে বহু যত্ন করিয়াছিলেন, কৃতকার্য্য না হওয়া প্রযুক্ত তাহাতে ক্ষান্ত হইলেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না, বা তাঁহার পূর্ব্বে কেহ কৃতকার্য্য হন নাই, এই মাত্র কারণে তিনি যে একেবারে এই নির্ঘাত কথাটি কহিয়া দেন যে, অনন্ত ভবিষ্যৎ কালেও কেহ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন না, ইহা তাঁহার ন্যায় কৃতবিদ্য ব্যক্তির মুখে কখনই শোভা পায় না। এক বিজ্ঞান অপর বিজ্ঞানের কোথায় সাধ্যানুসারে আনুকূল্য করিবে, তাহা না করিয়া যদি প্রতিকূলতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, তবে সে ভ্রাতৃবিরোধ যেমন শীঘ্র চুকিয়া গেলেই ভাল হয়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞানে বিজ্ঞানে বিবাদ লাগিলে, সে ঘরাও বিবাদ শীঘ্র নিষ্পত্তি হইয়া গেলেই ভাল হয়। মনুষ্য কি এমনিই কথায় ভুলিবার পাত্র যে, তুমি তাহাকে বলিবে "বাহিরে যত ইচ্ছা বিচরণ

* Positive philosopher

কর, ভিতরে প্রবেশ করিতে যাইও না” অথবা আর এক জন বলিবে, “না, তুমি ভিতরে যত ইচ্ছা প্রবেশ কর, বাহিরের দিকে যাইও না” আর অমনি সে তাহাতে মাথা নোয়াইবে! এও কি কখন সম্ভবে! “ওদিকে জুজু ওদিকে যাইও না’ এরূপ কথা যিনিই বলুন না কেন, প্লেটোই বলুন, আর কম্‌টিই বলুন, অজ্ঞান শিশুকেই যেন বলেন, মনুষ্যকে ওরূপ কথা যত অল্প বলেন ততই ভাল; আদবেই না বলেন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, মনুষ্য কখন কথায় ভুলিবার পাত্র নহে। মনুষ্যের মন যাহা চায়, তাহা সে না পাইলেই নয়। যে মনুষ্যের নিকট দুর্গম পর্ব্বত তৃণ-তুল্য, সমুদ্র গোস্পদ-তুল্য, পৃথিবী মৃৎপিণ্ড-তুল্য, যে মনুষ্য আপেল্ ফলের পতনেতে অসীম জগতের গতি-বিধি প্রতিবিম্বিত দেখে, সেই মনুষ্যই আপনার ক্ষুদ্র আত্মাতে অপরিসীম মহান্ আত্মাকে প্রতিবিম্বিত দেখে। নিউটন্ যেমন অনির্দ্দেশ্য অসীম অনন্ত জগৎকে করতলন্যস্ত আপেল্ ফলের ন্যায় প্রতীতি করিয়াছিলেন, অস্মদ্দেশীয় কোন পূর্ব্বতন আচার্য্য সেইরূপ অনাদ্যন্ত পরমাত্মাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন—দুইই আশ্চর্য্য—একের মনে সত্যের বিস্তার, অপরের মনে সত্যের প্রগাঢ়তা যত দূর প্রকাশ পাইতে পারে তাহা পাইয়াছে। অথবা মনুষ্যের নিকটে আবার আশ্চর্য্য কি? মনুষ্য নিজেই আশ্চর্য্য!

বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে এক্ষণে এই একটি কথার সৃষ্টি হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞান বিজ্ঞানের ন্যায় প্রামাণিক নহে। ইহার তাৎপর্য্য কেবল এই কথাটি সকলকে বলা যে, তত্ত্বজ্ঞানের দিকে যাইও না, বিজ্ঞানের চর্চ্চাতে ক্রমাগত নিযুক্ত থাক। প্রকৃত বৃত্তান্তটি এইঃ—এক পাত্র জলে যদি অল্প পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত থাকে, তবে তাহাতে বাস্তবিক শর্করা আছে কি না ইহা প্রমাণ করিতে হইলে বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক হয়। কিন্তু যদি সেই জলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা মিশ্রিত থাকে, তবে তাহার স্বাদগ্রহই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ, অন্যতর প্রমাণের কিছুমাত্র আবশ্যক হয় না। বহির্জগতে সত্য বহুধা বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, এ জন্য তথাকার কোন একটি সত্যের প্রমাণ দিতে হইলে অন্য আর একটি বা ততোধিক সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। “পৃথিবী গোল” এই সত্যটির প্রমাণ দিতে হইলে, জাহাজের মাস্তুল দিগন্তরেখায় ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া যায়, এই আর একটি সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। প্রত্যুত আত্মাতে সত্য এমনি প্রগাঢ় রূপে ওতপ্রোত রহিয়াছে যে, তাহা সহজ অনুভব ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। বহির্জগতে সত্য বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে বলিয়া তথায় একাধিক প্রমাণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আত্মাতে সত্য প্রগাঢ় ভাবে রহিয়াছে বলিয়া, একমাত্র স্বানুভূতি ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। এই কারণে যদি বিজ্ঞা-

নকে প্রামাণিক জ্ঞান বল তবে তাহাতে আমাদের অল্পই আপত্তি থাকে। কিন্তু যদি বল যে, তত্ত্বজ্ঞান প্রমাণের সহিত আদবেই কোন সম্পর্ক রাখে না সুতরাং তাহা খ-পুষ্পবৎ অলীক, তবে তাহাতে আমরা কখনই সায় দিতে পারি না। কেন না স্বানুভূতিকে আমরা প্রমাণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকার করি। যেখানে স্বানুভূতি সম্ভবে না, সেই স্থানেই অন্য প্রকার প্রমান দর্শান আবশ্যক হয়। যেমন জ্বলন্ত প্রদীপকে দেখিবার জন্য দ্বিতীয় প্রদীপ আবশ্যক হয় না, তেমনি আত্মাকে জ্ঞানায়ত্ত করিতে হইলে দ্বিতীয় কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না। আত্মা আপনিই আপনার প্রমাণ। এই আত্মপ্রত্যয়টি তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান। অতঃপর আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা এবং জগতের অপরিসীম বিস্তার এ দুয়ের মধ্যে অপরিমেয় ভাবের যেরূপ মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দুইকে একই অসীম সত্যের এপিট ওপিট মনে না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। সে সত্য এমনি যে তাহাতে অতলস্পর্শ জ্ঞানের গভীরতা এবং অপরিসীম শক্তির বিস্তার উভয়ই একাধারে পাওয়া যায়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে প্রথমে স্বানুভব, এবং তাহার পরে তাহার অসীম বিস্তার এবং প্রগাঢ়তা, এই দুই প্রকার প্রমাণের উপরে তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, বালুকার বাঁধের উপরে নহে। অতএব তত্ত্বজ্ঞানকে অপ্রমাণ না বলিয়া স্বপ্রমাণ বলাই যুক্তিসিদ্ধ। শুদ্ধ কেবল বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে প্রামাণিক বলিলে প্রকারান্তরে বলা হয় যে তত্ত্বজ্ঞানের পদ্ধতি প্রামাণিক নহে; এরূপ অত্যুক্তিতে না গিয়া এখন অবধি বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এবং তত্ত্বজ্ঞানের পদ্ধতিকে দার্শনিক পদ্ধতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। এক্ষণে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে উভয়ের মধ্যে কে কিরূপ সাক্ষ্য প্রদান করেন, একবার অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক।

ক্রমশঃ

মেঘনাদ বধ কাব্য।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।)

বঙ্গীয় পাঠকসমাজে যে কোন গ্রন্থকার অধিক প্রিয় হইয়া পড়েন তাঁহার গ্রন্থ নিরপেক্ষ ভাবে সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়। তাঁহার পুস্তক হইতে এক বিন্দু দোষ বাহির করিলেই, তাহা ন্যায্য হউক বা অন্যায্যই হউক, পাঠকেরা অমনি ফণা ধরিয়া উঠেন। ভীরু সমালোচকেরা ইহাঁদের ভয়ে অনেক সময়ে

আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করেন না। সাধারণ লোকদিগের প্রিয় মতের পোষকতা করিয়া লোকরঞ্জন করিতে আমাদের বড় একটা বাসনা নাই। আমাদের নিজের যাহা মত তাহা প্রকাশ্য ভাবে বলিতে আমরা কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইব না বা যদি কেহ আমাদের মতের দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহা প্রকাশ্য ভাবে স্বীকার করিতে আমরা কিছুমাত্র লজ্জিত হইব না। এখনকার পাঠকদের স্বভাব এই যে, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এক এক জন লেখকের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এরূপ অবস্থায় তাঁহারা সে লেখকের রচনায় কোন দোষ দেখিতে পান না, অথবা কেহ যদি তাহার কোন দোষ দেখাইয়া দেয় সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত হইলেও তাঁহারা সে গুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া থাকেন। আবার এমন অনেক ভীরুস্বভাব পাঠক আছেন, যাঁহারা খ্যাতনামা লেখকের রচনা পাঠকালে কোন দোষ দেখিলে তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করিতে ভয় পান, তাঁহারা মনে করেন এ গুলি গুণই হইবে, আমি ইহার গভীর অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না।

আমাদের পাঠকসমাজের রুচি ইংরাজি শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে অপরাংশে তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে। ভ্রমর, কোকিল, বসন্ত লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা তাঁহাদের ভাল না লাগুক, কবিতার অন্য সকল দোষ ইংরাজি গিল্‌টিতে আবৃত করিয়া তাঁহাদের চক্ষে ধর তাঁহারা অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইঁহারা ভাব-বিহীন মিষ্ট ছত্রের মিলন-সমষ্টি বা শব্দাড়ম্বরের ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন কিন্তু কার্য্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাঁহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে ভাবের দোষ তাঁহাদের চক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। কুশ্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্য-জড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু পরিচ্ছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, ঐ পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী ব্যক্তির কদর্য্যতা কিয়ৎ পরিমাণে প্রচ্ছন্ন করিতেও পারে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য্য অর্পণ করিতে পারে না।

আমরা এবারে যে মেঘনাদ বধের একটি রীতিমত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া অনেক পাঠক বিরক্ত হইয়া কহিবেন যে অত সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া পুস্তকের দোষগুণ ধরা অনাবশ্যক, মোটের উপর পুস্তক ভাল লাগিলেই হইল। আমরা বলি এমন অনেক চিত্রকর আছেন, যাঁহারা বর্ণপ্রাচুর্য্যে তাঁহাদের চিত্র পূর্ণ করেন, সে চিত্র দূর হইতে সহসা নয়ন আকর্ষণ করিলেও প্রকৃত শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তি সে চিত্রকরেরও প্রশংসা করেন না, সে চিত্রেরও প্রশংসা করেন না, তাঁহারা বিশেষ বিশেষ করিয়া দেখেন যে, চিত্রে ভাব কেমন সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং ভাবশূন্য চিত্র দেখিলেই তাঁহারা তৃপ্ত হন। কাব্যসম্বন্ধেও ঐরূপ

বলিতে পারা যায়। আমরা অধিক ভূমিকা করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক, এখন যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে তাহারই অবতারণা করা যাক।

লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিৎ, রাবণ, সীতা, প্রমীলা, ইন্দ্র, দুর্গা, মায়াদেবী, লক্ষ্মী ইহাঁরাই মেঘনাদবধের প্রধান চরিত্র। ইহার মধ্যে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই, এবং কতকগুলি আমাদের মনের মত হয় নাই। প্রথম, পুস্তক আরম্ভ করিতেই রাবণকে পাই। প্রথমে আমরা ভাবিলাম, কি একটি ভীষণ চিত্রই পাইব, গগনস্পর্শী বিশাল দশানন গম্ভীর, ভীষণ, অন্ধকারময় মূর্ত্তিতে উচ্চ প্রকাণ্ড সভামণ্ডপে আসীন, কিন্তু তাহা নহে, তাহা খুঁজিয়া পাই না। পাঠক প্রথমে একটি স্ফটিকময় রত্নরাজিসমাকুল সভায় প্রবেশ কর; সেখানে বসন্তের বাতাস বহিতেছে, কুসুমের গন্ধ আসিতেছে, চন্দ্রাননা চারুলোচনা কিঙ্করী চামর ঢুলাইতেছে, মদনের প্রতিরূপ ছত্রধর ছত্র ধরিয়া আছে, যাহা এক ভীষণের মধ্যে আছে দৌবারিক, কিন্তু দৌবারিককে মনে করিতে গিয়া শিবের রুদ্রভাব কমাইতে হয়। কবি পাণ্ডবশিবির দ্বারে শূলপাণি রুদ্রেশ্বরের সহিত দ্বারবানের তুলনা দিয়াছেন। পুষ্করিণীর সহিত সমুদ্রের তুলনা দিলে সমুদ্রকেই ছোট বলিয়া মনে হয়। কেহ বলিবেন যে, রামায়ণের রাবণ রত্নরাজি-সমাকুলিত সভাতেই থাকিত, সুতরাং মেঘনাদবধে অন্যরূপ কি করিয়া বর্ণিত হইবে? আমরা বলি রত্নরাজিসঙ্কুল সভায় কি গাম্ভীর্য্য অর্পণ করা যায় না? বাল্মীকি রাবণের সভা বর্ণনা করিতে বলিয়াছেন "রাবণের সভা তরঙ্গসঙ্কুল, নক্রকুম্ভীর ভীষণ সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর" (১) বাঙ্গালার একটি ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত বাল্মীকির বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে যাওয়া অন্যায় বটে, কিন্তু কোন কোন পাঠকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে তাঁহারা বুঝিবেন না।

ভূতলে অতুল সভা—স্ফটিকে গঠিত;
তাহে শোভে রত্নরাজি, মানসসরসে
সরস কমলকুল বিকশিত যথা।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত স্তম্ভ সারি সারি
ধরে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি,
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা,
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে
খচিত মুকুলে ফুলে পল্লবের মালা
ব্রতালয়ে। ইত্যাদি,

ইহা কি রাবণের সভা? ইহাত নাট্যশালার বর্ণনা!

কতকগুলি পাঠকের আবার পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন রাবণের সভা মহান্ করিতেই হইবে তাহার অর্থ কি? না হয় সুন্দরই হইল, ইহাঁদের কথার উত্তর দিতে আমাদের অবকাশ নাই এবং ইচ্ছাও নাই। এক কথায় বলিয়া রাখি যে, কবি ব্রজাঙ্গনায় যথাসাধ্য কাকলী, বাঁশরী স্বরলহরী, গোকুল বিপিন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারিতেন,

(১) শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। সুন্দরকাণ্ড।

কিন্তু মহাকাব্য রচনায়, বিশেষ রাবণের সভা বর্ণনায় মিষ্ট ভাবের পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতে আমরা উচ্চ, প্রকাণ্ড, গম্ভীর ভাব প্রার্থনা করি। এই সভার বর্ণনা পাঠ করিয়া দেখি রাবণ কাঁদিতেছেন, রাবণের রোদনে পুস্তকের প্রারম্ভ ভাগ যে নষ্ট হইয়া গেল, তাহা আর সুরুচি পাঠকদের বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ভাল, এ দোষ পরিহার করিয়া দেখা যাউক, রাবণ কি ভয়ানক শোকেই কাঁদিতেছেন ও সে রোদনই বা কি অসাধারণ; কিন্তু তাহার কিছুই নয়, বীরবাহুর শোকে রাবণ কাঁদিতেছেন। অনেকে কহিবেন, ইহা অপেক্ষা আর শোক কি আছে। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখুন, বীরবাহুর পূর্ব্বে রাবণের কত পুত্র হত হইয়াছে, সকল ক্লেশের ন্যায় শোকও অভ্যস্ত হইয়া যায়। এখন দেখা যাউক, রাবণের রোদন কি প্রকার। প্রকাণ্ড দশানন কাঁদিতেছেন কিরূপে।

"এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে,
অবিরল অশ্রুধারা—তিতিয়া বসনে"
ইত্যাদি।

রাণী মন্দোদরীকে কাঁদাইতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা পড়িলেই আমাদের মনে হয়, গালে হাত দিয়া একটি বিধবা স্ত্রী লোক কাঁদিতেছে। একজন সাধারণ নায়ক এরূপ কাঁদিতে বসিলে আমাদের গা জ্বলিয়া যায়, তাহাতে ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে সে নায়ক নয়, যিনি বাহুবলে স্বর্গ পুরী কাঁপাইয়াছিলেন এবং যাঁহার এতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল যে, তাঁহার চক্ষের উপরে একটি একটি করিয়া পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতা নিহত হইল, ঐশ্বর্য্যশালী জনপূর্ণ কনক-লঙ্কা ক্রমে ক্রমে শ্মশানভূমি হইয়া গেল, অবশেষে যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রামের নিকট নত হন নাই, তাঁহাকে এইরূপ বালিকাটির ন্যায় কাঁদাইতে বসান অতি ক্ষুদ্র কবির উপযুক্ত। ভাবুক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, মন্দোদরীই বিলাপ করিতে হইলে বলিতেন যে;

"হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীরচূড়ামণি!
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে?
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুই? হায়রে কেমনে
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে
এ বিপুল কুলমান এ কালসমরে?"
ইত্যাদি—

রাবণের ক্রন্দন দেখিয়া "সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ সারণ" সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন

"এ ভবমণ্ডল
মায়াময়, বৃথা এর সুখ দুঃখ যত।"

রাবণ কহিলেন "কিন্তু জেনে শুনে তবু কাঁদে এপরাণ অবোধ" ইহার পর দূত যে বীরবাহুর যুদ্ধের বর্ণনা করিলেন তাহা মন্দ নহে, তাহাতে কবি কথা গুলি বেশ বাছিয়া বসাইয়াছেন। তাহার পরে দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিল—"কাঁদে যথা বিলাপী স্মরিয়া পূর্ব্বদুঃখ" এ যথাটি অতিশয় অযথা হইয়াছে। অমনি সভাশুদ্ধ কাঁদিল, রাবণ কাঁদিল, আমার

মনে হইল আমি একরাশি স্ত্রীলোকের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম।

"অশ্রুময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ,
মন্দোদরী মনোহর,"

একেত অশ্রুময় আঁখি রাবণ, তাহাতে আবার "মন্দোদরী মনোহর," আমরা বাল্মীকির রাবণকে হারাইয়া ফেলিলাম। বড় বড় কবিরা এক একটি বিশেষণে তাঁহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের স্বপক্ষে এক এক আকাশ ভাব আনিয়া দেন। রোদনের সময় রাবণের "মন্দোদরী মনোহর" বিশেষণ দিবার প্রয়োজন কি? যখন কবি রাবণের সৌন্দর্য্য বুঝাইবার জন্য কোন বর্ণনা করিবেন তখন "মন্দোদরী মনোহর" রাবণের বিশেষণ অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। তৎপরে দূত তেজের সহিত বীরবাহুর মৃত্যু বর্ণনা করিলেন, তখন রাবণের বীরত্ব ফিরিয়া আসিল, কেন না ডমরুধ্বনি না শুনিলে ফণী কখন উত্তেজিত হয় না। তাহার পরে শ্মশানে বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া

"মহাশোকে শোকাকুল কহিলা রাবণ।
যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এশয়নে
সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় শত ধিক্ তারে।"

এতদূর পড়িয়া আশা হয় যে এবার বুঝি রাবণের উপযুক্ত রোদনই হইবে কিন্তু তাহার পরেই আছে।

"তবু বৎস যে হৃদয় মুগ্ধ মোহমদে
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্র আঘাতে
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন
অন্তর্যামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম।
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী।
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কিহে তুমি
হও সুখী? পিতা সদা পুত্র দুঃখে দুঃখী
তুমি হে জগতপিতা, একি রীতি তব?
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্রকেশরী
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে?"

সুরুচি পাঠকেরা কখনই বলিবেন না যে, ইহা রাবণের উপযুক্ত রোদন হইয়াছে।

"এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর"

ভাবিলাম মহাকবি সাগরের কি একটি মহান, গম্ভীর চিত্রই করিবেন, অন্য কোন কবি এ সুবিধা ছাড়িতেন না, সমুদ্রের গম্ভীর চিত্র দূরে থাক্, কবি কহিলেন

"বহিছে জলস্রোত কলরবে
স্রোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে"

যাঁহাদের কবি আখ্যা দিতে পারি তাঁহাদের মধ্যে কেহই এরূপ নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহই বিশাল সমুদ্রের ভাব এত ক্ষুদ্র করিয়া ভাবিতে পারেন না। এই স্থলে পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য রামায়ন হইতে একটি উৎকৃষ্ট সমুদ্র বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

১ "বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও

১ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ। যুদ্ধকাণ্ড, চতুর্থ সর্গ।

উদ্দেশ নাই, চতুর্দ্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজন্তুগণে পূর্ণ; প্রদোষকালে অনবরত ফেন উদ্গার পূর্ব্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন পূর্ব্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছাস বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিম্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর গভীরদর্শন; উহার ইতস্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি জলজন্তু সকল প্রচণ্ডবেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলস্পর্শ; ভীম অজগরগণ গর্ত্তে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ময়; সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাস্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং সমুদ্রে তরঙ্গজাল; আকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সঙ্ঘর্ষ নিবন্ধন মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ; উহা রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গম্ভীর রব বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।"

রাবণ সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া যাহা কহিলেন তাহা সুন্দর লাগিল। রাবণ পুনরায় সভায় আসিয়া,

"শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে
মহামতি, পাত্র মিত্র, সভাসদ্ আদি
বসিলা চৌদিকে, আহা নীরব বিষাদে!"

হেন কালে রোদনের "মৃদু নিনাদ' ও কিঙ্কিনীর "ঘোর রোল" তুলিয়া চিত্রাঙ্গদা আইলেন, কবি তখন একটি ঝড় বাধাইলেন এই ঝড়ের রূপকটি অতিশয় হাস্যজনক।

"সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ু; অশ্রু বারিধারা
আসার, জীমূত-মন্দ্র হাহাকার রব।"

এই ঝড় উপস্থিত হইতেই অমনি নেত্রনীরসিক্তা কিঙ্করী দূরে চামর ফেলিয়া দিল এবং ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে বসিল, আর পাত্র মিত্র সভাসদ আদি অধীর হইয়া "ঘোর কোলাহলে" কাঁদিতে লাগিল। রাবণের সভায় এত কান্না ত আর সহ্য হয় না, পাত্র মিত্র সভাসদ আদিকে এক একটি খেলেনা দিয়া থামাইতে ইচ্ছা করে। একটু শোকে কিঙ্করী চামর ছুঁড়িয়া ফেলিল, একটু শোকে ছত্রধর ছত্র ফেলিয়া কাঁদিতে বসিল, এক ত ইহাতে রাজসভার এক অপূর্ব্ব ভাব মনে আসে, দ্বিতীয়তঃ ক্রোধেই চামর আদি দূরে ফেলিয়া দিবার সম্ভাবনা, শোকে বরং হস্ত হইতে অজ্ঞাতে খসিয়া পড়িতে পারে। মহিষী রাবণকে যাহা কহিলেন তাহা ভাল লাগিল, রাবণ কহিলেন,

"বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর।"

এই উদাহরণটি অতিশয় সঙ্কীর্ণ হই-

য়াছে; যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকিতেন তবে দোষপরিচ্ছেদে যেখানে সূর্য্যের সহিত কুপিত কপি কপোলের তুলনা উদ্ধৃত করিয়াছেন সেই খানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত। দূতের ডমরুধ্বনিতে, চিত্রাঙ্গদার শোকার্ত্ত ভৎসনায় রাবণ শোকে অভিমানে "ত্যজি সুকনকাসন উঠিল গর্জ্জিয়া" সুকনকাসন, সুসিন্দুর, সুসমীরণ, সুআরাধনা, সুকবচ, সুউচ্চ, সুমনোহর, কথাগুলি কাব্যের স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, এগুলি তেমন ভাল শুনায় না। ইহার পরে রাবণ সৈন্যদের সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন, রণসজ্জার বর্ণনা তেমন কিছু চিত্রিতবৎ হয় নাই, নহিলে উদ্ধৃত করিতাম।

যাহা হউক প্রথম সর্গের এত খানি পড়িয়া যদি আমাদের রাবণের চরিত্র বুঝিতে হয় ত কি বুঝিব? রাবণকে কি মন্দোদরী বলিয়া আমাদের ভ্রম হইবে না? কোথায় রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু শুনিয়া পদাহত সিংহের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিবেন, না সভাশুদ্ধ কাঁদাইয়া কাঁদিতে বসিলেন! কোথায় পুত্রশোক তাঁহার কৃপাণের শান-প্রস্তর হইবে, কোথায় প্রতিহিংসা তাঁহার শোকের ঔষধি হইবে, না তিনি স্ত্রীলোকের শোকাগ্নি নির্ব্বাণের উপায় অশ্রুজলের আশ্রয় লইয়াছেন। কোথায় যখন দূত বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাঁদিবে তখন তিনি বলিবেন যে, আমার বীরবাহুর মৃত্যু হয় নাই ত তিনি অমর হইয়াছেন, না সারণ তাঁহাকে বুঝাইবে যে "এ ভবমণ্ডল মায়াময়" আর তিনি উত্তর দিবেন "তাহা জানি তবু জেনে শুনে কাঁদে এ পরাণ অবোধ!" যখন রাবণ বীরবাহুর মৃত কায় দেখিয়া বলিতেছেন "যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, বীরকুলসাদ এ শয়নে সদা" তখন মনে করিলাম, বুঝি এতক্ষণে মন্দোদরীর পরিবর্ত্তে রাবণকে পাইলাম, কিন্তু তাহা নয়, আবার রাবণ কাঁদিয়া উঠিলেন। রাবণের সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলনা করা যায় তবে স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বৃত্রের মহান ভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি তাহার চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা দেখিয়াই বৃত্রকে প্রকাণ্ড দৈত্য বলিয়া চিনিতে পারিলাম।

"নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস
পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ,
নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায়
বৃত্রাসুর প্রবেশিল তেমতি সভায়
ভ্রূকুটী করিয়া দর্পে ইন্দ্রাসন পরে
বসিল, কাঁপিল গৃহ দৈত্যপদভরে।"

মেঘনাদ বধের প্রথম সর্গের উপসংহার ভাগে যখন ইন্দ্রজিৎ রাবণের নিকট যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা করিলেন, তখন রাবণ কহিলেন "একাল সমরে নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা বারম্বার" কিন্তু বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় যখন পিতার নিকট সেনাপতি হইবার প্রার্থনা করিলেন তখন বৃত্র কহিলেন,

রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ,
পূর্ণ কর যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে;

বাসনা আমার নাই করিতে হরণ
তোমার সে যশঃপ্রভা পুত্র যশোধর!
ত্রিলোকে হোয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও
দৈত্যকুল উজ্জ্বলিয়া, দানবতিলক!
তবে যে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ
অদ্যাপি প্রজ্বল এত, হেতু সে তাহার
যশোলিপ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা
নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া।
অনন্ত তরঙ্গময় সাগর-গর্জ্জন,
বেলাগর্ভে দাঁড়াইলে, যথা সুখকর;
গভীর শর্ব্বরী যোগে গাঢ় ঘনঘটা
বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে সুখ;
কিম্বা সে গঙ্গোত্রীপার্শ্বে একাকী দাঁড়ায়ে
নিরখি যখন অম্বুরাশি ঘোর নাদে
পড়িছে পর্ব্বতশৃঙ্গ স্রোতে বিলুণ্ঠিয়া,
ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত!
তখন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি,
দুর্জ্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত;
সমরতরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা,
সেই সুখ চিত্তে মম হয়রে উত্থিত॥

ইহার মধ্যে ভয়, ভাবনা কিছুই নাই, বীরোচিত তেজ। মেঘনাদবধ কাব্যে অনেক গুলি "প্রভঞ্জন" "কলম্বকুল" প্রভৃতি দীর্ঘপ্রস্থ কথায় সজ্জিত ছত্র সমূহ পাঠ করিয়া তোমার মন ভারগ্রস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু এমন ভাব-প্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া পাইবে। অনেক পাঠকের স্বভাব আছে যে তাঁহারা চরিত্র চিত্রে কি অভাব কি হীনতা আছে তাহা দেখিবেন না, কথার আড়ম্বরে তাঁহারা ভাসিয়া যান, কবিতার হৃদয় দেখেন না, কবিতার শরীর দেখেন। তাঁহারা রাবণের ক্রন্দন অশ্রু আকর্ষণ করিলেই তৃপ্ত হন, কিন্তু রাবণের ক্রন্দন করা উচিত কি না তাহা দেখিতে চান না. এই জন্যই বঙ্গদেশময় মেঘনাদবধের এত সুখ্যাতি। আমরা দেখিতেছি কোন কোন পাঠক ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা ঘুরাইবেন যে, সমালোচক রাবণকে কেন তাহার কাঁদিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? এক জন চিত্রকর একটি কালীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়াছিল, আমি সেই মূর্ত্তিটি দেখিয়াছিলাম; পাঠকেরা জানেন, পুরাণে কালীর কিরূপ ভীষণ চিত্রই অঙ্কিত আছে, অমাবস্যার অন্ধকার নিশীথে যাঁহার পূজা হয়, আলুলিত কুন্তলে বিকট হাস্যে যিনি শ্মশান ভূমিতে নৃত্য করেন, নরমুণ্ডমালা যাঁহার ভূষণ, ডাকিনী যোগিনীগণ যাঁহার সঙ্গিনী, এমন কালীর চিত্র আঁকিয়া চিত্রকর তাঁহাকে আপাদ মস্তক স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত করিয়াছে, অনেক কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই চিত্রটির বড়ই প্রশংসা করিয়াছিলেন, যাঁহারা সংহারশক্তিরূপিণী কালিকার স্বর্ণভূষণে কোন দোষ দেখিতে পান না তাঁহারা রাবণের ক্রন্দনে কি দোষ আছে ভাবিয়া পাইবেন না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের জন্য এই সমালোচনা লিখিত হইতেছে না। মূল কথা এই, বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে যে, তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল

ঘটনা ও রাজাদিগের নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই বা স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতেও শিখেন নাই। বাল্মীকির রামায়ণে শোকের সময় রাবণের কিরূপ অবস্থা বর্ণিত আছে, এস্থলে তাহা অনুবাদ করিয়া পাঠকদের গোচরার্থে লিখিলাম, ইহাতে পাঠকেরা দেখিবেন বাল্মীকির রাবণ হইতে মেঘনাদবধের রাবণের কত বিভিন্নতা।

অনন্তর হনুমান কর্ত্তৃক অক্ষ নিহত হইলে রাক্ষসাধিপতি মনঃসমাধান পূর্ব্বক শোক সম্বরণ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে রণে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।[১] মনঃসমাধান পূর্ব্বক শোক সম্বরণ করার মধ্যে রাবণের যে মহান ভাব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যদি ইংরাজি-পুঁথি-সর্ব্বস্ব পাঠকেরা দেশীয় কবি বাল্মীকি লিখিয়াছেন বলিয়া বুঝিতে না পারেন, এইজন্য ইংরাজী কবি মিল্‌টন হইতে তাহার আংশিক সাদৃশ্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি,

"Thrice he essay'd and thrice, in spite of scorn,
Tears, such as angels weep, burst forth:—"

ধূম্রাক্ষ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া কৃতাঞ্জলি-বদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিলেন, অকম্পনকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্র যুদ্ধবিশারদ ঘোরদর্শন দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থে নির্গত হউক।[২]

অতঃপর ক্রুদ্ধ রাবণ অকম্পন হত হইয়াছেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ দীনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাক্ষসপতি মুহূর্ত্তকাল মন্ত্রীদিগের সহিত চিন্তা করিয়া ক্রোধে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহ হইতে নির্গত হইলেন।[৩]

অতিকায় নিহত হইলে তাহাদের বচন শুনিয়া শোকবিহ্বল, বন্ধুনাশবিচেতন, আকুল রাবণ কিছুই উত্তর দিলেন না। সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে শোকাভিপ্লুত দেখিয়া কেহই কিছু কহিলেন না; সকলেই চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন।

নিকুম্ভ ও কুম্ভ হত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ক্রোধে প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় হইলেন।[৪]

স্ববল ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষবধ শ্রবণে রাক্ষসেশ্বর রাবণ দ্বিগুণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।[৫]

এই সকল বর্ণনায় শোকের অপেক্ষা ক্রোধের ভাব অধিক ব্যক্ত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত পাড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে রাবণ কহিলেন,

" কুম্ভকর্ণ বলি
ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে
ভয়ে; হায় দেহ তার, দেখ, সিন্ধুতীরে
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা
বজ্রাঘাতে"

১ ৪৩ অধ্যায় সুন্দরকাণ্ড।
২ যুদ্ধকাণ্ড ২৯ অধ্যায়।
৩ যুদ্ধকাণ্ড ৩১ অধ্যায়।
৪ যুদ্ধকাণ্ড ৫৭ অধ্যায়।
৫ যুদ্ধকাণ্ড ৭৭ অধ্যায়।

বজ্রাঘাতে ভূপতিত গিরিশৃঙ্গসম, এই উদাহরণটি ত বেশ হইল, কিন্তু আবার "কিম্বা তরু" দিয়া কমাইবার কি প্রয়োজন ছিল, যেন কবি গিরিশৃঙ্গেও প্রকাণ্ড ভাব বুঝাইতে না পারিয়া " কিম্বা তরু " দিয়া আরো উচ্চ করিয়াছেন।

"তবে যদি একান্ত সমরে
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পূজ ইষ্টদেবে"

প্রভৃতি বলিয়া রাবণ ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন, তখন বন্দীদের একটি গানের পর প্রথম সর্গ শেষ হইল।

সপ্তম সর্গে বর্ণিত আছে, মহাদেব রাবণকে ইন্দ্রজিতের নিধনবার্ত্তা জানাইতে ও রুদ্রতেজে পূর্ণ করিতে বীরভদ্রকে রাবণসমীপে প্রেরণ করিলেন।

চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নামিলা চৌদিকে
সভয়ে, সৌন্দর্য্য তেজে হীনতেজা রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূল ছায়া পড়িল ভূতলে।
গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরব দূতে। উতরিলা রথী
রক্ষঃপুরে ; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনকলঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।

মেঘনাদবধ কাব্যে মহান ভাবোত্তেজক যে তিন চারিটি মাত্র বর্ণনা আছে তন্মধ্যে ইহাও একটি। রাবণের সভায় গিয়া এই " সন্দেশবহ" ইন্দ্রজিতের নিধনবার্ত্তা নিবেদন করিল, অমনি রাবণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ; রুদ্রতেজে বীরভদ্র বলী রাবণের মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। পরে বীরভদ্র যুদ্ধের বিবরণ বিস্তারিত রূপ বর্ণনা করিয়া কহিলেন,

"প্রফুল্ল হায়, কিংশুক যেমনি
ভূপতিত, বন মাঝে প্রভঞ্জনবলে
মন্দিরে দেখিনু শূরে।"

বায়ুবলচ্ছিন্ন কিংশুক ফুলটির মত মৃত মহাবীর মেঘনাদ পড়িয়া আছেন, ইহা ত সমুচিত তুলনা হইল না। একটি মৃত বালিকার দেহ দেখিয়া তুমি ঐরূপ বলিতে পারিতে! নহিলে দূতের বাক্য মর্ম্মস্পৃক্ হইয়াছে। পরে দূত উপরি উক্ত কথা গুলি বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এইবার রাবণ গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

"একনক-পুরে,
ধনুর্দ্ধর আছে যত সাজ শীঘ্রকরি!
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা
এ বিষম জ্বালা যদি পারিবে ভুলিতে!"

পাঠকেরা বলিবেন এই বার ত হইয়াছে ; এই বার ত রাবণ প্রতিহিংসাকে শোকের ঔষধি করিয়াছেন, কিন্তু পাঠক হয়ত দেখেন নাই " তেজস্বী আজি মহারুদ্র তেজে" রাবণ স্বভাবতঃ ত এত তেজস্বী নন, তিনি মহা রুদ্রতেজ পাইয়াছেন সেই জন্য আজ উন্মত্ত। কবি বীরবাহুর শোকে রাবণকে স্ত্রী লোকের ন্যায় কাঁদাইয়াছেন, সুতরাং ভাবিলেন যে রাবণের যেরূপ স্বভাব, তিনি তাঁহার প্রিয়তম পুত্র ইন্দ্রজিতের নিধনবার্ত্তা শুনিলে বাঁচিবেন কিরূপে? এই নিমিত্তই রুদ্রতেজাদির কল্পনা করেন। ইহাতেও রাবণ যে স্ত্রীলোক সেই-

স্ত্রীলোকই রহিলেন। এই নিমিত্ত ইহার পর রাবণ যে যে স্থলে তেজস্বিতা দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার স্বভাব-গুণে নহে তাহা দেব-তেজের গুণে।

মেঘনাদ-বধ কাব্যে কবি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক রাক্ষস-পতি রাবণকে ক্ষুদ্রতম মনুষ্য করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নয়। রাবণকে তিনি মহান্ চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে স্ত্রী প্রকৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন; তিনি তাহাকে কঠোর হিমাদ্রিসদৃশ করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু "কোমল সে ফুলসম" করিয়া গড়িয়াছেন। ইহা আমরা অনুমান করিয়া বলিতেছি না, মাইকেল আমাদের কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুকে যে পত্র লিখেন তাহার নিম্নলিখিত অনুবাদটি পাঠ করিয়া দেখুন।

"এখানকার লোকেরা অসন্তোষের সহিত বলিয়া থাকে যে, মেঘনাদ-বধ কাব্যে কবির মনের টান্ রাক্ষসদিগের প্রতি। বাস্তবিক তাহাই বটে। আমি রাম এবং তাঁহার অনুচরদিগকে ঘৃণা করি, কিন্তু রাবণের ভাব মনে করিলে আমার কল্পনা প্রজ্জ্বলিত ও উন্নত হইয়া উঠে। রাবণ লোকটা খুব জম্‌কালো ছিল*।

মেঘনাদ-বধকাব্যে রাবণের চরিত্র যে-রূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহাই যদি কবির কল্পনার চরম উন্নতি হইয়া থাকে তবে তিনি কাব্যের প্রারম্ভ-ভাগে "মধুকরী কল্পনা দেবীর" যে এত করিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন তাহার ফল কি হইল? এই খানে আমরা রাবণকে অবসর দিলাম।

ভঃ—

ক্রমশঃ

জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজি সভ্যতা।

(বকল্ সাহেব-কৃত 'ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস।)

ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাসে বকল্ সাহেব বলেন যে, ধর্ম্ম-নীতির উপর সভ্যতার উন্নতি তত নির্ভর করে না, জ্ঞানের উন্নতিতেই সভ্যতার প্রকৃত উন্নতি। তিনি স্বকীয় মত সমর্থনার্থ এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যখন সভ্যতা ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত ও উন্নত হইতেছে তখন তাহার কারণ এরূপ কোন বস্তু হইতে পারে না যাহা পরিবর্ত্তনশীল বা উন্নতিশীল নহে। চারিদিকের আহু সঙ্গিক ঘটনাবলী যদি অপরিবর্ত্তিত ভাবে থাকে

* People here grumble and say that the heart of the poet in 'মেঘনাদ' is with the Rakshasas! And that is the real truth. I despise Ram and his rabble, but the idea of "রাবণ" elevates and kindles my imagination. He was a grand fellow.

তাহা হইলে কোন একটী অচল কারণ হইতে সচল কার্য্য কখনই প্রসূত হইতে পারে না। ধর্ম্মনীতি এইরূপ একটী অচল কারণ, ইহা হইতে সভ্যতারূপ সচল কার্য্য কখনই সমুদ্ভূত হইতে পারে না। অন্যের ভাল করিবে—পরের উপকারের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবে—প্রতিবাসীকে আপনার মত ভাল বাসিবে—শত্রুকেও মার্জ্জনা করিবে—ইন্দ্রিয় দমন করিবে—পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ভক্তি করিবে—এই সমস্ত উপদেশই ধর্ম্মনীতির সার উপকরণ; এই সকল উপদেশ সহস্র সহস্র বৎসর হইতে প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তথাপি আর একটী নৈতিক সত্য একাল পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইল না; কিন্তু জ্ঞান সম্বন্ধে সেরূপ বলা যাইতে পারে না। জ্ঞান কোন একটী নির্দ্দিস্ট সীমায় আসিয়া বিশ্রাম করে না। উহা চির-উন্নতিশীল। অধুনাতন সভ্যতম ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ধর্ম্ম-নীতি-ঘটিত এরূপ একটী সত্যও জানা নাই যাহা পুরাকালের লোকেরা জানিতেন না; কিন্তু জ্ঞান-সম্বন্ধে এখনকার লোকেরা জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে নূতন নূতন সত্য কেবল আবিষ্কৃত করিয়াছেন এমত নহে, চির-প্রচলিত সত্যানুসন্ধানের প্রণালী পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়াছেন, এবং এরূপ নূতন নূতন বিজ্ঞান শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা পুরাকালীন্ মহা-পণ্ডিত দিগের স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। বকল্ সাহেব আরও বলেন যে, নীতি জ্ঞান অপেক্ষা শুদ্ধ যে উন্নতিশীল এমত নহে, উহার ফলও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। বুদ্ধি-দ্বারা যে সকল সত্য উপার্জ্জিত হয়, তাহা সকল দেশেই যত্নপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হয়, এইজন্য তৎসমুদায় মনুষ্য-জাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে, এবং বংশ-পরম্পরা তাহার ফলভোগেও সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদিগের নীতি হইতে যে সকল সৎকার্য্য প্রসূত হয়, তাহার ফল তত দূর-প্রবাহী নহে, ব্যক্তি বিশেষেই তাহা আবদ্ধ থাকে। বকল্ সাহেব আরও বলেন যে, কোন কোন স্থলে নীতি হইতে মঙ্গল হওয়া দূরে থাকুক্ প্রত্যুত অমঙ্গলেরই উৎপত্তি হয়। কোন একজন অনভিজ্ঞ লোকের যদি উদ্দেশ্য সৎ হয়, এবং যদি সেই উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষমতাও তাহার যথেস্ট থাকে, তাহা হইলে প্রায়ই তাহা দ্বারা মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলই সংসাধিত হয়। কিন্তু যদি ঐ লোকের আন্তরিক অকৃত্রিম আগ্রহ কোনরূপে কমাইতে পার, তাহার নিস্বার্থ উদ্দেশ্যের সহিত কোন স্বার্থপূর্ণ হীন উদ্দেশ্য মিশাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে তৎ-কর্ত্তৃক যে অমঙ্গল সংসাধিত হয়, অনেক পরিমাণে তাহার লাঘব হইতে পারে। এক জন অনভিজ্ঞ লোক ভাল ভাবিয়া একটা অমঙ্গল কার্য্য করিতে যাইতেছে, তুমি যদি কোনরূপে তাহাকে ভয় দেখাইতে পার, তাহা হইলে হয় তো সে ভীত হইয়া সেই কার্য্য হইতে বিরত হইতে পারে। কিন্তু সে যদি কোন প্রকারে ভীত না হয়, সে যাহা ভাল মনে করিয়াছে যদি তাহা অবাধে সংসাধন করিবার অবসর ও সুবিধা

পায়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কি অনিষ্ট না ঘটিতে পারে। বকল্ সাহেব বলেন যে, যে সকল রোমক্ সম্রাট্, ধর্ম্মের জন্য খৃষ্টীয়ানদিগের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ভাল লোক ছিলেন; অর্থাৎ তাঁহাদের উদ্দেশ্য সৎ ছিল।

নীতি ও জ্ঞান-সম্বন্ধে বকল্ সাহেবের কি মত, এবং তিনি স্বমত সমর্থনার্থ যে রূপ যুক্তি-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। এক্ষণে আলোচনা করা আবশ্যক এই মতটী কতদূর সঙ্গত। প্রথমতঃ তিনি বলিয়াছেন যে, নীতিরূপ অচল কারণ হইতে সভ্যতারূপ সচল কার্য্য কখনই প্রসূত হইতে পারে না। নীতি যে অচল, অপরিবর্ত্তনীয়, ও অনুন্নতিশীল তাহার প্রমাণ কি? মানব-ইতিহাস পাঠে বরং ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, জন-সমাজে নৈতিক জ্ঞান ক্রমশই উন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে। এক একটী অসভ্য জাতির ইতিহাস আলোচনা কর, দেখিবে প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি নীচ পশু-প্রবৃত্তি তাহাদের প্রধান কার্য্য-প্রবর্ত্তক। ডভ্ সাহেব টস্মানীয় বন্যজাতির উল্লেখ করিয়া বলেন যে, "তাহাদিগের কোন প্রকার নীতিজ্ঞান ছিল না"। অষ্ট্রেলীয়-গণ সম্বন্ধে আয়ার্ সাহেব বলেন "কোন্‌টি ন্যায় এবং কোন্‌টি বা অন্যায় এরূপ কোন নীতি-বোধ আদৌ না থাকায়, তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের এইমাত্র নিয়ম ছিল যে, সংখ্যা ও বলে শ্রেষ্ঠ হইলেই শত্রু-দিগকে অক্রমণ করা কর্ত্তব্য, নচেৎ নয়।" বর্টন সাহেব বলেন যে "পূর্ব্ব অফ্রিকায় নীতি-জ্ঞানের অস্তিত্ব মাত্রও নাই। কোন একটি সাংঘাতিক সঙ্কল্প সাধন করিতে না পারিলেই তদ্দেশবাসী মনুষ্যদিগের অনুতাপ উপস্থিত হয়, তৎভিন্ন অনুতাপ যে কি পদার্থ তাহারা জানেও না। তাহাদের মধ্যে ডাকাইতি সম্মানের কার্য্য এবং হত্যাকার্য্য যতই নিষ্ঠুররূপে সাধিত হয় ততই প্রশংসনীয় এবং যে ব্যক্তি এইরূপ হত্যা করিতে পারে, সেই প্রকৃত বীরপুরুষ।" এরূপ অনেক উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্য-ভয়ে বিরত হইলাম। অসভ্যদিগের মধ্যে নীতিজ্ঞান যে মূলেই নাই, এবিষয়ে অনেক মতামত উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের নীতির যে অত্যন্ত হীনাবস্থা তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। অধুনাতন অসভাগণের অবস্থা আলোচনা করিয়া আমরা এইরূপ ন্যায্য অনুমানে উপনীত হইতে পারি যে, অধুনাতন সভ্যজাতির পূর্ব্বপুরুষেরা যখন ঘোর অসভ্যতা-অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যেও ধর্ম্মনীতির এইরূপ হীনাবস্থা ছিল। বকল্ সাহেব কি বলিতে চাহেন যে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষেরা যৎকালে সর্ব্বাঙ্গে উল্কি পরিয়া দিগম্বর বেশে নৃত্য করিতেন তৎকালে তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম-নীতির যে রূপ অবস্থা ছিল, এখনও সেইরূপ আছে, তদপেক্ষা কি কিছুমাত্র উন্নত হয় নাই?

সুপ্রসিদ্ধ সর্ জন্ লবক্ তাঁহার "সভ্যতার উৎপত্তি ও মানবজাতির আদিম অবস্থা" বিষয়ক গ্রন্থে, অনেক আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "জাতিমাত্রেরই সাধারণ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, নৈতিক ভাব ক্রমশঃ গভীরতা প্রাপ্ত হয়।" এই "গভীরতা" শব্দের অর্থ অতি গভীর। কোন অসভ্যতম জাতির মধ্যেও কোন না কোন এরূপ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি জন্মাইতে পারেন, যিনি তৎকালীন কিম্বা তজ্জাতীয় মনুষ্য অপেক্ষা দুই এক পদবী উন্নত এবং যাঁহার মনে দু একটী নৈতিক জ্ঞানের সঞ্চার হইয়াছে। মনে কর, তিনি স্বীয় সমাজমধ্যে সেই সকল নূতন সত্য প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহার স্বজাতীয়েরা অপেক্ষাকৃত অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী, সুতরাং তাঁহার উপদেশগুলি সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইল না। হয়তো তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশে তাঁহার সন্তানসন্ততির মধ্যে নৈতিক জ্ঞান কথঞ্চিৎ সঞ্চারিত হইল, ক্রমে এই নৈতিক জ্ঞান তাঁহার পুত্রপৌত্র প্রভৃতি বংশপরম্পরা-ক্রমে প্রবাহিত হইল। ক্রমে এই জ্ঞান গভীরতা প্রাপ্ত হইয়া দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হইল—ক্রমে এই বিশ্বাসের আদর্শে তাহাদিগের আচার ব্যবহার গঠিত হইয়া জাতি-সাধারণের উন্নতি সাধন করিল। নৈতিক উন্নতির পদ্ধতিই এইরূপ। নীতিজ্ঞানের আবিষ্কার হইলেই হইল না—ঐ জ্ঞান যতক্ষণ না ব্যবহারে পরিণত হয়, ততক্ষণ উহা কোন উপকারে আইসে না। যতক্ষণ নীতি, জ্ঞানের সীমা-মধ্যে অবস্থিতি করে, ততক্ষণ তাহার সার্থকতা নাই—যখনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, তখনই তাহার সার্থকতা। বকল্ সাহেব বলেন, কতকগুলি নৈতিক উপদেশ একই ভাবে সহস্র সহস্র বৎসর প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, তথাপি কোন নূতন নৈতিক তত্ত্ব এ পর্য্যন্তও আবিষ্কৃত হইল না! সুতরাং নীতির ক্রমোন্নতি হইতেই পারে না। এই যুক্তিটী কতদূর অসঙ্গত বোধ হয় পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যখন অসভ্যজাতির ইতিহাস পাঠে প্রতিপন্ন হয় যে, নৈতিক জ্ঞান ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তখন আমরা এই ঊনবিংশতি শতাব্দীতে যে নীতিজ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হইয়াছি তাহার প্রমাণ কি? আরও নূতন নূতন নীতি-তত্ত্ব যে ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে। আর সহস্র বৎসর পরে সভ্যতার কিরূপ উন্নতি হইবে, কল্পনা করিয়া দেখিলে এই ঊনবিংশতি শতাব্দীর স্পর্দ্ধিত সভ্যতা যে অসভ্যতা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে তাহাই বা আশ্চর্য্য কি। ভাল, তর্কের অনুরোধে আপাততঃ স্বীকার করা গেল যে, নীতি-জ্ঞানের যতদূর উন্নতি হইতে পারে তাহা এক্ষণে হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নীতি যতক্ষণ ব্যবহারে পরিণত না হয়, ততক্ষণ তাহার সার্থকতা নাই। নীতির উন্নতি ও নীতি-জ্ঞানের উন্নতি সমান কথা নহে। একজন ইংরাজ আজন্মকাল বাইবেলের এই উপদেশটী শুনিয়া আসিয়াছেন যে

"যদি কেহ তোমার বাম গণ্ডে চপেটাঘাত করে, তাহা হইলে আর এক চড় খাইবার জন্য দক্ষিণ গণ্ডটী ফিরাইয়া দিবে"—কোন ইংরাজ কি এই উপদেশের দিক্ দিয়াও যান? দক্ষিণ গণ্ড ফিরাইয়া দেওয়া দূরে থাক্, তিনি হয়তো এক চড়ের পরিবর্ত্তে দশ চড় শুধ-শুদ্ধ ফিরাইয়া দেন। সেই জন্য বলি, ইংলণ্ডে নীতি-জ্ঞানের যদিও বা উন্নতি হইয়া থাকে, প্রকৃত নীতির উন্নতি হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে নীতিজ্ঞানরূপ বীজ পতিত হইলে তাহা অঙ্কুরিত হইতে সময় লাগে—যদিও বা অঙ্কুরিত হয়, তাহা বিশ্বাস ও কার্য্যে পরিণত হইয়া সাধারণ সমাজ-মধ্যে বদ্ধমূল হইতে অনেক বিলম্ব হয়। মনুষ্যের মানসিক ভাব সকল পুরুষানুক্রমে সংক্রামিত ও গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ বিশ্বাস ও কার্য্যে পরিণত হয়।

বকল সাহেব বলেন যে "নীতি অপেক্ষা জ্ঞান কেবল যে উন্নতিশীল এমত নহে, ইহার ফলও অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। বুদ্ধি দ্বারা যে সত্য উপার্জ্জিত হয় তাহা সকল দেশেই যত্ন পূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করা হয় এবং সেই জন্য তৎসমুদায় মনুষ্যজাতির সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়ে ও বংশপরম্পরা তাহার ফল ভোগেও সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদের নীতি হইতে যে সকল সৎকার্য্য প্রসূত হয় তাহা তত দূর-প্রবাহী নহে।" একথাও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। জ্ঞান অপেক্ষা নীতির ফল কোন অংশেই স্বল্প-স্থায়ী নহে। জ্ঞানের ফল যেরূপ জাজ্বল্যমান দেখিতে পাওয়া যায়, নীতির ফল সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না বটে, যেহেতু উহা অলক্ষিত রূপে গূঢ়ভাবে মনুষ্যসমাজে কার্য্য করে। যেরূপ কোন একটি পুস্তক পাঠে জ্ঞান লাভ হয়, সেইরূপ কোন একজন সাধু লোকের দৃষ্টান্তে, শত শত লোকের জীবনে সুনীতি গূঢ়ভাবে সংক্রামিত হইয়া তাহার ফল পুরুষপরম্পরায় প্রবাহিত হয়। বরং পুস্তক-সকল রাষ্ট্র-বিপ্লবে ধ্বংস হইয়া জ্ঞানের লোপ হইতে পারে, কিন্তু একটী জাতি একেবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত না হইলে আর তাহাদের আচার-ব্যবহারগত সুনীতি বিলুপ্ত হয় না। আমাদের ভারতবর্ষে অনেক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ কাল-স্রোতে বিলীন হইয়া গিয়াছে কিন্তু আমাদের কতকগুলি আচার ব্যবহারে যে সকল সুনীতি বদ্ধমূল রহিয়াছে, তাহা বিপ্লবের পর বিপ্লবেও কিছুমাত্র ধ্বংস হয় নাই।

জ্ঞান ও নীতি পরস্পর পরস্পরের উন্নতি সাপেক্ষ, কিন্তু এই উভয়ের সমগ্র উন্নতি ভিন্ন প্রকৃত সভ্যতা কখনই সমুদিত হয় না। স্বতন্ত্রভাবে এই উভয়েরই সাধনা আবশ্যক। একটীর সাধনা করিলে অপরটীর আপনা আপনি উন্নতি হইবে এরূপ মনে করা যুক্তিসঙ্গত নহে। যেমন কোন ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধি ও হৃদয় উভয়ই সমুন্নত না হইলে কখনই তাহার প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয় না—সেইরূপ সমাজ মধ্যে জ্ঞান ও নীতির সমগ্র উন্নতি না হইলে, প্রকৃত সভ্যতার উদয় হয় না। জ্ঞান অর্জ্জনশীল, নীতি রক্ষণশীল। জ্ঞান

পিতার ন্যায় বাহির হইতে নানা সত্য আহরণ করিয়া সমাজের পুষ্টি সাধন করে, নীতি মাতার ন্যায় স্নেহ প্রেম ভক্তি-বন্ধনে সমস্ত সমাজকে একত্র আবদ্ধ করিয়া রাখে। একটী প্রকৃতি আর একটী পুরুষ। একটী জননী আর একটী জনক। জ্ঞানের গতি স্বাধীনতার দিকে, নীতির গতি সম্মিলনের দিকে। এক জনের কার্য্য আহরণ, আর এক জনের কার্য্য পরিবেশন। জ্ঞানের ফল নীতি দ্বারা পরিশোধিত না হইলে স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অহঙ্কারে পরিণত হয়, এবং জ্ঞানদ্বারা নীতি নিয়মিত না হইলে নীতির উদ্দেশ্য বিফল হয়, এবং কোন কোন স্থলে দুর্নীতিতে পরিণত হয়। এই জন্য নীতি ও জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা না করিলে সমাজ মধ্যে প্রভূত অমঙ্গলের উৎপত্তি হয়; এবং সেই জন্য প্রকৃত সভ্যতাও কখন সমুদিত হইতে পারে না। ইংরাজি সভ্যতার মধ্যে নীতি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য নিবন্ধন স্বল্প-নৈতিক জ্ঞানের যে অবশ্যম্ভাবী ফল স্বার্থ-পরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অহঙ্কার তাহা বিলক্ষণরূপে ইংরাজ-সমাজমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইংরাজ-সমাজ সম্বন্ধে এক জন সুপ্রসিদ্ধ ফরাসিস্ গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই প্রস্তাবের উপসংহার-ভাগে উদ্ধৃত করিবার বাসনা রহিল। পাঠকগণ তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন, যাহা এস্থলে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা কতদূর সত্য।

অধুনাতন ইংরাজি সভ্যতা জ্ঞান-প্রধান, এবং ভারতবর্ষীয় সভ্যতা নীতি-প্রধান। এই জন্য উভয়ই আংশিক ও অঙ্গহীন। ইংরাজ-সমাজ মধ্যে জ্ঞান, নীতি দ্বারা পরিশোধিত না হওয়ায় তাহার ফল যেরূপ স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, স্বেচ্ছাচারিতা ও অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ অধুনাতন হিন্দুসমাজে জ্ঞান দ্বারা নীতি নিয়মিত না হওয়ায় নীতির ফল নির্ব্বীর্য্যতা, অলসতা ও দাসত্বে পরিণত হইয়া অনেক স্থলে নীতির উদ্দেশ্য বিফল হইয়া গিয়াছে। "দান করিবেক" ইহা একটী নৈতিক উপদেশ; কিন্তু জ্ঞানের কথা না শুনিয়া অপাত্রে দান-প্রথা অস্মদ্দেশে প্রচলিত থাকায় কত অমঙ্গল হইতেছে, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রণালী, স্নেহ প্রেম পারিবারিক ঐক্য প্রভৃতি নীতির উপকরণে গঠিত হইয়াছে, কিন্তু জ্ঞান দ্বারা নিয়মিত না হওয়াতে তাহা হইতে প্রভূত অশুভ ফল উৎপন্ন হইতেছে। হিন্দু পরিবার-মধ্যে যিনি কর্ত্তা তিনিই পরিশ্রম পূর্ব্বক উপার্জ্জন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার সেই পরিশ্রমের ফল ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র, অধিক কি সুদূর জ্ঞাতি পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞান বিরহিত নীতির প্রভাবে আমাদের দেশে দারিদ্র্য, আলস্য ও নিরুদ্যম প্রশ্রয় পাইতেছে মাত্র; যদি এই নীতির সহিত জ্ঞান সংযুক্ত হইত, এবং এক পরিবারের অন্তর্গত থাকিয়া সকলেই সমান পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিত, তাহা হইলে পারিবারিক ঐক্য ও শ্রম বিভাগের ফলে পরিবারের ধন, শৃঙ্খলা ও বল বৃদ্ধি পাইয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইত সন্দেহ

নাই। এবং নীতি-বিরহিত জ্ঞানে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে পারে তাহা পাঠকেরা চুক্তি-বিবাহ, স্ত্রী-পরিত্যাগ, ও পিতৃমাতৃ-ভক্তির অভাব, পৃথকান্ন-পরিবার-প্রণালী প্রভৃতি ইংলণ্ডের কতকগুলি সামাজিক কুনীতি ও কুপ্রথার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে, জ্ঞান ও নীতির মধ্যে যে পরিমাণে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইবে, সেই পরিমাণে প্রকৃত সভ্যতার উদয় হইবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সময় জ্যোতিষ্, গণিত, রসায়ণ, চিকিৎসা, কাব্য, সাহিত্য,ব্যাকরণ,নীতি প্রভৃতি সকল শাস্ত্রের প্রভূত অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মনীতির উন্নতি হইয়াছিল, সেই পুরাকালীন আর্য্যসভ্যতা জ্ঞান ও নীতির সামঞ্জস্য নিবন্ধন প্রকৃত সভ্যতার পথে যে অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এবং সেই স্রোত যদি অবাধে চলিয়া আসিত, তাহা হইলে অধুনাতন ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে পৃথিবীর আদর্শ-স্বরূপ হইত তাহা আমাদিগের বিলক্ষণ প্রতীতি হয়। জ্ঞানের হীনতা প্রযুক্ত যেরূপ অস্মদ্দেশীয় অধুনাতন সভ্যতা, সেইরূপ নীতির ন্যূনতা প্রযুক্ত ইংরাজি সভ্যতা অর্দ্ধাঙ্গ হইয়া রহিয়াছে। নীতি-শিক্ষার জন্য আমাদিগকে ইংরাজের দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইবে না। আমাদের দেশে নীতির অভাব নাই। আমরা ইংরাজদিগের নিকট যে রূপ জ্ঞান শিক্ষা করিতে পারি, তাঁহারা আমাদিগের নিকট সেইরূপ নীতি শিক্ষা করিতে পারেন। নৈতিক সভ্যতায় আমরা যে তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পণ্ডিত মনিয়ার উইলিয়াম্‌স্ সাহেব একস্থলে তাহা প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"দুর্নীতি-পরায়ণ ইতর ইয়ুরোপীয়গণের পাপাচার যতদূর অনিষ্টকর, ভারতবর্ষীয়-দিগের মধ্যে যাহারা নিকৃষ্টতম প্রকৃতির লোক তাহাদিগের পাপকার্য্য ততদূর অনিস্টকর কিনা সন্দেহস্থল। ভারতবর্ষীয় ভৃত্যেরা বিশ্বাসী, সৎ, এবং প্রভুভক্ত। প্রভুর নিকট হইতে সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হইলে তাহারা ইংরাজ ভৃত্যদিগের অপেক্ষা প্রভুর প্রতি অধিকতর অনুরক্ত হয়। তাহারা ইয়ুরোপীয়দের অপেক্ষা ইতর প্রাণীর প্রতি অধিক যত্ন প্রদর্শন করে। ইয়ুরোপীয়দের অপেক্ষা তাহারা স্বভাবতঃ শিস্টাচারী, অধিকতর মিতাহারী, অধিকতর পিতৃমাতৃভক্ত, এবং উচ্চপদস্থ, বৃদ্ধ, ও বিদ্বান ব্যক্তির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাবান। আমি একটি জাহাজের কাপ্তেনকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে তিনি ভারতবর্ষীয় ও ইংরাজদের মধ্যে কোন্ জাতীয় নাবিক পছন্দ করেন; তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন—ভারতবর্ষীয়; কারণ, তাহারা ইংরাজদিগের অপেক্ষা অধিকতর বশ্য, আজ্ঞাবহ; তাহারা ইংরাজদের ন্যায় পশুবৎ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে না, এবং তাহাদের ন্যায় মাতালও হয় না।"

ফলতঃ, যাহা দ্বারা সমাজের প্রকৃত সুখ বা শুভ বর্দ্ধন এবং প্রকৃত দুঃখ বা অশুভ

নিরাকরণ হয় তাহাই যদি প্রকৃত সভ্যতা শব্দের বাচ্য হয়, তাহা হইলে জ্ঞান ও নীতির সামঞ্জস্য ব্যতীত সে সভ্যতা কখনই পৃথিবীতে সমুদিত হইতে পারে না।

সঃ—

ক্রমশঃ

বঙ্গ সাহিত্য।

(শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত সি এস প্রণীত বঙ্গ সাহিত্য।)

শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিবৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম। এই বিষয়ে যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যে যে রমেশ বাবুর গ্রন্থখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। তিনি বিলাত হইতে প্রতিগমন করিয়া যে বঙ্গীয় সাহিত্যের অনুরাগী হইয়াছেন ইহা অতিশয় আহ্লাদের বিষয়। এই হেতু আমরা রমেশ বাবুর এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

গ্রন্থকার পুস্তকের ভূমিকাতেই কবিতা কাহাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। বাস্তবিকই সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইলে কবিতার প্রকৃত লক্ষণগুলি হৃদয়পটে জ্বলদক্ষরে অঙ্কিত রাখা উচিত। কেন না, সাহিত্যের আদিম অবস্থাতে মানব-হৃদয় কবিতারূপেই স্ফূর্ত্তি পায়, কবিতাই সাহিত্যের জীবন, কবিতাই সাহিত্যের ভূষণ! কবিতার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য সম্যক্ রূপে হৃদয়ঙ্গম না করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে গেলে, হয় আমরা প্লেটোর মতন কবিমাত্রকেই দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিতে চাহিব, নয় আমরা এখনকার বঙ্গীয় পাঠকদের মত মুদ্রাঙ্কিত চোদ্দ অক্ষর দেখিলেই ভাবে উন্মত্ত হইয়া উঠিব। সুতরাং গ্রন্থের ভূমিকাতে কবিতার প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা গ্রন্থকারের পক্ষে অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, "যে ছন্দোময়ী রচনা পাঠ করিলে মনে কোন একটি বিশেষ প্রতিমা বিভাসিত হয় বা কতকগুলি ভাব পরম্পরার উদ্রেক হয় এবং সেই প্রতিমা বা ভাব-পরম্পরার অবির্ভাবে হৃদয়ের কোমলতর রসগুলি উত্তেজিত হয়, সেই রচনাকেই কবিতা বলে।" কিন্তু গ্রন্থকারের এ কথায় আমরা তৃপ্ত হইতে পারিলাম না। তাঁহার এই কথার সমালোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রেই কোমলতর রস কাহাকে বলে বুঝিতে হইবে। ইহা অবশ্যই সকলে স্বীকার করিবেন যে সমগ্র রসগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়।—কতকগুলি কোমল আর কতকগুলি উগ্র বা কদর্য্য। করুণ বা শান্তি বা ভক্তি বা প্রেম—এ সকলই কোমল—আর বীভৎস বা রৌদ্র বা ভয়ানক ইত্যাদি সকল রসই কদর্য্য

বা উগ্র—সুতরাং ইংরাজি Finer Sensibilities অর্থাৎ কোমলতর রসগুলি বলিতে উপরি উক্ত দুই বিভাগের একটি মাত্র বুঝায়। গ্রন্থকারও যে, একটি বিভাগের উপর লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার আর সন্দেহ নাই। কেন না তাহা না হইলে তিনি "finer" বা "কোমলতর" এই তর-প্রত্যয় বিশিষ্ট বিশেষণটি ব্যবহার করিবেন কেন? তিনি আপনিই বলিয়াছেন যে, করুণ ভক্তি প্রেম ইত্যাদি রসই কোমলতর রসের অন্তর্গত। কিন্তু হাস্য-রসটি উপরি উক্ত দুই শ্রেণীর কোন্ শ্রেণীর অন্তর্গত তাহা নির্ণয় করা কিছু সুকঠিন। হাস্য-রসটি তন্ন তন্ন পূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে ইহাই প্রতীতি হয় যে, অবস্থা-বিশেষে ইহাতে কোমলতা বা কদর্য্যতার প্রাধান্য থাকে। যাহাই হউক, এ দুরূহ তর্কের মধ্যে আমাদের প্রবেশ করিবার আবশ্যকতা নাই, কেননা গ্রন্থকার স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়াছেন যে, হাস্যরস কবিতার সীমাগত নহে, ইহা হাস্যরস-প্রধান একখানি সাময়িক পত্রে শোভা পাইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কবিতার সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্কই নাই।

এই সকল কারণ বশত আমরা প্রথমেই বলিয়াছি যে, কবিতার প্রকৃতি-নিরূপণ বিষয়ে রমেশ বাবুর সহিত আমরা কোন মতেই একমতাবলম্বী হইতে পারি না। আশৈশব আমরা মহাকবিদের দিব্য কল্পনা-প্রসূত যে প্রতিমাগুলি হৃদয়-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করিয়া আসিতেছি, জগৎশুদ্ধ সকলেই যে প্রতিমাগুলিকে সাদরে পূজা করিতেও আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া আসিতেছে, যে সকল প্রতিমার ধ্যানে আমাদের সুখের সময় সুখের বৃদ্ধি এবং দুঃখের সময় দুঃখের শমতা অনুভব করি, সেই প্রতিমাকে আজ আমরা কেমন করিয়া গ্রন্থকারের কথা অনুসারে অকিঞ্চিৎকর প্রলাপ-সাগরে বিসর্জ্জন করিব? "প্রকৃতির মুখে দর্পণ ধরাই" যদি প্রকৃত কবির কার্য্য হয়, অন্তর্জ্জগৎ ও বহির্জ্জগৎ—এ উভয়ই যদি প্রকৃতরূপে কবিতার আয়ত্তাধীন হয়, তাহা হইলে অন্য সকল রস উপেক্ষিত হইয়া কোমলতর রসগুলির যে কিসে প্রাধান্য হইবে তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, গ্রন্থকারও তাহা আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন নাই। মহাকবি সেক্সপিয়ার যে ফল্‌স্‌ট্যাফ্ সৃজন করিয়া জগজ্জনের সমবেত ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন,আরভিং সাহেবের মতে যে ফল্‌স্‌ট্যাফ্, "মনুষ্যের প্রমোদ-সীমা দীর্ঘ বিস্তৃত করিয়াছে" সেই ফলস্‌ট্যাফ্‌কে কেন আজ আমরা কবিত্বের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত না বলিয়া নিরস্ত থাকিব? মালতীমাধবে শ্মশানের বর্ণনা, বেণীসংহারে রাক্ষস রাক্ষসীর কথোপকথন, মিল্‌টনের মৃত্যু ও পাপের কল্পনা, দান্তের নরকবাসী ইউগোলাইনোর বৃত্তান্ত—এ সকল ত তীব্র বীভৎস রসাত্মক, —কিন্তু কে আজ কোমলতর বৃত্তির অনুরোধে ঐ সকলকে কবিতার সীমা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে সাহসী হইবে? আবার সেক্সপিয়ার ম্যাক্‌বেথে যেখানে সেই কণ্টকময় বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের মধ্যে অন্ত-

তাকার ডাকিনীত্রয়কে একত্রিত করিয়াছেন, যেখানে তাহারা তাহাদের অধিনায়িকা হেকেটীর সঙ্গে পৈশাচিক মহামন্ত্র সকল সমস্বরে উচ্চারণ করিতে করিতে অগ্নি জ্বালিয়া অদ্ভুত কটাহে অদ্ভুত উপাদান সকল নিক্ষেপ করিয়া অদ্ভুত-ভাবে নৃত্য করিতেছে, যেখানে শেষে উন্মত্তপ্রায় ম্যাক্‌বেথ্ আসিয়া "রে ছদ্মচারিণি অন্ধকারময়ি নিশাচরি ডাকিনিগণ" বলিয়া তাহাদের নৃত্য গীতে ব্যাঘাত দিতে চেস্টা করিতেছেন, যেখানে সেই জ্বলন্ত কটাহ হইতে অপরূপ মস্তক সকল ক্ষণে ক্ষণে উত্থিত আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্তর্হিত হইতেছে, সেখানে আমাদের হৃদয়ের কোন্ কোমলতর রসের উত্তেজনা হয় ?—তখন কি বরং ভয়ানক,বিস্ময়, বীভৎস ইত্যাদি কতকগুলি কঠোর অকোমল রস একত্রে মিশ্রিত হইয়া অপ্রতিহত প্রতাপে আমাদের হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত আলোড়িত করিতে থাকে না ? কিন্তু কে আজ সাহস করিয়া বলিতে পারে যে ম্যাক্‌বেথের ও-অংশ টুকু কবিতা নামের যোগ্য নয়? প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও মহাকবি একটী বিশেষ রসকেই কবিতার অদ্বিতীয় জীবন জ্ঞান করেন না। সমস্ত প্রকৃতিই তাঁহাদের প্রমোদ-ক্ষেত্র, সকল প্রকার রসই তাঁহাদের অপরিত্যজ্য; এমন কি, সেক্‌সপীয়রের দৈব-প্রতিভা তাহাতেও সন্তুষ্ট ছিল না, সে প্রতিভা প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া অলৌকিক কল্পনা-ক্ষেত্রে বিহার করিতেও ত্রুটি করে নাই। ব্যাস, হোমর, দান্তে, মিলটন, ইহাঁরা সকলেই স্বর্গ, মর্ত্ত, নরক, পরিভ্রমণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। একেত এই পৃথিবীই ক্ষুদ্র, তাহার মধ্যে আবার কোমলতর রসের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে যদি কবিতাকে সঙ্কুচিত ভাবে আবদ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে কাব্যের আবশ্যকতা কি? কবির গরিমা কোথায় ? কল্পনার প্রয়োজন কি ? তাহা হইলে কোন্ মহাকাব্যই বা আমরা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারি ? সত্য বটে মহাকবিরা প্রায়ই মহাকাব্যে হাস্যরসের অবতারণা করেন না, কিন্তু তাহার একটি বিশেষ কারণ আছে। কতকগুলি রসের দ্বারা কতকগুলি রসের সামর্থ্য বর্দ্ধিত হয়, এই হেতু মহাকাব্যে নানা প্রকার রসের সন্নিবেশ থাকে। কিন্তু হাস্যরসটি সকল প্রকার গম্ভীর রসের বিঘ্নকারী। পাঠকের হৃদয় রৌদ্ররসেই উত্তেজিত হউক, আর ভয়ানক রসেই আলোড়িত হউক, করুণরসেই দ্রবীভূত হউক বা ভক্তিরসেই পুলকিত হউক, হাস্যরসের প্রকৃত অবতারণাতে হৃদয় এতদূর শিথিল হইয়া পড়ে যে ঐ সকল গভীর রসের উদ্দীপনশক্তি একেবারে ব্যর্থ হয় এবং মহাকাব্যের উদ্দেশ্য নিষ্ফল হইয়া যায়। শুদ্ধ মহাকাব্য কেন,—কি নাটক, কি খণ্ডকাব্য কি গীতিকাব্য, যে কোন রচনা দ্বারা কবি পাঠক-হৃদয়ের দেব-প্রকৃতি উত্তেজিত করিতে চাহেন সেই রচনাতেই, হাস্যরসের বিশেষ অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকবি সেক্‌সপিয়ার যিনি ফল্‌স্ট্যাফ ও ক্যালিব্যানের সৃষ্টিকর্ত্তা, যিনি

"ভ্রান্তি-বিলাসের" রচয়িতা, তিনিই আবার হ্যাম্‌লেট্ বা ম্যাক্‌বেথ্ বা ওথেলো বা লিয়ারে হাস্য-রসের অবতারণা করিতে এতদূর সঙ্কুচিত হইয়াছিলেন কেন? আর ঐ সকল নাটকে আমরা যতটুকু হাস্যরস পাই—কি পলোনিয়সের মূর্খতা, কি দ্বারবানের বিরক্তিভাব, কি কেশিওর সুরামত্ততা, আর কি পাগ্‌লার বাচালতা, এ সকলই কি ঐ সকল মহানাটকের মুখ্য উদ্দেশ্যের প্রতিপোষক নহে? ঐ সকল কি ছলনাময়ী আলেয়ার আলোকের ন্যায় ভীষণ শ্মশানের ভীষণতা আরও বর্দ্ধিত করে না? কিন্তু হাস্যরসের ঈষৎ আভাসের দ্বারা মহাকাব্য বা মহানাটকের গম্ভীর উদ্দেশ্য রক্ষা করা সেক্‌সপিয়ারের মত অসাধারণ কবি ব্যতীত আর কাহার সাধ্যায়ত্ত? কেটো বা ভেনিস্ প্রিজার্ভড্ বা ফেয়ার পেনিটেণ্টে হাস্যরসের নাম-গন্ধও নাই কেন? কালিদাস শকুন্তলাতে প্রচলিত রীতির অনুরোধে মাধব্যের অবতারণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু শকুন্তলা নাটকের গাম্ভীর্য্য যতই গাঢ়তর হইতে লাগিল ততই মাধব্যের বিদূষকত্ব হ্রাস হইয়া সখ্য ভাব বিকাশ পাইতে লাগিল কেন? এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে মহাকবিরা হাস্যরসটিকে যে, কবিতার অযোগ্য মনে করিতেন তাহা নয়, কিন্তু পাছে রচনা-বিশেষের মুখ্য উদ্দেশ্যের হানি হয়, এই হেতু তাঁহারা সেই সেই রচনাতে হাস্যরসের পূর্ণ প্রভাব প্রকাশ করিতেন না। সত্যবটে যে ভবভূতি বা মিল্টন প্রভৃতি কতকগুলি মহাকবির মানস-প্রকৃতি গাম্ভীর্য্য-রসে এরূপ পরিপ্লুত ছিল যে, হাস্যরস বিষয়ে তাঁহাদের সম্যক্ উপেক্ষা লক্ষিত হয়, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের কবিত্বেরও লাঘব হয় নাই, অথবা হাস্যরসেরও অবমাননা হয় নাই। ডিমক্রিটস্ জগতে যাহা দেখিতেন তাহাতেই হাসিতেন, হিরাক্লিটস্ জগতে যাহা দেখিতেন তাহাতেই কাঁদিতেন, কিন্তু জগতের যথার্থ প্রকৃতি বুঝিতে হইলে ডিমক্রিটস্ ও হিরাক্লিটসের সম্মিলিত চক্ষু দিয়া জগতের দৃশ্য সমূহ দর্শন করা উচিত। বাস্তবিকই যখন আমরা দেখিতেছি যে, সমস্ত প্রকৃতিময় হাস্যরস ও করুণরস অবাধে সর্ব্বত্রই তরঙ্গিত হইতেছে—যখন দেখি প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনসূত্রেই হাস্য ও রোদন ঘোর ঘনিষ্ঠ ভাবে গ্রথিত রহিয়াছে, তখন একটি রস যে কবিতার সীমাগত আর অন্যটি যে নয় তাহা কি নৈসর্গিক বা অনৈসর্গিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে? সত্যবটে যে হাস্যরসের ফলোৎপাদন-শক্তি অতি ক্ষণস্থায়ী, সত্যবটে যে, করুণরসের মত হাস্যরস মানব হৃদয়ের প্রত্যেক শিরায় ও উপশিরায় প্রবাহিত হয় না—সত্যবটে যে এই জগতে দুঃখের ভাগই অধিক, সুতরাং কাল্পনিক দুঃখের তীব্র মূর্ত্তি দ্বারা জগতের প্রকৃত দুঃখ বিষয়ে আমাদিগকে সর্ব্বদা জাগ্রত রাখা মহাকবিদের একটি মহান্ গরিমাস্থল, কিন্তু এই সকল কারণ হেতু যে, হাস্যরস কবিতার মোহিনী সীমার বহির্ভূত তাহা

বিশেষ যুক্তি দ্বারা সপ্রমাণ না হইলে কে তাহা শিরোধার্য্য করিবে?

এখন আমরা গ্রন্থকারের কবিতার লক্ষণ-গত দ্বিতীয় দোষটি প্রদর্শন করিব।—সকলেই বোধ হয় বঙ্কিম বাবুর কৃত করুণ-রস-প্রধান "বিষ-বৃক্ষ" নামক উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন। ইহা পাঠ করিতে করিতে মনে অনেকগুলি ভাবের উদ্রেক হয়, এবং করুনরসে পাঠকের হৃদয় পর্য্যন্ত যেন দ্রব হইয়া অশ্রুরূপে প্রবাহিত হইতে থাকে। কাদম্বরীতে যখন মহাশ্বেতা নিস্তব্ধ নিশীথে পরিচারিকা মাত্র সহায় করিয়া অভিসারিকা-বেশে পুণ্ডরীকের নিকট যাইতেছিলেন তখন বন্ধু-বিয়োগ-বিধুর কপিঞ্জলের করুণ বিলাপ হৃদয়ের প্রত্যেক তন্তুতে প্রবিষ্ট হয় এবং মন একেবারে উদাস হইয়া যায়। কিন্তু রমেশ বাবুর মতে বিষ-বৃক্ষ ও কাদম্বরী এই দুই খানি গ্রন্থ কাব্য নহে, কেন না ইহা ছন্দোবন্ধে নিবন্ধ নয়। ছন্দোবন্ধে নিবদ্ধ হইলেই এই দুইটি উৎকৃষ্ট কাব্য হইত! আমরা আরো এক পদ অগ্রসর হইব,—প্রাত্যহিক সাপ্তাহিক মাসিক অনেক প্রকার সংবাদ-পত্রে আমরা প্রায়ই মর্ম্মভেদী হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাঠ করিয়া থাকি। অনেকগুলি পড়িতে পড়িতে, আমাদের মনে অনেক প্রকার প্রতিমা বা ভাব-পরম্পরা জাগরূক হইয়া উঠে, এবং আমাদের হৃদয়েও কোমলতর রস উচ্ছ্বসিত হয়। সেই সংবাদ গুলি কবিতা নহে, কিন্তু সে গুলি যদি গদ্যরূপে আলুলায়িত না থাকিয়া পয়ারে বা ত্রিপদীতে গ্রথিত থাকিত, তাহা হইলে গ্রন্থকারের মতে সেই সংবাদ গুলিও কবিতা নামের যোগ্য হইত এবং সংবাদ-লেখকেরাও কবির প্রতিপত্তি লাভ করিত!

গ্রন্থকার কবিতার যে লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন তাহার দুইটি মাত্র অঙ্গ। আমরা দেখিলাম সেই দুইটী অঙ্গই ভ্রমাত্মক। আমাদের বোধ হয় গ্রন্থকার কোন কোন ইংরাজ আলঙ্কারিকের প্রলাপ বাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া ঘোর প্রমাদে পড়িয়াছেন। তাহাদের কূট তর্কের চাকচিক্যে ও প্রগল্‌ভতার আড়ম্বরে প্রতারিত না হইয়া, যদি সহজ জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া কবিতার লক্ষণ নির্দ্দেশ করা যায়, তাহা হইলে কেহ আর হেজ্‌লিটের মতন কবিতার শত সহস্র লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবে না, কিম্বা ইস্টুয়ার্ট্‌ মিলের মতন কবিতার সংজ্ঞা-নিরূপণ অসম্ভব বলিয়া হতাশ হইবে না।

সাহিত্যদর্পণ-কার বলিয়াছেন যে রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কিন্তু ইস্টুয়ার্ট্‌ মিল কবিতার এরূপ যুক্তিসঙ্গত লক্ষণ গ্রহণ করিবেন না। তিনি বলিবেন যে, তাহা হইলে বক্তার বক্তৃতা ও কবির কবিতা একই পদার্থ। সাহিত্য-দর্পণকার উত্তর করিবেন যে যদি বক্তার বক্তৃতা রসাত্মক হয় তাহা হইলে সেই বক্তৃতাও কাব্য। মিল প্রত্যুত্তর করিবেন যে বক্তৃতাতে আর কবিতাতে এমন একটী হৃদয়-গত মর্ম্মগত প্রভেদ আছে যে, সাহিত্য-

দর্পণ-কার নিতান্ত বিকৃতমনা না হইলে সেই প্রভেদটী উপলব্ধি করিতেন।

আগামী বারে আমরা মিল ও অন্যান্য ইংরাজ লেখকের মতের সহিত সাহিত্য দর্পণকারের মতের তুলনা করিয়া দেখিব।

গঞ্জিকা

অথবা

তুরিতানন্দ বাবাজির আক্‌ড়া।

আমাদের আক্‌ড়ার বাবাজি অতি অমায়িক-স্বভাব—সাক্ষাৎ আশুতোষ। ইহাঁকে যিনি দেখিয়াছেন তিনিই মজিয়াছেন। ইহাঁর আঁখির এমনি একটু ভাব আছে যে, তাহার দৃষ্টি-কৃপায় পড়িলে লোকে কেমন এক প্রকার লাড্‌ডু বনিয়া যায়। "বাবাজি" এই নামটা শুনিবা মাত্র মনে হয় যে, তুলসী বনের ব্যাঘ্র-বিশেষকে অর্থাৎ কোন একজন ভয়ঙ্কর গোঁড়া বৈষ্ণবকে লক্ষ্য করা হইতেছে। কিন্তু আমাদের এ বাবাজি তেমন বাবাজি নহে। গোঁড়ামি যে কাহাকে বলে তাহা তাঁহার অভিধানে লেখে না। লোককে আনন্দ দিতে পারিলেই তিনি আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করেন—তা' সে যিনিই হউন্ না কেন—বাঙ্গালিই হউন্, সাহেবই হউন্, খোট্টাই হউন্, মোল্লাই হউন, বিদ্যাভূষণই হউন, আর অবিদ্যাভূষণই হউন, তাহাতে বাবাজির কিছুমাত্র বাগ্বিচার নাই। বাবাজি সাক্ষাৎ তুরিতানন্দ-অবতার গট্ হইয়া বসিয়া আছেন, যিনি উপস্থিত হইতেছেন তাঁহাকেই তিনি প্রসাদ বিতরণে কৃতার্থ করিতেছেন। কেহ বা হুঁকা এগিয়া ধরিতেছেন, কেহ বা আল্‌বোলা, কেহবা গুড়গুড়ি; আবার দুই এক জন পেণ্ট্‌লুন্ আঁটা টঙ্-মেজাজের লোক ও-সকল ধূম-যন্ত্রকে ঊনবিংশ-শতাব্দীর অযোগ্য বিবেচনায় পাইপ এগিয়া ধরিতেছেন; বাবাজি বিধিমত যত্নসমাদরে সমভাবে সকলকেই প্রসাদ বণ্টন করিতেছেন, কাহাকেও তিনি বঞ্চিত করিতেছেন না। সে প্রসাদ কি? যদি বলি গাঁজা, তবে তাহা শুনিবামাত্র লোকে ছি ছি ছি ছি করিয়া দুই হস্তে কর্ণ আচ্ছাদন করিবে; এ জন্য আক্‌ড়ার সভাপণ্ডিত বাচস্পতি মহাশয় ও-শব্দটার পরিবর্ত্তে গঞ্জিকা-শব্দ ব্যবহারের বিধি দিয়াছেন। তিনি বলেন যে, গঞ্জিকা শব্দ শুনিতে যেমন সুশ্রাব্য, তাহার অর্থও তেমনি হৃদয়-গ্রাহী; যথা, গঞ্জিকা—কিনা পৃথিবীতে যত উত্তম সামগ্রী আছে তাহার গঞ্জনা-স্বরূপা, কিনা গঞ্জিকার মত এমন উত্তম সামগ্রী ত্রিভুবনে নাই।

প্রথম যে দিন আমি আক্‌ড়ায় ভর্ত্তি

হইলাম, সে দিন দেখি যে, তুরিতানন্দ বাবাজি পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে টুপ্‌ভুজঙ্‌ হইয়া বসিয়া আছেন। একটা দ্বিমুখী থেলো হুঁকা তাঁহার হস্তে রাজদণ্ডরূপে শোভা পাইতেছে। টান-পরায়ণ ব্যক্তির উচ্চ নজরে আকড়া একটা সুবিস্তীর্ণ রাজ্য বা সাম্রাজ্য, এমন কি, সসাগরা পৃথিবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, আর বাবাজি—তাহার রাজা বল, পাদ্‌সা বল, সম্রাট্ বল, অথবা দাসানুদাস বল, দীনাধীন বল, তৃণাধীন বল, যাহা বল—সকলই।

রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বাবাজির দক্ষিণ পার্শ্বে বিরাজমান। ইহাঁর নাম, দিগ্বিজয়ী সব্‌জান্‌তা।—

সকল শাস্ত্রেই ইহাঁর সমান অধিকার, সমান ব্যুৎপত্তি, সমান পারদর্শিতা। ইনি কেবলমাত্র আপনার এক বক্ষের সাহস-বলে মস্‌জিদের মোল্লাকে এবং টোলের মহা-মহোপাধ্যায়কে ধর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকেন, মুটে মজুর ছুতার মিস্ত্রী তাঁতি কলু চাসা কিঙ্কর দৌবারিক প্রভৃতিকে কর্ম্মোপদেশ করিয়া থাকেন, এবং সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতমণ্ডলীকে জ্ঞানোপদেশ করিয়া থাকেন। সব্‌জান্‌তা মহাশয়ের ন্যায় এমন বিজ্ঞ লোক পৃথিবীতে অদ্যাপি কেহ জন্মেও নাই এবং ভবিষ্যতে কখন যে জন্মিবে তাহার শঙ্কা-মাত্রও নাই।

বাবাজির অপর পার্শ্বে বেয়াল্লিশ কর্ম্মা মহোদয় নামক একজন ভয়ঙ্কর কাজের লোক বসিয়া আছেন। তাঁহার নাক মুখ চোক কান হাত পা একদণ্ড স্থির দেখিলাম না। ইহাঁকে দেওয়ানজি বল, সেরেস্তাদার বল, কর্ম্মাধ্যক্ষ বল, সম্পাদক বল, একাধারে ইনি সকলই। রাজ্যের সমস্ত কার্য্যই ইনি একাকী নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ইনি ইহাঁর পিতা বিশ্‌কর্ম্মা মহোদয়ের অধীনে কার্য্য করিতেন; এক্ষণে স্বীয় গুণ-গরিমার বেগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া তাঁহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া তাঁহার স্থলে স্বয়ং অভিষিক্ত হইয়াছেন।

রাজ্যের যিনি প্রধান সেনাপতি তাঁহার নাম নিধিরাম সর্দ্দার। ইনি বিনা ঢালে বিনা তরবালে লড়াই কত্তে করিয়া থাকেন। এমনি এমনি আরো অনেকে সভাস্থ আছেন; যথা,

আপনি মণ্ডল—ইনি গাঁয়ের মধ্যে একজন অতি প্রধান ব্যক্তি, তাহার আর সন্দেহ মাত্র নাই, কেবল দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাঁকে গাঁয়ে মানে না; ইহাঁর মান সম্ভ্রম খ্যাতি প্রতিপত্তি সকলই আকড়ার অভ্যন্তরে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া থাকে; সেখানে ইনি টানোদ্দীপ্ত গঞ্জিকানলের ন্যায় উচ্চশিরে দীপ্তি পাইয়া থাকেন।

হিজ্‌ হাইনেস্‌ মহারাজাধিরাজ জম্‌বুক সিংহ বাহাদুর — ইনি বনগাঁয়ের রাজা; স্বরাজ্যে ইনি সসাগরা পৃথিবীর একাধিপতি বলিয়া বিখ্যাত।

সহস্রমারী সেনগুপ্ত। ইনি প্রথমে কবিরাজ, পরে চিকিৎসক, পরে হাকিম, পরে ডাক্তার, এই চারি উপাধি পর পর আত্মসাৎ করিয়াছেন; কোথা হইতে

যে, তিনি ঐ উপাধি-গুলি সাথ করিলেন, তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ। একজন চিকিৎসার্থী ব্যক্তি দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহাকে কবিরাজ মহাশয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল—এই তাঁহার ক্রোধ দেখে কে! তিনি ক্রোধে কম্পমান হইয়া বলিলেন "কি-ই-ই! আমাকে কবিরাজ বল! তুমি জান না যে, আমাতে ডাক্তারের ড হাকিমের হ চিকিৎসকের চ এবং কবিরাজের ক, একাধারে বিদ্যমান! আমাকে ড-হ-চ-ক-রাজ না বলিয়া ফের যদি কবিরাজ বলিবে বা কাহাকেও বলিতে দিবে, তবে তোমার আমি মুখ দর্শন করিব না!"

আত্মারাম সরকার। ইনি এমনি একজন তুখোড় লোক যে, ইহাঁর হাড়ে ভেল্‌কি হয়। আপনার যাহাতে আরাম হয়, ইনি কেবল তাহারি দাঁও অন্বেষণ করিয়া ফিরেন। ইহাঁর একটু সময়ও ব্যর্থে যায় না। সকলের চক্ষে ধূলা দিয়া কিরূপে আপনার অভীষ্ট সাধন করিবেন, এই চেষ্টাতেই ইনি দিন যাপন করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় এই যে লোকে অল্পবুদ্ধি হেতু যত না প্যাঁচে পড়ে, ইনি অতিবুদ্ধি হেতু তাহা অপেক্ষা শত গুণ অধিক প্রবঞ্চিত, প্রতারিত, অপদস্থ, অপমানিত হ'ন; অথচ গঞ্জিকার এমনি মোহিনী শক্তি যে, লোককে ঠকাইতে হইবে এ গোঁ কোন ক্রমেই ছাড়েন না।

রসিকনাগর চূড়ামনি ইনি বিলাসীর মধ্যে অগ্রগণ্য। কাপড়, আতর, অঙ্গুরীয়ক, ঘড়ির চেন, পান তামাক, খাদ্যপানীয়, মছলন্দ, গদি, তাকিয়া, বয়স্য, নৃত্য গীত বাদ্য, রসালাপ, বেশ-বিন্যাস, এ সকলের মর্য্যাদা, মর্ম্মরস, নিগূঢ় তত্ত্ব ইনি এত জানেন যে ইহাঁর একটি জুড়ি মিলা ভার। ইনি যে গঞ্জিকা ব্যবহার করেন তাহার ধূম-সৌরভেই দিক্‌বিদিক্ আমোদিত হইতে থাকে।

ইঙ্গচরণ বঙ্গোপাধ্যায়; ইনি ইয়ংবেঙ্গলের অবতার। কখন কখন লোকে ইহাঁকে সাহেবান্ত করিয়া থাকে—যথা বং সাহেব; ঐরূপ সাহেবান্ত শুনিলে ইনি এমনি ভাবে-গদগদ হ'ন যে, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই বুঁদ্ অবস্থাপন্ন হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে থাকেন।

সেকালচরণ বাচস্পতি, ইহাঁর মুখে সে কালের প্রশংসা ভিন্ন আর কোন কথা নাই—ইনি আকড়ার সভা-পণ্ডিত। ইনি প্রবীণ ভাবে চলেন, প্রবীণ ভাবে কথা কহেন, প্রবীণ ভাবে ব্যবস্থা দেন, প্রবীণ ভাবে নস্য সেবন করেন, ইনি যাহা বলেন তাহা সকল সিদ্ধান্তের সার সিদ্ধান্ত; যাহারা তাঁহার কথায় প্রতিবাদ করে তাহারা অতি অর্ব্বাচীন, অপগণ্ড বালক, তাহারদের কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। কিন্তু প্রবীণ বলিয়া ইনি যে, অরসিক, তাহা নহে; রসিক-নাগর-চূড়ামনি উপরে উপরেই রসিক, ইনি তলে তলে রসিক, ইনি রস-প্রবীণ। এইরূপ আরো অনেক বড় বড় লোক সভাস্থ।

এই রাজসভাতে সে দিন মহা এক তর্ক উপস্থিত—তাহার বৃত্তান্ত এই;—

সেকালচরণ বাচস্পতি মহাশয় যিনি সভা-পণ্ডিত, তিনি, কোথা হইতে এক বহুকালের প্রাচীন পুঁথি অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছেন, সেই উপলক্ষে এইরূপ বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন;—"এই পুঁথিখানি যাহা আপনারা আমার হস্তে দেখিতেছেন, ইহা আমি অনেক ধূমব্যয় এবং শ্রম স্বীকারে বাহির করিয়াছি। পোকায় কাটিয়া ইহাকে এমনি সংক্ষিপ্ত করিয়াছে যে ইহার সংক্ষিপ্ত সার লিখিতে আর কাহাকেও কষ্ট পাইতে হইবে না। এক প্রকার ভালই হইয়াছে। কেননা ইহার যে যে স্থলে প্রয়োজনীয় কথা গুলি লিখিত আছে, সেখানকার একটি বর্ণও পোকায় ছোঁয় নাই; পোকাদের যতকিছু বল-বিক্রম সকলই নিষ্প্রয়োজনীয় অংশে-তেই ক্ষপিত হইয়া গিয়াছে। এই পুস্তকের নাম ধূম-রহস্য। ইহা বহুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সে ভাষা অতি সরল ভাষা; এজন্য তাহার অর্থগ্রহ করিবার জন্য টীকা অথবা ভাষ্য প্রয়োজন করে না। এই গ্রন্থে সকল ধূম অপেক্ষা গঞ্জিকা-ধূম শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; যথা; প্রতি অধ্যায়ের ঊনপঞ্চাশৎ শ্লোকে এইরূপ লিখিত আছে,

অনুষ্টুপ ছন্দ

ইষ্টিমে ইষ্ট মে নাহি গঞ্জিকা-ধূম উত্তমঃ।
একদ্বিত্রিচতুষ্টানে কে রাজা কে অকিঞ্চনঃ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইষ্টীম-কলের ধোঁয়াতে যদিও অনেক প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে তথাপি (গ্রন্থকার বলিতেছেন) আমার তাহাতে কোন ইষ্ট নাই, কেন? না যেহেতু গঞ্জিকা-ধূম তাহা অপেক্ষা উত্তম কিনা শ্রেষ্ঠ। কিসে তার শ্রেষ্ঠত্ব? না যেহেতু এক দুই তিন চারি টানেই কে যে রাজা আর কে যে অকিঞ্চন সাধকের সে বোধ থাকে না। এ বিষয়ে কাহারো যদি কোন মত-ভেদ থাকে তবে তিনি তাহা ব্যক্ত করুন"। বংসাহেব রাগিয়া টঙ্ হইয়া পাইপ্ সেবনানন্তর বলিলেন "সভ্য মহাশয়গণ, ইষ্টীম গাড়ির ল্যাণ্ঠান্ যার জ্বলন্ত চক্ষু, ইষ্টীম গাড়ির চোঙ্ যার ধূমন্ত চুরট্, ইষ্টীম গাড়ির চাকা যা'র ঘুরন্ত পা, এ সেই ঊনবিংশ শতাব্দী; এই জীবন্ত হাঁপন্ত শতাব্দীর উপর দাঁড়াইয়া আপনি ইষ্টীমের অপযশ ঘোষণা করি-তেছেন—একি ভাল কাজ? এই পৃথিবী যদিও রসাতলে যায় (পৃথিবীকে বেগে এক পদাঘাত এবং আকাশকে প্রকম্পিত যুষা প্রদর্শন) তথাপি আমি বলিতে ছাড়িব না যে, দেশের যত কিছু উন্নতি হইয়াছে, হইবে, এবং হইতে পারে, সমস্তেরই মূলাধার কেবল এক ইষ্টীম, তদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু সকলি উন্নতি-পথের কণ্টক, তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটন করাই কর্ত্তব্য; তবে, গঞ্জিকা যে পরম উৎকৃষ্ট পদার্থ, এ বিষয় এ সভায় কে অস্বীকার করিবেন?" এই বলিয়া তিনি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া সহসা উপবিষ্ট হইলেন। বাচস্পতি মহাশয় গঞ্জিকা-মিশ্রিত একটু নস্য লইলেন এবং সুবিবেচনা পূর্ব্বক বলি-লেন "ঊনবিংশ-শতাব্দী না জানি কেডা! গোড়াতেই এক ত দীর্ঘ-ঊ ল্যাজ গুটাইয়া

আছে উঃ। আবার ওই ও-মুড়ায় এক দীর্ঘ-ঈকার নিশান খাড়া করিয়া আছে ঈস্! ইহাতে আমার বোধ হয় এই যে, ঐ ল্যাজটাতে ভর করিয়া আর ঐ নিশানটা আকাশে উড়াইয়া শতাব্দী-জন্তুটা সুদীর্ঘ একটা লাফ মারিবে তাহার উদ্যোগ করিতেছে। শতাব্দী উনবিংশ বই নয় কিন্তু উহার বেগ ঊনপঞ্চাশকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে! সে যাহা হউক্ আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি; উনবিংশ শতাব্দী যিনি হউন না কেন তাঁহার পিতামহ প্রপিতামহ তস্য প্রপিতামহের আমলে নল নামে এক জন রাজা ছিলেন কি না? তাঁহার রথ রেল-গাড়ি অপেক্ষা শতসহস্র গুণ অধিক বেগে চলিত কি না? এখন তুমি হাঁ বলিয়াই নিশ্চিন্ত, কিন্তু প্রকৃত কথাটা শুনিলে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিবে। সে নল রাজাও নহে, পাদ্সাও নহে, সে নল গঞ্জিকার হুঁকার নল! বৃত্তান্তটা কি তবে শোনা হউক:—এই ধূমরহস্য গ্রন্থে নলোপাখ্যান নামে স্বতন্ত্র একটী অধ্যায় আছে; তাহাতে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, মান্ধাতার আমলের কোন রাজা শনির নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া রথ এবং গঞ্জিকা উভয়ই এক সঙ্গে চালাইতেন। তাঁহার হস্ত অশ্বচালনেই ব্যস্ত—সুতরাং হুঁকা-ধারণে অসমর্থ; একটা ত উপায় করা চাই—এজন্য তিনি রথমধ্যে বৃহৎ এক ধূমযন্ত্র স্থাপন পূর্ব্বক নলযোগে গঞ্জিকা টানিতেন; ইহারই জন্য তিনি নলরাজা নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন; আর তাঁহার ভার্য্যা যিনি, তিনি দম্ মারণ বিষয়ে তাঁহাকে সর্ব্বদা শাসন করিতেন বলিয়া দময়ন্তী নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গঞ্জিকা-ধূম-যন্ত্র নলরাজার রথের ইষ্টীম এঞ্জিন; তা'র প্রবল-প্রতাপে সে রথ এমনি দ্রুতবেগে চলিত যে,রেল্গাড়ি তাহার কাছে তৃতীয় শ্রেণীর ছক্র গাড়ি বলিয়াও গণ্য হইতে পারে না। উনবিংশ-শতাব্দীর যিনি প্রধান বাহন তাঁহারই যখন এই দুর্দ্দশা, তখন অন্যে পরে কা কথা। অতএব আমি গঞ্জিকা বিষয়ে ইতি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি তাহা অকাট্য।

যেহেতু এমন সজ্জন-সমারোহ অতি দুর্লভ, আপনারা যদি অনুমতি করেন তবে ধূমরহস্য গ্রন্থে গঞ্জিকার গুণ-বর্ণনা, এবং গঞ্জিকার একটা ভেদ-জ্ঞাপক তালিকা যাহা লিপিবদ্ধ আছে তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া আপনাদিগকে শুনাই।" সকলে উহাতেই সম্মত হইলেন। অতঃপর বাচস্পতি মহাশয় পুঁথি উদ্ঘাটন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"গঞ্জিকার কত গুণ তাহা শ্রবণ কর; যিনি গর্ব্বে স্ফীত হইয়া ফণা ধরেন,গঞ্জিকা তাঁহার ঈশের মূল; যিনি কাজকর্ম্মে ক্লান্ত হইয়া আরাম ইচ্ছা করেন গঞ্জিকা তাঁহার তাকিয়া বালিশ; যিনি চক্ষু থাকিতেও অন্ধ, গঞ্জিকা তাঁহার অঞ্জন-শলাকা; যিনি হাস্যরস চা'ন গঞ্জিকা তাঁহার কামধেনু; যিনি অল্প আয়াসে অধিক মূল্যের উপদেশ চা'ন, গঞ্জিকা তাঁহার কল্পতরু! যদি জিজ্ঞাসা কর যে গঞ্জিকা কয় প্রকার তবে তাহার উত্তর এই যে, ঊনপঞ্চাশ প্রকার; কিন্তু

কাল-মাহাত্ম্যে তাহার অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে, যে গুলি অবশিষ্ট আছে সে গুলি এবং তন্মধ্যে কাহার কি গুণ, উভয়ই নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

বিলাতরঞ্জন গঞ্জিকা—

ইহার ধূমপান করিলে ইংরাজি অথবা ইঙ্গবঙ্গী বুলি, সময়-সংক্ষেপ-রকমের চাল্ চোল্; ব্যক্তিবিশেষকে চমক্ লাগাইয়া ঘড়ি-ঘড়ি ঘড়ি উদ্ঘাটন; ধূমায়মান চুরট্ কামড়াইয়া ধরিয়া এবং মধ্যে মধ্যে তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুই অঙ্গুলির যোগে তাহাকে মুখ হইতে নাবাইয়া, ইংরাজি ঢঙের কথোপকথন দ্বারা লোক জনকে চকিতের মধ্যে আপ্যায়িত করা; এক কথায় এই যে, ধামাধরা এবং ঘড়িধরা চলা বলা খাওয়া পরা বসা দাঁড়ানো হাঁসা কাশা, এই সকল অনর্গল বাহির হইতে থাকে।

ভারতরঞ্জন গঞ্জিকা—

পান করিলে লোকের মুখে যেরূপ অসামান্য বল-বিক্রম তেজ করিয়া উঠে, তদুপলক্ষে আমার টোলের একটি রত্ন এইরূপ একপংক্তি কবিতা রচিয়াছেন।

"হাতে নাই কোন কার্য্য, মুখে ভারত আর্য্য,
বড়ই অনিবার্য্য, এ-সব লোক।
ভয়ঙ্কর হাঁক ডাক, শুনিয়া লাগে তাক্
মুখে না সরে বাক্, দেখিলে রোখ্॥
ডাগর ডাগর বুলি, বেরোয় ফুলি ফুলি;
বায়ুর গোলাগুলি, সে নহে মন্দ।"
বড় জয় গরজয়, আনন্দ উপজয়;
জয় তোমারি জয়, তুরিতানন্দ॥"

রাজরঞ্জন গঞ্জিকা—

পান করিলে হা রাজা যো রাজা, যা' করেন রাজা, দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা, রাজ-পদবী পাইলেই সসাগরা পৃথিবীর রাজত্ব লাভ হয়, এই প্রকার বুলি মুখে অনর্গল বাহির হইতে থাকে। যাঁহারা ছি-এ-ছাই (C S I) অথবা অন্য কোন প্রকার রাজ মহাপ্রসাদের কাঙ্গালি, তাঁহাদের পক্ষে এ গঞ্জিকা মহোপকারী।

সভারঞ্জন গঞ্জিকা—

পান করিলে সভা-ভিন্ন আর উন্নতি সাধনের উপায় নাই; অধিকাংশের মতই বেদবাক্য; বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বহুবিবাহ, জাতি-ভেদ, স্ত্রীর স্বাধীনতা, এই কতকগুলি বাঁধিগতের মালা জপিলেই দেশের উন্নতি সাধন হয়; এই প্রকার ভাব অন্তরে আবির্ভূত হয়; এবং ধাঁদা লাগাইয়া আঁধা করিয়া বাঁধা খদ্দের জুটাইবার চাঁদা পুস্তক বাহিরে আবির্ভূত হয়।

বিলাসরঞ্জন গঞ্জিকা—

পান করিলে ফিন্-ফিনে ধূতি, ফুর-ফুরে উড়ানি, সোনার বোতাম-ওয়ালা রকম-সই পিরাহেণ, ফুল্-মোজা, এসেন্স্-চোবানো সুচারু রুমাল, ঘড়ির চেন ঝল্‌মলায়মান, চিকন-চাকন যষ্টি, বুকে চাদরের চাপরাস বাঁধিয়া খোলা ফেটিন গাড়িতে টের্‌চা ভাবে উপবেশন, ইত্যাদি বেশভুষা, ভাবভঙ্গী; এবং মুখে মধুগন্ধ, গুণ্ গুণ্ গুণ্ টপ্‌পার আভাস, নট-নাগরি ছন্দের কথাবার্ত্তা হাস্য-পরিহাস ইঙ্গিত-ইসারা, ইত্যাদি বিবিধ হাবভাবের আবির্ভাব হয়।

মনোরঞ্জন গঞ্জিকা।—যিনি পান করেন তিনি সর্ব্বদাই মনোরথে ভর করিয়া আকাশে উড়িতেছেন, কাহারো সাধ্য নাই যে তাহাকে মাটিতে নাবায়। তিনি যদি কবি হ'ন তবে সামান্য একটা পুষ্করিণীকে অপ্সর-কিন্নর-সেবিত মানস-সরোবর মনে করেন; সামান্য একটা উদ্যানকে কুসুম-সৌরভে আমোদিত, শাল-তাল-তমাল-হিন্তাল-শোভিত, মহা এক অরণ্য-প্রদেশ মনে করেন। আপনাকে কাব্যের নায়ক বোধে মনে করেন যেন সেই বনে পথ হারাইয়াছেন—হায় কি হইবে! কোন আশ্রম-পালিতা পরমাসুন্দরী রমণী তাঁহাকে পথ বলিয়া দিবেন, শুদ্ধ-কেবল এই আশাতে ভর করিয়া অমন গহন অরণ্যে একাকী পরিভ্রমণ করিতেছেন। যদি বীর পুরুষ হ'ন তবে ঘোড়ায় চড়িয়াছেন কি আর তৎক্ষণাৎ আপনাকে হয় সেকেন্দর সা, নয় নেপোলিয়ন বোনাপাট মনে করিয়াছেন—এ রোগ কিছুতেই যাইবার নহে। যদি ধর্ম্ম-সংস্কারক হ'ন তবে আপনাকে দ্বিতীয় নিতাই চৈতন্য বা নানক বা যীশু-খ্রীষ্ট মনে না করিয়া কোন মতেই ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। যদি বিলাসী হ'ন তবে আপনাকে রূপে কন্দর্প, গুণে কন্দর্প-দর্পহারী মনে করিয়া সর্ব্বদাই সানন্দে থাকেন। যদি রসকস-বিহীন কঠোর বিষয়ী হ'ন তবে আর সকলকে নস্যাৎ করিয়া আপনাকে ভারি একজন কাজের লোক মনে করেন। যদি গ্রামের এক জন বর্দ্ধিষ্ণু লোক হন, তবে এবাড়ি ওবাড়ি ফিরিয়া সকল তাতেই কর্ত্তাগিরি করেন, কিছুতেই রোধ মানেন না। মনোরঞ্জন গঞ্জিকার এত ডাল-পালা যে তাহা আর না—বর্ণনা-তরণী একটানা কথা-স্রোতে ভাসিয়া যাইবে অতএব এইখানেই নোঙড় নিক্ষেপ করা যাউক।

ভিখারিণী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কাশ্মীরের দিগন্তব্যাপী, জলদস্পর্শী শৈল-মালার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর গুলি আঁধার আঁধার ঝোপ্ ঝাপের মধ্যে প্রচ্ছন্ন। এখানে সেখানে শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষচ্ছায়ার মধ্য দিয়া একটি দুইটি শীর্ণকায়, চঞ্চল, ক্রীড়াশীল নির্ঝর গ্রাম্য কুটীরের চরণ সিক্ত করিয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপলগুলির উপর দ্রুত পদক্ষেপ করিয়া এবং বৃক্ষচ্যুত ফুল ও পত্র গুলিকে তরঙ্গে তরঙ্গে উলট্‌পালট্ করিয়া নিকটস্থ সরোবরে লুটাইয়া পড়িতেছে। দূর-ব্যাপী, নিস্তরঙ্গ সরসী, লাজুক উষার রক্তরাগে, সূর্য্যের হেমময় কিরণে, সন্ধ্যার স্তর-বিন্যস্ত মেঘ-মালার প্রতিবিম্বে, পূর্ণিমার বিগলিত জ্যোৎস্না-ধারায় বিভাসিত হইয়া শৈল-লক্ষ্মীর বিমল দর্পণের ন্যায় সমস্ত দিনরাত্রি হাস্য করিতেছে। ঘন-বৃক্ষ-বেষ্টিত

অন্ধকার গ্রামটি শৈলমালার বিজন ক্রোড়ে আঁধারের অবগুণ্ঠন পরিয়া পৃথিবীর কোলাহল হইতে একাকী লুকাইয়া আছে ! দূরে দূরে হরিৎ শস্যময় ক্ষেত্রে গাভী চরিতেছে, গ্রাম্য বালিকারা সরসী হইতে জল তুলিতেছে, গ্রামের আঁধার কুঞ্জে বসিয়া অরণ্যের ম্রিয়মাণ কবি বউ-কথাকও মর্ম্মের বিষণ্ণ গান গাহিতেছে। সমস্ত গ্রামটি যেন একটি কবির স্বপ্ন।

এই গ্রামে দুইটি বালক বালিকার বড়ই প্রণয় ছিল। দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া গ্রাম্যশ্রীর ক্রোড়ে খেলিয়া বেড়াইত, বকুলের কুঞ্জে কুঞ্জে দুইটি অঞ্চল ভরিয়া ফুল তুলিত, শুকতারা আকাশে ডুবিতে না ডুবিতে, উষার জলদ-মালা লোহিত না হইতে হইতেই সরসীর বক্ষে তরঙ্গ তুলিয়া ছিন্ন কমল দুটির ন্যায় পাশাপাশি সাঁতার দিয়া বেড়াইত। নীরব মধ্যাহ্নে স্নিগ্ধ তরুচ্ছায়-শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে বসিয়া ষোড়শ বর্ষীয় অমরসিংহ ধীর মৃদুল স্বরে রামায়ণ পাঠ করিত, দুর্দ্দান্ত রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ পাঠ করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিত, দশম বর্ষীয়া কমলদেবী তাহার মুখের পানে স্থির হরিণ-নেত্র তুলিয়া নীরবে শুনিত, অশোক বনে সীতার বিলাপ-কাহিনী শুনিয়া পক্ষ্ম-রেখা অশ্রুসলিলে সিক্ত করিত। ক্রমে গগনের বিশাল প্রাঙ্গণে তারকার দীপ জ্বলিলে, সন্ধ্যার অন্ধকার-অঞ্চলে জোনাকি ফুটিয়া উঠিলে, দুইটিতে হাত ধরাধরি করিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসিত। কমলদেবী বড় অভিমানিনী ছিল, কেহ তাহাকে কিছু বলিলে সে অমরসিংহের বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত, অমর তাহাকে সান্ত্বনা দিলে, তাহার অশ্রুজল মুছাইয়া দিলে, আদর করিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত কপোল চুম্বন করিলে বালিকার সকল যন্ত্রণা নিভিয়া যাইত ; পৃথিবীর মধ্যে তাহার আর কেহই ছিল না, কেবল একটি বিধবা মাতা ছিল, আর স্নেহময় অমরসিংহ ছিল, তাহারাই বালিকাটির অভিমান, সান্ত্বনা ও ক্রীড়ার স্থল।

বালিকার পিতা গ্রামের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন ; রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী বলিয়া সকলেই তাঁহাকে মান্য করিত। সম্পদের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, এবং সম্ভ্রমের সুদূর চন্দ্রলোকে অবস্থান করিয়া কমল গ্রামের বালিকাদের সহিত কখনো মিশে নাই, বাল্যকাল হইতে তাহার সাধের সঙ্গী অমরসিংহের সহিত খেলিয়া বেড়াইত। অমরসিংহ সেনাপতি অজিতসিংহের পুত্র, অর্থ নাই কিন্তু উচ্চবংশজাত, এই নিমিত্ত কমল ও অমরের বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে। একবার মোহনলাল নামে একজন ধনীর পুত্রের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয় কিন্তু কমলের পিতা তাহার চরিত্র ভাল নয় জানিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই।

কমলের পিতার মৃত্যু হইল, ক্রমে তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হইয়া গেল, ক্রমে তাঁহার প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকাটি আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া গেল, ক্রমে তাঁহার পারিবারিক সম্ভ্রম অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইল এবং ক্রমে তাঁহার রাশি রাশি বন্ধু একে একে সরিয়া পড়িল। অনাথা

বিধবা জীর্ণ অট্টালিকা ত্যাগ করিয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিলেন। সম্পদের সুখময় স্বর্গ হইতে দারুণ দারিদ্র্যে নিপতিত হইয়া বিধবা অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। সম্ভ্রম রক্ষা করিবার উপায় দূরে থাক্ জীবন রক্ষারও কোন সম্বল নাই, আদরিণী কন্যাটি কি করিয়া দারিদ্র্য-দুঃখ সহ্য করিবে? স্নেহময়ী মাতা ভিক্ষা করিয়াও কমলকে কোন মতে দারিদ্র্যের রৌদ্র ভোগ করিতে দেন নাই।

অমরের সহিত কমলের শীঘ্রই বিবাহ হইবে, বিবাহের আর দুই এক সপ্তাহ অবশিষ্ট আছে, অমর গ্রামের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে কমলকে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কত কি সুখের কাহিনী শুনাইত; বড় হইলে দুইজনে ঐ শৈল-শিখরে কত খেলা খেলিবে, ঐ সরসীর জলে কত সাঁতার দিবে, ঐ বকুলের কুঞ্জে কত ফুল তুলিবে, চুপি চুপি গম্ভীর-ভাবে তাহারি পরামর্শ করিত। বালিকা অমরের মুখে তাহাদের ভবিষ্যৎ ক্রীড়ার গল্প শুনিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া বিহ্বল নেত্রে অমরের মুখের পানে চাহিয়া থাকিত। এইরূপে যখন এই দুইটি বালক বালিকা কল্পনার অস্ফুট জ্যোৎস্নাময় স্বর্গে খেলা করিতেছিল তখন রাজধানী হইতে সংবাদ আসিল যে রাজ্যের সীমায় যুদ্ধ বাধিয়াছে। সেনানায়ক অজিতসিংহ যুদ্ধে যাইবেন এবং যুদ্ধশিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার পুত্র অমরসিংহকেও সঙ্গে লইবেন।

সন্ধ্যা হইয়াছে, শৈল-শিখরের বৃক্ষচ্ছায়ায় অমর ও কমল দাঁড়াইয়া আছে। অমরসিংহ কহিতেছেন "কমল! আমিত চলিলাম, এখন রামায়ণ শুনিবি কার কাছে?" বালিকা ছল ছল নেত্রে মুখের পানে চাহিয়া রহিল। "দেখ্ কমল, এই অস্তমান সূর্য্য আবার কাল উঠিবে কিন্তু তোর কুটীর-দ্বারে আমি আর আঘাত দিতে যাইব না, তবে বল্ দেখি আর কাহার সহিত খেলা করিবি?" কমল কিছুই কহিল না, নীরবে চাহিয়া রহিল। অমর কহিল—"সখি! যদি তোর অমর যুদ্ধক্ষেত্রে মরিয়া যায়, তাহা হইলে"—কমল ক্ষুদ্র বাহু দুটিতে অমরের বক্ষ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল, কহিল "আমি যে তোমাকে ভাল বাসি অমর, তুমি মরিবে কেন?" অশ্রুসলিলে বালকের নেত্র ভরিয়া গেল, তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়া কহিল "কমল, আয়, অন্ধকার হইয়া আসিতেছে, আজ এই শেষ বার তোকে কুটীরে পৌঁছাইয়া দিই।" দুইজনে হাত-ধরাধরি করিয়া কুটীরের অভিমুখে চলিল। গ্রামের বালিকারা জল তুলিয়া গান গাইতে গাইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে, বনশ্রেণীর মধ্যে অলক্ষিত ভাবে একটির পর আর একটি পাপিয়া গাহিয়া গাহিয়া সারা হইতেছে, আকাশময় তারকা ফুটিয়া উঠিল। অমর কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে এই অভিমানে কমল কুটীরে গিয়া মাতার বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অমর অশ্রুসলিলে শেষ বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিল।

অমর পিতার সহিত সেই রাত্রেই গ্রাম

ত্যাগ করিয়া চলিল, গ্রামের শেষ প্রান্তের শৈলশিখরোপরি উঠিয়া একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, শৈলগ্রাম জ্যোৎস্নালোকে ঘুমাইতেছে, চঞ্চল নির্ঝরিণী নাচিতেছে, ঘুমন্ত গ্রামের সকল কোলাহল স্তব্ধ, মাঝে মাঝে দুই একটি রাখালের গানের অস্ফুট স্বর গ্রামশৈলের শিখরে গিয়া মিশিতেছে। অমর দেখিল, কমলদেবীর লতাপাতা-বেষ্টিত ক্ষুদ্র কুটীরটি অস্ফুট জ্যোৎস্নায় ঘুমাইতেছে, ভাবিল ঐ কুটীরে হয়ত এতক্ষণে শূন্য-হৃদয়া মর্ম্ম-পীড়িতা বালিকাটি উপধানে ক্ষুদ্র মুখখানি লুকাইয়া নিদ্রাশূন্য নেত্রে আমার জন্য কাঁদিতেছে। অমরের নেত্র অশ্রুতে পূরিয়া গেল। অজিতসিংহ কহিলেন "রাজপুতবালক! যুদ্ধযাত্রার সময় কাঁদিতেছিস্!" অমর অশ্রু মুছিয়া ফেলিল।

শীতকাল। দিবা অবসান হইয়া আসিতেছে, গাঢ় অন্ধকারময় মেঘরাশি উপত্যকা, শৈলশিখর, কুটীর, বন, নির্ঝর, হ্রদ, শস্যক্ষেত্র একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, অবিশ্রান্ত বরফ পড়িতেছে, তরল তুষারে সমস্ত শৈল আচ্ছন্ন হইয়াছে, পত্রহীন শীর্ণ বৃক্ষ সকল শ্বেত মস্তকে স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়মান; দারুণ তীব্র শীতে হিমালয় গিরিও যেন অবসন্ন হইয়া গিয়াছে, এই শীত-সন্ধ্যার বিষণ্ণ অন্ধকারের মধ্য দিয়া, গাঢ় বাষ্পময় স্তম্ভিত মেঘরাশি ভেদ করিয়া একটি ম্লান-মুখশ্রী ছিন্নবসনা দরিদ্র-বালিকা অশ্রুময় নেত্রে শৈলের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, তুষারে পদতল প্রস্তরের ন্যায় অসাড় হইয়া গিয়াছে, শীতে সমস্ত শরীর কাঁপিতেছে, মুখ নীলবর্ণ, পার্শ্ব দিয়া দুই একটি নীরব পান্থ চলিয়া যাইতেছে, হতভাগিনী কমল করুণ নেত্রে এক এক বার তাহাদের মুখের দিকে চাহিতেছে, কি বলিতে গিয়া বলিতেছে না, আবার অশ্রু-সলিলে অঞ্চল সিক্ত করিয়া তুষার-স্তরে পদচিহ্ন অঙ্কিত করিতেছে। কুটীরে রুগ্না মাতা অনাহারে শয্যাগত, সমস্ত দিন বালিকা এক-মুষ্টিও আহার করিতে পায় নাই, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পথে পথে ভ্রমণ করিতেছে, সাহস করিয়া ভীতিবিহ্বলা বালা কাহারো কাছে ভিক্ষা চাহিতে পারে নাই, বালিকা কখন ভিক্ষা করে নাই, কি করিয়া ভিক্ষা করিতে হয় জানে না, কাহাকে কি বলিতে হয় জানে না; আলুলিত কুন্তল-রাশির মধ্যে সেই ক্ষুদ্র করুণ মুখ-খানি দেখিলে, দারুণ শীতে কম্পমান তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহ-খানি দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইত। ক্রমে অন্ধকার ঘনীভূত হইল, নিরাশ বালিকা ভগ্ন হৃদয়ে শূন্য অঞ্চলে কুটীরে ফিরিয়া যাইতেছে; কিন্তু অসাড় পা আর উঠে না, অনাহারে দুর্ব্বল, পথশ্রমে ক্লান্ত, নিরাশায় ম্রিয়মাণ, শীতে অবসন্ন বালিকা আর চলিতে পারে না, অবশ হইয়া পথ-প্রান্তে তুষার-শয্যায় শুইয়া পড়িল, শরীর ক্রমে আরো অবসন্ন হইতে লাগিল, বালিকা বুঝিল ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া তুষারে চাপা পড়িয়া মরিবে, মাকে স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, যোড় হস্তে কহিল "মা ভগবতি, আমাকে মারিয়া

ফেলিও না, আমাকে রক্ষা কর, আমি মরিলে যে আমার মা কাঁদিবে, আমার অমর কাঁদিবে!" ক্রমে বালিকা অচেতন হইয়া পড়িল, কমল আলুলিত কুন্তলে, শিথিল অঞ্চলে তুষারে অৰ্দ্ধমগ্না হইয়া বৃক্ষচ্যুত মলিন ফুলটির মত পথ-প্রান্তে পড়িয়া রহিল। তুষারের উপর তুষার পড়িতে লাগিল, বালিকার বক্ষের উপর তুষারের কণা পড়িতেছে ও গলিতেছে, এবং ক্রমে জমিয়া যাইতেছে। এই আঁধার রাত্রিতে এক জন পান্থও পথ দিয়া যাইতেছে না। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, রাত্রি বাড়িতে লাগিল, বরফ জমিতে লাগিল, বালিকা একাকিনী শৈল-পথে পড়িয়া রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

কমলের মাতা ভগ্ন কুটীরে রোগ শয্যায় শয়ান, জীর্ণ গৃহ ভেদ করিয়া শীতের বাতাস তীব্রবেগে গৃহে প্রবেশ করিতেছে। বিধবা তৃণশয্যায় শুইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছেন; গৃহ অন্ধকার, প্রদীপ জ্বালিবার লোক নাই, কমল প্রাতে ভিক্ষা করিতে গিয়াছে এখনো ফিরিয়া আসে নাই, ব্যাকুল বিধবা প্রত্যেক পদ-শব্দে কমল আসিতেছে বলিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। কমলকে খুঁজিবার জন্য বিধবা কতবার উঠিতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই, কত কি আশঙ্কায় আকুল হইয়া মাতা দেবতার নিকট কাতর ক্রন্দনে প্রার্থনা করিয়াছেন, অশ্রুজলে কতবার কহিয়াছেন "আমি হতভাগিনী, আমার মরণ হইল না কেন? কখনো ভিক্ষা করিতে জানে না যে বালিকা, তাহাকেও আজ অনাথার মত দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইতে হইল? ক্ষুদ্র-বালিকা অধিক দূর চলিতে পারে না, সে এই অন্ধকারে, তুষারে, বৃষ্টিতে কি করিয়া বাঁচিবে?" উঠিতে পারেন না অথচ কমলকে দেখিতে পাইতেছেন না, বিধবা বক্ষে করাঘাত করিয়া অধীর ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। দুই এক জন প্রতিবাসী, বিধবাকে দেখিতে আসিয়াছিল, বিধবা তাহাদের চরণ জড়াইয়া ধরিয়া সজল নয়নে কাতর ভাবে মিনতি করিলেন, "আমার পথ-হারা কমল কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক বার তাহাকে খুঁজিতে যাও!" তাহারা কহিল, "এই তুষারে, অন্ধকারে আমরা ঘরের বাহিরে যাইতে পারি না।" বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন, "এক বার যাও, আমি অনাথ দরিদ্র, অর্থ নাই, তোমাদের কি দিব বল। ক্ষুদ্র বালিকা, সে পথ চিনে না, সে আজ সমস্ত দিন কিছু খায় নাই, তাহাকে মাতার ক্রোড়ে আনিয়া দেও, ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করিবেন!" কেহ শুনিল না, সে বৃষ্টিবজ্রে কে বাহির হইবে? সকলেই নিজ নিজ গৃহে ফিরিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি বাড়িতে লাগিল, কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুৰ্ব্বল বিধবা ক্লান্ত হইয়া গিয়াছেন, নিৰ্জ্জীব ভাবে শয্যায় পড়িয়া আছেন, এমন সময়ে বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল, বিধবা চকিত নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে কহিলেন "কমল, মা, আইলি?" এক জন বাহির হইতে রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "ঘরে কে আছে?"

গৃহ হইতে কমলের মাতা উত্তর দিলেন। সে শাখাদীপ* হস্তে গৃহে প্রবেশ করিল, এবং কমলের মাতাকে কি কহিল, শুনিবা মাত্র বিধবা চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে তুষার-ক্লিষ্ট কমল ক্রমে ক্রমে চেতন লাভ করিল, চক্ষু মেলিয়া চাহিল, দেখিল, একটি প্রকাণ্ড গুহা, ইতস্তত: বৃহৎ শিলাখণ্ড বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, গাঢ় ধূম্র মেঘে গুহা পূর্ণ; সেই মেঘের অন্ধকার ভেদ করিয়া শাখাদীপের আলোক-দীপ্ত কতক গুলি কঠোর শ্মশ্রুপূর্ণ মুখ কমলের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। প্রাচীরে কুঠার, কৃপাণ,প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র লম্বিত আছে, কতক গুলি সামান্য গার্হস্থ্য উপকরণ ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত। বালিকা সভয়ে চক্ষু নিমীলিত করিল। আবার চক্ষু মেলিয়া চাহিল, একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কে তুমি?" বালিকা উত্তর দিতে পারিল না, বালিকার বাহু ধরিয়া সবেগে নাড়াইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল "কে তুই?" কমল ভীতি-কম্পিত মৃদুস্বরে কহিল "আমি কমল!" সে মনে করিয়াছিল এই উত্তরেই তাহারা তাহার সমস্ত পরিচয় পাইবে। একজন জিজ্ঞাসা করিল 'আজ সন্ধ্যার দুর্য্যোগের সময় পথে ভ্রমণ করিতেছিলে কেন?" বালিকা আর থাকিতে পারিল না, কাঁদিয়া উঠিল, অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল "আজ আমার মা সমস্ত দিন আহার করিতে পান নাই"—সকলে হাসিয়া উঠিল, তাহাদের নিষ্ঠুর অট্টহাস্যে গুহা প্রতিধ্বনিত হইল, বালিকার মুখের কথা মুখে রহিয়া গেল, কমল সভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিল, দস্যুদের হাস্য বজ্রধ্বনির ন্যায় বালিকার বক্ষে গিয়া বাজিল, সে সভয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "আমাকে আমার মায়ের কাছে লইয়া যাও!" আবার সকলে মিলিয়া হাসিয়া উঠিল। ক্রমে তাহারা কমলের নিকট হইতে তাহার বাসস্থান, পিতামাতার নাম প্রভৃতি জানিয়া লইল, অবশেষে একজন কহিল, "আমরা দস্যু, তুই আমাদের বন্দিনী, তোর মাতার নিকট বলিয়া পাঠাইতেছি সে যদি নির্দ্ধারিত অর্থ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না দেয় তবে তোকে মারিয়া ফেলিব।" কমল কাঁদিয়া কহিল "আমার মা অর্থ কোথায় পাইবেন? তিনি অতি দরিদ্র; তাঁহার আর কেহ নাই; আমাকে মারিও না, আমাকে মারিও না, আমি কাহারো কিছু করি নাই।" আবার সকলে হাসিয়া উঠিল। কমলের মাতার নিকটে একজন দূত প্রেরিত হইল। সে গিয়া কহিল, "তোমার কন্যা বন্দিনী হইয়াছে, আজ হইতে তৃতীয় দিবসে আমি আসিব, যদি পাঁচশত মুদ্রা দিতে পার তবে মুক্ত করিয়া দিব, নচেৎ তোমার কন্যা নিশ্চিত হত হইবে।" এই সংবাদ শুনিয়াই কমলের মাতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

দরিদ্র বিধবা অর্থ পাইবেন কোথায়?

* পার্ব্বত্য লোক চীড় বৃক্ষের শাখা জ্বালাইয়া মশালের ন্যায় ব্যবহার করে।

একে একে সমস্ত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন, বিবাহ হইলে কমলকে দিবেন বলিয়া কতকগুলি অলঙ্কার রাখিয়া দিয়াছিলেন, সেগুলি বিক্রয় করিলেন, তথাপি নির্দ্দিস্ট অর্থের চতুর্থাংশও হইল না। আর কিছুই নাই, অবশেষে বক্ষের বস্ত্র মোচন করিলেন, সেখানে তাঁহার মৃত স্বামীর একটি অঙ্গুরীয়ক রাখিয়া দিয়াছিলেন; মনে করিয়াছিলেন, সুখ হউক, দুঃখ হউক, দারিদ্র্যই বা হউক, কখন সেটি ত্যাগ করিবেন না, চিরকাল বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবেন, মনে করিয়াছিলেন, এই অঙ্গুরীয়কটি তাঁহার চিতানলের সঙ্গী হইবে, কিন্তু অশ্রুময়-নেত্রে তাহাও বাহির করিলেন, সে অঙ্গুরীটিও যখন তিনি বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার বুকের এক এক খানি অস্থিও ভাঙ্গিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু কেহই কিনিতে চাহিল না। অবশেষে বিধবা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা চাহিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এক দিন গেল, দুই দিন গেল, তিন দিন যায়, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অর্থের অর্দ্ধেকও সংগৃহীত হয় নাই। আজ সেই দস্যু আসিবে, আজ যদি তাহার হস্তে অর্থ দিতে না পারেন তবে বিধবার সংসারের যে একমাত্র বন্ধন আছে তাহাও ছিন্ন হইবে। কিন্তু অর্থ পাইলেন না, ভিক্ষা করিলেন, দ্বারে দ্বারে রোদন করিলেন, সম্পদের সময় যাহারা তাঁহার স্বামীর সামান্য অনুচর ছিল, তাহাদের নিকটও অঞ্চল পাতিলেন কিন্তু নির্দ্দিষ্ট অর্থের অর্দ্ধেকও সংগৃহীত হইল না।

ভয়বিহ্বলা কমল গুহার কারাগারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল। সে ভাবিতেছে তাহার অমরসিংহ থাকিলে কোন দুর্ঘটনা ঘটিত না, অমরসিংহ যদিও বালক কিন্তু সে জানিত অমরসিংহ সকলই করিতে পারে। দস্যুরা তাহাকে মাঝে মাঝে ভয় দেখাইয়া যায়, দস্যুদের দেখিলেই সে ভয়ে অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিত; এই অন্ধকার কারা-গৃহে, এই নিষ্ঠুর দস্যুদিগের মধ্যে একজন যুবা ছিল। সে কমলের প্রতি তেমন কর্কশ ভাবে ব্যবহার করিত না, সে ব্যাকুল বালিকাকে স্নেহের সহিত কত কি কথা জিজ্ঞাসা করিত, কিন্তু কমল ভয়ে কোন কথারই উত্তর দিত না, দস্যু কাছে সরিয়া বসিলে সে ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। ঐ যুবাটি দস্যু-পতির পুত্র, সে একবার কমলকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, দস্যুর সহিত বিবাহ করিতে কি তাহার কোন আপত্তি আছে? এবং মাঝে মাঝে প্রলোভন দেখাইত যে, যদি কমল তাহাকে বিবাহ করে তবে সে তাহাকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করিবে। কিন্তু ভীরু কমল কোন কথারই উত্তর দিত না। এক দিন গেল ও দুই দিন গেল, বালিকা সভয়ে দেখিল দস্যুরা মদ্যপান করিয়া ছুরিকা শানাইতেছে।

এদিকে বিধবার গৃহে দস্যুদের দূত প্রবেশ করিল, বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিল অর্থ কোথায়? বিধবা ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সকলি দস্যুর পদতলে রাখিয়া কহিলেন "আমার আর কিছুই নাই, যাহা কিছু ছিল সকলি দিলাম, এখন তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি

আমার কমলকে আনিয়া দেও।" দস্যু সে মুদ্রাগুলি সক্রোধে ছড়াইয়া ফেলিয়া কহিল, "মিথ্যা প্রতারণা করিয়া পার পাইবি না, নির্দ্দিষ্ট অর্থ না দিলে নিশ্চয় আজি তোর কন্যা হত হইবে, তবে চলিলাম, আমাদের দলপতিকে বলিয়া আসি যে নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাইবে না, তবে এখন নর-শোণিতে মহাকালীর পূজা দেও।" বিধবা কত মিনতি করিলেন, কত কাঁদিলেন, কিছুতেই দস্যুর পাষাণ-হৃদয় গলাইতে পারিলেন না। দস্যু গমনোদ্যত হইলে কহিলেন "যাইও না, আর একটু অপেক্ষা কর, আমি আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

স্বাস্থ্য।

উপক্রমণিকা।

জন্মিলে মরিতে হয়, ইহা একটি চির-প্রসিদ্ধ কথা। তথাপি আমরা মৃত্যুর নাম শুনিবামাত্র ভীত হই। ইহার কারণ কি? অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহার কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথম, মৃত্যুর পর কাহার অবস্থা কি হইবে কেহ কিছুই জানে না। দ্বিতীয়, সংসারের সমস্ত প্রিয় বস্তু হইতে এক কালে বিচ্ছিন্ন হওয়া। তৃতীয়, মৃত্যু-যন্ত্রণা। চতুর্থ, ভোগ সুখের ইচ্ছা সত্ত্বেও অকাল-মৃত্যু। এই সকল কারণের মধ্যে শেষোক্ত দুইটির জন্যই অধিকাংশ লোক ভীত ও কাতর হইয়া থাকেন। বস্তুত পৃথিবীতে যদি অকাল-মৃত্যু ও উহার আনুসঙ্গিক যন্ত্রণা না থাকিত তাহা হইলে অনেকে সুখে মরিতে পারিত।

মনুষ্য জন্ম-কালে যেরূপ অচেতনাবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, মৃত্যুকালেও সেই রূপ অচেতন ভাবে মরিবে এইটি প্রকৃতির উদ্দেশ্য ও অমোঘ নিয়ম। জন্মকালে মনুষ্য প্রসবদ্বারে যেরূপ নিষ্পেষিত হইয়া থাকে তাহা দেখিলে ইহা কাহার না মনে হয় যে, যদি তৎকালে চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যের যন্ত্রণার অবধি থাকিত না। কিন্তু প্রকৃতি দেবীর এমনই অনুগ্রহ যে এরূপ বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়াও মনুষ্যের কিছুমাত্র যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। প্রত্যুত সন্তান সুষুপ্তের ন্যায় অবলীলাক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়। এস্থলে প্রকৃতি স্বয়ং ধাত্রীর ভার গ্রহণ করেন, সুতরাং মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছার কোন সংস্রব না থাকায় সম্যক্ প্রকারে স্বভাবেরই নিয়ম প্রতিপালিত হয়।

প্রকৃতির নিয়মানুসারে চলিলে মৃত্যুও এই রূপ যন্ত্রণাশূন্য হইত। বস্তুত জীবিত কাল পূর্ণ হইলে প্রকৃতি দেবী স্বয়ং আমাদিগের সহায়তা করেন, এই নিমিত্ত আমরা নিদ্রাভিভূতের ন্যায় মৃত্যুমুখে পতিত হই।

এই যন্ত্রণাশূন্য ব্যাপার, এই মোহসঙ্কুল বিলয়দশা, এই অনিত্য জীবনের স্বাভাবিক অবসানকেই পণ্ডিতেরা প্রকৃত

স্বচ্ছন্দ-মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। যাহাতে মানবগণ সুখ স্বচ্ছন্দে জীবিত কাল অতিবাহিত করিয়া সুস্থ শরীরে পূর্ব্বোক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে তাহার উপায় বিধান করাই চিকিৎসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। মনুষ্য মাত্রেরই এই রূপ মৃত্যুলাভে অধিকার আছে। কিন্তু যে সকল স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালন করিলে ঈদৃশ মৃত্যুলাভ হয়, তাহা সকলে জানেন না। এই স্বচ্ছন্দ মৃত্যু আমাদের শারীরিক সুস্থতার চরম ফল, ইহা আমাদের অব্যাহত জীবনের একমাত্র পরিচয়-স্থল।

প্রকৃতি-নিয়মিত এই সর্ব্বলোক-হিতকর মৃত্যুলাভের উপায় কি, তাহা সুচিকিৎসকের নিকট জানিতে পারিলে এবং আপামর সাধারণ সকলেই তদনুসারে চলিলে জগতে মৃত্যুনিবন্ধন ভয়, বা দুঃখ যন্ত্রণা কিছুই থাকিবে না। তখন শ্রান্তিহর নিদ্রার ন্যায় মৃত্যু আমাদের নিকট উপস্থিত হইবে।

অতঃপর অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন যে আমাদের এরূপ আশা কখন ফলবতী হইবে কি না? সংসারে এরূপ সুখের মৃত্যু কোথায়? এতদুত্তরে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে, সংসারে এরূপ মৃত্যু নিতান্ত বিরল বা দুর্ল্লভ নহে। আমাদের মধ্যে ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, প্রকৃতি দেবী সমস্ত বিঘ্ন বিপত্তি নিরাকৃত করিয়া সময়ে সময়ে স্নেহবতী জননীর ন্যায় অতি সন্তর্পণে আমাদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তিকে ইহলোক হইতে অপসারিত করেন। আর যদি আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা তাঁহার অভিপ্রায়ানুরূপ হয়, তাহা হইলে যত দিন সম্ভব তত দিন আমরা সংসারে থাকিয়া ঐশ্বর্য্য ও সুখ ভোগ করিতে পারি। অবশেষে এক একটী ইন্দ্রিয়-সুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া এরূপ অতর্কিত ভাবে মৃত্যুর হস্তে বিন্যস্ত করেন যে আমরা তাহার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না।

স্বচ্ছন্দ মৃত্যুর ঈদৃশ পূর্ব্ব-নিদর্শন অনেকেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কতবার আমাদের চক্ষের উপরে এরূপ সুখের মৃত্যু ঘটিয়াছে। কেমন সেই মুমূর্ষু ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি সকল মৃত্যুর পূর্ব্বে ক্রমশঃ হ্রাস হইতে থাকে, অথচ তজ্জন্য উহার মনে শোক দুঃখের সঞ্চার হয় না। তৎকালে মনের দুরাকাঙ্ক্ষা-সকল নিরস্ত হওয়াতে মনুষ্যেরা কিরূপ বিশ্রাম লাভার্থ ব্যগ্র হয়, কর্ত্তব্যজ্ঞানও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে থাকে। নিঃস্বপ্ন নিদ্রাই তখন জীবনের একমাত্র প্রয়োজন বলিয়া অনুমান হয়। "আমায় স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে দেও, আমি চিন্তাশ্রান্ত হইয়াছি, আর ভাবিতে পারি না" কেবল এই কথা গুলি তাহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপে মনুষ্য চরম কালে শ্রান্তিহর কোমল নিদ্রার ক্রোড়ে শয়ান থাকিয়া সমস্ত সময় অতিবাহিত করে। দিন দিন তাহার জাগ্রতাবস্থা ক্ষণস্থায়ী হইতে থাকে। আর যখন জাগিয়া উঠে, তখনও সংসারের ভাবনা চিন্তা বা দুঃখ তাহার মনে স্থান পায় না। পৃথিবীর কোলাহল, ক্রীড়াসক্ত বালকের আমোদ

প্রমোদ, বন্ধু বান্ধব বা স্ত্রী পুত্রের অনুকূল বাক্য, সামান্য বিষয়ের উপর কথোপকথন-চেষ্টা, এবং পূর্ব্বকালের স্মৃতি, সকলই তখন স্বপ্নবৎ সুখপ্রদ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সেও ক্ষণকাল মাত্র। কারণ, উহার পরক্ষণেই পুনরায় সেই সর্ব্বজয়ী নিদ্রা আসিয়া তাঁহার চেতনা হরণ করে। এই রূপে কিছুদিন গত হইলে, পরিশেষে তাহার মনোবৃত্তি সকল এককালে অসাড় ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, সুতরাং উত্তেজনা-অভাবে শরীরের অপরাপর ইন্দ্রিয়-কার্য্যও বন্ধ হয়। ইহাকেই প্রকৃতি-নিয়মিত মৃত্যু কহে। যখন মানবমণ্ডলী ইহার প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে, যখন এমন সময় উপস্থিত হইবে, যে অকাল মৃত্যুর নাম পর্য্যন্তও আর শুনা যাইবে না, তখন এই যে মৃত্যু যাহা স্মরণ-মাত্র লোকের হৃদয়শোণিত শুষ্ক হয়, তাহাও যথাকালে উপস্থিত হওয়াতে, ভবিষ্যতে তজ্জন্য কাহারও মনে আর ভয় বা যন্ত্রণার উদয় হইবে না।

পৃথিবীতে এইরূপে যথাসময়ে সুখের মৃত্যু ঘটিলে, মরণ-কালে কাহাকেও আর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। এমন কি যাহারা অন্যের মরণোত্তর জীবিত থাকিবে, তাহারাও মনুষ্যের মৃত্যু হইল বলিয়া আর দুঃখিত হইবে না। স্বাভাবিক নিয়মের প্রবল ব্যতিক্রম দেখিলেই আমরা বিস্মিত হই বা রোদন করি। পুরাকালীন গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতেরা অধিক দিন পর্য্যন্ত কাহাকে শোকাকুল থাকিতে দেখিলে উহা দোষ বলিয়া ধরিতেন এবং বিষাদের আতিশয্যকে উন্মত্ততা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেন।

ক্রমশঃ যঃ—

সম্পাদকের বৈঠক।

আফ্রিকা দেশের শৃঙ্গী মনুষ্য।—ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েসনের এক অধিবেশনে কাপ্তেন হে সাহেবের লিখিত একটি প্রস্তাব পঠিত হয়। তিনি বলেন পশ্চিম আফ্রিকার অ্যাকেম প্রদেশের অধিবাসী পুরুষদিগের হনুদেশ বর্দ্ধিত হইয়া নাসিকার উভয় পার্শ্বে শৃঙ্গাকারে সমুত্থিত হয়। এক হিসাবে ইহাদিগকে হনুমান মনুষ্য বলা যাইতে পারে।

মানব জাতির পূর্ব্বপুরুষ।—অধ্যাপক হেকেল সাহেব তাঁহার "সৃষ্টির ইতিহাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, যে জাতীয় বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি সে জাতীয় বানর পৃথিবীতে বিলুপ্ত হইয়াছে। হক্সলি সাহেবের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, বানরের ন্যায় মনুষ্যেরাও যে চারি হস্ত বিশিষ্ট জন্তু তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ চীন দেশীয় নাবিকগণ,

আফ্রিকার নিগ্রোগণ এবং বাঙ্গালার মজুরেরা কোন উচ্চ স্থানে আরোহণ করিবার সময় বানরের ন্যায় পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ব্যবহার করিয়া থাকে। প্রমাণটি চমৎকার হইয়াছে! হেকেল সাহেব বলেন যে, যে জাতীয় বানর হইতে মনুষ্যের উৎপত্তি তাহার লোপ হইয়াছে। আমরা বলি সে জাতীয় বানর এখনও বর্ত্তমান আছে। হেকেল সাহেবের ন্যায় আমরাও একটি অকাট্য প্রমাণ দিতে পারি। জাহাজী গোরারা লালবাজারে উঠিয়াই এক ছড়া কলা ও এক যোড়া বানর ক্রয় করে। ইহাতে তাহাদের নাড়ির টান বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। একজন ইংরাজ কবিও বলেন Fellow feeling makes us wondrous kind.

একটী চতুর বৃদ্ধ বানর।—এক জন ফরাসী পত্রলেখক লেমড্ নামক পত্রিকায় এই কৌতুকাবহ ঘটনাটী বর্ণনা করিয়াছেন। ট্রান্স্ ভাল রেপব্লিক প্রদেশে কাফি-ক্ষেত্রে বানরের বড় উৎপাৎ। কাফি বৃক্ষের মধ্যে এক প্রকার ঝোপ্ জন্মায়, শুঁড়ি ঘেঁসিয়া তাহার ফল বাহির হয়—এক জাতীয় বোল্‌তা এই ঝোপ-গাছে চাক্ করিয়াছিল। ঐ ফলের উপর বানরদিগের বড় লোভ, কিন্তু বোল্‌তার ভয়ে তাহারা স্পর্শ করিতে পারে না। এক দিন প্রাতঃকালে ঐ কাফিক্ষেত্রের অধিকারী হঠাৎ একটা ভয়ানক চিৎকার শুনিতে পাইলেন—এবং তাঁহার দুরবীন দিয়া নিম্নলিখিত ব্যাপারটী দেখিতে লাগিলেন;—একটী দলপতি প্রবীণ বানর কতকগুলি ছোট ছোট বানরকে ধরিয়া সেই ঝোপের উপর নিক্ষেপ করিতেছে—ছোট ছোট বানরেরা চিৎকার করিতেছে, তথাপি ঐ বৃদ্ধ বানর তাহাদিগের আর্ত্তনাদে কর্ণপাত না করিয়া বারংবার তাহাদিগকে ঐ ঝোপের উপর ছুড়িয়া ফেলিতেছে—এইরূপে বোল্‌তার চাক্ গুলি ভাঙ্গিয়া ভূমিতে পড়িল। ঐ ছোট ছোট বানর বেচারাদিগের উপর বোলতারা ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া পড়িল। এই অবকাশে ঐ বৃদ্ধ বানর কেমন অম্লান বদনে ফলারে বসিয়া গেলেন; মাঝে মাঝে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার আহারাবশিষ্ট উচ্ছিষ্ট বানরী ও বানর-শিশুদিগের নিকট নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরের মাথায় কিরূপে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া খাইতে হয় তাহা এই সুবিজ্ঞ বানরটীর নিকটে বোধ হয় ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

লূতাতন্তু।—মাকড়শার জালকে অনেক প্রকার কাজে লাগানো হইয়াছে। দূরবীক্ষণ-যন্ত্রে যে সূক্ষ্ম চুল দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও লূতাতন্তু। এক শতাব্দী হইল বোয়া অফ্ লাঙ্গেডক্ নামক ব্যক্তি লূতাতন্তু দ্বারা এক জোড়া মোজা ও এক জোড়া দস্তানা প্রস্তুত করেন। সেই মোজা ও দস্তানা খুব মজবুৎ হইয়াছিল। এই রূপ চেষ্টা আরও অনেকে করিয়াছিলেন। কিন্তু রেয়োমূর সাহেব বলেন যে, কাঠিন্য ও উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে লূতাতন্তু রেশমের সমকক্ষ হইতে পারে না। গুটি-পোকার গুটি ওজনে তিন কিম্বা চারি গ্রেণ হইবে। ২৩০৪ গুটি পোকা হইতে অর্দ্ধ সের রেশম

উৎপন্ন হয়। কিন্তু মাকড়্সার থলি পরিষ্কার করিয়া ওজন করিলে এক গ্রেণের তৃতীয়াংশেরও অধিক হয় না।

কুক্কুরগণ অনেক কাজে লাগে।—বোধ হয় এ কথাটী সকলে জানেন না, যে সান ফ্রান্‌সিস্‌কোতে কতকগুলি লোক মৃত কুকুরের কারবার চালাইতেছেন। তাঁহারা কুকুরের মৃতদেহ ক্রয় করিয়া তাঁহাদের কারখানায় পাঠাইয়া দেন। সেখানে প্রথমত তাহাদের চর্ম্মে দস্তানা প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হয়, তৎপরে তাহাদিগের ত্বক্-বিমুক্ত দেহ গুলিকে একটা বৃহৎ হাঁড়িতে নিক্ষেপ করিয়া জাল দেওয়া হয়। এই প্রক্রিয়ায় ক্রমে তাহাদের মাংস গুলি অস্থি হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে।—এই অস্থিগুলি চিনি-শোধকদিগের নিকট বিক্রীত হয়। চিনি-শোধকেরা অস্থি চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা চিনি পরিষ্কার করে। ঐ মৃত-দেহ গুলি জাল দিবার সময় যে তৈল উপরে ভাসিয়া উঠে, সেই তৈল তুলিয়া লইয়া তদ্দ্বারা কৃত্রিম কড্‌লিভর-অইল প্রস্তুত হয়; এবং অবশিষ্ট তৈল শূকরদিগকে পুষ্ট করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

চতুষ্পদ মৎস্য।—সেরমান ও কোলেরাডোর নিকট, সমুদ্র-সমতল হইতে ৮,২০০ ফিট্ উপরে এক প্রকার আশ্চর্য্যজনক চতুষ্পদ মৎস্য দেখা যায়। এই মৎস্য উভচর এবং চতুষ্পদ। স্থলে চলিবার সময় পদ ব্যবহার করে এবং জলে সাঁতার দিবার সময় পা-গুলি গুটাইয়া রাখে এবং তাহাদের গ্রীবাদেশের চতুর্দ্দিক হইতে গোলাকার পর্দ্দা পর্দ্দা ডানা নির্গত হয় এবং এই ডানার সাহায্যে তাহারা সন্তরণ করে। চতুষ্পদ মৎস্য তো আবিষ্কৃত হইল কিন্তু চতুষ্পদ মনুষ্যের কি এখনও আবিষ্কার হয় নাই?

চীনদেশীয় বহুরূপী বৃক্ষ।—প্যারিস্ নগরের জার্ড্যাঁ ডে প্লাঁত্ নামক সাধারণ উদ্যানে সম্প্রতি এক প্রকার নূতন বৃক্ষ চীন দেশ হইতে আনীত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইউরোপে তাহা কখন আইসে নাই। দিনের মধ্যে তিন বার করিয়া ইহার রং বদল হয়। প্যারিস্ নগরে প্রত্যহ বিবিদিগের পরিচ্ছদের যত প্রকার রং ও ঢং বদল হয় তাহা অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। মনুষ্য জাতির মধ্যেও একদল বহুরূপী আছেন, তাঁহারাও সময় বুঝিয়া এত প্রকার রং বদ্‌লাইতে পারেন যে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

বৃহৎ পদ্ম-পর্ণ।—গার্ডনার্স্ ম্যাগাজিন বলেন গেণ্ট নগরীয় বোটানিক্যাল গার্ডেনের তত্ত্বাবধায়ক ভন্ হুল সাহেব দেখিয়াছেন যে তথাকার একটী ভিক্টোরিয়া পদ্ম-পত্র সাড়ে নয় মন ভার বহন করিতে পারে—মনে করুন—প্রায় পাঁচ জন মনুষ্য তাহার উপর অনায়াসে দাঁড়াইতে পারে।

সাবান তৃণ।—নূতন মেক্সিকোয় এক প্রকার তৃণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেখানকার অধিবাসিরা তাহার মূল সাবানের

পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। তাহারা বলে যে পশমের জিনিস পরিষ্কারের পক্ষে সাধারণ সাবান অপেক্ষা ইহা অনেক উৎকৃষ্ট। কারণ যেমন ইহা দ্বারা পশমের মলা পরিষ্কৃত হয়, সেই রূপ ইহার স্বাভাবিক চাকচিক্যও সংরক্ষিত হয়।

কৃষ্ণ-গোলাপ।—এক জন ক্যালিফর্ণিয়ানিবাসী অনেক পরীক্ষার পর মসিবৎ কৃষ্ণবর্ণ গোলাপ উৎপাদনে সমর্থ হইয়াছেন। তিনি নিম্নলিখিত প্রণালীটী অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি একটী ঘোর রক্ত বর্ণ গোলাপের চারা কলম করিয়া ওক্ গাছের সহিত যুড়িয়া দিয়াছিলেন। ক্রমে উহা পরিবর্দ্ধিত ও পুষ্পিত হইল। ওক গাছের ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ রস গোলাপে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে ঘোর কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করিল। ইহাতে আর কিছু উপকার না হউক্, আমাদের দেশে একটী উপকার হইল। ইংরাজী কবিদিগের অনুচিকীর্ষু বঙ্গীয় কবিগণ গোলাপের সহিত শ্যামাঙ্গিনী মহিলাদিগের কপোলের তুলনা করিতে না পারিয়া মাথা খুঁড়িতেছিলেন। এবার তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। এবার তাঁহারা উপমাস্থলে অনায়াসে বলিতে পারিবেন যে—

আহা কিবা মুখ খানি কুচ্‌কুচে কালো।
কালীপর্ণী গোলাপটী করি আছে আলো॥

রামকান্তের সন্তান লাভ।—অনেক বয়স পর্য্যন্ত রামকান্তের সন্তানাদি হয় নাই। সন্তান লাভের জন্য কার্ত্তিকের অনেক আরাধনা করিয়াছেন। এমন গাছ ছিল না যাহার শিকড় তাঁহার পত্নীকে খাওয়ান নাই এবং পাড়ায় এমন লোক ছিল না যাহার পরামর্শ মতে কাজ করেন নাই। ঘৃত বিক্রয় করিয়া বৈদ্য বড় মানুষ হইয়া গেল এবং স্বস্ত্যয়ন করিয়া দৈবজ্ঞ প্রশস্ত দালান নির্ম্মাণ করিয়া লইল।

এক বার কোন কর্ম্মোপলক্ষে রামকান্তকে বিদেশে যাইতে হইল; সেখানে এক দিন রাত্রে সাপ স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন। সাপ স্বপ্নে দেখিলে সন্তান হয়, ব্রাহ্মণ নিদ্রাভঙ্গে মহা দাপাদাপি করিতে আরম্ভ করিলেন। এত দিনে তাঁহার কার্ত্তিকের আরাধনা সফল হইল মনে করিলেন। ক্রমে এক মাস দুই মাস তিন মাস করিয়া দশ মাস হইয়া গেল; আজ তাঁহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল, ক্রমে তাঁহার পুত্রের অন্নপ্রাশন; বাড়িতে বলিয়া আসিয়াছেন, কার্ত্তিকের প্রসাদে যদি তাঁহার পুত্রসন্তান হয় তবে তাহার নাম রাখিও রামজয়। "আমার রামজয় চিরজীবি হোয়ে থাক্" বোলে তাহার গহনা পত্রের ফর্দ্দ করিতে বসিলেন।

ছয় বৎসরের পরে রামকান্ত দেশে ফিরিয়া আসিলেন। অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন তাঁহার পত্নী, শাশুড়ি প্রভৃতি গুরু জনদের মধ্যে বসিয়া আছেন। উর্দ্ধশ্বাসে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার রামজয় কোথায়?" তাঁহার পত্নী ত অবাক, দুই তিন বার জিজ্ঞাসিত হইলে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না, গুরুজনদের সম্মুখে হাসিতে

না পারিয়া মুখে কাপড় দিয়া গৃহান্তরে চলিয়া গেলেন; এইত রামকান্ত মহাব্যাকুল; তিনি স্থির করিলেন যে তাঁর স্ত্রী বুঝি কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন, স্থির করিলেন তবে রামজয়ের মৃত্যু হইয়াছে, এইত বুক চাপ্ড়াইয়া চুল ছিঁড়িয়া"রামজয় হা রামজয়" করিয়া মহা কান্না কাটি দাপা দাপি আরম্ভ করিলেন; তাঁহার ভগিনী,মাতা, প্রতিবাসীগণ কিছুই বুঝিতে না পারিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, কিন্তু রামকান্তের পুত্রশোক কিছুতেই থামিবার নহে, আত্ম-হত্যার মানসে ছুটিয়া বাড়ির পুষ্করিণীতে গিয়া ঝাপাইয়া পড়িলেন, পাড়ার লোকেরা সকলে মিলিয়া অচেতনাবস্থায় তাঁহাকে জল হইতে তুলিল। অনেক কষ্টে তাঁহার চেতনা সম্পাদিত হইল। তখন তিনি শুনি-লেন তাঁহার পুত্র সন্তানের নাম গন্ধও নাই।

সে দিন কান্ভোকেশনে লার্ড লিটনের বক্তৃতা শুনিয়া এইরূপ অনেক রামকান্তের চটক্ ভাঙ্গিয়াছে। তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে মহা রাণীর ঘোষণা-পত্র শুনিয়া অবধি ইংরাজ-দিগের সহিত সমান অধিকার পাইয়াছি মনে করিয়া দিব্য আরামে নাসারন্ধ্রে তৈল দিতেছিলেন।

দেবতার মানত্।—এক জনের একটি গোরু হারাইয়া যায়, কোন মতে খুঁজিয়া না পাইয়া কালীঘাটে গিয়া কালীকে কহিল "মা, যদি গোরু খুঁজিয়া পাই তবে তোমার পূজায় একটা মহিষ বলি দিব।" কিছু দিনের পর গোরু খুঁজিয়া পাইল কিন্তু তখন মহিষ বলির কথা সমস্ত ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কালীর পাওনা, তিনি ভুলিবেন কেন? তাঁহার সংসারে অনটন পড়িতেই তিনি আসিয়া কহিলেন, "কই আমার মহিষ দিলি না?" মানুষ কহিল "মা আমার হাতে এখন টাকা নাই, মহিষ দিতে পারিব না, তবে যদি ভেড়া পাইলে সন্তুষ্ট হও তবে দিই।" কালী তাহাতেই সম্মত হইলেন, কিন্তু তা-হাও পাইলেন না। দেবী আসিয়া কহিলেন "কই ভেড়া দিলি না?" সে কহিল "মা আমি গরিব মানুষ, ভেড়া কোথায় পাইব? বলেন তো একটা ছাগলের চেষ্টা দেখা যায়।" তিনি তাহাতেই সম্মত হইলেন, তাহাও পাইলেন না, জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, "ছাগল ত পাইলাম না, তবে একটি হাঁস দিতে পারি" মা তাহাতেই সম্মত, তাহাও দিল না, সে কহিল "হাঁস নাই মা ফড়িঙ্গ্ চাও ত দিই" কালী তাহাতেও রাজী হইলেন। তখন সে যোড়হস্তে কহিল "দোহাই মা, যদি মোষ থেকে ফড়িঙ্গে এসে নাম্তে পার তবে নিজেই বাদায় গিয়ে ধরে নিয়ে এস না,আমাকে কেন কষ্ট দেওয়া?"

ইংরাজগণ এইরূপ বঙ্গদেবীর কাছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অর্ঘ্য মানিয়া ছিলেন, কিন্তু দেবী যখন রোড্শেস্, পব্লিক্ওয়ার্ক শেস্, ইরিগেষন্ শেস্ প্রভৃতি সকলই ঘাড় পাতিয়া লইলেন, তখন ইংরাজেরা তাঁহাকেও এইরূপ বলিতে পারেন যে, "মা, যদি তুমি এতদূর ত্যাগস্বীকার করিতে পার, তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আশাটিও কেন পরিত্যাগ কর না।"

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বিরচিত—সৃষ্টি।

(২) শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ বিরচিত—সাংখ্য দর্শন।

প্রথম সংখ্যা পত্রিকার ৭ পৃষ্ঠার পর।

সৃষ্টি-বিষয়ে বিজ্ঞান কি বলেন প্রথমে শুনা যাউক; পশ্চাতে তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্ত কিরূপ তাহা দেখা যাইবে। বিজ্ঞান বলেন যে, আদিতে জগৎ এখনকার মত এরূপ স্থূল ছিল না—অতি সূক্ষ্মভাবাপন্ন ছিল; এবং তাহার সর্ব্বত্র সমভাব ছিল; প্রথমে এক মাত্র সূর্য্য একাকী সর্ব্বে-সর্ব্বা ছিল, গ্রহ উপগ্রহ কিছুই ছিল না; সেই এক সূর্য্য হইতে গ্রহাদি ক্রমে ক্রমে প্রসূত হইল। এখন যেখানে গ্রহ উপগ্রহ বিদ্যমান আছে, পূর্ব্বে সেখানে সূর্য্যের প্রান্তভাগ তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া ছিল; সূর্য্যের প্রান্ত-ভাগ বার বার বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রহের পর গ্রহ সম্ভূত হওয়াতে এক্ষণে সূর্য্যের কলেবর পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি জেকব্ এনিস্ নামক এক জন জ্যোতির্ব্বেত্তা তারকাগণের আদি বৃত্তান্ত (The origin of the stars) নামক এক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই পুস্তকের তৃতীয় খণ্ডের প্রথমেই তিনি এইরূপ বলিতেছেন;—

বর্ত্তুলাকার সুন্দর জলবিন্দু সকল যাহা ইন্দ্রধনুতে বিভাসিত হয়, তাহারা যেমন জলীয় বাষ্পের সংঘাত হইতে উৎপত্তি লাভ করে, সেই রূপ বর্ত্তুলাকার সুন্দর তারকা-রাজি যাহা আকাশে দীপ্তি পায় তাহারা, সমস্ত আকাশময় ব্যাপিয়া ছিল যে আদিম ভৌতিক পদার্থ, সেই সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থের সংঘাত হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ইহার কিয়ৎপরে গ্রন্থকর্ত্তা বলিতেছেন;—

কি শক্তির বলে সেই সূক্ষ্ম ভৌতিক পদার্থ সমস্ত-আকাশময় ব্যাপিয়া ছিল?—পরমাণু-গত বিক্ষেপ-শক্তির বলে; সেই বিক্ষেপ-শক্তি, যাহার প্রভাবে আধ্ ছটাক্ জল-জনন বাষ্প, আধ্ ছটাক্ প্লাটিনম্ অপেক্ষা, সার্দ্ধ দুই লক্ষগুণ অধিক পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া থাকে। গ্রন্থকার ইহার কিয়ৎপরে বলিতেছেন;—

এই বিক্ষেপ-শক্তিকে দমন করা যায় কি প্রকারে?—রাসায়নিক শক্তি দ্বারা;—সেই রাসায়নিক শক্তি, যাহার প্রভাবে অম্লজনন এবং জলজনন বাষ্প একত্র সংহত হইয়া জলাকারে পরিণত হয়। জগতের আদিম উপাদান যে কত সূক্ষ্ম, তদুপলক্ষে গ্রন্থকার এইরূপ বলেন;—

বহু পূর্ব্বে সূর্য্য যখন নেপ্চুন গ্রহের গতিচক্র পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, তখন তাহা জল-জনন বাষ্প অপেক্ষা চতুর্দ্দশ কোটি গুণ সূক্ষ্ম ছিল। * * * * * * * * * * *

আলোকের কম্পন এক পলকে ৪৫৮০০০-০০০০০০ এত গুলি; এবং তাহা ঐ কাল-মধ্যে এক লক্ষ ক্রোশ পথ অতিবাহন করে। অতএব আলোক কি অচিন্তনীয় সূক্ষ্ম পদার্থ একবার মনে করিয়া দেখ! কিন্তু এ মনে করিও না যে, সূর্য্য নেপ্‌চুন গ্রহের গতিচক্র পর্য্যন্ত যখন প্রসারিত ছিল তখন তাহা আলোক পদার্থ অপেক্ষা অল্প সূক্ষ্ম ছিল। এই ত বিজ্ঞানের মত।

এ সূর্য্যের এই—আবার সূর্য্যেরও সূর্য্য আছে; তাহা যে সময়ে এই সূর্য্যের চরম-প্রান্তবর্ত্তী গ্রহের গতি-চক্র পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল, তখন তাহার উপদান আরো যে কত সূক্ষ্ম ছিল তাহা ভাবিতে গেলে জগ-তের কিছুই আর থাকে না, সকলই লোপা-পত্তি হইয়া যায়। অতএব আমাদের দেশের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই যে বলিয়াছেন যে, সর্ব্ব-প্রথমে আকাশ সৃষ্ট হইয়াছিল—কি মন্দ বলিয়াছেন? উক্ত গ্রন্থকার পুনশ্চ বলেন;—

ইহা আমরা বলিতে পারি না যে, সেই আদিম কালের সূক্ষ্ম ভূত জ্বলন্ত অবস্থায় ছিল। আমাদের এই যে সূর্য্য, ইহাও বুধ-গ্রহের পরিধি পর্য্যন্ত প্রসারিত থাকা কালীন জল-জনন বাষ্প অপেক্ষা বিশ গুণ সূক্ষ্ম ছিল। সূক্ষ্ম বাষ্প সকল রাসায়নিক যোগে প্রবৃত্ত হইবার সময় আলোক উদ্গীরণ করে না, যদি করে সে অতি যৎসামান্য অপরিস্ফুট আলোক।

উক্ত গ্রন্থকার ইহাও বলেন যে, পূর্ব্বে যেমন আলোক ছিল না, তেমনি উত্তাপও ছিল না*; পরমাণুসকলের পরস্পর ঘষাঘষি এবং রাসায়নিক যোগাযোগ দ্বারা উত্তাপের আবির্ভাব পরে হইয়াছে। ইহাতে-করিয়া প্রমাণ হইতেছে যে, ব্রহ্মাণ্ড অগ্নি-আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে সূক্ষ্ম-তম বায়ু-আকারে বিদ্যমান ছিল। দেখ, আমাদের দেশের তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের এই যে পুরা-তন উক্তি যে, আকাশের পরে বায়ু, বায়ুর পরে অগ্নি সৃষ্ট হইয়াছে—ইহা আজিও টলিতেছে না। নিত্য-নূতন পরিবর্ত্তনের আবর্ত্ত-মুখে না টলিয়া, যে অকুতোভয়ে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, সে কেবল এক আমাদের দেশের পুরাতন বচন। তত্ত্ব-জ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, অগ্নির পরে জলের উৎপত্তি এবং জলের পরে কঠিন মৃত্তি-কার উৎপত্তি;—বিজ্ঞানও অবিকল তাহাই বলেন; যথা, পৃথিবী প্রথমে ধূমকেতুর

* "We cannot suppose that matter was originally diffused through space by the repulsion of heat; because heat is a well known effect produced by some action. We can conceive of no action to produce such an enormous amount of heat. And if all space were pervaded by such heat, it must have re-mained. It could not have radiated away; for where could it go?"—Ennis' Origin of the stars.

লাঙ্গূলের ন্যায় জ্বলন্ত বাষ্পাকারে ছিল, পরে উত্তপ্ত দ্রব ধাতুপিণ্ডের রূপ ধারণ করে, তাহার পরে জলের অভ্যন্তরে নানা প্রকার স্তর নির্ম্মিত হইয়া সময়ে সময়ে তাহাদের কোন কোন অংশ তথা হইতে মস্তকোত্তোলন করাতে পৃথিবী জল স্থল দুই অংশে বিভক্ত হয়। এই রূপ, প্রথমে আকাশ, পরে বায়ু, পরে অগ্নি, পরে জল, পরে স্থল, সৃষ্টির এই যে একটি ধারাবাহিক ক্রম, ইহা তত্ত্বজ্ঞান বহু পূর্ব্বে স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন---এক্ষণে বিজ্ঞান নানা প্রকার প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা তাহার দৃঢ়তা সাধন করিতেছেন—ইহা অতি সুখের বিষয় তাহার আর সন্দেহ নাই। তত্ত্বজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের মধ্যে বিবাদ লাগিলে যাঁহারা কৌতুক দর্শন করিয়া আমোদ পান, তাঁহাদের সুখের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত হইল—কি করা যায়! বলিলাম কি—তাঁহাদের সুখের ব্যাঘাত? তাঁহাদের জন্য মিল্ কম্‌টি ডার্বিন্ এই সকল পর্ব্বত-প্রমাণ গ্রন্থকর্ত্তারা দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন,—তাঁহাদের আবার সুখের ব্যাঘাত! রসনাকে ধিক্! তাঁহাদের অনেকেরই এই রূপ মনোগত ভাব যে, মনুষ্য পৃথিবীর জীব, পৃথিবীতেই আপনার জীবিকা-সংস্থান করিয়া সুখে বিচরণ করুক—আকাশে হাত বাড়াইলে কি হইবে? ইঁহাদিগকে বুঝাইতে হইলে হয় বিস্তর শ্রম নয় বিস্তর ত্যাগ দুয়ের একটি না একটি স্বীকার করিতে হয়। আমাদের এই উষ্ণপ্রধান দেশে শ্রম স্বীকার যত কষ্টকর, ত্যাগ স্বীকার তত নহে; এজন্য আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্ববিৎগণ ত্যাগ স্বীকারকেই শ্রেয় করিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদের জ্ঞানের অধিকাংশ জলাঞ্জলি দিয়া লোককে জ্ঞানোপদেশ করিতেন,—অজ্ঞান হইয়া অজ্ঞানদিগকে বুঝাইতেন। ব্রহ্মা এই বলিয়াছেন, শিব এই বলিয়াছেন, বশিষ্ঠ এই বলিয়াছেন, ব্যাস এই বলিয়াছেন, অতএব অত্র নাস্তি বিচারণা, নির্ব্বিচারে সমস্তই মানিয়া যাও, এই তাঁহাদের শিক্ষাপ্রণালী। তাঁহারা ব্রহ্মা, শিব, বশিষ্ঠ, ব্যাস এইরূপ এক একটি নাম যখনি উচ্চারণ করিয়াছেন, তখনি সহস্র সহস্র বিচার বিতর্ক বাদানুবাদ প্রথম উদ্যমেই হতবীর্য্য হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছে। রোমক ইতিহাসে আছে যে, পুরাকালে ইতালীয়েরা হস্তী কিরূপ তাহা চক্ষে দেখে নাই; হানিবাল নামক সুবিখ্যাত কার্থেজীয় সেনাপতি হস্তিদল সমভিব্যাহারে প্রথমে যখন সে দেশে যুদ্ধার্থে প্রবেশ করিলেন, তখন হস্তীর আকার-প্রকার বলবিক্রম দেখিয়াই ইতালীয় সৈন্যেরা সর্ব্বত্র রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে যখন ইতালীয় সৈন্যগণের চক্ষু ফুটিল তখন তাহারা আগ্নেয় গোলা দ্বারা হস্তিদিগকে তাড়না করিতে লাগিল। তাহাতেই জয়-স্রোত একেবারে উলটিয়া গেল; হস্তিগণ কোথায় বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিবে, তাহা না করিয়া পলায়নের বেগাতিশয্যে স্বপক্ষীয় দল-বলেরই সমূহ অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিল।

আমাদের দেশে ইহারই ন্যায় অনিষ্ট-

সাধন হইতেছে। পূর্ব্বে অজ্ঞান-বিনাশের জন্য যে সকল বিভীষিকা দলবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহারা এক্ষণকার আগ্নেয় শকট এবং তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা তাড়িত হইয়া, অস্মদ্দেশীয় তত্ত্বজ্ঞান-পক্ষে প্রভুত অনিষ্ট সাধন করিতেছে। অতএব ব্যাস, বশিষ্ঠ, ব্রহ্মা, শিব এসকল কল্পিত নামের সাহায্যে তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করা এক্ষণে যুক্তি-সিদ্ধ নহে। এক্ষণে শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক যুক্তি এবং বিচারের সাহায্যে আমাদের দেশের পুরাতন তত্ত্বজ্ঞানকে স্ব-পদে উত্থাপন করাই এক মাত্র প্রয়োজন। পূর্ব্বকার পুরাণ-কর্ত্তারা মিথ্যার সাহায্যে অজ্ঞ ব্যক্তি-দিগের নিকট সত্য প্রচার করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাতেই আমাদের দেশ বিদ্যার জন্মভূমি হইয়াও অবিদ্যাতে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মিথ্যার সাহায্যে সত্য প্রচার করা, এবং অন্যায়োপার্জ্জিত ধন দ্বারা পরোপকার করা, উভয়ই আপাততঃ মধু কিন্তু পরিণামে বিষ। আমাদের দেশে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে সত্য জানা ছিল; সত্য-প্রণালী দ্বারা সত্যের শিক্ষা-দান হইত না বলিয়াই কাল-ক্রমে সত্য নির্জীব ভাবে পরিণত হইল। অতএব যেন তেন প্রকারেণ সত্য শিক্ষা দেওয়া এখন আর চলে না। সত্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সত্য শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। সত্যের ক খ হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চ উচ্চ সোপানে আরোহণ করিতে শিক্ষা দেওয়া অতীব কষ্টকর ব্যাপার তাহার আর ভুল নাই, কিন্তু কষ্টকর বলিয়া কি তাহা ছাড়িয়া দেওয়া মনুষ্যের কর্ত্তব্য। গ্রীক-দেশে দুই একটি কষ্টকর ব্যাপারের সূত্রপাত হওয়াতেই তাহার প্রসাদাৎ ইউ-রোপের অজ্ঞানান্ধকার কাল-ক্রমে বিনষ্ট হইয়াছে। জ্যামিতি বিদ্যা আমাদের দেশে না ছিল এমন নয়, দোষের মধ্যে কেবল সত্য-প্রণালী অনুসারে তাহার শিক্ষা প্রদান হইত না। গ্রীক দেশে যে অবধি জ্যামিতি বিদ্যা সত্য-প্রণালী অনুসারে প্রচারিত হয়, সেই অবধি করিয়া ইউরোপে বিজ্ঞান-শাস্ত্র ক্রমশই উচ্চ উচ্চ সোপানে পদনিক্ষেপ করিতেছে। আমাদের দেশে পৌরানিক মিথ্যা-প্রণালী অনুসারে যে অবধি সত্যের প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, সেই অবধিই বিদ্যা অবিদ্যা-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ক্রমশই হ্রাস পাইয়া আসিয়াছে। ইহা দেখিয়া শুনিয়া মিথ্যার পথ দিয়া সত্য প্রচার করিতে কাহার আর প্রবৃত্তি জন্মিবে? অতীব সুখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের দর্শন শাস্ত্র-সমূহে সত্য-প্রণালীর প্রথম সূত্র-পাত হয়।

পুরাণের মধ্যে অনেক সত্য আছে, কিন্তু সত্য-প্রণালী একটুও নাই। দর্শন-কারেরা সাধ্যানুসারে সত্য-প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক সৃষ্টি-তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, ইহাতেই তাঁহাদের মূল সিদ্ধান্ত-গুলি এমনি পাকা হইয়াছে যে, কিছুতেই তাহার আর মার নাই। পুরাণ-কর্ত্তারা অন্য দিকে গিয়াছেন—তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচা-র্য্যের নিকট হইতে সত্য উপার্জ্জন করিয়া মিথ্যার সাহায্যে সেই গুলি প্রচার করিতে

সচেস্ট হইয়াছেন। এই জন্য সৃষ্টি সম্বন্ধে পৌরাণিক সত্য অপেক্ষা দার্শনিক সত্য আমাদের পূজার্হ। দর্শন-শাস্ত্রে অল্প সত্য থাকিলেও প্রণালী-গুণে তাহা জিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিকট বহুমানাস্পদ হইয়া থাকে; পুরাণ শাস্ত্রে বহুবিধ সত্য থাকিলেও প্রণালী-দোষে তাহা প্রকৃত জিজ্ঞাসু ব্যক্তির হাস্য উদ্দীপন করে। অতএব অস্মদ্দেশীয় তত্ত্ববিদ্‌গণ সৃষ্টি-সম্বন্ধে যেরূপ যেরূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সংগ্রহ করিয়া মাত্র ক্ষান্ত থাকিলে এক্ষণে আর চলিবে না, কোন্ শাস্ত্র কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিয়া কিরূপ ফল লাভ করিয়াছেন, ইহা না অবগত হইতে পারিলে শাস্ত্রালোচনার প্রকৃত ফল আমাদের হস্তগত হইবে না। শুদ্ধ যদি জানা থাকে যে, দশ দুগুণে কুড়ি হয়, তবে এক শ দুগুণে কি হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু কি প্রণালী অনুসারে দশ দুগুণে কুড়ি হয়, ইহা জানা থাকিলে একশ দুগুণে কি হয়, দশ-শ দুগুণে কি হয়, ইত্যাদি সমস্তই অবলীলা-ক্রমে বলিতে পারা যায়। প্রকৃত জ্ঞান-প্রণালী-অনুসারে সামান্য একটি অণ্ডের প্রকরণ জানিতে পারিলে, সেই সোপান অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের প্রকরণ জানা যাইতে পারে।

সৃষ্টি-সম্বন্ধে অস্মদ্দেশীয় শাস্ত্র সকলের প্রধান প্রধান মত গুলি একত্র সংগ্রহ করাই যদি শিরোনামিত বস্তুজ মহাশয়ের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাঁহার পরিশ্রম সফল হইয়াছে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি। তাঁহার সাধু ইচ্ছা এবং অধ্যবসায় উভয়ই ধন্যবাদের যোগ্য, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা যখন তাঁহার বেদান্ত-প্রবেশ সমালোচনা করি তখন ভাবিয়াছিলাম যে, গ্রন্থকার যদি সাংখ্য এবং বেদান্তের মধ্যে সন্ধিস্থাপন করিবার চেস্টা করিতেন তবে ভাল হইত। বর্ত্তমান গ্রন্থে দেখিতেছি যে, প্রধানত তিনি সাংখ্যের মত অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই। বেদান্ত-দর্শন এবং সাংখ্য-দর্শন উভয়ের মধ্যে যে মত-ভেদ দেখা যায়, পৌরাণিক এবং অন্যান্য শাস্ত্রকারেরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া উভয়কেই অভেদ ভাবে দৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বেদান্তের মায়া এবং সাংখ্যের প্রকৃতি উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। অথবা কি বেদান্ত কি সাংখ্য কাহারো দিকে ঝোঁক না দিয়া উপনিষদ্ হইতেই রসাকর্ষণ করত স্ব স্ব পুরাণের পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা মায়া শব্দ ভূয়োভুয় ব্যবহার করিয়াছেন, অথচ মায়াবাদে লিপ্ত হন নাই; "প্রধান" শব্দ ভূয়োভুয় ব্যবহার করিয়াছেন অথচ নিরীশ্বর মত অনুমোদন করেন নাই।

তবে কি দর্শন অপেক্ষা পুরাণ শ্রেষ্ঠ? বেদান্তও এক দিক্‌দর্শী, সাংখ্যও এক দিক্‌দর্শী, ইহা যেন আমি মানিলাম। কিন্তু যে দিকে যিনি চলুন না কেন, তিনি যদি সত্য-প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলেন, তবে ক্রমশঃ সত্যের দিকে অগ্রসর হইবেন ইহাতে আর সন্দেহ নাই। বেদান্ত এবং সাংখ্য উভয়ই সত্য-প্রণালীর পক্ষপাতী এজন্য

উভয়ই সত্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। পুরাণ, সত্য বিষয়-সকলকে, মিথ্যা-প্রণালী অনুসারে প্রচার করিতে গিয়াছেন, এই অপরাধে তিনি উত্তরোত্তর মিথ্যার দিকেই পদনিক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং ক্রমে ক্রমে তন্ত্রশাস্ত্রের অন্ধ-তমিস্রাতে পরিণত হইয়া চরম বৈয়র্থ প্রাপ্ত হইয়াছেন। পুরাণ এবং তন্ত্রশাস্ত্রের তুলনায় নিরীশ্বর সাংখ্য-দর্শনও জ্যোতির্ম্ময় ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। পুরাণাদিতে অনেক উচ্চ মূল্যের সত্য আছে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় যে, সে-সকল সত্য মিথ্যা-রাশির মধ্যে জন্মাবচ্ছিন্ন বাস করিতেছে। আলোক যে কি তাহা তাহারা জানিল না, এবং জানিবেও না, তবে তাহাদের জন্মিবার প্রয়োজন কি? তথাপি পুরাণ যে এক-দর্শিতা-দোষ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন, সে কি রূপে? তিনি সকল পক্ষেরই কথা-বলিয়াছেন; কথা-গুলি পরস্পর সঙ্গত হইল কি না, ইহাতে কিছুমাত্র দৃকপাত করেন নাই। এই রূপ বহু-পক্ষীয় কথা নির্ব্বিচারে গ্রহণ করাতেই তিনি বহুদর্শী হইয়াছেন। কিন্তু এরূপ বহুদর্শিতা শ্লাঘার বিষয় নহে,ইহা বলা বাহুল্য। দর্শন-শাস্ত্র-সকল যেমন বিচার পূর্ব্বক স্ব স্ব পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, অন্য কোন শাস্ত্র যদি সেই রূপ বিচার পূর্ব্বক সর্ব্বপক্ষের মধ্য হইতে উচ্চতর এবং ব্যাপক-তর সত্য উদ্ধার করিতে পারিতেন, তবেই তাঁহাকে প্রকৃতরূপে বহুদর্শী বলা যাইতে পারিত। অতএব দর্শন-শাস্ত্র একদিক্‌দর্শী হইলেও, তাহা পুরাণ অপেক্ষা শ্রেয়, এবং পুরাণ বহুদর্শী হইলেও তাহা দর্শন অপেক্ষা হেয়। সৃষ্টিতত্বের গ্রন্থকার পুরাণ এবং দর্শন উভয়কেই নির্ব্বিশেষে সাক্ষী মানিয়াছেন। গ্রন্থকারের যেরূপ উদ্দেশ্য তাহাতে ওরূপ নির্ব্বিশেষ দৃষ্টি দোষের হয় নাই। গ্রন্থকার সঙ্গ্রহ কার্য্যেরই ভার গ্রহণ করিয়াছেন, এবং তাহাতে তিনি সুসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু পুরাণাদি যেমন নির্ব্বিচারে সাংখ্য-বেদান্ত উভয়েরই মত অনুমোদন করিয়াছেন, তিনি যদি তাহা না করিয়া বিচার পূর্ব্বক উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করিতেন, তবে একটি প্রকৃত কাজ করিতেন। যাহা করিয়াছেন তাহাতে শেষোক্ত গুরুতর কার্য্যের একটি উত্তম সোপান নির্ম্মিত হইয়া রহিল—ইহা অল্প সুবিধার বিষয় নহে। বলিতে কি, আমাদের দেশের একটি বড় দোষ—জ্ঞানের প্রণালী এবং সেই প্রণালীর উপযুক্ত প্রয়োগ, এ দুই বিষয়ে আমরা আদবেই মনোযোগ করি না। গোরার দোকানের ভাল ভাল দ্রব্য ক্রয় করিয়াই আমরা সন্তুস্ট; কি প্রণালীতে যে কোন্‌টি নির্ম্মিত হয়, তাহার প্রতি আমরা কিছুমাত্র মনোযোগ করি না; এক দিকে এই; আর এক দিকে,—পূর্ব্বতন জ্ঞানী-ব্যক্তিরা যে-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতেই আমরা সন্তুস্ট; কি প্রণালীতে আবিষ্কার করিয়াছেন, আমরা তাহা আদবেই দেখি না। কপিল মুনি বলিয়াছেন প্রকৃতি সত্ব রজ তমোগুণের সাম্যাবস্থা;

তৎপরে বলিয়াছেন প্রকৃতি হইতে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে অহংকার, অহংকার হইতে পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত, এই যে তিনি বলিয়াছেন—কি প্রণালীতে? সৃষ্টির গ্রন্থকার এ প্রশ্নের প্রতি সমুচিত আদর প্রকাশ করেন নাই। তিনি এ শাস্ত্র এই বলিয়াছেন, ও শাস্ত্র ঐ বলিয়াছেন, এই করিয়া পুস্তকের অনেক স্থান ভার-গ্রস্ত করিয়াছেন; যদি ঐ সকল নানা শাস্ত্রোক্ত বচনের মধ্যে একটা যুক্তির বাঁধুনি আঁটিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে এখন যাহা দোষ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, তাহা উল্‌টা আরো গুণ বলিয়াই প্রকাশ পাইত। আদ্যোপান্ত প্রণালী-শুদ্ধ হওয়াতেই বিজ্ঞানের এত মূল্য; তত্ত্বজ্ঞান যদি সেরূপ প্রণালী-সঙ্গত না হয়, তবে সে দোষ কি তত্ত্বজ্ঞানের? পূর্ব্বে বিজ্ঞান ছিল, কিন্তু তাহা প্রণালীবদ্ধ ছিল না, সে কি বিজ্ঞানের দোষ? তত্ত্বজ্ঞানেরও নয়, বিজ্ঞানেরও নয়, দোষ গ্রন্থকারের, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

তত্ত্বজ্ঞান-সম্বন্ধীয় সত্য আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণেই আছে,—এক্ষণে আবশ্যক তাহার আদ্যোপান্ত একটা প্রণালী বাঁধিয়া দেওয়া। তত্ত্বজ্ঞানের বচন আমাদের দেশের আপামর সকলেরই কর্ণগোচর হইয়া থাকে—তত্ত্বজ্ঞানের প্রণালী টোলের অধ্যাপক-গণেরও ধ্যানের অগোচর। আমাদের মতে প্রণালী এবং প্রয়োগ এই দুইটিই মূল কথা—আর সকলই তাহার নীচে। বিজ্ঞানেরই বা কি প্রণালী, এবং তত্ত্বজ্ঞানেরই বা কি প্রণালী, তাহার ইংরাজী নাম সকলেই জানেন, তাহার দেশী নাম কি দেওয়া যাইবে তাহাই এক্ষণে ভাবনার বিষয়। সংকীর্ণ দৃষ্টান্ত অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যাপক সিদ্ধান্ত অন্বেষণ করা বিজ্ঞানের প্রণালী; অখণ্ড সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক খণ্ড সত্য সমর্থন করা, তত্ত্বজ্ঞানের প্রণালী। সংকলন (তেরিজ) এবং ব্যবকলন (জমা-খরচ) গুণন এবং হরণ, ইত্যাদি প্রণালী-যুগল যেমন গণিত শাস্ত্রে সমাদৃত হইয়া থাকে, ও-প্রণালী-যুগল তেমনি সাধারণতঃ সমুদায় বিজ্ঞান-শাস্ত্রেই সম্মানিত হইয়া থাকে। এখানে এইটি বিশেষ করিয়া মনে রাখা উচিত যে, শরীরের যেমন দক্ষিণ এবং বাম এইরূপ যুগলাঙ্গ, গণিত শাস্ত্রের যেমন সংকলন ব্যবকলনাদি যুগলাঙ্গ, জ্ঞানের তেমনি, বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান, যুগলাঙ্গ। বিজ্ঞানের প্রণালী নীচে হইতে উপরে ওঠা (স্থূল বিষয় হইতে সূক্ষ্ম তত্ত্বে ওঠা), তত্ত্বজ্ঞানের প্রণালী উপর হইতে নীচে নাবা। এই দুই প্রণালীর মিলন ব্যতিরেকে উচ্চ অঙ্গের বিদ্যা কখনই সুসিদ্ধ হইতে পারে না। উচ্চ অঙ্গের গণিত বিদ্যার প্রাণ নামের যোগ্য যদি কিছু থাকে তবে তাহা সমীকরণ, এবং সেই সমীকরণের প্রাণ নামের যোগ্য যদি কিছু থাকে, তবে তাহা গণিত-প্রকরণের যুগলাঙ্গতা; এক পক্ষে সংকলন, গুণন, বর্গ ইত্যাদি; অপর পক্ষে ব্যবকলন, হরণ বর্গমূল, ইত্যাদি; এই দুই পক্ষে ভর

করিয়া গণিত বিদ্যা যে কত উচ্চে উঠিয়াছে, তাহা কৃতবিদ্য ব্যক্তি মাত্রেই জানিতেছেন। কেবল গণিত বিদ্যা বলিয়া নহে, সাধারণতঃ সকল বিদ্যাই ঐরূপ যুগলাঙ্গে ভর করিয়া উচ্চ উচ্চ সোপানে পদনিক্ষেপ করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে সৃষ্টির যে একটি ধারাবাহিক ক্রম পাওয়া যায়, দার্শনিক প্রণালীতে আলোচনা করিলেও ঠিক তাহাই পাওয়া যায়, ইহা ইতিপূর্ব্বে এক প্রকার প্রদর্শন করিয়াছি। মূল কথা এই;—সৃষ্টির অথবা প্রকৃতির দুই প্রান্ত; একটি সূক্ষ্ম, আর একটি স্থূল। আদি-প্রান্ত সূক্ষ্ম, চরম-প্রান্ত স্থূল। দুই প্রান্তের মধ্যে সম্বন্ধ কিরূপ, এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পৌঁছিতে হইলে মধ্যে কোন একটা সেতু বা সোপান-পদ্ধতির আশ্রয় মিলে কি না, যদি মিলে তবে তাহা কিরূপ, ইহাই জিজ্ঞাস্য বিষয়। এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি মীমাংসা করিতে হইলে, চাই সূক্ষ্ম প্রান্ত হইতে স্থূল প্রান্তে নাবি, চাই স্থূল প্রান্ত হইতে সূক্ষ্ম প্রান্তে উঠি, তাহাতে আইসে যায় না, যে দিক্ দিয়াই হউক উভয় প্রান্তের মধ্যে সোপান-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলেই ইষ্টসিদ্ধি হয়। সঙ্গীত শাস্ত্র হইতে আরোহ এবং অবরোহ এই দুই পারিভাষিক বচন তুলিয়া লইয়া উক্ত প্রণালী-দ্বয়ের নামকরণ সমাধা করা যাইতে পারে। সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে নাবাকে অবরোহ-প্রণালী এবং স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ওঠাকে আরোহ-প্রণালী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এক্ষণে উভয় প্রণালীর সমবেত সাহায্যে সৃষ্টিতত্ত্ব আমরা কতদূর জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারি, তাহা এক বার অনুধাবন করিয়া দেখা যাউক।

ক্রমশঃ

হিমালয়।

যেখানে জ্বলিছে সূর্য্য, উঠিছে সহস্র তারা,
প্রজ্জ্বলিত ধূমকেতু বেড়াইছে ছুটিয়া।
অসংখ্য জগৎ-যন্ত্র, ঘুরিছে নিয়ম-চক্রে
অসংখ্য উজ্জ্বল-গ্রহ রহিয়াছে ফুটিয়া॥
গম্ভীর অচল তুমি, দাঁড়ায়ে দিগন্ত ব্যাপি,
সেই আকাশের মাঝে শুভ্র শির তুলিয়া।
নির্ঝর ছুটিছে বক্ষে, জলদ ভ্রমিছে শৃঙ্গে,
চরণে লুটিছে নদী শিলা-রাশি ঠেলিয়া॥
তোমার বিশাল ক্রোড়ে লভিতে বিশ্রাম-সুখ
ক্ষুদ্র নর আমি এই আসিয়াছি ছুটিয়া।
পৃথিবীর কোলাহল, পারি না সহিতে আর,
পৃথিবীর সুখ দুখ গেছে সব মিটিয়া॥
সারাদিন, সারারাত, সমুচ্চ শিখরে বসি,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহময় শূন্য পানে চাহিয়া।
জীবনের সন্ধ্যাকাল কাটাইব ধীরে ধীরে,
নিরালায় মরমের গান গুলি গাহিয়া॥
গভীর নীরব গিরি, জোছনা ঢালিবে চন্দ্র,
দূরশৈলমালা গুলি চিত্র-সম শোভিবে।
ধীরে ধীরে ঝুরু ঝুরু, কাঁপিবেক গাছ পালা
একে একে ছোট ছোট তারা গুলি নিভিবে॥

তখন বিজনে বসি, নীরবে নয়ন মুদি,
স্মৃতির বিষণ্ণ ছবি আঁকিব এ মানসে।
শুনিব সুদূর শৈলে, এক তানে নিঝরিণী,
ঝর ঝর ঝর ঝর মৃদুধ্বনি বরষে ॥
ক্রমে ক্রমে আসিবেক, জীবনের শেষ দিন,
তুষার শয্যার পরে রহিব গো শুইয়া।
মর মর মর মর, ঝুলিবে গাছের পাতা
মাথার উপরে হুহু—বায়ু যাবে বহিয়া ॥
চখের সামনে ক্রমে, নিভিবে রবির আলো
বনগিরি নিঝরিণী অন্ধকারে মিশিবে।
তটিনীর মৃদুধ্বনি, নিঝরের ঝর ঝর
ক্রমে মৃদুতর হ'য়ে কাণে গিয়া পশিবে॥
এত কাল যার বুকে, কাটিয়া গিয়াছে দিন,
দেখিতে সে ধরাতল শেষ বার চাহিব।
সারাদিন কেঁদেকেঁদে-ক্লান্ত শিশুটির মত
অনন্তের কোলে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িব ॥
সে ঘুম ভাঙ্গিবে যবে, নূতন জীবন ল'য়ে,
নূতন প্রেমের রাজ্যে পুন আঁখি মেলিব।
যত কিছু পৃথিবীর সুখ, জ্বালা, কোলাহল,
ডুবায়ে বিস্মৃতি-জলে মুছে সব ফেলিব ॥
ওই যে অসংখ্য তারা, ব্যাপিয়া অনন্ত শূন্য
নীরবে পৃথিবী পানে রহিয়াছে চাহিয়া।
ওই জগতের মাঝে, দাঁড়াইব এক দিন,
হৃদয় বিস্ময়-গান উঠিবেক গাহিয়া ॥
রবি শশি গ্রহ তারা, ধূমকেতু শত শত
আঁধার আকাশ ঘেরি নিঃশবদে ছুটিছে।
বিস্ময়ে শুনিব ধীরে, মহাস্তব্ধ প্রকৃতির
অভ্যন্তর হ'তে এক গীতধ্বনি উঠিছে ॥
গভীর আনন্দ-ভরে, বিস্ফারিত হবে মন
হৃদয়ের ক্ষুদ্র ভাব যাবে সব ছিঁড়িয়া।
তখন অনন্ত কাল, অনন্ত জগত মাঝে
ভুঞ্জিব অনন্ত প্রেম মনঃ প্রাণ ভরিয়া ॥

জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজী সভ্যতা।

(বকল্ সাহেব-কৃত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস।)

প্রকৃত সভ্যতা কি তাহা আমরা পূর্ব্ব-সংখ্যায় এক প্রকার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে ইংরাজী সভ্যতা কি উপকরণে গঠিত তাহা একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ইংরাজী সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া আমরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাই, কিন্তু আমাদের জানা উচিত যে, উহা "বিষকুম্ভং পয়োমুখং"। ইংরাজী সভ্যতা-প্রভাবে বাহ্য সুখ-সমৃদ্ধির বৃদ্ধি হইয়াছে বটে, কিন্তু মনুষ্যের আভ্যন্তরিক প্রকৃতির উন্নতি হওয়া দূরে থাক্, বরং ক্রমশই অবনতি হইতেছে।

ইংরাজী সভ্যতা-প্রভাবে ইংরাজ-সমাজের উন্নতি কি অধোগতি হইতেছে তাহা ইংরাজদিগের মুখেই শুনা যাউক। ওয়ার্লড্ নামক ইংলণ্ডের একটী প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্র বলেন;—"সমাজে সম্ভ্রান্ত-শ্রেণীর মধ্যে

যে সকল ভয়ানক প্রবঞ্চনা ক্রমাগত অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ইতিহাস একবার পাঠ করিয়া দেখ—যে সকল জলবিম্ববৎ অস্থায়ী প্রবঞ্চক ব্যবসায়ী-দল বিশ্বাস-প্রবণ লোকদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশ ও আপনাদিগের স্বার্থসাধন করে, তাহাদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া দেখ। আমাদের কারাগারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর—দেখিবে তাহা জ্ঞানশূন্য নীচ পশুবৎ নিষ্ঠুর আচরণে দণ্ডিত বন্দীদিগের দ্বারা পূর্ণ। আমাদের বিক্রেতাগণ খাদ্য দ্রব্যের সহিত অস্বাস্থ্যকর-দ্রব্য-মিশ্রণ-প্রণালীর কত দূর উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা আলোচনা করিয়া দেখ এবং সমৃদ্ধ লণ্ডন নগরের অধিকাংশ স্থান যে সকল জঘন্য কুটীরে পূর্ণ, সেই সকল কুটীর-নিবাসীদিগের হীন নীতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর এবং তাহার পর বল দেখি আমাদের ধর্ম্মের ফল কি হইয়াছে? আমাদের চা-পানের সভার অভাব নাই—ধর্ম্মপ্রচারক সভার অভাব নাই—আমাদের Soup Kitchen আছে—আমাদের বাইবেল-বিতরণের সভা আছে—বৃহদায়তন দ্বারবিশিষ্ট সুদৃশ্য অনেক গির্জা আছে, এবং সেই সকল গির্জার ঘণ্টা সমস্ত দিনই টুং টাং ঢং ঢং করিয়া উপাসকদিগকে ডাকাডাকি করিতেছে সত্য, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, লোকের মনের ভাব কি খৃষ্টধর্ম্মানুগত? অতি বিষাদের সহিত বলিতে হইবে—না।

উচ্ছৃঙ্খলতা এখনকার কালের প্রাণ বলিলেও হয়। কেবল তাহার উপরিভাগে ধর্ম্ম এবং শিষ্টাচারের একটী দুর্ভেদ্য আবরণ আছে মাত্র। আমরা যুদ্ধপ্রিয় মৃত্যু-ভয়-শূন্য উদার-প্রকৃতি বীর পুরুষ নহি—আমরা নীচ ক্ষুদ্র হিসাবী লোক—পয়সা কুড়ানই আমাদিগের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। আমাদের একালে ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা বিদ্রূপ অধিক কার্য্যকরী এবং ভর্ৎসনা অপেক্ষা ব্যঙ্গ অধিক প্রয়োজনীয়—আমাদের একালে স্থইন্‌বর্ণের কবিতাই প্রণয়কথার চূড়ান্ত আদর্শ এবং বর্লেস্ক্ নাট্যই প্রকৃত দৃশ্য কাব্যরূপে পরিগৃহীত হয়। আমাদের একাল অস্বাভাবিকতার কাল, অসারতার কাল ও সন্দিগ্ধতার কাল। এই সন্দিগ্ধতা অকপট আগ্রহের মৃত্যুস্বরূপ—এই অসারতা ফলবত্তার বিঘ্নস্বরূপ এবং এই অস্বাভাবিকতা সত্যের শত্রুস্বরূপ। অতএব এই কালের নিকট হইতে পয়সা কুড়ান ভিন্ন আর কি আশা করা যাইতে পারে? এখন পয়সারই রাজত্ব, পয়সারই একাধিপত্য। সভ্যতা জিনিসটি মন্দ নয়, উন্নতিও নিতান্ত প্রয়োজনীয় বটে—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি—জন-সাধারণের ভাব-গতির অবনতি হইয়াছে—যে সকল গুণ না থাকিলে মনুষ্যের মহত্ত্ব হয় না, সেই অকপট মনের আগ্রহ, সরলতা এবং জ্বলন্ত উৎসাহ আমরা হারাইয়াছি। আমাদের একালে কোন চাঁদার খাতা খুলিতে গেলে তাহার প্রথমেই বড় বড় নাম থাকা চাই—সাধারণ হিতের জন্য কোন গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে তাহার ভিত্তি-সংস্থাপনের জন্য বড় লোক আবশ্যক,

ধর্ম্মোপদেষ্টা খুব নামজাদা না হইলে তাঁহার বক্তৃতা শোনা হয় না—দান যতই সামান্য হউক না, তাহার বিজ্ঞাপন মহা আড়ম্বরে চতুর্দ্দিকে ঘোষিত হয়।" ঐ পত্র আর এক স্থলে বলেন যে "আমাদের বৃহৎ বৃহৎ নীতি-গ্রন্থ আছে সত্য, কিন্তু এই সকল নীতি-উপদেশ কার্য্যে কতদূর পরিণত করা হয়? নীতি ও ধর্ম্ম যতক্ষণ না জীবনের কার্য্য সকল নিয়মিত করে, ততক্ষণ তাহাদের কোন মূল্যই নাই। আমাদের কি বিশ্বাস ও আচরণে কোন মিল আছে?—পার্লিয়ামেণ্টের কার্য্য-প্রণালীর সংস্কার লইয়া এত বৎসর ধরিয়া যে বিবাদ বিসম্বাদ চলিতেছে তাহার কারণ কি?—অন্যের ধন চুরি করা পাপ এই উপদেশটী এখানকার লোকে বাল্য কাল হইতে শিক্ষা করিয়া আসিতেছেন—কিন্তু অন্যের নিকট আপনাদের স্বাধীন মত বিক্রয় করা তাঁহারা দূষ্য বলিয়া মনে করেন না। এবং এই জন্য পার্লিয়ামেণ্টে সংস্কার আবশ্যক হইয়াছে। উৎকোচ গ্রহণ হইতে ইংরাজ-জাতিকে বিরত করিবার চেষ্টায় কত পার্লিয়ামেণ্ট সভার অধিবেশন স্থগিত হইয়া গেল—কত মন্ত্রিদলের পতন হইল—কত প্রতিভাশালী ব্যক্তি বৃথা মাথা খুঁড়িয়া মরিলেন। এদেশের অপরিমিত পান-দোষ দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়াছে এবং এখানকার বিচারপতিগণ স্ত্রী-নির্যাতক স্বামীদিগকে এরূপ দয়ার চক্ষে দেখেন যে, তাঁহারা মনে করেন যে দুই এক মাসের কারাদণ্ড দিলেই স্ত্রীর মাথা গুঁড়া করিবার জন্য স্বামীর যে দোষ তাহা সম্পূর্ণ রূপে ক্ষালিত হয়।"

স্যাটর্‌ডে রিভিউ নামক ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সমালোচনী পত্রিকা এক স্থলে বলেন—"এই সভ্য-কালে আমরা জাজ্বল্যমান দেখিতে পাইতেছি যে, নর্ত্তকী ও বেশ্যাদলের সংখ্যা ক্রমশই দ্রুতগতি বৃদ্ধি পাইতেছে, স্ত্রীলোকের অযথোচিত আধিপত্য এবং বিবাহ-নিয়মের অবাধ্যতা ক্রমশই বাড়িতেছে—বিলাস ও কোমলতা এত দূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, জগতের ইতিহাসে তাহার আর সাদৃশ্য নাই, বোধ হয় রোমীয় অবনতির শেষ অবস্থায় যেরূপ ঘটিয়াছিল কেবল তাহারই সহিত তুলনা হইতে পারে। এখনকার কালে যে উপায়েই হউক ধনোপার্জ্জন করিতেই হইবে, এবং লোকের এতদূর অধীরতা বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, তাড়িত বার্ত্তাবহও তাহা নিবৃত্তি করিতে পারে না। এখনকার সাহিত্য অপদার্থ পুনরুক্তি ও বিলাস-ভাবে আকীর্ণ এবং বাণিজ্য-ব্যবসায় নিরঙ্কুশ নিষ্ঠুর প্রতারণায় পরিপূর্ণ।"

নিকল্‌স্ সাহেব তাঁহার মানব-শরীরতত্ত্ব গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠায় বলেন—"প্রতি বৎসর লণ্ডন নগরের রাজপথে তিন শতেরও অধিক ভ্রূণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেবল অবিবাহিতা স্ত্রীলোকেরাই যে গর্ভ নষ্ট করে তাহা নহে—বিবাহিতা স্ত্রীলোকদিগকেও এই ভয়ানক নিষ্ঠুর কার্য্যে লিপ্ত দেখা যায়।" তিনি ঐ গ্রন্থের ৬৩ পৃষ্ঠায় আরও বলেন যে "ইংলণ্ডে জঘন্য লাম্পট্য

এবং অপবিত্রতার গভীর কলঙ্ক সমাজের কোন শ্রেণীবিশেষ, পদ-বিশেষ, বা বয়ঃক্রম বিশেষে বদ্ধ নাই। তবে বিলাস-পরায়ণ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ শ্রেণীর ভদ্র লোকের মধ্যে সুনীতির যেরূপ স্পষ্ট ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায় সেরূপ অন্য শ্রেণীর মধ্যে দৃষ্ট হয় না।" ঐ গ্রন্থের ৬৯ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন যে "লণ্ডন নগরে ১৮০০০, এবং সমস্ত ইংলণ্ডে ৫০০০০ বেশ্যার বাস।" ৩৮ পৃষ্ঠায় বলেন "লণ্ডনের প্রধান প্রধান রাজপথ সকল বেশ্যালয়ে পূর্ণ—উহার পূর্ব্ব দিকস্থ সেণ্ট্‌জর্জ্‌ অঞ্চলে ২৩০ বাটীর মধ্যে ১৫০ বাটী বেশ্যালয়।" ৬৯ পৃষ্ঠায় বলেন "প্রত্যেক দুর্গের চতুর্দ্দিকে বেশ্যাগণের উপনিবেশ, প্রত্যেক সৈন্য-নিবাস বেশ্যালয়ের মধ্যে সংস্থাপিত।"

সুবিখ্যাত লেখক হ্যাজ্‌লিট্‌ "জন্‌ বুলের চরিত্র" নামক প্রবন্ধে এই রূপ বলেন —"সংক্ষেপে বলিতে গেলে, জন্‌ বৃষ * এ-কটা নিরেট্‌ মূর্খ, দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য প্রকাণ্ড গোঁয়ার—শত বৎসরের দাসত্ব ভোগ না করিলে তাহার আর চৈতন্য হইবে না। তিনি চান যে লোকে তাঁহাকে স্বদেশানুরাগী বলিবেক, কেন না তিনি আর সকল দেশ-কেই ঘৃণা করেন—তাঁহাকে বিজ্ঞ বলিবেক, কেন না তিনি আর সকল লোককেই নির্বোধ মনে করেন—তাঁহাকে সৎ বলি-বেক, কারণ তিনি আর সকল লোককেই জুয়াচোর মনে করেন! যদি সমস্ত জীবন খুঁৎ খুঁৎ করিয়া কাটাইয়া দেওয়াই মানব-চরিত্র-গত উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয়, তবে জন-পুঙ্গব তাহার খুব নিকটে পৌঁছিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে প্রহার করেন, তাঁহার প্রতিবাসীর সহিত বিবাদ করেন, তাঁহার ভৃত্যগণকে জঘন্য গালাগালি দেন, এবং সময় কাটাইতে ও মনকে চাঙ্গা করিয়া তুলিতে মাতাল হয়েন—অথচ তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস যে তাঁহার ন্যায় নির্দ্দোষ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, ধর্ম্মশীল ও নীতিপরায়ণ ব্যক্তি সমস্ত খৃষ্টীয়মণ্ডলীর মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া ভার। তাঁহার আইনের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে তিনি অত্যন্ত গর্ব্ব করেন, অথচ সমস্ত ইউ-রোপ অপেক্ষা ইংলণ্ডেই অধিক লোক ফাঁসি-কাষ্ঠে আরোহণ করে। তিনি স্বদেশীয় মহিলাগণের সতীত্ব লইয়া বড়ই অহঙ্কার করেন, অথচ সমস্ত ইউরোপের রাজধানী একত্র করিলেও যত না হয়, শুদ্ধ লণ্ডনের রাজপথে তাহা অপেক্ষা অধিক বেশ্যার নিবাস। তাঁহার অনেক সুখের দ্রব্য আছে বলিয়া তিনি গর্ব্ব করেন, কেন না পৃথি-বীর মধ্যে এমন অসুখী মনুষ্য আর দ্বিতীয় নাই। জনসমাজে তাঁহার কোন আমোদ হয় না, এই নিমিত্ত তিনি নিজ বাটীর বিজন অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বেই আমোদ খোঁজেন—আর সেখানে যে তিনি হতবুদ্ধি হইয়া থাকি-বেন সে তো কথাই আছে, সেখানে যে তিনি মুখ ভার করিয়া থাকিবেন তাতে তো তাঁর অধিকারই আছে, এবং সেখানে তিনি যত ইচ্ছা হাস্যাস্পদ হইতে পারেন, কারণ সেখানে কেহ হাসিবার লোক নাই।—বৃষ-

* ইংরাজজাতি জন বুল অর্থাৎ বৃষ নামে আখ্যাত হয়।

মহাশয় অষ্টপ্রহর এরূপ জঘন্য শপথ করেন যে ফরাসিস্‌রা তাঁহাকে "Monsieur God damn me" উপাধি দিয়াছেন। ব্লুষ মহাশয়ের এক দলের উপর আড়ি থাকিলে, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধ দলের সহিত মতের মিল না হইলেও সম্পূর্ণরূপে যোগ দেন—তাঁহার শত্রুতা যেমন অমূলক কারণের উপর স্থাপিত, তাঁহার অন্ধ উৎসাহও তেমনি প্রচণ্ড। ইংলণ্ডের ইতর লোকের ন্যায় অদ্ভুত হাস্যাস্পদ পদার্থ আর জগতে নাই এবং উহারা যেরূপ নিজ উদ্দেশ্য না জানিয়া কাজ করে এরূপ আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।" বকল সাহেব যিনি ইংরাজী সভ্যতার বিষম পক্ষপাতী তিনিও বলেন যে "ইংরাজ সমাজ যাঁহারা উত্তম রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, সেই সকল পর্য্যবেক্ষক যাঁহাদিগের চরিত্র ও মত সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন, তাঁহারা সকলই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মিথ্যা-শপথ যাহা ইংলণ্ডে সচরাচর উচ্চরিত হইয়া থাকে এবং তত্রস্থ শাসন-প্রণালী যাহার অব্যবহিত স্রষ্টা, তাহা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এত দূর প্রচলিত যে উহা জাতীয় ভ্রষ্টাচারের আকর হইয়াছে, মানব-সাক্ষ্যের মূল্য হ্রাস করিয়াছে এবং মনুষ্যগণ পরস্পরের উপর স্বভাবত যে বিশ্বাস স্থাপন করে তাহাও বিচলিত করিয়াছে।" বিষপ্‌ বর্কলি গ্রেট্‌ ব্রিটেনের ধ্বংশ নিবারণ নামক প্রবন্ধে, মিথ্যা শপথ-প্রথা ইংরাজ জাতির অবনতির একটী প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন—"এই দোষটী আমাদের জাতির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আছে; পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নাই যাহার মধ্যে মিথ্যা-শপথ-প্রথা এত দূর প্রচলিত; এখানে লোকেরা যেমন সহজে আহার বিহার করে তেমনি সহজে শপথ-ভঙ্গ করে—গভর্ণমেণ্ট যতই কেন উপায় উদ্ভাবন করুন না, যতক্ষণ এই মিথ্যা-শপথ ও উৎকোচ-গ্রহণ রূপ মহাপাপের ভার আমাদের স্কন্ধে থাকিবে ততদিন আমাদের কখনই মঙ্গল হইবে না।" সর্‌ উইলিয়ম হ্যামিল্‌টন্‌ তাঁহার দর্শন শাস্ত্রের বাদানুবাদ নামক গ্রন্থের ৫৫৩ পৃষ্ঠায় বলেন—"কিন্তু যদি মিথ্যা-শপথ বিষয়ে ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে অগ্রগণ্য হয়, তাহা হইলে ইংরাজী বিশ্ববিদ্যালয়গুলি, বিশেষতঃ অক্‌সফোর্ডের* বিশ্ববিদ্যালয়টি যে আবার ইংলণ্ডের মধ্যে

* অক্‌স্‌ফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে বেন্‌থ্যামের উক্তি হ্যামিল্টনের মতের পোষকতা করিতেছে।—

In the university of Oxford among whose members, the greater number of ecclesiastical benefices are bestowed and which even for laymen is the most fashionable place of education,—when a young man presents himself for admission, his tutor who is generally a clergyman, and the vice-chancellor who is also a clergyman, put into his hands a book of statutes, of which they cause him to swear to abserve every one.

অগ্রগণ্য তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। * * * * অক্‌স্‌ফোর্ড্‌কে এক্ষণে মিথ্যা-শপথের জাতীয় শিক্ষালয় বলিলেও হয়।"

থ্যাকরে তাঁহার ভ্যানিটি-ফেয়ার অর্থাৎ "ফক্কিকারির হাট বাজার" নামক উপন্যাসের ৩০৬ পৃষ্ঠায় বিদেশে ইংরাজদিগের ব্যবহার সম্বন্ধে বলেন—"ফ্রান্স্‌ কিম্বা ইটালি দেশের প্রত্যেক নগরে দেখিতে পাইবে যে, আমাদের দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ সেই ইতর ধরণের দাম্ভিকতা-পূর্ণ নবাবি চাল-চোল ও ভড়ং ভাড়ং দেখাইয়া তত্রস্থ নিরীহ সরাইওয়ালা-দিগকে জুয়াচুরি করিয়া ফাঁকি দিতেছে—বিশ্বাস-প্রবণ ব্যাঙ্ক-অধ্যক্ষদিগের নিকট জাল চেক্‌ চালাইতেছে—গাড়ি ওয়ালাদিগের গাড়ি, স্যাকরাদিগের গয়না-পত্র, গোবেচারা পান্থদিগের সহিত তাস খেলিয়া তাহাদি-গের পয়সা কড়ি—এমন কি সাধারণ পুস্ত-কালয়ের পুস্তকগুলি আত্মসাৎ করিতেছে।" এই সকল বিখ্যাত ইংরাজ লেখকদিগের মুখেই ইংরাজ-সমাজের পরিচয় পাওয়া গেল—ইংরাজ-সমাজের বিষয় ইংরাজেরা যেরূপ ভাল করিয়া বলিতে পারেন সেরূপ আমরা কখনই পারিব না—অতএব ইহার পর ইংরাজ-সমাজ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা ধৃষ্টতা মাত্র। সুঃ—

বুড়ার কথা।*

এই অশীতি বৎসরে আমি যাহা দেখিয়াছি এবং স্বর্গীয় অতি-বৃদ্ধদের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে আরম্ভ করিলাম। ইতিহাসের কার্য্য কারণের বাঁধাবাঁধি, কালের আঁটা-আঁটি ও তর্কের খুটিনাটি ইহাতে কিছু থাকিবে না, শুষ্কপ্রায় স্মৃতি-নদীর ক্ষীণ জোয়ারে ধীরে ধীরে যাহা ভাসিয়া আসিবে তাহাই তুলিয়া দিব, ভরসা করি এ পরিশ্রম বিফল হইবে না।

গাড়ি, পাল্কি ও নৌকা।—পাশ্চাত্য সভ্যতার আবির্ভাবে এদেশীয়দিগের বাবুগিরির যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। দুই পদ অগ্রসর হইতে হইলে এক্ষণে যান-বাহন আ-বশ্যক। পূর্ব্বে যান-বাহনেরও অসদ্ভাব ছিল ও লোকেরাও বলিষ্ঠ ছিল। সুতরাং পদব্রজে

At the same time, it is perfectly well known to this vice-chancellor and to this tutor, that there never has been any person who was able to observe all these statutes. It is thus that the first lesson this young man learns, and the only lesson he is sure to learn is a lesson of perjury.

Bentham Vol II Page 210

* কাঁচড়াপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত উমানাথ রায় প্রণীত। ইঁহার বয়ঃক্রম অশীতি বৎসর।

সকলে যাতায়াত করিত। বোঁচা ও মেয়ানা পাল্‌কী, বজরা, তানজান্‌ ইত্যাদিতে বড় লোকেই চড়িতেন, বিবাহের সময় কেবল মধ্যবিত্ত লোকে পাল্‌কী চড়িত, বড়মানুষের ছেলে বিবাহ করিতে গেলে তানজানে যাইত। রথ, হস্তী ও ঘোটকে চড়িয়া বিবাহ করিতে যাওয়া রাজা ও হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে চলিত ছিল। বাঙ্গালির মধ্যে চুঁচুড়া-নিবাসী মৃত নীলমণি হালদার প্রথমে গাড়ি চড়েন, তাঁহার সাহেব কোচম্যান ছিল, তাঁহার দেখাদেখি কলিকাতার বড় মানুষেরা গাড়ি ধরিলেন। পূর্ব্বে এ প্রকার ছেক্‌ড়া গাড়ি ছিল না, দড়িতে ঝুলান নৌকা-আকারের গাড়ি কয়েক খানা মাত্র ছিল। জলপথে বধূ বা কন্যা আনিতে হইলে, জেলেডিঙ্গির উপর টাপর করিয়া সতরঞ্চ মুড়িয়া আনা হইত। যদি কেহ কখন পীড়া বশতঃ বা বড়মানষী করিয়া এক খানা ডিঙ্গী ভাড়া করিতেন, তাহা হইলে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলকেই সংবাদ দেওয়া হইত, সকলে একত্রিত হইয়া ডিঙ্গিচড়ার আয়েস উপভোগ করিতেন। তৎকালে লোকে ডুলিও সর্ব্বদা ব্যবহার করিত। ডুলি তিন কর্ম্মে প্রায় ব্যবহৃত হইত।

১। স্ত্রীলোক আনয়ন বা প্রেরণ।

২। পীড়িতকে গঙ্গাতীরস্থ করা।

৩। অপটু যাত্রীর শ্রীক্ষেত্রে গমন।

কালের গতিতে কি না হয়। পূর্ব্বে এক মাসে কাশীধামে পৌছিলে মনুষ্যের তৃপ্তি হইত, এক্ষণে ঐ সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করিয়া সন্তোষ হয় না, মনুষ্য অল্পায়ুঃ হইয়াছে, কার্য্যও যথেষ্ট বাড়িয়াছে, সুতরাং অল্প সময়ে অধিক কার্য্য করা আবশ্যক। সময়ের অভাব মোচন করিতে রেলগাড়ি কলের জাহাজ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে, হয় ত শত বৎসর পরে দ্রুত গমন করিবার আরও কিছু নূতন উপায়ের আবিষ্ক্রিয়া হইবেক।

বুড়ার সম্মান।—এখনকার নব্য সম্প্রদায় "বুড়া" মাত্রকেই "ওল্‌ড ফুল" বলিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বে বুড়াদের অত্যন্ত সম্মান ছিল। গ্রামের বুড়া কলহ ভঞ্জন করিবেন, দলাদলি নিবারণ করিবেন, পঞ্জিকা দেখিয়া দিনস্থির করিবেন, বিবাহ শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য কর্ম্মোপলক্ষে আয়োজনাদির ব্যবস্থা দিবেন, এমন কি, তিনি গ্রামের শিরোমণি, যাহা বলিবেন তাহাই হইবে। গ্রামের জামাতারা আসিয়া অগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, নূতন লোক আসিয়া প্রথম তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন, গ্রামস্থ নব্য দল তাঁহার নিকটে উচ্চ কথা কহিবে না, শীষ দিবে না, বা গান করিবে না, বৌ ঝিরা সে পথে যাইলে মলের বাদ্য করিবে না, এমন কি, মাথায় ফেরতা দিয়া সেখান দিয়া কেহ যাইবে না। ইংরাজদের টুপিখোলা প্রথা যেমন সম্মান-সূচক, মাথায় ফের্‌তা না দিয়া যাওয়াও তদ্রূপ ছিল।

বয়স্থের শৈশব-সরলতা—মৃত মহাত্মা দ্বারকানাথ ঠাকুর বড় চোর ডাকাইতের গল্প শুনিতে ভাল বাসিতেন। চোর ডাকাইতেরা গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিয়া

গেল শুনিলে তিনি মহা কাতর হইতেন, আর যদি গৃহস্থেরা চোর ডাকাইত ধরিয়াছে বা তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছে বা বিলক্ষণ প্রহার করিয়াছে এমত শুনিতেন, তাহা হইলে আর তাঁহার আনন্দের ইয়ত্তা থাকিত না। আর ঐ প্রকার তাড়নার গল্পই শুনিতে চাহিতেন।

কলিকাতার কোন বড় মানুষ প্রত্যহ বৈকালে গল্প শুনিতেন। গল্প করিবার জন্য মাহিনা করা চাকর নিযুক্ত ছিল। গল্পের নায়ক নায়িকা বা অপর কেহ যদি অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইত, বা তাহাদিগের কোন বিপদ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে তিনি এত উত্তেজিত হইতেন যে তৎক্ষণাৎ বলিতেন "মেরোনা মেরোনা, ওকে বাঁচাও আমি দশ টাকা দিব" অথবা "ঐ বাঘটাকে তাড়াইয়া দেও, ঘুমন্ত কোটালের পুত্রের অনিষ্ট না হয়, আমি ৫ টাকা দিব।" কথকেরা ইচ্ছা করিয়া বাবুকে উত্তেজিত করিত ও নায়ক নায়িকাদিগকে কষ্টে ফেলিয়া টাকা সংগ্রহ করিত।

সেকেলে বড়মানুষী—কোন হিন্দু-রাজা মন্ত্রী ও অপর পারিষদ্‌বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া একদা পৌষ মাসের রাত্রে স্বীয় বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। রাত্রি এক প্রহর হইতেই শিবাদল কোলাহল করিয়া উঠিল। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন হে মন্ত্রী শেয়াল গুলা ডাকিতেছে?" মন্ত্রী উত্তর করিলেন, "মহারাজ! ওরা শীতে কষ্ট পাইতেছে বলিয়া আপনাকে জানাইতেছে" রাজা ইহা শুনিয়া বলিলেন "আচ্ছা ওদের কম্বল দাও" পর দিন প্রাতঃকালে মন্ত্রী কোষাগার হইতে কম্বলের জন্য ৫০০০ টাকা বাহির করিয়া লইলেন। দিন কয়েক পরে রাজা পুনরায় পারিষদ-বর্গ লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় শিবাদল অভ্যাস মত আবার ডাকিয়া উঠিল। রাজা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন "কেমন হে মন্ত্রী কম্বল ত দেওয়া হইয়াছে, তবে আবার ডাকে কেন?" মন্ত্রী কহিলেন "মহারাজ আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে" রাজা কিছু না বলিয়া নিরুত্তর হইলেন। কিছুকাল পরে রাজা নিতান্ত পীড়িত হইলেন। এবং বাঁচিবার প্রত্যাশা নাই বুঝিয়া মন্ত্রী ও রাজকুমারকে আহ্বান করিলেন। উহাঁরা দুইজনে উপস্থিত হইলে পর রাজা মৃদুস্বরে বলিলেন "মন্ত্রী আমি ত চলিলাম, রাজকুমার ছেলে মানুষ, যাহাতে সমস্ত বজায় থাকে দেখিবে, অর্থ-নাশ কোন প্রকারে না হয়।" মন্ত্রী ক্রন্দনের ভাণ করিয়া কহিলেন, "মহারাজের ধন আমার শরীরের রক্ত, কোন মতে তার অপব্যয় হইবে না, আমি পাইটি পর্য্যন্ত কোষাগারে জমা দিব।" রাজা কহিলেন "তবে সেই ৫০০০ টাকা সুদ সমেত জমা দিও।" মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন ৫০০০?" রাজা উত্তর করিলেন "যে ৫০০০ টাকায় শিয়ালদের কম্বল দিয়াছিলে।" মন্ত্রী লজ্জায় অধোবদন হইলেন। রাজা আর কিছু না বলিয়া উত্তর করিলেন "তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য আমি ঐ প্রকার করিয়াছিলাম। তুমি খাঁটি নহ তাহা আমি জানিতাম, যাহা

হউক শেয়ালদের কম্বল দেওয়া আর কখন না হয়, ও প্রকার করিলে আপনার মান হারাইবে, ঐ প্রকার আচরণ করিলে উষ্ণ-শোণিত রাজকুমার কদাচ তোমার মান রাখিবেন না।"

গল্পটির সার এই—প্রতারিত হইতেছি জানিয়াও অনুগতকে অকাতরে ও সাহ্লাদে দান করা, এবং শেষে টাকার উল্লেখ করিয়া মন্ত্রীকে সতর্ক করা মাত্র।

গণিকা।—এসম্প্রদায় যদিও কুলটা তত্রাপি একেবারে ধর্ম্ম-কর্ম্ম বা দয়া দাক্ষিণে বর্জ্জিতা ছিল না। অনেকেই গৃহস্থের ন্যায় আচরণ করিত ও হিন্দুয়ানীতে বিশেষ আস্থা রাখিত; অনেকের বাটীতে নিত্য সেবা ও পূজাদি হইত। তখনকার অধিকাংশ লোকেই বেশ্যালয়ে গমন করিতেন। যাইবার কোন কদর্য্য অভিপ্রায় ছিল না। কেবল দশ-জন ভদ্রলোকে একত্রিত হইয়া গান বাদন, ক্রীড়া বা সদালাপ করামাত্র। এ বিষয়ে পূর্ব্বকার গ্রীকদিগের সহিত বাঙ্গালিদের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের (Hetairae) হিটেরি বেশ্যা-লয়ে, যত গণ্য মান্য ও সদ্বিদ্বান একত্রিত হইয়া সমালোচনা ও তর্কাদি করিতেন। সক্রেটিসের রক্ষিত আস্‌পেসিয়ার ভবনেও এই প্রকার বহুতর ভদ্র লোকের সমাগম হইত। ফ্রান্স্‌ দেশে (Ninon Declos) নিনো ডেক্লোর ভবনেও ঐরূপ হইত। কুটী-য়ালেরা আপিস হইতে আসিয়া, হস্তপদাদি ধৌত করিয়া, বৃদ্ধ ও আধ বৃদ্ধেরা হরি নামের ঝুলি লইয়া, বেশ্যালয়ে উপস্থিত হই-তেন; বয়সের তারতম্য ছিল না, সকল বয়-সের লোকই সমবেত হইতেন। অনেকে ঐ সমস্ত স্থানে "সহবৎ" শিক্ষা করিতে আসি-তেন। পান তমাকু সেবন, কখন কখন গাঁজা ও চরসের ধূম-পান ব্যতীত মদ্যের সহিত কোন সংশ্রব ছিল না। দুই এক ঘণ্টা আমোদ করিয়া সকলে চলিয়া যাইতেন। তখনকার বড় মানুষেরা এই প্রকার সবান্ধবে আমোদ করিবার নিমিত্ত বেশ্যা রাখিতেন। বেশ্যার সংখ্যা তখন অত্যন্ত অল্প ছিল।

মেঘনাদ-বধ কাব্য।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।)

আমরা গত বারে যখন রাবণের চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম, তখন মনে করিলাম যে, রাবণের ক্রন্দন করা যে অস্বা-ভাবিক, ইহা বুঝাইতে বড় একটা অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; কিন্তু এখন দেখিলাম বড় গোল বাধিয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন "রাবণ পুত্র-শোকে কাঁদি-য়াছে, তবেইত তাহার বড় অপরাধ!" পুত্র-শোকে বীরের কিরূপ অবস্থা হয়, তাঁহারা আপনা-আপনাকেই তাহার আদর্শ-

স্বরূপ করিয়াছেন। ইহাঁদের একটু ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। পাঠকদের কেহ বা ইচ্ছা করিয়া বুঝিবেন না, তাঁহাদের সঙ্গে যুঝা-যুঝি করা আমাদের কর্ম্ম নহে, তবে যাঁহারা সত্য অপ্রিয় হইলেও গ্রহণের জন্য উন্মুখ আছেন তাঁহারা আর একটু চিন্তা করিয়া দেখুন।

সেনাপতি সিউয়ার্ডের পুত্র যুদ্ধে হত হইলে রস্ আসিয়া তাঁহাকে নিধন-সংবাদ দিলেন। সিউয়ার্ড জিজ্ঞাসা করিলেন,"সম্মুখ ভাগেইত তিনি আহত হইয়াছিলেন?"

রস।—"হাঁ, সম্মুখেই আহত হইয়াছিলেন।"

সিউয়ার্ড্।—"তবে আর কি! আমার যত গুলি কেশ আছে তত গুলি যদি পুত্র থাকিত, তবে তাহাদের জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম মৃত্যু প্রার্থনা করিতাম না।"

ম্যাল্কম্।—"তাঁহার জন্য আরো অধিক শোক করা উচিত।"

সিউয়ার্ড।—"না, তাঁহার জন্য আর অধিক শোক উপযুক্ত নহে। শুনিতেছি তিনি বীরের মত মরিয়াছেন, ভালই, তিনি তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, ঈশ্বর তাঁহার ভাল করুন।"—ম্যাক্‌বেথ।

আমরা দেখিতেছি, মাইকেলের হস্তে যদি লেখনী থাকিত তবে এই স্থলে তিনি বলিতেন যে,

"হা পুত্র, হা সিউয়ার্ড্, বীর-চূড়ামণি
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে!"

আডিসন তাঁহার নাটকে পুত্র-শোকে কেটোকে ত ক্ষুদ্র মনুষ্যের ন্যায় রোদন করান নাই!

স্পার্টার বীর-মাতারা পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দিবার সময় বলিতেন না, যে,

"একাল সমরে,
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে
তোমা বারংবার!"

তাঁহারা বলিতেন "হয় জয় নয় মৃত্যু তোমাকে আলিঙ্গন করুক!"

রাণা লক্ষ্মণ-সিংহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ রাজপুত্র যুদ্ধে মরিলে জয় লাভ হইবে; তিনি তাঁহার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে মরিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি ত তখন রুদ্যমান পারিষদগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সভার মধ্যে

"ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রু-ধারা তিতিয়া বসনে,"

কাঁদিতে বসেন নাই।

রাজস্থানের বীরদিগের সহিত, স্পার্টার বীর-মাতাদের সহিত তুলনা করিলে কল্পনা-চিত্রিত রাবণকেও স্ত্রীলোকের অধম বলিয়া মনে হয়!

কেহ কেহ বলেন, "অন্য কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যে মাইকেলকে লিখিতে হইবে এমন কি কিছু লেখাপড়া আছে?" আমরা তাহার উত্তর দিতে চাহি না, কেবল এই কথা বলিতে চাহি যে, সকল বিষয়েরইত একটি উচ্চ আদর্শ আছে, কবির চিত্র সেই আদর্শের কত নিকটে পৌঁছিয়াছে এই দেখিয়াই ত আমাদের কাব্য আলোচনা করিতে হইবে।

স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই দুইটি কথা লইয়া কতকগুলি পাঠক অতিশয় গণ্ডগোল করিতেছেন। তাঁহারা বলেন যাহা স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর, তাহাই কবিতা; পুত্র-শোকে রাবণকে না কাঁদাইলে অস্বাভাবিক হইত, সুতরাং কবিতার হানি হইত। দুঃখের বিষয়, তাঁহারা জানেন না যে, এক জনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, আর এক জনের পক্ষে তাহাই অস্বাভাবিক। যদি ম্যাকবেথের ডাকিনীরা কাহারো কষ্ট দেখিয়া মমতা প্রকাশ করিত তবে তাহাই অস্বাভাবিক হইত, যদিও সাধারণ মনুষ্যদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক। আমি ত বলিতেছি না যে, বীর কষ্ট পাইবেন না, দুঃখ পাইবেন না'; সাধারণ লোক যত খানি দুঃখ কষ্ট পায় বীর তেমনি পাইবেন অথবা তদপেক্ষা অধিক পাইতেও পারেন, কিন্তু তাঁহার এতখানি মনের বল থাকা আবশ্যক যে, পুরুষের মত, বীরের মত, তাহা সহ্য করিতে পারেন; শরীরের বল লইয়াইত বীরত্ব নহে। যে ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া ফেলে সেই ঝড়ই হিমালয়ের শৃঙ্গে আঘাত করে, অথচ তাহা তিল-মাত্র বিচলিত করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন "ঐ প্রকার মত পূর্ব্বকার ষ্টোয়িক্‌দিগেরই সাজিত, এখন ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও কথা শোভা পায় না; ষ্টোয়িক দার্শনিক যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া স্থির ভাবে দহন-জ্বালা সহ্য করিয়াছেন সে তাঁহাদের সময়েরই উপযুক্ত।" শিক্ষিত লোকেরা এরূপ অর্থহীন কথা যে, কি করিয়া বলিতে পারেন তাহা আমরা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। তাঁহারা কি বলিতে চাহেন যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া ক্রন্দন করাই বীর পুরুষের উপযুক্ত! তাঁহাদের যদি এরূপ মত হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ বীরত্বের প্রয়োজন নাই, তবে তাঁহাদের সহিত তর্ক করা এ প্রস্তাবে অপ্রাসঙ্গিক, কেবল তাঁহাদিগকে একটি সংবাদ দিতে ইচ্ছা করি যে, বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়া ও অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া আমরা ত এই রূপ ঠিক্ করিয়াছি যে রাবণ ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক নহেন! ষ্টোয়িকদের ন্যায় সমস্ত মনোবৃত্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলা যে বীরত্ব নয় তাহা কে অস্বীকার করিবে? যেমন বিশেষ বিশেষ রাগ রাগিণীর বিশেষ বিশেষ বিসম্বাদী সুর আছে, সেই সেই সুর-সংযোগে সেই সেই রাগিণী নষ্ট হয়, সেইরূপ এক একটি স্বভাবের কতকগুলি বিরোধী গুণ আছে, সেই সকল গুণ বিশেষ বিশেষ চরিত্র নষ্ট করে। বীরের পক্ষে শোকে আকুল হইয়া কাঁদিয়া গড়াগড়ি দেওয়াও সেই প্রকার বিরোধী গুণ। যাক্—এসকল কথা লইয়া অধিক আন্দোলন সময় নষ্ট করা মাত্র। এখন লক্ষ্মীর চরিত্র সমালোচনা করা যাউক্। *

* আমরা পূর্ব্ব সংখ্যায় দেখাইয়াছি যে মৃত মেঘনাদের সহিত বায়ু-বল-ছিন্ন কিংশুক ফুলের তুলনা অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষাকে একটু মোচড়াইয়া "কিংশুক" শব্দে কিংশুক বৃক্ষ অর্থ করিলে সে দোষ কাটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষায় কিংশুক বলিতে বৃক্ষ না বুঝাইয়া পুষ্পই বুঝায়, যেমন আম্র বলিলে ফলই বুঝায়, গোলাপ বলিলে ফুলই বুঝায় ইত্যাদি।

প্রথম সর্গের মধ্যভাগে লক্ষ্মী-দেবীর অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মেঘনাদ-বধে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই এবং কতকগুলি আমাদের মনের মত হয় নাই। রাবণের চরিত্র যেমন আমাদের মনের মত হয় নাই তেমনি লক্ষ্মীর চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই। লক্ষ্মীর চরিত্র-চিত্রের দোষ এই যে, তাঁহার চরিত্র কি রূপ আমরা বলিতে পারি না। আমরা যেমন বলিতে পারি যে, মেঘনাদ-বধের রাবণ স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল-হৃদয়, অসাধারণ পুত্রবৎসল, তেমন কি লক্ষ্মীকে কিছু বিশেষণ দিতে পারি? সে বিষয় সমালোচনা করিয়াই দেখা যাউক্।

মুরলা আসিয়া লক্ষ্মীকে যুদ্ধের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষ্মী কহিলেন,

"——হায়লো স্বজনি!
দিন দিন হীন-বীর্য্য রাবণ দুর্ম্মতি,
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে!"

শেষ ছত্রটিতে ভাবের অনুযায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন তরঙ্গ বার বার আসিয়া তটভাগে আঘাত করিতেছে। মুরলা জিজ্ঞাসা করিলেন "ইন্দ্রজিৎ কোথায়?" লক্ষ্মীর তখন মনে পড়িল যে, ইন্দ্রজিৎ প্রমোদ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং মুরলাকে বিদায় করিয়া ইন্দ্রজিতের ধাত্রীবেশ ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইন্দ্রজিৎকে ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ দিয়া যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিলেন। এত দূর পড়িয়া আমরা দেবীকে ভক্তবৎসলা বলিতে পারি। কিন্তু আবার পরক্ষণেই ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিতেছেন,

"——বহু কালাবধি
আছি আমি সুরনিধি স্বর্ণ লঙ্কা ধামে,
বহুবিধ রত্নদানে বহু যত্ন করি,
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায় এত দিনে
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্ম্ম-দোষে
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র,
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু
পারে সে বাহির হোতে? যতদিন বাঁচে
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘরে।"

আর এক স্থলে—"না হইলে নির্ম্মূল সমূলে
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে!"

অর্থাৎ তুমি কারাগারের দ্বার খুলিবার উপায় দেখ, রাবণকে বিনাশ কর, তাহা হইলেই আমি আস্তে আস্তে বাহির হইয়া আসিব। রাবণ পূজা করে বলিয়া মেঘনাদ-বধের লক্ষ্মীর তাহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ জন্মিয়াছে, এ নিমিত্ত সহজে তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন না, ভাবিয়া ভাবিয়া একটি সহজ উপায় ঠাওরাইলেন, অর্থাৎ রাবণ সবংশে নিহত হইলেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এইরূপ বোধ হয় যে, রাবণ যদি লক্ষ্মীর স্বভাবটা ভাল করিয়া বুঝিতেন ও ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিতেন যে লক্ষ্মী অবশেষে এইরূপ নিমথারামী করিবেন, তবে নিতান্ত নির্ব্বোধ না হইলে কখনই তাঁহাকে

"বহুকালাবধি

বহুবিধ রত্নদানে বহু যত্ন করি"

পূজা করিতেন না।

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে কহিতেছেন,

"মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ী,
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে।"

ইহার মধ্যে যে একটু তীব্র উপহাস আছে; দেবী হইয়া লক্ষ্মী ইন্দ্রকে যে এরূপ সম্বোধন করেন, ইহা আমাদের কাণে ভাল শুনায় না। ঐ ছত্র দুটি পড়িলেই আমরা লক্ষ্মীর যে মৃদু হাস্য-বিষ মাখা একটি মর্ম্ম-ভেদী কটাক্ষ দেখিতে পাই, তাহাতে দেব ভাবের মাহাত্ম্য অনেকটা হ্রাস হইয়া যায়। লক্ষ্মী ঐরূপ আর এক স্থলে ইন্দ্রের কৈলাসে যাইবার সময় তাঁহাকে কহিয়াছিলেন,

"বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও বৈকুণ্ঠ পুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কা পুরে! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল, একবার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে?
কোন্ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হোতে
রাখে দূরে—জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে।"

এখানে "বিজ্ঞ জটাধর" কথাটি পিতার প্রতি কন্যার প্রয়োগ অসহনীয়। ইহার পর ষষ্ঠ সর্গে আর এক স্থলে লক্ষ্মীকে আনা হই-য়াছে। এখানে মায়া আসিয়া লক্ষ্মীকে তেজ সম্বরণ করিতে বলিলেন। লক্ষ্মী কহিলেন

"কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া অবহেলে তব
আজ্ঞা? কিন্তু প্রাণ মম কাঁদেগো স্মরিলে
এ সকল কথা! হায় কত যে আদরে
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রাণী মন্দোদরী,
কি আর কহিব তার?"

ইহাতে লক্ষ্মীকে অত্যন্ত ভক্ত-বৎসলা বলিয়া মনে হয়, তবে যেন মায়ার আজ্ঞায় ভক্ত-গৃহ ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছেন। আবার সপ্তম সর্গে তিনিই রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। লক্ষ্মী যে কিরূপ দেবতা তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না এবং কখনো যে তাঁহাকে পূজা করিতে আমাদের সাহস হইবে, তাহারো কোন সম্ভাবনা দেখিলাম না। মেঘনাদ-বধে দেবতা ও সাধারণ মনু-ষ্যের মধ্যে কিছুমাত্র বিভিন্নতা রক্ষিত হয় নাই; ইন্দ্রাদির চরিত্র-সমালোচনা-কালে পাঠকেরা তাহার প্রমাণ পাইবেন।

ভঃ

গঞ্জিকা।

অথবা

ভুরিতানন্দ বাবাজির আকড়া।

বাচস্পতি-মহাশয় এক দিন বলিলেন "অহে বংসাহেব, তোমরা যে কালেজ কালেজ কর, ও শব্দটার অর্থ কি? আমাকে বলিতে পার? আমি উহার এইরূপ ভাষা করি—কালেজ কি না কা-য়ের পশ্চাদ্ভাগে লেজ যাঁর ইতার্থে কালেজঃ। নামেও যা' কাজেও

তাই—আমাদের সেকালের টোলের যত বড় বিদ্যাসাগরই হউন না, তাঁহাকে লঙ্ঘন করা কালেজ-বীরেরই কার্য্য!" এই-রূপে যখন বাচস্পতি-মহাশয় নস্যের বারুদে হাস্যের অগ্নি সংযোগ করিয়া ভাষের গোলা নিক্ষেপ করিলেন, বংসাহেব কি করিলেন? তিনি পাইপ মুখে করিয়া, ফড়াৎ করিয়া ম্যাচ্ বক্‌সে দিয়েসলাই টানিয়া, বাম হস্তের অবধানতা এবং দক্ষিণ হস্তের দক্ষতার গুণে নল-ভাণ্ডে অগ্নি-কাণ্ড করিয়া, গল্পিকাধূমে মুখাভ্যন্তর পরিপূর্ণ করিয়া, এতগুলি কার্য্য চকিতের মধ্যে সামাধা করিয়া বাচস্পতি মহাশয়ের দিকে ধূম ফুংকার করত বলিলেন "উনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানের উজ্জ্বলতা, উদারতা এবং উন্নতি-শীলতার প্রতি উপহাস কি উচিত?" এইরূপ গোটা পাঁচ ছয় উয়ের ফুঁয়ে বাচস্পতি মহাশয়ের কথাটা একেবারেই উড়াইয়া দিলেন। সবজান্তা মহাশয় বলিলেন "ইঙ্গ-বঙ্গ তুমিও এক-দিক্ দেখিতেছ, বাচস্পতি-মহাশয় কিছু মনে করিবেন্ না, আপনিও কেবল একদিক দেখিতেছেন। তুমি ইঙ্গ-বঙ্গ বিলাত-রঞ্জন টানিয়া থাক, বাচস্পতি-মহাশয় আপনি ভারতরঞ্জন টানিয়া থাকেন—কিন্তু আমি পাঁচ মিসল করিয়া পঞ্চরঞ্জন টানিয়া থাকি। আমার কিছুতেই দ্বিধা নাই—আমার কাছে টিকি খড়মও যা, হ্যাট্ বুট্‌ও তা, সবই সমান। আমার যে কেবল পুঁথিগত বিদ্যা তাহা নহে, আমি অনেক ভ্রমণ করিয়াছি, অনেক দেখিয়াছি, অনেক শুনিয়াছি; এমনি সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছি যাহা তোমাদের স্বপ্নের অগোচর; উচ্চতরণের ভক্ত-সাহেবকে পট্টবস্ত্র পরিয়া হবিষ্য করিতেও দেখিয়াছি; আর বুড়া বাল্মীকি মুনিকে হ্যাট্ কোট্ পরিয়া খানা খাইতেও দেখিয়াছি; দেখিবার আর কিছু বাকি রাখি নাই।

বাল্মীকির নাম শুনিয়া হাস্য করিতেছেন? করিবেন না। আপনারা জানেন যে, ব্যাসদেবই অমর, কিন্তু আমি বহুশাস্ত্র অন্বেষণ করিয়া সন্ধান পাইয়াছি যে, বাল্মীকি মুনিও অমর। তিনি এখন ডাক্তার বাল্মীকি মুনি হইয়া অধুনাতন কালের তমসা নদীর (টেম্‌স্ নদীর) তীরে নন্দন পুরীতে (লণ্ডন নগরে) বাস করিতেছেন। তাঁহার রচিত উনবিংশ শতাব্দীয় রামায়ণের প্রথম ক্যাণ্টো আমার কণ্ঠস্থ আছে; তাহা শুনিলে আপনারা বিস্মিত হইবেন যে, এমন যে, সেকেলে মুনিগোসাঁই বাল্মীকি তিনিও কালেজী পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহা আমি পাঠ করিতেছি আপনারা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। এই বলিয়া পাঠারম্ভ করিলেন।

রামিয়াড্

অথবা

ডাক্তার বাল্মীকি এল্ এল্ ডি, এফ্ আর্ সি এস্ কৃত

উনবিংশ শতাব্দীয় রামায়ণ

পুণ্যতীর্থ তমসা-নদীর তীরে ডাক্তার বাল্মীকির তপোবন। তার-কণ্ঠী কুক্কুট

কুক্কুটী বিহঙ্গরা মনের উল্লাসে গান করিতেছে; কোথাও বা আশ্রম-মৃগ কুক্কুরগণ সুখে অস্থি-দূর্ব্বা রোমন্থ করিতেছে। ডাক্তার বাল্মীকি আশ্রম-কুটীরে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া ফায়ের-সাইড্ অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ঈজিচেয়ার-বেদীতে হেলান দিয়া ম্যানিলা পত্রের ধূমপান করিতেছেন; চুরট-প্রান্ত হইতে ঘন ধূমরাশি কুণ্ডলী পাকাইয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে, সেই ধূপধূনার পুণ্য গন্ধে আশ্রম-কুটীর আমোদিত হইতেছে। মধ্যে মধ্যে মুনিবর পার্শ্বস্থিত বোতল-কমণ্ডলু হইতে শ্যামপেনের সোম-পান করিতেছেন; এমন সময়ে কুটীর-দ্বারে ঘা পড়িল। মুনি-কুমার মাস্টর ভরদ্বাজ, ডাক্তার বাল্মীকির নিকটে আসিয়া সমাচার দিল—"রেবেরেণ্ড মিস্টর নারদ আসিয়াছেন।" ধ্যানমগ্ন বাল্মীকির চটক্ ভাঙিয়া গেল, অমনি তিনি শশব্যস্তে উঠিয়া দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন এবং হাইচর্চ মিসনরি সোসাইটির পরিব্রাজক মিসনরি, সঙ্গীতের অধ্যাপক, সহস্র চুরট-ভস্মকারী গোখাদকদিগের অগ্রগণ্য রেবেরেণ্ড নারদের সহিত চটুল-ভাবে হস্তালোড়ন পূর্ব্বক "কেমন করিতেছ" বলিয়া কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ উত্তর করিলেন "সম্পূর্ণ ভাল—ধন্যবাদ তোমাকে।" অতঃপর বাল্মীকি নারদকে আহ্বান পূর্ব্বক কুটীরের মধ্যে লইয়া গিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন। মহামুনি, ধুচুনি উষ্ণীষ মস্তক হইতে অবতারণ পূর্ব্বক চেয়ারে উপবেশন করিলেন; পরে চেয়ারের নিম্নে উষ্ণীষ স্থাপন করিয়া বলিলেন "বাল্মীকি! তোমায় আজ এত ভাবিত দেখিতেছি কেন?" বাল্মীকি উত্তর করিলেন "প্রিয় খুড়া, সত্য বলিয়াছ, আমি কিছু ভাবিত আছি; অনেক দিন হইতে আমি মনে করিতেছি একটি মহাকাব্য লিখিব—কে নায়ক হইবার উপযুক্ত তাহাই এতক্ষণ আমি এই অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া ধ্যান করিতেছিলাম। বুদ্ধিকে সতেজ করিবার জন্য গ্যালন্ গ্যালন্ সোমপান করিয়াছি তথাপি তাহার কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারি নাই। এক্ষণে, খুড়া, তুমি কি এত দয়ালু হইবে যে, ইহার একটা সৎপরামর্শ দিয়া আমাকে বাধিত করিবে?" সুবিজ্ঞ নারদ আজানুলম্বিত পাকা দাড়ি বুলাইতে বুলাইতে উত্তর করিলেন—"দেখ বাপু বাল্মীকি! মহাকাব্য, ভাষায় যাহাকে এপিক্ পোয়েম বলে, তাহা অতি দুরূহ ব্যাপার, তাহা লেখা তোমার আমার কর্ম্ম নহে। এক যা' লিখিয়াছিলেন মহর্ষি হোমর—তেমন এপর্য্যন্ত পৃথিবীতে কেহ লিখিতে পারে নাই—পারিবেও না; তুমি সে দুরাশা পরিত্যাগ কর।" বাল্মীকি বলিলেন "খুড়ো অমন আশীর্ব্বাদ করিও না—মনুষ্য যাহা করিয়াছে মনুষ্য তাহা করিতে পারে। হোমর ইলিয়াড লিখিয়াছেন—আমি কি কিছুই লিখিতে পারি না? হোমর ইলিয়াড্ লিখিয়াছিলেন, আমি রামিয়াড্ লিখিব। আমার ইন্‌স্‌পিরেষণ আসিয়াছে, তোমার হার্প্‌টা আমাকে দেও, আমি রামিয়াড্ গান করি।" এই কথা বলিয়া বাল্মীকি হার্প বাদন পূর্ব্বক গর্দ্দভ-বিনিন্দিত সুমধুর স্বরে উনবিংশ-

শতাব্দীয় রামায়ণ গান আরম্ভ করিলেন। বাল্মীকির স্বহস্ত-পালিত আশ্রম-মৃগ কুক্কুর-গণ প্রভু প্রসাদ গো-অস্থি রোমন্থ করিতেছিল—গীত-মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নিকটে আগমন পূর্ব্বক ভেউ ভেউ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। উভয় স্বর মিলিয়া একটি মধুর সঙ্গীত-লহরী গগনতলে সমুত্থিত হইল।

রাম নামে এক জন দোর্দণ্ড-প্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার দেহ মধ্যমাকার, হর্কুলিসের ন্যায় দৃঢ়-গঠন, নাশিকা রোমীয় ছাঁদের, ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ চাপা, ইহাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সূচিত হইতেছে। তাঁহার কুঞ্চিত কুন্তল আব্‌লুষ-কাষ্ঠ-বিনিন্দিত-মসৃণ-ললাটে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বোধ হইতেছে যেন বিশাল ওকগাছে আইবি-লতা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। সেই লোকপূজিত রাম গাম্ভীর্য্যে নেস্টরের ন্যায়, ধৈর্য্যে আল্প গিরির ন্যায়, বীর্য্যে এখিলিসের ন্যায়, সৌন্দর্য্যে ক্যুপিডের ন্যায়, ক্ষমায় যীশু খ্রীষ্টের ন্যায়, ধনে রথচাইল্‌ডের ন্যায়, শাস্ত্রজ্ঞানে মোক্ষমূলারের ন্যায় অসাধারণ ছিলেন। তিনি রাজা দশরথের প্রিন্স অফ্ ওয়েল্‌স্। এক দিন রাম মৃগয়ার্থ মিথিলা-সন্নিহিত কোন অরণ্যে খ্যাঁকশেয়ালী শীকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ অতি পরিপাটী। নীলাভ উৎকৃষ্ট বনাতের কোট্ ও নব্যতম ঢপের চোস্ত পেন্‌ট্‌লুন পরিধান, মস্তকোপরি সোলার হ্যাট্, পদদ্বয়ে শীকারোপযোগী ওয়েলিঙ্‌টন বুট্ আজানু-সমুত্থিত, এবং উইস্কির বোতল ও কাট্‌লেট্-সম্বলিত চর্ম্মঝুলি চর্ম্মোপবীতে আলম্বিত রহিয়াছে। শিঙ্গার নিনাদে, কুক্কুরের চীৎকারে, শিকারীগণের হুর্‌রে রবে, অশ্বের হ্রেষা-ধ্বনিতে কানন-প্রদেশ ধ্বনিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র বর্ষা উদ্যত করিয়া শৃগালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া একেবারে কাননের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন। শৃগাল দৃষ্টিবহির্ভূত হইল। রাম নিরাশ হইয়া একটা বৃক্ষে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলেন এবং পাকেট্ হইতে রুমাল বাহির করিয়া ঘন ঘন মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। সহসা রমণী কণ্ঠ-নিঃসৃত কাতর চীৎকার ধ্বনি তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। রাম এক জন গ্যালাণ্ট্ লোক। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই ধ্বনির অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

কিয়দ্দূর গিয়া দেখিলেন একটি চত্বারিংশৎ বর্ষীয়া বালিকা মূর্চ্ছিতা। রাম অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন—তাঁহার ব্যাগের মধ্যে আঘ্রাণ-লবণ খুঁজিলেন কিন্তু পাইলেন না। পরে উইস্কির বোতলে যে মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ ছিল তাহার এক ডোজ্ বালিকাটির মুখে ঢালিয়া দিলেন—দিবা মাত্রই সমস্ত শরীর নড়িয়া উঠিল—ক্রমে ক্রমে চক্ষু উন্মীলিত হইল, চক্ষু মেলিতেই সম্মুখে রামকে দেখিতে পাইলেন—অমনি "O my!" বলিয়া দুই হাতে পুনর্ব্বার চক্ষু আচ্ছাদন করিলেন। রাম বলিলেন "ভয় নাই—আমি আপনার রক্ষা হেতু আসিয়াছি। কি জন্য আপনি ভয় পাইয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিতে পারি? চত্বারিংশ বর্ষীয়া

বালিকা উত্তর করিলেন "আমি আরণ্যক দৃশ্যের স্কেচ্ তুলিতেছিলাম আর আমার গাউনের আঁচল ঘেঁসিয়া কেমন একটা জন্তু—বোধ হয় শৃগাল—দৌড়িয়া চলিয়া গেল, তাহা দেখিয়া আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়াছি।

রাম।—হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া আছেন কেন?

বালিকা।—আমার ভয় হইতেছে পাছে আবার শৃগালটা আসে—আমাকে যদি কেউ, এই অরণ্য-পথের রক্ষক হইয়া, আমার বাড়ি পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেন, তবে আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই।

রাম।—তার জন্য চিন্তা কি?

এই বলিয়া বালিকাকে উঠাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "আমি কি আপনাকে বাহুদান করিতে পারি?" সীতা বলিলেন "ধন্যবাদ আপনাকে।" রাম হস্ত বাড়াইয়া দিলেন; বালিকা ঈষৎ ব্লষ্ করিয়া তাহা গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন "আপনি যে আমাকে এই মহা বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন তাহার ঋণ আমি কিরূপে পরিশোধ করিব?"

রাম।—আমি যে উপকার করিলাম তাহা অতি সামান্য।

বালিকা। ও-কথা বলিবেন না—আপনার ন্যায় বীর পুরুষ উপস্থিত না থাকিলে নিশ্চয়ই আজ শৃগালের হস্তে প্রাণ হারাইতাম।

রাম।—আমি থাকিতে আপনার কোন ভয় নাই। এক্ষণে পরস্পরের নিকট আর অপরিচিত থাকা কর্ত্তব্য নয়। আমার নাম রাম—আপনার নাম জিজ্ঞাসার স্পর্দ্ধা কি মার্জ্জনা করিবেন?

বালিকা।—আমার নাম মিস্ সীতা জনক।

রাম। ও! আপনি হিজ্ ম্যাজেষ্টী জনকের কন্যা? তিনি খুব এক জন এন্লাইটেণ্ড্ লোক। আমার বলিতে সাহস হইতেছে না—প্রথম দৃষ্টিতেই,আপনাকে আমি ভাল বাসিয়াছি। এ ভক্ত কিঙ্কর কি আপনার পাণি গ্রহণের আশা করিতে পারে?

সীতা।—(সলজ্জ ভাবে) সে পিতা জানেন।

রাম।—তাঁর কাছে কি আমি প্রস্তাব করিতে পারি? তিনি সম্মত হইলে আপনার কোন আপত্তি থাকিবে না?

সীতা ব্লষ্ করিয়া নিরুত্তর হইলেন।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে জনক রাজার প্রাসাদে পৌছিলেন।

রাম জনক রাজার নিকটে গমন পূর্ব্বক আপনার কুলের পরিচয় দিয়া বলিলেন "আপনার কন্যার হস্তের নিমিত্ত আমি উমেদার।" জনক রাজা বলিলেন "অতি উত্তম! কিন্তু আমার একটি বন্দুক-ভঙ্গ পণ আছে, তাহার আমি অন্যথা করিতে পারি না। আমি টাইম্স্-সংবাদ পত্রে দেখিয়াছিলাম যে, কোন পর্য্যটক আফ্রিকা-বাসী গরিল্লা নামক বীর-চূড়ামণিকে বন্দুক মারিতে যাওয়াতে তিনি তাঁহার বন্দুক কাড়িয়া লইয়া এক মোচড়ে দ্বিখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। এইরূপ অসাধারণ বীরত্বের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া আমি

আর নীরব থাকিতে পারিলাম না। আমি দেশ বিদেশে প্রচার করিলাম যে, গরিল্লা-বীরকে আদর্শ মানিয়া, তাঁহার ন্যায় যিনি বন্দুক ভঙ্গ করিতে পারিবেন তাঁহাকে আমি কন্যা-সম্প্রদান করিব।" রাম বলিলেন "আচ্ছা আমি প্রস্তুত আছি।" অমনি একজন তৈয়ার ভৃত্য দ্রুতগতি একটা মার্টিনি-রাই ফেল্ আনিয়া রামের সম্মুখে ধরিয়া দিল। রাম তাহা দুই হস্তে ধরিয়া একটি মোচড়েই কর্ম্ম নিকাশ করিয়া সাতহাত হইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইলেন। জনক রাজা এবং তাঁহার পারিষদ্‌গণের তাক্ লাগিয়া গেল। জনক রাজা আনন্দে পুলকিত হইয়া বলিলেন "তুমি যেরূপ অসামান্য বলবীর্য্য দেখাইলে, কন্যা সম্প্রদানের অগ্রে, তাহার উপযুক্ত একটি উপাধি তোমাকে আমি প্রদান করিতে অভিলাষ করি। অনেকের অনেক প্রকার উপাধি আছে, যথা নর-ব্যাঘ্র, নর-পুঙ্গব, নর-র্ষভ, কিন্তু সে সমস্তই পুরাতন হইয়া গিয়াছে, তুমি আজ হইতে লোকে নর-গরিল্লা নামে খ্যাত হইবে। এক্ষণে মিস্ জনকের সম্মতির কেবল অপেক্ষা, অতএব যাও তাঁহাকে রাজি কর গিয়া। রাম সদ্য সদ্যই কোর্ট্‌সিপ্ সুরু করিলেন। সীতা যদিও চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকা বই নয়, কিন্তু তিনি সকল গুণেই গুণবতী ছিলেন। জনক রাজা একজন এন্‌লাইটেণ্ড্ লোক ছিলেন—তিনি বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক অনেক সভায় বক্তৃতা দিতেন। তিনি আপন কন্যাকে বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন * সীতা তাঁহার যত্নে সর্ব্বগুণে বিভূষিতা হইয়াছিলেন। তিনি কার্পেট-বুনানি কার্য্যে অতিশয় নিপুণা ছিলেন। ফরাশীশ্ ভাষায় নবেল্ পাঠ করিতেন। পল্কা এবং ওয়াল্‌ট্‌স্ নাচিতেন। প্যারিস নগরের নব্যতম ফেসিয়ানের গাউন পরিতেন—সহজে ব্লষ্ করিতে পারিতেন এবং ইচ্ছা করিলেই মূর্চ্ছা যাইতে পারিতেন। এমন রূপ-গুণে বিভূষিতা চত্বারিংশ বর্ষীয়া বালিকাকে দেখিয়া রাম যে মুগ্ধ হইবেন ইহাতে আর বিচিত্র কি। তিনি শীঘ্রই কোর্ট্‌সিপ্ শেষ করিয়া ফেলিলেন, এবং বিবাহের পর এক্ষণে তিনি মনের সুখে মধুচন্দ্র ভোগ করিতেছেন। ইতি সাত ক্যাণ্টো রামিয়াডের হনি-মূন নামকোহয়ং প্রথমঃ ক্যাণ্টো সমাপ্তঃ।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু।

দৈবায়ত্ত কারণে সংসারে যত প্রকার মৃত্যু সংঘটিত হয়, তন্মধ্যে বজ্রাঘাতের ন্যায় ত্বরিত মৃত্যু আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহাতেও কিঞ্চিৎ সময়ের প্রয়োজন হয়। অনেকে মনে করেন যে, শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিবামাত্র বা সূচী বিদ্ধ হইলে তদ্দণ্ডেই আমরা উহা বুঝিতে পারি। বস্তুতঃ তাহা নহে। মস্তিষ্কই আমাদের অনুভব শক্তি বা জ্ঞানের মূলস্থান। কোথাও আঘাত লাগিলে

ঐ সংবাদ যতক্ষণ মস্তিষ্কে না আইসে ততক্ষণ উহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। এজন্য মস্তিষ্কের নিকটস্থ স্থান অপেক্ষা দূরবর্ত্তী স্থানে আঘাত লাগিলে কিঞ্চিৎ বিলম্বে উহা আমরা বুঝিতে পারি। অনন্তর কিরূপ বেগে এই আঘাতের সংবাদ স্নায়ুকর্ত্তৃক জ্ঞানের মূলস্থানে আনীত হয় তাহাও সুবিজ্ঞ হেল্ম্ হল্জ্ সাহেব আপনার বিচিত্র বুদ্ধি-বলে বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা এক রূপ স্থির করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, ঐ সংবাদ এক সেকেণ্ডের মধ্যে ৬৬ হাত (১০০ ফিট) পর্য্যন্ত যাইতে পারে। অর্থাৎ বায়ুমধ্যে শব্দ যেরূপ বেগে চালিত হয়, আঘাত সংবাদের গতি তদপেক্ষা অনেক কম। এমন কি, উহার দশমাংশের একাংশও নহে। এতন্নিবন্ধন দৈর্ঘ্যে ৩৩ হাত (৫০ ফিট) প্রমাণ একটি তিমি মৎস্যের পুচ্ছদেশে আঘাত করিলে, অর্দ্ধ সেকেণ্ড পরে সে উহা বুঝিতে পারে। কিন্তু এক স্থান হইতে অন্য স্থানে আঘাতের সংবাদ বহনের জন্যই যে কেবল কাল বিলম্ব হয় এরূপও নহে। কাল বিলম্বের আরও কারণ আছে। শারীর বিধানবিৎ পণ্ডিত মাত্রেই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন যে অনুভব-ক্রিয়ার সময় মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুগুলি স্পন্দিত ও পুনরায় যথানিয়মে সংরক্ষিত হয়। ফলতঃ মস্তিষ্কের এরূপ অবস্থা প্রত্যেক চিন্তা বা অনুভূতির আনুসঙ্গিক বলিলেও বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ যখনই আমরা কোন বিষয় চিন্তা বা অনুভব করি, তখনই আমাদিগের মস্তিষ্কের পরমাণু-মধ্যে কোন না কোন প্রকার পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং এইরূপ পরিবর্ত্তন যে, কাল-সাপেক্ষ ইহা সকলে স্বীকার করিয়া থাকেন। সুতরাং আঘাতের সংবাদ-বহনোপযোগী কাল ব্যতীত, অনুভূতির জন্য মস্তিষ্কে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, তাহাতেও সময় আবশ্যক। কিন্তু সেও এক সেকেণ্ডের দশমাংশের অধিক নহে। অতঃপর ইহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তিমি মৎস্যের পুচ্ছে আঘাত লাগিবার পর ঐ সংবাদ মস্তিষ্কে যাইতে অর্দ্ধ সেকেণ্ড লাগে, এবং তথায় উহা অনুভূত হইতে এক সেকেণ্ডের দশমাংশ কাল অতিবাহিত হয়। আবার যদি আঘাত-প্রতীকারের জন্য মস্তিষ্ক হইতে পুচ্ছদেশে অন্য কোন সংবাদ আসিতে আর অর্দ্ধ সেকেণ্ড লাগে, তাহা হইলে ঐ মৎস্যের আঘাত বুঝিতে ও তৎপ্রতীকারার্থ পুচ্ছদেশ নাড়িতে সমুদায়ে এক সেকেণ্ড ও উহার দশমাংশের একাংশ সময় লাগিবার সম্ভাবনা। ইহাও অনেকে দেখিয়াছেন যে, আঘাত গুরুতর হইলে পূর্ব্বোক্ত সংবাদবাহক স্নায়ুগুলি কখন কখন অসাড় হইয়া পড়ে। সুতরাং তদ্দ্বারা সংবাদ-বহনকার্য্য আর সাধিত হয় না। প্রত্যুত আঘাত গুরুতর হইলে উহা মস্তিষ্কে না যাওয়াতে উহার বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারি না। অথবা জ্ঞানের মূলস্থানে, আঘাত উপলব্ধির প্রাক্কালীন কোন প্রকার পরিবর্ত্তন সংঘটন হইতে না হইতেই আমাদের মস্তিষ্কের কার্য্য এককালে বন্ধ হইয়া যায়। এমন কি, ঐরূপ আঘাতে

কাহার মৃত্যু ঘটিলেও তজ্জন্য আমাদিগকে কোন প্রকারে বেদনানুভব করিতে হয় না। বস্তুতঃ তৎকালে জীবনের পরিবর্ত্তে সহসা মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আমরা অচেতন অবস্থাতেই এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হই।

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সংসারে এরূপ ত্বরিত মৃত্যু অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। বন্দুকের গুলি মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া চলিয়া গেলে সহসা আমাদিগের ঐ দশা ঘটিয়া থাকে। এই প্রকারে মৃত্যু ঘটিলে মনুষ্যের মুখে কিছুমাত্র যন্ত্রণার চিহ্ন থাকে না। প্রত্যুত মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহার মুখ যেরূপ সৌম্য-ভাব-বিশিষ্ট ছিল তখনও উহাতে সেই ভাব লক্ষিত হয়। এতদ্দ্বারা পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ হেল্‌ম্‌হলজের ত্বরিত মৃত্যুতে বেদনার অভাব বিষয়ক অনুমান আরও সপ্রমাণ হইতেছে। এমনও শুনা গিয়াছে যে, যে ব্যক্তি কোন প্রকার আঘাত পাইয়া সহসা অচেতন হয় ও মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, সে সংজ্ঞা লাভ করিলে এই কথা বলিয়া থাকে যে, হতচেতন হইবার পূর্ব্বে তাহার কোন প্রকার বেদনানুভব হয় নাই। গুরুতর আঘাতজনিত, স্নায়ু বা মস্তিষ্কের অসাড়তাই ইহার মূল কারণ। প্রকৃতি এ সম্বন্ধে আমাদের উপর কতদূর অনুকূল তাহা বলা যায় না। মনুষ্যের মস্তক ভেদ করিয়া একটি বন্দুকের গুলি বাহির হইতে সচরাচর প্রায় এক সেকেণ্ডের সহস্রাংশের একাংশ মাত্র সময় লাগিয়া থাকে। সুতরাং এই অত্যল্প সময় মধ্যে কার্য্য সমাধা হওয়াতে, আমরা তৎকালে কোন প্রকার বেদনানুভব করিতে পারি না। এ জন্য তাদৃশ মৃত্যুতে আমাদের কিছুমাত্র যন্ত্রণানুভব হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার আছে যাহার বেগ বন্দুকের গুলি অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক। মেঘমালা বিদীর্ণ করিয়া তাড়িতালোক আকাশ-পথে যেরূপ ভয়ানক বেগে বিচরণ করে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু ঐ আলোক আমাদের চক্ষে পড়িয়া পুনরায় অদৃশ্য হইতে যে সময় লাগে তাহা অনেকেই জানেন না। পাঠকগণ শুনিলে আশ্চর্য্য হইবেন যে উহা এক সেকেণ্ডের লক্ষাংশেরও কম। ফলতঃ বিদ্যুতের গতি এতই প্রবল যে, পৃথিবী হইতে চন্দ্রলোক যদিও অনেক দূরবর্ত্তী, তথাপি বিদ্যুৎ-পদার্থ এক সেকেণ্ডের মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে পারে। ইহাও অনেকে অবগত আছেন যে, চক্ষের উপর একটি আলোক পড়িবামাত্র উহা তদভ্যন্তরে এরূপ প্রতিভাত হয়, যে ঐ আলোক অন্তর্হিত হইলেও উহা আমরা এক সেকেণ্ডের ষষ্ঠাংশ কাল পর্য্যন্ত মনশ্চক্ষে দেখিতে পাই। এই জন্যই একখানি প্রজ্বলিত অঙ্গার এক দিক হইতে আর এক দিকে সবেগে চালনা করিলে দর্শকের চক্ষে উহা ক্ষণকালের জন্য একটি আলোকময় ফিতার মত দেখায়।

অতঃপর ইহা কাহার না মনে হইবে যে, বন্দুকের গুলি লাগিলে যদি মনুষ্য মুহূর্ত্তের মধ্যেও অক্লেশে মরিতে পারে, তাহা হইলে বজ্রাঘাতে ইহা অপেক্ষা আরও কম সময়ের মধ্যে ও অজ্ঞাত ভাবে আমা-

দের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। পৃথিবীতে এ সম্বন্ধে প্রমাণেরও অসম্ভাব নাই। কারণ অনেক বজ্রাহত ব্যক্তি বজ্রাঘাতের পর চৈতন্য লাভ করিয়া এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন যে, বজ্রাঘাতের সময় শরীরে কিছুমাত্র ক্লেশানুভব হয় না। প্রাচীন হেমার সাহেবের গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যে একটি প্রস্তাব লিখিত আছে তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

কোন সময়ে এক জন সৈনিক পুরুষ দুর্গের কিয়দ্দূরে পাদচারণা করিতেছিলেন। এমন সময় সহসা বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইলে তিনি নিকটস্থ একটি বৃক্ষের তলে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন যে তাহার পূর্ব্বে তথায় একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে। অনন্তর বৃক্ষের আশ্রয়ে থাকিলে বৃষ্টি নিবারণ হইবে কিনা জানিবার জন্য তিনি উৰ্দ্ধমুখে উহার শাখা প্রশাখার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার উপর বজ্রাঘাত হওয়াতে তিনি সহসা ভূতলে পড়িয়া গেলেন। স্ত্রীলোকটির পদমূলে সামান্য আঘাত মাত্র লাগিল, সুতরাং তজ্জন্য উহার কিছুমাত্র চৈতন্যের হানি হয় নাই। কয়েক ঘণ্টা পরে সৈনিকের চেতনা লাভ হইলে তিনি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল এই মাত্র মনে হইতে লাগিল যে, তিনি ইতিপূর্ব্বে উৰ্দ্ধমুখে বৃক্ষশাখা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, ইহাই তাঁহার চেতনার শেষ কার্য্য। তাহার পর কি হইল, তাহা তাঁহার স্মরণ হয় না। বস্তুতঃ তিনি ঐ সময়ে বজ্রাঘাত-জন্য হঠাৎ অচেতন হইয়া পড়েন। অথচ ঐ সময় কিছুমাত্র যন্ত্রণানুভব হয় নাই।

কয়েক বৎসর অতীত হইল ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ পদার্থবিৎ পণ্ডিত টিণ্ডাল সাহেব কতকগুলি বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র একত্র করত, তৎপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া, সভামধ্যে বিদ্যুৎ বিষয়ক ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। অনবধানতা বশতঃ হঠাৎ তাঁহার হস্ত ঐ যন্ত্রোত্থিত তারের উপর সংস্পৃষ্ট হওয়াতে উহার সমুদায় তেজ তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইল। তিনিও অমনি হতচেতন হইয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক সেকেণ্ডের পর তাঁহার চেতনা হইলে দেখিলেন যে, তিনি সেই সকল সমুৎসুক শ্রোতৃবর্গ ও বিদ্যুৎজনন যন্ত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, অথচ কথা কহিতে পারিতেছেন না। শরীরের এই রূপ অবস্থা ও চতুর্দ্দিকস্থ দৃশ্য দেখিয়া তিনি এই স্থির করিলেন যে, কোন কারণে ঐ সকল যন্ত্রের তেজ তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই রূপ ভাবিতেছেন এমন সময় তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল এবং শ্রোতৃগণের ভয় ও বিস্ময় দূর করিবার জন্য বলিলেন যে, অনেক দিন হইতে আমি আশা করিয়াছিলাম, বিদ্যুতের সমবেত তেজ গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ শরীরে পরীক্ষা করিয়া দেখিব। আজ আমার সেই আশা পূর্ণ হইল। এই সময় তাঁহার সম্পূর্ণ চৈতন্যোদয় হইলেও, তিনি আপন শরীর বিকৃত চক্ষে দেখিতেছিলেন। এমন কি তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার

দেহ খানি নানা খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে। অধিকন্তু হস্ত ও পদ যেন শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্যে লম্বিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ স্মরণ ও বিচার শক্তি পুনরায় আবির্ভূত হইবার অনেক পরে তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইস্থলে টিণ্ডালের এই দৈবায়ত্ত ঘটনা উল্লেখ করিবার বিশেষ কারণ এই যে, এইরূপ গুরুতর বিদ্যুতাঘাত পাইয়াও তিনি কিছুমাত্র যন্ত্রণা অনুভব করেন নাই। অথচ তৎকালে তাঁহাকে ঐ জন্য এক কালে জ্ঞানশূন্য হইতে হয়। এতদ্দ্বারা বজ্রাঘাত-জনিত মৃত্যু যে যন্ত্রণাশূন্য তাহা আরও প্রতিপন্ন হইতেছে। বস্তুতঃ জীবমাত্রই এতদ্দ্বারা আহত হইবা মাত্র সহসা হতচেতন হইয়া পড়ে ও তদবস্থায় প্রাণত্যাগ করে। সুতরাং দৈব মৃত্যুর মধ্যে ইহা অপেক্ষা যন্ত্রণাশূন্য বা সুখের মৃত্যু আর কিছুই নাই।

বজ্রাঘাত নিবন্ধন শরীরে অতি যৎসামান্য বাহ্য চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। কাহারও কেশ গুলি পুড়িয়া যায়। কাহারও অঙ্গে একটি সামান্য ক্ষত চিহ্ন মাত্র দৃষ্ট হয়। এবং কাহারও বা ত্বকের উপর একটি লাল বর্ণের রেখা দেখা যায়।

অধুনা ইংলণ্ডে, প্রাণদণ্ডের নৃশংসতা সম্বন্ধে যেরূপ তর্কের ঢেউ উঠিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় হত্যাকারীর উপর এইরূপ দণ্ডবিধান ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডেশ্বরীর অপরাপর রাজ্য হইতে এক কালে উঠিয়া যাইবে। যদি তাহাও না যায় তথাপি উহার পরিবর্ত্তে এরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে যাহাতে তাদৃশ গুরুতর অপরাধী ব্যক্তিকে আর কখনই ফাঁশিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইবে না। ইহা যত শীঘ্র এদেশ হইতে উঠিয়া যায় ততই ভাল। প্রত্যুত যদি শাসনকর্ত্তারা দুষ্ট লোককে ভয় দেখাইবার জন্য এখন প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা রাজ্যমধ্যে প্রচলিত রাখিতে চাহেন, তাহা হইলে যাহাতে ঐ সকল লোক অক্লেশে মরিতে পারে তাহার উপায় বিধান করা উচিত। পূর্ব্বোক্ত তাড়িতাবহ যন্ত্র ইহার প্রধান উপায়। এতদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে অপরাধী ব্যক্তি অম্লান মুখে সংসার হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিতে পারে। এক জন অপরকে নৃশংসের ন্যায় খুন করিয়াছে বলিয়া, তৎপ্রতিশোধার্থ প্রথম ব্যক্তির উপর নৃশংসাচরণ করা কখনই মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে। অতএব প্রাণদণ্ডের ঐরূপ সহজ ও যন্ত্রণাশূন্য উপায় থাকিতে, অপরাধীকে ফাঁসিকাষ্ঠে তুলিয়া অত দীর্ঘকাল কষ্ট দেওয়া আমাদের কোন ক্রমে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। পরিশেষে এদেশীয় শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপরাধী ব্যক্তির মৃত্যুকালীন যন্ত্রণাভার লাঘব করেন। ইহাতে দণ্ডবিধি ও ধর্ম্মশাস্ত্র উভয়েরই উদ্দেশ্য সমভাবে সিদ্ধ হইতে পারে। যঃ—

ভিখারিণী।

মোহন লালের সহিত কমলের বিবাহের প্রস্তাব হয়, কিন্তু তাহা সম্পন্ন না হওয়াতে মোহন মনে মনে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া আছে। কমলের সমুদয় বৃত্তান্ত মোহনলাল প্রাতেই শুনিতে পাইয়াছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ কুল-পুরোহিতকে ডাকাইয়া শীঘ্র বিবাহের উত্তম দিন আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন।

গ্রামের মধ্যে মোহনের ন্যায় ধনী আর কেহ ছিল না; আকুল বিধবা অবশেষে তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মোহন উপহাসের স্বরে হাসিয়া কহিলেন "একি অপূর্ব্ব ব্যাপার! এত দিনের পর দরিদ্রের কুটীরে যে পদার্পণ হইল?"

বিধবা।—"উপহাস করিও না, আমি দরিদ্র, তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিয়াছি।"

মোহন।—"কি হইয়াছে?" বিধবা আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। মোহন জিজ্ঞাসা করিলেন "তা আমাকে কি করিতে হইবে?„

বিধবা—"কমলের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে।"

মোহন—"কেন, অমর সিংহ এখানে নাই?" বিধবা উপহাস বুঝিতে পারিলেন, কহিলেন, "মোহন, যদি বাসস্থান অভাবে আমাকে বনে বনে ভ্রমণ করিতে হইত, অনাহারে ক্ষুধার জ্বালায় যদি পাগল হইয়া মরিতাম, তথাপি তোমার কাছে একটি তৃণও প্রার্থনা করিতাম না। কিন্তু আজ যদি বিধবার একমাত্র ভিক্ষা পূর্ণ না কর, তবে তোমার নিষ্ঠুরতা চিরকাল মনে থাকিবে।"

মোহন—"আইস, তবে তোমাকে একটী কথা বলি! কমল দেখিতে কিছু মন্দ নহে, আর তাহাকে যে আমার পছন্দ হয় নাই এমনও নহে, তবে তাহার সহিত আমার বিবাহের আর ত কোন আপত্তি দেখিতেছি না। তোমার কাছে ঢাকিয়া কি করিব, বিনা কারণে ভিক্ষা দিবার মত আমার অবস্থা নহে।

বিধবা—"অগ্রেই যে অমরের সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" মোহন কিছু উত্তর না দিয়া হিসাবের খাতা খুলিয়া লিখিতে বসিলেন, যেন কেহই ঘরে নাই, যেন কাহারো সহিত কিছু কথা হয় নাই। এদিকে সময় বহিয়া যায়, দস্যু আছে কি গিয়াছে তাহার ঠিক্ নাই। বিধবা কাঁদিয়া কহিলেন "মোহন, আর আমাকে যন্ত্রণা দিও না, সময় অতীত হইতেছে।"

মোহন—"রোস, কাজ সারিয়া ফেলি।" অবশেষে যদি বিধবা, বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত না হইতেন, তাহা হইলে সমস্ত দিনে কাজ সারা হইত কিনা সন্দেহ স্থল। বিধবা মোহন লালের নিকট অর্থ লইয়া দস্যুকে দিলেন, সে চলিয়া গেল। সেই দিনই ভয়ে আশঙ্কায় ত্রস্তা হরিণীটির ন্যায় বিহ্বলা বালিকা মাতার ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল, এবং তাঁহার

বাহুপাশে মুখ খানি প্রচ্ছন্ন করিয়া অনেক ক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত করিল। কিন্তু অভাগিনী বালিকা এক দস্যুর হস্ত হইতে আর এক দস্যুর হস্তে পড়িল।

কত বৎসর গত হইয়া গেল, যুদ্ধের অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে। সৈনিকেরা দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে, ও অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া এক্ষনে ভুমি কর্ষণ করিতেছে। বিধবা সংবাদ পাইলেন যে, অজিত-সিংহ হত ও অমর কারাবদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু কন্যাকে ঐসংবাদ শুনান নাই।

মোহনের সহিত বালিকার বিবাহ হইয়া গেল। মোহনের ক্রোধ কিছুমাত্র নিবৃত্ত হইল না। তাহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি বিবাহ করিয়াই তৃপ্ত হয় নাই। সে নির্দ্দোষী অবলা বালার প্রতি অনর্থক পীড়ন করিত ; কমল মাতৃক্রোড়ের স্নিগ্ধ-স্নেহ-ছায়া হইতে এই নিষ্ঠুর কারাগৃহে আসিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, অভাগিনী কাঁদিতেও পায় না। বিন্দু মাত্র অশ্রু নেত্রে দেখা দিলে মোহনের ভর্ৎসনার ভয়ে ত্রস্ত হইয়া মুছিয়া ফেলিত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শৈল-শিখরের নিষ্কলঙ্ক তুষার-দর্পণের উপর উষার রক্তিম মেঘমালা স্তরে স্তরে সজ্জিত হইল। ঘুমন্ত বিধবা দ্বারে আঘাত শুনিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া দেখিলেন,সৈনিক বেশে অমর সিংহ দাঁড়াইয়া আছেন। বিধবা কিছুই বলিতে পারিলেন না, দাঁড়াইয়া রহিলেন। অমর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল, কমল কোথায়?" শুনিলেন স্বামীর আলয়ে। মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তিনি কত কি আশা করিয়াছিলেন, ভাবিয়াছিলেন কত দিনের পর দেশে ফিরিয়া যাইতেছেন; যুদ্ধের উন্মত্ত ঝটিকা হইতে প্রণয়ের শান্তিময় স্নিগ্ধনীড়ে ঘুমাইতে যাইতেছেন ; তিনি যখন অতর্কিত ভাবে দ্বারে গিয়া দাঁড়াইবেন, তখন হর্ষবিহ্বলা কমল ছুটিয়া গিয়া তাঁহার বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িবে। বাল্যকালের সুখময় স্থান সেই শৈল-শিখরের উপর বসিয়া কমলকে যুদ্ধ-গৌরবের কথা শুনাইবেন, অবশেষে কমলের সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া প্রণয়ের কুসুম-কুঞ্জে সমস্ত জীবন সুখের স্বপ্নে কাটাইবেন। এমন সুখের কল্পনায় যে কঠোর বজ্র পড়িল তাহাতে তিনি দারুণ অভিভূত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু মনে তাঁহার যতই তোলপাড় হইয়াছিল, প্রশান্ত মুখশ্রীতে একটি মাত্র রেখাও পড়ে নাই।

মোহন কমলকে তাহার মাতৃ-আলয়ে রাখিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে কমল-পুষ্পকলিকাটি ফুটিয়া উঠিল। ইহার মধ্যে কমল এক দিন বকুল বনে মালা গাঁথিতে গিয়াছিল, কিন্তু পারে নাই, দূর হইতেই শূন্য মনে ফিরিয়া আসিয়াছিল। আর এক দিন সে বাল্যকালের খেলেনা গুলি বাহির করিয়াছিল, আর খেলিতে পারিল না, নিরাশার নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে গুলি তুলিয়া রাখিল ; অবলা ভাবিয়াছিল যে, যদি অমর ফিরিয়া আসে

তবে আবার দুই জনে মালা গাঁথিবে, আবার দুই জনে খেলা করিবে। কত কাল তাহার বাল্য-সখা অমরকে দেখিতে পায় নাই, মর্ম্মপীড়িতা কমল এক এক বার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিত। এক এক দিন রাত্রিকালে গৃহে কমলকে কেহ দেখিতে পাইত না, কমল কোথায় হারাইয়া গিয়াছে, খুঁজিয়া খুঁজিয়া অবশেষে তাহার বাল্যের ক্রীড়া-স্থল সেই শৈল-শিখরের উপর গিয়া দেখিত, ম্লানবদনা বালিকা অসংখ্য তারা-খচিত অনন্ত আকাশের পানে নেত্র পাতিয়া আলুলিত কেশে শুইয়া আছে।

কমল মাতার জন্য, অমরের জন্য কাঁদিত বলিয়া মোহন বড়ই রুষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাকে মাতৃ-আলয়ে পাঠাইয়া ভাবিয়াছিল যে, দিন কতক অর্থাভাবে কষ্ট পাক্,তাহার পরে দেখিব কে কাহার জন্য কাঁদিতে পারে।

মাতৃভবনে কমল লুকাইয়া কাঁদে। নিশীথ-বায়ুতে তাহার কত বিষাদের নিশ্বাস মিশাইয়া গিয়াছে, বিজন-শয্যায় সে যে কত অশ্রুবারি মিশাইয়াছে, তাহা তাহার মাতা এক দিনও জানিতে পারেন নাই। এক দিন কমল হঠাৎ শুনিল তাহার অমর দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার কত দিনকার কত কি ভাব উথলিয়া উঠিল। অমরসিংহের বাল্যকালের মুখ খানি মনে পড়িল। দারুণ যন্ত্রণায় কমল কতক্ষণ কাঁদিল। অবশেষে অমরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বাহির হইল।

সেই শৈল শিখরের উপরে, সেই বকুল তরুচ্ছায়ায় মর্ম্মাহত অমর বসিয়া আছেন। এক একটি করিয়া ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়িতে লাগিল। কত জ্যোৎস্না রাত্রি, কত অন্ধকার সন্ধ্যা, কত বিমল উষা অস্ফুট স্বপ্নের মত তাঁহার মনে একে একে জাগিতে লাগিল। সেই বাল্যকালের সহিত তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের অন্ধকারময় মরুভূমির তুলনা করিয়া দেখিলেন, সঙ্গী নাই, সহায় নাই, আশ্রয় নাই, কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিবে না,কেহ তাঁহার মর্ম্মের দুঃখ শুনিয়া মমতা প্রকাশ করিবে না,অনন্ত আকাশে কক্ষচ্ছিন্ন জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায়,তরঙ্গাকুল অসীম সমুদ্রের মধ্যে ঝটিকা-তাড়িত একটি ভগ্ন ক্ষুদ্র তরণীর ন্যায়,একাকী নীরব সংসারে উদাস হইয়া বেড়াইবেন।

ক্রমে দূর গ্রামের কোলাহলের অস্ফুট ধ্বনি থামিয়া গেল, নিশীথের বায়ু আঁধার বকুল-কুঞ্জের পত্র মর্ম্মরিত করিয়া বিষাদের গম্ভীর গান গাহিল। অমর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে, শৈলের সমুচ্চ শিখরে একাকী বসিয়া দূর-নির্ঝরের মৃদু বিষন্ন ধ্বনি, নিরাশ হৃদয়ের দীর্ঘ নিশ্বাসের ন্যায় সমীরণের হু—হু শব্দ, এবং নিশীথের মর্ম্মভেদী একতানবাহী যে একটি গম্ভীর ধ্বনি আছে তাহাই শুনিতেছিলেন। তিনি দেখিতেছিলেন, অন্ধকারের সমুদ্র-তলে সমস্ত জগৎ ডুবিয়া গিয়াছে, দূরস্থ শ্মশান-ক্ষেত্রে দুই একটি চিতানল জ্বলিতেছে, দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত নীরন্ধ্র স্তম্ভিত মেঘে আকাশ অন্ধকার। সহসা শুনিলেন উচ্ছ্বসিত স্বরে কে কহিল "ভাই অমর"—এই অমৃতময়, স্নেহময়, স্বপ্নময় স্বর শুনিয়া তাঁহার স্মৃতির সমুদ্র আলোড়িত হইয়া উঠিল। ফিরিয়া

দেখিলেন কমল। মুহূর্ত্তের মধ্যে নিকটে আসিয়া বাহুপাশে তাঁহার গলদেশ বেস্টন করিয়া স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া কহিল "ভাই অমর"—অচল-হৃদয় অমরও অন্ধকারে অশ্রু-বিন্দু বিসর্জ্জন করিলেন, আবার সহসা চকিতের ন্যায় দূরে সরিয়া গেলেন। কমল অমরকে কত কি কথা বলিল, অমর কমলকে দুই একটি উত্তর দিলেন। সরলা আসিবার সময়ে যেরূপ উৎফুল্ল-হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে আসিয়াছিল, যাইবার সময় সেই-রূপ ম্রিয়মাণ হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল। কমল ভাবিয়াছিল, সেই ছেলেবেলাকার অমর ফিরিয়া আসিয়াছে, আর আমি সেই ছেলেবেলাকার কমল, কাল হইতে আবার খেলা করিতে আরম্ভ করিব। যদিও অমর মর্ম্মের গভীর তলে সাংঘাতিক আহত হইয়াছিলেন, তথাপি তিনি কমলের উপর কিছুই ক্রুদ্ধ হন নাই বা অভিমান করেন নাই। তাঁহার জন্য বিবাহিতা বালিকার কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা না পড়ে এই নিমিত্ত তিনি তাহার পর দিন কোথায় যে চলিয়া গেলেন তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

বালিকার সুকুমার হৃদয়ে দারুণ বজ্র পড়িল; অভিমানিনী কতদিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, এতদিনের পর সে বাল্য-সখা অমরের কাছে ছুটিয়া গেল, অমর কেন তাহাকে উপেক্ষা করিল? কিছুই ভাবিয়া পায় নাই। একদিন তাহার মাতাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মাতা তাহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, কিছুকাল রাজ-সভার আড়ম্বর-রাশির মধ্যে থাকিয়া সেনাপতি অমরসিংহ পর্ণ-কুটীর-বাসিনী ভিখারিণী ক্ষুদ্র বালিকাটিকে ভুলিয়া যাইবেন তাহাতে অসম্ভব কি আছে? এই কথায় দরিদ্র বালিকার অন্তরতম দেশে শেল বিঁধিয়াছিল। অমরসিংহ তাহার প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিল মনে করিয়া কমল কষ্ট পায় নাই। হতভাগিনী ভাবিত, আমি দরিদ্র, আমার কিছুই নাই, আমার কেহই নাই, আমি বুদ্ধিহীনা ক্ষুদ্র বালিকা, তাঁহার চরণ-রেণুরও যোগ্য নহি, তবে তাঁহাকে ভাই বলিব কোন্ অধিকারে, তাঁহাকে ভাল বাসিব কোন্ অধিকারে, আমি দরিদ্র কমল, আমি কে যে তাঁহার স্নেহ প্রার্থনা করিব? সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া কাটিয়া যায়, প্রভাত হইলেই সেই শৈল-শিখরে উঠিয়া ম্রিয়মাণ বালিকা কত কি ভাবিতে থাকে, তাহার মর্ম্মের নিভৃত তলে যে বাণ বিদ্ধ হইয়াছিল তাহা যদিও সে মর্ম্মেই লুকাইয়া রাখিয়াছিল, পৃথিবীর কাহাকেও দেখায় নাই, তথাপি ঐ মর্ম্মে লুক্কায়িত বাণ ধীরে ধীরে তাহার হৃদয়ের শোণিত ক্ষয় করিতে লাগিল। বালিকা আর কাহারো সহিত কথা কহিত না, মৌন হইয়া সমস্ত দিন সমস্ত রাত্রি ভাবিত, কাহারো সহিত মিশিত না, হাসিত না, কাঁদিত না; এক এক দিন সন্ধ্যা হইলেও দেখা যাইত, পথ-প্রান্তের বৃক্ষতলে মলিন ছিন্ন অঞ্চলে মুখ ঝাঁপিয়া দীন-হীন কমল বসিয়া আছে। বালিকা ক্রমে দুর্ব্বল ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল, আর উঠিতে পারে না; বাতায়নে একাকিনী বসিয়া থাকিত,

দেখিত, দূর শৈল-শিখরের উপর বকুল-পত্র বায়ুভরে কাঁপিতেছে। দেখিত, রাখালেরা সন্ধ্যার সময় উদাস-ভাবোদ্দীপক স্বরে মৃদু মৃদু গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছে।

বিধবা অনেক চেষ্টা করিয়াও বালিকার কষ্টের কারণ বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহার রোগের প্রতিকার করিতেও পারেন নাই। কমল নিজেই বুঝিতে পারিত যে, সে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহার আর কোন বাসনা ছিল না, কেবল দেবতার কাছে প্রার্থনা করিত যে, মরিবার সময় যেন অমরকে দেখিতে পাই।

কমলের পীড়া গুরুতর হইল। মূর্চ্ছার পর মূর্চ্ছা হইতে লাগিল, শিয়রে বিধবা নীরব, কমলের গ্রাম্য-সঙ্গিনী বালিকারা চারি ধার ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দরিদ্র বিধবার অর্থ নাই যে, চিকিৎসার বায়ভার বহন করিতে পারেন। মোহন দেশে নাই, এবং দেশে থাকিলেও তাহার নিকট হইতে কিছু আশা করিতে পারিতেন না। তিনি দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া কমলের পথ্যাদি যোগাইতেন। চিকিৎসকদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা চাহিতেন যে, তাহারা কমলকে এক বার দেখিতে আসুক। অনেক মিনতিতে চিকিৎসক কমলকে আজ রাত্রে দেখিতে আসিবে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

অন্ধকার রাত্রের তারাগুলি ঘোর নিবিড় মেঘে ডুবিয়া গিয়াছে, বজ্রের ঘোরতর গর্জ্জন শৈলের প্রত্যেক গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে, এবং অবিরল বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চকিতচ্ছটা শৈলের প্রত্যেক শৃঙ্গে শৃঙ্গে আঘাত করিতেছে, মুষল-ধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, প্রচণ্ড বেগে ঝটিকা বহিতেছে, শৈল-বাসীরা অনেক দিন এরূপ ঝড় দেখেন নাই। দরিদ্র বিধবার ক্ষুদ্র কুটীর টলমল করিতেছে, জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া বৃষ্টিধারা গৃহে প্রবাহিত হইতেছে, এবং গৃহপার্শ্বে নিষ্প্রভ প্রদীপশিখা ইতস্ততঃ কাঁপিতেছে। বিধবা এই ঝড়ে চিকিৎসকের আসিবার আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন। হতভাগিনী নিরাশ-হৃদয়ে নিরাশা-ব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টিতে কমলের মুখের পানে চাহিয়া আছেন ও প্রত্যেক শব্দে চিকিৎসকের আশায় চকিত হইয়া দ্বারের দিকে চাহিতেছেন। একবার কমলের মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল, মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া মাতার মুখের দিকে চাহিল, অনেক দিনের পর কমলের চক্ষে জল দেখা দিল, বিধবা কাঁদিতে লাগিলেন, বালিকারা কাঁদিয়া উঠিল। সহসা অশ্বের পদধ্বনি শুনাগেল, বিধবা শশব্যস্তে উঠিয়া কহিলেন চিকিৎসক আসিয়াছেন। দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে চিকিৎসক গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার আপাদ মস্তক বসনে আবৃত, বৃষ্টি-ধারায় সিক্ত বসন হইতে বারি-বিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে। চিকিৎসক বালিকার তৃণ-শয্যার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। অবশ বিষাদময় নেত্র চিকিৎসকের মুখের পানে তুলিয়া কমল দেখিল সে চিকিৎসক নয়, সে সেই সৌম্য গম্ভীর-মূর্ত্তি অমর সিংহ! বিহ্বলা বালিকা

প্রেমপূর্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিশাল নেত্র ভরিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল এবং প্রশান্ত হাস্যে কমলের বিবর্ণ মুখশ্রী উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু এই রুগ্ন শরীরে অত আহ্লাদ সহিল না। ধীরে ধীরে অশ্রুসিক্ত নেত্র নিমীলিত হইয়া গেল, ধীরে ধীরে বক্ষের কম্পন থামিয়া গেল, ধীরে ধীরে প্রদীপ নিভিয়া গেল। শোক-বিহ্বলা সঙ্গিনীরা বসনের উপর ফুল ছড়াইয়া দিল। অশ্রুহীন নেত্রে, দীর্ঘশ্বাস-শূন্য-বক্ষে, অন্ধকারময় হৃদয়ে, অমরসিংহ ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন। শোক-বিহ্বলা বিধবা সেই দিন অবধি পাগলিনী হইয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেন এবং সন্ধ্যা হইলে প্রত্যহ সেই ভগ্নাবশিষ্ট কুটীরে একাকিনী বসিয়া কাঁদিতেন।

কড়ুয়া কণবী।

গুজরাটে কৃষিদলের সাধারণ নাম কণবী। কণবীগণ প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—লেওয়া কণবী ও কড়ুয়া কণবী। কড়ুয়া ও লেওয়া কণবী একত্রে পান ভোজন করিতে পারে, কিন্তু উহাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান নাই।

কড়ুয়া কণবীদের মধ্যে দ্বাদশ বৎসর অন্তর বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়। এই দ্বাদশ বৎসরের নিয়ম সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এক দিন হরপার্ব্বতী বনের মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে এক স্থানে আসিয়া বিশ্রাম করিলেন। মহাদেব উমাকে কহিলেন, প্রিয়ে, তুমি এই স্থানে কিছুকাল অবস্থিতি কর, আমি বিরলে তপস্যা করিতে চলিলাম, দ্বাদশ বৎসর পরে আসিব। এই বলিয়া মহাদেব প্রস্থান করিলেন। বিরহবিধুরা উমা কথঞ্চিৎ কাল হরণ করিবার জন্য মৃত্তিকার পুত্তলী গড়াইয়া ক্রীড়া করিতেন। বার বৎসর পরে মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উমার অনুরোধে সেই সকল পুত্তলীকে জীবন দান করত সচেতন করিলেন। তাহা হইতেই কণবী জাতির উৎপত্তি হইল। এই হেতু কণবী-জাতি উমার বিশেষ ভক্ত।—যে স্থানে মহাদেব বার বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন তাহা গাইকবাড় পরগণার উমা নামক গ্রাম বলিয়া নির্দ্দিস্ট হয়। সেখানে একটি দুর্গা-মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই দেবীর আদেশক্রমে কড়ুয়া কণবীর মধ্যে বিবাহ লগ্ন স্থিরীকৃত হয়। প্রতি দশ কিম্বা বার বৎসর অন্তর সিংহরাশির সহিত বৃহস্পতির সমাগম হইলে তাহাদের বিবাহের সময় উপস্থিত হয়। উমা সম্মতি দান করিলে পূজারীগণ বিবাহের লগ্ন প্রকাশ করে ও তাহা গ্রামে গ্রামে সমস্ত কণবী জাতির মধ্যে দূত কর্ত্তৃক ঘোষিত হইয়া থাকে।

এই বিবাহের দিবস উপস্থিত হইলে কণবী জাতির মধ্যে যত অবিবাহিতা কন্যা থাকে তাহাদের উদ্বাহ-ক্রিয়া সেই এক দিবসেই সম্পন্ন হয়। মাসেকের দুগ্ধপোষ্য হইতে যোগ্য-বয়স্কা কন্যা পর্য্যন্ত সকলেই এক একটি বরের সহিত পরিণয়-সূত্রে বদ্ধ

হয়। এই অবসর চলিয়া গেলে আবার বার বৎসর কাল অপেক্ষা করিতে হয়; সুতরাং পারত-পক্ষে এ সময় কেহ অবহেলা করে না। যদি কারণ বশত কোন কন্যার উপযুক্ত বর না পাওয়া যায় তো পুষ্পরাশির সঙ্গে তাহার নাম-মাত্র বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। পর দিবস সেই সকল ফুল কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপ ক্রিয়া বরের মৃত্যু-সমান পরিগণিত হয়, ও তৎপরে সেই কন্যার 'নাত্রা' অর্থাৎ পুনর্বিবাহ হইবার কোন বাধা থাকে না। ঈদৃশ আর একটি প্রথার নাম 'বাহুবর' বিবাহ। অর্থাৎ স্বজাতীয় কোন পুরুষ যদি পূর্ব্ব হইতে এই রূপ অঙ্গীকার করে যে, আমি এত টাকা পাইলে আমার বিবাহে কোন দাবী থাকিবে না এবং এই বলিয়া যদি অর্থ গ্রহন করে তাহা হইলে সে কন্যার উপর তাহার কোন অধিকার থাকে না। কন্যাদানের অব্যবহিত পরেই সেই বিবাহ-বন্ধন হইতে বর ও কন্যা উভয়েই নিষ্কৃতি পায়। যে স্ত্রী এইরূপে অব্যাহতি পায় তাহার 'নাত্রা' অর্থাৎ পুনর্বিবাহ করিবার বাধা নাই। অবিবাহিতা স্ত্রীর নাত্রা হইবার বিধি নাই, সুতরাং বিবাহের নির্দ্দিস্ট কাল ভিন্ন তাহার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু একবার নাম-মাত্র বিবাহ দিতে পারিলে পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে ও এই রূপ বিবাহের কোন নিরূপিত সময় নাই, যখন ইচ্ছা দেওয়া যাইতে পারে। বাহু-বর বিবাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া পরক্ষণেই বর স্বকীয় আলয়ে গমন করে। কন্যা পিতৃ-গৃহে আসিয়া হস্তের চুড়ি ফেলিয়া স্নান করে, যেন তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। পরে সুবিধা হইলে পিতামাতা তাহার নাত্রা দেয়।

মুসলমানদের যেমন নিকা, নীচবর্ণ হিন্দুগণের সেই রূপ 'নাত্রা'। নাত্রাতে বিবাহের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি কিছুই আবশ্যক হয় না, বিবাহের ন্যায় তাহাতে ব্যয়-বাহুল্যও নাই। বয়স্কা বিধবার ত কথাই নাই— অল্প বয়সে পতিগৃহে গমন করিবার পূর্ব্বে যে স্ত্রীর বৈধব্য-দশা উপস্থিত হয়, অথবা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রকারে নামমাত্র বিবাহ হইবার পর যে স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ হয়, তাহার নাত্রা অপেক্ষাকৃত আড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। বরের ধুতির অঞ্চল ও কন্যার শাড়ীর অঞ্চলে গাঁঠ দেওয়া হয়, ও এইরূপ গ্রন্থিবদ্ধ দম্পতী অশ্বারূঢ় হইয়া জনতার মধ্য-দিয়া গীতবাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে। তথায় পুরোহিত তাহারদিগকে গণপতির পূজা করাইয়া বিবাহের কার্য্য সম্পন্ন করেন। ইহার নাম নাত্রা।

এইরূপ শুনা যায় যে, কণবী জাতির মধ্যে অজাত সন্তানদিগেরও বিবাহের সম্বন্ধ কখন কখন স্থির হইয়া থাকে। দুই প্রতিবাসীর নিজ নিজ স্ত্রী গর্ভবতী হইলে তাহারা এইরূপ চুক্তি করে যে তোমার পুত্র আমার কন্যা, কিম্বা আমার পুত্র তোমার কন্যা হইলে তাহাদের পরস্পর বিবাহ হইবে। এইরূপ ধার্য্য হইলে সত্য সত্যই যদি এক স্ত্রীর কন্যা ও অপরের পুত্র প্রসূত হয় ত অঙ্গীকার মত তাহাদের বিবাহ দেওয়া হয়।

সকলের কুল সমান নহে। কোন কুল উচ্চ, কোন কুল নীচ রূপে পরিগণিত।

পূর্ব্ব পুরুষের কৃতি ও সুখ্যাতি বশত কোন কোন বংশ বিশেষ গৌরবের পাত্র হইয়াছে। এক্ষণে অনেকটা জন্ম-ভূমির উপর বংশ-মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। অহমদাবাদের আদিম-বাসী কণবীগণ কুল-শীলে শ্রেষ্ঠরূপে প্রখ্যাত। কুলীনের সঙ্গে কিসে কন্যার বিবাহ হয় ইহারই উপর পিতা মাতার বিশেষ লক্ষ্য। নীচ কুলের বরের সঙ্গে কন্যার বিবাহ হওয়া মহা অপ-মানের বিষয়, কুলীন যদি হতশ্রী বা বিগত-যৌবন হয় তথাপি সে প্রার্থনীয়। ৫০ বৎসর বয়স্ক কুলীনের সঙ্গে মাতা তাঁহার দশম বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। উচ্চ কুলের বর পাইতে হইলে অনেক অর্থের প্রয়োজন ও বিবাহের অনুষ্ঠানেও বিস্তর ব্যয়। এই হেতু কুলাভিমানী নির্ধন কণবী এবং রাজপূতদের মধ্যে কন্যা-হত্যা এত প্রচলিত ছিল। কন্যা-সন্তানের প্রতি বিরাগের আর এক কারণ এই যে, পিতা মনে করেন কন্যার বিবাহ হইলেই অপর ব্যক্তি আমাকে শালা শশুর বলিয়া সম্বোধন করিবে, এ অপমান কিরূপে সহ্য হয়? কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহাকে এক দুগ্ধ-পূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দিয়া পিতা মাতা কন্যা-দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইতেন; এই প্রথার নাম 'দুধ পীতী'। ইহা বলা বাহুল্য যে ইংরাজ-রাজ্যে এ নিয়ম এক্ষণে সতীদাহ ও অন্যান্য নিষ্ঠুর প্রথার ন্যায় রাজ-শাসনে বিলুপ্ত হইয়াছে।

বর নীচ-বংশজ হইলে তাহাকে টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করিতে হয়। অর্থের অভাবে আপন পরিবারস্থ কোন কন্যার বিনিময়েও কন্যা পাওয়া যায়। মনে কর, রণছোড়ের এক ভগিনী ও দাজীর একটী কন্যা আছে। রণছোড় দাজীর ভ্রাতার সঙ্গে আপনার ভগিনীর বিবাহ দিয়া দাজীর কন্যাকে বিনিময়ে পাইতে পারেন। এইরূপ তিন ভ্রাতার তিন ভগিনী থাকিলে তাহারা প্র-ত্যেকে আপন আপন ভগিনীর বিনিময়ে এক এক স্ত্রী পরিগ্রহে সমর্থ হয়। এইরূপ বিবাহকে 'সট্টা' বিবাহ বলে।

কণবীদের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরস্পরের সম্মতিক্রমে বিবাহ-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইতে পারে। স্বামীকে অর্থ লালসার বশ করিতে পারিলে স্ত্রী আপনার অভি-লষিত নায়কের নিকট গমন করিতে সমর্থ হয়। স্বামীর অভিমতি ভিন্ন পর পুরুষের সহিত সহবাস করিলে অনেক সময় স্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভি-যোগ উপস্থিত করে; কিন্তু আইন-অনু-সারে স্ত্রী দণ্ডনীয় নহে, তাহার নায়কেরই দণ্ড ভোগ করিতে হয়। কিন্তু এই সকল মকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই প্রায় পঞ্চায়ত-কর্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। এই সকল বিবাহ সম্বন্ধীয় বিবাদে জাতীয় শাসন বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। জাতির পাঁচ জন মিলিয়া যে বিধান করেন তাহা উভয় পক্ষের শিরোধার্য্য। স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া যদি আর এক জনের সংসর্গে বাস করে—স্বামী স্বজাতীয় লোকদিগকে একত্র করিয়া তাহাদের নিকট আপন কাহিনী ব্যক্ত করেন। জাতির

মত হইলে স্ত্রীকে স্বামীর নিকট প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই আদেশ লঙ্ঘন করিলে তৎক্ষণাৎ সেই অপরাধী পুরুষকে জাতি হইতে বহিষ্কৃত করা হয়, ইহা হইতে গুরুতর দণ্ড আছে কি না সন্দেহ। জাতির অভিপ্রায়ে যদি স্থির হইল যে, পরস্ত্রী-গ্রহণের দণ্ড-স্বরূপ ৫০০ টাকা দিয়া স্বামীর সম্মতি ক্রয় করিতে হইবে তো অগত্যা তাহাতেই তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হয়। জাতির বিচারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইলে উপায়াভাবে আদালতের শরণাপন্ন হইতে হয়।

যে সকল কণবীর মধ্যে স্ত্রীজাতির সংখ্যা পুরুষ অপেক্ষা অল্প, তাহাদের পুরুষদের বিবাহ লইয়া মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। এক একটি কন্যারত্ন পাইবার জন্য তাহাদের প্রভূত অর্থ ব্যয় করিতে হয়, ও অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কাজে কাজেই অবিবাহিত থাকিতে হয়। এই সকল লোককে মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া ফাঁদে ফেলিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিবার আশয়ে কোন কোন প্রবঞ্চক এক এক কন্যা লইয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়। কন্যা হয়ত অন্য জাতীয়া—অথবা বিবাহিতা ও তাহার স্বামী জীবিত। বর ত কন্যার জন্য বুভুক্ষিত মৎস্যের ন্যায় তাকাইয়া আছেন—টোপ্ টপ্ করিয়া পড়িল কি অমনি তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া আট্‌কাইয়া পড়িলেন। ভবিষ্যতে কোন গোলযোগ না হয় তজ্জন্য গ্রামের দুই এক জন ভদ্র লোক হয় ত জামীন হইল—তাহাদের চক্ষে ধূলি দিয়া ছল-বল-কৌশলে তাহারদিগকেও বশ করিতে হয়। বর কন্যাকর্ত্তার হাতে টাকা গনিয়া দিয়া মহা উল্লাসে বিবাহ করিলেন, পর দিন প্রাতে উঠিয়া দেখেন সে কন্যা নাই—কন্যাকর্ত্তাও অন্তর্হিত হইয়াছে। খোঁজ্ খোঁজ্ খোঁজ্—পরে সন্ধান পাইলে হয় ত আদালতে এক মহা-মকদ্দমা আসিয়া উপস্থিত হয়। ইনি ত চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পরস্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলেন—এদিকে সে স্ত্রীর যে যথার্থ স্বামী তাহার বাটীতে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। তাহার স্ত্রী কোথায় পলায়ন করিল, এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তর অন্বেষণ করিয়া প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইলে তিনিও বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া কন্যাকর্ত্তার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। সত্য নিরূপণ করিতে বিচার-পতির মাথা ঘুরিয়া যায়। স্বামী চান তাঁহার স্ত্রী, উপস্বামী, প্রতারক দল, সকলেরই সমুচিত শাস্তি হয়। স্ত্রী বলিতেছেন—আমার স্বামী আমাকে মা বোন্ বলিয়া সম্বোধন করত গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন—আমার দোষ কি? উপস্বামী বলিতেছেন—এই স্ত্রীর স্বামী বর্ত্তমান ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর, জানিতে পারিলে কি এত টাকা দিয়া কন্যা ক্রয় করিতাম। প্রতারক দল বলিতেছে, আমরা ইহার কিছুই জানি না, আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছে—বর কন্যা আমরা কাহাকেও জানি না—আমরা আমাদের গ্রামে বাস করিতেছিলাম, তথা

হইতে পুলিষের লোকে আমাদিগকে ধরিয়া আনিয়াছে। প্রত্যেক পক্ষ আপন আপন সাক্ষীর সহিত দণ্ডায়মান। পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, এই মিথ্যা জালের মধ্য হইতে সত্য নির্ণয় করা কি সহজ ব্যাপার?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দুর্ভিক্ষ।

এবৎসর বোম্বাই-অঞ্চলে অনাবৃষ্টির হাহা-রব চতুর্দ্দিক হইতে উঠিতেছে। গত-বর্ষ হইতে মহারাষ্ট্র, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, সোলাপুর, খান্‌দেশ প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ-পিশাচ নর-শীকার অন্বেষণে ফিরিতেছে। আমাদের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অধ্যবসায়-সহকারে এই সর্ব্ব-সংহারক ভয়ঙ্কর শত্রুকে দমন করিবার চেষ্টায় আছেন। দুই দিক রক্ষা করা চাই, সরকারী টাকার অতিব্যয়ও না হয়, লোকেরাও অনাহারে না মরে। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত জনগণের মধ্যে প্রতিজনে কতটুকু অন্ন আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে এই বিষয় লইয়া মহা বাদ-বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ও বোম্বাই ডাক্তারের মত যে, অর্দ্ধ সের পরিমাণ শস্য একজন বলিষ্ঠ শ্রমজীবির পক্ষে যথেষ্ট। মান্দ্রাজের স্বাস্থ্য বিভাগের কমিসনর ডাক্তার করনিষ্ তীক্ষ্ণ লেখনী চালনা করিয়া এই মতের প্রতিবাদ করেন। সে যাহা হউক দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রদেশের প্রজাগণের যে শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। অন্নাভাবে মাতা শিশুসন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন, মানুষে হলাকর্ষক ও শকট-পরিচালক হইয়া বলদের ন্যায় কার্য্য করিতেছে। গরীব লোকেরা বাঁসের বীজ, তেঁতুলের বীচি, ভুসি, বৃক্ষপত্র, আহার করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন যাপন করিতেছে; এমন কি কাকের ন্যায় পরিত্যক্ত আহারাবশিষ্ট নর্দ্দামা হইতে কুড়াইয়া খাইতেছে। এই সময় যদি কোন কুকুর উপস্থিত থাকে, ত তাহার নিজ স্বত্বের উপর এই রূপ অন্যথাবিধ আক্রমণ দেখিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হয় এবং এই নর-কুকুরের যুদ্ধে মনুষ্য-জন্তু জয়ী হইয়া কুকুরের খাদ্য কাড়িয়া লইয়া উদরস্থ করে। এ শুদ্ধ লেখকের কল্পনা নহে—ইহা প্রতি দিনের বাস্তবিক ঘটনা। এ সকল কি প্রাণে সয়?

এবৎসর গুজরাটেও এই রূপ অনাবৃষ্টির লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে।—আবার কতক দিন এই রূপে গত হইলে বোম্বাই-অঞ্চলে শনির রাজ্য দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রজাগণ অনাবৃষ্টি নিবারণের জন্য নানাবিধ উপায় করিতেছে। বোম্বাই নগরীর প্রধানেরা হোম-যাগ দ্বারা ইন্দ্রদেবের তুষ্টি সাধনে তৎপর রহিয়াছেন—হোমের ধূমে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু কৈ, ইন্দ্রদেব ত বারিবর্ষণ করেন না। পারসীরা তাহাদের আতস বেহরাসে—মুসলমানেরা মসজিদে খৃষ্টীয়েরা তাহাদের চর্চে গিয়া বৃষ্টির জন্য সেই সর্ব্বনিয়ন্তার নিকটে প্রার্থনা করি-

তেছে। শৈব পল্লীস্থেরা বৃষ্টির উদ্দেশে শিব-লিঙ্গ দিবারাত্রি ২৪ ঘণ্টাই জলমগ্ন করিয়া রাখিতেছে।—ইহাতে তাহাদের মনস্কামনা কিরূপে সিদ্ধ হইবে বুঝা দুষ্কর। কেন না মহাদেব জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া মনে করিতে পারেন, এ কি মহাপ্রলয় উপস্থিত—এই ভাবিয়া জলদের মুখ বন্ধ করিবারই বিধান করিবেন—অতএব এ উপায়ে হিতে বিপরীত ঘটিবার সম্ভাবনা। এদেশে বর্ষা আনিবার আর এক প্রথা আছে—সে কি না উজানী যাওয়া, অর্থাৎ এক দিবস নগর-বাসীগণ একত্র হইয়া নগরের বাহিরে গিয়া আহারাদি করিয়া থাকে। সে দিন কাহারো ঘরে উনান জ্বলে না। অল্প দিন হইল, অহমদাবাদের কলেক্টর সাহেবের অনুমতিক্রমে সহরশুদ্ধ লোক সহরের বাহিরে উজানী করিতে গিয়াছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদিগকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। সেই অবধি বর্ষার নাম গন্ধও নাই। আকাশ যে নিরভ্র সেই নিরভ্র, ধরনী যে শুষ্ক সেই শুষ্কই রহিয়াছে। কয়েক দিবস হইল ইন্দোরে এই উজানী, মহা সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মহারাজ হোল্‌কার সপরিবারে নগরবাসী জনগণ সমভিব্যাহারে ইন্দোর হইতে এক ক্রোশ দূর বানগঙ্গা নামক গ্রামে গমন করিলেন। রাজাজ্ঞা এই যে, সেখানে সমস্ত দিবস যাপন করিতে হইবে—কেহ ঘরে চুলা জ্বালাইতে পারিবে না—সকলে আপন আপন পাথেয় লইয়া নগরের প্রান্তে গিয়া আহারাদি করিবেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে মিলিয়া প্রায় ১৫০০০ লোক একত্র হইয়াছিল। বৃষ্টি-আহ্বানোচিত পূজাদি কার্য্য সমাপন হইলে, মহারাজ নিজ হস্তে হল ধারণ করিয়া এক খণ্ড ভূমি কর্ষণ করিলেন। মহারাণী কৃষক-পত্নী-বেশে তাঁহার স্বামীর জন্য খাদ্য সামগ্রী স্বীয় বস্ত্রের অঞ্চলে বাঁধিয়া আনিয়া দিলেন। এক ক্ষেত্রে বসিয়া ভোজনাদি হইল। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া ইন্দ্রদেব আর উদাসীন থাকিতে পারিলেন না।—অল্পক্ষণ পরেই মুষল-ধারায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল ও রাজা প্রজা উল্লসিত চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

বোম্বাই ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে তাহাতে কি বঙ্গদেশ উদাসীন হইয়া তাঁহার চিরস্থায়ী বন্দবস্তের ছায়ায় বসিয়া আরাম করিবেন?—এই কি উচিত? ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন ভ্রাতৃ-ভগিনীগণের সাহায্যে কি একটুকু অগ্রসর হইবেন না? বর্দ্ধমানাধিরাজের ন্যায় লক্ষ-পতিগণ এ বিষয়ে একটুকু মনোযোগ করিলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হয়। ইংলণ্ডে যে কয়েকটি বীরপুরুষ আপনাদের প্রাণ-সঙ্কটেও খনি-নিবদ্ধ মুমূর্ষু লোকদিগকে খনি-মধ্যস্থিত প্রাচীর বিদারন করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পুরস্কার স্বরূপ অর্থ প্রেরণ করা উদারতার কার্য্য বটে, কিন্তু যিনি প্রকৃত দাতা, তিনি প্রথমে ঘরের লোকদিগের কষ্ট-নিবারণে যত্নশীল হইবেন। আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে,—

শক্তঃ পরজনে দাতা স্বজনে দুঃখজীবিনি।
মধ্বাপাতো বিষাস্বাদঃ স ধর্ম্মপ্রতিরূপকঃ॥

অনতিদূরে "জননীর ক্রোড়-নীড়ে শিশু শুকাইছে" এই দৃশ্যটি কল্পনা-নেত্রে দর্শন করিয়া, যদি বঙ্গীয় ধনাঢ্যগণ তাঁহাদের প্রভূত অর্থের স্বল্পাংশও অকাল-রাহুগ্রস্ত জনপদের কল্যাণার্থে ব্যয় করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অনেক পুণ্য সঞ্চয় করিবেন।

শ্রীস—

সম্পাদকের বৈঠক।

বৃষ্টি।

রক্ত বৃষ্টি।—মহাভারত রামায়ণে অনেক স্থলে রক্ত-বৃষ্টির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, এবং ভারতবর্ষে সম্প্রতিও অনেক বার রক্ত-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। সংবাদপত্রে দৃস্ট হইল—সে দিন হায়দ্রাবাদে রক্ত-বৃষ্টি হইয়াছে এবং যশোহরেও দুই এক বার হইয়াছিল। হোমরেও রক্ত-বৃষ্টির কথা লিখিত আছে, এবং ফ্রান্স ইটালী ও ইয়ুরোপের অন্যান্য অনেক স্থলে রক্ত-বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা এই ঘটনার নিম্ন-লিখিত কারণ নির্দ্দেশ করেন।

নিকটবর্ত্তী প্রদেশের লোহিত মৃত্তিকা ঝড়ে উড়িয়া বৃষ্টির সহিত মিশ্রিত হয়; ইহাতেই বৃষ্টি লোহিত বর্ণ ধারণ করে এবং ইহাকেই অজ্ঞ লোকেরা ঈশ্বরের ক্রোধ-সূচক রক্ত-বৃষ্টি মনে করে।" এ (Aix) নামক প্রদেশে একবার এইরূপ লোহিত-বর্ণ বৃষ্টি পড়ে; ধর্ম্ম-যাজকেরা তাহার অলৌকিক কারণ নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু মশিও ডিপেরেষ্ক্ বিশেষ যত্নে বৃষ্টি-বিন্দু পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছিলেন। তিনি কহেন, সেখানে জুলাই মাসে অতিরিক্ত প্রজাপতির আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তাহাদেরই পক্ষ-রেণু বৃষ্টিতে মিশ্রিত হওয়াতে বৃষ্টির জল লোহিত-বর্ণ হইয়া যায়। ধূলিজাল কখন কখন এতদূর হইতে উড়িয়া আসে যে তাহা বিস্ময়জনক। ড্রোম অঞ্চলে যে রক্তবৃষ্টি হয়, তাহা দ্বারা যে মৃত্তিকা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা ওজনে ১৯৯০০ মন। এই ধূলিজাল ১৩ই অক্টোবরে আমেরিকা হইতে রফ্তানি হয় এবং ১৭ই অক্টোবরে ফ্রান্সে আসিয়া পৌঁছায়। এইরূপ রক্তিম বরফ-বৃষ্টিও ইয়ুরোপে মাঝে মাঝে হইয়া গিয়াছে। বৃষ্টির সহিত মৃত্তিকা মিশ্রিত হইয়া অনেক সময়ে ভূমিতে সারের কাজ করে।

দুগ্ধবৃষ্টি।—ইয়ুরোপের প্রাচীন লেখকেরা অনেক স্থলে দুগ্ধবৃষ্টির কথা বলিয়া গিয়াছেন। এখনকার বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, হয় ত খড়ি-মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা বৃষ্টি এইরূপ শ্বেত হইয়া গিয়াছিল। ডায়ন ক্যাসিয়স্ একরূপ বৃষ্টির কথা বলেন, তাহা দেখিতে দুগ্ধের মত শ্বেত-বর্ণ। এই বৃষ্টি যে সকল তাম্র-পাত্রে ও তাম্র-মুদ্রায় পড়িয়াছিল,

তিন দিন ধরিয়া তাহাদের বর্ণ রৌপ্যের মত ছিল। ফ্লামারিয়ঁ বলেন, যদি তাহা সত্য হয় তবে নিশ্চয় পারদ বৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু কি করিয়া এইরূপ ঘটনা হইল তাহার কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্দেশ করা যায় না।

পুষ্টিকর খাদ্য-বৃষ্টি।—১৮২৪ এবং ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে পারস্যের কোন বিশেষ প্রদেশে লিচেন জাতীয় এক প্রকার উদ্ভিজ্জ-বৃষ্টি হইয়াছিল, তদ্দ্বারা ভূমির পাঁচ ছয় ইঞ্চি আচ্ছন্ন হইয়া যায়; গো মেষাদি জন্তুরা তাহা অতিশয় তৃপ্তি-পূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়াছিল, এমন কি, সেখানকার অধিবাসীরা তাহা দ্বারা রুটি প্রস্তুত করিয়াছিল। মুষেনব্রোয়েক্ বলেন, ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডে একবার বসা-বৃষ্টি হইয়াছিল।

গন্ধক-বৃষ্টি।—সাধারণ লোকে বৃক্ষ বিশেষের, বিশেষতঃ কেলু ও নট্ বৃক্ষের পুষ্পরেণু-বৃষ্টিকেই গন্ধক-বৃষ্টি বলিয়া মনে করে। এই রেণু সকল বায়ু দ্বারা বহু দূর হইতে আনীত হয়। সময়ে সময়ে আগ্নেয় পর্ব্বত হইতে গন্ধকীয় পদার্থ চালিত হইয়া প্রকৃত গন্ধক-বৃষ্টিও হইয়াছে। নরওয়েতে দুই একবার যে গন্ধক-বৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কারণ নিকটবর্ত্তী আইস্‌ল্যাণ্ডস্থিত আগ্নেয় পর্ব্বত এবং নেপল্‌সের গন্ধক-বৃষ্টির কারণ ভিসুভিয়স্ আগ্নেয় পর্ব্বত।

শুষ্ক পত্র-বৃষ্টি।—১৮৬৯ খৃঃ অব্দে এপ্রিল মাসে ১০টা বাজিয়া দশ মিনিটের সময় ফ্রান্সের অট্রেস প্রদেশে মশিও জ্যালোয়া শুষ্ক ওক-পত্র-বৃষ্টি দেখিয়াছেন। ইহার কারণ—৩রা আপ্রিলে একটি প্রচণ্ড ঝড়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ওক-পত্র-গুলি বায়ু-বলে আকাশের উচ্চ প্রদেশে নীত হয়, এবং বায়ুর পরাক্রমে ৩ দিন ক্রমান্বয়ে সেখানে ছিল, বায়ু শান্ত হইলেই আবার ভূমিতে পতিত হয়।

কমলা লেবু বৃষ্টি।—১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে নেপল্‌সের সমীপস্থ পসিলিপাসে এক জলস্তম্ভ উঠিয়া তীরস্থ দুইটি বৃহৎ কমলা লেবুর চাঙ্গারী লুঠ করে, অবশেষে পুনরায় কিছু দূরে তাহা বর্ষণ করে।

জীবন্ত প্রাণী-বৃষ্টি।—জল-স্তম্ভ, পুষ্করিণী হইতে মৎস্য ধরিয়া কখন কখন তাহা বর্ষণ করে। পেল্‌টিয়ে বলেন, একটি জল-স্তম্ভ তাঁহার মস্তকের উপর ভেক নিক্ষেপ করিয়াছিল।

স্যাভয়ের অন্তর্ভূত আরাচিতে ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে ৩ রা জানুয়ারিতে সার্দ্ধ চারি ঘণ্টার সময় বরফ পড়িতে আরম্ভ হয়, সেই বরফের সঙ্গে অসংখ্য কীট-ডিম্ব ও গুটিপোকা পাওয়া গিয়াছিল।

তিসো বলেন ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে টুরিণের শস্য-ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ঝটিকায় সহস্র সহস্র জীবিত কীট আসিয়া পড়িয়াছিল। এই জাতীয় কীট সার্ডিনিয়া ভিন্ন অন্য কোন স্থানে জন্মে না।

পঙ্গপাল-বৃষ্টি।—এই পঙ্গপাল-দল শস্যের দারুণ অনিষ্ট করে। বায়ুবলে আনীত হইয়া যে দেশে একবার পদার্পণ করে, সেখানকার উর্ব্বর ক্ষেত্র একেবারে মরুভূমি হইয়া যায়। সূর্য্য-মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া যখন পঙ্গপাল-দল উড়িতে থাকে

তখন দূর হইতে তাহাদিগকে ঘোর মেঘের মত দেখায়। যত দূর দৃষ্টি যায় তত দূর আকাশ অন্ধকার এবং ভূমি আচ্ছন্ন। তাহাদিগের অযুত পক্ষের শব্দ, নির্ঝরের প্রচণ্ড ধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইতে থাকে। পৃথিবীতে নাবিয়াই তাহারা বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া ফেলে, মুহূর্ত্তের মধ্যে কতক্রোশ ব্যাপিয়া শস্যের চিহ্ন মাত্র রাখে না। যবের বৃক্ষ-মূল পর্য্যন্ত চিবাইয়া খাইয়া ফেলে, এবং বড় বড় বৃক্ষের একটি পত্রও অবশিষ্ট রাখে না। প্রত্যেক দ্রব্য নষ্ট, চূর্ণ, খণ্ড খণ্ড বিভক্ত ও ভক্ষিত হয়। আর যখন কিছু অবশিষ্ট থাকে না, তখন এই ভয়ানক পতঙ্গদল দুর্ভিক্ষ ও মহামারিকে তাহাদের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া যেন কি একটি সঙ্কেত-বাক্যে সকলে মিলিয়া উঠিয়া পড়ে। কখন কখন ইহারা সমুদয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া অবশেষে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে। তাহাদের লক্ষ লক্ষ মৃতদেহ সূর্য্যোত্তাপে তপ্ত হইয়া অস্বাস্থ্যকর বাষ্পত্যাগ করে। এইরূপে দারুণ মড়ক সমস্ত জিলায় ব্যাপ্ত হয়।

নেপোলিয়ানের উক্তি।

ইংরাজ সৈন্য।—সৈন্য-বলে সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতে যাওয়াই ইংরাজ জাতির পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত কার্য্য হইয়াছে, কারণ তাহা হইলে তাহাকে রুসিয়া, প্রসিয়া অথবা অষ্ট্রিয়ার ইচ্ছাধীন হইয়া থাকিতে হইবে; কেন না তাহাদের এত লোক নাই যে, ফ্রান্স বা ইউরোপের অন্য কোন জাতির সহিত যুদ্ধ করিয়া উঠিতে পারে, সুতরাং উক্ত জাতির মধ্যে কাহারো না কাহারো নিকট হইতে সৈন্য ধার করিতে হইবে। কিন্তু সমুদ্র-যুদ্ধে তাহাদের নাবিকেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট স্বীকার করি। তাহাদের সৈনিকদিগের উৎকৃষ্ট যোদ্ধা হইবারও কোন গুণ নাই। তৎপরতা চতুরতা অথবা বুদ্ধিতে তাহারা ফরাসিস্‌দিগের সমতুল্য নহে। বিপদে পড়িলে তাহারা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়া যায়। আমি নিজে মুরের পলায়ন দেখিয়াছি। আমার জীবনে এরূপ বিশৃঙ্খলা কখনও দেখি নাই। সেই পলায়ন-পর সৈন্যদিগকে একত্র করা বা তাহাদের দ্বারা আর কোন কাজ করান একেবারে অসম্ভব হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছিল।

ইয়ুরোপ।—ইয়ুরোপ ত একটি ক্ষুদ্র উয়ের ঢিপি; এখানে কখন মহৎ সাম্রাজ্য স্থাপনও হয় নাই, ঘোরতর বিপ্লবও ঘটে নাই, কিন্তু ষাট্ কোটী লোকের নিবাসস্থান এসিয়া পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মের শৈশব-দোলা এবং সমুদয় দর্শন-শাস্ত্রের জন্ম-ভূমি।

ইংরাজি আচার ব্যবহার।—ইংরাজেরা স্ত্রী-সমাজ অপেক্ষা বোতলকে অধিক ভাল বাসে। কারণ, মদ খাইবার জন্য ও মাতাল হইবার জন্য তাঁহারা মহিলাদিগকে আহার-স্থান হইতে বিদায় করিয়া দেন। আমি যদি ইংলণ্ডে থাকিতাম, তবে নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকদিগের সহিত টেবিল ত্যাগ

করিয়া চলিয়া যাইতাম। যদি মাতাল না হইয়া শুদ্ধ কথোপকথন করাই উদ্দেশ্য হয়, তবে কেন তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হয়? মহিলারা না থাকিলে কখনই কথোপকথন তেমন সজীব বা সরস হয় না। আমি যদি ইংরাজ-মহিলা হইতাম ও পুরুষেরা ২। ৩ ঘণ্টা ধরিয়া মদ খাইবার জন্য আমাকে তাড়াইয়া দিত তবে কখনই আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। ফ্রান্সে স্ত্রীলোক না থাকিলে ত সে সভা মজুরই হয় না!

নিজের স্ত্রী।—আমি দেশ অধিকার করি কিন্তু জোজেফীন্ হৃদয় অধিকার করেন।

সত্বরতা।—সত্বরতা শিক্ষা কর। মনে রাখিও যে পৃথিবী সৃষ্টি করিতে কেবল ছয় দিন মাত্র লাগিয়াছিল। সময়টি ছাড়া আর আমার কাছে যাহা চাও তাহাই দিতে পারি। ঐ একটি দ্রব্য আছে যাহা দেওয়া আমার ক্ষমতার অতীত।

সেণ্ট্ হেলেনা।—যদি সেণ্ট্ হেলেনা ফ্রান্স্ হইত, তবে এমন যে ভীষণ মরুভূমি-তুল্য দ্বীপ, ইহাকেও আমি ভাল বাসিতাম।

তাঁহার ধর্ম্ম।—আমার ধর্ম্ম অতি সহজ। আমি যখন এই বিশাল জটিল মহান্ জগতের দিকে চাহিয়া দেখি, তখন আপনা আপনি বলিতে থাকি ইহা কখনো আকস্মিক ঘটনার ফল হইতে পারে না, কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই হউক, ইহা কোন অপরিজ্ঞাত সর্ব্বশক্তিমান পুরুষ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। মনুষ্য-উদ্ভাবিত উৎকৃষ্টতম যন্ত্র হইতে এই জগৎ যেমন উৎকৃষ্টতর, মনুষ্য অপেক্ষা তিনিও তেমনি শ্রেষ্ঠতর।

সুমাতা।—ফ্রান্সকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য সুমাতার যেমন প্রয়োজন এমন আর কিছুরই নয়।

সৈন্য।—সৈনিকেরা আজ্ঞাবহন করিবার যন্ত্র মাত্র।

বলসংখ্যা।—নেপোলিয়ন—"অধিকতর বল-সংখ্যা সর্ব্বদাই অল্পতর বল-সংখ্যাকে পরাভূত করে।"

গোহিয়ে—"কিন্তু আপনি ত অনেকবার অল্প সংখ্যক সৈন্যের দ্বারা অধিক সংখ্যক সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছেন।" নেপোলিয়ন— "সে স্থলেও অল্প বল অধিক বলের দ্বারা পরাজিত হইয়াছে। যখনি আমি অল্প সংখ্যক লোক-সমভিব্যাহারে অধিক সংখ্যক লোকের সম্মুখে উপস্থিত হই, তখনি আমার সেই অল্প সংখ্যক সৈন্যদিগকে একত্র জড় করিয়া বিপক্ষ-সৈন্যদের এক ভাগে বিদ্যুতের ন্যায় গিয়া পড়ি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া আবার আর এক দিকে আক্রমণ করি, এইরূপ অল্পে অল্পে, একে একে, সমগ্র বিপক্ষ-সৈন্য পরাস্ত হয়। ইহাতেও প্রমাণ হইতেছে যে, অধিক বল অল্প বলকে পরাজিত করে।

ব্রিটন দ্বীপস্থ পাথুরিয়া কয়লার খনি।—প্রকৃটর বলেন, ব্রিটনের যত কিছু মহত্ত্ব, সমস্তই তাহার পাথুরিয়া কয়লার খনির উপর নির্ভর করিতেছে; যদি কখনো এই পাথুরিয়া কয়লা নিঃশেষিত হইয়া যায়

তাহা হইলেই ব্রিটনের সভ্যতাও ক্রমে ক্রমে নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। ইংলণ্ডের খনি-শাস্ত্রবিৎগণ অনেকে গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, কয়লার ব্যয় যেরূপ ক্রমশই বাড়িতেছে তাহাতে আর দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে ব্রিটনস্থ কয়লার ভাণ্ডার শূন্য হইয়া যাইবে। তাহা হইলে ব্রিটনে বড়ই গোল বাধিবে, সমুদয় কারখানা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং ব্রিটিশেরা তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদের ন্যায় মৎস্য ধরিয়া ও শীকার করিয়া খাইবে।

সমুদ্রের ধ্বংস কার্য্য।—সেটলাণ্ড দ্বীপ গ্রানিট্ প্রভৃতি দৃঢ়তম শিলায় নির্ম্মিত অথচ সমুদ্র অল্প কালের মধ্যেই এই দ্বীপকে এমন ক্ষয় করিয়াছে যে তাহা বিস্ময়-জনক। আটলাণ্টিকের তীব্র বেগে তাহার শৈল সকলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গহ্বর খোদিত হইয়াছে। স্টেনেস দ্বীপও ক্রমশঃ সমুদ্রের আঘাতে এইরূপে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে। সেট্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দ্বীপের ন্যায় গ্রেট ব্রিটনের তীরভাগ শৈল-মালার দ্বারা রক্ষিত নহে, এবং সেখানে আটলাণ্টিকের বেগও অল্প। তথাপি ইয়র্ক্‌শিয়রের তীরভাগ ক্রমাগত নষ্ট হইয়া যাইতেছে, অনেক স্থলে, এখন যেখানে কেবল বালীর চিহ্নমাত্র বিদ্যমান আছে, পূর্ব্বে সেখানে প্রাচীন নগর ও গ্রাম স্থাপিত ছিল। অবর্ণ, হার্টবর্ণ, কিল্‌ন্‌সি প্রভৃতি অনেক স্থান ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। "ইয়র্ক্‌শিয়রের ভূতত্ত্ব" নামক গ্রন্থে ফিলিপ্স্ লিখেন যে, ভবিষ্যতে স্পার্ণ-পইণ্ট নামক স্থান ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া দ্বীপের আকার ধারণ করিতেও পারে, তাহা হইলে মহা-সমুদ্র হাম্বারের নদীমুখে প্রবেশ করিয়া দারুণ ধ্বংশ সাধন করিবে। নর্ফক্ এবং সাফোকের তীরদেশও এইরূপ দ্রুতবেগে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। লায়েল বলেন, এখন যেখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাহাজ ভাসিতে পারে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে সেই খানে গ্রাম-সমেত ৫০ ফিট উচ্চ শৈল দণ্ডায়মান ছিল। ইংলণ্ডের ক্ষুদ্র দ্বীপ এইরূপ ধ্বংসের মুখে পড়িয়াছে!

সূর্য্য-মণ্ডলে গোল বাধিয়াছে।—প্রক্টর বলেন অল্প দিনের মধ্যেই সূর্য্য-মণ্ডলে এরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে যে, জ্যোতির্ব্বিদেরা ভয় করিতেছেন যে, হয় সূর্য্যের তেজ অধিকতর বর্দ্ধিত হইতেছে, নয় ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। যদি এই সৌরজগতের বিশাল প্রদীপ ক্রমে নিভিয়া যায় বা অধিকতর জ্বলিয়া উঠে, উভয়ই আমাদের পক্ষে অনিষ্টজনক। জ্যোতির্ব্বিদেরা দেখিয়াছেন, কত নক্ষত্র দীপ্তিহীন হইয়া ক্রমে নিভিয়া গিয়াছে এবং কোন কোনটা বা অধিকতর দীপ্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের সূর্য্যও এই নক্ষত্র জগতের মধ্যে একটি, উহারও কোন দিন এইরূপ দশা ঘটিতে পারে।

প্রকাণ্ড সমুদ্র-তরঙ্গ।—অ্যারিকায় ভূমিকম্প হইবার অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সমুদ্র পিছনে হটিতে লাগিল, কিয়দ্দূর গিয়া পরক্ষণেই আবার প্রবল-বেগে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অপরিমেয় প্রকাণ্ড তরঙ্গ ৫০ ফিট উচ্চ হইয়া অন্ধকার দেয়ালের ন্যায়

নগরের দিকে অগ্রসর হইল এবং নগরের অধিকাংশই নষ্ট করিয়া ফেলিল। এক দিন ইকিক-নিবাসী লোকেরা দেখিল, দূর হইতে গভীর নীলবর্ণ প্রকাণ্ড জলরাশি সমুদ্রতল হইতে কর্দ্দম ও পঙ্ক লইয়া নগর-গ্রাম গ্রাস করিতে করিতে ছুটিয়া আসিতেছে। বন্দরে যে দ্বীপ ছিল তাহা এই তরঙ্গ-তলে মগ্ন হইয়া যায়। কত-গৃহ ভগ্ন করিয়া, গ্রাম নষ্ট করিয়া, মনুষ্য নিহত করিয়া এই প্রকাণ্ড তরঙ্গ আবার সমুদ্রের ক্রোড়ে ফিরিয়া গেল। এই প্রকার তরঙ্গ প্রায় ১০০ ক্রোশ হইতে ৫০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রশস্ত এবং ৪০০০ ক্রোশ দীর্ঘ হয়।

ঘড়ি।—ষার্ল্‌মেনের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী লিখিয়াছেন যে, ৮০৭ খৃষ্টাব্দে পারস্য-রাজ আবদুল্লা ষার্ল্‌মেন্‌কে একটি ঘড়ি উপহার দেন। তাহারো এক প্রকার চক্র-সম্বলিত যন্ত্র ছিল, কিন্তু তাহা জল-পতনে ঘুরিত; এই ঘড়ি দেখিয়া ফরাসী-রাজসভা অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিল। সময়-চিহ্নাঙ্কিত ঘটিকা-ফলকের উপর ১২টি সময়-জ্ঞাপক ক্ষুদ্র দ্বার ছিল, বিশেষ বিশেষ ঘণ্টায় বিশেষ বিশেষ দ্বার উন্মুক্ত হইত এবং ক্ষুদ্র তাম্র-গোলা বাহির হইয়া একটি ঘণ্টায় আঘাত করিত। বারটা বাজিয়া গেলে ১২টি অশ্বারোহী মূর্ত্তি ফলকের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইত।

অদ্ভুত উৎস।—ইয়র্ক্‌শিয়রে ন্যারেসবরো দুর্গের ধ্বংশাবশেষের বিপরীত দিকে নিড নদীর দক্ষিণ পশ্চিমতীরে একটি উৎস আছে। সেখানে দরিদ্র লোকেরা আসিয়া ফল ফুল বৃক্ষপত্র জলে ফেলিয়া দেয়। ঐ জলে সেই সকল দ্রব্য প্রস্তর হইয়া যায়। পরে তাহারা উহা লইয়া বিক্রয় করে। এমন কি, ডিম্ব-সমেত পক্ষীর নীড়ের প্রত্যেক সূক্ষ্ম অংশও প্রস্তর হইতে দেখা গিয়াছে।

নস্য গ্রহণে সময় ও অর্থের অপব্যয়।—লর্ড্‌ ষ্ট্যানাপ্‌ বলেন, প্রত্যেক অচিকিৎস্য, পাকা নস্য-সেবক দশ মিনিটে একটিপ্‌ করিয়া নস্য লন। নাক ঝাড়িতে, মুছিতে এবং নস্য গ্রহণের অন্যান্য নানাবিধ আনুসঙ্গিক অনুষ্ঠান করিতে করিতে দেড় মিনিট ব্যয়িত হইয়া যায়। এইরূপে ষোল ঘণ্টার মধ্যে দশ মিনিট অন্তর নস্য লইলে প্রতিদিনে ২ঘণ্টা ২৪ মিনিট নষ্ট হয়, সুতরাং প্রত্যেক বৎসরে সার্দ্ধ ছত্রিশ দিন অতিবাহিত হয়। এইরূপে সমস্ত চল্লিশ বৎসরে চারি বৎসর নষ্ট হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত নস্য, নস্যের বাক্‌স, রুমাল কিনিতে সাধারণ নস্য-সেবকদিগের যে অর্থ ব্যয় হয় তাহাতে আমাদের জাতীয় ঋণ পরিশোধ হইয়া যাইতে পারে।

মঙ্গল ও অমঙ্গল সমাচার।—দুই বন্ধু পরস্পর সাক্ষাৎকারে এক জন আর এক জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি কেমন আছেন? তিনি বলিলেন "ভাল নাই, অল্পদিন হইল আমি বিবাহ করিয়াছি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি।—ইহা সুসমাচার বলিতে হইবে।

প্রথম ব্যক্তি।—বড় সুসমাচার নয়, যে

হেতু, যে স্ত্রীকে আমি বিবাহ করিয়াছি, সে বড় কুঁদুলে।

দ্বিতীয়।—ইহা অমঙ্গল সমাচার বলিতে হইবে।

প্রথম।—বড় অমঙ্গল সমাচার নয়; কারণ বিবাহের সময় আমার শ্বশুর বিশ হাজার টাকা যৌতুক দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়।—ইহা সুসমাচার বটে।

প্রথম।—বড় সুসমাচার নয়, কারণ আমি ঐ টাকা দিয়া মেষ ক্রয় করিয়াছিলাম, সে সকল মেষ মড়কে মরিয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়। বড় দুঃখের বিষয়।

প্রথম। বড় দুঃখের বিষয় নয়, কারণ ঐ মেষের মূল্য যত ছিল, তাহা অপেক্ষা তাহাদের চর্ম্ম বিক্রয় করিয়া অধিক টাকা পাইয়াছি।

দ্বিতীয়। তবে ইহাতে তোমার ক্ষতি পূরণ হইয়াছে।

প্রথম। বড় ক্ষতিপূরণ নয়, কারণ ঐ টাকায় আমি এক বাড়ি নির্ম্মাণ করি, তাহা পুড়িয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়। বিলক্ষণ ক্ষতি বলিতে হইবে।

প্রথম। বড় ক্ষতি বলা যায় না, যে হেতু বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীও পুড়িয়া মরিয়াছে।

সংক্ষিপ্ততা।—চতুর্থ হেনরির অধীন এক ফরাসিস্ কর্ম্মচারী বহুদিন কর্ম্ম করিয়া বেতন না পাওয়াতে রাজার নিকট গমন করিলেন এবং অসঙ্কুচিত ভাবে কহিলেন "প্রভু, আপনাকে আমার এই তিনটি মাত্র কথা বলিবার আছে—টাকা, অথবা, জবাব।" রাজা কহিলেন "তোমাকে আমার চারিটি কথা বলিবার আছে—এটিও, নয়, উটিও, নয়।"

শত্রুর প্রতি প্রীতি।—চার্ল্‌স্ বেনিষ্টার নামে এক জন প্রসিদ্ধ মাতালকে মদ খাইতে দেখিয়া এক জন চিকিৎসক বলিয়াছিলেন "উহা পান করিও না, ব্রাণ্ডির ন্যায় জগতে আর শত্রু নাই।" চার্ল্‌স্ উত্তর করেন যে "আমি তাহা বিলক্ষণ জানি, কিন্তু বাইবেলে উপদেশ আছে যে শত্রুর প্রতি প্রীতি করা কর্ত্তব্য।"

চীন-বাসীদের খাদ্য।—চীনেরা জীবন্ত প্রাণী যাহা দেখে তাহাই প্রায় খাইয়া ফেলে। কুকুর, বিড়াল, পেঁচা, ঈগ্‌ল্, বাজ, সারস, ইহারাও বাজারে সচরাচর খাদ্য দ্রব্য রূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। ইহা না পাইলে দুই একটা নেংটে ইন্দুর, গেছো ইন্দুর, ও সাপের বাচ্ছাও খাদ্য। আরসুলা ও অন্যান্য কীট তাহাদের খাদ্য ও ঔষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কুকুরের মাংসের মত তাহারা আর কিছুই ভাল বাসে না। মোটা সোটা নরম কুকুরের মাংস বাজারে বড়ই মহার্ঘ। ভাল রাঁধুনী যদি কুকুর ছানার মাংস রন্ধন করে, তবে তাহা অমৃত বলিয়া গণ্য হয়। তত্রস্থ ইউরোপীয়েরাও কুকুর মাংসের অতিশয় প্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন যে, চীনদিগের ন্যায় রাঁধিলে হৃষ্ট পুষ্ট কুকুর-শাবক অতিশয় মিষ্ট লাগে।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বিরচিত—সৃষ্টি।

(২) শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ বিরচিত—সাংখ্য দর্শন।

দ্বিতীয় সংখ্যা পত্রিকার ৫৬ পৃষ্ঠার পর।

প্রথমে আরোহ-প্রণালী দ্বারা সৃষ্টি-তত্ত্বের কত দূর নিরাকরণ হইতে পারে তাহা দেখা যাউক, তাহার পরে অবরোহ-প্রণালী ধরা যাইবে। বিশেষ বিশেষ কার্য্যের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তাহা হইতে কোন সাধারণ নিয়ম আবিষ্কার করিতে পারিলেই আরোহ-প্রণালীর কার্য্যসিদ্ধি হয়। কোন কার্য্যের অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করিবামাত্র আমাদের মনে হয় যে, ইহা অবশ্য কোন না কোন নিয়মের অধীন। এখানে এইটি জানা আবশ্যক যে, কোন একটি বিশেষ অভিব্যক্তি সমর্থন করিতে পারিলেই যে নিয়মের নিয়মত্ব হয়, তাহা নহে; ঐ জাতীয় অভিব্যক্তি যেখানে যত আছে সর্ব্বত্রই তাহার বল পৌঁছান চাই তবেই তাহা নিয়ম নামের যোগ্য হয়। একটি ফল-পতনের নিয়ম শুদ্ধ কেবল সেই ফল-পতনেতেই বদ্ধ নহে, পরন্তু অসীম জগতের গতিবিধি সেই একই নিয়মে নিয়মিত হইতেছে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, নিয়মিত ঘটনা অপেক্ষা নিয়ম ব্যাপক। এই জন্য নিয়মিত ঘটনা হইতে নিয়মে উত্থান করা আর সংকীর্ণ দৃষ্টান্ত হইতে ব্যাপক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া একই কথা।

বিশেষ বিশেষ সৃষ্টির নিয়ম, সাধারণ হইতে সাধারণ সৃষ্টিতে, কিরূপে ব্যাপ্তি লাভ করে, ইহা দেখিয়া সর্ব্ব-সাধারণ সৃষ্টির নিয়ম নির্দ্ধারণ করা আরোহ-প্রণালীর কার্য্য। মনুষ্য-সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া পশ্বাদি সৃষ্টির নিয়ম নির্ণয় কর; পশ্বাদি সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া জীব-সৃষ্টির নিয়ম নিরূপণ কর; উদ্ভিদ্‌গণের জীবন আছে, এজন্য তাহাদিগকেও জীব-শ্রেণীর মধ্যে ধরা হইল। জীব-সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া, পৃথিবী-সৃষ্টির নিয়ম নির্দ্ধারণ কর, পৃথিবী-সৃষ্টির নিয়ম দেখিয়া সূর্য্য-সৃষ্টির নিয়ম নির্দ্ধারণ কর, সর্ব্বশেষে সাধারণতঃ সমুদায় সৃষ্টির নিয়ম কি তাহা অবধারণ কর, তাহা হইলে বলিব যে, তুমি আরোহ-প্রণালী অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিতেছ।

মনুষ্য জরায়ুর অভ্যন্তরে জন্মে, এই একটি নিয়ম পরীক্ষা-দ্বারা পাওয়া গেল; ইহা দেখিয়া পশুরাজ্যে সে নিয়মের ব্যাপ্তি আছে কি না, এই জিজ্ঞাসা উদয় হইল; তাহার পর পরীক্ষা দ্বারা পশুরাজ্যেও উক্ত নিয়মের ব্যাপ্তি নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু পক্ষীরা অণ্ডজ। তবে ত উক্ত নিয়মের ব্যাপ্তি পক্ষীতে সম্ভব হইতেছে না। প্রকারান্তরে হইতেছে। জরায়ু এবং অণ্ড একই,

প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে জরায়ু শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া জীব প্রসব করে; অণ্ড শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া জীব প্রসব করে। এই রূপ জানা গেল যে জরায়ুও অণ্ড-বিশেষ। সুতরাং মনুষ্য পশু পক্ষী সকলেই অণ্ডজ। এইরূপে ঐ বিশেষ নিয়মটিকে সাধারণ করিয়া গড়িয়া তোলা হইল। পক্ষী সরীসৃপ প্রভৃতি জন্তুরা যেন অণ্ডজ হইল। কিন্তু সমুদ্রতলে যে সকল আদিম জীব আছে, যাহারা জড় হইতে কেবল এক ধাপ উচ্চ বই নয়, তাহারা স্বেদজ। তবে কি এই খানে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যভিচার হইল! না তাহা নহে। অণ্ডের অভ্যন্তরে প্রথমে কেবল স্বেদই বর্ত্তমান থাকে। পরে তাহা দ্বিভাগ, চতুর্ভাগ, ষোড়শ ভাগ, এইরূপ অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া ক্রমশই সংহত হইতে সংহত ভাবে পরিণত হইয়া থাকে। অণ্ডগর্ভস্থ স্বেদের রাসায়নিক উপকরণ আর সমুদ্রতলস্থিত জীবোৎপাদক স্বেদের রাসায়নিক উপকরণ, উভয়ের মধ্যে জাতিগত কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। আরো আশ্চর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত স্বেদও যেমন খণ্ড খণ্ড হইয়া এক হইতে অনেক অঙ্গে পরিণত হয় সেই রূপ শেষোক্ত স্বেদও খণ্ড খণ্ড হইয়া এক জীব হইতে অনেক জীবে পরিণত হয়। এক স্বেদজ জীব দ্বিখণ্ড হইয়া দুই জীবে পরিণত হয়, তাহার প্রত্যেকে দ্বিখণ্ড হইয়া চারি জীবে পরিণত হয়, তাহার প্রত্যেকে দ্বিখণ্ড হইয়া ষোলো জীবে পরিণত হয়,এমনি করিয়া এক একটি স্বেদজ জীব অণ্ডগর্ভস্থ স্বেদের ন্যায় অনেক সংখ্যায় পরিণত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জরায়ু যেমন অণ্ড-বিশেষ, অণ্ড তেমনি স্বেদ-বিশেষ। অতএব মনুষ্য-হইতে ক্ষুদ্রতম কীট পর্য্যন্ত সকলই স্বেদজ; এই রূপ পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যাপ্তি আর এক গ্রাম উচ্চে উঠিল। অতীব নিকৃষ্ট জীব এবং অতীব নিকৃষ্ট উদ্ভিদ্ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এত অল্প যে, অনেক সময়ে জীবকে উদ্ভিদ্ এবং উদ্ভিদ্‌কে জীব বলিয়া ভ্রম হয়, এবং অনেক স্থলে কোন্‌টি জীব কোন্‌টি উদ্ভিদ্ উভয়ই বা জীব, উভয়ই বা উদ্ভিদ্, ইহার কিছুই মীমাংসা হইতে পারে না। অতীব নিকৃষ্ট জীবের ন্যায় অতীব নিকৃষ্ট উদ্ভিদ্‌ও স্বেদজ, এবং উৎকৃষ্ট জীবের ন্যায় উৎকৃষ্ট উদ্ভিদ্‌কে এক প্রকার অণ্ডজ বলিলেও বলা যায়। কেন না বিজ্ঞানের চক্ষে বীজ এবং অণ্ডের মধ্যে জাতি সাদৃশ্য স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। বীজের আদিম উপকরণ অণ্ডের আদিম উপকরণ, এবং জীবোৎপাদক স্বেদের উপকরণ সকলই একজাতীয়। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, জীব-রাজ্য এবং উদ্ভিদ্-রাজ্য সমস্ত ব্যাপিয়া এই এক নিয়ম বর্ত্তমান আছে যে, এক স্বেদ-পদার্থ বহুখণ্ডে বিভক্ত হইয়া হয় অনেক জীব অথবা অনেক উদ্ভিদ্ উৎপন্ন হয়, নয় উহা ঐরূপ বিভক্ত হইয়া এক-একটি জীব কিংবা উদ্ভিদের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়; আর অমনি সেই জীবস্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি রূপে জীব-একটি বা উদ্ভিদ্-একটি উৎপন্ন হয়। মনে করিও না যে উদ্ভিদ্ পর্য্যন্ত

ঐ নিয়মের ব্যাপ্তি হইলেই যথেষ্ট হইল; সমস্ত জীবজন্তুর আধার যে পৃথিবী তাহার উৎপত্তিও ঐ নিয়মের বশবর্ত্তী। প্রথমে এক সূর্য্য ছিল, তাহা হইতে তাহার কতক অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথিবী-রূপে পরিণত হইয়াছে। পৃথিবী দ্রবীভূত অবস্থায় সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, ইহা একটি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। যেমন অণ্ড-গর্ভস্থ স্বেদ বিভক্ত হইয়া-হইয়া জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়, সেইরূপ সূর্য্য এবং তাহার ছিন্নাংশ-সকল বিভক্ত হইয়া-হইয়া সৌর জগতের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পরিণত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে এই একটি ব্যাপক মূল নিয়ম পাওয়া যায় যে,এক হইতে অনেকে পরিণতি, একাকার হইতে বিভিন্নাকারে পরিণতি, এইরূপ নিয়মে সৃষ্টির মূল হইতে তাহার শাখা প্রশাখা উদ্ভূত হইয়া থাকে।

উপরে পাওয়া গেল এই যে, মনুষ্য-সৃষ্টির নিয়ম মনুষ্যেতেই বদ্ধ নহে, পরন্তু যখন মনুষ্য আদৌ জন্মে নাই সে সময়ে তাহা অপরাপর জীবজন্তু এবং উদ্ভিদ্ রাজ্যে প্রকারান্তরে বলবৎ ছিল। এবং তাহারাও যখন জন্মে নাই তখন তাহা প্রকারান্তরে সৌর জগতে বলবৎ ছিল। যখন সৌর জগৎও জন্মে নাই, যখন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আদি-ভূত সমস্ত-আকাশময় ব্যাপিয়া ছিল, তখনও উক্ত নিয়ম প্রকারান্তরে বলবৎ ছিল। উপরে যেমন দেখা গেল যে, কোন বিশেষ-সৃষ্টির নিয়ম সেই বিশেষ সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক, সেই রূপ নির্ব্বিশেষে বলা যাইতে পারে যে, সৃষ্টির নিয়ম সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক। প্রামাণিক পণ্ডিত বলেন যে, শুদ্ধ কেবল জগতের নিয়ম আবিষ্কার করিতে যত্নশীল হও। জগতের কারণ অন্বেষণ করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিও না। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, জগতের নিয়ম যাহা তুমি মান তাহা তোমার মনোরাজ্যে, না তোমার মনের বাহিরে কোথায় অবস্থিতি করিতেছে? যখন দেখা যাইতেছে যে, জগতের নিয়ম তোমার থাকা-না-থাকার উপর নির্ভর করে না, তুমি না থাকিলেও জগতের নিয়ম যেমন তেমনি থাকিবে; এবং যখন বাহ্যবস্তু সকলের পরীক্ষা হইতেই সে নিয়ম আবিষ্কার করিয়া পাওয়া যাইতে পারে তাহাকে মন হইতে উদ্ভাবন করিয়া পাওয়া যায় না, তখন সে নিয়ম আমাদের মনের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে তাহাতে আর সংশয় নাই। অতঃপর জিজ্ঞাস্য এই যে, কার্য্যের অভিব্যক্তি অগ্রে না তাহার নিয়ম অগ্রে? যখন কোন কার্য্য অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহা কোন না কোন নিয়মানুসারেই অভিব্যক্ত হয়; সুতরাং কার্য্য অভিব্যক্তির পূর্ব্বে তাহার নিয়ম সুস্থির থাকা চাই। অতএব দুইটী কথা সুনিশ্চিত—প্রথম জগতের নিয়ম আমাদের মনের বাহিরে; দ্বিতীয়, অগ্রে নিয়ম পরে কার্য্যের অভিব্যক্তি। নিয়ম-সম্বন্ধে আর একটি কথা জিজ্ঞাস্য এই যে, নিয়মের কোন বল আছে কি না? যদি বল, বল নাই, তবে তাহার আছে কি? নিয়ম দ্বারা কার্য্য হয় অথচ তাহার বল নাই, এ কথাই বা

কিরূপ। যে রাজার কোন বল নাই, সে রাজার নিয়মে কি কোন কার্য্য হয়? অতএব নিয়মের সঙ্গে বলেরও যোগ আছে। নিয়মের সঙ্গে যদি বলের যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তবে কারণ-শব্দের অর্থ, এবং নিয়ম-শব্দের অর্থ একই হইয়া দাঁড়ায়। যদি বল যে, নিয়মের বল আছে ইহাই আমি নিশ্চিত বলিয়া মানি, কিন্তু কারণের অস্তিত্বের কিছুই নিশ্চয়তা নাই; তবে তুমি একটা আতা ফল হস্তে করিয়া ইহাও বলিতে পার যে, দেখ আমি একটা আম্র ফল পাইয়াছি; ইহার গা দাগ্‌ড়া দাগ্‌ড়া; ইহার সাদা শাঁস এবং অনেক গুলি কালো কালো বীজ, ইত্যাদি। এরূপ আম্রফলকে আতা ফল বলিলেই ত ভাল হয়।

জগতের নিয়ম আমাদের মনের বাহিরে; তাহা আমাদের ইন্দ্রিয় গোচর নহে; তাহা সাক্ষী-গোপালের ন্যায় নিষ্কর্ম্মাও নহে তাহার বলে জগৎকার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে; এই রূপ, কারণের যত গুলি উপাধি আছে, সকল-গুলিই নিয়মেতে আরোপিত হইল, আতা ফলের যত-গুলি উপাধি আছে সকল-গুলিই আম্রফলে আরোপিত হইল, অথচ আমি এই একটি কোট ধরিয়া বসিলাম যে, আমি নিয়মই বলিব, কারণ শব্দ মুখে উচ্চারণ করিব না; আম্র ফলই বলিব আতাফল কোন মতেই বলিব না; এরূপ করিলে কারণেরও গৌরব-হানি হইবে না, নিয়মেরও গৌরব-বৃদ্ধি হইবে না; আতাফলেরও গৌরব-হানি হইবে না, আম্রফলেরও গৌরব-বৃদ্ধি হইবে না; হইবে কেবল একটা শব্দের পরিবর্ত্তন, আর কিছুই নহে। এরূপ শব্দ-পরিবর্ত্তনের না আছে অর্থ, না আছে হেতু, না আছে ফল, কেবল অনর্থক একটা গণ্ডগোল মাত্রই সার। অতএব "কারণ মানিব না" এ প্রতিজ্ঞা কোন কার্য্যের নহে। যদি তুমি নিয়মের বল মানিলে তবে আর কারণ মানিবার বাকি কি রহিল? যাহার বলে কার্য্য হয় তাহার নামই কারণ। "কারণ মানিব না" তোমার এ প্রতিজ্ঞা একত রক্ষা পাইল না, তাহাতে আবার নিয়মকে বল-বিশিষ্ট একটা বস্তুর ন্যায় করিয়া গড়িয়া তোলা হইল; একি সৃষ্টিছাড়া অসঙ্গত ব্যাপার! নিয়ম শূন্যে আছে এবং তাহার বল আছে এই রূপ একটা অদ্ভুত প্রকারের কারণ খাড়া করিতেছ, অথচ শক্তি-বিশিষ্ট বস্তু যাহা সম্ভবপর কারণ, তাহা মানিতে ভার বোধ করিতেছ। শূন্যের উপরে গন্ধর্ব্ব-নগর স্থাপন করিতেছ, অথচ পৃথিবীর কোন প্রদেশে যে নগর স্থাপন হইতে পারে ইহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছ না।

সে যাহা হউক আমরা নিয়মকে কারণ বলিতেও প্রস্তুত নহি, আর নিয়ম কোন বস্তুর অবলম্বন ছাড়িয়া শূন্যে শূন্যে ফিরে, ইহা বলিতেও প্রস্তুত নহি; শক্তিমান বস্তুকেই আমরা কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকি। এরূপ মূলতত্ত্ব সকল সহজে বুঝিলে অতি সহজ, নচেৎ কেবল শব্দের দ্বন্দ্ব কোলাহলই যথাসর্ব্বস্ব।

অগ্রে নিয়ম পরে কার্য্য অভিব্যক্তি ইহা, বুঝিলে সহজেই বুঝা যায়, কিন্তু

না বুঝিলে বুঝান সহজ নহে। মনে কর আমি কোন চিকিৎসকের নিকট শুনিলাম যে, প্রত্যূষে পদচারণা করিয়া বেড়াইলে শরীর খুব ভাল থাকে। তদবধি এই রূপ নিয়ম করিলাম যে, কল্য হইতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে বেড়াইতে বাহির হইব। তাহার পর নিয়মিত রূপে সেই রূপ কার্য্য করিতে লাগিলাম। সহস্র প্রামাণিক পণ্ডিত হইলেও এখানে কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, অগ্রে নিয়ম পরে কার্য্য-অভিব্যক্তি। এক জন ফরাসিস্ তত্ত্বজ্ঞানী নিজের সম্বন্ধে ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যদি নিয়ম করা যায় যে, আমি অমুক সময়ে গাত্রোত্থান করিব তাহা হইলে ঠিক সেই সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইবে। এইরূপ স্থলবিশেষে আমাদের অজ্ঞাত-সারেও আমাদের কৃত নিয়ম-সকল কার্য্যকারী হয়। পুনশ্চ "প্রত্যহ অমুক সময়ে গাত্রোত্থান করিব" এই নিয়মটি যদি কিছুদিন পালন করি, তাহা হইলে ইচ্ছা-পূর্ব্বক সে নিয়ম পুনর্ব্বার স্থিরী-কৃত না হইলেও অভ্যাস বশতঃ তাহা আমাদের অজ্ঞাতসারে কার্য্য করিবে। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, মানসিক নিয়ম অগ্রে, এবং সে নিয়মানুযায়ী যে কার্য্য হয় তাহা তাহার পরে। সে কার্য্য ঘটিবার পূর্ব্ব হইতেই সে নিয়ম বর্ত্তমান; কোথায় বর্ত্তমান? না সে কার্য্যের কারণ যে আমাদের মন সেই মনেতে। প্রামাণিক পণ্ডিত এখন বলিবেন যে, মানসিক নিয়ম ঐ রূপ বটে কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম আর প্রাকৃতিক ঘটনা এ দুয়ের মধ্যে ওরূপ অগ্র-পশ্চাদ্ভাব না থাকিতে পারে। তাঁহার এ কথা তাঁহার আর আর অনেক কথার ন্যায় কেবল একটা বল-প্রকাশ-মাত্র, যুক্তির সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। এই একটি প্রাকৃতিক নিয়ম যে, জলজনন বাষ্প এবং অম্লজনন বাষ্প দুয়ের বিধিমত যোগ হইলে জল উৎপন্ন হয়। জলোৎপত্তি রূপ যে একটি কার্য্য তাহা ঐ নিয়ম সাপেক্ষ। জল যখন উৎপন্ন হয় নাই তখন সে নিয়ম ছিল, জল যখন উৎপন্ন হয় তখন সেই নিয়মানুসারেই উৎপন্ন হয়। জলজনন বাষ্প এবং অম্লজনন বাষ্প, দুয়ের সংযোগে একটা হাতিও হইতে পারিত, ঘোড়াও হইতে পারিত, তাহা না হইয়া কেবল যে, জলই উৎপন্ন হইবে, এ নিয়ম কোথা হইতে আইল? অবশ্য জলজনন বাষ্প এবং অম্লজনন বাষ্প, উভয়ের প্রকৃতি হইতে। জলের কারণ যে অম্লজনন এবং জল-জনন বাষ্প, উভয়ের প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ঐ নিয়ম বর্ত্তিতেছে। ইহা যদি না মানো তবে ও-নিয়ম কোথায় বর্ত্তিতেছে? শূন্য আকাশে? জড়-বস্তু যেমন আকাশ ব্যাপিয়া স্থিতি করে, নিয়মও কি সেইরূপ? নিয়ম কি জড় পিণ্ডবৎ একটা সামগ্রী? অতএব জলোৎপত্তি বা অন্য কোন প্রকার প্রাকৃতিক কার্য্য-অভিব্যক্তির পূর্ব্বে তদীয় নিয়ম তাহার কারণাভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকে ইহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই।

সহজে এটি সকলেরই বোধ-গম্য হইতে পারে যে, যে কোন কার্য্য হউক না, তাহার

অভিব্যক্তির নিয়ম তাহা অপেক্ষা ব্যাপক; এই হেতু কোন কার্য্য-বিশেষ অবলম্বন করিয়া নিয়ম বর্ত্তিতে পারে না, কার্য্যের যে কারণ তাহাকে অবলম্বন করিয়াই নিয়ম স্থিতি করে। মনুষ্য-সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে মনুষ্য-সৃষ্টির নিয়ম বর্ত্তমান ছিল। কোথায় বর্ত্তমান ছিল? কারণেতে। যখন মনুষ্য সৃষ্ট হইল, তখন সে নিয়ম কার্য্যেতে প্রতিভাত হইল। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, নিয়ম কেবল যে কার্য্য-পরিসরের মধ্যেই বদ্ধ থাকে এমন নহে, কারণ পর্য্যন্ত তাহার ব্যাপ্তি। কার্য্য কারণ উভয় ব্যাপিয়া নিয়ম অবস্থিতি করে। কারণেরও কারণ আছে; যে যুক্তিতে কার্য্য হইতে কারণে নিয়মের ব্যাপ্তি মানিতে হইতেছে সেই যুক্তিতে কারণ হইতে তাহারও কারণে নিয়মের ব্যাপ্তি মানিতে হইবে। সুতরাং কার্য্য-কারণ শৃঙ্খলার আদ্যন্ত সর্ব্বত্রই নিয়মের ব্যাপ্তি মানিতে হইবে। অতএব সেই সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আদিভূত, সাংখ্যদর্শন যাহাকে ভূতাদি বলিয়াছেন, ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকেরা যাহাকে ঈথর্ বলিয়াছেন, বেদান্ত যাহাকে আকাশ বলিয়াছেন, সৃষ্টির নিয়ম সেই আদিভূত হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে, জীবজন্তু উদ্ভিদ্ সৃষ্টির পূর্ব্বে, পৃথিবী-সৃষ্টির পূর্ব্বে, সূর্য্য-সৃষ্টির পূর্ব্বে অসীম আকাশ-ব্যাপী যে ভূতাদি তাহার সহিত সৃষ্টির নিয়ম বর্ত্তমান ছিল। এই খানে আরোহ-প্রণালী চরম-সীমায় উপনীত হইল, আরোহ-প্রণালী ইহা অপেক্ষা আর উচ্চে উঠিতে পারে না। যেমন চক্রের অন্তর্ভূত ত্রিকোণ চতুষ্কোণাদি ফলকের কোণ-সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় ততই তাহা চক্রের নিকটবর্ত্তী হয়, কিন্তু উক্তরূপ কোণ বৃদ্ধি-প্রণালীদ্বারা উহা কোন কালেই চক্রের সহিত একীভূত হইতে পারে না; সেই রূপ আরোহ-প্রণালীদ্বারা স্থূল সৃষ্টি হইতে সূক্ষ্ম সৃষ্টিতে যতই আরোহণ করা যায়, ততই সৃষ্টির আদি-কারণের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় বটে কিন্তু সে প্রণালীতে কোন কালেই সেখানে পৌঁছিতে পারা যায় না। এই জন্যই অবরোহ প্রণালীর প্রয়োজন। আদিভূত যতই কেন সূক্ষ্ম হউক না, কিন্তু আত্মা তাহা অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। যদি বল যে তাহার প্রমাণ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, আত্মা আপনি আপনার প্রমাণ। বলিয়াছি এই যে, বহির্জগতে সত্য বহুধা বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে এজন্য তথাকার কোন একটি সত্যের প্রমাণ দিতে হইলে অন্য আর একটি বা ততোধিক সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। পৃথিবী গোল এই সত্যটির প্রমাণ দিতে হইলে জাহাজের মাস্তুর দিগন্ত রেখায় ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া যায়, এই আর একটি সত্যের সহায়তা আবশ্যক হয়। প্রত্যুত আত্মাতে সত্য এমনি প্রগাঢ়রূপে ওতপ্রোত রহিয়াছে যে, তাহা সহজ অনুভব ভিন্ন অন্য কোন প্রমাণের অপেক্ষা করে না। বহির্জগতে সত্য বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে বলিয়া তথায় একাধিক প্রমাণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আত্মাতে সত্য প্রগাঢ় ভাবে রহিয়াছে বলিয়া, একমাত্র

স্বানুভূতি ভিন্ন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। * * * * * * * * স্বানুভূতিকে আমরা প্রমাণের পরাকাষ্ঠা বলিয়া স্বীকার করি। যেখানে স্বানুভূতি সম্ভবে না, সেই খানেই অন্য প্রকার প্রমাণ দর্শান আবশ্যক হয়। যেমন জ্বলন্ত প্রদীপকে দেখিবার জন্য দ্বিতীয় প্রদীপ আবশ্যক হয় না, তেমনি আত্মাকে জ্ঞানায়ত্ত করিতে হইলে দ্বিতীয় কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না; আত্মা আপনিই আপনার প্রমাণ।

ক্রমশঃ।

মেঘনাদ-বধ কাব্য।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।)

গত সংখ্যার সমালোচনা পড়িয়া কেহ কেহ কহিতেছেন, পুরাণে লক্ষ্মী চপলা বলিয়াই বর্ণিত আছেন। কবি যদি পুরাণেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন তাহাতে হানি কি হইয়াছে? তাঁহাদের সহিত একবাক্য হইয়া আমরাও স্বীকার করি যে, লক্ষ্মী পুরাণে চপলা রূপেই বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু চপলা অর্থে কি বুঝায়? আজ আছেন, কাল নাই। পুরাণ লক্ষ্মীকে চপলা অর্থে এরূপ মনে করেন নাই, যে আমারই পূজা গ্রহণ করিবেন অথচ আমার বিরুদ্ধেই ষড়যন্ত্র করিবেন। এ লুকাচুরি, কেবল দেবতা নহে মানব চরিত্রের পক্ষেও কত খানি অসম্মান-জনক তাহা কি পাঠকেরা বুঝিতে পারিতেছেন না? কপটতা ও চপলতা দুইটি কথার মধ্যে যে অর্থগত প্রভেদ আছে ইহা বোধ হয় আমাদের নূতন করিয়া বুঝাইতে হইবে না। মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর চরিত্র মধ্যে দুইটি দোষ আছে, প্রথম কপটতা, দ্বিতীয় পরস্পর বিরোধী ভাব। গুপ্ত ভাবে রাবণের শত্রুতা সাধন করাতে কপটতা এবং কখন ভক্ত বৎসলতা দেখান ও কখন তাহার বিপরীতাচরণ করাতে পরস্পর-বিরোধী ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পাঠকেরা কেহ যদি লক্ষ্মীর পূর্ব্বোক্তরূপ হীন চরিত্র পুরাণ হইতে বাহির করিতে পারেন তবে আমরা আমাদের ভ্রম স্বীকার করিব। কিন্তু যদিওবা পুরাণে ঐরূপ থাকে তথাপি কি রুচিবান কবির নিকট হইতে তাহা অপেক্ষা পরিমার্জ্জিত চিত্র আশা করি না?

প্রথম সর্গে যখন ইন্দিরা ইন্দ্রজিতকে তাঁহার ভ্রাতার নিধন সংবাদ শুনাইলেন তখন

"ছিঁড়িলা কুসুম দাম রোষে মহাবলী
মেঘনাদ, ফেলাইলা কনক বলয়
দূরে, পদতলে পড়ি শোভিলা কুণ্ডল,
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে
আভাময়! "ধিক্‌মোরে" কহিলা গম্ভীরে
কুমার, "হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে

স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে?
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি;
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।"

ইন্দ্রজিতের তেজস্বিতা উত্তম বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ যখন ইন্দ্রজিতকে রণে পাঠাইতে কাতর হইতেছেন তখন

উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি রিপু;—
"কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি,
রাজেন্দ্র? থাকিতে দাস, যদি যাও রণে
তুমি, একলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে।
হাসিবে মেঘ বাহন, রুষিবেন দেব অগ্নি।"

ইহাতেও ইন্দ্রজিতের তেজ প্রকাশিত হইতেছে, এই রূপে কবি ইন্দ্রজিতের বর্ণনা যেরূপ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা ভাল লাগিল।

"সাজিলা রথীন্দ্রর্ষভ বীর আভরণে,
* * * *
মেঘবর্ণ রথ, চক্র বিজলীর ছটা;
ধ্বজ ইন্দ্রচাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে
আশুগতি।"

পূর্ব্বে কবি স্নোদনের সহিত ঝড়ের যেরূপ অদ্ভুত তুলনা ঘটাইয়াছিলেন এখানে সেই রূপ রথের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত মেঘ বিদ্যুত ইন্দ্রধনু বায়ুর তুলনা করিয়াছেন, কাব্যের মধ্যে এরূপ তুলনার অভাব নাই কিন্তু একটিও আমাদের ভাল লাগে না। বর্ণনীয় বিষয়কে অধিকতর পরিস্ফুট করাইত তুলনার উদ্দেশ্য কিন্তু এই মেঘ বিজলী ইন্দ্রচাপে আমাদের রথের যে কি বিশেষ ভাবোদয় হইল বলিতে পারি না। মেঘনাদবধের অধিকাংশ রচনাই কৌশলময়, কিন্তু কবিতা যতই সরল হয় ততই উৎকৃষ্ট। রামায়ণ হোমার প্রভৃতি মহাকাব্যের অন্যান্য গুণের সহিত সমালোচকেরা তাহাদিগের সরলতারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

"মানস সকাশে শোভে কৈলাস-শিখরী
আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন,
শিখি-পুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে!
সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণফুল শ্রেণী
শোভে তাহে, আহা মরি পীতধড়া যেন!
নির্ঝর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে—
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপুঃ!"

যে কৈলাস-শিখরী চূড়ায় বসিয়া মহাদেব ধ্যান করিতেছেন কোথায় তাহা উচ্চ হইতেও উচ্চ হইবে, কোথায় তাহার বর্ণনা শুনিলে আমাদের গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, নেত্র বিস্ফারিত হইবে, না "শিখি-পুচ্ছ-চূড়া যথা মাধবের শিরে।" মাইকেল ভাল এক মাধব শিখিয়াছেন, এক শিখি-পুচ্ছ, পীতধড়া, বংশীধ্বনি আর রাধাকৃষ্ণ কাব্যময় ছড়াইয়াছেন। কৈলাস-শিখরের ইহা অপেক্ষা আর নীচ বর্ণনা হইতে পারে না। কোন কবি ইহা অপেক্ষা কৈলাস-শিখরের নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না।

"শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদী;
তারা কিরীটিনী নিশি সদৃশী আপনি
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্রুবারি ধারা
শিশির, কপোল পর্ণে পড়িয়া শোভিল।"

এই সকল টানিয়া বুনিয়া বর্ণনা আমাদের কর্ণে অসম-ভূমি-পথে বাধা-প্রাপ্ত রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দের ন্যায় কর্কশ লাগে।

"গজরাজ তেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে;
স্বর্ণরথ শিরঃ চূড়া; অঞ্চল পতাকা
রত্নময়; ভেরী তূরী, দুন্দুভি, দামামা
আদি বাদ্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি,
তোমর, ভোমর, শূল, মুষল, মুদ্গার,
পট্টিশ, নারাচ কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে!
জনমিলা নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে।"

পাঠকেরা বলুন্ দেখি এরূপ বর্ণনা সময়ে সময়ে হাস্য-জনক হইয়া পড়ে কি না!

যখন মেঘনাদ রথে উঠিতেছেন তখন প্রমীলা আসিয়া কাঁদিয়া কহিলেন,

"কোথায় প্রাণ সখে,
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি?
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে,
ব্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া মাতঙ্গ
যায় চলি, তবু তারে রাখে পদাশ্রমে
যূথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?"

হৃদয় হইতে যে ভাব সহজে উৎসারিত উৎস-ধারার ন্যায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে তাহার মধ্যে কৃত্রিমতা বাক্য কৌশল প্রভৃতি থাকে না। প্রমীলার এই "রঙ্গ রসের" কথার মধ্যে গুণপনা আছে, বাক্য-চাতুরীও আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নাই।

ইহার সহিত একটি স্বভাব-কবি-রচিত সহজ হৃদয়-ভাবের কবিতার তুলনা করিয়া দেখ, যখন অক্রূর কৃষ্ণকে রথে লইতেছেন, তখন রাধা বলিতেছেন,

"রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ,
কি দোষ রাধার পাইলে?
শ্যাম, ভেবে দেখ মনে, তোমারি কারণে
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী।
নাহি অন্য ভাব, শুনহে মাধব
তোমারি প্রেমের প্রয়াসী।
ঘোরতর নিশি, যথা বাজে বাঁশি,
তথা আসি গোপী সকলে,
দিয়ে বিসর্জ্জন কুল শীলে।
এতেই হলাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি
এই দোষে কিহে ত্যজিলে?
শ্যাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি,
থাক হরি যথা সুখ পাও।
এক বার, সহাস্য বদনে, বঙ্কিম নয়নে
ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও।
জনমের মত, শ্রীচরণ দুটি,
হেরিছে নয়নে শ্রীহরি,
আর হেরিব আশা না করি।
হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার
হৃদে বজ্র হানি চলিলে?" হরুঠাকুর

ইহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী নাই, কৃত্রিমতা নাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া গড়িয়া পিটিয়া ঘর হইতে রাধা উপমা ভাবিয়া আইসেন নাই, সরল হৃদয়ের কথা নয়নের অশ্রুজলের ন্যায় এমন সহজে বাহির হইতেছে যে, কৃষ্ণকে তাহার অর্থ বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় নাই, আর মাতঙ্গ, ব্রততী, পদাশ্রম, রঙ্গরস প্রভৃতি কথা ও উপমার জড়ামড়িতে প্রমীলা হয়ত ক্ষণেকের জন্য ইন্দ্রজিৎকে ভাবাইয়া তুলিয়াছিলেন।

ইন্দ্রজিতের উত্তর সেই রূপ কৃত্রিমতা-

ময়, কৌশলময়, ঠিক যেন প্রমীলা খুব এক কথা বলিয়া লইয়াছেন, তাহার ত একটা উপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে, এই জন্য কহিতেছেন,

"ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি,
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে
সে বাঁধে" ইত্যাদি।

সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-ময় কথা অতি অল্পই আছে, প্রায় সকল গুলিই কৌশলময়। ৩য় সর্গে যখন প্রমীলা রামচন্দ্রের কটক ভেদ করিয়া ইন্দ্রজিতের নিকট আইলেন তখন ইন্দ্রজিৎ কহিলেন

"রক্তবীজে বধি তুমি এবে বিধুমুখী,
আইলা কৈলাস ধামে" ইত্যাদি

প্রমীলা কহিলেন

"ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভববিজয়িনী
দাসী, কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে।
অবহেলি শরানলে, বিরহ অনলে
(দুরূহ) ডরাই সদা ;" ইত্যাদি—

যেন স্ত্রীপুরুষে ছড়া-কাটাকাটি চলিতেছে। পঞ্চম সর্গের শেষ ভাগে পুনরায় ইন্দ্রজিতের অবতারণা করা হইয়াছে।

"কুসুম শয়নে যথা সুবর্ণ মন্দিরে,
বিরাজে রাজেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কূজন ধ্বনি সে সুখ সদনে।
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জ বন গীতে।
প্রমীলার করপদ্ম করপদ্মে ধরি
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায়রে, যেমতি
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে
চুম্বি নিমীলিত আঁখি) "ডাকিছে কূজনে,
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে
পাখীকুল! মিল প্রিয়ে, কমল-লোচন।
উঠ, চিরানন্দ মোর, সূর্য্যকান্ত মণি-
সম এ পরাণ কান্তা, তুমি রবিচ্ছবি ;—
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন।
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমিহে জগতে
আমার! নয়ন তারা! মহার্হ রতন।
উঠি দেখ শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে,
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে
কুসুম!" ইত্যাদি

এই দৃশ্যে মেঘনাদের কোমলতা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলার নিকট হইতে ইন্দ্রজিতের বিদায়টি সুন্দর হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাক্‌চাতুরী কিছুমাত্র নাই। কিন্তু আবার একটি যথা আসিয়াছে

"যথা যবে কুসুমেষু ইন্দ্রের আদেশে
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে,
ভাঙ্গিতে শিবের ধ্যান ; হায়রে, তেমতি
চলিলা কন্দর্প রূপী ইন্দ্রজিৎ বলী,
ছাড়িয়া রতি প্রতিমা প্রমীলা সতীরে।
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন ; কুলগ্নে
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী—
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী।"
ইত্যাদি।

বলপূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎকে মদন ও প্রমীলাকে রতি করিতেই হইবে। রতির ন্যায় প্রমীলাকে ছাড়িয়া মদনের ন্যায় ইন্দ্রজিৎ চলিলেন, মদন কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎও তাহাই করিলেন তখন মদন ও ইন্দ্রজিৎ একই মিলিয়া গেল, আর রতিও কাঁদিয়াছিলেন, রতিরূপিণী

প্রমীলাও কাঁদিলেন, তবেত রতি আর প্রমীলায় কিছুমাত্র ভিন্নতা রহিল না।

আবার আর একটি কৃত্রিমতাময় রোদন আসিয়াছে, যখন ইন্দ্রজিৎ গজেন্দ্র-গমনে যুদ্ধে যাইতেছেন তখন প্রমীলা তাঁহাকে দেখিতেছেন আর কহিতেছেন,—

"জানি আমি কেন তুই গহন কাননে
ভ্রমিস্‌রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি,
অভিমানী? সরু মাঝা তোররে কে বলে,
রাক্ষস-কুল-হর্য্যক্ষে হেরে যার আঁখি,
কেশরি? তুইও তেঁই সদা বনবাসী।
নাশিস্‌ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী
ভীম প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে," ইত্যাদি

এই কি হৃদয়ের ভাষা? হৃদয়ের অশ্রু জল? হেমবাবু কহিয়াছেন "বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল ভারতচন্দ্র রচিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তর্দাহ হয়, হৃৎকম্প হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে কই?" সত্য ভারতচন্দ্রের ভাষা কৌশলময়, ভাবময় নহে, কিন্তু "জানি আমি কেন তুই" ইত্যাদি পড়িয়া আমরা ভারতচন্দ্রকে মাইকেলের নিমিত্ত সিংহাসনচ্যুত করিতে পারি না। তাহার পরে প্রমীলা যে ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুবর্ণনা, লক্ষ্মণের চরিত্র-সমালোচনা স্থলে আলোচিত হইবে।

মেঘনাদ বধ কাব্যের মধ্যে এই ইন্দ্রজিতের চরিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাঁহাতে একাধারে কোমলতা বীরত্ব উভয় মিশ্রিত হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ-যাত্রার সময় আমরা প্রথমে প্রমীলার দেখা পাই, কিন্তু তখন আমরা তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, তৃতীয় সর্গে আমরা প্রমীলার সহিত বিশেষ রূপে পরিচিত হই। প্রমীলা পতি-বিরহে রোদন করিতেছেন।

"উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে।
সিহরি প্রমীলা সতী, মৃদুকল স্বরে,
বাসন্তী নামেতে সখি বসন্ত সৌরভা
তার গলা ধরি কাঁদি কহিতে লাগিলা;
"ওই দেখ আইল লো তিমির যামিনী,
কাল ভুজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে,
বাসন্তি! কোথায় সখি, রক্ষঃকুলপতি,
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তিকালে?"
ইত্যাদি

পূর্ব্বে কি বলি নাই মেঘনাদবধে হৃদয়ের কবিতা নাই, ইহার বর্ণনা সুন্দর হইতে পারে, ইহার দুই একটি ভাব নূতন হইতে পারে, কিন্তু কবিতার মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি অল্প। আমরা অনেক সময়ে অনেক প্রকার ভাব অনুভব করি, কিন্তু তাহার ক্রমানুযায়ী শৃঙ্খলা খুঁজিয়া পাই না, অনুভব করি অথচ কেন হইল কি হইল কিছুই ভাবিয়া পাই না, কবির অনুবীক্ষণী কল্পনা তাহা আবিষ্কার করিয়া আমাদের দেখাইয়া দেয়। হৃদয়ের প্রত্যেক তরঙ্গ প্রতিতরঙ্গ যাঁহার কল্পনার নেত্র এড়াইতে পারে না তাঁহাকেই কবি বলি। তাঁহার রচিত হৃদয়ের গীতি আমাদের হৃদয়ে চিরপরিচিত সঙ্গীত ন্যায় প্রবেশ করে। প্রমীলার বিরহ উচ্ছ্বাস আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে তেমন আঘাত

করে না ত, কাল ভুজঙ্গিনী-স্বরূপ তিমির-যামিনীর কাল, চন্দ্রমার অগ্নি-কিরণ ও মলয়ের বিষজ্বালাময় কবিতার সহিত অস্তমিত হইয়াছে।

প্রমীলা বাসন্তীকে কহিলেন—

"চল, সখি, লঙ্কা পুরে যাই মোরা সবে।"

বাসন্তী কহিল——"কেমনে পশিবে
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর
সম রাঘবীয় চমূ বেড়িছে তাহায়?"
"রুষিলা দানব বালা প্রমীলা রূপসী!
"কি কহিলি, বাসন্তি? পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?
দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃ কুলবধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,—
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?
পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভুজ বলে,
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি?"

এখানটি অতি সুন্দর হইয়াছে, তেজস্বিনী প্রমীলা আমাদের চক্ষে অনলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন।

তৎপরে প্রমীলার যুদ্ধযাত্রার উপকরণ সজ্জিত হইল। মেঘনাদবধের যুদ্ধসজ্জা বর্ণনা, সকলগুলিই প্রায় একই প্রকার। বর্ণনাগুলিতে বাক্যের ঘনঘটা আছে, কিন্তু "বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জ্বল" ভাবচ্ছটা কই? সকল গুলিতেই "মন্দুরায় হ্রেসে অশ্ব" "নাদে গজ বারী মাঝে" "কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা" ভিন্ন আর কিছুই নাই।

"চড়িল ঘোড়া একশত চেড়ি
* * * * *
* * হেষিল অশ্ব মগন হরষে
দানব দলনী পদ্ম পদযুগ ধরি
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি!"

শেষ দুই পংক্তিটি আমাদের বড় ভাল লাগিল না; একত কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া বিরূপাক্ষ নাদেন একথা কোন শাস্ত্রে পড়ি নাই। দ্বিতীয়তঃ কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়া মহাদেব চীৎকার করিতে থাকেন এ ভাবটি অতিশয় হাস্যজনক। তৃতীয়তঃ "নাদেন" শব্দটি আমাদের কাণে ভাল লাগে না। প্রমীলা সখীবৃন্দকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন—

"—লঙ্কা পুরে, শুন লো দানবী
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দীসম এবে।
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে?
যাইব তাঁহার পাশে, পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে;—এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে!
দানব কুল সম্ভবা আমরা, দানবী;—
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষত শোণিত নদে নতুবা ডুবিতে!
অধরে ধরিলো মধু গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে?
চল সবে রাঘবের হেরি বীর-পনা।
দেখিব যে রূপ দেখি সূর্পনখা পিসী
মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে;" ইত্যাদি

প্রমীলা লঙ্কায় যাউন্ না কেন, বিকট কটক কাটিয়া রঘুশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করুন্ না কেন, তাহাতে ত আমাদের কোন আ-

পত্তি নাই, কিন্তু স্বর্পনখা পিসির মদন-মদের কথা, নয়নের গরল, অধরের মধু লইয়া সখীদের সহিত ইয়ার্কি দেওয়াটা কেন? যখন কবি বলিয়াছেন

"কি কহিলি বাসন্তি? পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি?"

যখন কবি বলিয়াছেন—"রোষে লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজস্বিনী প্রমীলা।"

তখন আমরা যে প্রমীলার জ্বলন্ত অনলের ন্যায় তেজোময় গর্ব্বিত উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম, এই হাস্য পরিহাসের স্রোতে তাহা আমাদের মন হইতে অপসৃত হইয়া যায়। প্রমীলা এই যে চোক্ ঠারিয়া মুচকি হাসিয়া ঢল ঢল ভাবে রসিকতা করিতেছেন, আমাদের চক্ষে ইহা কোন মতে ভাল লাগে না!

একে বারে শত শঙ্খ ধরি
ধ্বনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনু
স্ত্রীবৃন্দ, কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে;
পর্ব্বত গহ্বরে সিংহ; বন হস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত।

সুন্দর হইয়াছে। পশ্চিম দুয়ারে যাইতেই হনু গর্জ্জিয়া উঠিল। অমনি "নৃমুণ্ড মালিনী সখি (উগ্রচণ্ডা ধনী)" রোষে হুঙ্কারিয়া সীতানাথকে সংবাদ দিতে কহিলেন। হনুমান অগ্রসর হইয়া সভয়ে প্রমীলাকে দেখিল, এবং মনে মনে কহিল

"অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, উতরিনু যবে
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে,
প্রচণ্ডা খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী।
দানব নন্দিনী যত মন্দোদরী আদি
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে।
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ কুল-বধূ
(শশিকলা সম রূপে) ঘোর নিশাকালে,
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে।
দেখিনু অশোক বনে (হায় শোকাকুলা)
রঘুকুল কমলেরে,—কিন্তু নাহি হেরি
এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে।

ভয়ঙ্করী ভীমা প্রচণ্ডা খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী এবং রক্ষঃকুলবালাদল শশিকলা সমরূপে, অশোক বনে শোকাকুল রঘুকুল-কমল, পাশাপাশি বসিতে পারে না, কবির যদি প্রমীলাকে ভয়ঙ্করী করিবার অভিপ্রায় ছিল, তবে শশিকলাসম রূপবতী রক্ষঃ-কুলবালা এবং রঘুকুলকমলকে ত্যাগ করিলেই ভাল হইত। কিম্বা যদি তাঁহাকে রূপমাধুরী-সম্পন্না করিবার ইচ্ছা ছিল তবে খর্পর খণ্ডা হস্তে মুণ্ডমালীকে পরিত্যাগ করাই উচিত ছিল।

প্রমীলা রামের নিকট নৃমুণ্ডমালিনী-আকৃতি নৃমুণ্ডমালিনীকে দূতী স্বরূপে প্রেরণ করিলেন,

"চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে,
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে
হেরি অগ্নি শিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী
মনে মনে। এক দৃষ্টে চাহে বীর যত
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে।
বাজিল নূপুর পায়ে কাঞ্চি কটি দেশে।

ভীমাকার শূল করে, চলে নিতম্বিনী
জর জরি সর্ব্ব জনে কটাক্ষের শরে
তীক্ষ্ণতর।"

আমরা ভয়ে জড় সড় হইব, না কটাক্ষে জর জর হইব এই এক সমস্যায় পড়িলাম।

"নব মাতঙ্গিনী গতি চলিলা রঙ্গিনী,
আলো করি দশ দিশ, কৌমুদী যেমতি,
কুমুদিনী সখী, ঝলে বিমল সলিলে,
কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরি শৃঙ্গ মাঝে।"

নৃমুণ্ডমালিনী আকৃতি উগ্রচণ্ডাধনীও বিমল-কৌমুদী ও অংশুময়ী উষা হইয়া দাঁড়াইল! এবং এই অংশুময়ী উষা ও বিমল কৌমুদীকেই দেখিয়া প্রফুল্ল না হইয়া রামের বীর সকল দড়ে রড়ে জড় সড় হইয়া গিয়াছিল।

"হেন কালে হনু সহ উতরিলা দূতী
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি পুটে,
(ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে)
কহিলা——————"

উগ্রচণ্ডাধনী কথা কহিলে ছত্রিশ রাগিণী বাজে, মন্দ নহে!

"উত্তরিলা ভীমা-রূপী; বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
* * * *
রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহ রণ তারে,
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা যাহে চাহ,
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্ব্বাণ ধর,
ইচ্ছা যদি, নরবর, নহে চর্ম্ম অসি,
কিম্বা গদা, মল্লযুদ্ধে সদা মোরা রত।"

এখানে মল্লযুদ্ধের প্রস্তাবটা আমাদের ভাল লাগিল না। রাম যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলে প্রমীলা লঙ্কায় গিয়া ইন্দ্রজিতের সহিত মিলিত হইলেন ও তৃতীয় সর্গ শেষ হইল। এখন আর একটি কথা আসিতেছে, মহা-কাব্যে যে সকল উপাখ্যান লিখিত হইবে, মূল আখ্যানের ন্যায় তাহার প্রাধান্য দেওয়া উচিত নহে, এবং উপাখ্যান গুলি মূল আখ্যানের সহিত অসংলগ্ন না হয়। একটি সমগ্র সর্গ লইয়া প্রমীলার প্রমোদ উদ্যান হইতে নগর প্রবেশ করার বর্ণনা লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ কি? এই উপাখ্যানের সহিত মূল আখ্যানের কোন সম্পর্ক নাই, অথচ একখানা শরতের মেঘের মত সে অমনি ভাসিয়া গেল তাহার তাৎপর্য্য কি? এক সর্গ ব্যাপিয়া এমন আড়ম্বর করা হইয়াছে যে আমাদের মনে হইয়াছিল যে প্রমীলা না জানি কি একটা কারখানা বাধাইবেন, অনেক হাঙ্গাম হইল,

কাঁপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাঁপিল
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রথী, তুরঙ্গমে
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে
পর্ব্বত গহ্বরে সিংহ; বন হস্তী বনে;

নৃমুণ্ডমালিনী সখি (উগ্রচণ্ডাধনী) আইলেন, বীর সকল দড়ে রড়ে জড় হইয়া গেল; কোদণ্ড টঙ্কার, ঘোড়া দড়বড়ি, অসির ঝনঝনি, ক্ষিতি টলমলি ইত্যাদি অনেক গোলযোগের পর হইল কি? না প্রমীলা প্রমোদ-উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করিলেন, একটা সমগ্র সর্গ ফুরাইয়া গেল, সে রাত্রে আবার ভয়ে রামের ঘুম হইল না। আচ্ছা, পাঠক বলুন দেখি আমাদের স্বভাবতঃ মনে হয় কি না, সে, ইন্দ্র

জিতের সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীতও আরো কিছু প্রধান ঘটনা ঘটিবে। ইন্দ্রজিৎবধ নামক ঘটনার সহিত উপরি-উক্ত উপাখ্যানের কোন সম্পর্ক নাই, অথচ মধ্য হইতে একটা বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া গেল।

তঃ—

আগমনী।

সুধীরে নিশার আঁধার ভেদিয়া
　ফুটিল প্রভাত-তারা।
হেথা হোথা হতে পাখীরা গাহিল
　ঢালিয়া সুধার ধারা।
মৃদুল প্রভাত-সমীর পরষে
কমল নয়ন খুলিল হরষে,
হিমালয় শিরে অমল আভায়
　শোভিল ধবল তুষার জটা।
খুলি গেল ধীরে পূরব দ্বার
ঝরিল কনক কিরণ ধার
শিখরে শিখরে জ্বলিয়া উঠিল,
　রবির বিমল কিরণ ছটা।
গিরি-গ্রাম আজি কিসের তরে,
উঠেছে নাচিয়া হরষ ভরে,
অচল গিরিও হয়েছে যেমন
　অধীর পাগল পারা।
তটিনী চলেছে নাচিয়া ছুটিয়া,
কলরব উঠে আকাশে ফুটিয়া
ঝর ঝর ঝর করিয়া ধনি
　ঝরিছে নিঝর ধারা।
তুলিয়া কুসুম গাঁথিয়া মালা,
চলিয়াছে গিরি-বাসিনী-বালা,
অধর ভরিয়া সুখের হাসিতে
　মাতিয়া সুখের গানে।
মুখে একটিও নাহিক বাণী
শবদ-চকিতা মেনকা রাণী
তৃষিত নয়নে আকুল হৃদয়ে,
　চাহিয়া পথের পানে।
আজ মেনকার আদরিণী উমা
　আসিবে বরষ পরে।
তাইতে আজিকে হরষের ধনি
　উঠিয়াছে ঘরে ঘরে।
অধীর হৃদয়ে রাণী আসে যায়,
কভু বা প্রাসাদ শিখরে দাঁড়ায়,
কভু বসে ওঠে, বাহিরেতে ছোটে
　এখনো উমা মা এলোনা কেন?
হাসি হাসি মুখে পুরবাসী গণে
অধীরে আসিয়া ভূধর ভবনে,
কই উমা কই বলে উমা কই,
　তিলেক বেয়াজ সহেনা যেন!
বরষের পরে আসিবেন উমা
　রাণীর নয়ন তারা।
ছেলেবেলাকার সহচরী যত
　হরষে পাগল পারা।
ভাবিছে সকলে আজিকে উমায়
　দেখিব নয়ন ভোরে।
আজিকে আবার সাজাব তাহায়
　বালিকা উমাটি কোরে।

তেমনি মৃণাল বলয় যুগলে
তেমনি চিকন চিকন বাকলে
তেমনি করিয়া পরাব গলায়
বনফুল তুলি গাঁথিয়া মালা
তেমনি করিয়া পরায়ে বেশ,
তেমনি করিয়া এলায়ে কেশ,
জননীর কাছে বলিব গিয়ে
এই নে মা তোর তাপসী বালা।
লাজ-হাসি-মাখা মেয়ের মুখ
হেরি উথলিবে মায়ের সুখ
হরষে জননী নয়নের জলে
চুমিবে উমার সে মুখ খানি।
হরষে ভুধর অধীর পারা
হরষে ছুটিবে তটিনী ধারা,
হরষে নিঝর উঠিবে উছসি,
উঠিবে উছসি মেনকা রাণী।
কোথা তবে তোরা পুরবাসী মেয়ে
যেথা যে আছিস্ আয় তোরা ধেয়ে
বনে বনে বনে ফিরিবি বালা,
তুলিবি কুসুম গাঁথিবি মালা,
পরাবি উমার বিনোদ-গলে।
তারকা খচিত গগন মাঝে
শারদ চাঁদিমা যেমন সাজে
তেমনি শারদা অবনী শশি
শোভিবে কেমন অবনী তলে?

* * * *

ওই বুঝি উমা, ওই বুঝি আসে,
দেখ চেয়ে গিরি রাণী!
আলুলিত কেশ, এলোথেলো বেশ
হাসি হাসি মুখ খানি।
বালিকারা সব আসিল ছুটিয়া
দাঁড়াল উমারে ঘিরি।
শিথিল-চিকুরে অমল মালিকা
পরাইয়া দিল ধীরি।
হাসিয়া হাসিয়া কহিল সবাই
উমার চিবুক ধোরে,
"বলিগো স্বজনী, বিদেশে বিজনে
আছিলি কেমন কোরে?
আমরাত সখি সারাটি বরষ
রহিয়াছি পথ চেয়ে,
কবে আসিবেক আমাদের সেই
মেনকা-রাণীর মেয়ে!
এইনে স্বজনী ফুলের ভূষণ
এইনে মৃণাল বালা,
হাসি মুখখানি কেমন সাজিবে
পরিলে কুসুম মালা।"
কেহবা কহিল "এবার স্বজনি
দিবনা তোমায় ছেড়ে
ভিখারী ভবের সরবস ধন
আমরা লইব কেড়ে!
বলত স্বজনি এ কেমন ধারা
এয়েছ বরষ পরে,
কেমনে নিদয়া রহিবে কেবল
তিনটি দিনের তরে।"
কেহবা কহিল "বল দেখি সখি
মনে পড়ে ছেলেবেলা?
সকলে মিলিয়া এ গিরি ভবনে
কতনা করেছি খেলা!
সেই মনে পড়ে যেদিন স্বজনী,
গেলে তপোবন মাঝে,
নয়নের জলে আমরা সকলে
সাজানু তাপসী সাজে।

কোমল শরীরে বাকল পরিয়া,
এলায়ে নিবিড় কেশ,
লভিবারে পতি মনের মতন
কত না সহিলে ক্লেশ!
ছেলেবেলাকার সখীদের সব
এখনোত মনে আছে,
ভয় হয় বড় পতির সোহাগে
ভুলিস্ তাদের পাছে!”
কত কি কহিয়া হরষে বিষাদে
চলিল আলয় মুখে,
কাঁদিয়া বালিকা পড়িল ঝাঁপায়ে
আকুল মায়ের বুকে।
হাসিয়া কাঁদিয়া কহিল রাণী,
চুমিয়া উমার অধর খানি,
“আয় মা জননি আয় মা কোলে,
আজ বরষের পরে।
দুখিনী মাতার নয়নের জল
তুই যদি মাগো না মুছাবি বল্
তবে উমা আর, কে আছে আমার
এ শূন্য আঁধার ঘরে?
সারাটি বরষ যে দুখে গিয়াছে
কি হবে শুনে সে ব্যথা,
বল্ দেখি উমা পতির ঘরের
সকল কুশল কথা।”
এত বলি রাণী হরষে আদরে
উমারে কোলেতে লয়ে,
হরষের ধারা বরষি নয়নে
পশিল গিরি আলয়ে।
আজিকে গিরির প্রাসাদে কুটীরে
উঠিল হরষ-ধনি,
কত দিন পরে মেনকা মহিষী
পেয়েছে নয়ন-মণি!

কুমারপাল।

কুমারপাল হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করত জৈন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জৈন সম্প্রদায়ের সমূহ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। জৈন ইতিবৃত্ত সমূহ কুমারপাল ও হেমসূরির গুণানুবাদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। এই প্রস্তাব পাঠে পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, জৈনগণ অতি সুনিয়মে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিতেন। আমরা বিবিধ দুষ্প্রাপ্য জৈন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বহু পরিশ্রমে সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং ক্রমে ক্রমে তাহা পুরাতত্ত্ব-প্রিয় পাঠক মহোদয়গণকে উপহার প্রদান করিব। জৈন-মাহাত্ম্য-প্রকাশক গ্রন্থনিচয় ভবিষ্যৎ বাক্য ও পুরাণের ন্যায় অলৌকিক বিবরণে পরিপূর্ণ, এজন্য তাহার মত এ সকল প্রস্তাবে গ্রহণ করিব না। আমরা কেবল জৈন ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সারাংশ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। সোমসুন্দর সূরির শিষ্য জিনমণ্ডলোপাধ্যায় কুমারপাল-প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার সংক্ষেপ-বিবরণ স্থলে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন।—

“তত শ্চৌলুক্যবংশৈকমৌক্তিকস্য মহৌজসঃ। শ্রীহেমচন্দ্র সূরীন্দ্রপাদপদ্মোপসেবিনঃ॥ ... ... (৫)

জিনধর্ম্মরসাবেসোল্লাসোল্লাসিতচেতসঃ
কৃপৈকপ্রাণনাথস্য ... ... (৮)
রাজ্ঞঃ কুমারপালস্যাম্বরসজ্ঞাপুর্য্যয়া
... ... প্রবন্ধং বচ্মি কিঞ্চন ॥ (৯)

চৌলুক্য বংশের একমাত্র মণিস্বরূপ মহাতেজা কুমার পাল রাজার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রবন্ধ বলিতে উদ্যত হইয়াছি। রাজা কুমারপাল হেমচন্দ্র সূরির শিষ্য এবং তিনি জৈন-ধর্ম্মের রসাবেসে উল্লসিতচিত্ত ছিলেন ও কৃপা দেবীর এক অর্থাৎ অদ্বিতীয় নাথ ছিলেন।—

এই বলিয়া গ্রন্থাবতরণ করিয়া প্রথমে জিন সম্প্রদায়ের বংশবর্ণনা করিয়াছেন। যথা,

ইক্ষ্বাকুবংশ ১, সূর্য্যবংশ ২, চন্দ্রবংশ ৩, যাদববংশ ৪, পরমারবংশ ৫, দাহমান ৬, চৌলুক্য ৭, বৈন্দক ৮, সিলার ৯, সৈন্ধব ১০, চাপোৎকট ১১, প্রতীহার ১২, চন্দুক ১৩, রাট্ ১৪, কূর্পট ১৫, নাক ১৬, করক ১৭, পাল ১৮, করঙ্গ ১৯, বাউল ২০, বন্দেল ২১, উহিল্লপুত্র ২২, পৌলিক ২৩, মৌরিক ২৪, মঙ্কুরাজক ২৫, ধান্যপালক ২৬, রাজপালক ২৭, আমঙ্গ ২৮, নিলুক্ষ ২৯, দধিলক্ষ ৩০, তুরুদলিয়ক ৩১ ডূন ৩২, হবিজড় ৩৩, নট ৩৪, মাস ৩৫, পোষর ৩৬, ইহার মধ্যে কুমারপাল চৌলুক্য বংশীয়।

কান্যকুব্জ দেশে কাঞ্চন কটকপুরে শ্রীভূয় রাজা ছিলেন। ইহাঁর কন্যা মহল্লনা দেবী। ইনি গুর্জ্জররাজ কুম্ভকের পত্নী ছিলেন। গুর্জ্জর দেশের বড়িয়ার রাজ্যের পচঞ্চাসর গ্রামের শ্রীশ্রীল সূরির যত্নে চাপোৎকট বংশের একটি বালক প্রতিপালিত হয়। এই বালক ৮ বৎসর বয়সে সমস্ত রাজলক্ষণে লক্ষিত এবং শ্রীগুরুদত্ত বলরাজ নাম প্রাপ্ত হয়েন। ইনি শ্রীপত্তনের সামন্তসিংহের ভগিনী লীলা দেবীকে বিবাহ করেন। লীলাদেবী গর্ভিণী-অবস্থায় মৃত হইলে মন্ত্রিবর্গ তাঁহার উদর হইতে এক বালক নিষ্কাশিত করেন। ঐ বালকের নাম মূলরাজ হইল। মূলরাজের জন্ম হওয়ার পর সামন্ত সিংহের অনেক রাজ্য দিন দিন বৃদ্ধি এবং ভূরি ভূরি মঙ্গল হইতে লাগিল দেখিয়া সামন্ত সিংহ তাঁহাকে রাজা করিলেন। মূলরাজ কোন কারণ বশত মাতুলকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। তিনি প্রবল-প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন। তিনি ৯৯৮ শকবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া স্বসমকালীন মহাবল পরাক্রম লাশোক রাজাকে পরাজয় করিয়া একছত্র হইয়াছিলেন। লাশোক-রাজ ১১ বার মূলরাজকে তাড়িত করিয়া ছিলেন। পরিশেষে কপিলকোট নগরে অবরুদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মূলরাজ ৫৫ বৎসর রাজ্য করিয়া কোন কারণে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অনন্তর বলরাজ রাজ্য গ্রহণ করেন। বলরাজ ভগিনীর শুভাদৃষ্টবলে রাজা হইয়া ছিলেন। ৮০২ বর্ষে শ্রীশ্রীল সূরি জৈন মন্ত্রপূত করিয়া শ্রীপত্তনে রাজ্য স্থাপনা করিয়াছিলেন। বলরাজ হইতে স্থাপিত গুর্জ্জরীয় রাজ্য জৈন ব্যতীত কেহ ভোগ করিতে পারিবে না এই প্রসঙ্গ রটনা হয়। বলরাজের রাজ্যভোগকাল ৩৫ বর্ষ।

তাঁহার পুত্র যোগরাজের ২৫,ক্ষেমরাজের ২৯। তৎপরে ভূয়ড়রাজ ২৫,বীরসিংহ ১৫,রত্নাদিত্য ৭,সামন্তসিংহ * * বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন। এইরূপে ১৯৬ বর্ষে চৌলুক্যকুলে ৭ রাজা হয় তৎপরে এতদ্দৌহিত্র সন্তানের চৌলুক্যকুলে রাজ্য প্রাপ্তি হয়। চৌলুক্য কান্যকুব্জীয়। তাঁহার নাম শ্রীভূয়ড় (প্রথমেই ইহার কথা বলা হইয়াছে) ভূয়ড়ের পুত্র কর্ণাদিত্য। তৎপুত্র চন্দ্রাদিত্য,তৎপুত্র সোমাদিত্য; ইনি পরলোকগত হইলে চামুণ্ডরাজ রাজা হইয়া ১৩ বৎসর রাজ্য করেন। তৎপরে বল্লভরাজ ৬ তৎপরে দুর্ল্লভরাজ ১১।৬ মাস রাজ্য করিয়াছিলেন। ইহাঁর পুত্র ভীম। এই ভীমের সহিত মুঞ্জের শক্রতা হইয়াছিল। ভীমের বৃন্দারাজ্ঞী বকুলদেবীর গর্ভোদ্ভব ক্ষেমরাজ। আর এক স্ত্রীর নাম উদরমতী। ইহার সন্তান কর্ণদেব। ক্ষেমরাজ আর কর্ণদেবের পরস্পর রাম লক্ষ্মণের ন্যায় সৌহৃদ্য ছিল। ক্ষেমরাজ কিছুকাল রাজ্য করিয়া কর্ণদেবকে রাজসিংহাসন প্রদান করেন। ইহাঁর নামান্তর ভোগীকর্ণ। ইহাঁর পুত্র জয়সিংহদেব। ধনেশ্বর স্থূরি ভদ্রেশ্বর স্থূরি ও মদনপাল কর্ণরাজার সাময়িক সভ্য। এই সকল পণ্ডিতেরা রাজাকে উপদেশ দিতেন।

'অপ্যাহুঙ্গরি তুম্বি অনুঙ্গরিত্তু তেহিং তি অবংসো অগ্নে অভবি অসতাঅনুমোঅন্তরে-জিন ভবণং।'

"জিনা ভবন।ই জে মুঙ্গবন্তি ভত্তি পড়সী অপড়িআইং তেতুঙ্গবন্তি অপ্যাং ভীমাহু ভব সমদ্ধাতু।"

"মাণিক্য হেমরত্নাদ্যৈঃ
প্রাসাদায়ে * * *
তেষাং পুণ্যৈকমূর্ত্তীনাং
কোবেদ ফলমুত্তমম্।'
'কাষ্ঠাদীনাং জিনাবাসে
যাবন্তঃ পরমানবঃ।
তাবন্তি বর্ষলক্ষানি
তৎকর্ত্তা স্বর্গভাগ্ভবেৎ॥
নবীনজিনগেহস্য বিধানে যৎফলং ভবেৎ
তস্মাদষ্টাদশগুণং জীর্ণোদ্ধারেণ জায়তে॥"
জীর্ণোদ্ধারায় বিজ্ঞপ্তঃ স্বজনেন নৃপস্ততঃ।
সুরাষ্ট্রোৎগ্রাহিতং * * * ভিন্ন পুরংযযৌ॥

ইহার সংক্ষেপ অর্থ এই যে, যাঁহারা মণিমানিক্যাদি দ্বারা জিনদেবের প্রাসাদ অলঙ্কৃত করেন তাঁহারা সাক্ষাৎ পুণ্য-মূর্ত্তি এবং তাঁহাদের সেই সেই কার্য্যের ফল-পরিমাণ কত, কে বলিতে পারে? তৃণ কাষ্ঠাদি যাহা কিছু জিন-মন্দিরে প্রদত্ত হয় তাহার প্রত্যেকের পরমাণু-সমসংখ্যক লক্ষবর্ষ স্বর্গ ভোগ করে। বিশেষতঃ নূতন গৃহ নির্ম্মাণ অপেক্ষা জীর্ণ-সংস্কার করার ১৮ গুণ অধিক ফল।—ইত্যাদি। ইহাঁর মাতাও নানাবিধ সদুপদেশ দিতেন। তিনি আপন পুত্রকে বলিয়াছেন, পুত্র!—

"দীপে স্নেহবৃত্তি তৈলপূরণবিধি স্তোয়ং চ সংশুষ্যতি।
প্রাবারো হিমসঙ্গমে জলগৃহং গ্রীষ্মজ্বরে জাগরে।
নির্ব্বাতং কবচং শরব্যতিকরে রোগোদ্ভবে ভেষজম্।
ধর্ম্মো মৃত্যুমহাভয়ে সতি সতাং সংসেবিতুং যুজ্যতে॥'

এইরূপ নানা উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া অনেক চৈত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে মাতার উপদেশে ভদ্রেশ্বরাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কর্ণরাজ আশাপল্লী নামক স্থানবাসী এক লক্ষ ভিল্ল জাতির অধিপতি অশোক নামক ভিল্লকে জয় করিয়া সেই স্থানে আপনার নামে অর্থাৎ কর্ণাবতা নামে নগর নির্ম্মাণ করেন। ইনি ২৯ বর্ষ রাজ্য করিয়াছিলেন। এতৎ পুত্র জয়সিংহদেব ৩০ বর্ষ রাজ্য করেন। ইহাঁর খ্যাতি শ্রীসিদ্ধ চক্রবর্ত্তী। ইনি যোগ-মার্গে সিদ্ধ ছিলেন। এই সিদ্ধরাজ হেমচন্দ্রের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এক দিন কথাপ্রসঙ্গে ও কাব্য-প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বলিলেন শ্রীবীর জিনেন্দ্র সমক্ষে শিশুকালে আমি যে যে তাঁহার ব্যাখ্যাত গ্রন্থ শুনিয়াছি সেই জৈনেন্দ্র নামক ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া থাকি। (আমাদের ব্যাকরণে "ইতি জিনেন্দ্র বুদ্ধিপাদ" বলিয়া অনেক উদাহরণ দৃস্ট হয়) সিদ্ধ বলিলেন "পুরাতন ত্যাগ করিয়া এখন কেহ নূতন ব্যাকরণ করিতে পারেন কি না তাহাই বলুন। "হেমচন্দ্র বলিলেন" "যদি সিদ্ধরাজ সাহায্য করেন তবে আমি পঞ্চাঙ্গ ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করিতে পারি।" এই কথায় রাজা ১৮ নানা দেশ হইতে সমস্ত ব্যাকরণ আনাইয়াছিলেন; তাহা অবলম্বন করিয়া হেম এক লক্ষ পঁচিশ হাজার শ্লোকে গ্রথিত এক বৃহৎ পঞ্চাঙ্গ লক্ষণে যুক্ত ব্যাকরণ এক বৎসর মধ্যে প্রস্তুত করিলেন। তাহার নাম হইল "শ্রীসিদ্ধ হেমচন্দ্র।" এই ব্যাকরণ প্রস্তুত হইবার পর উত্তম সজ্জায় সজ্জিত করিয়া শ্বেতহস্তীর উপর রক্ষা করিয়া চামরাদি ব্যজন করিতে করিতে (রাজার ন্যায়, ব্যাকরণের রাজা বলিয়া) রাজসভায় নীত হয়। সকল দেশের পণ্ডিত আহ্বান করিয়া তাহা পাঠ ও সংশোধন করা হইয়াছিল। ইহার পূজা করিয়া "সরস্বতী যোগানামক" পুস্তকালয়ে রাখা হয়। এই সময়ে পণ্ডিতেরা নিম্নলিখিত গাথা পাঠ করিয়াছিলেন।

" ... ... "

পাণিনিপ্রলপিতং কাতন্ত্রকে কা কথা
মাকার্ষী কটুশাকটায়নবচঃ ক্ষুদ্রেণ চান্দ্রেণকিম্

... ...

শ্রূয়ন্তে যদিতাচদর্থ মধুরাশ্রীসিদ্ধহেমোক্তয়ঃ॥

অর্থাৎ শ্রীসিদ্ধ হেমের মধুর উক্তি শ্রবণ কর তবে পনিনির ব্যাকরণ প্রলাপ বলিয়া বোধ হইবে সুতরাং কাতন্ত্র প্রভৃতির ত কথাই নাই।. শাকটায়নের ব্যাকরণ ভাল বটে কিন্তু বড় কটু। ক্ষুদ্র চান্দ্র ব্যাকরণ কোন কার্য্যে আইসে না। ইত্যাদি

দধিস্থলি পুরের ভীমদেবের পুত্র ক্ষেমরাজ ও তৎপুত্র দেবপ্রসাদ। ইহার পুত্র ত্রিভুবনপাল ও ভার্য্যা কশ্মীর দেবী। ইহারই গর্ব্ভে কুমারপালের জন্ম। ইনি যুদ্ধ-বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং নীতি-পরায়ণ ভূপতি ছিলেন।

কুমারপাল হেমচন্দ্রের নিকট নানা সদুপ্রদেশ প্রাপ্ত হন। কুমারপাল জয়সিংহের

সমীপে থাকিয়া পরিশেষে দধিস্থলীতে রাজ্য ভোগ করিয়া ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধরাজার সন্তান ছিল না। ইনি সন্তান-কামনায় হরি-বংশাদি শ্রবণ ও অনেক ক্রিয়াকাণ্ড করিয়াছিলেন। তৎপরে হেমচন্দ্রের উপদেশে তীর্থ ভ্রমণও করিয়াছিলেন।

তিনি রাজ্যলোভে ত্রিভুবনপালকে গোপনে বিনাশ করিয়া কুমারপালকে বিনাশ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তাহা সিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু কুমারপাল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। রাজ্যহীন হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের সহিত এই অবস্থায় পুনশ্চ সাক্ষাৎ হয়। হেম তাঁহাকে বলিলেন।—

"ভো কুমার! গুণাধার! নবাঙ্গেশ্বর বৎসরে (১১৯৯) চতুর্থ্যাং মার্গশীর্ষস্য শ্যামা যাং রবিবাসরে। পুস্পকর্ক্ষেঽপরাহ্নে চ তব রাজ্যং ন জায়তে॥"—*

অর্থাৎ ১১৯৯ শকের অগ্রহায়ণ কৃষ্ণ চতুর্থীতে পুনরায় তুমি রাজ্য পাইবে। কুমার মন্ত্রীগৃহে লুক্কায়িত থাকিতেন। বিজয়সিংহ দেব তাঁহার বিনাশার্থে চর নিযুক্ত করিলেন। চর সন্ধান করিয়া সেখানে গিয়া হেম স্যুরিকে জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু তিনি মিথ্যা করিয়া বলিলেন "এখানে নাই।" হেমাচার্য্য মনে করিলেন "প্রাণ পরিত্রাণং মহৎ পুণ্যম্" মিথ্যা বলার, পাপ অপেক্ষা এক জনের প্রাণ রক্ষা করায় মহৎ পুণ্য লাভ হয়। কুমারপাল পরিত্রাণ পাইয়া ভৃগুকচ্ছে গেলেন। তৎপরে কৈলম্বপত্তনে গমন করেন। এই কৌলম্ব-স্বামী ইঁহাকে স্বীয় রাজ্যের অর্দ্ধ প্রদান করেন। তাঁহারই সাহায্যে পুনর্ব্বার স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠানপুরে কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া উজ্জয়িনীতে গমন করেন। এখানে বিক্রমাদিত্যের যশ শুনিলেন। এক জন বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন "বিক্রমাদিত্যের সিদ্ধসেন দিবাকর নামে এক পার্শ্বদ ছিলেন। তিনি জৈন মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার উপদেশ সতত বিক্রমাদিত্য গ্রহণ করিতেন।" কুমার এখান হইতে নগেন্দ্র পত্তনে গমন করেন। তিনি তাঁহার ভগিনীপতি শ্রীকৃষ্ণদেবের গৃহে থাকিলেন। ইঁহার ভগিনীর নাম প্রেমল দেবী। এপর্য্যন্ত ইনি রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন নাই। ইহার পরেই অবসর ক্রমে খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসন গ্রহণ করেন এবং সে সময় বলিয়া ছিলেন যে, "খড়্গোনাক্রম্য ভূমিহীত বীরভোগ্যাং বসুন্ধরাম্" এই কার্য্যে তাঁহার ভগিনীপতি কৃষ্ণদেব প্রভৃতি সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সম্বৎ অব্দের ১১৯৯ বর্ষে মার্গশীর্ষ চতুর্থীতে রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। এখন ইহাঁর বয়স ৫০ বর্ষ। উদয়ন তাঁহার মহামাত্য ছিলেন। ইনি পণ্ডিত সর্ব্বগুণযুক্ত এবং কুমারের পূর্ব্বোপকারী। ৫০ বৎসর বয়সে কুমার স্বয়ং রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বের

* মেরুতুঙ্গাচার্য্য কৃত প্রবন্ধচিন্তামণি গ্রন্থে লিখিত আছে "বিক্রমার্কসম্বৎ প্রগতেষু নব নবত্যাধিকৈকাদশশতীমিতেষু কার্ত্তিক শুক্লদশম্যাং কুমারপালস্য রাজ্যাভিষেকোঽভূৎ।"

ব্রহ্মামাত্য ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাঁকে গোপনে বিনাশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। তিনি তাহা জানিতে পারিয়া তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কুমারপাল এই সকল রাজ্য জয় করিয়া ছিলেন যথা, পূর্ব্ব দিকে শূরসেন, কশাবর্ত্ত, পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, মগধ ইত্যাদি। উত্তর দিকে কাশ্মীর উড্ডীয়ন, জলেন্ধর, সপাদ লক্ষ পর্ব্বত প্রভৃতি পার্ব্বতীয় অসভ্য দেশ। দক্ষিণে—লাট, মহারাষ্ট্র তিলঙ্গ। তৎপশ্চিমে—স্বরাষ্ট্র—ব্রাহ্মণবাহক, পঞ্চনদ, সিন্ধুসৌরীর প্রভৃতি। এই দিগ্বিজয়-কালে সিন্ধুর পশ্চিম পারের পদ্মপুর নগরের রাজকন্যা পদ্মিনীকে বিবাহ করেন। মূলস্থানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে ১০০০০০ অশ্ব, ১০০০ গজ, ১৪০ রথ, ১৮ লক্ষ পদাতি সৈন্য ছিল। বীরচরিত্রে লিখিত আছে,—

"আগঙ্গ মৈন্দ্রিবিধ্যাং যাস্যমাসিন্ধু পশ্চিমং। আতুষ্কঞ্চ কৌবেরীং চৌলুক্যং সাধয়িষ্যতি।"

রাজা এক দিন মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "শ্রীসিদ্ধ রাজার কি আমার গুণ অধিক।"

কুমারপালের রাজ্যকালে হেমাচার্য্য দ্বারা জৈনদিগের নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি সম্বন্ধীয় অনেক নিয়ম প্রচারিত হয়। জৈন মতে মাংস ভোজন বড় নিষেধ। যথা,—

"জাতু মাংসং ন ভোক্তব্যং প্রাণৈঃ কণ্ঠাগতৈরপি।

জৈনেরা রাত্রে আহার করে না। রাত্রের জল রুধির এবং অন্ন মাংস-তুল্য জ্ঞান করে "ত্যজামো ভোজনোদকে" (হেমসূরি।)

"স্বয়ি চাস্তমিতে দেয় আপোরুধিরমুচ্যতে"

এই স্কন্দ পুরাণের বচন লইয়া হেমসূরি এই নিয়ম প্রচার করেন। অদ্যাবধি জৈনেরা বৈকালে আহার করে, রাত্রে ভোজন করে না। জৈনদিগের মতে জৈন মুনিরাই বৈষ্ণব, আর কেহ বৈষ্ণব নাই। কুমারপাল হেমসূরির উপদেশ ক্রমে অনেক জৈন মন্দিরের জীর্ণসংস্কার করিয়াছিলেন। তিনি ১২১১ সম্বৎ বর্ষে হেমসূরি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করিয়া ত্রিভুবনপাল বিহার নির্ম্মাণ করেন।

হেমাচার্য্য কহেন "বাগভট্টং মন্ত্রিণ মূচুঃ' কুমারপালের বাগভট্ট নামা মন্ত্রী ছিল। ইনিই প্রসিদ্ধ জৈন আলঙ্কারিক বাগভট্ট। ইহাঁর কৃত অলঙ্কার গ্রন্থ ও অলঙ্কারতিলকবৃত্তি জৈন-সাহিত্য-সংসার উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছে।

কুমার এই সকল দেশে অমারিপটহ অর্থাৎ অহিংসা ঘোষণা করিয়াছিলেন। কর্ণাট, গুর্জ্জর, লাট, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, সৈন্ধব, উচ্ছা, ভম্ভেরী, মালব, মারব, কোঙ্কণ, স্বরাজ্য, কীব, জনোদর, সপাদ, লক্ষ, মিবাড়, দীপাক্ষ, আভীরাক্ষ, কুমারগিরি, কাশী ও গাজনী প্রভৃতি দেশে কোথাও বিনয় কোথাও বা বল পূর্ব্বক হিংসা নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারস্থ সমুদায় দেবমন্দিরে পশুবলিদান নিষেধ করিয়াছিলেন।—

জৈনদিগের তীর্থ ২ প্রকার। স্থাবর ও জঙ্গম। জৈন মুনিরা জঙ্গম-তীর্থ, আর তাঁহাদের সেবিত স্থান সকল স্থাবর তীর্থ যথা—

'জঙ্গমং স্থাবরংচৈব তীর্থং দ্বিবিধমুচ্যতে।
জঙ্গমং মুনয়ঃ প্রোক্তং স্থাবরস্তন্নিষেবিতম্ ॥'

শত্রুঞ্জয় রৈবত গিরি, বৈভার, অষ্টাপাদ গিরি, সম্মেত শিখর, ইত্যাদি স্থাবর-তীর্থ। এতন্মধ্যে শত্রুঞ্জয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শত্রুঞ্জয়-যাত্রায় সকল তীর্থযাত্রার ফল হয়। জিন গণধর সকল জঙ্গম তীর্থ। শত্রুঞ্জয়ের অনেক নাম যথা—

শত্রুঞ্জয়ঃ পুণ্ডরীকঃ সিদ্ধিক্ষেত্রং মহাবলং
সুরশৈলো বিমলাদ্রিঃ পুণ্যরাশিঃ * * *।
পর্ব্বতেন্দ্র সুভদ্রশ্চ দৃঢ়শক্তিশ্চ কর্ম্মকঃ।
মুক্তিগেহং মহাতীর্থং শাশ্বতঃ সর্ব্বকামদঃ।
পুষ্পদন্তো মহাপদ্মং পৃথ্বীপীঠং প্রভাপ্রদং।— ইত্যাদি। ১০৮ নাম আছে।—

শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতে কুমারপাল পার্শ্বনাথের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। জৈনেরা গুরুমূর্ত্তি, গুরু-পাদুকা, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি জিন-মূর্ত্তির পূজা করে ও ধূপদীপ নৈবেদ্য ফুল প্রদান করে।

নেমির জন্মস্থান রৈবতক পর্ব্বত। এই জন্য ইহা মহাতীর্থ এবং ওখানে নেমির নির্ব্বাণ হইলে ৯০৯ বৎসর পরে কাশ্মীর দেশ হইতে রত্নদেব শ্রাবক রৈবতে আসিয়া যাত্রা মহোৎসব করিয়াছিলেন, তদবধি যাত্রা মহোৎসব হইয়া থাকে। সেই নেমিমূর্ত্তি ব্রহ্মেন্দ্রের স্থাপিত।

৮৪ বৎসর বয়সে হেমচন্দ্র আপনার মরণকাল আগত বুঝিতে পারিয়া সমস্ত সংঘ ও রাজাকে নিকটে ডাকিয়া সমাধিযোগে শরীর ত্যাগ করেন। রাজা কুমারপাল রোদন করিতে লাগিলেন। হেমাচার্য্যের সম্বৎ ১১৪৫ কার্ত্তিকী পূর্ণিমার রাত্রে জন্ম, ১১৪৫ সম্বতে স্বর্গ লাভ হয়। তাঁহার শরীর চন্দনাগুরু প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধময় করিয়া মৃত্তিকা-প্রোথিত করা হইয়াছিল। সেই স্থান হেমযন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। হেমচন্দ্রের মৃত্যুর ৬ বৎসর পরে, কুমারপাল ৩০ বৎসর ৮ মাস ২৭ দিন রাজ্য করিয়া ১২৩৫ সম্বৎ অব্দে শরীর ত্যাগ করেন। তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র অজয়পাল রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি মহীপালের পুত্র। ১৪৪ অব্দে এই কুমারপালের প্রবন্ধ সংগ্রহ হয়। তৎপরে তাহা সোমসুন্দর গুরুর শিষ্য জিনমণ্ডল উপাধ্যায় কর্ত্তৃক গ্রন্থাকারে গদ্য পদ্যে রচিত হইয়া ১৪৯৫ সম্বতে প্রচারিত হয়। যথা—স্বাস্তে সঞ্চরিতৈ র্বোহব্ধি মনুত্রিঃ কৈলাস বৈহায়িকৈঃ'—ইত্যাদি।

শ্রীসোমসুন্দর গুরোঃ শিরোঃ শিষ্যেণ যথাশ্রুতানুসারেণ শ্রীজিনমণ্ডল গুণিনা মনুপ্রচিত বৎসরে রুচির।—

কুমারপাল প্রবন্ধে কুমারপাল-চরিত এইরূপ লিখিত হইয়াছে। এই প্রস্তাবটী উক্ত গ্রন্থের সার-সঙ্কলন মাত্র। মূল প্রস্তাবে শ্রীপত্তন, ধারানগরী, ধন্ধুকপুর, নাগপুর, কর্ণাবতী, শঙ্খপুর, কুমার গ্রাম, প্রভৃতি স্থান মদনবর্ম্মা, শ্রীদত্তসূরি, গুণসেনসূরি প্রদ্যুম্নসূরি ও শূরশেখর প্রভৃতি ব্যক্তি বৃন্দেরও সিদ্ধান্তবৃত্তি, নেমিচরিত্র, হরিবংশ,

পদ্মপুরাণ, বীরচরিত্র প্রভৃতি গ্রন্থের উল্লে আছে এবং জৈন নীতি, ও ব্রতকথার নানা বিবরণ আছে তাহা বাহুল্য-ভয়ে এই প্রস্তাবে পরিত্যক্ত হইল। আমরা কেবল কুমারপাল-প্রবন্ধের ঐতিহাসিক বিবরণ সঙ্কলন করিলাম এবং আবশ্যক বোধে স্থানে স্থানে কুমারপাল সম্বন্ধীয় কোন কোন বিষয় কৃষ্ণাজী-প্রণীত রত্ন মালা রাজশেখর কৃত প্রবন্ধকোষ ও মেরুতুঙ্গাচার্য্য কৃত প্রবন্ধ-চিন্তামণি হইতে সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

শ্রীরামদাস সেন

জ্ঞান, নীতি ও ইংরাজী সভ্যতা।

(বকল্ সাহেব-কৃত ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ইতিহাস।)

ইংরাজী সভ্যতা-প্রভাবে ইংরাজ-সমাজ-মধ্যে যে নীতির দিন দিন অবনতি হইতেছে পূর্ব্ব-সংখ্যায় তাহা ইংরাজদের বাক্যেই সপ্রমাণ হইয়াছে। সেই ইংরাজী সভ্যতা আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছে। এক্ষণে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত যেন তাহার প্রবল স্রোতে আমাদের জাতীয় সদ্গুণ সকল এবং আমাদের সুনীতি-মূলক আচার-ব্যবহার গুলি ভাসিয়া না যায়। যে সকল গুণ আমাদের জাতীয় চরিত্রের অলঙ্কার-স্বরূপ, তাহা যেন আমরা এই মহা বিপ্লবের মধ্যে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করি। ধর্ম্মভাব, মর্য্যাদা-বোধ, আত্মোৎসর্গ, বিশ্বস্ততা, মমতা, বন্ধুতা, কৃতজ্ঞতা, দয়া দাক্ষিণ্য, বদান্যতা, পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, এই সকলই হিন্দু-চরিত্রের বিশেষ গুণ। ইংরাজদিগের মধ্যে যাঁহারা সত্য-প্রিয়, অপক্ষপাতী ও সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারাও ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

এসিয়াটিক সোসাইটীর ভূতপূর্ব্ব সভাপতি কর্ণেল্ সাইক্স বলেন—"সদভিমান ও মর্য্যাদা বোধ হিন্দু-চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে লাল-পলটন্ নামক বঙ্গীয় সৈন্যদল, যাহারা পলাসির ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহারা বিদ্রোহী হইয়া তাহাদিগের ইংরাজ নায়কদিগকে প্রথমে বন্দী করে। পরে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া চলিয়া যায়। তাহারা বলে যে, তাহাদিগকে যে পুরস্কার অঙ্গীকার করা হইয়াছিল সেই অঙ্গীকার পালন না করাই তাহাদের বিদ্রোহের কারণ। তৎপরে ইউরোপীয় মেরীন সৈন্যদল ও ব্রিট্যানিয়নের সিপাহি-পল্টন বিদ্রোহীদিগের অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে ধৃত করিয়া আনে। সেনাপতি মেজর মন্‌রো তাহাদিগের বধ দণ্ডের আজ্ঞা প্রচার করে। আটজন বিদ্রোহী সিপাহীকে কামানের মুখে বাঁধিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। তাহাদিগের মধ্যে গ্রেন্যাডিয়র নামক দীর্ঘকায় সৈন্যদলের তিন জন সৈনিক ছিল। তাহারা এই অনুরোধ করিল যেন তাহাদিগকে দক্ষিণ দিকস্থ কামান

গুলিতে বন্ধন করা হয়—কেন না তাহারা বরাবর দক্ষিণ দিকে থাকিয়াই যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তাহারা বলিল তাহাদিগের শেষ অনুরোধটি এই—যেন তাহারা মরিবার সময়েও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মরিতে পারে। সেনাপতি তাহাদিগের এই অনুরোধ গ্রাহ্য করিলেন—এবং সর্ব্বাগ্রে তাহাদেরই প্রাণ-দণ্ড হইল।

জেনেরাল্ ব্রিগ্ বলেন যে, ভরতপুর-দুর্গ অবরোধের সময় ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে আমাদের সৈন্যেরা চারিবার ঐ দুর্গ আক্রমণ করে, কিন্তু চারিবারই তাড়িত হয়—পরে পঞ্চম আক্রমনের আজ্ঞা প্রচার হইল। এই সময় লর্ড লেকের আর্দ্দালি এক জন হাবেলদার সেই দিন তাহার সৈন্যদলে যোগ দিবার জন্য লর্ড্ লেকের অনুমতি প্রার্থনা করিল। প্রথমে লর্ড লেক তাহার আবেদন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন—কিন্তু অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করায় যাইতে অনুমতি দিলেন। সে বলিল—'যদি আমরা যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারি তাহা হইলে সাহেব আমার মুখ আর কখনই দেখিতে পাইবেন না'—সেই সৈন্য-দল দুর্গের প্রাকারে আরোহণ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদিগের পৃষ্ঠ-রক্ষক কেহ না থাকায় হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু একমাত্র সেই হাবেলদার অটল ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার সঙ্গীগণ তাহাকে চলিয়া আসিবার জন্য কত অনুরোধ করিল—কিন্তু সে ঐ কথাতে কর্ণপাতও করিল না। তাহাদিগকে এইমাত্র বলিল,—আমাকে কোথায় যে তোমরা ছাড়িয়া যাইতেছ তাহা লর্ড্-লেককে বলিও—এই বলিয়া প্রাকারোপরি অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া বন্দুক দাগিতে লাগিল—পরক্ষণেই বিপক্ষগণের গুলির আঘাতে নিহত হইল। (ব্রিগ্ সাহেবের পত্র ৪৫ পৃষ্ঠা)

লর্ড লেক্ ভরতপুর-দুর্গ অনেক বার আক্রমণ করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া আর একবার আক্রমণ করিবার আদেশ প্রচার করিলেন। দুর্গ প্রাকার ভেদ করা অসাধ্য এই কথা বলিয়া ইউরোপীয় সৈন্য দল আক্রমণে অসম্মত হইল—কিন্তু সিপাহি-সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করিবার জন্য নির্গত হইল। এ আক্রমণেও লর্ড লেক্ কৃতকার্য্য হইলেন না,—তিনি এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন,—'যদিও সিপাহি সৈন্যেরা গত কল্যকার আক্রমণে সাহস ও অধ্যবসায়ের জাজ্জ্বল্যমান পরিচয় দেয় এবং তিন তিন বার দুর্গ-প্রাকারে ব্রিটিস্ পতাকা উড্ডীন করে তথাপি জয় লাভের পক্ষে যে, সকল বাধা বিঘ্ন আছে তাহা দুরতিক্রমণীয়।

এই অবস্থায় যখন সেনাপতি লেক্ পলায়নের আজ্ঞা দিলেন, তখন সিপাহিরা প্রথমত কিছুতেই সম্মত হইল না—তাহারা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল—"হয় এই স্থান আমরা অধিকার করিব নয় মরিব।" এই প্রতিজ্ঞানুসারেই তাহারা কার্য্য করিল—তাহাদিগের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও অধিক ঐ যুদ্ধে আহত ও নিহত হইল। সেনা-নায়কগণ পুনঃ পুনঃ পলায়নের আজ্ঞা প্রচার করায় তবে অবশিষ্ট সিপাহি-সৈন্য পলায়নে স্বীকৃত হয়। পৃথিবীর মধ্যে কি কোনও

সৈন্য-দল কোন কালে স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এই সিপাহি সৈন্য অপেক্ষা অধিক মহত্বের পরিচয় দিয়াছে?

রাজপুতদিগের মধ্যে তো দেখা যায় তাহারা প্রাণান্তেও শত্রুহস্তে আত্ম-সমর্পণ করে না। যখন নিতান্ত নিরুপায় হয় তখন অসি-হস্তে শত্রুগণকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করে এবং তাহাদের মধ্যে এক জনও জীবিত থাকিতে পরাংমুখ হয় না। রাজপুত-রাজ্যের সহিত মুসলমানদিগের যুদ্ধে তো ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। এই রূপ একটি ঘটনা আমার নিজ জ্ঞানে ঘটিয়াছিল। গাইকবাড়ের করদ, কাটেওয়ার অঞ্চলের চইয়া প্রদেশের রাজপুত অধিপতি প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হয়। গাইকবাড়ের সহিত ইংরাজেরা যে সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ ছিল তাহারই নিয়মানুসারে বিদ্রোহী রাজপুতকে বলদ্বারা বশীভূত করিবার জন্য গাইকবাড় ইংরাজদিগকে অনুরোধ করেন। এই হেতু ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ রাজার দুর্গ অবরোধ করিল এবং শীঘ্রই কামানের গোলায় দুর্গ-প্রাকার ভেদ করিল। দুর্গ-মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে—ইংরাজ-সৈন্য রাজাকে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য অনুরোধ করিল, কিন্তু রাজা ও দুর্গস্থ সৈন্যেরা আপন আপন স্ত্রী পুত্রগণকে বধ করিয়া তাহাদিগের মৃত দেহ কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করিল—এবং তাহাদের উষ্ণীষ দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া এবং মস্তকের শিখা আলুলিত করিয়া অসি-হস্তে দুর্গ হইতে নির্গত হওত ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল। ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইল। একটি রাজপুতও জীবিত রহিল না—পরে ইংরাজগণ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে গিয়া ভয়ঙ্কর দৃশ্য তাহাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইল। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের দেহ তখন কূপ মধ্য হইতে উত্তোলন করা হইয়াছে, কিন্তু কেহই জীবিত নাই। তাহার মধ্যে কেবল রাণী মুমূর্ষু অবস্থায় ছিলেন। তাঁহার পায়ে একটা বৃহৎ স্বর্ণ-মল ছিল। যে সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে প্রথম দেখিতে পান তিনি তাঁহাকে নিরাপদ মনে করিয়া অন্যান্য কূপ দেখিবার জন্য গমন করেন। সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন যে রাণীও গতাসু হইয়াছেন—তাঁহার যে পায়ে মল ছিল সে পাও নাই—সে মলও নাই। সৈন্যাধ্যক্ষ এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, অপরাধীকে যে ধৃত করিতে পারিবে তাহাকে পুরস্কার দিবেন এই রূপ ঘোষণা করিলেন। কিছু কাল পরে কাটেওয়ার প্রদেশে নবনগর যখন আক্রমণ করা হয়—তখন দুর্গস্থ বিপক্ষ সৈন্যগণ আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে যে শেষ কামান ছুঁড়িয়াছিল সেই কামানের গোলায় আমাদের এক জন গোলন্দাজ নিহত হয়—আমাদের আর এক জন গোলন্দাজ অমনি বলিয়া উঠে—'চইয়াতে ঐ ব্যক্তি যেমন রাণীর পা কাটিয়াছিল তেমনি তাহার ফল ফলিয়াছে।' ইহাকেই কি ধর্ম্মের বিচার বলে না?

১৮১৩ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল অ্যাডাম্‌সের অধীন এক দল সৈন্য ভাগলখণ্ড প্রদেশে

এস্তুরি-দুর্গ আক্রমণ করে—দুর্গস্থ বিপক্ষ সৈন্যগণ প্রাণ-পণে তাহার প্রতিরোধ করে। এক জন উপস্থিত ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ বলেন—দুর্গ মধ্যে ১৫০ জন মাত্র সৈন্য ছিল; গোলার আঘাতে দুর্গ প্রাকারে যে রন্ধ্র হইয়াছিল সেই রন্ধ্র দেশ রক্ষা করত চারি ঘণ্টা কালেরও অধিক তাহারা ব্যাঘ্রের ন্যায় যুদ্ধ করিয়াছিল। যখন প্রায় সমস্ত স্থানটি ইংরাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল তখন তাহারা দুর্গের নানাস্থলে অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়া সমস্ত স্থানটিকে একটি বিশাল অগ্নি-ক্ষেত্র করিয়া তুলিল। এই অগ্নি-রাশির মধ্যে তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল—এবং যখন রক্ষার আর কোন উপায় নাই, তখন দুর্গ-পতি পাছে শত্রু-হস্তে পতিত হয়েন এই আশঙ্কায় স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার্থ বারুদে অগ্নি সংযোগ করিয়া স্বীয় দেহকে গগনমার্গে উড়াইয়া দিলেন।

আত্মোৎসর্গ ও প্রভুভক্তি হিন্দুদিগের চরিত্র-গত আর একটি প্রধান লক্ষণ।

অর্ম্ সাহেব তাঁহার ভারতবর্ষীয় ইতিবৃত্তে ক্লাইব কর্ত্তৃক আর্কট-সংরক্ষণের বর্ণনা কালে যে দুইটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হিন্দু চরিত্রের মহত্ব প্রতিপাদন করে। একবার শত্রুগণ-কর্ত্তৃক এই দুর্গ আক্রমণ-সময়ে তাহাদিগের সেনাপতি দুর্গের পরিখার মধ্যে পড়িয়া যায়। ঐ ব্যক্তি আক্রমণ কালে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করে এই হেতু তাহার অধীনস্থ সৈন্যেরা তাহার এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে এক জন ৪০ টা বন্দুকের গুলি-বৃষ্টির মুখে পরিখায় নাবিয়া তাহাকে তুলিয়া আনে।

আর একটি ঘটনাও মর্ম্মস্পৃক্। এই আর্কট-দুর্গ ৫০ দিন পর্য্যন্ত অবরুদ্ধাবস্থায় থাকে—দুর্গাভ্যন্তরস্থ ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় সৈন্যগণের অন্নাভাবে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। অর্ম্ বলেন, 'আমি এই প্রসিদ্ধ অবরোধের ইতিবৃত্তে এমনি একটি বিশ্বাস-যোগ্য ঘটনার বিষয় উল্লেখ করিতে পারি, যাহাতে হিন্দু-চরিত্রের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। এই অবরোধের সময় আহার্য্য দ্রব্যের এত অনটন হইয়া পড়ে যে, সকলের আশঙ্কা হইয়াছিল পাছে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত হইয়া শত্রু-হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। এই সময় সিপাহিরা ক্লাইবকে বলিল "আমরা ফেন খাইয়াই থাকিতে পারিব—ইংরাজদিগের জন্য ভাত দরকার।" সিপাহিরা অনেক স্থলে জাতি-গত স্বার্থপরতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইউরোপীয়গণের সহিত ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হইয়া কতবার ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের পৃষ্ঠা সমুজ্জ্বল করিয়াছে! জেলালাবাদে সাহসী সেনাপতি সেলের অধীন দুর্গাভ্যন্তরস্থ কোম্পানির সৈন্যগণ যখন অবরুদ্ধ অবস্থায় অনাহারে কষ্ট পাইতেছিল, তখন তাহারা মধ্যে মধ্যে দুর্গ হইতে বলপূর্ব্বক নির্গত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে যে সকল মেষ চরিত তাহাদিগকে ধরিয়া আনিত। ইহার মধ্যে কতকগুলি সিপাহিদিগের অংশে পড়ে—কিন্তু তাহারা সর্ব্ব-শ্লাঘ্য আত্মোৎসর্গের পরিচয় দিয়া বলিল, "আমাদের জীবন ধার-

ণের জন্য মাংস নিতান্ত আবশ্যক নয়—মাংসাহার আমাদের অভ্যাসও নহে—অতএব যে গুলি আমাদের অংশে পড়িয়াছে সে সকল ইউরোপীয়গণকেই দেওয়া হউক।"

টিপুসুলতান বেড্‌নোর অধিকার করিলে ইংরাজ সেনাপতি ম্যাথু স্‌ সসৈন্যে তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই সময় টিপু নিজ সৈন্য-দলে প্রবিষ্ট করিবার জন্য সিপাহিদিগকে অনেক প্রলোভন দেখান—কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সিপাহিদিগকে ইউরোপীয় বন্দিগণ হইতে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল—তাহাদের মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্করিণী প্রভৃতি দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল। কিন্তু একজন বন্দী ইংরাজ সেনানায়ক পরে প্রকাশ করে যে, প্রতি রাত্রে সিপাহিরা এই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া,ক্রোশ-ব্যাপী পুষ্করিণী সকল সন্তরণ পূর্ব্বক, সতর্ক-রক্ষকদিগের চক্ষু এড়াইয়া, টিপু-সুলতানের নিকট হইতে যৎসামান্য যে খোরাকি পয়সা পাইত তাহার মধ্যে যাহা কিছু বাঁচাইতে পারিয়াছিল তাহা সঙ্গে লইয়া, ইউরোপীয় বন্দিগণের শিবিরে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে উপহার প্রদান করে। তাহারা ইংরাজ সৈন্যগণকে বলে—"আমরা যা-তা খাইয়াই জীবন ধারণ করিতে পারি—কিন্তু তোমাদিগের মাংস আবশ্যক।"

ম্যাল্‌কম সিপাহিদিগের সম্বন্ধে আর একটি গল্প বলেন। দাক্ষিণাত্যে নিজামের সৈন্যগণ একটি গ্রাম লুঠ করে এবং গ্রামবাসীগণ অনাহারে মৃতপ্রায় হয়। ম্যাল্‌কম তাঁহার সিপাহি সৈন্যদলের কতকগুলিকে রক্ষক-স্বরূপে ঐ গ্রামে প্রেরণ করেন—ঐ সিপাহিরা আপনাদিগের আহার্য্য চাউল হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া অনাহারী গ্রামবাসীদিগকে বিতরণ করে।

১৮০৩ খৃস্টাব্দে লাসোয়ারি যুদ্ধের পর সৈন্যগণের মধ্যে আহত ও পীড়িতের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে, হাস্‌পাতালের দ্বারা আর কোন সাহায্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এই অবস্থায় সেনাপতি এই আহত ও পীড়িতদিগকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে সিপাহিদিগকে অনুরোধ করিলেন। সিপাহিরা প্রফুল্লচিত্তে এই অনুরোধ রক্ষা করে।

১৮০৪ খৃস্টাব্দে সেনাপতি মন্‌সন্‌ যখন হোল্‌কারের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া সসৈন্যে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন হোলকার ইংরাজদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য সিপাহিদিগকে বলিয়া পাঠান। সিপাহিরা যদিও সেই সময় ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতেছিল—এবং হোলকারও তাহাদিগকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, তথাপি তাহারা ইংরাজের লবণ খাইয়াছে বলিয়া ইংরাজদিগের পক্ষ কিছুতেই পরিত্যাগ করে নাই।

১৮১৭ খৃঃ কির্কির যুদ্ধে আমার অধীনে যে সৈন্যদল ছিল, পেষোয়ার চরেরা তাহাদিগকে ধন-দ্বারা বশীভূত করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সিপাহিরা সেই সব কথা আমার নিকট বলিয়া দেয়।

আমার বন্ধুর নিকট হইতে একটি পত্র পাই তাহার প্রতিলিপি নিম্নে প্রকাশ করিতেছি—

আমি সেপ্টেম্বরের প্রারম্ভেই বোম্বাই নগরে উপনীত হই এবং ঐ মাসের শেষে আমার অধীন সৈন্যদল পারস্য দেশ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তাহাদের অবিশ্বস্ততা সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক জনরব উঠিয়াছিল— কিন্তু আমি আনন্দের সহিত বলিতেছি তাহারা যেরূপ সাহস ও সদাচারের পরিচয় দিয়াছে তদ্দ্বারা তাহাদের বিশ্বস্ততা বিশেষরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। এমন কি মৃত সর্ হেনরি হ্যাবেলক্ এই ২৬ সংখ্যক বোম্বাই সিপাহি সৈন্যদিগকে ভুয়োভুয়ঃ প্রশংসা করেন। * * * দাক্ষিণাত্য ও খান্‌দেশ প্রদেশে যখন ভিলদিগের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়, তখন এই সৈন্যদল তাহাদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করে। এই প্রদেশটি এরূপ পর্ব্বতময়, জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও খালখন্দে বিভক্ত, যে এখানে ভিলদিগের সহিত আঁটিয়া উঠা ভার—কিন্তু এই সিপাহি সৈন্যদল তাহাদিগকে পদে পদে পরাভূত করে। ইহারা ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিরাপদে রাখিবার জন্য কতই আগ্রহ প্রকাশ করে; যখন আমার পার্শ্ব ঘেঁশিয়া গোলা গুলি ছুটিতেছিল, তখন এক জন ব্রাহ্মণ সিপাহি আমাকে আপনার শরীরের অন্তরালে রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল। আর এক সময় এক জন মহারাষ্ট্রীয় সৈনিক, তাহার কাপ্তেনের প্রতি বিপক্ষের এক জন বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইল—এবং সেই খানে দাঁড়াইবামাত্র সেই বন্দুকের গুলি কাপ্তেনের গায়ে না লাগিয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করিল।'

এই রূপ বিশ্বস্ততার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা হিন্দু-চরিত্রের আর একটি লক্ষণ।

মেজর ফলেট্ ২৫ সংখ্যক বোম্বাই সিপাহি সৈন্যদলের নেতা হইয়া আমেদ-নগর হইতে আসীরগড়ে যাত্রাকালীন ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েন। মেজর ফলেট্ যদিও এক জন কঠোর নিয়ন্তা ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহার অখণ্ড ন্যায়পরতা নিবন্ধন সৈন্যগণের এতদূর অনুরাগ-ভাজন হইয়াছিলেন যে, রাজপুত ও ব্রাহ্মণ সৈনিকেরা তাহাদিগের জাতীয় নিয়ম অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদিগের সেনাপতির মৃতদেহ ডুলি হইতে নামাইয়া গোরের মধ্যে স্থাপন করে— এবং তাহারা নিজে গোর মধ্যে অবতরণ করিয়া ঐ মৃত শরীরকে তন্মধ্যে উত্তম রূপে প্রসারিত করিয়া তাহার উপর মৃত্তিকা চাপা দেয়। যদিও এই মৃত ম্লেচ্ছদেহস্পর্শে তাহারা আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করিয়া পরে তাহার যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হয়, তথাপি জাতীয় সংস্কারের অনুরোধে তাহাদিগের মৃত কাপ্তেনের সৎকার করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নাই। সেই দিন অপরাহ্নে কতকগুলি ইংরাজ

সেনা-নায়ক সেই সমাধি-স্থলে শিলা-খণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছে দেখিয়া সিপাহিরা তাহাদিগের শিবির হইতে বেগে নির্গত হইয়া একটি ক্ষুদ্র স্মরণ-স্তম্ভ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে ইংরাজ সৈন্যগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিল।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে সেনানায়ক সিভোয়েল কোহাটের নিকটে যুদ্ধে হত হইলে তাঁহার অধীনস্থ সিপাহিরা তাঁহার মৃতশরীর উদ্ধার করিয়া আনিবার জন্য অক্ষুব্ধচিত্তে স্বকীয় জীবন উৎসর্গ করে।

আমি যখন গভর্ণমেণ্ট-কর্ত্তৃক স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্টরের পদে নিয়োজিত হইয়াছিলাম তখন প্রায় বৎসরের মধ্যে আট মাস আমাকে শিবিরে শিবিরে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে একটা ব্যাঘ্র দুই জন কৃষককে দন্তাঘাতে ক্ষত বিক্ষত করে; এই সাঙ্ঘাতিক অবস্থায় তাহারা আমার শিবিরে আনীত হয়। আমি তাহাদিগের ক্ষত স্থানে প্রতি দিন ঔষধাদি দিতাম। পরে তাহারা সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য-লাভ করিলে তাহাদিগকে তাহাদের গ্রামে পাঠাইয়া দিলাম। আর যে কখন তাহাদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইবে এরূপ মনেও করি নাই। মে মাসের শেষে আমি পুনা অঞ্চলাভিমুখে যাত্রা করিতেছি এমন সময়ে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে সেই দুইজন কৃষক পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারা আমার গতি-বিধির সন্ধান লইয়া ৫ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া কতকগুলি পাত্রে মধু, চাট্‌কা মাখন ও দুগ্ধ—অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার উপহার-স্বরূপ আমার নিকট লইয়া আসিয়াছে।

উপচিকীর্ষা হিন্দুচরিত্রের আর একটি লক্ষণ। গত সিপাহি বিদ্রোহের মধ্যেও যে উপচিকীর্ষার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যৎকালে গোয়ালিয়ারে সিন্ধিয়া-সৈন্য-দলের মধ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্জলিত হয়, তখন লেফটনেণ্ট,—সত্বর অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক কাওয়াজের স্থানে যেমন উপস্থিত হইবেন অমনি সিপাহিদল হইতে গুলি বর্ষণ হইল—তাঁহার অশ্ব হত হইল—এবং চারি জন সিপাহি দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিল। পরে তাহারা তাঁহাকে ছাউনির বাহিরে লইয়া নদী পার হইয়া একটা কম্বল দিয়া বলিল "যাও জীবন লইয়া আগ্রাভিমুখে পলাও।" কিন্তু তিনি তাঁহার স্ত্রীকে রোগ-শয্যায় পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন—স্ত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না। উহার মধ্যে দুইজন সিপাহি বলিল "আচ্ছা আমরা তোমার স্ত্রীকে এখানে আনিয়া দিতেছি", এই বলিয়া তাহারা প্রস্থান করিল। কিয়ৎকাল পরে সেই রোগ-ক্লিষ্টা স্ত্রীলোকটিকে তাহারা সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি সেই রুগ্না স্ত্রীকে কি করিয়া লইয়া যাইবেন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে বলিলেন আমাদের দুজনকেই গুলি কর; কিন্তু গুলি করা দূরে থাকুক, তাহারা কম্বলের শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে রুগ্না স্ত্রীলোককে শুয়াইয়া

বন্দুকে ঐ কম্বলের শয্যা আলম্বিত করিয়া কোন নিরাপদ স্থানে তাঁহাদিগকে পৌছাইয়া দিল।

কোন বন্ধুর পত্র হইতে নিম্নলিখিতটি উদ্ধৃত করিতেছি—

'গত সিপাহি বিদ্রোহের গোলযোগের বিষয় স্মরণ করিবার সময় পঞ্চবিংশতি সিপাহি-সৈন্যদলের মহত্ত্বের প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। ২৩ শে তারিখের যুদ্ধে ঐ সৈন্যদলের অত্যন্ত কষ্ট হইয়াছিল। তাহারা সর্ব্ব প্রকার আঘাতে আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রের হাঁসপাতালে গমন করে। তাহাদিগের হস্তপদ বৃহৎ গোলার আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বন্দুকের গুলি দ্বারা বিদ্ধানুবিদ্ধ হয় এবং শরীরের মাংশেও সাজ্ঘাতিক আঘাত লাগে। এই সকল লোক আহত হইয়া জ্বলন্ত সূর্য্যোত্তাপে কেহ বা শুইয়া কেহ বা বসিয়া কল্পনাতীত অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিল এবং অম্লান বদনে দেখিতেছিল যে, তাহাদের পূর্ব্বে যে সকল আহত ব্যক্তি হাসপাতালে আসিয়াছে তাহাদিগকে লইয়াই অস্ত্র-চিকিৎসকেরা ব্যস্ত আছেন। এই দৃশ্যটি কেমন মহত্বপূর্ণ!—তাহারা সকলে এইরূপ বলিতেছে যে "আমাদের কষ্ট কিসের? আমরা অনেক দিন সরকারের লবণ খাইয়াছি—আমরা মরিলে কি ক্ষতি? আমরা ভাল কাজ করিয়াছি—আমরা মরিলে সরকার অবশ্য আমাদিগের পরিবারের ভরণ-পোষণের ভারগ্রহণ করিবেন।" এক জনের স্কন্ধাস্থি-সন্ধি হইতে অজস্র ধারে রক্ত নির্গত হইতেছিল—বলাধানের জন্য তাহাকে জল-মিশ্রিত ব্রাণ্ডি প্রদত্ত হয় কিন্তু তাহার পার্শ্বে আর একজন যন্ত্রণায় গোঁঙরাইতেছিল; পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি উদারতার পরিচয় দিয়া বলিল—"আগে আমার ভাইকে দাও।"—তৎপরে সে তাহা পান করিয়া বলিল "আমি আহত হইয়াছি তাহাতে ক্ষতি নাই, কারণ আমি জানি সরকার আমাকে ভুলিবেন না।" অস্ত্রচিকিৎসক সেই আহত ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও অঙ্গ ছেদনে প্রবৃত্ত হইলে তাহারা বীরোচিত ধৈর্য্য-সহকারে তাহা সহ্য করিল। ক্লোরোফরম্ দিয়া তাহাদিগকে অচেতন করা হয় নাই—অথচ যখন সেই ভয়ানক ছুরিকা তাহাদের শরীর হইতে কোন অঙ্গ বিশেষ বিচ্ছিন্ন করিতেছিল, তখন তাহাদিগের মুখ হইতে একটি হা হুতাশও নির্গত হয় নাই। তাহারা যুদ্ধের সময় যেরূপ ধীর সাহসী ও নির্ভীক; সেইরূপ অস্ত্রচিকিৎসকের বিষম যন্ত্রণাজনক অস্ত্রাঘাতেও তাহারা ধৈর্য্য, দৃঢ়তা ও চিত্ত প্রসাদের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছিল!

হল্ট ম্যাকেনজি একটি আশ্চর্য্য ঘটনার কথা আমার নিকট উল্লেখ করেন। কোন দাঙ্গায় দুই ভ্রাতা দণ্ডনীয় হয়; ইহার মধ্যে একজনের অতি সামান্য দণ্ড হয়—আর একজনের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। যাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য অপর ভ্রাতা তাহার নামের পরিচয় দিয়া স্বয়ং ফাঁশিকাষ্ঠে আরোহণ করিবার চেষ্টা করে।

ম্যাকেনজি বলেন ইংলণ্ডের নিউগেট্ কারাগারের ইতিবৃত্তে বোধ হয় ঈদৃশ ঘটনা দৃষ্ট হয় না।

বদান্যতা হিন্দুচরিত্রের আর একটি লক্ষণ। ভারতবর্ষে (Poor law) অর্থাৎ দারিদ্র্য নিবারণের জন্য কোন বিশেষ রাজ-বিধি নাই,—কোন কালে ছিলও না। এদেশে কেহ কখন বাধ্য হইয়া ক্ষুধিতকে অন্ন ও উলঙ্গকে বস্ত্র দান করে নাই। ভূমি যতই ফলবতী হউক না কেন—লোক-সমাজের যতই উন্নত অবস্থা হউক না কেন —বিংশতি কোটি লোকের মধ্যে দীন দরিদ্র থাকিবেই থাকিবে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষ যেরূপ দুর্ভিক্ষ মহামারী ও অশেষ যুদ্ধ বিপ্লবের রঙ্গভূমি, তাহাতে এখানে দরিদ্রের সংখ্যা তো আরও অধিক হইবার কথা। তথাপি এখানে যে দারিদ্র্য-কষ্ট নিবারণ হইতেছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে, হিন্দু-সমাজের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা দানশীলতা একবারে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। খৃষ্ট জন্মিবার ছয় শতাব্দী পূর্ব্বে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রথম অধিষ্ঠান হইতে আবহমান কাল পর্য্যন্ত—বুদ্ধ পুরোহিতেরা কমণ্ডলু-হস্তে ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করে! ইউরোপে ভিখারীগণকে যেরূপ কঠোর অর্দ্ধ-চন্দ্র খাইতে হয় ভারতবর্ষে সেরূপ নহে। এখানে ভিখারীগণের যাচ্ঞা নিষ্ফল হয় না—তাহারা বিশ্বস্ত চিত্তে ভিক্ষা করে—তাহারা বিলক্ষণ জানে যে এখানে লোকেরা ধর্ম্মের জন্যই দান করে। সর জন ম্যালকম বলেন প্রসিদ্ধ আলা-বাইয়ের বদান্যতা এতদূর ছিল যে তিনি হোলকার রাজ্যের অনেক স্থানে যে কেবল নিজ হস্তে প্রতিদিন দরিদ্রগণকে দান করিতেন এমত নহে, তিনি পথ-প্রান্তে তৃষিত পথিকদিগের জন্য অসংখ্য জলছত্র ও সরাই নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উপচিকীর্ষা মনুষ্য-জাতিতে বদ্ধ ছিল না। যে সকল পক্ষিগণকে কৃষকেরা নিজ নিজ ক্ষেত্র হইতে তাড়াইয়া দিত, তাহাদিগের জন্য তিনি স্বতন্ত্র শস্যময় ক্ষেত্র সকল উন্মুক্ত রাখিতেন। এই রূপ পশুদিগের প্রতি দয়াভাব যে শুদ্ধ পক্ষি-জাতিতে বদ্ধ এমত নহে, যাঁহারা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন—ধর্ম্মের সাঁড় সকল নগরের পথে ঘাটে মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছে এবং অবাধে পথ-প্রান্তস্থিত দোকানদারদের শস্য-পূর্ণ চাঙ্গারি মধ্যে মুখ দিতেছে—দোকানদারগণ তাহাদিগকে প্রহার না করিয়া শুধু ধম্‌কাইয়া তাড়াইয়া দিতেছে। * * *। পুষ্করিণী, সরাই, জলছত্র, অন্নছত্র প্রভৃতি জনহিতকারী সাধারণ কার্য্যে কত লোকে কত ব্যয় স্বীকার করিতেছে, তাহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

পিতামাতা ও আত্মীয় কুটুম্বদিগের প্রতি অনুরাগ হিন্দু-চরিত্রের আর একটি প্রধান লক্ষণ।

১৭৯৬-৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ হইতে এক দল সিপাহিসৈন্য—হায়দ্রাবাদে প্রেরিত হয়। তাহারা তাহাদিগের বেতন হইতে কিয়দংশ টাকা লইয়া স্ত্রীপরিবারগণকে

দিবার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা করিয়া যায়। কাপ্তেন উইলিয়াম্‌স্‌ বলেন যে, এ বিষয়ে তাহাদিগের চরিত্র ও আচরণ আদর্শ-স্বরূপ বলা যাইতে পারে। তাহারা কেবল যে স্বীয় স্ত্রীপুত্রগণকেই তাহাদিগের আয়ের অধিকাংশ দেয় এরূপ নহে; তাহাদিগকে তো দিতেই হইবে।* কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকে স্বীয় বৃদ্ধ পিতামাতা ও দরিদ্র আত্মীয় স্বজনকেও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রফুল্লচিত্তে সাহায্য করে। তাহারা পিতামাতা আত্মীয় স্বজনকে এত অধিক দান করে যে, বিদেশ-যাত্রাকালে পাছে তাহারা নিজে অর্থাভাবে কষ্ট পায় এই জন্য গভর্ণমেণ্টকে সময়ে সময়ে তাহাদের আয়-ব্যয়ে হস্ত-ক্ষেপ করিতে হয়। বঙ্গদেশ, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, এই তিন স্থানের সৈন্যগণের মধ্যেই এই রূপ সদ্ব্যবহার লক্ষিত হয়।

শিষ্টাচার হিন্দুচরিত্রের আর একটী প্রধান লক্ষণ। সর্ জন ম্যাল্‌কম বলেন—ভারতবর্ষবাসীগণ সকল জাতি অপেক্ষা অধিক শিষ্টাচারী। তাহারা প্রায় কখনই শিষ্টাচারের ব্যতিক্রম করে না। তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া প্রথমেই কাজকর্ম্মের প্রসঙ্গ উপস্থিত করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ। পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের বিষয়, আভিজাত্য বা ব্যক্তিগত কোন বিশেষ অভ্যাস বা রীতি নীতির কথা, ভদ্রের সহিত কথোপকথনে উপস্থিত করিতে নাই; পরিচ্ছদ বা কোন কুটুম্বের মুখশ্রী লইয়া কোন কথা বলা রূঢ়তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সম্মুখে অলঙ্কার, অশ্ব, হস্তী, প্রভৃতি যান বাহনের প্রশংসা করিলে বক্তাকে নম্রভাবে নিরস্ত করিয়া দেওয়া একটি শিষ্টাচারের নিয়ম। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন আমরা কেমন উদারতা-সহকারে এতদ্দেশীয়দিগের প্রতি 'নিগর্' এই ঘৃণা-ব্যঞ্জক শব্দটি অকাতরে প্রয়োগ করিয়া থাকি।

প্রসিদ্ধ পার্সি পোত-নির্ম্মাতা জ্যাম্‌সেট্‌জি এই নিগর্-শব্দ-প্রয়োগ লইয়া একটি যে তীব্র শ্লেষ-পূর্ণ উত্তর দিয়াছিলেন, জেনেরাল ব্রিগ্‌স্‌ তাহার উল্লেখ করেন। জ্যাম্‌সেট্‌জি একজন সামান্য ছুতার মিস্ত্রী হইতে পোত-নির্ম্মাতার পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি একমাত্র এতদ্দেশীয়দিগের কায়িক শ্রমের সাহায্যে রয়াল নেভির জন্য একটি জাহাজ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ জাহাজ ভাসাইবার যোগ্য হইলে, তিনি প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা ও তাঁহার অনুচরগণ এবং নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারিগণকে নিমন্ত্রণ করেন। জ্যাম্‌সেট্‌জি নিমন্ত্রিতদিগের জন্য সমস্ত আয়োজন করিতে করিতে জাহাজের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং গর্ব্ব ও সন্তোষ-সহকারে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

* প্রধান সেনাপতি সর্ চার্লস নেপিয়রের কালে কোন সৈনিক পুরুষ তাহার বিলাতস্থ মাতাকে আপনার বেতনের কিয়দংশ প্রতিমাসে প্রেরণ করাতে প্রধান সেনাপতি এই আচরণ অনুকরণ-যোগ্য বলিয়া সাধারণ সৈন্য-সমীপে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ আচরণ ভারতবর্ষীয়দিগের সম্বন্ধে আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

তৎপরে তিনি তদুপরি আরোহন-পূর্ব্বক জাহাজের খোলের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া এই কথাগুলি খুদিয়া রাখিলেন,—'১৮০০ খৃষ্টাব্দে এক জন কদাকার নিগর্ কর্ত্তৃক এই জাহাজ নির্ম্মিত হয়।' সে সময় তিনি এ কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করেন নাই—কিন্তু অনেক বৎসর পরে যখন জাহাজ আবার ডকে ফিরিয়া আসিল—তখন তিনি সকলকে সেই খোদিত লিপি দেখাইয়া দিলেন এবং তাহার মধ্যে যে একটি গূঢ় ভর্ৎসনা নিহিত ছিল তাহার ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।"

উপরোক্ত সমস্তই আমরা সাইক্সের প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

আমাদের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর জেনেরল ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ পার্লিয়ামেণ্টে সাক্ষ্য দিবার সময় হিন্দুচরিত্র-সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।—"কেহ কেহ অনেক কষ্ট করিয়া এখানকার সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই রূপ একটি সংস্কার জন্মাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন যে, ভারতবর্ষবাসীদিগের মধ্যে নীতি-জ্ঞানের অত্যন্ত হীনাবস্থা এবং যে সকল পাপাচার মনুষ্য-প্রকৃতিকে কলঙ্কিত করে, সেই সমস্ত তাহাদিগের কর্ত্তৃক অবাধে সচরাচর অনুষ্ঠিত হয়। আমি যে শপথ গ্রহণ করিয়াছি তাহার উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার দৃঢ়তা সহকারে বলিতেছি যে, তাহাদিগের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা অসত্য এবং সম্পূর্ণরূপে অমূলক। ভারতবর্ষ-বাসীদিগের কথা বলিতে গেলে হিন্দুদিগকে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক, যে হেতু ভারতবর্ষনিবাসীদিগের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু—ইহাদিগের মধ্যে মুসলমানও অনেক আছে, কিন্তু তাহারা স্বতন্ত্র সমাজে অবস্থান করে। হিন্দুরা অতি ভদ্র, উপচিকীর্ষু—তাহাদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করিলে তাহারা প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যগ্র হয় না বরং কেহ সদ্ব্যবহার করিলে তাহার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হয়। মনুষ্য-হৃদয়ের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মধ্যে যেরূপ দৃষ্ট হয়, ইহাদের মধ্যে তদপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক দৃষ্ট হয় না। তাহাদিগের মধ্যে কুসংস্কার আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের ন্যায় আমাদের সংস্কার নয় বলিয়া, তাহারা আমাদিগের সম্বন্ধে কিছুই মন্দ মনে করে না। তাহাদিগের উপাসনা-প্রণালী হীন হইলেও তাহাদিগের ধর্ম্মমধ্যে যে সকল উপদেশ আছে তাহা জনসমাজের উৎকৃষ্টতম উদ্দেশ্য-সাধন-পক্ষে উপযোগী।"

ইংরাজদিগের মধ্যে যাঁহারা সত্যপ্রিয় তাঁহারা স্বীয় সমাজ ও আমাদিগের সমাজ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা স্বতন্ত্র রূপে উদ্ধৃত করিয়াছি। নীতি বিষয়ে তাঁহাদের সমাজ অপেক্ষা ভারতবর্ষীয় সমাজ যে অনেকাংশে উৎকৃষ্ট তাহা তাঁহাদের বাক্যেই এক প্রকার সপ্রমাণ হইতেছে। বুদ্ধি জ্ঞান বিষয়ে আমরা যে এক্ষণে তাঁহাদিগের অপেক্ষা অনেক পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছি তাহা আমরা অস্বীকার করি না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি

যে জ্ঞান ও নীতি যদিও পরস্পর পরস্পরের উন্নতি-সাপেক্ষ তথাপি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র সাধনা আবশ্যক। জ্ঞানের উন্নতিতে নীতিরও যে কিয়ৎপরিমাণে উন্নতি হয়—তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, যে পরিমাণে জ্ঞানের উন্নতি হয় সেই পরিমাণেই যে নীতির উন্নতি হইবে,জ্ঞান নীতির মধ্যে এইরূপ কোন বাধ্যবাধক সম্বন্ধ নাই। তাহা যদি থাকিত তাহা হইলে ইংরাজেরা নীতি-বিষয়ে আমাদিগের অপেক্ষা অসংখ্য গুণে শ্রেষ্ঠ হইত সন্দেহ নাই। কারণ তাহারা আমাদিগের অপেক্ষা জ্ঞান-বিষয়ে অনেক পরিমাণে উন্নত। আমাদের যেরূপ প্রকৃতি, তাহাতে শরীর মন হৃদয় তিনই পরস্পর পরস্পরের উন্নতি-সাপেক্ষ, কারণ এই তিনই পরস্পর পরস্পরের সহিত জড়িত হইয়া আছে। শরীরের উন্নতিতে মনেরও কিয়ৎপরিমাণে উন্নতি হয় বটে, কিন্তু কেহ যদি মনে করেন যে, ব্যায়াম দ্বারা শরীর সবল ও সুস্থ হইলেই মন সাধনা-ব্যতীত আপনা হইতেই বুদ্ধি জ্ঞানে পুষ্ট হইবে, তিনি যেরূপ মহাভ্রমে পতিত হয়েন, সেই রূপ যিনি মনে করেন, যে পরিমাণে বুদ্ধিবৃত্তি মার্জ্জিত হইবে সেই পরিমাণে হৃদয়ের বৃত্তি সকলও উন্নত হইবে, তিনিও তদ্রূপ মহাভ্রমে পতিত হয়েন। নীতির মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞানের অংশ আছে সত্য—কিন্তু ভাবই উহার মূল উপকরণ—ভাবই উহার পত্তন-ভূমি, এবং ভাবই উহার প্রাণ। এই জন্যই আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে, এক জন লোক হয় তো সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি পণ্ডিত, অথচ সে নীতি বিষয়ে পশু অপেক্ষাও অধম—আর এক জন নিতান্ত নির্ব্বোধ অনক্ষর মূর্খ অথচ সে নীতি বিষয়ে উপরি উক্ত পণ্ডিত অপেক্ষাও অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। বেকনের ন্যায় অসাধারণ-ধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিত বোধ হয় পৃথিবীতে অল্পই জন্ম-গ্রহণ করিয়াছেন—কিন্তু তাঁহার দুর্নীতি ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ইংরাজ-কবি পোপ লিখিয়াছেন;—

"If parts allure thee, think how
Bacon shined,
The wisest, brightest, the meanest of
mankind."

ব্যক্তি-বিশেষের মধ্যে যখন এইরূপ বৈষম্য দৃষ্ট হয় তখন ব্যক্তি-বিশেষের সমষ্টি জাতি-বিশেষের মধ্যেও যে এইরূপ বৈষম্য থাকিতে পারে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি, এবং ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষীয় জনসমাজ-মধ্যে যে এইরূপ বৈষম্য আছে তাহাও আমরা এক প্রকার দেখাইয়াছি।

মনুষ্য দয়া, ভক্তি, প্রেম, ন্যায়পরতা প্রভৃতি হৃদয়ের উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকল দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে সকল কার্য্য করে এবং যাহা ভাল বলিয়া হৃদয়ও আপনা হইতেই সায় দেয়, তাহাই যে সুনীতি-মূলক কার্য্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হৃদয়ের এই সকল উৎকৃষ্ট ভাব হইতে যে সমস্ত কার্য্য স্বতই উৎপন্ন হয় সেই সকল কার্য্যের ফলাফল যখন আমরা আ

বার বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখি যে তদ্দ্বারা জন-সমাজের কোন হানি হয় না প্রত্যুত প্রভুত মঙ্গল হয়, তখন সেই সকল কার্য্য যে সুনীতি-মূলক তাহা জ্ঞান দ্বারা আমরা পরে দৃঢ়ীভুত করিয়া লই মাত্র। মিথ্যা কথা কহিবে না—ইহা একটি নৈতিক সত্য। পার্ব্বত্য-জাতি ও সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্যেরা, যে, মিথ্যা কথা প্রাণান্তেও কহে না তাহারা কি সমাজের ভাবী অনিষ্ট চিন্তা করিয়া ঐ রূপ আচরণ করে?—এরূপ বিচার-শক্তি তাহাদিগের নাই। আবার যখন কোন বুদ্ধি-জ্ঞান-সম্পন্ন সুসভ্য ব্যক্তি ইহার ফলাফল-বিচারে প্রবৃত্ত হন, তখন দেখিতে পান যে, সত্য কথা বলিলে জন-সমাজের সর্ব্বাংশে মঙ্গল হইবারই সম্ভাবনা। অতএব দেখা যাইতেছে হৃদয় হইতে যে সকল নীতি সমুদ্ভূত হয় বুদ্ধি তাহাকে পরে দৃঢ়ীকৃত করে মাত্র। অতএব শুদ্ধ জ্ঞানের উন্নতিতে নীতির উন্নতি হয় না, হৃদয়ের উন্নতি সর্ব্বাগ্রে বিশেষ আবশ্যক।

বিষয়-রাশির সহিত সংঘর্ষণে জ্ঞান যেরূপ ক্রমশঃ উদ্বোধিত হয়, হৃদয়ের ভাবও সেই রূপ ক্রমশঃ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। সাধনা অভ্যাস ও অবস্থা বিশেষে স্মৃতি, তুলনা কল্পনা প্রভৃতি মনুষ্যের বিশেষ বিশেষ বুদ্ধি-বৃত্তি সকলের যেরূপ উন্নতি হয়—হৃদয়ের বৃত্তি-সম্বন্ধেও সেই রূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়।

বকল সাহেব বলেন কুনীতি অপেক্ষা অজ্ঞান হইতে জনসমাজের অধিক অনিষ্ট হয়। তিনি বলেন—এক জন লোকের অভিপ্রায় সৎ হইলেও তদ্দ্বারা এরূপ সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে যাহা জনসাধারণের পক্ষে অতীব অনিষ্টকর। ইহার দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি বলেন, পূর্ব্বতন রোমীয় সম্রাটগণের মধ্যে যাঁহারা খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রতি দারুণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই সৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন; অর্থাৎ তাঁহারা জনসমাজের মঙ্গল-কামনায় নিঃস্বার্থ ভাবে ঐরূপ পীড়ন করিয়াছিলেন। সদভিপ্রায় সত্ত্বেও অজ্ঞানতা বশতঃ যে অনেক মন্দ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে পারে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, এক জন লোক অজ্ঞান অথচ সৎ—আর এক জন জ্ঞানবান্ অথচ অসৎ—এই উভয় লোকের মধ্যে কাহার দ্বারা জগতের অধিক অমঙ্গল হয়?—এক জন জ্ঞানবান অসৎ লোক এরূপ কৌশলে আর এক জনের সর্ব্বনাশ করিতে পারে যে, সেই নিপীড়িত ব্যক্তি বুঝিতেও পারিবে না যে তাহার সর্ব্বনাশ হইতেছে, কিম্বা এত বিলম্বে বুঝিবে যে তখন প্রতিবিধানেরও আর কোন উপায় নাই। ইতিহাস ইহার নিদর্শন। যখন আকবর শা ভারতবর্ষের সিংহাসনে প্রথম অধিরূঢ় হয়েন, তখন তাঁহার রাজকার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মে নাই এবং বুদ্ধিরও তাদৃশ পরিণতি হয় নাই।* এই

* "He was long ranked with Shab-udin, Alla, and other instruments of

জন্য তিনিও প্রথমে আল্লাউদ্দীন প্রভৃতি অত্যাচারী মুসলমানের ন্যায় ধর্ম্মান্ধ হইয়া হিন্দুদিগের মন্দির সকল চূর্ণ করিয়া সেই সেই স্থানে মস্‌জিদ্ স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিমান আক্‌বর আপনার এই ভ্রম শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন যে, স্পষ্টতঃ এরূপ হিন্দুদিগের ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিলে স্বীয় রাজত্ব রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে। এই জন্য তিনি প্রকাশ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধে অপক্ষপাতিতা দেখাইয়া ভিতরে ভিতরে হিন্দুধর্ম্মের বন্ধন শিথিল করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। † তিনি নানা প্রলোভন দেখাইয়া স্বীয় পরিবার-মধ্যে রাজপুত-মহিলাগণের সহিত বিবাহ-প্রথা প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিলেন। চতুর আকবর এই এক রাজনীতির বলে রাজপুতদিগের রাজ্যসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা ও ধর্ম্মের উপর অলক্ষিত ভাবে এবং বিনা আড়ম্বরে জয় লাভ করিলেন। কাহারও স্বাধীনতা হরণ করা যদি বিষম অনিষ্টজনক কার্য্য-মধ্যে গণনীয় হয়, তাহা হইলে আক্‌বর শা রাজপুত জনসমাজের যে বিষম অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার পূর্ব্বে কোন মুসলমান সম্রাট বাহুবলে রাজপুতদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। ‡ আক্‌বর শা বুদ্ধিবলেই তাহাদিগের স্বাধীনতা হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিবল না থাকিলে তিনি এই অনিষ্ট সাধনে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না। সেকন্দর শা—নেপোলিয়ন প্রভৃতি রাজ-দস্যুগণ যাঁহারা মানব-মণ্ডলীর স্বাধীনতা অপহরণ করিয়াছিলেন, বাহুবলের সহিত তাঁহাদিগের বুদ্ধি-বল না থাকিলে কখনই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না।

বকল সাহেব বলেন জ্ঞানের উন্নতিতেই পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়, তাহাতে নীতির প্রায় কোন হস্ত নাই। তাহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তিনি এই কথা বলেন যে, ইউরোপে যে এত যুদ্ধ-বিগ্রহ কমিয়াছে তাহার কারন বারুদের আবিষ্কার, আড্যানস্মিথ্ কর্ত্তৃক বার্ত্তা-শাস্ত্রের মত-পরিবর্ত্তন এবং বাষ্পীয় শকট ও অর্ণব-

destuction, and with every just claim; and like these, he constructed a Mumba for the Koran from the altars of Eklinga."

Tod's Rajasthan Vo I—P. 324.

† Oodoy-'le gros was the first of his race who gave a daughter in marriage to a Tatar. The bribe for which he bartered his honour was splendid; for four provinces yeilding 200,000 Ls of anunal revenue, were given in exchange for Jod Bae at once doubling the fisc of Marwar. With examples as Amber and Marwar, and with less power to resist the tamptation, the minor chiefs of Rajasthan with a brave and numerous vassalage, were transformed into Satraps of Deli. Do-P. 335.

‡ "Akber was the real founder of the empire of the Moguls, the first successful conqueror of Rajpoot independence."—Do—P. 324.

যানের সাহায্যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংশ্রব স্থাপন ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাঁহার বলিবার তাৎপর্য্য এই—যেহেতু এই সমস্ত ব্যাপার জ্ঞানের ফল, অতএব জ্ঞানের উন্নতিতেই যুদ্ধ-রূপ অমঙ্গল তিরোহিত হইয়াছে।

বকল যে সময় সভ্যতার ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তখন প্রায় চত্বারিংশ বৎসরব্যাপী শান্তির পর, ইউরোপের মধ্যে অসভ্যতম জাতিদ্বয় তুর্ক ও রুশীয়দিগের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল, তাই তিনি মনে করিয়াছিলেন বুঝি জ্ঞানোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সভ্যদেশ হইতে যুদ্ধ বিগ্রহ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। কিন্তু বকল সাহেব যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার মতের অসারতা এক্ষণে বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারিতেন। ইউরোপের মধ্যে যে দুই জাতি সর্ব্বাপেক্ষা সভ্যতম, জর্ম্মান ও ফরাসি, তাহাদিগের মধ্যে সে দিন কি ভয়ানক যুদ্ধই না হইয়া গেল। এক্ষণে তো রুসিয়া তুর্কির মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে। এই যুদ্ধানলে সমস্ত ইউরোপ যে আবার প্রজ্জ্বলিত হইবে না তাহাই বা কে বলিতে পারে। গত জর্ম্মণ ফরাসি যুদ্ধের নৈতিক কারণ অনুসন্ধান করিলে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবে যে, জর্ম্মণ জাতির প্রতি-হিংসা প্রবৃত্তি এবং ফরাসি জাতির অযথা আত্মাভিমানই সেই যুদ্ধের মূল কারণ।

বাষ্পীয় শকট ও অর্ণব-যানের প্রভাবে ইউরোপে কি যুদ্ধবিগ্রহের কিছুমাত্র হ্রাস হইয়াছে? প্রত্যুত এখন এইরূপ বোধ হয় যেন যুদ্ধবিগ্রহের জন্যই বাষ্পীয় শকট প্রভৃতির সৃষ্টি; কারণ প্রায়ই দেখা যায় যেখানে আর কোন প্রয়োজন সাধিত হইতেছে না, সেখানে কেবল যুদ্ধবিগ্রহের সৌকর্য্যার্থে লৌহবর্ত্মের জাল বিস্তৃত হইতেছে। বরং এক্ষণে যেরূপ জ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে হত্যাসাধক নানাবিধ কৌশলময় যন্ত্রেরও সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। যতদিন ইউরোপে স্বার্থপরতার প্রাদুর্ভাব থাকিবে, যত দিন না সেখানে সমগ্র মানবজাতির প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও মমতার উদয় হইবে, তত দিন যে তথা হইতে যুদ্ধবিগ্রহ একেবারে তিরোহিত হইবে এরূপ আশা আমরা কখনই করিতে পারি না। এই অনুরাগ এই মমতা ধর্ম্ম-নীতিরই অন্তর্ভূত। অতএব বকল সাহেব যে বলেন জ্ঞানের উন্নতিতেই যুদ্ধবিগ্রহ কমিয়াছে তাহা যুক্তি-সঙ্গত নহে। ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, কেবল বাষ্পীয় শকট প্রভৃতির বহুলতা হইলেই হয় না—জনসাধারণের হৃদয়ের উন্নতি সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি দ্বারা বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে গতিবিধির সুবিধা হইয়া পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে সৌহার্দ্দ্য বর্দ্ধিত হইতে পারে বটে—এবং এইরূপে জনসাধারণের হৃদয়ের উন্নতি-সাধন-পক্ষে সহায়তা হইতে পারে সত্য, কিন্তু ইহা অন্যান্য উপায়ের মধ্যে একটী উপায় মাত্র। যদি এই সকল উপায়ে যুদ্ধবিগ্রহের উপশম হয়, তবে ইহার অব্যবহিত কারণ কি জানা

আবশ্যক; ধর্ম্ম-নীতিই যে ইহার অব্যবহিত কারণ তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। মনুষ্য সমাজে যে পরিমাণে অমঙ্গল সকল তিরোহিত হইয়া মঙ্গলের রাজ্য বিস্তৃত হয়, সেই পরিমাণে জনসমাজে প্রকৃত সভ্যতার উদয় হয়। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে ধর্ম্মনীতি ব্যতীত কেবল জ্ঞান দ্বারা জনসমাজের অমঙ্গল সকল দূরীকৃত হয় না, অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে জ্ঞান ও নীতির সামঞ্জস্য-ব্যতীত জনসমাজে প্রকৃত সভ্যতারও অভ্যুদয় হয় না।

স্বঃ

* ভানুসিংহের কবিতা।

মল্লার—

সজনি গো——
অঁধার রজনী ঘোর ঘন ঘটা
চমকত দামিনী রে।
কুঞ্জপথে সখি, কয়্সে যাওব
অবলা কামিনীরে॥ ধূয়া॥
উন্মদ-পবনে যমুনা উথলত
ঘন ঘন গরজত মেহ।
দমকত বিদ্যুত বজ্র নিনাদত,
থর হর কম্পত দেহ॥
ঘন ঘন রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্, রিম্ ঝিম্,
বরখত নীরদ-রাশ।
অব সখি কয়সে যায়ব অবলা
কুঞ্জে কানুক পাশ॥
বোল ত সজনী এ দুরুযোগে
কুঞ্জে নিরদয় কান।
দারুণ বাঁশী কাহ বজায়ত
রাধা রাধা নাম॥
সজনি—
মোতিম হারে বেশ বনাদে
সাঁথি লগাদে ভালে।
উরহি বিলোলিত শিথিল চিকুর মম
বাঁধহ মালত-মালে॥
নয়নে অঞ্জন রঞ্জহ সত্বর
অলত লগাদে পায়।
একল যাওব যঁহি রে বাঁশী
রাধা রাধা গায়॥
হিয়া মাঝ সখি প্রেম দীপতহ
আঁধামে ক্যা হয় ডরলো।
শ্যাম ক ছোড়য় রাধা কয়সে
একলি রহবে ঘর লো॥
গহন রয়নমে ন যাও বালা
নয়ল কিশোর-ক পাশ।
গরজে ঘন ঘন, বহু ডর থাওব
কহে ভানু তব দাস॥

* এই ব্রজ-গাথাগুলি হিন্দুস্থানী উচ্চারণে ও দীর্ঘ হ্রস্ব রক্ষা করিয়া সংস্কৃত ছন্দের নিয়মানুসারে না পড়িলে শ্রুতি-মধুর হয় না—প্রত্যুত হাস্য জনক হইয়া পড়ে।

মেহ———মেঘ
বরখত———বর্ষিতেছে
দুরুযোগ———দুর্য্যোগ
উরহি বিলোলিত—বক্ষে আলুলিত
অলত———আলতা
যঁহি———যথায়
দীপতহ———জ্বলিতেছে
রয়ন———রাত্রি
নয়ল———নবীন

উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে।

যখন বিবেচনা করি যে, এ প্রদেশে ইউরোপীয় সভ্যতা আসিয়া কি বিপ্লব আনয়ন করিয়াছে, যখন বিবেচনা করি যে ইউরোপীয়দিগের গুণ সকল আমাদিগের দ্বারা অনুকৃত না হইয়া দোষ সকল অনুকৃত হইতেছে এবং যে লোকযাত্রা-নির্ব্বাহ-প্রণালী ইংলণ্ডের উপযুক্ত, এদেশে তাহা আরোপিত হইয়া কি অনিষ্ট সাধন করিতেছে, তখন আমার মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন দেখি যে, যৎকালে নিদাব-তাপের আতিশয্যে সমস্ত প্রকৃতি অবসন্ন, সমস্ত প্রাণী আকুল, মনুষ্যেরা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তখন কোন ইঙ্গ-বঙ্গ ইংরাজী-পরিচ্ছদ আঁটিয়া কষ্টে-সৃষ্টে সঞ্চরণ করিতেছেন, তথাপি তাহা পরিত্যাগ করিতেছেন না, তখন মনে হয় যে উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তজ্জন্যই এরূপ হইতেছে।

যখন দেখি যে আমাদিগের দেশের ইংরাজী-নবিশেরা আমাদিগের জাতির যেন কোন সুখাদ্য নাই এই জন্য ইংরাজী অর্দ্ধপক আমপ্রায় মাংস ও "সজীব" পণির ভক্ষণে রত হইতেছে, যখন দেখি যে, লোকে খানা খাইয়া তাহা গোপন করিবার চেষ্টায় কপট ব্যবহার করিতেছে, যখন দেখি বাঙ্গালী, হোটেলে আহার করিয়া হোটেলস্থ ইংরাজ অভ্যাগতদিগের হাস্যাস্পদ হইতেছে, যখন দেখি যে, বাঙ্গালীরা ইংরাজী প্রণালী-অনুসারে আহারে বসিয়া ইংরাজী শিষ্টাচারের কতই নিয়ম ভঙ্গ করিয়া থাকে, যখন দেখি যে, যাহাদিগের পেটে ইংরাজী A অক্ষর নাই, তাহারা তাহাদিগের অজ্ঞাত ইংরাজী আহার দ্রব্য অঙ্গুলী দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া "এটা দেও ওটা দেও" বলে, যখন দেখি যে, তাহারা ইংরাজী শব্দ good health অজ্ঞাত থাকা প্রযুক্ত good hell বলিয়া মদ্যপান করে, তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইয়াছে।

যখন দেখি যে, লোকে স্বদেশীয় ভাষা অপেক্ষা বিদেশীয় ভাষা অনুশীলনের প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদান করিতেছে, ঐ ভাষা আয়ত্ত করিবার মানসে অনেক বৎসর ক্ষেপণ করিতেছে, তথাপি প্রকৃত-রূপে আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না; যখন দেখি যে,বাঙ্গালী ইংরাজের মত ইংরাজী লিখিতে ও কহিতে পারগ হইবার দুরাকাঙ্ক্ষায় কি কষ্ট না পাইতেছে; যখন দেখি যে,বিদেশীয় ভাষার কোন শব্দ-উচ্চারণে অশুদ্ধ প্রয়োগ ধৃত হইলে যেন কত অপকর্ম্ম করিয়াছে মনে করিয়া লোকে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হয়; অথচ বাঙ্গালায় অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করা শ্লাঘার বিষয় মনে করে; যখন দেখি যে, লোকে ইংরাজী ভাষায় অসংখ্য ভুল করিয়াও তাহাতে সামান্য পত্র লিখিবে

তথাচ দেশীয় ভাষায় উহা লিখিবে না; যখন দেখি যে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সঙ্গে দশটা ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কথা কহেন, যখন শুনি যে,তাঁহারা আপনাদিগের ছাত্রকে বাঙ্গালায় দরজা দিতে না বলিয়া ইংরাজীতে 'give the door' বলেন; যখন বিবেচনা করি যে, এ-বিড়ম্বনার কারণ কি ; তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন দেখি, সন্তানদিগকে ইংরাজী বিদ্যা শিখাইবার জন্য লোকে অতিশয় আগ্রহবিশিষ্ট,ও তাহাদিগকে তৎপাঠে প্রবৃত্ত করাইয়া এত পরিশ্রম করাইতেছে যে, তাহাদিগের আর আহারের অবকাশ নাই,শারীরিক স্বাস্থ্য ও উন্নতির প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ নাই ; যখন দেখি, বিদেশীয় ভাষা আয়ত্ত করিবার জন্য কলেজের ছাত্রেরা এত পরিশ্রম করিতেছে যে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের দৃষ্টি ক্ষীণ হইতেছে, মস্তক ঘুরিতেছে, তথাপি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতেছে না ও নিবৃত্ত হইলেও চলে না, যখন বিবেচনা করি এ বিপদের কারণ কি, তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা বেচারা বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এইরূপ হইতেছে।

যখন স্মরণ করি যে, সেকালের লোক অল্প অর্থে কিরূপ প্রফুল্লচিত্তে কাল কাটাইতেন, যখন বিবেচনা করি যে, এক্ষণে আমাদিগের অবান্তর অভাব ও প্রয়োজন কত বৃদ্ধি পাইয়াছে, যখন বিবেচনা করি যে, জিনিস-পত্র ক্রমে কিরূপ মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে, যখন দেখি যে, উপজীবিকার উদ্বেগে লোকের হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইয়া যাইতেছে,ও ভবিষ্যতে কি হইবে এই ভাবনায় আকুল হইতেছে, যখন বিবেচনা করি যে, আমরা ত এক রূপে কাটাইলাম, ছেলে-পুলের দশা ইহার পর কি হইবে,যখন বিবেচনা করি যে, এ মহান বিপদের কারণ কি, তখন মনে হয় যে, উদোর বোঝা হতভাগ্য বুদোর ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে তজ্জন্যই এরূপ হইতেছে।

উদো যদি চেষ্টা করে বুদোর বোঝা কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব করিতে পারে কিন্তু সে দিকে মনোযোগ নাই। বরং তাহাকে সেই বোঝা আহ্লাদ-পূর্ব্বক বহন করাইতে ইচ্ছুক দেখা যায়। বুধো চেষ্টা করিলে অনুকরণের স্রোত অনেক পরিমাণে রোধ করিয়া সমাজের সারবত্তা ও নিজের কুশল রক্ষা করিতে পারে কিন্তু সেদিকে মনোযোগ নাই। উদোর ন্যায় পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সাহস-সম্পন্ন হইলে এবং তাহাদিগের ন্যায় দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করিলে উদোর যে বোঝা বুদোর ঘাড়ে পড়িয়াছে, তাহা অনেক লাঘব হইতে পারে, কিন্তু সে দিকে বুদোর মনোযোগ নাই। এই জন্যই দেশ ক্রমে অধোগতি প্রাপ্ত হইতেছে।

বঃ—

করুণা।

ভূমিকা।

গ্রামের মধ্যে অনূপকুমারের ন্যায় ধনবান আর কেহই ছিল না; অতিথিশালা নির্ম্মাণ, দেবালয় প্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি নানা সৎকর্ম্মে তিনি ধনব্যয় করিতেন। তাঁহার সিন্ধুক পূর্ণ টাকা ছিল, দেশ-বিখ্যাত যশ ছিল, ও রূপবতী কন্যা ছিল। সমস্ত যৌবন-কাল ধন উপার্জ্জন করিয়া অনূপ বৃদ্ধ বয়সে বিশ্রাম করিতেছিলেন। এখন কেবল তাঁহার একমাত্র ভাবনা ছিল যে, কন্যার বিবাহ দিবেন কোথায়। সৎপাত্র পান নাই ও বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র আশ্রয়স্থল কন্যাকে পরগৃহে পাঠাইতে ইচ্ছা নাই, তজ্জন্যও আজ কাল করিয়া আর তাঁহার দুহিতার বিবাহ হইতেছে না।

সঙ্গিনী-অভাবে করুণার কিছুমাত্র কষ্ট হইত না, সে এমন কাল্পনিক ছিল, কল্পনার স্বপ্নে সে সমস্ত দিন-রাত্রি এমন সুখে কাটাইয়া দিত যে, মুহূর্ত্ত মাত্রও তাহাকে কষ্ট অনুভব করিতে হয় নাই। তাহার একটি পাখী ছিল, সেই পাখীটি হাতে করিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর পাড়ে কল্পনার রাজ্য নির্ম্মাণ করিত। কাঠবিড়ালীর পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া, জলে ফুল ভাসাইয়া, মাটির শিব গড়িয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিত। এক একটি গাছকে আপনার সঙ্গিনী, ভগ্নী, কন্যা বা পুত্র কল্পনা করিয়া তাহাদের সত্য সত্যই সেই রূপ যত্ন করিত, তাহাদিগকে খাবার আনিয়া দিত, মালা পরাইয়া দিত, নানা প্রকার আদর করিত, এবং তাদের পাতা শুকাইলে, ফুল ঝরিয়া পড়িলে অতিশয় ব্যথিত হইত। সন্ধ্যাবেলা পিতার নিকট যা কিছু গল্প শুনিত, বাগানে পাখীটিকে তাহাই শুনান হইত। এই রূপে করুণা তাহার জীবনের প্রত্যূষ-কাল অতিশয় সুখে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার পিতা ও প্রতিবাসীরা মনে করিতেন যে, চির কালই বুঝি ইহার এইরূপে কাটিয়া যাইবে।

কিছু দিন পরে করুণার একটি সঙ্গী মিলিল। অনূপের অনুগত কোন একটী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মরিবার সময় তাঁহার অনাথ পুত্র নরেন্দ্রকে অনূপকুমারের হস্তে সঁপিয়া যান। নরেন্দ্র অনুপের বাটিতে থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করিত, পুত্রহীন অনূপ নরেন্দ্রকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। নরেন্দ্রের মুখশ্রী বড় প্রীতিজনক ছিল না, কিন্তু সে কাহারো সহিত মিশিত না, খেলিত না, ও কথা কহিত না বলিয়া ভাল মানুষ বলিয়া তাহার বড়ই সুখ্যাতি হইয়াছিল; পল্লীময় রাষ্ট্র হইয়াছিল যে, নরেন্দ্রের মত শান্ত শিষ্ট সুবোধ বালক আর নাই, এবং পাড়ায় এমন বৃদ্ধ ছিল না যে তাহার বাড়ীর ছেলেদের প্রত্যেক কাযেই নরেন্দ্রের উদাহরণ উত্থাপন

না করিত। কিন্তু আমি তখনই বলিয়াছিলাম যে,"নরেন্দ্র তুমি বড় ভাল ছেলে নও।" কে জানে নরেন্দ্রের মুখশ্রী আমার কোন মতে ভাল লাগিত না। আসল কথা এই, অমন বাল-বৃদ্ধ গম্ভীর সুবোধ শান্ত বালক আমার ভাল লাগে না।

অনূপকুমারের স্থাপিত পাঠশালায় রঘুনাথ সার্ব্বভৌম নামে এক গুরুমহাশয় ছিলেন, তিনি নরেন্দ্রকে অপরিমিত ভাল বাসিতেন, নরেন্দ্রকে প্রায় আপনার বাড়িতে লইয়া যাইতেন এবং অনূপের নিকট তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতেন।

এই নরেন্দ্রই করুণার সঙ্গী, করুণা নরেন্দ্রের সহিত সেই পুষ্করিণীর পাড়ে গিয়া কাদার ঘর নির্ম্মাণ করিত, ফুলের মালা গাঁথিত, এবং পিতার কাছে যে সকল গল্প শুনিয়াছিল, তাহাই নরেন্দ্রকে শুনাইত, কাল্পনিক বালিকার যত কল্পনা সব নরেন্দ্রের উপরে ন্যস্ত হইল। করুণা নরেন্দ্রকে এত ভাল বাসিত যে, কিছুক্ষণ তাহাকে না দেখিতে পাইলে ভাল থাকিত না, নরেন্দ্র পাঠশালে গেলে সে সেই পাখীটি হাতে করিয়া গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিত, দূর হইতে নরেন্দ্রকে দেখিলে তাড়াতাড়ি তাহার হাত ধরিয়া সেই পুষ্করিণীর পাড়ে সেই নারিকেল গাছের তলায় আসিত, ও তাহার কল্পনা-রচিত কতকি অদ্ভুত কথা শুনাইত।

নরেন্দ্র ক্রমে কিছু বড় হইলে কলিকাতায় ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। কলিকাতার বাতাস লাগিয়া পল্লীগ্রামের বালকের কতকগুলি উৎকট রোগ জন্মিল। শুনিয়াছি স্কুলের বেতন ও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার ব্যয় যাহা কিছু পাইত তাহাতে নরেন্দ্রের তামাকের খরচটা বেশ চলিত। প্রতি শনিবারে দেশে যাইবার নিয়ম আছে, কিন্তু নরেন্দ্র তাহার সঙ্গীদের মুখে শুনিল যে, শনিবারে যদি কলিকাতা ছাড়িয়া যাওয়া হয় তবে গলায় দড়ি দিয়া মরাটাই বা কি মন্দ? বালক বাটীতে গিয়া অনূপকে বুঝাইয়া দিল যে, সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন বাড়িতে থাকিলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। অনূপ নরেন্দ্রের বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ দেখিয়া মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিলেন যে, বড় হইলে সে ডিপুটি মাজিস্টর হইবে। তখন দুই এক মাস অন্তর নরেন্দ্র বাড়িতে আসিত, কিন্তু এ আর সে নরেন্দ্র নহে, পানের পিকে ওষ্ঠাধর প্লাবিত করিয়া, মাথায় চাদর বাঁধিয়া, দুই পার্শ্বের দুই সঙ্গীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, কনস্টেবলদের ভীতিজনক যে নরেন্দ্র প্রদোষে কলিকাতার গলিতে গলিতে মারামারি খুঁজিয়া বেড়াইত, গাড়িতে ভদ্রলোক দেখিলে কদলীর অনুকরণে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিত, নিরীহ পান্থ বেচারীদিগের দেহে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নির্দ্দোষীর মত আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিত, এ সে নরেন্দ্র নহে; অতি নিরীহ, আসিয়াই অনূপকে টীপ্ করিয়া প্রণাম করে, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, মৃদুস্বরে, নত মুখে, অতি দীন ভাবে উত্তর দেয় এবং যে পথে অনূপ সর্ব্বদা যাতায়াত করেন সেই খানে

একটি ওয়েবষ্টার ডিক্‌যনারী বা তৎসদৃশ অন্য কোন দীর্ঘকায় পুস্তক খুলিয়া বসিয়া থাকে।

নরেন্দ্র বহুদিনের পর বাড়ি আসিলে করুণা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। নরেন্দ্রকে ডাকিয়া লইয়া কতকি গল্প শুনাইত, বালিকা গল্প শুনাইতে যত উৎসুক, শুনিতে তত নহে। কাহারো কাছে কোন নূতন কথা শুনিলেই যতক্ষণ না নরেন্দ্রকে শুনাইতে পাইত, ততক্ষণ উহা তাহার নিকট বোঝা স্বরূপ হইয়া থাকিত। কিন্তু করুণার এই রূপ ছেলেমানুষীতে নরেন্দ্রের বড়ই হাসি পাইত, কখন কখন সে বিরক্ত হইয়া পলাইবার উদ্যোগ করিত। নরেন্দ্র সঙ্গীদের নিকটে করুণার কথা-প্রসঙ্গে নানাবিধ উপহাস করিত।

নরেন্দ্র বাড়ি আসিলে পণ্ডিত মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যগ্র হইয়া পড়েন। এমন কি, সেদিন সন্ধ্যার সময়েও গৃহ হইতে নির্গত হইয়া বাঁশঝাড়ময় পল্লীপথ দিয়া রাম নাম জপিতে জপিতে নরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন, নরেন্দ্রকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া নানাবিধ কুশল সংবাদ লইতেন। এই পণ্ডিতের কথা শুনিয়া দুই এক জন সঙ্গী নরেন্দ্রকে তাঁহার টিকি কাটিতে পরামর্শ দিয়াছিল, এবিষয় লইয়া গম্ভীর ভাবে অনেক পরামর্শ ও অনেক ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল, কিন্তু দেশে নরেন্দ্রের তেমন দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল না বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের টিকিটি নির্ব্বিঘ্নে ছিল। এই রূপে দেশে আদর ও বিদেশে আমোদ পাইয়া নরেন্দ্র বাড়িতে লাগিল।

নরেন্দ্রের বাল্যকাল অতীত হইল। অনুপ এখন অতিশয় বৃদ্ধ, চক্ষে দেখিতে পান না, শয্যা হইতে উঠিতে পারেন না, এক মুহূর্ত্তও করুণাকে কাছ-ছাড়া করিতেন না; অনুপের জীবনের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে; তিনি নরেন্দ্রকে কলিকাতা হইতে ডাকাইয়া আনিয়াছেন; অন্তিম কালে নরেন্দ্র ও পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকাইয়া তাঁহাদের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিয়া গেলেন।

অনুপের মৃত্যুর পর সার্ব্বভৌম মহাশয় নিজে পৌরোহিত্য করিয়া নরেন্দ্রের সহিত করুণার বিবাহ দিলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমি যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে; নরেন্দ্র যে কিরূপ লোক তাহা এত দিনে পাড়ার লোকেরা টের পাইল, আর হতভাগিনী করুণাকে যে কষ্ট পাইতে হইবে তাহা এত দিনে তাহারা বুঝিতে পারিল, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় দুয়ের কোনটাই বুঝিলেন না।

করুণা আজকাল কিছু মনের কষ্টে আছে। মনের উল্লাসে বিজন কাননে সে খেলা করিবে, বক্ষে করিয়া লইয়া পাখীর সঙ্গে কতকি কথা কহিবে, কোলের উপর রাশি রাশি ফুল রাখিয়া পাতুটি ছড়াইয়া আপন মনে গুন্ গুন্ করিয়া গান গাইতে গাইতে মালা গাঁথিবে, যাহাকে

ভাল বাসে তাহার মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া অস্ফুট আহ্লাদে বিহ্বল ও অস্ফুট ভাবে ভোর হইয়া যাইবে, সেই বালিকা বড় কষ্ট পাইয়াছে। তাহার মনের মত কিছুই হয় না; অভাগিনী যে নরেন্দ্রকে এত ভাল বাসে, যাহাকে দেখিলে খেলা ভুলিয়া যায়, মালা ফেলিয়া দেয়, পাখী রাখিয়া দিয়া ছুটিয়া আসে, সে কেন করুণাকে দেখিলে যেন বিরক্ত হয়? করুণা হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কি বলিতে আসে সে কেন ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মুখ ভার করিয়া থাকে? করুণা তাহাকে কাছে বসিতে কত মিনতি করে, সে কেন কোন ছল করিয়া চলিয়া যায়? নরেন্দ্র তাহার সহিত এমন নির্জ্জীব ভাবে এমন নীরস ভাবে কথাবার্ত্তা কয়, সকল কথায় এমন বিরক্ত ভাবে উত্তর দেয়, সকল কাজে এমন প্রভুভাবে আদেশ করে যে, বালিকার খেলা ঘুরিয়া যায় ও মালা গাঁথা সাঙ্গ হয় বুঝি, বালিকার আর বুঝি পাখীর সহিত গান গাওয়া হইয়া উঠে না!

মূল কথাটা এই, নরেন্দ্র ও করুণায় কখনই বনিতে পারে না; দুইজনে দুই বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত, নরেন্দ্র করুণার সেই ভালবাসার কতকি অসংলগ্ন কথার মধ্যে কিছুই মিষ্টতা পাইত না, তাহার সেই প্রেমে মাখানো অতৃপ্ত স্থির দৃষ্টি মধ্যে ঢল ঢল লাবণ্য দেখিতে পাইত না, তাহার সেই উচ্ছ্বসিত নির্ঝরিণীর ন্যায় অধীর সৌন্দর্য্যের মিষ্টতা নরেন্দ্র কিছুই বুঝিত না। কিন্তু সরলা করুণা সে অত কি বুঝিবে? সে ছেলে বেলা হইতেই নরেন্দ্রের গুণ ছাড়া দোষের কথা কিছুই শুনে নাই। কিন্তু করুণার একি দায় হইল? তাহার কেমন কিছুতেই আশ মিটে না, সে আশ-মিটাইয়া নরেন্দ্রকে দেখিতে পায় না, সে আশ-মিটাইয়া মনের সকল কথা নরেন্দ্রকে বলিতে পারে না, সে সকল কথাই বলে অথচ মনে করে যেন কোন কথাই বলা হইল না।

এক দিন নরেন্দ্রকে বেশ পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়া করুণা জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাইতেছ?" নরেন্দ্র কহিলেন— "কলিকাতায়।" "ক।—কলিকাতায় কেন যাইবে?" নরেন্দ্র ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া দেয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিল "কাজ না থাকিলে কখনো যাইতাম না। একটা বিড়াল-শাবক ছুটিয়া গেল, করুণা তাহাকে ধরিতে গেল, অনেক ক্ষণ ছুটাছুটি করিয়া ধরিতে পারিল না, অবশেষে ঘরে ছুটিয়া আসিয়া নরেন্দ্রের কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল "আজ যদি তোমাকে কলিকাতায় যাইতে না দিই?" নরেন্দ্র কাঁধ হইতে হাত ফেলিয়া দিয়া কহিল "সর, দেখ দেখি আর একটু হলেই ডিক্যাণ্টারটি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আর কি?"

করুণা—"দেখ, তুমি কলিকাতায় যাইও না, পণ্ডিত মহাশয় তোমাকে যাইতে দিতে নিষেধ করেন।" নরেন্দ্র কিছুই উত্তর না দিয়া শিশ্ দিতে দিতে চুল আঁচড়াইতে লাগিলেন। করুণা ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল ও এক শিশি এসেন্স্ আনিয়া নরেন্দ্রের চাদরে খানিকটা ঢালিয়া

দিল। নরেন্দ্র কলিকাতায় চলিয়া গেলেন, করুণা দুই একবার বারণ করিল, কিছু হাঁ হুঁ না দিয়া লক্ষ্ণৌ ঠুংরি গাইতে গাইতে নরেন্দ্র প্রস্থান করিলেন। যতক্ষণ নরেন্দ্রকে দেখা যায় করুণা চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর সে বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিল। কিয়ৎক্ষণ কাঁদিয়া মনের বেগ শান্ত হইতেই চখের জল মুছিয়া ফেলিয়া পাখীটি হাতে করিয়া লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে মালা গাঁথিতে বসিল।

বালিকা স্বভাবতঃ এমন প্রফুল্ল হৃদয় যে, বিষাদ অধিক ক্ষণ তাহার মনে তিষ্ঠিতে পারে না। হাসির লাবণ্যে তাহার বিশাল নেত্র দুটি এমন মগ্ন যে রোদনের সময়ও অশ্রুর-রেখা ভেদ করিয়া হাসির কিরণ জ্বলিতে থাকে। যাহা হউক্ করুণার চপল ব্যবহারে পাড়ার মেয়ে মহলে বেহায়া বলিয়া তাহার বড়ই অখ্যাতি জন্মিয়াছিল, "বুড়াধাড়ি মেয়ের" অতটা বাড়াবাড়ি তাহাদের ভাল লাগিত না। এ সকল নিন্দার কথা করুণা বাড়ির পুরাতন দাসী ভবির কাছে সব শুনিতে পাইত; কিন্তু তাহাতে তাহার আইল গেল কি? সে তেমনি ছুটাছুটি করিত, সে ভবির গলা ধরিয়া তেমনি করিয়াই হাসিত, সে পাখীর কাছে মুখ নাড়িয়া তেমনি করিয়াই গল্প করিত। কিন্তু এই প্রফুল্ল হৃদয় একবার যদি বিষাদের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়, এই হাস্যময় অজ্ঞান শিশুর মত চিন্তাশূন্য সরল মুখশ্রী একবার যদি দুঃখের অন্ধকারে মলিন হইয়া যায়, তবে বোধ হয় বালিকা আহত লতাটির ন্যায় জন্মের মত ম্রিয়মাণ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, বর্ষার সলিল-সেকে, বসন্তের বায়ু-বীজনে আর বোধ হয় সে মাথা তুলিতে পারে না।

নরেন্দ্র অনুপের যে অর্থ পাইয়াছিলেন, তাহাতে পল্লিগ্রামে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। অনুপের জীবদ্দশায় ক্ষেতের ধান, পুকুরের মাছ ও বাগানের শাক্-সব্‌জি ফল মূলে দৈনিক আহার ব্যয় যৎসামান্য ছিল। ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইত, নিয়মিত পূজা অর্চ্চনা দান ধ্যান, ও আতিথ্যের ব্যয় ভিন্ন আর কোন ব্যয়ই ছিল না। অনুপের মৃত্যুর পর অতিথিশালাটি বাবুর্চিখানা হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণগুলার জ্বালায় গোটা চারেক দরোয়ান রাখিতে হইল, তাহারা প্রত্যেক ভট্টাচার্য্যকে রীতিমত অর্দ্ধ চন্দ্রের ব্যবস্থা করিত, এবং প্রত্যেক ভট্টাচার্য্য বিধিমতে নরেন্দ্রকে উচ্ছিন্ন যাইবার ব্যবস্থা করিয়া যাইত। নরেন্দ্র গ্রামে নিজ ব্যয়ে একটি ডিস্পেন্সরী স্থাপন করিলেন। শুনিয়াছি নহিলে সেখানে ব্রাণ্ডি কিনিবার অন্য কোন সুবিধা ছিল না। গবর্ণমেণ্টের সস্তা দোকান হইতে রায় বাহাদুরের খেলানা কিনিবার জন্য ঘোড়দৌড়ের চাঁদা-পুস্তকে হাজার টাকা সই করিয়াছিলেন, এবং এমন আরো অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন যাহা লইয়া অমৃত বাজারের একজন পত্রপ্রেরক ভারি ধুমধাম করিয়া একপত্র লেখে, তাহার প্রতিবাদ ও তাহার পুনঃ প্রতিবাদের সময় অমূলক অপবাদ দেওয়া যে ভদ্র লোকের অকর্ত্তব্য ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হয়।

নরেন্দ্রকে পল্লীর লোকেরা জাতিচ্যুত করিল, কিন্তু নরেন্দ্র সে দিকে কটাক্ষপাতও করিলেন না, নরেন্দ্রের একজন সমাজ-সংস্কারক বন্ধু তাঁহার "মরাল করেজ" লইয়া সভায় তুমুল আন্দোলন করিলেন"।

নরেন্দ্র বাগবাজারে এক বাড়ি ভাড়া করিয়াছেন ও কাশীপুরে এক বাগান ক্রয় করিয়াছেন। এক দিন বাগবাজারের বাড়িতে সকালে বসিয়া নরেন্দ্র চা খাইতেছেন। নরেন্দ্রের সকাল ও আমাদের সকালে অনেক তফাৎ,সে দিন শনিবারে কুঠি যাইবার সময় দেখিয়া আসিলাম, নরেন্দ্রের নাক ডাকিতেছে। দুইটার সময় ফিরিয়া আসিবার কালে দেখি, চোক্ রগড়াইতেছেন, তখনো আন্তরিক ইচ্ছা আর এক ঘুম দেন। যাহাই হউক্ নরেন্দ্র চা খাইতেছেন এমন সময়ে সমাজ-সংস্কারক গদাধর বাবু, কবিতা-কুসুম-মঞ্জরী-প্রণেতা কবিবর স্বরূপচন্দ্র বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম অভ্যর্থনা সমাপ্ত হইলে সকলে চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন।

নানাবিধ কথোপকথনের পর গদাধর বাবু কহিলেন "দেখুন মশায় আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের দশা বড় শোচনীয়।" এই সময়ে নরেন্দ্র শোচনীয় শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বরূপচন্দ্র বাবু কহিলেন 'Deplorable;' নরেন্দ্রের পক্ষে উভয় কথাই সমান ছিল, কিন্তু নরেন্দ্র এই প্রতিশব্দটি শুনিয়া শোচনীয় শব্দের অর্থটা যেন জল বুঝিয়া গেলেন। গদাধর বাবু কহিলেন "এখন আমাদিগের উচিত তাহাদের অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়া।" অমনি নরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে কহিলেন, কিন্তু এটা কতদূর হ'তে পারে তাই দেখা যাক্, তেমন সুবিধা পাইলে অন্তঃপুরের প্রাচীর অনেক সময় ভাঙ্গিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে বটে কিন্তু পুলিসের লোকেরা তাহাতে বড়ই আপত্তি করিবে, ভাঙ্গিয়া ফেলা দূরে থাক একবার আমি অন্তঃপুরের প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে গিয়াছিলাম ম্যাজিস্ট্রেট তাতে আমার উপর বড় সন্তুষ্ট হয় নাই। অনেক তর্কের পর গদাধর ও স্বরূপে মিলিয়া নরেন্দ্রকে বুঝাইয়া দিল যে, সত্য সত্যই অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার প্রস্তাব হইতেছে না, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, স্ত্রীলোকদের অন্তঃপুর হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়া।

গদাধর বাবু কহিলেন "কত বিধবা একাদশীর যন্ত্রণায় রোদন করিতেছে, কত কুলীন পত্নী স্বামী জীবিত সত্বেও বৈধব্য-জ্বালা সহ্য করিতেছে।" স্বরূপ বাবু কহিলেন—এ বিষয়ে আমার অনেক কবিতা আছে, কাগজওয়ালারা তার বড় ভাল সমালোচনা কোরেছে; দেখ নরেন্দ্র বাবু, শরৎ কালের জ্যোৎস্না-রাত্রে কখনো ছাতে শুয়েছ? চাঁদ যখন ঢল ঢল হাসি ঢাল্‌তে ঢাল্‌তে আকাশে ভেসে যায় তখন তাকে দেখেছ? আবার সেই হাস্যময় চাঁদকে যখন ঘোর অন্ধকারে মেঘে আচ্ছন্ন করে ফ্যালে তখন মনের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট উপস্থিত হয় তাকি কখন সহ্য কোরেছ? তা যদি কোরে থাক তবে বল দেখি স্ত্রীলোকের কষ্ট দেখ্‌লে

সেইরূপ কষ্ট হয় কি না?" নরেন্দ্রের সম্মুখে এতগুলি প্রশ্ন একে একে খাড়া হইল, নরেন্দ্র ভাবিয়া আকুল, অনেক ক্ষণের পর কহিলেন "আমার এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" গদাধর বাবু কহিলেন "এখন কথা হচ্চে যে, স্ত্রীলোকদের কষ্ট মোচনে আমরা যদি দৃষ্টান্ত না দেখাই তবে কে দেখাইবে? এস, আজ থেকেই এবিষয়ের চেষ্টা করা যাক্।" নরেন্দ্রের তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না, তিনি মনে মনে কেবল ভাবিতে লাগিলেন এখন কাহার অন্তঃপুরের প্রাচীর ভাঙ্গিতে হইবে? গদাধর বাবু কহিলেন "স্মরণ থাকতে পারে মোহিনী নামে এক বিধবার কথা সে দিন বলে ছিলুম,আমাদের প্রথম পরীক্ষা তাহার উপর দিয়াই চলুক্। এবিষয়ে যা কিছু বাধা আছে তা আলোচনা কোরে দেখা যাক্,যেমন এক একটা পোষা পাখী শৃঙ্খল-মুক্ত হলেও স্বাধীনতা পেতে চায় না, তেমনি সেই বিধবাটিও স্বাধীনতার সহস্র উপায় থাকিতেও অন্তঃপুরের কারাগার হইতে মুক্ত হইতে চায় না, সুতরাং আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য তাহাকে স্বাধীনতার সুমিষ্ট আস্বাদ জানাইয়া দেওয়া।" নরেন্দ্র কহিলেন সকল দিক ভাবিয়া দেখিলে এ বিষয়ে কাহারো কোন প্রকার আপত্তি থাকিতে পারে না। সে বিধবার ভরণ পোষণ বাস-স্থান ইত্যাদি সমুদয় বন্দোবস্তের ভার নরেন্দ্র নিজ স্কন্ধে লইতে স্বীকৃত হইলেন। ক্রমে ত্রিভঙ্গচন্দ্র, বিশ্বম্ভর, ও জন্মেজয় বাবু আসিলেন, ক্রমে সন্ধ্যাও হইল, প্লেট্ আসিল, বোতল আসিল। গদাধর বাবু স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে অনেক বক্তৃতা দিয়া ও স্বরূপ বাবু জ্যোৎস্নারাত্রির বিষয়ে নানাবিধ কবিতাময় উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া শুইয়া পড়িলেন, ত্রিভঙ্গচন্দ্র ও বিশ্বম্ভর বাবু স্খলিত স্বরে গান জুড়িয়া দিলেন, নরেন্দ্র ও জন্মেজয় কাহাকে যে গালাগালি দিতে লাগিলেন বুঝা গেল না।

উৎসর্গ-গীতি।

জয়জয়ন্তি—তাল চৌতাল

তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
এবীণা তোমারি গাইবে গান॥
যদিও এবাহু অক্ষম দুর্ব্বল
তোমারি কার্য্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
তোমারি পাশ নাশিবে॥

যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার
কিছুই তোমার হবে না,
তবুও গো মাতা পারিতা' ঢালিতে
এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে
নিভাতে তোমার যাতনা॥
যদিও জননি, যদিও আমার
এবীণার কিছু নাহিক বল।
কি জানি যদি মা একটি সন্তান
জাগি উঠে শুনি এবীণা তান॥

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বিরচিত—সৃষ্টি।

(২) শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ বিরচিত—সাংখ্য দর্শন।

আত্ম-প্রত্যয়টি তত্ত্বজ্ঞানের প্রথম সোপান। অতঃপর আত্মার অতলস্পর্শ গভীরতা এবং জগতের অপরিসীম বিস্তার এ দুয়ের মধ্যে অপরিমেয় ভাবের যেরূপ মিল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে দুইকে একই সত্যের এপিট ওপিট মনে না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। সে সত্য এমনি যে, তাহাতে অতলস্পর্শ জ্ঞানের গভীরতা এবং অপরিসীম শক্তির বিস্তার উভয়ই একাধারে পাওয়া যায়।

আত্মপ্রত্যয় কিনা আত্মাতে বিশ্বাস, আপনার জ্ঞানেতে বিশ্বাস। আপনার জ্ঞানের উপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে, নিকটের বস্তুকে যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, দূরের বস্তুকেও তেমনি সত্য বলিয়া বোধ হয়; ক্ষুদ্র বস্তুকেও যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, বৃহৎ বস্তুকেও তেমনি সত্য বলিয়া বোধ হয়; ইন্দ্রিয়-গোচর বস্তুকেও যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুকেও তেমনি সত্য বলিয়া বোধ হয়; সসীম বস্তুকেও যেমন সত্য বলিয়া বোধ হয়, অসীম বস্তুকেও তেমনি সত্য বলিয়া বোধ হয়। আপনার জ্ঞানের প্রতি আর্কিমীডিসের এমনি দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শুদ্ধ কেবল জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া, পৃথিবীকেও নড়াইতে পারা যায়, ইহা বলিতে তিনি সঙ্কুচিত হ'ন নাই। আপনার জ্ঞানের উপরে যাহাদের সেরূপ আস্থা নাই তাহারা জানে যে, কাষ্ঠ-লোষ্ট্রকেই নড়ানো যায়; পৃথিবী এত বড় প্রকাণ্ড, ইহাকে নড়ানো কোন কালেই কাহারো সাধ্যায়ত্ত হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে, জ্ঞানের প্রতি যাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে তাঁহারা কাষ্ঠ-লোষ্ট্রকেও যেমন মনে করেন, পৃথিবীকেও তেমনি মনে করেন; ক্ষুদ্রকেও যেমন মনে করেন, বৃহৎকেও তেমনি মনে করেন; যাহাদের সেরূপ বিশ্বাস নাই, তাহারা ক্ষুদ্র বিষয়-সকলকে জ্ঞানের অধিকারায়ত্ত মনে করে, বৃহৎ বিষয়কে জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত মনে করে। বৃহৎ ব্যাপার দেখিলেই তাহারা আপনার জ্ঞানকে বলে "সাবধান! ওদিকে যাইও না।" আপনার জ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস নিউটনের এমনি প্রবল ছিল যে, বৃক্ষচ্যুত ফল পৃথিবী-কর্তৃক আকৃষ্ট হয় দেখিয়া পৃথিবীও সূর্য্য-কর্তৃক আকৃষ্ট হয় ইহা বলিতে তিনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হ'ন নাই। আপন জ্ঞানের প্রতি যাহাদের অনাস্থা, তাহারা বলে, "হাঁঃ রাখিয়া দেও ও-সব অর্ব্বাচীনের কথা! কোথায় একটা বৃক্ষচ্যুত ফল আর কোথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, দুই কি সমান হইল!" ইন্দ্রিয়-প্রত্যয়ী ব্যক্তিরা নিকট বস্তুর উপরে যেমন আস্থা রাখে, দূর বস্তুর উপরে তেমন নহে; ক্ষুদ্র বস্তুর উপর যেমন আস্থা রাখে, বৃহৎ বস্তুর উপর তেমন নহে; জ্ঞানপ্রত্যয়ী অথবা আত্মপ্রত্যয়ী ব্যক্তিরা দূর নিকট ক্ষুদ্র

বৃহৎ সকলকেই সমভাবে দেখেন। প্রামাণিক পণ্ডিত এদিকে বলেন যে "মনুষ্যের জন্য জগৎ" এ ভাবটি ছাড়িয়া দিয়া, জগতের নিয়ম-সকল নিরপেক্ষ-ভাবে আলোচনা কর; ওদিকে বলেন যে, বিজ্ঞানের পক্ষে সৌর জগৎ পর্য্যন্তই যথেষ্ট, তাহা অপেক্ষা আর অধিক উচ্চে উঠিবার প্রয়োজন করে না, কেন না সৌর জগতের বহির্ভূত প্রদেশের সঙ্গে মনুষ্যের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। কমটির প্রথম অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্যকে দূরে রাখিয়া জগতের নিয়ম-সকল যত আবিষ্কার করিতে পার ততই ভাল; তাঁহার দ্বিতীয় অভিপ্রায় এই যে, মনুষ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানের চর্চ্চা করিবে। প্রথম অভিপ্রায়টি দ্বিতীয় অভিপ্রায়ের সহিত স্পষ্টই মিলিতেছে না। এই ত এক অসঙ্গতি-দোষ। আর একটি দোষ এই যে, সৌরাতীত জগতের সঙ্গে মনুষ্যের কোন সম্পর্ক নাই যে, ইহার কোন প্রমাণ নাই, প্রমাণ সম্ভবেও না। সূর্য্যের সহিত পৃথিবীর সম্বন্ধ আছে, ইহাও যেমন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, নাক্ষত্রিক জগতের সহিত সূর্য্যের সম্বন্ধ আছে, ইহাও তেমনি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত। হর্শেল-নামক জ্যোতির্বেত্তা প্রাচীন কালের নক্ষত্রাবলীর স্থান-নির্ণায়ক তালিকার সঙ্গে বর্ত্তমান কালের নক্ষত্রাবলীর স্থানের ঐক্য করিয়া দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আকাশের একাংশে নক্ষত্রগণ পূর্ব্বাপেক্ষা কাছাকাছি হইয়া আসিতেছে, অপরাংশে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা ফাঁক ফাঁক হইয়া পড়িতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন যে, সৌর জগৎ হর্কুলীস্-নামক নক্ষত্র-মণ্ডলের মধ্যগত কোন একটি স্থানের অভিমুখে চলিতেছে। তাঁহার পরে তিন চারি জন বিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সপ্তর্ষি-মণ্ডলের মধ্যস্থিত আল্‌সিওন্ নামক নক্ষত্রই সৌর-জগতের প্রদক্ষিণ-কেন্দ্র। এ সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদ্‌গণের যদিও অনেক মত-ভেদ আছে কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত যে, সেই নক্ষত্রের অনতিদূর-স্থিত কোন না কোন প্রদেশে উক্ত প্রদক্ষিণ-কেন্দ্র অবস্থিতি করিতেছে। অতএব সৌর জগতের সহিত পৃথিবীর যেমন সম্বন্ধ আছে, নাক্ষত্রিক জগতের সহিত সৌর-জগতের তেমনি সম্বন্ধ আছে, সুতরাং নাক্ষত্রিক জগতেরও পৃথিবীর সহিত সম্বন্ধ আছে, ইহাতে আর সংশয় নাই। যদিই বা সে সম্বন্ধ কি, তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে না পাই, কিন্তু তাহা বলিয়া কি বিজ্ঞান সত্য নিরূপণে নিরস্ত হইবে? কম্‌টি নিজেই বলিয়াছেন The most important practical results continually flow from theories formed purely with scientific intent, and which have sometimes been pursued for ages without any practical result. A remarkable example is furnished by the beautiful researches of the greek geometers upon conic section, which after a long series of generations have renovated the science of

astronomy, and thus brought the art of navigation to a pitch of perfection which it could never have reached but for the purely theoretic enquiries of Archimedes and Apollonios. অতএব নিরপেক্ষ ভাবে বিজ্ঞান চর্চ্চা করা কর্ত্তব্য।

ইহা জানিয়াও কম্‌টি নাক্ষত্রিক জগৎকে বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে স্বচ্ছন্দে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আরো অনেক বিষয়কে তিনি বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। কম্‌টির শাস্ত্রে এইরূপ লেখে যে, যদি কোন বিষয় তাঁহার বিরোধী পক্ষে সহায়তা করে, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। কম্‌টির শিষ্যেরা এখন দেখিতেছেন যে, তিনি যে ঐরূপ লঘু পাপে গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, বড় ভাল করেন নাই। তাঁহারা ইহাও বলেন যে, তত্ত্বজ্ঞান অপরাধ করিয়াছে তাহাকেই দ্বীপান্তরে পাঠাও, মনোবিজ্ঞানকেও তাহার সঙ্গে ধরা হয় কেন? কম্‌টির আধুনিক শিষ্যেরা মনোবিজ্ঞানকে যথোচিত সম্মান পুনঃসর পুনর্ব্বার বিজ্ঞান-রাজ্যে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতেছেন। এমন কি তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিও তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সদয় ব্যবহার করিতেছেন। কম্‌টি বলেন মূল সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে, না থাকিলেও না থাকিতে পারে। স্পেন্‌সর বলেন, মূল সত্য আছে ইহা সুনিশ্চিত, তবে কি না তাহা আমাদের জ্ঞানায়ত্ত হইতে পারে না। জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের ভবিষ্যৎ বাণী অনেকবার ফলিতে দেখা গিয়াছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, কম্‌টির ভবিষ্যৎ বাণী প্রায়শই ব্যর্থ হইয়াছে। কাণ্ট্‌ ভাবিয়া দেখিয়াছিলেন যে, আকাশের অমুক স্থানে একটি গ্রহ থাকা খুব সম্ভব; পরে পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে তাঁহার সে কথা অতি সত্য। এই রূপ গেটে নামক জর্ম্মনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের অনেক ভবিষ্যৎ বাণী ফলিয়াছে। হর্ষেলের অনেক ভবিষ্যৎ বাণী ফলিয়াছে। কিন্তু কম্‌টির ভবিষ্যৎ বাণী সদ্য সদ্যই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। ফরাসীস্‌ রাজ্য চিরকাল ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য থাকিবে, এই যে তাঁহার গর্ব্বোক্তি তাহা কি ভয়ানক রূপে ব্যর্থ হইয়াছে! নাক্ষত্রিক জগৎকে তিনি বিজ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত করিয়া তুলিয়াছিলেন; এক্ষণে রশ্মি-নির্ব্বাচন-প্রণালী (Spectrum analysis) নূতন আবিষ্কৃত হওয়াতে নাক্ষত্রিক জগতের অনেকানেক জটিল তত্ত্ব জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের জ্ঞানায়ত্ত হইতেছে। তিনি মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানের অযোগ্য বলিয়া একেবারেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন; তাঁহার চেলারাই মনোবিজ্ঞানের অনুশীলনে বিশেষ তৎপর হইয়াছেন। অতএব ইহা নিতান্ত অসম্ভব নহে যে, কম্‌টি যেমন পারমার্থিক হইতে দার্শনিক, দার্শনিক হইতে প্রামাণিক পদ্ধতিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তেমনি তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা প্রামাণিক হইতে উচ্চতর দার্শনিক, উচ্চতর দার্শনিক হইতে উচ্চতর পারমার্থিক পদ্ধতিতে উপনীত হইবেন।

উপরে যাহা দেখা গেল, তাহা হইতে

একটি উত্তম উপদেশ পাওয়া যাইতেছে। বিজ্ঞানের অধিকার এই পর্য্যন্ত, তাহার ও-দিকে নহে, এরূপ কথা যখন প্লেটোর সময় অবধি করিয়া কম্‌টির সময় পর্য্যন্ত ক্রমাগতই ব্যর্থ হইয়া আসিতেছে, তখন প্রামাণিক পণ্ডিতগণের বলা উচিত হয় কেবল এই, যে, বিজ্ঞান এ বিষয় ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন, ও বিষয় একাল পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিতে পারেন নাই,—এটি যেন তাঁহারা না বলেন যে, বিজ্ঞান এই বিষয়ই ক্রমাগত অনুশীলন করুন, ও বিষয় কোন কালে আয়ত্ত করিতে পারিবেন না, সুতরাং ছাড়িয়া দিউন।

প্রকৃত কথা এই যে, জ্ঞানের অধিকারকে অল্পের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া রাখা একটি অসাধ্য ব্যাপার। পৃথিবীতে যে-সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায়, বিজ্ঞান সে-সমস্ত সৌর-জগতে বিস্তার করিতে সঙ্কোচ করেন নাই, এবং সৌর-জগতে যে সকল প্রাকৃতিক নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় সে-সমস্ত নাক্ষত্রিক জগতে বিস্তার করিতেও ক্রুটি করেন নাই। বিজ্ঞান ক্রমশই ব্যাপক হইতে ব্যাপক নিয়মে উত্থান করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বিশেষ কোন সৃষ্টি, যেমন মনুষ্য-সৃষ্টি,—তাহার নিয়ম যেমন সেই বিশেষ-সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক, সেইরূপ নির্ব্বিশেষে বলা যাইতে পারে যে সৃষ্টির নিয়ম সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক। বিশেষ-সৃষ্টির নিয়ম যেমন তাহার কারণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি-শীল সেইরূপ সাধারণতঃ সৃষ্টির নিয়ম সৃষ্টির কারণ পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি-শীল। মনুষ্য-সৃষ্টির যে নিয়ম তাহার ব্যাপ্তি উক্ত সৃষ্টির কারণ পর্য্যন্ত; সেই যে কারণ তাহাও কার্য্য-বিশেষ, সুতরাং তাহারও সৃষ্টি-নিয়মের ব্যাপ্তি তাহার কারণ পর্য্যন্ত; এই রূপ নিম্ন সোপান হইতে উচ্চ সোপানে ক্রমশই সৃষ্টি-নিয়মের ব্যাপ্তি দেখা যাইতেছে। পুনশ্চ মনুষ্য জীব জন্তু উদ্ভিদ্‌কে এক জাতি বলিয়া ধরিলে, সমস্তেরই সৃষ্টির নিয়ম যেমন পৃথিবীরূপ কারণেতে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়; সেইরূপ আবার জীব জন্তু উদ্ভিদ্ ও পৃথিবীকে এক-জাতি বলিয়া ধরিলে তাহার সৃষ্টির নিয়ম সূর্য্যরূপ কারণেতে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া প্রতীতি হয়; ইত্যাদি যেমন, তেমনি ভূতাদি* হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সমস্ত সৃষ্টিকে যদি এক-জাতি বলিয়া ধরা যায়, তবে তৎসমস্তের সৃষ্টি-নিয়ম কোথায় বর্ত্তমান থাকা উচিত? এই খানে জগতের নিয়ন্তা না মানিলে কোন মতেই চলে না।

---

* ভূতাদি কিনা আদিভূত। নৈহারিক মত (Nebular theory) লাপ্লাস্ প্রভৃতি বড় বড় বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত গণের মত। মধ্যে এক সময় সে মত জ্যোতির্বিদ্‌গণের অগ্রাহ্য হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, তৎপূর্ব্বে যাহা নক্ষত্র নীহার (Nebulæ) বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, হর্ষেলের বড় দূরবীক্ষণে তাহা দূর-দূরান্তরস্থিত নক্ষত্র রাশির সমষ্টি বলিয়া সপ্রমাণ হয়। এখন আবার (Spectrum analysis) রশ্মি নির্ব্বাচন প্রণালীর সাহায্যে পূর্ব্বমত পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখনকার মত এইরূপ যে, স্থল-বিশেষে তারকাগণের সমষ্টিকে নীহার বলিয়া ভ্রম হইয়াছে, এই বলিয়া নৈহারিক জগৎ যে নাই, তাহা নহে। এখনকার বিজ্ঞান এতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছে যে, কোন্‌টি নক্ষত্র-মণ্ডল আর কোন্‌টাই বা নীহার-মণ্ডল ইহা রশ্মি পরীক্ষা দ্বারা ধরা পড়িতে পারে। উক্ত পরীক্ষায় এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, সুদূর আকাশের স্থল-বিশেষে নক্ষত্র-মণ্ডল এবং স্থল-বিশেষে নীহার-মণ্ডল দুইই আছে।

পৃথিবী পর্য্যন্তই জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট সৌর-জগতে কাজ নাই, অথবা সৌর-জগৎই জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নাক্ষত্রিক জগতে কাজ নাই, অথবা নাক্ষত্রিক জগৎ পর্য্যন্তই জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট, তাহার ও-দিকে আর কাজ নাই, এ কথা বলিয়া যেমন জ্ঞানকে ধরিয়া রাখা যায় না, জগৎ পর্য্যন্তই জ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট, তাহার ওদিকে আর কাজ নাই, এ প্রকার স্তোক-বাক্যেও জ্ঞানকে ভুলাইয়া রাখিতে পারা যায় না। বৃক্ষের গুঁড়িতে কেবল রস-সঞ্চালন হইবে শাখাতে নহে, শাখাতেই হইবে প্রশাখাতে নহে, শাখা প্রশাখাতেই হইবে পত্রেতে নহে, পত্রেতেই হইবে পুষ্পেতে নহে, পুষ্পেতেই হইবে ফলেতে নহে, বিশ্বরাজ্যে এরূপ অবিচার কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। একটি শাখালম্বিত আম্র-ফলের পরমাণু যে নিয়মে তাহার ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, মনুষ্যের শরীরস্থিত পরমাণু যে নিয়মে শরীরাভ্যন্তরে ঘুরিয়া বেড়ায়, সৌর-জগৎও সেই নিয়মে অপরিমেয় আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির নিকট বড় ছোট নাই, দূর নিকট নাই, প্রকৃতির যে-সকল মূল নিয়ম, তাহা ছোটোতে যেমন বড়তেও তেমনি, দূরেও যেমন নিকটেও তেমনি, সর্ব্বত্রই তাহা বলবৎ, কোথাও তাহার ব্যভিচার নাই। কম্‌টি আপনার ক্ষুদ্র বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতির বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে কাহাকেও তিনি বহিষ্কার করিয়া দিতে পারেন না। প্রকৃতির নিয়ম সৌর-জগতে যেমন, নাক্ষত্রিক জগতেও তেমনি, জগতের আদি অন্ত মধ্য সমুদায় ব্যাপিয়া প্রকৃতির নিয়ম স্থিতি করিতেছে। প্রকৃতির মূল নিয়ম ইহার বেলায় খাটিবে, উহার বেলায় খাটিবে না, ছোটোর বেলায় খাটিবে, বড়র বেলায় খাটিবে না, বিশেষ-সৃষ্টির বেলায় খাটিবে, সাধারণ-সৃষ্টির বেলায় খাটিবে না, এরূপ হইতে পারে না। এই জন্যই বলি যে, মনুষ্য-সৃষ্টির নিয়ম যদি মনুষ্য অপেক্ষা ব্যাপক হইল, পৃথিবী-সৃষ্টির নিয়ম যদি পৃথিবী অপেক্ষা ব্যাপক হইল, তবে কি ভূতাদি সৃষ্টির নিয়ম ভূতাদি-অপেক্ষা ব্যাপক হইবে না, সমুদায় সৃষ্টির নিয়ম সমুদায় সৃষ্টি অপেক্ষা ব্যাপক হইবে না। ব্যাপকতাই নিয়মের প্রাণ; নিয়মের ব্যাপকতা নষ্ট হইলে তাহার প্রাণ বিনষ্ট হয়। নিয়ম যেমন ব্যাপক, জ্ঞানও তেমনি ব্যাপক, এজন্য জ্ঞান-ভিন্ন নিয়ম আর কোন কিছুর আশ্রয়ে থাকিতে পারে না, কেন না আর যাহার আশ্রয়ে থাকিবে, তাহাতে করিয়া তাহার ব্যাপকতা নষ্ট হইবে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে যে, নিয়মিত ঘটনা হইতে নিয়মের দিকে যাওয়া, আর জড়-জগতের আবির্ভাব হইতে জ্ঞানের দিকে যাওয়া, উভয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই। এ কাগজের এপিট আছে মানিলেই ওপিট আছে মানিতে হইবে, নিয়ম আছে মানিলেই তাহার মূলাধার মানিতে হইবে—নিয়ন্তা মানিতে হইবে।

কম্‌টির কথা গুলি যেরূপ বল-গর্ভ সেরূপ যুক্তিগর্ভ নহে; কিন্তু স্পেন্সর প্রভৃতি পণ্ডিত-

গণ যাঁহারা তাঁহার পরবর্ত্তী তাঁহাদের কথাগুলি যুক্তিতে পরিপূর্ণ, ইহা দেখিবামাত্রই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। স্পেন্‌সরের মূল সিদ্ধান্ত এই যে, মূল সত্য একেবারেই জ্ঞানের অধিকার-বহির্ভূত, কিন্তু মূল সত্য আছে ইহা নিঃসংশয়। স্পেন্‌সর এই যে একটি কথা বলিয়াছেন, ইহা যদি তিনি কেবল পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত সকলের পরীক্ষা হইতে পাইয়া থাকেন, তবে তাঁহার অত বড় কথাটা একেবারেই মাটি হইয়া যাইতেছে। কম্‌টি বিজ্ঞানের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত দেখিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, অদ্যাপিও ত কেহ নাক্ষত্রিক জগতের বিশেষ সংবাদ বলিতে পারিল না, তবে মিথ্যা কেন আর ও-সকল লইয়া মাথা ঘুরাণো। অতএব উহাকে একেবারেই বিজ্ঞান-রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাউক। তাঁহার এই রূপ বলপ্রকাশের এক্ষণে দর্পচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হইবেই ত। পূর্ব্ব-বৃত্তান্তের পরীক্ষাই তাঁহার একমাত্র বল, কোন নূতন বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত হইয়া তাঁহার প্রতিবল হইয়া দাঁড়াইতে কতক্ষণ;—তাহাই ঘটিয়াছে। অতএব অতীত কালের কোন পরীক্ষা-পরম্পরাই, নূতন প্রকারের পরীক্ষার একেবারেই পথরোধ করিতে পারে না। স্পেন্‌সর যদি তাহার ঐ সিদ্ধান্তটিকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন তবেই আমরা তাঁহার কথা শিরোধার্য্য করিব, নচেৎ উহা সহস্র পূর্ব্ব-বৃত্তান্তের অনুযায়ী হইলেও আমরা তাহাতে কোন আস্থা রাখিব না—নূতন প্রকারের কোন বৃত্তান্ত আবিষ্কৃত হইতে কতক্ষণ! তবে যদি স্পেন্‌সর বলেন যে, মূল সত্য বুদ্ধির আয়ত্তাধীন নহে, কিন্তু আছে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ, তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐ প্রকার স্বতঃসিদ্ধ সত্য আরো অনেক গুলি আছে। যথা, মূল সত্য আছে ইহা যেমন সত্য, মূল সত্য অসীম ইহাও তেমনি সত্য, মূল সত্য অতলস্পর্শ গভীর অন্তরতর অন্তরতম, ইহাও তেমনি সত্য।

এই খানেই অবরোহ-প্রণালীর সূত্রপাত হইল। আপেক্ষিক সত্য মাত্রই মূল সত্যকে অপেক্ষা করে।

মূল-সত্য আমাদের বুদ্ধির অগোচর ইহা সত্য, কিন্তু মূল সত্যের অস্তিত্বের প্রতি আর কাহারো কোন সংশয় হইতে পারে না। কেন না এপিট থাকিলেই ওপিট থাকা চাই, গৃহীতা থাকিলেই দাতা থাকা চাই, আপেক্ষিক সত্য থাকিলেই মূল-সত্য থাকা চাই। অতএব স্থির হইল যে, মূল-সত্যের অস্তিত্ব কোন মতে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। মূল-সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্থূল সত্য সমর্থন করাই অবরোহ-প্রণালীর কার্য্য। অগ্রে মূল-সত্যের মূল উপাধি গুলি প্রদর্শন করি।

প্রথমতঃ আপেক্ষিক সত্যের নিয়ম যত আছে তন্মধ্যে এইটি সর্ব্বাগ্রগণ্য যে, বাহ্য বস্তু জ্ঞানাভ্যন্তরে যে ভাবে প্রকাশ পায় জ্ঞানের বাহিরেও তাহা ঠিক সেই ভাবে থাকিতে পারে না। কেননা বাহ্য বস্তুর গুণ যাহা আমাদের জ্ঞান-সাপেক্ষ, এবং বাহ্য বস্তুর সত্তা যাহা আমাদের জ্ঞান-নিরপেক্ষ, উভ-

য়ই এক হইতে পারে না। জীব যদি আদবেই না থাকে, তথাপি বাহ্য বস্তুর সত্তা থাকিবে, কিন্তু গুণ-গ্রাহী ব্যক্তির অভাব প্রযুক্ত তাহার গুণ অব্যক্তে পরিণত হইবে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বাহ্য বস্তুর প্রকাশ জীবের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। আমাদের জ্ঞানের নিকট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহা কিছু প্রকাশ পায়, তাহা সত্তা নহে, তাহা সত্তার অভিব্যক্তি মাত্র, সত্তার ভাণ মাত্র, সত্তার আভাস মাত্র। অভিব্যক্তি দুই প্রকার, বহির্বস্তুর গুণ এবং অন্তঃকরণের অবস্থা। ফুলের সুগন্ধ ঘ্রাণ করিবামাত্র, অন্তঃকরণে সুখোদয় হইল, এ স্থলে ফুলেতে সুগন্ধি গুণের অভিব্যক্তি এবং অন্তঃকরণে সুখের অভিব্যক্তি, একই সময়ে ঘটিতেছে।

কতক-খানি আকাশ জুড়িয়া বাহ্য বস্তুর গুণ অভিব্যক্ত হয়। ফুলের প্রত্যেক অংশ অপরাংশের বাহিরে অবস্থিতি করিতেছে, এবং তাহার সর্ব্বাংশ ব্যাপিয়া সৌরভ-গুণ অবস্থিতি করিতেছে। আকাশ-ব্যাপ্তি ভিন্ন বাহ্য বস্তুর গুণ অভিব্যক্ত হইতে পারে না। অন্তঃকরণে যখন অবস্থা-বিশেষের অভিব্যক্তি হয়, তখন তাহা আকাশে নয় কিন্তু কালেতেই হইয়া থাকে। দুঃখাবস্থার পরে যখন সুখাবস্থা উদিত হয়, তখন এরূপ মনে হয় না যে, দুঃখের অবস্থা আত্মার একাংশ, সুখের অবস্থা আত্মার অপরাংশ; ইহাই মনে হয় যে, দুঃখের অবস্থাকে অভিভূত করিয়া সুখের অবস্থা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। একাংশের বাহিরে অপরাংশ এ ভাব আকাশের; এক অবস্থার পরিবর্ত্তে অপর অবস্থা, যথা অতীতাবস্থার পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান অবস্থা, এ ভাব কালের; এইরূপে দেশকালে যাহা কিছু অভিব্যক্ত হয়, সমুদায়ই আপেক্ষিক সত্য, মূল-সত্য দেশ-কালের অতীত। পুষ্পের সুগন্ধ, এবং অন্তঃকরণের সুখ, দুয়ের কোনটিকে আমরা মূল-সত্য বলিতে পারি না; কেন না বাহ্য বস্তুর গুণ-অভিব্যক্তি কতক পরিমাণে মনোযোগের অপেক্ষা করে, এবং অন্তঃকরণের অবস্থা পরিবর্ত্তন কতক পরিমাণে বহির্বস্তুর অপেক্ষা করে। উক্ত উভয় প্রকারের অভিব্যক্তিকেই আমরা অবশ্য সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু উহার কোনটিকেই মূল-সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। অন্তঃকরণের অভিব্যক্তি হইতে বহির্বস্তুর অভিব্যক্তি এত যে ভিন্ন, তথাপি উভয়কেই আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকি। ইহাও কতক সত্য, উহাও কতক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য ইহাও নয় উহাও নয়; উভয়ই আপেক্ষিক সত্য। যে সত্যের অধিষ্ঠান-প্রভাবে ইহাও সত্য হইয়াছে, উহাও সত্য হইয়াছে, সেই সত্যই মূল-সত্য। এক সেই সত্যের ভাব যাহা আমাদের আত্মাভ্যন্তরে আছে, তাহার সঙ্গে যাহার যত মিল হয়, তাহাকে সেই পরিমাণে সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি; এবং অন্য কোন সত্যের সহিত সেই মূল-সত্যের ভাব সম্পূর্ণ-রূপে সংলগ্ন হয় না বলিয়াই আর সকল সত্যকে আমরা আংশিক সত্য বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাকি। মূল-সত্যকে যদি না মানা যায়, তবে আপেক্ষিক সত্যও সম্পূর্ণরূপে অসত্য হইয়া দাঁড়ায়। সত্য আদবেই

নাই এইরূপ দাঁড়ায়। জলই যদি নাই তবে ঘোলা জল কিরূপে থাকিবে; পূর্ণ সত্যই যদি নাই তবে অপূর্ণ সত্য কিরূপে থাকিবে।

এক্ষণে আপেক্ষিক সত্যের সহিত মূল সত্যের কি রূপ ভেদাভেদ তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে। ক এবং খ এই দুইটিকে মনে কর যেন আপেক্ষিক সত্য। ক-য়েতে এমনি একটি সত্য আছে যাহা খ-য়েতে নাই; খ-য়েতে এমনি একটি সত্য আছে যাহা ক-য়েতে নাই। কিন্তু মূল-সত্য যেহেতু উভয়েরই মূলবর্ত্তী এ জন্য ক-য়ে যে সত্য আছে তাহা মূল সত্যে আছে, কিন্তু ক-য়ে সত্যের অভাব যেটি আছে তাহা মূল-সত্যে নাই; এইরূপ আবার খ-য়ে যে সত্য আছে তাহা মূল-সত্যে আছে কিন্তু খ-য়ে সত্যের অভাব যেটি আছে তাহা মূল-সত্যে নাই। ক-য়েতেও যেমন খ-য়েতেও তেমনি সত্যও আছে সত্যের অভাবও আছে, কিন্তু মূল-সত্যে সত্য ভিন্ন সত্যের অভাব কিছু মাত্র নাই। এ জন্য মূল-সত্যের "পরিপূর্ণ" এই একটী উপাধি। মূল-সত্যের বাহিরে যদি দ্বিতীয় মূল-সত্য থাকে, তবে একেতে অন্যের সম্পূর্ণ অভাব প্রযুক্ত দাঁড়ায় এই যে, উভয়ের কোনটিই মূল-সত্য নহে—উভয়ই আপেক্ষিক সত্য। অতএব মূল-সত্য এক অদ্বিতীয় এবং পরিপূর্ণ। এক অদ্বিতীয়, এই উপাধিতে মূল-সত্যের অপরিসীম ব্যাপ্তি বুঝায়, এই বুঝায় যে, তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয়ের একেবারেই স্থানাভাব। যদি মূল সত্যের সহিত সমস্ত জগতের তুলনা করিতে ইচ্ছা কর, তবে জগতের প্রত্যেকাংশ হইতে সত্য লইয়া তাহার সমষ্টি এক দিকে ধর, এবং প্রত্যেক অংশ হইতে সত্যের অভাব লইয়া তাহার সমষ্টি অপর দিকে ধর; পূর্ব্বোক্ত সত্য-সমষ্টি মূল-সত্যে আছে, শেষোক্ত অভাব-সমষ্টি মূল-সত্যে নাই। জগতের মধ্যে সত্যও আছে সত্যের অভাবও আছে, মূল-সত্যে সত্য ভিন্ন সত্যের অভাব মূলেই নাই; এ জন্য মূল-সত্যে ভাবসূচক লক্ষণ ভিন্ন কোন অভাব-সূচক লক্ষণ স্থান পাইতে পারে না। এই হেতু জড়-উপাধি অপেক্ষা জ্ঞান-উপাধি মূল সত্যের সহিত অধিকতর সংলগ্ন হয়। কেন না জড়েতে সত্যের কেবল এক পিট মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়, জ্ঞেয় ভাবটি মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়; জ্ঞানেতে জ্ঞেয়-ভাব ত আছেই, তদ্ব্যতীত এমন একটি সত্য তাহাতে আছে, যাহা জড়েতে সম্ভবে না; কি? না জ্ঞাতৃ-ভাব। জ্ঞান-পদার্থ আপনার নিকট জ্ঞাতও বটে জ্ঞাতাও বটে, জড়বস্তু জ্ঞাতই হইতে পারে, জ্ঞাতা হইতে পারে না; এই রূপ জড় পদার্থ অপেক্ষা জ্ঞান-পদার্থে সত্যের ভাবাধিক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং জ্ঞান পদার্থ অপেক্ষা জড় পদার্থে সত্যের অভাবাধিক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই জন্য জড়-লক্ষণ অপেক্ষা জ্ঞান-লক্ষণ পূর্ণতার লক্ষণ। জড় অপেক্ষা আমাদের আত্মা সত্যে পরিপূর্ণ,—জীবাত্মার এই যে পূর্ণভাব ইহা আপেক্ষিক মাত্র। প্রকৃত পূর্ণ-ভাব এক অদ্বিতীয় মূল সত্য ভিন্ন আর কাহারো হইতে পারে না। জড় হইতে আত্মার দিকে চলিলে আমরা পূর্ণতার দিকে

চলি, এই মাত্র কারণে আমরা পূর্ণ সত্যকে আত্মারও অন্তরাত্মা বলিয়া, পরমাত্মা বলিয়া, হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকি। এক অদ্বিতীয় বলাতে মূল-সত্যে যেমন সত্যের অসীম ব্যাপ্তি প্রতিপন্ন হয়, সেই রূপ পূর্ণ পরমাত্মা বলাতে তাঁহাতে সত্যের অসীম প্রগাঢ়তা প্রতিপন্ন হয়।

উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মূল-সত্য আত্মার অন্তরাত্মা। এ বিষয়টি আর একটু বিবৃত করিয়া বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে। জড় এবং আত্মা উভয়কে পরস্পর তুলনা করিয়া দেখ, দেখিবে যে, জড়-পদার্থে যে কিছু সত্য আছে, সকলই জ্ঞেয়-ভাবের সত্য, এবং তাহাতে যে সত্যটির অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জ্ঞাতৃ-ভাবের সত্য। জড়-পদার্থের ঐ যে সত্যভাব, ঐ যে জ্ঞেয়-ভাব, তাহা আত্মাতেও আছে; কিন্তু জড় পদার্থের ঐ যে সত্যাভাব, জ্ঞাতৃ-ভাবের ঐ যে অভাব, তাহা আত্মাতে নাই; জড়-পদার্থের ন্যায় আত্মাতে শুদ্ধ যে কেবল জ্ঞেয়-ভাবটি আছে, তাহা নহে, তাঃছাড়া আর একটী ভাব আছে, সে ভাব জ্ঞাতৃভাব। জড়-বস্তুতে কেবল জ্ঞেয়-ভাবের সত্য আছে, আত্মাতে জ্ঞেয়-ভাব এবং জ্ঞাতৃভাব দুই ভাবের সত্য আছে। অতএব জড় পদার্থ যদি এক গুণ সত্য হয়, আত্মা তবে দ্বিগুণ সত্য, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। জড় পদার্থের ঐ যে এক-গুণ সত্যভাব, তাহা আত্মাতে আছে, কিন্তু আত্মার ঐ যে দ্বিগুণ সত্যভাব, তাহা জড় পদার্থে নাই। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার তুলনা করিয়া ঐ রূপ বলা যাইতে পারে যে, জীবাত্মার ঐ যে দ্বিগুণ সত্যভাব, তাহা পরমাত্মাতে আছে, কিন্তু জীবাত্মাতে সত্যের অভাব যে-টি আছে, সে অভাবটি পরমাত্মাতে নাই। এক জীবাত্মা অন্য জীবাত্মাকে এবং জড়-জগৎকে অপেক্ষা করে, আবার জড়োপাধি-সমেত সকল জীবাত্মা মূল-সত্য পরমাত্মাকে অপেক্ষা করে; জীবাত্মাতে এই যে নিরবলম্ব ভাবের অভাব দেখিতে পাওয়া যায়, পরমাত্মাতে তাহা নাই। যাহা বলা হইল, তাহা সংক্ষেপে এইঃ—

জড়েতে——জ্ঞেয় ভাব মাত্র—এক গুণ সত্য।

জীবাত্মাতে—{ জ্ঞেয় ভাব, জ্ঞাতৃ ভাব } দ্বিগুণ সত্য।

পরমাত্মাতে—{ জ্ঞেয়ভাব, জ্ঞাতৃভাব, অসীম ভাব } অসীম সত্য।

জড় যেমন—বস্তু, জীবাত্মাও তেমনি—বস্তু; কিন্তু জড় আত্মা নহে, জীবাত্মা আত্মা; জড় যেমন—বস্তু, পরমাত্মাও তেমনি—বস্তু; জীবাত্মা যেমন—আত্মা, পরমাত্মাও তেমনি—আত্মা; কিন্তু জীবাত্মা নিরবলম্ব পরিপূর্ণ আত্মা নহে, পরমাত্মা নিরবলম্ব পরিপূর্ণ মহান্ আত্মা। জড় অপেক্ষা জীবাত্মা পরমাত্মার নিকটবর্ত্তী, এ-জন্য জীবাত্মার মধ্য দিয়াই পরমাত্মার অনুসন্ধান করা শ্রেয়ঃকল্প। পরমাত্মা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দুই প্রকার,—ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক। জীবাত্মা যেমন—আত্মা, পরমাত্মা তেমনি—আত্মা, এইটি ভাবাত্মক জ্ঞান। পরমাত্মা অসীম অনাদ্যন্ত নিরবলম্ব, এইটি অভাবাত্মক জ্ঞান। শরীর মন রূপ আপনার ক্ষুদ্র পরি-

সরের মধ্যে জীবাত্মা এক, জীবাত্মা দ্বিগুণ সত্য, জীবাত্মা নিরন্তা ; পরমাত্মা সর্ব্বতোভাবে এক, সর্ব্বতোভাবে সত্য, সর্ব্বতোভাবে নিয়ন্তা, এইটুকু স্পষ্টরূপে আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। কিন্তু নিরবলম্ব-ভাব যে কিরূপ ভাব, অসীম-ভাব যে কিরূপ ভাব, অতলস্পর্শ-ভাব যে কিরূপ ভাব, ইহা কোন কালেই আমরা জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারিব না। এই শেষোক্ত অভাবাত্মক জ্ঞান এই-রূপ যে, মূল-সত্য আছে,ইহা নিশ্চিত জানিয়াও, কোথাও তাঁহার অন্ত না পাইয়া—জানি না বলিতে বাধ্য হয়। পরমাত্মা-বিষয়ক অভাবাত্মক জ্ঞানের এইরূপ নতশির ভাব দেখিয়া, তাঁহার সম্বন্ধে ভাবাত্মক জ্ঞান যে-টুকু আমাদের আছে, তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা অতীব অন্যায়। উচিত এই যে, ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক উভয়-বিধ জ্ঞানকেই এক-যোগে আমরা পরমাত্মার প্রতি পরিচালনা করি। তাঁহাকে যে অংশে আমরা আত্মা রূপে হৃদয়ঙ্গম করি, সে অংশে আমাদের প্রীতিবৃত্তি চরিতার্থ হয়, এবং যে অংশে মহান্ অমাদ্যানন্ত অচিন্ত্য অনির্ব্বাচ্য রূপে হৃদয়ঙ্গম করি, সে অংশে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা চরিতার্থ হয় ; এই দুই ভাবের যোগে ঈশ্বরের উপাসনা করিলে সমগ্রভাবে তাঁহার উপাসনা করা হয়।

অতঃপর পরমাত্মা আত্মা, এই ভাবাত্মক সত্যটি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সৃষ্টির নিয়ম অন্বেষণ করা যাইতেছে। এইরূপ অন্বেষণ প্রণালীকেই অবরোহ-প্রণালী বলে।

শারদ জ্যোৎস্নায়

ভগ্ন হৃদয়ের গীতোচ্ছ্বাস।

আবার, আবার, শুনা রে আবার,
পীযূষ-ভরা সে প্রেমের গান,
আবার, আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

সুমধুর সুরে বাঁধ্ রে বীণা,
পঞ্চমে চড়ায়ে ললিত তান,
আবার, আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

মাতিয়ে উঠুক অবশ পরাণ,
নাচিয়ে উঠুক হৃদয় আজ ;
জোছনা-হাসিনী এমন যামিনী,—
বিষাদের মাথে পড়ুক বাজ!

"জোছনা হাসিনী, এমন যামিনী,"
প্রতিধ্বনি দিল সকল দিক্,
দিগঙ্গনা মেলি, দিল করতালি,
কুহু কুহু করি উঠিল পিক্!

ভাবে উজলিল যমুনার জল,
কুমুদের মুখে হাসি না ধরে,
হরষে পাপিয়া, আকাশ ছাপিয়া,
ধরিল সে গীত মধুর স্বরে!

ভ্রমর ভূতলে, ফুল-দলে দলে
গুন্ গুন্ রবে ধরিল তান,
"জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী"
দিশি দিশি এই উঠিল গান!

কর কর শশি, সুধা বরিষণ!
মিটাও মিটাও চকোর-আশ,
ফুটাও ফুটাও কুমুদের বন,
পরাও জগতে রজত বাস!

"সব-ই অকারণ, বৃথাই জীবন,
জীবন কেবলি যাতনা সার—"
ধিক্ ও কথায়, শুনিতে কে চায়,
কবির কাঁদুনি সহেনা আর!

জোছনা-হাসিনী, এমন যামিনী—
এমন শরৎ, এমন শশী,
আবার ভূতলে, যমুনার জলে,
কত ভাঙা চাঁদ প'ড়েছে খসি!

লহরী লীলায়, নেচে নেচে যায়,
নেচে নেচে যায় তারকাকুল!
লতাপাতা গুলি, নাচে হেলি দুলি,
ঘুম ঘুম আঁখি মেলিল ফুল!

ডাগর ডাগর, ফুটেছে টগর,
গোলাপ প্রলাপ বাড়ায় প্রাণে,
চামেলির ফুল, হেসেই আকুল,
কেতকী কত কি কুহক জানে!

শেফালিকা বেলা, করে কত খেলা,
মৃদুল পবন সহায় তায়,
মৃদুল পরশে, অলস-আবেশে
ঢুলে ঢুলে পড়ে এ ওর গায়!

বাঁধ্ তবে বীণা, আরো তুলে বাঁধ্,
নিখাদে চড়ায়ে ললিত তান,
আবার আবার, সে রবে আমার,
মাতিয়ে উঠুক অবশ প্রাণ!

এই যে চাঁদিমা বিমান উজলে,
উজলে ত আজি আমারি তরে,
আমারি ত লাগি, হইয়ে সোহাগী,
বহিছে যমুনা পুলক ভরে!

বিষাদের ঘোর কেন রবে তবে,
ভাবনায় কেন দলিত হ'ব,
চাহে না পৃথিবী, চাহিনা পৃথিবী,
আপনার ভাবে আপনি র'ব!

আমার হৃদয় আমারি হৃদয়,
বেচিনে ত তাহা কাহারো কাছে,
ভাঙা-চোরা হোক্, যা হোক্ তা হোক্,
আমার হৃদয় আমারি আছে!

চাহিনে কাহারো আদরের হাসি,
ভ্রূকুটীর কারো ধারিনে ধার,
মায়া-হাসিময় মিছে মমতায়,
ছলনে কাহারও ভুলিনে আর!

কাহারো ছলনে আর নাহি ভুলি
জলিয়া পুড়িয়া হয়েছি খাক্,
তাদের সোহাগ, তাদের বিরাগ
তাদের আদর তাদেরি থাক্ !

বাঁধ্ তবে বীণা, আরো তুলে বাঁধ্,
নিখাদে চড়ায়ে ললিত তান,
আপনার মন আপনারি ঠাঁই,
আপনারি ভাবে ভাসুক প্রাণ।

থাক্ থাক্ বীণা, শুনিতে চাহি না,
মরম-বিঁধুনি ও সব গান,
শোন শোন শোন কোকিল উদিকে,
ধরেছে কেমন মধুর তান !

ক্ষণেক দাঁড়াও যমুনা ! যমুনা !
পিউ পিউ ওই পাপীয়া গায় ;
আকাশ পাতাল, সে রবে মাতাল,
আকাশ পাতাল অঘোর প্রায় !

গাও গাও, পাখি, আমোদের গান !
মৃদুল পবন, মাতিয়ে রও !
আয় লো যমুনা বহিয়ে উজান !
আজ শশি ! তুমি হোথাই রও !

নিশি তুমি ! আজ হয়োনা প্রভাত,
ভানুর মাথায় পড়ুক বাজ,
কাঁদায়ে চকোরে, ফেলিয়ে আমারে,
মধুর যামিনী, যেয়োনা আজ ॥

বঙ্গ সাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

প্রথমেই ষ্টুয়ার্ট মিলের সঙ্গে আমাদের বিসম্বাদটী মিটাই। তাহা হইলেই আমাদের গন্তব্য পথটী নিষ্কণ্টক হইয়া পড়িবে। ভাবোদ্দীপক-বাক্যের সহিত কবিতার প্রভেদ নিরূপণ করিতে গিয়া মিল বলেন যে "উদ্দীপনা-বাক্য আমরা প্রকাশ্যভাবে শুনিয়া থাকি, আর কবিতা আমরা লুকাইয়া শুনি। উদ্দীপনা-বাক্য বলিতে গেলেই শ্রোতৃমণ্ডলীর উপস্থিতি মনে হয়, কিন্তু কবিতার বিশেষ লক্ষণ এই যে, বাহিরে কেহ শুনিতেছে কি না, এ বিষয়ে কবি সম্পূর্ণ বীতচেতন থাকেন।" * মিলের কাছে এরূপ অসঙ্গত কথা কখনই আমরা প্রত্যাশা করি নাই। "কেহ শ্রোতা আছেন কি না, এ বিষয়ে

* "——We should say that eloquence is heard, poetry is overheard. Eloquence supposes an audience, the peculiarity of poetry appears to us to lie in the poet's utter unconciousness of a listener."
Mill's Discussions and dissertations Vol. I.

কবি সম্পূর্ণ বীতচেতন থাকেন”—এ কথা আমরা কেমন করিয়া স্বীকার করিব? জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্যগুলি দেখিলে কি মিলের কথার সার্থকতা থাকে? বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণের প্রারম্ভেই বলিতেছেন, “পাঠক, এক্ষণে সেই সমাস-সন্ধি ও প্রকৃতি-প্রত্যয়-যোগসম্পন্ন দোষ-বিরহিত প্রসাদ-গুণোপেত বাক্য-সঙ্কলিত ঋষিপ্রণীত রাম-চরিত ও রাবণবধ শ্রবণ কর।”* গ্রীকদিগের মনোরঞ্জন করিবার জন্যই অন্ধ হোমর তাঁহার ইলিয়াড রচনা করিয়া নগরের পথে পথে গাহিয়া বেড়াইতেন। অগষ্টস্ সিজরের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ রোমান-দিগের চক্ষে প্রীতিকর করিবার জন্যই বর্জিল তাঁহার ইনিয়াড রচনা করিয়াছিলেন। কাল-প্রবাহে আরও একটু নাবিয়া আসিলে মিলটনকৃত প্যারাডাইজ লষ্ট আমাদের চক্ষে পড়ে। এই কাব্যের প্রথম সর্গেই কবি দিব্য-আত্মাকে নিবেদন করিতেছেন যে, ঈশ্বরের মঙ্গল উদ্দেশ্য প্রতিপন্ন করাই তাঁহার কাব্যের মুখ্য অভিপ্রায়। সেই মহাকাব্যের সপ্তম সর্গে আবার কবি দেবী ইউরেনীয়াকে বন্দনা করিয়া বলিতেছেন যে, “হে দেবি! তুমিই আমাকে উপযুক্ত শ্রোতৃমণ্ডলী সংগ্রহ করিয়া দাও—তাহাদের সংখ্যা অল্প হইলেও আমার দুঃখ নাই।” এই সকল প্রমাণ সত্ত্বেও আমরা কেমন করিয়া মিলের সহিত এক বাক্যে বলিব যে “বাহিরে কেহ শুনিতেছে কি না, এ বিষয়ে কবি সম্পূর্ণ বীতচেতন থাকেন।”

* শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ

কিন্তু মিলের কথা এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার উপরি-উক্ত মতটী সমর্থন করি-বার জন্য তিনি কবিতাসমূহ মুদ্রাঙ্কিত ও প্রচারিত হওয়ার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া আরও বলেন, “সকল কবিতাই আত্মগত উক্তিমাত্র। কিন্তু আমরা যাহা এক সময়ে আপনা আপনি বলি, অন্য সময়ে তাহা পরের নিকটে বলিতে পারি; যাহা আমরা এক সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিয়াছি, তাহা আমরা অন্য সময়ে অন্যের সম্মুখে প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু প্রকৃত কবিতাতে অন্যের দৃষ্টি যে আমাদের উপর আছে, এরূপ জ্ঞানের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না। যখন কোন কবি, অন্যের নিকট তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিতে যান, যখন তাঁহার বাক্যবিন্যাস বাক্যবিন্যাসেরই উদ্দেশে নহে, যখন তাহা একটী স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যের উপায় মাত্র—অর্থাৎ যখন তিনি আপন মনের ভাব প্রকাশ করিয়া অন্যের মনোভাব বা বিশ্বাস বা ইচ্ছাতে কোনরূপ বিকার উৎপাদন করিতে চাহেন, যখন তাঁর আত্মভাব প্রকাশটী ঐ রূপ উদ্দেশ্য দ্বারা, ঐরূপ অন্যের মনে সংস্কার উৎপাদনের ইচ্ছা দ্বারা রঞ্জিত হয়, তখন তাহাকে আর কবিতা বলিব না, তখন তাহা উদ্দীপনা-বাক্য হইয়া পড়ে।” * এখন

* All poetry is of the nature of soliloquy. (But) what we have said to ourselves we tell to others afterwards; what we have said or done in solitude we may voluntarily reproduce when we know that other eyes are upon us. But no trace of consciousness that other eyes are upon us must be visible in the work itself. When he turns round and

দেখা যাক্, মহাত্মা মিলের একথা গুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাকাব্য সমূহের ইতিবৃত্ত দ্বারা কত দূর সমর্থন করা যাইতে পারে। বাল্মীকির রামায়ণ ও হোমরের ইলিয়াড্—এ উভয়েরই সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন, সুতরাং রামায়ণ ও ইলিয়াড্‌কে তর্কভূমি হইতে অপসৃত করিয়া বর্জিলের ইনিয়াড্ লইয়া আমরা মিলের মতটী খণ্ডন করিতে চেষ্টা পাইতেছি।

অগষ্টস্ সিজর যখন রোম রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন রোমের আপামর সকলেই সাধারণ-তন্ত্র-প্রিয় ছিল। জুলিয়স্ সিজরের হত্যাকাণ্ডেই তাহাদের এই আসক্তির জ্বলন্ত প্রমাণ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সুতরাং অগষ্টস্ সিজর রাজা হইতে পারিলেও পুরবাসীদের হস্তে বিষম বৈরিতার আশঙ্কা তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। সেই আশঙ্কা অপনোদনার্থে তিনি বর্জিলকে একখানি কাব্য রচনা করিতে বলেন। বর্জিল ইনিয়াড্ লেখেন। কবি এই কাব্যে ইহাই প্রচার করেন যে, অগষ্টস্ সিজর দেবী বিনস্-প্রসূত ইনিয়সের বংশোদ্ভব, সুতরাং রাজ-সিংহাসনে তাঁহার ন্যায্য অধিকারই ছিল; বিশেষতঃ অগষ্টস্ সিজর যেরূপ সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন, তাহাতে তিনি যে রাজা হইয়া কেবল দেবদেব জুপিটারের একটী অঙ্গীকার সিদ্ধ করিতেছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই সকল জানিয়া শুনিয়াও কি আমরা বলিতে পারি যে, ইনিয়াড্-খানি লোক-রঞ্জন-রূপ উদ্দেশ্য-বিরহিত আত্মগত উক্তি মাত্র? যদি কেহ এমন বলেন যে, কবির নিগূঢ় উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, আমাদের তাহা জানিবার কোন অধিকার নাই, প্রচারিত কাব্যগ্রন্থখানিই দেখিতে আমাদের অধিকার, যদি সেই কবিতার অন্তরের প্রকাশ্য বা গূঢ় স্থানে অন্য সংক্রান্ত কোন উদ্দেশ্য উপলব্ধ না হয়, তাহা হইলে সে কবিতাকে আমরা কবির আত্মগত উক্তি ব্যতীত আর কি বলিতে পারি? মিল ত আপনিই বলিয়াছেন যে, "এক সময়ে যাহা কবি আপনি ভাবেন, অন্য সময়ে তাহা তিনি পরের কাছে প্রকাশ করিতে পারেন," সুতরাং বর্জিলের এক সময়কার আত্মগত উক্তিমাত্র সময়ান্তরে অন্যের কাছে ইনিয়াড্ রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্জিলের মুখ্য উদ্দেশ্য অগষ্টস্ সিজরের মনোরক্ষা হইতে পারে; কিন্তু যখন বর্জিল ইনিয়াড্ কাব্যখানি রচনা করিতে গিয়া আপনার কল্পনার তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছিলেন, যখন তিনি আপনার ভাবোচ্ছ্বাসে আপনিই উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন আর রোমের কথাও তাঁহার মনে ছিল না, অগষ্টস্ সিজরের অনুরোধও তাঁহার মনে ছিল

addresses himself to another person, when the act of utterance is not itself the end, but a means to an end,—viz. by the feelings he himself expresses to work upon the feelings, or upon the belief or the will of another, when the expression of his emotion, or of his thoughts tinged by his emotions is tinged also by that purpose, by that desire of making an impression on another mind, then it ceases to be poetry and becomes eloquence. Do.

না, তিনি আপনার মনে আপনিই আপনা-হারা হইয়াছিলেন।

মিলের কথার মর্ম্মার্থ বোধ হয় ইহা অপেক্ষা আর বিশদ-রূপে বিবৃত হইতে পারে না; এখন মিলের কথা আমরা এই-রূপে প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেছি;—ইনিয়াডের ষষ্ঠ সর্গে ইনিয়াস্ প্রেত-লোকে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেখানে তাঁহার পিতা ইস্কাইসিসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। পুত্রবৎসল ইস্কাইসিস্ ইনিয়াসকে সঙ্গে লইয়া তথাকার নানাপ্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার প্রদর্শন করিলেন, এবং ভবিষ্যতে যাঁহারা রোম রাজ্যে মহাবীরপুরুষ রূপে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাদিগের পরিচয় দিতে লাগিলেন। কেবল জুলিয়স ও অগষ্টসেরই অসামান্য গুণ-কীর্ত্তনে ক্ষান্ত না হইয়া তিনি আর একটী যুবা পুরুষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঐ যে পরমসুন্দর যুবা পুরুষটীকে দেখিতেছ, উনি ট্রোজন বংশের গরিমাস্থল ও রোম রাজ্যের অহঙ্কার-রূপে জন্ম গ্রহণ করিবেন। উনি জীবদ্দশায় সকলের ভক্তি-ভাজন ও জীবনান্তে সকলের পূজিত হইবেন। উনি অল্প বয়সে ধর্ম্মভাব, অপ্রতি-হত বীর্য্য, ও অপ্রতিহত সত্য-নিষ্ঠার দর্পণ স্বরূপ হইবেন। সমর ক্ষেত্রে অরাতি নিপাতে উনি অদ্বিতীয় বল-বিক্রম প্রকাশ করি-বেন।"—আমরা হেঁয়ালী-চ্ছলে পাঠককে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই যুবা পুরুষটি কে? আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, পাঠক যাহাকে মনে করিতেছেন, ইনি তিনি নন। ইনি দেবতা-সদৃশ অগষ্টস সিজরের দেবতা-স্বরূপা সহোদরা অক্টেভিয়ার পুত্র মার্সিলস! ইহাকে লইয়াই ভর্জিল প্রায় চল্লিশ পংক্তি অপব্যয় করিয়াছেন, অথচ রোমের এত শত বীরপুরুষের গুণ-কীর্ত্তন-মধ্যে পম্পে বা ব্রূটসের নাম কোথাও উল্লেখ নাই কেন? কারণ তাঁহারা জুলিয়স সিজরের বিপক্ষ ছিলেন। অ্যাণ্টনির নাম কোথাও উল্লেখ নাই কেন? কেন না তিনি অগষ্টস সিজরের বিপক্ষ ছিলেন। এখনো কি আমরা বলিতে পারি যে, ইনিয়াড্-খানি উদ্দেশ্য-বিরহিত কবির আত্মগত উক্তিমাত্র? যে কবিতার প্রত্যেক গ্রন্থিতে, প্রত্যেক উপগ্রন্থিতে, প্রত্যেক কল্পনাময়ী বর্ণনাতে, লোকরঞ্জন-রূপ উদ্দেশ্যটী জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তাহা কি কবির আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের তরঙ্গ মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারি?

যদি এই সূত্রে আমরা মহাকবিদের নাট-কের কথা উল্লেখ করি, তাহা হইলে মিল কি উত্তর দিবেন? হ্যামলেটে যে সকল নাটক-অভিনয় সম্বন্ধে উপহাস ও উপদেশ আছে, ম্যাকবেথে ষ্টুয়ার্ট্ বংশের যে গুণগরিমা কীর্ত্তিত আছে, মেরী ওয়াইব্স্ অফ্ উই-ণ্ডসরে, স্যার্ লিউসীর প্রতি যে সকল ব্যঙ্গ পরিহাস লক্ষিত আছে, মিড্সমর্ নাইট্স্ ড্রীমে কটাক্ষচ্ছলে এলিজাবেথের যে প্রশংসা-বাদ ও স্কটলণ্ডের হতভাগিনী মেরীর প্রতি এলিজাবেথের প্রীতিকর যে সকল ঈষৎ বিদ্রূপ আছে, সে-সকল দেখিয়া কে মনে করিতে পারে যে, সে-সকল উদ্দেশ্য-বির-হিত কবির আত্মগত উক্তি মাত্র?

আমরা কিছু এমন বলি না, যে মিল যে

বলিয়াছেন, যে, "আমরা এক সময়ে আপনা আপনি যাহা ভাবি, পরক্ষণে তাহা অন্যের নিকট বলিতে পারি"——একথা অসঙ্গত; কারণ কালিদাসের মেঘদূত বা মিলটনের লিসিডস্ বা শেলির এডোনিয়স্ বা টেনিসনের ইনমেমোরিয়ম ইত্যাদি অনেকগুলি কবিতা উক্ত কথার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, ঐরূপ কবিতা না হইলে কি কিছুই কবিতা নহে? আমরা তাহা বলি না।

যদি কেহ এমন বলেন যে, কবির উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, কিন্তু যখন তিনি একটী কবিতা রচনা করিতেছেন, যখন তিনি আপনার ভাবোচ্ছ্বাসে প্রধাবিত হইয়া যাইতেছেন, তখন আর তাঁহার বহির্জ্জগতের কথা মনে থাকে না। অর্থাৎ মার্সিলসের গুণকীর্ত্তন কবির উদ্দেশ্যগত হইলেও যখন তিনি সেই গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন, যখন তিনি তাঁহার কল্পনার পক্ষ সঞ্চালন পূর্ব্বক দেবতাদিগের সমস্ত গুণ আহরণ করিয়া মার্সিলস্‌কে সাজাইতেছেন, তখন আর তাঁহার বহির্জ্জগতের কথা মনে নাই। আমরা উত্তরে এই বলিব যে, বহির্জ্জগৎ হইতে ওরূপ আত্ম-অপসারণা কবিতার হৃদয়গত একটী বিশেষ লক্ষণ হইতে পারে না, কেন না ভাবোদ্দীপনা যাঁহাদের লক্ষ্য, সেই বাগ্মীরাও অন্যকে মাতাইতে গিয়া আপনারা মাতিয়া উঠেন। আপনারা না মাতিলে অন্যকেও ভাল করিয়া মাতান যায় না, বাগ্মীরা যে পরিমাণে আপনা-হারা হইয়া আপনাদিগকে অন্যের স্থলে আরোপিত করিতে পারেন, সেই পরিমাণে তাঁহাদের বক্তৃতা সফল হয়। মহাকাব্য-লেখক সুকবিরাও আপনা-হারা হইয়া আপনারা অন্যের স্থলাভিষিক্ত হইয়া নায়ক-নায়িকার চরিত্র বর্ণন করেন। উপস্থিত-ভাবী কবি-ওয়ালা এবং কথকেরাও আপনারা মাতিলে তবে অন্যকে মাতাইতে পারেন। অতএব দেখা যাইতেছে, আপনা-হারা হওয়া সম্বন্ধে কবিতা ও উদ্দীপনা বাক্যের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। তাহা হইলে মিলের মতব্যাখ্যানে কবিতার প্রকৃতি-বিষয়ে আমরা কি বিশেষ জ্ঞান লাভ করিলাম? যাহা করিলাম, তাহা ত আদৌ ভ্রমাত্মক। মিল উদ্দীপনা-বাক্যের সঙ্গে আর কবিতার সঙ্গে একটী সূক্ষ্ম প্রভেদ রক্ষা করিতে গিয়া এই রূপ প্রলাপ-সাগরে ভগ্নতরি হইয়াছেন। ক্যাটিলাইনের বিরুদ্ধে সিসিরো যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই কবিতাময় উদ্দীপনা, আবার ফ্র্যান্স্ দেশে "লা মার্সেইএজ্" বলিয়া যে গীতটী আছে, তাহা সমস্তই জলন্ত উদ্দীপনাময় কবিতা। এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলিব না, কারণ কবিতার লক্ষণ নিরূপণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য, উদ্দীপনার সহিত তাহার প্রভেদ নিরূপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। কবিতার লক্ষণ প্রকৃত প্রস্তাবে নিরূপিত হইলে, অন্য অন্য বিষয়ের সহিত তাহার যে সৌসাদৃশ্য ও প্রভেদ, তাহা আপনা আপনি দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে।

ক্রমশঃ

মেঘনাদ-বধ কাব্য।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত)

লক্ষ্মী ইন্দ্রকে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন।

কহিলেন স্বরীশ্বর ; "এ ঘোর বিপদে
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ কে আর রাখিবে
রাঘবে ? দুর্ব্বার রণে রাবণ-নন্দন।
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি।"

ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিকট শতবার পরাজিত হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি

"পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত,
ততোধিক ডরি তারে আমি,"

একথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। ইন্দ্রজিৎকে বাড়াইবার জন্য ইন্দ্রকে নত করা অন্যায় হইয়াছে ; প্রতিনায়ককে নত করিলেই যে নায়ককে উন্নত করা হয়, তাহা নহে ; হিমালয়কে ভূমি অপেক্ষা উচ্চ বলিলে হিমালয়ের উচ্চত্ব প্রতিভাত হয় না, সকল পর্ব্বত হইতে হিমালয়কে উচ্চ বলিলেই তাহাকে যথার্থ উন্নত বলিয়া বোধ হয়। এক বার, দুই বার, তিন বার পরাজিত হইলে কাহার মন দমিয়া যায় ? পৃথিবীর বীরের। সহস্র বার অকৃতকার্য্য হইলেও কাহার উদ্যম টলে না ? স্বর্গের দেবতার। ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের অপেক্ষা দুর্ব্বল হইতে পারেন, কিন্তু ভীরু কেন হইবেন ? চিত্রের প্রারম্ভ ভাগেই কবি যে ইন্দ্রকে কাপুরুষ করিয়া আঁকিয়াছেন, তাহা বড় সুকবি-সঙ্গত হয় নাই।

ইন্দ্র শচীর সহিত কৈলাস-শিখরে দুর্গার নিকটে গমন করিলেন এবং রাঘবকে রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এক বিষয়ে আমরা ইন্দ্রের প্রতি বড় অসন্তুষ্ট হইলাম, পাঠকের মনে আছে যে, ইন্দ্রের কৈলাসে আসিবার সময় লক্ষ্মী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে,

"বড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে।
কহিও, বৈকুণ্ঠ পুরী বহুদিন ছাড়ি
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে ! কত যে বিরলে
ভাবয়ে সে অবিরল ; একবার তিনি,
কি দোষ দেখিয়া তারে না ভাবেন মনে ?
কোন্ পিতা, দুহিতারে পতিগৃহ হতে
রাখে দূরে জিজ্ঞাসিও বিজ্ঞ জটাধরে !"

পাছে শিবের সহিত দেখা না হয় ও তিনি শিবের বিজ্ঞত্বের উপর যে ভয়ানক কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন, তাহা অনর্থক নষ্ট হয়, এই নিমিত্ত তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে,—

"ত্র্যম্বকে না পাও যদি, অম্বিকার পদে
কহিও এ সব কথা।"

লক্ষ্মীর এমন সাধের অনুরোধটি ইন্দ্র পালন করেন নাই।

মহাদেবের পরামর্শ মতে ইন্দ্র মায়াদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

"সৌর-খরতর-করজাল-সঙ্কলিত—
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী
শক্তীশ্বরী।"

আমাদের মতে মায়াদেবীর আসন সৌর-খরতর-করজাল-সঙ্কলিত না হইয়া যদি অস্ফুট অন্ধকার-কুজ্ঝটিকা-মণ্ডিত জলদময় হইত, তবে ভাল হইত। মায়াদেবীর নিকট হইতে দেব-অস্ত্র লইয়া ইন্দ্র রাম-সমীপে প্রেরণ করিলেন।

পঞ্চম সর্গে ইন্দ্রজিতের ভাবনায় ইন্দ্রের ঘুম নাই;

"—কুসুম শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে
বসেন ত্রিদিব-পতি রত্ন-সিংহাসনে;—
স্বর্ণ মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত।"

দেবতাদিগের ঘুমটা না থাকিলেই ভাল হইত, যদি বা ঘুম রহিল, তবে ইন্দ্রজিতের ভয়ে ইন্দ্রের রাতটা না জাগিলেই ভাল হইত।

শচী ইন্দ্রের ভয় ভাঙ্গিবার জন্য নানাবিধ প্রবোধ দিতে লাগিলেন,

"পাইয়াছ অস্ত্র কান্ত" কহিলা পৌলোমী
অনন্ত যৌবনা "যাহে বধিলা তারকে
মহাসুর তারকারি; তব ভাগ্য বলে
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পার্বতী,
দাসীর সাধনে সাধ্বী কহিলা, সুসিদ্ধ
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীশ্বরী
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;—
তবে এ ভাবনা নাথ কহ কি কারণে?"

কিন্তু ইন্দ্র কিছুতেই প্রবোধ মানিবার নহেন, দেব অস্ত্র পাইয়াছেন তাহা সত্য, শিব তাঁহার পক্ষ তাহাও সত্য, কিন্তু তথাপি ইন্দ্রের বিশ্বাস হইতেছে না,—

"সত্য যা কহিলে,
দেবেন্দ্রাণি; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে;
কিন্তু কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষ্মণে
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে।
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা নন্দন;
কিন্তু দন্তী কবে দেবি আঁটে মৃগরাজে?
দম্ভোলী নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদনে;
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে,
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী;
তবু থর থরি হিয়া কাঁপে, দেবি, যবে
নাদে রুষি মেঘনাদ,"

পাঠক দেখিলেন ত, ইন্দ্র কোনমতে শচীর সান্ত্বনা মানিলেন না।

"বিষাদে নিশ্বাসি
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে
(পতিখেদে সতী প্রাণ কাঁদেরে সতত।)
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে।"

আহা, অসহায় শিশুর প্রতি আমাদের যেরূপ মমতা জন্মে, ভয় ও বিষাদে আকুল ইন্দ্র বেচারীর উপর আমাদের সেই রূপ জন্মিতেছে।

উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা চিত্রলেখা প্রভৃতি অপ্সরারা বিষণ্ণ ইন্দ্রকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

সরসে যেমতি
সুধাকর কর রাশি বেড়ে নিশাকালে
নীরবে মুদিত পদ্মে।

বিষণ্ণ-সৌন্দর্য্যের তুলনা এখানে সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু মাইকেল যেখানেই "কিম্বা" আনেন, সেখানেই আমাদের বড় ভয় হয়,

কিম্বা দীপাবলী
অম্বিকার পীঠতলে শারদ পার্ব্বণে

হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে
চির বাঞ্ছা।

পূর্ব্বকার তুলনাটির সহিত ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে, দীপাবলী, শারদ পার্ব্বণ, সমুদয় গুলিই উল্লাস-সূচক।

এমন সময়ে মায়াদেবী আসিয়া কহিলেন,

"যাই, আদিতেয়,
লঙ্কাপুরে, মনোরথ তোমার পূরিব ;
রক্ষঃকুল চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে।"

এতক্ষণে ইন্দ্র সান্ত্বনা পাইলেন, নিদ্রাতুরা শচী ও অপ্সরীরাও বাঁচিল, নহিলে হয় ত বেচারীদের সমস্ত রাত্রি জাগিতে হইত।

ইন্দ্রজিৎ হত হইয়াছেন। লক্ষ্মী ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইবামাত্র ইন্দ্র আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া কহিতেছেন,

"দেহ পদধূলি,
জননি ; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে—
গত জীব রণে আজি দুরন্ত রাবণি!
ভুঞ্জিব স্বর্গের সুখ নিরাপদে এবে।"-

বড় বাড়াবাড়ি হইয়াছে ; ইন্দ্রের ভীরুতা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে। এইবার সকলে কহিবেন, যে, পুরাণে ইন্দ্রকে বড় সাহসী করে নাই, এক একটি দৈত্য আসে, আর ইন্দ্র পাতালে পলায়ন করেন ও একবার ব্রহ্মা একবার মহাদেবকে সাধাসাধি করিয়া বেড়ান, তবে মাইকেলের কি অপরাধ? কিন্তু এ আপত্তি কোন কার্য্যেরই নহে। মেঘনাদ বধে যদি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পুরাণের কথা যথাযথ রূপে রক্ষিত হইত, তবে তাঁহাদের কথা আমরা স্বীকার করিতাম। কত স্থানে তিনি অকারণে পুরাণ লঙ্ঘন করিয়াছেন, রাবণের মাতুল কালনেমীকে তিনি ইন্দ্রজিতের শ্বশুর করিলেন, প্রমীলার দ্বারা রামের নিকট তিনি মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, বীর চূড়ামণি রাবণকে কাপুরুষ বানাইলেন ; আর যেখানে পুরাণকে মার্জ্জিত করিবার সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল, সেখানেই পুরাণের অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে মার্জ্জনা করিতে পারি না। ইন্দ্রের পর দুর্গার অবতারণা করা হইয়াছে।

ইন্দ্রজিতের বধোপায় অবধারিত করিবার জন্য ইন্দ্র দুর্গার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের অনুরোধে পার্বতী শিবের নিকট গমনোদ্যত হইলেন। রতিকে আহ্বান করিতেই রতি উপস্থিত হইলেন, এবং রতির পরামর্শে মোহিনী মূর্ত্তি ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দুর্গা মদনকে আহ্বান করিলেন ও কহিলেন,

"চল মোর সাথে,
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি
যোগে মগ্ন এবে, বাছা ; চল ত্বরা করি।"

"বাছা" কহিলেন—

"কেমনে মন্দির হোতে, নগেন্দ্রনন্দিনি,
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী বেশে,
মুহূর্ত্তে মাতিবে, মাতঃ, জগত হেরিলে,
ও রূপ মাধুরী সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে,
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত

বিবাদিল দেব সহ সুধা-মধু হেতু।
মোহিনী মূরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।
ছদ্মবেশী হৃষিকেশে ত্রিভুবন হেরি,
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে!
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব দৈত্য; নাগদল নম্রশিরঃ লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচযুগে!
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে,
মলম্বা অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন
কান্তি কত মনোহর!"

"বাছার" সহিত মাতার" কি চমৎকার মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়াছেন? মলম্বা অম্বরের (গিল্‌টি) উদাহরণ দিয়া, মদন কথাটি আরো কেমন রসময় করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়াছেন? মহাদেবের নিকট পার্ব্বতী গমন করিলেন,

মোহিত মোহিনী রূপে; কহিলা হরষে
পশুপতি, "কেন হেথা একাকিনী দেখি,
এ বিজন স্থলে তোমা, গণেন্দ্র জননি?
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিঙ্কর শঙ্করি?
কোথায় বিজয়া, জয়া?" হাসি উত্তরিলা
সুচারু হাসিনী উমা; "এ দাসীরে ভুলি,
হে যোগীন্দ্র বহু দিন আছ এ বিরলে;
তেঁই আসিয়াছি নাথ, দরশন আশে
পা দুখানি। যে রমণী পতি পরায়ণা,
সহচরী সহ সেকি যায় পতি পাশে?"

পতিপরায়ণা নারীর সহচরীর সহিত পতিসমীপে যাইতে যে নিষেধ আছে, এমন কথা আমরা কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে পড়ি নাই। পুনশ্চ মহাদেবের নিকট দাসী ভাবে আত্ম-নিবেদন করা পার্ব্বতীর পৌরাণিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চ দেব-ভাবের সহিত দম্পতির একাত্মভাব যেরূপ সংলগ্ন হয়, উচ্চ নীচভাব সেরূপ নহে।

রাবণের সহিত যখন কার্ত্তিকেয়ের যুদ্ধ হইতেছে, তখন দুর্গা কাতর হইয়া সখী বিজয়াকে কহিতেছেন।

"যালো তুই সৌদামিনী গতি,
নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা
বাছার কোমল দেহে।" ইত্যাদি

অসুরমর্দ্দিনী শক্তিরূপিণী ভগবতীকে "বাছার কোমল দেহে রক্তধারা" দেখিয়া এরূপ অধীর করা বড় সুকল্পনা নহে; পৃথিবীতেও এমন নারী আছেন, যাঁহারা পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য সহচরী প্রেরণ করেন না; তবে মহাদেবী পার্ব্বতীকে এত ক্ষুদ্র করা কতদূর অসঙ্গত হইয়াছে, সুরুচি পাঠকদের বুঝাইবার জন্য অধিক আড়ম্বর করিতে হইবে না।

গুজরাটে নাম করণ।

গর্ভাধান হইতে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া পর্য্যন্ত যে ষোড়শ বৈদিক সংস্কার বিধিবদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে নামকরণ পঞ্চম সংস্কার। জাতকর্ম্মের পর নামকরণ —সন্তান জন্মিবার

দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত সামান্যতঃ ইহার সময় নির্দ্দিষ্ট। সকল বর্ণের মধ্যে সময়ের একই নিয়ম নাই; ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দ্বাদশ দিবস, ক্ষত্রিয়দের ত্রয়োদশ, বৈশ্যদের ষোড়শ, শূদ্রদের দ্বাবিংশ দিবস নামকরণের নির্দ্ধারিত কাল। আর কার্য্যগতিকে এই কালের ব্যতিক্রমও ঘটিয়া থাকে।

গুজরাটী ব্রাহ্মণদের মধ্যে জাতকর্ম্ম-প্রথা এক্ষণে প্রচলিত নাই, মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ তাহা অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু নামকরণ সাধারণ হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত। তাহা যে শাস্ত্রের বিধানানুসারে সম্পন্ন হয়, কেবল তাহা নহে, লৌকিক ব্যবহারে তাহা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে।

আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রের মতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দ্বাদশ দিবসে কিম্বা প্রথম মাসের অন্য কোন দিবসে, অথবা প্রথম সংবৎসরে পিতা পুত্রের নামকরণ করিবেন। পিতা যদি বিদেশে গিয়া থাকেন, তবে তথা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া নামকরণ করিবেন। নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া পুত্রের তিনবার মস্তক আঘ্রাণ করিবেন।

অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবসি হৃদয়াদধিজায়সে।
আত্মা বৈ পুত্রনামাঽসি স জীব শরদঃ শতম্॥

ককারাদি বর্গের প্রথম দ্বিতীয় অথবা চতুর্থ বর্ণ নামের আদিতে ও বিসর্গান্ত হ্রস্ব স্বর অন্তে থাকা বিধেয়, প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তি দ্বি অক্ষর নাম রাখিবেন; ব্রহ্ম-বর্চ্চস্-কাম চতুরক্ষরের নাম রাখিবেন; পুরুষের নামে যুক্তাক্ষর মিলিত থাকিলে হানি নাই, কন্যার নামের আদিতে যুক্তাক্ষর না থাকে, এইরূপ নাম রাখিবে, যথা সুখদা, সুভদ্রা, বসুদা, যশোদা, সাবিত্রী, সুমঙ্গলা, কলাবতী ইত্যাদি। পারস্কর গৃহ্য সূত্রের মতে পুরুষের নাম তদ্ধিতান্ত হওয়া বিধেয় নয় (দৈবদত্তিঃ ঔপমন্যবঃ ইত্যাদি।) স্ত্রীর নাম তদ্ধিতান্ত হইবার বাধা নাই, যথা, গান্ধারী, কৈকেয়ী, জানকী ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের উপাধি শর্ম্মণ্, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মন্, বৈশ্যের গুপ্ত, শূদ্রের দাস।

গোভিলীয় গৃহ্য-সূত্রে নামকরণ-প্রথা এইরূপ লিখিত আছে।

কুমারকে শুদ্ধ বসন পরিধান করাইয়া মাতা বামভাগে উপবিষ্ট পিতার হস্তে তাহাকে দিবেন। তৎপরে পত্নী পৃষ্ঠদেশ হইতে পতিকে পরিক্রমণ করত তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইবেন। পতি "যজ্ঞে সুসীমে" "যথা যম প্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধীতি" প্রভৃতি বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া পত্নীকে কুমার প্রত্যর্পণ করিবেন। পরে "যদদশ্চন্দ্রমসীত্যাদি" মন্ত্রে চন্দ্রমার অর্চ্চনা করিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিবেন ও যথোক্তপ্রকার হোমাদি অনুষ্ঠান করিয়া পুত্রের নামকরণ করিবেন।

কালক্রমে এই বৈদিক প্রথার অনেক পরিবর্ত্তন ও রূপান্তর হইয়া আসিয়াছে।

সংস্কার-পদ্ধতি প্রয়োগে নাম করণ পদ্ধতি নিম্নলিখিত প্রকার।

একাদশ কিম্বা দ্বাদশ দিবসে পিতা সন্তানের দীর্ঘায়ু ও কল্যাণ উদ্দেশে নামকরণ সঙ্কল্প করিবেন। হোম ক্রিয়া ইচ্ছাধীন। নিম্নলিখিত নাম হইতে নাম নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত।

১ কৃষ্ণ	২ অনন্ত	৩ অচ্যুত	৪ চক্রী
৫ বৈকুণ্ঠ	৬ জনার্দ্দন	৭ উপেন্দ্র	৮ যজ্ঞপুরুষ
৯ বাসুদেব	১০ হরি	১১ যোগীশ	১২ পুণ্ডরীকাক্ষ

চৈত্র হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত এক এক মাসের এক এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,—চৈত্র-প্রধান কৃষ্ণ, বৈশাখ-প্রধান অনন্ত ইত্যাদি। এই হেতু যে মাসে সন্তান জন্মে সেই মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামে তাহার নাম রাখিতে হইবে। যথা চৈত্রে জন্মিলে তাহাকে কৃষ্ণের নাম দেওয়া বিধেয়।

অপিচ গৃহ-দেবতা কি কুল-দেবতার নাম হইতেও সন্তানের নাম দেওয়া যায়, যথা শঙ্কর, মহাদেব, গোবিন্দ, গণেশ, গোপাল, বামন ইত্যাদি।

সংস্কার-পদ্ধতিতে নাম রাখিবার আর এক প্রথা নির্দ্দিষ্ট আছে।

একটী কাংস্য পাত্রে স্বর্ণ লেখনী দ্বারা চতুর্ব্বিধ নাম লিখিত হইবে যথা।

১। কুলদেবতার নাম (রাম, কৃষ্ণ, বিঠোবা ইত্যাদি)।

২। মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নাম (কৃষ্ণ অনন্ত ইত্যাদি)।

৩। রাশি নাম।

৪। কুলাচার-অনুযায়ী নাম।

রাশি নাম স্থিরীকৃত হইবার নিয়ম এই;—মেষ, বৃষ প্রভৃতি রাশি ২৭ নক্ষত্রে বিভক্ত। প্রত্যেক রাশির জন্য পৃথক্ পৃথক্ অক্ষর নির্দ্দিষ্ট আছে—মেষ রাশির অ, ল, ই—বৃষভে র, ব, উ—মিথুনে ক, ছ, গ ইত্যাদি। মেষ রাশিতে জন্ম হইলে অ, ল, অথবা ইকারাদি নাম রাখা যায় যথা, অনন্ত, ললুভাই, ঈশ্বর।

উল্লিখিত প্রকারে কাংস্য-পাত্রে নাম লিখিত হইলে মাতা শিশুকে দক্ষিণ-ক্রোড়ে বসাইবেন ও পিতা শিশুর দক্ষিণ কর্ণে নাম উচ্চারণ করিয়া "তদস্তু মিত্রাবরুণ" মন্ত্র পাঠ করিবেন ও পুরোহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া কর্ম্ম সমাপন করিবেন।

এই সকল নিয়মেও বৈদিক অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রভেদ প্রতীয়মান হইবে। কুলদেবতার নাম ও রাশি-নাম রাখিবার প্রথা বৈদিক কালে প্রচলিত ছিল না। অবতার-বাদ হিন্দু-সমাজে প্রবিষ্ট হইবার পর এই সকল নাম প্রচার হইয়াছে, ইহা সহজেই প্রতীতি হয়। কি মহারাষ্ট্রদেশে কি গুজরাটে পুত্র কন্যার নাম প্রায়ই দেবদেবীর নাম হইতে গৃহীত। বৈদিক নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। মুসলমানদের অনুকরণে দৌলতরায়, হুকুমতরায়, খুসালরায়, মহতাবরায়, ন্যামত রায় প্রভৃতি কতকগুলি নাম পারস্য ভাষায় সংরচিত দেখা যায়।

আমি গুজরাট হইতে লিখিতেছি। এ প্রদেশে নামকরণ পদ্ধতিকে 'বারা বলিয়া' অথবা 'বারসা' (বার বাসর) বলে; ইহাতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের আড়ম্বর নাই; নামকরণ কার্য্য স্ত্রীদের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। সন্তানের নাম রাখিবার ভার বিশেষ রূপে তাহার ফোই অর্থাৎ পিসিমার হস্তে সমর্পিত, ও এই উপলক্ষে তিনি তাঁহার

ভ্রাতার নিকট হইতে উপহার প্রত্যাশা করেন।

গুজরাটে নামকরণের প্রথা এইরূপ,—

চারিজন বালক যাহাদের উপনয়ন হয় নাই, অথবা চারি স্ত্রী একখণ্ড রেশমের কাপড়ের চারি কোণ ধরিয়া দাঁড়ায়, পরে মাতা সন্তানকে তাহাতে রাখিয়া দেন। বালকেরা অথবা স্ত্রীগণ সেই ঝোলা দুলাইতে দুলাইতে এই শ্লোক আবৃত্তি করে,—

ঝোলী পোলী পীপল পান
ফোইয়ে পাড়ুঁ্য (অমুক) নাম
(পিসিমায় রাখে অমুক নাম)

পরে মিষ্টান্ন পরিবেশন হইয়া ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণদের সচরাচর দুই নাম থাকে; এক ডাকনাম, এক রাশি নাম।

মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে কতকগুলি নাম কেবল পরিবার ও আত্মীয়দের মধ্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জন-সাধারণের মধ্যে তাহারা এক নামে পরিচিত, আপনাদের মধ্যে তাহাদের আর এক নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে—যথা

কৃষ্ণরাও	নানা সাহেব
ভীমরাও	তাত্যা সাহেব
খণ্ডেরাও	ভাউ
গণপতরাও	বালা

এইরূপ অপ্পা, অন্না প্রভৃতি আরো কতকগুলি ঘরাও নাম আছে। গুজরাটীদের মধ্যে এইরূপ নান্নু, মণু, মোটা-ভাই বলিয়া কতকগুলি নাম শ্রবণ করা যায়। অনেক সময় পিতাকে পুত্রেরা বাবার পরিবর্ত্তে হয়ত মোটা-ভাই বলিয়া সম্বোধন করে। মাতাকে 'মা' না বলিয়া মোটী-বেন' বলিয়া ডাকে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্য দাদা দিদির অনুরূপ কোন নাম নাই।

মহারাষ্ট্রী গুজরাটী ও বাঙ্গালা ভাষায় সম্বন্ধসূচক নামাবলী পাঠ করিয়া পাঠকগণ এই তিন ভাষায় সৌসাদৃশ্য অনেকাংশে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

বাঙলা	গুজরাতী	মহারাষ্ট্রী
বাপ পিতা	বাপ পিতা	বাপ পিতা
মা মাতা	মা মাতা	আই মাতুশ্রী
ভাই	ভাই	ভাউ
ভগিনী বোন	বেন	বহিন
খুড়তুতা ভাই	পিত্রাই	চুলত ভাউ
কাকা	কাকা	কাকা
কাকী	কাকী	কাকী
স্বামী	ধনী বর	নবরা-ভ্রতার
স্ত্রী	বায়ড়ী	বায়কো
বড় ঠাকুর	জেঠ	জেঠ
দেওর-ঠাকুরপো	দের	দীর
ননদ	ননদ	ননদ
শালা	সালা	মেহমনা
ভাজ	ভোজাই ভাবী	ভাউজাই
ভগ্নীপতি বোনাই	বনেবী	বনেবী-দাজী
সতীন	সোখ	সবত

ভাগনে	ভানেজ	ভাচা
ভাগনী	ভানেজ	ভাচা
মামা	মামা	মামা
পিসি	ফোই	ফোই
মাসী	মাউসী	মাউসী
বউ	বহু	সুন
জামাই	জমাই	জাঁবই
ঠাকুর দাদা	দাদা	আজা
দিদিমা	দাদী	আজী
পৌত্র } নাতী }	পৌত্র	নাতু
ভাইপো	ভতৃজ	পুতনা

জ্যেষ্ঠা ও মূল, এই দুই নক্ষত্র অশুভ বলিয়া পরিগণিত। এই দুই নক্ষত্রে পুত্র কি কন্যা জন্মিলে জনক জননী আপনাদের মৃত্যু আশঙ্কা করেন। এই অমঙ্গল নিবারণ হেতু সেই নক্ষত্রের নামে সন্তানের নাম রাখিবার নিয়ম আছে। জ্যেষ্ঠাতে জন্ম হইলে নাম জেঠা কিম্বা জেঠী, মূলনক্ষত্রে জন্ম হইলে নাম মূলজী, মূলশঙ্কর অথবা মূলী রাখা হইয়া থাকে। যদি অনেক সন্তান মৃত হইয়া দৈববশাৎ এক সন্তান বাঁচিয়া থাকে, তবে তাহার নাম জীবা কি জীবী রাখা হয়। যে গৃহে বালকের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহাদের যত্ন নাই, তথায় হয়ত ধুলা, কচরা, জূঠা, পূঁজা, প্রভৃতি অযত্ন-সূচক নাম শ্রুতিগোচর হয়।

এদেশে নাম রাখিবার সময় পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যোগ করিয়া দিবার এক রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত। মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী পারসী সকলেরই মধ্যে এই রীতি দৃষ্ট হয়। যথা—পিতার নাম সারাভাই—পুত্রের নাম ভোলানাথ সারাভাই—পৌত্রের নাম ভীমরাও ভোলানাথ। পারসীদের মধ্যেও এইরূপ—পিতার নাম খরসদ্-জী, পুত্রের নাম মানকজী খরসদ্-জী, পৌত্রের নাম জাহাঙ্গীর মানকজী। অনেক স্থলে এই স্বনাম ও পিতৃ-নাম ভিন্ন জাতি-সূচক নাম কিম্বা মর্য্যাদা-সূচক কোন উপাধি দৃষ্ট হয় না। বঙ্গ-বাসীদের মধ্যে যেমন বন্দ্য, চট্ট, মিত্র, দাস প্রভৃতি জাতি-সূচক নাম ব্যবহৃত হয়, এখানে সেরূপ নিয়ম নাই। তবে মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে অনেকেরই কুল-পদবী থাকে—যথা গোড়বোলে (মিষ্ট ভাষী), কড়কড়ে, জোসীমুনসি, তথড়কর ইত্যাদি। ইহা অপরিবর্ত্তনশীল বংশগত নাম।

গুজরাটে 'জী' ও 'ভাই' শব্দান্ত নামই অধিক প্রচলিত, কায়স্থ ও বণিকদের মধ্যে দেবতার নামের শেষে দাস শব্দ সংযুক্ত করিবার রীতি আছে, যেমন জগজ্জীবন দাস, লক্ষ্মণ দাস, নরোত্তম দাস ইত্যাদি। এক প্রদেশে রণছোড় নামক এক শ্রীকৃষ্ণভাব দেবতা আছে, অনেকে সেই নাম ধারণ করেন। একজন নব্য সম্প্রদায়ের গুজরাটী কায়স্থ, ঐ নামের উপর চটিয়া আপনার পুত্রের নাম 'রণজিৎ' রাখিয়াছেন, ইহা উন্নতির লক্ষণ বলিতে হইবে। মহারাষ্ট্র দেশে বিঠোবা-নামক দেবতা-বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে, এই হেতু মহারাষ্ট্রীদের মধ্যে "বিঠোবা" "বিঠ্ঠল রাও" অনেকের এই নাম শ্রুত হওয়া যায়।

স্ত্রীলোকের নাম দেবী ও অধিকাংশ নদী হইতে গৃহীত হয়; যথা, পার্ব্বতী, লক্ষ্মী, উমা, দুর্গা, রেবা, যমুনা। সীতা চিরদুঃখিনী বলিয়া কন্যার ঐ নাম রাখিতে বঙ্গবাসীরা যেরূপ কুণ্ঠিত, এখানে সেরূপ ভাব দেখা যায় না। সীতা, জানকী প্রভৃতি নাম এখানে অত্যন্ত প্রচলিত। এতদ্ভিন্ন পুষ্প কিম্বা স্বর্ণ মাণিক্য হইতে কন্যার নাম প্রদত্ত হয়। মোতী, সোনু, জহর, রত্ন, চম্পক, চমেলী এ সকল নামও প্রচলিত। বিবাহিতা স্ত্রী পতি-গৃহে নামান্তর গ্রহণ করেন। বিবাহের দিন কন্যা পতি-গৃহে উপস্থিত হইলে গৃহ-দেবতার সম্মুখে দম্পতী উপবিষ্ট হয়েন। বরের মাতা তাঁহার বধূর যে নাম রাখা স্থির করেন, তাহা এক পাত্রে চাল রাখিয়া তাহার উপরে অঙ্কিত করেন। পরে বর কন্যার কাণে কাণে সেই নাম বলিয়া দেন। জ্যেষ্ঠা পুত্র-বধূর নাম সচরাচর লক্ষ্মী রাখা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, স্বামীর নাম অনুসারে স্ত্রীর নাম রচিত হয়। স্বামীর নাম মহাদেব হইলে স্ত্রীর নাম পার্ব্বতী, শঙ্কর হইলে উমা, কৃষ্ণ হইলে রাধা, বিঠোবা হইলে রুক্মা, রাম হইলে সীতা। কন্যার নাম যদি আবড়ী (আদুরী) থাকে, তবে আত্মা-রামের সঙ্গে বিবাহ হইলে তাহার নাম রাধা হইতে পারে, কেমনা কৃষ্ণের আর এক নাম আত্মারাম। গুজরাটে অনেক সময় অবিবাহিতা কন্যার প্রতি 'কুমারী' ও বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি 'বধূ' শব্দের প্রয়োগ হয়।

যথা,　পার্ব্বতী কুমারী—পার্ব্বতী বধূ
　　　রুক্মিণী কুমারী—রুক্মিণী বধূ

বাই-শব্দ মর্য্যাদা-সূচক—স্ত্রীদের নামের প্রথমে কি শেষে ইহা যুক্ত হয়; যথা,—সোনু বাই, আনা বাই, দুর্গা বাই, বাই রতন, বাই মানক ইত্যাদি।

পারসীরা তাহাদের পারস্যদেশীয় পুরাতন বীরপুরুষদের নাম সচরাচর ধারণ করে, যথা রোস্তম কাইখসরু (Cyrus) জমসদ, জহাঙ্গীর, খুরসদ, দোরাব, সোরাব ইত্যাদি। এই সকল নামে গুজরাটের প্রথা-অনুসারে জী কিম্বা ভাই যোগ করিয়া দিলে পারসী নাম সম্পূর্ণ হয়। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি হিন্দু নামও তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে, রতন-জী, পদম-জী, ডোসা-ভাই, দাদা-ভাই, আদর-জী, জীবন-জী ইত্যাদি। পারসী স্ত্রীগণ হিন্দু স্ত্রীর নামানুযায়ী নাম ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু কতকগুলি পারস্য নামও প্রচলিত আছে যথা সিরীন—পরোচিস্তা ইত্যাদি।

পারসীদের মধ্যে কতকগুলি হাস্যকর পদবী ও উপাধি দৃষ্ট হয়, তাহা অনেক স্থলে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবলম্বিত ব্যবসা হইতে কল্পিত বোধ হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—বোতল-ওয়ালা—দারুখানা-ওয়ালা—দাস-ওয়ালা। এই সকল নামের মধ্যে দুইটি নাম বোম্বাই মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ—বোতল-ওয়ালা ও রেডিমণি (নগদ পয়সা-ওয়ালা)। সর্ জমসদজী জি জি ভাই প্রসিদ্ধ নাইটের পদবী বোতল-ওয়ালা। প্রবাদ আছে যে প্রথম সর্ জমসদজী বোতল

বিক্রয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন ও ক্রমে বাণিজ্য-কার্য্যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়া তাহার সদ্ব্যয় দ্বারা ব্রিটিষ নাইটের উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। অপর এক জন পারসী নাইটের উপাধি Ready money (নগদ-কড়ি) কিন্তু ইনি ভারত-নক্ষত্রের নাইট, ইঁহার নাম সর্ কাওয়াসজী জহাঙ্গীর, ইনিও উদারতা ও বদান্যতায় নাইট পদবী পাইয়াছেন। এমন কোন হিতকর বিষয় নাই, যাহাতে ইঁহার দান প্রকাশ না পায়, ইঁহার দান দেশ-কাল-পাত্র-সাপেক্ষ নহে। সকল জাতির জন্যই ইঁহার ধনাগার মুক্ত রহিয়াছে। ইংলণ্ড-বাসীদের দারিদ্র্য-মোচনই বল—স্বদেশের কল্যাণ-সাধনই বল, ইঁহার নগদ টাকা সর্ব্বত্রই কার্য্যে আইসে।

বঙ্গদেশ ও বোম্বায়ের মধ্যে তুলনা করিলে দেখা যায়, বঙ্গদেশে নাম-রাজ্য অপেক্ষাকৃত সুবিস্তীর্ণ। বঙ্গ-বাসীর মধ্যে দেব-দেবীর নামেরও অভাব নাই—দ্বারকানাথ, গোপীমোহন, গোকুলকৃষ্ণ, নবগোপাল, শারদা, বরদা, লক্ষ্মী প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। তদ্ভিন্ন প্রকৃতির মনোহর সুন্দর পদার্থ হইতে আমরা অনেক সময়ে নাম গ্রহণ করি—এদেশে প্রায় সেরূপ নাম শুনা যায় না, যেমন চারুচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্র, শশীন্দ্র, নীলকমল, ইত্যাদি। কতকগুলি নাম গুণ-বাচক—যথা সত্য, করুণা, প্রতাপ, মনোমোহন; আর কতকগুলি নাম রাজা অথবা বীর-সংজ্ঞক—যথা রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র, সুরেন্দ্র, মহীন্দ্র, নরেন্দ্র, এ সকল নাম এ প্রদেশে প্রচলিত নাই। স্ত্রীলোকের নাম তুলনা করিয়া দেখিলেও বঙ্গাঙ্গনাদের প্রাধান্য দিতে হয়। বঙ্গাঙ্গনাদের নামের বিচিত্রতা ও শ্রুতিমাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, সৃষ্টির সমুদয় মধুর পদার্থ হইতে সেই সকল নাম সংগৃহীত। সৌদামিনী, উষা, নলিনী কুমুদিনী মালতী প্রভৃতি নানা জাতীয় পুষ্প, ঋতু-প্রধান বসন্ত ও শরতের অধিষ্ঠাত্রী কুমারী, সুশীলতা, দয়া, করুণা প্রভৃতি গুণসমূহ, স্বর্ণ হীরা মুক্তা মণি মাণিক্য, এ সকলই বঙ্গাঙ্গনাদিগের নামের কল্পতরু-স্বরূপ। নামের সঙ্গে গুণের যোগ থাকা যদি স্বাভাবিক হয়, তবে বঙ্গ-স্ত্রীদের মত রূপগুণসম্পন্ন নারীরত্ন কোথায় পাওয়া যাইবে?

শ্রীস—

করুণা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেন্দ্র।

মহেন্দ্র এত দিন বেশ ভাল ছিল। ইস্কুলে ছাত্র-বৃত্তি পাইয়াছে, কলেজে এলে, বিয়ে, পাস করিয়াছে, মেডিকাল কলেজে তিন চার বৎসর পড়িয়াছে, আর কিছু দিন

পড়িলেই পাস হইত, কিন্তু বিবাহ হওয়ার পর হইতেই অমন হইয়া গেল কেন? আমাদের সঙ্গে আর দেখা করিতে আসে না, আমরা গেলে ভাল করিয়া কথা কয় না, এসব ত ভাল লক্ষণ নয়। সহসা এরূপ পরিবর্ত্তন যে কেন হইল, আমরা ভিতরে ভিতরে তাহার সন্ধান লইয়াছি। মূল কথাটা এই, কন্যা-কর্ত্তাদিগের নিকট হইতে অর্থ লইয়া মহেন্দ্রের পিতা যে কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন, তাহা মহেন্দ্রের বড় মনোনীত হয় নাই, মনোনীত না হইবারই কথা বটে; তাহার নাম রজনী ছিল, বর্ণও রজনীর ন্যায় অন্ধকার, তাহার গঠনও যে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল, তাহা নয়; কিন্তু মুখ দেখিলে তাহাকে অতিশয় ভাল মানুষ বলিয়া বোধ হয়। বেচারী কখনো কাহারো কাছে আদর পায় নাই, পিত্রালয়ে অতিশয় উপেক্ষিত হইয়াছিল, বিশেষতঃ তাহার রূপের দোষে বর পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া যাহার-তাহার তাহাকে কাছে নিগ্রহ সহিতে হইত, কখনো কাহারো সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিতে সাহস করে নাই; এক দিন আয়না খুলিয়া কপালে টিপ পরিতেছিল, বলিয়া কত লোকে কত রকম ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিল, সেই অবধি উপহাসের ভয়ে বেচারী কখনো আয়নাও খুলে নাই, কখনো বেশভূষাও করে নাই। স্বামী-আলয়ে আসিল। সেখানে স্বামীর নিকট হইতে এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও আদর পাইল না, বিবাহ-রাত্রের পরদিন হইতে মহেন্দ্র তাহার কাছে শুইত না। এদিকে মহেন্দ্র এমন বিদ্বান, এমন মৃদু-স্বভাব, এমন সদ্বন্ধু ছিল, এমন আমোদ-দায়ক সহচর ছিল, এমন সহৃদয় লোক ছিল যে, সেও সকলকে ভাল বাসিত, তাহাকেও সকলে ভাল বাসিত, রজনীর কপাল-দোষে সে মহেন্দ্রও বিগড়াইয়া গেল। মহেন্দ্র পিতাকে কখনো অভক্তি করে নাই, কিন্তু বিবাহের পরদিনেই পিতাকে যাহা বলিবার নয়, তাহাই বলিয়া তিরস্কার করিয়াছে। পিতা ভাবিলেন, তাঁহারই বুঝিবার ভুল, কলেজে পড়িলেই ছেলেরা যে অবাধ্য হইয়া যাইবে, ইহা ত কথাই আছে।

রজনীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে গিয়া বুঝাইলাম, আমি বলিলাম, রজনীর ইহাতে কি দোষ আছে, তাহার কুরূপের জন্য সে কিছু দোষী নহে, দ্বিতীয়তঃ তাহার বিবাহের জন্য তোমার পিতাই দোষী, তবে বিনা অপরাধে বেচারীকে কেন কষ্ট দাও? মহেন্দ্র কিছুই বুঝিল না বা আমাকেও বুঝাইল না, কেবল বলিল তাহার অবস্থায় যদি পড়িতাম, তবে আমিও ঐরূপ ব্যবহার করিতাম; এ কথা যে মহেন্দ্র অতি ভুল বুঝিয়াছিল, তাহা বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ আমার সহিত গল্পের অতি অল্পই সম্বন্ধ আছে।

এ সময়ে মহেন্দ্রের কলেজ ছাড়িয়া দেওয়াটা ভাল হয় নাই, পড়ো জমিতে কাঁটা গাছ জন্মায়, অব্যবহৃত লোহে মরিচা পড়ে, মহেন্দ্র এমন অবস্থায় কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া বসিয়া থাকিলে অনেক কুফল ঘটিবার সম্ভাবনা। আমি আপনি মহেন্দ্রের কাছে গেলাম,

সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম, মহেন্দ্র বিরক্ত হইল, আমি আস্তে আস্তে চলিয়া আসিলাম।

একটা কিছু আমোদ নহিলে কি মানুষে বাঁচিতে পারে? মহেন্দ্র যেরূপ কৃত-বিদ্য, লেখা পড়ায় সেত অনেক আমোদ পাইতে পারে, কিন্তু পরীক্ষা দিয়া দিয়া বই গুলার উপর মহেন্দ্রের এমন একটা অরুচি জন্মিয়াছে যে, কলেজ হইতে টাট্‌কা বাহির হইয়াই আর একটা কিছু নূতন আমোদ পাইলেই তাহার পক্ষে ভাল হইত। মহেন্দ্র এখন একটু আধটু করিয়া সেরী খায়, কিন্তু তাহাতে কি হানি হইল? কিন্তু হইল বৈকি, মহেন্দ্রও তাহা বুঝিত, এক একবার বড় ভয় হইত, এক একবার অনুতাপ করিত, এক একবার প্রতিজ্ঞা করিত, আবার এক এক দিন খাইয়াও ফেলিত এবং খাইবার পক্ষে নানা-বিধ যুক্তিও ঠিক করিত। ক্রমে ক্রমে মহেন্দ্র অধোগতির গহ্বরে এক এক সোপান করিয়া নাবিতে লাগিলেন। মদ্যটা মহেন্দ্রের এখন খুব অভ্যস্ত হইয়াছে। আমি কখনো জানি-তাম না, এমন সকল সামান্ত বিষয় হইতে এমন গুরুতর ব্যাপার ঘটিতে পারে। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, সেই ভাল মানুষ মহেন্দ্র স্কুলে যে ধীরে ধীরে কথা কহিত, মৃদু মৃদু হাসিত, অতি সন্তর্পণে চলাফিরা করিত, সে আজ মাতাল হইয়া অমন যা-তা বকিতে থাকিবে, সে অমন বৃদ্ধ পিতার মুখের উপর উত্তর প্রত্যুত্তর করিবে। সর্ব্বা-পেক্ষা অসম্ভব মনে করিতাম যে, ছেলেবেলা আমার সঙ্গে মহেন্দ্রের এত ভাব ছিল, সে আজ আমাকে দেখিলেই বিরক্ত হইবে, আমাকে দেখিলেই ভয় করিবে যে, বুঝি ঐ আবার লেক্‌চার দিতে আসিয়াছে। কিন্তু আমি আর তাহাকে কিছু বুঝাইতে যাইতাম না, কাজকি, কথা মানিবে না যখন, কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র, তখন তাহাকে বুঝাইয়া আর কি করিব? কিন্তু তাহাও বলি, মহেন্দ্র হাজার মাতাল হউক, তাহার অন্য কোন দোষ ছিল না, আপনার ঘরে বসিয়াই মাতাল হইত, কখনো ঘরের বাহির হইত না। কিন্তু অল্প দিন হইল, মহেন্দ্রের চাকর শম্ভু আসিয়া আমাকে কহিল যে, বাবু বি-কাল হইলে বাহির হইয়া যান আর অনেক রাত্রি হইলে বাড়ি ফিরিয়া আসেন, এই কথা শুনিয়া আমার বড় কষ্ট হইল; খোঁজ লই-লাম, দেখিলাম দূষ্য কিছু নয়, মহেন্দ্র তাহা-দের বাগানের ঘাটে বসিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কারণ কি? এখনওত বিশেষ কিছু সন্ধান পাই নাই।

সংস্কারক মহাশয় যে বিধবা মোহিনীর কথা বলিতেছিলেন, সে মহেন্দ্রের বাড়ির পাশেই থাকিত, মহেন্দ্রের বাড়িও আসিত, মহেন্দ্রও রোগ বিপদে সাহায্য করিতে তাহাদের বাড়ি যাইত। মোহিনীকে দেখিতে বেশ ভাল ছিল, কেমন উজ্জ্বল চক্ষু, কেমন প্রফুল্ল ওষ্ঠাধর, সমস্ত মুখের মধ্যে কেমন একটি মিষ্ট ভাব ছিল, তাহা বলিবার নয়।

যাহা হউক, মোহিনীকে স্বাধীনতার আলোকে আনিবার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র চলিতেছে। মোহিনীকে একাদশী করিতে হয়, মোহিনী মাছ খাইতে পায় না, মোহিনীর প্রতি সমাজের এই সকল অন্যায় অত্যাচার

দেখিয়া গদাধর বাবু অত্যন্ত কাতর আছেন। স্বরূপ বাবু মোহিনীর উদ্দেশে নানা সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রিকায় নানাবিধ প্রেমের কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন, তাহার মধ্যে আমাদের বাঙ্গালা সমাজকে ও দেশাচারকে অনেক গালি দিলেন ও অবশেষে সমস্ত মানব জাতির উপর বিষম ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তিনি নিজে বড় বিষণ্ণ হইয়া গেলেন ও সমস্ত দিন রাত্রি অনেক নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন।

নরেন্দ্রের কাশীপুরস্থ বাগানের পাশেই মোহিনীর বাড়ি। যে ঘাটে মোহিনী জল আনিতে যাইত, নরেন্দ্র সেখানে দিন কতক আনাগোনা করিতে লাগিলেন। এই সকল দেখিয়া মোহিনী বড় ভাল বুঝিল না, সে আর সে ঘাটে জল আনিতে যাইত না। সে তখন হইতে মহেন্দ্রের বাগানের ঘাটে জল তুলিতে ও স্নান করিতে যাইত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মোহিনীর ও মহেন্দ্রের মনের কথা।

"এমন করিলে প্যারিয়া উঠা যায় না। মহেন্দ্রের বাড়ি ছাড়িয়া দিলাম, ভাবিলাম দূর হোক্‌গে, ওদিকে আর মন দিব না। মহেন্দ্র আমাদের বাড়িতে আসিলে আমি রান্নাঘরে গিয়া লুকাইতাম, কিন্তু আজ কাল মহেন্দ্র আবার ঘাটে গিয়া বসিয়া থাকে, কি দায়েই পড়িলাম, তাহার জন্য জল আনা বন্ধ হইবে নাকি? আচ্ছা না হয় ঘাটেই বসিয়া থাকিল, কিন্তু অমন করিয়া তাকাইয়া থাকে কেন? লোকে কি বলিবে? আমার বড় লজ্জা করে। মনে করি ঘাটে আর যাইব না, কিন্তু না যাইয়া কি করি? আর কেনই বা না যাইব? সত্য কথা বলিতেছি, মহেন্দ্রকে দেখিলে আমার নানান্ ভাবনা আইসে, কিন্তু সে সব ভাবনা ভুলিতেও ইচ্ছা করে না। বিকাল বেলা একবার যদি মহেন্দ্রকে দেখিতে পাই তাহাতে হানি কি? হানি হয় হউক গে, আমিত না দেখিয়া বাঁচিব না। কিন্তু মহেন্দ্রকে জানিতে দিব না যে, তাহাকে ভাল বাসি, তাহা হইলে সে আমার প্রতি যাহা খুসী তাহাই করিবে। আর এ সকল ভালবাসাবাসির কথা রাষ্ট্র হওয়াও কিছু নয়" এইত গেল মোহিনীর মনের কথা।

মহেন্দ্র ভাবে "আমিত রোজ ঘাটে বসিয়া থাকি, কিন্তু মোহিনী ত এক দিনও আমার দিকে ফিরিয়া চায় না। আমি যে দিকে থাকি, সে দিক দিয়াও যায় না, আমাকে দেখিলে শশব্যস্তে ঘোমটা টানিয়া দেয়, পথে আমাকে দেখিলে প্রান্ত-ভাগে সরিয়া যায়, মোহিনীর বাড়িতে গেলে কোথায় পলাইয়া যায়, এমন করিলে বড় কষ্ট হয়। আগে জানিতাম মোহিনী আমাকে ভাল বাসে, ভাল না বাসুক যত্ন করে, কিন্তু আজ কাল অমন করে কেন? এ কথা মোহিনীকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করিতে কি দোষ আছে? মোহিনীকে ত আমি কত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, মোহিনীর বাড়ির সকলে আমাকে এত ভাল

বাসে যে, মোহিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিলে কেহত কিছু মনে করে না।"

এক দিন বিকালে মোহিনী জল তুলিতে আসিল। মহেন্দ্র যেমন ঘাটে বসিয়া থাকিত, তেমনি বসিয়া আছে। বাগানে আর কেহ লোক নাই। মোহিনী জল তুলিয়া চলিয়া যায়। মহেন্দ্র কম্পিত স্বরে ধীরে ধীরে ডাকিল "মোহিনী," মোহিনী যেন শুনিতে পাইল না, চলিয়া গেল। মহেন্দ্র ফিরিয়া আর ডাকিতে সাহস করিল না। আর একদিন মোহিনী বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে, মহেন্দ্র সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন; মোহিনী তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া দিল, মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘর্ম্মাক্ত-ললাট হইয়া কত কথা কহিল, কত কথা বাধিয়া গেল, কোন কথাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে পারিল না। মোহিনী শশব্যস্তে কহিল "সরিয়া যান, আমি জল লইয়া যাইতেছি।"

সেই দিন মহেন্দ্র বাড়ি গিয়াই একটা কি সামান্ত কথা লইয়া পিতার সহিত ঝগড়া করিল, নির্দ্দোষী রজনীকে অকারণ অনেক ক্ষণ ধরিয়া তিরস্কার করিল, শম্ভু চাকরটাকে দুই তিন বার মারিতে উদ্যত হইল, ও মদের মাত্রা আরো খানিকটা বাড়াইল। কিছু দিনের মধ্যে গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের আলাপ হইল, তাহার দিন চারেক পরে স্বরূপ বাবুর সহিত সখ্যতা জন্মিল, তাহার সপ্তাহ খানেক পরে নরেন্দ্রের সহিত পরিচয় হইল, ও মাসেকের মধ্যে মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সভায় সন্ধ্যাগমে নিত্য অতিথিরূপে হাজির হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ।

পূর্ব্বে রঘুনাথ সার্ব্বভৌম মহাশয়ের একটি টোল ছিল। অর্থাভাবে অল্প দিনেই টোলটি উঠিয়া যায়। গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার অনূপকুমার যে পাঠশালা স্থাপন করেন, অল্প বেতনে তিনি তাহার গুরুমহাশয়-পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু গুরুমহাশয়ের পদে আসীন হইয়া তাঁহার শান্তপ্রকৃতির কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হয় নাই।

পণ্ডিত মহাশয় বলিতেন, তাঁহার বয়স সবে চল্লিশ বৎসর; এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া শপথ করিয়া বলা যায় তাঁহার বয়স আটচল্লিশ বৎসরের ন্যূন নয়। সাধারণ পণ্ডিতদের সহিত তাঁহার আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না; তিনি খুব টস্‌টোসে রসিক পুরুষ ছিলেন না বা খট্‌খটে ঘটপট-বাগীশ ছিলেন না, দলাদলির চক্রান্ত করিতেন না, শাস্ত্রের বিচার লইয়া বিবাদে লিপ্ত থাকিতেন না, বিদায় আদায়ের কোন আশাই রাখিতেন না, কেবল মিল ছিল প্রশস্ত উদরটিতে, নস্যের ডিবাটিতে, ক্ষুদ্র টিকিটিতে ও শ্মশ্রুবিহীন মুখে। পাঠশালার বালকেরা প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা তাঁহার বাড়িতেই পড়িয়া থাকিত। এই বালকদের জন্য তাঁহার অনেক সন্দেশ খরচ হইত; সন্দেশের লোভ পাইয়া বালকেরা ছিনা জোঁকের মত তাঁহার বাড়ির মাটি কামড়াইয়া পড়িয়া থাকিত। পণ্ডিতমহাশয় বড়ই ভাল মানুষ ছিলেন এবং দুষ্ট বাল-

কেরা তাঁহার উপর বড়ই অত্যাচার করিত। পণ্ডিত মহাশয়ের নিদ্রাটি এমন অভ্যস্ত ছিল যে, তিনি শুইলেই ঘুমাইতেন, বসিলেই ঢুলিতেন ও দাঁড়াইলেই হাই তুলিতেন, এই সুবিধা পাইয়া বালকেরা তাঁহার নস্যের ডিবা, চটিজুতা ও চসমার ঠুঙ্গিটি চুরি করিয়া লইত। একেত পণ্ডিত মহাশয় অতিশয় আল্‌গা লোক, তাহাতে পাঠশালার দুষ্ট বালকেরা তাঁহার বাটিতে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা রাখিত না। পাঠশালায় যাইবার সময় কোন মতে তাঁহার চটিজুতা খুঁজিয়া পাইতেন না, অবশেষে শূন্যপদেই যাইতেন। একদিন সকালে উঠিয়া দৈবাৎ দেখিতে পাইলেন তাঁহার শয়ন-গৃহে বোল্‌তায় চাক করিয়াছে, ভয়ে বিব্রত হইয়া সে ঘরই পরিত্যাগ করিলেন; সে ঘরে তিন পরিবার বোল্‌তায় তিনটি চাক বাঁধিল, ইঁদুরে গর্ত্ত করিল, মাকড়্‌সা প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিল এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদ্র পিপীলিকা সার বাঁধিয়া গৃহময় রাজপথ বসাইয়া দিল। বালীর পক্ষে ঋষ্যমুখ পর্ব্বত যেরূপ, পণ্ডিত মহাশয়ের পক্ষে এই ঘরটি সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। পাঠশালায় গমনে অনিচ্ছুক কোন বালক যদি সেই গৃহে লুকাইত তবে আর পণ্ডিত মহাশয় তাহাকে ধরিতে পারিতেন না।

গৃহের এইরূপ আল্‌গা অবস্থা দেখিয়া পণ্ডিত মহাশয় অনেক দিন হইতে একটি গৃহিনীর চিন্তায় আছেন। পূর্ব্বকার গৃহিণীটি বড় প্রচণ্ড স্ত্রীলোক ছিলেন। নিরীহ প্রকৃতি সার্ব্বভৌম মহাশয় দিল্লীশ্বরের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতেন। স্ত্রী নিকটে থাকিলে অন্য স্ত্রীলোক দেখিয়া চক্ষু মুদিয়া থাকিতেন। একবার একটি অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার দিকে চাহিয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার পত্নী সেই বালিকাটির মৃত পিতৃপিতামহ প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া যথেষ্ট গালি বর্ষণ করেন, ও সার্ব্বভৌম মহাশয়ের মুখের নিকট হাত নাড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "তুমি মর, তুমি মর, তুমি মর!" পণ্ডিত মহাশয় মরণকে বড় ভয় করিতেন, মরণের কথা শুনিয়া তাঁহার বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতে লাগিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর দৈনিক গালি না পাইয়া অভ্যাস-দোষে দিনকতক বড় কষ্ট অনুভব করিতেন। যাহা হউক অনেক কারণে পণ্ডিত মহাশয় বিবাহের চেষ্টায় আছেন। পণ্ডিত মহাশয়ের একটা কেমন অভ্যাস ছিল, যে তিনি সহস্র মিষ্টান্নের লোভ পাইলেও কাহারো বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকিতেন না, কাহারো বিবাহের সংবাদ শুনিলে সমস্ত দিন মন খারাপ হইয়া থাকিত। পণ্ডিত মহাশয়ের এক ভট্টাচার্য্য বন্ধু ছিল, তাঁহার মনে ধারণা ছিল যে, তিনি বড়ই রসিক, যে ব্যক্তি তাঁহার কথা শুনিয়া না হাসিত, তাহার উপরে তিনি আন্তরিক চটিয়া যাইতেন। এই রসিক বন্ধু মাঝে মাঝে আসিয়া ভট্টাচার্য্যীয় ভঙ্গী ও স্বরে সার্ব্বভৌম মহাশয়কে কহিতেন "ওহে ভায়া—শাস্ত্রে আছে "যাবন্ন বিন্দতে জায়াং তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্। যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্গৃহম্।" কিন্তু তোমাতে তদ্বৈপরীত্যই লক্ষিত হচ্চে, কারণ কিনা, যখন তোমার ব্রাহ্মণী বিদ্যমান ছিলেন

তখন তুমি ভয়ে আশঙ্কায় অর্দ্ধেক হোয়ে গিয়ে ছিলে, স্ত্রী-বিয়োগের পর আবার দেখ্‌তে দেখ্‌তে শরীর দ্বিগুণ হোয়ে উঠল। অপরন্তু শাস্ত্রে যে লিখ্‌চে বালকের দ্বারা পরিবৃত না হইলে গৃহ শ্মশান-সমান হয়, কিন্তু বালক কর্ত্তৃক পরিবৃত হওয়া প্রযুক্তই তোমার গৃহ শ্মশান-সমান হোয়েছে।" এই বলিয়া সমীপস্থ সকলকে চোক্ টিপিতেন, ও সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিলে পর তিনি সন্তোষের সহিত মুহুর্মুহুঃ নস্য লইতেন। ওপারের একটি মেয়ের সঙ্গে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সম্বন্ধ হইয়াছে। এ কয় দিন পণ্ডিত মহাশয় বড় মনের স্ফূর্ত্তিতে আছেন। পাঠশালার ছুটি হইয়াছে। আজ পাত্র দেখিতে আসিবে, পাড়ার কোন দুষ্ট লোকের পরামর্শ শুনিয়া পণ্ডিত মহাশয় নরেন্দ্রের নিকট হইতে এক জোড়া ফুল মোজা, জরির পোষাক ও পাগ্‌ড়ি চাহিয়া আনিলেন। পাড়ার দুষ্ট লোকেরা এই সকল বেশ পরাইয়া তাঁহাকে সং সাজাইয়া দিল। ক্ষুদ্র পরিসর পাগ্‌ড়িটি পণ্ডিত মহাশয়ের বিশাল মস্তকের টিকির অংশ টুকু অধিকার করিয়া রহিল মাত্র, চার পাঁচটা বোতাম ছিঁড়িয়া কষ্টে স্বষ্টে পণ্ডিত মহাশয়ের উদরের বেড়ে চাপকান কুলাইল। অনেক ক্ষণের পর বেশ ভুষা সমাপ্ত হইলে পর সার্ব্বভৌম মহাশয় দর্পণে একবার মুখ দেখিলেন। জরির পোষাকের চাকচিক্য দেখিয়া তাঁহার মন বড় তুপ্ত হইল। কিন্তু সেই ঢল্‌ঢোলে জুতা পরিয়া, আঁট সাঁট চাপকান গায়ে দিয়া চলিতেও পারেন না, নড়িতেও পারেন না, জড় ভরতের মত একস্থানে বদ্ধিয়াই রহিলেন। মাথা একটু নিচু করিলেই মনে হইতেছে পাগ্‌ড়ি বুঝি খসিয়া পড়িবে। ঘাড় বেদনা হইয়া উঠিল, তথাপি যথাসাধ্য মাথা উঁচু করিয়া রাখিলেন। ঘণ্টা খানেক এইরূপ বেশে থাকিয়া তাঁহার মাথা ধরিয়া উঠিল, মুখ শুকাইয়া গেল, অনর্গল ঘর্ম্ম প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। পল্লীর ভদ্রলোকেরা আসিয়া অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহার বেশ পরিবর্ত্তন করাইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার অব্যবস্থিত গৃহ পরিষ্কৃত ও সজ্জিত করিবার নিমিত্ত নানা খোষামোদ করিয়া নিধিরাম ভট্টকে আহ্বান করিয়াছেন। এই নিধিরামের উপর পণ্ডিত মহাশয়ের অতিরিক্ত ভক্তি ছিল, তিনি বলিতেন, গার্হস্থ্য ব্যাপার সুচারু রূপে সম্পন্ন করিতে নিধি তাঁহার পুরাতন গৃহিণীর সমান, মকদ্দমার নানাবিধ জটিল তর্কে সে স্বয়ং মেজেষ্টার সায়েবকেও ঘোল পান করাইতে পারে এবং সকল বিষয়ের সংবাদ রাখিতে ও চতুরতা পূর্ব্বক সকল কাজ সম্পন্ন করিতে সে কালেজের ছেলেদের সমানই হউক্ বা কিছু কমই হউক্।

চতুরতাভিমানী লোকেরা আপনার অভাব লইয়া গর্ব্ব করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি গার্হস্থ্য ব্যবস্থার চতুরতা জানাইতে চায়, সে আপনার দারিদ্র্য লইয়া গর্ব্ব করে, অর্থাৎ অর্থের অভাব সত্বেও কেমন সুচারু রূপে সংসারের শৃঙ্খলা সম্পাদন করিতেছি। নিধি তাঁহার মূর্খতা লইয়া গর্ব্ব করিতেন। গল্প-বাগীশ লোক মাত্রেই পণ্ডিত মহাশয়ের প্রতি বড়

অনুকূল, কারণ নীরবে সকল প্রকারের গল্প শুনিয়া যাইতে ও বিশ্বাস করিতে পল্লীতে পণ্ডিত মহাশয়ের মত আর কেহই ছিল না। এই গুণে বশীভূত হইয়া নিধি মাসের মধ্যে প্রায় দুই শত বার করিয়া তাঁহার এক বিবাহের গল্প শুনাইতেন। গল্পের ডাল পালা ছাঁটিয়া ছুটিয়া দিলে সার মর্ম্ম এইরূপ দাঁড়ায়—নিধিরাম ভট্ট বর্ণ পরিচয় পর্য্যন্ত শিখিয়াই লেখা পড়ায় দাঁড়ি দিয়াছিলেন, কিন্তু চালাকির জোরে বিদ্যার অভাব পূরণ করিতেন। নিধির বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে; কিন্তু এমন শ্বশুর পৃথিবীতে নাই, যে নিধির মত গোমূর্খকে জানিয়া শুনিয়া কন্যা সম্প্রদান করে। অনেক কৌশলে ও পরিশ্রমে পাত্রী স্থির হইল। আজ জামাতাকে পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। অদ্বিতীয় চতুর নিধি দাদার সহিত পরামর্শ করিয়া একটি পাল্কী আনাইল এবং চাপকান ও শামলা পরিয়া গুটি কতক কাগজের তাড়া হাতে করিয়া কন্যা-কর্ত্তাদিগের সম্মুখেই পাল্কীতে চড়িলেন। দাদা কহিলেন "ও নিধি, আজ যে তোমাকে দেখ্‌তে এয়েচেন।" নিধি কহিলেন "না দাদা, আজ সাহেব সকাল সকাল আস্‌বে, ঢের কাজ ঢের লেখা পড়া আছে, আজ আর হোচ্চে না।" কন্যা-কর্ত্তারা জানিয়া গেল যে, নিধি কাজ কর্ম্ম করে, লেখা পড়াও জানে। তাহার পর দিনেই বিবাহ হইয়া গেল। নিধি ইহার মধ্যে একটি কথা চাপিয়া যায়, আমরা সেটি সন্ধান পাইয়াছি; পাড়ার একটী এণ্ট্রেন্স ক্লাসের ছাত্র তাহাকে বলিয়া দিয়াছিল যে, যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্ কলেজে পড়, তবে বলিও বিষপন্ কলেজে।" দৈবক্রমে বিবাহ-সভায় ঐ প্রশ্ন করায় নিধি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়াছিল বিষাক্ত কালেজে! ভাগ্যে কন্যা-কর্ত্তারা নিধির মূর্খতাকে রসিকতা মনে করে তাই সে যাত্রায় সে মানে মানে রক্ষা পায়।

নিধি আসিয়াই মহা গোলযোগ বাধাইয়া দিলেন। ওরে ও—ওরে তা—এ ঘরে একবার, ও ঘরে একবার, এটা ওল্টাইয়া, ওটা পাল্টাইয়া, দুই একটা বাসন ভাঙ্গিয়া, দুই একটা পুঁথি ছিঁড়িয়া, পাড়া শুদ্ধ তোল পাড় করিয়া তুলিলেন। কোন কাজই করিতেছেন না অথচ মহা গোল, মহা ব্যস্ত; চটি জুতা চট্ চট্ করিয়া এবর ওবর, এবাড়ি ওবাড়ি, এপাড়া ওপাড়া করিতেছেন, কোন খানেই দাঁড়াইতেছেন না, উর্দ্ধশ্বাসে ইহাকে দু একটি উহাকে দুই একটি কথা বলিয়া আবার সট্ সট্ করিয়া গুরু মহাশয়ের বাড়ি প্রবেশ করিতেছেন। ফলটা এই, সন্ধ্যার সময় গিয়া দেখিব, সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাড়ি যে কে সেই, তবে পূর্ব্বে এক দিনে যাহা পরিষ্কৃত হইত, এখন এক সপ্তাহেও তাহা হইবে না। যাহা হউক, গৃহ পরিষ্কার করিতে গিয়া একটি গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছিল, ঝাঁটার আঘাতে, লোক জনের কোলাহলে তিন ঘর বোলতা বদ্রোহী হইয়া উঠিল। নিধিরামের নাক মুখ ফুলিয়া উঠিল, চটি জুতা ফেলিয়া, টিকি উড়াইয়া, কোঁচার কাপড়ে পা জড়াইতে জড়াইতে, চৌকাটে হুঁচুট খাইতে খাইতে, পণ্ডিত

মহাশয়কে গালি দিতে দিতে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। এক সপ্তাহ ধরিয়া বাড়ির ঘরে ঘরে বিশৃঙ্খল বোল্‌তার দল উড়িয়া বেড়াইত; বেচারী পণ্ডিত মহাশয় দশ দিন আর অরক্ষিত গৃহে বোল্‌তার ভয়ে প্রবেশ করেন নাই, প্রতিবাসীর বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, ও যাইবার সময় ঘটি ঘড়া ইত্যাদি যে সকল দ্রব্য বাড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলেন,আসিবার সময় তাহা আর দেখিতে পাইলেন না।

অদ্য বিবাহ হইবে। পণ্ডিত মহাশয় কাল সমস্ত রাত স্বপ্ন দেখিয়াছেন। বহুকালের পুরাণো সেই ঝাঁটা গাছটি স্বপ্নে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এটি তাঁহার শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হইল। হাসিতে হাসিতে প্রত্যূষেই শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াছেন। চেলীর জোড় পরিয়া চন্দন-চর্চ্চিত কলেবরে ভাবে ভোর হইয়া বসিয়া আছেন। থাকিয়া থাকিয়া সহসা পণ্ডিত মহাশয়ের মনে একটি দুর্ভাবনার উদয় হইল; তিনি ভাবিলেন, সকলইত হইল এখন নৌকায় উঠিবেন কি করিয়া। অনেক ক্ষণ ধরিয়া ভাবিতে লাগিলেন; বিশ বাইশ ছিলিম তাম্রকূট ভস্ম হইলে ও দুই এক ডিবা নস্য ফুরাইয়া গেলে পর একটা সদুপায় নির্দ্ধারিত হইল। তিনি ঠিক করিলেন যে, নিধিরামকে সঙ্গে লইবেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, নিধিরাম সঙ্গে থাকিলে নৌকা ডুবিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। নিধির অন্বেষণে চলিলেন; সেদিনকার দুর্ঘটনার পরে নিধি, আর পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়িমুখো হইব না বলিয়া স্থির করিয়াছিল, অনেক খোষামোদে স্বীকৃত হইল। এইবার নৌকায় উঠিতে হইবে। সার্ব্বভৌম মহাশয় তীরে দাঁড়াইয়া নস্য লইতে লাগিলেন। আমাদের নিধিরামও নৌকাকে বড় কম ভয় করিতেন না, যদি কন্যা কর্ত্তাদের বাড়িতে আহারের প্রলোভন না থাকিত তাহা হইলে প্রাণান্তেও নৌকায় উঠিতেন না। অনেক কষ্টে পাঁচ ছয় জন মাঝিতে ধরাধরি করিয়া তাঁহাদিগকে কোন ক্রমে ত নৌকায় তুলিল। নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা যতই নড়ে চড়ে পণ্ডিত মহাশয় ততই ছট্‌ফট করেন। পণ্ডিত মহাশয় যতই ছট্‌ফট করেন, নৌকা ততই টল্‌মল করে; মহা হাঙ্গাম, মাঝীরা বিব্রত, পণ্ডিত মহাশয় চিৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন, ও মাঝিদিগকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন যে, যদিই পাড়ি দিতে হইল তবে যেন ধার ধার দিয়া দেওয়া হয়। নিধিরামের মুখে কথাটি নাই, তিনি এমন অবস্থায় আছেন যে, একটু বাতাস উঠিলে বা একটু মেঘ দেখা দিলেই নৌকার মাস্তলটা লইয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িবেন। পণ্ডিত মহাশয় আকুল ভাবে নিধির মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। দুই এক জায়গায় তরঙ্গ বেগে নৌকা একটু টলমল করিল, নিধি লাফাইয়া উঠিল, পণ্ডিত মহাশয় নিধিকে জড়াইয়া ধরিলেন। তখনো তাঁহার বিশ্বাস ছিল নিধিকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে প্রাণহানির কোন সম্ভাবনা নাই। নিধি সার্ব্বভৌম মহাশয়ের বাহুপাশ ছাড়াইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিত মহা-

শয় ততই প্রাণপণে আঁটিয়া ধরিতে লাগিলেন। শীর্ণকায় নিধি দারুণ নিষ্পেষণে রুদ্ধ-শ্বাস হইয়া যায় আর কি, রোষে, বিরক্তিতে, যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিতে করিতে নৌকা তীরে লাগিল। মাঝিরা এরূপ নৌকা-যাত্রা আর কখনো দেখে নাই, তাহারা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল, কণ্ঠাগত-প্রাণ নিধি নিশ্বাস লইয়া বাঁচিলেন, পণ্ডিত মহাশয় এক ঘটি জল খাইয়া বাঁচিলেন।

বিবাহের সন্ধ্যা উপস্থিত, পণ্ডিত মহাশয় টিকিযুক্ত শিরে টোপর পরিয়া গদির উপর বসিয়া আছেন। অনাহারে, নৌকার পরিশ্রমে ও অভ্যাস-দোষে দারুণ ঢুলিতেছেন, মাথার উপর হইতে মাঝে মাঝে টোপর খসিয়া পড়িতেছে, পার্শ্ববর্ত্তী নিধি মাঝে মাঝে এক একটি গুঁতা মারিতেছে, সে এমন গুঁতা যে তাহাতে মৃত ব্যক্তিরও চৈতন্য হয়, সেই গুঁতা খাইয়া পণ্ডিত মহাশয় আবার ধড়ফড়িয়া উঠিতেছেন ও শিরচ্যুত টোপরটি মাথায় পরিয়া মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে চারি দিক অবলোকন করিতেছেন, সভাময় চোক টেপাটেপী করিয়া হাসি চলিতেছে। লগ্ন উপস্থিত হইল, বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন, পুরোহিতটি তাঁহারি টোল-আউট্ শিষ্য। শিষ্য মহা লজ্জায় পড়িয়া গেল, পণ্ডিত মহাশয় কানে কানে কহিলেন, তাহাতে আর লজ্জা কি, এবং লজ্জা করিবার যে কোন প্রয়োজন নাই একথা তিনি স্কন্দ ও কল্কিপুরাণ হইতে উদাহরণ প্রয়োগ করিয়া প্রমাণ করিলেন। সার্ব্বভৌম মহাশয় বিবাহ-আসনে উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত মন্ত্র বলিবার সময় একটী ভুল করিল। সংস্কৃতে ভুল পণ্ডিত মহাশয়ের সহ্য হইল না, অমনি মুগ্ধবোধ ও পাণিনি হইতে গণ্ডা আষ্টেক সূত্র আওড়াইয়া ও তাহা ব্যাখ্যা করিয়া পুরোহিতের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। পুরোহিত অপ্রস্তুত হইয়া ও ভেবাচেকা খাইয়া আরো কতকগুলি ভুল করিল। পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন যে, তিনি টোলে তাহাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন, পুরোহিত বাবাজি চাল কলার সহিত তাহা নিঃশেষে হজম করিয়াছেন। বিবাহ হইয়া গেল, উঠিবার সময় সার্ব্বভৌম মহাশয় কিরূপ বেগতিকে পায়ে পা জড়াইয়া তাঁহার শ্বশুরের ঘাড়ে পড়িয়া গেলেন, উভয়ে বিবাহ সভায় ভূমিসাৎ হইলেন। বরের কাপড় ছিঁড়িয়া গেল, টোপর ভাঙ্গিয়া গেল, শ্বশুরের শূলবেদনা ছিল, স্থূলকায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার উদর চাপিয়া পড়াতে তিনি বিষম চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ৭।৮ জন ধরাধরি করিয়া উভয়কে তুলিল, সভাশুদ্ধ লোক হাসিতে লাগিল, পণ্ডিত মহাশয় মর্ম্মান্তিক অপ্রস্তুত হইলেন ও দুই একটি কি কথা বলিলেন, তাহার অর্থ বুঝা গেল না। এক বার দৈবাৎ অপ্রস্তুত হইলে পদে পদে অপ্রস্তুত হইতেই হইবে। অন্তঃপুরে গিয়া গোলেমালে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার শাশুড়ির পা মাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার শাশুড়ি "নাঃ—কিছু হয় নাই!" বলিলেন ও অন্তরে গিয়া সিক্ত বস্ত্রখণ্ড তাঁহার পায়ের আঙ্গুলে

বাঁধিয়া আসিলেন। আহার করিবার সময় দৈবক্রমে গলায় জল বাধিয়া গেল, আধ-ঘণ্টা ধরিয়া কাশিতে কাশিতে নেত্র অশ্রু-জলে ভরিয়া গেল। বাসর-ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে একটা আরস্থলা আসিয়া তাঁহার গায়ে উড়িয়া বসিল। অমনি লাফা-ইয়া ঝাঁপাইয়া, হাত পা ছড়াইয়া, মুখ বি-কটাকার করিয়া তাঁহার শালীদের ঘাড়ের উপর গিয়া পড়িলেন। আবার দুইটি চারিটি কান মলা খাইয়া ঠিক স্থানে আসিয়া বসি-লেন। একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, স্ত্রী-আচার করিবার সময় পণ্ডিত মহাশয় এমন উপর্য্যু-পরি হাঁচিতে লাগিলেন, যে চারি দিকের মেয়েরা বিব্রত হইয়া পড়িল। বাসর ঘরের বিপদ হইতে কি করিয়া উদ্ধার হইবেন এবিষয়ে পণ্ডিত মহাশয় অনেক ভাবিয়া ছিলেন, সহসা নিধিকে মনে পড়িয়াছিল, কিন্তু নিধির বাসর-ঘরে যাইবার কোন উপায় ছিল না। যাহা হউক্ ভাল মানুষ বেচারী অতিশয় গোলে পড়িয়া ছিলেন। শুনিয়াছি দুটি একটি কি কথার উত্তর দিতে গিয়া স্মৃতি ও বেদান্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন। এবং যখন তাঁহাকে গান করিতে অনুরোধ করে, অনেক পীড়াপীড়ির পর গাহিয়া ছিলেন "কোথায় তারিণী মাগো বিপদে তারহ সুতে।" এই তিনি মনের সঙ্গে গাহিয়া ছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাগিণীর দিকে বড় একটা নজর করেন নাই, যে সুরে তিনি পুঁতি পড়ি-তেন, সেই সুরেই গানটি গাহিয়া ছিলেন। যাহা হউক অনেক কষ্টে বিবাহ-রাত্রি অতি-বাহিত হইল।

স্বাস্থ্য।

অতঃপর যে সকল শারীরিক নিয়ম প্রতিপালিত হইলে জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা হইতে পারে এই প্রস্তাবে যথাসাধ্য ঐ সকল নিয়ম প্রকাশ করিতে চেষ্টা পাইব। এতদুপলক্ষে উপদেশ বাক্য আমাদের সক-লের তুষ্টিকর না হইলেও হইতে পারে। কিন্তু ঐ গুলি যে তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ উপযোগী হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

আমাদের জীবিত-কাল চারি ভাগে বিভক্ত। ১ম শৈশব, ২য় যৌবন, ৩য় প্রৌঢ়, ৪র্থ বার্দ্ধক্য। জন্ম হইতে ১৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শৈশব বা বাল্য কাল, তাহার পরই যৌবন কাল। ১৬ হইতে ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত ঐ কালের সীমা। ৩৫ বৎসর হইতে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত প্রৌঢ়াবস্থা। তাহার পর বার্দ্ধক্য। স্ত্রীলোকেরা পুরুষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অগ্রে যৌবন-সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার অবস্থানুসারে স্বা-স্থ্যের পৃথক পৃথক নিয়ম আছে। সুতরাং আম-রাও তদনুসারে উহার এক একটি অবস্থার নিয়ম পৃথক করিয়া বলিব। ইহাতে কোন কোন স্থানে পুনরুক্তি-দোষ ঘটিলেও ঘটিতে

পারে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া পাঠকগণ সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

১ম শৈশব, কৌমার বা বাল্যাবস্থা।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত কালকে বাল্য কাল বলে। এই কালে প্রায় সকলেই পিতা মাতার অধীন থাকে। সুতরাং মানুষের সুস্থা-সুস্থতা তাঁহাদের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দুঃখের বিষয় এই যে অনেকেই এই কালে কিরূপে সন্তান প্রতিপালন করিতে হয় তাহা জানেন না। আর যাঁহারা জানেন তাঁহারাও তদ্বিষয়ে মনোযোগী হন না। এই জন্যই আমাদের দেশে কি ধনী কি দরিদ্র সকলের গৃহেই বালক বালিকার মৃত্যু সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ধনী অপেক্ষা নির্ধনের মধ্যে শৈশব মৃত্যু আরও বেশী। ঐ সকল লোকের অন-ভিজ্ঞতা ও অসাবধানতাই ঐ রূপ ঘটনার মূল-কারণ। এক্ষণে যে যে উপায় অব-লম্বন করিলে সাধারণে এই অনর্থ-পরম্পরা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে তাহা নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে পর প্রথমতঃ তাহার নাড়ী কাটিতে হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত সন্তান কাঁদিয়া না উঠে, অথবা উহার শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে আরম্ভ না হয়, ততক্ষণ নাড়ী কাটা উচিত নহে। ইহার পূর্ব্বে নাড়ীচ্ছেদ করিলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। নাড়ীছেদনের নিয়ম এই যে, সন্তানের নাভিমূলের ৩।৪ ইঞ্চ উপরে ফিতে দিয়া একটি শক্ত গাঁঠ দিবে। এই গ্রন্থির ১॥।২ ইঞ্চ উপরে ঐরূপ আর একটি গাঁঠ দিতে হইবে। তাহার পর একখানি কাঁচি লইয়া এই দুই গ্রন্থির মধ্যস্থলে কাটিয়া ফেলিবে। এই গুলি ধাত্রীর কার্য্য। কিন্তু পিতা মাতারও ইহা জানা উচিত। কারণ অনেক স্থলে ধাত্রীর অভাব হইতে পারে। এবং অভাব না হইলেও স্থান-বিশেষে ঐ সকল লোক এতই অজ্ঞ যে, সন্তানের নাড়ী সমূলে ছেদ করিয়া বিষম অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

কখন কখন সন্তান মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়। তখন চিকিৎসক উপস্থিত না থাকিলে সহসা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। এজন্য তদ্বিষযে যাহা যাহা করিতে হয় তাহাও বলিতেছি। প্রথমতঃ সন্তানের মুখের ভিতর একটি অঙ্গুলি দিয়া তন্মধ্যস্থ বদ্ধ শ্লেষ্মা বাহির করিবে। পরে গুহ্য-দ্বারের উপরি-ভাগে কয়েক বার আস্তে আস্তে আঘাত করিতে হইবে। ইহাতেও সন্তানের চেতনা সম্পাদন না হইলে বক্ষঃস্থল, পৃষ্ঠদেশ, ও পাদমূলে কোমল বস্ত্র বা ব্রুশ দিয়া ঘর্ষণ করিতে থাকিবে, অথবা ঐ সকল স্থানে সুশীতল জল নিক্ষেপ পূর্ব্বক ফ্লানেল বা রেশমি কাপড় দিয়া ঘন ঘন ঘর্ষণ করিবে। এতদ্ভিন্ন সন্তানের মুখে ও নাসিকা মধ্যে পালক ও ফুৎকার দেওয়াতেও অনেক সময়ে চৈতন্যের সঞ্চার হইতে পারে। এই সময়ে যাহাতে সন্তানের গাত্রে শীতল বাতাস না লাগে তজ্জন্য গরম ফ্লানেল দিয়া সর্ব্ব শরীর আবৃত রাখা উচিত। যদি

তাহাতেও সন্তানের চেতনা না হয় তাহা হইলে উহাকে গরম জলের টবে বসাইবে ও বুক পিঠ ঘর্ষণ করিতে থাকিবে। দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ চেষ্টা করিয়াও যদি বিফল-যত্ন হও তবেই উহার জীবনাশা ত্যাগ করিবে।

যে সন্তান সুস্থ শরীরে জন্মগ্রহণ করে, তাহার জন্য ঐরূপ কোন ক্রিয়ার আবশ্যকতা নাই। নাড়ী কাটার পর উহার সর্ব্ব শরীর গরম জল (৮০ ডিগ্রি) দিয়া পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়, তাহার পর শুষ্ক বস্ত্র দিয়া মুছাইতে হয়। মুছাইবার সময় বগল ও কুঁচকির জায়গা উত্তম রূপে দেখিতে হয়, কারণ ঐ সকল স্থানে ক্লেদ থাকিলে পরে তথায় ঘা হইবার সম্ভাবনা। অনন্তর দুই পুরু পরিষ্কার বস্ত্র দ্বারা নাভিস্থল আবৃত করিয়া তদুপরি একটী পেটী বাঁধিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এমন করিয়া বাঁধা উচিত যাহাতে সন্তানের হস্তপদ চালনার ব্যাঘাৎ না হয়। পরে উহাকে একটী পরিষ্কার শয্যায় শয়ন করাইবে এবং যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে তজ্জন্য গলদেশ পর্য্যন্ত গরম কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। যাহাতে চক্ষের উপর সূর্য্য বা প্রদীপের আলো না পড়িতে পায় তাহারও উপায় বিধান করিয়া দিবে। অনেক জননী এই আলোক হইতে কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহা অবগত না থাকায় চিরকালের জন্য সন্তানের চক্ষু নষ্ট করিয়া ফেলেন।

ভুমিষ্ঠ হইলে পর কিছু দিন পর্য্যন্ত সন্তানকে গরমে রাখিতে হয়। কারণ বহিস্থ বায়ুর অপেক্ষা মাতৃগর্ভের উষ্ণতা অনেক বেশী। সুতরাং সহসা উত্তাপের এত ইতর বিশেষ ঘটিলে সন্তানের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ হানি হইবার সম্ভাবনা। এজন্য যাহাতে উক্ত উত্তাপের বৈষম্য না হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। এজন্য আমাদের দেশে আপামর সাধারণ সকলেই সূতিকা-গৃহে আগুন রাখিয়া থাকে। অনেকে আবার ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অগ্নির তাপ দ্বারা সন্তানের শরীর উষ্ণ রাখিতে চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের দেশে এই সকল অনুষ্ঠান নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিলে তাপ দেওয়া দূরে থাকুক, গৃহ মধ্যে অগ্নি রাখাও অবিধেয়। যদি কোন সন্তানের শরীর স্পর্শ করিলে শীতল বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলেই উক্ত প্রকার কৃত্রিম তাপের আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু আমরা যতই উহার উষ্ণতা সম্পাদন করি না কেন, সদ্য-প্রসূত সন্তান মাতৃ-ক্রোড়ে যেমন উষ্ণ থাকে এমন আর কিছুতেই নহে। এই জন্যই দরিদ্র সন্তানের তাপ রক্ষার্থ শীত বস্ত্রাদির তত আবশ্যক হয় না। তিন চার মাসের হইলে সন্তানের শরীরে কৃত্রিম তাপ দেওয়াতে কোন ফলোদয় হয় না। তখন বায়ুর স্বাভাবিক তাপই উহার পক্ষে যথেষ্ট।

এস্থলে আমরা সন্তানের গাত্রাবরণ সম্বন্ধে আর একটি কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। যাঁহারা মনে করিলে সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য যথোচিত

অর্থ-ব্যয় করিতে পারেন তাঁহারা যেন অর্থ-ব্যয়ের ভয়ে সূতিকা-গৃহে প্রসূতির নিকট দুই চারি খানি পুরাতন কাপড় দিয়া নিশ্চিন্ত না হন। এ সময়ে মাতার নিকট অন্ততঃ ২ ডজন গুতি ও এক ডজন ফ্লানেলের চাদর থাকা উচিত। তাহা হইলে সন্তান ও মাতার কোন প্রকার অসুবিধা হইবারি সম্ভাবনা থাকে না।

২। স্তনপান-বিধি।—প্রসবের পূর্ব্ব হইতেই সন্তানের জীবন রক্ষার্থ প্রকৃতি দেবী মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার করেন। কিন্তু প্রসবের পরেই উহা যথোচিত রূপে নিঃসৃত হইতে থাকে। স্তন হইতে প্রথমে যে দুগ্ধ বাহির হয়, তাহার নাম গাঁজলা। উহা আটার মত গাঢ়, এজন্য অনেকে উহা গালিয়া ফেলে। সন্তানকে খাইতে দেয় না। কিন্তু এরূপ আচরণ কত যুক্তিযুক্ত তাহা বলা যায় না। কারণ ইহাও দেখা গিয়াছে যে, ঐ দুগ্ধ সন্তানের উদরস্থ হইবামাত্র বালক গর্ভাবস্থার সঞ্চিত মল (Meconium) পরিত্যাগ করে। সে যাহাই হউক প্রসূতী একটু সুস্থ ও সবল না হইলে এবং যৎকিঞ্চিৎ আহার না করিলে, সন্তানকে স্তনপান করিতে দেওয়া কখনই উচিত নহে। ইত্যবসরে সন্তান ক্ষুধায় অস্থির হইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলে এক বোতল চিনিপানা প্রস্তুত করিয়া কিয়ৎকাল গরম জলে ডুবাইয়া রাখিবে, এবং উহা হইতে মধ্যে মধ্যে চামোচ বা পোলুতে করিয়া সন্তানকে খাইতে দিবে। পরে মাতার প্রসবশ্রান্তি দূর হইলে উহাকে স্তনপান করিতে দিবে। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে অথবা রাত্রিতে প্রসব হইলে সন্তান ও মাতা উভয়েই প্রায় রাত্রিকাল নিদ্রায় অতিবাহিত করে, সুতরাং তন্মধ্যে স্তন, পান করাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। যদি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব প্রকারে চিনি পানার জল দিলেই সন্তান নিস্তব্ধ হইয়া থাকে। ইহাতে আশু এই উপকার দর্শে যে, সন্তানের মুখ-মধ্যাগত অবশিষ্ট গাঢ় লালা বা শ্লেষ্মা তথা হইতে অপসৃত হইয়া যায় এবং মাতারও রাত্রিকালে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটে না।

অনেকে প্রসবের পর অকারণ মাতাকে চা, কফি, বা পোর্ট দিয়া থাকেন,কিন্তু এরূপ প্রথা কি প্রসূতী কি সন্তান কাহারো পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে। তৎকালে গরম জল বা দুগ্ধই বিশেষ উপকারী। যতক্ষণ শরীর গরম থাকিবে ততক্ষণ ঈষদুষ্ণ পানীয় দ্রব্যই ব্যবস্থা, শরীর শীতল হইলে ঠাণ্ডা জল বা দুগ্ধে কোন হানি হয় না।

প্রাচীন ভারতের শিল্প।

কালজ্ঞান-সাধন শিল্প।

আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্প বিষয়ে লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। তন্মধ্যে কালজ্ঞান-সাধন শিল্পই আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়। পৃথিবী সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া

দিবা রাত্রি উৎপাদন করিতেছেন। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন পুনঃপুনঃ ফিরিয়া আইসে, মনুষ্য জন্মিয়াই ইহা দেখিতে পায়। তাহা লইয়া পক্ষ, মাস, বৎসর, শত বৎসর, যুগ প্রভৃতির কল্পনা করে। এ সকল স্থূল কাল। এইরূপ সূক্ষ্মকালও আদিম মানবের কল্পনার বিষয় হইয়াছিল স্পষ্ট প্রমাণ হয়। যাম, অর্দ্ধযাম, মুহূর্ত্ত, দণ্ড, দণ্ডার্দ্ধ,—পল, অনুপল, বিপল, ত্রুটি প্রভৃতি প্রাচীন প্রাচীন শব্দ সকল উহার সাক্ষ্য-স্থল।

দণ্ড, দণ্ডার্দ্ধ প্রভৃতি সূক্ষ্মকাল সকল কি বর্ত্তমান কালিক কি প্রাচীন কালিক ব্যক্তি মাত্রেরই প্রয়োজনীয়। মনে করিবেন না যে, প্রথম কালের মানবদিগের অত সূক্ষ্ম কালের প্রয়োজন ছিল না। সূক্ষ্মকালের প্রয়োজন ছিল বলিয়াই তদ্বোধক শব্দ-রাশি উৎপন্ন হয়। যখন দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীন কালেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কালের ব্যবহারের আবশ্যকতা ছিল এবং তদ্বোধক শব্দ ছিল, তখন অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই সেই কাল নির্ণয় করিবার কোন না কোন উপায় ছিল। বৈদিক কালের যন্ত্রবিদ্যা পর্য্যালোচনা করিলেই সেই সেই সূক্ষ্ম কালের ব্যবহার-সত্তা নির্ণয় হয়। অতএব সূক্ষ্মকালের ব্যবহার এবং তাহার নির্ণয়োপায় সকল আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের অজ্ঞাত ছিল না।

অনুসন্ধান দ্বারা জানা যায় যে, অতি প্রাচীন কালে সূক্ষ্ম বা খণ্ড কাল-গুলি স্বাভাবিক ঘটনা দ্বারা নির্ণীত হইত। শব্দোচ্চারণ, শ্বাস-প্রশ্বাস, মনুষ্য-দেহের রক্ত সঞ্চালন (নাড়ীর গতি), সূর্য্যের ছায়া, চক্ষের নিমেষ নক্ষত্রের উদয়াস্ত ইত্যাদি।

এই রূপে প্রত্যেক দিবা রাত্রের নিয়মিত নৈসর্গিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া তাহার ভাগ প্রভাগ দ্বারা কাল নির্ণয় হইত। ক্রমে ঐ সকল নৈসর্গিক প্রক্রিয়া আদর্শ করিয়া কৃত্রিম প্রক্রিয়ার আবির্ভাব হইল। ছায়া-যন্ত্র (সন্ ডায়াল) ধনুর্যন্ত্র, চক্রযন্ত্র, তোয়যন্ত্র (জল-ঘড়ি বা তামী ঘড়ি), ময়ূর, নর ও বানরাকৃতি যন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ কালজ্ঞান-সাধন যন্ত্রের আবির্ভাব হইল। অবশেষে তৎপরে পারদ ও জল-ঘটিত গ্রীষ্ম বর্ষাদি পরিমাপক যন্ত্রও (থর্ম্মোমেটর ও ব্যারোমেটর) সৃষ্ট হইয়াছিল। এ সকলের বিশ্বাস্য প্রমাণ ও নির্ম্মাণ-কৌশল প্রভৃতি পরে প্রদর্শিত হইবে। শব্দোচ্চারণ শ্বাস প্রশ্বাস, নাড়ীর গতি, নেত্রোন্মেষ প্রভৃতি নিয়মিত নৈসর্গিক ঘটনা দৃষ্টে যে কাল নির্ণয় হইত—অগ্রে তাহারই বর্ণন করা যাউক।

শব্দোচ্চারণ—শব্দোচ্চারণ দ্বারা কিরূপে খণ্ড কালের নির্ণয় হইত, তাহা দেখান যাইতেছে।

কণ্ঠ দ্বারা বর্ণ ব্যক্ত করিতে যে স্বরের আবশ্যক হয়, সেই স্বরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার প্রত্যেক সম সূক্ষ্মাংশ গুলিকে মাত্রা বলে; ছন্দঃগাঁথার মতন তাহার ১২ বা ততোধিক একত্রিত করিয়া যে বিশেষ বিশেষ মাত্রা জন্মে, তাহারই বিশেষ বিশেষ নাম হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত। এই হ্রস্ব দীর্ঘ প্লুত কাল-ঘটিত নিয়ম হইতে সম্ভূত।

ইহা উচ্চ, নীচ, বিভিন্ন স্বরে আবদ্ধ হইলে উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত নামে ব্যবহৃত হয়। প্রাচীন কালের ঋষিরা যখন বর্ণোচ্চারণ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম বিধি-বদ্ধ করিলেন, তখন তাঁহারা দেখিলেন যে, সমস্ত দিবা রাত্রের মধ্যে ২১৬০০০-এর অধিক গুরুবর্ণ উচ্চারিত হয় না। একটি গুরুবর্ণে দুইটি মাত্রা থাকে, সুতরাং সমস্ত দিবারাত্রে, ৪৩২০০০ মাত্রাত্মক সূক্ষ্ম খণ্ড-কাল আছে। পরে তাঁহারা ইহাও অব-ধারিত করিলেন যে, এক দিবারাত্রের ৪৩২০০০ অংশের এক অংশ একমাত্রা। যখন এইরূপ কাল-জ্ঞান ও এবম্প্রকার বর্ণোচ্চারণ নির্ণীত হইল তখনই তাহাকে ভাগ করিয়া তদনুগত দণ্ড, দণ্ডার্দ্ধ প্রভৃতি কাল-নিশ্চায়ক বর্ণোচ্চারণ বিধিবদ্ধ করি-লেন—

"দশগুর্ব্বক্ষরোচ্চায়ঃ
কালঃ প্রাণঃ ষড়াত্মকঃ।
তৈঃ পলং স্যাৎ ততঃ
ষষ্ঠ্যা দণ্ড ইত্যভিধীয়তে॥"

ইহার অর্থ এই যে, দশটি গুরু অক্ষর ঠিক্ করিয়া উচ্চারণ করিতে যে সময় টুকু লাগে, তাহার নাম প্রাণ। ছয় প্রাণে ১ পল। তাহার ৬০ পলে ১ দণ্ড এবং এতাদৃশ ৬০ দণ্ডে এক অহোরাত্র।

এই রূপে অতি প্রাচীন কালের লো-কেরা অক্ষর উচ্চারণ করিয়া দণ্ড পল, দ-ণ্ডার্দ্ধ প্রভৃতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খণ্ড কাল সকল ব্যবহার করিতেন, যাহাতে অক্ষর ঠিক্ হয় অর্থাৎ সমরাত্রিন্দিবার এক অহোরাত্রের ২১৬০০০ গুরুবর্ণ বা ৪৩২০০০ লঘু বর্ণের উচ্চারণ সমাপ্ত হয়, এরূপ করিয়া শিক্ষা ও অভ্যাস করিতেন। শিক্ষা ও অভ্যাস-বলে তাঁহারা অক্ষর উচ্চারণ করিয়া অনায়াসে সূক্ষ্ম কাল গুলি অবধারণ করিতেন। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর শিক্ষিত লোক অনেক ছিল। পরবর্ত্তী ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা এই কাল নির্ণায়ক বর্ণ-ঘটিত একটি শ্লোক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি প্রচারিত আছে। তাহার নাম "পল পড়া শ্লোক"। যথা—

মা কান্তে পক্ষ স্যান্তে
পর্য্যাকাশে দেশে স্বাপ্সীঃ।
কান্তং বক্ত্রং পূর্ণং চন্দ্রং
মত্বা রাত্রৌ চেৎ ক্ষুৎ কামঃ॥
প্রাটং প্রাটং শেতৈ শেতৌ
রাহুঃ ক্রূরঃ প্রাদ্যাৎ।
তস্মাদ্ধান্তে হর্ম্যস্যান্তে
শয্যো কান্তে কর্ত্তব্যা॥

এই শ্লোকটি একবারে ৬০টি গুরু অক্ষরে রচিত। ঠিক নিয়মে একবার এই শ্লোকটি পড়া হইলেই জানা যাইত যে, এক পল সময় হইল। ইতি পূর্ব্বে দুর্গোৎসবের সন্ধি-পূজার সময় কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে পল-পড়া বামনেরা এই শ্লোক পাঠ করিয়া সন্ধি-পূজার সময় অবধারণ করিয়া দিত।

অনেকে বলিতে পারেন যে, উপরোক্ত শ্লোকটি একবার পড়িলেই যে এক পল হইবে এবং ৬০ বার পড়িলেই যে এক দণ্ড হইবে, উহা ঠিক্ হইতেও না পারে। তবে একটা স্থূল বুঝা মাত্র। আমরা তাহাতে

উত্তর করি যে, না—শুদ্ধ স্থূল বুঝা নহে, উহা সূক্ষ্ম বুঝাও বটে, কারণ; উহার উচ্চারণের যেরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয়, তাহাতে ন্যূনাতিরেক হইবার সম্ভাবনা নাই। ইচ্ছা করিয়া দ্রুত, কি ইচ্ছা করিয়া বিলম্বিত পাঠ করিবার যো নাই। পাঠ মাত্রেরই নিয়ম আছে। অদ্রুত, অবিলম্বিত, অবিস্পষ্ট, অতিবিস্পষ্ট, অল্প প্রাণ, ইত্যাদি অনেক প্রকার নিয়ম হিন্দুদিগের বর্ণোচ্চারণে অনুগত আছে। সে সকল নিয়ম রক্ষা করিয়া পাঠ করিলে, বিশেষত তাদৃশরূপে শিক্ষিত ও অভ্যস্ত ব্যক্তি অতি সাবধানে পাঠ করিলে কখনই ন্যূনাধিক্য ঘটে না। আমরা অশিক্ষিত, তথাপি আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, প্রায় ঠিক্ হয়।

২৪ মিনিটে বাঙ্গালা ১ দণ্ড এবং ২৪ সেকেণ্ডে বাঙ্গালা ১ পল। উপরোক্ত ৬০ গুরুবর্ণ-গ্রথিত শ্লোকটীর উচ্চারণ কাল ১ পল অথবা ২৪ সেকেণ্ড। আমাদের অভ্যাস নাই এবং আমরা বৈদিকদিগের ন্যায় বর্ণোচ্চারণ বিষয়ে শিক্ষিত নহি, তথাপি আমরা ঘড়ি ধরিয়া পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, ঐ শ্লোক আবৃত্তি করিতে দুই সেকেণ্ডের অধিক তফাৎ হয় নাই।

ভারতবর্ষবাসী পুরাতন মনুষ্যেরা যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে এইরূপে বর্ণোচ্চারণ-দ্বারা সূক্ষ্ম কাল নির্ণয় করিতেন। ইহাতে অসুবিধা অনেক হইত। একজনে কার্য্য করিবেন, অন্য জনকে তথায় উপস্থিত থাকিয়া অনন্যমনে বর্ণোচ্চারণ করিতে হইত।

বর্ণোচ্চারণের দ্বারা কাল-নির্ণয়ের প্রথা ব্যক্ত করা গেল। আগামী পত্রিকায় শ্বাস প্রশ্বাস, নেত্র-নিমেষ এবং নাড়ীর গতি অনুসারে যে কাল নির্ণয় হইত তাহা ব্যক্ত করিবার মানস রহিল।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

সম্পাদকের বৈঠক।

বাতুলদিগের উপর সূর্য্যের প্রভাব।

গ্যাজেট্ ডেজোপিটো নামক ফরাসিস পত্রিকায় এই বিষয়ে একটী প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে। পিয়েমো প্রদেশের অ্যালেস্যাণ্ড্রিয়া নামক নগরের বাতুলাশ্রমের অধ্যক্ষ দাক্তার পঞ্জার মনে প্রথম উদয় হয় যে, হয় তো সূর্য্যকিরণে মস্তিষ্ক-পীড়ার আরোগ্য হইতে পারে। এই কথা তিনি রোম নগরের ফাদর্ সেকিকে বলেন। ফাদর সেকি তাহার এইরূপ উত্তর দেন;—"চুম্বক শক্তি-গত আন্দোলনে এবং রঞ্জিত সূর্য্যকিরণে, বিশেষত সূর্য্যের বেগুনি রঙ্গে যেরূপে বাতুলদিগের অবস্থান্তর উপস্থিত হয় তাহার আলোচনা একটি গুরুতর বিষয়। এবং আমার বিবেচনায় ইহা আমাদিগের অনুশীলনেরও একটি অতি উপযুক্ত বিষয়।" ঐ প্রকার আলোক ঐ রংএর কাচের মধ্য-

দিয়া অনায়াসে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ফাদর সেকি বলেন বেগুনি রংএ কি এক রকম বিষন্ন ভাব আছে—কি এক রকম ভাব যাহাতে মনটা একেবারে দমিয়া যায়। এই জন্যই বোধহয় কবিরা বিষন্নতার বেগুনি পরিচ্ছদ কল্পনা করিয়াছেন। বোধ হয় বেগুনি আলোকে দুর্ভাগ্য বাতুলদিগের স্নায়বীয় উত্তেজনার উপশম হইতে পারে। তিনি ডাক্তার পঞ্জাকে পত্রে এইরূপ পরামর্শ দেন যে তিনি যে ঘরে এই বিষয় লইয়া পরীক্ষা করিবেন যেন সেই ঘরের দেওয়াল ও জান্‌লার শাশিগুলি বেগুনি রংগে রঞ্জিত হয়। এবং ঐ ঘরে অনেক গুলি জানলা থাকা আবশ্যক—কেন না, তাহা হইলে দিনের মধ্যে সকল সময়েই তন্মধ্যে আলোক প্রবেশ করিতে পারে। যে ঘরে পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়া প্রচুর রূপে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে এবং যাহার জানলার শাশি ও দেওয়াল বেগুনি রংএ রঞ্জিত, রোগীকে এরূপ ঘরে রাত্রি যাপন করিতে হইবে। ডাক্তার পন্‌জা পণ্ডিতবর সেকির পরামর্শ-ক্রমে উপরি-বর্ণিত নিয়মানুসারে কতকগুলি ঘর প্রস্তুত করিয়া তথায় কতকগুলি রোগীকে পরীক্ষাধীন রাখিয়াছিলেন। উঁহাদের মধ্যে একজন আলাপ-বিমুখ রোগী তিন ঘণ্টা কাল একটা লাল ঘরে থাকিয়া প্রফুল্ল ও প্রিয়-বাদী হইয়া উঠে, আর এক জন আহার-বিমুখ রোগী ২৪ ঘণ্টা কাল ঐ লাল ঘরে থাকিয়া আহারের ইচ্ছা প্রকাশ করে। অত্যন্ত উত্তেজিত আর একজন বাতুলকে একটা নীল ঘরে সমস্ত দিন রাখা হইয়াছিল, এক ঘণ্টা পরে তাহার উত্তেজিত ভাব অনেক প্রশমিত হইল। চক্ষুস্নায়ুর উপর নীল বর্ণের এরূপ প্রবল প্রভাব যে উহাতে এক প্রকার কষ্ট অনুভব হয়। আর একজন রোগীকে নিশাকালে একটি বেগুনি বর্ণ ঘরে রাখা হইয়াছিল—তাহার পর দিবসে সেই ব্যক্তি আপনাকে রোগ-মুক্ত অনুভব করিয়া তাহাকে বাড়ি পাঠাইবার নিমিত্ত ডাক্তার পন্‌জাকে অনুরোধ করে। সেই অবধি সে আরোগ্য লাভ করিয়াছে।

এই সকল পরীক্ষার পর ডাক্তার পন্‌জা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন;—বেগুনি কিরণের বৈদ্যুৎ-রাসায়নিক শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রখর; লাল আলোকও তাপজনক কিরণে পরিপূর্ণ—কিন্তু নীল বর্ণ আলোকে তাপ-জনক কিরণও নাই, বৈদ্যুতিক বা রাসায়নিক কিরণও নাই। ইহার উপকারিতা কি রূপে জন্মিল বুঝান কঠিন; ইহাতে কোন প্রকার উত্তেজক শক্তি আদৌ না থাকায় ইহা উন্মাদ-গ্রস্তদিগের ভয়ানক উন্মত্ততা প্রশমনে আশ্চর্য্যরূপে কৃতকার্য্য হয়।——World of science.

কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যের অন্তঃপ্রয়োগ।

চর্ম্ম ঈষৎ কাটিয়া তাহার মধ্যে খাদ্য প্রবেশ করিয়া দিবার প্রণালী সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সকলেই জানেন চর্ম্ম কাটিয়া তন্মধ্যে মর্ফিয়া প্রবেশ করাইয়া রোগীর নিদ্রাকর্ষণ-প্রথা অনেক বৎসর হইতে প্রচলিত। ক্রয়েগ্ নামক ভিয়েনা নগরের এক-

জন ডাক্তার এই প্রণালী অনুসারে দুগ্ধ চিনি ও ডিমের শাঁশ একত্র মিশ্রিত করিয়া চর্ম্ম মধ্যে প্রয়োগ করেন। যে সকল বাতুল-দিগকে সহজে আহার করান যায় না, তাহাদিগকে এইরূপে খাওয়ান সুবিধা। কণ্ঠ-নালীর মধ্যে ঘা হইলে যখন খাদ্য গিলিতে অত্যন্ত কষ্ট হয়, তখনও বোধ হয় এইরূপ প্রণালী অবলম্বন করা মন্দ নহে।

ইঁদুর-ধরা মেয়ে।—ফিলাডেল্‌ফিয়া লেজর বলেন, পেন্‌সিলভেনিয়া প্রদেশের এরি নামক স্থানের কিয়ৎ ক্রোশ দূরে একটি মেয়ের ব্যাবহারে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছেন। এই মেয়েটির বয়ঃক্রম এক বৎসর। সে যে ঘরে থাকে সেখানে একটি পুরাতন অগ্নি-কুণ্ড আছে। এই অগ্নিকুণ্ডটি ক্ষুদ্র মূষিকে আকীর্ণ। এই অগ্নি-কুণ্ডের কোণে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। মেয়েটির অভ্যাস এই যে, যখনি তার ঘুম ভাঙ্গে তখনি সে বিড়ালবৎ গুঁড়ি মারিয়া সেই ছিদ্রে অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে চক্ষু দিয়া থাকে। যতক্ষণ না একটি মূষিক নির্গত হয় ততক্ষণ সে চুপ করিয়া ঐরূপ ভাবে বসিয়া থাকে। যখনি কোন ইঁদুর বাহির হয় অমনি সে খপ্‌ করিয়া তাহার গলা চাপিয়া ধরে। এইরূপে শীকারটি যখন তাহার কবলের মধ্যে আইসে, তখন তাহার আর আনন্দের ইয়ত্তা থাকে না—সমস্ত শরীর পুলকে স্পন্দিত হয়—ও বিড়ালের ন্যায় গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে। সেই মেয়েটির কেমন এক প্রকার মোহিনী শক্তি আছে সে মূষিকটী বাহির হইবামাত্র একেবারে যেন অবশ হইয়া পড়ে। পলাইবার কোন চেষ্টা করে না। যদি কোন ব্যক্তি এই সময়ে আসিয়া মূষিকটি তাহার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে, তো সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুখের মধ্যে লুকাইয়া রাখে। এই পেন্‌শিলভেনিয়া সুশীলা মেয়েটির মত যদি সব মেয়ের স্বভাব হয়, তাহা হইলে শৈশবের মধুরতা যে কত গুণে বর্দ্ধিত হয় তাহা বলা যায় না!—পেলমেল্‌ গেজেট্‌।

ভল্‌টেয়ারের উক্তি।

জীবন।—জীবন-পথ কণ্টকে আকীর্ণ। এই পথে দ্রুত-পদে গমন ভিন্ন এই কণ্টক সকল হইতে উদ্ধার পাইবার আর কোন উপায় নাই। দুঃখের বিষয় আমরা যতই ভাবিব, ততই দুঃখ আমাদিগকে যন্ত্রণা দিবে।

ঔষধ।—একজন যুবক ভল্টেয়ারের নিকট বলে যে তাহার চিকিৎসা শাস্ত্র শিখিবার সংকল্প আছে। ইহাতে ভল্টেয়ার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন;—তুমি যে ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যাইতেছ তাহা এই—যে সকল গাছ গাছড়ার গুণাগুণ প্রায় কিছুই জানা নাই, সেই সকল গাছ গাছড়া এমন শরীরে প্রবিষ্ট করা, যে শরীরের বিষয় আরও কম জানা আছে।

ঔষধ অপেক্ষা পথ্য-নিয়ম উৎকৃষ্ট। আপনি আপনার চিকিৎসক হওয়া কর্ত্তব্য। প্রকৃতিকে কেবল সাহায্য করা বিধেয়—তাহার উপর বল প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে।

বিশেষতঃ কি করিয়া সহ্য করিতে হয়—বৃদ্ধ হইতে হয়—অবশেষে মরিতে হয় তাহা আমাদিগের জানা উচিত। কতকগুলি পদার্থ আছে যাহা স্বাস্থ্য জনক—এবং কতকগুলি অনিষ্ট জনক। যাহা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছ তোমার ধাতে সহ্য হয়, তাহাই অল্প পরিমাণে আহার করিবে। যাহা পরিপাক করা যায়.তদ্ভিন্ন আর কিছুই উপকারী নহে। কোন্ ঔষধে পরিপাক হয়?——ব্যায়াম। কিসে ক্ষয়-প্রস্ত বলের ক্ষতি-পূরণ হয়?——নিদ্রা। কিসে অচিকিৎস্য রোগের উপশম হয়?——ধৈর্য্য।

শ্রমশীলতা।—"আমার যদি ১০০ টা শরীর থাকিত, আমি সকল গুলিকেই ক্লান্ত করিয়া ফেলিতাম।"

মৃত ব্যক্তির গ্রন্থ-সমালোচনা।—সুপ্রসিদ্ধ ফরাসি-কবি কর্ণেই সম্বন্ধে ভল্টেয়ার বলিয়াছিলেন——"তোষামোদে তাঁহার কি উপকার, সত্য কথা কহিলেই বা তাঁহার কি হানি হইতে পারে? আমি তোষামোদ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছি, না—জন-হিতকারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি?—কর্ণেই অপেক্ষা সত্য প্রার্থনীয়। মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার অনুরোধে, জীবন্ত ব্যক্তিদিগকে প্রতারণা করা আমাদিগের উচিত নহে।"

অন্ধ সমালোচনা—"আমি অধুনাতন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত একদিন আহার করিতেছি। লামট্ হুদারের নব-প্রকাশিত আখ্যায়িকা সম্বন্ধে সকলেই যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—লাফন্‌টেনের একটা অতি নিকৃষ্ট আখ্যায়িকারও নিকটে উহা ঘেঁসিতে পারে না। এই সময়ে আমি বলিলাম লাফন্‌টেনের রচনাবলীর যে একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি নূতন আখ্যায়িকা যোজিত হইয়াছে। লাফণ্টেনের রচিত বলিয়া একটি আখ্যায়িকা আমি উহাঁদিগের নিকট আবৃত্তি করিলাম। আবৃত্তি করিবামাত্র সকলেই একেবারে মোহিত হইয়া গেলেন—বলিতে লাগিলেন "ইহা লামটের রচনা-প্রণালী অপেক্ষা কত বিভিন্ন!—কেমন প্রাঞ্জল!—কেমন পরিপাটী!—লাফণ্টেন যে ইহার লেখক, প্রত্যেক কথাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।" যখন এই সব কথা হইতেছিল আমি তখন মনে মনে হাসিতেছিলাম। কেন না,—ঐ আখ্যায়িকাটি বাস্তবিক লামটের প্রণীত—লাফণ্টেনের নহে।

মিতব্যয়িতা।—মিতব্যয়িতা বদান্যতার আকর।

সুরুচি।—সুরুচি সহজে উপার্জ্জিত হয় না। ইহার উপার্জনে প্রথমে কষ্ট বোধ হয়—সুখ বোধ হয় না। কতকগুলি খেলা আছে যাহাতে কতকটা ব্যুৎপত্তি না জন্মিলে, আমোদ হয় না। ইহাও তদ্রূপ। প্যারি নগরে এরূপ অনেক বিদেশীয়দিগের সহিত আমার পরিচয় হইয়াছে যাঁহারা র‍্যাসীন্ ও দান্‌সের রচণা-প্রণালীর বিভিন্নতা বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা "জায়িদ্" না ক্রয় করিয়া নূতন উপন্যাসগুলি ক্রয় করেন; আমি

অনেক বিদেশে ভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি যে যাঁহারা খুব পণ্ডিত্ তাঁহারা সকল সময়ে সুরুচি-সম্পন্ন নহেন। কারণ আমি প্রায়ই দেখিয়াছি তাঁহারা তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের রচনাবলী হইতে এরূপ স্থল সকল উদ্ধৃত করেন যাহা তেমন কিছুই চমৎকার-জনক নহে। তাঁহারা আসল ও ঝুঁটা হিরার বিভিন্নতা বুঝিতে পারেন না। পণ্ডিতগণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই সুরুচি-বিষয়ে ভাগ্যবান্। যে সকল কার্য্য আইন-ঘটিত—আয়ব্যয়ের হিসাব-ঘটিত বা ব্যবসা-বাণিজ্য-ঘটিত সে সকল কার্য্য সুকুমার শিল্পের অত্যন্ত বিরোধী। মানব জাতির পক্ষে ইহা অতি লজ্জার বিষয় বলিতে হইবে যে, সুরুচি-দেবী প্রায় শিক্ষিত সমৃদ্ধ অলসদিগেরই পক্ষপাতী হয়েন। ভের্সাই নগরে একজন বুদ্ধিমান মসি-জীবির সহিত আমার পরিচয় ছিল—সে প্রায়ই আমাকে বলিত "আমার অত্যন্ত দুর্ভাগ্য—সুরুচি অর্জনের আমার সময় নাই।"

মশার বাদ্য-যন্ত্র।—পাঠক গণ আপনারা কি মশার বাদ্য-যন্ত্র কি তাহা জানেন? মশা কানের কাছে ভন্ ভন্ করিলে আমরা তিতিবিরক্ত হইয়া তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া রক্ষা পাই, কিন্তু মশক-ধ্বনি হইতে যে সুশ্রাব্য বাদ্যের সৃষ্টি হইতে পারে ইহা আমাদের স্বপ্নেরও অগোচর। আমেরিকায় এই অভিনব বাদ্য-যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সহস্র সহস্র বিজ্ঞাপন সত্বেও অনেক দিন পর্য্যন্ত ইহা কেহ বিশ্বাস করে নাই, কিন্তু এক্ষণে অবিশ্বাস দূর হইয়াছে ও সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে যাইতেছে। এই অদ্ভুত বাদ্য এককালে দেড়শত লোকের শ্রুতিগোচর হইতে পারে।

এই বাদ্যকর সেই লোকটি যিনি পূর্ব্বে মক্ষিকাদল শিক্ষিত করিয়া কৌতুক দর্শাইতেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার মক্ষিকাদের দ্বারা আর বিশেষ কিছু হয় না। লোকদিগের কৌতূহল নিবৃত্তি হইয়াছে; আর তাহারা তাহাদের বাজীখেলা, গাড়ীটানা দেখিতে আইসে না। এই হেতু তিনি আমোদের এক নূতন পথ আবিষ্কার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। মক্ষিকা হইতে মশকের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। প্রথমে তিনি মশকদিগকে মক্ষিকার মত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যখন প্রদর্শনের সময় নিকটবর্ত্তী হইল তখন হঠাৎ এক নূতন ভাব তাঁহার মনে উদয় হইল। নিয়ত এই সকল জীবদিগের সঙ্গে থাকিয়া ও তাদের ভন্ ভন্ শব্দ শুনিয়া শুনিয়া তাহাদের স্বরের তারতম্য চিনিতে পারিলেন ও ভাবিলেন যে, কৌশলক্রমে এই শব্দ হইতে উৎকৃষ্ট বাদ্য-যন্ত্রের উৎপত্তি হইবার বাধা কি? ভাবিয়া ভাবিয়া ক্রমে এই আশ্চর্য্য মশক-বাদ্য-যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া সকলকে বিস্মিত করিলেন।

এই বাদ্য-যন্ত্র বিংশতি চতুষ্কোণ কাষ্ঠের বাক্সে নির্ম্মিত। বাক্সগুলি প্রায় ৬ ইঞ্চ

সমচতুষ্কোণ। এই বাক্সের উপরকার ডালা ইচ্ছামত বন্ধ ও মুক্ত করা যাইতে পারে। প্রতি বাক্সের উপরি ভাগে এক একটী বলবৎ শব্দোদ্দীপক ফলক সংলগ্ন। ভিতরে সহজে ঘূর্ণিত হইতে পারে এই রূপ এক একটি তারযন্ত্র নির্ম্মিত। প্রত্যেক বাক্সে এক একটি মশক থাকে। প্রতি মশকের ঘর ভিন্ন ভিন্ন হওয়াতে বিংশতি প্রকার বিভিন্ন গ্রামের স্বর নির্গত হয়। বাদ্য বাজাইবার নিয়ম এই—বাক্সের অন্তঃস্থিত তারযন্ত্র সকল পরিচালিত হইলে, তাহাতে প্রত্যেক মশক উড়িয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়, সুতরাং তাহারা ভন্ ভন্ স্বর অবিশ্রান্ত ছাড়িতে থাকে। বাক্সের উপরকার ডালা উঠাইবামাত্র একটি স্বর নির্গত হয়। এই স্বর শব্দফলকে প্রতিঘাত পাইয়া বিবৃদ্ধ-রবে শ্রোতৃবর্গের কর্ণে প্রবেশ করে। এই উপায়ে বাদ্যকর অনেকগুলি রাগ-রাগিণী আলাপ করিতে পারেন।

এই যন্ত্রের মৃদু মধুর সুকোমল বাদ্য শ্রবণ করিয়া অবাক্ হইতে হয়; বোধ হয় যেন স্বর্গ হইতে অপ্সরা নামিয়া গুণ গুণ স্বরে গান করিতেছে। ইহা শুনিবার জন্য লোকের এত ভিড় হয়, আর যাহারা একবার ইহা শুনিয়াছে তাহারা আবার আসিয়া শুনিতে এত ব্যগ্র যে, তাহাতে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়। এই হেতু বাদ্যকর নিয়ম করিয়াছেন যে, সিন্‌সিনাটি নগরের সমুদয় লোকের একবারে শোনা শেষ না হইলে, যিনি একবার শুনিয়াছেন তিনি দ্বিতীয় বার আসিতে পারিবেন না। ঐ সহরে ৫ লক্ষ লোকের বসতি, অতএব লেখক লিখিতেছেন আমি একবার শুনিয়াছি, সুতরাং অনেক কাল পরে আবার এ মধুময় বাদ্য শুনিবার সুযোগ পাইব।

রুষিয়াতে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা।—আমরা সচরাচর শুনিয়া থাকি যে আমাদের দেশে অনেকে লোভে পড়িয়া খৃষ্ট-ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। কোন পল্লীগ্রামে খৃষ্টানদের সংখ্যা অধিক দেখিয়া যদি তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে যাই ত হয়ত শুনা যায় যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে যত না হউক, খাওয়া পরার প্রত্যাশা তদপেক্ষা ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের বলবত্তর কারণ। আমরা শুনিয়া থাকি খৃষ্টান প্রচারকগণ ছলে কৌশলে অনেক সময় আপনাদের মেষদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু মুসলমানেরা যেমন এক হাতে কোরাণ ও একহাতে তলবার ধারণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া থাকে খৃষ্ট-মতাবলম্বীগণ যে তাহার অনুকরণ করিবেন ইহা নূতন কথা। কিন্তু রুসিয়া রাজ্যে এরূপ ঘটনাও নিত্য ঘটিয়া থাকে। এই বিষয়ে একজন ইংরাজ ৩৬ বৎসর রুষিয়ায় বাস করিয়া স্বীয় পরীক্ষিত যে সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন তাহা হইতে পাঠকগণ প্রকৃত ঘটনা কতক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। তিনি বলেন, "কাজান নগর যাহা পূর্ব্বে তাতার খাঁদিগের রাজধানী ছিল তথাকার ২০০০ চুবাশ জাতীয় চাসার খৃষ্টধর্ম্মে-দীক্ষা দর্শনার্থ সে প্রদেশের গবর্ণর জেনেরাল আমাকে নিমন্ত্রণ করেন। আমি মহা কৌতূ-

হলের সহিত তথায় উপস্থিত হইলাম। গবর্ণর জেনেরাল, সেনাপতি, পুলিসের অধ্যক্ষ প্রভৃতি সকলেই কার্য্যানুষ্ঠানে প্রস্তুত।

বাইবল ও প্রার্থনা পুস্তকাবলি হস্তে করিয়া ও জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া এক দঙ্গল পুরোহিত আসিতেছে ইহা দেখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে বেত্র ও ভল্ল হস্তে ভয়ঙ্কর কসাক-সৈন্যদল আসিয়া উপস্থিত। "পেগানদিগকে" খৃষ্টান করিতে হইবে; কসাক-রীতি-অনুসারে দীক্ষাকার্য্যের আরম্ভ হইল।

কম্পিত কলেবর চুবাসদের শ্রেষ্ঠী ও প্রধানগণ গবর্ণর জেনেরলের সম্মুখে আনীত হইল। তিনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা খৃষ্টান হইতে চাও কি না? অনেকে বলিল 'হাঁ', কেহ কেহ বলিল 'না'। তৎক্ষণাৎ কসাক সেনাগনের প্রতি সঙ্কেত করা হইল,তাহারা সঙ্কেত বুঝিয়া প্রতিজনে এক এক চাবুক হস্তে আসিয়া পড়িল। কয়েক মিনিটের মধ্যে বেচারী চুবাসদের পৃষ্ঠদেশ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল।

এখনো তোমারা 'হীদেন' থাকিতে চাও? তোমরা ভূদেব-কেশরীর অবমাননা করিতে চাও?

না! না! না! চতুর্দ্দিক হইতে এই রূপ শব্দ উঠিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বেত্র প্রহারের ফল ফলিয়াছে দেখা গেল।

এই ক্ষণে রুসীয় পুরোহিতগণ অগ্রসর হইল। দুই সহস্র যুবক জানু পাতিয়া বসিয়া গেল। তাহাদিগকে খৃষ্টের মৃত্যু-স্মরণচিহ্ন 'ক্রুস,' চুম্বন করিতে দেওয়া হইল। তাহারা প্রত্যেকে একটী কাগচের উপর 'ক্রুস' চিহ্নে স্ব স্ব নাম সাক্ষর করিল—এইরূপে ৪ ঘণ্টার মধ্যে রুষিয়া সম্রাটের দুই সহস্র 'হীদেন' প্রজা খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইল। মাসকতক পরে এই দুই সহস্র ব্যক্তি খৃষ্ট-ধর্ম্মে উৎকৃষ্ট উপদেশ ও শিক্ষা লাভ করিলে পর আমি কার্য্যবশাৎ তাহাদের এক খৃষ্টান গ্রামে গিয়া উপনীত হইলাম। একদল খৃষ্টান আসিয়া আমার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তোমরা ঈশ্বর-পুত্র ঈশাকে মান? তাঁকে মানি বৈ কি মহাশয়, অবশ্য অবশ্য মানি। এইরূপ উত্তর করিবার সময় সেই কসাকের বেত্র তাহাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল সন্দেহ নাই। ঈশ্বর পিতাকেও মান?—পরে এই প্রশ্নটি করিলাম। ইহাতে তাহারা যেন কিছু অপ্রস্তুতের মত হইল। অবশেষে তাহাদের মধ্য হইতে জনৈক বৃদ্ধ অগ্রসর হইয়া গম্ভীর-ভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"কি বলছেন মহাশয় সেই বৃদ্ধ পুরুষ কি এখনও পর্য্যন্ত বাঁচিয়া আছেন?" পিতা জীবিত থাকিতে পুত্র কিরূপে রাজ্য ভোগ করিবে ইহা তাহারা ভাবিয়া উঠিতে পারিল না।

প্রকৃত শিক্ষা-প্রণালী।

মনুষ্যের সর্ব্বাঙ্গীন চিত্তোৎকর্ষ সাধনই শিক্ষা-বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাহাতে বয়োবৃদ্ধি-সহকারে শিশুগণের উদ্ভেদোন্মুখ মনোবৃত্তি সকল ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত ও পরিচালিত হয়, যাহাতে বিবেক, মেধা ও চিন্তাশক্তি উত্তেজিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, যাহাতে চরিত্র বিশুদ্ধরূপে পরিণত হয়, যাহাতে বালক ভবিষ্যতে মানুষ হইয়া সংসারের গুরুভার বহন করিতে সক্ষম হয়, যাহাতে আত্ম সম্বন্ধীয়, পরিবার-সম্বন্ধীয়, স্বদেশহিত-সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া তদনুষ্ঠানে যত্নবান্ হয়—এই সকল উদ্দেশ্য সাধনই শিক্ষা-বিধানের কার্য্য। এই সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালীর সম্যক্‌রূপে অনুসরণ করা অবস্থাক্রমে সকলের পক্ষে সম্ভাবিত নহে; কিন্তু এই উচ্চ আদর্শের অনুগমন করিতে যিনি যত দূর সক্ষম হয়েন তিনি সেই পরিমাণে আপনাকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের পথে উন্নত ও জীবনকে সার্থক করিতে পারেন। শৈশবাবস্থা হইতে এই শিক্ষার আরম্ভ হয় কিন্তু চিরজীবনে তাহার পরিসমাপ্তি হয় না। আমাদিগের মানসিক বৃত্তি-সকলের উন্নতির সীমা নাই; যতই কর্ষণ করিবে, যতই পরিচালনা করিবে ততই তাহা অধিকতর তেজস্বী হইবেক, ততই আমাদিগের আন্তরিক শক্তি ও কার্য্য-কুশলতার আয়ত্তি বৃদ্ধি হইবেক। কিন্তু শৈশবকালে এই শিক্ষাকে অবহেলা করিলে, অথবা তাহা সুপ্রণালী-ক্রমে প্রদত্ত না হইলে বিষম অনিষ্টোৎপত্তির কারণ হয়। পুত্র সুশিক্ষিত ও সুপণ্ডিত হইয়া সর্ব্বাংশে কৃতী ও সকলের নিকট যশোভাজন হইবেক ইহা সকল পিতা মাতারই একান্ত অভিলাষ। কিন্তু কি উপায়ে বালককে শিক্ষিত করিলে ভবিষ্যতে সে পিতা মাতার আশা ফলবতী করিতে পারিবেক, কিরূপে শিশুর সুকুমার চিত্ত স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-সহকারে উন্নত ও স্বতেজে পরিবর্দ্ধিত হইবেক তাহার চিন্তা অল্প লোকেই করিয়া থাকেন এবং তাহার প্রকৃত তথ্য তদপেক্ষা স্বল্প লোকে অবগত আছেন। অথচ প্রকৃত শিক্ষাবিধানের নিয়মানুসারে শিক্ষাকার্য্য সম্পাদিত না হইলে যে চিত্তোৎকর্ষ-সাধনপক্ষে গুরুতর ব্যাঘাৎ এবং বালকগণের চিত্তবৃত্তি সকলের উন্নতির বিশেষ হানি হইয়া থাকে তাহার ভূরি ভূরি উদাহরণ সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইবেক। একারণ প্রকৃত শিক্ষাবিধানের কএকটি মূলতত্ত্ব আমরা এই প্রস্তাবে বিবৃত করিতে ইচ্ছা করি এবং সেই মূলতত্ত্ব অবলম্বন করিয়া এতদ্দেশীয় বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাব ও দোষগুণের আলোচনা করা যাইবেক।

পুরাকালে রাজভক্তির ন্যায় গুরুভক্তির একান্ত প্রাবল্য ছিল। তখন রাজা স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাহা করিতেন তাহাই হইত;

রাজকার্য্য-সম্বন্ধে যখন যে আদেশ করিতেন, যে বিধি সংস্থাপন করিতেন, তাহাই প্রকৃতি-বর্গ বিনীতভাবে শিরোধার্য্য করিত। কারণ লোকের দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, ভুপতিগণ দেবাংশে জন্ম গ্রহণ করেন এবং স্ব স্ব রাজশক্তি ও প্রভাব দেবতাগণের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপে গুরুকেও সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া লোকে মান্য করিত। জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিষয়ে গুরু যে শিক্ষা প্রদান করিতেন তাহাই অতর্কিত ভাবে অটল বিশ্বাসের সহিত সত্য বলিয়া গৃহীত ও হৃদ্‌গত করিয়া রাখা হইত। সেই গুরুবাক্য অলঙ্ঘনীয়,তাহার প্রতি লেশমাত্র সংশয় করিতে নাই। এই নিমিত্ত তাহার সত্যাসত্য বা দোষগুণ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান কি বিচার করিতে কাহারও সাহস কি সাধ্য হইত না। সুতরাং তৎকালে গুরূপদেশ-গুলি অভ্যাস করাই একমাত্র শিক্ষাকার্য্যের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কালসহকারে এই সকল মতের বহুল পরিবর্ত্তন হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে জনসমাজে স্বাধীনতার ভাব বিস্তৃতরূপে প্রচার হইয়াছে, ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ক্রমশ প্রবল হইতেছে এবং তৎসহকারে সুসভ্য জনপদ মাত্রেই রাজার যথেচ্ছাচার-শক্তির ও অপরিমিত পরাক্রমের খর্ব্বতা ও সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জনসমাজ যে রাজার ইচ্ছামত চালিত হইতে পারে না,তাহা যে নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক নিয়মাধীন এবং তাহার প্রকৃত হিত-সাধন করিতে হইলে সেই সকল নিয়মের অনুগামী হইয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য ইহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এক্ষণে স্বীকার করেন। জনসমাজের ন্যায় ব্যক্তিবিশেষের উন্নতিও অনেকাংশে স্বাভাবিক নিয়মাধীন জানিতে হইবেক। শিশুগণের চিত্তবৃত্তির উন্মেষ শিক্ষকের স্বেচ্ছাধীন নহে। শৈশব-চিত্ত বীজাঙ্কুরের ন্যায় আপনা হইতে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী সেই পরিবর্দ্ধনের অনুকূলাচরণ করিয়া শিশুগণের মনোবৃত্তি সকলের উপযুক্তমত উত্তেজনা করিয়া দেয় এবং যাহাতে শিশুগণ আপনা হইতে কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তাহাদের বুদ্ধির উপযোগী নূতন নূতন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে উৎসাহযুক্ত হয় সেই আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টাকে উদ্রেক করিয়া দেওয়াই শিক্ষাবিধানের প্রথম সোপান। বাস্তবিক শিক্ষাকার্য্যে বালকগণের স্বতঃ-প্রবৃত্তি জন্মাইতে হইবেক। কোন একটি জ্ঞানের বিষয় জানিতে তাহাদের কৌতূহল এত অধিক উত্তেজিত করিয়া দিতে হইবেক যে, তাহারা অবলীলাক্রমে আপনা হইতে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু হইয়া তাহার সবিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে সচেষ্টিত হয়। এইটি শিক্ষা-বিধানের প্রথম মূল-সূত্র।

কোন বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে হইলে দুইটি বিষয়ে সংযোগ আবশ্যক;—এক শিক্ষকের সাহায্য, দ্বিতীয় শিক্ষার্থীর আন্তরিক চেষ্টা এবং বুদ্ধি-চালনা। শিক্ষক যদি সকল কথা বলিয়া দেন, তাহা হইলে বালক কেবল তৎপ্রদত্ত জ্ঞানের আধার স্বরূপে সেই কথা গুলি মনে ধারণ করিয়া রাখিলেই স্বল্পায়াসে কার্য্যসিদ্ধ হয় বটে

কিন্তু তাহাতে প্রকৃত ফলের অনেক হানি হয়। অনেকে এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া অল্পায়াসে অল্পকাল মধ্যে অধিক শিখাইবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েন ও বালকগণকে শিক্ষাবিষয়ক সকল কথা বলিয়া দিয়া সহজে পাঠ অভ্যাস করাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, তাহাতে অভ্যস্ত পাঠে নিজ নিজ বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তি সংযোগ করিয়া আপনা হইতে সকল কথা বুঝিয়া লইবার অবকাশ মাত্রও বালকগণ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু এইরূপ শিক্ষার ফল কি? বুদ্ধি বিবেক ও চিন্তা-শক্তি পরিচালনা-অভাবে স্তম্ভিত ও নিদ্রিত থাকে এবং তজ্জন্য অভ্যস্ত পাঠ কদাপি মনোমধ্যে উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাসিত বা স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয় না। সুতরাং অনেক সময়ে যাহা এ কাণ দিয়া প্রবেশ করে তাহা ও কাণ দিয়া নির্গত হইয়া যায়। যাহা সহজে আইসে তাহা সহজেই চলিয়া যায়, এই প্রবাদ বাক্যটি বিষয়-ব্যাপারে যেমন সর্ব্বদা সংলগ্ন হয় সেই রূপ শিক্ষাবিধান সম্বন্ধেও তাহার সার্থকতা সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করিতে হইবেক। যে বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবেক তাহার তথ্য বালকগণকে অগ্রে বলিয়া না দিয়া যাহাতে তাহারা সেই তথ্যের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় তাহার উপায় প্রদর্শন করাই শিক্ষকের কর্ত্তব্য; যাহাতে বালকগণ নিজ নিজ বুদ্ধি চালনা করিয়া একাগ্রতার সহিত শিক্ষিতব্য বিষয় অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় এই পর্য্যন্ত সাহায্য প্রদান করাই বিধেয়। পূর্ব্বকৃত সিদ্ধান্ত সকল এক কালে ছাত্রগণকে বলিয়া দিবার অপেক্ষা যে যে প্রণালীক্রমে সেই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে তাহার অনুসরণ করিয়া যদি ছাত্রগণ সেই সিদ্ধান্তের মূলতত্ত্ব পুনরায় আপনা হইতে আবিষ্কার করিয়া লইতে পারে সেইরূপে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা করাই প্রকৃত শিক্ষকের কার্য্য। বালকগণ এই প্রকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া সকল স্থলে নিজ আয়াসে অভিপ্রেত সিদ্ধান্তে যে উপনীত হইতে পারিবেক ইহা আশা করা যায় না বটে, কিন্তু সেই চেষ্টা কদাপি নিষ্ফল হয় না। তাহা অন্তত চিত্তোৎকর্ষ সাধনের একটি উৎকৃষ্ট উপায় হয়। প্রথমতঃ এই রূপ জ্ঞানান্বেষণে বুদ্ধিবৃত্তি সকলের বিশেষ পরিচালনা হয়; স্মৃতি, চিন্তা ও বিবেক-শক্তির সমূহ উত্তেজনা ও প্রখরতা সম্পাদিত হয় এবং তাহাতে আপাততঃ অভীষ্ট ফল লাভ না হইলেও আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়, অভিনিবেশ শক্তি ও চিত্তের একাগ্রতা পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং ভাবী অনুসন্ধান ও চিন্তার জন্য অন্তঃকরণ সমধিক উদ্যম ও উৎসাহযুক্ত হইতে থাকে। বালকগণ এই রূপে আপন আয়াস ও প্রযত্ন সহকারে যতই শিক্ষা করিতে থাকিবেক ততই শিক্ষিত বিষয় তাহাদের চিত্তে স্থায়ীভাবে ও সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইতে থাকিবেক। নিজ যত্নে ও পরিশ্রমে যে বিদ্যা আয়ত্তাধীন হয় তাহা সহজে স্মৃতিপথ হইতে অপসৃত হইতে পারে না এবং এই রূপ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে আরো জ্ঞানলাভের

জন্য আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে থাকে। একটি বালককে জ্যামিতির কোন একটি কঠিন প্রতিজ্ঞা আনুপূর্ব্বিক বুঝাইয়া দেও, সে আপাতত অনায়াসে বুঝিল, সুতরাং মনে করিল যে আর বুঝিবার বাকি নাই, কিন্তু দুই দিন পরে সেই প্রতিজ্ঞাটি তাহাকে প্রমাণ করিয়া দিতে বল, সে তাহাতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া এক স্থানে গোলযোগ দেখিল, তখন সকলই অন্ধকারময় দেখিতে লাগিল, শিক্ষক কি বলিয়া দিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিবার চেস্টা করিল, কিন্তু কিসের পর কোন্ কথা শিক্ষক বলিয়াছিলেন তাহার ক্রমটি ভুলিয়া গিয়াছে, নিজ বুদ্ধি চালনা করিয়া প্রতিজ্ঞাটির প্রমাণ পূর্ব্বে আত্মসাৎ করিয়া লয় নাই, সুতরাং এক্ষণে তাহাতে বুদ্ধি-সংযোগ করা কঠিন হইয়া উঠিল, অবশেষে হতাশ ও লজ্জিত হইয়া নিরস্ত হইল। পরন্তু যে বালক শিক্ষকের নিকট না গিয়া স্বয়ং সেই প্রতিজ্ঞাটি বুঝিতে চেস্টা করিয়াছে তাহার প্রতিপদে হয় তো অনেক চিন্তা করিয়া বুঝিতে হইয়াছে এবং প্রতিজ্ঞাটি প্রমাণ করিতে অনেক কস্ট ও সময় লাগিয়াছে, কিন্তু সে এই রূপে এক বার যাহা আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে তাহা আর কদাপি ভুলিবার নহে।

এই দুই দৃস্টান্তে স্পস্টই অনুভূত হইবেক যে শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষার্থী ব্যক্তির নিজ চেস্টা ও যত্নেরই প্রাধান্য সর্ব্বদা বলবৎ রাখিতে হইবেক, তাহা হইলেই প্রকৃত ও স্থায়ী ফল নিশ্চিত লাভ হইবেক। বালককে তোতা পাখীর ন্যায় কতকগুলি পাঠাভ্যাস করাইলে তাঁহার স্মরণ-শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে মার্জ্জিত হয় বটে, কিন্তু তাহার বিবেক ও চিন্তাশক্তি উদ্রিক্ত ও পরিচালিত না হওয়ায় ক্রমে নিস্তেজ ও নিরুদ্বেগ হইয়া যায়। কোন বিষয় নিজ চেস্টায় বুঝিতে আর তাহার যত্ন বা উৎসাহ হয় না, বুঝাইয়া না দিলে কোন কথাই আর তাহার সহজে বোধগম্য হয় না। এই রূপে সে বালক সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষকের অধীন হইয়া পড়ে। শিক্ষকের বা শিক্ষাপ্রণালীর দোষেই শিশুদিগের সুকুমার চিত্তের এই রূপ দুরবস্থা অনেক স্থলে ঘটিয়া থাকে। বালকগণকে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবেক তাহা তাহাদের বুদ্ধির উপযোগী কি না তাহা অগ্রে দেখা কর্ত্তব্য, তাহাদিগের অন্তর্বৃত্তি সকল যে পরিমাণে উন্মীলিত হইতে থাকিবেক তদুপযোগী জ্ঞানের বিষয় সকল তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবেক। প্রথমে সরল ও সহজ ভাব সকল, পরে ক্রমে ক্রমে অধিকতর জটিল ও কঠিন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক এবং একটি বিষয় যে পর্য্যন্ত সম্যক্ রূপে আয়ত্ত না হয় সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা কঠিনতর বিষয়ে তাহাদের বুদ্ধি চালনা করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইলে অধিক সময় লাগে। ইহাতে শিক্ষকের বিলক্ষণ পরিশ্রম আছে এবং আশু ফলের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহার আধিক্য দর্শাইয়া শিক্ষক যে প্রশংসাভাজন হইবেন তাহারও উপায় নাই। অথবা কোন স্থলে প্রচলিত প্রণালী-অনু-

সারে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাঠ সম্পূর্ণ করিতে হইবেক, এই সকল কারণে শিক্ষক সহজ পথ অবলম্বন করেন। ছাত্রগণ বুঝিতে পারুক বা নাই পারুক, ভয়-মৈত্রী প্রদর্শনে তাহাদের কতকগুলি পাঠ অভ্যাস করাইয়া দেন। বালকগণ শিক্ষকের তাড়নায় মহাক্লেশে অগত্যা বিদ্যার ভার মস্তকোপরি উঠাইয়া লয়। কিন্তু যে ভার তাহারা বহন করে তাহার মধ্যে তাহাদের নিজের সম্পত্তি কিছুই নাই, তাহারা কেবল পরের বোঝা বহিতেছে এই চিন্তায় এবং বোঝার গুরুভারে তাহারা ক্রমে অস্থির চিত্ত হইয়া বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে যৎপরোনাস্তি বিরাগযুক্ত হয় এবং কতক্ষণে অবকাশ পাইয়া বোঝাটি নিক্ষেপ করিয়া শ্রান্তি দূর করিবেক এই চিন্তায় ফিরিতে থাকে। অবশেষে কার্য্যেও তাহাদের ইচ্ছা ফলবতী হয়। কিছুদিন গত হইলে অভ্যস্ত পাঠ সকল এককালীন তাহাদের স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হয়। জ্ঞানার্জ্জনের যে স্বাভাবিক ইচ্ছা শিশু মাত্রেরই অন্তঃকরণে নিয়ত উদয় হইয়া থাকে তাহা এইরূপ অস্বাভাবিক শিক্ষাবিধানে একবারে নিস্তেজ হইয়া যায়। আর উদ্ধতস্বভাব শাসনাসহিষ্ণু বালকগণের মধ্যে অনেকেই এই সময়ে পুস্তক-ভার মস্তক হইতে নিক্ষেপ করিয়া সরস্বতীর নিকট হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া থাকে। বাল্যকালে যাহাদের এতদ্দেশীয় পাঠশালার শিক্ষা ও শাসন-প্রণালীর অধীন হইতে হইয়াছিল তাঁহারা উপরোক্ত কথার প্রামাণিকতা-পক্ষে অবশ্যই অনুমোদন করিবেন। অল্পবয়স্ক বালকগণের উন্নতির পরীক্ষা করিতে হইলে তাহারা কতগুলি পুস্তক পাঠ করিয়াছে তাহা না দেখিয়া, পুস্তক পাঠে তাহাদের কি পর্য্যন্ত অভিনিবেশ হইয়াছে, কি পর্য্যন্ত তাহাদের জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রতি আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ জন্মিয়াছে, কি পর্য্যন্ত তাহারা নিজ বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া অভ্যস্ত বিষয়ের প্রকৃত ও পরিষ্কার জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহাদের বিবেক, মেধা, চিন্তা ও একাগ্রতা কি পর্য্যন্ত তেজস্বী হইয়াছে, তাহাদের পরিদর্শন-শক্তির কতদূর উদ্রেক হইয়াছে, যাহা শিক্ষা করিয়াছে তাহার মূলতত্ত্ব কিপর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিয়াছে এবং সাধারণরূপে তাঁহাদের চিত্তোৎকর্ষ কি পর্য্যন্ত হইয়াছে, এই সকল বিষয় দেখা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা মনে করেন শিশুর মনকে কুম্ভকার-হস্তস্থিত মৃৎপিণ্ডের ন্যায় ইচ্ছানুরূপ গড়িয়া লওয়া যায়, তাঁহারা বাস্তবিক মনস্তত্ত্ব বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। শিশুর মন একটি নির্দ্দিষ্ট স্বাভাবিক নিয়মানুসারে ক্রমে ক্রমে বিকসিত ও পরিণত হইয়া থাকে। যে কোন কারণে হউক সেই স্বাভাবিক চিত্তোন্মেষের প্রতিরোধ হইলেই মানসিক উন্নতির ব্যাঘাত হইবেক।

চিত্তবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুগণের জ্ঞান লাভ করিবার স্বাভাবিক আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা কেবল সতৃষ্ণ নয়নে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে। কোন নূতন

বস্তু দেখিলে কি পর্য্যন্ত না তাহারা আগ্রহান্বিত হয়, চতুস্পার্শ্বের বস্তু সকলের পরিচয় লাভ করিবার নিমিত্ত তৎসম্বন্ধে কত অসংখ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। এই প্রথম শিক্ষার সময়ে তাহাদের সেই স্বাভাবিক চিত্তোদ্বেগ চরিতার্থ না করিয়া পিতা মাতাগণ শিশুগণকে ক, খ, শিখাইবার এবং পুস্তক পাঠে মনঃসংযোগ করাইবার নিমিত্ত মহা ব্যস্ত হইয়া থাকেন। এই একটি বিষম ভ্রান্তি। চতুস্পার্শ্বস্থ চেতনাচেতন বস্তু সকলের স্বাভাবিক অবস্থা ও গুণাগুণের পরিচয় লাভ জ্ঞানোপার্জ্জনের প্রথম সোপান। যাহাতে শিশুগণ এই সকল বস্তুর পরিচয় বিশেষরূপে শিক্ষা করিয়া স্মরণ রাখিতে পারে তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এই বস্তুশিক্ষার সঙ্গে পরিদর্শন-শক্তির উদ্রেক হইতে আরম্ভ হয়। এই পরিদর্শন শক্তির উত্তেজনা ও পুষ্টিসাধন করাই শিক্ষাবিধানের দ্বিতীয় মূল-সূত্র। এই শক্তি যে পরিমাণে তেজস্বী হয় সেই পরিমাণে মনুষ্য কার্য্যদক্ষতা এবং বিজ্ঞতা লাভ করেন। এই শক্তির প্রভাবেই বিজ্ঞানবিষয়ে, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে এবং সামান্যত সকল বিদ্যাবিষয়ে নানাবিধ নূতন নূতন আবিষ্কার হইয়াছে। বয়োবৃদ্ধি-সহকারে ও ভূয়োদর্শনে এই পরিদর্শন-শক্তির পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক স্থলে বিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালীর প্রভাবে বালকগণের চিত্ত নিয়ত পুস্তক পাঠাভ্যাসে রত থাকায় বাহ্য বস্তু সকলের পরিদর্শনের স্বাভাবিক স্পৃহা মন্দীভূত হইয়া যায়। চিত্তের এই অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। কিন্তু শিক্ষকগণের তাড়নায় বালকগণের সকল যত্ন, সকল আয়াস, সকল চিন্তা পুস্তকাধ্যয়নে ও শব্দ-শিক্ষায় আকৃষ্ট হওয়ায় অন্য সকল দিকেই অন্তঃকরণ উদ্যম-শূন্য হইয়া যায়; এই প্রকারে অনেকের অল্প বয়সে আন্তরিক কৌতূহল এত অধিক হ্রাস হইয়া যাইতে দেখা গিয়াছে যে তাহাদের চক্ষের উপরে নূতন কোন জন্তু বা কোন বস্তু উপস্থিত করিয়া দিলে তৎসম্বন্ধে দুই চারিটি সামান্য প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত হয়, আর কিছুই জানিতে তাহাদের ইচ্ছা হয় না। ইহা জানা আবশ্যক যে, বাহ্য বিষয়-সকলের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে এবং তাহাদের গুণাগুণ ও পরস্পর-সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিতে না পারিলে প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইবার উপায় নাই। বাস্তবিক সেই সকল বিষয়ের পরোক্ষ জ্ঞানই পুস্তকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একারণ যে ব্যক্তি নিজ পরিদর্শন-শক্তিকে যে পরিমাণে চালনা করিবেক সেই পরিমাণে সে গ্রন্থোল্লিখিত বিষয় সকলের জ্ঞান সুস্পস্ট রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেক। অতএব যাহাতে এই পরিদর্শন-শক্তি বলবতী হয় তদ্বিষয়ে শিক্ষকগণের যত্ন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

শিক্ষাবিধানের আর একটি মূল-সূত্র এই—বালকগণকে যেমন স্বতঃ-প্রবৃত্তি-সহকারে বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে হইবেক সেই রূপ শিক্ষাটি তাহাদের মনোরম ও আহ্লাদ-জনক হওয়া চাই। প্রকৃত

শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তি সকলের পরিচালনা হেতু একটি অপূর্ব্ব চিত্ত-প্রফুল্লতা জন্মে। সেই প্রফুল্লতা যে পর্য্যন্ত থাকে সে পর্য্যন্ত মন উৎসাহের সহিত জ্ঞান-শিক্ষার পথে গমন করে। তখন শিক্ষকের উত্তেজনা বা উৎসাহের প্রয়োজন হয় না, তখন শিক্ষা-বিষয়ে কোন শ্রমই কষ্টকর বোধ হয় না, এবং উৎসাহ ও একাগ্রতার আধিক্য হেতু জ্ঞাতব্য বিষয়টি সত্বরে স্বল্পায়াসে ও সর্ব্বতোভাবে আয়ত্ত হইয়া আইসে। কিন্তু সেই প্রফুল্লতা বিরহিত হইয়া শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে মনোবৃত্তি সকল সহজে আপনা হইতে উত্তেজিত হয় না, শিক্ষার বিষয়ে মনঃসংযোগ হয় না, চিত্তের একাগ্রতা জন্মে না, যাহা পাঠ বা অভ্যাস করা যায় তাহা অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয় না। যদি চেষ্টা করিয়া মনঃসংযোগ করা যায় তাহা হইলে মন শীঘ্র শ্রান্ত ও অলস হইয়া পড়ে। এই জন্য বালকদিগকে শিক্ষা দিবার সময়ে তাহাদের চিত্ত-প্রসাদ যাহাতে সংরক্ষিত হয়, যাহাতে তাহারা প্রফুল্ল চিত্তে শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হয় এই প্রকার কৌশলে শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

প্রকৃতির ক্রোড়ে শিশুগণ কি প্রকারে শিক্ষা লাভ করে তাহা অভিনিবেশপূর্ব্বক দেখিলেই উপরোক্ত শিক্ষা-প্রণালীর মূল-সূত্র সকল কতদূর প্রামাণিক, যুক্তিযুক্ত ও হিত-জনক তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবেক। শিশুর শিক্ষা প্রকৃত পক্ষে মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই আরম্ভ হয়। তখন প্রকৃতি দেবী স্বয়ং শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। মনুষ্য-প্রদত্ত শিক্ষা আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বে অল্পে অল্পে অবলীলাক্রমে অথচ সমূহ আন্তরিক চেষ্টা-সহকারে শিশু যে কত বিষয়ের জ্ঞান লাভ করে তাহা অনুধাবন করিলে বিস্ময়যুক্ত হইতে হয়। বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ হইবার বহু পূর্ব্বে শিশুগণ মাতৃভাষা কেমন আশ্চর্য্য কৌশলে শিখিয়া লয়। নূতন বস্তু ধরিতে, নূতন দৃশ্য দেখিতে, নূতন শব্দ শুনিতে শিশুগণ কেমন একান্ত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য প্রকাশ করে। সেই আগ্রহাতিশয্যই তাহাদের শিক্ষা-বিষয়ে একমাত্র প্রবল উত্তেজনা। কেহ, তাহাদের চেষ্টা করিতে বলে না, কেহ শিখিতে কহে না, কিন্তু অন্তর হইতে তাহাদের যেন কেহ উত্তেজিত করিয়া দিতেছে এবং তাহারা উৎসাহের সহিত, আনন্দের সহিত আবশ্যক অভ্যাসগুলি ক্রীড়াচ্ছলে অনবরত যত্ন সহকারে শিক্ষা করিতে থাকে। ক্ষুদ্র শিশুগণ নিকটে যাহা পায় তাহাই ধরিতে যায়, কোন দ্রব্য হস্তে পাইলে তাহা মুখে দেয়, ভুমিতে নিক্ষেপ করে, এবং টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে এবং এই রূপ করিতে পারিলেই পরমানন্দ লাভ করে। এই রূপে সর্ব্বদাই সে ব্যস্ত সমস্ত থাকিতে চাহে, এক দণ্ড তাহাকে স্থিরভাবে রাখা বিষম দায় হইয়া উঠে। শিশু কিসের জন্য এতাধিক ব্যস্ত সমস্ত, মাতা তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহাকে দুষ্ট দুরন্ত বলিয়া দমন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রবৃত্তির উত্তেজনার

নিকট কোন শাসনই প্রবল হইতে পারে না। প্রকৃতি দেবীর এই রূপ শিক্ষাপ্রণালী; এই প্রণালীর যতই অনুসরণ করিতে পারা যাইবেক ততই আমাদিগের শিক্ষাপ্রণালী ফলবান ও মঙ্গলজনক হইবেক।

ক্রমশঃ

ত—

ঝান্সীর রাণী।

আমরা এক দিন মনে করিয়াছিলাম যে, সহস্র বর্ষ ব্যাপী দাসত্বের নিপীড়নে রাজপুতদিগের বীর্য্য-বহ্নি নিভিয়া গিয়াছে ও মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাদের দেশানুরাগ ও রণকৌশল ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে দিন বিদ্রোহের ঝটিকার মধ্যে দেখিয়াছি কত বীর পুরুষ উৎসাহে প্রজ্বলিত হইয়া স্বকার্য্য-সাধনের জন্য সেই গোলমালের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যুঝাযুঝি করিয়া বেড়াইয়াছেন। তখন বুঝিলাম যে, বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে যে সকল গুণ নিদ্রিত ভাবে অবস্থিতি করে, এক একটা বিপ্লবে সেই সকল গুণ জাগ্রত হইয়া উঠে। সিপাহি যুদ্ধের সময় অনেক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীর তাঁহাদের বীর্য্য অযথা পথে নিয়োজিত করিয়াছিলেন, একথা স্বীকার করিলেও মানিতে হইবে যে, তাঁহারা যথার্থ বীর ছিলেন। তাঁতিয়া টোপী ও কুমারসিংহ ক্ষুদ্র দুইটি বিদ্রোহী মাত্র নহেন, ইতিহাস লিখিতে হইলে পৃথিবীর মহা মহা বীরের নামের পার্শ্বে তাঁহাদের নাম লিখা উচিত; যে অশীতি বর্ষীয় অশ্বারোহী কুমারসিংহ লোলজ্জ রজ্জুতে বাঁধিয়া দুই হস্তে কৃপাণ লইয়া হাইলণ্ডের সৈন্যদলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন, যে তাঁতিয়া টোপী কতকগুলি বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল লইয়া যথোচিত অস্ত্র নাই, আহার নাই, অর্থ নাই, অথচ ভারতবর্ষে বিদেশীয় শাসন বিচলিতপ্রায় করিয়াছিলেন, যদিও তাঁহাদের কার্য্য লইয়া গৌরব করিবার আমাদিগের অধিকার নাই তথাপি তাঁহাদের বীর্য্যের, উদ্যমের, জ্বলন্ত উৎসাহের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষের কি দুর্ভাগ্য, এমন সকল বীরেরও জীবনী বিদেশীয়দের পক্ষপাতী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংগ্রহ করিতে হয়।

সিপাহি যুদ্ধের সময় রাসেল টাইম্‌স্ পত্রে লিখেন যে,"তাঁতিয়াটোপী মধ্য ভারতবর্ষকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন; বড় বড় থানা ও ধনাগার লুঠ করিয়াছেন, অস্ত্রাগার শূন্য করিয়াছেন, বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়াছেন, বিপক্ষ-সৈন্য বলপূর্ব্বক তাঁহার সমুদয় অপহরণ করিয়া লইয়াছে, আবার যুদ্ধ করিয়াছেন, পরাজিত হইয়াছেন, পুনরায় ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের নিকট হইতে কামান লইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন, বিপক্ষ সৈন্যেরা পুনরায় তাহা অপহরণ করিয়া

লইয়াছে, আবার সংগ্রহ করিয়াছেন, আবার হারাইয়াছেন। তাঁহার গতি বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত। সপ্তাহ ধরিয়া তিনি প্রত্যহ ২০।২৫ ক্রোশ ভ্রমণ করিয়াছেন, নর্ম্মদা এপার হইতে ওপার, ওপার হইতে এপার ক্রমাগত পার হইয়াছেন। তিনি কখন আমাদের সৈন্য-শ্রেণীর মধ্য দিয়া, কখন পার্শ্ব দিয়া, কখন সম্মুখ দিয়া, সৈন্য লইয়া গিয়াছেন। পর্ব্বতের উপর দিয়া, নদী অতিক্রম করিয়া, শৈলপথে, উপত্যকায়, জলার মধ্য দিয়া, কখন সম্মুখে, কখন পশ্চাতে, কখন পার্শ্বে, কখন তির্য্যক্ ভাবে চলিয়াছেন। ডাক গাড়ির উপর পড়িয়া, চিঠি অপহরণ করিয়া, গ্রাম লুঠিয়া কখন বা সৈন্য চালনা করিতেছেন, কখন বা পরাজিত হইয়া পলাইতেছেন, অথচ কেহ তাঁহাকে ধরিতে ছুঁইতে পারিতেছে না।"

এই অসামান্য বীর যখন পারোনের জঙ্গলের মধ্যে ঘুমাইতেছিলেন, তখন মানসিংহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল। গুরুভার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া, সৈনিক বিচারালয়ে আহূত হইয়া তিনি ফাঁসি-কাষ্ঠে আরোহণ করিলেন। মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার প্রকৃতি নির্ভীক ও প্রশান্ত ছিল। তিনি বিচারের প্রার্থনা করেন নাই, তিনি বলিয়াছিলেন যে, "আমি ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্টের হস্তে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কিছুই আশা করি না। কেবল এই মাত্র প্রার্থনা যে, আমার প্রাণ-দণ্ড যেন শীঘ্রই সমাধা হয়, ও আমার জন্য যেন আমার নির্দ্দোষী বন্দী পরিবারেরা কষ্ট ভোগ না করে।"

ইংরাজেরা যদি স্বার্থপর বণিক জাতি না হইতেন, যদি বীরত্বের প্রতি তাঁহাদের অকপট ভক্তি থাকিত, তবে হতভাগ্য বীরের এরূপ বন্দীভাবে অপরাধীর ন্যায় অপমানিত হইয়া মরিতে হইত না, তাহা হইলে তাঁহার প্রস্তর-মূর্ত্তি এত দিনে ইংলণ্ডের চিত্রশালায় শ্রদ্ধার সহিত রক্ষিত হইত। যে ঔদার্য্যের সহিত আলেক্‌জাণ্ডার পুরুরাজের ক্ষত্রিয়োচিত স্পর্দ্ধা মার্জ্জনা করিয়াছিলেন, সেই ঔদার্য্যের সহিত তাঁতিয়া টোপীকে ক্ষমা করিলে কি সভ্যতাভিমানী ইংরাজ জাতির পক্ষে আরো গৌরবের বিষয় হইত না? যাহা হউক ইংরাজেরা এই অসামান্য ভারতবর্ষীয় বীরের শোণিতে প্রতিহিংসারূপ পশু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিলেন।

আমরা সিপাহী যুদ্ধ সময়ের আরো অনেক বীরের নামোল্লেখ করিতে পারি, যাঁহারা ইউরোপে জন্ম গ্রহণ করিলে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, কবির সঙ্গীতে, প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তিতে, অভ্র-ভেদী স্মরণ-স্তম্ভে অমর হইয়া থাকিতেন। বৈদেশিকদের লিখিত ইতিহাসের এক প্রান্তে তাঁহাদের জীবনীর দুই এক ছত্র অনাদরে লিখিত রহিয়াছে, ক্রমে ক্রমে কালের স্রোতে তাহাও ধৌত হইয়া যাইবে এবং আমাদের ভবিষ্যবংশীয়দের নিকট তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত থাকিবে।

শঙ্করপুরের রাণা বেনীমাধু লর্ড ক্লাইডের আগমনে নিজ দুর্গ পরিত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার ধন সম্পত্তি অনুচর-বর্গ কামান ও

অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে লইয়া অযোধ্যার বেগম ও বির্জিস্ কাদেরের সহিত যোগ দিলেন। তিনি তাঁহাদিগকেই আপনার অধিপতি বলিয়া জানিতেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদিগকে রাজার ন্যায় মান্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন। ব্রিটীষ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে চাহিলেন, তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তাঁহার ক্ষতি পূরণ করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং তাঁহার কষ্টের কারণ অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু রাজা সমুদয় প্রস্তাব তুচ্ছ করিয়া বেগম ও তাঁহার পুত্রের জন্য টেরাই প্রদেশে আশ্রয়হীন ও রাজ্যহীন হইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বেণীমাধু জীবনের বিনিময়েও তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন নাই এবং ইংরাজদের হস্তে কোন মতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। রাজপুত বীর নহিলে আপনার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য কয়জন লোক এরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে পারে?

স্নয়ার রাজপুত অধিপতি নৃপৎসিং খঞ্জ ছিলেন। তিনি যুদ্ধের সময় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, 'ঈশ্বর আমার একটি অঙ্গ লইয়াছেন, অবশিষ্ট অঙ্গগুলি আমার দেশের জন্য দান করিব।'

কিন্তু আমরা সর্ব্বাপেক্ষা বীরাঙ্গনা ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী বাইকে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার করি। তাঁহার যথার্থ ও বিস্তারিত ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর, অনুসন্ধান করিয়া যাহা পাওয়া গেল তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিলাম।

লর্ড ড্যাল্‌হূসি ঝান্সী রাজ্য ইংরাজশাসনভুক্ত করিলেন, এবং ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাইয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া উপজীবিকা স্বরূপ যৎসামান্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। এই স্বল্প বৃত্তি রাণীর সম্ভ্রম-রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, এই নিমিত্ত তিনি প্রথমে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন, অবশেষে অগত্যা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। কিন্তু ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না, লক্ষ্মী বাইয়ের মৃত স্বামীর যাহা কিছু ঋণ ছিল তাহা রাণীর জীবিকা হইতে পরিশোধ করিতে লাগিলেন। রাণী ইহাতে আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহা গ্রাহ্য হইল না। ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্যে গো-হত্যা আরম্ভ করিল, ইহাতে রাজ্ঞী ও নগরবাসীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ইহার বিরুদ্ধে আবেদন করিল কিন্তু তাহাও গ্রাহ্য হইল না।

এইরূপে রাজ্যহীনা, সম্পত্তিহীনা, অভিমানিনী রাজ্ঞী নিষ্ঠুর অপমানে মনে মনে প্রতিহিংসার অগ্নি পোষণ করিতে লাগিলেন এবং যেমন শুনিলেন কম্পানির সৈনিকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, অমনি তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য সুকুমার দেহ রণসজ্জায় সজ্জিত করিলেন। লক্ষ্মী বাই অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসরের কিছু অধিক, তাঁহার দেহ যেমন বলিষ্ঠ মনও তেমনি দৃঢ় ছিল। রাজ্ঞী অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন।

রাজ্য পালনের জটিল ব্যাপার সকল অতি সুন্দররূপে বুঝিতেন। ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের জাতিগত স্বভাব অনুসারে এই হৃতরাজ্য রাজ্ঞীর চরিত্রে নানাবিধ কলঙ্ক আরোপ করিলেন, কিন্তু এখনকার ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেন যে, তাহার এক বর্ণও সত্য নহে।

ঝান্সী নগরী অতিশয় পরিপাটী পরিচ্ছন্ন, উহা দৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত, এবং বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের কুঞ্জ ও সরোবরে সেই সকল প্রাচীরের চতুর্দ্দিক সুশোভিত ছিল। একটি উচ্চ শৈলের উপর দৃঢ়-দুর্গ-বদ্ধ রাজপ্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে। নগরীতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া অনেক ইংরাজ অধিবাসী সেখানে বাস করিত। কাপ্তেন ডান্‌লপের হস্তে ঝান্সী নগরীর রক্ষা-ভার ছিল। ভারতবর্ষে যখন বিদ্রোহ জ্বলিয়া উঠিয়াছে তখন ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে সতর্ক হইতে পরামর্শ দেন, কিন্তু ঝান্সীর শান্ত অবস্থা দেখিয়া তিনি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

এই প্রশান্ত ঝান্সীরাজ্যে বিধবা রাজ্ঞী ও তাঁহার ভৃত্যবর্গের উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে একটি বিষম বিপ্লব ধূমায়িত হইতেছিল। সহসা একদিন শুব্ধ আগ্নেয় গিরির ন্যায় নীরব ঝান্সী নগরীর মর্ম্মস্থল হইতে বিদ্রোহের অগ্নিস্রাব উদ্‌গীরিত হইল।

প্রকাশ্য দিবালোকে কান্টনমেণ্টের মধ্যে দুইটি ডাক বাঙ্গালা বিদ্রোহীরা দগ্ধ করিয়া ফেলিল, যেখানে বারুদ ও ধনাগার রক্ষিত ছিল, সেখান হইতে বিদ্রোহীদিগের বন্দুক-ধ্বনি শ্রুত হইল, এক দল সিপাহি ঐ দুর্গ অধিকার করিয়াছে, তাহারা উহা কোন মতে প্রত্যর্পণ করিতে চাহিল না। ইয়ুরোপীয়েরা আপনাপন পরিবার ও সম্পত্তি লইয়া নগরী-দুর্গে আশ্রয় লইল। ক্রমে ক্রমে সৈন্যেরা স্পষ্ট বিদ্রোহী হইয়া অধিকাংশ ইংরাজ সেনানায়কদিগকে নিহত করিল। বিদ্রোহীগণ দুর্গে উপস্থিত হইল।

ক্যাপটেন ডান্‌লপ্ হিন্দু সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু তাহারা সেইখানেই তাঁহাকে বন্দুকে হত করিল। দুর্গস্থ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মধ্যাহ্নে বিদ্রোহী-সৈন্যেরা দুর্গের নিম্ন অংশ অধিকার করিয়া লইল। পরাজিত ইংরাজ সেনারা বিদ্রোহী সেনাদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিল, কিন্তু উন্মত্ত সৈন্যেরা তাহাদিগকে নিহত করিল। এই নিধন-কার্য্যে রাজ্ঞীর কোন হস্ত ছিল না, এমন কি এ সময়ে রাজ্ঞীর কোন অনুচরও উপস্থিত ছিল না। যখন রাজ্যে একটিও ইংরাজ অবশিষ্ট রহিল না তখন রাজ্ঞী এই অন্যায়কারী দিগকেও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। এক্ষণে কথা উঠিল, কে রাজ্য অধিকার করিবে? রাজ্ঞী সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন; সদাশিব রাও নামে এক জন ঐ রাজ্যের প্রার্থী কুরারা দুর্গ অধিকার করিল। পরে রাজ্ঞীর সৈন্য কর্তৃক তাড়িত হইয়া সিন্ধিয়া-রাজ্যে পলায়ন করিল। এই রূপে ইংরাজেরা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হত ও

তাড়িত হইলে পর ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে লক্ষ্মী বাই হৃত-সিংহাসনে পুনরায় আরোহণ করিলেন। কিছুকাল রাজত্ব করিয়া লক্ষ্মী বাই ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ইংরাজ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইংরাজ সেনানায়ক সার হিউ রোজ্ সৈন্য-দল সমভিব্যাহারে ঝান্সী নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রস্তরময় নগর-প্রাচীরে ব্রিটিষ কামান গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। দুর্গস্থ লোকেরা আক্রমণ-প্রতিরোধের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। পুর-মহিলাগণ দুর্গ-প্রাকার হইতে কামান ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল এবং সৈন্যদের খাদ্যাদি বণ্টন করিতে লাগিল, এবং সশস্ত্র ফকিরগণ নিশান হস্তে লইয়া জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

৩১শে মার্চ রাণী দেখিলেন, তাঁতিয়া টোপী ও বাণপুরের রাজা অল্পসংখ্যক সৈন্যদল লইয়া ইংরাজ শিবির-পার্শ্বে নিবেশ স্থাপন করিয়া সঙ্কেত-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিয়াছেন। হর্ষধ্বনি ও তোপের শব্দে ঝান্সীদুর্গ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। তাহার পর-দিন] ইংরাজ-সৈন্যদের সহিত তাঁতিয়াটোপীর ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল, এই যুদ্ধে তাঁতিয়াটোপীর ১৫০০ সৈন্য হত হইল এবং তিনি পরাজিত হইয়া বেটোয়ার পর পারে পলায়ন করিলেন।

যুদ্ধে প্রত্যহ রাজ্ঞীর ৫০। ৬০ জন করিয়া লোক মরিতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কামান গুলির মুখ বন্ধ করা হইয়াছে এবং ভাল ভাল গোলন্দাজেরা হত হইয়াছে।

ক্রমে ইংরাজ সৈন্যেরা গোলার আঘাতে [নগর-প্রাচীর ভেদ করিল এবং প্রাসাদ ও নগরীর প্রধান প্রধান অংশ অধিকার করিল। প্রাসাদের মধ্যে ঘোরতর সম্মুখ-যুদ্ধ বাধিল। রাণীর শরীর রক্ষকদের মধ্যে ৪০ জন অশ্বশালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। আহত সৈন্যেরা মুমূর্ষু অবস্থাতেও ভূতলে পড়িয়া অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল। একে একে ৩৯ জন হত হইলে অবশিষ্ট এক জন বারুদে আগুন লাগাইয়া দিল, আপনি উড়িয়া গেল ও অনেক ইংরাজ সৈন্যও সেই সঙ্গে হত হইল।

রাত্রেই রাজ্ঞী কতকগুলি অনুচরের সহিত দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, শত্রুরা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিল এবং আর একটু হইলেই তাঁহাকে ধরিতে সক্ষম হইত। লেপ্টনেণ্ট বাউকর অশ্বারোহী সৈন্যদলের সহিত ঝান্সী হইতে দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত রাজ্ঞীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে দেখিলেন অশ্বারোহী লক্ষ্মী বাই চারি জন অনুচরের সহিত গমন করিতেছেন; বহু সৈন্য-বেষ্টিত বাউকর এই চারি জন অশ্বারোহী কর্ত্তৃক এমন আহত হইলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। এই সময়ে তাঁতিয়াটোপী কতক গুলি সৈন্য লইয়া রাণীর রক্ষক হইলেন।

৪ঠা এপ্রিলে ইংরাজেরা সমস্ত ঝান্সী নগরী অধিকার করিয়া লইল। সৈনিকেরা নগরে দারুণ হত্যা আরম্ভ করিল, কিন্তু নগরবাসীরা কিছুতেই নত হইল না। পাঁচ

সহস্রেরও অধিক লোক ব্রিটিষ বেয়নেটে বিদ্ধ হইয়া নিহত হইল। নগরবাসীরা শত্রুহস্তে আত্ম সমর্পণ করা অপমান ভাবিয়া স্বহস্তে মরিতে লাগিল। অসভ্য ইংরাজ সৈনিকেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করিবে জানিয়া পৌরজনেরা স্বহস্তে স্ত্রী কন্যাগণকে বিনস্ট করিয়া মরিতে লাগিল।

রাও সাহেব পেষোয়া বংশের শেষ বাজি-রাওর দ্বিতীয় পোষ্য পুত্র। তিনি, তাঁতিয়া টোপী ও ঝান্সীরাণী বিক্ষিপ্ত সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিষদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, কুঞ্চ নগরে সৈন্য স্থাপন করিলেন। অবিরল কামান বর্ষণ করিয়া হিউ রোজ তাঁহাদের তাড়াইয়া দিল। চারি ক্রোশ রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়না করিয়া সেনাপতি চারিবার ঘোড়ার উপর হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

অবশেষে লক্ষ্মী বাই কাল্পীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার এই শেষ অস্ত্রাগার রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেস্টা করিলেন। মনে করিয়াছিলেন রাজপুতেরা যোগ দিবে, কিন্তু তাহারা দিল না। ব্রিটিষ সৈন্যেরা একত্র হইয়া আক্রমণ করিল, অদৃঢ় দুর্গ কাল্পীতে রাজ্ঞীর সৈন্য আর তিষ্ঠিতে পারিল না।

কুঞ্চের পরাজয়ের পর তাঁতিয়াটোপী যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন কেহ জানিতে পারিল না। তিনি এখন গোয়ালিয়রের বাজারে প্রচ্ছন্ন ভাবে ইংরাজদের মিত্ররাজা সিন্ধিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন। তাঁতিয়াটোপী অধিবাসীদিগকে উত্তেজিত করিতে অনেকটা কৃতকার্য্য হইলে পর রাজ্ঞীকে সংবাদ দিলেন। রাজ্ঞী গোপালপুর হইতে রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহারা রাজার সহিত শত্রুতা করিতে যাইতেছেন না, তবে কিছু অর্থ ও খাদ্যাদি পাইলেই তাঁহারা দক্ষিণে চলিয়া যাইবেন, রাজা তাঁহাদের যেন বাধা না দেন, কারণ বাধা দেওয়া অনর্থক। গোয়ালিয়ারের লোকেরা ইংরাজ-বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়াছে। তাঁহারা তাহাদের নিকট হইতে দুই শত আহ্বান-পত্র পাইয়াছেন। কিন্তু ইংরাজভক্ত সিন্ধিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন।

রাও ও রাণী দৃঢ়স্বরে তাঁহাদের অনুচরদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমরা বোধ হয় নাগরিকদের নিকট হইতে কোন বাধা প্রাপ্ত হইব না, যদি বা পাই তবে তোমাদের ইচ্ছা হয়ত পলাইও, কিন্তু আমরা মরিতে প্রস্তুত হইয়াছি।"

১লা জুনে সিন্ধিয়া ৮০০০ লোক ও ২৪টি কামান লইয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার সৈন্যদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সিন্ধিয়া তাঁহার শরীর-রক্ষকদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইলেন কিন্তু তাহারা হত ও আহত হইল। সিন্ধিয়া অশ্বারোহণে আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন। মহারাণীর মাতা "গুজ্জারাজা," সিন্ধিয়া বিদ্রোহীদের হস্তে বন্দী হইয়াছেন মনে করিয়া, কৃপাণ লইয়া অশ্বারোহণে তাঁহাকে মুক্ত করিতে গেলেন; অবশেষে সিন্ধিয়া পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়া নিবৃত্ত হইলেন। ঝান্সীরাজ্ঞীর সৈন্যগণ সিন্ধিয়ার

রাজকোষ হস্তগত করিল, এবং তাহা হইতে রাণী সৈন্যদের ছয় মাসের বেতন চুকাইয়া দিলেন ও নগরবাসীদিগকে পুরস্কার দানে সন্তুষ্ট করিলেন। কিন্তু তাঁতিয়াটোপী ও রাজ্ঞী দুর্গরক্ষার কিছুমাত্র আয়োজন করেন নাই; তাঁহারা প্রকাশ্য ক্ষেত্রেই সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন; সমুদায় বন্দোবস্ত রাণী একাকীই সম্পন্ন করিতেছিলেন। তিনি সৈনিকের বেশ পরিয়া, যে রৌদ্রে ইংরাজ-সেনাপতি চারিবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন, সেই রৌদ্রে অপরিশ্রান্ত ভাবে মুহূর্ত্ত বিশ্রাম না করিয়া অশ্বারোহণে এখানে ওখানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন।

সার্ হিউ রোজ্ যখন শুনিলেন যে, গোয়ালিয়ার শত্রু হস্তগত হইয়াছে, তখন সৈন্যদল সংগ্রহ করিয়া রাজ্ঞী-সৈন্যের দুর্ব্বল ভাগ আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধের দারুণ বিপ্লবের মধ্যে রাজ্ঞী অসি-হস্তে ইতস্ততঃ অশ্বচালনা করিতেছেন। রাজ্ঞীর সৈন্যরা ভঙ্গ দিল; বিপক্ষ সৈন্যদের গুলিতে রাজ্ঞী অত্যন্ত আহত হইলেন। তাঁহার অশ্ব সম্মুখে একটি খাত দেখিয়া কোন মতে উহা উল্লঙ্ঘন করিতে চাহিল না; লক্ষ্মী বাইয়ের স্কন্ধে বিপক্ষের তলবারের আঘাত লাগিল, তথাপি তিনি অশ্বপরিচালনা করিলেন। তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী ভগিনীর মস্তকে তলবারের আঘাত লাগিল এবং উভয়ে পাশাপাশি রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। এই ভগিনী যুদ্ধের সময়ে কোন ক্রমে রাজ্ঞীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই, অবিশ্রান্ত তাঁহারি সহযোগিতা করিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলে যে, তিনি রাজ্ঞীর ভগিনী নহেন, তিনি তাঁহার স্বামীর উপপত্নী ছিলেন।

ইংরাজী ইতিহাস হইতে আমরা রাজ্ঞীর এইটুকু জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা নিজে তাঁহার যেরূপ ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল। ভ—

ভানুসিংহের কবিতা।

বিহাগড়া——

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশি বাজে
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি! আও আও লো।
পিনহ চারু নীল বাস
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম রাশ
হরিণ নেত্রে বিমল হাস
কুঞ্জ বনমে যাও লো॥

ঢালে কুসুম সুরভ-ভার
ঢালে বিহগ সুরব-সার
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার
বিমল রজত ভাতিরে।
মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতিরে॥

দেখলো সখি শ্যাম রায়
নয়নে প্রেম উথল যায়
মধুর বদন অমৃত সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।

আও আও সজনী-বৃন্দ
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ
শ্যামকো পদারবিন্দ—
ভানুসিংহ বন্দিছে॥

প্রাচীন ভারতের শিল্প।

একটি পুরাতন সংস্কৃত শব্দ আছে, "বাসায়নিক।" যাঁহারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন আদিম কালে তাঁহাদিগকে "বাসায়নিক" বলিত। আদ্যকালের সরল-বুদ্ধি মনুষ্যেরা প্রথমে বাসায়নিক ছিলেন না। ক্রমে কাল পরিবর্ত্তনে যখন তাঁহারা বাসায়নিক হইলেন, তখন তাঁহাদের বাসোপযোগী বিবিধ বস্তুর আবশ্যক হইল। এই বাসায়নিক কালেই ভারতবর্ষে শিল্প-প্রচারের সূত্রপাত হয়। সেই কাল হইতে ভারতবাসীদিগের দ্বারা শিল্পের যেরূপ উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল তাহার একটা স্থূল বিবরণ ভারতী-পাঠকগণের নেত্রগোচর করিব, এই প্রতিজ্ঞায় আমরা ৪র্থ সংখ্যক ভারতীতে কাল-সাধন-শিল্প-ঘটিত কিঞ্চিৎ বিবরণ বিবৃত করিয়াছি, এক্ষণে তাহার শেষাংশ ব্যক্ত করিতেছি।

ঋজুবুদ্ধি পুরাতন মানবেরা যে নৈসর্গিক ঘটনা বা ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া খণ্ড কাল সকল অবধারণ করিতেন, বর্ণোচ্চারণ-ঘটিত তদীয় উপায়টি বর্ণনা করা হইয়াছে। এক্ষণে শ্বাস-প্রশ্বাস-ঘটিত দ্বিতীয় উপায়ের বিবরণ ব্যক্ত করিতেছি।

নাসা-যন্ত্রের দুইটি ছিদ্র। শ্বাসপতন এই দুই ছিদ্র দ্বারাই হয় বটে, কিন্তু যুগপৎ উভয় ছিদ্র দ্বারা তুল্যরূপে শ্বাস পতন হয় না। আদিম মানবেরা দেখিলেন যে, কি জাগ্রৎ কি স্বপ্ন, কি দিবা কি রাত্রি, সকল কালে ও সকল অবস্থাতেই শ্বাস-পতন হয়। মনুষ্য যদি শ্রম, ব্যায়াম প্রভৃতি শ্বাস-ক্রিয়ার উত্তেজক কোন কার্য্য না করে, স্থির ভাবে থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক শ্বাস পতনের ব্যবধান কাল তুল্য থাকে। আর ইহাও তাঁহারা অনুভব করিয়া দেখিয়াছেন যে, একবারে উভয় নাসারন্ধ্র হইতে শ্বাস পতন হয় না। একটি বন্ধ থাকে, একটি দিয়া শ্বাস নির্গত হয়। সেটি পরিবর্ত্তিত হয়, অন্যটি ক্রিয়াবান্ হয়। এই দুইটি স্বাভাবিক ঘটনা হইতে তাঁহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুইটি অসাধারণ ফল আহরণ করিয়াছিলেন। সকল অবস্থায় ও সকল কালে শ্বাসপতনের অবিচ্ছিন্নতা, এতদ্দ্বারা একরূপ কাল নির্ণয়, আর নাসারন্ধ্রের পরিবর্ত্তন অনুসারে আর এক প্রকার কাল নির্ণয়। নাসারন্ধ্রের পরিবর্ত্তন অনুসারে যে কাল নির্ণয় হয়, তাহা একটি স্থূল কাল। এই স্থূল কালটি কতকগুলি কালের সূক্ষ্মতম অংশ-সমষ্টি। যথা দণ্ড ও মুহূর্ত্তাদি।

শ্বাস-পতনের দ্বার পরিবর্ত্তন।—বিধাতার কি অনির্ব্বচনীয় বিধান! এই দ্বার-পরিবর্ত্তনও নিয়মিত রূপে হইবে, কদাচিৎ নিয়ম ভঙ্গ হইবে না। পুরাকালের লোকেরা ইহার সন্ধান পাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, এক মুহূর্ত্ত অন্তর শ্বাস পতনের দ্বার পরিবর্ত্তন হয়। যে মুহূর্ত্তে নাসিকার যে রন্ধ্রে শ্বাসক্রিয়া চলিতে থাকে সেই মুহূর্ত্তে অন্য রন্ধ্রটি বিশ্রাম করিতে থাকে। পূর্ব্বকালের মানবেরা এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া মুহূর্ত্তাদি কাল নির্ণয় করিতেন। দিবা রাত্রে ত্রিংশৎ মুহূর্ত্ত, অতএব যে মুহূর্ত্তে যে নাসিকায় শ্বাস বহিবে, তাহা তাঁহারা দৃঢ় সিদ্ধান্তে আবদ্ধ রাখিতেন। শ্বাস পতন ও নাসিকা রন্ধ্রের পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা তাঁহাদের বিশেষ পরিচিত ছিল, যখন তখন তাঁহারা বলিতে পারিতেন যে, এই অমুক মুহূর্ত্ত।*

অবিচ্ছেদে শ্বাসক্রিয়া—এই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার লইয়া তাঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম কালের অবধারণ করিতেন। যথা—

"ষষ্টিশ্বাসৈর্ভবেৎ প্রাণঃ
ষট্ প্রাণা নাড়িকা মতা।
ষষ্টি নাড্যা হ্যহোরাত্রম্।"
• "একবিংশতি সাহস্রং
ষট্ শতাধিক মীশ্বর!"

বোধ হয় কোন অনুসন্ধায়ী পুরুষ ভ্রমণাদি রহিত হইয়া স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গণনা করিয়াছিলেন। তাহাতে নিশ্চয় হয় এক অহোরাত্রে ২১৬০০ একবিংশতি সহস্র ছয় শত শ্বাস হয়। অধিক বা ন্যূন হয় না। সুতরাং উহাকে ভাগ করিয়া দণ্ডাদিতে আনয়ন করিয়া তত্তাবতের ব্যবহার করিতেন।

পতন উৎপতন-রূপ প্রাণ-ক্রিয়া ৬০ বার হইতে যে কাল লাগে, সেই কাল-প্রবাহের নাম প্রাণ। ছয় প্রাণ পরিমিত কালে এক দণ্ড। ইহার ৬০ দণ্ডে এক অহোরাত্র।

এই নিয়ম আয়ত্ত থাকিলে দণ্ডাদি প্রভৃতি সূক্ষ্ম কাল অনায়াসে জানিতে পারা যায় কিন্তু এতৎপক্ষে অনেক বিঘ্ন আছে। শ্বাস প্রশ্বাসের কদাচিৎ শীঘ্রতা কদাচিৎ বিলম্ব দৃষ্ট হয়। ভ্রমণ, ব্যায়াম, প্রভৃতি পরিশ্রম-কালে শ্বাসের শীঘ্রতা জন্মে এবং তাহার সন্ধিস্থলে বিলম্ব জন্মে। এই নিমিত্ত যাঁহারা শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা কাল নির্ণয় করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বর্জ্জিত আছে। বিশেষ বিশেষ দৈহিক ও মানসিক ক্রিয়া বর্জ্জিত হইয়া তাঁহারা স্বাভাবিক শ্বাসের গতি রক্ষায় অভ্যাস করিবেন, এইরূপ বিধি আছে।

* "প্রাণগতিঃ শ্বাসঃ স মুহূর্ত্তাৎপরিবর্ত্ততে" এই মুহূর্ত্ত যে কতটুকু কালের নাম, তাহা এস্থলে নিশ্চিত রূপে ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। কারণ শাস্ত্রকারেরা কখন এক দণ্ডকে মুহূর্ত্ত বলিতেছেন, আবার কখন দুই দণ্ডকেও মুহূর্ত্ত বলিতেছেন। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, শ্বাসপথের পরিবর্ত্তন হয় বটে, কিন্তু তাহা যে কত সময় অন্তর তাহা দেখা হয় নাই। পরন্তু একটি রন্ধ্র যে এক বারে নিষ্ক্রিয় থাকে, এরূপ অনুভব হয় না, তবে এক ছিদ্রে যখন শ্বাস ক্রিয়ার আধিক্য থাকে, তৎকালে অন্য ছিদ্রে তৎক্রিয়ার বিশেষ ন্যূনতা থাকে বটে। বস্তুতঃ শাস্ত্রকারেরা ঐ আধিক্য অনুসারে একটি রন্ধ্র থাকে অন্যটি ক্রিয়াবান্ থাকে এইরূপ বলিয়াছেন সংশয় নাই।

অভ্যাসের মহিমা আশ্চর্য্য! যাঁহারা গুরুর নিকট উহার কৌশল শিক্ষা করিয়া অভ্যাস করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় প্রাণগতি দ্বারা কাল নির্ণয় করিলে অধিক ব্যতিক্রম হয় না।

প্রাচীন কালের কথিত সিদ্ধান্ত অনুসারে ইংরাজী ২৪ ঘণ্টায় যদি ২১৬০০ বার প্রাণ ক্রিয়া হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক ঘণ্টায় ৯০০ বার হইবে। বাঙ্গালা সার্দ্ধদ্বিতয় (২॥০) দণ্ডে ইংরাজী এক ঘণ্টা। সুতরাং উহাকে ২॥০ ভাগ করিয়া বাঙ্গালা এক দণ্ডে ও ইংরাজী ২৪ মিনিটের মধ্যে স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস ৩৬০ বার হয় বলিতে হইবে। তন্মধ্যে ১৮০ পতন এবং ১৮০ বার উৎপতন। "৩৬০" ইহাকে ২৪ ভাগ করিয়া লইলে ইংরাজি প্রত্যেক মিনিটে সুস্থ অবস্থাপন্ন মনুষ্যের শ্বাসোচ্ছাস ১৫ বার হয়। ৮ বার পতন ও ৭ বার উৎপতন। অথবা ৭ বার পতন আর ৮ বার উৎপতন। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ইচ্ছা হইলে পাঠকগণও পরীক্ষা করিতে পারেন যে, একটি মিনিটে উক্ত সংখ্যাধিক শ্বাসোচ্ছাস সমাধা হয় না। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, ২।৩ সেকেণ্ডের অতিরিক্ত ব্যতিক্রম হয় নাই।

প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণের এতদ্রূপ অনুসন্ধান ছিল। তাঁহাদের এতাদৃশ সন্ধিৎসা ছিল বলিয়া তাঁহাদের পরবর্ত্তী পুত্র পৌত্রগণ সমধিক উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে কএক প্রকার প্রাচীন কাল নির্ণয়ের প্রথা বর্ণন করা হইল, তদতিরিক্ত আরও দুই চারিটি আছে। যথা—রক্ত সঞ্চলন বা নাড়ীর গতি, নাক্ষত্রিক উদয়াস্ত ইত্যাদি সমস্ত প্রায় এই রূপ, সুতরাং তাহা আর বিস্তার করিলাম না। এক্ষণে মধ্যকালে কাল নির্ণয় প্রথা, যাহাতে শিল্পসংযোগ আছে, তাহাই বিশদ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সে সকল বিশদ করিতে হইলে ভারতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আবির্ভাব নির্ণয় করিতে হয়। এজন্য আপাততঃ এই স্থানেই প্রস্তাব শেষ করিলাম, ভবিষ্যতে "ভারতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের আবির্ভাব" সংক্ষেপে নির্ণয় করিয়া কালজ্ঞান সাধন শিল্প গুলি ব্যক্ত করিব।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বিরচিত—সৃষ্টি।

(২) শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ বিরচিত—সাংখ্য দর্শন।

চতুর্থ সংখ্যা পত্রিকার ১৫৪ পৃষ্ঠার পর।

এতাবৎ কাল প্রকৃত প্রস্তাবের কিপর্য্যন্ত মীমাংসা হইল, অগ্রে তাহার একটি চুম্বক প্রদর্শন করি; তাহার পর অবরোহ-প্রণালীতে রীতিমত হস্তক্ষেপ করিব। প্রথম, আরোহ-প্রণালী অনুসারে স্থূল ভূত-সজ্ঘাত হইতে সূক্ষ্ম ভূতে উপনীত হইলাম; দ্বিতীয়, তাহাই যে চরম সূক্ষ্ম এমন নহে—সূক্ষ্মেরও সূক্ষ্ম আছে এইরূপ স্থির করিলাম।

কেননা ভৌতিক পদার্থ সহস্র-সূক্ষ্ম হইলেও তাহা আপেক্ষিক, তাহার এক পরমাণু আর এক পরমাণুকে অপেক্ষা করে, এবং উভয়ই সূক্ষ্মতর মধ্যস্থ-বিশেষকে অপেক্ষা করে। একটি মধ্যস্থ-পদার্থকে আমরা জানি যে, তাহা সূর্য্য হইতে প্রসারিত হইয়া, বায়ুরাশি ভেদ করিয়া, পৃথিবীর জলস্থল ভেদ করিয়া তিষ্ঠিতেছে ;—কে ? না যে-পদার্থের কম্পন-দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ে আলোক-বোধের উৎপত্তি হয়। আলোক-জনন সেই সূক্ষ্ম পদার্থে—সেই সূক্ষ্ম সূত্রে—সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র সকলই গ্রথিত রহিয়াছে। ভারাকর্ষণই হউক, যোগাকর্ষণই হউক, চুম্বকাকর্ষণই হউক, সকলই ঐরূপ কোন না কোন সূক্ষ্ম মধ্যস্থ-পদার্থকে অপেক্ষা করে। কেন-না আকর্ষণাধীন দুই দুই বস্তুর মধ্যে তৃতীয় কোন সূক্ষ্ম বস্তু না থাকিলে উক্ত বস্তু-দ্বয়ের একটি হইতে অন্যটিতে আকর্ষণ-ক্রিয়া প্রবাহিত হইতে পারে না। এ বিষয়টি বেদান্তবাগীশ মহাশয় তাঁহার সাংখ্য দর্শনে অতি সুন্দররূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন। পাঠকের উপকারার্থে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করি। "বল দেখি শক্তি-পদার্থটি কি ? স্বতন্ত্র ? কি কাহারও অনুগত ? বিচার করিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, শক্তি, রূপ-প্রভৃতির ন্যায় সেই সেই বস্তুর অধীন, অর্থাৎ গুণ-পদার্থ। গুণ, কোন ক্রমেই আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সঙ্গত হয় না সুতরাং শক্তিও আশ্রয়-চ্যুত হইয়া দূরে প্রস্থিত হয় না। বিশেষতঃ দ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থে* ক্রিয়া জন্মে না। ক্রিয়া না জন্মিলেও বস্তুর চলন হয় না। যদি শক্তি-ক্ষেত্রে ক্রিয়া বা চলন না হয়, তবে সে দূরস্থ পদার্থের সহিত কিরূপে সংযুক্ত হইবে ? মনে কর, অগ্নির দাহিকা-শক্তি আছে জলের শৈত্য-গুণ আছে পুষ্পের সৌরভ আছে। কিন্তু দাহিকা শক্তি, শৈত্য গুণ, সৌরভ, ইহারা কি অগ্নি জল ও পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া যায় ? কখনই না। তবে যে আমরা দূর হইতে তাপ বা স্ফুলিঙ্গ, শৈত্য বা সৌরভ আসিতে দেখি, তাহা কেবল গুণ বা শক্তি নহে, সকলই আপন আপন আশ্রয়-দ্রব্যের পরমাণু-সহযোগেই আইসে।" উপরে যাহা উদ্ধৃত করা হইল তাহার কিয়দংশ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু তাহাতে প্রমাণের কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মে নাই। তাপ গুণ কেবল অগ্নিতে আছে জলেতে নাই এ কথা ঠিক নহে—কিন্তু তাহাতে আইসে যায় না। শূন্যকে আশ্রয় করিয়া কোন ক্রিয়া চলিতে পারে না, এটি যথার্থ কথা। বায়ু-পদার্থ অগ্নি পদার্থ হইতে (অর্থাৎ উত্তপ্ত এবং জ্বলন্ত বস্তু যাহা কিছু তাহা হইতে) ভিন্ন বটে কিন্তু এত ভিন্ন নয় যে, অগ্নির তাপ-গুণ বায়ুতে সংক্রমিত হইতে পারে না। চাই মানো যে, বায়ু অগ্নি জল স্থল সমুদায়ের ভিতর দিয়া তাপ-বাহক কোন একটি সূক্ষ্ম মধ্যস্থ বস্তু

* চলিত ভাষায় আমরা কেবল দ্রব্যকেই পদার্থ বলিয়া থাকি, কিন্তু নৈয়ায়িক ভাষায় দ্রব্য গুণ ক্রিয়া প্রভৃতির প্রত্যেকেই পদার্থ; এমন কি অভাবকেও পদার্থের মধ্যে ধরা হইয়াছে।

বিতত রহিয়াছে; চাই মানো যে, জল-স্থল বায়ু পরস্পর এরূপ ছোঁয়াছুঁয়ি করিয়া আছে যে, একের উত্তাপ অপরে-সংক্রমিত হইতে পারে—যাহাই মানো না কেন—ইহা সুনিশ্চিত যে,শূন্য আশ্রয় করিয়া গতি, ক্রিয়া, শক্তি, গুণ, ইহার কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব আকর্ষণাধীন বস্তুদ্বয়ের মধ্যে আকর্ষণ-ক্রিয়ার একটা সঞ্চার-ভূমি বর্ত্তমান থাকা চাই, সূক্ষ্ম মধ্যস্থ একটি বর্ত্তমান থাকা চাই; আবার সেই সূক্ষ্ম-মধ্যস্থটি যদি ভৌতিক পদার্থ হয়, তবে তাহারও পরমাণুগণের মধ্যে আকর্ষণ রহিয়াছে মানিতে হয়; সুতরাং সেই আকর্ষণ-ক্রিয়া-বাহক সূক্ষ্মতর মধ্যস্থ-একটি তাহারও মূলে বর্ত্তমান থাকা চাই।

সকল ভৌতিক বস্তুই ছিদ্রালু (porous); পরমাণু-গণ পরস্পর ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া আছে সত্য, কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ি করিয়া নাই; তাহাদের মধ্যে একটু না একটু ব্যবধান আছেই আছে। বল-পূর্ব্বক সেই ব্যবধান কমাইতে গেলেই বিক্ষেপ-শক্তি তাহার প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং ভৌতিক-বস্তুর ছিদ্র-সকল আকর্ষণ এবং বিক্ষেপ-শক্তির বাহক কোন না কোন সূক্ষ্ম মধ্যস্থ দ্বারা পরিপূরিত, ইহাতে আর ভুল নাই। এবং সেই সূক্ষ্ম বস্তুর ছিদ্র-সকলও সূক্ষ্মতর বস্তু দ্বারা পরিপূরিত। মনে কর যেন ঐরূপ করিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোন এক উচ্চ সোপানে উপনীত হইয়াছ; কিন্তু তাহা যদি ভৌতিক বস্তু হয়, তবে তাহার এক পরমাণু আর এক পরমাণুকে অপেক্ষা করে এবং উভয়ই মধ্যস্থ বিশেষকে অপেক্ষা করে;—ইহার উপরে যখন কোন কথা নাই তখন সে বস্তুকেও আপেক্ষিক বলিয়া মানিতে হইতেছে। কিন্তু যদি কোন বস্তুকে এত সূক্ষ্ম মনে কর যে, তাহার ছিদ্র নাই, পরমাণু নাই, আবরণ নাই, তবে তাহা আর ভৌতিক বস্তু রহিল না, তাহা আপেক্ষিক বস্তুও রহিল না, তাহা অখণ্ড এবং স্বয়ং-সিদ্ধ। আপেক্ষিক বস্তু স্বতঃ থাকিতে পারে না, নিরালম্ব বস্তুর আশ্রয়ে তাহাকে থাকিতেই হইবে। যাহা নিরালম্ব তাহার অংশ ছিদ্র বা আবরণ কিছুই থাকিতে পারে না। কেননা যাহার অংশ আছে তাহা যোজক বস্তুকে অপেক্ষা করে; যাহার আবরণ আছে তাহা আবরণ-কারী বস্তুকে অপেক্ষা করে; যাহার ছিদ্র আছে তাহা ব্যবধান-কারী বস্তুকে অপেক্ষা করে। দ্বিতীয় কোন কিছুকেই অপেক্ষা করে না যে, তাহাকেই আমরা নিরালম্ব বলি; সুতরাং তাহা নিরংশ অনুপহিত এবং নীরন্ধ্র। অতএব ইহা স্থির হইল যে ভৌতিক জগৎ, অংশ আবরণ এবং ছিদ্র-বিহীন এক নিরালম্ব বস্তুকে আশ্রয় করিয়া স্থিতি করিতেছে। জীবাত্মাও অখণ্ড অর্থাৎ নিরংশ কিন্তু তাহার আবরণ আছে—সীমা আছে—তাহা আপেক্ষিক সত্য—এটি যেন মনে থাকে। অনুপহিত অখণ্ড বস্তু এবং আপেক্ষিক বস্তু উভয়ের মধ্যে যে কি প্রভেদ তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি; তাহা এই,—আপেক্ষিক বস্তুতে সত্যও আছে সত্যের অভাবও আছে, অনুপহিত অখণ্ড বস্তুতে সত্যই কেবল আছে

সত্যের অভাব অণুমাত্রও নাই; অনুপহিত অখণ্ড বস্তুতে কোন প্রকার অভাবাত্মক উপাধি মূলেই বর্ত্তিতে পারে না, সে বস্তু পরিপূর্ণ সত্য। দেহাদি-উপহিত অখণ্ড বস্তু যে জীবাত্মা, তিনি জড় অপেক্ষা সত্য-পূর্ণ; নিরালম্ব অখণ্ড-বস্তু, জীবাত্মা অপেক্ষাও অসীম গুণে সত্য-পূর্ণ ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি; এই জন্য তিনি আত্মারও আত্মা পরমাত্মা শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন। জড় বস্তু অপেক্ষা আত্মার সহিত তাঁহার অধিক সাদৃশ্য-বোধে আমরা তাঁহাকে বস্তু না বলিয়া—বলি তিনি পূর্ণ পুরুষ। কেননা পুরুষ শব্দে কেবল যে বস্তু বুঝায় এমন নহে, কিন্তু জড় অপেক্ষা দ্বিগুণ সত্যশালী, সুতরাং পূর্ণতার নিকটবর্ত্তী, উচ্চ মূল্যের বস্তু বুঝায়—আত্মা বুঝায়।

পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত এই পর্য্যন্ত; এক্ষণে অবরোহ-প্রণালী দোহন করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং প্রকরণ যৎকিঞ্চিৎ যাহা আমাদের বোধ-গম্য হয় তাহাই প্রদর্শন করি।

কম্‌টি বলেন আপেক্ষিক লইয়াই যাহা কিছু আমাদের প্রয়োজন, তাহার ও-দিকে আর কিছু থাকে থাকুক, না থাকে না থাকুক, তাহাতে আমাদের কিছুমাত্র ইষ্টাপত্তি নাই। স্পেন্সর বলেন যে, আপেক্ষিক সত্যের মূলে অসীম নিরালম্ব সত্য, আছে, ইহা সুনিশ্চিত, কিন্তু তাহা আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহে। স্পেন্‌সরের উপর আর একটু অধিক আমরা এই বলিতে চাই যে, অসীম সত্য আমাদের জ্ঞানের আয়ত্তাধীন নহেন তথাপি আমরা যেমন তাঁহার অস্তিত্ব ধ্রুবরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, তেমনি আমরা আর একটি বিষয়েরও সন্ধান পাইতে পারি;—কি? না আত্মা হইতে জড়ের দিক্ অসীম সত্যের দিক্ নহে, পরন্তু তাহার বিপরীত দিক যে, জড় হইতে আত্মার দিক্, তাহাই অসীম সত্যের দিক্। আমরা গম্য স্থানের অন্ত না পাই—দিক্ নির্ণয় করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইতে পারি। আরোহ অবরোহ যেমন দুই প্রণালী, জড় হইতে আত্মা এবং আত্মা হইতে জড় তেমনি দুই দিক্। পূর্ব্বোক্ত দিক্‌ই অসীম সত্যের দিক্। ইহার প্রমাণ যাহা বারান্তরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এই রূপ স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, আপেক্ষিক সত্য যত কিছু তাবতের মূলে এক অদ্বিতীয় অখণ্ড পরিপূর্ণ অসীম নিরবলম্ব জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা বর্ত্তমান। পরমাত্মার সহিত জগৎসৃষ্টির কিরূপ সম্বন্ধ তাহাই এক্ষণে নিরূপণ করা যাইতেছে।

আরোহ-প্রণালী অনুসরণ করিয়া যত ঊর্দ্ধে উঠা যায় ততই জগতের আদিম অবস্থার ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়। সে ভাব ভেদ-রাহিত্য। জলে স্থলে বায়ুতে অগ্নিতে যে প্রভেদ তাহা আধুনিক। জগতের প্রথমাবস্থায় সর্ব্বত্রই একাকার ভাব ছিল। সেরূপ একাকার ভাব সৃষ্টি-অভিব্যক্তির পূর্ব্ব-ভাব; কেননা ভিন্নতা না থাকিলে বিশেষ কোন কিছুর অভিব্যক্তি হইতে পারে না। শ্বেত বর্ণ কাগজে ভিন্ন-বর্ণের

অঙ্কুরই ফুটে, শ্বেত বর্ণের অঙ্কুর ফুটে না। অভিব্যক্তির পক্ষে ভিন্নতাও যেমন চাই সমতাও তেমনি চাই। যদি সমান কালো বর্ণ বা অন্য কোন বর্ণ এক ঠাঁই জোড়া-গাঁথা না হয় তাহা হইলেও তাহার অভিব্যক্তি সম্ভবে না। শ্বেতবর্ণ হইতে, ভিন্ন কেবল নয় কিন্তু, সমভিন্ন (অর্থাৎ সমান মাত্রায় ভিন্ন) বর্ণ-নিচয়ের সমষ্টি ব্যতিরেকে, শ্বেত নয় এমন কোনও বর্ণের অভিব্যক্তি সম্ভবে না। ক—খ এই রেখা যদি আত্যন্তিক ক্ষুদ্র হয় তবে তাহা প্রকাশ পাইতে পারে না। সম কৃষ্ণবর্ণ কিয়দংশ স্থানে পুঞ্জ ভূত না হইলে কৃষ্ণবর্ণ ক—খ রেখা ব্যক্ত হইতে পারে না। সঙ্গীতের সা রে গা মা কাহারো অবিদিত নাই;—কতক মাত্রা সময় ব্যাপিয়া সা উচ্চারণ করিলে তবে তাহা স্বর-বিশেষ বলিয়া প্রকাশ পায়। পূর্ব্বে যেরূপ শব্দ শ্রুত হইতেছিল অথবা নিঃশব্দতা অনুভূত হইতেছিল তাহা হইতে সমভিন্ন (সমান মাত্রায় ভিন্ন) স্বর বিশেষের সমষ্টি হইতে (যথা সা আ আ আ ইহার সমষ্টি হইতে) সা এই স্বর উৎপন্ন হয়। অতএব বিশেষ কোন কিছুর প্রকাশের জন্য প্রথম চাই ভিন্নতা, পরে চাই সমান-মাত্রায় ভিন্ন অনেকের সমতা, পরে চাই সেই সমভিন্ন অনেকের সমষ্টি। এই তিনটি না হইলেই নয়।

সর্ব্বাদিম অব্যক্ত একাকার ভাব—সৃষ্টির পূর্ব্ব ভাব—কিরূপ? প্রকাশ পাইতেছে এ ভাব নহে—ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভবিষ্যতে প্রকাশ পাইতে পারে এই ভাবই জগৎসৃষ্টির পূর্ব্ব ভাব। অত জটিলতায় কাজ কি—শুদ্ধ কেবল দিক্ উলটাইলেই পাওয়া যায় যে, আপেক্ষিক সত্যের সম্বন্ধে মূল সত্য যখন অদ্বৈত পূর্ণ এবং নিরবলম্ব স্বতন্ত্র, তখন তাঁহার সম্বন্ধে জগৎ বহুধা বিচিত্র অপূর্ণ এবং আশ্রিত হইবেই ত।

যে বিষয় যত গভীর যত উৎকৃষ্ট তাহার আবির্ভাব ততই কাল সাপেক্ষ। জগৎ যেরূপ অতলস্পর্শ "গভীর রচনা", তাহার প্রকাশও সেইরূপ অনন্ত-কাল ব্যাপী। কবি যদি অন্তঃকরণের সকল ভাব এককালেই প্রকাশ করিতে যান, তাহা হইলে সে ভাব ভাব মাত্রই রহিয়া যায়, আবির্ভাবের সম্ভাবনা থাকে না। কবি আপনার মনের ভাব আপাততঃ অপ্রকাশ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিলে তবেই তাহা কাব্যরূপে আবির্ভূত হয়। প্রকাশ হইয়াছে, অপ্রকাশ রহিয়াছে, এবং অপ্রকাশের মধ্য হইতে প্রকাশ হইবার উপক্রম হইতেছে, এই তিন অবস্থার উপর ভর করিয়া সমুদায় প্রকৃতি গম্যপথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দেখিয়াই বোধ হয় সাংখ্যদর্শন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, জগতের মূল উপাদান তিনটি মাত্র—একটি প্রকাশক, আর একটি প্রকাশের বাধাজনক, আর একটি চালক। প্রকাশক যেটি তাহার নাম সত্ত্ব গুণ, বাধক যেটি তাহার নাম তমোগুণ, চালক যেটি (অর্থাৎ প্রকাশ হইতে অপ্রকাশে এবং অপ্রকাশ হইতে প্রকাশে লইয়া যায় যেটি) তাহার নাম রজোগুণ।

আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, সাংখ্য

দর্শন চলিত-অর্থেই গুণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে; গুণ-শব্দে আত্মার বন্ধন বুঝিতে হইবে ইহাই সাংখ্যদর্শনের অভিমত। প্রকাশ-ধর্ম্মী চলত্ব-ধর্ম্মী এবং আবরণ-ধর্ম্মী বস্তুত্রয়ই গুণত্রয়-বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ঐ মূল-বস্তু-তিনটির সম্যাবস্থাই প্রকৃতি। বৈবম্যাবস্থাই জগৎ।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, প্রত্যেক আলোকচ্ছটা সাতটি উপছটার সাম্যাবস্থা। সেই সাতটির মধ্যে তিনটি বিশুদ্ধ, তদ্ব্যতীত আর যে চারিটি তাহাদের প্রত্যেকে উক্ত তিনটির ভিতরকার কোন একটির সহিত অপর কোনটির সম্মিশ্র-বিশেষ। অতএব, সূক্ষ্ম ধরিতে গেলে এই রূপ দাঁড়ায় যে, প্রত্যেক আলোকছটা ঐ বিশুদ্ধ উপছটা-তিনটির সাম্যাবস্থা। তিনটির মধ্যে একটি রক্ত বর্ণ, একটি পীতবর্ণ, অপরটি নীলবর্ণ। পীতবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ মধ্য বিধ উজ্জ্বল, নীলবর্ণ অনুজ্জ্বল।

পীতবর্ণকে মনে কর সত্ত্বগুণ, রক্তবর্ণকে রজোগুণ, নীলবর্ণকে তমোগুণ।

ন্যূনাধিক মাত্রায় তিন মূল বর্ণের সম্মিশ্র হইতে আর আর সমুদায় বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিজাত বস্তু সকলকে মনে কর যেন সেই মিশ্রবর্ণ। প্রকৃতিজাত বস্তু মাত্রই ন্যূনাধিক পরিমাণে সত্ত্ব রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণের সম্মিশ্র। সাংখ্যদর্শনের নিরীশ্বরতা বাদ দিয়া তাঁহার উপরিউক্ত মত যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে এই রূপ দাঁড়ায় যে সৃষ্টির পূর্ব্বে বহুল-বিচিত্র মিশ্র বস্তু সমুদায়, কিম্বা তাহাদের মূল-গত সত্ব রজঃ তমঃ এই আদি-বস্তু-তিনটি, সাম্যাবস্থায় অবস্থিত ছিল—মূল-প্রকৃতি রূপে ঈশ্বরের শক্তিতে তন্ময়ীভূত ছিল—তাহাদের বহুত্ব একত্বে কেন্দ্রীভূত ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় প্রকৃতি ত্রিগুণ-সাম্য হইতে ত্রিগুণ-বৈষম্যে পরিণত হইয়া —অব্যক্ত ছিল ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হইল।

আলোকের উপমা এখনো শেষ হয় নাই। আলোকের উপছটা-তিনটির মধ্যে পীতবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, রক্তবর্ণ মধ্যবিধ উজ্জ্বল, এবং নীলবর্ণ অনুজ্জ্বল। ইহার ভাষান্তর এই যে, মূল যে উজ্জ্বল আলোকছটা—পীতবর্ণে তাহার সাদৃশ্য, রক্তবর্ণে তাহার অপভ্রংশ এবং নীলবর্ণে তাহার বৈপরীত্য লক্ষিত হইয়া থাকে। এ যেমন —তেমনি বলা যাইতে পারে যে, সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের সদৃশ-আবির্ভাব, রজোগুণ কলুষিত আবির্ভাব, তমোগুণ বিসদৃশ আবির্ভাব। অতএব ঈশ্বরের নিকট-সাদৃশ্য দূর-সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যই গুণ-ত্রয়-ভেদের পরিমাপক। তাৎপর্য্য এই যে, ঐশ্বরিক ভাবের প্রকাশক, বাধক, এবং সংক্রামক তিন প্রকার বস্তুই জগতে আছে। ইহার কারণ এই যে ভিন্নতা না থাকিলে কোন কিছুর অভিব্যক্তি সম্ভবে না। ঈশ্বর যদি সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ হন, তবে তিনি ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পায় না। ঈশ্বরের সে স্বপ্রকাশ ভাব ত আছেই, তদ্ভিন্ন আর একটি যে প্রকাশ—জগৎ-প্রকাশ—তাহাও তাঁহারই প্রকাশ, কিন্তু তাহা বাধা-যুক্ত প্রকাশ;—

তাহা তাঁহার স্বরূপভাব নহে তাহা আবির্ভাব, কেননা তাহাতে তাঁহার প্রকাশও আছে, প্রকাশের বাধাও আছে। সুতরাং প্রকাশক, বাধক এবং দুয়ের মধ্যস্থ এই তিনের সংঘাত ভিন্ন জগতের অভিব্যক্তি সম্ভবে না।

আমরা দেশ কালের তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে তৎসংক্রান্ত নানা প্রকার বিভিন্নতা দেখিতে পাই। প্রথম, দেশ হইতে কালের বিভিন্নতা; দ্বিতীয়, অসীম দেশ-কাল হইতে সসীম দেশ-কালের বিভিন্নতা; তৃতীয়, দেশকাল হইতে দেশকালান্তরের বিভিন্নতা; চতুর্থ, বর্ত্তমান-কাল হইতে ভূত-ভবিষ্যতের বিভিন্নতা; পঞ্চম, দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং বেধের বিভিন্নতা। সৃষ্টি আলোচনার সময়—দেশ কালের অতীত পরমাত্মার সহিত দেশকালের অন্তঃপাতী জগতের সম্বন্ধ আলোচনার সময়—তিনটি মাত্র মূল বিভিন্নতা সাংখ্যকারের মনে হইয়াছিল। কি? না ত্রিগুণের পরস্পর বিভিন্নতা, ত্রিগুণ-সাম্য হইতে ত্রিগুণ-বৈষম্যের বিভিন্নতা, এবং আত্মা হইতে ত্রিগুণের বিভিন্নতা। সাংখ্য-দর্শন ঈশ্বর-বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই, দুই একটি কথা যাহা বলিয়াছেন তাহা না বলারই মধ্যে। ঈশ্বরের সহিত ত্রিগুণের ভিন্নতা কিরূপ এবিষয়ে নিরীশ্বর সাংখ্য কিছুই বলেন নাই বটে কিন্তু সেশ্বর সাংখ্য পাতঞ্জল তাহা বলিতে ত্রুটি করেন নাই। পাতঞ্জল বলিয়াছেন "ক্লেশ কর্ম্মবিপাকাশয়ৈর্ অপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" অবিদ্যা-মূলক যে ক্লেশ এবং কর্ম্মফল-পরিপাকের আধার যে সংস্কারাত্মক বাসনা-সমূহ তাহা হইতে নির্লিপ্ত পুরুষ-বিশেষই ঈশ্বর। সাংখ্য মতে আত্মামাত্রই নির্গুণ কিন্তু ত্রিগুণের সংসর্গদোষে জীবাত্মা নির্গুণ হইয়াও সগুণ; সাধন-বিশেষ-দ্বারা ত্রিগুণের সঙ্গ-ত্যাগ করিতে পারিলেই তবে তিনি আপনার স্বরূপ লাভ করেন—নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ করেন—আপনি যাহা তাহাই হন, যতক্ষণ তাহা না হ'ন ততক্ষণ আপনি যাহা নহেন তাহাই আপনাকে মনে করেন—সুখদুঃখ মোহ-পাশে বদ্ধ মনে করেন; —এই রূপ বন্ধন-সংস্কারই জীবাত্মার বন্ধন, এবং তাহা হইতে মুক্তিই জীবাত্মার মুক্তি—সাংখ্যের এই প্রকার মত। কি উপায়ে জীব মুক্তিলাভ করেন? না সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ সাধন দ্বারা। (পাতঞ্জল বলেন) কিন্তু ঈশ্বরেতে নিত্য কালই সত্ত্ব-গুণের উৎকর্ষ রহিয়াছে—তাহাতে সাধনের অপেক্ষা নাই; "তস্য চ তথাবিধম্ ঐশ্বর্য্যম্ অনাদেঃ সত্ত্বোৎকর্ষাৎ।"

ঈশ্বর-সম্বন্ধে পাতঞ্জলের মনোগত অভিপ্রায় এইরূপ; সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ জীবাত্মাকেই বন্ধন করিতে পারে; পরমাত্মাকে নহে। কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, পরমাত্মাতে যদি সত্ত্বগুণ (প্রকাশক বস্তু) না থাকে তবে "তিনি স্বপ্রকাশ" এ কথা কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, সত্ত্বগুণ পরমাত্মাকে প্রকাশ করিবে কি—পরমাত্মার প্রকাশ দ্বারাই সত্ত্বগুণ অনুপ্রকাশিত হইতেছে—সত্ত্বগুণ পরমাত্মার প্রকাশের অনুপ্রকাশ মাত্র। যে-প্রকাশ

বিরোধী বস্তু দ্বারা বাধা পাইতে পারে তাহাই সত্ত্বগুণের প্রকাশ। দৈর্ঘ প্রস্থ বেধের ন্যায় সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ পরস্পরাপেক্ষ অর্থাৎ বস্তু বিশেষে দৈর্ঘ-প্রস্থ-বেধের যেমন ন্যূনাধিক্য দেখা যায় তেমনি বস্তু-বিশেষে গুণ-তিনটির ন্যূনাধিক্য হইতে পারে, কিন্তু কোন একটি গুণ মূলেই নাই এরূপ হইতে পারে না। এক খণ্ড স্বর্ণকে যদি দৈর্ঘে বাড়াও, তবে তাহার প্রস্থ এবং বেধ কমিয়া যাইবে; প্রস্থে বাড়াও, দৈর্ঘ এবং বেধ কমিয়া যাইবে; বেধে বাড়াও, দৈর্ঘ এবং প্রস্থ কমিয়া যাইবে; কিন্তু সহস্র কমিলেও তিনের কোনটি আদবেই নাই এরূপ হইতে পারিবে না। এই কাগজটির বেধ এত অল্প যে তাহা মনে ধারণা করাই সুকঠিন, কিন্তু তাহা আছে-যে তাহাতে আর সংশয় নাই। যেমন দৈর্ঘ-বেধ-বিহীন প্রস্থ থাকিতে পারে না, প্রস্থ-বেধ-বিহীন দৈর্ঘ থাকিতে পারে না, দৈর্ঘ-প্রস্থ-বিহীন বেধ থাকিতে পারে না, সেইরূপ কোন বস্তুতে সত্ত্বরজো-বিহীন তমঃ, অথবা তমোরজোবিহীন সত্ত্ব, অথবা সত্ত্ব-তমো-বিহীন রজঃ একাকী থাকিতে পারে না। সত্ত্ব-রজস্তমো-গুণ এইরূপ আপেক্ষিক। কিন্তু ঈশ্বরের যে স্বপ্রকাশ মহিমা তাহা প্রাকৃতিক সত্ত্ব-গুণের ন্যায় আপেক্ষিক নহে, তাহা বাধা-গ্রস্ত নহে; এ জন্য যদি ইচ্ছা কর তবে তাহাকে শুদ্ধসত্ত্ব বলিতে পার, কেবল এইটি মনে রাখিও যে, তাহা সত্ত্বরজস্তমোগুণের ভিতরকার বাধা-যুক্ত সত্ত্বগুণ নহে, প্রকৃতির ভিতরকার সত্ত্বগুণ নহে, রজস্তমোহপেক্ষ সত্ত্বগুণ নহে—অর্থাৎ তাহাকে সত্ত্বগুণ না বলিলেই ভাল হয়। কেননা যাঁহার প্রকাশের্তে করিয়া সত্ত্বগুণ অনুপ্রকাশিত হয়, তাঁহাকে সত্ত্বগুণ বলিলে ভ্রমোৎপত্তির একটি পথ খুলিয়া রাখা হয়। পাতঞ্জল যে বলিয়াছেন ঈশ্বরেতে সত্ত্বগুণ ঐকান্তিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, তাহার অর্থ এই যে, তাহা রজস্তমো কর্তৃক কিছুমাত্র বাধা-গ্রস্ত নহে, সুতরাং তাহা প্রাকৃতিক সত্ত্বগুণ হইতে ভিন্ন। ইতিপূর্ব্বে যাহা একবার বলিয়াছি তাহা আবার বলি; পীতবর্ণ উপছটা যেমন মূল ছটার সদৃশ আবির্ভাব, রক্তবর্ণ কলুষিত আবির্ভাব, নীলবর্ণ বিসদৃশ আবির্ভাব; সেইরূপ সত্ত্ব-গুণ ঐশী শক্তির সদৃশ-আবির্ভাব, রজোগুণ কলুষিত আবির্ভাব, এবং তমোগুণ বিসদৃশ আবির্ভাব। বিভিন্নতা ব্যতিরেকে জগতের অভিব্যক্তি সম্ভবে না; ত্রিগুণের বিভিন্নতাই আর আর সমুদায় বিভিন্নতার মূলে বর্ত্তমান আছে। সত্ত্বগুণ ঈশ্বরের সদৃশ আবির্ভাব হইলেও তাহা আবির্ভাব মাত্র, ছায়া মাত্র—সুতরাং ঈশ্বরের স্বপ্রকাশ মহিমা হইতে তাহা ভিন্ন। পরমাত্মার যে স্বপ্রকাশভাব তাহা ত্রিগুণাতীত।

অতঃপর ত্রিগুণাত্মক জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং ক্রম কিরূপ তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ।

ইংরাজেরা এদেশ জয় করিয়া শতাব্দীর অধিক কাল আমাদের উপর রাজত্ব করিতেছে কিন্তু এদেশীয়দিগের সহিত এখনও তাহাদের সদ্ভাবের কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। ইহা যেমন আক্ষেপের বিষয় তেমনি অনিবার্য্য ঘটনা বলিতে হইবে। আমাদের দেশের যে কোন ব্যক্তি ব্রিটিষ-সিংহকে তাহার নিজ গহ্বরে দর্শন করিয়াছে সেই তাহার মহান্ উদার ভাব দেখিয়া বিমোহিত হয় কিন্তু সেই সিংহ যখন বিদেশে আসিয়া বিচরণ করে তখন তাহার তর্জ্জন-গর্জ্জনকারী বিকট মূর্ত্তি দর্শন করিয়া লোক-সকল শশব্যস্ত হয়। যে ইংরাজ সেই ইংলণ্ডে, সেই ইংরাজ এই ভারতে—তবে তাহার অবস্থান্তর হইবার কারণ কি? শুধু আমরা নই—কিন্তু তাহাদের আপনাদের লোকেরাও এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া অনেক সময় বিস্ময়াপন্ন হয়। এদেশে এক জন ইংরাজ যে সকল ঘটনার মধ্যে নিপতিত হয় তাহা এরূপ বিসদৃশ—যে ইহার মধ্যে পড়িয়া কতক বৎসরের মধ্যেই তাহার প্রকৃত মহৎ ভাব অন্তর্হিত হয়; অথবা তাহাদিগের সমাজ-প্রণালীর এরূপ শাসন যে তাহাতে সে বাধ্য হইয়া সভ্যতার আবরণে তাহার প্রকৃত নীচ ভাব স্বদেশে গোপন করিয়া রাখে, বা প্রকাশ করিবার অবসর পায় না—কিন্তু যখনি সে বিদেশে গিয়া স্বীয় সামাজিক বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই সে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করে—আঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ান নামে এক নূতন জীব হইয়া দাঁড়ায় এবং "এই বিড়াল বনে গেলেই বন বিড়াল হয়" এই প্রবাদটীর সত্যতা প্রকারান্তরে সপ্রমাণ করে।

যে কারণেই হউক, ইংলণ্ডবাসী ইংরাজের স্বভাব এক প্রকার—ভারতীয় ইংরাজের ভাব অন্য প্রকার বলিয়া আমাদের চক্ষে প্রতীয়মান হয়। বিলাতে গিয়া ইংরাজদের সঙ্গে সমানভাবে মিশিলে মেশা যায়। তাহাদের ভোজনালয়ে বসিয়া একত্রে আহারাদি কর—ক্রীড়াকাননে তাহাদের সহিত একত্র আমোদ আহ্লাদ কর—ইংরাজ-পরিবারে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার গৃহিণীগণের সহিত মন খুলিয়া আলাপ কর, সকলি সম্ভবে। কত আদরের সহিত তাহারা তোমাকে গ্রহণ করিবে—সখা বলিয়া তোমার প্রতি হস্ত প্রসারিত করিবে—অভ্যাগত বলিয়া আতিথ্য-সৎকারের ক্রটি করিবে না। যিনি কোন ইংরাজ-পরিবার মধ্যে বাস করিয়া প্রাতঃকালে গৃহিণীর সহাস্য বদনে সুপ্রভাত অভিবাদন ও রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সৌরাত্র অভিবাদনে অভিনন্দিত হইয়াছেন তিনি তাহা কখন বিস্মৃত হইতে পারেন না। ইংরাজ-স্ত্রী হইতে বিদেশীয়গণ যে সেবা শুশ্রূষা পান তাহাতে তাঁহাদের ইংলণ্ড-বাস প্রবাস বলিয়াই বোধ হয় না। ভারতবর্ষীয় মাত্রই সে দেশে সম্মানের

সহিত গৃহীত হয়—ভারতবর্ষীয় ধনাঢ্য ব্যক্তি তথায় যুবরাজ বলিয়া সমাদৃত হন।

ঐ এক ছবি—এদেশে দেখ আর এক চিত্র। সেই ইংরাজদের সহিত এদেশে আলাপ করিতে যাও দেখিবে তাহাদের আর সে ভাব নাই। তাহাদের গৃহদ্বার বন্ধ। হাস্যালাপের পরিবর্ত্তে ভ্রূকুটি। তাহারা আপনাদের দলবল লইয়া যে বূহ বন্ধন করে সাধ্য কি যে, এদেশীয় কোন ব্যক্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে। তাহাদের রাত্রি আমাদের দিন—আমাদের দিন তাহাদের রাত্রি। তাহাদের আমোদ আহ্লাদ স্বতন্ত্র—আমোদ প্রমোদের স্থান স্বতন্ত্র। তাহাদের ক্লবে আমাদের প্রবেশের অধিকার নাই। ইংলণ্ডে গিয়া আমাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি তাহাদের ধনাঢ্য কুলীনদিগের সহিত একাসনে উপবেশন করেন এখানে হয়ত তাঁহারা সামান্য ইংরাজ-সমাজ হইতেও পরিচ্যুত। তাহাদের গার্হস্থ্য-জীবনের সহিত এদেশীয়দিগের কোন সম্পর্ক নাই। আমরা ইংরাজদের যাহা কিছু দেখিতে পাই তাহা কেবল কর্ম্ম ক্ষেত্রে। ইংরাজ বিচারাসনে—আমরা উকীল হইয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। ইংরাজ প্রভুপদে—আমরা দাস হইয়া তাঁহার সেবা করি। ইংরাজ শাসনকর্ত্তা—আমরা যোড়-হস্তে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হই। মুসলমানদের রাজত্ব-কালে হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য ছিল সন্দেহ নাই কিন্তু ক্রমে সে ভাব অনেক শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। মুসলমানদের আচার ব্যবহার হিন্দুদের আচার ব্যবহারে অনেক সৌসাদৃশ্য ছিল। মুসলমান রাজা হিন্দুমন্ত্রীর পরামর্শ লইতে সঙ্কুচিত হইতেন না। হিন্দুবীরকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। যেমন তাঁহাদের পরস্পর মধ্যে দ্বেষাগ্নি প্রজ্বলিত ছিল তেমনি সখ্য বন্ধনেরও নানা উপকরণ বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ইংরাজ ও এদেশীয়দের সম্বন্ধ অন্য প্রকার—তাহাদের পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব বোধ হয় না যে কোন কালে বিদূরিত হইবে।

সে দিন আমার দুইটি মহারাষ্ট্রীয় বন্ধুর মধ্যে এবিষয়ে কথোপকথন হইতেছিল। একজন বলিলেন "ইংরাজেরা আমাদের দেশ সুশাসন করিতেছেন তাহা কি বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারেন? দেখ তাঁহারা না থাকিলে আমাদের কি দুর্দ্দশাই হইত। আমরা পরস্পর পরস্পরের উপর খড়্গাঘাত করিয়া দেশকে রক্তে প্লাবিত করিতাম—যাহার বল তাহারই রাজ্য—অধর্ম্মেরই জয়। রাজবিদ্রোহ, অরাজকতা—প্রজাপীড়ন—ঠগি ডাকাতি এই সকল সাঙ্ঘাতিক অমঙ্গল হইতে ভারতের অধঃপাতে যাইবার উপক্রম হইয়াছিল—ইংরাজ-তরবার ভারতভূমিকে এ সকল বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিয়াছে। ইংরাজদের আগমনে এদেশে সুশৃঙ্খল রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে—দস্যু তস্করের ভয়—বর্গীদিগের অত্যাচার, পিণ্ডারীগণের আক্রমণ ভয় বিদূরিত হইয়াছে। ধন প্রাণ সুরক্ষিত—পরিশ্রম স্বেচ্ছাধীন ও বন্ধন-শূন্য,

সুতরাং প্রত্যেকে আপন আপন শ্রমের ফল নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ করিতেছে। বাণিজ্য-ব্যবসা বিস্তারে দেশের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হই য়াছে। কত জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে—কত মরুভূমি-তুল্যস্থান আবাদ হইয়াছে। লৌহ-পথ ও বাষ্পপোতের দ্বারা চলাচলের সুগম হইয়াছে। প্রবাসস্থ বন্ধুগণের নিকট হইতে পত্রাদি পাইবার কেমন সুযোগ—আকাশের তড়িৎ পর্য্যন্ত একার্য্যে নিযুক্ত। আবার দেখ আমাদিগকে বিদ্যাদানে আমাদের রাজপুরুষের কেমন নিঃস্বার্থ যত্ন। আমাদের চক্ষু ফুটাইলে পাছে তাঁহাদের ভবিষ্যতে কোন হানি হয় ইহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার জন্য কত শত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। ধর্ম্মের উপর, সমাজের রীতি-নীতির উপর তাঁহারা হস্তক্ষেপে বিরত। বুদ্ধি ও চিন্তা-শক্তির উপর কোন শৃঙ্খল নাই। এ রাজ্যে বাস করিয়া মন খুলিয়া আপনাদের সুখ দুঃখ প্রকাশ করিতে পারিতেছি। সর্ব্বসাধারণের হিতজনক রাজ-নিয়ম-প্রভাবে প্রত্যেকে আপন মনের স্ফূর্ত্তিতে স্বচ্ছন্দে ইচ্ছামত কার্য্য করিতে ও জগতের হিতসাধনে নিযুক্ত হইতে পারিতেছে। আর কি চাও? এত উপকার প্রাপ্ত হইয়াও তোমরা ইংরাজ-রাজ্যের বিপক্ষে লেখনী চালনা করিতে ক্ষান্ত নহ? আর ইহাও যে করিতে পার সে কেবল ইংরাজ রাজ্যের অনুগ্রহে, তাঁহারা মনে করিলে মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। অতএব এই সকল উপকার স্মরণ করিয়া আমাদের রাজপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।”

আমার অপর বন্ধু উত্তর করিলেন—“এই সকল যুক্তি আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় না। বিদেশীয় রাজার প্রতি রাজ-ভক্তি উদয় হওয়া সহজ নহে। তবে যদি তাঁহারা স্বদেশীয় রাজার ন্যায় পিতৃ-ভাবে শাসন করেন, তবেই তাহা সম্ভব, নচেৎ নয়। দেখ এই বিদেশীয়দিগের দ্বারা ভারতের যথাসর্ব্বস্ব অপহৃত হইতেছে কি না। বিলাতে এক গবর্ণমেণ্ট—এদেশে এক গবর্ণমেণ্ট—ওদিকে মন্ত্রীদল-পরিবেষ্টিত সেক্রেটরি অফ্‌ ষ্টেট্‌, এদিকে রাজপ্রতিনিধি গবর্ণর-জেনেরল, গবর্ণর, লেফটনেণ্ট গবর্ণর, কমিসনর প্রভৃতি অধিপতিগণ আমাদের দেশ হইতে কত কোটি কোটি টাকা লুটিয়া লইতেছেন। বিদেশীয় সৈন্য-রক্ষার জন্য কত ব্যয় হইতেছে। রাজপুরুষদের ধর্ম্ম-যাজকগণ ‘হীদেন’ প্রজা-নিষ্পীড়িত ধনকোষ হইতে অবাধে অর্থ সংগ্রহ করিতে কিছুই মনে করেন না। কত দিক দিয়া ভারতের রক্ত শোষণ হইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। পিণ্ডারীদের উপদ্রব নাই সত্য বটে কিন্তু প্রজাগণের দারিদ্র্য-নিবন্ধন কষ্ট তেমনি প্রবল। কত প্রকার রাজস্বের সৃষ্টি হই-তেছে তাহার সীমা নাই। আমাদের উপর যে ভূরি ভূরি আইন বর্ষণ হইতেছে তাহাতে আমাদের বাস্তবিক উপকার কি অপকার তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। সর্ব্বত্রই শুনা যায় যে, পূর্ব্বে আমাদের পরস্পর-ব্যবহারে যে সত্য ও সরলতা ছিল তাহা একালে আর

নাই। পূর্ব্বে আমাদের এক কথার যে মূল্য ছিল, এখনকার শত দলিল দস্তাবেজের সে মূল্য নাই। যে প্রদেশে ইংরাজি আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইংরাজি আইন প্রচলিত হইয়াছে সেখানেই কপটতা—কুটিলতা—জাল—মিথ্যাশপথ প্রশ্রয় পাইতেছে। চোর ডাকাতের ভয় নাই সত্য কিন্তু আমরা নিরস্ত্র ও আত্মসংরক্ষণে অসমর্থ হইয়া ক্রমেই বলবীর্য্যহীন নির্জ্জীব হইয়া পড়িতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতাপে আমাদের জাতীয় গৌরব হ্রাস হইতেছে। বিদেশীয় বাণিজ্য ব্যবসা বৃদ্ধি পাইতেছে বটে কিন্তু তাহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমে আমাদের দেশীয় ব্যবসায়ের লোপাপত্তি হইতেছে—কত কত দেশীয় শ্রমোপজীবির অন্ন মারা যাইতেছে। এ সকল সত্ত্বেও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজশাসনে আমাদের দেশের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছে—কিন্তু ইহাও বলিতে হইবে যে সে শাসন ভয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রীতির উপর নহে। আমাদের সঙ্গে ইংরাজদের মমতা নাই। পূর্ব্বপশ্চিমের মধ্যে ভাবের কেমন অমিল। রাজা যখন বিদেশী—জেতৃ-বিজিতের মধ্যে যখন এত বিষয়ে অনৈক্য তখন আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের সম্বন্ধ কেবল স্বার্থ-সম্বন্ধ বলিয়াই প্রতীতি হয়। আমরা বলি ইংরাজেরা আমাদের জন্য যাহা করিতেছেন তাহা হয় দায়ে পড়িয়া নতুবা স্বার্থসাধন উদ্দেশে। তাঁহাদের রাজ্য—রাজ্যের সুশৃঙ্খলা আবশ্যক। তাঁহারা সভ্যজাতি—সভ্যতার অনুরোধে আমাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিতে হইতেছে। এদেশীয় লোকে শিক্ষিত না হইলে রাজকার্য্য চলিবে কি প্রকারে? তথাপি দেখা যাইতেছে তাঁহারা সহজে আমাদিগকে সমান অধিকার প্রদানে সম্মত নহেন। আমাদিগকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সহজে তাঁহারা স্বীকৃত হন না। সিবিল সর্বি‍স সর্ব্ব সাধারণের জন্য মুক্ত কিন্তু সে কেবল নামমাত্র। সিবিল সর্বি‍সে প্রবেশের নিয়মাবলী এরূপ কল-কৌশলে সংরচিত যে এদেশীয়দের জন্য তাহার প্রবেশ-দ্বার অবরুদ্ধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সৈনিক দলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইবার পথ আমাদের সম্বন্ধে একেবারেই রুদ্ধ। এই সকল দেখিয়া আমাদের মধ্যে অনেক কৃতবিদ্যও মনে করেন যে ইংরাজেরা মুখে যাহাই বলুন, তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই যে আমরা প্রভুদাসের সম্বন্ধ যেন কখন বিস্মৃত না হই। তাঁহাদের ইচ্ছা যে আমরা অনাবৃত পদে, গললগ্নীকৃত বস্ত্রে, সেলাম করিতে করিতে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হই। এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, ভয় অপেক্ষা প্রীতির আকর্ষণী শক্তি অধিক। শস্ত্রের বলে ভারতের কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জকে বশে রাখা সহজ নহে। দেশীয় বিদেশীয়দের মধ্যে যাহাতে প্রীতি ও একতা স্থাপিত হয় তাহাই স্থায়ী মঙ্গলের সোপান। আমরা চাই যে ইংরাজেরা আমাদের সহিত ভদ্র ব্যবহার করুন, এদেশীয়দিগকে আপনাদের সঙ্গে সমান অধিকার প্রদান করুন, কৃষ্ণ শ্বেত বর্ণের মধ্যে প্রভেদ যতদূর সাধ্য বিলুপ্ত করুন, এদেশীয়দের উপর কঠোর

বিচ্ছিন্নভাব না রাখিয়া তাঁহাদের সহিত সখ্য ও সমতা বন্ধন করুন, আমরা আর অধিক কিছু প্রার্থনা করি না। তাঁহারা যদি সৎভাবে আমাদের দিকে একপদ অগ্রসর হন, আমরা শতপদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদিগকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত।"

তৎপরে তিনি আমাকে মধ্যস্থ মানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি ত ভাই ইংরাজদের সঙ্গে অনেক মিশিয়াছ, তোমার মনে তাঁহাদের গুণাগুণ কিরূপ দাঁড়াইয়াছে?" আমি উত্তর করিলাম, মানুষ অপূর্ণ জীব—দোষ গুণ সকল-মানুষেরই আছে, ইংরাজদের চরিত্রও এনিয়মের বহির্ভূত নহে, কিন্তু আমার মনে হয় যে তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের এক্ষণকার অপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হইলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। আমি অনেক সময় মনে করিয়া দেখি এদেশীয় ইংরাজদের মধ্যে আমার কেহ বন্ধু আছে কি না? তাঁহাদের সঙ্গে আমি একত্র পান ভোজন করিয়াছি, ক্রীড়ালয়ে একত্রে ক্রীড়া করিয়াছি, কর্ম্ম কাজ-প্রসঙ্গে অনেক সময় মিলিত হইয়াছি, তাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় আমার সর্ব্বদাই হইয়া থাকে কিন্তু কৈ, একজনকে এমন দেখিনা যাহাকে আপনার বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি, সখা বলিয়া যাহার নিকট আপনার মনের দ্বার মুক্ত করিতে পারি। একজন ভদ্র ইংরাজ আমার সম্মুখে হয়ত আমার স্বজাতির নিন্দা করিতে বিরত হইতে পারেন কিন্তু আমার পশ্চাতে কি করেন তাহা জানাই আছে। দেখা হইলে 'ভাল আছেন' বলিয়া অভিবাদন অথবা সময়ে সময়ে ভোজনের নিমন্ত্রণ অথবা ভদ্র রীতি-অনুসারে কথোপকথন ইহা অপেক্ষা অধিক অনুরাগ সঞ্চারের কোন সম্ভাবনা দেখি না। তবে অবশ্য বলিব যে কর্ত্তব্য জ্ঞান ইংরাজ-প্রকৃতির এক অসাধারণ গুণ। কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইংরাজেরা সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত, সকল প্রকার ত্যাগস্বীকার করিতে তৎপর। আমার বন্ধু বলিলেন, "ইংরাজেরা আমাদের সঙ্গে ভাবে মিলিয়া চলিবে ইহা সম্ভবপর নহে। আমাদের আশা অতদূর উঠিতে সাহস করে না। তাহারা যে এদেশীয়দিগকে আপনাদের জাত-ভায়ের সঙ্গে সমান চক্ষে দেখিবে অথবা সমান অধিকার প্রদান করিবে এরূপ আশা দুরাশা মাত্র। আমরা আর অধিক কিছু চাই না, আমরা তাঁহাদের একটুকু ভদ্র ব্যবহারেই সন্তুষ্ট। নিতান্ত 'নিগার' বলিয়া আমারদিগকে ঘৃণা না করেন তাহা হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু ততটুকু দাক্ষিণ্যভাবও দুর্লভ। দুঃখের কথা কি কহিব, সে দিন আমার কন্যার বিবাহোপলক্ষে কলেক্টর সাহেবের নিকট রাস্তা দিয়া বাদ্য বাজাইয়া যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আবশ্যকমত পরওয়ানা দিতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু আমি সমস্ত আয়োজন করিয়া সময়-কালে দেখি যে, সাহেবের অনুতাপ উপস্থিত। তিনি পুলিষ দূত কর্ত্তৃক বলিয়া পাঠাইলেন যে তাঁহার মাডামের শরীর ভাল নাই, টম্‌টম্ বাদ্য তাঁহার বাটীর নিকট দিয়া বাজাইয়া যাইবে ইহা তাঁহার সহ্য হইবে না, অতএব পরও

য়ানা বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। বাদ্যের অভাবে বিবাহের উৎসব ভঙ্গ হইল ও আমার গৃহের স্ত্রীগণের হৃদয়ে কিরূপ আঘাত লাগিল তাহা বুঝিতেই পার। এক মিনিটের জন্য এই বাদ্য তাঁহার মাডামের শ্রুতিকর্কশ বোধ হইবে এই আশঙ্কায় সাহেব আমার সমুদয় কুল-কামিনীকে বিষাদে মগ্ন করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হইলেন না। এইরূপ স্বার্থপরতা দেখিয়া ইংরাজদের প্রতি আমাদের অশ্রদ্ধা হয়। তাঁহারা আমাদের রীতিনীতি এত অল্প জানেন ও সেই অনভিজ্ঞতা-নিবন্ধন সময়ে সময়ে এমত অদ্ভুত নিয়ম জারী করেন যে আমাদের বৃথা মনক্ষোভ জন্মানো ভিন্ন আর কিছুই তাহার উদ্দেশ্য বোধ হয় না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—এক পাদুকা লইয়া মধ্যে মধ্যে কত গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহারা ভদ্র সমাজে গেলে টুপি খুলিয়া যান, আমরা মস্তক আবৃত রাখি কিন্তু তাঁহারা মনে করেন যে বড়লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে অনাবৃত পদে যাওয়া আমাদের ভদ্ররীতি। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া এইক্ষণে তাঁহারা নিয়ম করিয়াছেন যে ইংরাজ-মহলে বুট পরিয়া যাইবার বাধা নাই কিন্তু দেশীয় পাদুকা ব্যবহার নিষিদ্ধ। জান ত পারসীরা কেমন রাজভক্ত, তাহাদের আপনাদের রাজ-ভক্তির কতই গৌরব করে! সে দিন পুনার গবর্ণরের এক দরবারে এক জন সম্ভ্রান্ত পারসী পুরোহিত উপস্থিত হন। গিয়া দেখেন প্রবেশের অনুমতি নাই—অপরাধের মধ্যে তিনি দেশীয় পাদুকা পরিয়া গিয়াছিলেন। দ্বারপাল-কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া তিনি প্রাইবেট সেক্রেটরির নিকট বলিয়া পাঠান। তাহার উত্তর—দেশী জুতা পরিয়া যাইতে গবর্ণর সাহেবের হুকুম নাই!! অনেক কাকুতি মিনতিতে কিছুই ফলোদয় হইল না। একে পারসী, তাহাতে পারসী পুরোহিত, তিনি এ অপমান গ্রাহ্য না করিয়া রাজদ্বারে যাইবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দমনীয় রাজভক্তি কিছুতেই পরাজিত হইবার নহে, কি করেন, অবশেষে তাঁহার এক বন্ধুর নিকট হইতে এক জোড়া ইংরাজী বুট ধার করিয়া গবর্ণর সাহেবকে সেলাম করিয়া আসেন। আমরা ত ইংরাজদের পদানত প্রজা কিন্তু তাঁহারা এদেশীয় রাজা-রাজড়ার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। যোধপুরের রাজাকে রাজদরবার হইতে কিরূপে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল তাহা তোমার মনে থাকিতে পারে। সে দিন এক মহারাষ্ট্র পত্রে আর একটী বিবরণ পাঠ করিলাম তাহা এই ;—সম্প্রতি বোম্বায়ের গবর্ণর সাহেব কোহ্লাপুর পরিদর্শন করিতে যান ও তদুপলক্ষে কোহ্লাপুর মহারাজার প্রাসাদে এক দরবার হয়। মহারাজা ও দরবারে নিমন্ত্রিত সৈনিক ও অন্যান্য ভদ্র লোক আসন গ্রহণ করিলে দক্ষিণ মহারাষ্ট্র-সম্পর্কীয় জনৈক ইংরাজ সৈনিক পুরুষ দরবারে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিবা মাত্র মহারাজা আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে বিনীত ভাবে সেলাম করেন। মহা-

রাজাকে উঠিতে দেখিয়া স্বয়ং গবর্ণর সাহেব ও সভাস্থ সকলে উঠিয়া দাঁড়ান ও মহারাজ সৈনিক কর্ম্মচারীকে বসাইয়া নিজে আসন গ্রহণ করিলে তবে তাঁহারা স্ব স্ব আসনে পুনর্ব্বার উপবিষ্ট হন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া সভাস্থ সকলে ও নিজে গবর্ণর সাহেব পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। গবর্ণর সাহেব এই বিস্ময়জনক ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে মহারাজ উত্তর করিলেন যে, তিনি তাঁহার ইংরাজ গুরুদিগের নিকট হইতে এই উপদেশ পাইয়াছেন যে যখনি কোন ইংরাজ দেখিবে অমনি আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে সেলাম করিবে। ইংরাজদের এইরূপ ব্যব্হারে আমরা চটিয়া যাই। বাস্তবিক ত আমরা চিরদিন পরাধীন পরাজিত জাতি, কিন্তু মৃতের উপর খড়্গাঘাতের প্রয়োজন কি? একটুকু বাহ্য ভদ্রতায় উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। বাস্তবিক তরবারির বলে আমাদের দেশ জিত হইয়াছে কিন্তু তাহা সর্ব্বদা আমাদের চক্ষের সামনে ধরিয়া রাখিবার আবশ্যক কি? বল" অপেক্ষা প্রীতিতে রাজ্যের ভিত্তি নির্ম্মাণ করা অধিক শ্রেয়স্কর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শস্ত্র অপেক্ষা শাস্ত্রের বল অধিক সভ্য জাতিকে একথা বলা বাহুল্য। নূতন নূতন পদবী-বৃষ্টিতে, রাজ-সভার বৃথা আড়ম্বরে, শস্ত্রের বলে, অথবা রাজ-নীতির কৌশলে যাহা না হয়, ইংরাজেরা দেশীয়দের প্রতি একটুকু আন্তরিক সদ্ভাব ও মমতা দেখাইয়া তাহা করিতে পারেন। দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত লোকদিগের কষ্ট নিবারণে সাহায্যদান, অথবা কোন দেশহিতকর কার্য্যে উৎসাহ প্রদান কিম্বা দেশীয় কোন মহাত্মার বিয়োগে শোক প্রকাশ দ্বারা, ভারতের হৃদয়কে ইংরাজ রাজ্যের প্রতি তদপেক্ষা সহস্রগুণে আকৃষ্ট করিতে পারেন। কঠোর লৌহ শৃঙ্খল ক্ষণভঙ্গুর কিন্তু প্রেমের মোহন শৃঙ্খল ভগ্ন হইবার নহে। ইংরাজেরা যদি আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে চান ত আমাদের সঙ্গে সমান ভাবে—আপনার মত ব্যবহার করুন, কৃষ্ণবর্ণের জন্য এক নিয়ম, শ্বেত বর্ণের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম, এ ভাব পরিত্যাগ করুন। আমারা সকলেই সেই এক সাম্রাজ্ঞীর প্রজা, অতএব আমরা সকলে সদ্ভাবে মিলিয়া কার্য্য করিলে রাজ্যের যথার্থ গৌরব রক্ষা হয়।"

ক্রমশঃ।　　　　শ্রীস—

বঙ্গসাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা গতবারে ষ্টুয়ার্ট্‌ মিলের সঙ্গে বিবাদ বিসম্বাদ করিয়া এবার সাহিত্যদর্পণকারের মতটি বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব। সাহিত্য-দর্পণকার বলেন যে "রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য"—এই 'রস' শব্দ ব্যবহারে তিনি ইংরাজ আলঙ্কারিকদের

অপেক্ষা কবিতার প্রকৃতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মিল্ বলেন যে "আমাদের হৃদয়ের ভাবগুলি যে সকল চিন্তা ও বাক্যের আকারে আপনা আপনি প্রকাশ হয় তাহার নামই কবিতা," এবং রবার্ট্সন্ বলেন যে "উচ্ছ্বসিত হৃদয় ভাবের ভাষার নামই কবিতা"—এইরূপ আরও অনেক আলঙ্কারিকদের মত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের লক্ষণের বিশেষ দোষ এই যে ঐ বাক্য বা ভাষাতে পাঠকের বা শ্রোতার মনে অনুরূপ ভাবের উদ্রেক হইল কি না সে বিষয়ে তাঁহাদের ভ্রূক্ষেপ নাই। যে কেহ যে কোন অবস্থায় পড়িয়া কাঁদিলেই যে তাহা শুনিয়া কোন শ্রোতার মনে করুণ রসের আবির্ভাব হইবেই হইবে এমন কোন নিশ্চয় নাই। আমরা দেখিয়াছি যে অনেকে আপনাদের শোক প্রকাশ করিতে গিয়া এমন বাক্য প্রয়োগ করে যে তাহাতে চক্ষে জল না আসিয়া মুখে হাসি আইসে। বিশেষতঃ আদিরসের স্থলে অনেকে অপরের মনে আদিরসের ভাব না আনিয়া বীভৎস রসের উদ্রেক করিয়া দেয়। সুতরাং ভাবোচ্ছ্বাসময় বাক্য হইলেই যে অন্যের হৃদয়ে সেই ভাবের তরঙ্গ উঠিবেই উঠিবে তাহা বলা যুক্তিসিদ্ধ নহে। কিন্তু সেইরূপ তরঙ্গ উঠাইতে না পারিলে ভাবোচ্ছ্বাসময় বাক্য মাত্রকেই কেহ কবিতা বলিতে স্বীকার করিবে না। বাল্মীকিকে আমরা কবি বলি কেন? না তাঁহার ভাবে আমরা উত্তেজিত হইয়া রামের প্রতি আমাদের যেমন শ্রদ্ধাভক্তি হয়, রাবণের প্রতিও আবার তেমনি অশ্রদ্ধা উপস্থিত হয়। মিল্টনকে আমরা কবি বলি কেন? না তাঁহার নরক-প্রদেশ সম্মুখে বিস্তারিত দেখিয়া আমরা ভীত হই, আবার তাঁহার ইদেন-উদ্যানের বর্ণনা পড়িয়া আমরা তেমনি উল্লসিত হই। বোধ হয় এ কথা বলাই বাহুল্য যে পাঠকের হৃদয়তন্ত্র যদি কবির হৃদয়ের সঙ্গে তালে তালে না নিনাদিত হয় তাহা হইলে কবির কবিত্বই আকাশ-কুসুমবৎ অলীক। এই যে লেখকের ও পাঠকের মধ্যে মমতা-ভাবটি, ইহা সাহিত্য-দর্পণকারের 'রস' শব্দেই নিহিত আছে। দ্রাক্ষাফলকে আমরা মিষ্ট বলিয়া থাকি, কেন না আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছি যে উহা মিষ্ট; উহা যদি মিষ্ট না লাগিয়া কটু লাগিত তাহা হইলে দ্রাক্ষাফলকে আমরা কটুই বলিতাম। সত্যবটে যে দেশভেদে কালভেদে রুচিভেদ হয়, এমন কি, শারীরিক অবস্থা-ভেদেও রুচির বৈষম্য ঘটে। ইংলণ্ডের এমন এক সময় গিয়াছে যে সময়ে চিরশিশু শেলীর নামে সকলে কর্ণে হাত দিত—মিল্টনের প্যারাডাইজ্ লষ্ট্ পুস্তকালয়ের নিভৃত প্রদেশে ধূলিধূসরিত থাকিত—এমন কি, জ্বলন্ত সূর্য্যের ন্যায় মহাকবি সেক্স্পিয়ারও পিউরিট্যান্দের হস্তে কিছুকালের জন্য রাহুগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই, প্রকৃতিস্থ ইংলণ্ড এখন মিল্টনের নামে লোমাঞ্চ-কলেবর হয়, অভাগা শেলীর নামে এখন অশ্রুবিসর্জ্জন করে! এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে যদি দেশভেদে কালভেদে এরূপ রস-

অনুভূতির বৈষম্য ঘটে তাহা হইলে কোন্ রচনাটি যে প্রকৃত কবিতা আর কোনটিই বা নয় তাহা নিশ্চয় করিয়া কে বলিতে পারে? কে বলিতে পারে যে, যে সকল রসাত্মক কাব্য আমরা এক্ষনে "কিছুই নয়" বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতেছি—অন্য সময়ে আমরা তাহাকে প্রকৃত কবিতা নামের যোগ্য মনে করিব না; আবার এক্ষণে আমরা যে সকল কাব্যকে বাক্‌দেবীর পদ্মবনের এক একটি প্রকৃত পদ্ম ভাবিয়া অতি সন্তর্পণে হৃদয়ে ধরিতেছি, সময়ে সেই সকল কাব্যকেই আমরা পদ দ্বারা দলিত করিব না? তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাহিত্য-দর্পণকারের কথার সার্থকতা কি? যদি রস-অনুভূতিরই এত বৈলক্ষণ্য ঘটে তাহা হইলে কোন্ নিয়ম দ্বারা আমরা কবিতার প্রকৃতি নিরূপন করিব? পল্লিগ্রামস্থ এক জন বৃদ্ধ বলিবেন যে "দাশরথীর ছড়াগুলিই আমার পক্ষে প্রকৃত রসাত্মকং বাক্যং—মাইকেলের থিটিমিটি আমার ভাল লাগে না"—তখন সাহিত্যদর্পণকার কি উত্তর দিবেন? বাস্তবিক আমরা ন্যায়-শাস্ত্রের কোন অধ্যায় ধরিয়াই তাহাকে বুঝাইতে পারিব না যে, মাইকেল একটি স্বর্গের কুসুম আর দাশরথী মর্ত্তের একটি মানুষ মাত্র। তর্কের আড়ম্বর ওস্থলে কেবল প্রলাপে পরিণত হইবে। যেমন চীন-দেশীয় প্রণয়ীকে তাহার ক্ষুদ্রপদ প্রণয়িনীর বা ইংলণ্ডীয় প্রণয়ীকে তাহার কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ প্রণয়িনীর কদর্য্যতা বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন, সেইরূপ দাশরথী ভক্তকে তাহার পূজা কবির জঘন্যতা বুঝাইয়া দেওয়া দুরূহ ব্যাপার! কিন্তু ইহা আবার সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সৌন্দর্য্য বা মধুরতার একটি সর্ব্ববাদী-সম্মত আদর্শ সকল প্রকৃতিস্থ হৃদয়ে বিরাজিত আছে, দেশভেদে কালভেদে সে আদর্শের ব্যভিচার হয় না। কোন্ সহৃদয় বা অহৃদয় মনুষ্য চন্দ্রের মধুরতা বা পদ্মের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারে না? কোন্ সহৃদয় বা অহৃদয় লোকের কাছে বৃক্ষের মর্মর শব্দ বা নদীর কুলুকুলুধ্বনি শ্রুতি-কঠোর বোধ হয়? চীন হইতে পিরু পর্য্যন্ত কোন্ সভ্য বা অসভ্য জাতির চক্ষে যুবতীর যৌবন-ছটা বা শিশুর শৈশব-লাবণ্য অপ্রীতিকর লাগে? জগতের সমস্ত লোকই বোধ হয় সমস্বরে উত্তর করিবে যে উহাদের কোনটিই কাহারো অসন্তোষকর নহে, এবং তাহার কারণ এই যে, দেশভেদে কালভেদে রুচির যতই বৈলক্ষণ্য হউক না কেন, সকল প্রকার আরোপিত বা উপার্জ্জিত সংস্কার পরিত্যাগ করিলে লোকের মনে যে সৌন্দর্য্য বা মধুরতার সর্ব্ববাদীসম্মত এবং অবিকৃত আদর্শ থাকে, সেই আদর্শই সকল সৌন্দর্য্য বা মধুরতার প্রকৃত নিকষ-স্বরূপ। সেই আদর্শ-অনুসারেই সেক্‌স্‌পিয়ার এবং কালিদাস কবিতা-কুঞ্জের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রকৃতিস্থ-হৃদয়ে সেই আদর্শের মহিয়সী শক্তির প্রভাব বিদ্যমান আছে। সেই আদর্শ-অনুসারেই শ্লেগেল সেক্‌স্‌পিয়ারের সৌন্দর্য্য ও গেটে কালিদাসের মধুরতা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, নানা প্রকার

বাহ্যিক ও আন্তরিক কারণ বশতঃ সেই আদর্শের বিকৃতভাব উপস্থিত হয়। রাজনীতি-সম্পর্কীয় মত-বৈষম্য ও দ্বিতীয় চার্লসের রাজ্যকালীন বিলাস-প্রিয়তা হেতু মিল্টনের প্রতি, এবং সামাজিক রীতিনীতিঘটিত কারণে সেলির প্রতি, তৎসাময়িক লোকদের বিরাগ, এমন কি, ধর্ম্মোন্মত্ততা ঘটিত কারণে সেক্‌স্‌পিয়ারের প্রতি পিউরিটানদিগের শক্রতা, তাহার দেদীপ্যমান সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ কোথাও হিংসা, কোথাও মতভেদ, কোথাও মনের বিকৃত গঠন বশতঃ আমরা সেই সর্ব্ববাদীসম্মত আদর্শের বিকার দেখিতে পাই। একজন বিরহিনী যেমন বলিয়াছিলেন "যে চন্দ্রের অপেক্ষা চণ্ডাল আর কেহই নাই।" একজন গণিতবিদ্‌ও সেইরূপ বলিয়াছিলেন যে, প্যারাডাইস্‌ লস্ট্‌ তাঁহার পক্ষে অতি বিরক্তিকর, কেননা মিল্‌টন কিছুই প্রমাণ করিতে পারেন নাই। এইরূপ কারণ বশতঃই ভল্‌টেয়ার সেক্‌স্‌পিয়ারকে অসভ্য বলিয়াছেন ও জেফি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ্‌কে অপোগণ্ড প্রলাপী কহিয়াছেন। এখন আমরা বলিতে পারি যে, এই সকল বাহুল্য কারণ না থাকিলে সর্ব্বহৃদয়ে বিরাজিত সেই সর্ব্ব-বাদী-সম্মত আদর্শের প্রভাবে দেশ কাল ও অবস্থার বিঘ্ন সকল তিরোহিত হইয়া সমস্ত জগৎ আলোকিত হইত এবং সাহিত্য-দর্পণকারের কথা পলকে প্রতিপন্ন হইত।

সাহিত্যদর্পণকারের কবিতার লক্ষণটী নিতান্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত হওয়াতে সাহিত্য-মণ্ডলে একটি ঘোর ভ্রান্তি প্রচারিত হইয়াছে। সেই ভ্রান্তিটি এখনও ভঞ্জন না করিলে আর রক্ষা নাই। দর্পণকার নাকি বলেন যে "রসাত্মক বাক্যের নামই কাব্য" সুতরাং পুত্রশোক-বিহ্বলা রোরুদ্যমানা জননীর বিলাপ-বাক্যগুলিও কবিতানামে আখ্যাত হইতে পারে। কেননা নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও সে বিলাপ শুনিলে সহজেই দ্রব হইয়া যায়। এই হেতু কেহ কেহ মনে করেন যে, মাতার বিলাপ শুনিয়া যদি শ্রোতার মন দ্রব হয় তাহা হইলে অবিকল তাহা লিপি-বদ্ধ করিলেও পাঠকের মন দ্রব হইবে—সুতরাং লেখকেরও কবিত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইবে। শুদ্ধ মাতার বিলাপ কেন, তাঁহারা মনে করেন যে, প্রকৃত জগতে যাহা আমাদের হৃদয়-তন্ত্রে আঘাত করে, লিখিত হইলেও তাহা সেইরূপে আঘাত করিবে। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাস্যের মৃত্যু হইলে আমাদের দেশীয় একজন নাটককার কমলাকে এই বলিয়া বিলাপ করাইতেছেন— "রোহিত রে! ওরে আমার প্রাণের রোহিত রে! ওরে বাবা! ওরে বাবা! কি হলোরে—ওরে কেন তুই কথা ক'সনে? ওরে রোহিত রে!" স্বীকার করি, যদি আমরা সেই ঘোর অন্ধকারময়ী রজনীতে সেই ভয়াবহ শ্মশান-প্রান্তরে উপস্থিত থাকিতাম তাহা হইলে নিশ্চয়ই কমলার বিলাপে আমাদের হৃদয় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। এমন কি, কমলার অবস্থা স্বচক্ষে না দেখিয়াও যদি শুদ্ধ তাহার রোদন শুনিতে পাই-

তাম, তাহা হইলেও আমাদের হৃদয় শোকে অবিভূত হইত। কিন্তু নাটকে সেই বিলাপটি অবিকল প্রতিবিম্বিত হওয়াতে আমাদের হৃদয়ে যে কোন্ রস উদ্দীপিত হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, প্রকৃত মাতার প্রকৃত রোদন শুনিয়া কেনই বা আমরা কাতর হই, আর সেই রোদন পাঠ করিয়া কেনই বা আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না? ইহার উত্তর অতি সহজেই দেওয়া যায়। নাটক কিম্বা কাব্য কল্পনা-সাগরের তরঙ্গ, কল্পনা বিরহিত হইলে নাটকের নাটকত্ব ও কাব্যের কাব্যত্ব থাকে না। কল্পনা-প্রভাবে কালিদাস পুরা-যুগের দুষ্মন্ত ও শকুন্তলাকে কলিযুগে উজ্জয়িনী-নগরের এক প্রান্তে বসিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন—মালতীনদী-তীরস্থ সেই প্রশান্ত আশ্রম প্রদেশে তাঁহাদের সেই মধুর প্রেমালাপ শুনিতে পাইয়াছিলেন—মহর্ষি কণ্বের "হে সন্নিহিত তরুগণ"-সম্বলিত আর্ত্তনাদ শুনিয়া বিহ্বল হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে রাজা দুষ্মন্তের সহিত আশ্রম-বাসিনীর বিবাহ দিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন। এখন শকুন্তলা পাঠ করিতে করিতে পাঠকের হৃদয়ও কল্পনা-স্রোতে উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে—পাঠকও ক্ষণকালের জন্য হেমকূট পর্ব্বতে উঠিয়া রাজা দুষ্মন্তের সঙ্গে সঙ্গে শকুন্তলার উদ্ধত সন্তানটীকে দেখিতে পায়—কল্পনা ক্রমে আরও বলবতী হইতে থাকে, পাঠক সেই হেমকূট পর্ব্বতের দৃশ্য ব্যতীত সমস্ত জগৎমণ্ডল একেবারে ভুলিয়া যায়—স্বচক্ষে সিংহ-শাবকটী দেখিতে পায়, স্বকর্ণে শুনিতে পায় দুষ্মন্ত বলিতেছেন "আহা! যাহার এই পুত্র সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মৃদুমধুর আধ-আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়।"—পাঠকের হৃদয়ও কণ্টকিত হয়। কিন্তু পাঠক যদি ঐরূপ বিলাপ না শুনিয়া একজন আধুনিক কবির মতন দুষ্মন্তের মুখে শুনিতে পায়—

"যবে আধ' আধ' বোলে
বাবা বাবা ব'লে বাছা অমৃত ছড়ায় রে,
কি আনন্দে নাচে প্রাণ পিতাই তা জানেরে!"

তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই পাঠকের কল্পনা-মোহ, পাঠকের সুখস্বপ্ন ভগ্ন হইয়া যায়, কল্পনার দৃষ্টিপথ হইতে মুহূর্ত্ত-মধ্যে হেমকূট পর্ব্বত, সিংহশাবক, মুনিকন্যাগণ বিলীন হইয়া যায়, এবং তাহার পরিবর্ত্তে লেপ, কাঁথা, চুসিকাটি সম্মুখে প্রকাশ পায়, সুতরাং আকস্মিক ভাব-বিপর্য্যয়ে হাস্যরসের আবির্ভাব হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, প্রকৃত জগতে যে কথাগুলিতে আমাদের মনে কোন রসের উদয় হয়, কবিতার জগতে অর্থাৎ কল্পনার জগতে তাহাতে বিপরীত ফল দর্শে। কবিতার জগতে প্রকৃতি ও কল্পনাকে এরূপ কৌশলে মিশ্রিত করিতে হইবে যে, সেই মিশ্রণ-প্রভাবে পাঠকের হৃদয়তন্ত্র কবির হৃদয়ের সহিত তালে তালে বাজিতে থাকিবে, এবং তাহা হইলে 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যং' শ্লোকটির সার্থকতা প্রতিপন্ন হইবে। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বের শোকে কমলা "ওরে

বাবারে” ইত্যাদি বলিয়া কাঁদিয়াছেন বটে, কিন্তু আর্থরের শোকে সেক্‌সপিয়ার কন্‌স্‌ট্যান্স্‌কে ওরূপ করিয়া কাঁদান্‌ নাই, অথচ কন্‌স্‌ট্যান্স যখন বলিয়া উঠিলেন—

No, I defy all counsel, all redress,
But that which ends all counsel, all redress
Death, death ! O amiable lovely death
* * * Misery's love,
O Come to me * * *
O that my tongue were in the thunder's mouth,
Then with a passion would I shake the world.
And rouse from sleep that fell anatomy
Which cannot hear a lady's feeble voice !
* * * *
O Lord ! my boy, my Arthur, my fair Son.
My life, my joy, my food, my all the world,
My widow-comfort, and my sorrow's cure.

তখন কোন্‌ পাঠকের হৃদয় না শোকে দ্রবীভূত হইতে থাকে ? এমন কি, সম্মুখস্থ একটি পদ্মফুলকে কল্পনার চক্ষে না দেখিলে কল্পনার প্রভাবে না বর্ণনা করিলে, কবির পদ্মবর্ণনার সহিত একজন উদ্ভিদবেত্তার পদ্মবর্ণনার কোন প্রভেদই থাকিতে পারে না। কিন্তু এইরূপ স্বভাব ও কল্পনার মিশ্র-উপাদানে “রসাত্মকং বাক্যং” রচনা করা অতিশয় সুকঠিন। যদি ঐ উভয়বিধ উপাদানে কিছুমাত্র বৈষম্য থাকে, তাহা হইলে তাহারা কখনই সমঞ্জসীভূতভাবে মিশ্রিত হইতে পারে না, এবং ঐ উভয়বিধ উপাদান সমঞ্জসীভূতভাবে মিশ্রিত না হইলে তাহাদের সংযোজনে যে কি এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি হয় তাহার একটি উদাহরণ আমরা দিতেছি। চৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যখন গুপ্তভাবে গৃহ পরিত্যাগ করেন, তখন তাঁহার জননী বিস্তর কাঁদিয়াছিলেন এবং সেই উপলক্ষ্যে একজন “অসাধারণ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন” কবি লিখিতেছেন

“ডাকেন জননী, নিমাই নিমাই,
প্রতিধ্বনি বলে, নাই নাই নাই,
ডাকিছেন যত, শোক-সিন্ধু তত
উথলিয়ে উঠে কোথা রে নিমাই !
গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে
সেই প্রতিধ্বনি যাই যাই করে,
ভাবেন জননী আসে গুণমণি
ডাকেন উৎসাহে হরিষ অন্তরে !”

প্রতিধ্বনির এরূপ বাক্‌চতুরতা দেখিয়া কে না বিস্ময়াপন্ন হইবে? কে না “নিমাই”-য়ের মায়ের দুঃখ ভুলিয়া প্রতিধ্বনিকে সাবাসী দিতে থাকিবে? এবং কার না বট্‌লস্‌ হুডিব্রাসের কথা সহজেই মনে পড়িবে ?

Quoth he, O whither, wicked Bruin,
Art thou fled to my—Echo 'Ruin,'

Think'st thou'twill not be in the dish
Thou turnd'st thy back? (Quoth Echo) 'Pish'
To turn from those thou would'st overcome
Thus cowardly? (Quoth Echo) 'mum!'

তবে বট্‌লরের সঙ্গে আর আমাদের কবির সঙ্গে প্রভেদ এই যে, বট্‌লর হাসাইব মনে করিয়া হাসাইয়াছেন, আর আমাদের কবিবর কাঁদাইব মনে করিয়া হাসাইয়া ফেলিয়াছেন—সুতরাং সাহিত্যদর্পণকারের মতে এ উভয়ের মধ্যে যে কে সুকবি তাহা বোধ হয় আর বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। কল্পনাময় ভাবের কথা দূরে থাক্, কল্পনার স্ফুলিঙ্গস্বরূপ একটি মাত্র কথাতেই কবিতার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হইতে পারে।—'নির্ব্বাসিত সীতার' সীতা বনে বসিয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন—

"বিনা দোষে বর্জ্জিলেন বিপিন মাঝার,
কোথা নাথ, কোথা প্রেম—সব ফক্কিকার!"

এই এক "ফক্কিকার" শব্দে বাক্‌দেবীর আদ্য শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে—কিন্তু আবার "বিষবৃক্ষে" সূর্য্যমুখী দেহত্যাগ করিয়াছেন ভাবিয়া নগেন্দ্রনাথ যখন শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিষণ্ণভাবে বসিলেন, শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সূর্য্যমুখী কোথায়?" নগেন্দ্রনাথ স্বর্গ-নরক বিশ্বাস না করিয়াও আকাশপানে চাহিয়া বলিলেন "স্বর্গে!" এই একটি কথায় নগেন্দ্রনাথের শোকের গভীরতা পবিত্রতা ও মহান্‌ভাব এককালে জ্বলন্তরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে, সাহিত্য-দর্পণকারের মতে কোন কবিতা রচনা করিতে হইলে প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক কথাটির উপর পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

আমরা সাহিত্য-দর্পণকারের কথাগুলি অবলম্বন করিয়া আগামী বারে বঙ্গ-সাহিত্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

চ—

করুণা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র নরেন্দ্রদের দলে মিশিয়াছে বটে, কিন্তু এখনো মহেন্দ্রের আচার-ব্যবহারে এমন একটি মহত্ব জড়িত ছিল যে, নরেন্দ্র তাহার সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না, এমন কি সে থাকিলে নরেন্দ্র কেমন একটা অসুখ অনুভব করিত, সে চলিয়া গেলে কেমন একটু শান্তিলাভ করিত। অলক্ষিতভাবে নরেন্দ্রের মন মহেন্দ্রের মোহিনী শক্তির পদানত হইয়াছিল।

মহেন্দ্র বড় মৃদু-স্বভাব লোক, হাসিবার

সময় মুচকিয়া হাসে, কথা কহিবার সময় মৃদুস্বরে কথা কহে, আবার অধিক লোক-জন থাকিলে মূলেই কথা কহে না, সে কাহারো কথায় সায় দিতে হইলে "হাঁ" বলিত বটে, কিন্তু সায় দিবার ইচ্ছা না থাকিলে হাঁও বলিত না, নাও বলিত না। এ-মহেন্দ্র নরেন্দ্রের মনের উপর যে অমন আধিপত্য স্থাপন করিবে তাহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় বটে।

মহেন্দ্রের সহিত গদাধরের বড় ভাব হইয়াছিল। ঘরে বসিয়া উভয়ে মিলিয়া দেশাচারের বিরুদ্ধে নিদারুণ কাল্পনিক সংগ্রাম করিতেন। স্বাধীন বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গে মহেন্দ্র সংস্কারক মহাশয়ের সহিত উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন, কিন্তু বহুবিবাহ নিবারণ-প্রসঙ্গে তাঁহার তেমন উৎসাহ থাকিত না। এভাবের তাৎপর্য্য যদিও গদাধর বাবু বুঝিতে পারেন নাই,কিন্তু আমরা এক রকম বুঝিয়া লইয়াছি।

গদাধর ও স্বরূপের সঙ্গে মহেন্দ্রের যেমন বনিয়া গিয়াছিল, এমন নরেন্দ্র ও তাহার দলবলের সহিত হয় নাই। মহেন্দ্র ইহাদের নিকট ক্রমে তাহার দুই একটি করিয়া মনের কথা বলিতে লাগিল, অবশেষে মোহিনীর সহিত প্রণয়ের কথাটাও অবশিষ্ট রহিল না। এই প্রণয়ের কথাটা শুনিয়া স্বরূপবাবু অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন মহেন্দ্র তাঁহার প্রণয়ের অন্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছেন, অনেক দুঃখ করিয়া অনেক কবিতা লিখিলেন, এবং আপনাকে একজন উপন্যাস নাটকের নায়ক কল্পনা করিয়া মনে মনে একটু তৃপ্ত হইলেন।

গদাধর কোন প্রকারে মোহিনীর পারিবারিক অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া তাহাকে মুক্ত বায়ুতে আনয়ন করিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিলেন। তিনি কহেন, গৃহ হইতে আমাদের স্বাধীনতা শিক্ষা করা উচিত, প্রথমে পারিবারিক-অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিতে শিখিলে ক্রমশ আমরা স্বাধীনতা-পথে অগ্রসর হইতে পারিব। ইংরাজী শাস্ত্রে লেখে "Charity begins at home" তেমনি গৃহ হইতে স্বাধীনতার সুরু। সংস্কারক মহাশয় নিজে বাল্যকাল হইতেই ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আসিতেছেন, বারো বৎসর বয়সে পিতার সহিত বিবাদ করিয়া তিনি গৃহ হইতে নিরুদ্দেশ হন, ষোল বৎসর বয়সে শিক্ষকের সহিত বিবাদ করিয়া ক্লাস ছাড়িয়া চলিয়া আসেন, কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার স্ত্রীর সহিত মনান্তর হয়,এবং তাঁহাকে তাঁহার বাপের বাড়ি পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হন এবং এইরূপে স্বাধীনতার সোপানে সোপানে উঠিয়া সম্প্রতি ত্রিশ বৎসর বয়সে নিজে সমস্ত কুসংস্কার ও প্রেজুডিসের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া অসভ্য বঙ্গদেশের নির্দ্দয় দেশাচার-সমূহকে বক্তৃতার ঝটিকায় ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু গদাধরের সহিত মহেন্দ্রের মতের ঐক্য হইল না, এমন কি মহেন্দ্র মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হইল, গদাধর আর অধিক কিছু বলিল না, ভাবিল, আরো দিনকতক যাক, তাহার পরে পুনরায় এই কথা তুলিব।

আরো দিনকতক গেল, মহেন্দ্র এখন নরেন্দ্রদের দলে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়াছে। মহেন্দ্রের মনে আর মনুষ্যত্বের কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই, গদাধর আর একবার পূর্ব্বকার কথা পাড়িল, মহেন্দ্রের তাহাতে কোন আপত্তি হইল না।

মহেন্দ্রের নামে কলঙ্ক ক্রমে রাষ্ট্র হইতে লাগিল। কিন্তু মহেন্দ্রের হৃদয়ে এতটুকু লোক-লজ্জা অবশিষ্ট ছিল না যে, এই অপবাদে তাহার মন তিলমাত্র ব্যথিত হইতে পারে।

মহেন্দ্রের ভগিনী, পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়েরা ইহাতে কিছু কষ্ট পাইল বটে কিন্তু হতভাগিনী রজনীর হৃদয়ে যেমন আঘাত লাগিল এমন আর কাহারো নয়। যখন মহেন্দ্র মদ খাইয়া এলোমেলো বকিতে থাকে তখন রজনীর কি মর্ম্মান্তিক ইচ্ছা হয় যে, আর কেহ সেখানে না আসে। যখন মহেন্দ্র মাতাল অবস্থায় টলিতে টলিতে আইসে রজনী তাহাকে কোন ক্রমে ঘরের মধ্যে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়, তখন তাহার কতই না ভয় হয় পাছে আর কেহ দেখিতে পায়। অভাগিনী, মহেন্দ্রকে কোন কথা বলিতে, পরামর্শ দিতে বা বারণ করিতে সাহস করিত না, তাহার যতদূর সাধ্য কোন মতে মহেন্দ্রের দোষ আর কাহাকেও দেখিতে দিত না। মহেন্দ্রের অসম্বৃত অবস্থায় রজনীর ইচ্ছা করিত, তাহাকে বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখে, যেন আর কেহ দেখিতে না পায়। কেহ তাহার সাক্ষাতে মহেন্দ্রের নিন্দা করিলে সে তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত না, অন্তরালে গিয়া ক্রন্দন করা ভিন্ন তাহার আর কোন উপায় ছিল না। সে তাহার মহেন্দ্রের জন্য দেবতার কাছে কত প্রার্থনা করিয়াছে, কিন্তু মহেন্দ্র তাহার মত্ত অবস্থায় রজনীর মরণ ভিন্ন কিছুই প্রার্থনা করে নাই। রজনী মনে মনে কহিত, রজনীর মরিতে কতক্ষণ, কিন্তু রজনী মরিলে তোমাকে কে দেখিবে?

এক দিন রাত্রি দুইটার সময় টলিতে টলিতে মহেন্দ্র ঘরে আসিয়া ভূমিতলে শুইয়া পড়িল। রজনী জাগিয়া জানলায় বসিয়াছিল, সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বসিল। মহেন্দ্র তখন অচৈতন্য। রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কতক্ষণের পর মহেন্দ্রের মাথা কোলে তুলিয়া লইল। আর কখন সে মহেন্দ্রের মাথা কোলে রাখে নাই; সাহসে বুক বাঁধিয়া আজ রাখিল। একটি পাখা লইয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। ভোরের সময় মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিল, পাখা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কহিল 'এখানে কি করিতেছ? ঘুমাওগে না!' রজনী ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া গেল। মহেন্দ্র আবার ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতের রৌদ্র মুক্ত বাতায়ন দিয়া মহেন্দ্রের মুখের উপর পড়িল, রজনী আস্তে আস্তে জানালা বন্ধ করিয়া দিল।

রজনী মহেন্দ্রকে যত্ন করিত, কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে করিতে সাহস করিত না; সে গোপনে মহেন্দ্রের খাবার গুছাইয়া দিত, বিছানা বিছাইয়া দিত, এবং সে অল্পস্বল্প যাহা কিছু মাসহারা পাইত, তাহা মহেন্দ্রের

খাদ্য ও অন্যান্য অবশ্যকীয় দ্রব্য কিনিতেই ব্যয় করিত, কিন্তু এ সকল কথা কেহ জানিতে পাইত না। গ্রামের বালিকারা, প্রতিবেশিনীরা, এত লোক থাকিতে, নির্দোষী রজনীরই প্রতি-কার্য্যে দোষারোপ করিত, এমন কি বাড়ির দাসীরাও মাঝে মাঝে তাহাকে দুই এক কথা শুনাইতে ত্রুটি করিতনা, কিন্তু রজনী তাহাতে একটি কথাও কহিত না; যদি কহিতে পারিত তবে অত কথা শুনিতেও হইত না।

রাত্রি প্রায় দুই প্রহর হইবে, মেঘ করিয়াছে, একটু বাতাস নাই, গাছে গাছে পাতায় পাতায় হাজার হাজার জোনাকি পোকা মিট্ মিট্ করিতেছে। মোহিনীদের বাড়িতে একটি মানুষ আর জাগিয়া নাই, এমন সময়ে তাহাদের খিড়কির দরজা খুলিয়া দুই জন তাহাদের বাগানে প্রবেশ করিল। একজন বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিল আর এক জন গৃহে প্রবেশ করিল। যিনি বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া রহিলেন তিনি গদাধর, যিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন তিনি মহেন্দ্র। দুই জনেরি অবস্থা বড় ভাল নহে, গদাধরের এমন বক্তৃতা করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে তাহা বলিবার নহে, এবং মহেন্দ্রের পথের মধ্যে এমন শয়ন করিবার ইচ্ছা হইতেছে যে কি বলিব। ঘোরতর বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ হইল, গদাধর দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন, কিন্তু পরোপকারের জন্য কি কষ্ট না সহ্য করা যায়, এমন কি, এখনি যদি বজ্র পড়ে, গদাধর তাহা মাথায় করিয়া লইতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু এই কথাটা অনেকক্ষণ ভাবিয়া দেখিলেন যে, এখনি তাহাতে তিনি প্রস্তুত নহেন, বাঁচিয়া থাকিলে পৃথিবীর অনেক উপকার করিতে পারিবেন, বৃষ্টি বজ্রের সময় বৃক্ষতলে দাঁড়ানো ভালনয় জানিয়া একটি ফাঁকা জায়গায় গিয়া বসিলেন, বৃষ্টি দ্বিগুণ বেগে পড়িতে লাগিল।

এদিকে মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া মোহিনীর ঘরেরদিকে চলিল, যতই সাবধান হইয়া চলে ততই খস্ খস্ শব্দ হয়। ঘরের সম্মুখে গিয়া আস্তে আস্তে দরজায় ধাক্কা মারিল, ভিতর হইতে দিদিমা বলিয়া উঠিলেন "মোহিনী! দেখ্‌ত বিড়াল বুঝি! দিদিমার গলা শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি সরিবার চেষ্টা দেখিলেন, সরিতে গিয়া এক রাশি হাঁড়ি-কলসির উপর গিয়া পড়িলেন, হাঁড়ির উপর কলসী পড়িল, কলসীর উপর হাঁড়ি পড়িল, এবং কলসী হাঁড়ি উভয়ের উপর মহেন্দ্র পড়িল, হাঁড়িতে কলসীতে, থালায় ঘটিতে দারুন ঝন্ ঝন্ শব্দ বাধাইয়া দিল, এবং কলসী হইতে ঘড় ঘড় শব্দে জল গড়াইতে লাগিল, বাড়ির ঘরে ঘরে "কি হইল, কি হইল" শব্দ উপস্থিত হইল, মা উঠিলেন, পিসি উঠিলেন, দিদি উঠিলেন, খোকা কাঁদিয়া উঠিল, দিদি মা বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে পোড়ার মুখা বিড়ালের মরণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, মোহিনী প্রদীপ হস্তে বাহিরে আসিল, দেখিল মহেন্দ্র; তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া কহিল, "পালাও পালাও।" মহেন্দ্র পলাইবার উদ্যোগ করিল, ও মোহিনী তাড়াতাড়ি প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিল।

দিদিমা চক্ষে কম দেখিতেন বটে, কিন্তু কাণে বড় ঠিক ছিলেন, মোহিনীর কথা শুনিতে পাইলেন, তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিলেন, " কাহাকে পলাইতে বলিতেছিস্ মোহিনী ?" দিদিমা অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু পলায়নের ধুপ্ধাপ্ শব্দ শুনিতে পাইলেন; দেখিতে দেখিতে বাড়িশুদ্ধ লোক জমা হইল।

মহেন্দ্র ত অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিল। এদিকে গদাধর বাগানে বসিয়া ভিজিতেছেন, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া একটু তন্দ্রা আসিতেই শুইয়া পড়িলেন, ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি বক্তৃতা করিতেছেন, আর হাততালীর ধ্বনিতে সভা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; সভায় গবর্ণর জেনেরাল উপস্থিত ছিলেন, তিনি বক্তৃতা-অন্তে পরম তুষ্ট হইয়া আপনি উঠিয়া যেক্হ্যাণ্ড করিতে যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পৃষ্ঠে দারুণ এক লাঠির আঘাত লাগিল, ধড়্ফড়িয়া উঠিলেন, একজন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে কি করিতেছিস্? কে তুই?" গদাধর জড়িত-স্বরে কহিলেন "দেশ ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রাণ দেওয়া সকল মনুষ্যেরই কর্ত্তব্য। ডাল ও ভাত সঞ্চয় করাই যাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, তাহারা গলায় দড়ি দিয়া মরিলেও পৃথিবীর কোন অনিষ্ট হয় না। দেশ-সংস্কারের জন্য রাত্রি নাই, দিবা নাই, আপনার বাড়ি নাই, পরের বাড়ি নাই, সকল সময়ে সর্ব্বত্রেই কোন বাধা মানিবে না, কোন বিঘ্ন মানিবে না, কেবল ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে; যে না করে সে পশু, সে পশু, সে পশু! অতএব—" আর অধিক অগ্রসর হইতে হইল না, প্রহারের চোটে তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, আর অল্পক্ষণ থাকিলে শরীর-সংস্কারের আবশ্যকতা হইত। অতিশয় বাড়াবাড়ি দেখিয়া গদাধর বক্তৃতা-ছন্দ পরিত্যাগ করিয়া গোঙ্গানি-চ্ছন্দে তাঁহার মৃত পিতা, মাতা, কনষ্টেবল, পুলিস ও দেশের লোককে ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। তাহারা বুঝিল যে, অধিক গোলযোগ করিলে তাহাদেরই বাড়ির নিন্দা হইবে, এই জন্য আস্তে আস্তে তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিল।

মোহিনীর উপরে তাহার বাড়িশুদ্ধ লোকের বড়ই সন্দেহ হইল। রাত্রে কে আসিয়াছিল, এবং কাহাকে সে পলাইতে কহিল, এই কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য তাহার প্রতি দারুণ নিগ্রহ আরম্ভ হইল, কিন্তু সে কোনমতে কহিল না। কিন্তু এ কথা ছাপা থাকিবার নহে, মহেন্দ্র পলাইবার সময় তাহার চাদর ও জুতা ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সকলে বুঝিতে পারিল যে মহেন্দ্রেরই এই কায। এই ত পাড়াময় টীটী পড়িয়া গেল; পুকুরের ঘাটে, গ্রামের পথে, ঘরের দাওয়ায়, বৃদ্ধদের চণ্ডীমণ্ডপে এই এক কথারই আলোচনা হইতে লাগিল। মোহিনীর ঘর হইতে বাহির হওয়া দায় হইল, সকলেই তাহার পানে কটাক্ষ করিয়া কথা কয়; না

কহিলেও মনে হয় তাহারই কথা হইতেছে। পথে কাহারও হাস্য-মুখ দেখিলে তাহার মনে হইত তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই হাসি তামাসা চলিতেছে, অথচ মোহিনীর ইহাতে কোন দোষ ছিল না।

প্রাপ্ত গ্রন্থ।

১। ভারত-চিকিৎসা। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা-বিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন। শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত। হোমিওপেথি কি, এবং উহার মূলে কোন সত্য আছে কি না, ইহা বুঝাইয়া দেয়, এরূপ গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র বাঙ্গালা ভাষায় একখানিও দেখিতে পাওয়া যায় না। এরূপ স্থলে কোন গ্রন্থ বা সাময়িক পত্র আমাদের সেই অভাব পূরণ করিতে উদ্যত হইলে আমরা উহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি। "ভারত-চিকিৎসককেও" আমরা সেই ভাবে গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু "ভারত-চিকিৎসক" হইতে আমাদের অভাব কতদূর পূরণ হইবে বলিতে পারি না। আমরা ইহার ভূমিকা হইতে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কোথাও "ভারত-চিকিৎসক"-প্রণেতাকে বিচক্ষণ চিকিৎসা-ব্যবসায়ী লোক বলিয়া বোধ হয় না। প্রত্যুত তিনি তাঁহার প্রত্যেক প্রস্তাবে চিকিৎসা-শাস্ত্রে আপনার অনভিজ্ঞতারই পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি হানিমানের জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়েও নিতান্ত অনভিজ্ঞ। শরচ্চন্দ্র বাবু "ভারত-চিকিৎসকের" ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, "প্রায় একশতাব্দী অতীত হইতে চলিল, হোমিওপেথির নিষ্ঠুর শত্রুগণের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, ইহার বিখ্যাতনামা আবিষ্কর্ত্তা মহাত্মা হানিমান স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভয়ানক কষ্ট সহ্য করতঃ অবশেষে জার্ম্মাণ রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন।" কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ১৭৫৫ খ্রীঃ অব্দে জার্ম্মাণ মহারাজ্যের অন্তর্গত কার-স্যাক্সনি প্রদেশস্থ মিসেন্ নামক একটি ক্ষুদ্র নগরে হানিমানের জন্ম হয়। ইনি উনবিংশতি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্বদেশীয় বিদ্যালয়ে যথোপযুক্ত বিদ্যা-শিক্ষা করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের অনুরোধে ১৭৭৫খ্রীঃঅব্দে প্রথমতঃ লিপ্‌জিগ্-নগরে উপনীত হন। পরে তথাকার পাঠ শেষ হইলে বিয়েনা নগরে আইসেন, এবং অবশেষে ১৭৭৯ খ্রীঃ অব্দে এর্‌ল্যাঙ্গেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া চিকিৎসা-বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। আট বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে এলোপেথিক মতে চিকিৎসা করিয়া তিনি উহাতে বীত-শ্রদ্ধ হইলেন। এবং অচিরকাল মধ্যে নিজ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া রসায়ন-বিদ্যানুশীলনে নিযুক্ত হন। এইরূপ কিছুকাল গত হইলে তিনি ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় লীপ্‌জিগ্ নগরে আসিয়া উপস্থিত হন।

এই সময় হইতেই তাঁহার মন আবার চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের দিকে ধাবিত হয়। অনন্তর তিনি বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারা হোমিওপেথি-চিকিৎসার মূলসূত্র প্রাপ্ত হন। এবং আপন মত প্রচার করিবার মানসে প্রসিদ্ধ ডাক্তার হিউফ্‌লাণ্ড সাহেবের চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায় ঐ সকল বিষয় প্রকাশ করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই কতকগুলি এলোপেথিক চিকিৎসক ও ঔষধবিক্রেতা (Apothicaries) তাঁহার পরম শত্রু হইয়া উঠে। ১৭৯০।৯১ হইতে ১৮২০।২১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অবোধ শত্রুগণের মিথ্যা গ্লানির হস্ত এড়াইবার জন্য জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের নানা স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পরিশেষে প্রিন্স ফ্রেডেরিকের অনুগ্রহে এন্‌হান্ট কোথেন নামক স্থানে অবস্থিতি করেন। এই স্থানে থাকিতে থাকিতেই ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ইহার চারি বৎসর পরে ফরাসি দেশীয় একজন সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক রোগপ্রতীকারার্থ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর হানিমান তাঁহাকে অতিশয় যত্নপূর্ব্বক চিকিৎসা করিয়া অল্প দিনের মধ্যে আরাম করিয়া তুলিলে, উক্ত স্ত্রীলোক তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিণয়পাশে বদ্ধ করেন ও অবশেষে ফরাশিষ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া স্বামীসমভিব্যাহারে প্যারিশ নগরে উপনীত হন। হানিমান তদবধি এইখানেই চিকিৎসা করিয়া জীবনের শেষকাল সুখে অতিবাহিত করেন।

অতঃপর পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে হানিমান জার্ম্মান রাজ্যে জন্ম গ্রহণ করেন এবং চির-জীবন প্রায় ঐ খানেই থাকিয়া আপন মত প্রচার করিয়াছেন। কেবল শেষাবস্থায় দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণ করিয়া স্ত্রীর অনুরোধে স্বদেশের আশা ত্যাগ করিয়া প্যারিশ নগরে উপনীত হন। কিন্তু ভারত-চিকিৎসকের পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে, হানিমানকে কখনই জার্ম্মান বলিয়া বোধ হয় না। ভারত-চিকিৎসকের মধ্যে আর এক স্থলে "হোমিওপেথি কি" এই বিষয়টি বুঝাইতে গিয়া শরৎবাবু যেরূপ আপনার অনভিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন এমন আর কোথাও নহে। তিনি গ্রন্থ বিশেষকে অনুকরণ করিতে গিয়া এসম্বন্ধে তিন স্থলে তিন প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ১ম—"হোমিওপেথি সদৃশ-চিকিৎসা, যেমন বিষের ঔষধ বিষ।" ২য়—"যে জাতীয় বস্তু দ্বারা রোগোৎপত্তি হয়, পীড়িত ব্যক্তি, সদৃশ বস্তু সেবন দ্বারা রোগ হইতে মুক্ত হয়।" ৩য়—"যে বস্তু দ্বারা মনুষ্যের মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ জন্মে, সেই বস্তু সেবন দ্বারা আবার তাহার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আরোগ্য হয়।" শরৎবাবু এই তিনটিকেই হোমিওপেথি মতের পোষক মনে করিয়াছেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাদের সহিত হোমিওপেথির কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই। প্রত্যুত এই সকল মত ভ্রান্তি-জনক বলিয়াই বোধ হয়। সুতরাং পাঠকগণের পক্ষে শরৎবাবুর কৃত হোমিওপেথির ব্যাখ্যা পড়িয়া উহার যথার্থ

মর্ম্মাবগত হওয়া নিতান্ত দুরূহ। হোমিও-পেথি মতের প্রকৃত তাৎপর্য্য এই :—

সহজ শরীরে যে ঔষধ বা বিষবৎ দ্রব্য সেবন করিলে যে রোগ বা রোগের লক্ষণ উৎপন্ন হয়, সেই রোগ বা রোগের লক্ষণ অন্যকারণে উৎপন্ন হইলে সেই ঔষধই ব্যবস্থা। অর্থাৎ যে পারদ দ্রব্য ব্যবহার করিলে সহসা মনুষ্যের মুখ হইতে লালা বাহির হইতে থাকে, সেই পারদ-দ্রব্য পক্ষান্তরে উক্ত প্রকার রোগের ঔষধ। এই প্রণালীর চিকিৎসাকেই হোমিও-পেথি-চিকিৎসা বলে। কিন্তু পারা খাইয়া রোগ জন্মিলে তাহাকে পুনরায় পারা খাওয়ান কখনই হোমিওপেথি চিকিৎসার উদ্দেশ্য নহে। অথচ শরৎবাবুর ব্যাখ্যা পড়িলে ঐরূপেই চিকিৎসা করিতে হয়।

এদিকে শরৎ বাবু "স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মন্তব্য" বলিয়া যে প্রস্তাবটি লিখিয়াছেন তাহাও ভ্রম-শূন্য নহে। তিনি প্রথমেই Hygieneকে "শারীরবিদ্যা" বলিয়াছেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে Hygieneকে কখনই শারীর-বিদ্যা বলা যায় না। অধুনাতন লেখকেরা Physiologyকেই শারীরবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। "স্বাস্থ্য-বিধানই" হাইজীনের প্রকৃত অনুবাদ।

Hygiene প্রস্তাবের মধ্যে লেখকের আর একটি দোষ এই যে, তিনি দুইস্থানে ইহার দুইরূপ অর্থ করিয়াছেন। একবার লিখিয়াছেন যে, "যে দর্শন-শাস্ত্রের যে শাখা পাঠ করিলে শরীর সুস্থ ও সবল থাকে, অকাল মৃত্যুর হস্ত এড়াইতে পারে, তাহাকেই শারীর-বিদ্যা কহে।" আবার লিখিয়াছেন যে "প্রকৃতপক্ষে হাইজীন্ বা শারীর বিদ্যার অর্থ শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি-সমূহের অনুশীলন-বিষয়ক নিয়মাবলী।" কিন্তু পাঠকগণ এদুয়ের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিবেন বলা যায় না।

আমরা পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের মধ্য হইতে পাঠকগণের হৃদ্বোধার্থ আর কয়েকটি কৌতুকাবহ ও সগর্ব্ব উক্তি উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

"আমাদের এ সম্বন্ধে জ্ঞান ও সমর্থ নিতান্ত অসম্পূর্ণ হইলেও ইহাতে যে সমস্ত বিষয় লিখিত হইবে, তাহা অবগত হইলে পৃথিবীতে স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে যুগান্তর উপস্থিত হইতে পারিবে তাহা সন্দেহ করিতে পারি না।"

"প্রাচীন জাতিদিগের ভাব ও ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া যেমন আবশ্যক, তাহাকে তদপেক্ষা অল্প আবশ্যক কোন মতে মনে করা যায় না।"

"কি কারণে রোগোৎপত্তি হয়, মুদ্রাযন্ত্র সকল, বিশেষতঃ চিকিৎসা-সম্বন্ধীয় আলোচনা দ্বারাই লোকে সে সমস্ত অবগত হইতে পারে।"

"ভারত-চিকিৎসকের" ভূমিকায় শরৎবাবু "বহুকাল প্রচলিত, সাংঘাতিক চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূলোৎপাটন" করিতে গিয়া লিখিয়াছেন যে, "ভণ্ড প্রবঞ্চক মনুষ্যগণ মানবজাতির ব্যাধি নিরাকরণ-অভিপ্রায়ে যে

সমস্ত ভয়ানক যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছে, নির্দ্দয়-রাক্ষস-প্রকৃতি যম-কিঙ্করগণ অদ্যাপিও যাহা রক্ষা করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতেছে।" শরৎবাবুর মতে এলোপেথিকেরা সকলেই ভণ্ড ও প্রবঞ্চক এবং নির্দ্দয় ও রাক্ষস-প্রকৃতি যম-কিঙ্করের ন্যায়। এরূপ উক্তি চিকিৎসকের পক্ষে কতদূর সঙ্গত বলিতে পারি না। শরৎবাবু যদি চিকিৎসাশাস্ত্রের ইতিবৃত্ত (History of medicine) পাঠ করিতেন, তাহা হইলে প্রাচীন চিকিৎসকদিগের উদ্দেশে তিনি কখনই ঐরূপ গুণবাচক শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিতেন না।

শরৎবাবু 'পথ্য' বিষয়ক প্রস্তাবে যেরূপ অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকগণের পক্ষে উহার মর্ম্মাবগত হওয়া সহজ নহে। আমরাও পুনঃপুনঃ পাঠ করিয়া লেখকের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এতদ্ভিন্ন " ভারত চিকিৎসকের " শেষ ভাগে শরৎবাবু যে দুইটি ঘৃণিত রোগের উল্লেখ করিয়া তাহাদের কারণ, লক্ষণ ও চিকিৎসাদি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা অধিকতর ক্ষুব্ধ হইলাম। কারণ, শারীরস্থানবিদ্যা (Anatomy) বিষয়ে তাঁহার ব্যুৎপত্তি না থাকায় তিনি অন্ধের ন্যায় যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে প্রকৃত চিকিৎসা-ব্যবসায়ী অথবা ইংরাজী চিকিৎসা-শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত কেহই উহার অর্থগ্রাহী হইতে পারেন না। তিনি প্রমেহ নামক প্রস্তাবে রোগ নির্ব্বাচন-স্থলে লিখিয়াছেন যে "স্ত্রী এবং পুরুষ জাতির মূত্রযন্ত্রের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও জননেন্দ্রিয়ের অতি সন্নিহিত স্থান কোন অজ্ঞাত বিষ-সংস্পর্শ দ্বারা প্রদাহিত হইয়া তাহা হইতে পূঁজময় ক্লেদ নিঃসরণ হওয়াই প্রমেহ।" কিন্তু এতদ্দ্বারা কিছুই বুঝা যায় না। ইংরাজী চিকিৎসা-শাস্ত্র-অনুবাদকেরা কিড্‌নি (Kidney) নামক শরীরাভ্যন্তরস্থ দুইটি যন্ত্রকেই ঐ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। কিন্তু শরৎবাবু ভ্রমবশতঃ বহির্মূত্র-প্রণালী অর্থাৎ ইউরিথ্রার (Urethra) ঐ নাম দিয়াছেন। এ দিকে "জননেন্দ্রিয়ের অতি সন্নিহিত স্থান" বলিলে যে কত প্রকার স্থান বুঝাইতে পারে তাহা বলা যায় না।

তিনি "প্রমেহ শব্দের প্রকৃত অর্থ শুক্রক্ষরণ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। "গনোরিয়া" (Gonorhea) এই শব্দেরই ধাতুগত অর্থ শুক্রক্ষরণ। প্রমেহ শব্দের অর্থ স্বতন্ত্র।

আবার আর একস্থলে শরৎবাবু ইউরিথ্রা-নামক যন্ত্রকে মূত্রাধার বলিয়াছেন। কিন্তু লোকে ব্লাডার নামক যন্ত্রকেই সচরাচর মূত্রাধার বলিয়া থাকে।

প্রমেহ প্রস্তাবের দ্বিতীয় পাতে লিখিত আছে যে, 'এইরূপ হইবার কারণ পুরুষের মূত্রাধারে * স্পঞ্জের ন্যায় একপ্রকার শোষক পদার্থ আছে তাহা আটাবৎ রস বিশেষ দ্বারা সিক্ত হইলেই মূত্রযন্ত্র ঐরূপ সোজা

* Urethra.

হইয়া উঠে।' এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে,শরৎবাবু মূত্রাধারে যে স্পঞ্জের ন্যায় পদার্থের উল্লেখ করিতেছেন তাহা মূত্রাধারে নাই। কিন্তু ঐ তন্তু (tissue) মূত্রপ্রণালীর চতুর্দ্দিকে কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত পরিবেষ্টন করিয়া থাকে। শরৎবাবু মৃতদেহ স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অথবা কোন শারীর-স্থান বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ পাঠ করিলে কখনই এরূপ ভ্রমে পতিত হইতেন না।

'সঙ্কুচিত মূত্র প্রণালী' নামক প্রস্তাবে শরৎবাবু মূত্রযন্ত্রে, শ্লৈষ্মিক এবং উপশ্লৈষ্মিক ঝিল্লী লইয়া যেরূপ গোলযোগ করিয়াছেন তাহা দেখিলে বোধ হয় যে তিনি যে ইংরাজী গ্রন্থ * হইতে ঐ সকল বিষয় অনুবাদ করিয়াছেন তাহা তিনি স্বয়ং বুঝেন না। শারীরস্থান-বিদ্যায় জ্ঞান না থাকাই ইহার মূল কারণ। এই জন্যই তিনি Prostate glandকে প্রস্টাটিক চুঙ্গি, Submucus tissue শ্লৈষ্মিক পেশী এবং albuminous fluidকে ক্ষীরবৎ গাঢ় রস বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই জন্যই তিনি বলেন যে 'আটাবৎ ক্লেদ নির্গত হইয়া আঁশযুক্ত পেশী উৎপন্ন হয়।' এই শেষোক্ত কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা অমূলক। এটি তাঁহার স্বকপোল-কল্পিত বলিলেও বলা যায়। কারণ ইহা কোন চিকিৎসা-শাস্ত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না।

'শুক্রক্ষরণ' নামক ভারত-চিকিৎসকের শেষ প্রস্তাবটি নিতান্ত মন্দ নহে। কিন্তু শরৎবাবুর ইংরাজী শিক্ষার দোষে তিনি

* Ruddock's Text Book.

গ্রন্থ বিশেষ * হইতে অনুবাদ করিতে গিয়া নানা প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

প্রথমতঃ রোগ নির্ব্বাচনের সময় irritability শব্দের অর্থ টাটানি করিয়াছেন। বস্তুতঃ irritability অর্থ উত্তেজন-প্রবণতা। অর্থাৎ যাহাতে কোন বস্তু সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠে।

এই 'রোগোৎপত্তির কারণ' বিষয়ক প্রস্তাবে লিখিয়াছেন যে 'শিশুগণ বিচারালয়ে স্ত্রী-পরিত্যাগরূপ মোকদ্দমা দৃষ্টে, এই বিষয় শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।' বাস্তবিক রডকের লিখিত পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবে ওরূপ কোন কথাই নাই। তবে তিনি বলেন যে যুবকেরা নানাস্থানে জঘন্য অভ্যাস শিক্ষা করে। তন্মধ্যে অসৎ পুস্তক পাঠ, অসদলাপ এবং সংবাদপত্র-লিখিত স্ত্রীপরিত্যাগ-বিষয়ক মোকদ্দমার সম্বাদ পাঠই ইহার প্রধান কারণ।

রডক্ সাহেবের গ্রন্থে লিখিত আছে যে "Very extensive correspondence and considerable private practice, have afforded us unusual opportunity of investigating this subject and prove to us that the evils of the above condition are widespread beyond the credibility of those who have not thoroughly investigated it." শরৎবাবু উহার অনুবাদে লিখিয়াছেন "বহু বিস্তৃত কথোপকথন ও মফঃসল চিকিৎসা দ্বারা আমরা এই অস্বাভাবিক

* Ruddock's Text Book.

ক্রিয়ার বিস্তৃতি ও তাহার বিষময় ফল সম্বন্ধে এতদূর অবগত হইয়াছি যে অন্যে তাহা কদাপি বিশ্বাস করিতে পারে না।”

ভারত-চিকিৎসক হইতে আমরা প্রথমে এই প্রস্তাবটি পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম যে হয় ত শরৎ বাবু বহুদিন হইতে স্বয়ং এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া এতদূর বলিতে সাহসী হইয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি যে অন্যের লিখিত বিষয় আপনার বলিয়া লোকসমাজে প্রচার করেন, ইহা আমাদের স্বপ্নের অগোচর। যাহাই হউক, ভরসা করি শরৎ বাবু পুনরায় আমাদিগকে এরূপ বিষম সমস্যায় ফেলিবেন না।

উপসংহার-কালে, ‘ভারত-চিকিৎসক’ সম্বন্ধে আমরা আরও গুটিকতক কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পরিলাম না।

‘ভারতচিকিৎসকের’ মধ্যে উপক্রমনিকা বা ভূমিকা ভিন্ন,প্রায় সকল গুলিই অনুবাদ। এই অনুবাদগুলি আবার এতই দুর্ব্বোধ্য যে, প্রত্যেক প্রস্তাবের টীকা না করিলে উহা বুঝা যায় না। উহার ভাষা বিশুদ্ধ নহে। উহার স্থানে স্থানে এরূপ ভুল আছে যাহা দেখিলে অনুবাদককে নিতান্ত অশিক্ষিত বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন শরৎবাবু যে সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছেন তাহাও তিনি উত্তমরূপ জানেন না। অতঃপর আমাদের পরামর্শ এই যে যদি শরৎবাবু যথার্থই দেশের মঙ্গলোদ্দেশে হোমিওপেথি-প্রচারে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, যদি ধনোপার্জন তাঁহার মুখ্য অভিপ্রায় না হয়, তাহা হইলে তিনি যেন স্বয়ং সম্পাদকের ভার গ্রহণ না করেন। শিক্ষিত চিকিৎসা-ব্যবসায়ী লোকের সাহায্য-ব্যতীত এরূপ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে বিবেচনাসিদ্ধ হয় নাই। ভরসা করি তিনি আমাদের এই সকল উপদেশ-বাক্য অক্ষুব্ধ-চিত্তে গ্রহণ করিবেন। আমরা তাঁহার লিখিত মাসিক পত্রিকা সম্বন্ধে একটিও অনুকূল বাক্য প্রয়োগ করিতে পরিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইলাম। গ্রন্থকারের ছিদ্রানুসন্ধান আমাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার ভ্রমসংশোধন করাই আমাদিগের অভিপ্রেত।

জাতীয় উদ্দীপনা—ঢাকা গিরীশযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৶০ আনা মাত্র। সংগ্রাহকের নাম নাই। এই পুস্তকখানি কতকগুলি স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক সুন্দর কবিতার সংগ্রহ। গ্রন্থখানি পাইয়া আমরা অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়াছি। হেমচন্দ্র বাবুর ভারত-সঙ্গীতটি থাকিলেই পুস্তকখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইত।

সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিল—শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত। ঈষ্টইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৶০ আনা। গ্রন্থকার স্ত্রী-বিয়োগে এই বিলাপ-কবিতাটি রচনা করিয়াছেন। এ পুস্তকের বাহুল্য সমালোচনা করিলে অকৃত্রিম শোকের অবমাননা করা হয়। যাহা হউক, তাঁহার সহিত আমরা মমতা প্রকাশ করিতেছি।

নিশীথে হিমাদ্রি-শিখরে—যোগেন্দ্রনাথসেন প্রণীত। বরিশাল সত্য-প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৶০ আনা। এই ক্ষুদ্র কাব্য-

খানির রচয়িতা অল্পবয়স্ক। ইহা ভারতের বর্ত্তমান ছুরবস্থাজনিত বিলাপ-প্রসঙ্গ। সপ্তদশ বর্ষীয় বালকের পক্ষে এই পুস্তকখানি প্রশংসনীয়।

ললিতা সুন্দরী—অধরলাল সেন বিরচিত। নূতন বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। এ কাব্যখানির স্থানে স্থানে মন্দ হয় নাই। গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন, "ইহার সকল ভাব লেখকের মানসপ্রসূত নহে; মধ্যে মধ্যে অপরাপর ভাষার ভাবেরও অসদ্ভাব নাই, ঘটনাটি অনৈতিহাসিক, এবং রচনা-চাতুরীর অভিমান করে না।" যদিও আমরা "অভিমান করে না" এই ক্রিয়ার প্রকৃত কর্ত্তাটি খুঁজিয়া পাইলাম না, তবুও গ্রন্থকারের অকপটতাকে আমরা সাধুবাদ দিই।

মেনকা—ঐ—ঐ—মূল্য চারি আনা। এই গীতি-কাব্যখানি-সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বক্তব্য নাই। ইহা মূরের প্যারাডাইজ্ এণ্ড দি পেরীর স্বাধীন অনুবাদমাত্র। পূর্ব্ব গ্রন্থখানির অপেক্ষা ইহার রচনা-প্রণালী কিঞ্চিৎ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

নলিনী—ঐ—ঐ—মূল্য ছয় আনা।
"ভালবাসা, সুখ আশা তামাসার নয়।"•

* * * * *

"সে প্রেম কোথায়?
ভালবেসে পরিশেষে কিবা সুখ হোল।
তামাসা ফুরিয়ে গেল—হৃদয় শ্মশান হোল
চক্রবাক্ চক্রবাকী কাঁদে উভরায়
বাজে "হায়, হায় হায়!"

এরূপ ভাব ও ভাষা-সম্বলিত শ্লোকসমষ্টির বাহুল্য সমালোচনা গ্রন্থকারের অপ্রীতিকর হইবে জানিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

কুসুমকানন—ঐ—ঐ—গ্রন্থকারের প্রিয় কবি বায়রণ্ লিখিয়াছেন।—
"Oh Southey, Southey, in mercy spare,
A fourth, alas, is more than we can bear."

ছিন্ন লতিকা।

সাধের কাননে মোর, রোপন করিয়াছিনু
একটি লতিকা সখি অতিশয় যতনে,
প্রতিদিন দেখিতাম, কেমন সুন্দর ফুল
ফুটিয়াছে শত শত হাসি হাসি আননে।
প্রতিদিন সযতনে, ঢালিয়া দিতাম জল
প্রতি দিন ফুল তুলে গাঁথিতাম মালিকা,
সোনার লতাটি-আহা বন করেছিল আলো,
সে লতা ছিঁড়িতে আছে, নিরদয় বালিকা?

কেমন বনের মাঝে, আছিল মনের সুখে
গাঁঠে গাঁঠে শিরে শিরে জড়াইয়া পাদপে।
প্রেমের সে আলিঙ্গনে, স্নিগ্ধ রেখেছিল তায়,
কোমল পল্লবদলে নিবারিয়া আতপে।
এত দিন ফুলে ফুলে, ছিল ঢল ঢল মুখ,
শুকায়ে গিয়াছে আজি সেই মোর লতিকা।
ছিন্ন-অবশেষ-টুকু, এখনো জড়ানো বুকে
এ লতা ছিঁড়িতে আছে নিরদয় বালিকা?

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

(১) শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বিরচিত—সৃষ্টি।

(২) শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ বিরচিত—সাংখ্য দর্শন

পঞ্চম সংখ্যা পত্রিকার ২১৬ পৃষ্ঠার পর।

আরোহ-প্রণালী কিরূপ আর অবরোহ-প্রণালীই বা কিরূপ, তাহার পরিচয় এক-প্রকার দেওয়া হইয়াছে। এক্ষণে উভয়ের মধ্যে কে কেমন প্রামাণিক, তাহা একবার প্রণিধান করিয়া দেখা যাক্।

এক আপেক্ষিক বস্তু, আর এক সূক্ষ্মতর আপেক্ষিক বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আছে, তাহাও আবার ততোধিক সূক্ষ্মতর বস্তুকে অবলম্বন করিয়া আছে; এইরূপ করিয়া যতই চলা যায়, আরোহ-প্রণালী আপেক্ষিকের উর্দ্ধে কোনক্রমেই যাইতে পারে না।

আরোহ প্রণালীর প্রারম্ভে স্থূল-তম বিষয়, এবং তাহার উপসংহারে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বিষয়।

অবরোহ-প্রণালীর প্রারম্ভে সূক্ষ্মতম বিষয়, পরিণামে স্থূল হইতে স্থূলতর বিষয়।

স্থূল-তম বিষয়, যাহা আরোহ-প্রণালীর ভিত্তিমূল, তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি, এ কথা কেহই জিজ্ঞাসা করেন না,—সকলেই জানেন যে, প্রত্যক্ষই তাহার প্রমাণ। জিজ্ঞাসা কেবল এই যে, সূক্ষ্মতম বিষয়, যাহা অবরোহ প্রণালীর ভিত্তিমূল, তাহা ত প্রত্যক্ষের বিষয় নহে,—তাহার প্রমাণ কি? ইহার উত্তর এই যে, স্থূলের পরাকাষ্ঠা যেমন আমরা জড় বস্তুতে প্রত্যক্ষ করি, সূক্ষ্মের পরাকাষ্ঠা সেইরূপ আমরা বিশুদ্ধ জ্ঞানেতে উপলব্ধি করি। স্থূলগুলি প্রত্যক্ষ করি ইন্দ্রিয়-দ্বারা, সূক্ষ্মতমটি (বিশুদ্ধ জ্ঞান) উপলব্ধি করি আত্মা দ্বারা।

একদিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অপর দিকে আত্ম-প্রমাণ; প্রথমটি স্থূল-সত্যের প্রমাণ, দ্বিতীয়টি মূল-সত্যের প্রমাণ। আমরা যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা একেবারেই স্থূল-বস্তুকে প্রত্যক্ষ করি, সেইরূপ আত্মা দ্বারা একেবারেই সূক্ষ্মতম বস্তুকে উপলব্ধি করি। তাহা যদি না হইত, তবে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, তাহা হইতেও সূক্ষ্মতর এইরূপ করিয়া মনকে ক্রমাগতই শ্রান্ত ক্লান্ত বিভ্রান্ত হইতে হইত, আর, কোথাও বিশ্রাম করিতে না পাইয়া অন্ধকার দেখিতে হইত। অন্ধকার দেখে না যে, তাহার কারণ শুদ্ধ কেবল আত্মার অন্তরতম-জ্যোতি—বিশুদ্ধ জ্ঞান—প্রজ্ঞা।*

এ ধারে প্রত্যক্ষ, ওধারে প্রজ্ঞা, মধ্যে আরোহ অবরোহ এই দুই প্রণালী।

* ইংরাজীতে যাহাকে বলে Pure reason.

আরোহ প্রণালীর প্রারম্ভে প্রত্যক্ষ-প্রমাণ শিরোধার্য্য করিয়াছি, অবরোহ-প্রণালীর প্রারম্ভে বিশুদ্ধ জ্ঞান শিরোধার্য্য করিতেছি। প্রত্যক্ষ-বিষয় যেমন আপনা আপনি সপ্রমাণ, বিশুদ্ধ-জ্ঞানও সেইরূপ আপনা আপনি সপ্রমাণ। ইন্দ্রিয়-মনের যোগে প্রত্যক্ষ বিষয়ের উপলব্ধি হয়, আত্মার যোগে বিশুদ্ধ-জ্ঞানের উপলব্ধি হয়,—প্রজ্ঞার উপলব্ধি হয়। প্রজ্ঞা হইতে নীচে নাবিতে হইলে যুক্তি-সোপান অবলম্বন করিতে হয়, এবং প্রত্যক্ষ হইতে উপরে উঠিতে হইলে অনুমান-সোপান অবলম্বন করিতে হয়। প্রত্যক্ষ হইতে অনুমান-প্রবাহ উর্দ্ধগামী; প্রজ্ঞা-হইতে যুক্তি-প্রবাহ নিম্নগামী।

প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করিলে আরোহ-প্রণালী সম্ভবে না; প্রজ্ঞাকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ না করিলে অবরোহ-প্রণালী সম্ভবে না। প্রত্যক্ষকে যদি প্রমাণ না বল, তবে অনুমানকে প্রমাণ বলিতে পার না; প্রজ্ঞাকে যদি প্রমাণ না বল, তবে যুক্তিকে প্রমাণ বলিতে পার না।

প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানে আরোহণ—ইহাই আরোহ প্রণালী; প্রজ্ঞা হইতে যুক্তিতে অবরোহণ—ইহাই অবরোহ প্রণালী। প্রত্যক্ষ যদি অসিদ্ধ হয়,তবে অনুমান অসিদ্ধ, আরোহ প্রণালী অসিদ্ধ, বিজ্ঞান-শাস্ত্র অসিদ্ধ। প্রজ্ঞা যদি অসিদ্ধ হয়, তবে যুক্তি অসিদ্ধ, অবরোহ প্রণালী অসিদ্ধ, দর্শনশাস্ত্র অসিদ্ধ। আরোহ-প্রণালীর ভিত্তিমূল যে প্রত্যক্ষ তাহারো আমরা প্রমাণ চাহি না, অবরোহ প্রণালীর ভিত্তিমূল যে প্রজ্ঞা, তাহারও আমরা প্রমাণ চাহি না, উভয়কেই আমরা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া জ্ঞানপথে অগ্রসর হই। আমরা ভিত্তিমূলের আর ভিত্তিমূল চাহি না। যদি বল প্রত্যক্ষ যে প্রমাণ তাহার প্রমাণ কি? প্রজ্ঞা যে প্রমাণ তাহার প্রমাণ কি? তবে বল না কেন—প্রমাণ যে প্রমাণ তাহার প্রমাণ কি? ইহাকেই বলে তার্কিকতা।

প্রমাণ-বিষয়ে এত বাহুল্য করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই যে, অনেকে পরের কথা শুনিয়া আপনাকে এবং আপনার মূল পত্তন ভূমিকে একেবারেই উড়াইয়া দিয়া থাকেন। লৌকিক প্রবাদ আছে, কাকে কাণ উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে শুনিলে লোক-বিশেষ বলেন "তাই ত কি হইবে!" শুনিলেন যে, বৈজ্ঞানিকেরা আত্মার ভিত্তিমূলকে উড়াইয়া দিয়াছে, অমনি বলেন "তবে ত তাহা আর নাই! তবে ত আত্মা নাই! বিশুদ্ধ জ্ঞান তবে ত আর টেকে না।" কাকে যে কাণ উড়াইয়া লইয়া যায় নাই, বিশুদ্ধ-জ্ঞানকে যে কেহ উড়াইয়া দিতে পারে না, এই সহজ বিষয়টি যাঁহার সহজে হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাঁহার প্রজ্ঞা-শূন্য বিজ্ঞতা, তাঁহার চক্ষুবিহীন সূক্ষ্মদর্শিতা, তাঁহার শিরোনাস্তি শিরঃপীড়া সহজে আরোগ্য হইবার নহে! সহজ সত্যে ভ্রম পৌঁছিলে তাহার প্রতিবিধান করা সহজ আয়াসের কর্ম্ম নহে। বিশুদ্ধ জ্ঞান যে কতদূর প্রামাণিক, তাহা

একটু ঘোর ফের করিয়া না বলিলে তাঁহাদের বোধগম্য হইবে না।

প্রজ্ঞা সকল-যুক্তিরই প্রমাণ সাধন করে, সুতরাং প্রজ্ঞার প্রমাণ সাধন করিতে পারে এমন যুক্তি সম্ভবে না। প্রজ্ঞার প্রামাণিকতা প্রকারান্তরে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে তাহার একমাত্র উপায় এই যে, প্রজ্ঞা হইতে যে-সকল যুক্তি দোহন করিয়া পাওয়া যায়, সেইগুলি কতদূর প্রামাণিক তাহাই অবধারণ করা।

যুক্তি কাহাকে বলে? না যোগ করা। প্রজ্ঞাকে বিষয়-বিশেষে যোগ করিবার (নৈয়ায়িক ভাষায় বলিতে হইলে ব্যাপক সত্যকে ব্যাপ্য বিষয়েতে যোগ করিবার) পদ্ধতিকেই যুক্তি কহে। প্রজ্ঞার প্রয়োগ-পদ্ধতিকেই যুক্তি কহে। প্রজ্ঞা-মূলক যুক্তি কিরূপ তাহা নিম্নে প্রদর্শন করিতেছি।

সকলেই অবগত আছেন যে, একটা গোলা ক হইতে খ-য়ের দিকে (ক—খ) তাড়িত হইলে, তাহা যদি দ্বিতীয় কোন কিছু দ্বারা চালিত অথবা বাধিত না হয়, তবে তাহা সমান বেগে ক—খ এই সরল রেখায় ধাবিত হইবে। ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, চালক অথবা বাধক বস্তুর অভাবে বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে না; কেন পারে না? না যেহেতু কারণের অভাবে কার্য্য হইতে পারে না। কারণের অভাবে কার্য্য হইতে পারে না,এই যে একটি কথা,এটি প্রজ্ঞার কথা,বিশুদ্ধ জ্ঞানের কথা; চলন্ত গোলাটি ঐ প্রজ্ঞা-তত্ত্বটির অন্যথাচরণ করিতে পারে না। কার্য্যতঃ আমরা কোন বস্তুকে অনন্ত কাল নিরবচ্ছিন্ন সমান বেগে চলিতে দেখি নাই দেখিব না। সুতরাং উপরিউক্ত সত্যটির প্রত্যক্ষ প্রমাণ অসম্ভব; প্রজ্ঞা-মূলক যুক্তিই উহার একমাত্র প্রমাণ, তদ্ভিন্ন আর দ্বিতীয় প্রমাণ সম্ভবে না।

দ্বিতীয়তঃ প্রজ্ঞা-মূলক যুক্তি দ্বারা ইহাও সমর্থিত হইতে পারে যে, গোলাটি ক হইতে খ-য়ের দিকে তাড়িত হইলে দ্বিতীয় কোন চালক অথবা কোন বাধক বস্তুর অভাবে ক—খ এই সরল রেখাতেই চলিবে, বক্র রেখাতে চলিবে না। যথাঃ—

(ক⊖খ) ক এবং খ য়ের মধ্যে একটি-বই সরল রেখা সম্ভবে না। কিন্তু ও-দুয়ের মধ্যে এই সমতল কাগজে ঐ দুটি (এবং তদ্ভিন্ন অসংখ্যটি) অবিকল সমান বক্ররেখা অঙ্কিত হইতে পারে। ক হইতে খয়ে পৌঁছিতে হইলে গোলাটির পক্ষে দুটি রেখাই ঠিক সমদূর, সম কোণ, সমবক্র, সর্ব্বপ্রকারেই সমান; সুতরাং একটিকে ছাড়িয়া অন্যটিতে যাইবার একেবারেই কারণাভাব; কারণাভাবে কার্য্য হইতে পারে না; সুতরাং গোলাটি বক্র-রেখা-দুটির কোনটিতেই চলিতে পারে না; সুতরাং তাহা সরল রেখাতে চলিবেই চলিবে। দেখ কারণাভাবে কার্য্য হয় না, এইমাত্র প্রজ্ঞা-বলেই আমরা স্থির-নিশ্চয় করিতে পারিতেছি যে, গোলাটি কথিত অবস্থায় সরল ভিন্ন বক্রপথে কখনই চলিবে না।

কম্‌টির মতে পরীক্ষাসাধ্য ভবিষ্যৎ-বাণী প্রামাণিকতার প্রধান একটি লক্ষণ। প্রজ্ঞার ভবিষ্যৎবাণী পরীক্ষার প্রয়োজন

রাখে না, অথচ তাহা কেমন নিশ্চিত উপরে ঐ ত দেখা গেল। একটা গোলা সমান বেগে সরল রেখায় অনন্ত কাল চলিবে, এব্যাপারটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গেলে যুগযুগান্তরেও পরীক্ষার শেষ হইবে না। এখানে পরীক্ষা থই পাইতেছে না—ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। " কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারে না " শুদ্ধ কেবল এই স্বতঃ-সিদ্ধ মূল-তত্ত্বের বলে উপরের ঐ সিদ্ধান্তটি অকাট্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে।

এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রজ্ঞা-হইতে যুক্তিতে অবতরণ করিয়া যে সকল সত্য উপার্জ্জন করা যায়, তাহা প্রত্যক্ষের গোচর হয় হউক, না হয় না হউক, কোন অবস্থাতেই তাহার নিশ্চয়তা এক বিন্দুও এদিক ওদিক হইতে পারে না।

আনুমানিক-সত্য যত আছে, পরীক্ষাই তাহাদের সর্ব্বস্ব। পরীক্ষার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয়, তাহাদের পক্ষে ততই ভাল—ততই তাহাদের মূল দৃঢ় হয়। সর্পের পদ কেহই আমরা দেখি নাই, অথচ আমরা সাহস করিয়া এরূপ বলিতে পারি না যে, সর্পের পদ কখনই সম্ভবে না। যদি কোন বন্ধুজনের মুখে শুনি যে, অমুক দেশে পদ-বিশিষ্ট সর্প দেখা দিয়াছে, তবে এই বলি "আশ্চর্য্য কি, হইলেও হইতে পারে।" কিন্তু যদি সেই ব্যক্তির মুখে শুনি যে, অমুক দেশে কারণ-বিহীন কার্য্য দেখা দিয়াছে, তবে আমরা তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করি যে, লোকটির মস্তকে দোষ জন্মিয়াছে! সত্য বটে যে, ভারতবর্ষীয় এত লোকের মধ্যে কেহই আমরা সর্পের পদ একবারও দেখি নাই; তথাপি কোনও দেশে পদবিশিষ্ট সর্প আছে কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দোষ কিছুমাত্র নাই বরং গুণই আছে; কিন্তু বিনা-কারণে কার্য্য হইতে পারে কি না, ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে যাওয়া বাতুল ভিন্ন আর কাহারো কর্ম্ম নহে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রজ্ঞার প্রমাণ পরীক্ষাধীন নহে, প্রজ্ঞা স্বতঃসিদ্ধ।

প্রত্যক্ষ-গোচর স্থূল বিষয়েতে প্রজ্ঞার প্রয়োগ করিয়া, প্রজ্ঞার বল কার্য্যে কতদূর, তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি;—এই দেখিয়াছি যে, গোলা-একটা জড়পিণ্ড বই নয়, অথচ তাহা দুই দিকের দুই বক্র পথ পরিত্যাগ করত সোজা পথ দিয়া ক হইতে খ-য়ে পৌঁছিতেছে। গোলাটা স্থূল, কিন্তু তাহার উপরি-উক্ত কার্য্যটা অতি সূক্ষ্ম। দুই দিকের কোন দিকে না হেলিয়া ঠিক্ মধ্যস্থ অবলম্বন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। পথ-টি যেমন সোজা, সোজা পথে চলা-টি তেমন সোজা নহে। ক এবং খ-য়ের মধ্যে অসংখ্যটি বাঁকা পথ, একটি মাত্র সোজা পথ। গোলাটা প্রতিমুহূর্ত্তে সেই সোজা পথটিই বাছিয়া লইতেছে। গোলাটা-কর্ত্তৃক এই যে সূক্ষ্ম কার্য্য একটি সম্পাদিত হইতেছে—স্থূলের মধ্যে এই যে একটি সূক্ষ্ম ব্যাপার দৃষ্ট হইতেছে—ইহার মূল কোথায়? প্রজ্ঞার এই যে বিধান যে—কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হইবে না,

এইটিই উহার মূল, তাহার আর ভুল নাই; ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রমাণ যথেষ্ট দেওয়া হইয়াছে।

এস্থলে এইটি যেন মনে থাকে যে, যদিও প্রজ্ঞার মূলতত্ত্ব-গুলিকে দেশকালে প্রয়োগ করিয়া দেখিলে সহজেই তাহার (প্রজ্ঞার) প্রামাণিকত্ব আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়, তথাপি প্রজ্ঞার প্রকৃত প্রমাণ যুক্তি হইতে পাওয়া যায় না—স্বতঃসিদ্ধতাই প্রজ্ঞার প্রকৃত প্রমাণ। দীপ-শিখা যেমন আপনাকে প্রকাশ করে, এবং তাহার কিরণ প্রবাহ যেমন অন্যকে প্রকাশ করে, প্রজ্ঞা সেইরূপ গোড়ায় আপনাকে প্রমাণ করে, এবং তাহার যুক্তিপ্রবাহ বিষয়ান্তর প্রমাণ করে। দীপের কিরণই দীপশিখাকে অপেক্ষা করে, যুক্তিই প্রজ্ঞাকে অপেক্ষা করে। প্রজ্ঞা প্রামাণিক বলিয়াই যুক্তি প্রামাণিক, ইহার উল্‌টা সম্ভবে না। বিশেষ একটি অভিব্যক্তি অথবা প্রত্যক্ষ ঘটনার উপরে প্রজ্ঞার প্রয়োগ যাহা উপরে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সেই-প্রজ্ঞার প্রয়োগ, যে-প্রজ্ঞার নিকট পৃথিবীও যা, সৌরজগৎও তাই, সৌরজগৎও যা, নাক্ষত্রিক জগৎও তাই, আতাফলও যা, দ্যুলোক ভূলোকও তাই। অতএব প্রজ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতম ব্যাপকতম এবং বলবত্তম প্রমাণ।

পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে, আরোহ-প্রণালী অনুসরণ করিয়া সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ততোধিক সূক্ষ্মতর, এরূপ করিয়া চলিলে, যে জন্য চলা, তাহা সফল হয় না, ধ্রুব সত্যে পৌছান যায় না, সূক্ষ্মতমে পৌছান যায় না। আরোহ-প্রণালী যেখানেই থামে সেইখানেই "এ নয় ইহা অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর" এই কথাটি স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পায়। মূলসত্য সম্বন্ধে আরোহ প্রণালী "ইহা নহে ইহা নহে" ইহাই ক্রমাগত বলিতে থাকে। ইহা যদি নহে তবে কি?—আরোহ প্রণালীর মুখে আর কথা নাই।

প্রজ্ঞা আপনার স্বজ্যোতিতে আপনি প্রকাশ,—প্রজ্ঞা বলেন "আমিই সেই সূক্ষ্মতম সার্ব্বভৌমিক সার্ব্বকালিক মূলসত্য যাহা তুমি চাহিতেছ। আমা দ্বারাই সমস্তের সহিত প্রত্যেকের, পূর্ব্বের সহিত পশ্চাতের অনাদি নিয়মের সহিত অনন্ত ঘটনার যোগ রক্ষিত হইতেছে। আমিই সেই সূক্ষ্মতম যোগ-সূত্র যাহা আকাশের রোমে রোমে এবং কালের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে।" প্রজ্ঞা এক জনের আত্মাতে নহে, কিন্তু প্রতি জনের আত্মাতে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে। আমরা প্রতিজনে যেমন একই সূর্য্য বাহিরে অবলোকন করি, সেইরূপ প্রতিজনে একই প্রজ্ঞা অন্তরে উপলব্ধি করি। চক্ষু যেমন কর্ণ হইতে ভিন্ন, এক জীবাত্মা তেমনি অন্য জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। আবার, যে মন চক্ষুর অভ্যন্তরে থাকিয়া দেখিতেছে, সেই মনই কর্ণের অভ্যন্তরে থাকিয়া শুনিতেছে, এ যেমন, তেমনি যে প্রজ্ঞা এক জীবাত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া ধ্রুব সত্য প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রজ্ঞা অন্য জীবাত্মার অভ্যন্তরে থাকিয়া ধ্রুব সত্য প্রকাশ করিতেছে। চক্ষেতে কর্ণেতে প্র-

ভেদ আছে কিন্তু চক্ষের ভিতরকার মনেতে (দ্রষ্টাতে) আর কর্ণের ভিতরকার মনেতে (শ্রোতাতে) কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সেই রূপ আমাতে তোমাতে প্রভেদ আছে সত্য কিন্তু আমার ভিতরকার প্রজ্ঞাতে আর তোমার ভিতরকার প্রজ্ঞাতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। চক্ষু-ব্যবচ্ছেদে বা কর্ণ ব্যবচ্ছেদে যেমন মনের ব্যবচ্ছেদ হয় না, সেইরূপ শরীর-ব্যবচ্ছেদে প্রজ্ঞার ব্যবচ্ছেদ হয় না; মনের অবস্থান্তরেও প্রজ্ঞার অবস্থান্তর হয় না। সকল ইন্দ্রিয়ই যেমন মন-হইতে চেতন পায়, সকল আত্মাই সেইরূপ প্রজ্ঞা হইতে জ্ঞান পাইতেছে। যুক্তি-কুশল পণ্ডিতগণ প্রজ্ঞাকে নানা বিষয়ে প্রয়োগ করিতে জানেন, অনভিজ্ঞ লোকে তাহা জানে না; তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ প্রজ্ঞাকে অস্থির মনো-বৃত্তি সকল হইতে বাছিয়া লইতে জানেন, অনভিজ্ঞ লোক তাহা জানে না, প্রজ্ঞাকে কেহ বা চিনিয়াছে কেহ বা চিনে নাই,—আছেন তিনি সর্ব্বত্র। প্রজ্ঞা সকল-প্রভেদ অগ্রাহ্য করিয়া, সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, সকল ব্যবধান দূর করিয়া, সকল শূন্য পূর্ণ করিয়া সমান বলে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে ঐ যে স্বপ্রকাশ জ্যোতিঃস্বরূপ প্রজ্ঞা, যাহাতে করিয়া সমুদায়ের সহিত প্রত্যেকের, কারণের সহিত কার্য্যের, অসীমের সহিত সসীমের যোগ রক্ষিত হইতেছে, তাহাতেকরিয়াই আমরা পরমাত্মাকে জানিতে পাই যে, তিনিই বিশুদ্ধ-জ্ঞান-স্বরূপ, তিনিই প্রজ্ঞান-ঘন, সমুদায়ের এবং প্রত্যেকের তিনিই অন্তরাত্মা তিনিই এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা। এক্ষণে প্রজ্ঞামূলক যুক্তিকে সহায় করিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং প্রকরণ বিষয়ে যাহা আমাদের বলিবার আছে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রথমে দেখিয়াছি যে, আপেক্ষিক সত্য মাত্রই অসীম নিরবলম্ব সত্যকে অপেক্ষা করে; তাহার পরে দেখিয়াছি যে, আত্মা হইতে জড়ের দিক্ অসীম সত্যের দিক্ নহে, জড় হইতে আত্মার দিক্ই অসীম সত্যের দিক্; এখন তদপেক্ষা আরও অধিক এই দেখিতেছি যে, আত্মা হইতে বিশুদ্ধজ্ঞানের দিক্ অসীম সত্যের দিক্। বিশুদ্ধজ্ঞান যাহা জীবাত্মাতে আছে, তাহা ব্যক্তি-নিষ্ঠ নহে, তাহা সত্য-নিষ্ঠ। ব্যক্তিবিশেষ যখন অভ্যাসবশতঃ বা সংস্কার বশতঃ বা ভ্রমবশতঃ বা বাসনা বশতঃ কোন বিষয়কে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তখনকার সেই যে জ্ঞান, তাহাই ব্যক্তিনিষ্ঠ; কিন্তু কোন বিশেষ ব্যক্তি নহে, পরন্তু সাধারণতঃ সকল ব্যক্তিই সমুদায় আত্মার সহিত যখন কোন বিষয়কে স্বতঃসিদ্ধ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, তখনকার সেই যে জ্ঞান তাহা ব্যক্তি-নিষ্ঠ নহে—তাহা সত্যনিষ্ঠ; কেননা তাহা ব্যক্তি-বিশেষের পরিবর্ত্তনশীল মনের গতির উপর নির্ভর করে না, তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ধ্রুব সত্যের উপরেই নির্ভর করে। মূল-সত্য পরমাত্মাই প্রজ্ঞারূপে প্রতিজনের আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। আমাদের আত্মা মন-দ্বারা বিষয়ের সহিত

এবং প্রজ্ঞা-দ্বারা পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত রহিয়াছে। পরমাত্মা জীবাত্মাকে দেহবদ্ধ করিয়া পরিমিত করিয়াছেন, এবং আপনার প্রতি আকর্ষণ করিয়া উন্নত হইতে উন্নততর ধামে লইয়া যাইতেছেন; ইহাতেই আমরা বুঝিতেছি যে, জীবাত্মার মঙ্গলই সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য।

পরমাত্মার কিছুই অভাব নাই তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ-স্বরূপ; অতএব ইহা হইতে পারে না যে, তিনি আপনার কোন অভাব মোচনার্থে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; ইহাই সঙ্গত যে আমারদের-সকলকার অভাব মোচনার্থেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে, জীবাত্মা, পরমাত্মার শক্তিতে তন্ময়ীভূত ছিল, তখন জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না; স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অভাব এই যে তাহার ছিল, তাহা মোচন করা জগৎ সৃষ্টির একতম উদ্দেশ্য। পরমাত্মা যদি জীবাত্মার সকল অভাব এক মুহূর্ত্তেই পূরণ করেন, তিনি যদি তাহাকে এককালেই পূর্ণতা প্রদান করেন, তবে তাঁহাতে আর জীবাত্মাতে কিছুই আর প্রভেদ থাকে না; তাহা হইলে পরমাত্মা আপনিই প্রকাশ পান, তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছুই আর প্রকাশ পায় না, জীবাত্মা আর প্রকাশ পায় না; তাহা হইলে স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অভাব জীবাত্মার যেমন ছিল, তেমনিই থাকে। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়া সৃষ্টি না করিলে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোন মতেই রক্ষা পাইতে পারে না। অতএব, পরমাত্মা, জীবাত্মাকে পরিমিত করিবার জন্যই যে পরিমিত করিয়াছেন তাহা নহে, জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমর্থন করিবার জন্যই তাহাকে পরিমিত করিয়াছেন। পরমাত্মা এক দিকে জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়া, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যে একটি অভাব তাহার ছিল, তাহা পূরণ করিয়াছেন; আর একদিকে তাহাকে অনন্ত উন্নতির যোগ্যতা প্রদান করিয়া অপূর্ণতা-নিবন্ধন তাহার যে একটি অভাব আছে, তাহাও পূরণ করিয়াছেন। জীবাত্মার অভাব পূরণ যতদূর করিতে হয়, পরমাত্মা তাহা করিয়াছেন। জগৎ সৃষ্টির একতম উদ্দেশ্য জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমর্থন করা, অন্যতম উদ্দেশ্য জীবাত্মার অনন্ত উন্নতি সমর্থন করা। অতএব সংশয়ান্ধ ব্যক্তিগণের যাহাতে চক্ষু ফুটিবে তাহার মন্ত্র এই।—

"জীবাত্মন্, পরিমিত না হইলে তুমি হইতেই পারিতে না; অতএব হওয়া যদি মঙ্গল হয়, তবে সে মঙ্গলের জন্য পরমাত্মাকে ধন্যবাদ দেও। আর যদি পরিমিত-ভাবকে অমঙ্গল ভাবো, এবং অসীম-ভাবকে মঙ্গল ভাবো, তবে যিনি অসীম-উন্নতি-পথের দ্বার তোমার জন্য খুলিয়া রাখিয়াছেন, যিনি আপনার অসীম ভাবের আকর্ষণ দ্বারা তোমার পরিমিত ভাবের দোষ যত দূর খণ্ডন করিতে হয় তাহা করিয়াছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ দেও।" দেখ সৃষ্টির উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, শুদ্ধ কেবল জীবাত্মার মঙ্গল।

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ।

৫ সংখ্যক পত্রিকার ২২৩ পৃষ্ঠার পর।

ইংরাজ ভক্ত গোবিন্দরাও বলিলেন:— "বিদেশীয় রাজা বলিয়া যাই বল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইংরাজদের আগমনে আমাদের দেশ সুপ্তাবস্থা হইতে উত্থিত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। ব্রিটিষ ভারতবর্ষ ও দেশীয় রাজ্য এ উভয়ের অবস্থা আলোচনা করিয়া দেখিলে তাহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেশীয় রাজ্যে রাজকার্য্যের কিরূপ বিশৃঙ্খলা, রাজার কিরূপ অত্যাচার, প্রজাগণের কি দুর্দ্দশা! ইংরাজরাজ্য কি তাহা অপেক্ষা শতগুণে উৎকৃষ্ট নহে? আমরা যদি আপনাদের রাজ্য আপনারা চালাইতে পারিতাম, তাহা হইলে ত কোন কথাই নাই। কিন্তু আমাদের মধ্যে ঐক্য কোথায়? জাতীয় বন্ধন কোথায়? আমরা আত্ম-সংরক্ষণে অক্ষম বলিয়াই ত ইংরাজেরা এ দেশ জয় করিয়াছে, নতুবা তাহাদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইত না। আমাদের স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের ক্ষমতা নাই বলিয়াই বিদেশীয় রাজার শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। তোমার ভাবের ভাবুকগণ বিদেশীয় রাজ্যের প্রতি দোষারোপে তৎপর, কিন্তু তাহার বিনিময়ে কি পাইবে? স্বাধীন রাজ্য? জাতীয় গৌরব? না অরাজকতা, অন্যায় অত্যাচার, পরস্পর বিদ্বেষ, পরস্পর বিবাদ বিচ্ছেদ; ব্রিটিষ তরবারি এই সকল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে—সুতরাং বিদেশীয় রাজ্য-রক্ষা-নিবন্ধন যে অধিক অর্থ ব্যয় ও আর আর কতক বিষয়ে ক্ষতি তাহা অবশ্য আমাদের দায়ে পড়িয়া স্বীকার করিতে হইতেছে। আমাদের সঙ্গে ইংরাজদের ভাবে মেলে না,—আমাদের পরস্পর মমতা নাই, কি করা যায়, তাহার কোন উপায়ান্তর নাই। যত দূর পারা যায় মন্দের মধ্য হইতে ভালটুকু বাছিয়া লইতে হইবে। যে পাশ্চাত্য জ্ঞানসূর্য্য উদয় হইয়াছে, তাহার আলোক যথাসাধ্য বিকীর্ণ কর! পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে যে স্বাধীনতার ভাব যে উন্নতির ভাব লাভ করা যায়, তাহা শিক্ষা করিয়া স্বজাতির উৎকর্ষ সাধনে নিয়োগ কর। সভ্য জাতিকে সভ্যতার অস্ত্রে বশ করিয়া যতদূর সাধ্য দেশের কল্যাণ সাধন কর। গতানুশোচনায় কি ফল? যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহার প্রতিরোধের চেষ্টা বৃথা। বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়া দেশহিতকর কার্য্যে ব্রতী হও। স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করায় লাভ কি? ভারতের ভাগ্য নিন্দা করিয়া বৃথা আক্ষেপের প্রয়োজন কি?"

দেশানুরাগী দাদাজি ক্ষণ কাল স্তব্ধ থাকিয়া অধীর স্বরে উত্তর করিলেন— "আমাদের আর আছে কি? যাহা ছিল সকলই গিয়াছে। এক সময় ভারত স্বাধীন ছিল ও স্বতেজে পৃথিবীকে আলো-

ক্ষিত করিয়াছিল,—এখন সে পরাধীন। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সকলি গিয়াছে। তাহার সন্তানগণের আক্ষেপ ভিন্ন আর কি গতি? সে পথটুকুও কি বন্ধ করিতে চাও? বালকের বল ক্রন্দন—আমাদেরও তাই। আমরা ত নিরস্ত্র "নিঃসত্ত্ব-পরাণ" হইয়াছি। তুমি চাও যে, আমরা আপনাদের অবস্থা ভুলিয়া থাকি, কিন্তু তাহা পারি কৈ? তুমি বলিতেছ আমাদের জাতীয় বন্ধন নাই, জাতীয় ঐক্য নাই, সেটি কিসে হয় তাহা দেখিতে হইবে। ধনাঢ্য ব্যক্তির মোসাহেব হইয়া থাকিলে খাওয়া পরার কোন ভাবনা থাকে না সত্য বটে, কিন্তু সেই কি সুখের অবস্থা? স্বাধীন ভাবে শাকান্ন আহার করিয়া দিনপাত করা ভাল, পরাধীন হইয়া রাজপ্রসাদ উপভোগ করাও কষ্টকর, এ কি তুমি অস্বীকার করিতে পার? আমাদের দেশের যদি প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি সাধন করিতে চাও, ত তাহা আমাদের স্বতেজে, নিজ বলে, আপনাদের মধ্য হইতেই করিতে হইবে। পরের উপর নির্ভর করিয়া তাহা সাধিত হইবে না। বিদেশীয় রাজা যতই প্রজাবৎসল হউন না কেন, সে রাজ্যের এক প্রধান দোষ এই যে, তাহাতে বাস করিয়া আমাদের আত্মনির্ভর, স্বাধীনতা, স্বাবলম্বন ক্রমেই শিথিল হইতে থাকে, জাতীয় ভাব ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া যায়। পরের অনুগ্রহের উপর সকল নির্ভর, আমরা আপনার জন্য কিছুই করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট যাহা করিয়া দিবেন, তাহাতেই আমাদের নিস্তার। যদি দেশের কোন অমঙ্গল নিবারণ করিতে চাহি, কোন সামাজিক উৎকর্ষ-সাধন করিতে ইচ্ছা করি, তাহার জন্য গবর্ণমেণ্টের দ্বারে গিয়া বলি—ভিক্ষাং দেহি। ইহা অপেক্ষা কোন জাতির অধিক হীনাবস্থা আর কি হইতে পারে? ইংরাজদের রাজত্ব এত কাল রহিয়াছে, তাহার বিষ-ফল আমরা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি। আমরা সভ্যতার নামমাত্র গ্রহণ করিয়া বাহ্য আচার ব্যবহার পরিবর্ত্তনের প্রতিই উন্মুখ রহিয়াছি। আহার পান বিষয়ে যথেচ্ছাচারই আমাদের সভ্যতার পরাকাষ্ঠা। পশ্চিমবাসীদের সহিত সংস্রব হইয়া আমরা তাহাদের কতকগুলি বাহ্য আড়ম্বরেই মুগ্ধ থাকি। তাহাদের বাহ্য সভ্যতাই আমাদের দেহ মনকে আকর্ষণ করিতেছে। এক সভ্য জাতি অন্য এক দুর্ব্বল জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিলে যে সকল অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, আমাদের দেশে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই আকর্ষণ-বলে এ দেশের যে সকল আধ্যাত্মিক উন্নত ভাব, তৎসমুদায় ক্রমে অস্তমিত হইতেছে। আমাদের জাতীয়তা ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। পরাধীনতা-অন্ধকারে আমরা এরূপ আবৃত রহিয়াছি যে, কি ভাল কি মন্দ তাহা আমরা ইংরাজের চক্ষু দিয়াই দর্শন করি। আমরা মান মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরাজদের উপরেই তাকাইয়া থাকি। আমাদের দেশের কি উপযোগী ও প্রকৃত কল্যাণকর সে বিষয়ে আমরা বাস্তবিক অন্ধ। ইহা

অপেক্ষা অধিক দুরবস্থা আর কি হইতে পারে? বিদেশীয় রাজার স্বার্থ এই যে, প্রজাগণ নিঃসত্ত্ব ও দুর্ব্বল হইয়া তাহার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে শিখুক, প্রজারাও যদি সেই দিকেই ধাবিত হয়, তাহারা যদি সেই স্রোতের প্রতিকূলে সন্তরণ করিতে না চায়,তবে তাহাদের উদ্ধারের আর উপায় নাই। ইংরাজদের নিকট হইতে আমরা যে সকল উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হও, আমি 'না' বলিব না, কিন্তু ভাই, তাই বলিয়া তোমরা স্বজাতির প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হইও না। রোগী যদি রোগের যাতনা অনুভব করিতে না পারিয়া আপনাকে সুস্থ মনে করিয়া কার্য্য করে, ত নিশ্চয় জেনো তাহার আসন্ন কাল উপস্থিত। জাতির পক্ষেও এই নিয়ম। তুমি ভাই যাই বল, আমি ত কখনই মনে করিতে পারি না যে, ইংরাজ-রাজ্যে আমাদের সুখের পরাকাষ্ঠা। গণ্ডের উপর আবার বিস্ফোটক, একে পর-রাজ্য, তাহাতে আবার ইংরাজদের উদ্ধত স্বভাব, তাহাদের ও আমাদের মধ্যে ভাবের অমিল। তাহাদের জাতীয় স্বার্থপরতা, অনুদারতা, অহঙ্কার দেখিয়া আমাদের বিদ্বেষানল সততই প্রজ্বলিত থাকে। ইহা যেন মনে থাকে যে, আমাদের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে রাজার স্বার্থ এবং প্রজার স্বার্থ পরস্পর-বিরোধী। সুতরাং রাজ-ভক্তির মূলেই কুঠারাঘাত। দেশীয় বাণিজ্য ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি হইলে মাঞ্চেষ্টর হইতে হাহাকার উঠে। আমাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রচার হইলে রাজপুরুষদের ভয় হয় পাছে আমরা তাহাদের সমকক্ষ হইতে সাহসী হই, পাছে তাহাদের অধিকৃত উচ্চ কর্ম্মস্থানগুলি অধিকার করিয়া লই। ইংরাজ-রাজ্য হইতে আমাদের ইষ্টানিষ্টের তুলনা করিলে বেশীর ভাগ কি দাঁড়ায়, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এই সম্বন্ধে মহাত্মা সর টমস্ মন্‌রোর নিম্ন-লিখিত হৃদয়-ভেদী কথাগুলি আমাদের প্রণিধান যোগ্যঃ—

ব্রিটিষ রাজ্য হইতে এদেশীয় লোকদিগের লাভালাভ তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, লাভের ভাগ যত অধিক হওয়া উচিত তাহা হয় নাই। বাহিরের যুদ্ধ বিগ্রহ অথবা আভ্যন্তরীণ বিপ্লবাদি হইতে তাহারা সুরক্ষিত সন্দেহ নাই, তাহাদের ধন প্রাণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংরক্ষিত, কর্ত্তৃপুরুষদের দ্বারা তাহাদের বিনাপরাধে দণ্ড অথবা অর্থাপহরণের সম্ভাবনা নাই, আর তাহাদের করভারও অপেক্ষাকৃত লঘু। কিন্তু আর একদিকে দেখ, তাহাদের জন্য যে সকল আইন হইতেছে,তাহার রচনাতে তাহাদের কোন হস্ত নাই ও কনিষ্ঠ পদের কর্ম্মচারীদের যতদূর সম্ভবে তদ্ভিন্ন সেই সকল আইন জারী করিবারও তাহাদের অধিকার নাই। সিবিল্ অথবা সৈনিক বিভাগের উচ্চ পদবীতে আরোহণে তাহারা অসমর্থ। যাহারা দেশের প্রাচীন কর্ত্তা ও নেতা, তাহারা হীন পরাধীন জাতিরূপে, দাস ও অনুচররূপে সর্ব্বত্র পরিগণিত।

দেশীয়দিগকে ন্যায়াবহ রাজনিয়ম ও

লঘু করের সুফল প্রদানেই যথেষ্ট হইল তাহা নহে। তাহাদের জাতীয় স্বভাব উন্নত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু বিদেশীয় রাজার রাজ্যে তাহাদের অবনতির এত রাশি রাশি কারণ রহিয়াছে যে, অধঃপতন হইতে তাহাদিগকে তুলিয়া রাখা দুষ্কর। এক প্রাচীন উক্তি আছে, "He who loses liberty loses half his virtue" যে ব্যক্তি স্বাধীনতা হারাইয়াছে সে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম হারাইয়াছে, ইহা যেমন প্রতিজনের পক্ষে তেমনি জাতির পক্ষেও খাটে। যে ব্যক্তির কিছুই সম্পত্তি নাই,সে যেমন কৃপাপাত্র,যে জাতির সমুদয় সম্পত্তি পররাজ্যের অধীন, সে তদপেক্ষা ন্যূন নহে! ক্রীতদাস যেমন স্বাধীন জীবের অধিকার হইতে বিচ্যুত, পরাজিত জাতি সেইরূপ জাতীয় অধিকার হইতে। সে অধিকার কি, না আপনাদের জন্য করস্থাপন, আপনাদের জন্য আইন-বন্ধন, স্বরাজ্যের রাজকার্য্য পরিচালন; ব্রিটিষ ভারতবর্ষ এই সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত। পররাজ্য সুখময় হইলেও স্বজাতীয় রাজার একাধিপত্য ততোধিক প্রার্থনীয়। যদি অধীনতাই স্বীকার করিতে হয়, ত বিদেশী অপেক্ষা দেশীয় রাজার আধিপত্য স্বীকার করা বিজিত জাতির অধিক গৌরবের বিষয়। রাজ্য প্রজাতন্ত্রই হউক আর সাম্রাজ্যই হউক, তাহাদের বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহার প্রজাগণ সর্ব্বদাই তৎপর থাকে। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া জাতীয় ভাব উত্তেজিত হয়, এবং এইরূপ সঙ্কট-স্থলে প্রজাগণ ঐ উভয়বিধ রাজ্য রক্ষাতেই প্রাণপণে যত্নশীল হয়। বিদেশীয় রাজার অধীনতা স্বীকার করিলে যেমন জাতীয় ভাবের ও জাতীয় গৌরবের নাশ হয়, দেশীয় রাজার যদৃচ্ছ শাসনে তেমন হয় না। যখন জাতীয় ভাব বিনষ্ট হইল, তখন সমাজগত ব্যক্তিগত জীবনে যাহা কিছু মহৎ যাহা কিছু প্রশংসনীয়, সকলই সমূলে শুষ্ক হয়, এবং জাতীয় ভাবের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বভাবেরও অধঃপাত হয়।"

আমার বন্ধুদ্বয় শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে যেরূপ তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন,তদ্বিষয়ে আমি আর অধিক কিছু বলিব না। ভারতবর্ষীয় ইংরাজদের আচার ব্যবহার সমালোচনা করিতে মনস্থ করিয়াছি, এক্ষণে তাহাতেই প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

আংলো ইণ্ডিয়ানের প্রকৃত ভাব যদি দেখিতে চাও, ত মফস্বলের কোন এক নামাঙ্কিত নগরে তাহাদিগকে দর্শন কর। সেখানে হয় ত একদিকে ইউরোপীয় অথবা দেশীয় দুই এক সেনাদল প্রতিষ্ঠিত ও তৎসম্বন্ধে কয়েকজন সৈনিক পুরুষ অবস্থিত আছে, অপর দিকে জজ কালেক্টর প্রভৃতি সিবিলিয়ান দল রাজত্ব করিতেছেন, একদিকে লালকোট, অন্যদিকে কালকোট। সেনাদলের মধ্যে লেফ্‌টেনণ্ট, কাপ্তেন, মেজর, লেফ্‌টেনণ্ট কর্ণেল, কর্ণেল ও সর্ব্বোচ্চ-শিখরে সৈন্যাধ্যক্ষ জেনেরল সাহেব বিরাজিত। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত, অল্পসংখ্যক ব্যক্তি

সস্ত্রীক হইয়া রাজ্য ভোগ করেন। মিলিটরিদিগের মধ্যে সকলে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করেন না। "মেস্" নামক তাঁহাদের সাধারণ ভোজনালয় প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইবে। যেখানে সৈনিক দলের আবাস, সেখানে এক কিম্বা একাধিক মেস্ প্রতিষ্ঠিত। যাঁহারা বিবাহিত তাঁহারা প্রায় নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করেন, তদ্ভিন্ন আর আর সকলে প্রায় প্রতিদিন মেসেই আহারাদি করিয়া থাকেন। ইহা সাধারণের মিলিবার স্থান। মধ্যে মধ্যে বাহিরের লোকদের নিমন্ত্রণ হয়। সেই নিমন্ত্রণ-রাত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক সমারোহে ভোজাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়। মেস যেমন মিলিটারিদের জন্য, ক্লব তেমনি সর্ব্ব সাধারণ ইংরাজের জন্য প্রতিষ্ঠিত। কলিকাতা মান্দ্রাজ বোম্বাই পুণা প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে ইংরাজদিগের সাধারণ-সম্মিলন স্থান এক একটি ক্লব দৃস্ট হয়। মিলিটরি, সিবিলিয়ন ও ইংরাজদের মধ্যে আর আর বাছাগোছা লোক তাহার অঙ্গীভুত। এই সকল ক্লবে "নেটিব"দের প্রবেশের অধিকার নাই। ইংলণ্ডে গিয়া তুমি হয়ত বিক্‌টোরিয়া সাম্রাজ্ঞীর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করিয়া আসিবে, কিন্তু এখানকার এক সামান্য ক্লবে তোমার প্রবেশের দ্বার রুদ্ধ। এই সকল ক্লবে বাসের নিয়ম, গৃহ সজ্জা, আহারাদির পারিপাট্য,পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, ভৃত্যদের কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়। আমরা বিলাতে যে এই সকল চাকচিক্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাই তাহা আশ্চর্য্য নহে। এ দেশে আমাদের চক্ষে এ সকল সচরাচর পতিত হয় না বলিয়া আমরা এক প্রকার সুস্থির থাকি, ইংলণ্ডে গিয়া ইংরাজ-মহলে প্রবেশ করিয়া আমাদের মস্তক এরূপ ঘূর্ণিত হইয়া যায় যে, আপনারা আপনাকে স্থির রাখিতে পারি না। স্বদেশের প্রতি মমতা চলিয়া যায়, দেশীয়দিগের উপর অসভ্য বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা জন্মে। যাহা ইংরাজী তাহাই সেব্য, যাহা দেশীয় তাহাই ত্যাজ্য। হায়! ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের চক্ষু ফুটে,আমরা দেখিতে পাই যে, এ জাদুর রাজ্য আমাদের নহে, আমরা যে ইংরাজের পদধূলি লইতে যাই, তাহাদের পদাঘাত পাইয়া আমাদের অবশেষে চেতনা হয়।

এখানকার অধিকাংশ ইংরাজেরা কাজ কর্ম্মে সমস্ত দিবস ব্যস্ত থাকে। তাহাদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয়ের বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। যখন কোন ব্যক্তি কোন এক নূতন ষ্টেসনে বাস করিতে আসেন, তাঁহার উচিত যে, তিনি প্রথমে বাসন্দাদিগের বাটীতে গিয়া তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বিশেষতঃ বিবাহিত লোকদের বাটী গিয়া মহিলাগণের সহিত পরিচিত হওয়া তাঁহার প্রধান কার্য্য। তিনি নিজে যদি অবিবাহিত হন, ত কোন ভদ্রস্ত্রী তাঁহার বাড়ী আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন না। তিনি যদি কোন পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করেন, ত তাঁহার নিকট হইতে প্রতিসাক্ষাৎকার প্রত্যাশা করেন,

যদি কোন পরিবারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তবে হয় পুরুষের নিকট হইতে প্রতিসাক্ষাৎকার, নয় গৃহিণীর নিকট হইতে ভোজনের নিমন্ত্রণ লাভ করেন। যদি বিবাহিত পুরুষ কোন এক ষ্টেসনে আসিয়া বাস করেন, ষ্টেসনবাসীদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহার স্ত্রীর সহিত প্রথমে গিয়া সাক্ষাৎ করেন। এ নিয়মের ত্রুটি হইলে ইহাঁদের সহিত আলাপ পরিচয়ের সম্ভাবনা নাই। দস্তুরের বাহিরে ইংরাজেরা এক পা চলেন না। যদি কোন সাহেবকে জিজ্ঞাসা কর, অমুক লোকের সহিত আপনার পরিচয় আছে? হয় ত তাহার উত্তর করিবেন, সেত আমার স্ত্রীর সঙ্গে এখনো দেখা করিতে আসে নাই! এই সকল নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ করিবার সময় আপনার নামের এক কিম্বা একাধিক কাড্ পাঠাইয়া দিতে হয়। মেম সাহেবের যদি দেখা করিবার ইচ্ছা না থাকে ত বলিয়া পাঠান, মেম সাহেব ঘরে নাই। তোমার যদি কাহারো সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা না থাকে, অথচ নিয়ম রক্ষা করা চাই, ত গৃহস্বামী অথবা গৃহিণী ঘরে না থাকেন এমন সময় বুঝিয়া যাইতে হয়, ও তোমার নামের কাড্ রাখিয়া আইলেই যথেষ্ট। এই সকল সাক্ষাৎকার সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সহজ নহে। কত প্রকার সাক্ষাৎকার ও তৎসম্বন্ধীয় বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে বলা যায় না। আগন্তুকের প্রথম সাক্ষাৎকার, ভোজন-নিমন্ত্রণ-বিনিময় সাক্ষাৎকার, বন্ধুতার সাক্ষাৎকার, শোক-সংজ্ঞাপক সাক্ষাৎকার, অভিনন্দন-সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। কোন কোন সময় তুমি নিজে না গিয়া তোমার নামের কাড পাঠাইয়া দিলেও সাক্ষাৎকার সমাধা হইতে পারে। সাহেবেরা এইরূপে ভৃত্য-হস্তে কাড্ পাঠাইয়া কখন কখন দেশীয়দের সাক্ষাৎকারের প্রতিদান করিয়া থাকেন।

আহারের নিমন্ত্রণে ইংরাজদিগের সামাজিকতার বিশেষ পরিচয়। ভাল খাওয়া ও খাওয়ান ইংরাজ-জীবনের মধ্য বিন্দু। তাঁহাদের আমোদ প্রমোদ, দেখা সাক্ষাৎ, হাস্য পরিহাস, আলাপ পরিচয়ের স্থান ভোজনালয়। আমাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আহার পানের নিয়ম নাই, তাঁহাদের মধ্যেও সেইরূপ; তবে জাতিভেদের নিয়মমাত্র ভিন্ন। জাতি-ভেদ-প্রথা যে, তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল, তাহা তাঁহাদের পরস্পর পান ভোজনের নিয়মে বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। সামাজিক মান মর্য্যাদায় সমান সমান ভিন্ন তাঁহারা একত্রে পান আহার করেন না। আমাদের মধ্যে অনেকে ইংরাজী খানাপিনা আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু এমন মনে করিবেন না যে, আপনাদের সঙ্গে ইংরাজেরা একাসনে বসিয়া আহার করিতে সহজে সম্মত হইবেন। এমন কি, অনেক বড় হোটেলে দেশীয়দের প্রবেশের অধিকার নাই। আমার একজন পারসী বন্ধু বলিলেন যে, তিনি আপনার কয়েকটী বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া অমুক হোটেলে আহারের আয়োজন করিয়াছিলেন, সেখানে গিয়া দেখেন যে, তাঁহাদের জন্য নির্দ্ধারিত

বিশ্রী গুদামের মত এক কোণের ঘরে আহার প্রস্তুত। তিনি হোটেল-কর্ত্তাকে ডাকাইয়া সাধারণ ভোজনালয়ে তাঁহাদের স্থান দিতে অনুরোধ করিলেও তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল না। অবশেষে তিনি প্রস্তুত খাদ্য সামগ্রী ফেলিয়া বুভুক্ষিত বন্ধুবান্ধবসহ অন্যত্র চলিয়া যান। সে যা হোক্ এখন ইংরাজদের ভোজনালয়ে প্রবেশ করা যাক্। ভোজনের নিমন্ত্রণে স্ত্রীপুরুষ বেশভূষা করিয়া একত্রিত হন। মিলিটরিদের মধ্যে কাহারো লাল, কাহারো অন্যরূপ জরির কাপড়, সিবিলিয়ানদের লাঙ্গূলবিশিষ্ট কাল বনাতের কোট, বিবিদের নানা প্রকার চিত্র বিচিত্র সাজ। ১৩ জন এক টেবিলে একত্র হওয়া অলক্ষণ বলিয়া ইংরাজদের এক সংস্কার আছে, তদ্ভিন্ন ঘর ও টেবিলের পরিমাণ বুঝিয়া নিমন্ত্রিতের সংখ্যা নিরূপিত হয়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত হইলে ভৃত্য আসিয়া বলে খানা প্রস্তুত। পরক্ষণেই এক একজন সাহেব এক একজন বিবির হাতে হাত দিয়া খানার টেবিলে লইয়া আপনার পার্শ্ববর্ত্তী আসনে উপবেশন করাইয়া নিজে উপবিষ্ট হন। বসিবার সময় স্বামী স্ত্রী পাশাপাশী বসিতে না পারেন এই নিয়মটি রক্ষা করিয়া বসিতে হয়। কোন্ সাহেব কোন্ বিবিকে টেবিলে লইয়া যাইবেন তাহার নিয়ম আছে। অভ্যাগতের মধ্যে যিনি সকল অপেক্ষা বড় বিবি, তাঁহাকে গৃহস্বামী লইয়া যান—আর যিনি সকল অপেক্ষা বড় সাহেব তিনি গৃহিণীকে লইয়া যান। এইরূপে স্ত্রীপুরুষের মানমর্য্যাদা অনুসারে এক এক জন বিবি এক একজন সাহেবের হস্তে সমর্পিত হন। স্ত্রীলোকের মান তাঁহার স্বামীর পদের উপর অনেকটা নির্ভর। এইরূপ মর্য্যাদা রক্ষার ক্রটি হইলে মহা গোলযোগ উপস্থিত হয়, আর স্ত্রীপুরুষের যথাযোগ্য বিলি বন্দেজের ব্যতিক্রম না হয় তাহার প্রতি কর্ত্তা ও গৃহিণীর বিশেষ দৃষ্টি থাকে। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে যথা স্থানে উপবেশন করাইতে একটু বিবেচনা আবশ্যক। যদি অভ্যাগতের মধ্যে কোন এক বিদ্বান্ কি সদ্বক্তা উপস্থিত থাকেন, তবে যেখানে বসিয়া তিনি সকলের সঙ্গে কথা কহিতে ও আলাপ করিতে পারেন, এমন মধ্যস্থানে তাঁহাকে উপবেশন করাইতে হয়। দুইজন সমব্যবসায়ীকে পাশাপাশি বসান যুক্তিসঙ্গত নহে, কেননা তাঁহারা হয়ত আপনার কাজ-কর্ম্ম-সংক্রান্ত কথোপকথন করিয়াই কালহরণ করিবেন, তাহাতে অন্য কাহারো মনোরঞ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। আহারের সময় কিরূপে কাঁটা চামচা ধরিয়া আহার করিতে হয়, পরিবেশনের নিয়ম কি, কোন্ সময় কোন্ জিনিস খাইতে হয়, কোন্ সামগ্রীর সহিত কোন্ মদ্য পান করা বিধেয়, কিরূপ শব্দ পরিহার্য্য, কিরূপ ব্যবহার ভদ্র ও অভদ্র বলিয়া পরিগণিত এ সকল বিষয় বলিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়ে, সুতরাং এ সকল বিষয়ে প্রবেশ করিলাম না। আহারান্তে স্ত্রীগণ আহারের টেবিল হইতে উঠিয়া সমীপবর্ত্তী উপবেশন গৃহে

আসন গ্রহণ করেন। বিবিরা উঠিয়া গেলে সাহেবগণ অবসর পাইয়া মনের সাধে পান ও পরস্পর আলাপাদি করিতে পারেন। কিন্তু ইহা বলিতে হইবে যে, ভদ্র-সমাজে পানাতিশয্য এক্ষণে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বিবিদের টেবিল হইতে অগ্রে উঠিয়া যাইবার নিয়ম কেবল ইংরাজ জাতির মধ্যে প্রচলিত—অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে এ প্রথা প্রচলিত নাই। তাঁহারা স্ত্রীসহবাস হইতে বঞ্চিত হইয়া টেবিলে বসিয়া আমোদ প্রমোদ করা নিতান্ত অসভ্যতার কার্য্য জ্ঞান করেন। ওদিকে বিবিরা পুরুষদের সহবাস হইতে পরিচ্যুত হইয়া কিরূপে আলাপাদি করেন, তাহা জানিতে অনেকের কৌতূহল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সে সকল গুপ্তকথা কি প্রকারে প্রকাশিত হইবে? সে স্ত্রীসভাতে কত কাপড়, কত গয়নার কথা, কত বিবাহের পরামর্শ, কত লোকের চরিত্র সমালোচন,কত পরাধিকার-চর্চ্চা উত্থাপিত হয় কে বলিতে পারে? এই বিষয়ে এক গ্রন্থ রচিত হইলে কত না জানি পুরুষদের শিক্ষোপযোগী বিষয় তাহাতে উপলব্ধি করা যায়?

পরচ্ছিদ্রান্বেষণ ইংরাজদের এক জাতীয় ধর্ম্ম, তাহার দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিলে অনেক পাওয়া যাইতে পারে। বড় বড় ষ্টেসনে সন্ধ্যার সময় সকলের যে মিলিবার স্থান তাহার নাম Scandal point (নিন্দালয়)। দিবসের কাজ কর্ম্ম হইতে অবসৃত হইয়া আংলো ইণ্ডিয়ান স্ত্রীপুরুষ এই স্থানে সম্মিলিত হইয়া আলাপাদি করেন। সাহেবেরা কেহ অশ্বপৃষ্ঠে কেহ পদব্রজে গাড়ীতে উপবিষ্ট এক একজন বিবির সহিত মধুরালাপে মগ্ন। মধ্যে মধ্যে ব্যাণ্ড বাদ্যধ্বনি উত্থিত হইতেছে। "ঈশ্বর! রাণীকে রক্ষা করুন" এই তান উঠিলে জানা গেল যে, গৃহে যাইবার সময় হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন পরস্পর মিলিবার স্থান ক্রীড়ালয়। ইংরাজদের অধিকাংশ ক্রীড়া ব্যায়াম-সমন্বিত, আর যাহার সঙ্গে শারীরিক পরিশ্রমের যোগ নাই, উৎসাহ বর্দ্ধনের জন্য সে সকল ক্রীড়াতে বাজী রাখা হয়। হয় শারীরিক পরিশ্রম, নয় মানসিক উত্তেজনা এ দুয়ের এক না থাকিলে ক্রীড়া মনস্থ হয় না। cricket (গুলিডাণ্ডা) প্রভৃতি প্রথমের দৃষ্টান্ত,ঘোড়দৌড়, তাস দ্বিতীয়ের উদাহরণ। ইংরাজদের জাতীয় খেলার মধ্যে প্রধান ক্রকেট। তাহাদের দৃষ্টান্তে এক্ষণে পারসীরা এই খেলায় এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছে যে, তাহাদের সঙ্গে খেলিয়া ইংরাজদেরও অধোবদন হইতে হয়, ও এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, এক দল পারসী ক্রীড়ক ইংলণ্ডে জনবুলের সঙ্গে বাজী রাখিয়া খেলিতে যাইবে। ক্রকেট আমাদের গুলি ডাণ্ডারই প্রকারান্তর খেলা। ইহা হইতে কোমলতর আর এক প্রকার ক্রীড়ার নাম ক্রোকে; ইহার বিশেষ গুণ এই যে, বিবিরাও ইহাতে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু শারীরিক পরিশ্রমের তত উপযোগী নয় বলিয়া ক্রমে ইহার গৌরব হ্রাস হইয়া আসিতেছে। ব্যাড্‌মিন্‌টন নামক খেলা এক্ষণে ক্রোকের স্থান অধিকার করিয়াছে। পক্ষযুক্ত

খেচর গুলি, ডাণ্ডা দ্বারা আকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিপক্ষের ডাণ্ডা দ্বারা তাহা আহত হয়—এইরূপে ঘাত প্রতিঘাতে গোলা এদিক্ ওদিক চলাচল করিতে থাকে ; যে পক্ষের লোক ধরিতে না পারে তাহাদের হয় হাত উঠিয়া যায়, কিম্বা প্রতিপক্ষকে এক পয়েণ্ট দিতে হয়। এইরূপ এক এক সংখ্যা লাভ করিয়া যে দল নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় আগে পৌঁছিতে পারে তাহাদের জিত। ইহাতে হার জিত যে পক্ষেরই হউক শারীরিক পরিশ্রম উভয় দলেরই সমান। আর এক রকম খেলা আছে,তাহার নাম skating rink। শীতকালে যখন কোন জলাশয়ের জল জমিয়া কঠিন হয়—তখন সেই বরফের উপর দিয়া চলাচল করার নাম স্কেটিং। শীত-প্রধান দেশে ইহা এক মহা আমোদ, কিন্তু এই উষ্ণ দেশে জল তরল ভাব সহজে পরিত্যাগ করে না সুতরাং এখানে স্কেটিং কিরূপে সম্ভবে? এই সমস্যা ভেদ করিয়া এই সকল দেশের জন্য স্থলস্কেটিং নামে এক নূতন ক্রীড়ার সৃষ্টি হইয়াছে। এক খণ্ড ভূমি পরিষ্কৃত ও পদার্থ বিশেষের সংযোগে বরফতুল্য মসৃণ চিকণ করিয়া এক প্রকার চক্রবিশিষ্ট পাদুকা পরিয়া তাহার উপর দিয়া সহজে চলিতে ফিরিতে পারা যায়। ইহাতে শরীরের ভার রক্ষা করিয়া চলা অনেক অভ্যাসের কর্ম্ম। অনভ্যস্তদিগকে অনেক সময় ধরণীতে লুণ্ঠিত হইয়া ভগ্নদেহতরী হইতে দেখা যায়। যাঁহারা ইহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন তাঁহারা যখন সহজে ভাবে হেলিয়া দুলিয়া নানা প্রকার চিত্র কাটিতে কাটিতে চলিয়া ফিরিয়া বেড়ান, তখন মনে হয় যেন তাঁহারা আকাশ-পথে বিচরণ করিতেছেন, দুঃখ হয় মানুষের কেনই বা পক্ষ হইল না—হইলে কি আরামে উড়িয়া বেড়ান যাইত। এখন যেন ধরণীর সহিত যুদ্ধ করিয়া আমাদিগকে প্রতিপদ অগ্রসর হইতে হয়। এই সকল ক্রীড়াস্থলে নিয়মিত সময়ে বিবি সাহেব একত্রিত হন। এই সকল ব্যায়াম-চর্চ্চার দৃষ্টান্ত যদি আমরা ইংরাজদের নিকট হইতে গ্রহণ করি ত বিস্তর উপকার হয় সন্দেহ নাই। আমরা মনে করি যে, বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ। বাল্যকালই ক্রীড়ার কাল; যুবক ক্রীড়ায় যোগ দিতে সঙ্কুচিত হন। ইংরাজদের এভাব নাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই খেলা ধূলায় শারীরিক শ্রম সাধন ও মনের আয়াস নিবৃত্তি করেন। আমাদের এরূপ ক্রীড়া অতি বিরল। শীতকালে অর্দ্ধক্রোশ পদচালনা বাবুদের ব্যায়ামের এক শেষ। বাবু নামের সঙ্গে সঙ্গে গদিতে হেলান দিয়া পান তামাক, গল্পসল্প, আমোদ করা, এই ভাবই মনে উদয় হয়। ইংরাজদের মধ্যে ব্যায়াম শিক্ষা শিক্ষার এক প্রধান অঙ্গ। অশ্বারোহণ, অস্ত্র-চালনা, ঘুসিমারা, সাঁতার, নাচ, পদচারণা এই সকল না শিখিলে ইংরাজ-ভদ্র-সমাজের উপযোগী শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ইংরাজেরা যেখানেই একত্রিত হউক না কেন,তাহাদের বহির্দ্বার-ক্রীড়ার বিশেষ উৎসাহ দৃষ্ট হয়। আঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানদের ক্রীড়ালয়ের নাম জিমখানা। এই জিমখানার কার্য্য বৎসরের মধ্যে

একবার সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ উৎসব সপ্তাহ খানিক চলে। ইহাই তাহাদের জাতীয় দুর্গোৎসব। এ সময়ে তাহাদের উৎসাহের আর সীমা থাকে না। বাহিরের নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রিত লোক জনের সমাগম হয় ও অতিথিসৎকার খানাপিনার ধূম লাগিয়া যায়। এই উপলক্ষে ঘোড়দৌড়, ক্রকেট, ব্যাড্‌মিন্‌টন, নৃত্য গীত-অভিনয়, নানা প্রকার ক্রীড়াকলাপের আনন্দধ্বনি উঠিতে থাকে। নৃত্যশালায় ইহাদের যে আমোদ তাহার বর্ণনা কি করিব। নাচগৃহ ইন্দ্র-ভবনের ন্যায় আলোকিত ও সজ্জিত হয়—বিবিরা উৎকৃষ্ট মনোহর বেশে স্বর্গের পরি ও অপ্সরার ন্যায় সাজিয়া আসেন ও নিজ নিজ সহচরের সহিত নৃত্য ও প্রেমালাপে মগ্ন থাকিয়া সমস্ত রজনী যাপন করেন। মধ্যে একবার পান ভোজনে সকলের শ্রান্তি দূর হইলে নবীন উৎসাহসহকারে নৃত্য আরম্ভ হয় ও উষার সঙ্গে সঙ্গে মজলিস ভঙ্গ হয়। বর্ষার সময় যখন ষ্টেষন পূর্ণ থাকে, তখন আঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে এই সকল আমোদের স্রোত বহিতে থাকে—বর্ষান্তে সিবিলিয়ানদের দল বাহিরে চলিয়া গেলে ষ্টেষন পূর্ব্ববৎ শান্তভাব ধারণ করে।

শরীরের জন্য জিমখানা—মনের জন্য এক এক পুস্তকালয় ও প্রতি রবিবার ঈশ্বরারাধনার জন্য এক ভজনালয়। কার্য্যালয়, ভজনালয়, ভোজনালয়, পুস্তকালয় ও জিমখানা—এই পঞ্চতীর্থে আঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ানগণ তাহাদের প্রবাস যাপন করে।

ইংরাজেরা শীতপ্রধান দেশের লোক, অথচ এত উষ্ণদেশে তাঁহাদের প্রবাস, কিন্তু ভারতে তাঁহাদের বাসোপযোগী স্থান নাই এমত নহে। এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাগে জলবায়ু বিভিন্ন; কোথাও বায়ু অতি উষ্ণ, কোথাও বা সুরম্য, সুশীতল, স্বাস্থ্যকর। বোম্বাই অঞ্চলে দেখ। নিজ বোম্বাই সহর সমুদ্রের ধারে, কোন সময়েই গ্রীষ্মের আতিশয্য হয় না। মালাবার হিল প্রভৃতি সাগর তটস্থ স্থানে অবস্থিতি করিলে গ্রীষ্ম কাহাকে বলে প্রায়ই জানা যায় না। যদি কোন ব্যক্তি শীতকালে বোম্বাই, বর্ষা ঋতুতে পুণা ও গ্রীষ্মকালে কোন পর্ব্বত প্রদেশে বাস করিতে পারেন তবে তাঁহাকে গরমীর উপদ্রব কখনই সহ্য করিতে হয় না। ইংরাজদের মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গতি ও সুবিধা আছে তাঁহারা বোম্বাই অঞ্চলে এইরূপে সুখে জীবনক্ষেপ করেন। আরাম (comfort) কাহাকে বলে, তাহা যেমন ইংরাজে বুঝে, আমাদের লোকেরা তাহার কিছুই অবগত নহে। ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল থাকা, এর কৌশল শিখিবার যদি আবশ্যক হয়, ত তাহাদের নিকট হইতে শিক্ষা কর। মালাবার হিলে তাহাদের বিবিধ সামগ্রী-সজ্জিত বৃক্ষলতায় শোভমান বায়ু-সঞ্চার-যোগ্য গৃহাবলী দর্শন করিলে কে না তাহাদের বাস-নৈপুণ্যের প্রশংসা করিবে। আঙ্গ্লোইণ্ডিয়ানগণ এদেশে যে অর্থ উপার্জন করে, তাহার অধিক ভাগই তাহাদের নিজ নিজ আহার পান শারীর সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্পাদনেই ব্যয়

হয়। আমরা এরূপ করাকে অপব্যয় মনে করি। তাহারা আপনার শরীর পোষণে যে অর্থ ব্যয় করে, তাহাতে আমাদের কত দুঃস্থ পরিবারের ভরণ পোষণ হয়। অবসর পাইলে ইংরাজেরা পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে ত্রুটি করেন না। আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট পার্ব্বত্য প্রদেশ ইংরাজদের বাসগৃহে পরিপূর্ণ। অবকাশ পাইলে তাঁহারা তথায় গিয়া বিশ্রাম করেন। হিমালয়, নীলগিরি, দারজিলিং প্রভৃতি পর্ব্বত-শ্রেণী আংলো ইণ্ডিয়ানদের আমোদধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত দেখা যায়; তাঁহাদের অভাবে এ সকল স্থান হয় ত দুর্গম বিজন বন হইয়া থাকিত। বোম্বায়ের এইরূপ দুই প্রধান সুগম সুরম্য পর্ব্বত-প্রদেশের নাম—মাথেরান ও মহাবলেশ্বর। মহাবলেশ্বর সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪০০০ ফীট উচ্চ ও শোভা সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। মহাবলেশ্বর হইতে প্রতাপগড় নামক পাহাড় দৃষ্ট হয়, সেখানে মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবজী নবাব অফজুল খাঁকে প্রতারণা পূর্ব্বক ব্যাঘ্রনখ দ্বারা হত্যা করিয়াছিলেন। শিবজীর সিংহগড় প্রভৃতি অন্যান্য দুর্গম দুর্গও এক্ষণে সুরম্য বাসস্থলে পরিণত হইয়াছে। এই সকল পর্ব্বতধাম ইংরাজদের প্রিয় আবাসস্থান। ইহাদের জল বায়ু ফল ফুল তাহাদের স্বদেশ স্মরণ করাইয়া দেয়। যে সকল সাহেব কার্য্যের অনুরোধে নিজে এ সকল স্থানে আসিতে না পারেন, তাঁহারা অন্তত তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে পাঠাইয়া দেন। কেহ কেহ আপনার জন্য এক এক গৃহ কিনিয়া রাখেন। এই সকল স্থানে ইংরাজদের সমাগমে এ দেশের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহাদের প্রসাদে অনেক দেশীয় শ্রম-জীবীর অন্ন লাভ হয়। যে কয় মাস তাঁহারা পর্ব্বতে বাস করেন, সে কয় মাস মুটে, মজুর ও অন্যান্য শ্রমজীবি গরীব লোক যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করে ও সম্বৎসরের মত উপজীবিকা করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে থাকে, সন্দেহ নাই।

কোন জাতির আচার ব্যবহারের বিষয় লিখিতে হইলে তাহাদের উদ্বাহ-প্রণালী সর্ব্বাগ্রে বর্ণন করা আবশ্যক। আংলো ইণ্ডিয়ানদের অধিকাংশই অবিবাহিত। এ দেশে অবিবাহিতা কন্যা আসিলে তাঁহাকে অধিক কাল অনূঢ়া থাকিতে হয় না। যে সকল স্ত্রীলোকের ভাগ্যে স্বদেশে বর না জোটে, তাঁহারা এদেশে বিবাহার্থে আগমন করেন, ও শীঘ্রই তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। আংলো ইণ্ডিয়ানদের বিবাহক্রিয়া তাঁহাদের মূল সমাজের নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন হয়, এ দেশে ভিন্ন আকার ধারণ করে নাই। ইংরাজদের মধ্যে পিতামাতা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন না। তাঁহাদের বিবাহ সংঘটনে কোন ঘটক বা মধ্যস্থের আবশ্যক হয় না। স্ত্রীরত্ন উপার্জ্জন করিতে যুবকদিগের স্বচেষ্টা ও স্বাবলম্বন প্রয়োজন। যুবতীগণের রূপগুণই বিবাহের দৌত্য কার্য্য সম্পাদন করে। পিতা মাতার মতে বিবাহ, আর স্বয়ম্বরকৃত বিবাহ ইহার মধ্যে কোন্ প্রথাটি জন-সমাজের অধিক হিতকর,

তাহা লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলিতে পারে। ইংরাজদিগের উদ্বাহ-ক্রিয়ার তিন অঙ্ক, প্রথম সাধনা, দ্বিতীয় প্রস্তাব ও সম্মতি, তৃতীয় বিবাহ। আপনি দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ করিতে গেলে পুরুষের সাধ্য-সাধনার প্রয়োজন ইহা বলা বাহুল্য। যুবকের যদি কোন স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি জন্মে, ত তাঁহার অভিলষিত যুবতীর চিত্তদুর্গ ভেদ করা তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। কিসে তাঁহার মনোরঞ্জন ও প্রণয়-আকর্ষণ করিতে পারেন, কায়মনোবাক্যে তাহারই যত্ন করিতে থাকেন। এইরূপ সাধ্য সাধনার নাম কোর্ট্ শিপ্। যদি যুবতী নিতান্ত চঞ্চলা, বিলাসিনী ও প্রতারণা-পরায়ণা না হন, ত তাঁহার প্রেমাসক্ত যুবক অবশ্যই বুঝিতে পারেন, তাঁহার সাধনা সিদ্ধ হইবার কতদূর সম্ভাবনা। পরে তিনি অবসর বুঝিয়া প্রিয়ার নিকট আত্মনিবেদন করেন। পুরুষের নিকট স্ত্রীলোকের স্বীয় মনের ভাব প্রকাশ করিবার রীতি নাই। বিবাহের প্রস্তাব করা পুরুষের কার্য্য। পুরুষ বরপ্রার্থী—নারী বরদায়িনী। বিবাহের প্রস্তাব করায় একটু কৌশল ও চাতুর্য্য চাই। পুরুষ যদি সদ্বক্তা হন, যদি মনের কথা ভাল করিয়া বলিতে পারেন তিনি যদি রূপবান হন, ও হাব ভাব রূপ লাবণ্যে জয়লাভের আশা থাকে, ত তিনি নিজে যুবতীর নিকট গিয়া মুখেই প্রস্তাব করেন। হয়ত বলেন—"সুন্দরি! তুমি কি আমার হইবে? তোমার সুখের ভার কি আমার হস্তে সমর্পণ করিবে? তোমা ভিন্ন আমি আর কাহাকেও জানি না, আমার সমুদয় সুখ সমুদয় আশা ভরসা তোমার এক কথার উপর নির্ভর করিতেছে। আমাকে নিরাশা করিও না। বল তুমি আমার।" প্রিয়ার লজ্জাবনত রক্তিম মুখমণ্ডলে অনুকূল উত্তর পাঠ করিয়া যুবক আকাশের চন্দ্র হস্তে পান, তাঁহার জীবন এক নূতন রাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে। কিন্তু সকল সময়ে আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, প্রেম-রাজ্যেও এই নিয়ম।

যুবক আপনার প্রণয় ব্যক্ত করিবার মানসে প্রত্যূষে প্রিয়ার দ্বারে উপস্থিত। সমস্ত রাত্রি ভাবিয়া ভাবিয়া তাঁহার নিদ্রা হয় নাই। কল্পনায় কত কি চিত্র করিতেছেন, তিনি আশা ভয়ে আন্দোলিত হইয়া প্রেয়সীর সম্মুখে উপবিষ্ট হইলেন। কামিনীর কথার ধরণে বোধ হইল যেন তিনি কিছু বিরক্ত।—

যুবক। কেন ভাই তুমি কি আমার উপর রাগ করেছ? কেন বল দেখি আমার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কর্‌ছ?

স্ত্রী। না, আর কিছু নয়। তা সময় নেই অসময় নেই এই কি দেখা করিবার সময়? সকালের দিকটা একটু ঘুম এসেছিল, এমন সময় ডাক পড়িল, আমি তাড়াতাড়ি করে উঠে কাপড় পরে নীচে আস্‌ছি কাজে কাজেই চট্‌তে হয়।

যুবক। চটই আর যাই কর, আমার উপর ঔদাস্য করো না। সুন্দরি! আমি তোমার প্রেমের ভিখারী, তোমার একটুকু

ভালবাসার উপর আমার সমুদয় সুখ নির্ভর কর্ছে।

এই বলিয়া যুবক রমণীর হস্ত ধারণ করিতে গেলেন। যুবতী তাঁহার হস্ত প্রক্ষেপ করিয়া একটু দূরে গিয়া বসিলেন ও তাঁহার প্রতি উগ্রভাবে দৃষ্টি করত বলিলেন—আর যাই কর—ভালবাসার কথা বলে আমাকে বিরক্ত করো না।

যুবক চারি দিক অন্ধকার দেখিলেন—জগৎ সংসার তাঁহার নিকট শ্মশানতুল্য প্রতিভাত হইল।

তবে কি এই তোমার শেষ কথা—ইহার আর কোন অন্যথা হইবে না?

রমণী। যদি ভালবাসা বল তবে তাই। তোমার প্রতি আমার কোন বিরক্তি কি মন্দ ভাব নাই।

যুবক নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া গেলেন। স্বদেশের প্রতি তাঁহার অনাস্থা জন্মিল—নিয়মিত কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেন ও বিদেশে গিয়া নবজীবন আরম্ভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

পুরুষ যদি লজ্জাশীল হন—অসম্মতি-প্রকাশে নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া আপনাকে আপনি সামলাইতে পারিবেন না, তাঁহার যদি এইরূপ ভয় থাকে তবে লেখনীর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যুবতী তাঁহার প্রণয়ীর প্রস্তাবে সম্মতি কি অসম্মতি যাহা হয় প্রকাশ করেন। সম্মতি পাইলে যুবক কামিনীর পিতা মাতার সম্মতি প্রার্থনা করেন। পিতা মাতার অনুমতি হইলে তিনি তাঁহার প্রেয়সীকে আপনার প্রেম-নিদর্শন নানা প্রকার উপহার প্রেরণ করেন। বহুমূল্য উপহার গ্রহণে যদি কোন আপত্তি থাকে—ত পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে তিনি প্রিয়ার প্রতি স্বীয় অনুরাগ প্রকাশ করিতে পারেন। প্রণয়ীর নিকট হইতে পুষ্প-উপহার গ্রহণে কোন বাধা নাই। অবিবাহিতা কুলকামিনীদিগের পর পুরুষের নিকট হইতে পুষ্পোপহার গ্রহণ করা বিহিত নহে। বিবাহের দিন স্থির করা কামিনীর অধিকার।

বিবাহের পূর্ব্বে এ বিবাহে কাহারো কোন আপত্তি আছে কি না জানিবার জন্য অনেক সময় এক ঘোষণা-পত্র প্রকাশিত হয়—তাহা উপর্য্যুপরি তিন রবিবার চর্চে পঠিত হইয়া থাকে।

অমুক অমুকের বিবাহ সম্বন্ধীয় ঘোষণা-পত্র প্রকাশ করিতেছি। যদি তোমাদের কাহারো এই উভয়ের বিবাহ বিষয়ে কোন আপত্তি থাকে, তাহা ব্যক্ত করিবে। এই প্রথমবারের (দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় বারের) বিজ্ঞাপন দেওয়া যাইতেছে।

বিবাহ-কালে কন্যার সহিত দুই জন হইতে বার জন সখী উপস্থিত থাকেন। কন্যার ভগিনীগণ অথবা বরের নিকট সম্পর্কীয় কয়েকটী স্ত্রী সখী-পদে নিযুক্ত হন। সখীগণ ও কন্যার পরিবারস্থ লোকেরা যাত্রীদলের প্রথম, কন্যা ও তাঁহার পিতা মাতা যাত্রীদলের শেষ, এইরূপে যাত্রীগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলেন। বর ও সখীগণ ভজনালয়ে প্রথম গিয়া কন্যার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। কন্যা তাঁহার পিতার

হাত ধরিয়া বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হন। কন্যা বরের বামপার্শ্বে দাঁড়ান ও বামহস্তের দস্তানা খুলিয়া লন—বর তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দস্তানা মোচন করেন। পরে পুরোহিত বেদী হইতে বলেন। *

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ,আমরা ঈশ্বরের সমক্ষে, এই উপাসক-মণ্ডলীর সমক্ষে এই পুরুষ ও এই স্ত্রীকে পবিত্র উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ করিবার জন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছি। উদ্বাহ-সংস্কার বহুমানাস্পদ। মনুষ্যের নির্দ্দোষাবস্থায় ইহার সূত্রপাত। ঈশা ও তাঁহার ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে যে নিগূঢ় সম্বন্ধ, ইহা তাহার সংজ্ঞাপক। অতএব ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে অনবধানতা, অবিবেচনা ও যদৃচ্ছা পূর্ব্বক প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয় নহে। প্রজ্ঞাহীন পশুর ন্যায় মনুষ্যের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। বুদ্ধি পূর্ব্বক, বিবেচনা পূর্ব্বক, ভক্তির সহিত, নম্রভাবে, ঈশ্বরের উপর ভয় রাখিয়া, কি উদ্দেশে উদ্বাহ-প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে তাহা স্মরণ রাখিয়া ইহাতে প্রবৃত্ত হওয়া কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ, বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তানোৎপত্তি,ঈশ্বর-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মপথে রাখিয়া সন্তানগণের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান।

দ্বিতীয়তঃ, বিবাহের উদ্দেশ্য যাহাতে মানবসমাজে ব্যভিচার-দোষ প্রবেশ না করে। যাহারা ইন্দ্রিয়-সংযমে অক্ষম, তাহারা দার-পরিগ্রহ করিয়া খৃষ্ট-সমাজে আপনাদিগকে পবিত্র রাখিতে সমর্থ হয়।

তৃতীয়তঃ, বিবাহের উদ্দেশ্য, সুখ দুঃখ সম্পৎ বিপদে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সহবাস লাভ,পরস্পর সাহায্যদান ও সন্তোষ সাধন। এই পবিত্র দাম্পত্য-ব্রতে ব্রতী হইবার মানসে এই দুই জন উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাঁদের বিবাহে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে, ত এইবেলা প্রকাশ করুন, নতুবা ভবিষ্যতে যেন ইহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা না বলেন।

যদি কাহারো কোন আপত্তি দর্শাইবার না থাকে, ত পুরোহিত বরকে সম্ভাষণ করিয়া বলিবেন।

তুমি কি এই স্ত্রীর সহিত ঈশ্বর-প্রণীত পবিত্র উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া ইহাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে, তুমি কি ইহাকে ভাল বাসিবে, যত্ন করিবে, ইহাঁকে সুখী করিতে তৎপর থাকিবে, রোগে অরোগে ইহাঁকে রক্ষা করিবে ও আর সকল পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন ইহাঁর প্রতি অনুরক্ত থাকিবে?

বর উত্তর করিবেন, হাঁ থাকিব।

পরে কন্যাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিবেন,

তুমি কি এই পুরুষের সহিত ঈশ্বর-প্রণীত পবিত্র উদ্বাহ-সূত্রে বদ্ধ হইয়া ইহাকে পতিত্বে বরণ করিবে? তুমি কি ইহাঁর বশে থাকিবে, ইহাঁর সেবা করিবে, ইহাঁকে ভাল বাসিবে; ভক্তি করিবে, রোগে অরোগে ইহাঁকে রক্ষা করিবে ও আর সকল পরিত্যাগ করিয়া যাবজ্জীবন ইহাঁরই প্রতি অনুরক্ত থাকিবে?

কন্যা উত্তর করিবেন, হাঁ থাকিব।

পরে পুরোহিত বলিবেন।

* English marriage Service.

এই পুরুষকে এই কন্যাদান কে করিতেছেন ?

তৎপরে পুরোহিত কন্যাকে তাঁহার পিতার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া বরের দক্ষিণ হস্তে কন্যার বাম হস্ত যোগ করিয়া বরকে এইরূপ বলিতে বলিবেন।

আমি তোমাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতেছি, ভালই হউক মন্দই হউক—সম্পদে বিপদে, রোগে অরোগে, অদ্য হইতে আমি তোমারই থাকিব ও যতদিন বাঁচিয়া থাকি তোমাকে ভাল বাসিব ও যত্ন করিব, ইহাতে আমার সত্য বচন দিতেছি।

পরে তাঁহাদের হস্ত খুলিয়া লইবেন ও কন্যা তাঁহার দক্ষিণ হস্তে বরের বাম হস্ত ধারণ করিয়া পুরোহিতের পরেপরে বলিবেন।

আমি তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতেছি। ভালই হউক মন্দই হউক, সম্পদে বিপদে, রোগে অরোগে, অদ্য হইতে আমি তোমারই থাকিব ও যতদিন বাঁচিয়া থাকি তোমাকে ভাল বাসিয়া যত্ন ও সেবা করিব, ইহাতে আমার সত্যবচন দিতেছি।

তদনন্তর বর কন্যার বাম হস্তের চতুর্থ অঙ্গুলিতে এক অঙ্গুরীয় পরিধান করাইয়া সেই অঙ্গুরীয় স্পর্শ করত পুরোহিতের কথা মত বলিবেন।

এই অঙ্গুরীয়ের সহিত তোমাকে বিবাহ করিতেছি, আমার দেহের সহিত তোমার অর্চনা করিতেছি, আমার ধন সম্পত্তি তোমাকে সমর্পণ করিতেছি।

পরে দম্পতী জানু পাতিয়া বসিলে পুরোহিত আশীর্ব্বাদ ও প্রার্থনা করিবেন ও প্রার্থনার পর দম্পতীর হস্তে হস্ত মিলাইয়া বলিবেন,

ঈশ্বর যাঁহাদের সংযুক্ত করিয়াছেন, কোন মনুষ্য যেন তাঁহাদের বিযুক্ত না করেন।

অনন্তর পুরোহিত সমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিবেন,

অমুক অমুক ঈশ্বরের সমক্ষে ও এই সমাজের সমক্ষে পবিত্র উদ্বাহে বদ্ধ হইয়া পরস্পরকে সত্য বচন দিয়াছেন ও অঙ্গুরীয় দান ও প্রতিগ্রহ দ্বারা ও হস্তে হস্ত যোগ করিয়া তদ্বিষয়ে আপনাদের মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এক্ষণে আমার বক্তব্য এই ইহাঁরা স্বামী স্ত্রী রূপে একত্রে সহবাস করুন। তৎপরে প্রার্থনা সঙ্গীত উপাসনা ও আশীর্ব্বাদে অনুষ্ঠান সমাপ্ত।

অনুষ্ঠানের পর দম্পতীকে রেজিষ্টরে নাম স্বাক্ষর করিতে হয়। তদনন্তর বর ও কন্যা এক গাড়ীতে বসিয়া কন্যার বাটী গমন করেন। বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া গৃহে প্রবেশ করেন। সেখানে সকলে মিলিত হইলে মধ্যাহ্ন-ভোজন মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। আহারান্তে বর-কন্যার স্বাস্থ্য ও কল্যাণ উদ্দেশে বক্তৃতা ও পানাদি সমাপন হইলে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করেন। পিতামাতা কন্যা-ভার হইতে মুক্ত হইলেন। দম্পতী তাঁহাদের মধুচন্দ্র যাপন করিতে এক্ষণে বাহির হইলেন। ইংরাজদের অদ্ভুত প্রথানুসারে তাঁহাদের পশ্চাতে পুরাতন পাদুকা নিক্ষিপ্ত হইল। বিবাহের পালা সাঙ্গ হইল।

পাঠকের মধ্যে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বরকন্যার স্বাস্থ্য-উদ্দেশে বক্তৃতা ইহার অর্থ কি? কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে ভোজনের নিমন্ত্রণ হইলে ভোজনান্তে ব্যক্তি ও সম্প্রদায় বিশেষের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ উদ্দেশে সুরাপান ও বক্তৃতা করিবার রীতি ইংরাজদের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রথম গণ্ডূষ রাণীর স্বাস্থ্য উদ্দেশে পান করিতে হয়। সভাপতি বলিয়া উঠেন "মহাশয়েরা পাত্র পূর্ণ করুন। মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া যাঁহার রাজ্যে সূর্য্য কখন অস্তমিত হয় না, অন্যায় অত্যাচার স্থান পায় না, যাঁহার সুশাসনে শত্রুদলের গর্ব্ব খর্ব্ব ও প্রজাগণের সুখ সমৃদ্ধি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, যিনি আপনার পবিত্র চরিত্র ও অমায়িক প্রজাবাৎসল্যে সকলেরই প্রীতি ভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন, তাঁহার প্রতি ইংরাজদিগের রাজভক্তি উদ্দীপন করিবার জন্য অধিক বাক্যব্যয় আবশ্যক করে না। সকলে জয় জয় শব্দে রাণীর স্বাস্থ্য উদ্দেশে পান করুন।" রাণীর পর যুবরাজ ও তাঁহার মহিষী, তৎপরে ক্রমান্বয়ে সৈন্যদল, নাবিকদল, পার্লেমেণ্ট সভার সভ্যগণ, রাজমন্ত্রী, আচার্য্য, পুরোহিত, ন্যায়াধীশ ইত্যাদির, অবশেষে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" এই বচন অনুসারে "মহিলাগণের" স্বাস্থ্য পানের প্রস্তাব করা হয়। এই বিষয়ের প্রস্তাবক যেমন উৎসাহের সহিত বক্তৃতা করেন, শ্রোতৃগণও তেমনি উৎসাহের সহিত তাহা অনুমোদন করত পান করেন। এই ভাবে বক্তৃতা হয়, যথা "সভাপতি ও মহোদয়গণ, আমার উপর যে ভার অর্পিত হইয়াছে, তাহা কষ্টের নহে, আনন্দের ভার।—তাহা এই যে, মহিলাগণের স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব করা, ইহা অপেক্ষা সুখকর, উৎসাহকর প্রস্তাব আর কি হইতে পারে? কিন্তু কোথায় সেই অতুল-গুণ-নিধান অপ্রতিম-সৌন্দর্য্যখনি কামিনী-কুল, আর কোথায় আমার এই দুর্ব্বল নিস্তেজ বাক্য, কিরূপে তাঁহাদের বর্ণন করিব? যে সকল সদ্গুণে মানবপ্রকৃতি উন্নত ও অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহা স্ত্রীজাতিতেই প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। রমণীর কমনীয় জ্যোতি বিহীন হইলে পুরুষ-সমাজ কি নীরস, কি কঠোর হইয়া পড়ে। নারীগণই পুরুষদের সুখ সৌভাগ্যের একমাত্র সেতু। স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন, স্ত্রী ও শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই। শৈশব-কালে মাতার যে অকৃত্রিম স্নেহে ও যত্নে আমরা লালিত পালিত হই, ভগিনীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা, পতিব্রতা সতীর পবিত্র প্রেম, যে প্রেম ও ভাল বাসা, কালে ক্ষয় হয় না, দূরে হ্রাস হয় না, সহস্র কলঙ্কেও যাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না, তাহা কাহার না স্মরণ হইবে? যখন আমরা অনাহারে, অনিদ্রায় দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়া রোগশয্যায় শয়ান হই, তখন স্ত্রীলোকের সুকোমল স্পর্শ ভিন্ন কে আমাদের সেই বিষম তাপের উপশম করিতে পারে? সে সময়ে কাহার পদবিক্ষেপ এমন নিঃশব্দ? কাহার বাক্য এমন সান্ত্বনাবহ? কাহার হাস্য

এমন মধুর ? কাহার অশ্রুজল এমন দুঃখ-নাশন ? কাহার প্রার্থনা এমন ফলদায়ী ? স্ত্রী ভিন্ন কে আমাদের জীবনপথের নিত্য সঙ্গী, সম দুঃখ-সুখ অচলা সখী ? আমরা যেন আমোদে মত্ত হইয়া তাঁহাদের স্নেহ প্রেম ভুলিয়া না যাই। আইস দেখি তোমরা যে যোষিৎকুলের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা ঋণে আবদ্ধ রহিয়াছ, তাহার কিরূপে প্রতিশোধ দাও ”

এই সকল উপলক্ষে স্ত্রীরা প্রায় উপস্থিত থাকেন না, কিন্তু তাঁহাদের প্রতিনিধি কোন ললনা-ভক্ত পুরুষ তাঁহার হইয়া প্রস্তাবককে সাধুবাদ করেন।

আংলো ইণ্ডিয়ানদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে আর অধিক বলিবার আবশ্যক করে না। যাহা বলা গেল তাহা অনেকেরই জানা কথা, আর অধিক বলিতে গেলে প্রস্তাব বাহুল্য হইয়া পড়ে। তবে এখনো আর একটি কথা বক্তব্য আছে, তাহা বলিয়াই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

ক্রমশঃ

সঃ—

কবি-কাহিনী।

প্রথম সর্গ।

শুন কলপনা বালা, ছিল কোন কবি
বিজন কুটীর-তলে। ছেলেবেলা হোতে
তোমার অমৃত-পানে আছিল মজিয়া।
তোমার বীণার ধ্বনি ঘুমায়ে ঘুমায়ে
শুনিত, দেখিত কত সুখের স্বপন।
একাকী আপন মনে সরল শিশুটি
তোমারি কমল-বনে করিত গো খেলা,
মনের কতকি গান গাহিত হরষে,
বনের কতকি ফুলে গাঁথিত মালিকা।
একাকী আপন মনে কাননে কাননে
যেখানে সেখানে শিশু করিত ভ্রমণ;
একাকী আপন মনে হাসিত কাঁদিত।
জননীর কোল হোতে পালাত ছুটিয়া,
প্রকৃতির কোলে গিয়া করিত সে খেলা,
ধরিত সে প্রজাপতি, তুলিত সে ফুল,
বসিত সে তরুতলে, শিশিরের ধারা
ধীরে ধীরে দেহে তার পড়িত ঝরিয়া।
বিজন কুলায়ে বসি গাহিত বিহঙ্গ,
হেথা হোথা উঁকি মারি দেখিত বালক,
কোথায় গাইছে পাখী। ফুলদলগুলি,
কামিনীর গাছ হোতে পড়িলে ঝরিয়া
ছড়ায়ে ছড়ায়ে তাহা করিত কি খেলা!
প্রফুল্ল উষার ভূষা অরুণ-কিরণে
বিমল সরসী যবে হোত তারাময়ী,
ধরিতে কিরণগুলি হইত অধীর।
যখনি গো নিশীথের শিশিরাশ্রু জলে
ফেলিতেন উষা দেবী সুরভি নিশ্বাস,
গাছপালা লতিকার পাতা নড়াইয়া,
ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিয়া ঘুমন্ত নদীর
যখনি গাহিত বায়ু বন্য-গান তার,

তখনি বালক-কবি ছুটিত প্রান্তরে,
দেখিত ধান্যের শিষ দুলিছে পবনে।
দেখিত একাকী বসি গাছের তলায়,
স্বর্ণময় জলদের সোপানে সোপানে
উঠিছেন উষাদেবী হাসিয়া হাসিয়া।
নিশা তারে ঝিল্লীরবে পাড়াইত ঘুম,
পূর্ণিমার চাঁদ তার মুখের উপরে
তরল জোছনা-ধারা দিতেন ঢালিয়া,
স্নেহময়ী মাতা যথা সুপ্ত শিশুটির
মুখ পানে চেয়ে চেয়ে করেন চুম্বন।
প্রভাতের সমীরণে, বিহঙ্গের গানে
উষা তার সুখ-নিদ্রা দিতেন ভাঙ্গায়ে।
এইরূপে কি একটি সঙ্গীতের মত,
তপনের স্বর্ণময়-কিরণে প্লাবিত
প্রভাতের একখানি মেঘের মতন,
নন্দন বনের কোন অপ্সরা-বালার
সুখময় ঘুমঘোরে স্বপনের মত
কবির বালক কাল হইল বিগত।

যৌবনে যখনি কবি করিল প্রবেশ,
প্রকৃতির গীতধ্বনি পাইল শুনিতে,
বুঝিল সে প্রকৃতির নীরব কবিতা।
প্রকৃতি আছিল তার সঙ্গিনীর মত।
নিজের মনের কথা যত কিছু ছিল,
কহিত প্রকৃতি দেবী তার কানে কানে;
প্রভাতের-সমীরণ যথা চুপি চুপি
কহে কুসুমের কানে মরম-বারতা।
নদীর মনের গান বালক যেমন
বুঝিত, এমন আর কেহ বুঝিত না।
বিহঙ্গ তাহার কাছে গাইত যেমন,
এমন কাহারো কাছে গাইত না আর।
তার কাছে সমীরণ যেমন বহিত
এমন কাহারো কাছে বহিত না আর।
যখনি রজনী-মুখ উজলিত' শশী,
সুপ্ত বালিকার মত যখন বসুধা
সুখের স্বপন দেখি হাসিত নীরবে;
বসিয়া তটিনী তীরে দেখিত সে কবি,
স্নান করি জোছনায় উপরে হাসিছে
সুনীল আকাশ, হাসে নিম্নে স্রোতস্বিনী;
সহসা সমীরণের পাইয়া পরশ
দুয়েকটি ঢেউ কভু জাগিয়া উঠিছে;
ভাবিত নদীর পানে চাহিয়া চাহিয়া,
নিশাই কবিতা আর দিবাই বিজ্ঞান।
দিবসের আলোকে সকলি অনাবৃত,
সকলি রয়েছে খোলা চখের সমুখে,
ফুলের প্রত্যেক কাঁটা পাইবে দেখিতে।
দিবালোকে চাও যদি বনভূমি পানে,
কাঁটা খোচা কর্দ্দমাক্ত বীভৎস জঙ্গল
তোমার চখের পরে হবে প্রকাশিত;
দিবালোকে মনে হয় সমস্ত জগৎ
নিয়মের যন্ত্র-চক্রে ঘুরিছে ঘর্ঘরি।
কিন্তু কবি নিশাদেবী কি মোহন-মন্ত্র
পড়ি দেয় সমুদয় জগতের পরে,
সকলি দেখায় যেন রহস্যে পূরিত;
সমস্ত জগৎ যেন স্বপ্নের মতন;
ওই স্তব্ধ নদী-জলে চন্দ্রের আলোকে
পিছলিয়া চলিতেছে যেমন তরণী,
তেমনি সুনীল ওই আকাশ সলিলে
ভাসিয়া চলেছে যেন সমস্ত জগৎ;
সমস্ত ধরারে যেন দেখিয়া নিদ্রিত,
একাকী গম্ভীর-কবি নিশাদেবী ধীরে
তারকার ফুলমালা জড়ায়ে মাথায়,

জগতের গ্রন্থে কত লিখিছে কবিতা।
এইরূপে সেই কবি ভাবিত কতকি।
হৃদয় হইল তার সমুদ্রের মত,
সে সমুদ্রে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার
প্রতিবিম্ব দিবানিশি পড়িত খেলিত,
সে সমুদ্র প্রণয়ের জোছনা পরশে
লঙ্ঘিয়া তীরের সীমা উঠিত উথলি,
সে সমুদ্র আছিল গো এমন বিস্তৃত
সমস্ত পৃথিবী দেবি, পারিত বেষ্টিতে
নিজ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে। সে সিন্ধু-হৃদয়ে
দুরন্ত শিশুর মত মুক্ত সমীরণ
হু হু করি দিবানিশি বেড়াত খেলিয়া।
নির্ঝরিণী, সিন্ধুবেলা, পর্ব্বত-গহ্বর,
সকলি কবির ছিল সাধের বসতি।
তার প্রতি তুমি এত ছিলে অনুকূল
কল্পনা! সকল ঠাঁই পাইত শুনিতে
তোমার বীণার ধ্বনি, কখনো শুনিত
প্রস্ফুটিত গোলাপের হৃদয়ে বসিয়া,
বীণা লয়ে বাজাইছ অস্ফুট কি গান।
কণক-কিরণময় উষার জলদে
একাকী পাখীর সাথে গাইতে কি গীত
তাই শুনি যেন তার ভাঙ্গিত গো ঘুম!
অনন্ত তারা-খচিত নিশীথ-গগনে
বসিয়া গাইতে তুমি কি গম্ভীর-গান,
তাহাই শুনি যেন বিহ্বল হৃদয়ে
নীরবে আকাশ পানে রহিত চাহিয়া।
নীরব নিশীথে যবে একাকী রাখাল
সুদূর কুটীর-তলে বাজাইত বাঁশি,
তুমিও তাহার সাথে মিলাইতে ধ্বনি,
সে ধ্বনি পশিত তার প্রাণের ভিতর।
নিশার আঁধার-কোলে জগত যখন
দিবসের পরিশ্রমে পড়িত ঘুমায়ে,
তখন সে কবি উঠি তুষার-মণ্ডিত
সমুচ্চ পর্ব্বত-শিরে, গাইত একাকী
প্রকৃতি-বন্দনা-গান মেঘের মাঝারে।
সে গম্ভীর গান তার কেহ শুনিত না,
কেবল আকাশ-ব্যাপী স্তব্ধ তারকারা
এক দৃষ্টে মুখ পানে রহিত চাহিয়া।
কেবল, পর্ব্বত-শৃঙ্গ করিয়া আঁধার,
সরল পাদপ-রাজি নিস্তব্ধ গম্ভীর
ধীরে ধীরে শুনিত গো তাহার সে গান;
কেবল সুদূর-বনে দিগন্ত-বালার
হৃদয়ে সে গান পশি প্রতিধ্বনি রূপে
মৃদুতর হোয়ে পুন আসিত ফিরিয়া।
কেবল সুদূর শৃঙ্গে নির্ঝরিণী বালা
সে গম্ভীর গীতি সাথে কণ্ঠ মিশাইত,
নীরবে তটিনী যেত সমুখে বহিয়া,
নীরবে নিশীথ-বায়ু কাঁপাত পল্লব।
গম্ভীরে গাইত কবি "হে মহা প্রকৃতি,
কি সুন্দর, কি মহান্ মুখশ্রী তোমার,
শূন্য আকাশের পটে হে প্রকৃতি দেবি,
কি কবিতা লিখছ যে জ্বলন্ত অক্ষরে,
যতদিন রবে প্রাণ, পড়িয়া পড়িয়া
তবু ফুরাবে না, পড়া মিটিবেনা আশ!
শত শত গ্রহ তারা তোমার কটাক্ষে
কাঁপি উঠে থরথরি, তোমার নিশ্বাসে
ঝটিকা বহিয়া যায় বিশ্বচরাচরে।
কালের মহান্ পক্ষ করিয়া বিস্তার,
অনন্ত আকাশে থাকি হে আদি জননি,
শাবকের মত এই অসংখ্য জগৎ
তোমার পাখার ছায়ে করিছ পালন।
সমস্ত জগৎ যবে আছিল বালক,

দুরন্ত শিশুর মত অনন্ত আকাশে
করিত গো ছুটাছুটি না মানি শাসন,
স্তনদানে পুষ্ট করি তুমি তাহাদের
অলঙ্ঘ্য সখ্যের ডোরে দিলে গো বাঁধিয়া।
এ দৃঢ় বন্ধন যদি ছিঁড়ে একবার,
সেকি ভয়ানক কাণ্ড বাধে এ জগতে,
কক্ষচ্ছিন্ন কোটি কোটি সূর্য্য চন্দ্র তারা
অনন্ত আকাশময় বেড়ায় মাতিয়া,
মণ্ডলে মণ্ডলে ঠেকি লক্ষ সূর্য্য গ্রহ
চূর্ণ চূর্ণ হোয়ে পড়ে হেথায় হোথায় ;
এমহান্ জগতের ভগ্ন অবশেষ
চূর্ণ নক্ষত্রের স্তূপ, খণ্ড খণ্ড গ্রহ
বিশৃঙ্খল হয়ে রহে অনন্ত আকাশে !
অনন্ত আকাশ আর অনন্ত সময়,
যা ভাবিতে পৃথিবীর কীট মানুষের
ক্ষুদ্র বুদ্ধি হোয়ে পড়ে ভয়ে সঙ্কুচিত,
তাহাই তোমার দেবি সাধের আবাস।
তোমার মুখের পানে চাহিতে হে দেবি,
ক্ষুদ্র মানবের এই স্পর্দ্ধিত জ্ঞানের
দুর্ব্বল নয়ন যায় নিমীলিত হয়ে।
হে জননি আমার এ হৃদয়ের মাঝে
অনন্ত-অতৃপ্তি-তৃষ্ণা জ্বলিছে সদাই,
তাই দেবি পৃথিবীর পরিমিত কিছু
পারে না গো জুড়াইতে হৃদয় আমার,
তাই ভাবিয়াছি আমি হে মহাপ্রকৃতি,
মজিয়া তোমার সাথে অনন্ত প্রণয়ে
জুড়াইব হৃদয়ের অনন্ত পিপাসা !
প্রকৃতি জননি ওগো, তোমার স্বরূপ
যতদূর জানিবারে ক্ষুদ্র মানবেরে
দিয়াছ গো অধিকার সদয় হইয়া,
ততদূর জানিবারে জীবন আমার
করেছি ক্ষেপণ, আর করিব ক্ষেপণ।
ভ্রমিতেছি পৃথিবীর কাননে কাননে ;
বিহঙ্গও যতদূর পারেনা উড়িতে
সে পর্ব্বত শিখরেও গিয়াছি একাকী ;
দিবাও পশেনি দেবি যে গিরিগহ্বরে,
সেখানে নির্ভয়ে আমি করেছি প্রবেশ।
যখন ঝটিকা ঝঞ্ঝা প্রচণ্ড সংগ্রামে
অটল পর্ব্বত-চূড়া করেছে কম্পিত,
সুগম্ভীর অম্বুনিধি উন্মাদের মত
করিয়াছে ছুটাছুটি যাহার প্রতাপে,
তখন একাকী আমি পর্ব্বত-শিখরে
দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি সে ঘোর বিপ্লব,
মাথার উপর দিয়া সহস্র অশনি
সুবিকট অট্টহাসে গিয়াছে ছুটিয়া,
প্রকাণ্ড শিলার স্তূপ পদতল হোতে
পড়িয়াছে ঘর্ঘরিয়া উপত্যকা দেশে,
তুষার-সঙ্ঘাত-রাশি পড়েছে খসিয়া
শৃঙ্গ হোতে শৃঙ্গান্তরে উলটি পালটি।
অমানিশীথের কালে নীরব প্রান্তরে
বসিয়াছি, দেখিয়াছি চৌদিকে চাহিয়া,
সর্ব্বব্যাপী নিশীথের অন্ধকার গর্ভে
এখনো পৃথিবী যেন হতেছে সৃজিত।
স্বর্গের সহস্র আঁখি পৃথিবীর পরে
নীরবে রয়েছে চাহি পলকবিহীন,
স্নেহময়ী জননীর স্নেহ-আঁখি যথা
সুপ্ত বালকের পরে রহে বিকসিত।
এমন নীরবে বায়ু যেতেছে বহিয়া,
নীরবতা ঝাঁঝাঁ করি গাইছে কি গান,
মনে হয় স্তব্ধতার ঘুম পাড়াইছে।
কি সুন্দর রূপ তুমি দিয়াছ উষায়
হাসি হাসি নিদ্রোত্থিতা বালিকার মত

আধ ঘুমে মুকুলিত হাসিমাখা আঁখি !
কি মন্ত্র শিখায়ে দেছ দক্ষিণ বালারে—
যেদিকে দক্ষিণ-বধূ ফেলেন নিশ্বাস,
সেদিকে ফুটিয়া উঠে কুসুম-মঞ্জরী,
সেদিকে গাহিয়া উঠে বিহঙ্গের দল,
সেদিকে বসন্ত-লক্ষ্মী উঠেন হাসিয়া !
কি হাসি হাসিতে জানে পূর্ণিমা-শর্ব্বরী,
সে হাসি দেখিয়া হাসে গম্ভীর পর্ব্বত,
সে হাসি দেখিয়া হেসে উথলে জলধি,
সে হাসি দেখিয়া হাসে দরিদ্র কুটীর !
হে প্রকৃতি দেবি তুমি মানুষের মন
কেমন বিচিত্র ভাবে রেখেছ পূরিয়া,
করুণা, প্রণয়, স্নেহ, সুন্দর শোভন
ন্যায়, ভক্তি, ধৈর্য্য আদি সমুচ্চ মহান্,
ক্রোধ, দ্বেষ, হিংসা আদি ভয়ানক ভাব,
নিরাশা মরুর মত দারুণ-বিষণ্ণ—
তেমনি আবার এই বাহির জগৎ
বিচিত্র বেশভূষায় করেছ সজ্জিত।
তোমার বিচিত্র কাব্য-উপবন হতে
তুলিয়া সুরভি ফুল গাঁথিয়া মালিকা,
তোমারি চরণ তলে দিব উপহার !”
এইরূপে সুনিস্তব্ধ নিশীথ-গগনে
প্রকৃতি-বন্দনা-গান গাইত সে কবি।

মেঘনাদ-বধ কাব্য।

(মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।)

বাল্মীকি রামের চরিত্র-বর্ণনা কালে বলিয়াছেন “যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য্য।” * “ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না।” যখন কৈকেয়ী রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, তখন “মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছুমাত্র ব্যথিত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না।” “চন্দ্রের যেমন হ্রাস, সেইরূপ রাজ্য-নাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না! জীবন্মুক্ত যেমন সুখে দুঃখে একই ভাবে থাকেন, তিনি তদ্রূপই রহিলেন; ফলতঃ ঐ সময়ে তাঁহার চিত্ত-বিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।” “ঐ সময় দেবী কৌশল্যার অন্তঃপুরে অভিষেক-মহোৎসব প্রসঙ্গে নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়াও এই বিপদে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্না-পূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না; সেইরূপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না।” সাধারণ্যে রামের প্রজারঞ্জন, এবং বীরত্বের ন্যায় তাঁহার অটল ধৈর্য্যও প্রসিদ্ধ আছে। বাল্মীকি রামকে মনুষ্য-

* উদ্ধৃত গুলি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত রামায়ণ হইতে।

চরিত্রের পূর্ণতা অর্পণ করিতে চেস্টা করিয়াছেন; তিনি তাঁহাকে কোমলতা ও বীরত্ব, দয়া ও ন্যায়, সহৃদয়তা ও ধৈর্য্য প্রভৃতি সকল প্রকার গুণের সামঞ্জস্য-স্থল করিতে চেস্টা করিয়াছেন। আমরা উপরি উক্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মেঘনাদ বধ কাব্যের রাম চরিত্র-সমালোচনা করিব, অথবা যদি মাইকেল রাম-চরিত্র-চিত্রে আদিকবির অনুসরণ না করিয়া থাকেন, তবে তাহা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখিব।

যখন প্রমীলার দূতী নৃমুণ্ডমালিনী রামের নিকট অসি, গদা বা মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিতে গেলেন, তখন রঘুপতি উত্তর দেন যে,

"———শুন সুকেশিনী
বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে।
অরি মম রক্ষঃপতি, তোমরা সকলে
কুলবালা, কুলবধূ; কোন্ অপরাধে
বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে ?"
ইত্যাদি—

তখন মনে করিলাম যে, 'রাম ভালই করিয়াছেন, তিনি বীর, বীরের মর্য্যাদা বুঝেন; অবলা স্ত্রীলোকদের সহিত অনর্থক বিবাদ করিতেও তাঁহার ইচ্ছা নাই। তখন ত জানিতাম না যে, রাম ভয়ে যুদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই।

"দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে
রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি।
মূঢ় যে ঘাঁটায় সথে হেন বাঘিনীরে।"

এ রাম যে কি বলিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন সেই এক সমস্যা! প্রমীলা ত লঙ্কায় চলিয়া যাউন, কিন্তু রামের যে ভয় হইয়াছে তাহা আর কহিবার নয়।

তিনি বিভীষণকে ডাকিয়া কহিতেছেন—

"এবে কি করিব, কহ, রক্ষ-কুল মণি?
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে,
কে রাখে এ মৃগ পালে?'

রামের কাঁদো কাঁদো স্বর যেন আমরা স্পস্ট শুনিতে পাইতেছি। লক্ষ্মণ, দাদাকে একটু প্রবোধ দিলেন; রাম বিভীষণকে কহিলেন—

"কৃপা করি, রক্ষোবর, লক্ষ্মণেরে লয়ে,
দুয়া'র দুয়ারে সথে, দেখ সেনাগণে।
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্লান্ত সবে
বীরবাহু সহ রণে। * * *
* * এ পশ্চিম দ্বারে
আপনি জাগিব আমি ধনুর্ব্বাণ হাতে!"

লক্ষ্মণ ষষ্ঠ সর্গে রামকে কহিলেন—

"মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে!"

রঘুনাথ উত্তর করিলেন—

"হায় রে কেমনে—
যে কৃতান্ত দূতে দূরে হেরি, ঊর্দ্ধশ্বাসে
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে
প্রাণ লয়ে; দেবনর ভস্ম যার বিষে;
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে,
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।"
ইত্যাদি

লক্ষ্মণ বুঝাইলেন যে, দেবতারা যখন আমাদের প্রতি সদয়, তখন কিসের ভয়। বিভীষণ কহিলেন যে, লঙ্কার রাজলক্ষ্মী তাঁহাকে স্বপ্নে কহিয়াছেন যে, তিনি শীঘ্রই

প্রস্থান করিবেন, অতএব ভয় করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাম কাঁদিয়া উঠিলেন—

"উত্তরিলা সীতানাথ সজল নয়নে ;
'স্মরিলে পূর্ব্বের কথা রক্ষকুলোত্তম
আকুল পরাণ কাঁদে। কেমনে ফেলিব
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ?'"
ইত্যাদি

কিছুতেই কিছু হইল না, রামের ভয় কিছুতেই ঘুচিল না, অবশেষে আকাশ-বাণী হইল।

"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেব-বাক্য, দেবকুলপ্রিয়
তুমি ?"

অবশেষে আকাশে চাহিয়া দেখিলেন যে অজগরের সহিত একটা ময়ূর যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু যুদ্ধে অজগর জয়ী ও ময়ূর নিহত হইল। এতক্ষণে রাম শান্ত হইলেন, ও লক্ষ্মণকে যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিলেন। লক্ষ্মণ যুদ্ধে যাইবার সময় রাম একবার দেবতার কাছে প্রার্থনা করিলেন, একবার বিভীষণকে কাতর ভাবে কহিলেন,

"সাবধানে যাও মিত্র। অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথীবর!"

বিভীষণ কহিলেন, কোন ভয় নাই। ইন্দ্রজিৎ-শোকে অধীর হইয়া যখন রাবণ সৈন্য-সজ্জায় আদেশ দিলেন, তখন রাক্ষস-সৈন্য-কোলাহল শুনিয়া রাম আপনার সৈন্যাধ্যক্ষ-গণকে ডাকাইয়া আনিলেন ও তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"পুত্রশোকে আজি
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্বরে ;
* * * *
রাখগো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে।
স্ববন্ধু-বান্ধব-হীন বনবাসী আমি
ভাগ্য দোষে ; তোমরা হে রামের ভরসা
বিক্রম, প্রতাপ, রণে। *
কুল, মান প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি
রঘুবন্ধু, রঘুবধূ বন্ধা কারাগারে
রক্ষ-ছলে! স্নেহ-পণে কিনিয়াছ রামে
তোমরা, বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা পাশে
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য দাক্ষিণ্য প্রকাশি!"
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।

এরূপ দুগ্ধপোষ্য বালকের ন্যায় কথায় কথায় সজল নয়নে বিষম ভীরুস্বভাব রাম বনের বানর গুলাকে লইয়া এত কাল লঙ্কায় তিষ্ঠিয়া আছে কিরূপে তাহাই ভাবিতেছি।

লক্ষ্মণের মৃত্যু হইলে রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন, সে বিলাপ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু বলিতে চাহি না, কেবল ইলিয়াড হইতে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধু পেট্রক্লসের মৃত্যুতে একিলিস যে বিলাপ করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকেরা বুঝিয়া লইবেন যে কিরূপ বিলাপ বীরের উপযুক্ত। একিলিস তাঁহার দেবী-মাতা থেটিস্‌কে কহিতেছেন,

He, deeply groaning—"To this cureless grief.
Not even the Thunderer's favour brings relief.

Patroclus—Ah!—say, goddess, can I boast
A pleasure now? revenge itself is lost;
Patroclus, loved of all my martial train,
Beyond mankind, beyond myself, is slain!
'Tis not in fate the alternate now to give;
Patroclus dead Achilles hates to live.
Let me revenge it on proud Hector's heart,
Let his last spirit smoke upon my dart;
On these conditions will I breathe: till then,
I blush to walk among the race of men."
A flood of tears at this the goddess shed:
"Ah then, I see thee dying, see thee dead!
When Hector falls, thou diest."—"Let Hector die,
And let me fall! (Achilles made reply)
Far lies Patroclus from his native plain!
He fell, and, falling, wish'd my aid in vain.
Ah then, since from this miserable day
I cast all hope of my return away;
Since, unrevenged, a hundred ghosts demand
The fate of Hector from Achilles' hand;
Since here, for brutal courage far renown'd,
I live an idle burden to the ground,
(Others in council famed for nobler skill,
More useful to preserve, than I to kill)
Let me—But oh! ye gracious powers above!
Wrath and revenge from men and gods remove:
Far, far too dear to every mortal breast,
Sweet to the soul, as honey to the taste:
Gathering like vapours of a noxious kind
Form fiery blood, and darkening all the mind.
Me Agamemnon urged to deadly hate;
Tis past—I quell it; I resign to fate.
Yes—I will meet the murderer of my friend;
Or (if the gods ordain it) meet my end.
The stroke of fate the bravest cannot shun:
The great Alcides, Jove's unequal'd son,
To Juno's hate, at length resign'd his breath,
And sunk the victim of all-conquering death.

So shall Achilles fall! stretch'd pale and dead,
No more the Grecian hope, or Trojan dread!
Let me, this instant, rush into the fields,
And reap what glory life's short harvest yields.
Shall I not force some widow'd dame to tear
With frantic hands her long dishevel'd hair?
Shall I not force her breast to heave with sighs,
And the soft tears to trickle from her eyes?
Yes, I shall give the fair those mournful charms—
In vain you hold me—Hence! my arms, my arms!—
Soon shall the sanguine torrent spread so wide,
That all shall know, Achilles swells the tide."

রাম লক্ষ্মণের ঔষধ আনিবার জন্য যম-পুরীতে গমন করিলেন। সেখানে বালীর সহিত দেখা হইল, বালী কহিলেন—

"———কি হেতু হেথা সশরীরে আজি,
রঘুকুল চূড়ামণি? অন্যায় সমরে
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে;
কিন্তু দূর কর ভয়, এ কৃতান্ত পুরে
নাহি জানি ক্রোধ মোরা,জিতেন্দ্রিয় সবে।"

পরে দশরথের নিকটে গেলেন;

"হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি
বাহুযুগ, (বক্ষঃস্থল আর্দ্র অশ্রু জলে)"

বালী যেমন দেহের সহিত ক্রোধ প্রভৃতি রিপু পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে সুখভোগ করিতেছেন, তেমনি দশরথ যদি পৃথিবীর অশ্রুজল পৃথিবীতেই রাখিয়া আসিতেন ত ভাল হইত। শরীর না থাকিলে অশ্রুজল থাকা অসম্ভব, আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। এমনকি ইহার কিছু পরে রাম যখন দশরথের পদধূলি লইতে গেলেন, তখন তাঁহার পা-ই খুঁজিয়া পান নাই, এমন অশরীরী আত্মার বক্ষঃস্থল কিরূপে যে অশ্রুজলে আর্দ্র হইয়াছিল, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহা হউক রামের আর অধিক কিছুই নাই। রামের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। রাম যে কথায় কথায় "ভিখারী রাম" "ভিখারী রাম" করিয়াছেন, সেগুলি আমাদের ভাল লাগে না: এইরূপে নিজের প্রতি পরের দয়া উদ্রেক করিবার চেস্টা, অতিশয় হীনতা প্রকাশ করা মাত্র। একজন দরিদ্র বলিতে পারে "আমি ভিক্ষুক আমাকে সাহায্য কর।" একজন নিস্তেজ দুর্ব্বল বলিতে পারে, "আমি দুর্ব্বল, আমাকে রক্ষা কর।" কিন্তু তেজস্বী বীর সেরূপ বলিতে পারেন না; তাহাতে আবার রাম ভিখারীও নহেন,তিনি নির্ব্বাসিত বনবাসী মাত্র।

"ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে।"

"অমূল রতনে
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে।"

"বাঁচাও করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।"

ইত্যাদি

যাহা হউক, রামায়ণের নায়ক মহাবীর রাম, মেঘনাদবধকাব্যের কবি তাঁহার একি দুর্দ্দশা করিয়াছেন! তাঁহার চরিত্রে তিলমাত্র উন্নত-ভাব অর্পিত হয় নাই, এরূপ পরমুখাপেক্ষী ভীরু কোনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। বাল্যকাল হইতে রামের প্রতি আমাদের এরূপ মমতা আছে যে, প্রিয়ব্যক্তির মিথ্যা-অপবাদ শুনিলে যেরূপ কস্ট হয়, মেঘনাদবধ-কাব্যে রামের কাহিনী পড়িলে সেইরূপ কস্ট হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রামের চরিত্রে বীরত্ব ও কোমলত্ব সমানরূপে মিশ্রিত আছে। পৌরুষ এবং স্ত্রীত্ব উভয় একাধারে মিশ্রিত হইলে তবে পূর্ণ-মনুষ্য সৃজিত হয়, বাল্মীকি রামকে সেইরূপ করিতে চেস্টা করিয়াছেন। মেঘনাদবধে রামের কোমলতা অংশটুকু অপর্য্যাপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু পাঠক, এমন একটি কথাও কি পাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে বীর বলিয়া মনে হয়? প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবল বিভীষণের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, কেবল লক্ষ্মণের জন্য রোদন করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রেরণ করিবার সময় সংস্কৃত রামায়ণে রাম লক্ষ্মণকে কহিতেছেনঃ—

বৎস, সেই ভয়াবহ দুরাত্মার (ইন্দ্রজিতের) সমস্ত মায়া অবগত আছি। সেই রাক্ষসাধম দিব্য অস্ত্রধারী, এবং সংগ্রামে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণকেও বিসংজ্ঞ করিতে পারে। সে রথে আরোহণ পূর্ব্বক অন্তরীক্ষে বিচরণ করে, এবং মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় তাহার গতি কেহ জ্ঞাত হইতে পারে না। হে সত্যপরাক্রম অরিন্দম, বাণ দ্বারা সেই মহাবীর রাক্ষসকে বধ কর।

হে বৎস, সংগ্রামে দুর্ম্মদ যে বীর বজ্রহস্তকেও পরাজিত করিয়াছে, হনুমান, জাম্বুবান ও ঋক্ষসৈন্য দ্বারা পরিবৃত হইয়া যাও—তাহাকে বিনাশ কর। বিভীষণ তাহার অধিষ্ঠিত স্থানের সমস্ত অবগত আছেন, তিনিও তোমার অনুগমন করিবেন।

মূল-রামায়ণে লক্ষ্মণের শক্তিশেল যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনুবাদিত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

ভুজগরাজের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত-শক্তি রাবণ দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া মহাবেগে লক্ষ্মণের বক্ষে নিপতিত হইল। লক্ষ্মণ এই দূরপ্রবিস্ট শক্তি দ্বারা ভিন্নহৃদয় হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সন্নিহিত রাম তাঁহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া ভ্রাতৃস্নেহে বিষন্ন হইলেন ও মুহূর্ত্ত কাল সাশ্রুনেত্রে চিন্তা করিয়া ক্রোধে যুগান্তবহ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। "এখন বিষাদের সময় নয়" বলিয়া রাম রাবণ বধার্থ পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মহাবীর অনবরত শর বর্ষণ পূর্ব্বক রাবণকে ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। শর-জালে আকাশ পূর্ণ হইল এবং রাবণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর রাম দেখিলেন, লক্ষ্মণ শক্তিবিদ্ধ হইয়া শোণিত-লিপ্ত-দেহে সসর্প-পর্ব্বতের

ন্যায় রণস্থলে পতিত আছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান প্রভৃতি মহাবীরগণ লক্ষ্মণের বক্ষঃস্থল হইতে বহুযত্নেও রাবণ-নিক্ষিপ্ত-শক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। পরে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া দুই হস্তে ঐ ভয়াবহ শক্তি গ্রহণ ও উৎপাটন করিলেন। শক্তি উৎপাটন-কালে রাবণ তাঁহার প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিল। কিন্তু মহাবীর রাম তাহা লক্ষ্য না করিয়া লক্ষ্মণকে উত্থাপন পূর্ব্বক হনুমান ও সুগ্রীবকে কহিলেন, দেখ, তোমরা লক্ষ্মণকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক এই স্থানে থাক এবং ইহাকে অপ্রমাদে রক্ষা কর। ইহা চিরপ্রার্থিত পরাক্রম প্রকাশের অবসর। ঐ সেই পাপাত্মা রাবণ, বর্ষার মেঘের ন্যায় গর্জন করত আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। হে সৈন্যগণ, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর, আজ জগৎ অরাবণ বা অরাম হইবে। তোমরা কিছুতে ভীত হইও না। আমি সত্যই কহিতেছি এই দুরাত্মাকে নিহত করিয়া রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্য্যটন ও জানকীবিয়োগ এই সমস্ত ঘোরতর দুঃখ ও নরক-তুল্য-ক্লেশ নিশ্চয় বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই কপিসৈন্য আহরণ করিয়াছি, যাহার জন্য সুগ্রীবকে রাজা করিয়াছি, যাহার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলাম, সেই পাপ আজ আমার দৃষ্টিপথে উপস্থিত, তাহাকে আজ আমি সংহার করিব। এই পামর আজ দৃষ্টিবিষ ভীষণ-সর্পের দৃষ্টিতে পড়িয়াছে, কিছুতেই ইহার নিস্তার নাই। সৈন্যগণ, এক্ষণে তোমরা শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়া আমাদের এই তুমুল সংগ্রাম প্রত্যক্ষ কর। আমি আজ এমন ভীষণ কার্য্য করিব যে, অদ্যকার যুদ্ধে গন্ধর্ব্বেরা, কিন্নরেরা, দেবরাজ ইন্দ্র, চরাচর সমস্ত লোক, স্বর্গের সমস্ত দেবতারা রামের রামত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যতকাল পৃথিবী রহিবে ততকাল তাহা ঘোষণা করিতে থাকিবে।

এই বলিয়া মহাবীর রাম মেঘ হইতে জল-ধারার ন্যায় শরাসন হইতে অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। উভয়পক্ষের নিক্ষিপ্ত শর গতিপথে সঙ্ঘর্ষ প্রাপ্ত হওয়াতে একটী তুমুলশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

এইত রামায়ণ হইতে লক্ষ্মণের পতন দৃষ্টে রামের অবস্থা বর্ণনা উদ্ধৃত করাগেল। এক্ষণে রামায়ণের অনুকরণ করিলে ভাল হইত কিনা, আমরা তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, পাঠকেরা তাহা বিচার করিবেন।

ভঃ—

প্রাচীন-সিংহলের বাণিজ্য।

আজি নহে, কালি নহে, প্রাচীনতম কাল হইতেই সিংহল সভ্য-সমাজে পরিচিত, প্রাচীনতম কাল হইতেই তাহার সমৃদ্ধি-সৌরভ দিগন্তব্যাপ্ত। কত প্রাচীন কাল

হইতে আসিয়ার সভ্যসমাজ যে ইহার গুণ-গৌরব জ্ঞাত হইয়াছিল, আমরা তাহার কোন স্থির-প্রমাণ পাই না, তবে ইউরোপের কথা বলিতে পারি, আমরা তাহাই বলিতেছি। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ কালে তাঁহার সহচরদ্বয় নিয়ার্কস Nearchus ও অনেসিক্রিটস্ Onesicritus কর্তৃক সিংহলের সমৃদ্ধি ও বাণিজ্য-ব্যাপার প্রথম গ্রীকগণ মধ্যে প্রচারিত হয়। তৎপরে প্লিনি, এরিয়ান, টলেমি, কস্‌মস্, নক্স, মার্কোপলো, ভ্যালেণ্টাইন্, মণ্ডেভিল প্রভৃতি লেখকগণ দ্বারা ক্রমে ক্রমে উহা ইউরোপখণ্ডে আরো সুবিস্তৃতরূপে প্রখ্যাত হয়। আবার যখন সিংহল ব্রিটিশ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হইল, তত্ত্বান্বেষী ইংরাজ অমনি বদ্ধ-পরিকর হইয়া উহার অন্তঃপ্রদেশ গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং বহুতর সুদৃঢ় প্রমাণ পাইয়া তাঁহাদের মনে প্রতীতি হইল, যে, ইহার অবস্থা এরূপ ছিল না। চারিদিকেই প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশিষ্ট স্তূপাকারে থাকিয়া পূর্ব্ব-গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। দেবালয়, গগনস্পর্শিনী সৌধ-মালা, ক্ষেত্রে জলপ্রদান-মানসে নির্ম্মিত খণ্ডপ্রস্তর-মণ্ডিত দূরব্যাপী বিশাল তড়াগ-রাজি অতীত-সাক্ষী ইতিহাস-পত্রের ন্যায় প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতেছে। সিংহলের এই সকল বিস্ময়জনক পূর্ব্ব-গৌরব-ভগ্নাবশেষ দেখিবামাত্র তাঁহাদের মনোমধ্যে এই প্রশ্নের আবির্ভাব হইল যে, এ সকল কোন্ সময়ের নির্ম্মিত? কোন সময়ের প্রবল বাণিজ্য-স্রোত ইহাকে এরূপ ধনশালী করিয়াছিল? ইংরাজ, পূর্ব্বতন লেখকগণের নিকট যতটুকু জানিতে পারিয়াছে, আজি আমরা পাঠক-সমাজে তাহাই বিবৃত করিতেছি।

বাণিজ্যের বিষয় লিখিতে গেলে দেশের অবস্থান, প্রকৃতি ও উৎপন্নদ্রব্য বিষয়ে প্রয়োজনমত কিঞ্চিৎ লিখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সিংহলের অবস্থানের বিষয় সকলেই জানেন, উহা লিখা অনাবশ্যক। কেবল উহার প্রকৃতি ও উৎপন্নদ্রব্য বিষয়ে দুই একটী কথার আলোচনা করিয়া প্রস্তাবিত-প্রবন্ধে অগ্রসর হইব।

আমরা যাহাকে সিংহল বা লঙ্কাদ্বীপ * বলিয়া থাকি, ইংরাজেরা যাহাকে Ceylon বলিয়া থাকেন, প্রাচীন কালে বিদেশীয়েরা তাহাকে তাপ্রোবেন Taprobane † কহিত। ইহার অন্তঃপ্রদেশ অপ্রবেশনীয় ঘনবনাচ্ছাদিত পর্ব্বত-মালায় সমাকীর্ণ। তন্মধ্যে মালেল বা আদিম শৈলই Adam's Peak ‡ সর্ব্বোচ্চ; উহা দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে অব-

---

* সিংহল দ্বীপ, এই নামের উৎপত্তি বিষয়ে Asiatic Res vol vii P 48 দেখ।

† Tap (দ্বীপ) এবং Ravan (রাবণ) এই দুই কথা হইতেই ঐ নামের উৎপত্তি। See Asiatic Res. vol. v. Page 39.

‡ সিংহলবাসীরা ইহাকে "মালেল" বলিয়া থাকে। খৃষ্টিয়ান প্রবাদ এই যে, Adam এবং Eve স্বর্গচ্যুত হইয়া শত বৎসর ধরিয়া এখানে অনুতাপাশ্রু বিসর্জ্জন করেন, এবং সেই অশ্রুজলে একটী হ্রদের উৎপত্তি। See The History of Ceylon by Philalethes P 11.

স্থিত। ইহার উত্তরভাগে ক্রমাগত সুবিস্তৃত ক্ষেত্র, তীর সকল সমতল। একদিকে আফ্রিকার পূর্ব্বোপকুল ও আরব, একদিকে ভারতবর্ষ, আর একদিকে চীনোপকূল; আবার অপরপক্ষে ইহার বহুসংখ্যক বন্দরের * অসাধারণ-বাণিজ্য-সুগমতা, ইহাতে বোধ হয় যেন প্রকৃতি দক্ষিণে ইহাকে বাণিজ্যাধিষ্ঠাত্রী-দেবতার একটী লোকললাম আবাস-স্থান করিয়া দিয়াছেন।

তৃণকমলী হইতে আরিপা এবং মান্নার পর্য্যন্ত বিস্তৃত উত্তর-ভাগ বাণিজ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মান্নার আরিপা হইতে এক সঙ্কীর্ণ প্রণালী দ্বারা বিভিন্ন। এখানকার জল গভীর নহে; এইস্থল অতি প্রাচীন-কাল হইতে প্রবাল ও শংখের জন্য বিখ্যাত। বাণিজ্য-পোত গমনাগমন ও বহুলরূপে কৃষিচর্চ্চা প্রযুক্ত ইহা যে, দ্বীপের অন্যান্য-ভাগ অপেক্ষা অধিক জনশালী হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আজিও তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যায়। এই স্থানের নিকটেই আমরা মানতত্ত্বী mantotti এবং কেন্দ্রমালী condromalee এই প্রাচীন সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগরীদ্বয়ের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাই। নক্স বলেন আরিপা নদী-গর্ভে সমুচ্চ স্তম্ভ, ও ভগ্নাট্টালিকার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। †

* তৃণকমলীর বন্দর ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

† Robert Knox, Historical Relation of the Isle of Ceylon ; vol IV. chap 10.

মানতত্ত্বীতে মানবহস্ত-গঠিত বহুসংখ্যক জল-সঞ্চয়-স্থান * আছে, তদ্দেশীয়েরা তাহাকে কাত্তোকারল্ cattocarle বলিয়া থাকে। উহারা পঞ্চাশৎ † বা ততোধিক মন চাউল-উৎপাদনকারী ভূমিতে জল প্রদান করিতে পারে। এইখানেই আবার অণ্টোনাইনিসের সময়ের রোমীয়-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। ‡ ইহা প্রাচীন-সিংহলের বিপুল বাণিজ্যের আর একটী উদাহরণ।

কোন্ প্রাচীন সময়ে সিংহল, বাণিজ্যে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এক্ষণে আমরা সেই প্রশ্নের মীমাংসা করি। হিন্দু-স্থাপত্যের মহচ্চিহ্নস্বরূপ যে সকল দেবালয় দেখিয়া ইংরাজের মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল, তৎসমুদয়ই বৌদ্ধদিগের অভ্যুদয়কালিক। দেবালয় সকল দেখিয়াই তাহা স্পষ্ট প্রতীতি হয়,কেননা প্রায় সকল দেবালয়ের মধ্যেই বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। (১) বিখ্যাত দেবালয় নিচয়, সুবৃহৎ অট্টালিকা প্রভৃতি যে, দেশের ধন বৃদ্ধি বা, বাণিজ্য বৃদ্ধির চিহ্ন, তাহা বলা

* ইহাদের আকারাদি সম্বন্ধে A view of the agricultural, commercial and financial interest of Ceylon, by Aut Bertolacci বা Heeren's Historical Researches vol III P 435 দেখ।

† বিদেশীয়েরা উহাকে Giant's Tank বলিয়া থাকেন।

‡ See Heeren's Historical Researches. P. 436.

(১) John Davy's account of the Interior of Ceylon. P. 232.

বাহুল্য। আর ধর্ম্ম, বাণিজ্যের উপর সামান্য কার্য্য করে না, সকল দেশের ইতিহাসে তাহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম যখন তাহার পতাকা লইয়া ভুবনবিজয় করিয়াছিল, তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পুণ্যনিকেতন সিংহল যে, বাণিজ্যে বিশেষ প্রাধান্য-লাভ করিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাত অশোকের সময়ে; ইহার পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্ত বা তাঁহার পিতা নন্দর সময়ে, ভারতবর্ষ সুতরাং তৎসহচরী লঙ্কাও যে বাণিজ্যে বিলক্ষণ গৌরব ও মহত্ত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহা আমরা মিগাস্থিনিস্ ও আলেকজাণ্ডারের সহচরদ্বয়ের মুখে শুনিতে পাই। ঐ সহচরদ্বয়ের মধ্যে নিয়ার্কস বলেন যে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের অনেক পূর্ব্বে পারস্য-রাজত্ব-কালেও সিংহলের বাণিজ্য বিলক্ষণ প্রবল ছিল। ইহা অপেক্ষা আর প্রাচীন-সময়ে সিংহলের নাম শুনিতে পাওয়া যায় না, সুতরাং এই সময় হইতে উহার বাণিজ্য বিষয় কতদূর জানিতে পারি দেখি; ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন লেখক এতদ্বিষয়ে কি বলেন, তদালোচনায় প্রবৃত্ত হই।

এই মাত্র বলিলাম, নিয়ার্কসের (Nearchus) মুখে শুনিতে পাই যে, আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের অনেক পূর্ব্বে পারস্য-রাজত্বকালেও সিংহলের বাণিজ্য বিলক্ষন প্রবল ছিল। তিনি বলেন যে, ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া যাইবার কালে পারস্য-উপসাগরে প্রবেশ করিয়া তিনি মকেটা (১) (এক্ষণে উহাকে মমেন্দন কহে) নামক স্থানে বহুল পরিমাণে সিংহল-জাত দারু-চিনি ও অন্যান্য ভারতবর্ষীয় দ্রব্য সকল বিক্রীত হইতে দেখিয়াছিলেন। সে সকল দ্রব্য আবার তথা হইতে বাবিলোনিয়ায় বিক্রীত হইবার জন্য প্রেরিত হইত। এই লেখকের মুখে ভারতবর্ষীয় প্রবালেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। পারস্যাধিপত্য সময়ে যে, সিংহলজাত দ্রব্য সকল আরব, বাবিলন ও পারস্য দেশের বিপণী-মণ্ডলীতে সাদরে গৃহীত ও বিক্রীত হইত, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে আলেকজাণ্ডারের সময়। আলেকজাণ্ডারের সময়েও সিংহল কতদূর সুবিখ্যাত ছিল, ষ্ট্রাবো এবং প্লিনি তাহার সাক্ষী। প্লিনি বলেন "তাপ্রোবেন বহুকাল হইতে দ্বিতীয় পৃথিবী বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং আণ্টিক্ থনিস্ (Antich thones) নামে কথিত হইত। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ কালে এই দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়। তাঁহার যুদ্ধ-জাহাজাধ্যক্ষ অনেসিক্রিটস্ বলেন যে, ভারতবর্ষ অপেক্ষা এখানে অধিক পরিমাণে হস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। মিগাস্থিনিস বলেন যে, ইহা একটী নদী দ্বারা বিভক্ত, এবং ইহার অধিবাসীদিগকে পলিয়গনি Paleaogoni কহে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা এখানে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও বড় বড় প্রবাল সমুৎপন্ন হয়। ইরাটস্থিনিসের Eratosthenes মতে

(১) See, foot note, Heeren's Historical Researches vol III P 463.

ইহার দৈর্ঘ্য সপ্তসহস্র ষ্টেডিয়া (১) এবং প্রস্থ পঞ্চ সহস্র, ষ্টেডিয়া। ইহাতে নগর নাই, ইহা কেবল গ্রাম মালায় পূর্ণ; তাহার সংখ্যা সাত শতেরও অধিক, পূর্ব্বে ইহা প্রাসিয়াইদিগের রাজ্য (মগধ) (২) হইতে বিংশ দিবস পোত গমনের পথ বলিয়া বোধ হইত। কিন্তু পরিশেষে দৃষ্ট হইল যে, ইহার অধিবাসীরা যে অল্পায়াস নির্ম্মিত পোতে (নীল নদীতে যেরূপ পোত ব্যবহৃত হইত) সচরাচর গমন করিয়া থাকে, তাহাতে এক সপ্তাহ সময় লাগে। মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রে মাঝে মাঝে স্বল্প গভীরতা দেখিতে পাওয়া যাওয়া যায়; কিন্তু এক এক প্রণালীতে এত গভীরতা আছে যে তথায় নঙ্গর স্থান পায় না। এই জন্য তাহারা অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ সূক্ষ্ম করিয়া এক প্রকার জাহাজ নির্ম্মাণ করিত, যদ্দ্বারা একেবারেই ঐ গভীর প্রণালী দিয়া গতায়াত করিতে পারিত; তাহাদিগের আর অপ্রশস্ত, স্বল্প গভীর প্রণালী দিয়া যাইবার আবশ্যক হইত না। বায়ু-সঞ্চালনের সহিত পোত গমনাগমনের কিরূপ সুবিধা, তদ্দেশবাসীরা তাহা বিলক্ষণরূপে অবগত ছিল।" আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক নিয়ার্কস্ ও অনেসিক্রিটস্ ও তাঁহাদের পরবর্ত্তী মিগাস্থিনিস্, ডায়ামেকস্ প্রভৃতির কথা লইয়াই প্লিনি উহা বলিয়াছেন; স্ট্র্যাবোও তাঁহাদের কথামতে বহুবিধ বাণিজ্য-দ্রব্য, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে আমদানীর জন্য কচ্ছপপৃষ্ঠ ও হস্তিদন্তের উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য-প্রমাণ সহিত বলিয়াছেন যে, এ সময়ে সিংহল এক বহুবিস্তৃত-বাণিজ্য-স্থান ছিল।

ক্রমশঃ প্রঃ—

বঙ্গ-সাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমরা কবিতা বিষয়ক তর্ক-তুফানে ভাসিতে ভাসিতে এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি যে, রমেশচন্দ্র বাবু একেবারে আমাদের চক্ষুর অন্তরালে পড়িয়াছেন। কিন্তু আর না, এখন আমরা কূলে ফিরিলাম, এবং কূলে ফিরিয়া রমেশ বাবুকে সঙ্গে লইয়া আমরা এবার বঙ্গ-সাহিত্য-সমুদ্রে ঝাঁপ দিব; এবং ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হইব। আমরা স্বীকার করি যে, আমাদের মন্থনীয় সমুদ্র অপার বা অতলস্পর্শ নহে।—বৌদ্ধ-সাহিত্যের মতন ইহার প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে হিন্দুধর্ম্ম-রূপ অচল-প্রতিষ্ঠ পর্ব্বতও বিকম্পিত হয় নাই এবং ফরাসি-সাহিত্যের মতন ইহার অপ্রতিহত-মহাপ্লাবনে বিপুল

(১) একষ্টেডিয়ম্ ইংরাজী ৬০৬ ফিট নয় ইঞ্চ।

(২) মিগাস্থিনিস মগধবাসিদিগকে "প্রাসিয়াই" (Prasii) বলিতেন। See Lethbridge's History of India P.48.

রাজ্যদেশও বিপ্লবস্ত হয় নাই—কিন্তু এ সাগর মন্থন করিলে যে, আমরা পরিশ্রমের প্রচুর পুরস্কার লাভ করিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

কতকগুলি সিদ্ধ সত্যের বাহুল্য আলোচনায় এখন আর আবশ্যক নাই। এ কথা সকলেই জানেন যে, সংস্কৃতের অপভ্রংশে প্রাকৃত, প্রাকৃতের অপভ্রংশে বাঙ্গালা ভাষা সৃষ্ট হয়। এই ভাষার প্রথম-অবস্থায় ইহার সাহিত্যে হিন্দী ও ব্রজবুলি, পর অবস্থায় উর্দ্দু—তৎপরে দেশজ-শব্দ ও বাক্য, এবং পরিশেষে সংস্কৃত ও ইংরাজি ধরণ ধারণের প্রাচূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়! কিন্তু যে সময় হইতে পাশ্চাত্য-আলোক আসিয়া বঙ্গদেশে বিকীর্ণ হইল, এবং ভাগীরথীর বক্ষে টেম্‌সের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল, সে সময়ের কথা আমরা এখন কিছুই তুলিব না। কারণ, একালের সাহিত্যের সঙ্গে পুরাকালের সাহিত্যের এত প্রভেদ,—কেবল শরীরগত নহে মর্ম্মগত এত প্রভেদ যে, সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যকে এক মনে সমালোচনা করিতে গেলে আমরা ঘোর প্রমাদে পতিত হইব! সুতরাং আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা বিদ্যাসাগরের অভ্যুদয়ের সময়েই পুরাকালের সাহিত্য-সমালোচনা শেষ করিব। স্বীকার করি যে, এই অভ্যুদয়ের পুর্ব্বেও পাশ্চাত্য-আলোক আসিয়া মহানগরীর স্থানে স্থানে প্রতিফলিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা এত স্বল্প ও সঙ্কীর্ণ ছিল যে, তাহা আমরা সচ্ছন্দে অগ্রাহ্য করিতে পারি।

পুরাকালের সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে ইহার যে একটি বিশেষত্ব লক্ষিত হয়, তাহা অন্য কোন দেশের সাহিত্যে লক্ষিত হয় না। ধর্ম্মানুরাগেই পুরাকালের বঙ্গসাহিত্যের জন্ম, ধর্ম্মানুরাগেই তাহা পরিপুষ্ট এবং ধর্ম্মানুরাগেই তাহা পরিণত হইয়া উঠে। বৈষ্ণবেরা তাহার জন্মদাতা ও প্রতিপালক, এবং শাক্তেরা তাহার চূড়ান্ত উৎকর্ষকারী। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস কৃষ্ণপ্রেমে অনুরক্ত হইয়া যে মধুর বংশীবাদন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আবার জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাসের কণ্ঠে আসিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ক্রমে সেই স্বরলহরী বঙ্গাকাশে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একশতাব্দী গত না হইতে হইতেই সেই কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগ নবদ্বীপে উন্মত্ততায় পরিণত হইল এবং চৈতন্য দেবের শিষ্য ও সহচরেরা সেই উন্মত্ততা সর্ব্বত্র প্রচার করিবার আশয়ে ভূরি ভূরি গ্রন্থ রচনা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা ক্রমে মুমূর্ষু হইয়া পড়িল এবং আপনাদের দলের দুএকটি কবিমাত্র সাহিত্য ক্ষেত্রে রাখিয়া শাক্ত-কবিদের হস্তেই তাহার সমস্ত ভার দিয়া আপনারা নিরস্ত হইলেন। সেই দুএকটি বৈষ্ণব-কবির মধ্যে কাশীরামদাসই সর্ব্বপ্রধান; কীর্ত্তিবাস ও কবিকঙ্কন, এবং তাঁহাদের পরবর্ত্তী রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র প্রভৃতি শাক্ত-কবিরা সে ক্ষেত্রের যে কতদূর উর্ব্বরতা ও শোভা সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা আর বলিতে পারা যায় না।

এই সকল মহাত্মাদিগের কবিতা-গুণে পৌরাণিক ইতিবৃত্তান্তসমূহ বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, ভাষার ওজস্বিতা ও বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারত আবাল-বৃদ্ধবনিতার ধর্ম্মচর্চ্চার সময়ে ধর্ম্মচর্চ্চার এবং বিশ্রামের সময় বিশ্রামের সহযোগিতা করিতে লাগিল। ক্রমে নূতন এক প্রকার কবির সম্প্রদায় উঠিল। তাঁহারা ঐসকল পূর্ব্বতন কবির উপর নির্ভর করিয়া কবিতাময় প্রশ্নোত্তরে চারিদিক আমোদিত করিতে লাগিলেন। কেন যে রমেশ বাবু সেই সকল কবিদের কথা যথোচিত সম্মানের সহিত তাঁহার পুস্তকে উল্লেখ করেন নাই, তাহা বলিতে পারি না। যদি বলেন যে, সে সকল কবিরা তাঁহাদের সঙ্গীতগুলি কোন গ্রন্থাকারে প্রচারিত করেন নাই, সেই জন্য সাহিত্যের ইতিবৃত্তে তাহাদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে না; কিন্তু তাহা হইলে সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিবৃত্তে বেদের কথা বা গ্রীক-সাহিত্যের ইতিবৃত্তে হোমরের কথাও উল্লেখ করা যুক্তিসংগত নহে। যদি বলেন যে, সে সকল সঙ্গীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্গীত মাত্র, তাহা হইলে তিনি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের এত বাহুল্য উল্লেখ করিলেন কেন? যদি বলেন যে, সে সকল সঙ্গীতে প্রকৃত কবিতা কিছুই নাই, তাহা হইলে তাঁহার মত আমরা গ্রহণ করিব না। আমরা যথাস্থানে দেখাইব যে, হরুঠাকুর বা রাম বসুর সেই সেই সঙ্গীতগুলি আতষী কাঁচের ন্যায় প্রকৃত কবিতার জ্বলন্ত রশ্মীসমূহ যেরূপ সংহতভাবে প্রতিফলিত করিয়াছে, এমন আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুরাকালের বঙ্গসাহিত্য পাঠে দেখা যায় যে, বঙ্গ-সাহিত্যের বৈষ্ণব আদি কবিরা আদিরসটিকেই তাঁহাদের কল্পনা-কাননের সকল পুষ্প দিয়াই সাজাইয়াছিলেন। কি বিদ্যাপতি, কি চণ্ডীদাস, কি তাঁহাদের পশ্চাদ্বর্ত্তী জ্ঞানদাস ও গোবিন্দ দাস সকলেই শ্রীকৃষ্ণের যৌবন-লীলা লইয়া সাহিত্য-সমাজে গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এবং আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, তাঁহারা সে বিষয়ে অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের কবিতা সমূহ যে কতদূর মধুর ও মিষ্ট, কত দূর স্বাভাবিক ও স্বভাব সম্পন্ন তাহা সহজে বর্ণনা করা যায় না। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে ইহাও বলা উচিত যে,সে সকল কবিতার গভীরতা নাই, তাহাদের মধ্যে কোনটিতেই একটি মহানভাবের আভাস মাত্রও নাই। সে সকল কবিতা পাঠ করিতে করিতে আমাদের শরীর লোমাঞ্চিত হইতে থাকে, নয়ন মুদিয়া আসিতে থাকে, এবং বসন্তবায়ু-বিকম্পিত সরসীর ন্যায় হৃদয় ঈষৎ বিকম্পিত হয় মাত্র, তাহা পাঠ করিলে হৃদয়ের শেষতল পর্য্যন্ত আলোড়িত হয় না, কিম্বা প্রণয়ের একটিও গভীরতম বিশ্বব্যাপী সত্য আমাদের মনে প্রতিভাত হয় না। তাঁহাদের কবিতা পাঠে এমন বোধ হয় না যে, প্রণয় আমাদের জীবন-

মালিকার মূলসূত্র এবং সংসার-সমুদ্রের ধ্রুব নক্ষত্র ; বরং কেবল এইমাত্র বোধ হয় যে, প্রণয় আমাদের যৌবনকালের একটি উপাদেয় লীলাস্বরূপ। স্বীকার করি যে, এবিষয়ে তাঁহাদের পৌরাণিক আদর্শসমূহও নিতান্ত নির্দোষ নহে, কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, কবির শক্তি ও কল্পনা অনুসারে পৌরাণিক-আদর্শের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হয়! পুরাণে কথিত আছে, যে সময় মহাদেব হিমালয়-শিখরে গভীর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে দেবতাদিগের কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া কন্দর্প তাঁহার প্রতি সম্মোহন-বাণ সন্ধান করেন ; সেই বাণে ব্যথিত হইয়া মহান্ যোগীবর যে কি করিলেন তাহা কালিদাস এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

ঈষৎ চঞ্চল হল তাপসের মন,
সবেমাত্র চন্দ্রোদয়ে সাগর যেমন,
বিম্বাধর উমামুখে তখন মহেশ
একেবারে ত্রিনয়ন করিলা নিবেশ।

*   *   *   *

মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ করি নিবারণ,
দিগন্তের চারিধার, ফিরায়ে নয়ন তাঁর
দেখিতে লাগিলা কোথা বিকৃতি-কারণ।

*   *   *   *

রুদ্র-ক্রোধানলে ভস্ম হইলে মদন,
(বজ্রপাতে দগ্ধ হয় পাদপ যেমন)
পরিহার করিবারে নারী-সন্নিধান,
অনুচর সহ শিব হৈলা অন্তর্ধান॥

কিন্তু ভারতচন্দ্র সেই পৌরাণিক ব্যাপারটি এইরূপে চিত্রিত করিয়াছেন—

মরিল মদন, তবু পঞ্চানন, মোহিত তাহার বাণে।
বিফল হইয়া, নারী তপসিয়া, ফিরেন সকল স্থানে।
কামে মত্ত হর, দেখিয়া অপ্সর, কিন্নরী দেবী সকল।
যায় পলাইয়া, পশ্চাতে তাড়িয়া, ফিরেন শিব চঞ্চল।

আমরা এই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে, কবির শক্তি-অনুসারে পুরাণের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সাধিত হইতে পারে। সুতরাং কৃষ্ণ-প্রেমের ব্যাপারটি যে স্বর্গীয়-বর্ণে রঞ্জিত হইতে পারে না, তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাস তাহা করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের কর্তৃক কৃষ্ণ-প্রেম যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আমরা একবার সমালোচনা করিয়া দেখিব। কৃষ্ণের বা রাধিকার দেবত্ব সম্পর্কে আমাদের এস্থলে কিছুই বক্তব্য নাই; তাঁহাদের প্রেমের আভ্যন্তরিক ভাবের ভিতর আমরা এস্থলে প্রবেশ করিব না।—কেবল বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কবিতার মানুষিক নায়ক নায়িকার ভাবে আমরা কৃষ্ণ রাধিকার প্রণয় সম্পর্কে দুএকটি কথা বলিতে সাহসী হইব। এ কথা বলিতে আমরা কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয় ইন্দ্রিয়গত, অস্থিচর্ম্মগত, এবং পৃথিবী হইতেও পার্থিব। তিনি শত সহস্র বার, "দেহি পদপল্লবমুদারং" বলিলেও তাঁহাকে কখন প্রকৃত প্রণয়ের আদর্শস্থল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিব না। তিনি

দুষ্মন্ত বা পুরূরবা হইতে শত গুণে নিকৃষ্ট- এবং দেবতাপক্ষে কুমারসম্ভবের মহা- দেবের সহিত তাঁহার নাম এক নিশ্বাসে উচ্চারিতও হইতে পারে না। আর রাধি- কার প্রণয়?—আমরা স্বীকার করি যে, ইহাতে কতকটা পার্থিব মাধুর্য্য আছে, কিন্তু ইহাতে সীতার গভীরতা বা অপর্ণা উমার মহান ভাব বা রুক্মিণীর উদারতার আভাস মাত্র নাই। প্রথমেইত দেখিতে পাই যে, রাধিকা সখীগণ সঙ্গে যমুনায় জল আনিতে যান, আর শ্রীকৃষ্ণ পথমধ্যে কদম্ব- তলায় দাঁড়াইয়া মধুর বংশী বাজাইয়া তাঁহাদের মন হরণ করিতে চেষ্টা পান; ক্রমে সমস্ত ব্রজনারীগণ মধ্যে তিনি রাধি- কার রূপে বিশেষ বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং সাত্বিকভাবে জর্জ্জরিত হইয়া এইরূপে মনোবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন—

অলখিতে হামে হেরি বিনোদিনী থোরি,
জনু রজনী ভেল চান্দ উজোরি,
কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল,
মধুকর ডম্বর অম্বর ভেল।
আকুল করি গেও হামারি পরাণ।
কাহার রমণী কে উহা জান॥
লীলা কমলে ভ্রমরা কিয়ে বারি,
চমকি চলনি ধনী চকিত নেহারি॥
তে ভেল বেকত পয়োধর শোভা,
কনক কমল হেরি তাহে মনোলোভা॥
আধ লুকায়লি আধ উদাস।
কুচকুম্ভ কহি গেও আপনক আশ॥
বিদ্যাপতি কহে নব অনুরাগ,
গোপত মদন শর কাহে না লাগ॥

এদিকে শ্রীরাধিকাও ফাঁদে পড়িলেন এবং মনের আবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া সহচরীগণকে বলিলেন—

কি পেখিনু যমুনার তীরে,
কালিয়া বরণ এক মানুষ আকার গো
বিকাইনু তার আঁখি ঠারে।
নিতি নিতি আসি যাই, হেন কভু দেখিনাই
কি খেনে দেখিনু আজ তারে।
গুরুয়া গরবকুল, নাশাইল কুলবতী,
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে।
কামের কামান জিনি, ভুরুর ভঙ্গিমা গো
হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটি আঁখি।
কালিয়া নয়ন-বাণ, মরমে হানিল গো,
কালাময় আমি সব দেখি॥
চিকন কালারূপে, আকুল করিল গো
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চাঁদ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিল গো,
যদু কহে কত সুধা দিয়া॥

ক্রমে বৃন্দা-দূতী আসিয়া প্রণয়ের সহা- য়তা করিলেন, এবং পরিশেষে রাধাকৃষ্ণের সম্মিলন হইল। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাতেই পরিতৃপ্ত হইলেন না, চন্দ্রাবলীও তাঁহার সোহাগের সোহাগিনী হইলেন। এই প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা-স্থলে শ্রীরাধার মানের ত আর অবধি থাকিবারই নহে, আবার সেই মান উপলক্ষ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কখনও বিদেশিনী, কখনও নাপিতানী, কখন তপ- স্বিনী বেশ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীরাধার কুঞ্জে অপরূপ লীলা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাধিকার মান কতদূর মর্ম্মগত, ও শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জন কতদূর গভীর প্রণয়প্রসূত, তাহা

নিম্নে উদ্ধৃত পদাবলী হইতেই বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইবে—

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন
কিলাগি বদন, ঝাঁপসি সুন্দরি
হরল চেতন মোর। * *
মানিনি, আকুল হৃদয় মোর।
মদন বেদন, সহিতে না পারি
শরণ লইনু তোর॥
কিয়ে গিরিবর, কনয়া কটোর
তা দেখি লাগয়ে ধন্দ।
হিয়ার উপরে, শম্ভু পূজিত
বেড়িয়া বালকচন্দ॥
একর-কমলে পরশিতে চাহি
বিহি নহে যদি বামা।
তোহারি চরণে শরণ লইনু
সদয় হইবে রামা॥ ইত্যাদি। বিদ্যাপতি।

রাধিকাও এই বাক্‌চাতুরীতে গলিয়া গেলেন।

এই ছলে কিছুকাল ব্রজধামে প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে রাধিকা বিচ্ছেদ-বেদনায় নিতান্ত ব্যথিত হইয়া এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন—

কালি বলি কালা, গেলা মধুপুরে
সে কালের কত বাকি?
যৌবন সায়রে, সরিতেছে ভাঁটা
তাহারে কেমনে রাখি?
জোয়ারের পানি, নারীর যৌবন,
গেলে না ফিরিবে আর?
জীবন থাকিলে, বঁধুরে পাইব,
যৌবন মিলন ভার। ইত্যাদি চণ্ডীদাস।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং আবার বলিতেছি যে, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার ভিতরের ভাব বা উদ্দেশ্যের কথা আমরা কিছুই বলিতে চাহিনা, শ্রীকৃষ্ণের বা রাধার দেবত্ব বা অদেবত্বের সহিত আমাদের আপাততঃ কোন সম্পর্কই নাই, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কবিদের পদাবলীর নরলোকস্থ মানুষিক-নায়ক-নায়িকাভাবে আমরা তাঁহাদিগকে দেখিতে চেষ্টা করিতেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, ঐ ভাবে দেখিতে গেলে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম যে নিতান্ত নিকৃষ্ট-পদবীগত তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়। শুদ্ধমাত্র রূপ-লাবণ্যই যে প্রণয়ের প্রবর্ত্তক, অশেষ প্রকার লীলাই যে প্রণয়ের জীবন, বসন্ত এবং বর্ষাকালেই যে প্রণয়ের উৎকর্ষ, যৌবনেই যে প্রণয়ের সম্মান, দারুণ বিচ্ছেদের সময়েও—"নিতি নিতি মদন ঝঙ্কারই" যে প্রণয়ের দারুণ-বিচ্ছেদ যাতনা, সে প্রণয়ের গরিমা কীর্ত্তন করিতেও লজ্জা বোধ হয়।

স্বীকার করি, যে, এই প্রণয়ের প্রসঙ্গে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চমৎকার কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং এই প্রণয়ের যতদূর মনোহর চিত্র চিত্রিত করা সম্ভব তাহাও তাঁহারা করিয়াছেন। প্রণয়ের অতৃপ্ত ভাব বিদ্যাপতি কি সুন্দর রচনা-প্রণালীতে বর্ণনা করিয়াছেন—

জনম অবধি হম, রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল, শ্রবণ হি শুননু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল।

কত মধু যামিনী, রভস গোঁয়ায়নু
না বুঝিনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ, হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

চণ্ডীদাস হইতে এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি—

সই, কেবা শুনাইলে শ্যাম নাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদনে ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আরও অনেক কবি আছেন, আগামী বারে সংক্ষেপে তাঁহাদের বিষয় বলা যাইবে। এইমাত্র এখানে আমাদের বলা কর্ত্তব্য যে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বঙ্গভাষার আদি কবি, তাঁহারা এখন হইতে প্রায় ৪০০ বৎসর পুর্ব্বে বঙ্গদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা যে উভয়েই সুকবি তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসের আমরা বিশেষ প্রশংসা করি, কারণ বিদ্যাপতি কৃতবিদ্য ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষা হইতে অনেক রত্ন গ্রহণ করিয়া পদাবলী গ্রথিত করিয়াছিলেন, কিন্তু চণ্ডীদাস আপনার হৃদয় উৎস হইতে যাহা কিছু উৎসারিত হইয়াছে, তাহাই সুমধুর সরল ভাষায় বিন্যাস করিয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতাতে ছন্দঃপতন বা যতিঃপতন প্রায় হয় না, চণ্ডীদাসের তাহা ভূয়োভূয় হইয়াছে, কিন্তু পিঞ্জররুদ্ধ শিক্ষিত পক্ষীর সুমিষ্ট গীত-ধ্বনির সহিত বন-বিহঙ্গদের মধুর কাকলীর যেরূপ প্রভেদ, বিদ্যাপতির সুললিত পদাবলীর সহিত চণ্ডীদাসের মর্ম্ম-উচ্ছ্বসিত সঙ্গীত-উল্লাসের সেইরূপ প্রভেদ।

করুণা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র যখন বাড়ি আসিয়া পৌছিলেন, তখনো অনেক রাত আছে। নেশা অনেক ক্ষণ ছুটিয়া গেছে। মহেন্দ্রের মনে এক্ষণে দারুণ অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে। ঘৃণায়, লজ্জায়, বিরক্তিতে ম্রিয়মান হইয়া শুইয়া পড়িল। একে একে কতকি কথা মনে পড়িতে লাগিল; শৈশবের এক একটি স্মৃতি বজ্রের ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইতে লাগিল। যৌবনের নবোন্মেষের সময় ভবিষ্যৎ-জীবনের কি মধুময় চিত্র তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল, কত মহান্ আশা, কত উদার কল্পনা তাঁহার উদ্দীপ্ত হৃদয়ের শিরায় শিরায় জড়িত বিজড়িত ছিল। যৌবনের সুখস্বপ্নে তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মান মাতৃভূমির ইতিহাসে গৌরবের অক্ষয়-অক্ষরে লিখিত থাকিবে,

তাঁহার জীবন তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতাদের আদর্শ-স্বরূপ হইবে এবং ভবিষ্যৎকাল আদরে তাঁহার যশ বক্ষে পোষণ করিতে থাকিবে। কিন্তু সে হৃদয়ের, সে আশার, সে কল্পনার আজ কি পরিণাম হইল? তাঁহার যশ কলঙ্কিত হইয়াছে, চরিত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়াছে, হৃদয় দারুণ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। কালি হইতে তাঁহাকে দেখিলে গ্রামের কুলবধূগণ সঙ্কোচে সরিয়া যাইবে, বন্ধুরা লজ্জায় নতশির হইবে, শত্রুদের অধর ঘৃণার হাস্যে কুটিল হইবে, বৃদ্ধেরা তাঁহার শৈশবের এই অনপেক্ষিত-পরিণামে দুঃখ করিবে, যুবকেরা অন্তরালে তাঁহার নামে তীব্র উপহাস বিদ্রূপ করিবে, সর্ব্বাপেক্ষা, তিনি যে নিরপরাধিনী বিধবার পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিলেন, তাহার আর মুখ রাখিবার স্থান থাকিবে না। মহেন্দ্র মর্ম্মভেদী কষ্টে শয্যায় পড়িয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। মহেন্দ্রের রোদন দেখিয়া রজনীর কি কষ্ট হইতে লাগিল, রজনীই তাহা জানে; মনে মনে কহিল, "তোমার কি হইয়াছে বল; যদি আমার প্রাণ দিলেও তাহার প্রতিকার হয়, তবে আমি তাহাও দিব।" রজনী আর থাকিতে পারিল না, ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে মহেন্দ্রের কাছে আসিয়া বসিল; কত বার মনে করিল যে, পায়ে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবে যে, কি হইয়াছে, কিন্তু সাহস করিয়া পারিল না, মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। মহেন্দ্র মনের আবেগে তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিয়া গেল; রজনী ভাবিল সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র চলিয়া গেল। আর থাকিতে পারিল না, কাতর স্বরে কহিল, "আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি শোও!" মহেন্দ্র তাহার কিছুই উত্তর না দিয়া অন্য মনেচলিয়া গেল।

ধীরে ধীরে বাতায়নে গিয়া বসিল। তখন মেঘমুক্ত চতুর্থীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্না বিকীর্ণ করিতেছেন। বাতায়নের নিম্নে পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর ধারের পরস্পর-সংলগ্ন অন্ধকার নারিকেল-কুঞ্জের মস্তকে অস্ফুট জ্যোৎস্নার-রজত রেখা পড়িয়াছে। অস্ফুট জ্যোৎস্নায় পুষ্করিণী-তীরের ছায়াময় অন্ধকার গম্ভীরতর দেখাইতেছে। জ্যোৎস্নাময় গ্রাম যতদূর দেখা যাইতেছে, এমন শান্ত, এমন পবিত্র, এমন ঘুমন্ত, যে মনে হয় এখানে পাপ তাপ নাই, দুঃখ যন্ত্রণা নাই; এক স্নেহ হাস্যময় জননীর কোলে যেন কতকগুলি শিশু এক সঙ্গে ঘুমাইয়া রহিয়াছে। মহেন্দ্রের মন ঘোর উদাস হইয়া গিয়াছে। সে ভাবিল, "সকলেই কেমন ঘুমাইতেছে, কাহারও কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, কাল সকালে আবার নিশ্চিন্তভাবে উঠিবে, আপনার আপনার কাজকর্ম্ম করিবে, কেহ এমন কাজ করে নাই, যাহাতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইলে সে মুখ লুকাইয়া বাঁচে, এমন কাজ করে নাই যাহাতে প্রতিমুহূর্ত্তে তীব্রতম অনুতাপে তাহার মর্ম্মেমর্ম্মে শেল বিদ্ধ হয়। আমিও যদি এইরূপ নিশ্চিন্তভাবে ঘুমাইতে পারিতাম, নিশ্চিন্তভাবে জাগিতে পারিতাম! আমার যদি মনের মত বিবাহ

হইত, গৃহস্থের মত বিনাদুঃখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতাম, স্ত্রীকে কত ভাল বাসিতাম, সংসারের কত উপকার করিতাম, কেমন সহজে দিনের পর রাত্রি, রাত্রের পর দিন কাটিয়া যাইত, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া ও সমস্ত দিন ঘুমাইয়া এই বিরক্তি-ময় জীবন বহন করিতে হইত না। আহা—কেমন জ্যোৎস্না, কেমন রাত্রি, কেমন পৃথিবী! আঁধার নারিকেলবৃক্ষগুলি মাথায় একটু একটু জ্যোৎস্না মাকিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া আছে; যেন তাহাদের বুকের ভিতর কি একটি কথা লুকান রহিয়াছে, তাহাদের আঁধার ছায়া আঁধার পুষ্করিণীর জলের মধ্যে নিদ্রিত।" মহেন্দ্র কত ক্ষণ দেখিতে লাগিল, দেখিয়া দেখিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "আমার ভাগ্যে পৃথিবী ভাল করিয়া ভোগ করা হইল না।" মহেন্দ্র সেইরাত্রেই গৃহত্যাগ করিতে মনস্থ করিল, ভাবিল পৃথিবীতে যাহাকে ভাল বাসিয়াছে, সকলকেই ভুলিয়া যাইবে। ভাবিল সে এপর্য্যন্ত পৃথিবীর কোন উপকার করিতে পারে নাই, কিন্তু এখন হইতে পরোপকারের জন্য তাহার স্বাধীন-জীবন উৎসর্গ করিবে। কিন্তু গৃহে রজনীকে একাকিনী ফেলিয়া গেলে সে নিরপরাধিনী যে কষ্ট পাইবে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে? একথা ভাবিলে অনেকক্ষণ ভাবা যাইত, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাবিতে ইচ্ছা হইল না, ভাবিল না।

মহেন্দ্র তাহার নিজ দোষের যত কিছু অপবাদ-যন্ত্রণা, সমুদয় অভাগিনী রজনীকে সহিতে দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইল। বায়ু স্তম্ভিত, গ্রাম-পথ আঁধার করিয়া দুইধারে বৃক্ষ-শ্রেণী স্তব্ধ-গম্ভীর-বিষণ্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। সেই আঁধার-পথ দিয়া, ঝটিকাময়ী নিশীথিনীতে বায়ুতাড়িত ক্ষুদ্র এক খানি মেঘখণ্ডের ন্যায় মহেন্দ্র যেদিকে ইচ্ছা চলিতে লাগিলেন।

রজনী ভাবিল যে, সে কাছে আসাতেই বুঝি মহেন্দ্র অন্যত্র চলিয়া গেল; বাতায়নে বসিয়া জ্যোৎস্না-সুপ্ত পুষ্করিণীর জলের পানে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

করুণা ভাবে এ কি দায় হইল, নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসে না কেন? অধীর হইয়া বাড়ির পুরাতন চাকরানী ভবির কাছে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, নরেন্দ্র কেন আসিতেছেন না। সে হাসিয়া কহিল, সে তাহার কি জানে? করুণা কহিল "না, তুই জানিস্।" ভবি কহিল, 'ওমা, আমি কি করিয়া বলিব?" করুণা কোন কথায় কর্ণপাত করিল না, ভবির বলিতেই হইবে, নরেন্দ্র কেন আসিতেছে না। কিন্তু অনেক পীড়াপীড়িতেও ভবির কাছে বিশেষ কোন উত্তর পাইল না। করুণা অতিশয় বিরক্ত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল ও প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি মঙ্গলবারের মধ্যে নরেন্দ্র না আসেন, তবে তাহার যতগুলি পুতুল আছে সব জলে ফেলিয়া দিবে। ভবি বুঝাইয়া

দিল যে, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিলেই যে, নরেন্দ্রের আসিবার বিশেষ কোন সুবিধা হইবে তাহা নহে, কিন্তু তাহার কথা শুনে কে? না আসিলে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেই ফেলিবে।

বাস্তবিক নরেন্দ্র অনেক দিন দেশে আসে নাই, কিন্তু পাড়ার লোকেরা বাঁচিয়াছে, কারণ আজকাল নরেন্দ্র যখনি দেশে আসে, তখনই গোটা দুই তিন কুকুর এবং তদপেক্ষা বিরক্তিজনক গোটা দুই চার সঙ্গী তাহার সঙ্গে থাকে, তাহারা দুইতিন দিনের মধ্যে পাড়া শুদ্ধ বিব্রত করিয়া তুলে, আমাদের পণ্ডিত মহাশয় এই কুকুর গুলা দখিলে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতেন।

যাহা হউক্, পণ্ডিত মহাশয়ের বিবাহের কথাটা লইয়া পাড়ায় বড় হাসিতামাসা চলিতেছে, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিশ বাইশ ছিলিম তামাকের ধূঁয়ায়,গোটাকতক নস্যের টিপে এবং নবগৃহিণীর অভিমান-কুঞ্চিত ভ্রূমেঘ-নিক্ষিপ্ত দুই একটি বিদ্যুতা লোকের আঘাতে সকল কথা তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেন। নিধিরাম ব্যতীত পণ্ডিত-মহাশয়কে বাটী হইতে কেহ বাহির করিতে পারিত না। পণ্ডিতমহাশয় আজকাল একখানি দর্পণ ক্রয় করিয়াছেন, চসমাটি সোণা দিয়া বাঁধাইয়াছেন, দুরদেশ হইতে সূক্ষ্মশুভ্র উপবীত আনয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী কাত্যায়নী পাড়ার মেয়েদের কাছে গল্প করিয়াছে যে, মিন্সা নাকি আজ কাল মৃদু হাসি হাসিয়া উদরে হাত বুলাইতে বুলাইতে রসিকতা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করেন, কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের নামে পূর্ব্বে কখন এরূপ কথা উঠে নাই। আমরা পণ্ডিত মহাশয়ের রসিকতার যে দুই একটা নিদর্শন পাইয়াছি তাহার মর্ম্মার্থ বুঝা আমাদের সাধ্য নহে; তাহার মধ্যে প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার, প্রমা, অবিদ্যা, রজ্জুতে সর্পভ্রম, পর্ব্বতোবহ্নিমান ধূমাৎ ইত্যাদি নানাবিধ দার্শনিক হাঙ্গামা আছে। পণ্ডিতমহাশয়ের বেদান্তসূত্র ও সাংখ্যের উপর মাকড়্সায় জাল বিস্তার করিয়াছে, আজকাল জয়দেবের গীতগোবিন্দ লইয়া পণ্ডিত মহাশয় ভাবে ভরপূর হইয়া আছেন। এইত গেল পণ্ডিত মহাশয়ের অবস্থা। আর আমাদের কাত্যায়নী ঠাকুরাণীটি দিন কতক আসিয়াই পাড়ার মেয়ে মহল একেবারে সরগরম করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহার মত গল্পগুজব করিতে পাড়ায় আর কাহারো সামর্থ্য নাই,হাত পা নাড়িয়া, চোক্ মুখ ঘুরাইয়া চতুর্দ্দশ ভুবনের সংবাদ দিতেন, একজন তাঁহার নিকট কলিকাতা সহরটা কি প্রকার, তাহারই সংবাদ লইতে গিয়াছিলেন, তিনি তাহাকে বুঝাইয়া দেন যে, সেখানে বড় বড় মাঠ, সায়েবরা চাস করে, রাস্তার দুধার সিপাহি শাস্তিরি গোরার পাহারা, ঘরে ঘরে গরু কাটে ইত্যাদি আরো অনেক সংবাদ দিয়াছিলেন, সকল কথা আবার মনেও নাই। কাত্যায়নীর পতিভক্তি অতিরিক্ত ছিল; এবং এই পতি-ভক্তি সংক্রান্ত নিন্দার কথা তাঁহার কাছে যত শুনিতে পাইবো এমন আর কাহারো কাছে নয়, পাড়ার সকল মেয়ের নাড়ী-নক্ষত্র পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন; তাঁহার আর

একটি স্বভাব ছিল যে, তিনি ঘণ্টায় ঘণ্টায় সকলকে মনে করাইয়া দিতেন যে, মিছা মিছি পরের চর্চ্চা তাঁর কোনমতে ভাল লাগে না, আর বিন্দু, হারার মা ও বোসেদের বাড়ির বড় বৌ যেমন বিশ্বনিন্দুক এমন আর কেহ নয়। কিন্তু তাহাও বলি, কাত্যায়নী ঠাকুরাণীকে দেখিতে মন্দ ছিল না, তবে চলিবার, বলিবার, চাহিবার ভাবগুলি কেমন এক প্রকারের, তা' হউক্ গে, অমন এক এক জনের স্বাভাবিক হইয়া থাকে'।

ভানুসিংহের কবিতা।

বাজাও রে মোহন বাঁশী!
সারা দিবসক, বিরহ দহন-দুখ,
মরমক তিয়াষ (১) নাশি।
রিঝ (২) মন-ভেদন, বাঁশরি-বাদন
কঁহা শিখলিরে কান?
হানে থির থির, মরম অবশকর
লহু লহু (৩) মধুময় বাণ!
ধস ধস করতহ, উরহ (৪) বিয়াকুল
ঢল ঢল অবশ-নয়ান।
কত কত বরষক, বাত সোঁয়ারয় (৫)
অধীর করয় পরাণ॥
কত শত আশা, পূরল না বঁধু
কত সুখ করল পয়ান।
(৬) পহুগো কত শত, পিরীত-যাতন
হিয়ে বিঁধাওল বাণ।
হৃদয় উদাসয়, নয়ন উছাসয়
দারুণ মধুময় গান।
সাধ যায় বঁধু, যমুনা বারিম
ডারিব দগধ-পরাণ॥
সাধ যায় পহু, রাখি চরণ তব
হৃদয় মাঝ হৃদয়েশ!
হৃদয় জুড়াওন, বদন-চন্দ্র তব
হেরব জীবন শেষ॥
সাধ যায় বঁধু, তোঁহার দেহ
মিলাওব দেহ ম মোর।
হরখে নিতি নিতি, চরণ পখালব (৭)
ডারয় লোচন-লোর (৮)॥
সাধ যায় বঁধু! দুঁহু দুঁহু মেলই
ইঁহসে (৯) করই পয়ান,
মেঘ মেঘ পর, হরখে ভরমিব,
দুঁহু মিলি করইব গান॥
সাধ যায় ইহ, চাঁদম কিরণে,
বসন্ত বায়ু সুশীতে,
কুসুম পরিমলে, প্রাণ মিশায়ব,
বাঁশিক সুমধুর গীতে॥
প্রাণ ভৈবে (১০) মঝু (১১) বেণু-গীতময়
রাধাময় তব বেণু।
জয় জয় মাধব, জয় জয় রাধা
চরণে প্রণমে ভানু॥

(১) তৃষা
(২) হৃদয়
(৩) লঘু
(৪) বক্ষ
(৫) স্মরণ করাইয়া দেয়
(৬) প্রভু
(৭) প্রক্ষালিত করিব
(৮) জল
(৯) এখান হইতে
(১০) হইবে (১১) আমার

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ।



ইংরাজদের আচার ব্যবহারে ভাল মন্দ মিশ্রিত আছে। তাহা কতক আমাদের জাতীয় ভাবের ও দেশের উপযোগী, কতক অনুপযোগী। এস্থলে বক্তব্য এই যে, ভালর সঙ্গে সঙ্গে যেন আমরা মন্দটী গ্রহণ না করি। যদি অনুকরণ করাই আবশ্যক হয় তবে দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনা খাটাইয়া যেন অনুকরণ করি। এমন মনে করিও না যে, ইংরাজী রীতি নীতি অবলম্বন করিলে ইংরাজ-সমাজে সমাদৃত হইবে। বরং তাহাতে তোমার একুল ওকুল দুকুল যাই-বারই সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে পড়িল। আমার বিলাত-ফেরতা এক মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু দেশীয়-বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার এক ইংরাজ নাচ-মজলিসে নিমন্ত্রণ হয়। তিনি কি কাপড় পরিয়া যাইবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না। পরে এই সকল মজলিসে ইংরাজেরা যে লাঙ্গুল-বিশিষ্ট কোট ব্যবহার করে, তাহার অনুরূপ কোট পরিয়া যাওয়াই ধার্য্য হইল। একজন দরজিকে ডাকাইয়া কোট ফতুই প্রভৃতি তাঁহার মনের মত পোষাক প্রস্তুত করিয়া সং সাজিয়া গিয়া উপস্থিত। আমি তাঁহাকে ইংরাজদের পরিহিত পরিচ্ছদের সঙ্গে তাঁহার কাপড়ের তুলনা করিয়া দেখাইয়া দিলাম যে, তাহার সঙ্গে ইহার অনেক অমিল—ইহা দেখিয়া তিনি কিছু অপ্রতিভ হইলেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহার নিজের মহারাষ্ট্র-বেশে তাঁহাকে শতগুণ মানাইত ও এরূপ মনঃক্ষুণ্ণ হইতে হইত না। বিদেশীয় রীতির অনু করণ করিতে গিয়া আমাদের অনেক স্থলে এই বিপদে পড়িতে হয়। ভারতকুলবালা যদি গৌন ও পেটিকোট ব্যবহার করেন, তবে তাঁহাদের পদে পদে অপদস্থ হইতে হয় সন্দেহ নাই। বিবির সাজ সাজিতে হইলে কাল-সহকারে যে ফ্যাসানের পরি-বর্ত্তন হয়, তাহার উপর বিশেষ লক্ষ্য না রাখিলে সভ্য-সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে, এটী যেন তাঁহাদের মনে থাকে।

প্যারিসে কখন্ কোন্ নূতন 'ফ্যাসনের' সৃষ্টি হইল—কোন্ পুরাতন 'ফ্যাসন' উঠিয়া গেল—আজিকার ধরণ 'ক্রিনলীন' কি মার্জ্জনী গৌণ, হে বিবিয়ানা-পরায়ণা ভারত-কুল-ললনা, এসকল নিগূঢ় তত্ত্বের প্রতি উদাসীন থাকিও না। ফ্যাসনের ব্যাকরণ যেন তোমার কণ্ঠস্থ থাকে—ফ্যাসনের স্রোতের সঙ্গে তোমায় সাঁতার দিতে হইবে—নতুবা বিলাত-সমাজে উপহাসাস্পদ হই-বার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু সৎপরামর্শ গ্রহণ কর ত ও পথে যাইও না।

ইংরাজ ও দেশীয়দের মধ্যে যে বিচ্ছিন্ন ভাব, তাহা প্রকৃতিতে এরূপ বদ্ধমূল যে, বোধ হয় না তাহা কোন কালে অপনীত হইবে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে

গেলে অনেক গুলি কারণ উপলব্ধি হয়।

প্রথমতঃ ইংরাজদের সহিত আমাদের জেতৃজিত সম্বন্ধ। তাঁহারা রাজার জাতি—আমরা পরাজিত প্রজার জাতি। শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণ বর্ণের মধ্যে যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব, তাহা পৃথিবীর সকল স্থানেই দৃষ্ট হয়। যুদ্ধেই হউক—বসতির জন্যই হউক—বাণিজ্য ব্যবসার উদ্দেশেই হউক—যে কোন কারণে এই দুই জাতি একত্রিত হয়—শ্বেতাঙ্গ পুরুষ আপনার শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতে ক্রটি করেন না। তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ ভ্রাতার সহিত আপনার সামাজিক সম্মিলনের পথ আটে ঘাটে বন্ধ করিয়া রাখেন। বৈদিক কালে আর্য্য ও দস্যুদের মধ্যে এই কারণেই বিশেষ বিদ্বেষ লক্ষিত হয়। এই বর্ণ-ভেদের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজ ও ভারতবাসীদিগের মধ্যে ভাষা, ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা। এই জাতিগত বৈষম্য হইতে বিদ্বেষ ভাব উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। এ ভাব যে কোন কালে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইবে তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ ইংরাজেরা এদেশে চারি দিনের যাত্রী; কতক দিন বাস করিয়া টাকা করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। ইউরোপ ও এদেশের মধ্যে যাতায়াতের এক্ষণে যেরূপ সুবিধা হইয়াছে তাহাতে ভারতবর্ষের উপর ইংরাজদের টান থাকিবার অল্পই সম্ভাবনা। পূর্ব্বে এক এক জন ইংরাজের দেশীয়দের উপর সময়ে সময়ে বিলক্ষণ মমতা দেখা যাইত—তাহার কারণ এই, তাঁহারা ভারতবর্ষে অধিক কাল বাস করিয়া এদেশকে স্বদেশতুল্য জ্ঞান করিতেন কিন্তু এক্ষণে আর সে ভাব নাই। ইংরাজেরা এখানে প্রবাসীর মত থাকিয়া চলিয়া যান। দেশ-ভ্রমণে দুই চারি দিনের জন্য যাহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় তাহার সহিত বিশেষ সখ্যতা সচরাচর ঘটে না। "নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে, প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।" বিশেষতঃ ইংরাজদের যেরূপ স্বভাব তাহাতে তাঁহারা বিদেশীয়দের প্রিয়পাত্র কখনই হইতে পারেন না। ইংরাজেরা যখন বিদেশে ভ্রমণ করেন তখন তাঁহাদের 'জন্‌বুল্' ভাব সকলেরই অপ্রীতিকর হইয়া উঠে। স্বকীয় রীতি-নীতি হইতে যাহা ভিন্ন তাহা ইংরাজের চক্ষে নিতান্ত ঘৃণাস্পদ। তাঁহার সেই 'রোষ্টবীফ' ও বিয়র মদ্য ভিন্ন পারিসের উৎকৃষ্ট হোটেলেও তৃপ্তি হয় না। ইংরাজেরা পৃথিবী জুড়িয়া আপনাদের রাজত্ব বিস্তার করিতেছেন কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ দ্বীপোচিত ক্ষুদ্রভাব পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন জাতির সঙ্গে মিশিতে পারেন না, তাঁহাদের স্বভাবই এরূপ নয়। ইংরাজ ও ইউরোপীয় অন্যান্য জাতির মধ্যে যখন এমন অমিল তখন এদেশীয়দের ত কথাই নাই। ইউরোপে ভাষা রীতি নীতি আচার ব্যবহারে অনেক সাদৃশ্য আছে, কিন্তু এখানে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আগা গোড়া সকল বিষয়েই অমিল। আমাদের বর্ণ রীতি নীতি সকলই ভিন্ন। এমন সাধারণ ঐক্য-স্থল

নাই যাহার উপর পরস্পরের প্রীতি সৌহার্দ্দ্য স্থাপিত হইতে পারে। যে যাহাকে দেখিতে পারে না, তাহার চলন বাঁকা, ইংরাজ ও দেশীয়-মধ্যে এই রূপ সম্বন্ধ। ইংরাজ এদেশকে কখনই আপনার বলিয়া মনে করিতে পারেন না। ইহার জল বায়ু তাঁহার সহ্য হয় না, ইচ্ছা করিলেও এদেশে অধিক কাল বাস করিতে অক্ষম। পিতা-মাতা, পুত্র কন্যাকে অল্প বয়সেই আপনাদের ভারত-গৃহ হইতে বিযুক্ত করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করিতে বাধ্য হন। মাতা ভারত হইতে ইংলণ্ডে, ইংলণ্ড হইতে ভারতে যাতায়াত করিয়া জীবন যাপন করেন। স্বামীকেও নিতান্ত একলাটী রাখিতে পারেন না—সন্তানগণেরও মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধান আবশ্যক। পিতাও হয়ত অনতিকাল বিলম্বে 'লিবর' রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রী পুত্র পরিবারের সহিত গিয়া মিলিত হন। এদেশে তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে আসেন, অর্থ সঞ্চয় করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। এ দেশ কর্ম্ম-ক্ষেত্র, স্বদেশ ভোগালয়—এ দেশে আয়, সে দেশে ব্যয়—শরীর এখানে, মন ওখানে—সুতরাং দেশীয় ও ইংরাজ মধ্যে প্রণয়-বন্ধন কি রূপে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে?

আমি বলিয়াছি ইংরাজেরা যেখানেই যাক, তাহাদের জাতীয় ক্ষুদ্র ভাব পরিত্যাগ করিতে পারে না। এ দেশে তাহাদের আচার ব্যবহারে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যৎকালে নিদাঘ-তাপের আতিশয্যে সমস্ত প্রাণী আকুল, মনুষ্যেরা ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তখন ইংরাজেরা তাহাদের বনাতের কোট প্যাণ্ট্‌লুন পরিধান করিয়া গ্রীষ্মের কষ্ট দ্বিগুণিত করে। প্রখর রৌদ্রের সময় তাহারা মহা সাজ সজ্জা করিয়া পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে বাহির হয়। এ দেশে সকল ঋতুতে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে বিশুদ্ধ সুশীতল বায়ু সেবনের সময় প্রাতঃকাল ৫টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত; কিন্তু রাত্রের খানা-পিনা নৃত্য-গীত আমোদ-প্রমোদে রাত্রি জাগরণ করিয়া উষার সঙ্গে সঙ্গে গাত্রোত্থান করা কিরূপে সম্ভবে? আবার এ দেশে প্রচুর আমিষ ভক্ষণ, সুরাপান শরীরের উপযোগী নহে, ইহা সকলেই স্বীকার করিবে। ভারতবাসীদের অনেকেই নিরামিষাশী, উদ্ভিদ্-ভোজী, কোন কোন জাতির তণ্ডুলমাত্র জীবনের একমাত্র অবলম্বন; এই রূপ মিতাহার এ দেশে স্বাস্থ্য রক্ষার প্রধান উপায়; কিন্তু ইংরাজদের আহারের রীতি দেখিলে বোধ হয় না যে, তাঁহারা উষ্ণ দেশে বাস করিতেছেন। প্রাতঃকালে ৬টা ৭টার সময় চা, রুটি, মাখম, ডিমসিদ্ধ প্রভৃতি 'ছোটা হাজরি'—৯টা ১০টার সময় মদ্য মাংস সমেত 'বড়া হাজরি'—২টার সময় ঠাণ্ডা গরম মাংস মিষ্টান্ন ফলারের টিফিন— ৪টা ৫টার সময় চা বিস্কিট ইত্যাদি—৭।৮টার সময় মদ্য মাংসের ভূরি ভোজন, সময় বিশেষে মধ্যরাত্রির সপর—এই ত তাহাদের পানাহারের নিয়ম, পানীয় মধ্যে ব্রাণ্ডি আর সোডা সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহার অর্থ জনৈক ফরাসি পরিব্রাজক Count Goblet D'Almeida

এই রূপ করেন যে, আরম্ভে অল্প ব্রাণ্ডি অধিক সোডা ও শেষে অধিক ব্রাণ্ডি অল্প সোডা। ইহার আর এক নাম 'Peg' খুঁটি অর্থাৎ জীবনের অবলম্বন। এই রূপ অপর্য্যাপ্ত আহার-পানে যে তাহাদের স্বাভাবিক বলিষ্ঠ সুস্থ শরীর 'লীবর' ও অন্যান্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্বদেশে যাইতে বাধ্য করে, তাহাতে বিচিত্র কি? কেমন করিয়া এত দিন টিকিয়া থাকে এই আশ্চর্য্য?

তৃতীয়তঃ জাতিতে জাতিতে সখ্য-বন্ধন হইবার পূর্ব্বে আচার ব্যবহারের কতকটা মিল চাই, কিন্তু তাহার কিছুই নাই। তাহারাও যেমন আমাদিগকে দূরে রাখিতে চায়, আমরাও তেমনি তাহাদের হইতে দূরে থাকিতে চাই, তাহারা আমাদিগকে পরাজিত জাতি বলিয়া অবজ্ঞা করে, আমরাও তাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া ঘৃণা করি। অতএব আমাদের পরস্পর সদ্ভাবের সঞ্চার কোথা হইতে হইবে।

চতুর্থতঃ ইংরাজের স্বভাবই কতকটা সামাজিকতার বিরোধী। শুদ্ধ আমাদের সম্বন্ধে কেন—তাহাদের আপনাদের মধ্যেও পরস্পরের ব্যবহারে এই পার্থক্য-প্রকাশ পায়। ইংরাজেরা আমাদের জাতিভেদ-প্রথা অনিষ্টকর বলিয়া বর্ণন করে, কিন্তু ইংরাজ-সমাজে বিশেষতঃ ভারতবর্ষীয় ইংরাজ-সমাজে যে জাতিভেদ বিলক্ষণ প্রবল, পদে পদে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তবে তাহাদের জাতিভেদ ধন ও পদ মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের জাতিভেদ বংশ-মর্য্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত। একজন নীচ বংশোদ্ভব কমিসনর হয়ত আপনা হইতে উচ্চকুল-জাত সহকারী কমিসনরের সহিত একত্রে ভোজন করিতে সম্মত হইবেন না। চিহ্নিত পদস্থ কর্ম্মচারী ও অচিহ্নিত পদস্থ কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে যে সামাজিক স্বতন্ত্রতা তাহা ত জানাই আছে। অচিহ্নিত পদের লোকেরা রূপে গুণে কুলে শীলে যেমনই হউন না কেন, তাঁহাদের হেয় জ্ঞান করা চিহ্নিত পদারূঢ় কর্ম্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কলেক্টর সহকারী কলেক্টরের সহিত সমকক্ষ হইয়া চলিবেন, কেন না তাঁহারা উভয়েই চিহ্নিত দলের লোক, কিন্তু অচিহ্নিত ডেপুটির সহিত তাঁহার স্বতন্ত্র ব্যবহার।

ইংরাজ ও আমাদের মধ্যে সহজ ভাবে দেখা সাক্ষাৎ আলাপ পরিচয় হইবার আর এক প্রতিবন্ধক এই যে, তাঁহাদের হাতে কর্ম্মচারী নিয়োগের সমস্ত ভার অর্পিত। আমাদের মধ্যে অনেকে কেবল কর্ম্ম-প্রার্থী হইয়া ইংরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। আমাদের সম্বন্ধে তাঁহারা এই দাতা ও প্রার্থীর ভাব ভুলিতে পারেন না। দেশীয় কোন ভদ্র লোক যে নিঃস্বার্থ ভাবে আলাপ করিবার মানসে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, ইহা সহজে তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহার সাক্ষাৎকারে কোন না কোন স্বার্থ-লাভ অভিসন্ধি থাকিবে, ইহা তাঁহারা আগে থাকিতে স্থির করিয়া লন। সুতরাং তাঁহারা আমাদের সকলেরই নিকট হইতে 'সেলাম' প্রত্যাশা করেন, স্বাধীন ভাবে তাঁহাদের সহিত দেখা ক-

রিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র, কেন না তাহার কোন প্রতিদান নাই।

তুমি একজন সাহেবের বাটীতে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ কর, তিনি কি কখন তোমার বাটীতে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন? এরূপ প্রত্যাশা বৃথা। ঘরাও রকমে সাহেবদের সহিত আলাপ পরিচয় হয়, ইহা যদিও অনেক কারণে প্রার্থনীয়, কিন্তু সম্ভবপর নহে। আমরা গৃহে কিরূপে বাস করি, আমাদের আন্তরিক ভাব কি, আমাদের গার্হস্থ্য প্রণালী রীতি নীতি কিরূপ, সমস্ত জীবন ভারতবর্ষে কাটাইয়া কোন ইংরাজ তাহা জানিতে পারেন কি না সন্দেহ। যখনি তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হয়, তখনি আমরা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া মনের শোক দুঃখ সম্বরণ করিয়া সহাস্যবদনে তাঁহাদিগকে দর্শন দিই। আমাদের প্রকৃত অবস্থা তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত, আমাদের গৃহদ্বার তাঁহাদের প্রতি রুদ্ধ। আমরা ভিক্ষুক হইয়া তাঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হই, তাঁহারা দাতা হইয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-উপহার প্রত্যাশা করেন।

যুবরাজ যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন তিনি ইংরাজ ও এতদ্দেশীয়দিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব দর্শন করিয়া বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এভাব যে কিসে বিদূরিত হইবে, তাহার উপায় আবিষ্কার করা সহজ নহে। দুই পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। দুই পক্ষের লোকেরা কিছু কিছু ত্যাগ স্বীকার না করিলে সদ্ভাব সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ইংরাজেরা রাজার জাতি, তাঁহারা অল্প প্রয়াসেই আমাদের সদ্ভাব আকর্ষণ করিতে পারেন। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে, কোটি কোটি প্রজা-পুঞ্জের সহিত এই ভারতবর্ষ জয় করিয়া সেই সকল প্রজাকে সুখী করা ও তাহাদের প্রীতি আকর্ষণ করা তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। প্রজা-রঞ্জন রাজার প্রধান ধর্ম্ম। তাঁহারা যদি একপদ অগ্রসর হইয়া আসেন আমরা সহস্র পদ অগ্রসর হইয়া তাঁহাদের নিকট যাইতে প্রস্তুত। আমাদের যদি কোন বিষয়ে দোষ থাকে ত তাঁহারা ক্ষমাদৃষ্টিতে দেখুন, কেন না "শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা।" তাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধিতে আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উচিত যে, আমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যান। যদি কখন এমন সময় আসে যে, তাঁহাদিগকে এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে হয়, তখন তাঁহারা গৌরবের সহিত বলিতে পারিবেন যে, আমরা তোমাদিগকে শিক্ষিত ও স্বাধীন করিয়া দিয়াছি, এখন তোমরা আপনাদিগকে আপনারা রক্ষা কর। তখন তাঁহারা কোটি কোটি লোকের আশীর্ব্বাদের পাত্র হইবেন। এমন সময় উপস্থিত হইলে আমরা সদ্ভাবের সহিত পরস্পর বিযুক্ত হইব ও তাঁহাদের রাজত্ব-কালে যে বহুবিধ উপকার লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট চিরকাল ঋণজালে বদ্ধ থাকিব। ভারতের সহিত ইংলণ্ডের যোগ ঈশ্বর মঙ্গলেরই জন্য বিধান করিয়াছেন, কিন্তু ইহা হইতে যত শুভ ফল

প্রসূত হইতে পারে, তাহার জন্য উভয় জাতিরই যত্ন ও চেষ্টার আবশ্যক। ইংরাজেরা আমাদিগকে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে পারে। তাহারাও আমাদের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। বিশেষতঃ ইংরাজমহিলা আমাদের স্ত্রীগণ হইতে অনেক বিষয়ে শিক্ষা পাইতে পারেন। কিন্তু এ দেশীয় ইংরাজ মহিলারা কোন বিষয়ে আমাদিগের স্ত্রীগণের আদর্শ হইতে পারেন না। এ দেশে ইংরাজদের গার্হস্থ্য বিধানের আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। যদি এ দেশীয়দিগের সহিত তাঁহাদের মমতা থাকিত, তাহা হইলে তাঁহাদের সময় কাটাইবার জন্য বৃথা আমোদ অন্বেষণ করিতে হইত না, কিন্তু এক্ষণে কি দেখা যায়? ইংরাজ রমণীগণ কিরূপে সময়ক্ষেপ করেন? স্বামী সমস্ত দিবস কাজ কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া সুখালাপে বঞ্চিত ও শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যার সময় গৃহে প্রত্যাগমন করেন। স্ত্রী একাকিনী সময়ের ভার বহন করিতে থাকেন। সমস্ত দিনের মধ্যে ঘরের বাহির হইবার উপায় নাই। সন্তানগণ ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হয়, তিনি তাঁহার সন্তান হইতেও বিযুক্ত। বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস হয়ত তিনি স্বামী হইতে দূরে কোন পর্ব্বত প্রদেশে বাস করেন, স্বামী সত্ত্বেও তাঁহাদের বৈধব্য-যন্ত্রণা * ভোগ করিতে হয়। কোন বিশেষ জন-হিতকর কার্য্য হস্তে নাই যে, তাহাতে মনোনিবেশ করিয়া সুখী হইবেন। স্বামীর অগাধ ধন-কোষ তাঁহার হস্তে রহিয়াছে, এমন কোন ভোগের সামগ্রী নাই যাহা তাঁহার দুষ্প্রাপ্য, ইচ্ছামত আপনার সমুদয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারেন, অথচ তিনি সুখী নহেন। যে গরীব প্রজাপুঞ্জ দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত, তাহাদের অস্তিত্বের প্রতিও তিনি সন্দিহান। এই অবস্থায় তিনি যে আমাদের মহিলাগণের আদর্শ ও উপমাস্থল হইবেন এরূপ আশা করা বৃথা।

ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয়দের সম্বন্ধে পূর্ব্বোল্লিখিত ফরাসিস্ পরিব্রাজক আপনার সদ্যপ্রণীত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত L'Inde et Himalaya গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করি।

"আমার ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালে অনেক ইংরাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, কি দেখিয়া তোমার সকল অপেক্ষা আশ্চর্য্য বোধ হইল? আমি ইহার উত্তরে বলিতে পারিতাম, এ দেশে তোমাদের দেখিয়া, বিশেষতঃ তোমরা এখানে এত দিন তিষ্ঠিয়া রহিয়াছ তাহা দেখিয়া। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এ কথা সামান্য প্রশংসার কথা নয়, কেন না ৬০,০০০ রের অনধিক ইউরোপীয় সৈন্য দ্বারা বশীভূত ২৫ কোটি হিন্দুর উপর যে দুর্দ্ধর্ষ অটল রাজত্ব স্থাপন, ইহাতে শুদ্ধ প্রজাগণের অসাধারণ সহিষ্ণুতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, কিন্তু ইহা হইতে ইংরাজদিগের প্রভাবশালী অথচ বিচক্ষণ শাসনপ্রণালী উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে এই রূপ জয়লাভের উপযোগী যে সকল গুণ,

* এই রূপ বিধবাকে ইংরাজিতে grass widow কহে।

এমন কি যে সকল দোষ থাকা আবশ্যক তাহা তাহাদের আছে। মূলনীতি রক্ষা করিতে গিয়া আসল-কাজ-ভুলিয়া-না-যাওয়া কার্য্যদক্ষতা; একাধিপত্যও থাকিবে অথচ তাহা যথেচ্ছাচারে পরিণত হইতে পারিবে না, এরূপ রাজনীতি-কুশলতা; শাসন সম্বন্ধে কঠোর ন্যায় রক্ষা ও সত্যপালন; বিজাতীয় ধর্ম্মের প্রতি চিরাভ্যস্ত সমদর্শিতা; দ্রুতগতি না হউক স্থায়ী উন্নতির নিদানভূত আমূল সংস্কারের বশবর্ত্তিতা; প্রজাগণের কল্যাণ-সাধনে মনের সহিত যত্ন করেন এতটুকু ধর্ম্মজ্ঞান; প্রজাগণের অজস্র তোষামোদ ও আভ্যন্তরিক অসন্তোষ এ উভয়কেই উপেক্ষা করিতে পারেন এতটুকু অহঙ্কার; এই সকল গুণে ভারতবর্ষের উপর অটল রাজ্য স্থাপন বিদেশীয় রাজার যতদূর সাধ্যায়ত্ত, ইংরাজেরা তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। ভারতবর্ষের জল বায়ু ইউরোপীয় প্রকৃতির অনুপযুক্ত বলিয়া এ দেশ তাঁহাদের স্থায়ী বসতির উপযুক্ত স্থান নহে; সুতরাং তাঁহাদিগকে স্বদেশ হইতে নিত্য নূতন নূতন লোক আনাইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়, ইহাতে রাজা প্রজার পার্থক্যভাব দূরীভূত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সকল জাতি ভারতের উপর আধিপত্য স্থাপনান্তর দুর্গতিগ্রস্ত হইয়াছে তদনুরূপ দুর্গতি হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইহা এক প্রধান কারন বলিতে হইবে। এই কারণে রক্ষণশীলতা ও শাসনানুরাগরূপ স্বর্গীয় অগ্নি ইংরাজদের হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্বলিত দেখা যায়।"

"যে প্রভু তাঁহার আজ্ঞাধীন ভৃত্যকে তাহার নিজের ইচ্ছা-বিরুদ্ধে সুখী করিতে চাহেন, সে প্রভু কখন ভৃত্যের প্রিয় পাত্র হইতে পারেন না। যে জাতি চিরন্তন প্রথানুসারে সহজ ও অকৃত্রিম শাসনের অভ্যাসাধীন, তাহাদের মধ্যে কঠোর ও কৃত্রিম শাসন-প্রণালী প্রচলিত করিতে যে সঙ্ঘর্ষণ উপস্থিত হয়, তাহা ত ইংরাজদিগের জনসাধারণের নিকট অপ্রীতিভাজন হইবার এক কারণ, কিন্তু তাহা ছাড়িয়া দিলেও দেখিতে পাইবে যে, ইংরাজদের এমন কিছুই গুণ নাই যাহাতে তাহারা পরাজিত জাতির শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়। তাহারা তাহাদের উচ্চতর সভ্যতার গুণে ভারতের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তৎপর বটে, কিন্তু তজ্জনিত অহঙ্কার প্রকাশেও তাহারা নিরস্ত নহে। ইংরাজেরা ন্যায়ী কিন্তু ভদ্র নহে, ইহা সকলেরই মুখে শুনা যায়। কলিকাতা, বোম্বাই সিংহল যেখানেই হউক, যখনি শিক্ষিত ও স্বাধীনতা-প্রিয় দেশীয় ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়াছি, আর তাহারা আমাকে বিদেশী জানিয়া অসঙ্কোচে আমার নিকট তাহাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছে, তখনি ঐরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়াছি। উচ্চপদস্থ দেশীয়দের সহিত ইংরাজেরা যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা আমাদের দেশে একজন সামান্য ভৃত্য কি গাড়োয়ানও সহ্য করিয়া থাকিতে পারে না। কাজ কর্ম্মের সম্বন্ধে ইংরাজেরা দেশীয়দের সহিত সাধু ও ভদ্র ব্যবহারে সচরাচর ত্রুটি করে না বটে, কিন্তু ভারতবর্ষবাসীদিগের সহিত ঘরাও

ভাবে মিলিতে তাহারা কোন ক্রমেই সম্মত নহে। তাহারা আপনাদের সমাজ-দুর্গ দেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে প্রাণপণে রক্ষা করে ও সাধ্যমতে দেশীয়দের সংস্রব হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে—এমন কি বাষ্প শকটে ভ্রমণ-কালীন ইউরোপীয় ও দেশীয়দের এক গাড়ীতে একত্রে উপবেশন, ইহাও দুর্লভ-দর্শন। বোধ হয় যেন ইংরাজেরা দেশীয় সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত করিয়া আপনাদের এক নূতন সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছেন। সে সম্প্রদায় পূর্ব্বতন প্রথানুযায়ী ধর্ম্ম-সংস্কারের উপর স্থাপিত নহে, কিন্তু বিভেদ ও জাত্যভিমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজয়ী ও পরাজিত জাতির ভদ্র কুলের মধ্যে আদান প্রদানের পথ একেবারে অবরুদ্ধ—এরূপ উদাহরণ ইতিহাসে আর কোথাও পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। মিশ্র ফিরিঙ্গিজাতি, ইউরোপীয় ও দেশীয় রক্তের সম্মিশ্রণে যাহাদের উৎপত্তি, তাহারা কোথায় এই উভয় জাতির সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া তাহাদের একতা সম্পাদন করিবে, না উভয় জাতিরই সমাজ হইতে তাহারা বহিষ্কৃত। যে দিকে নেত্রপাত করি, এ দুই জাতির মধ্যে মমতা বা সামাজিক ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় একতা দৃষ্টি-গোচর হয় না। লক্ষের অনধিক ইউরোপীয় কর্তৃক পরিরক্ষিত এই দুই শত পঞ্চাশ কোটি আসিয়াবাসী যখন আপনাদের বল ও অধিকার বিষয়ে চেতনা লাভ করিবে, তখন যে কিরূপে ইংরাজ-রাজ্য রক্ষিত হইবে বলা যায় না। একমাত্র ভরসা এই যে ইংরাজেরা যে গুরুতর শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন ও যাহা তাঁহাদেরই দ্বারা সুসম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা যেন তাহার পরিপক্কতা সাধন করিবার সময় পান; তাঁহাদের রাজ্য যেন অকালে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়।„

শ্রীস——

বঙ্গে সমাজ-বিপ্লব।



বিশৃঙ্খলা অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারে না। প্রাকৃতিক ঘটনায় এক একটা যে বিপ্লব-বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সকল প্রকৃতির কার্য্য-শৃঙ্খলারই একটি অঙ্গ। বিপ্লব-বিশৃঙ্খলার অর্থই এই যে, এখন যে অবস্থা আছে ইহা এখনকার সময়ের উপযোগী নহে, ইহা পরিবর্ত্তিত না হইলে সমূহ অনিষ্ট হইবে। বর্ত্তমানে যখনই বিপ্লব দেখিব, তখনই জানিব যে, ভূতকালের যে ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া আছি, তাহা জীর্ণ বা অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে পুনঃসংস্কার হইবে। যেখানকার বায়ু লঘু হইয়া যাইবে,

সেইখানেই চারিদিক হইতে বায়ুর স্রোত আসিয়া একটি ঝটিকা বাধিবে বটে, কিন্তু তাহার ফল এই হইবে যে, বায়ু পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। মনুষ্যের সামাজিক-রাজ্যেও সেইরূপ এক এক সময় ঝঞ্ঝা ঝটিকা বহিতে থাকে, তখন সকলেই ভয় করেন যে, বুঝি সমাজের সমুদয় শৃঙ্খলা উলট্‌পালট্‌ হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহাদের ভয় করিবার কোন কারণ নাই; তাঁহারা যদি ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেন, ত দেখিতেন যে, জীর্ণ সমাজের কতক কতক ভগ্ন ও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু আবার দৃঢ়তর উপাদানে নূতন সমাজ নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজপুরুষের একাধিপত্য অনেক দিন ইউরোপখণ্ডে চলিয়া আসিতেছিল, হয়ত ততদিন প্রয়োজন ছিল, কিন্তু যখনি সে সময় অতীত হইয়া গেল, অমনি একটা বিপ্লব বাধিল; দারুণ রক্তপাত, অরাজকতা, অত্যাচার উপস্থিত হইল, কিন্তু পরিণামে তাহা হইতে অশুভ ফল উৎপন্ন হইল না। অসভ্য অবস্থায় অসাধারণ পরাক্রমশালী প্রভুর প্রয়োজন ছিল, নচেৎ তখনকার দুর্দ্দান্ত লোকেরা যুক্তিতে বা সুনিষ্ট ব্যবহারে বশ হইত না, কিন্তু সে অবস্থা চলিয়া গেলে সে নিয়ম খাটিল না। এক কথায় বলিতে গেলে বিপ্লব আপাততঃ অতিশয় বিকটাকার বোধ হইলেও পরিণামে তাহা হইতে অনেক শুভ ফল উৎপন্ন হয়। লণ্ডনে যখন দারুণ মড়ক হইয়াছিল, তখন যে অগ্নিদাহ হয়, তাহা হইতে যদিও অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, কিন্তু গড়কের বীজ দগ্ধ হইয়া গুরুতর অনিষ্ট নিরাকৃত হয়।

বঙ্গদেশের প্রাচীন লোকেরা সভয়ে দেখিতেছেন, যে, নূতন বংশের অভ্যুত্থানশীল যুবকদের মধ্যে অতিশয় বিপ্লব চলিতেছে। তাঁহারা ভাবিতেছেন, কলির সন্ধ্যাকাল বুঝি উপস্থিত হইয়াছে; কেহ কাহাকে মানে না, সকলেই স্ব স্ব প্রধান, স্বদেশ-সম্বন্ধে-অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের কাছে তাহারা পরামর্শ চায় না, বিদেশের সর্ব্ববিদ্যাভিমানী গ্রন্থকারের কথাই তাহাদের বেদবাক্য, প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিতে নিতান্ত বিমুখ, এবং ভালই হউক্ আর মন্দই হউক্ তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিলে আপনাকে মহাবীর বলিয়া মনে করেন, সকলেই মনে করেন, আমারই উপর বিধাতা এই অসভ্য বঙ্গ দেশের সংস্কারের ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমার কথাতেই সকলে চলিবে, আমি কাহারো কথায় চলিব না, এবং যাঁহারা একবার বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পদার্পণ করেন বা তথা হইতে নির্গত হন, তাঁহারা দেশের লোকের রুচির, জ্ঞানের, সভ্যতার দোষ ধরিয়া বেড়ান, তাঁহারা মনে করেন সকল বিষয়েই আমার অধিকার আছে, এই জন্য তিনি বুঝুন বা না বুঝুন সকল কথা লইয়াই তোলাপাড়া করিয়া থাকেন। যাহা হউক, আমাদের এই নব্য বংশ এখনো বৃদ্ধদের শাসনে আছেন, কিন্তু যখন এই প্রাচীনবংশ লোপ পাইবেক, তখন এই যথেচ্ছাচারী শত শত শিক্ষিত লোক কি গোলযোগ বাধাইবেন কে বলিতে পারে।

এই সকল ভাবিয়া অনেকে ভয় পাইতেও পারেন, কিন্তু আমরা বলি এ বিপ্লব চিরকাল থাকিবে না। নিদ্রোন্মীলিত নয়নে নূতন জ্ঞানের আলোক লাগিয়া বঙ্গবাসীরা অন্ধ হইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা দিগ্বিদিক্‌-শূন্য হইয়া কি করিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না। যখন এই আলোক তাঁহাদের চক্ষে সহিয়া যাইবে, তখন আবার তাঁহারা চারিদিক স্পষ্টতর দেখিতে পাইবেন এবং দেশ কাল পাত্র বুঝিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন। তাঁহারা পারিবারিক সুখের বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেলাকেই স্বাতন্ত্র্য মনে করেন, যথেচ্ছাচারিতাকেই স্বাধীনতা বলিয়া আলিঙ্গন করেন ও স্বদেশকে ঘৃণা করাকেই সার্ব্বভৌমিক ভাব মনে করেন। এ অবস্থা যে চিরকাল থাকিবে আমরা সে ভয় করি না, কিন্তু একটি বিষয়ে আমাদের ভয় হয়। এখন এই যে একটি সম্পূর্ণ নূতন ভাবস্রোত বহিতেছে, ইহাতে যাহা কিছু সময়ের অনুপযোগী তাহা ভাঙ্গিয়া যাইবে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যাহা উপযোগী তাহাও ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, বা যাহা অনুপযোগী তাহাও নূতন ভাসিয়া আসিতে পারে, এই বিষয়ে আমাদের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য; সহস্র সহস্র বৎসরে যাহা গঠিত হয়, তাহা ভাঙ্গিয়া গেলে গড়িতে কত পরিশ্রম করিতে হইবে এবং সহস্র বৎসরে যাহার ভার বহনে আমরা সমর্থ হইব, এখনই তাহা স্কন্ধে লইলে চাপা পড়িয়া মরিতে হইবে।

বঙ্গদেশের সামাজিক-বিপ্লব যে চিরকাল তিষ্ঠিতে পারিবে না, এখনি তাহার প্রমাণ পাইতেছি। আমাদের দেশের যুবকেরা যখন প্রথম ইংরাজি শিক্ষা পাইয়াছিলেন, তখন যাহা কিছু দেশীয় তাহারই উপর তাঁহাদের আন্তরিক ঘৃণা ছিল ও যাহা কিছু বিদেশীয় তাহারই উপর তাঁহাদের অতিশয় অনুরাগ জন্মিয়াছিল; এমন কি, বিদেশীয় পানাহার চলিত হওয়াও তাঁহারা বঙ্গদেশের সভ্যতার একটি মুখ্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের সে ভাব অপনীত হইতেছে। এখন দেশীয় কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির উপর আমাদের অনুরাগ জন্মিতেছে ও বিদেশীয় অনেক আচার ব্যবহারকে আমরা তুচ্ছ করিতে শিখিয়াছি। আমাদের দেশীয় কোন লোক বিদেশীয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া আসিলে আমরা তাহাকে ঘৃণা করি। কিছু দিন আগে কেবল ভাঙ্গ্‌ ভাঙ্গ্‌ শব্দ পড়িয়া গিয়াছিল, এখন সকলে রাখ্‌ রাখ্‌ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছেন।

এখন সমাজে তিন দল উত্থিত হইয়াছেন। যাঁহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারা সকলি ভাঙ্গিতে চান। যাঁহারা আমূল-রক্ষণ-প্রিয় তাঁহারা সকলি রাখিতে চান। যাঁহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারা যাহা ভাল তাহাই রাখিতে চান, যাহা মন্দ তাহাই ভাঙ্গিতে চান। এইরূপে উপরি-উক্ত দুইটি শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে এবং শেষোক্ত শক্তির উত্তেজনায় সমাজ ঠিক উন্নতির সরল-পথে চলিতেছে।

উন্নতির পথ মধ্যবর্ত্তী, উন্নতির পথ এক-ঝোঁকা নহে। কেন্দ্রাতিগ এবং কেন্দ্রানুগ শক্তি দুই দিক হইতে কোন বস্তুর উপর

কার্য্য করিলে তাহা মধ্য-পথ আশ্রয় করে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় ও আমূল-সংস্কার-প্রিয় এই দুই শক্তি আমাদের সমাজের উপর কার্য্য করাতে সমাজ উন্নতির মধ্যবর্ত্তী পথে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে আবার রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় উত্তেজনা করাতে সমাজ দ্বিগুণ-সাহায্য প্রাপ্ত হইতেছে। যাঁহারা আমূল-রক্ষণ-প্রিয় তাঁহারা উন্নতি শীল নাম ধারণ করিতে পারেন না; যাঁহারা আমূল-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারাও উন্নতিশীল নহেন, যাঁহারা রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় তাঁহারাই প্রকৃত উন্নতি শীল। কিন্তু ইহাঁদের কাহাকেও সমাজ হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে না। আমূল-রক্ষণ-প্রিয় মনে করিতেছেন, আমূল-উন্নতি-প্রিয় সমাজকে অবনতির দিকে আকর্ষণ করিতেছেন, আবার আমূল-উন্নতি-প্রিয় মনে করিতেছেন যে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় সমাজকে অবনতির গহ্বর হইতে উদ্ধার করিতে বাধা দিতেছেন, আবার রক্ষণ-সংস্কার শীল মনে করিতেছেন যে, আমূল-রক্ষণ-প্রিয় ও আমূল-সংস্কার-প্রিয় উভয়ে মিলিয়া সমাজের দারুণ অনিষ্ট সাধন করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাঁরা কেহই সমাজের উন্নতি-পথের কণ্টক নহেন। তবে আমূল-সংস্কার ও আমূল-উন্নতি-প্রিয় উভয়ে ভ্রান্ত পথ আশ্রয় করিয়া সমাজের উন্নতির সাহায্য করিতেছেন, ও রক্ষণ-সংস্কার-প্রিয় প্রকৃত পথ আশ্রয় করিয়া সমাজের উন্নতি সাধন করিতেছেন। যখন যুবকেরা নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে বহির্গত হন, যখন তাঁহাদের উন্নতির ইচ্ছা আছে কিন্তু অভিজ্ঞতা নাই, যখন তাঁহারা উন্নতির কতকগুলি মূল সূত্র শিখিয়াছেন কিন্তু দেশ কাল পাত্রে প্রয়োগ করিতে শিখেন নাই, যখন তাঁহারা মনে করেন যে বলিষ্ঠ ব্যক্তির খাদ্য ও রোগীর পথ্য একই, যখন তাঁহারা মনে করেন যে, ইংলণ্ডের বোঝা বাঙ্গালার স্কন্ধের উপযোগী, তখন তাঁহারা বঙ্গদেশকে একেবারে ইংলণ্ড করিতে চান, ভাগীরথীকে টেম্‌স্ করিতে চান্, বাঙ্গালীকে ফিরাঙ্গী করিতে চান্। কিন্তু যখন তাঁহারা সংসারে প্রবিষ্ট হন, তখন ক্রমশঃ শান্ত ও শীতল হইয়া আসেন ও রক্ষণ-শীলতার প্রতি একটু একটু করিয়া ঝুঁকিতে থাকেন। আবার তখনকার নব্য বংশ সমাজের আগাগোড়া ভাঙ্গিবার জন্য গদা উদ্যত করেন। এইরূপে রক্ষণ-শীল ও সংস্কার-শীল চিরকালই সমাজে জাগ্রত থাকে, না থাকিলে সমাজের দারুণ অনিষ্ট হয়। যখন ভারতবর্ষে উন্নতির মধ্যাহ্ন কাল, তখন ধীরে ধীরে কতকগুলি নূতন দর্শন ও নূতন দল নির্ম্মিত হইতে লাগিল, এবং তাহাদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম উত্থিত হইয়া সমাজে একটি ঘোরতর বিপ্লব বাধাইয়া দিল। পৌরাণিক ঋষিরা ভুল বুঝিলেন, তাঁহারা মনে করিলেন এরূপ বিপ্লব অনিষ্ট-জনক। অমনি পুরাণে, সংহিতায় ও অন্যান্য নানা প্রকারে সমাজের হস্তপদ অষ্টপৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন এবং ভবিষ্যতে এরূপ বিপ্লব না বাধে তাহার নানা উপায় করিয়া রাখিলেন। সমাজের স্বাস্থ্য নষ্ট হইল এবং সমাজ ক্রমশই অবনতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

সংস্কার-শীলতার অভাবে ও রক্ষণ-শীলতার বাড়াবাড়িতেই হিন্দু সমাজ নির্জীব হইয়া পড়িল।

বঙ্গদেশের এই সামাজিক বিপ্লব আমাদের ত শুভ লক্ষণ বলিয়া মনে হয়; যে উপায়েই হউক্ এই যে, বহু কাল-ব্যাপী নিরুদ্যমের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে এবং শিক্ষিত লোকেরা নব-উদ্যমে কার্য্য করিবার ক্ষেত্র অন্বেষণ করিতেছেন ইহা ত মঙ্গলেরই চিহ্ন। যেমন যুদ্ধ বিপ্লবের অনুষ্ঠানে জাতির শারীরিক বল বর্দ্ধিত হয়, সেই রূপ মানসিক বিপ্লবে মনের বল বাড়িবার কথা। আর অধিক দিন নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমস্ত বাঙ্গালী জাতি নির্জীব হইয়া পড়িত। এখন যে রূপ ভাঙ্গা গড়া ও চারিদিক হইতে উপাদান সংগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয়, অল্প দিনের মধ্যে এই বাঙ্গলার সমাজ নূতন দৃঢ়তর ভিত্তিতে স্থাপিত হইবে।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

ইতি-পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আত্মার মঙ্গলই সৃষ্টির উদ্দেশ্য, এক্ষণে সৃষ্টির প্রকরণ-পদ্ধতি কিরূপ তাহার প্রতি মনঃসংযোগ করা যাইতেছে।

বিশুদ্ধ-জ্ঞানের অভ্যন্তরে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়, এই দুই বিরোধী পক্ষের বিরোধ-ভঞ্জন দেখিতে পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ জ্ঞানের গোড়ার কথা এই—যিনি জানিতেছেন তাঁহাকে জানা। এরূপ স্থলে যিনি জ্ঞাতা তিনিই জ্ঞানের বিষয়, ইহা অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞেয়ভাব জ্ঞাতৃভাবের বিরোধী সত্বেও বিশুদ্ধ-জ্ঞানেতে সে বিরোধ স্থান পাইতে পারে না। জ্ঞাতা যে আপনি, এবং জ্ঞাত যে আপনি, উভয়ের মধ্যে ভেদ-রাহিত্যই বিশুদ্ধ জ্ঞানের লক্ষণ।

জ্ঞানের জ্ঞাতাও যে, জ্ঞানের জ্ঞেয়ও সে, এটি জ্ঞানের ভিতরকার কথা। জ্ঞান-মাত্রই জ্ঞানরূপে আপনার নিকট প্রকাশ পায়;—প্রকাশ যখন পায়, তখন তাহা জ্ঞেয় নয় ত আর কি? আবার যখন তাহারই জ্ঞানেরই কাছে জ্ঞান প্রকাশ পায়, তখন তাহা জ্ঞাতা নয় ত আর কি? অতএব জ্ঞানের অভ্যন্তরে জ্ঞাত যে আপনি, এবং জ্ঞাতা যে আপনি, এ দুয়ের ঐক্য অবশ্যম্ভাবী। দীর্ঘ-প্রস্থ-বেধ এই ত্রিবিধ আয়তনের সংহত-ভাব যেমন আকাশ-মাত্রেরই ধর্ম্ম, তেমনি জ্ঞাতা-জ্ঞান-জ্ঞেয় এই ত্রিবিধ ভাবের সংহত-ভাব চেতন-পদার্থ-মাত্রেরই ধর্ম্ম।

বিশুদ্ধ-জ্ঞানের জ্ঞাতা আপনি এবং জ্ঞাত-

আপনি এই দুই বিরোধী পক্ষকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া দেখিলে এই রূপ দাঁড়ায় যে, ইহাও যে বস্তু উহাও সেই বস্তু—তবে কি না প্রকারান্তরে। প্রকারান্তর কাহাকে বলে তাহার একটি উদাহরণ দিই;—ভাবের স্থায়িত্বও যা', অভাবের অস্থায়িত্বও তা'; কিন্তু অভাবের অস্থায়িত্ব ক্রিয়াসাপেক্ষ—চেষ্টা করিয়া অভাব মোচন করিতে হয়, ভাবের স্থায়িত্ব আপনা-আপনি আছে, দুয়ের মধ্যে এইরূপ প্রকার-ভেদ দৃষ্ট হইতেছে। ভাবের প্রভাব দ্বারা অভাবের যে অভাব, তাহাকে বলে আবির্ভাব; অর্থাৎ পূর্ব্বে ছিল না, ভাব-প্রভাবে এখন হইল, এরূপ যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, সকলই আবির্ভাব। ভাবও যা', আবির্ভাবও তাই,—প্রকারান্তরে। জ্ঞানের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে, জ্ঞাতৃপক্ষে জ্ঞানের ভাব, এবং জ্ঞাতপক্ষে জ্ঞানের আবির্ভাব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ-জ্ঞানের জ্ঞাতৃপক্ষই পরমাত্মা, জ্ঞাত পক্ষই আত্মানাত্ম-ময় জগৎ। জ্ঞাতৃজ্ঞেয় এ দুই বিরোধী পক্ষের মধ্যে যে বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই, জীবাত্মাই তাহার প্রমাণ-স্থল। জ্ঞেয়-পক্ষের মধ্য হইতে জ্ঞাতৃ-পক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া—সেই জ্ঞেয়পক্ষের সহিত নহে কিন্তু—মূল জ্ঞাতৃপক্ষের সহিত আপনার মিল সপ্রমাণ করিতেছে; শস্য উৎপন্ন হইয়া, বৃক্ষের সহিত নহে, কিন্তু বীজের সহিত আপনার মিল সপ্রমাণ করিতেছে। জীবাত্মা, পরমাত্মার বিরোধীপক্ষ নহে, পরন্তু বিরোধী পক্ষের (জড়ত্বের) বিরোধী পক্ষ;—জীবাত্মা, বিরোধের ভঞ্জন-স্বরূপ। একদিকে মূল-জ্ঞাতৃপক্ষের অপরিবর্ত্তনীয় স্বপ্রকাশ ভাব; অন্যদিকে, জ্ঞেয়পক্ষের মধ্যে (জগতের মধ্যে) জ্ঞাতৃপক্ষের ক্রমশঃপ্রকাশ্য অনন্ত পরিণাম কি না চেতন ভাবের উত্তরোত্তর অনন্ত পরিস্ফুটন; দুয়ের মধ্যে বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই,—ভেদ যাহা, তাহা প্রকার-ভেদ মাত্র। মূলে যে পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান আছে, জগতে অনন্ত কাল অভাবের অভাব হইলে, তাহাই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, নূতন কিছুই হইবে না। জ্ঞাতৃপক্ষের, একদিকে, পূর্ণপ্রভাব; জ্ঞেয় পক্ষের, অন্যদিকে, অভাবের ক্রমশই অভাব; এ দুয়ের মধ্যে বর্ত্তমানে—প্রতি বর্ত্তমান ক্ষণে—আকাশ-পাতাল প্রভেদ, কিন্তু অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল ধরিতে গেলে কিছুই প্রভেদ নাই। জ্ঞেয়পক্ষে আপাততঃ জ্ঞাতৃপক্ষের বিরোধ;—কিন্তু সে বিরোধের ক্রমশই ভঞ্জন হইতেছে—ক্রমশই জ্ঞেয় পক্ষের মধ্যে জ্ঞান সংক্রমিত হইয়া তাহাকে জ্ঞাতৃ-পক্ষের প্রতিচ্ছবি করিয়া তুলিতেছে; মূলের ভাব (জ্ঞাতৃভাব) যাহা জগতের (জ্ঞেয়ভাবের) অভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, ক্রমশই তাহা উত্তরোত্তর অভিব্যক্ত হইতেছে—ইহা দেখিলে জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভাবের পরস্পর বিরোধকে আর বিরোধ বলিয়াই মনে হয় না।

জ্ঞেয়পক্ষের মধ্যে জ্ঞাতৃপক্ষের পূর্ণ-প্রভাব যাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা

আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতে না পাইলাম নেই, মনদ্বারা দেখিতে পাই তাহাই আমাদের পরম সৌভাগ্য। আমরা চক্ষু-শ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা আবির্ভাব দেখি,—চক্ষুশ্রোত্র-ব্যাপী সাধারণ ইন্দ্রিয় যে মন, তাহা দ্বারা ভাব দেখি। চক্ষু দ্বারা আমরা জ্যোৎস্নাকে উজ্জ্বল দেখি—রসনা দ্বারা নহে; রসনা দ্বারা দ্রব্য-বিশেষের মধুর আস্বাদ গ্রহণ করি—চক্ষু দ্বারা নহে; আবার, চক্ষু এবং রসনার মধ্যে ঐ যে প্রভেদ, তাহা অগ্রাহ্য করিয়া মন-দ্বারা জ্যোৎস্নাকে মধুর বলিয়াও অবধারণ করি। মন দেখে, শোনে, আস্বাদন করে, ঘ্রাণ করে, স্পর্শ করে, সকল ইন্দ্রিয়েরই কার্য্য একা করিয়া থাকে। মনেতে যখন রসনা এবং চক্ষুর এপ্রকার অভেদ ভাব, তখন জ্যোৎস্নাকে মধুর বলিতে পারে এরূপ অধিকার তাহার সম্পূর্ণই আছে বলিতে হইবে। চক্ষু দ্বারা আমরা দেখি জ্যোৎস্না উজ্জ্বল; মনোদ্বারা দেখি জ্যোৎস্না মধুর; চক্ষু দ্বারা আবির্ভাব দেখি, মনোদ্বারা ভাব দেখি।

জ্ঞাতৃপক্ষ হইতে জ্ঞেয়-পক্ষের বহিষ্কার—ভাব হইতে আবির্ভাবের বহিষ্কার—সৃষ্টির এই যে প্রথম পদ্ধতি, ইহাকে বলে অনুলোম পদ্ধতি। আবির্ভাবের মধ্য-হইতে ভাবের উদ্ধার—সৃষ্টির এই যে দ্বিতীয় পদ্ধতি, ইহাকে বলে প্রতিলোম পদ্ধতি। ও দুই পদ্ধতি এইরূপ;—

আদিতে প্রজ্ঞা (বিশুদ্ধ জ্ঞান) শুদ্ধসত্যে পরিপূর্ণ; প্রজ্ঞাতে অনিশ্চিত কিছুই নাই, সকলই সুনিশ্চিত। প্রজ্ঞার সত্য ধ্রুব-সত্য। প্রজ্ঞা কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষ অবলম্বন করে না, সুনিশ্চিত ধ্রুব সত্যের পক্ষে ভর দিয়া অপরাজিত বলে স্থিতি করে। প্রজ্ঞা পরমাত্মাতে স্বপ্রকাশ ভাবে এবং জগতে ক্রমশ-প্রকাশ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

আবার এই দেখিতে পাই যে, ধ্রুব সত্যের প্রতি প্রজ্ঞার যেমন একটি টান আছে, তেমনি আপনার আপনার প্রতি আমাদের একটি টান আছে; প্রতি জনের আপনার আপনার প্রতি এই যে একটি টান, ইহাই সাংখ্য শাস্ত্রে অহঙ্কার শব্দে উক্ত হইয়াছে। প্রজ্ঞা এবং অহঙ্কার এ দুয়ের মধ্যে ভাব এবং আবির্ভাবের সম্বন্ধ। ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, যেখানে চক্ষু হউক কর্ণ হউক বিশেষ কোন ইন্দ্রিয়, সেই খানেই আবির্ভাব দেখা দেয়, এবং চক্ষু-শ্রোত্রব্যাপী সাধারণ ইন্দ্রিয় যে মন, সেই খানেই ভাব দেখা দেয়। এই যুক্তি অবলম্বন করিয়া ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে যে, সর্ব্বসাধারণ-ব্যাপী যে প্রজ্ঞা তাহাই ভাব-স্বরূপ, এবং বিশেষ-বিশেষ জীবের যে বিশেষ বিশেষ অহংভাব তাহা তাহার (প্রজ্ঞার) আবির্ভাব-স্বরূপ।

প্রজ্ঞার আবির্ভাব যেমন অহংভাব (অহংকার), সেইরূপ অহংভাবের আবির্ভাব, ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যেকে। কেননা অহংভাব বিশেষ-বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাধারণ ঐক্য স্থল।

মন সকল-ইন্দ্রিয়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ;

এ জন্য বাহুল্যে না গিয়া মনকেই সর্ব্বেন্দ্রিয় বলিয়া ধরা যাউক।

সকল কুড়াইয়া এইরূপ পাওয়া যায় যে, অহংরূপী জীব একদিকে প্রজ্ঞা দ্বারা পরমাত্মার সহিত এবং অন্যদিকে মন দ্বারা বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত।

প্রজ্ঞা, পরমাত্মা-হইতে ভিন্নরূপে, আবির্ভূত হইবার জন্য অহংভাবের প্রয়োজন; অহংভাব, প্রজ্ঞা হইতে ভিন্নরূপে আবির্ভূত হইবার জন্য ইন্দ্রিয়, মন এবং বিষয়ের প্রয়োজন। তাই সাংখ্য দর্শন বলেন যে, ভোগসাধক ইন্দ্রিয় মন এবং ভোগ্য বিষয়ের মূল উপাদান-স্বরূপ সূক্ষ্ম আদি-ভূত, উভয়ই অহংভাবের আবির্ভাব স্বরূপ।

ইন্দ্রিয়-মন-রূপ শৃঙ্খল দ্বারা অহংভাবকে বিষয়েতে বদ্ধ করিয়া তাহার স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি সাধন করা সৃষ্টির একতম উদ্দেশ্য; ইহার যে প্রকরণ, তাহার নাম অনুলোম পদ্ধতি।

তাহার পর প্রজ্ঞার সংক্রমণ-দ্বারা পরমাত্মার ভাবের ভাবুক করিয়া উত্তরোত্তর তাহার (অহংরূপী জীবের) মুক্তিসাধন করা সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য; ইহার যে প্রকরণ, তাহাকে বলে প্রতিলোম পদ্ধতি।

অণ্ডের অভ্যন্তরে যেমন জীব, জীবের ইন্দ্রিয়-গণ, এবং তাহার ভোগসামগ্রী, একীভূত হইয়া স্থিতি করে; তেমনি প্রজ্ঞার অভ্যন্তরে অহংভাব, অহংভাবের বহিঃস্ফূর্ত্তি স্বরূপ ইন্দ্রিয়-মন, এবং তাহার ভোগ-সামগ্রীর মূল উপাদান-স্বরূপ সূক্ষ্মভূত, এ তিনটি প্রথমে একীভূত অবস্থায় অবস্থিত ছিল। তখন—অহংভাবের মধ্যে ইন্দ্রিয় মনের মধ্যে ভোগসামগ্রীর মধ্যে ভেদের অভিব্যক্তি হয় নাই—সৃষ্টির সেই প্রাগবস্থা। তাহার পর, তিনই অভিব্যক্তি হইতে উত্তরোত্তর অভিব্যক্তিতে পরিণত হইতে লাগিল। যাহা দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া যুগযুগান্তর পরে ইন্দ্রিয়-সহকৃত-অহংভাব ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইবে, সেই আদিভূত, আদি অন্ন, এত সূক্ষ্ম যে, তাহাকে আকাশ বলা হইয়া থাকে।

আবির্ভাবের বহিষ্করণ এবং ভাবের আকর্ষণ, এ দুইটি ব্যাপার ইতিপূর্ব্বে যাহা প্রজ্ঞাতে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা সৃষ্টির সর্ব্বত্রই কোন না কোন রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশজাতীয় অতীব সূক্ষ্ম যে একটি লাসক * পদার্থ, যাহার নর্ত্তন দ্বারা আলোক বোধের উৎপত্তি হয়, তাহাতে যে ঘাত প্রতিঘাত চলিতে-থাকে তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ; গ্রহগণের কেন্দ্রাতিগ (Centrifugal) এবং কেন্দ্রানুগ (Centripetal) ভাব যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ; উদ্ভিদের শাখা-প্রশাখা

* Elastic এই ইংরাজী শব্দের গঠন দৃষ্টে বোধ হয় যে, লস-ধাতুই উহার মূল। লাস শব্দে নৃত্য বুঝায়; ঘাত-প্রতিঘাতে তরঙ্গের ন্যায় নর্ত্তন-ক্ষম—এই, বোধ হয়, Elastic শব্দের অর্থ। লাসক শব্দেও ঐ অর্থ বুঝায়। স্থিতিস্থাপকতা বলিয়া যে একটা শব্দ নূতন সৃষ্ট হইয়াছে তাহাতে প্রথমতঃ শব্দাড়ম্বর দ্বিতীয়তঃ অর্থের ঘোরফের দেখিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে লাসকতা শব্দ ব্যবহার করা শ্রেয় বোধ করিতেছি।

বিস্তার এবং তাহাদের সকলের মধ্যে প্রাণের টান যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ; জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকাশ এবং তাহাদের মধ্যে পরস্পর ব্যথার-ব্যথিত্ব-রূপ মনের টান যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ; পরমাত্মা হইতে আত্মার বিচ্ছেদ, এবং তাঁহার প্রতি আত্মার আন্তরিক টান যাহা রহিয়াছে, তাহাও সেই বহিষ্করণ এবং আকর্ষণ। পরমাত্মা আপনার আবির্ভাবকে আপনা-হইতে পৃথক্ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন এবং উত্তরোত্তর আপনার সদৃশ করিয়া গঠিয়া তুলিতেছেন,—সামান্যতঃ ইহাই সৃষ্টি-প্রকরণ। তিনি যে এইরূপ করিতেছেন, ইহা তিনি আপনার অসীম প্রেম-প্রভাবে অনায়াসেই করিতেছেন,—তাঁহার মঙ্গল-ইচ্ছাময় অধিষ্ঠানই সৃষ্টির একমাত্র প্রবর্ত্তক। পরমাত্মা সমস্ত জগৎ চালাইতেছেন অথচ তিনি একপদও চলেন না, তিনি সকল কার্য্যই করিতেছেন অথচ তিনি কোন কার্য্যই করেন না—সৃষ্টির এই যে একটি আশ্চর্য্য-ভাব, ইহার একটি ভৌতিক উদাহরণ দিতেছি;—

সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে আকর্ষণ করে পৃথিবীও সেইরূপ সূর্য্যকে আকর্ষণ করে; কিন্তু সূর্য্যকে পৃথিবী এত অল্প চলায় যে, তাহা না চলাইবারই মধ্যে। সূর্য্য যদি অসীম হইত তাহা হইলে পৃথিবী আদবেই সূর্য্যকে চলাইতে পারিত না। তাহা হইলে সূর্য্যের অধিষ্ঠানই সূর্য্যের চলন-স্বরূপ হইত। পরমাত্মার অধিষ্ঠান-মাত্রই পরমাত্মার চলন-ক্রিয়া, পরমাত্মার নিষ্ক্রিয়-ভাবই তাঁহার সক্রিয় ভাব, পরমাত্মার অটল প্রভাবই সমস্ত জগতের নিয়ামক এবং পরিচালক। পরমাত্মা অটলমঙ্গল ইচ্ছারূপে স্থিতি করিতেছেন, এই ভাবের আকর্ষণেই সমুদায় জগৎ তাঁহার অভিমুখে তাগমান-লয়ে পর্য্যুত্থান করিতেছে। পরমাত্মাতে প্রেমের এমনি অসীম প্রগাঢ়তা যে, তিনি বাহিরে অদৃশ্য অথচ তাঁহার প্রেম ভিতরে ভিতরে সকল বস্তুতেই কোন না কোন রূপে জানান্ দিতেছে,—সকলেই পথ চিনিয়া চিনিয়া তাঁহার নিকট প্রত্যাগমন করিতেছে। পরমাত্মার প্রতি জগতের এই যে আকর্ষণ ইহাই প্রতিলোম পদ্ধতি। অনুলোম এবং প্রতিলোম পদ্ধতির বিশেষ বিশেষ সোপান যেরূপ সৃষ্টিতে দৃষ্টিগোচর হয় তাহা পরে প্রদর্শন করা যাইতেছে।

বাঙ্গালীর আশা ও নৈরাশ্য

সভ্যতার প্রথম অবস্থায় ধনের আবশ্যক। যত দিন মনুষ্য আহারান্বেষণে ব্যস্ত থাকে, তত দিন তাহারা জ্ঞান অর্জনে যত্নশীল থাকে না। উর্ব্বর দেশেই সভ্যতার

প্রথম অঙ্কুর নিঃসৃত হয়। ভারতবর্ষ, ইটালি ও গ্রীস দেশের উর্ব্বর ক্ষেত্রেই আর্য্যেরা আসিয়া জীবিকা ও সভ্যতা সহজে উপার্জন করেন। অভাবের উৎপীড়ন হইতে অবসর পাইলেই জ্ঞানের দিকে মনুষ্যের নেত্র পড়ে। এইরূপে অবসর-প্রাপ্ত ব্যক্তির অনুসন্ধিৎসুনেত্রের সম্মুখে জ্ঞানের দ্বার ক্রমশঃ উন্মুক্ত হইতে থাকে। এই জন্য আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রাহ্মণদের কোন কার্য্য ছিল না, জ্ঞানানুশীলনের উপযোগী বৃক্ষ-লতা-বেষ্টিত তপোবনে তাঁহাদের বাস ছিল; তাঁহারাই ত ভারতবর্ষে কবিতার সৃষ্টি করিয়াছেন, দর্শনের উন্নতি করিয়াছেন, বিজ্ঞানের অনুসন্ধান করিয়াছেন, শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের আলোচনা করিয়াছেন, ভাষা ও ব্যাকরণের পূর্ণ-সংস্কার করিয়াছেন। অতএব সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অবসর আবশ্যক করে, অবসর পাইবার জন্য ধন আবশ্যক, ও ধন উপার্জ্জনের জন্য উর্ব্বর ভূমির আবশ্যক।

উর্ব্বর ভূমিই যদি সভ্যতার প্রথম কারণ হয়, তবে বঙ্গদেশ সে বিষয়ে সৌভাগ্যশালী, এই আশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া আমরা মনে করিতে পারি যে, বঙ্গদেশ এক কালে সভ্যতার উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের ধ্বংসাবশিষ্ট সভ্যতার ভিত্তির উপর ইউরোপীয় সভ্যতার গৃহ নির্ম্মিত হইলে সে কি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দৃশ্য হইবে! ইউরোপের স্বাধীনতা-প্রধান ভাব ও ভারতবর্ষের মঙ্গল-প্রধান ভাব, পূর্ব্বদেশীয় গম্ভীর ভাব ও পশ্চিম দেশীয় তৎপর ভাব, ইউরোপের অর্জনশীলতা ও ভারতবর্ষের রক্ষণ-শীলতা, পূর্ব্বদেশের কল্পনা ও পশ্চিমের কার্য্যকরী বুদ্ধি উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া কি পূর্ণ চরিত্র গঠিত হইবে। ইউরোপীয় ভাষার তেজ ও আমাদের ভাষার কোমলতা, ইউরোপীয় ভাষার সংক্ষিপ্ততা ও আমাদের ভাষার গাম্ভীর্য্য, ইউরোপীয় ভাষার প্রাঞ্জলতা ও আমাদের ভাষার অলঙ্কার-প্রাচুর্য্য উভয়ে মিশ্রিত হইয়া আমাদের ভাষার কি উন্নতি হইবে! ইউরোপীয় ইতিহাস ও আমাদের কাব্য উভয়ে মিশিয়া আমাদের সাহিত্যের কি উন্নতি হইবে! ইউরোপের শিল্প বিজ্ঞান ও আমাদের দর্শন উভয়ে মিলিয়া আমাদের জ্ঞানের কি উন্নতি হইবে! এই সকল কল্পনা করিলে আমরা ভবিষ্যতের সুদূর সীমায় বঙ্গদেশীয় সভ্যতার অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাই। মনে হয়, ঐ সভ্যতার উচ্চ শিখরে থাকিয়া যখন পৃথিবীর কোন অধীনতায় ক্লিষ্ট অত্যাচারে নিপীড়িত জাতির কাতর ক্রন্দন শুনিতে পাইব, তখন, স্বাধীনতা ও সাম্যের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া তাহাদের অধীনতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দিব। আমরা নিজে শতাব্দী হইতে শতাব্দী পর্য্যন্ত অধীনতার অন্ধকার-কারাগৃহে অশ্রু-মোচন করিয়া আসিয়াছি, আমরা সেই কাতর জাতির মর্ম্মের বেদনা যেমন বুঝিব তেমন কে বুঝিবে? অসভ্যতার অন্ধকারে পৃথিবীর যে সকল দেশ নিদ্রিত আছে, তাহাদের ঘুম ভাঙ্গাইতে আমরা দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিব। বিজ্ঞান দর্শন কাব্য পড়িবার জন্য দেশ বিদেশের লোক আমা-

দের ভাষা শিক্ষা করিবে! আমাদের দেশ হইতে জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় দেশ বিদেশের লোকে পূর্ণ হইবে। বঙ্গের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের অলিখিত পৃষ্ঠায় এই সকল ঘটনা লিখিত হইবে, ইহা আমরা কল্পনা করিয়া লইতেছি সত্য, কিন্তু পাঠকেরা ইহা নিতান্ত অসম্ভব বোধ করিবেন না। প্রকাণ্ড সমুদ্রের কোন্ এক প্রান্তে কতকগুলি বালুকণা জমিয়া ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র যে একটি তুষারাবৃত অনুর্ব্বর দ্বীপ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্ব-নিবাসীদের আকাশই অম্বর ছিল, পশুবৎ ব্যবহার ছিল, তরুকোটর বাসস্থান ছিল, নর-রক্ত-লোলুপ ড্রুইডগণ পুরোহিত ছিল, আজ তাহাদেরই পুত্র পৌত্রগণ কোথা হইতে তাড়িয়া ফুঁড়িয়া অসভ্যদের সভ্য করিবেন বলিয়া মহা গোলযোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ইহাও যদি সম্ভব হইল, পতিত ইটালী ও গ্রীসও যদি পুনরায় জাগিয়া উঠিল, তবে যে নূতন জাতি আজ নব উদ্যমে জ্বলিয়া উঠিতেছে, নবজীবনে সঞ্জীবিত হইতেছে, নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে, সে যে সভ্যতার চরম শিখরে না উঠিয়া বিশ্রাম করিবে না, তাহাতে অসম্ভব কি আছে ? সভ্যতা পৃথিবীতে স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইতে থাকে, একেবারে প্রচুর পরিমাণে সভ্যতা কখন পৃথিবীতে জন্মিতে পারে না। ক্রমই প্রকৃতির নিয়ম। সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আসিয়া ভারতবর্ষ, গ্রীস ও ইটালীতে এক স্তর সভ্যতা নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল দেশ হইতে দেবী চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু এক স্তর সভ্যতা সেখানে এখনো অবশিষ্ট আছে। তিনি এখন ফ্রান্স জর্ম্মনি প্রভৃতি দেশে সভ্যতা নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং কিছুদিন পরে সেখানেও পদচিহ্ন রাখিয়া আবার আমেরিকা, রুসিয়া, জাপান মাড়াইয়া পুনরায় সেই প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকে উদিত হইবেন, তাহাতে অসম্ভব কিছুই নাই। সভ্যতার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এইরূপে পৃথিবীময় পরিভ্রমণ করিতেছেন এবং স্তরে স্তরে পৃথিবীতে পূর্ণ সভ্যতা নির্ম্মাণ করিতেছেন। ভবিষ্যতের একদিন আমরা কল্পনা-চক্ষে দেখিতেছি, যে দিন আমাদের দীপ্যমান সভ্যতার সম্মুখে ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স, জর্ম্মনি, ইংলণ্ডের সভ্যতা নিবিয়া যাইবে। এ কথা অবিশ্বাস করিবার নহে। অনন্ত কাল-সমুদ্রে কত ঘটনা-তরঙ্গ উঠিবে ও পড়িবে, আর আমাদের এই বঙ্গদেশ, এই লক্ষ লক্ষ অধিবাসী চিরকালই যে অধীনতার অন্ধকারে নির্জ্জীব ভাবে ঝিমাইবে, তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। আমরা ইউরোপের সঞ্চিত সভ্যতা অনায়াসে অর্জ্জন করিয়া লইতেছি, নিউটন যতখানি মাথা ঘুরাইয়া পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বুঝিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে আমাদের নিউটনের একপঞ্চদশ-অংশও ভাবিতে হয় না। ইয়ুরোপ যখন বৃদ্ধ ও ক্লান্ত হইয়া যাইবেন, তখন তাঁহার সঞ্চিত সভ্যতা অর্জ্জন করিয়া লইয়া আমরা আবার নব উদ্যমে অধিকতর সঞ্চয় করিতে আরম্ভ করিব। যে জাতি নব উদ্যমে উঠিতে আরম্ভ করে, তাহারাই ক্রমে সভ্যতার উচ্চ-শিখরে আরোহণ করে।

কি অল্প কালের মধ্যে আমাদের বঙ্গদেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। বঙ্গ ভাষায় গদ্য এই সেদিন ত নির্ম্মিত হইয়াছে ; যতদিন ভাষার উন্নতি না হয়, ততদিন জাতির উন্নতি হয় না, অথবা জাতির উন্নতির চিহ্নই ভাষার উন্নতি। যাঁহারা প্রায় বাঙ্গলা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা তাঁহারা আজিও বর্ত্তমান আছেন। বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্য এই অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে আশ্চর্য্য উন্নত হইয়াছে। এত দ্রুত ও এত অল্প কালের মধ্যে বোধ হয় কোন ভাষারই উন্নতি হয় নাই। এই উন্নতি-স্রোত যদি দারুণ প্রতিঘাত না পায় তবে কথনো থামিবে না। বাঙ্গালীদের এই অর্দ্ধশতাব্দীর উন্নতি, ইহার মধ্যে তাহাদের উদ্যম কত বাড়িয়া উঠিয়াছে, অধীনতার অনুৎসাহের মধ্যে এতদূর আশা করা যায় না। স্কট্‌লণ্ডে গিয়া তাহারা কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে, লণ্ডনে গিয়া সেখানকার বিজ্ঞান-আচার্য্য উপাধি আহরণ করিতেছে, অঙ্ক বিদ্যা শিখিতেছে, জর্ম্মনীতে নিজের মত প্রচার করিতেছে, রুসিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আসন অধিকার করিতেছে, সমস্ত ভারতবর্ষে রাজনৈতিক ঐক্যতা স্থাপনের জন্য প্রাণপনে চেষ্টা করিতেছে, সাহস পূর্ব্বক কত সামাজিক শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছে, সফল হউক বা না হউক, গবর্ণমেণ্টের কুনিয়মের বিরুদ্ধে সাহস পূর্ব্বক স্বীয় মত প্রকাশ করিতেছে, আমেরিকায় শিক্ষা পাইবার জন্য কত যুবক উদ্যত হইয়াছেন, এবং আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব যে, তাহারা পোত-নির্ম্মাণবিদ্যা, যন্ত্র-বিদ্যা এবং ইংরাজেরা যদি যুদ্ধ শিক্ষা না দেন, তবে ফ্রান্সে গিয়া, জর্ম্মনিতে গিয়া যুদ্ধ শিথিয়া আসিবে, ইহা নিশ্চয়ই। গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য জুটিতেছে না, সুতরাং জীবিকার অভাবে বিদেশে গিয়া অর্থের নিমিত্তেও বিদ্যা শিখিবে, বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, এখনি আমাদের দেশীয় লোকের বাণিজ্যের দিকে মন পড়িয়াছে, অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে অধীনতার সীমাবদ্ধক্ষেত্রে এত দূর উন্নতি কোন্ জাতি করিয়াছে জানি না।

পাঠকেরা জিজ্ঞাসা করিবেন যে আমরা পূর্ব্বে বলিলাম সভ্যতার প্রথম অবস্থায় অর্থের আবশ্যক করে, তবে এখন কেন বলিতেছি যে, অর্থাভাবও বাঙ্গালীদের জ্ঞান উপার্জ্জনের প্রধান প্রবর্ত্তক? স্বাধীন সভ্যতার নিমিত্ত প্রথম অবস্থায় নিশ্চয়ই অর্থ আবশ্যক, আমাদের যদি ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের মস্তিষ্ক হইতে এই সভ্যতা গঠিত করিতে হইত, তবে নিশ্চয়ই অবসর নহিলে পারিতাম না, অপরে আমাদের জ্ঞান গিলাইয়া দিতেছে, ইহার জন্য অধিক অর্থ আবশ্যক করে না, আমরা নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্ক্রিয়া করিতে পারিব না, নূতন যন্ত্র উদ্ভাবন করিতে পারিব না, সুতরাং আমরা একটি জাতীয় মহত্ত্ব উপার্জ্জন করিতে পারিব না। পৃথিবীতে এখন সভ্যতা গঠিত হইতেছে, এই গঠন-কার্য্যে আমরা কোন সাহায্য করিতে পারিব কি না সন্দেহস্থল, তবে

গঠিত হইলে জাতিসাধারণের সহিত তাহা আমরা ভোগ করিতে পারিব। আমাদের গঠন-শক্তি নানা বাহ্য কারণ হইতে ব্যাঘাত পাইতেছে। প্রথম দারিদ্র্য, দ্বিতীয় জলবায়ু।

আমাদের দেশ উর্ব্বর সত্য, কিন্তু অনেক কারণে দারিদ্র্য প্রশ্রয় পাইতেছে। সাধারণ লোকদের মধ্যে সমান রূপে ধন বিভক্ত হইলেই দেশ ধনী হয়। দেশীয় কৃষকেরা যাহা উৎপন্ন করে তাহার সমস্ত লাভ মহাজন প্রভৃতিরাই ভোগ করে, তাহাদের কেবল জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী কিছু অবশিষ্ট থাকে, তদধিক সঞ্চয় করিবার কোন উপায় নাই. দুর্ভিক্ষের পর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতেছে। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বিদ্যা শিখিবার জন্য অনেকে ধন এবং তদপেক্ষা বহুমূল্য স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছেন, কিন্তু শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ধন উপার্জ্জন করিবার কোন উপায় দেখিতেছেন না। দেশের মৃত্তিকা ক্রমশঃ অনুর্ব্বর হইয়া যাইতেছে, এক স্থানে ক্রমাগত একই শস্য জন্মিলে মৃত্তিকার তেজ নষ্ট হইয়া যায়। প্রাচীন লোকেরা বলেন, এখনকার খাদ্য-সামগ্রী ক্রমশঃ বিস্বাদ হইয়া যাইতেছে; তাহার কারণ, মৃত্তিকা ক্রমেই নিস্তেজ হইয়া যাইতেছে। এই দারিদ্র্যের জ্বালায় অস্থির হইয়া লোকে এক বিন্দু অন্য বিষয় ভাবিবার সময় পাইবে কোথায়? যদিই বা ক্রমে আমরা ধনী হই, তাহা হইলেও কি আমাদের দেশ জ্ঞান উপার্জ্জন বিষয়ে সকল দেশের অগ্রগণ্য হইতে পারে, তাহাতেও সন্দেহ আছে। আমাদের জল বায়ু এমন অতেজস্কর, যে নিবাসীদের মন একেবারে উৎসাহশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। কোন একটি কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগা এদেশে কাহারো সাধ্য নহে। যদি বা কোন কৃত্রিম উপায়ে একবার উৎসাহ উদ্দীপ্ত করা যায়, তথাপি অধিক দিন তাহা স্থায়ী হয় না, অল্প দিনের মধ্যে শিথিল হইয়া যায়। দেশের আর্দ্র বায়ু স্বাস্থ্যের এত বিঘ্নজনক যে, তাহাতে অনেক অনিষ্ট হইতেছে। খর্ব্বাকার রুগ্ন শীর্ণ কতকগুলি লোকের কাছে কত দূর আশা করা যায়? শারীরিক বলের অভাবে তাহাদের মনের মহত্ত্ব জন্মিবে কোথা হইতে? তাহারা অত্যাচারে অভাবে শিশু ও অবলার ন্যায় ক্রন্দন করিতে পারে; পুরুষের মত, বীরের মত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না। আধ ঘণ্টা কঠিন বিষয় চিন্তা করিলে মাথা ঘুরিয়া যাইবে, দুই চারিটি চিন্তা-সাধ্য পুস্তক লিখিলে মাথার পীড়া হইবে। তবে এখন নূতন বৈজ্ঞানিকসত্য আবিষ্কার করিবে কি করিয়া? যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যস্ত থাকেন, কত রাত্রি নিদ্রাহীননেত্রে তারকার দিকে চাহিয়া থাকেন, কত দিবস আহার ত্যাগ করিয়া সূর্য্য গ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। ঐ সকল কি আমাদের দেশের দৃষ্টি অভাবে চসমা-চক্ষু, রাত্রি জাগরণে অজীর্ণ-রোগী, বিশ্রাম অভাবে রুগ্ন—দেহ, জল বায়ুর দোষে শীর্ণ-ধাতু বিএ এমের কর্ম্ম? বাঙ্গালা দেশ হইতে উঠিয়া না গেলে আমাদের নিস্তার নাই। ভারতবর্ষের

অন্য কোন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিলেই তবে আমাদের রক্ষা, নহিলে কতক গুলি অপচ্যজ্ঞান গিলিয়া গিলিয়া বিকৃত-মস্তিষ্ক, বিলাতী প্রভুদের বুট জুতার আঘাত সহিয়া সহিয়া হীন-প্রকৃতি, দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া করিয়া রুগ্ন দেহ ও সাহেবি সভ্যতার সহিত নানাবিধ অভাব আমদানি হওয়াতে দরিদ্র হইয়া মরিতে হইবে।

আমাদের জ্ঞান অর্জ্জনের যে সকল বাধা জন্মিয়াছে, তাহা নিরাকৃত করিবার কি কোন উপায় নাই? আমাদের কত খানি উন্নতির আশা আছে দুই একটি কারণে তাহা যে নষ্ট হইবে ইহা ত সহ্য হয় না। প্রথম বিঘ্ন দারিদ্র্য, এই দারিদ্র্য কি কখনো চিরকাল তিষ্ঠিতে পারে? ইহা অসম্ভব যে একটি সমগ্র জাতি একেবারে না খাইয়া মরিবে, অথবা অভাবের উৎপীড়ন সহিয়াও স্থির হইয়া থাকিবে। ইংলণ্ড দেশটি কিছু উর্ব্বর নহে তবে তাহারা ধনী হইল কি করিয়া? ভাবিয়া দেখিতে গেলে অভাবই তাহাদের ধনী করিয়াছে। নিজের দেশে জীবিকার সংস্থান করিতে না পারিয়া তাহারা দেশ বিদেশে গিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। যেখানে অভাব সেখানেই একটি না একটি উপায় আছে। আমাদের দেশে স্বাধীন বাণিজ্য-প্রচার আরম্ভ হইয়াছে, ক্রমশঃ যে তাহার উন্নতি হইবে না তাহা কে বলিতে পারে? গবর্ণমেণ্ট যদি বিঘ্ন না দেন, তবে বাঙ্গালীরা নিশ্চয়ই বাণিজ্যের উন্নতি করিতে পারিবে। ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতিরা অত্যন্ত বাণিজ্য-প্রিয়, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার-অভাবে তাহাদের অনেক বাধা পড়িতেছে, কিন্তু শিক্ষিত ও স্বভাব-চতুর বাঙ্গালীরা নদীবহুল ও সমুদ্রতীরস্থ বঙ্গদেশে এ বিষয়ে শীঘ্রই উন্নতি লাভ করিবে। অর্থ উপার্জ্জিত হইলে জ্ঞান উপার্জ্জনের অনেক সুবিধা হইবে। কিন্তু ইংরাজদের কিছু অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছে; অর্থ জ্ঞানের সহায়তা করে বটে, কিন্তু অতিরিক্ত হইলেই আবার জ্ঞানের শত্রুতাচরণ করে; বিলাস মনকে এমন নিস্তেজ করিয়া ফেলে যে জ্ঞানের শ্রমসাধ্য আলোচনায় অক্ষম হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডে বিলাস-স্রোত যেরূপ অপ্রতিহত প্রভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ইংলণ্ডের সভ্যতা যে শীঘ্র ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি। বিলাসের শীতল ছায়ায় লালিত পালিত হইয়া এখন সেখানে কেহ যুদ্ধ প্রভৃতি গোলযোগে প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছে না। ক্রমেই তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িবে। আমাদের দেশে অর্থ অধিক উপার্জ্জিত হইলে বিলাস-বৃদ্ধির অধিকতর সম্ভাবনা, কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। উত্থান-পতন-শীল কালের তরঙ্গে কত কি গঠিত হইবে ও কত কি বিপর্য্যস্ত হইয়া যাইবে, তাহা নিঃসংশয়ে স্থির করা সাধ্যাতীত। ভবিষ্যতের অন্ধকারময় পথে কি কি ঘটনা আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে তাহা দেখা অতিশয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কর্ম্ম। কিন্তু এখনকারমত আমাদের অর্থ নহিলে চলিতেছে না, এবং শীঘ্রই যে অর্থ উপার্জিত হইবে তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি।

এক হিসাবে আমাদের অভাব অত্যন্ত উপকারী। অভাব না থাকিলে দেশের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হয় না, এবং একটি প্রদেশের ক্ষুদ্র সীমায় জ্ঞানও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। বাণিজ্য দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশ হইতে জ্ঞানও আহৃত হয়। এইরূপে নানা দেশের ধন লইয়া দেশ ধনশালী হয় এবং নানা জাতির জ্ঞান লইয়া জাতিও জ্ঞানশালী হয়। এই জন্য বলিতেছি যে, দারিদ্র্য প্রবল ও গবর্ণমেণ্ট অনুদার হইয়া আমাদের দেশের মূলে অনিষ্ট হইতেছে না, বরং তাহা দূরবর্ত্তী মঙ্গলকে আহ্বান করিতেছে।

এক্ষণে একটি কথা উঠিতে পারে যে, নানা বাহ্য কারণে ও জল বায়ুর প্রভাবে বাঙ্গালীদের এরূপ স্বভাব হইয়া গিয়াছে যে, বরং তাহারা না খাইয়া মরিবে, তথাপি পরিশ্রম করিয়া তাহা নিরাকরণ করিবে না, তবে অভাবে তাহাদের কি উপকার হইবে? কিন্তু বিদ্যা যতই প্রচার হইবে, ততই সে সকল বাধা দূর হইবে। কর্ত্তব্য-জ্ঞানে মনের এমন বল জন্মে যে, বাহিরের অনেক বাধা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। এখন দেখা যাইতেছে যে, শিক্ষিতদের মধ্যে অনেকের বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে বাণিজ্য বহুল রূপে প্রচারিত হইলে জন-সাধারণ শীঘ্রই তাঁহাদের অনুগামী হইবে।

আমাদের উন্নতির দ্বিতীয় বাধা জল বায়ু। ভাবিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, আমাদের দেশের জল বায়ু কিছু এত মন্দ নহে যে, তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার কোন উপায় নাই। আমাদের দেশে পরিশ্রম করিলেই বল সঞ্চয় করিতে পারা যায়। পল্লীগ্রামের শ্রমশীল কৃষকেরা ত দুর্ব্বল নহে। আমাদের মনে উদ্যম জ্বলিয়া উঠিয়াছে, কেবল দুর্ব্বল শরীর তাহার বাধা দিতেছে; কিন্তু এদেশীয় কৃষকদের ন্যায় যদি বল লাভ করা যায় তাহা হইলে আমাদের শরীর আমাদের মনকে সাহায্য করিবে। কর্ত্তব্য জ্ঞান ও শিক্ষা-বলে বলীয়ান হইয়া শ্রমসাধ্য বিষয়ের প্রতি আমাদের অরুচি অন্তর্হিত হইবে। মন বৃদ্ধ হইয়া গেলেই শরীর বৃদ্ধ হয়, আমাদের দেশে অল্প-বয়সেই মহা বিজ্ঞ রকমের চাল চুল প্রকাশ পাইতে থাকে। যতদিন নাচিয়া হাসিয়া, ক্রীড়া করিয়া কাটাইয়া দেওয়া যায়, ততদিন মনে বার্দ্ধক্যের মরিচা পড়িতে পারে না। যাহা হউক আমাদের দেশের উন্নতির পক্ষে যে দুইটি বাধা বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা নষ্ট করিবার তেমনি দুইটি অমোঘ উপায় আছে,—ব্যবসায় ও ব্যায়াম।

স্বাস্থ্য।

যাহাতে রাত্রিতে মাতা ও সন্তান সুখে নিদ্রা যাইতে পারে, তাহার উপায় বিধান করা উভয়ের স্বাস্থ্যের জন্য নিতান্ত আবশ্যক। রাত্রিতে নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিলে উভয়েরই অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির যেরূপ নিয়মিত সময়ে আহার করিবার ইচ্ছা হয়, সন্তানেরও সেইরূপ হইয়া থাকে। যদি কেহ বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে রাত্রি দুই প্রহরের সময় প্রত্যহ আহার করেন এবং রাত্রিশেষে চা খান, তাহা হইলে কর্ম্মে ব্যাপৃত না থাকিলেও অভ্যাস বশতঃ সেই ব্যক্তির ঐ দুই সময়ে যথানিয়মে খাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আহারাদির পর শয়ন করিয়া সমস্ত রাত্রি নিদ্রায় অভিভূত থাকে ও পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করে, সে কখনই অধিক রাত্রিতে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া জাগিয়া উঠে না। অভ্যাসের নিয়মই এই। বিশেষতঃ প্রকৃতির নিয়মানুসারে সুস্থকায় ব্যক্তির নিদ্রাবস্থায় কখন ক্ষুধার উদ্রেক হয় না।

অধিক বয়স্কের প্রতি যখন প্রকৃতি এতদূর অনুকূল, তখন তিনি প্রসূতি ও সন্তানকে কেন নিগ্রহ করিবেন। কেনই বা তাহারা নিদ্রাসুখে বঞ্চিত হইবে। যদি বঞ্চিত হয়, সে বুঝিবার দোষে। অনেকে মনে করেন যে, দিবসের ন্যায় রাত্রিতে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সন্তানকে দুধ না খাওয়াইলে অনাহারে উহার মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। বস্তুত তাহা নহে। অভ্যাস করাইলে বালক রাত্রিতে দুই ঘণ্টা অন্তর কেন, প্রতি ঘণ্টায় জাগরিত হইয়া দুগ্ধের জন্য কাঁদিতে পারে। সেইরূপ প্রথম হইতে অভ্যাস করাইলে সেই বালকই রাত্রিতে একবারও না উঠিয়া সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে থাকে। আর যদি প্রথম দুই এক দিন কোন কারণ বশত কাঁদিয়া উঠে এবং তৃষ্ণাতুর হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত রূপ চিনি পানা দিবা মাত্র পুনরায় ঘুমাইয়া পড়ে। না দিলেও ক্ষণকাল কাঁদিয়া আবার নিস্তব্ধ হয়। এইরূপে ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে, যে সন্তান সমস্ত রাত্রি স্তনপান করিত, সেও ক্রমে ক্রমে দুগ্ধ না খাইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এরূপ অভ্যাস সহজে সম্পন্ন হয় না। কিন্তু যাহার ঐরূপ অভ্যাস হয় নাই তাহাকে অনায়াসেই সমস্ত রাত্রি রাখা যায়।

রাত্রিকালে স্তনপান-দোষে অনেক সন্তান অল্পকাল মধ্যে অসুস্থ বা রুগ্ন হইয়া পড়ে। রাত্রিতে স্তনপান কেবল অভ্যাসের ফল মাত্র। ইহা কখনই প্রকৃতি-নিয়মিত নহে। এতদ্দ্বারা প্রথমতঃ সন্তানের পেটের অসুখ হয়, ক্রমে সন্তান রুগ্ন ও শীর্ণ-কলেবর হইতে থাকে এবং পরিশেষে উহার জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়।

বালকেরা যেরূপ নিয়মিত সময়ে আহার করে, ক্রোড়স্থ শিশুসন্তানকেও সেইরূপ নিয়ম করিয়া যথাকালে ও মাত্রায় আহার দেওয়া উচিত। বালকেরা অসময়ে বা কোন জিনিস দেখিবামাত্র খাইতে চাহিলে তাহা দেওয়া বিশেষ অনিষ্টকর।

নিয়মিত সময়ে স্তনপান করাইলে বালক নিঃশেষে স্তনের দুগ্ধ পান করিতে পারে। এদেশে আর একটি কুপ্রথা এই যে সন্তান কাঁদিলেই মাতা তাহাকে স্তনপান করান। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে অনেক সময়ে সন্তান অন্য কারণেও কাঁদিয়া থাকে। অতএব স্তনপান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত এই নিয়মটি প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ইহা সকলের পক্ষে উপযুক্ত না হইলেও হইতে পারে কিন্তু চেষ্টা করিলে অনেকেই তদনুসারে চলিতে পারেন।

রাত্রি ৯॥। ১০ টার সময় সন্তান স্তন্য পান করিলে পর জননী শিশুটিকে লইয়া শয়ন করিবেন ও একবারে ৫ টার সময় উঠিয়া তাহাকে স্তন দিবেন। ইতিমধ্যে সন্তান কাঁদিয়া উঠিলে তাহার গাত্র-বস্ত্র বা পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। অথবা যদি উহার ওষ্ঠদ্বয় শুষ্ক দেখেন, তবে এক ঝিনুক শীতল জল দিলেই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু কখন যেন উহার মুখে স্তন না দেন। পাঁচটা বাজিলেই সন্তানকে স্তন পান করাইবেন। তাহার পর বেলা নয়টার সময় ছেলেকে পুনরায় স্তন দিতে হইবে। নটার পর হইতে চারি ঘণ্টা অন্তর এক একবার স্তন্যপান করাইলেই সন্তানের ক্ষুধা শান্তি হইতে পারে।

৩। যে প্রসূতির শরীর সুস্থ ও সবল তাহারই পুত্রকে স্তনপান করাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত। মাতার এই ভার পরের হস্তে সমর্পণ করা অতি নিষ্ঠুরের কাজ। নিতান্ত প্রয়োজন হইলেই মাতাকে এইরূপ অস্বাভাবিক উপায় অবলম্বন করিতে হয়। ইংরাজদের সম্ভ্রান্ত লোকের পুবস্ত্রী সকল সন্তানকে স্তন দেওয়া নীচ কার্য্য বলিয়া মনে করেন। লিপসিকের একজন সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার বলেন যে জননী মাত্রেরই স্বহস্তে সন্তান-প্রতিপালন-ভার গ্রহণ করা উচিত। ইহাতে গৌরব ভিন্ন অপমানের বিষয় কিছুই নাই। যে মাতা সৌন্দর্য্য ও যৌবন-সুলভ কমনীয়তার হানি হইবে মনে করিয়া সন্তানকে স্তন দিতে বিরত হন, তাঁহারাই অচিরে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ঐ সকল বিষয়ে বঞ্চিত হন। বস্তুত প্রসবের পর মাতৃস্তনে দুগ্ধ সঞ্চার হওয়া প্রকৃতি-নিয়মিত কার্য্য। সচরাচর এই দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণেই মাতৃস্তনে পাওয়া যায়। এসময়ে উহা সন্তানকে না দিয়া যদি ঔষধ বা অন্য কোন অস্বাভাবিক উপায়ে বন্ধ করা হয়, তাহা হইলে মাতার সমূহ অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা। এমন কি ইহাতে রক্তস্রাব প্রদর-রোগ শিরঃপীড়া জ্বর পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব প্রসূতি মাত্রেরই এবিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত। এবং যাহাতে ছয় মাস পর্য্যন্ত দুগ্ধ নিঃসরণ হইতে পারে তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় ও স্তন পর্য্যায়ক্রমে

মদন ভস্ম।

সময় লঙ্ঘন করি নায়ক তপন
উত্তর অয়ন যবে করিল আশ্রয়,
দক্ষিণের দিক-বালা প্রাণের হুতাশে
অধীর হইয়া উঠি ফেলিল নিঃশ্বাস।
নূপুর-শিঞ্জন-সহ সুন্দরী-কুলের
চারু পদ-পরশের বিলম্ব না সহি,
অশোকের কাঁধ হৈতে সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া
ফুটিয়া-উঠিল ফুল পল্লব সহিতে।
কচি কচি নবীন পল্লব উদগমে
সমাপ্তি লভিল যেই নব-চূত-বান,
বসাইল অলিবৃন্দ বসন্ত অমনি
কুসুম-ধনুর যেন নামাক্ষর গুলি।
কর্ণিকার-ফুলের এমন বর্ণ শোভা,
সৌরভ নাহি রে তার, বড় প্রাণে বাজে!
একাধারে সব গুণ বর্ত্তিবে যে কভু
বিধাতার প্রবৃত্তি বড়ই তাহে বাম।
মর্ম্মর শবদে যথা জীর্ণ পর্ণ ঝরে—
হেন বনে মদ-ভরে উদ্ধত হইয়া
বায়ুর প্রত্যভিমুখে চরে মৃগ কুল,—
পিয়াল-মঞ্জরী-হ'তে উড়ি' আসি রেণু
করিতেছে তা'-সবার নয়ন আকুল।
উদ্যত-কুসুম-ধনু সঙ্গে লয়ে রতি
সেই ঠাঁই যখন হইলা উপনীত,
জীব-জন্তু সবাকার মরমে মরমে
কি যে রস সঞ্চারিল, অন্তরের ভাব
বাহিরিতে লাগিল সবার সব কাজে।
ভ্রমরীর পিছে পিছে উড়িয়া ভ্রমর
একই কুসুম-পাত্রে মধু কৈল পান;
কৃষ্ণসার-মৃগবর মৃগীর শরীরে
শৃঙ্গ বুলাইছে কিবা, পরশের সুখে
মুদিয়া আসিছে আঁখি কুরঙ্গিনীটির।
রসাবেশে করিণী হইয়া গদ-গদ
গণ্ডূষ করিয়া লয়ে পদ্মগন্ধী জল
পিয়াইয়া দিল তাহা প্রিয় মাতঙ্গেরে।
থামে যেই কিন্নরী করিয়া গীত গান,—
যখন মুখ-মণ্ডলে পত্রলেখা-ছাপ
উঠিয়া গিয়াছে কিছু শ্রম-জল লাগি,
ঘুরিছে আঁখি যখন পুষ্প মদ ভরে,—
সেই অবসরটিতে রসিয়া কিন্নর
প্রেয়সীর বিধুমুখ চুম্বে ঘন ঘন।
লতা-বধূ যতেক কানন-বন-ময়—
কুসুম-স্তবক-ভার স্তন যাহাদের,
নব কিশলয় আর ওষ্ঠ মনোহর,
বাঁধিল তাহারা সবে গাঢ় আলিঙ্গনে
তরু-শাখা-সবাকারে নম্র ফুল-ভরে।
দিব্য শুনা যাইতেছে অপ্সরীর গান
তবুও শঙ্কর-দেব ধ্যান-পরায়ণ,
আপনি আপন-প্রভু যে মহাপুরুষ,
কোন বিঘ্ন কভু তাঁরে নারে টলাইতে।
লতা-গৃহ-দ্বারে নন্দী করি আগমন
বাম করতলে এক হেম-বেত্র ধরি
অধরে অঙ্গুলি দিয়া করিল সঙ্কেত।
নিষ্কম্প অমনি বৃক্ষ, নিভৃত ভ্রমর,
মূক হ'ল বিহঙ্গম, শান্ত মৃগ-কুল,
সমস্ত কাননময় তাহারি শাসনে
ছবি-সম যে যেমন তেমনি রহিল।
আসন্ন মরণ নাকি মদনের, তাই
দেবদারু-বেদীতে শার্দ্দূল-চর্ম্মাসনে
নিরখিল আসীন সংযমী মহাদেবে।
পূর্ব্বকায় ঋজু-স্থির, স্কন্ধ দুই নত,
কর-দুটি শোভিতেছে ঊর্দ্ধ-মুখ-তল,

প্রফুল্ল পঙ্কজ যেন অঙ্কের মাঝারে।
জড়ানো জটাকলাপে ভুজগ-বন্ধন,
দুই ফের করি, আর কানে অক্ষমালা,
গ্রন্থিযুত কৃষ্ণাজিন আছেন যা' পরি
হয়েছে বিশেষ নীল কণ্ঠের প্রভায়।
চক্ষে নাহি পলক, স্তিমিত উগ্র তারা
কিঞ্চিত কেবল পাইতেছে পরকাশ,
ভুরু-দ্বয়ে বিকারের প্রসঙ্গটি নাই,
নাসিকার অগ্রভাগে লক্ষ্য আছে পড়ি।
জল-পূর্ণ জলদ বৃষ্টির নাহি নাম,
অকূল অগাধসিন্ধু তরঙ্গটি নাই,
নিবাত-নিষ্কম্প-শিখা প্রদীপ যেমন,
এমনি হইয়াছেন প্রাণ-বায়ু-রোধে।
জ্যোতির অঙ্কুর যাহা ব্রহ্মরন্ধ্র হ'তে
উঠিয়াছে, পথ পেয়ে মধ্যের আঁখিতে—
মৃণালের সূত্র হ'তে সুকুমারতর
নব শশধর-শ্রীকে করিছে মলিন।
ইন্দ্রিয় হইতে মন ফিরাইয়া আনি
হৃদয়ে স্থাপন করি সমাধির বশে,
যে অক্ষর পুরুষে ক্ষেত্রজ্ঞ জন জানে,
আত্মাতে সেই আত্মারে দেখিছেন তিনি।
মনেরো অধৃষ্য যিনি, অদূরে তাঁহারে
নিরখি অমন ধারা ধ্যানে নিমগন,
এমনি জড় আড়ষ্ট হইল মদন
হাত হৈতে পড়ি গেল ধনুর্ব্বাণ খসি,
কখন যে পড়িল তা নারিল জানিতে।
বীর্য্য নিভ' নিভ' প্রায় এই যে তাহার
উস্কাইয়া তুলি তাহা রূপের ছটায়,
পর্ব্বত-রাজ-দুহিতা দেখা দিল আসি,
পাছু পাছু দুই বন-দেবতা সুন্দরী।
পদ্মরাগ মণি জিনি অশোক-কুসুম,
কাড়িয়াছে হেমদ্যুতি কর্ণিকার-ফুল,
হইয়াছে সিন্ধুবার মুকুতা-কলাপ,
বসন্ত কুসুম যত অঙ্গ-আভরণ।
স্তনভারে নতকায় কিঞ্চিত অমনি,
তরুণ অরুণ রাগ বসনে আবার,
কুসুম-স্তবক-ভরে নম্র আহা মরি
সঞ্চারিণী পল্লবিনী যেন গো লতাটি।
খসি খসি পড়িতেছে বকুল মেখলা,
পুনঃ পুনঃ রাখিছেন আটক করিয়া।
ভ্রমর তৃষিত হয়ে নিশ্বাস সৌরভে
বিম্ব অধরের কাছে বেড়ায় ঘুরিয়া,
চঞ্চল-নয়ন-পাতে উমা প্রতিক্ষণ
লীলা শতদল নাড়ি দিতেছেন তাড়া।
যাঁর রূপ রাশি হেরি রতি লজ্জা পায়
অকলঙ্ক সে উমারে নিরখি মদন,
জিতেন্দ্রিয় শূলি-প্রতি স্বকাজ সাধিতে
পুনরায় বক্ষে নিজ বাঁধিল সাহস।
এমন সময়ে উমা ভবিষ্যৎ-পতি
মহেশের দুয়ারে হইলা উপনীত,
তিনিও পরম জ্যোতি পরমাত্ম রূপ
নিরখি অন্তরে ক্ষান্ত হইলেন যোগে।
ক্রমে ক্রমে প্রাণ বায়ু করিয়া মোচন
যোগাসন শিথিল করিতেছেন হর,
ওদিকে ভুজঙ্গ-অধিপতির মস্তকে
কষ্টকর ঠেকিতেছে ধরণীর ভার।
নন্দী তাঁর পদতলে প্রণিপাত করি
নিবেদিল, "এসেছেন শুশ্রূষার তরে
শৈলসুতা," মহেশের ভ্রূক্ষেপ হ'তেই
প্রবেশের অনুমতি হইল বুঝিয়া
নন্দী গিরি নন্দিনীরে পশাইল তথি।
সখী দুটি মহাদেবে করিয়া প্রণাম

উমার স্বহস্তে-তোলা পল্লবে-জড়িত
হিম-সিক্ত ফুল গুলি অর্পিল চরণে।
উমাও যেমন তাঁরে করিলা প্রণাম,
সুনীল অলক-শোভী নব কর্ণিকার
খসিয়া অবনী-তলে পড়িল অমনি।
অনন্য-ভাজন পতি লাভ কর বলি
আশীষিলা মহাদেব,—যথার্থ আশীষ,
উচ্চরিত হয় যবে ঈশ্বরের বাণী
কভু বিপরীত অর্থ না হয় ঘটনা।
বহ্নি-মুখ-কামী কাম, পতঙ্গ যেমতি,
অবসর ঠাহরিয়া বাণ সন্ধানের
মুহূর্ত্তেক আকর্ষিল শরাসন-গুণ।
পার্ব্বতী এ হেনকালে তাম্র-রুচি করে
লয়ে গেলা মন্দাকিনী-পদ্মবাজ মালা
ভানুর কিরণে শুষ্ক, শিবেরে সঁপিতে।
ভকত-বাৎসল্য-হেতু যেমন শঙ্কর
লইবেন আদরে পুষ্কর-বাজ-মালা,
অমান অব্যর্থ বাণ, নাম সম্মোহন,
শরাসনে যুড়িল কুসুম-শরাসন।
চন্দ্রোদয়-আরম্ভে যেমন অম্বুরাশি,
এক রতি অধীর হইল তাঁর মন,
বিম্বাধর-শোভিত উমার মুখপানে
ত্রিনয়ন নিবেশিলা শম্ভু একেবারে।
উমাও মনের ভাব নারিলা ঢাকিতে—
অঙ্গ যেন বিকসিত কদম্ব কুসুম,
লজ্জায় বিভ্রান্ত আঁখি সামালিতে নারি
আড় ভাবে রাখিলেন চারু মুখ-খানি।
মহাবশী মহাদেব, অন্য কেহ নয়!
মুহূর্ত্তে ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ নিগ্রহ করিয়া
বিকৃতির কারণ কি জানিবার তরে
করিলা নয়ন-পাত দিগ্ দিগন্তরে।
মদনেরে দেখিলেন, দক্ষিণ অপাঙ্গে
মুষ্টি রহিয়াছে লগ্ন, ধনুর্গুণ-ধারী,
বাম পদ কুঞ্চিত, কাঁধের দিক নত,
চক্রাকার করিয়া সুন্দর ধনু খানি
টানিয়াছে গুণ, মারে আর কি সে বাণ।
বাড়িল শিবের ক্রোধ তপস্যার ভঙ্গে,
এমনি ভ্রূভঙ্গ যে তাকায় মুখ পানে
সাধ্য নাই কাহারো, তৃতীয় নেত্র হ'তে
স্ফুরন্ত-উদর্চি-বহ্নি ছুটিল সহসা।
"ক্রোধ প্রভু সংহর সংহর" এই বাণী
দেবতা-সবার হোথা চরিছে বাতাসে,
হেতায় সে হুতাশন ভবনেত্র-জাত
করিল মদন তনু ভস্ম-অবশেষ।

কুমারসম্ভব।

সঙ্গীত।

কেমন সুন্দর আহা ঘুমায়ে রয়েছে
চাঁদের জোছনা এই সমুদ্র বেলায়!
এ'স প্রিয়ে এই খানে বসি কিছুকাল;
গীতস্বর মৃদু মৃদু পশুক্ শ্রবণে!
সুকুমার নিস্তব্ধতা আর নিশীথিনী—
সাজে ভাল মর্ম্ম-ছোঁয়া সুধা-সঙ্গীতেরে।
বইস জেসিকা, দেখ, গগন প্রাঙ্গন
জলৎ কাঞ্চন-পাতে খচিত কেমন!
এমন একটি নাই তারকা-মণ্ডল
দিব্য গীত যে না গায় প্রতি পদক্ষেপে!
অমর আত্মাতে হয় এমনি সঙ্গীত।
কিন্তু ধূলিময় এই মর্ত্ত্য-আবরণ
যত দিন রাখে তারে আচ্ছন্ন করিয়া
ততদিন সে সঙ্গীত পাই না শুনিতে।

সেক্স্পিয়র।

ছিটওয়ালা

সিবিলিয়ান সাহেব।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, হুস্‌টন (Houston) সাহেব নামক এক জন সিবিলিয়ান ছিলেন। ইনি উচ্চ কুলোদ্ভব ও এক জন বিখ্যাত গবর্ণর জেনেরেলের স্বসম্পর্কীয়। ইনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। ইনি বাঙ্গালা, হিন্দি, পারসী আরবী এই সকল ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন এবং এদেশের রীতি নীতি বিশেষ রূপে অবগত ছিলেন। ইনি কার্য্যেও পারদর্শী ছিলেন, কিন্তু ইহাঁর ছিট্ ছিল। সে ছিট্ ছিট্-মান যন্ত্রের ঠিক উনপঞ্চাশ সংখ্যা পর্য্যন্ত না পেঁছুক, তাহার কাছাকাছি বটে।

যখন তিনি মেদিনীপুর জিলায় স্পেশল কালেক্টর পদে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি ঐ জেলার এক জন চাষা জমীদারকে একবার একটী পরোয়ানা লিখেন। তখনকার রীত্যনুসারে ঐ পরোয়ানা পারসী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। সে পরোয়ানার প্রথমে এই পাঠ ছিল। "ঈশপনুহা লাঙ্গল দস্তগা বাদো বয়েল বআফিয়ৎ বাশন্দ" "হে হলযন্ত্র ফলকপ্রতিপালক! হে হলযন্ত্রধারী! দুইটী বলীবর্দ্ধ লইয়া তুমি কুশলে থাক।" একদা ঐ জিলায় জমীদারী নিলামের দিন একটি তালুক লইয়া দুই জন জমীদারের প্রতিনিধি দুই মোক্তারের মধ্যে বিলক্ষণ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল। তন্মধ্যে এক জন মোক্তারের নাম তুলসী, অপরের নাম দামোদর। তুলসীর চেষ্টা তালুকটি আপনার প্রভুর জন্য ক্রয় করে। দামোদরের চেষ্টা তাহার প্রভুর জন্য ক্রয় করে। দুই জনে নিলামের ডাক ডাকিতে ডাকিতে তুলসী কিছু ঘাটিয়া গেল। তখন হুষ্টন সাহেব তাহাকে বলিলেন, "তুলসী! তোম কিসওয়াস্তে ঘট্ যাতে হো, দামোদর কা উপর চড়্ বইঠো।" হুষ্টন সাহেব অবগত ছিলেন যে আমরা শালগ্রামের উপরে তুলসী দিই। এই রীতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

হুষ্টন সাহেব ভারতবর্ষকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়াছিলেন, কালীকা বিলাত, শিওকা বিলাত, জগন্নাথ কি বিলাত। বিলাত শব্দে পারসীতে দেশ বুঝায়। কালীঘাটের কালী বঙ্গদেশের প্রধান দেবতা, এই জন্য বঙ্গদেশকে তিনি কালীকা বিলাত বলিয়া ডাকিতেন। কাশীর বিশ্বেশ্বর উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান দেবতা, এই জন্য উত্তর পশ্চিমাঞ্চলকে তিনি শিওকা বিলাত বলিয়া ডাকিতেন। জগন্নাথ উড়িষ্যার প্রধান দেবতা, এই জন্য উড়িষ্যা প্রদেশকে তিনি জগন্নাথের বিলাত বলিয়া ডাকিতেন।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণস্থিত অনার্য্য দেশ বলিয়া বোধ হয় তিনি তাহা ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।

তিনি ব্রাহ্মণকে অত্যন্ত মান্য করিতেন, আবার ব্রাহ্মণের মধ্যে কুলীনকে সর্ব্বাপেক্ষা মান্য করিতেন। তিনি প্রত্যেক উমেদারের কুলপরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেন। যদি কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া, বিশেষতঃ চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, মুকুয্যে অথবা গাঙ্গুলী বলিয়া পরিচয় দিত, তাহা হইলে তাহার শীঘ্র কর্ম্ম হইবার সম্ভাবনা। নিকৃষ্ট জাতি হইলে তাহাকে ছয় বৎসর ধরিয়া ঘোল খাইতে হইত।

যখন তিনি মেদিনীপুর জিলায় নিযুক্ত ছিলেন তখন এক জন সুবর্ণবণিক তাঁহার সেরিস্তাদার ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাব উপরওয়ালা যে কমিসনার সাহেব ছিলেন, তিনি বিলাতের এক ধোপার ছেলে। সেরিস্তাদারের সহিত হুষ্টন সাহেবের সর্ব্বদা টক্ ঝক্ হইত, কিন্তু সে ব্যক্তি কমিসনর সাহেবের প্রিয় পাত্র বলিয়া তাহার কিছু করিতে পারিতেন না। এক দিন তিনি সেরিস্তাদারের উপর কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন "তোমারা পানি কোই ছোঁতা নেই, তোমারা মনিব কা পাণিভি কোই ছোঁতা নেই।"

যখন তিনি কৃষ্ণনগর জেলায় বদলী হইলেন, তখন সেখানে গিয়া প্রথম কর্ম্মের চার্জ্জ্ লইবার সময় প্রত্যেক আমলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমলাদিগের মধ্যে বেচারা সেরিস্তাদার চট্টগ্রামবাসী বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে হুষ্টন সাহেব বলিলেন, "হ্বিয়া কাঁহাসে একঠো মগ্ আয়ারে।" চট্টগ্রাম জেলা ব্রহ্মরাজ্যের সন্নিকট প্রযুক্ত তাহার দক্ষিণ ভাগে অনেক গুলি মগের নিবাস আছে এই জন্য হুষ্টন সাহেব সিরাস্তাদারকে মগ্ বলিয়াছিলেন।

উক্ত জিলায় কর্ম্ম করিবার সময় তিনি একবার একটী মোক্তারের প্রতি কুপিত হইয়া তাঁহার নিকটস্থ রূলে হাত দিয়াছিলেন। মোক্তারকে মারিবার ইচ্ছা ছিল না, কেবল ভয় দেখাইবার জন্য ঐ প্রকার করিয়াছিলেন, কিন্তু একবার মাত্র তাঁহার সেই রূল স্পর্শের ফল অতিশয় ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল। মোক্তার মনে করিল সাহেব বুঝি তাঁহাকে মারিতে যাইতেছেন সেই জন্য সে পলাইল। সে যদি পলাইল আমলারাও পলাইল। মোক্তার আমলারা যদি পলাইল তবে কাছারীর বাহিরে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে উপবিষ্ট মকদ্দমাকারী ব্যক্তিগণও পলাইল। নগরের লোক দেখিল দুই তিন শত লোক কেবল ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইতেছে। কি খবর, না, সাহেব খেপিয়াছেন।

একজন ব্রাহ্মণ-পুত্র হুষ্টন সাহেবের অতিশয় প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহাকে তাঁহার বাল্যকালে প্রতিপালন করিয়া শেষে একটি কর্ম্ম করিয়া দেন। সে ব্যক্তি পরে ক্রমে ডেপুটি কলেক্টর পদ প্রাপ্ত হন। সাহেব যখন হুগলীতে বদলী হইলেন তখন সেই ব্যক্তি হুগলী জিলায় ঐ কর্ম্ম করিতেছিলেন। হুষ্টন সাহেব তথাকার কালেক্টর হওয়াতে তিনি তাঁহার অধীনস্থ হইলেন। সাহেব একদিন তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া চাপরাসীকে তাঁহার কান ধরিয়া ঘোড়

দৌড় করাইতে হুকুম দিলেন এবং সেই হুকুম অনুসারে কার্য্যও হইল। হুষ্টন সাহেব এতদ্দেশে থাকিয়া প্রায় এতদ্দেশীয় লোক হইয়া গিয়াছিলেন। যখন ঐ হুকুম দিয়াছিলেন তখন সে ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারী ইহা বিস্মৃত হইয়া ছিলেন; এবং এতদ্দেশীয় লোকে বাটীর চির প্রতিপালিত অন্নদাসের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে সেইরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনিবেন কেন? তাঁহারা তাঁহাকে অস্বাস্থ্যকর চট্টগ্রাম জেলায় বদলী করিয়া দিলেন, সেই থানেই তিনি মানব লীলা সম্বরণ করেন। বঃ—

প্রাপ্ত গ্রন্থ।

ঐতিহাসিক রহস্য; প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় সংস্করণ। শ্রীরামদাস সেন প্রণীত, রায় যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ রামদাস বাবুর এই পুস্তকের গুণ গরিমা কীর্ত্তন করা বাহুল্য। পুরাতত্ব-প্রিয় পাঠকগণের নিকট রামদাস বাবু বিশেষ রূপে পরিচিত আছেন।

ভারত উদ্ধার—(অথবা চারি আনা মাত্র) রামদাস শর্ম্ম বিরচিত। এই হাস্য-রস উদ্দীপক "মহা কাব্য" খানি পাঠ করিতে করিতে আমরা গ্রন্থকর্ত্তাকে শত শত সাধুবাদ দিয়াছি। বাস্তবিক এরূপ সরস গ্রন্থ আমরা অনেক দিন পাঠ করি নাই এবং বোধ হয় এরূপ বিদ্রূপাত্মক কাব্য (satire) বঙ্গভাষায় আর নাই। ভারতের স্বাধীনতা-প্রিয় বঙ্গ-যুবক কর্ত্তৃক কি রূপে "পাবণ্ড-ইংরাজ" "বঁটাম্বিত" নিরস্ত্র ও পরাস্ত হইবে তাহাই গ্রন্থকার ভবিষ্যদ্বক্তা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

মহাপ্রস্থান। শ্রীপ্রকাশনাথ মল্লিক প্রণীত। সুবর্দ্ধন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। ইহা এক খানি নভেলী আড়ম্বরে আষাঢ়ে গল্প। গ্রন্থকার এক স্থলে ঘোর অন্ধকারের বর্ণনা করিতে গিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন—"অন্ধকার অনেক দেখিয়াছি; বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার অন্ধকার দেখিয়াছি, আমাদের বাটীর একটি অসূর্য্য-স্পর্শা পুরাতন ঘরের অন্ধকার দেখিয়াছি; শত সহস্র বার চক্ষুর কবাট বন্ধ করিয়া অন্ধকার দেখিয়াছি, কিন্তু এ অন্ধকার সে রূপ নয়।"

ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী। কাব্য। শ্রীপ্রসন্নকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক প্রণীত। ভবানীপুর সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য এক

আনা। পাঠকদের বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া এবং বাহুল্য সমালোচনা না করিয়া এই কাব্য হইতে কলিকাতার আক্ষেপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম।

"অভিমান ভরে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে
কহে কলিকাতা সজল আঁখি—
'যাও দিল্লী পানে, লিটন যেথানে
যাও আমেদের চাতক পাখী!

* * * *

কিসের বিভব দেখিলে আমার?
আমি কাঙালিনী বিভব কই?
ভারত সাম্রাজ্যে দিল্লী পাটেশ্বরী;
না হোলে আজিএ যাতনা সই?

* * * *

বিলাতী ব্রোহাম, বিলাতী ফিটন
বগী দ্রুত গামী, আফিষ যান
চলেছে ঘর্ঘর, কাল শিরা পাড়ি
বুকেতে আমার,—যায় যে প্রাণ!
ওয়াটস্‌, প্যাক্স্‌টন, মণ্টিথ হার্পার,
কইস প্রভৃতি হাঁপায়ে দেয়
পাদুকার ভারে সদাই আমারে;
আমা হোতে কেহ আছে কি হেয়?
বাথ্‌গেট, স্মিথ, টমসন, কর্ফিল্ড্‌
ডন্‌লপ, বেরিনি, সেত্রিল আদি
বুকেতে আমার বিষের ভাণ্ডার
রেখেছে সাজায়ে,—জ্বালায় কাঁদি।
ডাউলিং, মর্ডক,—কুলীন সন্তান—
বুকের উপর করিছে বাস!!
অভাগিনী আমি, বেঁচে আছি তাই;—
গলায় জোড়ে না দড়ির ফাঁস!"

কবিতা মঞ্জরী। শ্রীভগবানচন্দ্র সেন। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দেড় আনা। প্রভাত বর্ণনা হইতে এক স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"ওই পাখীগণ, ডাকে শুন ঘন,
আর অন্ধকার নাই।
পানী-কাক জলে, খেলে কুতূহলে
পেঁচার চেঁচানি নাই॥
কাক বুল বুল, আর দধি কুল,
নাচিছে ডাকিছে সব।
ঘরে গাভীগণ, করিতেছে ঘন—
দুগ্ধ ভরে হম্বারব॥"

এরূপ আরও অনেক উদ্ধৃত করিবার আছে।

নবপাঠ। সংযুক্ত বর্ণ-শিক্ষা। শ্রীরাম কানাই দত্ত প্রণীত। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত। মূল্য দেড় আনা মাত্র। গ্রন্থকার বালকদিগকে সহজে যুক্তাক্ষর শিক্ষা দিবার জন্য কতকগুলি শ্লোক রচনা করিয়াছেন। ট-য়ের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"কূপ-মৎস্য পড়ে যদি জলধির জলে
চট্টার চট্টার করে মিছা কৌতূহলে॥"

ড়া-য়ের শ্লোকটি এইরূপ।—

'এড়াইলে জাড্য দোষ করিয়া যতন,
দৌড়াইবে গাড়ি ঘোড়া মনের মতন॥'

—

ভানুসিংহের কবিতা।



ভৈরবী।

হম সখি দারিদ নারী!
জনম অবধি হম, পীরিতি করনু
মোচনু লোচন-বারি॥ ধ্রু॥
রূপ নাহি মম, কছুই নাহি গুণ
দুখিনী আহির জাতি,
নাহি জানি কছু, বিলাস ভঙ্গিম,
যৌবন গরবে মাতি॥
অবলা রমণী, ক্ষুদ্র হৃদয় ভরি
পীরিত করনে জানি।
এক নিমিখ পল, নিরখি শ্যাম জনি
সোই বহুত করি মানি॥
কুঞ্জ পথে যব, নিরখি সজনি হম,
শ্যামক চরণক চীনা।
শত শত বার ধূলি চুম্বি সখি,
রতন পাই জনু দীনা॥
নিঠুর বিধাতা, এ দুখ-জনমে
মাঙিব কি তুয়া পাশ?
জনম অভাগী, উপেখিতা হম,
বহুত নাহি করি আশ॥
দূর থাকি হম, রূপ হেরইব,
দূরে শুনইব বাঁশি।
দূর দূর রহি সুখে নিরীখিব,
শ্যামক মোহন হাসি॥
মানস ফলকে, আঁকনু যো সখি
শ্যামক রূপক রেহ।
না মুছিবে সখি, লোচন সলিলে
যব তক রাখব দেহ॥
শ্যাম-প্রেয়সি রাধা! সখিলো!
থাক' সুখে চিরদিন!
তুয়া সুখে হম রোয়ব না সখি
অভাগিনী গুণ হীন॥
আপন দুখে সখি, হম রোয়ব লো,
নিভৃতে মুছইব বারি!
কোহি ন জানব, কোন বিষাদে
তন-মন দহে হমারি॥
ভানু সিংহ ভনয়ে, শুন কালা
দুখিনী অবলা বালা—
উপেখার অতি তিখিনী বাণে
না দিহ না দিহ জ্বালা॥

কার্য্য করিবে, ইহাই প্রকৃতির উদ্দেশ্য। গর্ভাবস্থায় স্তনদ্বয়ে কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই থাকে না। তখন গর্ভাশয়ই সন্তানকে পোষণ করিতে থাকে। প্রসবের পর ঐ দুই অঙ্গের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, অর্থাৎ স্তনদ্বয় জরায়ুর ভার গ্রহণ করে। ইহার ব্যভিচারে সন্তান ও মাতা উভয়েরই অনিষ্ট হয়।

যঃ—

ভারতী-বন্দনা।

প্রথম কবি।—

আজিকে তোমার মানস সরসে
কি শোভা হয়েছে,—মা
অরুণ বরণ চরণ পরশে
কমল কানন, হরষে কেমন
ফুটিয়ে রয়েছে,—মা!
নীরবে চরণে উথলে সরসী,
নীরবে কমল, করে টল মল
নীরবে বহিছে বায়।
মিলি কত রাগ, মিলিয়ে রাগিণী,
আকাশ হইতে করে গীত-ধ্বনি,
শুনিয়ে সে গীত আকাশ-পাতাল
হোয়েছে অবশ প্রায়,
শুনিয়ে সে গীত, হোয়েছে মোহিত
শিলাময় হিমগিরি,
পাখীরা গিয়েছে গাইতে ভুলিয়া
সরসীর বুক উঠিছে ফুলিয়া
ক্রমশঃ ফুটিয়া ফুটিয়া উঠিছে
তান-লয় ধীরি ধীরি;
তুমি গো জননি, রয়েছ দাঁড়ায়ে
সে গীত-ধারার মাঝে,
বিমল জোছনা-ধারার মাঝারে
চাঁদটি যেমন সাজে।
দশ দিশে দিশে, ফুটিয়া পড়েছে
বিমল দেহের জ্যোতি,
মালতী ফুলের পরিমল সম
শীতল মৃদুল অতি।
আলুলিত চুলে কুসুমের মালা
সুকুমার করে মৃণালের বালা
লীলা শতদল ধরি,
ফুল-ছাঁচে ঢালা কোমল শরীরে
ফুলের ভূষণ পরি।
দশ দিশি দিশি, উঠে গীত ধ্বনি,
দশ দিশি ফুটে দেহের জ্যোতি
দশ দিশি ছুটে ফুল-পরিমল
মধুর মৃদুল শীতল অতি।
নব দিবাকর ম্লান সুধাকর
চাহিয়া মুখের পানে,
জলদ আসনে দেব বালাগণ
মোহিত বীণার তানে।

আজিকে তোমার মানস-সরসে
কি শোভা হোয়েছে-মা !—
রূপের ছটায় আকাশ পাতাল
পূরিয়া রয়েছে-মা !—
যেদিকে তোমার পড়েছে জননি,
সুহাস কমল-নয়ন দুটি
উঠেছে উজলি' সেদিক অমনি,
সেদিকে পাপিয়া, উঠিছে গাহিয়া
সেদিকে কুসুম উঠিছে ফুটি !
এস মা আজিকে ভারতে তোমার,
পূজিব তোমার চরণ দুটি !
বহুদিন পরে, ভারত অধরে
সুখময় হাসি উঠুক্ ফুটি !
আজি কবিদের মানসে মানসে
পড়ুক্ তোমার হাসি,
হৃদয়ে হৃদয়ে উঠুক্ ফুটিয়া
ভকতি-কমল-রাশি !
নমিয়া ভারতী-জননী চরণে
সঁপিয়া ভকতি-কুসুম-মালা,
দশ দিশি দিশি প্রতিধ্বনি তুলি
হুলুধ্বনি দিক্ দিকের বালা !
চরণ-কমলে অমল কমল
আঁচল ভরিয়া ঢালিয়া দিক্ !
শত শত হৃদে তব বীণাধ্বনি
জাগায়ে তুলুক শত প্রতিধ্বনি,
সে ধ্বনি শুনিয়া কবির হৃদয়ে
ফুটিয়া উঠিবে শতেক কুসুম
গাহিয়া উঠিবে শতেক পিক !

দ্বিতীয় কবি।—

কেনগো ভারতে আজি, আসিবে ভারতী দেবি
আছে কি এ শ্মশানের মাঝে ?
কোমল কমল রাজি, তোমার আসন মাতা
হেথায় কি তোমারে গো সাজে ?
কিদিয়ে আমরা আর, পূজিব চরণ তব,
কোথা পাব মানস-কমল,
বল গো কমলাসনা, কোথায় দাঁড়াবে তুমি
এ শ্মশানে নাই হেন স্থল !
আঁধার আকাশ দিয়া, উচ্ছ্বসিয়া যায় বায়ু
শিবাদল করিছে রোদন,
গগন জলদে অন্ধ, গুমরিয়া গুমরিয়া
থেকে থেকে করিছে গর্জ্জন।
ক্ষণেক আলেয়া আলো, ছলনা করিয়া আঁখি
পলকে মিশায় প্রকাশিয়া,
যেন রে রাক্ষস ঘোর, সর্ব্বগ্রাসী অন্ধকার
উঠিতেছে হাসিয়া হাসিয়া।
মাঝে মাঝে চিতানল, নীরবে নীরবে জ্বলি,
ভস্ম হোয়ে নিভিছে আবার,
আকাশেতে চন্দ্র নাই, সূর্য্য নাই তারা নাই,
চার দিকে—আঁধার—আঁধার !—
এ মহা-শ্মশান মাঝে, যদি গো বাজাও বীণা,
কি ভীষণ শুনাবে সে ধ্বনি !
ঘুম ভাঙ্গাইল বলি, গাঢ়নিদ্র অন্ধকার
ভ্রূকুটিয়া উঠিবে অমনি !
সে শব্দে চেতনা পেয়ে, নিদ্রোত্থিত রোগী সম,
চারি দিক কাঁদিয়া উঠিবে,
পেচকের, বাদুড়ের, শিবার অশিব ধ্বনি
একত্তরে চৌদিকে ছুটিবে।
বল দেখি বীণাপাণি, কমলবাসিনি ওগো
ডাকি হেথা তোমারে কি বলি,
থাক তুমি থাক সুখে, কোমল-কমল-বুকে
মানসের সরসী উজলি !
এক দিন ছিল দেবি, ভারতে আসিতে তুমি,

শত কবি উঠিত গাইয়া,
সহস্র ভারতবাসী করিত তোমার স্তব
সমস্বরে আকাশ ছাইয়া!
সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি, বেড়াইত খেলাইয়া
হিমাদ্রির গুহায় গুহায়,
ভারত সমুদ্র বক্ষে, সহস্র তরঙ্গ উঠি
মিশাইত কণ্ঠস্বর তায়।
বাল্মীকির বীণাধ্বনি, ব্যাসের ভেরী-নিনাদ
ঋষিদের আরণ্যক গান,
শুনিতে শুনিতে তুমি, ভারতের বক্ষে আসি
কেমন হইতে অধিষ্ঠান!
কালিদাস ভাব-মুগ্ধ, কুহকিনী বাঁশি লয়ে
বাজাতেন কি মোহন গীত,
তটিনী ধরিত তান, কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী গুলি
গাইত গো তাহার সহিত!
হা দেবি সে দিন নাই, কাজ কি আসিয়া তবে?
যে বন হোয়েছে শূন্য মরু—
সেখানে বসন্ত এলে, আর কি ডাকিবে পাখী
মুঞ্জরিবে শুষ্ক যত তরু?
তোমারে দেখিলে দেবি, সে দিনের যত কথা
একে একে জেগে উঠে মনে,
কি আঘাত লাগে প্রাণে, বুক যেন ফেটে যায়
মর্ম্মভেদী-স্মৃতির দংশনে?
থাক্ থাক্ ও সকল, মরমের কথা গুলি
মরমেই ঘুমাক্ নীরবে—
প্রতিধ্বনিও যেথা, সাড়া নাহি দেয় কভু
সে অরণ্যে কাঁদিয়া কি হবে?

তৃতীয় কবি।—

ওগো বীণাপাণি, কমলবাসিনি
দেখিছ না তুমি চেয়ে?
ভারতের মুখ, ঘোর বিষাদের
আঁধার ফেলেছে ছেয়ে।
কত আর বল কাঁদিবে অভাগী,
যাতনা সহিবে কত?
তোমারি সুহাসি কিরণে, ভারতি,
নাশ গো বিষাদ যত।
যদি বীণাপাণি ঢাল গো হেথায়
ও বীণার সুধারাশি,
এখনি ভারত মুছিবে নয়ন
এখনি উঠিবে হাসি!
মলিন শ্রীহীন, ভারত এখন,
সকলি গিয়েছে তার,
ধন মান যশ সুখ স্বাধীনতা
কি আছে বল গো আর!
লক্ষ্মী এক দিন ছিলেন ভারতে
ছাড়িয়া গেছেন তারে।
বল দেখি তবে ভারত এখন
কি লয়ে হাসিতে পারে?
তব আগমনে যদি গো ভারত
হাসে দিনেকের তরে
সেই টুকু সুখে করো না বঞ্চিত
কহি দেবি সকাতরে!
এস তবে আজি বীণা-পাণি দেবি
লও বীণা কোলে তুলি,
তোমার চরণ পরশে ভারত
যাক্ শোক তাপ ভুলি।
ও পদ পরশে মুছুক্ ভারত
নয়ন-সলিল রাশি।
দিনেকের তরে অভাগী ভারত
হাসুক্ সুখের হাসি।
আইস গো তবে ভারতী এবার,
আজি পুণ্য মাঘ মাসে,

কবিতা কমল তুলিয়াছি শুধু
তোমার পূজার আশে।

চতুর্থ কবি।—

এত হাসি কেন আজ, ভারতের গৃহে গৃহে
কি সুখ হোয়েছে আজ তার?
ভারতে সুখের রবি, আবার কি উঠিয়াছে?
ঘুচেছে কি কলঙ্ক আঁধার?
স্বাধীন বিহঙ্গ সম, ভারতে কবিরা আজ
এত কিগো গাইতেছে গান,
এত গো কিসের সুখে, উথলিয়া উঠিয়াছে
কবিদের বিষণ্ণ পরাণ?
এখনো ত ভারতের আকাশ জলদে-ভরা
এখনো ত ঘুচেনি আঁধার;
তবে কেন এত হর্ষ, হাসির উল্লাস ধ্বনি
ধ্বনিত করিছে কারাগার।
এ মহান্ আর্য্যদের সমাধি মন্দিরে বসি
কে গো আজ চায় হাসিবারে?
কাজ নাই কাজ নাই, যত কাল বেঁচে রব
পূজিব গো অশ্রু জল ধারে।
এখনি কি এ ভারত, কলঙ্কের এ শৃঙ্খল
অলঙ্কার করিয়াছে মনে?
দাসত্বের পদধূলি, আনত করিয়া মাথা
লইছে কি গৌরবের সনে?
কি ভ্রমে ভুলিয়া তবে আজি এ দুখের দিনে
এ ভারত হাসিবারে চায়?
মর্ম্মভেদী অশ্রুজলে কাঁদিয়া মরিব, তবু
হাসিবারে চাব না হেথায়!

পঞ্চম কবি।—

হা ভারতি দেবি, তোমারে দেখিয়া
ভারত আর কি হাসিবে?
তোমার মৃদুল হাসির কিরণে
এ আঁধার কিগো নাশিবে?
চাই না গো দেবি হাসিতে আমরা
এ দুখে হাসিব কেমনে?
কাঁদিবার তরে ডাকি গো তোমারে
এই ভারতের আসনে!
আঁধার ভারতে কত দিন মাতা
তোমার ও বীণা বাজেনি!
ভারতের আহা আঁধার হৃদয়ে
তোমার চরণ সাজেনি।
ভারতের ভালে নিভিল যে দিন
সোণার প্রদীপ খানি,
সেই দিন হোতে তোমার বীণাও
নীরব ভারতী রাণী!
সেই দিন হোতে ভারত কাননে
কুসুম রহে না ফুটিয়া,
সুরভিত হত আঁধার পৃথিবী
যাহার সুরভি লুটিয়া,
সেই দিন হোতে একটি পাখীও
বসিয়া ভারত কাননে
গায়না হরষে হৃদয়ের গান
তরুণ রবির কিরণে!
আর ত জননি পারি না সহিতে,
নীরবে নীরবে বিষাদ বহিতে,
হৃদয়ে লুকায়ে নয়ন সলিল
মুখেতে হাসিব কেমনে?
তোমার ও বীণা বাজাও জননি
ধ্বনিত করিয়া আকাশ ধরণী,
বিজন, নীরব, আঁধার ভারত
কাঁদিবে তোমার চরণে!
ভারতের অতি বিজন মরমে
যত দুখ আছে লিখা,

ভারত-হৃদয়ে জ্বলিছে যে এক
লুকানো অনল-শিখা,
তোমারে সকলি দেখাবে জননি
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়া,
মুছিবে দুখের নয়ন সলিল
তোমার আঁচল তুলিয়া।
তার হৃদয়ের বিষাদের গান
গাও তুমি ওগো জননি
স্বরগে উঠুক সে শোকের গাথা
ধ্বনিত করিয়া ধরণী!
চাই না জননি হাসিতে আমরা
হাসিবার কি বা আছে?
কাঁদিতেই চাই, তুমি না আইলে
কাঁদিব কাহার কাছে।
তাই বলি এস বীণা-পানি দেবি
ভারত-হৃদয়-কমলে,
দুখের নয়ন-সলিল বরষি
পূজিব তোমারে সকলে!
কি দিয়ে পূজিব তোমায় জননি
নাইক কমল দল
হৃদয় হইতে ঢালিব চরণে
দুখের নয়ন জল!
দেখিতে দেখিতে ওই, আলোকে আলোকে যেন
দশ দিক উঠিল উথলি।
সুনীল আকাশ তলে, কে গো ওই কলপনা,
নিশান্তের ললাট উজলি!
চরণে জলদ রাশি, শুভ্র বিভা পরকাশি
স্তরে স্তরে স্তবকিত ভূধর সমান।
চরণ-কিরণ ধার, পদ হোতে ঝরি তাঁর
মেঘে মেঘে ইন্দ্রধনু করেছে নির্ম্মাণ।
চরণের মেঘ তলে, প্রভাতের তারা জ্বলে
প্রাতঃশশি সে জলদে মাথা করি নত।
ঊষার বিশদ-বাস, দেহে তাঁর পরকাশ
দিশি দিশি শুভ্র আভা করি বিকীরিত।
অরুণ কিরীট শিরে, জ্বলিতেছে ধীরে ধীরে
নিলীম-আকাশ তল উজল করিয়া,
তারকা-রতন গুলি, চুল হোতে খুলি খুলি
হেথায় হোথায় পড়ে ঝরিয়া ঝরিয়া।
আলো করি দুটি পাশ, দাঁড়ায়ে বাল্মীকি ব্যাস
প্রদীপ্ত অনল সম দিগন্ত উজলি।
ভাবেতে বিভোর হোয়ে, স্বর্গ পারিজাত লোয়ে
পদ প্রান্তে কালিদাস দেন পুষ্পাঞ্জলি।
সহসা উঠিল সেই বীণার ঝঙ্কার,
পুলকে শিহরে ধরা, শিহরে শশাঙ্ক তারা
ধীরে ধীরে খুলে গেল স্বরগের দ্বার।
অনন্ত অনন্ত স্তরে দূর হোতে দূরান্তরে,
আলোকের মহারণ্য সহসা প্রকাশে,
দীপ্ত গ্রহ শত শত, ফিরিছে ঘুরিছে কত,
উঠিছে ছুটিছে শূন্যে উন্মাদ উল্লাসে।
অনন্ত অনন্ত স্তরে, দেবগণ সমস্বরে
জয় জয় সরস্বতী করিল ঘোষণা।
অনন্ত অনন্ত স্তরে, বিদ্যাধরী বিদ্যাধরে,
গাহিয়া উঠিল জয় জয় পদ্মাসনা!
সে ধ্বনি উথলি উঠি, শূন্যে করে ছুটাছুটি
দিগঙ্গনা উত্তরিল প্রতিধ্বনি দিয়ে,
উল্লাসে জাহ্নবী ছোটে, সাগর উচ্ছ্বসি ওঠে,
হিমাদ্রি কন্দরে ধ্বনি গরজে আসিয়ে।
জয় জয় সরস্বতী হইল ঘোষণা
প্রকৃতি উঠিল গাহি জয় পদ্মাসনা।
আবার উঠিল সেই বীণার ঝঙ্কার
অমনি হইল ধরা হরষ উল্লাসে ভরা,
ফুটিল বাসন্ত ফুল কানন মাঝার।

নিভৃত নিকুঞ্জে বসি খুলি দিয়া প্রাণ,
গাইল বনের পাখী বসন্তের গান।
বহিল কানন ময় বসন্তের বায়,
নবীন বসন্ত-ঋতু আইল ধরায়।
তুমিও আইলে বাণি, হাসিলেন উষা,
পরিল পৃথিবী নব বসন্তের ভূষা।
তোমারে দেখিয়া হর্ষে হইয়া অধীর,
মুছিয়া নয়ন হোতে নীহারের নীর,
বরণ বরণ ফুলে করিয়া খচিত,
পৃথিবী আসন তব কোরেছে রচিত।
আইস হেথায় তবে কহিতেছে কবি
যেথা তব পদার্পণ, রাত্রি করে পলায়ন,
সেথায় জাগিয়া উঠে সুতরুণ রবি।

কবি-কাহিনী।

দ্বিতীয় সর্গ—

"এত কাল হে প্রকৃতি, করিনু তোমার সেবা,
তবু কেন এ হৃদয় পূরিল না দেবী?
এখনো বুকের মাঝে, রয়েছে দারুণ শূন্য,
সে শূন্য কি এ জনমে পূরিবে না আর?
মনের মন্দির মাঝে, প্রতিমা নাহিক যেন
শুধু এ আঁধার গৃহ রয়েছে পড়িয়া,
কত দিন বল দেবী, রহিবে এমন শূন্য,
তা হলে ভাঙিয়ে যাবে এ মনো-মন্দির!
কিছু দিন পরে আর, দেখিব সেখানে চেয়ে
পূর্ব্ব হৃদয়ের আছে ভগ্ন অবশেষ,
সেই ভগ্ন অবশেষে—সুখের সমাধি পরে
বসিয়া দারুণ দুখে কাঁদিতে কি হবে?
মনের অন্তর তলে, কি যে কি করিছে হুহু
কি যেন আপন ধন নাইক সেখানে,
সে শূন্য পূরাতে দেবী, ঘুরেছি পৃথিবীময়
মরুভূমে তৃষাতুর মৃগের মতন।
কত মরীচিকা দেবি, কোরেছে ছলনা মোরে,
কত ঘুরিয়াছি তার পশ্চাতে পশ্চাতে,
অবশেষে শ্রান্ত হোয়ে তোমারে শুধাই দেবী
এ শূন্য পূরিবে না কি কিছুতে আমার?
উঠিছে তপন শশি, অস্ত যাইতেছে পুনঃ
বসন্ত শরত শীত চক্রে ফিরিতেছে—
প্রতি পদক্ষেপে আমি, বাল্যকাল হোতে দেবী,
ক্রমে ক্রমে কতদূর যেতেছি চলিয়া;
বাল্যকাল গেছে চোলে, এসেছে যৌবন এবে
যৌবন যাইবে চলি আসিবে বার্দ্ধক্য,
তবু এ মনের শূন্য, কিছুতে কি পূরিবে না?
মন কি করিবে হুহু চিরকাল তরে?
শুনিয়াছিলাম কোন উদাসী যোগীর কাছে
"মানুষের মন চায় মানুষেরি মন—
গম্ভীর সে নিশীথিনী, সুন্দর সে উষাকাল
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি, সমুচ্চ সে গিরিবর

আঁধার সে পর্ব্বতের গহ্বর বিশাল ;
তটিনীর কলধ্বনি, নির্ঝরের ঝর ঝর
আরণ্য বিহঙ্গদের স্বাধীন সঙ্গীত,
পারে না পূরিতে তারা, বিশাল মনুষ্য হৃদি
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন।"
শুনিয়া প্রকৃতি দেবি, ভ্রমিনু পৃথিবীময়
কত লোক দিয়েছিল হৃদি উপহার—
আমার মর্ম্মের গান, যবে গাহিতাম দেবী
কত লোক কেঁদেছিল শুনিয়া সে গীত,
তেমন মনের মত, মন পেলাম না দেবী
আমার প্রাণের কথা বুঝিল না কেহ,
তাইতে নিরাশা হোয়ে আবার এসেছি ফিরে
বুঝি গো এ শূন্য মন পূরিল না আর।"
এইরূপ কেঁদে কেঁদে, কাননে কাননে কবি,
একাকী আপন মনে করিত ভ্রমণ।
সে শোক-সঙ্গীত শুনি, কাঁদিত কাননবালা,
নিশীথিনী হাহা করি ফেলিত নিশ্বাস।
বনের হরিণ গুলি, আকুল নয়নে আহা
কবির মুখের পানে রহিত চাহিয়া।
"হাহা দেবী একি হোলো, কেন পূরিলনা প্রাণ"
প্রতিধ্বনি হোতো তার কাননে কাননে।
শীর্ণ নির্ঝরিণী যেথা, ঝরিতেছে মৃদু মৃদু
উঠিতেছে কুলু কুলু জলের কল্লোল,
সেথানে গাছের তলে একাকী বিষণ্ণ কবি
নীরবে নয়ন মুদি থাকিত শুইয়া,
তৃষিত হরিণ শিশু সলিল করিয়া পান
দেখি তার মুখ পানে চলিয়া যাইত।
শীতরাত্রে পর্ব্বতের তুষার শয্যার পরে
বসিয়া রহিত স্তব্ধ প্রতিমার মত,
মাথার উপরে তার পড়িত তুষার কণা
তীব্রতম শীত বায়ু যাইত বহিয়া।

দিনে দিনে ভাবনায়, শীর্ণ হোয়ে গেল দেহ
প্রফুল্ল হৃদয় হ'ল বিষাদে মলিন,
রাক্ষসী স্বপ্নের তরে, ঘুমালেও শান্তি নাই
পৃথিবী দেখিত কবি শ্মশানের মত।
এক দিন অপরাহ্নে, বিজন পথের প্রান্তে
কবি বৃক্ষতলে এক রয়েছে শুইয়া,
পথ-শ্রমে শ্রান্ত দেহ, চিন্তায় আকুল হৃদি,
বহিতেছে বিষাদের আকুল নিশ্বাস।
হেনকালে ধীরি ধীরি, শিয়রের কাছে আসি
দাঁড়াইল এক জন বনের বালিকা,
চাহিয়া মুখের পানে, কহিল করুণ স্বরে
"কে তুমি গো পথশ্রান্ত বিষণ্ণ পথিক ?
অধরে বিষাদ যেন, পেতেছে আসন তার
নয়ন কহিছে যেন শোকের কাহিনী।
তরুণ হৃদয় কেন, অমন বিষাদময় ?
কি দুখে উদাস হোয়ে করিছ ভ্রমণ ?"
গভীর নিশ্বাস ফেলি, গম্ভীরে কহিল কবি
"প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না বালা ?"
একে একে কত কথা কহিল বালিকা কাছে,
যত কথা রুদ্ধ ছিল হৃদয়ে কবির—
আগ্নেয় গিরির বুকে জলন্ত অগ্নির মত
যত কথা ছিল কবি কহিলা গম্ভীরে।
"নদ নদী গিরি গুহা, কত দেখিলাম তবু
প্রাণের শূন্যতা কেন ঘুচিল না দেবী!"
বালার কপোল বাহি, নীরবে অশ্রুর বিন্দু
স্বর্গের শিশির সম পড়িল ঝরিয়া,
সেই এক অশ্রু বিন্দু, অমৃত ধারার মত
কবির হৃদয় গিয়া প্রবেশিল যেন ;
দেখি সে করুণ-বারি, নিরশ্রু কবির চোখে
কত দিন পরে হল অশ্রুর উদয়।
শ্রান্ত হৃদয়ের তরে, যে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে

পাগল ভ্রমিতেছিল হেথায় হোথায়—
আজ যেন একটুকু আশ্রয় পাইল হৃদি
আজ যেন একটুকু জুড়াল যন্ত্রণা।
যে হৃদয় নিরাশায়, মরু ভূমি হোয়েছিল
সেথা হোতে হোল আজ অশ্রু উৎসারিত।
শ্রান্ত সে কবির মাথা, রাখিয়া কোলের পরে,
সরলা মুছায়ে দিল অশ্রু বারিধারা,
কবি সে ভাবিল মনে, তুমি কোথাকার দেবী
কি অমৃত ঢালিলে গো প্রাণের ভিতর!
ললনা তখন ধীরে, চাহিয়া কবির মুখে
কহিল মমতাময় করুণ কথায়,—
"হোথায় বিজন বনে, দেখেছ কুটীর ওই
চল পান্থ ওইখানে যাই দুজনায়।
বন হোতে ফল মূল, আপনি তুলিয়া দিব,
নির্ঝর হইতে তুলি আনিব সলিল,
যতনে পর্ণের শয্যা, দিব আমি বিছাইয়া,
সুখ নিদ্রা কোলে সেথা লভিবে বিরাম,
আমার বীণাটি লয়ে গান শুনাইব কত
কত কি কথায় দিন যাইবে কাটিয়া,
হরিণ শাবক এক, আছে ও গাছের তলে
সে যে আসি কত খেলা খেলিবে পথিক
দূরে সরসীর ধারে, আছে এক চারু কুঞ্জ
তোমারে লইয়া পান্থ দেখাব সে বন,
কত পাখী ডালে ডালে, সারাদিন গাইতেছে
কত যে হরিণ সেথা করিতেছে খেলা।
আবার দেখাব সেই, অরণ্যের নির্ঝরিণী,
আবার নদীর ধারে লয়ে যাব আমি,
পাখী এক আছে মোর, সে যে কত গায় গান
নাম ধোরে ডাকে মোরে 'নলিনী' 'নলিনী'।
যা আছে আমার কিছু, সব আমি দেখাইব,
সব আমি শুনাইব যত জানি গান—
আসিবে কি পান্থ ওই বনের কুটীর মাঝে?"
এতেক শুনিয়া কবি চলিল কুটীরে।
কি সুখে থাকিত কবি, বিজন কুটীরে সেই
দিন গুলি কেটে যেত মুহূর্ত্তের মত—
কি শান্ত সে বন ভূমি, নাই লোক নাই জন
শুধু সে কুটীর খানি আছে এক ধারে।
আঁধার তরুর ছায়ে—নীরব শান্তির কোলে
দিবস যেন রে সেথা রহিত ঘুমায়ে।
পাখীর অস্ফুট গান, নির্ঝরের ঝরঝর
স্তব্ধতারে আরো যেন দিত মিষ্ট করি।
আগে একদিন কবি মুগ্ধ প্রকৃতির রূপে,
অরণ্যে অরণ্যে একা করিত ভ্রমণ.
এখন দুজনে মিলি, ভ্রমিয়া বেড়ায় সেথা
দুই জন প্রকৃতির বালক বালিকা।
সুদূর কানন তলে, কবিরে লইয়া যেত
নলিনী, সে যেন এক বনেরি দেবতা,
শ্রান্ত হোলে পথশ্রমে, ঘুমাত কবির কোলে
খেলিত বনের বায়ু কুন্তল লইয়া,
ঘুমন্ত মুখের পানে, চাহিয়া রহিত কবি—
মুখে যেন লিখা আছে আরণ্য কবিতা।
"একি দেবি কলপনা, এত সুখ প্রণয়ে যে
আগে তাহা জানিতাম না ত!
কি এক অমৃত ধারা, ঢেলেছ প্রাণের পরে
হে প্রণয় কহিব কেমনে?
অন্য এক হৃদয়েরে হৃদয় করা গো দান,
সে কি এক স্বর্গীয় আমোদ।
এক গান গায় যদি, দুইটি হৃদয়ে মিলি
দেখে যদি একই স্বপন,
এক চিন্তা এক আশা, এক ইচ্ছা দুজনার
এক ভাবে দুজনে পাগল,
হৃদয়ে হৃদয়ে হয়, সে কি গো সুখের মিল,

এ জনমে ভাঙ্গিবেনা তাহা। *
আমাদের দুজনের হৃদয়ে হৃদয়ে দেবী,
তেমনি মিশিয়া যায় যদি—
এক সাথে এক স্বপ্ন দেখি যদি দুই জনে
তা হইলে কি হয় সুন্দর!
নরকে বা স্বর্গে থাকি, অরণ্যে বা কারাগারে
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা হোয়ে—
কিছু ভয় করিনাকো—বিহ্বল প্রণয় ঘোরে
থাকি সদা মরমে মজিয়া।
তাই হোক্—হোক্ দেবী, আমাদের দুইজনে
সেই প্রেম এক কোরে দিক্।
মজি স্বপনের ঘোরে, হৃদয়ের খেলা খেলি
যেন যায় জীবন কাটিয়া।"
নিশীথে একেলা হোলে, এইরূপ কত গান
বিরলে গাইত কবি বসিয়া বসিয়া।
সুখ বা দুখের কথা, বুকের ভিতরে যাহা
দিন রাত্রি করিতেছে আলোড়িত প্রায়,
প্রকাশ না হোলে তাহা, মরমের গুরুভারে
জীবন হইয়া পড়ে দারুণ ব্যথিত।
কবি তার মরমের প্রণয় উচ্ছ্বাস কথা
কি করি যে প্রকাশিবে পেত না ভাবিয়া।
পৃথিবীতে হেন ভাষা নাইক, মনের কথা
পারে যাহা পূর্ণ ভাবে করিতে প্রকাশ।
ভাব যত গাঢ় হয়, প্রকাশ করিতে গিয়া,
কথা তত নাহি পায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া,
বিষাদ যতই হয়, দারুণ অন্তর ভেদী
অশ্রুজল তত যায় শুকায়ে যেমন!
মরমের ভার সম হৃদয়ের কথা গুলি
কত দিন পারে বল চাপিয়া রাখিতে?
একদিন ধীরে ধীরে বালিকার কাছে গিয়া
অশান্ত বালক মত কহিল কতকি।

অসংলগ্ন কথাগুলি, মরমের ভাব আরো
গোলমাল করি দিল প্রকাশ না করি,
কেবল অশ্রুর জলে, কেবল মুখের ভাবে
পড়িল বালিকা তার মনের কি কথা!
এই কথা গুলি যেন পড়িল বালিকা ধীরে
"কত ভাল বাসি বালা কহিব কেমনে,
তুমিও সদয় হোয়ে, আমার সে প্রণয়ের
প্রতিদান দিও বালা এই ভিক্ষা চাই।"
গড়ায়ে পড়িল ধীরে বালিকার অশ্রুজল,
কবির অশ্রুর সাথে মিশিল কেমন—
স্কন্ধে তার রাখি মাথা কহিল কম্পিত স্বরে
"আমিও তোমারে কবি বাসিনা কি ভাল?"
কথা না স্ফুরিল আর, শুধু অশ্রুজল রাশি
আরক্ত কপোল তার করিল প্লাবিত।
এইরূপ মাঝে মাঝে অশ্রুজলে অশ্রুজলে
নীরবে গাইত তারা প্রণয়ের গীত।
অরণ্যে দুজনে মিলি, আছিল এমন সুখে
জগতে তারাই যেন আছিল দুজন;
যেন তারা সুকোমল ফুলের সুরভি শুধু
যেন তারা অপ্সরার সুখের সঙ্গীত।
আলুলিত চুল গুলি, সাজাইয়া বন ফুলে
ছুটিয়া আসিত বালা কবির কাছেতে,
একথা ওকথা লয়ে, কি যে কি কহিত বালা
কবি ছাড়া আর কেহ বুঝিতে নারিত।
কভু বা মুখের পানে, সে যে কি রহিত চেয়ে
ঘুমায়ে পড়িত যেন হৃদয় কবির।
কভু বা কি কথা লয়ে, সে যে কি হাসিত হাসি
তেমন সরল হাসি দেখেনি কেহই।
আঁধার অমার রাত্রে, একাকী পর্ব্বত শিরে
সেওগো কবির সাথে রহিত দাঁড়ায়ে,
উনমত্ত ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ অশনি আর

পর্ব্বতের বুকে যবে বেড়াত মাতিয়া,
তাহারো হৃদয় যেন, নদীর তরঙ্গ সাথে
করিত গো মাতামাতি হেরি সে বিপ্লব,
করিত সে ছুটাছুটি, কিছুতে সে ডরিত না,
এমন দুরন্ত মেয়ে দেখিনিত আর!
কবি যা কহিত কথা, শুনিত কেমন ধীরে
কেমন মুখের পানে রহিত চাহিয়া।
বন দেবতার মত, এমন সে এলোথেলো,
কখনো দুরন্ত অতি ঝটিকা যেমন,
কখনো এমন শান্ত, প্রভাতের বায়ু যথা
নীরবে শুনে গো যবে পাখীর সঙ্গীত।
কিন্তু কলপনা যদি কবির হৃদয় দেখ,
দেখিবে এখনো তাহা পূর্ণ হয় নাই।
এখনো কহিছে কবি, "আরো দাও ভাল বাসা,
আরো ঢাল' ভাল বাসা হৃদয়ে আমার।"
প্রেমের অমৃত ধারা, এত যে করেছে পান
তবু মিটিলনা কেন প্রণয় পিপাসা?
প্রেমের জোছনা ধারা, যত ছিল ঢালি, বালা
কবির সমুদ্র হৃদি পারেনি পূরিতে।
স্বাধীন বিহঙ্গ সম কবিদের তরে দেবী
পৃথিবীর কারাগার যোগ্য নহে কভু।
অমন সমুদ্র সম, আছে যাহাদের মন
তাহাদের তরে দেবী নহে এ পৃথিবী।
তাদের উদার মন, আকাশে উড়িতে যায়
পিঞ্জরে ঠেকিয়া পক্ষ নিম্নে পড়ে পুনঃ,
নিরাশায় অবশেষে ভেঙ্গে চুরে যায় মন,
জগৎ পূরায় তার আকুল বিলাপে।
কবির সমুদ্র বুক পুরাতে পারিবে কিসে
প্রেম দিয়া ক্ষুদ্র ওই বনের বালিকা।
কাতর ক্রন্দনে আহা আজিও কাঁদিল কবি,
"এখনও পূরিল না প্রাণের শূন্যতা"
বালিকার কাছে গিয়া কাতরে কহিল কবি
"আরো দাও ভাল বাসা হৃদয়ে ঢালিয়া।
আমি যত ভাল বাসি, তত দাও ভাল বাসা,
নহিলে গো পূরিবেনা প্রাণের শূন্যতা।"
শুনিয়া কবির কথা, কাতরে কহিল বালা
"যা ছিল আমার কবি দিয়েছি সকলি,
এ হৃদয়, এ পরাণ, সকলি তোমার কবি,
সকলি তোমারে প্রেমে দেছি বিসর্জ্জন।
তোমার ইচ্ছার সাথে, ইচ্ছা মিশায়েছি মোর
তোমার সুখের সাথে মিশায়েছি সুখ।
সে কথা শুনিয়া কবি, কহিল কাতর স্বরে
"প্রাণের শূন্যতা তবু ঘুচিল না কেন?
ওই হৃদয়ের সাথে, মিশাতে চাই এ হৃদি
দেহের আড়াল তবে রহিল গো কেন?
সারাদিন সাধ যায়, শুনাই মনের কথা
এত কথা তবে কেন পাই না খুঁজিয়া?
সারাদিন সাধ যায়, দেখি ও মুখের পানে
দেখেও মিটে না কেন আঁখির পিপাসা?
সাধ যায় এ জীবন, প্রাণ ভোরে ভাল বাসি
বেসেও প্রাণের শূন্য ঘুচিল না কেন?
আমি যত ভালবাসি তত দাও ভালবাসা
নহিলেগো পূরিবেনা প্রাণের শূন্যতা।
একি দেবি! একি তৃষ্ণা জ্বলিছে হৃদয়ে মোর,
ধরার অমৃত যত করিয়াছি পান,
প্রকৃতির আছে যত অতুল সৌন্দর্য্য-রাশি,
প্রণয়ের আছে যত সুধা হতে সুধা,
কল্পনার আছে যত তরল স্বর্গীয় গীতি,
সকলি হৃদয়ে মোর দিয়াছি ঢালিয়া;
শুধু দেবী পৃথিবীর হলাহল আছে যত
তাহাই করিনি পান মিটাতে পিপাসা!
শুধু দেবী ঐশ্বর্য্যের কনক শৃঙ্খল দিয়া

বাঁধি নাই আমার এ স্বাধীন হৃদয়!
শুধু দেবী মিটাইতে মনের বীরত্ব গর্ব্ব
লক্ষ মানবের রক্তে ধুইনি চরণ!
শুধু দেবী এজীবনে নিশাচর বিলাসেরে
সুখ-স্বাস্থ্য অর্ঘ্য দিয়া করি নাই সেবা!
তবু কেন হৃদয়ের তৃষা মিটিল না মোর
তবু কেন ঘুচিল না প্রাণের শূন্যতা?
শুনেছি বিলাস সুরা বিহ্বল করিয়া হৃদি,
ডুবাইয়া রাখে সদা বিস্মৃতির ঘুমে,
কিন্তু দেবী—কিন্তু দেবী—এতযে পেয়েছি কষ্ট
বিস্মৃতি চাইনে তবু বিস্মৃতি চাইনে!—
সেকি ভয়ানক দশা, কল্পনাও শিহরে গো—
স্বর্গীয় এ হৃদয়ের জীবনে মরণ!
আমার এ মন দেবী, হোক্ মরুভূমি সম
তৃণলতা জলশূন্য জলন্ত প্রান্তর,
তবুও তবুও আমি, সহিব তা প্রাণ-পণে
বহিব তা যতদিন রহিব বাঁচিয়া;
মিটাতে মনের তৃষা ত্রিভুবন পর্য্যটিব,
হত্যা করিব না তবু হৃদয় আমার।
প্রেম ভক্তি স্নেহ আদি মনের দেবতা যত
যতনে রেখেছি আমি মনের মন্দিরে,
তাঁদের করিতে পূজা, ক্ষমতা নাইক বলে
বিসর্জ্জন করিবারে পারিব না আমি।
কিন্তু ওগো কলপনা আমার মনের কথা
বুঝিতে কে পারিবেক বল দেখি দেবী?
আমার ব্যথার মর্ম্ম কারে বুঝাইবে বল—
বুঝাইতে না পারিলে বুক যায় ফেটে।
যদি কেহ বলে দেবি, তোমার কিসের দুখ,
হৃদয়ের বিনিময়ে পেয়েছ হৃদয়,
তবে কাল্পনিক দুখে, এত কেন ম্রিয়মাণ?
তবে কি বলিয়া আমি দিবগো উত্তর?
উপায় থাকিতে তবু যে সহে বিষাদ জ্বালা,
পৃথিবী তাহারি কষ্টে হয়গো ব্যথিত,
আমার এ বিষাদের উপায় নাইক কিছু,
কারণ কি তাও দেবি পাইনা খুজিয়া।
পৃথিবী আমার কষ্ট বুঝক্ বা না বুঝুক্,
নলিনীরে কিবলিয়া বুঝাইব দেবী?
তাহারে সামান্য কথা গোপন করিলে পরে
হৃদয়ে কি কষ্ট হয় হৃদয় তা' জানে।
এত তারে ভালবাসি, তবু কেন মনে হয়
ভালবাসা হইল না আশ মিটাইয়া,
আঁধার সমুদ্রতলে, কি যেন বেড়াই খুঁজে
কি যেন পাইতেছি না চাহিতেছি যাহা।
বুকের যেখানে তারে রাখিতে চাইগো আমি
সেখানে পাইনে যেন রাখিতে তাহারে,
তাইতে অন্তর বুক এখনো পুরিতেছে না,
তাইতে এখনো শূন্য রয়েছে হৃদয়।"
কবির প্রণয় সিন্ধু, ক্ষুদ্র বালিকার মন
রেখেছিল মগ্ন করি অগাধ সলিলে,
উপরে যে ঝড় ঝঞ্ঝা, কতকি বহিয়া যেত,
নিম্নে তার কোলাহল পেতনা শুনিতে,
প্রণয়ের অবিচিত্র, নিয়ত নূতন তবু
তরঙ্গের কলধ্বনি শুনিত কেবল,
সেই একতান ধ্বনি, শুনিয়া শুনিয়া তার
হৃদয় পড়িয়াছিল ঘুমায়ে কেমন!
বনের বালিকা আহা, সে ঘুমে বিহ্বল হোয়ে,
কবির হৃদয়ে রাখি অবশ মস্তক
স্বর্গের স্বপন শুধু, দেখিত দিবস রাত্তি
হৃদয়ের হৃদয়ের অনন্ত মিলন।
বালিকার সে হৃদয়ে, সে প্রণয়-মগ্ন-হৃদে
অবশিষ্ট আছিল না এক তিল স্থান,
আর কিছু জানিত না, আর কিছু ভাবিত না

শুধু সে বালিকা ভাল বাসিত কবিরে।
শুধু সে কবির গান, কত যে লাগিত ভাল,
শুনে শুনে শুনা তার ফুরাত না আর,
শুধু সে কবির নেত্র, কি এক স্বর্গীয় জ্যোতি
বিকীরিত, তাই হেরি হইত বিহ্বল!
শুধু সে কবির কোলে, ঘুমাতে বাসিত ভাল
কবি তার চুল লয়ে করিত কি খেলা।
শুধু সে কবিরে বালা. শুনাতে বাসিত ভাল
কত কি—কত কি কথা অর্থ নাই যার.
কিন্তু সে কথায় কবি, কত যে পাইত অর্থ
গভীর সে অর্থ নাই কত কবিতায়—
সেই অর্থহীন কথা, হৃদয়ের ভাব যত
প্রকাশ করিতে পারে এমন কিছু না।
এক দিন বালিকারে কবি সে কহিল গিয়া—
"নলিনি! চলিনু আমি ভ্রমিতে পৃথিবী!
আর একবার বালা, কাশ্মীরের বনে বনে
যাই গো শুনিতে আমি পাখীর কবিতা!
রুসিয়ার হিমক্ষেত্রে, আফ্রিকার মরুভূমে
আর একবার আমি করি গে ভ্রমণ,
এই খানে থাক তুমি, ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ—
ওই মধু মুখ খানি করিব চুম্বন।"
এতেক কহিয়া কবি, নীরবে চলিয়া গেল
গোপনে মুছিয়া ফেলি নয়নের জল।
বালিকা নয়ন তুলি, নীরবে রহিল চাহি,
কি দেখিছে সেই জানে অনিমিষ চখে।
সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে, তবুও রহিল চাহি,
তবুও ত পড়িল না নয়নে নিমেষ।
অনিমিষ নেত্র ক্রমে করিয়া প্লাবিত,
এক বিন্দু দুই বিন্দু ঝরিল সলিল।
বাহুতে লুকায়ে মুখ কাতর বালিকা
মর্ম্মভেদী অশ্রুজলে করিল রোদন।

হা-হা-কবি কি করিলে, ফিরে দেখ-ফিরে এস,
দিও না বালার হৃদে অমন আঘাত—
নীরবে বালার আহা, কি বজ্র বেজেছে বুকে
গিয়াছে কোমল মন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া!
হা কবি অমন কোরে, অনর্থক তার মনে
কি আঘাত করিলে যে বুঝিলেনা তাহা?
এত কাল সুখ স্বপ্ন, ডুবায়ে রাখিয়া মন
এত দিন পরে তাহা দিবে কি ভাঙ্গিয়া?
কবি ত চলিয়া যায়—সন্ধ্যা হোয়ে এল ক্রমে
আঁধারে কানন ভূমি হইল গম্ভীর—
একটি নড়ে না পাতা, একটু বহে না বায়ু
স্তব্ধ বন কি যেন কি ভাবিছে নীরবে!
তখন বনান্ত হোতে সুধীরে শুনিল কবি,
উঠিছে নীরব শূন্যে বিষণ্ণ সঙ্গীত,
তাই শুনি বন যেন রয়েছে নীরবে অতি
জোনাকি নয়ন শুধু মেলিছে মুদিছে।
একবার কবি শুধু চাহিল কুটীর পানে,
কাতরে বিদায় মাগি বন দেবী কাছে,
নয়নের জল মুছি—যে দিকে নয়ন চলে
সে দিকে পথিক কবি যাইল চলিয়া।

সঙ্গীত।—

কেন ভাল বাসিলে আমায়?
কিছুই নাইক গুণ, কিছুই জানিনা আমি,
কি আছে? কি দিয়ে তব তুষিব হৃদয়!
যা' আমার ছিল সাধ্য, সকলি করেছি আমি
কিছুই করিনি দোষ চরণে তোমার,
শুধু ভাল বাসিয়াছি, শুধু এ পরাণ মন
উপহার সঁপিয়াছি তোমার চরণে।
তাতেও তোমার মন তুষিতে নারিনু যদি,
তবে কি করিব বল, কি আছে আমার?
গেলে যদি, গেলে চলি, যাও যেথা ভাল লাগে

একবার মনে কোরো দীন অধীনীরে।
ভ্রমিতে ধরার মাঝে, কত ভাল বাসা পাবে
তাতে যদি ভাল থাক তাই হোক্ তবে,
তবু একবার যদি, মনে কর নলিনীরে
যে দুখিনী, যে তোমারে এত ভাল বাসে!
কি করিলে মন তব, পারিতাম জুড়াইতে
যদি জানিতাম কবি করিতাম তাহা!
আমি অতি অভাগিনী, জানিনা বলিয়া যেন
বিরক্ত হয়োনা কবি এই ভিক্ষা দাও!
না জানিয়া না শুনিয়া, যদি দোষ করে থাকি
ক্ষুদ্র আমি, ক্ষমা তবে করিও আমারে-
তুমি ভাল থেকো কবি, ক্ষুদ্র এক কাঁটা যেন
ফুটে না তোমার পায়ে ভ্রমিতে পৃথিবী।
জননি, কোথায় তুমি রেখে গেলে দুহিতারে?
কত দিন একা একা কাটালাম হেথা.
একেলা তুলিয়া ফুল, কত মালা গাঁথিতাম
একেলা কাননময় করিতাম খেলা!
তোমার বীণাটি ল'য়ে, উঠিয়া পর্ব্বত শিরে
একেলা আপন মনে গাইতাম গান,
হরিণ শিশুটি মোর বসিত পায়ের তলে,
পাখীটি কাঁধের পরে শুনিত নীরবে।
এইরূপ কতদিন কাটালেম বনে বনে
কতদিন পরে তবে এলে তুমি কবি!
তখন তোমারে কবি, কি যে ভাল বাসিলাম
এত ভাল কাহারেও বাসি নাই কভু।
দূর স্বরগের এক, জ্যোতির্ম্ময় দেব সম
কত বার মনে মনে করেছি প্রণাম।
দূর থেকে আঁখি ভরি দেখিতাম মুখ খানি,
দূর থেকে শুনিতাম মধুময় গান।
যে দিন আপনি আসি, কহিলে আমার কাছে
ক্ষুদ্র এই বালিকারে ভাল বাস তুমি,
সে দিন কি হর্ষে কবি, কি আনন্দে কি উচ্ছ্বাস
ক্ষুদ্র এ হৃদয় মোর ফেটে গেল যেন।
আমি কোথাকার কেবা! আমি ক্ষুদ্র হোতে ক্ষুদ্র
স্বর্গের দেবতা তুমি, ভাল বাস' মোরে?
এত সৌভাগ্য কবি, কখনো করিনি আশা,
কখনো মুহূর্ত্ত তরে জানিনি স্বপনে।
যেথায় যাওনা কবি, যেথায় থাকনা তুমি
আমরণ তোমারেই করিব অর্চ্চনা।
মনে রাখ নাই রাখ, তুমি যেন সুখে থাক
দেবতা! এ দুখিনীর শুন গো প্রার্থনা।

সম্পাদকের বৈঠক।

অনুবাদ।

বিচ্ছেদ।

শরীর সে ধীরে ধীরে যাইতেছে আগে,
অধীর হৃদয় কিন্তু চায় পিছু বাগে,
ধ্বজা লয়ে গেলে যথা প্রতিকূল বাতে,
পতাকা তাহার মুখ ফিরায় পশ্চাতে।

শকুন্তলা।

বিচ্ছেদ।

প্রতিকুল বায়ুভরে, ঊর্ম্মিময় সিন্ধুপরে
তরীখানি যেতেছিল ধীরি,
কম্পমান কেতু তার, চেয়েছিল কতবার
সে দ্বীপের পানে ফিরি ফিরি।
যারে আহা ভালবাসি, তারে যবে ছেড়ে আসি
যত যাই দূর দেশে চলি,
সেইদিক পানে হায়, হৃদয় ফিরিয়া চায়
যেখানে এসেছি তারে ফেলি।
বিদেশেতে দেখি যদি, উপত্যকা, দ্বীপ, নদী,
অতিশয় মনোহর ঠাঁই,
সুরভি কুসুমে যার, শোভিত সকল ধার
শুধু হৃদয়ের ধন নাই,
বড় সাধ হয় প্রাণে, থাকিতাম এই খানে,
হেথা যদি কাটিত জীবন,
রয়েছে যে দূরবাসে, সে যদি থাকিত পাশে
কিযে সুখ হইত তখন।
পূর্ব্বদিক সন্ধ্যাকালে, গ্রাসে অন্ধকার জালে
ভীত পান্থ চায় ফিরে ফিরে,
দেখিতে সে শেষজ্যোতি, মৃদুতর হোয়ে অতি
এখনো যা' জ্বলিতেছে ধীরে।
তেমনি সুখের কাল, গ্রাসে গো আঁধার-জাল
অদৃষ্টের সায়াহ্নে যখন,
ফিরে চাই বারে বারে, শেষবার দেখিবারে
সুখের সে মুমূর্ষু কিরণ॥

Moore's Irish Melodies.

বিদায় চুম্বন।

একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার
জনমের মত দেখা হবেনাকো আর।
মর্ম্মভেদী অশ্রু দিয়ে, পূজিব তোমারে প্রিয়ে
দুখের নিঃশ্বাস আমি দিব উপহার।
সেত তবু আছে ভালো, একটু আশার আলো
জ্বলিতেছে অদৃষ্টের আকাশে যাহার।
কিন্তু মোর আশা নাই, যে দিকে ফিরিয়া চাই
সেই দিকে নিরাশার দারুণ আঁধার।
ভাল যে বেসেছি তারে দোষ কি আমার ?
উপায় কি আছে বল উপায় কি তার ?
দেখা মাত্র সেই জনে, ভাল বাসা আসে মনে
ভাল বাসিলেই ভুলা নাহি যায় আর !
নাহি বাসিতাম যদি এত ভাল তারে
অন্ধ হোয়ে প্রেমে তার মজিতাম নারে
যদি নাহি দেখিতাম, বিচ্ছেদ না জানিতাম
তাহোলে হৃদয় ভেঙ্গে যেতনা আমার !
আমারে বিদায় দাও যাইগো সুন্দরী,
যাই তবে হৃদয়ের প্রিয় অধীশ্বরী,
থাক তুমি থাক সুখে, বিমল শান্তির বুকে
সুখ, প্রেম, যশ, আশা থাকুক্ তোমার
একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার।

Burns.

কষ্টের জীবন।

মানুষ কাঁদিয়া হাসে,
পুনরায় কাঁদেগো হাসিয়া।
পাদপ শুকায়ে গেলে,
তবু ও সে না হয় পতিত,
তরণী ভাঙ্গিয়া গেলে
তবু ধীরে যায় সে ভাসিয়া,
ছাদ যদি পোড়ে যায়,
দাঁড়াইয়া রহে তবু ভিত।
বন্দী চোলে যায় বটে,
তবুও ত রহে কারাগার,
মেঘে ঢাকিলেও সূর্য্য,
কোন মতে দিন অস্ত হয়,

তেমনি হৃদয় যদি,
ভেঙ্গে চুরে হয় চুর মার,
কোনক্রমে বেঁচে থাকে,
তবুও সে ভগন হৃদয়।
ভগন দর্পণ যথা,
ক্রমশঃ যতই ভগ্ন হয়,
ততই সে শত শত,
প্রতিবিম্ব করয়ে ধারণ,
তেমনি হৃদয় হোতে,
কিছুইগো যাইবার নয়।
হোক্‌না শীতল স্তব্ধ,
শত খণ্ডে ভগ্ন চূর্ণ মন,
হউক্‌না রক্তহীন,
হীন তেজ তবুও তাহারে,
বিনিদ্র জ্বলন্ত জ্বালা,
ক্রমাগত করিবে দাহন,
শুকায়ে শুকায়ে যাবে,
অন্তর বিষম শোক ভারে,
অথচ বাহিরে তার,
চিহ্নমাত্র না পাবে দর্শন।

Byron.

জীবন উৎসর্গ।

এস এস এই বুকে নিবাসে তোমার,
যূথভ্রষ্ট বাণবিদ্ধ হরিণী আমার,
এইখানে বিরাজিছে সেই চির হাসি,
আঁধারিতে পারিবেনা তাহা মেঘরাশি।
এই হস্ত এ হৃদয় চিরকাল মত
তোমার, তোমারি কাজে রহিবে গো রত!
কিসের সে চিরস্থায়ী ভালবাসা তবে,
গৌরবে কলঙ্কে যাহা সমান না রবে?
জানিনা, জানিতে আমি চাহিনা, চাহিনা;
ও হৃদয়ে এক তিল দোষ আছে কিনা,
ভালবাসি তোমারেই এই শুধু জানি,
তাই হোলে হল, আর কিছু নাহি মানি।
দেবতা সুখের দিনে বলেছ আমায়,
বিপদে দেবতা সম রক্ষিব তোমায়,
অগ্নিময় পথ দিয়া যাব তব সাথে,
রক্ষিব, মরিব কিম্বা তোমারি পশ্চাতে।

Moore's Irish melodies.

ললিত নলিনী।

(কৃষকের প্রেমালাপ।)

ললিত।

হা নলিনী গেছে আহা কি সুখের দিন,
দোঁহে যবে এক সাথে, বেড়াতেম হাতে হাতে
নবীন হৃদয় চুরি করিলি নলিন!
হা নলিনী কত সুখে গেছে সেই দিন।

নলিনী।

কত ভাল বাসি সেই বনের ললিত,
প্রথমে বলিনু যেথা, মনের লুকানো কথা,
স্বর্গ-সাক্ষী করি যেথা হয়ে হরষিত
বলিলে, আমারি তুমি হইবে ললিত।

ললিত।

বসন্ত বিহগ যথা সুললিত ভাষী,
যত শুনি তত তার, ভাল লাগে গীত ধার,
যত দিন যায় তত তোরে ভাল বাসি,
যত দিন যায় তব বাড়ে রূপ রাশি।

নলিনী।

কোমল গোলাপ কলি থাকে যথা গাছে,
দিন দিন ফুটে যত, পরিমল বাড়ে তত,
এ হৃদয় ভাল বাসা আলো করি আছে
সঁপেছি সে ভালবাসা তোমারিগো কাছে।

ললিত

মৃদুতর রবি কর সুনীল আকাশ
হেরিলে শস্যের আশে, হৃদয় হরষে ভাসে
তার চেয়ে এ হৃদয়ে বাড়ে গো উল্লাস
হেরিলে নলিনী তোর মৃদু মধু হাস।

নলিনী

মধু আগমন বার্ত্তা করিতে কূজিত
কোকিল যখন ডাকে, হৃদয় নাচিতে থাকে
কিন্তু তার চেয়ে হৃদি হয় উথলিত,
মিলিলে তোমার সাথে প্রাণের ললিত।

ললিত।

কুসুমের মধুময় অধর যখন
ভ্রমর প্রণয় ভরে, হরষে চুম্বন করে
সেকি এত সুখ পায় আমার মতন
যবে ও অধর খানি করি গো চুম্বন?

নলিনী।

শিশিরাক্ত পত্র কোলে মল্লিকা হসিত,
বিজন সন্ধ্যার ছায়ে, ফুটেসে মলয় বায়ে,
সে এমন নহে মিষ্ট নহে সুবাসিত
তোমার চুম্বন আহা যেমন ললিত।

ললিত।

ঘুরুক্ অদৃষ্ট চক্র সুখ দুখ দিয়া
কভু দিক্ রসাতলে, কভু বা স্বরগে তুলে
রহিবে একটি চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়া
সে চিন্তা তোমারি তরে জানিওগো প্রিয়া

নলিনী।

ধন রত্ন কনকের নাহি ধার ধারি
পদতলে বিলাসীর, নত করিব না শির
প্রণয় ধনের আমি দরিদ্র ভিখারী,
সে প্রণয় ললিত গো তোমারি তোমারি।

Burns.

বিদায়।

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর প্রবাসে
নব বন্ধু নব হর্ষ নব সুখ আশে।
সুন্দরী রমণী কত, দেখিবে গো শত শত
ফেলে গেলে যারে তারে পড়িবে কি মনে?
তব প্রেম প্রিয়তম, অদৃষ্টে নাইক মম
সে সব দুরাশা সখা করি না স্বপনে
কাতর হৃদয় শুধু এই ভিক্ষা চায়
ভুল' না আমায় সখা ভুল না আমায়।
স্মরিলে এ অভাগীর যাতনার কথা,
যদিও হৃদয়ে লাগে তিল মাত্র ব্যথা,
মরমের আশা এই, থাক্ রুদ্ধ মরমেই
কাজ নাই দুখিনীরে মনে করে আর।
কিন্তু দুঃখ যদি সখা, কখন গো দেয় দেখা
মরমে জনমে যদি যাতনার ভার,
ও হৃদয় সান্ত্বনার বন্ধু যদি চায়
ভুল না আমায় সখা ভুল না আমায়।

Mrs. Opie.

প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালী।

প্রকৃতির ক্রোড়ে শিশুগন কি প্রকারে অবলীলাক্রমে শিক্ষা লাভ করে তদ্‌বিষয়ে পূর্ব্ব-প্রস্তাবে কিঞ্চিৎ লিখিত হইয়াছে। সেই স্বাভাবিক প্রণালী যতদূর অবলম্বন করিয়া শিক্ষা প্রদান করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। সেই প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইলে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিশুগনের মনোবৃত্তি সকল যে নিয়মে ও যে ক্রমাধীন বিকসিত হইতে থাকিবে তাহাদের শিক্ষার বিষয়ও ঠিক্ তদুপযোগী হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে ইহা নিঃসংশয়ে অবধারিত হইয়াছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় মানসিক বৃত্তি সকল যুগপৎ সমভাবে পরিণত না হইয়া ক্রমে অগ্রপশ্চাৎ-রূপে পরিস্ফুটিত হইতে থাকে। এবং মনোবৃত্তির এই প্রকার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তৎ তৎ ব্যাপারোপযোগী জ্ঞান লাভের স্পৃহা ও শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং শিশুদিগের চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতির নিয়ম জানিতে পারিলে প্রকৃত শিক্ষা-প্রণালীও সুস্থির হইতে পারে। মনোবিজ্ঞানের ক্রমশঃ উন্নতি ও আলোচনা-সহকারে এই বিষয়ের প্রকৃত তথ্য যে নিশ্চয়রূপে নিরূপিত হইবেক তাহার সন্দেহ নাই এবং এক্ষণে শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে যে সকল মতভেদ দৃষ্ট হয় তাহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া ঐকমত্য স্থাপিত হইবেক।

কি শারীরিক কি মানসিক উভয়-বিধ উন্নতির যে নির্দ্দিস্ট ক্রম ও স্বাভাবিক নিয়ম আছে তাহা অনেকে বুঝিতে চাহেন না। এবং অনেকে ঐ নিয়মের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও কার্য্যেতে তৎপ্রতি লক্ষ্য করেন না। রোগ হইলে কেবল ঔষধের বলে অবিলম্বে রোগের উপশম হইবেক এই দৃঢ় বিশ্বাসে শরীরের নিয়ম ও স্বভাবের গতির প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া কোন কোন চিকিৎসক অনবরত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে রোগ-শান্তি না হইয়া বিপরীত ঘটিয়া উঠে। শরীরের স্বাভাবিক ব্যাপার ও শক্তির প্রতি উপেক্ষা করাই এই অনিষ্টের কারণ। একটি চারা গাছ স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হইয়া, সুবৃক্ষে পরিণত হইতে যদি পাঁচ বৎসর কালের অপেক্ষা করে, তাহাকে সহস্র প্রকার যত্ন করিলেও কদাপি পাঁচ মাসের মধ্যে সেই রূপ বৃক্ষে পরিণত করা যাইতে পারিবে না। শারীরিক ও মানসিক উন্নতির সম্বন্ধেও তদ্রূপ জানিতে হইবে। অনেক শিক্ষকের সংস্কার আছে যে, বালকগণকে যতই শিখাইবে ততই তাহারা শিখিতে পারিবে। এই প্রত্যয়ে তাঁহারা বালকগণের চিত্তোন্মেষের স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি

কিছুমাত্র দৃষ্টি না রাখিয়া স্বল্পকালমধ্যে বহুতর বিষয়ে শিক্ষিত করিবার দূরাকাঙ্ক্ষায় বালকগণকে অনবরত পাঠাভ্যাসে নিযুক্ত রাখেন। কিন্তু এই প্রকার শিক্ষায় প্রকৃত উন্নতি কদাপি হয় না। বরং তাহাতে যে সমূহ অনিষ্টের উৎপত্তি হয় তাহা পশ্চাতে প্রতিপাদিত হইবে। অতএব স্বাভাবিক শক্তি-অনুসারে শিশুগণের স্মৃতি-শক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি যে পরিমাণে বিকসিত হইতে থাকিবে সেই পরিমাণে তাহাদের বুদ্ধির উপযোগী জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এই সম্বন্ধে কএকটি নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রথমতঃ—শিশুগণকে কোন সাধারণ বিধি বা সাধারণ তত্ত্ব-সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করিবার অগ্রে বিশেষ দৃষ্টান্ত সকল তাহাদিগকে দেখাইতে ও বুঝাইয়া দিতে হইবে। তৎপরে সেই সকল দৃষ্টান্ত হইতে সাধারণ বিধি যে প্রকারে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা ক্রমে তাহাদের মধ্যে উদ্ভাবিত করিয়া দিতে হইবে। এইটি শিক্ষা প্রদানের স্বাভাবিক প্রণালী। লোকে যেমন অগ্রে বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ বিশেষ বস্তু সকল পরীক্ষা করিয়া পরে চিন্তা ও সংকলন-শক্তির বলে সেই সকল ঘটনা বা বস্তু সমূহের পরস্পর সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া তৎ-তৎ সম্বন্ধে সাধারণ বিধি সকলের আবিষ্কার করিয়া থাকে, সেই প্রণালীতে শিশুগণের উপদেশ প্রদান করিতে পারিলে বাস্তবিক স্থায়ী ফল ও উপকার সাধন হয়। অনেকে মনে করেন যে সাধারণ বিধি বা তত্ত্ব সকল অল্প কথায় ব্যক্ত হয় বলিয়া বালকগণ তাহা অনায়াসে শিখিতে ও মনোমধ্যে ধারণ করিতে পারে, সুতরাং তাহাই অগ্রে শিখান উচিত। কিন্তু এই প্রণালী প্রকৃত জ্ঞানের পথ নহে। তাহাতে শিশুগণ অনেক সময়ে কতকগুলি শব্দমাত্র শিক্ষা করে, প্রকৃত জ্ঞানের পরিচয় প্রাপ্ত হয় না।

দ্বিতীয়তঃ—শিশুগণ যে সকল শব্দ অভ্যাস করিবে তাহা যেযে বস্তু বা বিষয়ের প্রকাশক তৎতৎ বস্তু ও বিষয়গুলি তাহারা স্পষ্টরূপে যাহাতে উপলব্ধি করিতে পারে এ প্রকার যত্ন নিয়তই করিতে হইবে। এই বিষয়ের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য না করাতেই শিশুগণের শিক্ষার সমূহ ব্যাঘাৎ জন্মিয়া থাকে। অনেক স্থলে কেবল শিক্ষকের অনবধানতা বা অবহেলা-প্রযুক্ত কেবল কতকগুলি নীরস শব্দাবলী মাত্র কণ্ঠস্থ করাই শিশুদিগের পাঠাভ্যাসের কার্য্য হইয়া পড়ে, কিন্তু এ প্রকার অভ্যাসে সহজেই মনোভিনিবেশ হওয়া সুকঠিন। সুতরাং বালকগণ পাঠে ভঙ্গ দেয়, এবং এপ্রকার শিক্ষায় তাহাদের সহজেই বিতৃষ্ণা জন্মে। শিক্ষক ইহার নিগূঢ় ভাব না বুঝিয়া পাঠাভ্যাসে অনাসক্ত বলিয়া বালকগণকে শাসন করিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু এস্থলে প্রকৃত পক্ষে শিক্ষকেরই দোষ, বালকের নহে। শিশুগণের ক্ষুদ্র বুদ্ধি যে পর্য্যন্ত পরিচালিত হইতে পারে সেই সীমার মধ্যে অনেক বিষয় আছে যাহাতে তাহাদিগকে সমূহ উপকার-জনক শিক্ষা প্রদান করা যাইতে

পারে। সেই সীমা অতিক্রম করিয়া কতকগুলি কঠোর শব্দ মাত্র অভ্যাস করাইলে বিশেষ কোন ফল লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং তাহাতে বিশেষ অনিষ্টোৎপত্তি হইতে পারে। প্রকৃত শিক্ষার নিয়মানুসারে শিশুগণের বর্ণ পরিচয় বা শব্দবোধ হইবার পূর্ব্বে বস্তুপরিচয় হওয়া আবশ্যক। এই বিষয়ে আমাদিগের ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালীর কতিপয় দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদিগের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থার অনুরোধে এতদ্দেশীয় বালকগণকে অল্প বয়সেই বিজাতীয় ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে হয় এবং ইংরাজি শিখিবার জন্য ইংরাজি বালকগণের নিমিত্ত যে সকল পাঠ্য পুস্তক লিখিত হইয়াছে তাহাই এদেশীয় বালকগণের হস্তে সমর্পিত হয়। কিন্তু সেই সকল পাঠ্য পুস্তকে অনেক শব্দ আছে যাহার অনুরূপ বস্তু এতদ্দেশে নাই অথবা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐসকল পুস্তকে অনেক কথা আছে যাহার ভাব এদেশীয় লোকে সহসা উপলব্ধি করিতে পারে না সুতরাং সেই সকল শব্দ ও সেই সকল কথা এতদ্দেশীয় বালকগণকে প্রথম শিক্ষার স্থলে কদাপি অভ্যাস করান কর্ত্তব্য নহে, বাস্তবিক তাহাতে প্রকৃত শিক্ষা কিছুই হয় না।* সেই রূপ ক্ষুদ্র বালকগণকে ব্যাকরণের নিয়ম সকল অভ্যাস করাইবার যে চেষ্টা শিক্ষকগণ করিয়া থাকেন তাহাও প্রকৃত শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধ। অনেকে মনে করেন যে এই প্রকার অভ্যাসে বালকগণের স্মরণ-শক্তি প্রবল হয় কিন্তু তাহাতে শৈশব চিত্ত যে পরিমাণে পরিশ্রান্ত হয় তদনুযায়ী ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না বরং তাহাতে শিক্ষার প্রতি অনাদর ও অনিচ্ছা জন্মিবার সম্ভাবনা। বালককে যে কোন বিষয়ে শিক্ষা দিতে হইবে তাহা শিখিবার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিতে যে পর্য্যন্ত না তাহার যত্ন হয় সে পর্য্যন্ত তদভ্যাসে তাহার কদাপি মনঃসংযোগ হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ—শিশুগণের বিদ্যাভ্যাসে অতিমাত্র মানসিক পরিশ্রম যাহাতে না হয় তদ্‌বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। অনেকে ইচ্ছা করেন যে তাঁহাদের পুত্রগণ নিরবচ্ছিন্ন লেখা পড়ার চর্চ্চা করিবেক এবং অল্প কাল মধ্যে অধিক শিক্ষা করিয়া সকলের নিকট যশোভাজন হইবেক। এই অভিলাষের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা বালকগণকে লেখাপড়া করিবার জন্য সর্ব্বদাই অনুযোগ ও তাড়না করিয়া থাকেন। কিন্তু এটি নিতান্ত গর্হিত কার্য্য। বালকগণের শরীরের ন্যায় মনোবৃত্তি সকল পরিণত হইতে সময় লাগে। এবং যাহাতে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল সামঞ্জস্যভাবে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য-সহকারে পরিবর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হইতে পারে তৎপ্রতি সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহাদের যেমন শক্তি সেই মত পরিশ্রম স্বাভাবিক অবস্থায় সহ্য হয়, তদপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে তাহাদের

*বিলাতী পুস্তকের এই সকল দোষ দেখিয়া মৃত বাবু প্যারীচরণ সরকার এদেশীয় বালকগণের নিমিত্ত যেসকল ইংরাজি পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছেন তদ্দ্বারা উপরোক্ত দোষ অনেকাংশে খণ্ডিত হইয়াছে।

মানসিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ হানি হই-বারই সম্ভাবনা। অন্যাপেক্ষা যে বালকের কিঞ্চিৎ অধিক বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় তাহার পিতা মাতা বা শিক্ষক তাহাকে অধিকতর যত্ন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করাইতে থাকেন, কিছু কাল সে বালক হয় তো বিশেষ উন্নতির পরিচয় দিয়া সকলের নিকট প্রশংসা-ভাজন হয় এবং সেই উৎসাহে অধিকতর পরিশ্রম করিতে থাকে কিন্তু এই অস্বাভাবিক পরিশ্রম হেতু বয়োবৃদ্ধি-সহকারে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বলিষ্ঠ না হইয়া ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া আইসে। সুতরাং তাহার পিতা মাতার বলবতী আশা অবশেষে নিষ্ফল হইয়া যায়।

বাঙ্গালি যুবকদিগের অধিকাংশ ব্যক্তিরই এই শোচনীয় অবস্থা দৃস্ট হয়। তাহারা যে পর্য্যন্ত পাঠদ্দশায় থাকে সে পর্য্যন্ত তাহাদের বুদ্ধির তীক্ষ্নতা, স্মরণ শক্তির প্রাখর্য্য এবং বিদ্যাভ্যাসে সমধিক যত্ন ও অধ্যবসায় দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আশ্চর্য্য শ্রমশক্তি-সহকারে অল্পকালমধ্যে নানাবিধ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করে। কিন্তু বিদ্যামন্দির হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সংসার-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিবামাত্র তাহাদের অধ্যবসায় শ্রম-শক্তি এবং বুদ্ধির প্রাখর্য্য যেন বাষ্পবৎ কোথায় উড়িয়া যায়। সংসারক্ষেত্রে প্রবিস্ট হইয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম ও পারদর্শী হইবেক এই উদ্দেশেই বাল্য কাল হইতে শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু বাঙ্গালি যুবকগণের সম্বন্ধে সেই শিক্ষার ফল কিজন্য এরূপ বিসদৃশ হয় তাহার তথ্য অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ অন্বেষণ করিলে দৃস্ট হইবে যে, বাঙ্গালিদিগের একে স্বাভাবিক দুর্ব্বল প্রকৃতি তাহাতে অল্প বয়সে অতিমাত্র মানসিক পরিশ্রম জন্য শারীরিক ও মানসিক শক্তির হ্রাস হওয়ায় তাহারা অল্প কালেই উদ্যমশূন্য ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

বাস্তবিক বর্ত্তমান সভ্যতার উন্নতি-সহকারে মনুষ্যের যেরূপ সামাজিক অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এবং দিন দিন নূতন নূতন অভাব মোচনের এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যে ব্যয়বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম না করিলে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। পুরাকালে দৈহিক বল-বীর্য্যেরই গৌরব ছিল এবং মানসিক উন্নতির প্রতি অত্যল্প দৃষ্টি ছিল। এক্ষণে সভ্য জনপদমাত্রে তাহার বিপরীত ভাব উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে শারীরিক শক্তির কোন প্রভাব বা গৌরব নাই। এখন কেবল বুদ্ধি ও বিদ্যার বলই প্রধান বল, এবং ধন মান ও পদ-মর্য্যাদা লাভের এক মাত্র সোপান হইয়াছে। বিদ্যা-সাপেক্ষ বিবিধ ব্যবসায়ে ও নানাবিধ কর্ম্ম-ক্ষেত্রে বহুতর লোক প্রতিষ্ঠিত হইয়া জীবিকা আহরণের চেস্টায় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় সেই সকল ব্যবসায় ও কর্ম্মে বিস্তর পরিশ্রম সহকারে পারদর্শী না হইতে পারিলে তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন সুকঠিন হইয়া পড়ে। সুতরাং সর্ব্বত্রই দিন দিন লোকের মানসিক পরিশ্রম সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে।

যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে রহিয়াছে তাহারা আপন আপন পদ ও ব্যবসায় রক্ষা করিবার জন্য অনবরত পরিশ্রম করিতেছে এবং বালক ও যুবকগণ সেই সকল ব্যবসায় ও কর্ম্মে প্রবেশ করিবার অভিলাষে কঠিন পরিশ্রম সহকারে প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। কিসে শীঘ্র শীঘ্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবে সামান্যত অধিকাংশ লোকের এই চিন্তা এই চেষ্টা হইয়াছে। এই জন্যই শিশুগণের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতে না হইতেই তাহাদের বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করাইবার জন্য পিতা মাতা ব্যস্তসমস্ত হইয়া থাকেন। বালকগণ প্রতিদিন কি শিক্ষা করিতেছে, তাহাদের পাঠ কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এই বিষয়েরই সর্ব্বদা অনুসন্ধান লওয়া হয়! কিন্তু তাহাদের শরীরের পুষ্টি-সাধন উপযুক্ত মত হইতেছে কি না তাহা দেখিবার আবশ্যক মনে হয় না। নিয়ত কঠিন মানসিক পরিশ্রম জন্য শীর্ণকায় বলহীন হইতেছে ইহা দেখিয়াও অনেক পিতা মাতা বালককে সেই পরিশ্রম হইতে কিছুকালের জন্য বিরত করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু শরীর ও মনের পরস্পর যে রূপ সংযোগ তাহাতে শারীরিক বল ও শক্তি না থাকিলে মানসিক পরিশ্রম এবং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা সম্যকরূপে হওয়াই অসম্ভব। এজন্য মানসিক উৎকর্ষ ও উন্নতি সাধনের নিমিত্ত শরীরের পুষ্টিসাধন ও বলাধানের প্রতি সবিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। এবং এই বিষয়ের প্রতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল প্রকৃতি বঙ্গবাসীগণের সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা যে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শারীরিক ও মানসিক সমুদায় ব্যাপার এক জীবনী শক্তির প্রভাবে সম্পাদিত হইতেছে। সেই শক্তির বলে ভুক্ত অন্ন পরিপাক হইয়া রক্তে পরিণত হয়, সেই শক্তির প্রভাবে হৃদয়স্থিত রক্ত শিরা ও ধমনীর মধ্য দিয়া পরিচালিত হইয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহের পুষ্টি সাধন করিতেছে, সেই শক্তির দ্বারা আমরা অঙ্গ চালনা ও শারীরিক পরিশ্রম করিতে সক্ষম হইতেছি, সেই শক্তির দ্বারা মনের প্রধান ইন্দ্রিয় যে মস্তিষ্ক তাহা উত্তেজিত হইয়া মানসিক কার্য্য সকল সংসাধিত হইতেছে এবং শরীর ও মনের চালনা হেতু প্রতিদিন দেহের ও মস্তিষ্কের যে ক্ষয় প্রাপ্তি হয় তাহাও সেই জীবনী শক্তির প্রভাবে পূরণ হইতে থাকে। কিন্তু সেই জীবনী শক্তির একটি সীমা ও পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং শরীর সম্বন্ধীয় কোন একটি ব্যাপার সাধনে যদি সেই শক্তি অধিক মাত্রায় নিয়োজিত হয় তাহা হইলে সহজেই অন্য দিকে তাহার কার্য্য মন্দীভূত ও দুর্ব্বল হইয়া আইসে। এই জন্য অতিমাত্র ভোজন করিলে সেই ভুক্ত অন্ন পরিপাকে জীবনী শক্তির অধিকাংশ ব্যয়িত হয় সুতরাং শরীরের অন্য ব্যাপার সকল তখন মন্দীভূত হইয়া শরীর অসমর্থ ও অলস হইয়া আইসে। সে সময়ে কোন শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা হয় না। সেই মত অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করিলে মনোবৃত্তি সক-

লের চালনা করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। এবং মানসিক পরিশ্রম অধিক পরিমাণে করিলে শরীর নিশ্চেষ্ট ও হীন-বল হইয়া পড়ে।

পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির অপেক্ষা বালক ও যুবকগণের শরীরের পুষ্টিসাধনের প্রতি অধিকতর যত্ন করা আবশ্যক। পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিগণের নিত্য শারীরিক ও মানসিক শ্রমোপযোগী বল এবং সেই শ্রমজনিত শারীরিক ক্ষয় পূরণ হওয়া আবশ্যক। বালকগণের শরীরের পরিবর্দ্ধন ও পুষ্টিসাধন-রূপ তদতিরিক্ত আর একটি ব্যাপার আবশ্যক। জীবনী শক্তির অধিকাংশ তাহাদের শরীরের পরিবর্দ্ধন কার্য্যে এবং অঙ্গাদির পরিণতি সাধনেই নিঃশেষিত হয় সুতরাং অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ শক্তি শিশুগণের মানসিক ব্যাপার সাধন জন্য স্বভাবতঃ সঞ্চিত থাকে এবং তদনুযায়ী মানসিক পরিশ্রম করাই শিশুগণের স্বভাবসিদ্ধ। তদতিরিক্ত পরিশ্রম-সহকারে বিদ্যাভ্যাসের অনুরোধে তাহাদের মনোবৃত্তি সকল অতিমাত্র সঞ্চালিত করিলেই অনিষ্টোৎপত্তির কারণ হয়। এই রূপ মানসিক পরিশ্রমে শরীর শীর্ণ ও ক্ষুদ্রাকার হইয়া আইসে এবং মস্তিষ্কের অনবরত চালনা হেতু তাহার আয়তন বৃদ্ধি না হইয়া ক্ষুদ্রাকার রহিয়া যায়। সুতরাং প্রকৃত মানসিক শক্তি বয়োবৃদ্ধি-সহকারে পরিবর্দ্ধিত না হইয়া ক্রমে হ্রাস পাইতে থাকে।

বাস্তবিক প্রকৃতিকে হিসাবে ফাঁকি দিবার উপায় নাই। তাঁহার নিকট একদিকে অতি মাত্রায় আদায় করিয়া লইলে অন্য দিকে তিনি কর্ত্তন করিয়া লইয়া হিসাব সমান করিয়া লয়েন। যদি শরীরের কোন অঙ্গ অকালে অতিমাত্র উত্তেজিত ও অল্পকালে পরিণত করিতে চাহ তাহা হইলে বিরক্ত হইয়া প্রকৃতি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিবেন বটে কিন্তু সেই অতিরিক্ত কার্য্য-হেতু তিনি অপর গুরুতর কার্য্য সকল ফেলিয়া রাখিবেন। শারীর-বিধান বিদ্যার একটি প্রধান তত্ত্ব এই যে, শরীরের পরিবর্দ্ধন এবং সংগঠন রূপ দুইটি ব্যাপার পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন। উভয় ব্যাপার যুগপৎ সমভাবে সাধিত হয় না। যে সময়ে পরিবর্দ্ধন ব্যাপারটি ত্বরিত চলিতে থাকে তখন সংগঠন কার্য্য স্থগিত বা কিয়ৎপরিমাণে মন্দীভূত থাকে। ইহার উদাহরণ নিম্ন শ্রেণীর জীবগণের মধ্যে সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। যে কীট হইতে প্রজাপতির জন্ম তাহার পরিবর্ত্তনের প্রতি দৃষ্টি করিলে প্রতীতি হইবে যে প্রথমাবস্থায় তাহা একটি সামান্য পোকা মাত্র থাকে, তখন তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন কিছুই দৃষ্ট হয় না, এই অবস্থায় ঐ কীটের কেবল আয়তন বৃদ্ধি হইতে থাকে। পরে সম্পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল ক্রমে সংরচিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন দেহের আয়তন আর বাড়ে না বরং কমিয়া যাইতে থাকে। উচ্চ শ্রেণীর জীবগণের দেহে এই দুইটি ব্যাপার যুগপৎ চলিতে থাকে বলিয়া দুইটির পরস্পর প্রভেদ ও বিরোধ এতাধিক স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় না।

তথাপি মনুষ্য জাতির স্ত্রীপুরুষদিগের দৈহিক পরিণতি সম্বন্ধে যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে উপরোক্ত নিয়মের পরিচয় ও প্রমাণ অনেকাংশে প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্ত্রীজাতির শারীরিক গঠনের পরিণতি ও পূর্ণতা পুরুষাপেক্ষা শীঘ্র সম্পাদিত হইতে আরম্ভ হয়। এজন্য তাহাদের বৃদ্ধি অল্প কাল মধ্যে সমাপ্ত হইয়া যায়। বালকগণের শরীরের আয়তন অনেক কাল পর্য্যন্ত পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে কিন্তু তাহাদের অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সকল অনেক কাল পর্য্যন্ত অপূর্ণ ও অপরিপক্ক থাকে। যে বয়সে একটি বালিকার শারীরিক বৃদ্ধি সম্পাদন ও ইন্দ্রিয় সকলের পরিণতি হয় এবং তাহার মনোবৃত্তি সকল তেজস্বী হইয়া উঠে, সে বয়সে বালকের শারীরিক কি মানসিক গঠনের পূর্ণতা সম্পাদিত হইতে অনেক বিলম্ব থাকে। তৎকালে তাহার দেহের বৃদ্ধি ও পুষ্টি সাধন ব্যাপারই বিশেষ রূপে হইতে থাকে। পরিবর্দ্ধন ও সংগঠন সম্বন্ধীয় উপরোক্ত নিয়ম শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ, প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই লক্ষিত হয়। এবং ইহা সামান্যত বলা যাইতে পারে যে, কোন একটি অঙ্গ বা ইন্দ্রিয়ের গঠন-প্রক্রিয়া অকালে বা অত্যধিক মাত্রায় চালিত হইলে তাহার পরিবর্দ্ধন ও পুষ্টি সাধনের ব্যাঘাত অবশ্যই হইবে। শরীরের প্রধান অঙ্গ এবং মানসিক ব্যাপারের প্রধান ইন্দ্রিয় যে মস্তিষ্ক তাহারও সম্বন্ধে এই নিয়ম বলবৎ জানিতে হইবে। বাল্য কালে মস্তিষ্কের আয়তন বড় থাকে কিন্তু তাহার গঠন নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক থাকে। সেই অবস্থায় মানসিক চিন্তা ও মানসিক পরিশ্রম সহকারে যদি মস্তিষ্কের অতিমাত্র উত্তেজনা করা হয় তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক পুষ্টি-সাধন কার্য্য রহিত হইয়া গঠনের পরিণতি হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু এই প্রণালীতে মস্তিষ্কের আয়তন ও শক্তির বৃদ্ধি এক কালে নিবারিত হইয়া যায় এবং পরিণামে তাহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং মস্তিষ্কের এই প্রকার দৌর্ব্বল্য-হেতু মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি সকল স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। এতদ্ভিন্ন অল্প বয়সে অতিমাত্র মানসিক পরিশ্রম হেতু সাধারণ রূপে শরীরের পুষ্টিসাধনেরও ব্যাঘাৎ হয়, তাহাতে * নানা উৎকট রোগ জন্মে এবং মনুষ্যকে বলহীন ও উদ্যম শূন্য করিয়া ফেলে। মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্য হেতু মানুষ যেমন বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা করিতে এবং সামান্যত সকল মানসিক পরিশ্রমে অপারগ হয়, সেই মত তদ্দ্বারা শরীরের আন্তরিক প্রক্রিয়া সকলেরও অনেকাংশে ব্যাঘাৎ জন্মে এবং তজ্জন্য পরিপাকক্রিয়া রক্তসঞ্চালন ইত্যাদি ব্যাপার সকল মন্দীভূত হইয়া আইসে। এই রূপে অল্প বয়সে অতিমাত্র মানসিক পরিশ্রম দ্বারা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া কোন কোন যুবক চিরকালের নিমিত্ত দুঃসহ শিরঃপীড়ায় ভুগিতেছে, কাহার মস্তক ঘূর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়াছে, কাহারো বা হৃৎকম্প অনিদ্রা ও অগ্নিমান্দ্য হইয়া অন্ন পরিপাক হওয়া সুকঠিন হইয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য উদরাময় অম্ল শূল ইত্যাদি কঠিন

রোগ শরীরকে স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়াছে। এই রূপে যে সকল ব্যক্তি বিদ্যামন্দির হইতে রুগ্ন ও ভগ্ন শরীর লইয়া সংসার-ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হয়েন তাঁহাদের দ্বারা জনসমাজের কোন উপকারই প্রত্যাশা করা যায় না। অতিমাত্র ও অস্বাভাবিক মস্তিষ্কের উত্তেজনা করিলে যে কি ভয়ানক ও শোচনীয় ফল উৎপন্ন হয় তাহা এতদ্দেশীয় শিক্ষিত যুবকগণের দৃষ্টান্তে বিশেষ রূপে প্রতিপন্ন হইবেক।

সাংসারিক কর্ম্মক্ষেত্রের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে থাকিয়া যে ব্যক্তি নিজ শক্তি সহকারে জয় লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহার সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে সুস্থ ও বলিষ্ঠ শরীর এবং সুপরিণত মস্তিষ্কের দ্বারা যে কার্য্য হয়, বহুপ্রযত্ন-সহকারে অর্জ্জিত বিদ্যা দ্বারা তাহা সম্পাদিত হয় না। সংসারে অধ্যবসায়ী এবং উদ্যমশীল ব্যক্তিগণ অনেক স্থলে কৃতবিদ্যগণকে অতিক্রম করিয়া আপন উদ্দেশ্য সাধন করিয়া নিজ পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া থাকেন।

অল্পবয়সে অনেক শিক্ষা করিবার আকাঙ্ক্ষায় চিরকালের মত আপনার শরীরকে অসুস্থ ও অপটু করিয়া ফেলার অপেক্ষা অদূরদর্শিতার কার্য্য আর কিছুই নাই। অতএব বালকগণের মনোবৃত্তির যাহাতে অতিমাত্র পরিচালনা না হয় তদ্বিষয়ে সকল পিতামাতার সাবধান হওয়া আবশ্যক। কাঁচা আম্রকে উত্তাপের দ্বারা শীঘ্র পাকাইবার অপেক্ষা গাছে রাখিয়া তাহা সময়ে পরিপক্ক করা ভাল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীগণের উপযুক্ত বয়সের নিয়ম উঠাইবার জন্য যাঁহারা ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাঁহারা এই কথাটি মনে রাখিবেন। ষোল বৎসরের কম বয়সের ছাত্রগণ প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার অযোগ্য বলিয়া যে বিধি করা হইয়াছে তাহা বাস্তবিক সুনিয়ম বলিতে হইবে। উক্ত পরীক্ষার জন্য যে সকল পুস্তক ও যে সকল পাঠ নিরূপিত হইয়া থাকে তাহা সচরাচর ষোড়শ বর্ষের কম বয়সের বালকগণ উপযুক্ত মত শিক্ষা করিতে কদাপি সক্ষম হয় না। তবে দুই একটি মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি বালক তদপেক্ষা অল্পকাল মধ্যে ঐ সকল পাঠের পরীক্ষা দিতে সক্ষম হয় বটে। কিন্তু এরূপ দুই এক জনের অনুরোধে সর্ব্বসাধারণের উপকার-জনক নিয়মটি রহিত করা কর্ত্তব্য নহে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযুক্ত বয়সের নিয়ম সম্বন্ধে যে রূপ দূরদর্শিতা প্রকাশিত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্ব্বিস নামক রাজকীয় কর্ম্মে প্রবেশ জন্য পরীক্ষার্থীগণের যোগ্যতা-সূচক বয়সের যে উচ্চসীমা অবধারিত হইয়াছে তাহা যে উচিত বিবেচনার সহিত হইয়াছে ইহা কদাপি বলা যাইতে পারে না।

ত—

ভারতবর্ষীয় ইংরাজ।

(পরিশিষ্ট)

ইংরাজেরা যেমন পুলিষ কোর্টে আমাদের রীতি নীতি স্বভাব চরিত্র শিক্ষা করেন আমরাও তেমনি হয়ত লাল বাজারের গোরাকে ইংরাজ জাতির আদর্শ-রূপে গ্রহণ করি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কর্ম্মক্ষেত্রে তাহাদের সঙ্গে আমাদের যা কিছু আলাপ পরিচয়, কিন্তু তাহারা আপনাদের মধ্যে কিরূপে জীবন যাপন করে, তাহাদের গার্হস্থ্য প্রণালী সামাজিক রীতি নীতি কিরূপ, তাহা এদেশে আমরা নবেল পড়িয়া যাহা কিছু জানিতে পারি, লৌকিক ব্যবহারে অল্পই দেখিতে পাই। ইংরাজেরাও আমাদের ভিতর-কার ভাব অল্পই দেখিতে পান। তাঁহারা আমাদিগকে যেরূপ ভাবে দেখেন তাহা আমরা মেকলে-কৃত ওয়ারেন হেষ্টিংস প্রস্তাবে বঙ্গবাসীদিগের চরিত্র পাঠে কতক অবগত হইতে পারি। দেশীয় সম্বন্ধে তাঁহাদের মতামত বিবেচনা করিতে গেলে তাঁহাদিগকে সামান্যতঃ দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দলের মত দেশীয়-দিগের প্রতি সদ্ব্যবহার, ভারতবর্ষের শুভ উদ্দেশে ভারতবর্ষ শাসন, উপযুক্ত হইলে তাহাদিগকে উচ্চ পদ উচ্চ অধিকার প্রদান। অপর দলের ভাব স্বার্থপরতা—"হিন্দুস্থান তাঁহাদেরই ভোগের বস্তু, হিন্দুরা কখনই স্বাধীনতার উপযুক্ত নহে, চিরকালই তাহাদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করিতে হইবে। ইংরাজদের সঙ্গে সমকক্ষ হইয়া চলিতে যাওয়া তাহাদের স্পর্দ্ধা মাত্র। এদেশ ইংরাজেরা তরবারির বলে জয় করিয়াছে, তরবারির বলে তাহাদের রক্ষা করিতে হইবে। প্রীতি সৌহার্দ্দ্য ভ্রাতৃভাব স্বাধীনতা এ সকল কেবল মুখে বলিবার জিনিস, কাজের নহে। কৃষ্ণবর্ণ জাতি কখন শ্বেতাঙ্গদের সমান অধিকার লাভের যোগ্য নহে। যদি হইত ত ইংরাজদের এদেশ অধিকারের ক্ষমতা থাকিত না। তাহাদিগকে সমান অধিকার দিলে ইংলণ্ডের মর্য্যাদার হানি হইবে। যাঁহারা আপনাদের শরীর পতন করিয়া ভারতবর্ষ জয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিজ সন্তান সন্ততিগণকে উপেক্ষা করিয়া দেশীয়-দিগের মর্য্যাদা রক্ষা নিতান্ত অবিচারের কার্য্য। দেশীয়দিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিয়া, দেশীয়দিগকে স্বাধীনতা শিক্ষা দিয়া, আপনাদের পদচ্যুতির সোপান করিয়া দেওয়া নিতান্ত মূর্খতার কার্য্য। এরূপ নিঃস্বার্থ উপদেশ দেওয়া ভণ্ডামি মাত্র।" দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে ভারতবর্ষীয় ইংরাজদের মধ্যে এই শেষোক্ত দলের সংখ্যাই অধিক। ইংরাজি সংবাদ পত্র সকলকে যদি এই দুই দলের প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা

হইলে এই দুই দলের আপেক্ষিক বল ও সংখ্যা সহজে অবধারিত হইতে পারে।

আর কতকগুলি ইংরাজ আছে (সংখ্যা তাহাদের অল্পই) এক কথায় যাহাদের মত এই যে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের গলগ্রহ মাত্র, আর সে এমন গলগ্রহ যে তাহা হইতে নিষ্কৃতিরও উপায় নাই। এই সম্বন্ধে ইংলণ্ডের এক মাসিক সমালোচনী পত্রিকায় (The Fortnightly Review November The foreign dominions of the Crown) পার্লমেণ্ট সভার সভ্য সুবিখ্যাত লো সাহেব স্বীয় অভিপ্রায় যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম পাঠকদিগের গোচরার্থ নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"প্রথমে যাহারা ভারতবর্ষে ব্রিটিষ রাজ্য সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাদের স্বার্থ-সাধন ভিন্ন আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ইংলণ্ডের গৌরব-বৃদ্ধি অথবা ভারতবর্ষবাসীদিগের কল্যাণসাধন—এরূপ কোন ভাব তাহাদের মনে উদয় হয় নাই। এক দল ব্যবসায়ীর কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া তাহাদের ভারতবর্ষে প্রবেশ—তাহারা বিলক্ষণ অবগত ছিল যে যাহা কিছু করিয়া লইতে হইবে সে কেবল তরবারির বলে। কত কত দেশ উচ্ছন্ন গেল—কত রাজ্য ও রাজা বিনষ্ট হইল—কত লুটপাট আরম্ভ হইল—ইংলণ্ডের সেনাগণ ক্রীত ডাকাতের কার্য্যে নিযুক্ত হইল—নিরপরাধী নিরীহ স্ত্রীগণ লুণ্ঠিত হইল—দৈব মানব সকল প্রকার নিয়ম পদতলে দলিত হইল—এ সকলি অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশে। ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যেক অভিযোগ সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান। উপায় যেমনই নিষ্ঠুর ও কলঙ্কিত হউক না কেন—জয়লাভ তেমনি সম্পূর্ণ হইয়াছিল। যদি ক্লাইব কিম্বা হেষ্টিংসকে জিজ্ঞাসা করা যাইত—তোমাদের ভারতবর্ষে হুলুস্থুল বাধাইবার অভিসন্ধি কি? তাঁহারা অনায়াসে উত্তর দিতে পারিতেন—কোম্পানি বাহাদুরের আয় বৃদ্ধি। আর যদি অকপট ভাবে উত্তর করিতে ইচ্ছা করিতেন তবে ইহাও বলিতে পারিতেন—"আর আমাদের নিজেরও যৎকিঞ্চিৎ কাজ গোছান"। কিন্তু এ ভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই। তাহাদের কার্য্য-প্রণালী সময়োচিত হয় নাই। যদিও হেষ্টিংস্ নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইলেন, তাঁহার বিচারে যে সকল ব্যাপার প্রকাশিত হইল তাহাতে অবশেষে ইংলণ্ডের ধর্ম্ম-বুদ্ধি জাগ্রত হইল। ক্রমে এই সকল অন্যায় অত্যাচার সংশোধিত হইল—বল ও যথেচ্ছাচারিতার পরিবর্ত্তে ন্যায় ও সুবিচার সংস্থাপিত হইল। বিজয়ী কোম্পানিকে প্রথমে ব্রিটিষ রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করিতে হইল ও পরে তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হইল। যদি রোমীয়দের রাজ্য হইত ত তাঁহারা ভারতবর্ষ হইতে বার্ষিক ২০ কোটি টাকা আদায় করিয়া লইতেন—ব্রিটিষ রাজ্য নিজের জন্য এক পয়সাও গ্রহণ করেন না। প্রত্যুত ইংলণ্ডের নাবিকগণ ভারতবর্ষ রক্ষার জন্য বিনা বেতনে যে কর্ম্ম করে তাহা ধরিতে

গেলে তজ্জন্য ও অন্যান্য বিষয়ে ভারতবর্ষের উপর আমরা ন্যায়ত অনেক টাকার দাবী করিতে পারি সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষকে করদ রাজ্যরূপে গণ্য করা দূরে থাকুক আমরা উল্টা তাহাকে সাহায্য দানে সমুৎসুক। যদিও তাহার রাজস্বের সংখ্যা ৫০ কোটি পৌণ্ড, আর ধনীরা তাহাতে প্রায় কিছুই দেন না, তথাপি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সাধ্যায়ত্ত নিজ কর্ত্তব্য সাধনে (দুর্ভিক্ষ মোচন) সাহায্য দিবার জন্য আমরা চাঁদা করিয়া টাকা উঠাইতে প্রস্তুত —আরো শুনা যাইতেছে শতকরা দুই এক টাকা সুদ বাঁচাইবার জন্য আমরা তাহার দুর্ভিক্ষ নিবারণ কার্য্যে টাকা ধার করিয়া উঠাইতে প্রস্তুত—আর ইংলণ্ডীয় করদাতা প্রজাগণ, যাহাদের উপর তাহাদের নিজের দরিদ্র-ভরণের ভার সমর্পিত, তাহাদের হইয়া ভারতবর্ষকে সমুদায়ে ৫০ কোটি টাকা উপঢৌকন দেওয়া হয়, এরূপ প্রস্তাবও শ্রবণ করা যায়।

"ভারতবর্ষ হইতে লুটপাট মারপীট অন্যায় অত্যাচার সকল উঠিয়া গিয়াছে শুধু তাহা নয়, ভয় হইতেছে পাছে তাহার জন্য আমাদের অর্থ লুণ্ঠন আরম্ভ হয়। ভারতভূমি আমাদের কতই আদরের ধন—সোহাগের বস্তু—নাই পাইয়া নষ্ট শিশু তুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ যে চিরকালই আমাদের উপর তাহার নির্ভর করিয়া থাকিতে হইবে—কেবল তাহা নহে, সে আমাদের নিকট হইতে কত আদর কত যত্ন পায়, আর যে সকল উপনিবেশ আমাদের নিজের সৃষ্টি তাহাদের গতি কি হয়, তাহার প্রতি আমাদের ভ্রূক্ষেপও নাই।

"ভারতের উপর আমাদের ত এইরূপ স্নেহ দৃষ্টি। ইহার উপর আমাদের যতটা অনুরাগ ও মমতা, ইহা হইতে তদুপযোগী লাভ উৎপন্ন হয় কিনা জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে? এক এই বলা যাইতে পারে যে ভারতের সহিত আমাদের যেরূপ ব্যবহার তাহাতে পৃথিবী-শুদ্ধ লোকে আমাদের পরোপকার-ব্রত ও নিঃস্বার্থ ভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইতেছে। আমরা এইক্ষণে ভারতের সঙ্গে যে ভদ্র ব্যবহার করিতেছি তাহাতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সকল দোষের প্রায়শ্চিত্ত যতদূর সাধ্য তাহা হইয়াছে। আমরা জগৎকে দেখাইতেছি যে অল্পসংখ্যক ইউরোপীয় কর্ত্তৃক কিরূপে কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জের মধ্যে শান্তি সুনিয়ম সৌরাজ্য বিস্তার হইয়া তাহাদের অবস্থার সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছে—যাহা তাহাদের আপনাদের যত্নে কখনই হইতে পারিত না ও আমাদের সাহায্য বিনা এক বৎসর কালও স্থায়ী হইত না। এই সুদৃশ্যটি আমরা পৃথিবীর সম্মুখে প্রকাশিত করিয়া আপনাদিগকে যথার্থ গৌরবান্বিত মনে করিতে পারি। কিন্তু একথা থাক্—ভারতবর্ষ হইতে আমাদের পুণ্য লাভের কথা হইতেছে না—আসল প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য এই, তাহা হইতে আমাদের বৈষয়িক লাভ কত দূর হইতেছে?

"এক এই লাভ অবশ্য স্বীকার করিতে

হইবে যে আমাদের মধ্যে অনেক গুণবান ও কর্ম্মিষ্ঠ লোক যাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র আমাদের দেশে অতি সঙ্কীর্ণ, তাহাদের জন্য ভারতবর্ষে অনেক গুলি উচ্চ অর্থকর যশস্কর পদ উন্মুক্ত রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষাও অধিকতর লাভ এই যে, ভারতবর্ষীয় সিবিল সর্বিস সাধারণের জন্য মুক্ত হওয়াতে বিদ্যাশিক্ষার বিশেষ উত্তেজনা লাভের এবং গুণ ও পরিশ্রমের পুরস্কার প্রদানের এক প্রকৃষ্ট উপায় যোজনা হইয়াছে। আমরা ভারতবর্ষের প্রশস্ত কার্য্যালয়ে প্রবেশ করিয়া যে সকল নিয়ম বন্ধন করিয়াছি তাহাতে আমাদের গুণবান্ বিদ্বান্ যুবকগণ যেমন তাহাদের উপযুক্ত কর্ম্ম-ভূমি পাইতেছে সেই অনুসারে ভারতবর্ষীয়দেরও উপকার সংসাধিত হইতেছে।

"ভারতবর্ষীয় রাজস্বের সদ্ব্যয় ও শৃঙ্খলা বন্ধন আমাদের সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। লবণের উপর অযথোচিত কর ও শুল্ক আদায় সম্বন্ধে আর যে কতকগুলি দোষ ও অজ্ঞতা দৃষ্ট হয়, কালে তাহা বিলুপ্ত হইবে। যাহা হউক্, ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে যে, বার্ত্তা শাস্ত্রের নিয়ম বহির্ভূত যে সকল শুল্ক ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজ্যের রাজস্ব-প্রণালীর কলঙ্ক স্বরূপ তাহা হইতে আমরা ভারতবর্ষকে মুক্ত রাখিয়াছি। মানবজাতির এমন বিস্তৃত জন-সংখ্যার মধ্যে যে আমরা শান্তি ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছি—যে সকল শক্তি পরস্পরের প্রতিঘাত ও বিনাশ সাধনে নিয়োজিত হইত তাহা যে পরিশ্রম ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতে পারিয়াছি ইহাও বিশেষ প্রশংসার বিষয় বলিতে হইবে। প্রজার প্রতি রাজার কর্ত্তব্য কি—প্রজাদের পরস্পর কিরূপ সদ্ভাবে চলা কর্ত্তব্য তাহার উচ্চ আদর্শ আমরা আর আর জাতির সম্মুখে ধারণ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইতেছি। ভারতরাজ্য হইতে আমাদের যাহা কিছু উপকার লাভ হইতেছে তাহার তালিকা এক প্রকার প্রদর্শিত হইল। আর অধিক কিছু ভাবিয়া পাওয়া যায় না। এখন অন্য দিকটা দেখা যাটক—এই সকল উপকার সাধনের জন্য আমাদের কতটা ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে।

কোন কোন জ্ঞানবান বিচক্ষণ ব্যক্তির মত এই যে, ভারতবর্ষ অধিকারে আমাদের মহা কার্য্যদক্ষতা ও দূরদর্শিতা প্রকাশ পাইতেছে। তাহার উত্তর. এই—যদি ইহা হইয়া থাকে ত তাহা আমাদের ভাগ্যের গুণে বুদ্ধিবলে নহে, কেন না ভারত-বিজয় ইংলণ্ডের মতামত-সাপেক্ষ ছিল না। ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট ও প্রজাগণ, ভারত-বিজয়ে যাহাদের প্রকৃত ইষ্টানিষ্ট, তাহাদের সে বিষয়ে কোন হস্ত ছিল না। পলাশীর যুদ্ধ হইতে একবার আমাদের রাজত্ব স্থাপিত হইবার পর, বিগ্রহের পর সন্ধি সন্ধির পর বিগ্রহে দেশীয় রাজ্য সকল ক্রমে আমাদের পদতলে বিদলিত হইল। আমরা প্রথম হইতে একেবারে হস্তক্ষেপ না করিতাম সে এক, কিন্তু কতক দূর অগ্রসর হইয়া এখন 'থামা যাক আর কাজ নাই'

এরূপ বলিবার আর আমাদের সামর্থ্য রহিল না। এখন ত আমাদের অবস্থা আরো ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে। এখন আর আমাদের পিছু হটিবার যো নাই। এই কোটি কোটি প্রজাপুঞ্জ যে রাজ্যের অধীন ছিল তাহা আমরা স্বার্থ-সাধন-উদ্দেশে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের উপর রাজত্ব স্থাপন করিবার ভার লইয়াছি। ইহা নিশ্চয় যে এখন আর আমাদের মত পরিবর্ত্তনের উপায় নাই, আমরা স্বহস্তে দেশীয় রাজ্য উচ্ছিন্ন করিয়া এক্ষণে প্রজাদিগকে অরাজকতার অন্ধকূপে পুনরায় নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারি না। বহু দূরস্থ ভবিষ্য কালেও কখন যে এমন সময় আসিবে যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন ভাবে স্বরাজ্য পরিচালনে সক্ষম হইবে তাহারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ভারতবর্ষের সহিত আমাদের বিচ্ছেদ দুই কারণে হইতে পারে, হয় ভিতর হইতে বিদ্রোহোৎপত্তি—অথবা বাহির হইতে শত্রুর আক্রমণ। ভারতের সহিত আমাদের ভাগ্য এরূপ সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে যে ইচ্ছা করিলেও আমরা সে সম্বন্ধ ভগ্ন করিতে পারি না। ইহা আমাদের সামান্য বিপদ নহে। দূরদর্শী রাজা এমন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না যাহাতে স্বীয় রাজ্যের ভাবী ভাগ্যের উপর নিজের অধিকার একেবারে তিরোহিত হয়। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষের রাজস্ব সম্বন্ধেও আমাদের ঘোরতর সঙ্কট উপস্থিত হইতে পারে। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের কথার উপর নির্ভর করিয়া কোটি কোটি মুদ্রা ধার দেওয়া হইয়াছে—পার্লমেণ্ট পর্য্যন্ত এই ঋণের সঙ্গে জড়িত। মনে কর, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট কোন কারণে এই ঋণের টাকা প্রদানে অসমর্থ হন। তখন যদি উত্তমর্ণগণ ব্রিটিষ ধনকোষের উপর দাবী করিতে প্রবৃত্ত হয় ত তাহা খণ্ডন করা আমাদের পক্ষে সহজ হইবে না। বলা যাইতে পারিবে যে পার্লমেণ্টের অধীনস্থ ব্রিটিষ রাজ্যের রাজমন্ত্রীগণ স্বয়ং এই টাকা কর্জ্জ করিয়াছেন ও ঐ টাকা পরিশোধের জন্য রাণী নিজে কথা দিয়া দায়ী হইয়াছেন।

ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া—শুধু অধিকার করিয়া নয়, তথায় শান্তি ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া আমাদের এক লাভ এই হইয়াছে যে, সে দেশে আমাদের বানিজ্য ব্যবসা নির্বিঘ্নে চলিবার সুবিধা হইয়াছে। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত ইংলণ্ডের বাণিজ্য ব্যবসায় ঘটিত সম্বন্ধ—সেই সকল দেশে রাজ্যের সুব্যবস্থা শান্তি ও ধন সমৃদ্ধি স্থায়ী হইলে তাহাতে ইংলণ্ডের নিজের স্বার্থ সন্দেহ নাই। কিন্তু এই স্বার্থের পূর্ণ ফল লাভের জন্য ইহা আবশ্যক যে অন্যান্য স্থানে তাহারা যে মূল্যে যে প্রকার সামগ্রী পাইতে পারে আমরা তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সামগ্রী অল্প মূল্যে আনয়ন করি। কিন্তু ইহা সকল সময় হইয়া উঠে না। ভারতবর্ষে শ্রমের মূল্য অপেক্ষাকৃত সুলভ, এই জন্য এবং অন্যান্য কারণে ভারতবর্ষীয়গণ আমাদের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া

উঠিতেছে। অতএব বাণিজ্য সম্বন্ধীয় লাভ অপ্রতিহত ও স্থায়ী লাভ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

এই সম্বন্ধে আর একটী গুরুতর বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। ভারতের উপর আমাদের যে অধিকার তা কিসের বলে? বাহির হইতে বিদেশীয় শত্রুর আক্রমণের ভয় বিচার-যোগ্য কিন্তু তাহা দূরে থাকুক ইহা ত অপ্রকাশ নাই যে আমাদের রাজত্ব রক্ষাহেতু সেই উষ্ণদেশে প্রায় ৭০০০০ ব্রিটিষ সৈন্য রাখিবার প্রয়োজন হইতেছে। আমরা দেশীয়দের সদ্ভাব রক্ষা ও প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্য যতই চেষ্টা করি না কেন তথাপি ব্রিটিষ সৈন্যের সাহায্য ব্যতীত আমাদের চলে না। আর কোন কালে যে তাহা ছাড়িয়া চলিবে তাহারও কোন সম্ভাবনা নাই। এই সকল সৈন্য রক্ষার জন্য যে ব্যয়ের আবশ্যক তাহা ভারতবর্ষীয় রাজস্ব হইতে নির্ব্বাহিত হয় সত্য তথাপি এই কারণে আমাদিগকে অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় না। আমাদের রাজ্য সম্বন্ধীয় স্বাধীনতা এইরূপ যে, আমরা কোন প্রজাকে তাহার ইচ্ছা-বিরুদ্ধে সৈন্যদলে ভুক্ত করিতে পারি না। আমরা যে কেবল লোক-সংখ্যায় দরিদ্র তাহা নয় কিন্তু অপরাপর স্থলে অধিক বেতনে কর্ম্ম লাভের যেরূপ সুবিধা তাহাতে সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস হইবার আর এক প্রধান কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষ তাঁহার নিজের সন্তানগণকে ভক্ষণ করেন না বটে কিন্তু ইউরোপীয় রাজপুরুষদের উপর তাঁহার এরূপ কটাক্ষ যে ঐদেশের জলবায়ুর গুণে ইউরোপীয়দের যে ধ্বংস, তাহা অনেক ঘোর রক্তস্রাবী যুদ্ধজনিত নিপাতের সমতুল্য। ১৮৫৭ সালের সিপাই বিদ্রোহের ফল কি হইয়াছিল বিবেচনা কর। আমরা তৎপূর্ব্বে যে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলাম তাহাতে আমাদের সৈন্য-সংখ্যা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল। আমাদের ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলও নানা কারণে ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ও সে ক্ষতি পূরণ না হইতে হইতেই ভারতবর্ষে এক মহা বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইল। কত কষ্টে কত সাহসী ও অনুরাগী ব্রিটিষ সৈন্যের অতুল বীর্য্য উদ্যম সাহস পরাক্রমে—কি ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের পর তবে আমাদের রাজ্য প্রলয় দশা হইতে উদ্ধার পাইল। ইহা যেন কেহ মনে না করেন এইরূপ সঙ্কট চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে না। যদি ইংলণ্ড আর এক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন ত আমাদের সৈন্যাভাব তেমনিই উপলব্ধি হইবে—তেমনি বিপদ উপস্থিত হইবে। মনে কর সিপাই বিদ্রোহ আর এক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইত অথবা ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ আর এক বৎসর অধিক স্থায়ী হইত। তাহা হইলে কি হইত? তাহা হইলে রুসিয়ার রণক্ষেত্রে আমাদের আরো অধিক সৈন্য পাঠাইবার আবশ্যক হইত। আবার এদিকে ভারতবর্ষে আমাদের অল্প সংখ্যক প্রপীড়িত সৈন্য-দলের সাহায্যে লোক না পাইলে সিবিলিয়ন দলের ইংরাজগণ ও তাহাদের অসহায় স্ত্রী পুত্রের সমূহ বিপদ উপস্থিত—এরূপ স্থলে কি

করা যাইত? উভয় পক্ষ রক্ষা করিতে কি আমরা কৃতকার্য্য হইতাম? তাহা না হইলে কোন্ পক্ষকে কাল-কবলে ছাড়িয়া দিতে প্রবৃত্ত হইতাম?

"যে সকল লেখক ও বক্তা ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের মহামূল্য মণি বলিয়া বর্ণনা করে তাহাদের বাক্যের সত্যতা বিষয়ে এখন আমরা বিবেচনা করিতে পারি। তাহাদের মতে ভারতবর্ষ গেলে ইউরোপীয় রাজ্য-মণ্ডলীতে ইংলণ্ডের প্রাধান্য বিনষ্ট হইবে। আমাদের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যদি কখন আমাদিগের বিপদে পড়িতে হয় ত সে কেবল ভারতবর্ষেরই জন্য। আমরা অতীত ঘটনা হইতে যে শিক্ষা ও বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছি তাহা ইউরোপীয় জাতিদের সহিত ব্যবহারে কার্য্যে আসিতে পারে। আমরা আমাদের পরস্পরের ভাব বুঝিতে পারিয়াছি—আমাদের মতাভিমত উদ্দেশ্য অনেকটা সমান। কিন্তু ভারতবর্ষীয়দের মনোগত অভিপ্রায় বোধে আমরা কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি? এই রূপ শুনা যায় যে ভারতবর্ষীয় মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে আমরা তুর্কির সুলতানের করদ আশ্রিত প্রজা। চর্বিযুক্ত কাট্রিজে যেমন সিপাহি বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়—পাগড়ীর আকার পরিবর্ত্তনে যেমন বেলোরে বিদ্রোহ সমুদ্ভূত হয়, কে বলিতে পারে কখন এইরূপ কোন সামান্য কারণে আমাদের ভারতবর্ষীয় রাজ্যে মহা হুলুস্থূল বাধিয়া যাইবে?"

শ্রীস—

প্রাচীন ভারতের শিল্প।

এক সময়ে এই ভারতবর্ষে কি পর্য্যন্ত শিল্পোন্নতি হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত আমরা "প্রাচীন ভারতের শিল্প" এই শীর্ষক প্রস্তাব প্রচার করিয়া আসিতেছি।

পঞ্চম সংখ্যক ভারতীতে ব্যক্ত করিয়াছিলাম যে, যাহাতে বাস্তবিক শিল্প-সংযোগ আছে, তাহা প্রচার করিবার পূর্ব্বে আমরা ভারতে জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের আবির্ভাব নির্ণয় করিয়া, পশ্চাৎ সে গুলি ব্যক্ত করিব। কোন কারণ বশত সে অধ্যবসায় হইতে আপাতত ক্ষান্ত হইলাম। তথাপি আমরা এস্থলে বলিয়া দিতেছি যে, যাহাকে আমরা অতি আধুনিক মনে করিয়া থাকি, সেই সিদ্ধান্ত-শিরোমণি নামক গ্রন্থ খানির উপর দিয়া অন্যূন ৮০০ শত বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ইহাই যথেষ্ট, আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। চিন্তাশীল ভারতী-পাঠকগণ এই ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বের ভারতবর্ষ এবং ইয়ুরোপে মনোরথে গমন করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইব, তাঁহারাও সন্তুষ্ট হইবেন।

৮০০ বৎসরের পূর্ব্বের ইয়ুরোপে যাইতে বলিতেছি কেন? তাহা শুন। কতকগুলি লোকের এমন এক প্রকার স্বভাব আছে, যাহা চিন্তাশীলদিগের নিকট কূপমণ্ডূকতা দোষে আঘাত বলিয়া প্রতীত হয়। এই শ্রেণীর লোকেরা মনে করেন যে, ইংরাজ-জগৎ একটি নূতন জগৎ, ইংরাজ-সৃষ্টি নূতন সৃষ্টি। "আমাদের অমুক বস্তু ছিল" বলিলে যদি তাহা কোন অংশে ইংরাজ সৃষ্টির সদৃশ হয় তবেই তাঁহারা বলিয়া ফেলেন, "ইহা কৃত্রিম—আধুনিক ইংরাজ-দিগের দেখিয়া কোন ধূর্ত্ত ভট্টাচার্য্য বচন গড়িয়া দিয়াছে।" কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা জানেন না কাল অনুসারে পুরাতন বস্তুরও 'নূতন' সংজ্ঞা হইয়া থাকে। আমাদের সময়েও কোন বস্তু যদি দীর্ঘকাল লুপ্তাবস্থায় থাকে, আর তাহা কিম্বা তাহার সদৃশ বস্তু যদি আমাদের নিম্নতন বংশ-পুরুষের সময়ে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তাহা তাহারা নূতন বলিয়া স্থির করিবে সংশয় নাই। সূর্য্যসিদ্ধান্ত-রচয়িতা নানা-বিধ যন্ত্রের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, এই সকল যন্ত্র সাক্ষাৎ সূর্য্যের রচিত, কিন্তু ইহা সময়ে সময়ে লোপ হয়, আবার কোন বুদ্ধিমান্ দ্বারা তাহাই প্রস্তুত হয়। বস্তু এক, কিন্তু প্রত্যেক আবির্ভাবে কিছু কিছু বা কোন এক অংশে প্রভেদ থাকে মাত্র।

"যুগে যুগে সমুচ্ছিন্না রচনেয়ং বিবস্বতঃ।
প্রসাদাৎ কস্যচিদ্ভূয়ঃ প্রাদুর্ভবতি কামতঃ।"
১৩,১৮, সূ।

তথাপি আমরা বলিতেছি যে, যে যে স্থানে আধুনিকত্ব শঙ্কার সম্ভাবনা, সেই সেই স্থানের মূল এবং সেই সেই গ্রন্থের নামাদি প্রদান করিব, যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, দেখিয়া লইতে পারিবেন।

কাল-সাধন যন্ত্র ত্রিবিধ। অবহ ও স্বয়ংবহ এবং ঘটী। অবহ যন্ত্র কি? লিখন-ভঙ্গীতে জানা যায় যে, তাহা ছায়া-সাধক যন্ত্র। স্বয়ংবহ যন্ত্র সেরূপ নহে, তাহার প্রক্রিয়া ভিন্ন। এ সমস্তই আমরা প্রদর্শন করিব, কিন্তু এবিষয়ে ভারতী-পাঠকগণের ধৈর্য্যের আশা করি।

এই 'অবহ' জাতীয় যন্ত্র অনেক আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে সূর্য্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থকার ৪টি এবং সিদ্ধান্ত শিরোমণি ৫টি যন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"কালসংসাধনার্থায় তথা যন্ত্রাণি সাধয়েৎ"
১৩,১৯।

"শঙ্কু যষ্টি ধনুশ্চক্রৈ শ্ছায়াযন্ত্রৈরনেকধা।
গুরূপদেশাদ্বিজ্ঞেয়ং কালজ্ঞানমতন্দ্রিতৈঃ॥"
১৩,২০।

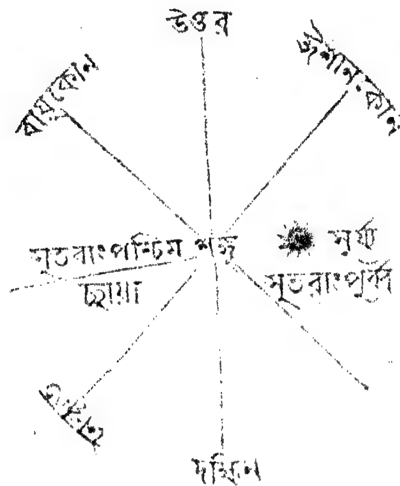
শঙ্কু, যষ্টি, ধনু ও চক্র প্রভৃতি ছায়া-সাধক যন্ত্র অনেক প্রকার আছে। সে সকল জ্ঞান গুরু-উপদেশ-সাপেক্ষ।

শঙ্কু যন্ত্র।—এই শঙ্কুযন্ত্র যে কেবল কাল জ্ঞানেরই সাধক এমন নহে; ইহার দ্বারা দিক্ ও দেশাদির জ্ঞানও হইয়া থাকে। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি গ্রন্থে ভাস্করাচার্য্য বলি-য়াছেন যে, "জ্ঞানং দিগ্‌দেশকালানাম্।" দিক্ নির্ণয়ও ইহার দ্বারা হয়। ইহার আ-কার কিরূপ? তাহা নিম্ন লিখিত বাক্যের দ্বারা বুঝিয়া লও। ইহার গণিত বিচার

এবং সংস্থাপন-নির্ণয় চক্ষে না দেখিলে বুঝা যায় না, বুঝানও যায় না। কাশীস্থ মান-মন্দিরে এখন কিছু নাই, কিন্তু যখন ছিল, তখন যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা অধ্যয়ন না করিলেও গুরুর নিকট শিক্ষা না করিলেও বুঝিতে পারিতেন।

"সমতলমস্তকপরিধির্ভ্রমসিদ্ধো দন্তিদন্তজঃ শঙ্কুঃ।

তচ্ছায়াতঃ প্রোক্তং জ্ঞানং দিগ্‌দেশকালানাম্‌॥" সি. ভা।



মস্তক ও পরিধি সমতল, কিংবা তলভাগ, মস্তক ও পরিধি সমান, হস্তিদন্তনির্ম্মিত শলাকাকে ভ্রম-সিদ্ধ অর্থাৎ ঘুরিবার যোগ্য করিয়া লইয়া তাহার ছায়ার দ্বারা কাল-জ্ঞানের বিধি বলা হইয়াছে এবং ইহার দ্বারা দিক্‌ নির্ণয়ের ব্যবস্থাও উক্ত হইয়াছে।

ইহার দ্বারা এই যন্ত্রের সমস্ত কৌশল অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা বুঝা যাইতেছে যে, এই শলাকার দ্বারা যে কৌশলে বা যে প্রক্রিয়ায় কাল-নির্ণয় হয়, দিক্‌-নির্ণয় কালে তাহার অন্য প্রক্রিয়া বা অন্যবিধ কৌশল আছে। তাহা কি? আমরা জানি না। জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিতেরাই তাহা জ্ঞাত আছেন।

প্রক্রিয়া—"যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভানুঃ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।" যেখান হইতে যাহারা সূর্য্যকে প্রথম দেখে, তাহাই তাহাদের নিকট সূর্য্যোদয় বলিয়া প্রথিত এবং তাহাই তাহাদের পূর্ব্ব দিক্‌। সূর্য্যের উদয়াবধি অস্ত পর্য্যন্ত বস্তু মাত্রেরই ছায়া থাকে এবং তাহা সূর্য্যের বিপরীত দিকেই পতিত হয়। এই নিয়মানুসারে উদয়-কালের ছায়া পশ্চিমবাহিনী হয় এবং সূর্য্যের আবর্ত্তনের সঙ্গে ছায়াও আবর্ত্তিত হইতে থাকে। সেই কারণে সূর্য্য পশ্চিমে গমন করিলে ছায়া সকল পূর্ব্ববাহিনী হইয়া দাঁড়ায়। ইত্যাকারের ছায়া-পরিবর্ত্তন কখন দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে, কখন বা বামাবর্ত্ত ক্রমে

হইয়া থাকে এবং তাহা সূর্য্যের দক্ষিণায়ন উত্তরায়ণ অনুসারেই হইয়া থাকে।

এখন মনে কর, যদি আমাদের কখন দিগ্‌ভ্রম উপস্থিত হয়, আর আমরা 'শঙ্কুযন্ত্র' সঙ্গে রাখি, তাহা হইলে আমরা দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া লইতে পারি কি না।

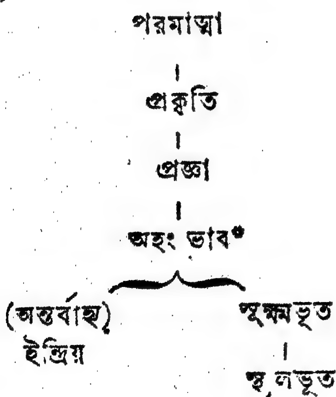
উল্লিখিত "শঙ্কুযন্ত্রের" চিত্র দেওয়া হইল। এতদ্দ্বারা দিঙ্‌নির্ণয় এবং বেলা-নির্ণয় করা যাইতে পারে (যদি মেঘ না থাকে)। বেলা-নির্ণয়-ব্যবস্থা ও তাহার সঙ্কেতাদি আগামী কোন পত্রিকায় প্রকাশ করা যাইবেক।

কালনির্ণায়ক "অবহযন্ত্র" "স্বয়ংবহযন্ত্র" ও "ঘটীযন্ত্র" প্রভৃতির সমুদায় বিবরণ ক্রমে বিবৃত করিব।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

অনুলোম পদ্ধতির সোপান-পরম্পরা যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা এই ;—



উপরি-উক্ত সোপান-পরম্পরার মধ্যমটি অহংভাব; অহংভাবের ঊর্দ্ধে পরমাত্মা, প্রকৃতি, প্রজ্ঞা, এবং নিম্নে অন্তরিন্দ্রিয়, বহিরিন্দ্রিয়, ভূত-সত্ত্ব।

পরমাত্মা।—

সাংখ্য প্রকৃতিকে প্রথম বলিয়া ধরিয়াছেন, আমরা পরমাত্মাকে প্রথম বলিয়া ধরিতেছি। যদি এরূপ মনে কর যে পরমাত্মা পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ—আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত, এমত স্থলে জড় জগৎ এবং অপূর্ণ জীবজন্তু সৃষ্টি করিয়া কি আর তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, যেখানে জ্ঞান সেইখানে আপনাকে ভালবাসা, এবং সেইখানেই আপনার আবির্ভাবের ইচ্ছা বর্ত্তমান থাকিবেই থাকিবে। যে জ্ঞান আপনাকে জানে, সে জ্ঞান আপ-

*অহংভাব শব্দটি দ্বারা দার্শনিক অহংকার শব্দের প্রকৃত অর্থটি খুলিয়া দেওয়া হইল। চলিত ভাষায় অহঙ্কার বলিবামাত্র গর্ব্ব বুঝায়, অহংকার শব্দের দার্শনিক অর্থ "আমি কর্ত্তা" এই রূপ একটা মনের ভাব; অর্থান্তরন্যাস ভয়ে অহংভাব শব্দ নূতন প্রয়োগ করিলাম।

নাকে ভালও বাসে, আর আপনার আবির্ভাব ইচ্ছাও করে। জ্ঞান হইতে প্রেম এবং ইচ্ছাকে হরণ করিলে জ্ঞানের প্রাণহরণ করা হয়। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানেতেই আমরা দেখিতে পাই যে, প্রেম এবং তাহার আবির্ভাবের ইচ্ছা আছে বলিয়াই তাহা জীবন্ত আছে। ভিতরের বিশুদ্ধ-জ্ঞানকে যত আমরা বাহিরের কার্য্যে আনয়ন করিতে পারি, ততই আমরা জাগ্রত জীবন্ত আত্মা নামের যোগ্য হই, মনুষ্য-নামের যোগ্য হই। পরমাত্মার জ্ঞান কি আমাদের জ্ঞান অপেক্ষা নির্জীব যে, তাহাতে প্রেম থাকিবে না, আবির্ভাবের ইচ্ছা থাকিবে না? এ অতি অসঙ্গত কথা! সকল আপেক্ষিক সত্যের মূলে যে এক নিরালম্ব সত্য পরমাত্মা আছেন, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি, আবার তাহা পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই।

প্রকৃতি।—

প্রকৃতি কি? না প্র-কৃতি, প্রকৃষ্ট কার্য্য, জগৎকার্য্য। আবার, যে শক্তি দ্বারা জগৎকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় তাহাও প্রকৃতি-শব্দে উক্ত হইয়া থাকে; এক কথায় এই যে, আবহমান কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলাই প্রকৃতি। কার্য্যোৎপত্তির মূলে কার্য্যোৎপাদিকা-শক্তিরূপে প্রকৃতি বর্ত্তমান এবং উৎপদ্যমান কার্য্যেতে সেই শক্তির অভিব্যক্তিরূপে প্রকৃতি বর্ত্তমান। প্রকৃতি স্বতঃ কিছুই নহে—তাহা পরমাত্মার শক্তিস্বরূপা। বস্তু যাহা, তাহা যাহা আছে তাহাই আছে, তাহার পরিবর্ত্তন নাই; শক্তি যাহা, তাহা অব্যক্ত হইতে ক্রমশঃ ব্যক্তে পরিণত হয়। ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই দুই পক্ষে ভর দিয়া শক্তি নিয়তই কার্য্যে পরিণত হইতে থাকে। উত্তাপ-শক্তি কাহাকে বলে? উত্তাপ পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, এখন ব্যক্ত হইল; উত্তাপের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এই যে দুই অবস্থা, উভয়ের সন্ধিস্থলে কোন না কোন শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে; কেন না, অব্যক্ত আছে অব্যক্তই থাকুক—তাহা না থাকে কেন? ব্যক্ত হয় কেন? শক্তির উত্তেজনাতেই না? উত্তাপের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এ দুই অবস্থার সন্ধিস্থলেই উত্তাপ-শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। এ যেমন দেখা গেল, এমনি জগতের অব্যক্ত অবস্থা, এবং ব্যক্ত অবস্থা, উভয়ের মধ্যস্থলে মহতী এক ঐশী শক্তি অবশ্যই বিদ্যমান আছে; তাহাই প্রকৃতি শব্দের বাচ্য। সাংখ্য বলেন, ত্রিগুণের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি; আবার ইহাও বলেন যে, প্রকৃতি নিয়তই ত্রিগুণের সাম্যাবস্থা হইতে বৈষম্যাবস্থায় পরিণত হইতেছে। উভয়ই-সত্য,—এজন্য উক্ত সাম্যাবস্থা এবং বৈষম্যাবস্থা উভয়ের মধ্যস্থলে প্রকৃতি, এরূপ বলিলেও হানি নাই। কারণরূপী প্রকৃতি অব্যক্ত, কার্য্যরূপী প্রকৃতি ব্যক্ত, কিন্তু উভয়ই প্রকৃতি এটি যেন মনে থাকে। এই কাগজের এ পৃষ্ঠা ব্যক্ত, ও পৃষ্ঠা অব্যক্ত, কিন্তু কাগজ একই—এমনি প্রকৃতি একদিকে ব্যক্ত, একদিকে অব্যক্ত, কিন্তু পদার্থ একই। চক্ষুরুন্মীলন করিলাম, আর, একটা অট্টালিকা নয়ন সমক্ষে ব্যক্ত হইল; চক্ষু নিমীলন করিলাম আর অমনি

তাহা অব্যক্ত হইয়া গেল;—অব্যক্ত হউক কিন্তু যে শক্তি দ্বারা তাহা ইতিপূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছিল তাহা যেমন তেমনি আছে;—কেবল চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগের অভাবে তাহার কার্য্য স্থগিত রহিয়াছে,—এই মাত্র; চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ ঘটিবামাত্রেই আবার তাহার কার্য্য পরিস্ফুট হইবে। নেত্রপথবর্ত্তী কার্য্যরূপী অট্টালিকা এবং নেত্র-বহির্ভূত শক্তিরূপী অট্টালিকা—একই অট্টালিকা। এমনি, জগৎ-কার্য্যের অব্যক্ত শক্তি, এবং ব্যক্ত আবির্ভাব উভয়ই একই প্রকৃতি।

প্রকৃতিকে পরমাত্মা হইতে বিযুক্ত করিয়া দেখিলে তাহা মূলে একটা অন্ধ শক্তি এবং ফলে—কোথাও কিছু নাই—একটা বৃহৎ আড়ম্বর, এ ভিন্ন আর যে কি তাহা বুঝা যায় না। প্রকৃতি পরমাত্মার ঐশী শক্তি, তাঁহার ইচ্ছাতে বিচেষ্টিত হইতেছে,—প্রকৃতিকে এইরূপ চক্ষে দেখিলেই প্রকৃতির ভিতরকার ভাবরত্ন-সকল আমাদের নিকট অনাবৃত হয়।

পরমাত্মার প্রতি প্রগাঢ় নির্ভরের ভাবই প্রকৃতির সর্ব্বস্ব। পরমাত্মার আশ্রয়-প্রভাবে প্রকৃতি অকিঞ্চন হইয়াও সকল ঐশ্বর্য্যের আকর-স্বরূপা, অন্ন-স্বরূপা, প্রাণ-স্বরূপা, ধ্যান-স্বরূপা, বিদ্যা-স্বরূপা, আনন্দ-স্বরূপা সকলই।

আদিতে, প্রকৃতি সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণের সাম্যাবস্থা; কিন্তু পরিণামে সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব প্রসব করিবে সেই দিকেই তাহার চেষ্টা, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা সেই চেষ্টার উত্তেজক। পরমাত্মার সদৃশাবির্ভাব যে সত্ত্বগুণ, তাহা প্রকৃতির গর্ব্ভে পরিপোষিত হইয়া, পরিশেষে প্রজ্ঞারূপে মনুষ্যে মনুষ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিবে সৃষ্টির এই একটি প্রধান উদ্দেশ্য। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ-প্রধান অংশটিকেই প্রজ্ঞা কহি। সন্তান যতক্ষণ মাতার গর্ব্ভে থাকে ততক্ষণ তাহা মাতার অংশ বই আর কি? ভূমিষ্ঠ হইলে পর—তবে তাহা একটি স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি (ব্যক্তি) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। ইত্যাদ্রূপ,—প্রজ্ঞা প্রথমে প্রকৃতির সারাংশ—পরে প্রকৃতির অভিব্যক্তি—বলিয়া অবধারিতব্য।

পরমাত্মার প্রগাঢ় প্রেমপূর্ণ মঙ্গল ইচ্ছা প্রকৃতির উপর এমনি স্থির ভাবে পড়িয়া আছে যে, ক্রমিকই তাহা অভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে, নিয়তই তাহার শ্রী সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতেছে, ক্রমশই তাহার মধ্য হইতে প্রজ্ঞা প্রস্ফুটিত হইয়া উন্নতি-সোপানে অগ্রসর হইতেছে।

প্রজ্ঞা।—

প্রকৃতির মূলে ত্রিগুণাতীত অনন্ত জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা; প্রকৃতির অভ্যন্তরে তাঁহার ত্রিগুণাত্মক প্রতিচ্ছবি, প্রতিনিধি, আবির্ভাব, অথবা অনুপ্রকাশ—প্রজ্ঞা। ছবির সম্বন্ধে যেমন প্রতিচ্ছবি, ধ্বনির সম্বন্ধে যেমন প্রতিধ্বনি, পরমাত্মার সম্বন্ধে সেই রূপ প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞাতে পরমাত্মাতে এরূপ বিভিন্নতা সত্ত্বেও যে, আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি প্রজ্ঞা ভাবস্বরূপ আর অহংভাব তাহার আবির্ভাব স্বরূপ—অন্যথা বলি নাই; জীবের অহংভাবের সম্বন্ধেই প্রজ্ঞা ভাবস্বরূপ, পর

মাত্মার সম্বন্ধে আবির্ভাব মাত্র; অহংভাবও একদিকে যেমন আবির্ভাব-স্বরূপ, আর এক দিকে তেমনি ভাব-স্বরূপ,—প্রজ্ঞার সম্বন্ধে আবির্ভাব স্বরূপ, ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধে ভাব-স্বরূপ। অতএব অহংভাবের সম্বন্ধে প্রজ্ঞাকে আমরা ভাবস্বরূপ বলিয়াছি বলিয়া এমন যেন কেহ না ভাবেন যে আমরা প্রজ্ঞাকে সাক্ষাৎ পরমাত্মা বলিয়াছি। আমাদের প্রজ্ঞাতে পরমাত্মার আবির্ভাব লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলিয়াছি যে, পরমাত্মা প্রজ্ঞারূপে আমাদের আত্মাতে বিরাজমান আছেন;—এস্থলেও প্রজ্ঞাকে স্বয়ং পরমাত্মা জ্ঞান করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। সংস্কৃত একটি প্রবাদ আছে "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ", আপনিই পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করে, ইহাতে এইমাত্র বুঝায় যে পুত্র আপনার সদৃশ-আবির্ভাব; তেমনি "প্রজ্ঞারূপে পরমাত্মা আত্মাতে বিরাজমান", ইহার অর্থ প্রজ্ঞা পরমাত্মার সদৃশ-আবির্ভাব, এই পর্য্যন্ত। প্রজ্ঞা-সম্বন্ধে আর একটি কথা এই বলিয়াছি,—পরমাত্মা প্রজ্ঞার জ্ঞাতৃপক্ষ। প্রজ্ঞা-শব্দে যদি আমরা আমাদের নিজের প্রজ্ঞাটুকুই বুঝি, তাহা হইলে দাঁড়ায় এই যে আমরা নিজেই তাহার জ্ঞাতৃপক্ষ। কিন্তু কেবল আমাদের নিজের কেন, যত জীবের যত প্রজ্ঞা আছে, সকলই প্রজ্ঞা-নামের যোগ্য; সকল প্রজ্ঞার সমষ্টি স্বরূপ এক যে সেই সার্ব্বলৌকিক প্রজ্ঞা তাহার একমাত্র জ্ঞাতা কেবল পরমাত্মা। সার্ব্বলৌকিক প্রজ্ঞা সমস্ত প্রকৃতির চক্ষুরুন্মীলন-স্বরূপ; তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছি যে, তাহার জ্ঞাতৃপক্ষ পরমাত্মা। আমাদের প্রত্যেকজনের অহংভাব সেই সার্ব্বলৌকিক প্রজ্ঞার এক একটি শাখা বই নয়; এই যে শাখা-প্রজ্ঞা ইহারি জ্ঞাতৃপক্ষ আমরা আপনারা। অহংভাব সেই শাখা-প্রজ্ঞার নামান্তর মাত্র।

প্রকৃতির অভ্যন্তরে সত্ত্ব-গুণের প্রাদুর্ভাবই প্রজ্ঞা; কিন্তু তাহাতেও রজস্তমোগুণের সহকারিতা চাই। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তিন গুণের সম্মিশ্র ভিন্ন পরিমিত সৃষ্টবস্তু সম্ভবে না। সাংখ্যদর্শন ত্রিগুণাত্মক বস্তুর সহিত প্রদীপের উপমা দিয়াছেন। তিনি বলেন "যথা প্রদীপঃ পরস্পরবিরুদ্ধতৈলাগ্নিবর্ত্তি-সংযোগাদর্থপ্রকাশং জনয়তি এবং সত্ত্বরজস্তমাংসি পরস্পরবিরুদ্ধান্যর্থং নিষ্পাদয়ন্তি।" 'প্রদীপের তৈল অগ্নি এবং বর্ত্তিকা যেমন পরস্পর-বিরুদ্ধ অথচ সংযোগ দ্বারা বস্তু-প্রকাশ উৎপাদন করে, এই রূপ সত্ত্ব রজস্তমোগুণ পরস্পর-বিরুদ্ধ অথচ সমবেত হইয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সাধন করে।' সত্ত্বগুণের পক্ষে রজস্তমোগুণের একেবারে সম্পর্ক রহিত হওয়াও যা, আর তিরোহিত হওয়াও তাই; ইহার কারণ এই যে বিভিন্ন শক্তির পরস্পর বাধ্যবাধকতা ব্যতীত পরিমিত কিছুরই প্রকাশ সম্ভবে না। পরমাত্মার পূর্ণ-প্রকাশ তাঁহাতেই কেবল সম্ভবে; জগতে তাঁহার ক্রমশঃ প্রকাশ্য আবির্ভাবই কেবল সম্ভবে। রজস্তমোগুণের উপরে সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাবই সেই ক্রমশঃ প্রকাশ্য আবির্ভাব। অগ্নি-শিখার উৎপত্তিই যেমন প্রদীপের লক্ষ্য, তৈল এবং বর্ত্তিকা তাহার উপলক্ষ্য মাত্র; সেইরূপ সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাবই

স্বষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য, রজস্তমোগুণের সাহচর্য্য তাহার কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। রজস্তমো-গুণের ঘাত-প্রতিঘাত ভিন্ন সত্ত্বগুণের প্রকাশ সম্ভবে না ইহারই জন্য ও-দুটির প্রয়োজন। দীপ বলিবা-মাত্র আমাদের লক্ষ্য দীপ-শিখার প্রতিই সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হয়, তাহার যে সঙ্গী দুটি—তৈল এবং বর্ত্তিকা, উভয়ের কাহাকেও মনে হয় না; অতএব প্রজ্ঞা বলিবামাত্র পরমাত্মার প্রতিচ্ছবি যে সত্ত্বগুণ তাহারই প্রতি আমাদের চক্ষু পড়িবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? সত্ত্বগুণ শুদ্ধ যে কেবল প্রকাশ-ধর্ম্মী তাহা নহে তদ্ব্যতীত তাহা আনন্দ-ধর্ম্মীও বটে, সদিচ্ছা-ধর্ম্মীও বটে, সকল শাস্ত্রেরই এইরূপ অভিপ্রায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞান হইতে প্রেম এবং ইচ্ছাকে হরণ করিলে তাহার প্রাণ হরণ করা হয়। পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, যে খানে যে কোন জ্ঞানের কথা উল্লেখ করিয়াছি বা করিব, সেইখানেই তাহার সহিত প্রেম এবং সদিচ্ছা পরিমাণ-বিশেষে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে বুঝিতে হইবে। অতএব ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে যে, সুপরিস্ফুট প্রজ্ঞা প্রেমপূর্ণ এবং সদিচ্ছাপূর্ণ।

অহংভাব।—

জীবের ত্রিগুণাত্মক পরিমিত অহংভাব-কে লক্ষ্য করিয়াই অহংভাব এই শব্দ ব্যবহার করা যাইতেছে। পরমাত্মার ত্রিগুণাতীত অচিন্ত্য অনন্ত অহংভাব আমাদের বুদ্ধির অগোচর সুতরাং বচনের অতীত। যথা-সময়ে যথা-নিয়মে মনুষ্যে মনুষ্যে অভিব্যক্তি লাভ করিবে, এমন যে একটি বীজ প্রকৃতি আপনার গর্ব্ভে ধারণ করিতেছে, তাহাই প্রজ্ঞা; এবং সেই প্রজ্ঞা-বীজের শস্য অভিব্যক্তিই অহংভাব,—এ জন্য অহংভাব ব্যক্তি শব্দের বাচ্য। সাংখ্যদর্শন জীবাত্মাকে অহংভাব হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র একটি তত্ত্ব বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু আমরা অহংভাবকেই জীবত্মা বলি; সাংখ্যদর্শন জীবাত্মাকে ত্রিগুণাতীত বলিয়াছেন, আমরা পরমাত্মাকেই ত্রিগুণাতীত বলি। আমরা যেখানে পরমাত্মা বলিতেছি, সাংখ্যদর্শন সেই খানে অল্প কিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া জীবাত্মা বলিতেছেন, এই জন্য আমরা সাংখ্যের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারি না।

বৃক্ষের বীজকে মনে কর যেন সত্ত্বগুণ, জল-বায়ুকে মনে কর যেন রজোগুণ, এবং মৃত্তিকাকে মনে কর যেন তমোগুণ। বীজ প্রথমে মৃত্তিকা এবং জলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়; মনে কর যেন, তাহাই সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা। কিয়ৎকাল পরে বৃক্ষ যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহাতে বীজেরও অংশ আছে, মৃত্তিকারও অংশ আছে, জল-বায়ুরও অংশ আছে ইহা নিঃসংশয়; তাহার পর বৃক্ষের যখন চরম অভিব্যক্তি হয়, তখন উক্ত তিন অংশই সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎ বীজাকারে কিনা শস্যাকারে পরিণত হয়। প্রকৃতির মধ্যে পরমাত্মার অনুপ্রকাশ যে বীজরূপী সত্ত্বগুণ তাহাই প্রজ্ঞা; সেই প্রজ্ঞার শস্যরূপী অভিব্যক্তিই অহংভাব।

এক বীজ যেমন নানা শস্যে পরিণত

হয় ; সেই রূপ এক প্রজ্ঞা নানা অহংভাবে পরিণত হয়। এজন্য জনে জনে অন্যান্য নানা প্রকার প্রভেদ সত্বেও, সকলেই যে এক প্রজ্ঞা ছাঁচে গঠিত, ইহার অন্যথা দেখা যায় না।

জীবাত্মা যদিও অনেক কিন্তু সকলের মূল স্থান—প্রকৃতির অভ্যন্তরে (ঐশী শক্তির অভ্যন্তরে) একীভূত রহিয়াছে ; সকল জীবাত্মার মধ্যে মূলের এই যে একাত্মভাব ইহা পরমাত্মারই প্রতিচ্ছবি—ইহাই মহান্ আদর্শ—ইহাই প্রজ্ঞা। অপিচ ত্রিকালজ্ঞ পরমাত্মার নিকট অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল একই বর্ত্তমান কাল। এজন্য প্রকৃতির মধ্য হইতে, সকল জীবাত্মার সমষ্টি স্বরূপ যে, এক পূর্ণ-প্রজ্ঞ মহান্ আদর্শ অনন্ত ভবিষ্যৎ কালে উদ্ভাসিত হইবে, পরমাত্মার নিকট তাহা পূর্ব্ব হইতেই উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। সেই মহান্ আদর্শকে চক্ষে রাখিয়া চলা সকলেরই কর্ত্তব্য ; কিন্তু ইহা যেন মনে থাকে যে, কোন জীবাত্মাই পরিমিত কালের মধ্যে সে আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবেন না; তবে যদি কল্পনাতেও এরূপ কদাচিৎ সম্ভবে যে, অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল কোন সময়ে বর্ত্তমান হইয়াছে, তবেই বলা যাইতে পারে যে, সেই সময়ে সকল জীবাত্মা একাত্মা হইয়া সেই মহান্ আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক এই যে, ত্রিকালাতীত পরমাত্মার ত্রিকালজ্ঞ দৃষ্টিতেই সৃষ্টির সেই চরম আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে,—এবং তিনি স্বয়ং সেই আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রকৃতির অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, কোন সৃষ্ট জীব সে মহান্ আদর্শে পৌঁছিতে পারে না। পরমাত্মা প্রকৃতির আদ্যন্ত অন্তর্ব্বাহ্য সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

এতক্ষণ যে বিষয়ের মীমাংসা করিলাম, তাহার তাৎপর্য্য কি—উদ্দেশ্য কি—ফল কি—ইহা জানিবার জন্য অনেকে উৎসুক হইতে পারেন। ফল-নিরপেক্ষ হইয়া সত্যের আলোচনা করা কতক দূর পর্য্যন্তই শোভা পায়—শুধু শোভা পায় কেন—নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু তাহার পরক্ষণে এমনি একটি সময় উপস্থিত হয় যে, আর ফলের প্রতি উদাসীন থাকিলে চলে না। সত্যের অবয়বগুলিকে পরস্পর বিযুক্ত করত এক-একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা যে সময়ে আবশ্যক, সে সময়ে ফল-জিজ্ঞাসা করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। কিন্তু যখন সত্যের অবয়ব-গুলি পৃথক্ পৃথক্ করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তখন একটু থামিয়া দাঁড়াইয়া দেখা উচিত যে, বিভিন্ন অবয়ব গুলির আদ্যোপান্ত সকল কুড়াইয়া কি পাওয়া যায়—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি জোড়া দিলে ফলে কি দাঁড়ায় ;—ফল কি—তাৎপর্য্য কি—উদ্দেশ্য কি—এ সকল প্রশ্ন তখনই কেবল শোভা পায়; তাহার পূর্ব্বে তাহার প্রসঙ্গও মুখে আনিতে নাই।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, সমস্ত একত্র করিলে ফলে এই রূপ দাঁড়ায় ;—

পরমাত্মার মঙ্গল ইচ্ছা, অথবা শুভ আশীর্ব্বাদ, প্রকৃতির মধ্যে দিয়া সমুদায় জীবাত্মার সঙ্গম স্থলে (জ্ঞান-নদীর সাগর-

সঙ্গম স্বরূপ, মনুষ্যত্বের চরম আদর্শ-স্বরূপ) প্রজ্ঞাতে, চির প্রবাহিত রহিয়াছে। তথা হইতে, সমস্ত জগতের প্রতি ব্যক্তিতে, প্রতি অহংভাবেতে, প্রবাহিত হইতেছে। কোন অবতারাভিমানী ব্যক্তি এমন মনে করিতে পারেন যে, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা কেবল আমাতেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অত্যুক্তি তাহাতে আর সংশয় নাই। বাস্তব এই যে, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা এক জন বা দুই জনেতে সংকুচিত নাই,— প্রত্যুত সকল জীবাত্মার সঙ্গম-স্থলে কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে; সকল জগতের যেখানে ভ্রাতৃভাব সেই খানেই পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। আমরা অহংকারের বিপরীত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজ্ঞা দ্বারে উপনীত হইলে তবেই আমরা তাঁহার সেই আশীর্ব্বাদে পরিপ্লুত হই, রোগ শোক মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাই, পরম পুরুষার্থ লাভ করি।

প্রজ্ঞার নিম্নে অহংভাব, প্রজ্ঞার উর্দ্ধে প্রকৃতি (ঐশী শক্তি), এবং পরমাত্মা। ইহার তাৎপর্য্য এখন আর অপ্রকাশ থাকিতে পারে না। সে তাৎপর্য্য এই — প্রকৃতির উর্দ্ধে পরমাত্মার পিতৃভাব, এবং প্রকৃতির মধ্যে আত্মা-সমস্তের ভ্রাতৃভাব, দুয়েরই প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি থাকে। পরমাত্মা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাতী, ইহা বলিলে আত্মা-সমস্তের মধ্যে যে পরস্পর ভ্রাতৃ ভাব আছে তাহার বিপক্ষে বলা হয়; আর যদি সাংখ্যের মতানুসারে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট প্রকৃতিকে পরব্রহ্ম জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে নিরালম্ব সত্যের স্থলে আপেক্ষিক সত্যের অধ্যারোপ করা হয়। যদিও সাংখ্য-মতের সহিত আমাদের এই রূপ অনৈক্য,কিন্তু ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি (সময়ান্তরে প্রমাণও করিব) যে, আমাদের দেশের প্রধান প্রধান তত্ত্ব-জ্ঞান-শাস্ত্রের ভিতরকার ভাব যাহা, তাহাই আমি বলিয়াছি। এক্ষণে অনুলোম পদ্ধতির অবশিষ্ট পথ অতিবাহন করা যাউক।

কবিকাহিনী।

তৃতীয় সর্গ।

কত দেশ দেশান্তরে ভ্রমিল সে কবি
তুষার-স্তম্ভিত গিরি করিল লঙ্ঘন,
সুতীক্ষ্ণ কণ্টকময় অরণ্যের বুক
মাড়াইয়া গেল চলি রক্তময় পদে।
কিন্তু বিহঙ্গের গান, নির্ঝরের ধ্বনি,
পারে না জুড়াতে আর কবির হৃদয়।
বিহগ, নির্ঝর-ধ্বনি প্রকৃতির গীত,
মনের যে ভাগে তার প্রতিধ্বনি হয়,
সে মনের তন্ত্রী যেন হোয়েছে বিকল।
একাকী যাহাই আগে দেখিত সে কবি,
তাহাই লাগিত তার কেমন সুন্দর,
এখন কবির সেই একি হোল দশা,

যে প্রকৃতি-শোভা মাঝে নলিনী না থাকে
ঠেকে তা শূন্যের মত কবির নয়নে,
নাইক দেবতা যেন মন্দির মাঝারে।
বালার মুখের জ্যোতি করিত বর্দ্ধন
প্রকৃতির রূপছটা দ্বিগুণ করিয়া;
সে না হোলে অমাবস্যা নিশির মতন
সমস্ত জগৎ হোত বিষণ্ণ আঁধার।

* * * *

জ্যোৎস্নায় নিমগ্ন ধরা, নীরব রজনী।
অরণ্যের অন্ধকারময় গাছগুলি
মাথার উপরে মাখি রজত জোছনা,
শাখায় শাখায় ঘন করি জড়াজড়ি,
কেমন গম্ভীর ভাবে রোয়েছে দাঁড়ায়ে।
হেথায় ঝোপের মাঝে প্রচ্ছন্ন আঁধার,
হোথায় সরসীবক্ষে প্রশান্ত জোছনা।
নভ-প্রতিবিম্ব-শোভী ঘুমন্ত সরসী
চন্দ্র তারকার স্বপ্ন দেখিতেছে যেন।
লীলাময়ী প্রবাহিনী চলেছে ছুটিয়া,
লীলাভঙ্গ বুকে তার পাদপের ছায়া
ভেঙ্গে চুরে কত শত ধরিছে মুরতি।
গাইছে রজনী কিবা নীরব সঙ্গীত!
কেমন নীরব বন নিস্তব্ধ গম্ভীর;
শুধু দূর-শৃঙ্গ হোতে ঝরিছে নির্ঝর,
শুধু এক পাশ দিয়া সঙ্কুচিত অতি
তটিনীটি সর সর যেতেছে চলিয়া।
অধীর বসন্ত বায়ু মাঝে মাঝে শুধু
ঝরঝরি কাঁপাইছে গাছের পল্লব।
এহেন নিস্তব্ধ রাত্রে কত বার আমি
গম্ভীর অরণ্যে একা কোরেছি ভ্রমণ।
স্নিগ্ধ রাত্রে গাছ পালা ঝিমাইছে যেন,
ছায়া তার পোড়ে আছে হেথায় হোথায়।
দেখিয়াছি নীরবতা যত কথা কয়
প্রাণের মরম-তলে, এত কেহ নয়।
দেখি যবে অতি শান্ত জোছনায় মজি
নীরবে সমস্ত ধরা রয়েছে ঘুমায়ে,
নীরবে পরশে দেহ বসন্তের বায়,
জানিনা কি এক ভাবে প্রাণের ভিতর
উচ্ছ্বসিয়া, উথলিয়া উঠেগো কেমন!
কি যেন হারায়ে গেছে খুঁজিয়া না পাই,
কি কথা ভুলিয়া যেন গিয়েছি সহসা,
বলা হয় নাই যেন প্রাণের কি কথা,
প্রকাশ করিতে গিয়া পাইনা তা' খুঁজি!
কে আছে এমন যার এহেন নিশীথে,
পুরাণো সুখের স্মৃতি উঠেনি উথলি!
কে আছে এমন যার জীবনের পথে
এমন একটি সুখ যায়নি হারায়ে,
যে হারা-সুখের তরে দিবা নিশি তার,
হৃদয়ের এক দিক শূন্য হোয়ে আছে।
এমন নীরব-রাত্রে সে কিগো কখনো
ফেলে নাই মর্ম্মভেদী একটি নিশ্বাস?
কত স্থানে আজ রাত্রে নিশীথ-প্রদীপে
উঠিছে প্রমোদ-ধ্বনি বিলাসীর গৃহে।
মুহূর্ত্ত ভাবেনি তারা আজ নিশীথেই
কত চিত্ত পুড়িতেছে প্রচ্ছন্ন অনলে।
কত শত হতভাগা আজ নিশীথেই
হারায়ে জন্মের মত জীবনের সুখ
মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় হইয়া অধীর
একেলাই হা হা করি বেড়ায় ভ্রমিয়া।

* * * *

ঝোপ-ঝাপে ঢাকা ওই অরণ্য-কুটীর;
বিষণ্ণ নলিনী বালা শূন্য নেত্র মেলি
চাঁদের মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।

জানিনা কেমন কোরে, বালার বুকের মাঝে,
সহসা কেমন ধারা লেগেছে আঘাত,
আর সে গায়না গান, বসন্ত ঋতুর অন্তে
পাপিয়ার কণ্ঠ যেন হোয়েছে নীরব।
আর সে লইয়া বীণা বাজায়না ধীরে ধীরে,
আর সে ভ্রমেনা বালা কাননে কাননে।
বিজন কুটীরে শুধু, পরণ শয্যার পরে
একেলা আপন মনে রয়েছে শুইয়া।
যে বালা মুহূর্ত্তকাল, স্থির না থাকিত কভু,
শিখরে, নির্ঝরে, বনে করিত ভ্রমণ,
কখনো তুলিত ফুল, কখনো গাঁথিত মালা,
কখনো গাইত গান, বাজাইত বীণা,
সে আজ এমন শান্ত, এমন নীরব স্থির,
এমন বিষণ্ণ শীর্ণ সে প্রফুল্ল মুখ।
এক দিন, দুই দিন, যেতেছে কাটিয়া ক্রমে
মরণের পদ শব্দ শুনিছে সে যেন!
আর কোন সাধ নাই, বাসনা রয়েছে শুধু
কবিরে দেখিয়া যেন হয়গো মরণ।
এদিকে পৃথিবী ভ্রমি, সহিয়া ঝটিকা কত
ফিরিয়া আসিছে কবি কুটীরের পানে,
মধ্যাহ্নের রৌদ্রে যথা জ্বলিয়া পুড়িয়া পাখী
সন্ধ্যায় কুলায়ে তার আইসে ফিরিয়া।
বহুদিন পরে কবি, পদার্পিল বন-ভুমে,
বৃক্ষলতা সবি তার পরিচিত সখা,
তেমনি সকলি আছে, তেমনি গাইছে পাখী,
তেমনি বহিছে বায়ু ঝর ঝর করি।
অধীরে চলিল কবি কুটীরের পানে;
দুয়ারের কাছে গিয়া, দুয়ারে আঘাত দিয়া,
ডাকিল অধীর স্বরে নলিনী, নলিনী!
কিছু নাই সাড়া শব্দ, দিলনা উত্তর কেহ,
প্রতিধ্বনি শুধু তারে করিল বিদ্রূপ।
কুটীরে কেহই নাই, শূন্য তা রয়েছে পড়ি,
বেষ্টিত বিতন্ত্রী-বীণা লূতা-তন্তু-জালে।
ভ্রমিল আকুল কবি কাননে কাননে,
ডাকিয়া সমুচ্চ স্বরে নলিনী নলিনী।
মিসিয়া কবির সাথে, বন দেবী উচ্চস্বরে
ডাকিল কাতরে আহা নলিনী, নলিনী।
কেহই দিলনা সাড়া, শুধু সে শবদ শুনি
সুপ্ত হরিণেরা ত্রস্ত উঠিল জাগিয়া।
অবশেষে গিরি-শৃঙ্গে উঠিল কাতর কবি,
নলিনীর সাথে যেথা থাকিত বসিয়া।
দেখিল সে গিরি-শৃঙ্গে, শীতল তুষার পরে,
নলিনী ঘুমায়ে আছে ম্লান-মুখচ্ছবি।
কঠোর তুষারে তার এলায়ে পড়েছে কেশ,
খসিয়া পড়েছে পাশে শিথিল আঁচল।
বিশাল নয়ন তার অর্দ্ধ নিমীলিত,
হাত দুটি ঢাকা আছে অনাবৃত বুকে।
একটি হরিণ শিশু, খেলা করিবার তরে
কভুবা অঞ্চল ধরি টানিতেছে তার,
কভু শৃঙ্গ দুটি দিয়া সুধীরে দিতেছে ঠেলি,
কভুবা অবাক্-নেত্রে রয়েছে চাহিয়া,
তবু নলিনীর ঘুম, কিছুতেই ভাঙ্গিছে না,
নীরবে নিস্পন্দ হোয়ে রয়েছে ভূতলে।
দূর হোতে কবি তারে দেখিয়া কহিল উচ্চে,
"নলিনি, এয়েছি আমি দেখ্‌সে বালিকা।"
তবুও নলিনী বালা না দিয়া উত্তর,
শীতল তুষার পরে রহিল ঘুমায়ে।
কবি সে শিখর পরে করি আরোহণ
শীতল অধর তার করিল চুম্বন;
শিহরিয়া, চমকিয়া দেখিল সে কবি
না নাড়ে হৃদয় তার, না পড়ে নিশ্বাস।
দেখিল না, ভাবিল না, কহিল না কিছু,

যেমন চাহিয়া ছিল রহিল চাহিয়া।
নিদারুণ কি যেন কি দেখিয়া তরাসে
নয়ন হইয়া গেল অচল পাষাণ।
কতক্ষণে কবি তবে পাইল চেতন,
দেখিল তুষার-শুভ্র নলিনীর দেহ,
হৃদয়-জীবন-হীন জড় দেহ তার,
অনুপম সৌন্দর্য্যের কুসুম-আলয়,
হৃদয়ের মরমের আদরের ধন—
তৃণ কাষ্ঠ সম ভূমে যায় গড়াগড়ি!
বুকে তারে তুলে লয়ে ডাকিল "নলিনী",
হৃদয়ে রাখিয়া তারে, পাগলের মত কবি
কহিল কাতর স্বরে "নলিনী" "নলিনী!"
স্পন্দহীন, রক্তহীন অধর তাহার
অধীর হইয়া ঘন করিল চুম্বন।

* * * *

তার পর দিন হোতে, সে বনে কবিরে আর
পেলে না দেখিতে কেহ গেছে সে কোথায়;
ঢাকিল নলিনী-দেহ তুষার সমাধি,
ক্রমে সে কুটীরখানি, কোথা ভেঙ্গে চুরে গেল
ক্রমে সে কানন হোল গ্রাম লোকালয়,
সে কাননে—কবির সে-সাধের কাননে
অতীতের পদচিহ্ন রহিল না আর।

ক্রমশঃ

বিজন চিন্তা।

কল্পনা।

এই মহাকল্লোলময় মহানগরের এক প্রান্তে এক খানি পর্ণ-কুটীরে আমার বাস। আমি সংসারী নহি, কেন না আমার সংসার নাই—আমি বিধবা, আমার আদর করিবার স্বামী নাই, সান্ত্বনা করিবার বন্ধু নাই, স্নেহ কিনিবার বিভব নাই, যত্ন লাভের সামর্থ্য নাই। ছিন্ন তৃণবৎ আমি সংসার-সাগর-স্রোতে একলাই ভাসিতেছি, একলাই উঠিতেছি, একলাই পড়িতেছি। ভিক্ষা ভিন্ন আমার আর উপায় নাই। ভিক্ষা করিতে গিয়া আমি নানা প্রকার লোক দেখিতে পাই—তাহাদের নানাবিধ ভাবভঙ্গী আলোচনা করি—বিদ্বান মূর্খদের দলে দাঁড়াইয়া তাহাদের মতামত শুনি, মনে মনে হাসি কখন বা কাঁদি, আবার বাড়ি আসিয়া সেই সব কথা লিখি। এইরূপে কোন প্রকারে সময় কাটাই। আমি এখন খুব স্বাধীন, অথচ স্বাধীনতায় সুখ পাই না। মনের ভিতর যেন কেমন একটা হু হু করিতে থাকে। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রিকাল পর্য্যন্ত আমি কত লোকই দেখিতেছি কিন্তু আমি কেমন আছি, বা আমি কে, একথা জিজ্ঞাসা করিবার এক জনকে দেখিতে পাই না—সুতরাং লক্ষ লক্ষ মানবের মধ্যে থাকিয়াও আমার পর্ণ-কুটীরের বিজনতা কখনই ভঙ্গ হয় না। আমি আপনি হাসি, আপনি কাঁদি, আপনি ভাবি। মনে করিয়াছিলাম যে সংসারের শৃঙ্খল ছেদ করিয়া এই বিজন কুটীরে মনের সুখে বাস

করিব। মনে করিয়াছিলাম যে, যখন কাহারো সঙ্গে আর সম্পর্ক নাই তখন কিসের উদ্বেগ, যখন আমি আর মোহের অধীন নহি তখন আর কিসের যাতনা, যখন মায়ায় [illegible] নহি তখন কিসের ভাবনা, কিন্তু অপরিমিত স্বাধীনতাতেই কি সুখ ?—অপরিমিত স্বাধীনতাতে রাজ্য উচ্ছিন্ন হয়, সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হয়, ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লবস্থ হয়। লোকে যেমন ভাষা কথায় বলিয়া থাকে "বড় হবে ত ছোট হও" তেমনি প্রকৃত স্বাধীনতা সম্বন্ধে একথাও বলা যাইতে পারে যে, স্বাধীন হবে ত পরাধীন হও। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পক্ষে যে কথা স্থির সিদ্ধান্ত প্রায়, সমস্ত সমাজ, সমস্ত রাজ্যপক্ষে যে কথা স্থির সিদ্ধান্ত প্রায়, প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে কেনই বা তাহা অপ্রতিষ্ঠ হইবে? সমস্ত বাহ্য প্রকৃতির নিয়ম পরাধীনতা; সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতির নিয়মও পরাধীনতা। সমস্ত বাহ্য প্রকৃতি এক আকর্ষণের অধীন হইয়া চলিতেছে, সমস্ত অন্তঃ-প্রকৃতিও এক আকর্ষণের অধীন হইয়া চলিতেছে। যে লোক বলিয়াছেন—

"আমার হৃদয় আমারি হৃদয়
বেচিনিত তাহা কাহারো কাছে।"

তিনি মিথ্যা কথা কহিয়াছেন। এরূপ গর্ব্বিত আস্ফালন কোন হৃদয়-সম্পন্ন মানুষের কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হইতে পারে না। আমার হৃদয় আছে যখনি ভাবিতে পারিলাম তখন ইহাও নিশ্চয় যে সে হৃদয় পরাধীন——হয় কোন ব্যক্তি বিশেষের নয় কোন বস্তু বিশেষের। কিন্তু এই প্রকার পরাধীনতা কি বিষাদের? এই পরাধীনতার শৃঙ্খল কি মানুষ মাকড়সার মত আপনা হইতেই উদ্ভূত করিয়া আপনিই তাহাতে বিজড়িত হইতে চাহে না? এই পরাধীনতার বীজ মানবহৃদয়ে নিহিত থাকিলেও মানুষে আপনিই কি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাহা অঙ্কুরিত করিতে—তাহা বৃক্ষে পরিণত করিতে চাহে না ? পরিণামে সেই বৃক্ষে বিষময় ফলই উৎপন্ন হোক আর সুধাময় ফলই উৎপন্ন হোক, সে বৃক্ষকে ফলিত করিতে কি মানুষে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে শিথিল-প্রযত্ন হয়? মানব হৃদয়ের ইতিবৃত্ত পড়িলে কখনই তাহা বোধ হইবে না। কিন্তু কিসের মোহে মুগ্ধ হইয়া মানুষে এইরূপ স্ব-নির্ম্মিত তরঙ্গে তরঙ্গিত হইতে থাকে? সে কেবল কল্পনার মোহে! মহাকবি সেক্‌স্পিয়ার বলিয়াছেন বটে যে, কবি প্রণয়ী আর উন্মাদগ্রস্ত ইহারাই কল্পনাপ্রধান, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বাহ্যপ্রকৃতি যেমন এক মাধ্যাকর্ষণ শক্তিতে পরিচালিত হইতেছে, মানবহৃদয়ও সেই প্রকার কেবল কল্পনা-প্রভাবেই পরিচালিত হইতেছে। ম্যাডেগ্যাস্কর দ্বীপের অসভ্য জাতিরা যখন তাহাদের বিকট-দর্শন প্রস্তরময় দেবমূর্ত্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কাতর হৃদয়ে বর প্রার্থনা করে, হিন্দুরা যখন বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া ভগ্নহৃদয় হয়, খৃষ্টানেরা যখন কুমারিপুত্র যিশুখৃষ্টকে আপনাদের পাপের ভার বহন করিতে প্রার্থনা করে, তখন কি কল্পনায় মোহন

প্রভাব প্রতীত হয় না? ধনোপার্জ্জন, বিদ্যাশিক্ষা, পুত্রপালন, এ সকলেরই গভীরতম মূল প্রদেশে কল্পনা-শক্তিই প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজিত থাকে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে এসকল কার্য্যে আশাই আমাদিগকে প্রবর্ত্তিত করে, কিন্তু যদি আশারূপ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কাঁচ কল্পনার দ্বারা সুমার্জ্জিত ও সুরঞ্জিত না হইত, তাহা হইলে আশার উত্তেজনায় কেহই উত্তেজিত হইত না।

কল্পনার মহান্ প্রভাব এখানেই ক্ষান্ত নহে; শুদ্ধ যে আমরা ইহার প্রভাবে সুন্দর সামগ্রীকে সুন্দরতর দেখি এমন নহে, শুদ্ধ যে আমরা ইহার প্রভাবে সকল প্রকার বিঘ্ন ব্যবধান অতিক্রম করিয়া মরুভূমিতে থাকিয়াও নন্দনকাননের শোভা সন্দর্শন করি এমন নহে, কিন্তু ইহার প্রভাবে আমরা সকল প্রকার সুন্দর পদার্থ হইতে তাহাদের সুন্দরতম অংশগুলি গ্রহণ করিয়া অশেষবিধ তিলোত্তমা বা প্যাণ্ডোরা সৃজন করিতে পারি।

সত্য বটে যে কল্পনা যেমন সুখের কারণ, আবার কল্পনা তেমনি দুঃখের কারণ, সত্য বটে যে, কল্পনা-প্রভাবে আমরা বৈজয়ন্ত ধামকেও শ্মশানের চিতা-আকারে রূপান্তরিত করিতে পারি, সত্য বটে যে কল্পনা-প্রভাবে আমরা মিল্টন-বর্ণিত দেবতুল্য মানবমুখেও বায়রণ-বর্ণিত পিশাচের প্রতিকৃতি উপলব্ধি করিতে পারি এবং মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবী-অংশভূতা নারীজাতিকেও হ্যামলেটের মত অসতীস্বরূপ দুর্ব্বলতার নামান্তর মনে করিতে পারি, কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে কল্পনার দোষ নহে, তাহা আমাদেরই দোষ! কল্পনাকে সংযত করা শিক্ষিত করা ও বিবেক বুদ্ধির অধীন করা আমাদের উপরেই নির্ভর করিতেছে। কল্পনাই আমাদের কার্য্যের প্রবর্ত্তক, ভাবনার প্রকৃত উত্তেজক, আশার চিত্রকর, সুখের আত্মা।

কল্পনার তারতম্যে আমাদের সুখেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। এই যে সমস্ত বিশ্বকাণ্ড আমাদের সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, এই যে অনন্ত শোভার ভাণ্ডার আমাদের সম্মুখে মুক্তদ্বার রহিয়াছে—ইহার কি কোন রসই আমরা অনুভব করিতে পারিতাম, কোন ভাবই কি গ্রহণ করিতে পারিতাম, কোন শোভাই কি উপভোগ করিতে পারিতাম যদি কল্পনার দ্বারা আমাদের দিব্য চক্ষু না পরিস্ফুটিত হইত? পৃথিবী ত মৃত্তিকাময়, সমুদ্র ত সলিলময়, সূর্য্য ত অগ্নিময় মাত্র—তবে কেন পৃথিবীর শোভা সন্দর্শনে হৃদয় দ্রবীভূত হয়, সাগরের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে এবং সূর্য্যের অভ্যুদয়ে হৃদয়ও এক নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে।

কল্পনা-বিরহিত হইলে কে আর সেক্স্পিয়রের মতন বৃক্ষ-পল্লবে অস্ফুট ভাষা বুঝিতে পারিত, প্রবহমান নদীবক্ষে গ্রন্থ পাঠ করিতে পারিত, প্রস্তর-খণ্ডে উপদেশ গ্রহণ করিতে পারিত ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় মঙ্গল ভাব উপলব্ধি করিতে পারিত? কল্পনায় সকল দ্রব্যকেই হৃদয়ের উপভোগের মত করিয়া লওয়া যায়—

The meanest floweret of the vale,
The simplest note that swells the gale,
The common sun, the air, the skies,
To him are sweetest paradise.

বিধবা

মেঘনাদ-বধ কাব্য।

রামের নিকট বিদায় লইয়া লক্ষ্মণ এবার যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন, মায়ার প্রসাদে অদৃশ্য হইয়া লক্ষ্মণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া—

হেরিলা সভয়ে বলী সর্ব্বভুক্‌রূপী
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষ্বেড়নধারী।
ইত্যাদি।

কবি কাব্যের স্থানে স্থানে অযত্ন সহকারে, নিশ্চিন্তভাবে দুই একটি কথা ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ফল বড় ভাল হয় নাই। "সভয়ে" কথাটি এখানে না ব্যবহার করিয়াও তিনি সমস্ত বর্ণনাটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে শেষ করিতে পারিতেন।

প্রবল পবন-বলে বলীন্দ্র পাবনি
হনু, অগ্রসরি শূর, দেখিলা সভয়ে
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী।

হনূমানের প্রমীলাকে দেখিয়া এত ভয় কেন হইল তাহা জানেন? হনূমান রাবণের প্রণয়িনীদের দেখিয়াছেন, 'রক্ষঃকুলবধূ ও রক্ষঃকুলবালাদের' দেখিয়াছেন, শোকাকুলা রঘুকুল-কমলকে' দেখিয়াছেন, "কিন্তু এহেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে" দেখেন নাই বলিয়াই এত সভয়! "———কুম্ভকর্ণ বলী ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে ভয়ে।" যাহা হউক এরূপ সভয়ে, সত্রাসে, সজল নায়নে, প্রভৃতি অনেক কথা কাব্যের অনেক স্থানে অযথারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এরূপ দুটি একটি ক্ষুদ্র কথার ব্যবহার লইয়া এতটা আড়ম্বর করিতেছি কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। তুলিকার একটি সামান্য স্পর্শ মাত্রেই চিত্রের অনেকটা এদিক ওদিক হইয়া যায়। কবি লিখিবার সময় লক্ষ্মণের চিত্রটি সমগ্র ভাবে মনের মধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারেন নাই; নহিলে যে লক্ষ্মণ দর্শন ভীষণ"মূর্ত্তি"মহাদেবকে দেখিয়া অস্ত্র উদ্যত করিয়াছিলেন, তিনি প্রক্ষ্বেড়নধারী বিরূপাক্ষ রাক্ষসের প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন কেন? "সভয়ে" এই কথাটির ব্যবহারে আমরা লক্ষ্মণের ভয়গ্রস্ত মুখশ্রী স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে "রঘুজ অজ-অঙ্গজ" দশরথ-তনয় সৌমিত্রির প্রতি যে আমাদের ভক্তি বাড়িতেছে তাহা নহে।

ইহার পরে লক্ষ্মণের সহিত ইন্দ্রজিতের যে যুদ্ধ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে যে, লক্ষ্মণের নীচতা, কাপুরুষতা, অক্ষত্রোচিত ব্যবহার স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কবি তাহা ভ্রমক্রমে করেন নাই, ইচ্ছা পূর্ব্বক করিয়াছেন, তিনি একস্থলে ইন্দ্রজিতের মুখ দিয়াই কহিয়াছেন,

ক্ষুদ্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে?
কহ, মহারথি, একি মহারথী প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
এ কথা!'

যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক করিয়া থাকেন, তবে কেন করিলেন? এ মহাকাব্যে কি মহান চরিত্র যথেষ্ট আছে? রাবণকে কি স্ত্রীলোক করা হয় নাই? ইন্দ্রকে কি ভীরু-মনুষ্যরূপে চিত্রিত করা হয় নাই? এ কাব্যের রাম কি একটি কৃপাপাত্র বালক নহেন? তবে এ মহাকাব্যে এমন কে মহান্ চরিত্র আছেন, যাঁহার কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমাদের হৃদয় স্তম্ভিত হয়, শরীর কণ্টকিত হয়, মন বিস্ফারিত হইয়া যায়। ইহাতে সয়তানের ন্যায় ভীষণ দুর্দ্দম্য মন, ভীষ্মের ন্যায় উদার বীরত্ব, রামায়ণের লক্ষ্মণের ন্যায় উগ্র জ্বলন্ত মূর্ত্তি, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহান্ শান্তভাব, চিত্রিত হয় নাই। ইহাতে রাবণ প্রথম হইতেই পুত্রশোকে কাঁদিতেছেন, ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের ভয়ে কাঁপিতেছেন, রাম বিভীষণের নিকট গিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, ইহা দেখিয়া যে কাহার হৃদয় মহান্ ভাবে বিস্ফারিত হইয়া যায়, জানি না।

যখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে কহিলেন,

নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথীকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;—কি আর কহিব?

তখন জলদ প্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্রি,
"আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়েরে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ তেমনি তোরে। জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব,
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে।

একথা বলিবার জন্য জলদপ্রতিমস্বনের কোন আবশ্যক ছিল না।

রামায়ণের লক্ষ্মণ একটি উদ্ধত উগ্র-যুবক, অন্যায় তাঁহার কোন মতে সহ্য হয় না, তরবারীর উপরে সর্ব্বদাই তাঁহার হস্ত পড়িয়া আছে, মনে যাহা অন্যায় বুঝিবেন মুহূর্ত্তে তাহার প্রতিবিধান করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার আর বিবেচনা করিবেন না, অগ্রপশ্চাৎ করিবেন না, তাহার ফল ভাল হইবে কি মন্দ হইবে তাহা জ্ঞান নাই, অন্যায় হইলে আর রক্ষা নাই। অল্প-বয়স্ক বীরের উদ্ধত চঞ্চল হৃদয় রামায়ণে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে। যখন দশরথ রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন ও রামও তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ যাহা কহিতেছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, ইহাতে পাঠকেরা কিয়ৎ পরিমাণে রামায়ণে বর্ণিত লক্ষ্মণচরিত্র বুঝিতে পারিবেন।

*রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনত-মুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাট-পট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস পরি-

* হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।

ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতি-ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন আপনার শূণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানা প্রকার গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! ধর্ম্মদোষ পরিহার এবং স্বদৃষ্টান্তে লোক-দিগকে মর্য্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বন গমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। * * *আপনি অনায়াসে দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন? * *বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না! এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহি-তেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও আপনি যে ধর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্ম-কেই দ্বেষ করি। আপনি কর্ম্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্ম্ম-পূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বরদান ছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ; ফলতঃ আপনার এই ধর্ম্মবুদ্ধি নিতা-ন্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। * * *তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করি-লেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য, সেইই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহাদিগের বল-বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে দৈবকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দ্দান্ত মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের, কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোক-পাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করি-য়াছে, আজ তাহাদিগকেই চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপ-স্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্ব্বি-

বহু পৌরষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রূপ দৈববল কদাচই সুখের নিমিত্ত হইবে না।

* * প্রতিজ্ঞা করিতেছি. আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব, নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ই যত্নবান হইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোন প্রকার বিরোধাচরণ করেন আমি একাকীই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য্য! আমার যে এই ভুজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গ কি কাষ্ঠ বন্ধন এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়? —মনেও করিবেন না; এই চারিটি পদার্থ শত্রুবিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্রই কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন না, বিদ্যুত্বৎ ভাস্বর তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শুণ্ড অশ্বের উরুদেশ এবং পদাতির মস্তক আমার খড়্গে চূর্ণ হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দামশোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে। * * যে হস্ত চন্দন লেপন, অঙ্গদ ধারণ, ধনদান ও সুহৃদ্বর্গের প্রতিপালনের সম্যক উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার অভিষেক-বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহৃজ্জন হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্মণের যেরূপ যুদ্ধ বর্ণনা আছে তাহার কিয়দংশ আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থে এই খানে অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

তুমি এই স্থানে বয়স কাটাইয়াছ, তুমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, সুতরাং পিতৃব্য হইয়া কিরূপে আমার অনিষ্ট করিতেছ? জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব জাতি ও সৌহার্দ্দও তোমার নিকট কিছুই নয়। তুমি ধর্ম্মকেও উপেক্ষা করিতেছ। নির্ব্বোধ! তুমি যখন স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছ তখন তুমি শোচনীয় এবং সাধুগণের নিন্দনীয়। আত্মীয় স্বজনের সহবাস ও অপর নীচ ব্যক্তির আশ্রয় এই দুইটীর যে কত অন্তর তুমি বুদ্ধি শৈথিল্যে তাহা বুঝিতেছ না। পর যদি গুণবান হয় এবং স্বজন যদি নির্গুণও হয় তবুও নির্গুণ স্বজন শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। স্বজনের প্রতি তোমার যেরূপ নির্দ্দয়তা, ইহাতে তুমি জনসমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুখ কদাচই পাইবে না। আমার পিতা গৌরব বা প্রণয় বশতই হউক তোমাকে যেমন কঠোর

ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, তেমনি ত আবার সান্ত্বনাও করিয়াছেন। গুরু লোক প্রীতি-ভরে অপ্রিয় কথা বলেন বটে কিন্তু অবিচারিত মনে আবার ত সমাদরও করিয়া থাকেন। দেখ, যে ব্যক্তি সুশীল মিত্রের বিনাশার্থ শত্রুর বৃদ্ধি কামনা করে ধান্য গুচ্ছের সন্নিহিত শ্যামাকের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া ক্রোধভরে লক্ষ্মণকে কটূক্তি করিতে লাগিলেন। তখন মহাবীর লক্ষ্মণ রোষাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রে দুষ্ট! কথা মাত্রে কখন কার্য্যের পারগামী হওয়া যায় না, যিনি কার্য্যত তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান। তুই নির্ব্বোধ, কোন দুষ্কর কার্য্যে কতক গুলি নিরর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতকার্য্য জ্ঞান করিতেছিস্। তুই অন্তরালে থাকিয়া রণস্থলে আমাদিগকে ছলনা করিয়াছিস্। কিন্তু দেখ্ এই পথটী তস্করের, বীরের নয়। এক্ষণে আত্মশ্লাঘা করিয়া কি হইবে, যদি তুই সম্মুখ্ যুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিস্ তবেই আমরা তোর বলবীর্য্যের পরিচয় পাইব। আমি তোরে কঠোর কথা কহিব না, তিরস্কার কি আত্মশ্লাঘাও করিব না অথচ বধ করিব। দেখ্ আমার কেমন বল বিক্রম। অগ্নি নীরবে সমস্ত দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং সূর্য্য নীরবে উত্তাপ প্রদান করিয়া থাকেন। এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

অভিনয় সমালোচনা।

আমাদের নাট্যশালার একটা বড় আশ্চর্য্য দেখিতেছি, কত কাল হইল তাহার আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু গোড়ায় যাহা দেখিয়াছিলাম আজো তাহাই দেখিতেছি, ইহার আর উন্নতিও হইল না, অবনতিও হইল না। বীর রস অভিনয় করিতে হইলেই তাঁহারা চীৎকার করিতে থাকেন, করুণ রস হইলেই তাঁহারা বুক চাপড়াইয়া নিশ্বাস টানিয়া টানিয়া বিকৃত অস্ফুট স্বরে কাঁদিতে থাকেন, হাস্য রসের অবতারণা করিতে হইলেই বিবিধ অপূর্ব্ব অঙ্গভঙ্গী করিয়া বিকৃত কণ্ঠে সে যে কত প্রকার ভাঁড়ামি করিতে থাকেন তাহার আর সীমা পরিসীমা নাই। ধীর প্রশান্ত গম্ভীর বীরত্ব যে কিরূপ, তাহা তাঁহারা জানেন না, চটুল চপল আস্ফালনই তাঁহাদের বীরত্বের আদর্শ; প্রশান্ত চিন্তাময় যে এক প্রকার বিষাদ আছে তাহা তাঁহারা জানেন না, তাঁহারা যখন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে থাকেন, তখন করুণ রসের আবির্ভাব দূরে থাকুক, উল্টা এমন বিরক্তি বোধ হয় যে, তাহা আর বলিবার নহে; আর ভাঁড়ামি না করিয়া, নিরর্থক প্রলাপোক্তি না

করিয়াও যে হাসাইবার শত সহস্র উপায় আছে ইহা কি তাঁহারা এপর্য্যন্ত বুঝিলেন না? কিম্বা দর্শক-মণ্ডলীরই বা কিরূপ বিচার? নাটকের যদি কোন বীর প্রাণপণে ভগ্ন কণ্ঠে চীৎকার করিতে পারিলেন, যদি কোন শোকগ্রস্ত ব্যক্তি দুই চারিটি কথা বলিয়া সোজা হইয়া মূর্চ্ছা যাইতে পারিলেন, তবে আর রক্ষা নাই; করতালীর পর করতালী, রঙ্গভূমির কন্সর্ট বাদ্য অপেক্ষাও আমাদের বিরক্ত করিয়া তুলে। দর্শকমণ্ডলীর রুচির উপর অভিনয়ের ও অভিনেতাদিগের অভিনয়ের উপর দর্শকমণ্ডলীর রুচির উন্নতি নির্ভর করে সত্য, এবং নাট্যশালাধ্যক্ষেরা বলিতে পারেন যে, দর্শকদের যাহাতে ভাল লাগে সেই অনুসারেই তাঁহাদের কার্য্য করিতে হইবে, নহিলে তাঁহাদের চলিবে কি করিয়া। চাতক পক্ষীর ন্যায় তাঁহাদিগকে ঐ করতালীর ধারা বর্ষণের জন্য তৃষিত কর্ণে অপেক্ষা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতেও বঞ্চিত হইলে তাঁহাদের উৎসাহ থাকিবে কিরূপে? এবং উৎসাহ অভাবে যে অভিনয় অধিকতর নিকৃষ্ট হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কথাটি সত্য বটে, কিন্তু ইহা তাঁহারা নিশ্চিত জানিবেন যে, ভাল অভিনয় হইলে দর্শকদিগের সন্তোষজনক হইবে না ইহা অসম্ভব; যদি দর্শকদিগের এতই রুচি বিকৃত হইয়া থাকে তবে তাঁহাদের দোষেই হইয়াছে এবং তাঁহাদেরই হস্তে তাহার সংস্কারের ক্ষমতাও আছে। অভিনেতাদিগের আর এক দোষ আছে গ্রন্থকার নাটকের প্রতি ছত্র কত ভাবিয়া চিন্তিয়া কত সাবধানে বসাইয়াছেন তাহা তাঁহারা ভাবেন না, তাঁহারা যে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিশ্চিন্ত ভাবে দুই এক কথা বাড়াইয়া বা কমাইয়া দেন, তাহা অতিশয় অবিবেচনার কার্য্য বলিতে হইবে। একটি ক্ষুদ্র কথায় সামান্য স্বর ও হস্তপদ-ভঙ্গীতে এক একটি চরিত্র উলটিয়া পালটিয়া যায়, তাহা তাঁহাদের জ্ঞান নাই।

সমালোচনা করায় যে অনেক উপকার আছে ইহা আবার নূতন করিয়া প্রমাণ করিতে বসিলে অনেক পুরাতন কথার উল্লেখ করিতে হয় এই জন্য সে বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম, কেবল সঙ্ক্ষেপে বলিয়া রাখি যে, ন্যাসনেল থিয়েটরের অধ্যক্ষ মহাশয়গণ যে আমাদের আহ্বান পত্র দিয়াছেন তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি, এবং আমরা তাঁহাদের অভিনয় সমালোচনা করিব ও সমালোচনা করিলে তাহা নিস্ফল হইবে না এই আমাদের বিশ্বাস। আমরা মেঘনাদবধ অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম, সে সম্বন্ধে আমাদের মত সঙ্ক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

মেঘনাদের চরিত্র অতি সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। ইন্দ্রজিৎ কেমন গম্ভীর ভাবে লক্ষ্মণকে কহিলেন

"সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ; সংগ্রাম সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ?"

অন্য কোন অভিনেতা হইলে এই স্থলে এমন চীৎকার করিতেন যে, তাঁহার অগ্র

কণ্ঠের কর্কশ স্বরে একটি অক্ষরও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম না! বিভীষণকে কেমন বিষণ্ণ অথচ তীব্র ভর্ৎসনায় কহিলেন

"এতক্ষণে ———

জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল—"

ইত্যাদি

সংক্ষেপে বলিতে গেলে ইন্দ্রজিতের অংশ অতি সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রমীলার চরিত্র তেমনি জঘন্য হইয়াছিল। প্রথমতঃ সে যাহাই বলুক না কেন তাহার মুখের ভাবের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ তাহার মুখের কথার সহিত তাহার মুখের ভাবের কিছুমাত্র মিল হয় নাই, কি এক প্রকার হাস্য তাহার মুখে সমান ভাবে লাগিয়া ছিল, তাহা আমাদের অতিশয় কষ্টকর বোধ হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ সে অত লাফালাফি দৌড়াদৌড়ি করে কেন বুঝিতে পারিলাম না, সে ছুটিয়া রঙ্গস্থলে প্রবেশ করে এবং ছুটিয়া রঙ্গস্থল হইতে প্রস্থান করে, প্রমীলার চরিত্রের সহিত ছুটাছুটি লাফালাফি করা অতিশয় অসংলগ্ন। যে প্রমীলা "কি কহিলি বাসন্তী?" প্রভৃতি বলিয়াও

"গজপতি গতি

রোষাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ মন্দিরে।"

তাহার কি অত চপলতা ভাল দেখায়?

রাবণের অভিনয় ভাল হয় নাই, যেখানে সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন "কি-সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে," ইত্যাদি যাহার প্রতি ছত্রে ছত্রে তীব্র উপহাসের ভাব গ্রথিত রহিয়াছে সে স্থলে রাবণ এমন হাহাকার শব্দে বিলাপ করিয়াছিলেন যে তাহা সমূহ বিরক্তিজনক হইয়া উঠিয়াছিল। রোদনের স্বরে কথা কহাটা প্রত্যেক অভিনেতার এমন অভ্যস্ত যে তাহাই আশ্চর্য্য! যখন দূত কহিল যে

"ক্ষত বক্ষস্থল মম, দেখ, নৃপমণি,

রিপু প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অস্ত্রলেখা।"

তখন এমন রোদনের স্বরে কহিয়াছিল যে, মনে হইয়াছিল, যেন পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা নাই বলিয়া তাহার অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে।

মহাদেব সুন্দর হইয়াছিল। অভিনেতা এমন গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছিলেন যে, মনে হইয়াছিল যেন পাষাণের মূর্ত্তিই কথা কহিতেছে। সীতা ও সরমার অংশ পরিত্যাগ করিলেই ভাল হইত, সে অংশটি অতিশয় বিরক্তিজনক হইয়াছিল।

রামের অংশও অতিশয় সুন্দর অভিনীত হইয়াছিল। ইন্দ্রজিৎ ও রামের অংশই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম হইয়াছিল।

স্বাস্থ্য।

৪। স্তন[illegible] করাইবার জন্য ধাত্রীর অনাবশ্যকতা।——সন্তান ধাত্রীর হস্তে প্রতিপালিত হইলে, উহার স্তন পান করিয়া বালক ধাত্রীর পৈতৃক রোগপ্রবণতা ও কিয়দংশ তাহার স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ইহা অন্যায় ও নিতান্ত দোষাবহ।

কখন কখন এরূপও দেখা গিয়াছে যে দাইয়ের দোষে সন্তানের শরীরে নানা প্রকার জঘন্য রোগ জন্মে। এতদ্ভিন্ন এদেশের ধাত্রী মাত্রেই প্রায় নীচ কুলোদ্ভব। উহাদের দ্বারা সুকুমার বালকের হৃদয়ে যে কত প্রকার অসৎ প্রবৃত্তির বীজ সংরোপিত হয় তাহা বলা যায় না। এই সমস্ত বিষয় সন্তানের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। মিথ্যা কথন, চৌর্য্যবৃত্তি ও অপরাপর অন্যায়াচরণ আমরা অনেক সময়ে এই ধাত্রী হইতেই শিক্ষা করি। শৈশবে এই সকল দোষ একবার বদ্ধমূল হইলে আমরা আজীবন উহাতেই লিপ্ত থাকি। এই রূপ জানিয়া শুনিয়া কোন্ অভাগা জননী ইচ্ছাপূর্ব্বক আপন সন্তানকে ঈদৃশ অসৎ সম্পর্কে অধিক দিন রাখিতে পারেন। কোন্ নরাধম, সন্তানের এই সমস্ত অপ্রতিকার্য্য দোষ ঘটিবে জানিয়া তাহাকে স্বহস্তে নরকস্বরূপা ধাত্রীর ক্রোড়ে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। যাহাই হউক নিতান্ত নিরুপায় হইলেও কেহ যেন সন্তানকে ধাত্রীর হস্তে এক বৎসরের অধিক না রাখেন। "সৎপুত্র কুলের ভূষণ" ইহা আমাদের মধ্যে একটি চিরপ্রচলিত কথা। কিন্তু পুত্র কিরূপে সৎ হয় তাহা অনেকেই জানেন না। প্রথম হইতে সন্তানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে সে জন্মের মত মন্দ হইয়া যায়। কারণ আমরা শৈশবাবস্থায় যাহা শিক্ষা করি বা দেখি তাহই পরিণামে আমাদিগের একমাত্র পথপ্রদর্শক হয়। জ্ঞানোদয় হইলে আমরা শৈশবাগত অনেক দোষ পরিহারে চেষ্টা পাই কিন্তু অভ্যাস দোষে আমরা সময়ে সময়ে ভ্রমে পতিত হই। বাল্যসংস্কারই ইহার একমাত্র কারণ। অতএব ঐ সময় সন্তান যাহাতে কুসংসর্গে না পড়ে তদ্বিষয়ে সকলেরই সতর্ক হইয়া চলা উচিত। তাহা হইলে অনেক পরিবার মধ্যে সুখের সীমা থাকিবে না। অনেক মাতার অসৎপুত্র লইয়া আর সংসারে চিরদিন যন্ত্রণা ভোগ বা রোদন করিতে হইবে না।

৫। মাতৃস্তন-অভাবে সন্তান প্রতিপালনের উপায়।—সন্তান কোন বিশেষ বিশেষ কারণে মাতৃস্তন না পাইলে তাহাকে অতি যত্ন পূর্ব্বক ও সাবধানে প্রতিপালন করিতে হয়। কারণ স্বভাবতঃ মাতৃদুগ্ধই উহাদের একমাত্র খাদ্য। তাহার অসদ্ভাব ঘটিলে অপর যে কোন প্রকার দুগ্ধ হউক না কেন, সকলেতেই সন্তানের অসুখ আনয়ন করে। এমন কি যত দিন ঐরূপ দুগ্ধপান অভ্যস্ত না হয় তত দিন ছেলে কষ্ট পায়। তথাপি সন্তানের পোষণার্থ আমাদিগকে অগত্যা নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এই

সকল উপায় মধ্যে গোদুগ্ধই প্রধান। এই দুগ্ধ অল্পবয়স্ক গাভি হইতে পাইলেই ভাল। তাহার ঐ দুগ্ধে অর্দ্ধেক জল ও কিঞ্চিৎ মিছরি বা পরিষ্কার চিনি মিশ্রিত করিয়া সন্তানকে যথানিয়মে খাওয়াইতে হয়। টাটকা দুধ না পাইলে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই গরম করিয়া একটি কাচের মুখনল-বিশিস্ট বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয় এবং যথাসময়ে ঐ বোতল সন্তানের মুখে ধরিলে সে মুখনল চুসিয়া দুধ পান করে। এইরূপে সন্তানের উদরপূর্ত্তি করিতে হয়। এই বোতল গুলির নাম ফিডিং বটল, ইহা ভাল ডিস্পেন্সরি মাত্রেই কিনিতে পাওয়া যায়। দুগ্ধ খাওয়াইবার জন্য বোতল একবার ব্যবহার হইলে পর উহাকে প্রথমতঃ গরম জল দিয়া সাফ করিতে হয়, পরে কিছুক্ষণ ঠাণ্ডা জলে রাখিলেই উহা পুনরায় ব্যবহার্য হইয়া থাকে। এরূপ না করিলে দুগ্ধ-সংস্পর্শে বোতল মধ্যে অম্লরস উৎপন্ন হয়, সুতরাং বালক তদবস্থায় উহা হইতে দুগ্ধ পান করিলে, উকি তোলে অথবা বমন করিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন অপর একটি কাচের পাত্রে চিনি ভিজাইয়া রাখিতে হয়, ঐ চিনিপানা দুগ্ধের পরিবর্ত্তে মধ্যে মধ্যে দেওয়া যাইতে পারে।

সন্তানের যতই বয়োবৃদ্ধি হয় ও পরিপাক শক্তি বাড়িতে থাকে ততই দুগ্ধে মিশাইবার জলের পরিমাণ কমাইতে হয়। যদি ইহাতে উদরাময় জন্মে তাহা হইলে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে যবসিদ্ধ জল, কিঞ্চিৎ চিনির সহিত মিশাইয়া খাওয়ানই ভাল। তাহাতে ও পেটের অসুখ না সারিলে চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইতে হইবে। বালক শুদ্ধ দুধ খাইয়া পরিতৃপ্ত না হইলে, তাহাকে সাগু, এরারুট, টেপিওকা অথবা পাঁউরুটি গরম দুগ্ধে দিয়া খাওযাইতে হয়। কিন্তু তাহাতে পেট খারাপ হইলে অমনি উহা বন্ধ করিয়া অন্য কোন লঘু আহার দেওয়া উচিত।

অনেকে মনে করেন যে সন্তান দেখিতে যত হৃষ্টপুষ্ট হয় ততই ভাল কিন্তু এটি তাহাদের বড় ভুল। কারণ সে পুষ্টি কখনই স্থায়ী হয় না, প্রত্যুত একটু কিছু অসুখ হইলেই শীর্ণ হইয়া পড়ে। আর এক দোষ এই যে, সন্তান স্থূলকায় হইলে সর্ব্বদা ফোড়া ও পাঁচড়া হয়। সুতরাং জনক জননীরা যেন সন্তানকে অধিক মোটা করিবার জন্য ব্যস্ত না হন। যতদিন সন্তানের দাঁত না উঠে ততদিন উহাকে পেয় দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন কঠিন দ্রব্য খাইতে দেওয়া উচিত নহে। দাঁত উঠিলেই কঠিন দ্রব্য দেওয়া বিধেয়।

যে সকল বালক দুগ্ধপোষা, স্বভাবতঃ অতিশয় শীর্ণ ও রোগপ্রবণ, তাহাদের বয়স বেশী হইলেও, তৈলাক্ত সামগ্রী খাইতে দেওয়া অন্যায়। ইহাতে তাহার জীবনান্ত হইবার সম্ভাবনা। অতএব তাহাদিগকে কেবল জলমিশ্রিত দুগ্ধ দিতে হইবে এবং প্রত্যহ শীতল জলে পৃষ্ঠদেশ (মেরুদণ্ড) ধৌত করিতে হইবে। এ ছাড়া তাহাদিগকে ঔষধ দেওয়াও আবশ্যক।

খ—

করুণা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্রের অনেকগুলি দোষ জুটিয়াছে সত্য, কিন্তু করুণাকে সে সকল কথা কে বলে বল দেখি ? সে বেচারী কেমন বিশ্বস্ত চিত্তে স্বপ্ন দেখিতেছে,তাহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গাইবার প্রয়োজন কি ? কিন্তু সে এত শত বুঝেও না, অত কথায় কাণও দেয় না ; কিন্তু রাত দিন শুনিতে শুনিতে দুইএকটা কথা মনে লাগিয়া যায় বৈ কি। করুণার অমন প্রফুল্ল মুখ, সেও দুই একবার মলিন হইয়া যায় নয় ত কি ? কিন্তু নরেন্দ্রকে পাইলেই সে সকল কথা ভুলিয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিতে মনেই থাকে না, অবসরই পায় না, তাহার অন্যান্য এত কথা কহিবার আছে যে, তাহাই ফুরাইয়া উঠিতে পারে না, ত অন্য কথা ! কিন্তু করুণার এভাব আর অধিক দিন থাকিবে না তাহা বলিয়া রাখিতেছি। নরেন্দ্র যেরূপ অন্যায় আরম্ভ করিয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। নরেন্দ্র এখন আর কলিকাতায় বড় একটা যাতায়াত করে না। করুণাকে ভাল বাসিয়া যে, যায় না, সে ভ্রম যেন কাহারো না হয়। কলিকাতায় সে যথেষ্ট ঋণ করিয়াছে,পাওনাদারদের ভয়ে সে কলিকাতা ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

দিনে দিনে করুণার মুখ মলিন হইয়া আসিতেছে,নরেন্দ্র যখন কলিকাতায় থাকিত ছিল ভাল, চর্ব্বিশ ঘণ্টা চখের সামনে থাকিলে কাহাকেই বা না চিনা যায় ? নরেন্দ্রের স্বভাব করুণার নিকট ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পাইতে লাগিল। করুণার কিছুই তাহার ভাল লাগিত না। সর্ব্বদাই খিটি খিটি, সর্ব্বদাই বিরক্ত। এক মুহূর্ত্তও ভাল মুখে কথা কহিতে জানে না, অধীরা করুণা যখন হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া তাহার নিকট আসে তখন সে সহসা এমন বিরক্ত হইয়া উঠে যে করুণার মন একেবারে দমিয়া যায়। নরেন্দ্র সর্ব্বদাই এমন রুস্ট থাকে যে করুণা তাহাকে সকল কথা বলিতে সাহস করে না, সকল সময় তাহার কাছে যাইতে ভয় করে, পাছে সে বিরক্ত হইয়া তিরস্কার করিয়া উঠে। তদ্ভিন্ন সন্ধ্যাবেলা তাহার নিকট কাহারো ঘেঁসিবার যো ছিল না, সে মাতাল হইয়া যাহা ইচ্ছা তাই করিত। যাহা হউক করুণার মুখ দিনে দিনে মলিন হইয়া আসিতে লাগিল ; অলীক কল্পনা বা সামান্য অভিমান ব্যতীত অন্য কোন কারণে করুণার চক্ষে প্রায় জল দেখি নাই, এইবার ঐ অভাগিনী আন্তরিক মনের কষ্টে কাঁদিল। ছেলেবেলা হইতেই সে কখনো অনাদর উপেক্ষা সহ্য করে নাই,আজ আদর করিয়া তাহার অভিমানের অশ্রু মুছাইবার আর কেহই নাই। অভিমানের প্রতিদানে তাহাকে এখন বিরক্তি সহ্য করিতে হয়। যাহা হউক করুণা আর বড় একটা খেলা

করুণা বেড়ায় না, সেই পাখীটি লইয়া অন্তঃপুরের বাগানে বসিয়া থাকে। নরেন্দ্র মাঝে মাঝে কলিকাতায় গেলে দেখিয়াছি এক এক দিন করুণা সমস্ত জোৎস্না রাত্রি বাগানের সেই বাঁধা ঘাটটির উপরে শুইয়া আছে, কতকি ভাবিতেছে জানিনা, ক্রমে তাহার নিদ্রাহীন নেত্রের সম্মুখ দিয়া সমস্ত রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র যেমন অর্থ ব্যয় করিতে লাগিল, তেমনি ঋণও সঞ্চয় করিতে লাগিল। সে নিজে এক পয়সাও সঞ্চয় করিতে পারে নাই, টাকার উপর তাহার তেমন মায়াও জন্মে নাই, তবে এক পরিবারের মুখ চাহিয়া লোকে অর্থ সঞ্চয়ের চেষ্টা করে, তা নরেন্দ্রের সে সকল খেয়ালই আসে নাই। একটু আধটু করিয়া যথেষ্ট ঋণ সঞ্চিত হইল। অবশেষে এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঘর হইতে দুটা একটা জিনিষ বন্ধক রাখিবার প্রয়োজন হইল।

করুণার শরীর অসুস্থ হইয়াছে। অনর্থক কতক গুলা অনিয়ম করিয়া তাহার পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। নরেন্দ্র কহিল সে দিবারাত্র এক পীড়া লইয়া লাগিয়া থাকিতে পারে না; তাই বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল। এদিকে করুণার তত্ত্বাবধান করে কে তাহার ঠিক নাই; পণ্ডিত মহাশয় যথাসাধ্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতেই বা কি হইবে? করুণা কোন প্রকার ঔষধ খাইতে চায় না, কোন নিয়ম পালন করে না। করুণার পীড়া বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল; পণ্ডিত মহাশয় মহা বিব্রত হইয়া নরেন্দ্রকে আসিবার জন্য এক চিঠি লিখিলো। নরেন্দ্র আসিল, কিন্তু করুণার পীড়া বৃদ্ধির সংবাদ পাইয়া নয়, কলিকাতায় গিয়া তাহার এত ঋণ বৃদ্ধি হইয়াছে যে চারিদিক হইতে পাওনাদারেরা তাহার নামে নালিষ আরম্ভ করিয়াছে, গতিক ভাল নয় দেখিয়া নরেন্দ্র সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

নরেন্দ্রের এবার কিছু ভয় হইয়াছে, দেশে ফিরিয়া আসিয়া ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। এবং মনের পাত্রের মধ্যে মনের সমুদয় আশঙ্কা ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। আর কাহার সঙ্গে দেখা করে নাই, কথা কহে নাই, তাহার সে ঘরটিতে কাহারো প্রবেশ করিবার যো নাই। নরেন্দ্র যেরূপ কষ্ট ও যেরূপ কথায় কথায় বিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, চাকর বাকরেরা তাহার কাছে ঘেঁসিতেও সাহস করে না। পীড়িতা করুণা খাদ্যাদি গুছাইয়া ধীরে ধীরে সে ঘরে প্রবেশ করিল, নরেন্দ্র মহা রুক্ষ হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কে তাহাকে সে ঘরে আসিতে কহিল? একথার উত্তর আর কি হইতে পারে? তাহার পরে পিশাচ যাহা করিল তাহা কল্পনা করিতেও কষ্ট বোধ হয়, পীড়িতা করুণাকে এমন নিষ্ঠুর পদাঘাত করে যে সে সেই খানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল, নরেন্দ্র সে ঘর হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

অল্প দিনের মধ্যে করুণার এমন আকার

পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে যে, তাহাকে দেখিলে সহসা চিনিতে পারা যায় না। তাহার সে শীর্ণ বিবর্ণ বিষণ্ণ মুখখানি দেখিলে এমন মায়া হয় যে, কি বলিব। নরেন্দ্র এবার তাহার উপর যত দূর অত্যাচার করিবার তাহা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সরলা সমস্তই নীরবে সহ্য করিতেছে, একটি কথা কহে নাই, নরেন্দ্রের নিকটে এক মুহূর্ত্তের জন্য রোদনও করে নাই; এক দিন কেবল অত্যন্ত কষ্ট পাইয়া অনেক ক্ষণ নরেন্দ্রের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আমি তোমার কি করিয়াছি?" নরেন্দ্র তাহার উত্তর না দিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়।

দশম পরিচ্ছেদ।

এক বার ঋণের আবর্ত্ত মধ্যে পড়িলে আর রক্ষা নাই। যখনি কেহ নালিশের ভয় দেখাইত, নরেন্দ্র তখনই তাড়াতাড়ি অন্যের নিকট হইতে অপরিমিত শুদে ঋণ করিয়া পরিশোধ করিত। এইরূপে আসল অপেক্ষা শুদ বাড়িয়া উঠিল, নরেন্দ্র এবার অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল, নালিষ দায়ের হইল, সমনও বাহির হইল। এক দিন প্রাতঃকালে শুভ মুহূর্ত্তে নরেন্দ্রের নিদ্রা ভঙ্গ হইল ও ধীরে ধীরে শ্রীঘরে বাস করিতে চলিলেন।

বেচারী করুণা না খাওয়া না দাওয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার করিয়া দিল, কি করিতে হয় কিছুই জানে না, অধীর হইয়া বেড়াইতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় এ কুসংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু কি করিতে হইবে, সে বিষয়ে তাঁর করুণা অপেক্ষা অধিক জানিবার কথা নহে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নিধিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন; নিধি জিনিষ পত্র বিক্রয় করিয়া ধার শুধিতে পরামর্শ দিল। এখন বিক্রয় করে কে? সে স্বয়ং তাহার ভার লইল। করুণার অলঙ্কার অল্পই ছিল, পূর্ব্বেই নরেন্দ্র তাহার অধিকাংশ বন্ধক দিয়াছে ও বিক্রয় করিয়াছে, যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল সমস্ত আনিয়া দিল। নিধি সেই সমুদয় অলঙ্কার ও অন্যান্য গার্হস্থ্য দ্রব্য অধিকাংশ নিজে যৎসামান্য মূল্যে, কোন কোনটা বা বিনামূল্যেই গ্রহণ করিল ও অবশিষ্ট বিক্রয় করিল। পণ্ডিত মহাশয় ত কাঁদিতে বসিলেন, ভয়ে কষ্টে করুণা অধীর হইয়া উঠিল। বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু পাওয়া গেল তাহাতে পণ্ডিত মহাশয় নিজের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ দিয়া দেয়-অর্থ কোন প্রকারে পূরণ করিয়া দিলেন। নরেন্দ্র কারাগার হইতে মুক্ত হইল, কিন্তু ঋণ হইতে মুক্ত হইল না। তদ্ভিন্ন এই ঘটনায় তাহার কিছুমাত্র শিক্ষাও হইল না। যে রকম করিয়াই হউক না কেন, এখন মদ নহিলে তাহার আর চলে না। করুণার প্রতি কিছুমাত্র সদয় হয় নাই, করুণা গার্হস্থ্য দ্রব্যাদি কেন অমন করিয়া বিক্রয় করিল, তাহাই লইয়া নরেন্দ্র করুণাকে যথেষ্ট পীড়ন করিয়াছে।

গদাধর ও স্বরূপ এখানে আসিয়া

জুটিয়াছে। সেবারকার প্রহারের পরও গদাধরের অন্তঃপুর-সংস্কার-প্রিয়তা কিছুমাত্র কমে নাই, বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানেই যাউক্ না কেন সেখানেই তাহার ঐ চিন্তা, নরেন্দ্রের দেশেও তাঁহার সেই উদ্দেশ্যেই আগমন, ইচ্ছা আছে এখানেও দুই একটি সৎউদাহরণ রাখিয়া যাইবেন। পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুদের পাইয়া নরেন্দ্র বিলক্ষণ আমোদ করিতে লাগিলেন। স্বরূপ ও গদাধরের নিকট আরো অনেক ঋণ করিলেন, তাহারা জানিত না যে নরেন্দ্র লক্ষ্মীভ্রষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বিশ্বস্তচিত্তে কিঞ্চিৎ সুদের আশা করিয়া ধার দিল। গদাধরের হস্তে এই বার একটি কাজ পড়িয়াছে; নরেন্দ্রের মুখে সে কাত্যায়নী ঠাকুরাণীর সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়াছে, শুনিয়া সে মহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বিবাহিত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এত বয়সের তারতম্য কোন হৃদয় সম্পন্ন মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না; বিশেষতঃ সমাজ সংস্কারই যাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, হৃদয়ের প্রধান আশা, অবকাশের প্রধান ভাবনা, কার্য্যক্ষেত্রের প্রধান কার্য্য, তাহারা সমাজের এ সকল অন্যায় অবিচার কোন মতেই সহ্য করিতে পারে না। ইহা সংশোধনের জন্য, এপ্রকার অন্যায় রূপে বিবাহিত স্ত্রীলোকদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য, সংস্কারকদিগের সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করা কর্ত্তব্য, এবং আমাদের কাত্যায়নী দেবীর উদ্ধারের জন্য গদাধর সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতেই প্রস্তুত আছেন। আর যখন স্বরূপ বাবু তাঁহার ক্ষুদ্র কবিতাবলী পুস্তকাকারে মুদ্রিত করেন, তাহার মধ্যে "রাহুগ্রাসে চন্দ্র" নামে একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহাতে, যে বিধাতা কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, কোকিলে কুরূপ দিয়াছেন, তাঁহাকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়া একটি বিবাহ বর্ণনা লিখিত ছিল, আমরা গোপনে সন্ধান লইয়া শুনিয়াছিলাম যে, তাহা কাত্যায়নী ঠাকুরাণীকেই লক্ষ্য করিয়া লিখিত হয়, অনেক সমালোচক নাকি তাহাতে অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

প্রাপ্ত গ্রন্থ।

মৃণ্ময়ী।—পণ্ডিত গোবিন্দ মোহন রায় বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আমরা এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছি। পাঠকগণ "মৃণ্ময়ী" নাম শুনিলে সহসা মনে করিতে পারেন যে, পুস্তক খানি কোন প্রকার নাটক অথবা আখ্যায়িকা সংক্রান্ত, "মৃণ্ময়ী" তাহার নায়িকা, বস্তুতঃ তাহা নহে। এখানি আর্য্যজাতির সিদ্ধান্ত বা গণিত শাস্ত্রোক্ত ভূগোলবিদ্যার সার সঙ্কলন গ্রন্থ। ইহাতে গ্রহ ভ্রমণ, পৃথিবীর আকার সংস্থান প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় ব্যক্ত আছে। বিদেশীয়দিগের সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য

করিয়া লেখায় গ্রন্থখানি উপাদেয় ও আদরের বস্তু হইয়াছে সংশয় নাই, এরূপ গ্রন্থ যত অধিক প্রচারিত হইবে ততই মঙ্গল। কেননা দেশীয় পুরাতত্ত্বের মর্য্যাদা দেখিতে পাইলে সেই সূত্রে লোকের ক্রমশঃ স্বদেশানুরাগ অঙ্কুরিত হইতে পারে।

পুরাণাদি শাস্ত্র বিশদ না থাকাতে মাধ্যাকর্ষণবাদী এতদ্দেশীয় ইংরাজী পাঠকেরা আপনাদের পূর্ব্বপিতামহদিগকে ভ্রমান্ধ বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। রায়মহাশয় দেখাইয়া দিয়াছেন যে, নিউটনের বহু পূর্ব্বেও এদেশের লোকেরা পৃথিবীর ঐ আশ্চর্য্য শক্তির বিষয় অবগত ছিলেন। সূর্য্য-কিরণে প্রতিফলিত হইয়াই যে চন্দ্র প্রকাশমান হন, তাহারও প্রমাণ দেখান হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই মতটি আমাদের দেশে প্রচলিত। বৈদিক ঋষিরাও উহা জ্ঞাত ছিলেন। যথা—

চন্দ্রমা অপ্স,ন্তরা সুপর্ণো ধাবতে দিবি !

(ঋগ্বেদ ১সংকুৎস্য ঋষিরস্তোত্র)

জলময় মণ্ডলের মধ্যে বর্ত্তমান সূর্য্যরশ্মিযুক্ত চন্দ্রমা দ্যুলোকে ধাবিত হইতেছেন।

পার্থিবচ্ছায়া দ্বারা যে গ্রহণ হয়, তাহাও বৈদিক ঋষিরা জানিতেন। অত্রি গোত্রের ঋষিরা ইহার প্রথম জ্ঞাতা। লোকের শ্রদ্ধা বৃদ্ধির নিমিত্তে বৈদিক বাক্যের সহিত মৃণ্ময়ীর সম্বন্ধ বন্ধন করিলে সমধিক সুখের বিষয় হইত।

গ্রন্থকার একস্থলে বলিয়াছেন "পঞ্চাল রাজধানী অহিচ্ছত্রের চিহ্নও নাই" কিন্তু অহিচ্ছত্র পঞ্চাল রাজধানী বলিয়া বোধ হয় না, মহাভারত দৃষ্টে বোধ হয় যে অহিচ্ছত্র হস্তিনার নিকটবর্ত্তী এবং তাহা হস্তিনার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত ছিল। কারণ উদ্যোগ পর্ব্বে লিখিত আছে যে, প্রথমতঃ দ্রুপদ রাজা সন্ধির নিমিত্ত স্বয়ং পুরোহিতকে প্রেরণ করেন। পুরোহিত পাঞ্চালরাজধানী হইতে হস্তিনায় আসিয়া দেখিলেন যে, হস্তিনায় তিলার্দ্ধ স্থান নাই, সৈন্য সামন্ত পরিপূর্ণ হইয়াছে এবং তদ্ভিন্ন

"তথা রোহিতকারণ্যং মরুভূমিশ্চ কেবলা।
অহিচ্ছত্রং কালকূটং গঙ্গাকূলঞ্চ ভারত ॥'

এই সকল প্রদেশেও কুরুসৈন্যে পরিপূর্ণ, অতএব যদি অহিচ্ছত্র পাঞ্চাল রাজধানী হইল তথা হইতে দ্রুপদ-পুরোহিত হস্তিনায় আসিয়া আবার কোন অহিচ্ছত্রে কুরুসেনার স্কন্ধাবার দেখিবেন? যাহাই হউক এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা অতিমাত্র প্রীত হইলাম। এবং বোধ হয় সাধারণেও ইহা আদরের সহিত গৃহীত হইবে।

কোরকে কীট। বা সমাজ চিত্র। উপন্যাস। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৷৵০ আনা মাত্র। প্রকৃতিবাদ যন্ত্রে মুদ্রিত। এ গ্রন্থখানি হইতে এক স্থল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"স্বামী—যত্নে রত্নহার; মনের অভিলাষ; চিন্তায় কল্পনা। ভক্তিতে গুরু; ব্যথায় ব্যথিত; প্রণয়ে প্রণয়ী। স্বামী সুখের সুখী; দুঃখের দুঃখী; বিপদে বান্ধব।

তৃষ্ণায় জল; জলে তরণী; অগ্নিতে জল। স্বামী—জলমগ্নে সন্তরণ; গৃহদাহে পলায়ন; সর্পদংশনে মণিমন্ত্র। স্বামী—গ্রীষ্মে শীতল বীজন; বর্ষার সুখশয্যা, শরতের চাঁদ। স্বামী—হেমন্তে গাত্র-বস্ত্র; শীতের আগুন; বসন্তে মলয়ানিল।

কুসুম কলিকা।—শ্রী প্রসন্নকুমার ঘোষ প্রণীত। বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। "রমণীর কেশের প্রতি" নামক চতুর্দ্দশপদী কবিতাটি উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে উপহার দিলাম!!

প্রাচীন মিসর বাসী, স্বদেশ প্রিয়তা
দেখাইতে ধরাতলে, করিত যেমন
স্বদেশেতে চিরবাস, পেয়েও পঞ্চতা,
দেহে অপরূপ বাস করিয়া ধারণ,
হে রমণী-কেশদল! তোমরা তেমন
জন্ম স্থান প্রতি দৃঢ় অনুরাগ ভরে,
উৎপাটিত হইয়াও, কর গো ধারণ—
রজ্জুরূপ, নারীশিরে থাকিবার তরে!
ভবের ভূষণ হোয়ে, অসীম আদরে,
সাধে কি গো নারীকুল করেন ধারণ
তোমাদের কালো রূপ মস্তক উপরে?
তোমরা করিতে পাও শ্যামাঙ্গে লেপন
দেবতার অভীপ্সিত গন্ধদ্রব্য চয়,
নারী সনে ভাল বাসা করি বিনিময়।

পাদুকা নামক কবিতাটিতে পাদুকার সহিত আধুনিক ভারতবর্ষবাসীগণের যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলনা করা হইয়াছে তাহা সর্ব্বাংশে বেশ মিলিয়া গিয়াছে।

ভানুসিংহের কবিতা।

সখিরে—পিরীত বুঝবে কে?
আঁধার মরমক, আঁধার কাহিন (১)
বোলব, শুনবে কে?
রাধিকার অতি অন্তর বেদন
কে বুঝবে অয়ি সজনী,
কে বুঝবে সখি রোয়ত রাধা
কোন দুখে দিন রজনী?
কলঙ্ক রটায়ব জনি সখি রটাও (২)
কলঙ্ক নাহিক মানি,
সকল তয়াগব লভিতে শ্যামক
একঠো আদর বাণী।
মিনতি করিলো সখি শত শত বার, তু (৩)
শ্যামক না দিহ গালি,
শীল মান কুল, অপনি সজনি হম
চরণে দিয়াছি ঢালি॥
সখিলো
বৃন্দাবন কো দুরজন মানুখ
পিরীত নাহিক জানে,
বৃথাই নিন্দা কাহে রটাওত
হমার শ্যামক নামে?
কলঙ্কিনী হম রাধা, সখিলো
ঘৃণা করহ জনি (৪) মনমে,

(১) কাহিনী।
(২) সখি! যদি কলঙ্ক রটাইতে চাও তবে রটাইও।
(৩) তুমি।
(৪) যদি।

ন আসিও তব, কবহুঁ সজনি লো
হমার আঁধা ভবনমে ॥
কহে ভানু অব—বুঝবে না সখি
কোহি মরম কো বাত,
বিরলে শ্যামক, কহিও বেদন,
বক্ষে রাখয় মাথ !

সতিমির রজনী, সচকিত সজনী.
শূন্য নিকুঞ্জ অরণ্য !
কলয়িত মলয়ে, সুবিজন নিলয়ে
বালা বিরহ-বিষণ্ণ !
নীল আকাশে, তারক ভাসে
যমুনা গাওত গান,
পাদপ মরমর, নির্ঝর ঝরঝর
কুসুমিত বল্লি বিতান।
তৃষিত নয়ানে, বন-পথ পানে
চায় বিয়াকুল বালা,
দেখ ন পাওয়ে, আঁখ ফিরাওয়ে
গাঁথে বন-ফুল মালা।
কুঞ্জে কুঞ্জে, বিহঙ্গ পুঞ্জে
সহসা গাওল গান,
মঞ্জু তরঙ্গনী, গঙ্গা-সঙ্গিনী,
সহসা বহল উজান !
বকুল কলাপে, ভৃঙ্গ আলাপে
সহসা প্রফুল্ল বল্লি,
ফুটল মঞ্জুল বঞ্জুল মঞ্জরী
ফুটল হসন্ত মল্লি।
সহসা রাধা, হরষে উলসিত
দূরে খেপল মালা,
কহল "সজনি শুন, বাঁশরি বাজে
কুঞ্জে আওল কালা !
চমকি গহন নিশি, দূর দূর দিশি
বাজত বাঁশি সুতানে !
কণ্ঠ মিশাওল ঢল ঢল যমুনা
কল কল কল্লোল গানে !
হসিত বয়ানে ফুল্ল নয়ানে
কুঞ্জে আওল কালা,
সঙ্গিনী মেলই, নাচল গাওল
উলসিল রাধিক বালা ॥
কহতহ ভানু—শুন গো কানু
পিয়াসিত গোপিনী প্রাণ।
তোঁহার প্রেমক বিমল অমৃত রস
হরষে করবে পান ॥

সম্পাদকের বৈঠক।

বায়রণের কথোপকথনকালীন উক্তি।

অমরত্ব।—আত্মার অমরত্বে বিশ্বাসই জীবনের দুঃখকষ্ট নিবারণের একমাত্র প্রকৃত ঔষধ।

যশের যন্ত্রণা।—কোন গ্রন্থ জনসমাজে সমাদৃত হইলে তাহার লেখক চিরকালের জন্য অসুখী হয়েন। ইহাতে তাঁহার যশ-তৃষ্ণা এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে, তাঁহার মন হইতে শান্তি চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়। তাঁহার একটি গ্রন্থ জনসমাজে আদৃত হওয়ায় তিনি উৎসাহিত হইয়া আরও অন্যান্য

গ্রন্থ লিখিতে সচেষ্ট হয়েন; লোকেও প্রত্যাশা করে যে, তাঁহার প্রথম গ্রন্থ অপেক্ষা পরবর্ত্তী গ্রন্থগুলি আরও উৎকৃষ্ট হইবে। এই জন্য নিরাশা উপস্থিত হয়। কারণ লোকের আশা এতদূর উত্তেজিত হয় যে, তাহা কিছুতেই পূর্ণ হয় না। বিশেষতঃ আজ কালের এইরূপ ধরণ যে, গ্রন্থকারের একটি রচনাও যদি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হয়—তাহা হইলে আর তাঁহার রক্ষা নাই—তাঁহার পূর্ব্ব রচিত যদি ৫০ খানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ থাকে তথাপি একটি নিকৃষ্ট গ্রন্থ তাঁহার পূর্ব্ব কীর্ত্তির অপলাপ করে।

জীবন।—জীবনের স্বল্পতা লইয়া লোকে আক্ষেপ করে; জীবন অতি দীর্ঘ বলিয়া বরং তাহাদিগের আক্ষেপ করা উচিত। কারণ জীবন-চক্রের অর্দ্ধ পথে যাইতে না যাইতেই জীবনের সমস্ত সুখ তিরোহিত হইয়া যায়। যে সকল ছলনার অস্তিত্বে জীবন ভারবহ বলিয়া বোধ হয় না, সেই সকল ছলনাগুলি চলিয়া গিয়া যখন গম্ভীর উপদেষ্টা অভিজ্ঞতা আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করে, তখন আর জীবনে কি সুখ? তাহার পূর্ব্বেই যাহারা মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় তাহারা অতি ভাগ্যবান্। যৌবন যখন জীবন তরণীর হাল ধরিয়া থাকে, প্রবৃত্তি স্রোত যখন তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়—অভিজ্ঞতা তখন তফাৎ থাকেন। কিন্তু যখনি যৌবন পলায়ন করে ও প্রবৃত্তির বেগ মন্দীভূত হয়, যখন অভিজ্ঞতার সাহায্য আর প্রয়োজন হয় না, তখনি অভিজ্ঞতা আসিয়া অতীতের জন্য আমাদিগকে তিরস্কার করিতে থাকেন, বর্ত্তমানের প্রতি বিরক্তি জন্মাইয়া দেন, এবং ভবিষ্যতের জন্য ভয় প্রদর্শন করেন।

বিজনতা।—বিজনতায় একটি মাত্র দোষ আছে। নির্জ্জনে থাকিলে আপনাকে আপনি অত্যন্ত বড় মনে হয়। কিন্তু জনসমাজ আমাদের নিজ দোষ প্রতিক্ষণে স্মরণ করাইয়া দেয়।

উন্মাদ।—এসংসারে পাগলামির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব পাগলামির তিনটি সোপান আছে।—এই তিন সোপানের ভিন্ন ভিন্ন তিনটী নাম আছে,—ছিট্‌গ্রস্ততা, বাতিকগ্রস্ততা ও উন্মাদ। খেয়াল, রুচি বা ব্যবহার বিষয়ে অন্য অপেক্ষা একটু তফাৎ হইলেই লোকে তাহাকে ছিট্‌গ্রস্ত বলে—আরও অধিক তফাৎ হইলে তাহাকে বাতিকগ্রস্ত বলে; এবং যখন এই প্রভেদটী একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করে তখনই তাহা উন্মাদ হইয়া দাঁড়ায়। প্রতিভাশালী ব্যক্তি মাত্রই একটু ছিটগ্রস্ত।

আত্মনির্ভর।—অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞান আমাদের অন্তরে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জনসমাজে মিশিলে এই উপকারটী সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যুবকদিগের এই একটী বিষম দোষ যে তাহারা অন্যের মতে নিতান্ত অতর্কিত ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু যুবকের পক্ষে ইহার বিপরীত আচরণই লোকে প্রশংসনীয় বলিয়া মনে করে।

কিন্তু আমি বলি আপনার বিবেচনার উপরেই নির্ভর করিবে। যদি তুমি জান যে

তোমার একটু বিবেচনা শক্তি আছে তবে অন্যের পরামর্শ চাইবে না। তোমার কাছে কোন বিষয় অজ্ঞাত থাকিলে অবশ্য অন্যের নিকট তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার। কেন না, কোন বিষয়ে তোমা অপেক্ষা আর এক জনের বেশি জানা থাকিতে পারে। তাই বলিয়া যার তার নিকটে পরামর্শ চাইতে পারো না। পরামর্শ চাহিবার অর্থই এই, যে তুমি তোমার নিজের বিবেচনা শক্তির উপর নির্ভর করিতে পার না। যদি কোন বিশেষ কার্য্য সাধনে তোমার নিজের বিবেচনা শক্তির অভাব অনুভব কর, তাহা হইলে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবারই প্রয়োজন নাই।

ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিক।—ধার্ম্মিক ও অধার্ম্মিকের মধ্যে অনেক প্রভেদ। একজন ভবিষ্যতের জন্য বর্ত্তমানকে বিসর্জ্জন করেন,—আর একজন বর্ত্তমানের জন্য ভবিষ্যৎকে বিসর্জ্জন করেন।

প্রেম।—অধিক বয়সে হাম্ রোগ যেরূপ সাঙ্ঘাতিক, প্রেম-রোগও সেইরূপ।

রাজ্যশাসনের নিগূঢ়তথ্য।—রাজনৈতিক সততা বলিয়া কোন পদার্থ মূলেই নাই। একজন রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি নিজে কি বিশ্বাস করেন তাহা লইয়া কিছুই আইসে যায় না। তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য এই যে তিনি অন্যকে কি পরিমাণে বিশ্বাস করাইতে পারেন। ইহাই রাজকীয় ব্যাপারের গূঢ় মর্ম্ম।

কবিতা-প্রবণ প্রকৃতি।—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে কবিতাপ্রবণ-প্রকৃতিতে কি একটী উপাদান আছে যাহা সুখের নিতান্ত বিরোধী। যাহার প্রকৃতি কবিতাপ্রবণ সে নিজেও সুখী হয় না—তাহার সম্পর্কীয় লোকদিগকেও সুখী হইতে দেয় না।

প্রতিভা ও জন-সমাজ।—জনসমাজ ও প্রতিভা এই দুইটী পরস্পর বিরোধী পদার্থ। প্রতিভা, জনসমাজের সহিত অধিক কিম্বা ঘনিস্ট সংস্রবে আসিলে প্রায়ই অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু রসিকতা ও কার্য্যপটুতা সম্বন্ধে সেরূপ নহে। এই দুইটী গুণ জনসমাজের ঘর্ষণেই উত্তেজিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

বাল্যসখী।

এই তো সুরম্য নন্দন কাননে,
কত যে করেছি খেলা,
দেখিতে দেখিতে, জানিনে কেমনে,
কাটিয়া যাইত বেলা।

তরু মূলে মূলে, ফুল তুলে তুলে,
কহেছি লুকানো কথা,
সুখেতে হেসেছি, কেঁদেছিও সুখে
দুজনে পেয়েছি ব্যথা।

উড়াইয়া অলি, তুলি বেল-কলি,
তুলিয়ে কত কি ফুল,
কুসুমের সাজে, সাজাইতে তোরে,
গেঁথেছি মালিকা দুল।

আহালো কতই, হরষিত হৃদে,
কতই আমোদে মেতে,
লতিকার বিয়ে, দিয়েছি যতনে,
অশোক তমাল সাথে।

সরসীর কূলে, বসে দুজনায়,
গাঁথিতে গাঁথিতে মালা,
পাপড়ি ভাসায়ে, দেখিতাম সুখে
কেমন করিত খেলা।

মলয় সমীর, ফুল ছুঁয়ে তোর,
দোলাত কানের ফুল,
মৃদুল মৃদুল, ওমুখ চুমিয়া
দুলিত অলক চুল।

মরি কি মধুর, সাজিত তখন,
কমল বদন খানি,
উজলিয়া রূপে, কুসুম কানন,
শোভিতিস্ বন-রাণী।

আবার যখন, সাঁজের গগণে
পরিয়া তারকা মালা,
দেখা দিত বিধু, ছড়াইত মধু,
জোছনায় করি আলা।

মনে আছে সখি! চাঁদিমা হইতে
ও মুখ লাগিত ভাল,
বলিতাম মরি এ রূপের কাছে,
জোছনা ও যেন কাল।

ও কেমন কথা, বলিয়া সোহাগে,
হাসিতে সরম হাসি,
অমনি লাজের রকতিম মুখে,
চুমিতাম রাশি রাশি।

কোকিল, পাপিয়া, পিউ পিউ কুহু
ডাকিয়া মোহিত প্রাণ,
সেই মধু স্বরে, মিলাইয়া বীণা
দুজনে গেয়েছি গান।

আপনা ধ্বনিতে, মোহিত হইয়া,
আপনা হয়েছি হারা,
ভুলেছি জগতে, আছে আর কেহ
আমরা দুইটি ছাড়া।

হৃদয় দুইটি, একটি স্বরেতে,
বাঁধা গো আছিল হেন,
ছুঁইলে একটি হৃদয়ের তার,
দুইটি কাঁপিত যেন।

সারাদিন গেছে, বনেতে কাটিয়ে,
দুজনে বনের বালা—
জানিতাম না তো, সরলে আমরা,
কেমন বিষাদ জ্বালা।

সে সুখের দিন, কোথায় এখন,
সজনি লো বল দেখি,
হৃদয়ের ধন, তুই লো কোথায়
আমি বা কোথায় সখি।

একটি বোঁটায়, দুইটি কুসুম,
আছিল কেমন ফুটি,
কে ছিঁড়িল আহা, একটি গো তার
একটি হৃদয় টুটি,

সকলি ত হায়, তেমনি রয়েছে,
তেমনি ফুটিছে ফুল,
এ ফুলে ও ফুলে, মধু খেয়ে খেয়ে,
ছোটে ত মধুপকুল।

সেই তো বহিছে, তেমনি করিয়া,
সমীরণ মৃদু মৃদু,
সেই তো তারকা, উজলে বিমান,
অমৃত ঢালিছে বিধু।

পাপিয়া কোকিল, গাহিছে সেই তো,
কেন নাহি মোহে প্রাণ,
কেন আর সখি, নাহি মন উঠে,
গাইতে লো কোন গান!

সেই তো হোথায়, বীণা আছে পড়ে,
ছুঁইতে পারিনে আর,
কতদিন হতে, কি বলিব সখি,
নীরব আছে ও তার,

দুই দিনে বালা, সকলি ফুরাল,
ঘুচিল গো ছেলে বেলা,
ফুরাইল সুখ, ফুরাইল দুঃখ
ফুরালো সাধের খেলা।

বোম্বাই রায়ৎ।

বঙ্গদেশে ভূমি সম্পর্কীয় চিরস্থায়ী বন্দবস্ত বঙ্গসমাজের ইষ্টজনক কি অনিষ্টজনক এই বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই বাদানুবাদ শ্রবণ করা যায়। অধিকাংশ আঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ানের মত এই যে এ বন্দবস্ত ভাল হয় নাই। ইহাতে জমিদারদিগের ধনাগমের সুবিধা হইয়াছে বটে কিন্তু প্রজাদিগের অকল্যাণ। ইহা যে কেবল বঙ্গদেশের প্রজাগণের দুরবস্থার মূলকারণ তাহা নহে কিন্তু ইহাতে সমুদয় ভারতবর্ষের ক্ষতি। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের স্পৃহনীয় রাজস্ব জমিদারের ঘরে যাইতেছে এবং সে ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের উপর অযথোচিত করভার ন্যস্ত হইতেছে। তাহার দৃষ্টান্তে তাঁহারা বলেন যে দেখ বঙ্গদেশের আয়তন ও বসতি অনুসারে তাহা হইতে যে নির্দ্ধারিত রাজস্ব আদায় করা হয়, বোম্বাইয়ের আয়তন ও বসতির তুলনায় তাহা হইতে তদপেক্ষা অধিক টাকা নিষ্পীড়িত হইতেছে ও যত দিন এ বন্দবস্ত বিদ্যমান থাকিবে ততদিন এই রূপ চলিবে। এই সকল লোকের বাক্য কতদূর যুক্তিসিদ্ধ তাহা নির্ণয় করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে। ইহা নিশ্চয় যে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশে নিজ ভূস্বত্ব কতকটা শিথিল করিয়া এই ক্ষণে অনুতাপ করিতেছেন। অন্যান্য অনেক কৃতবিদ্য লোকের মত এই যে বঙ্গদেশের যাহা কিছু উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায় সে কেবল এই চিরস্থায়ী বন্দবস্তের প্রসাদে। বঙ্গদেশে জমিদার ও প্রজামধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অন্যান্য স্থলে গবর্ণমেণ্ট ও প্রজার মধ্যে সে সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। ধনী জমিদার রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ। অন্ন-চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া দেশের উন্নতি সাধনে তিনি সময় পান ও তাহার যোগ্য উপায় অবলম্বন করিতে পারেন। সে যাহা হউক এইক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে এই বন্দবস্তে যেমন জমিদারের লাভ সেই অনুসারে প্রজার কল্যাণ কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত নহি, কেন না বঙ্গদেশের প্রজাদের অবস্থা কিরূপ সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তবে এই মাত্র বলিতে পারি যে বোম্বাই প্রদেশে ভূমি সম্বন্ধে যে নিয়ম তাহাতে প্রজারা যে সুখে আছে তাহা বোধ হয় না। এখানকার অস্থায়ী বন্দবস্ত বশতঃ ও অন্যান্য কারণে প্রজাদের উপর লক্ষ্মী অপ্রসন্না সন্দেহ নাই ও অনেকের বিশ্বাস এই যে চিরস্থায়ী বন্দবস্ত তাহাদের দারিদ্র্য মোচনের এক প্রধান উপায়।

এ প্রদেশে প্রজাদের যে দুরবস্থা তাহা কাহারো অবিদিত নাই। তাহাদের অধিকাংশই আপাদ মস্তক ঋণগ্রস্ত—ও কোন বৎসর অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি কি অন্য কোন উৎপাত উপস্থিত হইলে তাহাদের দুর্দশার আর পরিসীমা থাকে না। এক বৎসর

শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিলে তাহাদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া যায়, এতটুকু সঙ্গতি নাই যে তাহার বলে তাহারা দৈবের ক্ষণ-স্থায়ী বিঘ্ন সকল অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে। এই দুর্ভিক্ষে তাহার পরিচয় বিলক্ষণ পাওয়া গিয়াছে। মহারাষ্ট্র দেশে মহাজনদের বিরুদ্ধে যে রায়তদের বিদ্রোহ সংঘটিত হয় তাহা বোধ করি পাঠকগণ শুনিয়া থাকিবেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে এই বিপ্লব উপস্থিত হয়। ঐ বৎসরে মে মাসের দ্বাদশ দিবসে পুণা জিলায় সুপা নামক গ্রামে ইহার প্রথম সূত্রপাত। সে দিন হাটের দিন, পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী হইতে অনেক লোকজনের সমাগম হইয়াছে, এমন সময় সহসা বনিক ও মাড়ওয়ারীর দোকানে লুটপাট আরম্ভ হইল। রায়তেরা ঐ সকল দোকানদারদের খাতাপত্র, কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী একত্রিত করিয়া জ্বালাইয়া দেয়। এই বিদ্রোহের সংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট-পদাতিক ও অশ্বারোহী পুলিস সিপাহি ও এক দল সৈন্য সমভিব্যাহারে সুপায় গিয়া উপস্থিত হন—এদিকে পুলিসের অধ্যক্ষ তাঁহার দলবল লইয়া উপস্থিত। তাঁহাদের যত্নে গ্রামের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রায় ৬।৭০০০ টাকার সামগ্রী উদ্ধার করা যায়—শতাধিক রায়ত গ্রেফ্‌তার হয় ও তাহাদের মধ্যে সাব্যস্ত অপরাধীগণ মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়। এই বিপ্লব সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া অন্যান্য গ্রামেও এই অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। এ সকলেরই লক্ষণ একই প্রকার, রায়তেরা মহাজনদের নিকট হইতে তাহাদের খৎ-পত্র কাড়িয়া লইয়া ভস্মসাৎ করে ও মহাজনেরা কাগজ পত্র বাহির করিতে বিলম্ব করিলে তাহাদের উপর নানাবিধ অত্যাচার করে। কাগজ পত্রই মহাজনদের প্রখর অস্ত্র, ইহার জ্বালায় অস্থির হইয়া প্রজারা ভাবিল—এই কাগজগুল জ্বালাইয়া দিতে পারিলেই আমরা পরিত্রাণ পাই। এই রূপে শত শত দলিল দস্তাবেজের ধ্বংশ—ও অনেকানেক মহাজনের নাক কান কর্ত্তন, দ্রব্যাদি লুণ্ঠন আরম্ভ হইল। পুণা হইতে অহমদনগরের স্থানে স্থানে এই উৎপাত প্রবেশ করে। পরিশেষে কর্ত্তৃপুরুষ ও পুলিষের যত্নে বিদ্রোহানল প্রশমিত হয়। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয় মহাজনদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল কিন্তু এক উপকার এই হয় যে তথাকার রায়তদের অবস্থার প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এই বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়েক জন প্রবীন ও বিচক্ষণ জুডিসিয়াল ও রেবেনিউ কর্ম্মচারীর এক কমিসন নিযুক্ত হয় ও কমিসনরগণ বিস্তর অনুসন্ধানের পর অনেক প্রমান সংগ্রহ করিয়া গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট প্রেরণ করেন। তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, রায়তদের দারিদ্র্য নিবন্ধন কষ্ট ও দুর্দ্দশার সীমা নাই। জুডিসিয়ল মেম্বরেরা বলেন—রায়তেরা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ভারে প্রপীড়িত, তাহার লাঘব করা কর্ত্তব্য—রেবেনিউ মেম্বরদের মতে আদালত ও মকদ্দমার হাঙ্গামেই রয়তের সর্ব্বনাশ—তৎসংক্রান্ত নিয়ম সং-

শোধন করা কর্ত্তব্য। এই সকল রিপোর্টের কি হইল এখন আর তাহার বিশেষ কিছু শুনা যায় না। রিপোর্টাবলীর চিরনিদ্রার স্থান —অকেজো কাগজের ঝুড়িতে তাঁহার গতি না হইলে রক্ষা। আশা হয় না, কমিসনরগণ রায়তের দুর্গতি নিবারণের যে সকল উপায় নিরূপন করিয়াছেন তাহা অচিরাৎ অবলম্বিত হইয়া তাহাদের যত্ন ও পরিশ্রম সার্থক হইবে। তালুকদার, জাইগীরদার প্রভৃতি বড় বড় জমিদারদের ঋণ মুক্তি লাভ উদ্দেশে ভূরি ভূরি আইন বর্ষিত হইতেছে কিন্তু গরীব রায়তের পক্ষে হইয়া কেহ কোন কথা কহিলে তাহাতে সহজে কর্ণপাত প্রত্যাশা করা যায় না।

বোম্বাই অঞ্চলে অধিকাংশ ভূমি সম্বন্ধে রয়তওয়ারী বন্দবস্ত দৃষ্ট হয়। এই বন্দবস্তের দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বোম্বাই প্রদেশের রেবেনিউ কার্য্যপ্রণালী কিরূপ তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত করা সঙ্গত বোধ হইতেছে।

নিম্নলিখিত কর্ম্মচারীদিগের হস্তে রেবেনিউ কার্য্য পরিচালনের ভার সমর্পিত।*

কর্ম্মচারী	মোট মাসিক বেতন সংখ্যা
৩ জন রেবিনিউ কমিসনর	১০০০০
১২ জন বরিষ্ঠ (সিনিয়র) কলেক্টর	২৭৯০০
৬ জন কনিষ্ঠ (জুনিয়র) কলেক্টর	১০৮০০
১৫ জন প্রথম সহকারী কলেক্টর	১৩৫০০
১৫ জন দ্বিতীয় সহকারী কলেক্টর	১০৫০০
৩৫ জন ডিপুটী কলেক্টর	১৪০০০

*Revenue Handbook Bombay

ইঁহারাই স্থায়ী কর্ম্মকর্ত্তা—এতদ্ব্যতীত কতক গুলি অতিরিক্ত সহকারী কলেক্টর আবশ্যকমতে স্থানে স্থানে নিযুক্ত হয়। ইঁহাদের সর্ব্বশুদ্ধ মাসিক বেতন সংখ্যা ১ জানুয়ারি ১৮৭৭ পর্য্যন্ত—২৩,৪১৪ টাকা।

সিন্ধুদেশ ও নিজ বোম্বাই সহরের স্বতন্ত্র বন্দবস্ত। তাহা ছাড়িয়া দিলে এই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ব্রিটিষ রাজ্য অষ্টাদশ কলেক্টরেটে বিভক্ত ও তাহা উল্লিখিত কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক প্রশাসিত। ইঁহাদের মোট বেতন সংখ্যা মাসিক এক কোটিরও অধিক টাকা।

প্রতি কলেক্টরেট কতকগুলি তালুকে বিভক্ত ও প্রত্যেক তালুকের প্রধান রেবেনিউ কর্ত্তৃপুরুষ এক এক জন মামলতদার, গ্রামস্থ অপরাপর রেবেনিউ কর্ম্মচারীগণ তাঁহার অধীন।

এত দিন পর্য্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে দুই জন রেবেনিউ কমিসনর নিযুক্ত ছিলেন।—সম্প্রতি মধ্য ভাগের জন্য এক জন তৃতীয় রেবেনিউ কমিসনর নিযুক্ত হইয়াছেন। রেবেনিউ কমিসনরগণ পুলিষেরও প্রধান অধ্যক্ষ। পূর্ব্বে তাঁহাদের নাম 'রেবেনিউ ও পুলিষ কমিসনর' ছিল। সম্প্রতি তাঁহাদের হস্তে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় সংস্থানের* রাজকার্য্য তত্ত্বাবধানের ভার ন্যস্ত হইয়া তাঁহাদের উপাধি 'কমিসনরে' পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কতকগুলি

* মহারাষ্ট্র দেশে Stateকে সংস্থান কহে।

'পোলিটিকল এজেণ্ট' যাঁহাদিগের সহিত পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পত্র লেখালেখি চলিত তাঁহাদিগকে এক হিসাবে কমিসনরদের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে—এই নিয়ম এক বৎসরের জন্য ধার্য্য হইয়াছে—এক বৎসর কাল কিরূপ চলে তাহা দেখিয়া পরে তাহার স্থায়িত্ব নির্নীত হইবে। কমিসনরদের হস্তে মাজিষ্ট্রেটের কোন অধিকার নাই।—রেবেনিউ সংক্রান্ত তত্ত্বাবধান তাঁহাদের প্রধান কার্য্য। শীত কালে তাঁহারা নিজ নিজ বিভাগ পরিদর্শনার্থে বাহির হইয়া কলেক্টরদের কাজকর্ম্ম হিসাবপত্র পর্য্যবেক্ষণ করেন। প্রত্যেক কমিসনরের অধীনস্থ কনিষ্ঠ কর্ম্মচারীদিগের উপর এক জন সহকারী কমিসনর প্রতিষ্ঠিত—তাঁহার পদটী ডেপুটী কলেক্টরের সঙ্গে সমান।

প্রত্যেক কলেক্টরেটে এক এক জন কলেক্টর বিরাজিত—তিনিই আবার জিলার মাজিষ্ট্রেট। জিলার মধ্যে তিনিই সর্ব্বেসর্ব্বা হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। কলেক্টর নাম তাঁহার কার্য্যের ঠিক উপযোগী নয়। এই নামে লোকে মনে করিতে পারে যে গবর্ণমেণ্টের কর আদায়ের জন্যই তিনি নিযুক্ত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ—জিলার মধ্যে এমন কোন কার্য্য নাই যাহা তাঁহার দৃষ্টিবহির্ভূত। বাণিজ্য ব্যবসার উন্নতি অবনতি—অর্থের হ্রাস বৃদ্ধি—ন্যায় ও শিক্ষাকার্য্যের শৃঙ্খলা—পথ ঘাট বাপী সেতু কোথায় কি আবশ্যক—নগরের শোভা সৌন্দর্য্যবর্দ্ধন—যে কোন কার্য্য তাঁহার অধীনস্থ প্রজাপুঞ্জের সুখসমৃদ্ধি সাধনের উপযোগী তাহার সহিত তাঁহার কোন না কোন রূপ সংশ্রব দেখা যায়। তাঁহার পক্ষে পরাধিকার চর্চ্চা বর্জ্জনীয় সত্য বটে কিন্তু তাঁহার নিজাধিকারবহির্ভূত কোন বিষয়ে বিশৃঙ্খলা দেখিলে বিবেচনা পূর্ব্বক হস্তক্ষেপ করা তাঁহার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হইতে পারে।

কলেক্টর এবং সহকারী কলেক্টরের পদে সিবিলিয়ন ভিন্ন কেহ আরূঢ় হইতে পারে না। সহকারী কলেক্টরের সংখ্যা অল্প কমাইয়া তাহাদের বেতন বৃদ্ধির সম্প্রতি এক প্রস্তাব হইয়াছে। কোন এক জন সিবিলিয়ন প্রথমে এদেশে পদার্পণ করিলে তিনি অতিরিক্ত সহকারীরূপে এক জন কলেক্টরের অধীনে নিযুক্ত হন। পরে প্রথম ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে তিনি দুই এক তালুকের স্বতন্ত্র অধিকার প্রাপ্ত হয়েন ও ক্রমে কার্য্যগতিকে তাঁহার পদের উন্নতি ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বেতন বৃদ্ধি হয়। গ্রামস্থ ও তালুকের কর্ম্মচারীদিগের তত্ত্বাবধান সহকারী কলেক্টরের প্রধান কার্য্য। তিনি কোন গ্রামে গিয়া তাম্বু করিলে প্রথমে পাটেল, কুলকর্ণী অথবা তলাটীদিগকে ডাকাইয়া তাহাদের সহিত কৃষিকার্য্য রাস্তা বিদ্যালয় ও অন্যান্য বিষয়ে কথোপকথন করিয়া গ্রামের কার্য্য বিবরণ অবগত হইবেন। পরে কোন এক দিবস স্থির করিয়া রায়তদের দাখিলা প্রভৃতি হিসাব পত্র অবলোকন করিবেন—তাহারা যে খাজানা দিয়াছে তাহা তাহাদের রসিদ পুস্তকে

বরাবর জমা হইয়াছে কিনা ও তাহাদের কাহার কি আবেদন কাহার কি অভাব এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিবেন। গ্রামের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি করিবেন —বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন, ক্ষেত্রের সীমা চিহ্ন সকল ঠিক আছে কি না বিশেষ করিয়া দেখিবেন। পথ ঘাট বাঁধ পুষ্করিণী ছায়াতরু সকলের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। গ্রাম পরিদর্শন কার্য্য সমাপ্ত হইলে তালুকের কাচারী, ত্রিজুরি—মামতলদারদিগের হিসাবপত্র পরীক্ষা করা ইত্যাদি অনেক কাজ সহকারী কলেক্টরের হস্তে। তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ও বিচক্ষণতার উপর তালুকের মঙ্গল অনেকটা নির্ভর করে।

ডেপুটী কলেক্টরগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত—সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ডেপুটীর বেতন মাসিক ৭০০ টাকা। তাঁহাদের কর্ম্ম বিভাগ অনুসারে—হজুর ডেপুটী ও জিলার ডেপুটী এই দুই নাম। ডিষ্ট্রিক্ট ডেপুটী ও সহকারী কলেক্টরের কার্য্য ও অধিকার প্রায় সমান। হজুর ডেপুটী জিলার প্রধান নগরীতে ত্রিজুরী সম্বন্ধীয় ও অপর কার্য্যে নিযুক্ত—তদ্ভিন্ন আর আর রেবেনিউ কর্ম্মচারীগণ বর্ষার চতুর্মাস ভিন্ন নিজ নিজ বিভাগ পরিদর্শনের জন্য তাম্বু করিয়া ভ্রমণে বাহির হয়েন।

তালুকের প্রধান রেবেনিউ কর্ম্মাধ্যক্ষের নাম মামলতদার। তাঁহার অধীনস্থ গ্রাম সমূহের কর্ম্মচারী মুখী পাটেল কুলকর্ণী তলাটি প্রভৃতি তাঁহার আজ্ঞাবহ। তালুকের ত্রিজুরী যাহাতে গ্রাম-সংগৃহীত গবর্ণমেণ্টের সমুদয় খাজানা জমা হয় ও যাহা হইতে তালুকের নির্দ্দিষ্ট সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়—তাহার তিনিই পরিরক্ষক। কলেক্টর যাহাকে যে কোন অনুজ্ঞা প্রেরণ করেন্ তাহা মামলতদারের হস্ত হইতেই প্রেরিত হয়। মামলতদারদের কার্য্যকুশলতা অনুসারে তাহাদের প্রথম দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের অধিকার। তদ্ব্যতীত পোলিষাধ্যক্ষ— এঞ্জিনিয়র — ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাষ্টর—রেজিস্ট্রার প্রভৃতি সকলেরই মামলতদারের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পত্রব্যবহার চলে। কোন ভ্রমণকারী যে কোন কারণেই হউক তাঁহার সীমার মধ্যে আগমন করিলে তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হয় তাহার জন্য মামলতদারের নিকটেই আবেদন করেন। ইহা হইতে মামলতদারের উপরে যে অগাধ কার্য্যভার নিপতিত তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারে। রেবেনিউ ও অপরাপর বিষয়ে মামলতদার যে কোন আদেশ প্রদান করেন তালুকের সহকারী কলেক্টরের নিকট সামান্যতঃ তাহার আপীল হইয়া থাকে। কেবল এক বিষয়ে কোন আপীল নাই। কোন ব্যক্তি কোন ভূমি, বাটী বৃক্ষ ফসল জলকর অথবা তাহার উপস্বত্ব হইতে অন্যায় পূর্ব্বক বেদখল হইলে অথবা ইজারার মেয়াদ অতীত হওয়াতে কি অন্য কোন কারণে ঐ সকল বস্তুর ন্যায্য অধিকার লাভে স্বত্ববান্ হইয়া তাহা হইতে বঞ্চিত হইলে সে প্রতিকার উদ্দেশে ছয় মাসের মধ্যে মামলতদারের নিকটে আবেদন করিতে পারে ও তাহা হইলে মামলতদার তাহাকে তাহার

অপহৃত বিষয় প্রত্যর্পণ অথবা তাহার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করিতে পারেন। অথবা এই সকল বিষয়ের অধিকার হইতে কেহ কাহাকেও বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিলে মামলতদার সেই আশঙ্কিত অত্যাচার নিবারণের জন্য আজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন। বোম্বাই আইন অনুসারে এই সকল মকদ্দমার উপর আপীল নাই। মামলতদার ব্রাহ্মণের গরুটির মত মহোপকারী ভৃত্য অথচ অল্পাহারে সন্তুষ্ট। তাঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রধান শ্রেণীস্থ মামলতদারের মাসিক ২৫০ টাকা বেতন মাত্র।

যে সকল কর্ম্মচারী গবর্ণমেণ্ট ও রায়তের মধ্যবর্ত্তী তাঁহাদের শৃঙ্খল সম্পূর্ণ বাঁধিতে গেলে গ্রামস্থ কর্ম্মচারীগণের উল্লেখ করিতে হয়। এই সকল কর্ম্মচারীর মধ্যে পটেল ও কুলকর্ণী প্রধান। গুজরাটে পটেলের নাম মুখী ও কুলকর্ণীর নাম তলাটি। আক্ষেপের বিষয় এই যে পল্লীগ্রামে পূর্ব্বে কাজ কর্ম্মের যে সুন্দর ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল ইংরাজদের আমলে তাহা ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইতেছে। মুখী অথবা পটেল গ্রামের মণ্ডল—রায়ত ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সকল কার্য্যস্থলে পটেল রায়তের মুখপাত্র স্বরূপ। পটেলের কার্য্য অনুসারে সে—হয় রেবেনিউ কিম্বা পুলিষ পটেল—এই দুই নাম ধারণ করে। রেবেনিউ পটেলের হস্তে গ্রামের রেবেনিউ সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য; পুলিষ পটেলের হস্তে পুলিষ সংক্রান্ত সমুদয় কার্য্য। কোন কোন স্থলে রেবেনিউ ও পুলিষ পটেলের কার্য্য একই জনের হস্তে সমর্পিত দেখা যায়। রায়তের নিকট হইতে সরকারী খাজানা আদায় করা ও সর্ব্বতোভাবে গ্রামের কৃষি ও আর আর বিষয়ের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখা পটেলের কার্য্য। অনেক স্থলে পটেলের কার্য্য বংশানুক্রমে পিতা হইতে পুত্রে অবতীর্ণ হয় ও কার্য্যকর্ত্তা চাকরা জমী বেতনের বিনিময়ে উপভোগ করে।

গ্রামের হিসাবপত্র রাখা কুলকর্ণীর কার্য্য। ইহার পদও অনেক স্থলে বংশপরম্পরাগত ও ভূমির উপস্বত্ব হইতে সে তাহার বেতন লাভ করে। পটেলের ন্যায় তাহার হস্তেও সরকারী খাজানা আদায়ের ভার। খাজানা আদায় হইলে তাহা সরকারী দফতরে প্রবিষ্ট করা ও রায়তকে তাহার দাখিলা লিখিয়া দেওয়া এই সকল লেখা পড়ার কর্ম্ম কুলকর্ণীর। সে সচরাচর ব্রাহ্মণজাতীয়—গ্রামের সরকারী খাজাঞ্চি। গ্রামে যে খাজানা জমা হয় তাহা মামলতদারের তহবিলে ও তথা হইতে হজুর ত্রিজরীতে প্রেরিত হয়।

এতদ্ভিন্ন আরো কতকগুলি কর্ম্মচারী আছে যাহাদের কতক গবর্ণমেণ্টের কাজে—কতক গ্রামবাসীদের কাজে নিযুক্ত যথা,—

মাহার—গ্রাম পরিরক্ষক—ফসল ও সীমাচিহ্ন রক্ষণাবেক্ষণ করা, সরকারী খাজানা তালুকের তহবিলে পৌঁছান—চিটিপত্র লইয়া যাওয়া—পথিকদিগের পথ প্রদর্শন করা ইত্যাদি তাহার কার্য্য। ছুতার—লৌহকার—স্বর্ণকার কুম্ভকার—গদ্দায় ধোবা নাপিত—দৈবজ্ঞ—গুরু ইত্যাদি লোকেরা

প্রচলিত প্রথা অনুসারে গ্রামবাসীদের কার্য্য করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ চাকরা জমী উপভোগ করে, কেহ বা অন্য প্রকারে রায়তদের নিকট হইতে কিছু কিছু করিয়া পায়।

এইত রেবেনিউ কার্য্যপ্রণালী ও কর্ম্মচারীদিগের বিষয় বলা হইল—এই ক্ষণে রায়তওয়ারী বন্দবস্ত বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে। এই বন্দবস্তের মূলসূত্র এই যে রাজার প্রজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ—তাহাদের মধ্যবর্ত্তী কোন ভূস্বামী নাই। গবর্ণমেণ্টই জমীদার ও গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি খাজানা আদায়ের ভার অর্পিত। পূর্ব্বে দেশীয় রাজার রাজত্ব কালে সামান্যতঃ এইরূপ বন্দবস্ত ছিল যে, জমিতে যে শস্য জন্মিত রাজা তাহার অমুক অংশ গ্রহণ করিতেন, এক্ষণে আর শস্যের ভাগ গৃহীত হয় না। তাহার পরিবর্ত্তে নির্দ্ধারিত খাজানা মুদ্রাকারে গ্রহণ করা হয়। এই রূপে সমুদয় রয়তওয়ারী ভূমির জরীপ হইয়া তাহার জমাবন্দি নিরূপিত হইয়াছে। ১৮৩৬—৩৭ শালে এই অঞ্চলে জরীপ কার্য্য আরম্ভ হয় ও তৎসংক্রান্ত নিয়মাবলি ১৮৬৫ শালের বোম্বায়ের ১ আইনে বিধিবদ্ধ হয়।

জরীপ বিভাগের কার্য্য দুই জন কমিসনর, কতকগুলি সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাহার অনেকানেক সহকারী ও কনিষ্ঠ কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হয়। জরিপ ও জমাবন্দি করিবার নিয়ম এই —

১ ভূপৃষ্ঠ পরিমাপ।

২ জমীর গুণাগুণ নির্ণয় করিয়া তাহা শ্রেণীবদ্ধ করা।

৩ জল বায়ু রাজার কৃষির অবস্থা অনুসারে এক এক তালুক কতকগুলি পল্লী শ্রেণীতে বিভাগ করা।

৪ প্রতি পল্লী শ্রেণীর জন্য এই রূপ নিয়মে কর নির্দ্ধারণ করা যে তাহা রায়তেরা সহজে দিতে পারিবে—অর্থাৎ যাহা দিয়া উদ্বৃত্ত মুনফায় তাহারা কৃষিকার্য্যের খরচ ও উন্নতি সাধনে সমর্থ হইতে পারে।

৫ প্রতি ক্ষেত্রের জমা নিরূপণ করা।

১ ভূমি পরিমাপ, এই কার্য্যের জন্য এক দল আমীন তালুকে প্রেরিত হয়—তাহারা এক এক গ্রামের আবাদ যোগ্য ও পতিত ভূমি কতকগুলি ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রের এক এক 'জরীপ নম্বর' স্থির করে। এক জোড়া বলদের সাহায্যে যত বিঘা জমী সহজে আবাদ করা যায় তাহা দেখিয়া ক্ষেত্রের আয়তন স্থির হয়। তত বিঘা হইতে তাহার দ্বিগুণ বিঘা পর্য্যন্ত এক এক ক্ষেত্রের আয়তন, তাহা অপেক্ষা নিতান্ত বড়ও নয় ছোটও নয়। আয়তন স্থির হইলে ক্ষেত্রের সীমা নিরূপিত ও সীমাচিহ্ন স্থাপন ও রক্ষণের বিহিত উপায় অবলম্বিত হয়।

২ ক্ষেত্রের গুণাগুণ নির্ণয়।

ইহার জন্য পরে আর এক দল আমীন আসিয়া উপস্থিত হয়। যে সকল কারণে জমী মূল্যবান হয়—যেমন তাহার জলবত্তা

—জল সেকের সুবিধা, বাজারের সন্নিধি ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন্ ক্ষেত্র কোন্ শ্রেণীতে গণ্য তাহারা তাহা নির্ণয় করে। ইহার অনেক নিয়ম আছে, প্রস্তাব বাহুল্য-ভয়ে তৎপ্রদর্শনে ক্ষান্ত হইলাম।

৩—৪ পল্লী শ্রেণীতে তালুকের বিভাগ —ও প্রত্যেক শ্রেণীর দর নিরূপণ।

ইহা খাজানার হারের সমীকরণের জন্য। ক্ষেত্রের জরীপ নকসা ও শ্রেণী বিভাগ হইয়া গেলে গ্রাম শ্রেণীতে তালুকের বিভাগ করা হয় ও প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তাহার উর্দ্ধ সংখ্যক হার নিরূপিত হয়। এই হার জরীপ সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট কমিসনরের মত লইয়া বন্ধন করেন ও গবর্ণমেণ্টের সম্মতি হইলে তাহা ধার্য্য হয়।

৫ প্রতি ক্ষেত্রের জমা নিরূপণ—

তৎপরে প্রত্যেক ক্ষেত্রের শ্রেণী অনুসারে তাহার জমাবন্দির হার নির্দ্ধারিত হয়। উত্তর পশ্চিম ও অন্যান্য প্রদেশে গ্রামের জন্য সদর খাজনা ধার্য্য হয় ও প্রত্যেকের জমির জন্য কত করিয়া খাজানা দিতে হইবে তাহা গ্রামবাসীগণ আপনাদের মধ্যে স্থির করে কিন্তু বোম্বায়ে সেরূপ নয়। —এখানে আমীনেরা প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য খাজানার দেয় অংশ স্থির করিয়া দেন। ক্ষেত্রের জমাবন্দি স্থির হইলে গ্রামস্থ রায়েত দিগকে আহ্বান করিয়া প্রতি জনের জমির জন্য যাহা দেয় তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া—তাহাদের কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহার নিষ্পত্তি করা—অনধিকৃত জমীর উপর প্রজাপত্তন—রেবেনিউ আমীন দিগের এই শেষ কার্য্য। এই সকল শেষ হইলে কাগজপত্র কলেক্টরের নিকট প্রেরিত হয় ও আমীনগণ দল বল লইয়া অন্যত্রে প্রস্থান করেন। এই যে জমাবন্দী সম্বন্ধীয় বন্দবস্ত ইহাকেই রায়তওয়ারী বন্দবস্ত কহে—সামান্যতঃ ইহা ত্রিংশৎ বৎসর-ব্যাপী।

এই রূপে যে খাজানা নির্দ্দিষ্ট হয় রায়ত তাহা যত দিন দিতে পারিবে ততদিন জমির উপর তাহার সম্পূর্ণ স্বত্ব—সে স্বত্ব হইতে কেহই তাহাকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। তাহার সে স্বত্ব বিক্রী কিম্বা বন্ধক দ্বারা হস্তান্তর করা তাহার সম্যক্ ইচ্ছাধীন—যে তাহা গ্রহণ করিবে সেই গবর্ণমেণ্টের নিয়মিত খাজানার জন্য দায়ী। জমাবন্দি সম্বন্ধীয় বন্দবস্ত সাধারণতঃ ত্রিংশৎ বৎসর ব্যাপী—তাহার মধ্যে জমার হ্রাস বৃদ্ধি হইবার নহে। সেই কাল অতীত হইলে রায়তের অযত্নসম্ভূত কারণে জমি ও ফসলের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নূতন বন্দবস্তে গবর্ণমেণ্টের খাজানা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। সেই খাজানা দিতে পারিলে রায়তের স্বত্ব বংশ পরম্পরা চালিত হইবার কোন বাধা নাই।

ক্রমশঃ

শ্রী স—

কবিকাহিনী।

চতুর্থ সর্গ।

"এ তবে স্বপন শুধু? বিম্বের মতন
আবার মিলায়ে গেল নিদ্রার সমুদ্রে!
সারারাত নিদ্রার করিনু আরাধনা,
যদি বা আইল নিদ্রা এ শ্রান্ত নয়নে,
মরীচিকা দেখাইয়া গেল গো মিলায়ে!
হা স্বপ্ন, কি শক্তি তোর, এহেন মুরতি
মুহূর্ত্তের মধ্যে তুই ভাঙ্গিলি, গড়িলি?
হা নিষ্ঠুর কাল, তোর এ কিরূপ খেলা,
সত্যের মতন তুই গড়িলি প্রতিমা,
স্বপ্নের মতন তাহা ফেলিলি ভাঙ্গিয়া?
কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল, আবার গেল মিলায়ে তাহাতে?
না না, তাহা নয় কভু, নলিনী, সেকিগো
কালের সমুদ্রে শুধু বিম্বটির মত!
যাহার মোহিনী মূর্ত্তি হৃদয়ে হৃদয়ে
শিরায় শিরায় আঁকা শোণিতের সাথে,
যত কাল রব বেঁচে যার ভাল বাসা
চিরকাল এহৃদয়ে রহিবে অক্ষয়,
সে বালিকা, সে নলিনী, সে স্বর্গ-প্রতিমা,
কালের সমুদ্রে শুধু বিম্বটির মত
তরঙ্গের অভিঘাতে জন্মিল মিশিল?
না না, তাহা নয় কভু, তা যেন না হয়।
দেহ-কারাগার মুক্ত সে নলিনী এবে
সুখে দুখে চিরকাল সম্পদে বিপদে,
আমারিই সাথে সাথে করিছে ভ্রমণ।
চির হাস্যময় তার প্রেম দৃষ্টি মেলি,
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
রক্ষক দেবতা সম আমারি উপরে
প্রশান্ত প্রেমের ছায়া রেখেছে বিছায়ে।
দেহ-কারাগার মুক্ত হইলে আমিও
তাহার হৃদয় সাথে মিশাব হৃদয়।
নলিনি, আছ কি তুমি, আছকি হেথায়?
এক বার দেখা দেও, মিটাও সন্দেহ!
চিরকাল তরে তোরে ভুলিতে কি হবে?
তাই বল্ নলিনীলো, বল্ একবার!
চিরকাল আর তোরে পাব না দেখিতে,
চির কাল আর তোর হৃদয়ে হৃদয়
পাব না কি মিশাইতে, বল্ একবার!
মরিলে কি পৃথিবীর সব যায় দূরে?
তুই কি আমারে ভুলে গেছিস্ নলিনি?
তাহোলে নলিনি, আমি চাইনা মরিতে।
তোর ভাল বাসা যেন চিরকাল মোর
হৃদয়ে অক্ষয় হোয়ে থাকে গো মুদ্রিত
কষ্ট পাই পাব, তবু চাইনা ভুলিতে!
তুমি নাহি থাক যদি তোমার স্মৃতিও
থাকে যেন এ হৃদয় করিয়া উজ্জ্বল!
এই ভাল বাসা, যাহা হৃদয়ে মরমে
অবশিষ্ট রাখে নাই এক তিল স্থান,
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসের সাথে
মুহূর্ত্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন?
যত কাল বেঁচে রব, রবে যা' হৃদয়ে
মুহূর্ত্তে না পালটিতে আঁখির পলক
ক্ষণ-স্থায়ী কুসুমের সুরভের মত
শূন্য এই বায়ুস্রোতে যাইবে মিশায়ে?

হিমাদ্রির এই স্তব্ধ আঁধার গহ্বরে
সময়ের পদক্ষেপ গণিতেছি বসি,
ভবিষ্যৎ ক্রমে হইতেছে বর্ত্তমান,
বর্ত্তমান মিশিতেছে অতীত সমুদ্রে।
অস্ত যাইতেছে নিশি, আসিছে দিবস,
দিবস নিশার কোলে পড়িছে ঘুমায়ে।
এই সময়ের চক্র ঘুরিয়া নীরবে
পৃথিবীরে, মানুষেরে অলক্ষিত ভাবে
পরিবর্ত্তনের পথে যেতেছে লইয়া,
কিন্তু মনে হয় এই হিমাদ্রির বুকে
তাহার চরণ-চিহ্ন পড়িছে না যেন।
কিন্তু মনে হয় যেন আমার হৃদয়ে
দুর্দ্দান্ত সময়-স্রোত অবিরাম গতি,
নূতন গড়েনি কিছু, ভাঙ্গেনি পুরাণো।
বাহিরের কত কি যে ভাঙ্গিল চূরিল,
বাহিরের কত কি যে হইল নূতন,
কিন্তু ভিতরের দিকে চেয়ে দেখ দেখি,
আগেও আছিল যাহা এখনো তা' আছে,
বোধ হয় চিরকাল থাকিবে তাহাই!
বরষে বরষে দেহ যেতেছে ভাঙ্গিয়া
কিন্তু মন আছে তবু তেমনি অটল।
নলিনী নাইক বটে পৃথিবীতে আর,
নলিনীরে ভাল বাসি তবুও তেমনি।
যখন নলিনী ছিল, তখন যেমন
তার হৃদয়ের মূর্ত্তি ছিল এ হৃদয়ে
এখনো তেমনি তাহা রয়েছে স্থাপিত।
এমন অন্তরে তারে রেখেছি লুকায়ে,
মরমের মর্ম্মস্থলে করিতেছি পূজা,
সময় পারে না সেথা কঠিন আঘাতে
ভাঙ্গিবারে এজনমে সে মোর প্রতিমা,
হৃদয়ের আদরের লুকানো সে ধন!

ভেবেছিনু এক বার এই যে বিষাদ
নিদারুণ তীব্র-স্রোতে বহিছে হৃদয়ে,
এ বুঝি হৃদয় মোর ভাঙ্গিবে চূরিবে,
পারেনি ভাঙ্গিতে কিন্তু একতিল তাহা,
যেমন আছিল মন তেমনি রয়েছে!
বিষাদ যুঝিয়াছিল প্রাণপণে বটে,
কিন্তু এ হৃদয়ে মোর কি যে আছে বল,
এ দারুণ সমরে সে হইয়াছে জয়ী।
গাওগো বিহগ তব প্রমোদের গান
তেমনি হৃদয়ে তার হবে প্রতিধ্বনি!
প্রকৃতি! মাতার মত সুপ্রসন্ন দৃষ্টি
যেমন দেখিয়াছিনু ছেলে বেলা আমি,
এখনো তেমনি যেন পেতেছি দেখিতে।
যা কিছু সুন্দর, দেবি, তাহাই মঙ্গল,
তোমার সুন্দর রাজ্যে হে প্রকৃতি দেবি,
তিল অমঙ্গল কভু পারে না ঘটিতে।
অমন সুন্দর আহা নলিনীর মন,
জীবন্ত সৌন্দর্য্য, দেবি, তোমার এরাজ্যে
অনন্ত কালের তরে হবে না বিলীন।
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবে তা' দেবি,
এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
তোমার আশ্বাস বাক্যে হে প্রকৃতি দেবি,
সংশয় কখন আমি করি না স্বপনে!
বাজাও রাখাল তব সরল বাঁশরী!
গাওগো মনের সাধে প্রমোদের গান!
পাখীরা মেলিয়া যবে গাইতেছে গীত,
কানন ঘেরিয়া যবে বহিতেছে বায়ু,
উপত্যকাময় যবে ফুটিয়াছে ফুল,
তখন তোদের আর কিসের ভাবনা?
দেখি চির হাস্য ময় প্রকৃতির মুখ,
দিবা নিশি হাসিবারে শিখেছিস্ তোরা,

সমস্ত প্রকৃতি যবে থাকে গো হাসিতে,
সমস্ত জগৎ যবে গাহেগো সঙ্গীত,
তখন ত তোরা নিজ বিজন কুটীরে,
ক্ষুদ্রতম আপনার মনের বিষাদে
সমস্ত জগৎ ভুলি কাঁদিস্ না বসি!
জগতের, প্রকৃতির ফুল্ল মুখ হেরি,
আপনার ক্ষুদ্র দুঃখ রহে কিগো আর?
ধীরে ধীরে দূর হোতে আসিছে কেমন
বসন্তের সুরভিত বাতাসের সাথে
মিশিয়া মিশিয়া এই সরল রাগিণী।
একেক রাগিণী আছে করিলে শ্রবণ,
মনে হয় আমারি তা' প্রাণের রাগিণী;
সেই রাগিণীর মত আমার এ প্রাণ,
আমার প্রাণের মত যেন সে রাগিণী!
কখনো বা মনে হয় পুরাতন কাল
এই রাগিণীর মত আছিল মধুর,
এমনি স্বপন ময় এমনি অস্ফুট;
তাই শুনি ধীরি ধীরি পুরাতন স্মৃতি
প্রাণের ভিতরে যেন উথলিয়া উঠে!"
ক্রমে কবি যৌবনের ছাড়াইয়া সীমা,
গম্ভীর বার্দ্ধক্যে আসি হোল উপনীত!
সুগম্ভীর বৃদ্ধ কবি, স্কন্ধে আসি তার
পড়েছে ধবল জটা অযত্নে লুটায়ে!
মনে হোত দেখিলে সে গম্ভীর মুখশ্রী,
হিমাদ্রি হোতেও বুঝি সমুচ্চ মহান্!
নেত্র তাঁর বিকীরিত' কি স্বর্গীয় জ্যোতি,
যেন তাঁর নয়নের শান্ত সে কিরণ
সমস্ত পৃথিবীময় শান্তি বরষিবে।
বিস্তীর্ণ হইয়া গেল কবির সে দৃষ্টি,
দৃষ্টির সম্মুখে তার, দিগন্তও যেন,
খুলিয়া দিতগো নিজ অভেদ্য দুয়ার।

যেন কোন দেববালা কবিরে লইয়া
অনন্ত নক্ষত্রলোকে কোরেছে স্থাপিত,
সামান্য মানুষ যেথা করিলে গমন,
কহিত কাতর স্বরে ঢাকিয়া নয়ন,
"একিরে অনন্ত কাণ্ড, পারি না সহিতে!"
সন্ধ্যার আঁধারে হোথা বসিয়া বসিয়া,
কি গান গাইছে কবি, শুন কলপনা।
"কি সুন্দর সাজিয়াছে ওগো হিমালয়,
তোমার বিশালতম শিখরের শিরে
একটি সন্ধ্যার তারা! সুনীল গগন
ভেদিয়া, তুষারশুভ্র মস্তক্ তোমার!
সরল-পাদপরাজি আঁধার করিয়া
উঠেছে তাহার পরে; সে ঘোর অরণ্য
ঘেরিয়া হুহুহু করি তীব্র শীত বায়ু
দিবানিশি ফেলিতেছে বিষণ্ণ নিশ্বাস!
শিখরে শিখরে ক্রমে নিভিয়া আসিল
অস্তমান তপনের আরক্ত কিরণে
প্রদীপ্ত জলদ চূর্ণ। শিখরে শিখরে
মলিন হইয়া এল উজ্জ্বল তুষার,
শিখরে শিখরে ক্রমে নামিয়া আসিল
আঁধারের যবনিকা ধীরে ধীরে ধীরে!
পর্ব্বতের বনে বনে গাঢ়তর হোল
ঘুমময় অন্ধকার। গভীর নীরব!
সাড়াশব্দ নাই মুখে অতি ধীরে ধীরে
অতি ভয়ে ভয়ে যেন চলেছে তটিনী
সুগম্ভীর পর্ব্বতের পদতল দিয়া!
কি মহান্! কি প্রশান্ত! কি গম্ভীর ভাব!
ধরার সকল হোতে উপরে উঠিয়া
স্বর্গের সীমায় রাখি ধবল জটায়
জড়িত মস্তক তব, ওগো হিমালয়,
নীরব ভাষায় তুমি কি যেন একটি

গম্ভীর আদেশ ধীরে করিছ প্রচার!
সমস্ত পৃথিবী তাই নীরব হইয়া
শুনিছে অনন্য মনে সভয়ে বিস্ময়ে।
আমিও একাকী হেথা রয়েছি পড়িয়া,
আঁধার মহা-সমুদ্রে গিয়াছি মিশায়ে,
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র নর আমি, শৈলরাজ!
অকূল সমুদ্রে ক্ষুদ্র তৃণটির মত
হারাইয়া দিগ্বিদিক্, হারাইয়া পথ,
সভয়ে বিস্ময়ে হোয়ে হত জ্ঞান প্রায়
তোমার চরণতলে রয়েছি পড়িয়া।
উর্দ্ধমুখে চেয়ে দেখি ভেদিয়া আঁধার
শূন্যে শূন্যে শত শত উজ্জ্বল তারকা,
অনিমিষ নেত্র গুলি মেলিয়া যেন রে
আমারি মুখের পানে রয়েছে চাহিয়া।
ওগো হিমালয়, তুমি কি গম্ভীর ভাবে
দাঁড়ায়ে রয়েছ হেথা অচল অটল,
দেখিছ কালের লীলা, করিছ গণনা,
কালচক্র কত বার আইল ফিরিয়া!
সিন্ধুর বেলায় চক্ষে গড়ায় যেমন
অযুত তরঙ্গ, কিছু লক্ষ্য না করিয়া,
কত কাল আইল রে, গেল কত কাল
হিমাদ্রি, তোমার ওই চক্ষের উপরি।
মাথার উপর দিয়া কত দিবাকর
উলটি কালের পৃষ্ঠা গিয়াছে চলিয়া।
গম্ভীর আঁধারে ঢাকি তোমার ওদেহ
কত রাত্রি আসিয়াছে গিয়াছে পোহায়ে।
কিন্তু বল দেখি ওগো হিমালয় গিরি,
মানুষ সৃষ্টির অতি আরম্ভ হইতে
কি দেখিছ এই খানে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে?
যা' দেখিছ যা' দেখেছ, তাতে কি এখনো
সর্ব্বাঙ্গ তোমার গিরি, উঠেনি শিহরি?

কি দারুণ অশান্তি এ মনুষ্য জগতে,
রক্তপাত, অত্যাচার, পাপ কোলাহল
দিতেছে মানব মনে বিষ মিশাইয়া!
কত কোটি কোটি লোক, অন্ধকারাগারে
অধীনতা শৃঙ্খলেতে আবদ্ধ হইয়া
ভরিছে স্বর্গের কর্ণ কাতর ক্রন্দনে,
অবশেষে মন এত হোয়েছে নিস্তেজ,
কলঙ্ক-শৃঙ্খল তার অলঙ্কার রূপে
আলিঙ্গন ক'রে তারে রেখেছে গলায়!
দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার কোরে
মাথায় বহন করে পর প্রত্যাশিরা!
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তি ভরে করে গো চুম্বন!
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন, সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু!
সবল, সে দুর্ব্বলেরে পীড়িতে কেবল,
দুর্ব্বল, বলের পদে, আত্ম বিসর্জ্জিতে!
স্বাধীনতা কারে বলে জানে যেই জন
কোথায়-সে অসহায় অধীন জনের
কঠিন শৃঙ্খল রাশি দিবেগো ভাঙ্গিয়া,
না, তার স্বাধীন হস্ত হোয়েছে কেবল
অধীনের লৌহপাশ দৃঢ় করিবারে।
সবল দুর্ব্বলে কোথা সাহায্য করিবে,
দুর্ব্বলে অধিকতর করিতে দুর্ব্বল,
বল তার, হিমগিরি, দেখিছ কি তাহা?
সামান্য নিজের স্বার্থ করিতে সাধন
কত দেশ করিতেছে শ্মশান অরণ্য,
কোটি কোটি মানবের শান্তি স্বাধীনতা,
রক্তময় পদাঘাতে দিতেছে ভাঙ্গিয়া,

তবুও মানুষ বলি গর্ব্ব করে তারা,
তবু তারা সভ্য বলি করে অহঙ্কার !
কত রক্ত মাখা ছুরি হাসিছে হরষে,
কত জিহ্বা হৃদয়েরে ছিঁড়িছে বিঁধিছে !
বিষাদের অশ্রুপূর্ণ নয়ন হে গিরি,
অভিশাপ দেয় সদা পরের হরষে,
উপেক্ষা ঘৃণায় মাথা কুঞ্চিত অধর
পর অশ্রু জলে ঢালে হাসি মাখা বিষ !
পৃথিবী জানে না গিরি, হেরিয়া পরের জ্বালা,
হেরিয়া পরের মর্ম্ম-দুখের উচ্ছ্বাস,
পরের নয়ন জলে, মিশাতে নয়ন জল
পরের দুখের শ্বাসে মিশাতে নিশ্বাস !
প্রেম ? প্রেম কোথা হেথা এ অশান্তি ধামে
প্রণয়ের ছদ্মবেশ পরিয়া যেথায়
বিচরে ইন্দ্রিয়সেবা, প্রেম সেথা আছে ?
প্রেমে পাপ বলে যারা, প্রেম তারা চিনে ?
মানুষে মানুষে যেথা আকাশ পাতাল,
হৃদয়ে হৃদয়ে যেথা আত্ম অভিমান,
যে ধরায় মন দিয়া ভাল বাসে যারা
উপেক্ষা বিদ্বেষ ঘৃণা মিথ্যা অপবাদে
তারাই অধিক সহে বিষাদ যন্ত্রণা;
সেথা যদি প্রেম থাকে তবে কোথা নাই,
তবে প্রেম কলুষিত নরকেও আছে !
কেহবা রতনময় কনক ভবনে
ঘুমায়ে রয়েছে সুখে বিলাসের কোলে,
অথচ সুমুখ দিয়া দীন নিরালয়
পথে পথে করিতেছে ভিক্ষান্ন-সন্ধান !
সহস্র পীড়িতদের অভিশাপ লোয়ে
সহস্রের রক্তধারে ক্ষালিত আসনে
সমস্ত পৃথিবী রাজা করিছে শাসন,
বাঁধিয়া গলায় সেই শাসনের রজ্জু,
সমস্ত পৃথিবী তার রহিয়াছে দাস !
সহস্র পীড়ন সহি আনত মাথায়
একের দাসত্বে রত অযুত মানব !
ভাবিয়া দেখিলে মন উঠে গো শিহরি
ভ্রমান্ধ দাসের জাতি সমস্ত মানুষ !
এ অশান্তি কবে দেব, হবে দূরীভূত !
অত্যাচার গুরু ভারে হোয়ে নিপীড়িত,
সমস্ত পৃথিবী দেব, করিছে ক্রন্দন !
সুখ শান্তি সেথা হোতে লয়েছে বিদায় !
কবে দেব এ রজনী হবে অবসান ?
স্নান করি প্রভাতের শিশির সলিলে,
তরুণ রবির করে হাসিবে পৃথিবী !
অযুত মানবগণ এক কণ্ঠে দেব,
এক গান গাইবেক স্বর্গ পূর্ণ করি !
নাইক দরিদ্র, ধনী, অধিপতি, প্রজা,
কেহ কারো কুটীরেতে করিলে গমন
মর্য্যাদার অপমান করিবে না মনে,
সকলেই সকলের করিতেছে সেবা,
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস !
নাই ভিন্ন জাতি আর নাই ভিন্ন ভাষা
নাই ভিন্ন দেশ, ভিন্ন আচার ব্যাভার !
সকলেই আপনার আপনার লোয়ে
পরিশ্রম করিতেছে প্রফুল্ল অন্তরে।
কেহ কারো সুখে নাহি দেয় গো কণ্টক,
কেহ কারো দুখে নাহি করে উপহাস !
দ্বেষ নিন্দা ক্রূরতার জঘন্য আসন
ধর্ম্ম-আবরণে নাহি করে গো সজ্জিত !
হিমাদ্রি, মানুষ সৃষ্টি আরম্ভ হইতে
অতীতের ইতিহাস পড়েছ সকলি,
অতীতের দীপ শিখা যদি হিমালয়
ভবিষ্যৎ অন্ধকার পারে গো ভেদিতে,

তবে বল কবে গিরি, হবে সেই দিন
যেদিন স্বর্গই হবে পৃথ্বীর আদর্শ!
সে দিন আসিবে গিরি, এখনিই যেন
দূর ভবিষ্যৎ সেই পেতেছি দেখিতে
যেই দিন এক প্রেমে হইয়া নিবদ্ধ
মিলিবেক কোটি কোটি মানব হৃদয়!
প্রকৃতির সব কার্য্য অতি ধীরে ধীরে,
এক এক শতাব্দীর সোপানে সোপানে,
পৃথ্বী সে শান্তির পথে চলিতেছে ক্রমে,
পৃথিবীর সে অবস্থা আসেনি এখনো,
কিন্তু একদিন তাহা আসিবে নিশ্চয়।
আবার বলিগো আমি হে প্রকৃতি দেবি,
যে আশা দিয়াছ হৃদে ফলিবেক তাহা,
এক দিন মিলিবেক হৃদয়ে হৃদয়।
এযে সুখময় আশা দিয়াছ হৃদয়ে
ইহার সঙ্গীত দেবি, শুনিতে শুনিতে
পারিব হরষ চিতে ত্যজিতে জীবন!"
সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল
বৃদ্ধ সে কবির নেত্র করিল পূর্ণিত!
যথা সে হিমাদ্রি হোতে ঝরিয়া ঝরিয়া
কত নদী শত দেশ করয়ে উর্ব্বরা।
উচ্ছ্বসিত করি দিয়া কবির হৃদয়
অসীম করুণা সিন্ধু পোড়েছে ছড়ায়ে
সমস্ত পৃথিবীময়। মিলি তাঁর সাথে
জীবনের একমাত্র সঙ্গিনী ভারতী
কাঁদিলেন আর্দ্র হোয়ে পৃথিবীর দুখে,
ব্যাধ শরে নিপতিত পাখীর মরণে
বাল্মীকির সাথে যিনি করেন রোদন!
কবির প্রাচীন-নেত্রে পৃথিবীর শোভা
এখনও কিছুমাত্র হয়নি পুরাণো ?
এখনো সে হিমাদ্রির শিখরে শিখরে
একেলা আপন মনে করিত ভ্রমণ।
বিশাল ধবল জটা বিশাল ধবল শ্মশ্রু,
নেত্রের স্বর্গীয় জ্যোতি গম্ভীর মূরতি,
প্রশস্ত ললাট দেশ, প্রশান্ত আকৃতি তার
মনে হত হিমাদ্রির অধিষ্ঠাতৃ-দেব!
জীবনের দিন ক্রমে ফুরায় কবির!
সঙ্গীত যেমন ধীরে আইসে মিলায়ে,
কবিতা যেমন ধীরে আইসে ফুরায়ে,
প্রভাতের শুক তারা ধীরে ধীরে যথা
ক্রমশঃ মিশায়ে আসে রবির কিরণে,
তেমনি ফুরায়ে এল কবির জীবন।
প্রতিরাত্রে গিরিশিরে জোছনায় বসি,
আনন্দে গাইত কবি সুখের সঙ্গীত।
দেখিতে পেয়েছে যেন স্বর্গের কিরণ,
শুনিতে পেয়েছে যেন দূর স্বর্গ হোতে,
নলিনীর সুমধুর আহ্বানের গান।
প্রবাসী যেমন আহা দূর হোতে যদি
সহসা শুনিতে পায় স্বদেশ-সঙ্গীত,
ধায় হরষিত চিতে সেই দিক্ পানে,
এক দিন দুই দিন যেতেছে যেমন
চলেছে হরষে কবি, যেই দেশ হোতে
স্বদেশ সঙ্গীত ধ্বনি পেতেছে শুনিতে।
এক দিন হিমাদ্রির নিশীথ বায়ুতে
কবির অন্তিম শ্বাস গেল মিশাইয়া!
হিমাদ্রি হইল তার সমাধিমন্দির,
একটি মানুষ সেথা ফেলেনি নিশ্বাস!
প্রত্যহ প্রভাত শুধু শিশিরাশ্রু জলে
হরিত পল্লব তার করিত প্লাবিত।
শুধু সে বনের মাঝে বনের বাতাস.
হুহু করি মাঝে মাঝে ফেলিত নিশ্বাস!
সমাধি উপরে তার তরুলতা ফুল

প্রতি দিন বরষিত কত শত ফুল।
কাছে বসি বিহগেরা গাইত গো গান,
তটিনী তাহার সাথে মিশাইত তান।

সান্ত্বনা।

আমার সময়ে সময়ে কেমন মন খারাপ হইয়া যায়, হয় হউক্‌গে তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু অমনি লোকে সান্ত্বনা দিতে আইসে কেন? অমনি দশ জনে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি হইয়াছে, কেন হইয়াছে, করিয়া এমন বিরক্ত করিয়া তুলে যে, হাজার কষ্ট হইলেও কিছুই হয় নাই কিছুই হয় নাই করিয়া মুখে হাসি টানিয়া আনিতে হয়, সে হাসির চেয়ে আর কষ্টকর কিছু আছে? এ হাসি হাসার অপেক্ষা যদি সমস্ত দিন রাত্রি মুখ গম্ভীর করিয়া ভাবিতে পারিতাম তবে বাঁচিয়া যাইতাম। তাহারা কি এসকল বুঝে না? হয়ত বুঝে, কিন্তু মনে করে, পাছে আমি মনে করি যে, আমি এমন মুখ বিষণ্ণ করিয়া বসিয়া আছি, তথাপি আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিল না, কাজেই তাহাদের কর্ত্তব্য কাজ করিতে আসে। যেমন চিঠিতে মান্যবর, পরম পূজনীয়, প্রাণাধিক প্রভৃতি সম্বোধন পড়িবার সময় আমরা চোক্ বুলাইয়া যাই মাত্র, তখন মনে একতিলও বিশ্বাস হয় না যে, যিনি আমাকে লিখিতেছেন তিনি আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা মান্য করেন বা আমাকে পরম পূজা করিয়া থাকেন, বা আমি তাঁহার প্রাণেরো অধিক, অতীত কালের শিরোনামা-স্রষ্টারা উহা আমাদের বরাদ্দ করিয়া দিয়াছেন মাত্র, তেমনি উহারা আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করিতে আসে, তখন বেশ বুঝিতে পারি যে আমাকে মমতা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে না, জিজ্ঞাসা করিতে হয় বলিয়া করিতেছে, তাহাতে আমার যে কি সান্ত্বনা হয়, তাহা আমিই জানি। অধিকাংশ লোক সান্ত্বনা করিবার পদ্ধতি জানে না, তাহারা যে দুঃখে সান্ত্বনা দিতে আসে, সে দুঃখ তাহাদের সান্ত্বনা বাক্য অপেক্ষা অধিকতর মিস্ট বোধ হয়। সান্ত্বনা দিতে হইলে প্রায়ই লোকে কহিয়া থাকে, তোমার কিসের দুঃখ? আরোত কত লোক তোমার মত কষ্ট পাইতেছে। এমন কষ্টকর সান্ত্বনা আর নাই, প্রথমতঃ যে একথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে আইসে, স্পষ্টই বোধ হয় আমার দুঃখে তাহার কিছু মাত্র মমতা হয় নাই; কারণ সে আমার দুঃখকে এত তুচ্ছ বলিয়া জানে, যে, এত ক্ষুদ্র দুঃখে তাহার মমতাই জন্মিতে পারে না, দ্বিতীয়ত মনে হয় যে, আমার মনের দুঃখ সে বুঝিলই না, যে সকলের সঙ্গে আমার দুঃখের তুলনা করিয়া বেড়ায়, সে আমার দুঃখের মর্য্যাদাই বুঝে নাই, আমার যেটুকু দুঃখ হইয়াছে তাহাতেই তোমার মমতা জন্মায় ত জন্মাউক্, নহিলে আর কেহ এরূপ দুঃখ পায় কি না, আর কাহাকেও এত

কষ্ট পাইতে হয় কি না, এত শত ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার দুঃখের গুরুলঘুত্ব ওজন করিয়া তবে তুমি আমার সহিত একটুখানি মমতা করিতে আসিবে, আমার সে মমতায় কাজ নাই। যদিও মমতা উদয় হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ওই সকল ভাবনা হয়ত অলক্ষিত ভাবে হৃদয়ে কার্য্য করে; কিন্তু তাই বলিয়া মুখে ওই সকল কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলে তাহা কষ্টকর হইয়া পড়ে, আর কাহারো হয় কি না জানি না কিন্তু আমার হয়। আমি কাহাকেও সান্ত্বনা করিতে গেলে অমন করি না, আমি হয়ত বলি যে, আহা, বাস্তবিক তোমার বড় কষ্টের অবস্থা, সে মনে করে যে, আহা তবু আমার কষ্ট একজন বুঝিতে পারিল, সে তাহাতে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে ও তখন আমার কাছে কত কথাই বলিতে থাকে, এইরূপে তাহার হৃদয়ের ভার অনেকটা লঘু হইয়া যায়। এমন করিয়া সান্ত্বনা দেওয়া আবশ্যক যে, শোকগ্রস্ত ব্যক্তি না বুঝিতে পারে যে তাহাকে সান্ত্বনা দিতে আসা হইয়াছে। আমি যদি বুঝিতে পারি আমাকে কেহ সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছে, অমনি মনে হয়, ও ব্যক্তি আমার কষ্টে কষ্ট অনুভব করে নাই, ও ব্যক্তি মনে করে যে, আমার এ কষ্টে কষ্ট পাওয়া উচিত নহে, নহিলে সে আমার এ কষ্ট থামাইতে চেষ্টা করিবে কেন? যে ব্যক্তি মনে করে যে, যে কষ্টে আমি শোক করিতেছি সে কষ্ট শোকের উপযুক্ত নহে, সে ব্যক্তি আমার কষ্টে তেমন মমতা অনুভব করিতেছে না ইহা অনেকটা নিশ্চয়। সে হয়ত মনে করিতেছে যে এ কি ছেলে মানুষ! আমি হইলে ত এরূপ করিতাম না। মনে না করুক আমাকে সেইরূপ বিশ্বাস করাইতে চায়। অতটা আত্মাবমাননা স্বীকার করিয়া আমি মমতা প্রার্থনা করি না। একজন যে গম্ভীর ভাবে বসিয়া বসিয়া আমার অশ্রুজলের সমালোচনা করিতেছে ইহা জানিতে পারা অতিশয় কষ্টকর। কি! আমি যে কষ্টে কষ্ট পাইতেছি, তাহা কষ্ট পাইবার যোগ্যই নহে; আমার কষ্ট এতই সামান্য, আমি এতই দুর্ব্বল যে অত সামান্য কষ্টেই কষ্ট পাই? একথা মনে করিয়া কেহ কেহ হয়ত সান্ত্বনা পাইতেও পারে, আপনার প্রতি ধিক্কার দিতেও পারে ও ক্রমে দুঃখ ভুলিতেও পারে। কিন্তু আমার মত লোকও ত ঢের আছে, আমার সে সান্ত্বনাকারীর প্রতি রাগ হয়, মনে হয় কি, আমাকে এত ক্ষুদ্র ঠাহরাইতেছে? তুমি যদি আমার শোকের কারণ দেখিয়া কষ্ট পাইয়া থাক ত আইস, তোমাকে আমার মনের কথা বলি, তাহা হইলে আমার কষ্টের অনেকটা লাঘব হইবে, নহিলে তোমার যদি মনে হইয়া থাকে, দুর্ব্বল হৃদয়, অল্পেতেই কষ্ট পাইতেছে, উহাকে একটু থামাইয়া ঘুমাইয়া দিই, তবে তোমায় কাজ নাই, তোমার সান্ত্বনা দিতে হইবে না। আসল কথাটা এই যে, সান্ত্বনা অনেক সময় বড় বিরক্তিজনক, অনেক সময় মনে হয় যে, আমার নিজের দুঃখের ভাবনা ভাবিবার যেটুকু সময় পাইয়াছি, একজন

আসিয়া তাহা মিছামিছি নষ্ট করিয়া দিতেছ মাত্র; দুঃখ ভাবনা ভাবিবার সময় নষ্ট হইলে যে কষ্ট হয় না তাহা নহে, দুঃখের ভাবনা ভাবিবার সময় লোকে গোলমাল করিতে আইলে বড় কষ্ট হয়, এই জন্যই বজনে দুঃখের ভাবনা ভাবিতে ভাল লাগে। শোকার্ত্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহার দুঃখের কারণ কষ্টের হউক কিন্তু দুঃখের ভাবনা অনেকটা সুখের, যদি তুমি তাহার দুঃখের কারণ বিনাশ করিতে পারিত ভাল, নতুবা তাহার ভাবনার সময় অলীক সান্ত্বনা দিতে গিয়া তাহার ভাবনায় ব্যাঘাৎ দিও না।



ভ—

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

প্রজ্ঞা প্রকৃতির অভ্যন্তরে অপরিস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান আছে, এবং তাহাই মনুষ্যে মনুষ্যে পরিস্ফুট-ভাব ধারণ করিতেছে, এ বিষয়টি স্পস্ট করিয়া খুলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

জ্ঞান সকল-মনুষ্যেতেই বর্ত্তমান আছে, কিন্তু পাত্র-বিশেষে, অবস্থা-বিশেষে কাল-বিশেষে জ্ঞান-পরিস্ফুটনের বিস্তর মাত্রা-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞান, অসভ্য জাতিতে অপরিস্ফুট, সভ্য জাতিতে পরিস্ফুট, নিদ্রা-কালে অপরিস্ফুট, জাগ্রৎকালে পরিস্ফুট, অশিক্ষিত ব্যক্তিতে অপরিস্ফুট, শিক্ষিত ব্যক্তিতে পরিস্ফুট, শৈশবকালে অপরিস্ফুট, প্রৌঢ় বয়সে পরিস্ফুট, অধম জীবে অপরিস্ফুট, মনুষ্যে পরিস্ফুট; এইরূপ জ্ঞানোন্মীলনের তারতম্য সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

কেহ বলিতে পারেন যে, জ্ঞানের অপরিস্ফুট ভাবও যা, জ্ঞানের অভাবও তাই। পরিস্ফুটতা কি? না প্রকাশ। অপরিস্ফুটতা কি? না অপ্রকাশ। প্রকাশই জ্ঞানের ধর্ম্ম—ধর্ম্ম কেন—জ্ঞানের সাক্ষাৎ স্বরূপ। অতএব জ্ঞান যখন অপ্রকাশ আছে, তখন আর কেমন করিয়া বলি যে তাহা বর্ত্তমান আছে। এই প্রশ্নটির মীমাংসায় প্রবৃত্ত হই;—

এই কাগজটি আমরা দেখিতেছি, সুতরাং দর্শনেন্দ্রিয়ে প্রকাশ পাইতে পারে এই গুণটি ইহার আছে; ঐ গুণটিকে বলা যাউক্ দৃশ্য গুণ। সমুদায় কাগজটির যেমন দৃশ্য-গুণ আছে, তাহার প্রত্যেক অংশেরও সেইরূপ দৃশ্য-গুণ আছে। মনে কর এই কাগজটিকে কোটি বা দশ কোটি অংশে বিভাগ করিলে ইহার খণ্ডাংশ-গুলি এত সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয় যে, তাহারা একেবারেই আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া পড়ে। সেই খণ্ডাংশ গুলি দৃষ্টিবহির্ভূত হউক্, কিন্তু ইহা বলিতে পার না যে, দৃশ্য-গুণ তাহাদের নাই; কেন না প্রত্যেক খণ্ডাংশের দৃশ্য-গুণ সংগ্রহ করিয়াই কাগজের সমস্তটা দৃষ্টি-পথে আবির্ভূত হইতেছে। এমন একটি অণুবীক্ষণ থাকিবার কোন বাধা নাই

যাহাতে এই কাগজের অযুত কোটি খণ্ডাংশের একাংশ পর্য্যন্ত দৃষ্টি-পথে উদ্ভাসিত হইতে পারে। ঐরূপ একটি অণুবীক্ষণ পাইলে এই কাগজের দশ কোটি খণ্ডাংশের একাংশ সহজেই দৃষ্টি-গোচর হইতে পারে। দৃষ্টি-বহির্ভূত উক্ত খণ্ডাংশের—মূলেই যদি দৃশ্য-গুণ নাই, তবে অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট হইতে পারে এই যে তাহার একটি গুণ দেখা গেল, তাহাও ত দৃশ্য-গুণ, তাহা কোথা যাইবে। অতএব খণ্ডাংশগুলি দৃষ্টিবহির্ভূত হইলেও এরূপ বলিতে পার না যে, মূলেই তাহাদের দৃশ্য-গুণ নাই—এই মাত্র বলিতে পার যে, সে গুণ অপরিস্ফুট অথবা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

খণ্ডাংশগুলির একেবারেই দৃশ্য-গুণ নাই এ কথা বলিলে কি দোষ হয়? না ব্যষ্টিদিগের গুণ একত্র সংগৃহীত হইয়া সমষ্টির গুণ স্থিরীভূত হইতেছে. সর্ব্বাংশের মধ্যে একটি আবহমান যোগ-সূত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই সত্যটির অগৌরব করা হয়। জ্ঞান যেখানে অপরিস্ফুট বা প্রচ্ছন্ন আছে সেখানে জ্ঞানকে অবর্ত্তমান বলিলে ঠিক্ ঐ দোষটি ঘটে। নিদ্রিতাবস্থায় জ্ঞানকে অপরিস্ফুট না বলিয়া যদি অবর্ত্তমান বল তবে জাগিয়া উঠিবার সময় যে জ্ঞানোদয় হয় তাহাকে কি বলিবে? তোমার মতে, কল্যকার পুরাতন জ্ঞান ত অবর্ত্তমান হইয়াছে, একেবারেই লোপ পাইয়াছে, সুতরাং তুমি এরূপ বলিতে পার না যে, গতকল্য যে-জ্ঞান ছিল তাহাই অদ্য উদিত হইল—কল্যকার সূর্য্য যদি কল্যই লোপ পাইয়া থাকে তবে অদ্যকার সূর্য্যোদয় আর একটি সূর্য্যের নূতন-সৃষ্টি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? সুতরাং তোমার মতানুসারে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, গত কল্যকার জ্ঞান গত কল্যই বিলুপ্ত হইয়াছে, আজিকার এইযে জ্ঞান, ইহা জ্ঞানের একটি নূতন সৃষ্টি। এ অবস্থায় আজিকের জ্ঞানের সহিত কালিকের জ্ঞানের কোন সম্পর্ক থাকিতে পারে না; কালিকে তুমি যাহা দেখিয়াছ শুনিয়াছ করিয়াছ আজিকে তাহা তোমার জ্ঞানে স্থান পাইতে পারে না। এই সকল অলীক সিদ্ধান্ত হইতে যদি অব্যাহতি চাও, তবে স্বীকার কর যে, নিদ্রার সময় জ্ঞান অবর্ত্তমান থাকে না—প্রচ্ছন্ন থাকে মাত্র।

সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রজ্ঞা বর্ত্তমান আছে—প্রজ্ঞা কোথাও অবর্ত্তমান নাই—এখন ইহা সুস্পষ্টরূপে বোধগম্য হইতে পারিবে। প্রজ্ঞা মনুষ্যে যেমন পরিস্ফুট, পশু পক্ষীতে তেমন নহে; পশু পক্ষীতে যেমন, তরু লতাতে তেমন নহে; তরুলতাতে যেমন, ধাতু প্রস্তরে তেমন নহে, কোথাও বা অধিক পরিস্ফুট কোথাও বা অল্প পরিস্ফুট এই যা প্রভেদ—আছে সর্ব্বত্রই। জ্ঞান পরিস্ফুটনের এই যে তারতম্য,ইহা কেবল বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে নহে, একই ব্যক্তির মধ্যে কাল-ভেদে অবস্থা ভেদে দৃষ্টি-গোচর হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থা অপেক্ষা স্বপ্নাবস্থাতে, স্বপ্নাবস্থা অপেক্ষা সুষুপ্তি অবস্থাতে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই

জ্ঞান অপরিস্ফুট হইয়া আইসে। সুষুপ্তির পূর্ব্ব সময় এবং সুষুপ্তি ভাঙিবার সময়, এই দুই বিভিন্ন মুহূর্ত্তের মধ্যে যেটুকু কালের ব্যবধান, সেই ব্যবধান-স্থলে জ্ঞান নাই-যে এমন নহে, আছে—তবে কি না প্রচ্ছন্নভাবে। যদি সুষুপ্তির সময় জ্ঞানের অসদ্ভাব হইত, তবে সুষুপ্তির পূর্ব্ব-কালীন জ্ঞান এবং তাহার উত্তর-কালীন জ্ঞান, উভয়ই যে ধারাবাহিক একই জ্ঞান, এ সত্যটি কিছুতেই রক্ষা পাইতে পারিত না। এক ব্যক্তির জ্ঞানের সহিত যে সেই ব্যক্তির জ্ঞানান্তরের যোগ আছে, এ সত্যটির যখন অন্যথা সম্ভবে না, তখন, সুষুপ্তির সময় জ্ঞান প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান থাকে, ইহাই যুক্তি-সঙ্গত; অবর্ত্তমান থাকে—ইহা অত্যুক্তি।

সুষুপ্তির সহিত জড়ের, স্বপ্নের সহিত অধম জীবের এবং জাগ্রৎভাবের সহিত মনুষ্যের তুলনা হইতে পারে। সুষুপ্তির অভ্যন্তরে যদি জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিল, তবে জড়ের অভ্যন্তরে কেননা তাহা প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারিবে? স্বপ্নে যদি কিয়ৎ পরিমাণে পরিস্ফুট হইতে পারিল তবে অধম জীবে কেননা পারিবে? জাগ্রৎকালের সহিত মনুষ্যের জ্ঞান-সাদৃশ্যের ত কথাই নাই। সুষুপ্তি কাল, স্বপ্ন কাল, জাগরণ কাল, এই রূপ কালভেদে জ্ঞান-বিকাশের তারতম্য সত্ত্বেও যেমন জ্ঞানের অসদ্ভাব কোন কালেই সম্ভবে না, সেইরূপ—মনুষ্য, পশুপক্ষী, উদ্ভিদ, ধাতু-প্রস্তর প্রভৃতি পাত্র-ভেদে জ্ঞান-বিকাশের প্রভূত তারতম্য সত্ত্বেও জ্ঞানের অসদ্ভাব কুত্রাপি সম্ভবে না। অতএব প্রকৃতির অভ্যন্তরে প্রজ্ঞা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেই বল, আর অব্যক্ত রহিয়াছেই বল, যাহাই বল না কেন—আছে তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু প্রজ্ঞার যদি স্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখিতে চাও, তবে মনুষ্যেতে তাহা দেখ—আপন অভ্যন্তরে মনুষ্যত্বের যে একটি আদর্শ আছে, তাহার প্রতি প্রণিধান কর—দেখিতে পাইবে।

মনুষ্যে মনুষ্যে প্রজ্ঞা কিরূপে প্রস্ফুটিত হয়? প্রজ্ঞা এমন কোন আকস্মিক জ্ঞান নহে যে, তাহা পূর্ব্বে ছিল না এক মুহূর্ত্তে অমনি আমাদের হস্তগত হইল। যেমন একখণ্ড আকাশের মধ্যে সকল প্রকার আয়তন, রেখায়তন* ক্ষেত্রায়তন† পিণ্ডায়তন‡ তন্ময়ীভূত রহিয়াছে, তাহার মধ্যে যাহার প্রতি যত মনোনিবেশ করা যায় তাহাই তত পরিস্ফুট ভাব ধারণ করে, সেইরূপ প্রজ্ঞার অভ্যন্তরে সকল প্রকার মূলতত্ত্ব তন্ময়ীভূত রহিয়াছে, যাহার যেমন আলোচনা হয় তাহা সেইরূপ পরিস্ফুটতা লাভ করে। প্রজ্ঞার অভ্যন্তরে যে-সকল মূলতত্ত্ব সংগ্রথিত আছে, তাহাদের মধ্যে যে পরস্পর প্রভেদ, তাহা প্রজ্ঞার স্বগত ভেদ; আহংকারিক জ্ঞান হইতে প্রজ্ঞার যে প্রভেদ, তাহা প্রজ্ঞার স্বজাতীয় ভেদ; মনো-বৃত্তি হইতে প্রজ্ঞার যে প্রভেদ তাহা প্রজ্ঞার বিজাতীয় ভেদ। প্রজ্ঞার

* Linear extension.
† Superficial extension.
‡ Solid extension.

সহিত আহঙ্কারিক জ্ঞানের কিরূপ ভেদাভেদ তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আহংকারিক জ্ঞানের সহিত মনোবৃত্তির কিরূপ ভেদাভেদ তাহার প্রতি একবার প্রণিধান করা হউক। মনোবৃত্তি সকলের উপর আহংকারিক জ্ঞানের এরূপ অধিকার যে, আহংকারিক জ্ঞানকে মনোবৃত্তি-সমূহের লয়স্থান, মূলপ্রদেশ, অথবা কেন্দ্র বলিলেই হয়; এবং উভয়ের মধ্যে এইরূপ একটি নিয়ম দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনোবৃত্তির বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইলে আহংকারিক জ্ঞান অভিভূত হয় আর আহংকারিক জ্ঞানের বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইলে মনোবৃত্তি-সকল অভিভূত হয়। সূর্য্য-গ্রহণের প্রারম্ভ-কালে সূর্য্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া গ্রাসের পরিমাণ নিরূপণ করিতে আমরা পরাস্ত মানি কেন? না তৎকালে সূর্য্যের প্রখর জ্যোতির উত্তেজনায় আমাদের চাক্ষুষ মনোবৃত্তির এত প্রাদুর্ভাব হয় যে আমরা আপনার কর্ত্তৃত্ব (আহংকারিক জ্ঞান) খাটাইয়া গ্রহণের গ্রাস-মাত্রা নির্ণয় করি এতটুকুও আমাদের শক্তি থাকে না। এ যেমন দেখা গেল, এমনি আর একটি নিয়ম প্রজ্ঞা এবং আহঙ্কারিক জ্ঞান উভয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আহঙ্কারিক জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হইলে প্রজ্ঞা অভিভূত হয়, এবং প্রজ্ঞার প্রাদুর্ভাব হইলে আহংকারিক জ্ঞান অভিভূত হয়। যাঁহারা আহংকারিক জ্ঞান খাটাইয়া প্রজ্ঞার স্বতঃসিদ্ধ সত্য আয়ত্ত করিতে যান, ঐ নিয়মটি তাঁহাদিগকে অকূল দ্বৈধসাগরে ভাষাইয়া দেয়। এ উপলক্ষে শঙ্করাচার্য্য একটি চমৎকার উপমা দিয়াছেন; তিনি বলিয়াছেন "মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং মানেন যে বুভুৎসন্তি। এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহা সুধিয়ঃ॥ প্রমাণকে প্রবোধিত করে, অর্থাৎ প্রমাণের প্রমাণত্ব সাধন করে, এমন যে স্বতঃসিদ্ধ মূলজ্ঞান কি না প্রজ্ঞা, তাহাকে যাঁহারা প্রমাণ দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন, সেই মহা পণ্ডিতেরা কি করেন? না কাষ্ঠকে দহন করে যে অগ্নি, সেই অগ্নিকে কাষ্ঠ দ্বারা দহন করিতে ইচ্ছা করেন। ক্যাণ্ট নামে বিখ্যাত ইউরোপের একজন অদ্বিতীয় তত্ত্ববিৎ ঐ নিয়মটি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। দেশকালের অতীত প্রজ্ঞাতত্ত্বকে শুদ্ধ কেবল আহংকারিক (Subjective) জ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করিতে গেলে বাস্তবিক সত্য যে কি তাহার কিছুই নির্ণয় হয় না ইহা তিনি জলের ন্যায় স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু তিনি অবিনীত আহংকারিক জ্ঞানের ঐরূপ অরাজকতা দোষ দেখাইয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, সে দোষের প্রতীকার কিরূপে হইতে পারে তাহা দেখাইতে পারেন নাই; চিকিৎসক রোগ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে ঔষধি প্রয়োগ করিতে ইতস্ততঃ করিয়া বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি বলেন যে স্বতঃসিদ্ধ প্রজ্ঞাতত্ত্বকে কার্য্যত জানিতে চেষ্টা কর, জ্ঞানত জানিতে যাইও না। রোগ হইয়াছে চক্ষে, ঔষধি লেপনের ব্যবস্থা হস্তপদে, এ যেমন অসঙ্গত—জ্ঞানেতে দোষ

দর্শন, কার্য্যেতে তাহার প্রতিবিধান,' ইহাও সেই প্রকার বলিতে হইবে। প্রকৃত কথা এই যে, প্রজ্ঞাতত্ত্ব প্রমাণের গম্য নহে বলিয়া তাহা যে মূলেই জ্ঞানের গম্য নহে, ইহা একটি ঘোরতর অত্যুক্তি। "শিরো নাস্তি" যদি সত্য হয় তবে শিরঃপীড়া থাকে কোথায়? অহংজ্ঞান যদি নাই, তবে রূপ রসাদি জ্ঞান থাকে কোথায়? গোড়ায় যদি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান নাই, তবে প্রমাণের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? অতএব স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে প্রমাণ করিতে চাহিতেছ—এইটি রোগ; স্বতঃসিদ্ধ সত্য তুমি ভিতরে ভিতরে জানিতেছ, অতএব তাহাতে অকুতোভয়ে বিশ্বাস স্থাপন কর,—এইটি ঔষধি।

প্রজ্ঞা এবং আহংকারিক জ্ঞান দুয়ের মধ্যে বিবাদই আধ্যাত্মিক সকল-রোগের মূল। প্রজ্ঞা দ্বারা আহংকারিক জ্ঞানকে নিয়মিত হইতে দেও, তবেই প্রজ্ঞা যে কি অমূল্য রত্ন তাহা বুঝিতে পারিবে; তাহা না করিয়া প্রজ্ঞাকে যদি আহঙ্কারিক জ্ঞানের অধীনে আনিতে চেষ্টা কর, তবে এমন যে সুনিশ্চিত প্রজ্ঞা-তত্ত্ব তাহাও তোমার নিকট অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। প্রজ্ঞা নিয়ামক, আহংকারিক জ্ঞান নিয়মিতব্য, এইটি বিশেষরূপে জানা উচিত। আপনার কিংবা অন্যের অহংকারের উপাসনা করিয়া কেহ কখন সত্য লাভ করিতে পারে নাই পারিবে না,—অহংকারের বিপরীত পথেই ধ্রুব সত্যের মন্দির প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। আহংকারিক জ্ঞান যখন প্রজ্ঞাকে অমান্য করে তখন তাহা বুদ্ধির গর্ব্বই করে, বুদ্ধির কার্য্য একটুও করে না। "পরমাত্মাকে আমার কোন প্রয়োজন নাই—তোমার প্রয়োজন থাকে তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহা কর, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই" এরূপ গর্ব্ব শূন্যগর্ভ ইহা কি আর জানা যাইতেছে না? আত্মাকে ঈশ্বর-প্রেমে আর্দ্র করিবার প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন কেবল আত্মাকে শুষ্ক কাষ্ঠ করিয়া রাখা! অনন্ত জীবনে প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন কেবল অনন্ত কাল মরিয়া থাকা! জ্ঞানালোকে প্রয়োজন নাই, সত্য বস্তুতে প্রয়োজন নাই—প্রয়োজন কেবল অজ্ঞানান্ধকার আর শূন্য অভাব! এ সকল নিষ্ফল গর্ব্বোক্তি বিসর্জ্জন দিয়া এই সত্যটির প্রতি মনোনিবেশ করিলে ভাল হয় যে, মনোবৃত্তি-সকল অহংভাবের অনুগত এবং অহংভাব প্রজ্ঞার অনুগত হইলে তবেই আধ্যাত্মিক রাজ্যে সুনিয়ম সংস্থাপিত হইবে, তাহার ব্যতিক্রম হইলে অরাজকতা উপস্থিত হইবে, ইহা অনিবার্য্য।



অশ্রুজল।

যে দিকে ফিরিয়া দেখি সেই দিকেই হাসির লহরী উঠিতেছে,সেই দিকেই সুখের আড়ম্বর বিদ্যমান। এমন একটুও স্থান নাই, একটুও সময় নাই, যে আমি নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদি। আবার সকলে যে সময় হাসিতেছে, সে সময় না হাসিলেও নয়, সুতরাং হাসিতেই হয়, কিন্তু সে হাসির কষ্ট, হে অন্তর্দেবতা তুমিই জান'। আমার মনে হয় যে হাস্য-আমোদকারীরা যদি একমুহূর্ত্তের জন্য কান্নার কোমলতর ভাব অনুভব করিতে পারিত, তাহা হইলে হাসিবার জন্য তাহারা অত লালায়িত হইত না। তরঙ্গময়ী গঙ্গার উপকূলে নীরব নিশীথে একাকী শয়ান রহিয়া ঊর্দ্ধ-দৃষ্টে চন্দ্র তারা দেখিতে দেখিতে আপনার দুঃখেই হোক, পরের দুঃখেই হোক, যখন যুগল চক্ষুর অপাঙ্গ ভিজাইয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল নিঃসৃত হইতে থাকে, শ্মশানের চিতালোক দেখিয়া যখন কোন মৃত শৈশব-সহচরীর বিদায়-কটাক্ষ মনোমধ্যে আলেয়া-আলোকের ন্যায় সহসা প্রতিভাত হয়, বিজন প্রান্তরে অথবা গভীর নিশীথে বিচরণ করিতে করিতে সুদূর পল্লী হইতে মন্দীভূত বংশীধ্বনি আসিয়া যখন বালিকা বয়সের কোন অতি প্রিয় অথবা বিস্মৃত একটি সঙ্গীতকে অর্দ্ধজাগরিত করিয়া দেয়, তখন অতি ধীরে, অতি মৃদুভাবে হৃদয়ের পূর্ণ উৎস হইতে যে অশ্রু লহরী উৎসারিত হয়, তাহার কোমলতা, তাহার গভীরতা, তাহার পবিত্রতা, তাহার মহান ভাব' চিরহাস্যকারীরা কখনই অনুভব করিতে পারে না। সে সময়ে হৃদয়ের দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিগুলি কি যে এক মোহ-যন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া যায়; বর্ত্তমানের দারুণ শোক বা বিকট উল্লাস কি যে এক মোহিনী নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে, মরমের কোন্ নিভৃত স্থল হইতে যে ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের বিষণ্ণ জ্যোৎস্নার ন্যায় একটি রমণীয় ভাব সমস্ত হৃদয়ে বিকীরিত হয় তাহা অনুভব ব্যতীত বর্ণনা করা যায় না। হাসি যত সহজে হয়, কান্না তত সহজে হয় না। হৃদয়ের গূঢ়তম তন্ত্র না বাজিয়া উঠিলে চক্ষে এক ফোঁটাও অশ্রু আইসে না। এমন কি, আনন্দও প্রকৃত আনন্দ নামে পরিচিত হইতে পারে না যতক্ষণ না তাহা অশ্রুতে পরিণত হয়। যুগ যুগান্তের পরে যখন বান্ধবে বান্ধবে মিলিত হয়, তখন উভয়ে উভয়ের বক্ষে মুখ লুকাইয়া দরবিগলিত লোচনে যত অশ্রু বিসর্জন করে,তাহা তো হাস্যের স্থানীয় মাত্র। কিন্তু সে হাস্য,মর্ম্মভেদী সে হাস্য,হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশের অশ্রু-উৎসকে জাগাইয়া অশ্রুরূপেই পরিণত হয়। আবার যখন দেখি কোন মহান্ ঋষিপুরুষ গঙ্গার পবিত্র জলে আবক্ষ নিমগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধহস্তে প্রাতঃসূর্য্যকে বন্দনা করিতে করিতে জাহ্নবীর তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অশ্রুতরঙ্গ মিশাইতে

থাকেন,তখন সেই প্রশান্ত প্রতিমা ছাড়িয়া, সংসার! আমি তোমার কোন প্রতিমাই হৃদয়মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিতে চাহি না।

এই হর্ম্ম্যময়ী মহানগরীতে বিচরণ করিতে করিতে আমরা কত অট্টালিকাই দেখিতে পাই—কিন্তু সে সকল দেখিয়া আমাদের চক্ষু তৃপ্ত হয় মাত্র, হৃদয়ের একটি শিরাও স্পন্দিত হয় না। তাহাদের সঙ্গে ভূতকালের সম্পর্কই নাই। তাহারা কেবল বর্ত্তমান কালটিকে ঘিরিয়া আছে। তাহাদিগকে দেখিলে আমরা কেবল শিল্পকরের নিপুণতায় ঈষৎ মুগ্ধ হইতে পারি, এবং মানুষের কার্য্যদক্ষতায় ঈষৎ চমৎকৃত হইতে পারি। কিন্তু মনে কর যদি কোন জ্যোৎস্নাময়ী গভীর রজনীতে ইন্দ্রপ্রস্থের ভগ্নাবশিষ্ট প্রাসাদ মণ্ডলে বিচরণ করিতে করিতে সেই ভূতকালের সাক্ষীস্বরূপ, বর্ত্তমানের মোহস্বরূপ এবং ভবিষ্যতের কবিতাস্বরূপ জরাজীর্ণ স্তম্ভগুলিকে দেখিতে পাই, যখন তাহাদের অর্দ্ধস্ফুট মূর্ত্তিতে তাহাদের মুগ্ধকর ইতিবৃত্ত জ্বলন্ত অক্ষরে দেদীপ্যমান দেখি, যখন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে কালের করাল স্রোতে উজান বাহিয়া কল্পনা প্রায় কালের উৎস-প্রদেশে গিয়া পড়ে, তখন হৃদয়ের তরঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে যে মমতালহরী বহিতে থাকে তাহা হে প্রকৃতি দেবি তোমার অনন্ত ভাণ্ডারের কোন্ সামগ্রীর সঙ্গে তুলনায় হইতে পারে?

আবার দুঃখের সময় হৃদয় যখন শোকে নিষ্পেষিত হইতে থাকে, যখন শরীরের সমস্ত শোণিত একত্র হইয়া মর্ম্মের দ্বারে ভীষণ আঘাত করিতে থাকে, যখন আমাদের এই ক্ষুদ্র মনের ভিতরে প্রণয়-বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন অশ্রুলহরী ব্যতীত আমাদের আর কি সহায় আছে? কবিবর টেনিসন বলিয়াছেন যে, কোন সময় একটি বীরপুরুষ সমরে হত হইলে তাঁহাকে তাঁহার পরিবার মধ্যে আনা হয়। বীরপত্নী তাঁহাকে দেখিয়া একেবারে প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন,তাহার চেতনা লোপ হইল না বটে কিন্তু তাহার মুখে কথা নাই, চক্ষেও অশ্রু নাই। তাঁহার সহচরীরা তাঁহাকে কাঁদাইতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে কাঁদাইতে পারিল না, সুতরাং সকলেই এই আশঙ্কা করিতে লাগিল যে অসহ যাতনায় তিনিও সহসা হতপ্রাণ হইবেন। পরিশেষে একটি বৃদ্ধা সহচরী সেই বীরপত্নীর নবপ্রসূত শিশুটিকে লইয়া তাঁহার অঙ্কে দিবা মাত্রই তিনি "রে বিধবা-সর্ব্বস্ব! আমি তোরই জন্য বাঁচিয়া আছি" বলিয়া রোদন করিয়া উঠিলেন এবং শ্রাবণ ধারার ন্যায় চক্ষে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন সকল সহচরীরাই তৃপ্ত হইল, সকলেই বুঝিল যে বীরপত্নীর যাতনার উপশম হইয়া আসিতেছে। বাস্তবিক, অশ্রুলহরী না থাকিলে আমরা অনেক সময়ে আত্মহত্যা করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হইতাম না। আবার, আমার হৃদয়বেদনা উপস্থিত হইলে আমি নিজেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া যে আমার বেদনা নিবারণ করি এমন নহে, কিন্তু আ-

মার বেদনা জানিয়া অন্যে যদি আমার জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন করে, তাহা হইলে বেদনার উপশমের কথা দূরে থাকুক, অনেক সময়ে সেই বেদনাকেই প্রকৃত পক্ষে সুখকর বলিয়া মনে হয়। যখন মনোবেদনায় অস্থির হইয়া একেলা সংসার মধ্যে উন্মত্তের ন্যায় ভ্রমণ করিতে থাকি, যখন শরতের ছিন্ন পল্লবের ন্যায় বায়ুতাড়নে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত হই—যখন আমার আর্ত্তনাদ কেবল দিক-মণ্ডলেই ধ্বনিত হইতেছে, দীর্ঘশ্বাস বায়ুতেই মিশাইতেছে, অশ্রুলহরী বালুকাতেই শুখাইতেছে, তখন যদি কোন ব্যথার ব্যথী আসিয়া আমার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে, আমার দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাহার নিঃশ্বাস মিশায়, আমার অশ্রুতরঙ্গে অশ্রুতরঙ্গ ঢালিয়া দেয়, তখন হে পৃথিবি! তোমার রাক্ষসী মূর্ত্তিও কি বিনোদ বেশ ধারণ করে!

কিন্তু হায়, সংসারে এই অশ্রুতে অশ্রুর প্রত্যুত্তর কি দুর্লভ! অশ্রুতে অশ্রু মিশান' দূরে থাকুক অনেক সময়ে অনেক স্থলে অশ্রুর উত্তরে কেবল মাত্র তিরস্কার বা বিরক্তিই প্রতিদান পাওয়া যায়। পত্নীহারা অরফিয়ুস্ যখন প্রেতলোকে যমরাজার কাছে নিজের দুঃখের কথা বলিয়াছিলেন তখন নৃশংস যমরাজের গণ্ডস্থল ভিজাইয়া "লৌহময় অশ্রুলহরী" প্রবাহিত হইয়াছিল, কিন্তু মর্ত্ত্যলোকের কোন কোন পিশাচ পিশাচীদের চক্ষুর্দ্বয় এমন বজ্রায়সে নির্ম্মিত, যে ভগ্ন-হৃদয়ের অনর্গল অশ্রুলহরীতে অশ্রু মিশান দূরে থাকুক, তাহাতেই তাহারা ঘৃণার হাস্য, উপেক্ষার কটাক্ষ বর্ষণ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। এমন স্থলে এমন সময়ে অনেক বার বৃদ্ধ রাজা লিয়রের মত আপনার চক্ষু বলপূর্ব্বক উৎপাটন করিয়া ধূলির সঙ্গে বিমর্দ্দিত করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে যেন আর এক বিন্দুও অশ্রুজল নিপতিত না হয়, কিন্তু-ভগ্নহৃদয়ের অশ্রু থামিবার নহে, পাষাণ হৃদয়ের মমতাও পাইবার নহে, সুতরাং হে পৃথিবি তোমারই জয়!!

চ—

করুণা।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সমস্ত দিন মেঘ-মেঘ করিয়া আছে, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে, বাদলার আর্দ্র বাতাস বহিতেছে, আজ করুণা মন্দিরে মহাদেবের পূজা করিতে গিয়াছে। কাঁদিয়া কাটিয়া প্রার্থনা করিল, যেন তাহাকে আর অধিক দিন এরূপ কষ্টভোগ করিতে না হয়, এবার তাহার যে সন্তান হইবে সে যেন পুত্র হয়, কন্যা না হয়, নারী-জন্মের যন্ত্রণা যেন আর কেহ ভোগ না করে। করুণা প্রার্থনা করিল, তাহার মরণ হউক,

তাহা হইলে নরেন্দ্র স্বেচ্ছামতে অকণ্টকে সুখ ভোগ করিতে পাইবে।

এই দুঃখের সময় নরেন্দ্রের এক পুত্র জন্মিল। অর্থের অনটনে সমস্ত খরচপত্র চলিবে কি করিয়া তাহার ঠিক নাই। নরেন্দ্রের পূর্ব্বকার চাল কিছুমাত্র বিগড়ায় নাই; সেই সন্ধ্যাকালে গদাধর ও স্বরূপের সহিত বসিয়া তেমনি মদটি খাওয়া আছে, তেমনি ঘড়িটি, ঘড়ির চেনটি, ফিন্‌ফিনে ধুতিটি, এসেন্সটুকু, আতরটুকু সমস্তই আছে, কেবল নাই অর্থ। করুণার গার্হস্থ্য পটুতা কিছুমাত্র নাই, তাহার সকলই উল্‌টা পালটা গোলমাল। গুছাইয়া কি করিয়া খরচ পত্র করিতে হয় তাহার কিছুই জানে না, হিসাব পত্রের কোন সম্পর্কই নাই, কি করিতে যে কি করে তাহার ঠিক নাই। করুণা যে কি গোলে পড়িয়াছে তাহা সেই জানে, নরেন্দ্র তাহাকে কোন সাহায্য করে না, কেবল মাঝে মাঝে গালাগালি দেয় মাত্র, নিজে যে, কি দরকার, কি অদরকার, কি করিতে হইবে, কি না করিতে হইবে, তাহার কিছুই ভাবিয়া পায় না। করুণা রাত দিন ছেলেটি লইয়া থাকে বটে, কিন্তু কি করিয়া সন্তান পালন করিতে হয় তাহার কিছু যদি জানে! ভবি বলিয়া বাড়ির যে পুরাতন দাসী ছিল, সে করুণার এই দুর্দ্দশায় বড় কষ্ট পাইতেছে। করুণাকে সে নিজ হস্তে মানুষ করিয়াছে, এই জন্য তাহাকে সে অত্যন্ত ভাল বাসে। নরেন্দ্রের অন্যায়াচরণ দেখিয়া সে মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে খুব মুখনাড়া দিয়া আসিত, হাত মুখ নাড়িয়া যাহা না বলিবার তাহা বলিয়া আসিত। নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইয়া কহিত "তুই বাড়ি হইতে দূর হইয়া যা!" সে কহিত "তোমার মত পিশাচের হস্তে করুণাকে সমর্পণ করিয়া কোন্ প্রাণে চলিয়া যাই?" অবশেষে নরেন্দ্র উঠিয়া দুই চারিটি পদাঘাত করিলে পরে সে গর্‌গর্‌ করিয়া বকিতে বকিতে কখনো বা কাঁদিতে কাঁদিতে সেখান হইতে চলিয়া যাইত। ভবিই বাড়ির গিন্নি; সেই বাড়ির সমস্ত কাজকর্ম্ম করিত, করুণাকে কোন কাজ করিতে দিত না। করুণার এই অসময়ে সে যাহা করিবার তাহা করিয়াছে। ভবির আর কেহ ছিল না, যাহা কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিল, সমস্ত করুণার জন্য ব্যয় করিত। করুণা যখন একলা পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিত, তখন সে তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। করুণাও ভবিকে বড় ভাল বাসিত, যখন মনের কষ্টের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে পারিত না, তখন দুই হস্তে ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া এমন কাঁদিয়া উঠিত যে, ভবিও আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না, সে শিশুর মত কাঁদিয়া একাকার করিয়া দিত। ভবি না থাকিলে করুণা ও নরেন্দ্রের কি হইত বলিতে পারি না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

স্বরূপ বাবু কহেন যে, পৃথিবী তাঁহাকে ক্রমাগতই জ্বালাতন করিয়া আসিয়াছে, এই নিমিত্ত মানুষকে তিনি পিশাচ জ্ঞান করেন; কিন্তু আমরা যতদূর জানি, তাঁহাকে তিনিই

দেশের লোককে জ্বালাতন করিয়া আসিতেছেন, তিনি যাহার সহিত কোন সংশ্রবে আসিয়াছেন, তাহাকেই অবশেষে এমন গোলে ফেলিয়াছেন যে, কি বলিব!

স্বরূপ বাবু সর্ব্বদা এমন কবিত্ব চিন্তায় মগ্ন থাকেন যে অনেক ডাকাডাকিতেও তাঁহার উত্তর পাওয়া যায় না ও সহসা অ্যাঁ বলিয়া চমকিয়া উঠেন। হয়ত অনেক সময়ে কোন পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া আছেন, অথচ যে, সম্মুখে পশ্চাতে পার্শ্বে মানুষ আছে তাহা টেরও পান নাই, অথবা যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা টের পায় নাই যে তিনি টের পাইতেছেন। ঘরে বসিয়া আছেন এমন সময়ে হয়ত থাকিয়া থাকিয়া বাহিরে চলিয়া যান, জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, জানালার ভিতর দিয়া তিনি এক খণ্ড মেঘ দেখিতে পাইয়াছিলেন, তেমন সুন্দর মেঘ কখনো দেখেন নাই। কখনো কখনো তিনি যেখানে বসিয়া থাকেন, ভুলিয়া দুই এক খণ্ড তাঁহার কবিতা লিখা কাগজ ফেলিয়া যান, নিকটস্থ কেহ সে কাগজ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলে তিনি 'ও! —এ কিছুই নহে' বলিয়া টুকুরা টুকুরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেন। বোধ হয় তাঁহার কাছে তাহার আর এক খানা নকল থাকে, কিন্তু লোকে বলে যে, না, অনেক বড় বড় কবির ঐরূপ অভ্যাস আছে। মনের ভুল এমন আর কাহারও দেখি নাই. কাগজ পত্র কোথায় যে কি ফেলেন তাহার ঠিক নাই, ঐরূপ কাগজপত্র যে কত হারাইয়া ফেলিয়াছেন তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু সুখের বিষয়, ঘড়ি টাকা, বা অন্য কোন বহুমূল্য দ্রব্য কখনো হারান্ নাই। স্বরূপ বাবুর আর একটি রোগ আছে, তিনি যে কোন কবিতা লিখেন, তাহার উপরে বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে 'বিজন কাননে' বা 'গভীর নিশীথে' লিখিত, বলিয়া লিখা থাকে, কিন্তু আমি বেশ জানি যে, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্তানগণ দ্বারা পরিবৃত গৃহে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক আমাদের স্বরূপ বাবু বড় প্রেমিক ব্যক্তি। তিনি যত শীঘ্র প্রেমে বাঁধা পড়েন এত আর কেহ নয়, ইহাতে তিনিও কষ্ট পান, আর অনেককেই কষ্ট দেন।

স্বরূপ বাবু দিবা রাত্রি নরেন্দ্রের বাড়িতে আছেন, মাঝে মাঝে আড়ালে আবডালে করুণাকে দেখিতে পান, কিন্তু তাহাতে বড় গোলযোগ বাধিয়াছে। তাঁহার মন অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে, ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িতেছে ও রাত্রে ঘুম হইতেছে না। তিনি ঘোর উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়াছেন, সুতরাং এখন তাঁহাকে কোকিলেও ঠোক্‌রায় না, চন্দ্রকিরণও দগ্ধ করে না বটে, কিন্তু হইলে হয় কি, পৃথিবী তাঁহার চক্ষে অরণ্য শ্মশান হইয়া গিয়াছে, ফুল শুকাইতেছে আবার ফুটিতেছে, সূর্য্য অস্ত যাইতেছে আবার উঠিতেছে, দিবস আসিতেছে ও যাইতেছে, মানুষ শুইতেছে ও খাইতেছে, সকলি যেমন ছিল তেমনি আছে, কিন্তু হায়! তাঁহার হৃদয়ে আর শান্তি নাই, দেহে বল নাই. নয়নে নিদ্রা নাই, হৃদয়ে সুখ নাই,

এক কথায়, যাহাতে যাহা ছিল, তাহাতে আর তাহা নাই! স্বরূপ কতকগুলি কবিতা লিখিয়া ফেলিল, তাহাতে যাহা লিখিবার সমস্তই লিখিল! তাহাতে ইঙ্গিতে করুণার নাম পর্য্যন্ত গাঁথিয়া দিল। এবং সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্‌ করিয়া মধ্যস্থ নামক কাগজে পাঠাইয়া দিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

নিধি নরেন্দ্রের বাড়িতে মাঝে মাঝে আইসে। কিন্তু আমরা যে ঘটনার সূত্র অবলম্বন করিয়া আসিতেছি, সে সূত্রের মধ্যে কখনো পড়ে নাই; এই বার পড়িয়াছে। স্বরূপ বাবু তাঁহার অভ্যাসানুসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক বা দৈবক্রমেই হউক্, এক খণ্ড কাগজ ঘরে ফেলিয়া গিয়াছেন, নিধি সে কাগজটি কুড়াইয়া পাইয়াছে। সে কাগজটিতে গুটি দুয়েক কবিতা লিখা আছে, অন্য লোক হইলে সে কবিতাগুলির সরল অর্থটি বুঝিয়া পড়িত ও নিশ্চিন্ত থাকিত, কিন্তু বুদ্ধিমান নিধি সেরূপ লোকই নহে। যদিবা তাহার কোন গূঢ় অর্থ না থাকিত তথাপি নিধি তাহা বাহির করিতে পারিত। তবু ইহাতে ত কিছু ছিল! নিধির সে কবিতাগুলি বড় ভাল ঠেকিল না, ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল ও ভাবিল, ইহার নিগূঢ় তাহাকে জানিতে হইবে। অমন বুদ্ধিমান লোকের কাছে কিছুই ঢাকা থাকে না, ইঙ্গিতে সকলি বুঝিয়া লইল। চতুরতাভিমানী লোকেরা নিজ বুদ্ধির উপর অসন্দিগ্ধ রূপে নির্ভর করিয়া এক এক সময়ে যেমন সর্ব্বনাশ ঘটায়, এমন আর কেহই নহে।

"দিদি, কেমন আছ, দেখিতে আসিয়াছি" বলিয়া নিধি করুণার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। নিধি ছেলেবেলা হইতেই অনূপের অন্তঃপুরে যাইত ও করুণার মাকে মা বলিয়া ডাকিত। নিধি এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই করুণা কেমন আছে দেখিতে আইসে। একদিন নরেন্দ্র কলিকাতায় গিয়াছে; নরেন্দ্র কবে কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিবে, করুণা, স্বরূপ বাবুর নিকট ভবিকে জানিয়া আসিতে কহিল। নিধি আড়াল হইতে শুনিতে পাইল, মনে মনে কহিল "হুঁ হুঁ—বুঝিয়াছি, এত লোক থাকিতে স্বরূপ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিতে পাঠান কেন, গদাধর বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেও ত চলিত!" এক দিন করুণা ভবিকে কি কথা বলিতেছিল, দূর হইতে নিধি শুনিতে পাইল না, কিন্তু মনে হইল, করুণা যেন একবার "স্বরূপ বাবু" বলিয়াছিল, আর একটি প্রমাণ জুটিল। আর এক দিন নরেন্দ্র, স্বরূপ ও গদাধর বাগানে বসিয়াছিল, করুণা সহসা জানলা দিয়া সেই দিক পানে চাহিয়া গেল, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে, করুণা স্বরূপেরই দিকে চাহিয়াছিল, নিধি এইত তিনটি অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছে, ইহা অন্য লোকের নিকট যাহাই হউক কিন্তু নিধির নিকট ইহা সমস্তই পরিষ্কার প্রমাণ! শুদ্ধ ইহাই যথেষ্ট নহে, করুণা যে দিনে দিনে শীর্ণ, বিষণ্ণ, রুগ্ন হইয়া যাইতেছে, নিধি স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার কারণ আর কিছুই নয়,—স্বরূপের ভাবনা!

এখন স্বরূপের নিকট কথা আদায়

করিতে হইবে, এই ভাবিয়া নিধি ধীরে ধীরে তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। হঠাৎ গিয়া কহিল, "করুণা ত ভাই তোমার জন্য একেবারে পাগল!" স্বরূপ একেবারে চমকিয়া উঠিল, আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কি করিয়া জানিলে?' নিধি মনে মনে কহিল "হুঁ-হুঁ আমি তোমাদের ভিতরকার কথা কি করিয়া সন্ধান পাইলাম, ভাবিয়া ভয় পাইতেছ? পাইবে বৈ কি, কিন্তু নিধিরামের কাছে কিছুই এড়াইতে পায় না।" কহিল "জানিলাম, এক রকম করিয়া!" বলিয়া চোক টিপিতে টিপিতে চলিয়া গেল। তাহার পরদিন গিয়া আবার স্বরূপকে কহিল, "করুণার সহিত তুমি যে গোপনে গোপনে দেখা সাক্ষাৎ করিতেছ ইহা নরেন্দ্র যেন টের না পায়।" স্বরূপ কহিল"সেকি? করুণার সহিত একবারো ত আমার দেখা সাক্ষাৎ কথা বার্ত্তা হয় নাই!" নিধি মনে মনে কহিল "নিশ্চয় দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, নহিলে এত করিয়া ভাঁড়াইবার চেস্টা করিবে কেন?" ইহাও একটি প্রমাণ হইল, কিন্তু আবার স্বরূপ যদি বলিত যে "হাঁ দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল" তবে তাহাও একটি প্রমাণ হইত।

যাহা হউক্ নিধির মনে আর সন্দেহ রহিল না। এমন একটী নিগূঢ় বার্ত্তা নিধি আপনার বুদ্ধি-কৌশলে জানিতে পারিয়াছে, একথা কি সে আর গোপনে রাখে? তাহার বুদ্ধির পরিচয় লোকে না পাইলে আর হইল কি? "তুমি যাহা মনে করিতেছ তাহা নয়, আমি ভিতরকার কথা সকল জানি।" চতুরতাভিমানী লোকেরা ইহা বুঝাইতে পারিলে বড়ই সন্তুষ্ট হয়। নিধির কাছে যদি বল যে, "রামহরি বাবু বড় সৎলোক।" অমনি নিধি চমকিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিবে "কি বলিতেছ? কে সৎলোক? রামহরি বাবু? ওঃ—" এমন করিয়া বলিবে যে তুমি মনে করিবে, এবুঝি রামহরি বাবুর ভিতরকার কি একটা দোষ জানে। পীড়াপীড়ি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে কহিবে, "সে অনেক কথা!" নিধি সম্প্রতি যে গুপ্ত খবর পাইয়াছে তাহা পরামর্শ দিবার ছলে নরেন্দ্রকে বলিবে এইরূপ মনে মনে স্থির করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কয়দিন ধরিয়া ছোট ছেলেটির পীড়া হইয়াছে। তাহা হইবে নাতকি? কিছুরইত নিয়ম নাই, করুণা ডাক্তার ডাকাইয়া আনিল, ডাক্তার আসিয়া কহিল পীড়া শক্ত হইয়াছে। করুণা ত দিন রাত্রি তাহাকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল, পীড়া বাড়িতে লাগিল, করুণা কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইল, গ্রামের নেটিব ডাক্তার কপালীচরণ বাবু পীড়ার তত্বাবধান করিতেছেন, তাঁহাকে কি দিবার সময় তিনি কহিলেন থাক্, থাক্, পীড়া অগ্রে সারুক। পণ্ডিত মহাশয় বুঝিলেন, নরেন্দ্রদের দুরবস্থা শুনিয়া দয়ার্দ্র ডাক্তারটি ফি লইতে বুঝি রাজি নহেন। দুই বেলা তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিলেন, তিনিও অম্লান বদনে আসিলেন।

নরেন্দ্র এক্ষণে বাড়িতে নাই। ওপাড়ার পিতৃমাতৃহীন নাবালক জমিদারটি

সম্প্রতি সাবালক হইয়া উঠিয়া জমীদারী হাতে লইয়াছেন, নরেন্দ্র তাঁহাকেই পাইয়া বসিয়াছেন। তাঁহারি স্কন্ধে চাপিয়া নরেন্দ্র দিব্য আরামে আমোদ করিতেছেন এবং গদাধর ও স্বরূপকে তাঁহারি হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু গদাধর ও স্বরূপকে যে শীঘ্র তাঁহার স্কন্ধ হইতে নড়াইবেন, তাহার যো নাই; গদাধরের একটি উদ্দেশ্য আছে, স্বরূপেরও এক উদ্দেশ্য আছে।

ছেলেটির পীড়া অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার ডাকিতে একজন লোক পাঠান হইল। ডাক্তারটি তাহার হস্ত দিয়া, তাঁহার দুবেলার যাতায়াতের দরুণ যাহা পাওনা আছে সমস্ত হিসাব সমেত এক বিল পাঠাইয়া দিলেন। ছেলেটি অবশ হইয়া পড়িয়াছে, করুণা তাহাকে কোলে করিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আছে, সকল কর্ম্মে নিপুণ নিধি মাঝে মাঝে তাহার নাড়ি দেখিতেছে, কহিল নাড়ি অতিশয় ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। আকুল হৃদয়ে সকলই ডাক্তারের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে বিল লইয়া সেই লোকটি ফিরিয়া আসিল। সকলই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করিল ডাক্তার কই? সে সেই বিল হাজির করিল। সকলেই ত অবাক্। মুখ চোক শুকাইয়া পণ্ডিত মহাশয় ত ঘামিতে লাগিলেন, নিধির হাত ধরিয়া কহিলেন "এখন উপায় কি?" নিধি কহিল "টাকার যোগাড় করা হউক্।" সহসা টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে? এদিকে পীড়ার অবস্থা ভাল নহে, যত কাল বিলম্ব হয় ততই খারাপ হইবে, মহা গোলযোগ পড়িয়া গেল, করুণা বেচারী কাঁদিতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় বিব্রত হইয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন, হাতে যাহা কিছু ছিল আনিলেন। কাত্যায়নী ঠাকুরাণীটি টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় অনেক আপত্তি করিয়া ছিলেন, পণ্ডিত মহাশয় বিস্তর কাকুতি মিনতি করিয়া তবে টাকা বাহির করেন। ভবি তাহার শেষ সম্বল বাহির করিয়া দিল। অনেক কষ্টে অবশেষ ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রোগীর মুমূর্ষু অবস্থা। ডাক্তারটি অম্লান বদনে কহিলেন "ছেলে বাঁচিবে না।"

এমন সময় টলিতে টলিতে নরেন্দ্র ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ঘরে ঢুকিয়া ঘরে যে কিসের গোলমাল কিছুই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। কিছু ক্ষণ শূন্যনেত্রে পণ্ডিত মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিল, অবশেষে কি বিড় বিড় করিয়া বকিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিল, পণ্ডিত মহাশয়ও মহা গোলযোগে পড়িয়া গেলেন, ডাক্তার ছাড়াইতে গেলেন, তাঁহার হাতে এমন একটি কামড় দিল যে রক্ত পড়িতে লাগিল। এইরূপ গোলযোগ করিয়া সেই খানে শুইয়া পড়িল।

ক্রমে শিশুর মুখ নীল হইয়া আসিল। করুণা সমস্ত গোলমালে অর্দ্ধ হতজ্ঞান হইয়া বালিসে ঠেস দিয়া পড়িয়াছে। ক্রমে শিশুর মৃত্যু হইল, কিন্তু দুর্ব্বল করুণা তখন একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছে।

উদ্ভিদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উদ্ভিদগণ সজীব এবং প্রাণিগণের ন্যায় ইহাদেরও উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও বিনাশ হইয়া থাকে। সন্তান পরম্পরায় যেরূপ জীব সমূহের বংশ বৃদ্ধি হয়, ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির নিয়মও তদনুরূপ। কিন্তু প্রাণিশরীরে যেরূপ নিয়ত তাপানুভব হয় উহাদের শরীরে সেরূপ হয় না। উদ্ভিদগণের পার্শ্ববর্ত্তী জলবায়ুর তাপানুসারে ইহাদের শরীরে তাপ অনুভূত হইয়া থাকে। কেবল অঙ্কুরোৎপত্তি ও পুষ্পোদ্গমের সময়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। অর্থাৎ তখন ইহাদের তাপ পার্শ্ববর্ত্তী জলবায়ুর তাপাপেক্ষা অধিক হইয়া উঠে।

উদ্ভিদের জীবিত কাল।—কতক গুলি উদ্ভিদের জীবন-কাল নির্দ্দিষ্ট। অর্থাৎ একবার মাত্র পুষ্পোদ্গম হইলেই মরিয়া যায়। অপর কতকগুলির জীবন কাল অনির্দ্দিষ্ট; ইহারা যাবজ্জীবন ঋতু বিশেষে পুষ্পোৎপাদন করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত উদ্ভিদের মধ্যে এক বৎসর বা যে গুলি তদপেক্ষা অল্প কাল জীবিত থাকে তাহাদিগকে বার্ষিক বলে। যথা ছোলা, মটর, গম ইত্যাদি। যাহারা দুই বৎসর কাল জীবিত থাকে, তাহাদিগকে দ্বিবার্ষিক বলে, যেমন বাঁধা কপি, শালগম ইত্যাদি। আর যেগুলি বহু কাল পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধিত হইয়া পরিশেষে একবার মাত্র পুষ্পোৎপাদন করিয়া মরিয়া যায়, তাহাদিগকে পুষ্পঘাতক বলে, যথা বাঁশ, মানকচু ইত্যাদি। যে সকল উদ্ভিদের জীবন কাল নির্দ্দিষ্ট নাই, তাহাদিগকে বহুবার্ষিক বা স্থায়ী উদ্ভিদ বলে। এই শেষোক্ত উদ্ভিদের মধ্যে কতকগুলি তরু ও গুল্ম অপর গুলি কোমল কাণ্ড বলিয়া অভিহিত হয়। তরু গুল্মেরও শাখা ও কাণ্ড বর্ষে বর্ষে বর্দ্ধিত হয়, যেমন ওক্, হদর‍্ন্ ইত্যাদি। কিন্তু কোমল কাণ্ডের ভূমধ্যস্থ মূলসদৃশ কাণ্ড হইতে প্রতিবৎসর নূতন নূতন শাখা বা পত্র উৎপন্ন হইয়া আবার সেই বৎসরেই শুষ্ক হইয়া যায়। যথা ভুঁইচাঁপা, রজনীগন্ধ ইত্যাদি।

উদ্ভিদের স্থান বিশেষে অবস্থিতির নিয়ম।—অর্থাৎ উদ্ভিদের আবাস ভূমি। পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানেই উদ্ভিদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্র এক জাতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে ও আর্দ্র ভূমিতেই অধিক পরিমাণে বৃক্ষলতাদি উৎপন্ন হয়, কিন্তু যেখানে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব অথবা যেখানকার ভূমী অত্যন্ত নীরস সেখানে কোন প্রকার উদ্ভিদ প্রায় লক্ষিত হয় না। সেইরূপ হ্রদ অথবা সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশেও উদ্ভিদের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। এদিকে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ হইতে যতই শীত প্রধান দেশে যাওয়া যায় ততই বৃক্ষগণের

আকার খর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়। কেবল দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ও কালীফর্ণিয়া দেশে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। তথায় শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইলেও অতি বিশাল দুই প্রকার বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে। আবার কোন কোন শীতপ্রধান দেশস্থ সমুদ্রের শৈবাল, গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় সমুদ্রজাত শৈবাল অপেক্ষা অধিক বড় হয়। ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদ ব্যতীত গিরি-গহ্বরে স্থানে স্থানে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের দেহাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়, সেই সকল বৃক্ষ পৃথিবীতে আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। পূর্ব্বোক্ত দেহাবশেষের মধ্যে, যে গুলি অতি অল্প দিন তদবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে সুতরাং পর্ব্বতের নূতন স্তরে অবস্থিত, সে গুলির সহিত এক্ষণকার ভূপৃষ্ঠস্থিত বৃক্ষের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। আর যেগুলি অনেক দিন হইল তদবস্থাপন্ন হইয়াছে, তাহাদের সহিত বর্ত্তমান উদ্ভিদের সাদৃশ্য অতি অল্প। এমন কি কোন কোন স্থলে উহাদিগকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। ফলতঃ যে উদ্ভিদ যত প্রাচীন, বর্ত্তমান উদ্ভিদের সহিত তাহার ততই প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান ও প্রাচীন বৃক্ষে যতই প্রভেদ থাকুক না কেন উহাদের উৎপত্তি বৃদ্ধি ও বিনাশের নিয়ম এক। অর্থাৎ উভয়ই আলোক উত্তাপ ও জলের সাহায্য সাপেক্ষ।

উদ্ভিদের আকার নানাবিধ। তরু, গুল্ম, লতা, তৃণ প্রভৃতির যে ভিন্ন ভিন্ন আকার ইহা কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু ভূমণ্ডলে যত প্রকার উদ্ভিদ আছে তাহার সহিত তুলনা করিলে এই কয়েকটি নাম অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়। বর্ষাকালে ছাদ ও আলিশার উপর স্থানে স্থানে যে সকল কৃষ্ণ, হরিৎ ও শ্বেত বর্ণের পদার্থ জন্মিয়া থাকে তাহাও এক এক প্রকার উদ্ভিদ বিশেষ। এরূপ উদ্ভিদ শুদ্ধ ভারতবর্ষেই যে কত শত আছে তাহা বলা যায় না। এতদ্ভিন্ন আমাদের দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বা জলাশয়ে যে এক প্রকার পানা জন্মে তাহাও পূর্ব্বোক্ত উদ্ভিদের অন্যতর নিদর্শন। দূর হইতে ঐ সকল স্থান দেখিলে বোধ হয় যেন কোন হরিদ্বর্ণ আবরণে আবৃত রহিয়াছে। পুরাতন প্রাচীরে অথবা কোন জলমগ্ন কাষ্ঠের উপর যে ছ্যাত্‌লা পড়ে, ইহাও এক প্রকার শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ—প্রস্তরময় পর্ব্বত-প্রদেশে অথবা শক্ত মাটির উপর ক্রমাগত জল পড়িলেও ঐ রূপ উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে। বর্ষাকালে পুস্তক, চর্ম্মপাদুকা, অব্যবহৃত বস্ত্র, ও তণ্ডুলাদিতে যে এক প্রকার ছাতা ধরে, তাহাও উদ্ভিদ পদার্থ। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার উদ্ভিদ আছে যাহা বৃক্ষের স্থান বিশেষে উৎপন্ন হইয়া অচিরকাল মধ্যে উহাকে নষ্ট করিয়া ফেলে। কতক গুলি আবার গোল আলু, দ্রাক্ষা ও অন্যান্য ফলে উৎপন্ন হইয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য নষ্ট করে। এমন কি কখন কখন ইহারা, জীবের শরীর পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া থাকে।

উদ্ভিদ-শরীরের পোষণোপযোগী পদার্থ। উদ্ভিদগণের জীবন রক্ষার্থ জল,

বায়ু, তাপ, আলোক ও আর কতকগুলি পার্থিব পদার্থ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুই একটি স্থলে উহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশে তুষার-রঞ্জন নামে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক প্রকার লোহিত বর্ণের উদ্ভিদ জন্মিয়া থাকে, তদ্দ্বারা ঐ সকল স্থানের বরফ রক্তবর্ণ দেখায়। এতদ্ভিন্ন আর এক জাতীয় উদ্ভিদ নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারেও উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার উদ্ভিদ ব্যতীত অপর কোন উদ্ভিদই—তাপ ও আলোকের অভাবে সতেজ ও জীবিত থাকিতে পারে না।

উদ্ভিদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উপযোগিতা বা শ্রম-বিভাগ। জীবদ্দশায় উদ্ভিদগণের ভিন্ন ভিন্ন অংশ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সাধিত হয়। কোন কোন অংশ উহাদের শরীর পোষণ ও জীবন রক্ষার উপযোগী। কোন কোন অংশ হইতে বীজ উৎপন্ন ও সেই বীজ হইতে বৃক্ষান্তর জন্মিয়া থাকে। উল্লিখিত অংশগুলিকে উদ্ভিদের অঙ্গ বলে।

পুষ্পদ উদ্ভিদের চারিটি প্রধান অঙ্গ মূল, কাণ্ড, পত্র ও পুষ্প। ১ম—মূল, উহা দ্বারা বৃক্ষ ভূমিতে দৃঢ় রূপে সংলগ্ন থাকে। অর্থাৎ বল প্রয়োগ ব্যতীত কোনরূপে স্থানচ্যুত হয় না। মৃত্তিকা হইতে শরীর পোষণ জন্য রস গ্রহণ করা ইহার আর একটি কার্য্য। ২য়—কাণ্ড, ইহা শাখা, কোরক, পত্র, পুষ্প ও ফলের আধার স্বরূপ। ৩য়—পত্র, আলোক সমাহরণ ইহার কার্য্য। এই নিমিত্ত পত্রের এক পিঠ নিয়ত সূর্য্যাভিমুখে থাকে। ৪র্থ পুষ্প, ইহা কতকগুলি অঙ্গের সমষ্টি মাত্র। ইহার কিয়দংশ ফল রূপে পরিণত হয় এবং ঐ ফলে বীজ থাকে।

পূর্ব্বোক্ত অঙ্গ দ্বারা যে সকল ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় তাহাকে উহার কার্য্য বলে। এই সকল কার্য্য মধ্যে পোষণ ও বীজোৎপাদনই প্রধান।

মূল ও পত্র দ্বারাই পুষ্পপ্রসূ উদ্ভিদের ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। প্রাণিগণের ন্যায় ইহাদের আহার গ্রহণোপযোগী পৃথক পাকস্থলী বা পুষ্টিকর রস সঞ্চালনের জন্য স্বতন্ত্র কোন হৃদয় বা শিরা নাই এবং শরীর হইতে অসার ও অব্যবহৃত অংশ বহিষ্কৃত করিবার জন্যও কোন পথ দৃষ্ট হয় না।

উদ্ভিদের পোষণ সামগ্রী তরল ও বায়বীয় পদার্থ ভিন্ন অপর কোন কঠিন ও নীরস দ্রব্য দ্বারা উদ্ভিদগণের শরীর পোষণ হয় না। মূল দ্বারা যে জল বা রস আকৃষ্ট হয় তাহাতে বায়বীয় ও খনিজ উভয়বিধ পদার্থই মিশ্রিত থাকে। এই রস ক্রমশঃ ঊর্দ্ধগামী হইয়া পত্রেতে আনীত হয়। পত্রগুলিও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বায়ু হইতে আঙ্গারিক অম্ল গ্রহণ করে। এই পত্রস্থ আঙ্গারিক অম্ল ও জলের উপর আলোক পতিত হওয়াতে তন্মধ্যে যে এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে নির্য্যাস বলে। এই নির্য্যাস সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া উদ্ভিদের শরীর পোষণে নিয়োজিত হয়।

মূলাকৃষ্ট জলের অনাবশ্যক ভাগ পত্র হইতে বাষ্পাকারে নির্গত হয়। এইরূপে

প্রতিনিয়ত বাষ্পোদ্গম হওয়াতে পত্রগুলির শীতলতা রক্ষিত হইয়া থাকে।* পত্রাভ্যন্তরস্থ নির্যাস এবং মূল দ্বারা আকৃষ্ট যে তরল মিশ্র পদার্থ বৃক্ষের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া থাকে, তাহা হইতে শ্বেত সারাত্মক এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। ইহা উদ্ভিদ-শরীরের পুষ্টি সাধনে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এবং উহা হইতেই বৃক্ষাভ্যন্তরে ধূনা, শর্করা, তৈল, মোম ও নানাবিধ বর্ণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

উদ্ভিদের উৎপত্তির নিয়ম। ইহা দ্বিবিধ।—বীজ ও অঙ্কুর। ইহাদের মধ্যে বীজই প্রধান। দুইটি পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের পরস্পর সংযোগ দ্বারা ঐ বীজ উৎপন্ন হয়। এই বীজ ও তদুপরিস্থ বীজাবরণের সাধারণ নাম ফল। অঙ্কুর সকল উদ্ভিদের নানা স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। যথা পত্র ও কাণ্ডের সংযোগ-স্থল বা গ্রন্থিতে। যেমন ওল ও বিলাতি আলুর মৃত্তিকা-নিহিত কন্দ।

কতকগুলি উদ্ভিদ আবার কৃত্রিম উপায় দ্বারা উৎপাদিত হয়। যেমন গোলাব ও করবী ফুলের ডাল মূলবৃক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া আর্দ্র ভূমিতে পুতিলে উহা হইতে অঙ্কুর ও শিকড় বাহির হয় এবং কালক্রমে উহাই একটি স্বতন্ত্র বৃক্ষ হইয়া উঠে। আম্রের যোড়-কলমও এই কৃত্রিম উপায়ের আর একটি উদাহরণ-স্থল।

উদ্ভিদ তন্তু। একখানি প্রস্তর ভাঙ্গিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ করিলে ধূলিকণার ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন একাকারে কতগুলি পদার্থ নয়নগোচর হয়। উদ্ভিদ্ ছেদন করিয়া ঐ রূপে নিরীক্ষণ করিলে সেরূপ লক্ষিত হয় না। বরং তৎপরিবর্ত্তে কতক গুলি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অণ্ডাকৃতি পদার্থ পরস্পর সংসক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে কোষ বলে। এতদ্ভিন্ন নলের ন্যায় আর এক প্রকার পদার্থও পূর্ব্ববৎ পরস্পর সংলগ্ন থাকে। এই গুলিকে দীর্ঘ কোষ বা শিরা কহে। কিন্তু শেষোক্ত শিরাগুলি প্রথমোক্ত কোষের উপর্য্যুপরি বিন্যাস বশতই সেরূপ দীর্ঘাকার হয়।

উদ্ভিদের অন্তর্ব্বর্ত্তী রাসায়ণিক উপাদান। প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদ-শরীরে অপরাপর বস্তু অপেক্ষা জলের ভাগই অধিক। উদ্ভিদ-তন্তুতে জলের মূলীভূত রূঢ় পদার্থ অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু ও লঘু-বায়ু ভিন্ন অঙ্গার ও নাইট্রোজেন (ক্ষারভূ) নামক আর দুইটি রূঢ় পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শেষোক্ত পদার্থ, সকল স্থানে লক্ষিত হয় না। কিন্তু উদ্ভিদ-তন্তু মাত্রেই যে অঙ্গার আছে, কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া দেখিলেই তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইতে পারে। বৃক্ষে যে জলের ভাগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার অধিকাংশই মূল দ্বারা বৃক্ষাভ্যন্তরে নীত হয়। উদ্ভিদগণ পত্র দ্বারা বায়ুমণ্ডলের আঙ্গারিক অম্ল হইতে অঙ্গার এবং মূল দ্বারা মৃত্তিকা-অংশভূত শোরা বা নিশাদল হইতে জলবৎ ক্ষারভূ অর্থাৎ নাইট্রোজেন বায়ু গ্রহণ করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অধিকাংশ উদ্ভিদের মধ্যে যে দুই একটি খনিজ পদার্থ লক্ষিত হয় তাহাও জলবৎ অবস্থায় মূল দ্বারা আকৃষ্ট হয়।

উদ্ভিদের বল্কল ও পত্র প্রভৃতির কোষ সমূহে যে এক প্রকার বর্ণক পদার্থ আছে তাহার গুণেই বৃক্ষ লতাদির বর্ণ হরিৎ হয়। সেই বর্ণক পদার্থকে পত্রহরিৎ বা হরিতায়ক বলে। সূর্য্যালোক-প্রভাবেই উক্ত পদার্থ হরিদ্বর্ণ দেখায়। এই নিমিত্ত যে সকল উদ্ভিদ অন্ধকারে উৎপন্ন হয় তাহাদের বর্ণ কখনই হরিৎ হয় না। এই জন্যই মৃত্তিকা-নিহিত মূল সকল শ্বেতবর্ণ হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত হরিৎ পদার্থ, কোষগুলির অভ্যন্তরে থাকে। ঐ কোষের পার্শ্বদেশ কাঁচের ন্যায় স্বচ্ছ; ঐ স্বচ্ছ প্রদেশ হইতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় বলিয়া অধিকাংশ বৃক্ষের পত্র চিক্কণ ও উজ্জ্বল দেখায়।

উদ্ভিদগণের শ্রেণীবিভাগ। আমরা চতুর্দ্দিকে যে সকল উদ্ভিদ দেখিতে পাই তাহারা পরস্পর নিতান্ত বিসদৃশ বা নিঃসম্পর্ক নহে। প্রত্যুত উহাদের মধ্যে কতকগুলির সহিত অপর কতকগুলির এরূপ সৌসাদৃশ্য আছে যে তাহাদিগকে এক জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু এক জাতীয় বলিয়া তাহারা পরস্পর সম্পূর্ণ সমান নহে। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে একজাতীয় বা একশ্রেণীভুক্ত দুইটি বৃক্ষের মধ্যেও প্রভেদ লক্ষিত হয়। এই নিমিত্ত উদ্ভিদ্‌বেত্তারা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া উদ্ভিদকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।

উদ্ভিদগণ প্রথমতঃ দুইটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। পুষ্পপ্রসূ ও পুষ্পহীন। এই দুই শ্রেণীর পরস্পর প্রভেদ অত্যন্ত গুরুতর। পুষ্পপ্রসূ উদ্ভিদ জাতির যে সকল লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট আছে তন্মধ্যে পুষ্পই সর্ব্বপ্রধান। এই পুষ্প হইতেই বীজ উৎপন্ন হয় এবং এই বীজ মধ্যে ভাবী উদ্ভিদের অঙ্কুর, ভ্রূণের ন্যায় অবস্থিতি করে। পুষ্পহীন বৃক্ষে এই দুয়ের কিছুই নাই। সুতরাং ইহাদের পুষ্পে বীজও লক্ষিত হয় না। কিন্তু বীজের পরিবর্ত্তে ইহাদের মধ্যে এক প্রকার সূক্ষ্ম রেণু আছে তাহাই পরিবর্দ্ধিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হয়। পুষ্পহীন যথা—শুষনির শাক ও পানা।

জীবগণ প্রতিনিয়ত নিশ্বাস দ্বারা যে বায়ু দূষিত করে, উদ্ভিদগণ সেই বায়ু সংশোধিত করিয়া পুনরায় জীবের প্রশ্বাস-যোগ্য করিয়া থাকে। আবার অধিকাংশ প্রাণীর উদ্ভিদ বা উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রধান আহার ও আশ্রয়-স্থান। এতদ্ভিন্ন ভূপৃষ্ঠে বৃক্ষ লতাদি থাকাতেই দিবাভাগে তদুপরি অধিক সূর্য্যোত্তাপ লাগিতে পায় না এবং রাত্রিকালেও পৃথিবী সহসা শীতল হয় না। বৃক্ষ লতাদির দ্বারা তাপোদ্গমের ব্যাঘাত হয় বলিয়াই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এদিকে বৃক্ষ লতাদি থাকাতেই ভূপতিত বৃষ্টির জল বাষ্পাকারে শীঘ্র শীঘ্র উপরে উঠিতে পায় না। পরিশেষে এই উদ্ভিদ হইতে মানবগণ নানাবিধ ঔষধ ও শিল্প কার্য্যের উপকরণ সামগ্রী ও রন্ধনার্থ যাবদীয় কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ঋ—

স্বাস্থ্য।

মাতৃস্তন্য-পান-কালের সীমা। প্রকৃতি স্বয়ং এই বিষয় দেখাইয়া দেন। কারণ সন্তান নয় মাসের হইলেই মাতৃ-স্তন নরম হইয়া ঝুলিয়া পড়ে। এদিকে মাসিক ঋতুও দেখা দেয়। এবং সন্তানের দাঁত উঠিতে থাকে। এজন্য স্তন্যপানেরও ব্যাঘাত জন্মে। অতএব নবম মাস পর্য্যন্ত মাই দেওয়াই প্রকৃতির নিয়ম। ইহার অতিরিক্ত হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। অনেকে মাথাঘোরা পৃষ্ঠে বেদনা প্রভৃতি দুর্ব্বলতার চিহ্ন দেখিয়া ইহার পূর্ব্ব হইতেই স্তন দেওয়া বন্ধ করেন। কিন্তু এরূপ সাবধানতা প্রায় ধনবানের গৃহেই লক্ষিত হয়। অধিকাংশ স্ত্রীলোক দুর্ব্বলতার লক্ষণ দেখিয়াও কখন এক বৎসর কখন বা দুই বৎসর পর্য্যন্ত স্তনপান করাইয়া থাকেন ও পরিশেষে যন্ত্রণার পরাকাষ্ঠা ভোগ করেন।

নয় মাসের মধ্যে মাতা পুনরায় গর্ভবতী হইলে, তদ্দণ্ডেই অমনি স্তনপান বন্ধ করিতে হয়, ইহা না করিলে গর্ভস্থ বালকের হানি হইতে পারে।

প্রসবের পর ছয় মাসের মধ্যে মাতা ঋতুমতী হইলেই স্তন পান বন্ধ করার তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। তবে সন্তানকে মধ্যে মধ্যে গাভি-দুগ্ধ দিলে ভাল হয়, কারণ রক্তস্রাবের নিমিত্ত তৎকালে স্তনদুগ্ধের পুষ্টিকারিতার হানি হইয়া থাকে। ঐ সময় মাতারও পুষ্টিকর দ্রব্য খাওয়া উচিত। বেশী দুর্ব্বল বুঝিলে বলকর ঔষধ সেবন করা কর্ত্তব্য।

মাই ছাড়াইবার নিয়ম। হঠাৎ সন্তানকে মাই দেওয়া বন্ধ করা উচিত নহে। করিলে মাতা ও সন্তান উভয়েরই অসুখ হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং ক্রমে ক্রমে বন্ধ করিলেই ভাল হয়।

বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে প্রসবের ছয় মাস পরে মাই ছাড়াইতে আরম্ভ করিতে হয় এবং নয় মাস পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে ঐ চেষ্টায় থাকিতে হয়। প্রথমে দিবসের মধ্যে একবার কমাইতে হয়, পরে দুইবার, এইরূপ ক্রমে ক্রমে বন্ধ করিতে হয়। তৎকালে স্তনদুগ্ধের পরিবর্ত্তে সন্তানকে মধ্যে মধ্যে গাভিদুগ্ধ খাওয়াইতে হয়।

যখন সন্তান দিনান্তে একবার বই আর স্তন পান করে না, তখন এককালে মাই ছাড়ান অতিশয় সহজ হইয়া উঠে। কারণ এই কালের মধ্যে সন্তানের গাভিদুগ্ধ খাওয়া একরূপ অভ্যাস পায়।

সন্তানের কঠিন দ্রব্য আহারের সময় নির্দ্ধারণ।—দুই চারিটি দাঁত না উঠিলে সন্তানকে কখন শক্ত জিনিশ খাইতে দেওয়া উচিত নহে। ঐ সময়ে আবশ্যক হইলে মধ্যে মধ্যে শীতল জলও দেওয়া যাইতে পারে। শক্ত দ্রব্যের মধ্যে রুটি ও সুরস ও সুপক্ক ফল খাইলে কোন অপকার

হয় না। দুগ্ধ দিবসে দুইবার ও রাত্রিতে একবার মাত্র খাইলেই যথেষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাকে আলুসিদ্ধ একটু মিষ্টান্ন অথবা বিস্কুট দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ সতর্ক হইয়া সন্তানকে লালন পালন করিতে পারিলে এবং ক্ষুধার্ত্ত বুঝিয়া খাইতে দিলে. তাহার কখনই পেটের অসুখ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

দোলায় চড়াইয়া ঘুম পাড়াইবার বিষময় ফল। বিলাতে কোন সময়ে শৈশব মৃত্যুর সংখ্যা অধিক বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া কয়েক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক উহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন যে দোলাইয়া ঘুম পাড়ান শৈশব-মৃত্যুর একটি প্রধান কারণ। দোলায় রাখিয়া দোল দিলে, সন্তানের মস্তক ঘুরিতে থাকে ও তজ্জন্য মোহ উপস্থিত হওয়াতে সে ঘুমাইয়া পড়ে। কিন্তু তাহার নিদ্রা গাঢ়তর হয় না। সে মধ্যে মধ্যে স্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠে ও কাঁদিতে থাকে। তখন পুনরায় উহাকে দোল দিতে হয়। দোল দিলেই আবার ঘুমাইয়া পড়ে। এই রূপে পুনঃ পুনঃ দোল খায় ও ঘুমায়। ইহাতে বালকের শরীর সুস্থ হওয়া দূরে থাকুক বরং অধিকতর কাতর হইয়া পড়ে। কৌমারাবস্থায় বালকের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত কোমল, সেই জন্য পুনঃ পুনঃ দোল দিলে তাহার সর্ব্বদা বমনেচ্ছা বা বমন হয়; এমন কি কখন কখন ঐ কারণে মস্তিষ্কের প্রদাহ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। আর যদি দুলিতে দুলিতে কোন স্থানে ধাক্কা লাগে তাহা হইলে মস্তিষ্ক গুরুতররূপেই আহত হয়।

ভোজনের পর পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকেও দোলায় চড়াইয়া দোল দিলে তাহার ভয়ানক অসুখ করে। ইহা জানিয়াও অনেক জননী ক্রোড়স্থ শিশুসন্তানকে দুধ খাওয়াইয়া ঘুম পাড়াইবার জন্য স্নেহভরে তাহাকে ঘন ঘন দোলাইতে থাকেন। কিন্তু ইহাতে যে সন্তানের শরীর সম্বন্ধে বিশেষ হানি হইতে পারে তাহা স্বপ্নেও ভাবিয়া দেখেন না।

বালকগণের দোল খাওয়া একবার অভ্যাস হইলে, সে দিনের বেলায় সর্ব্বদা কোলে থাকিতে চাহে, সুতরাং তাহাকে নিয়ত একজন বুকে বা হাতে করিয়া বেড়াইতে না পারিলে সে কাঁদিয়া অস্থির হয়। যখন কোলে থাকিয়াও সুস্থির না হয় তখন মাতা বা দাসী তাহার পৃষ্ঠ বা পাছা চাপড়াইয়া সান্ত্বনা করেন কিন্তু এরূপ করাতে সন্তানের জননেন্দ্রিয় অকালে অতিশয় উত্তেজিত হয়, ও তজ্জন্য পরিণামে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে আর একটি কুপ্রথা এই যে, সন্তানকে আদর দিবার জন্য স্ত্রীলোকেরা তাহার জননেন্দ্রিয় চুম্বন বা স্পর্শ করে কিন্তু ইহাতে ভবিষ্যতে সন্তানের যে কতদূর অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা তাহা কেহই বুঝেন না। অতএব এই সকল বিষয়ে মাতার বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

ঘুম পাড়াইবার জন্য দুগ্ধের সহিত সন্তানকে পুনঃ পুনঃ কোন মাদক দ্রব্য দেওয়া অনুচিত। ইহাতে হঠাৎ বালকের

মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা। মৃত্যু না ঘটিলেও পুনঃ পুনঃ মাদক দ্রব্য সেবন করাতে সন্তানের বুদ্ধির দোষ ঘটিতে পারে।

প্রসবের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত সন্তান মাতার কাছেই শুইয়া থাকে। কিন্তু কিছু বয়োবৃদ্ধি হইলে উহাকে দিবারাত্র নিকটে রাখা উচিত নহে। এরূপ করিলে মাতৃশরীরের দূষিত বায়ুস্পর্শে সন্তানের স্বাস্থ্যের হানি হয়। নিয়ত মাতার সঙ্গে একত্র শয়ন করার আর এক দোষ এই যে, সন্তান একাকী নিদ্রা যাইতে পারে না। এজন্য মাতার ঘুম না পাইলেও ছেলের জন্য অসময়ে শয়ন করিতে হয়।

এতদ্ভিন্ন সন্তানের অসুখ করিলে সে একটি বারও মায়ের কাছ-ছাড়া হইতে চাহে না। এই কারণ বশত জননীর অসুবিধার একশেষ হয়।

নিতান্ত শৈশবাবস্থায় অতিবৃদ্ধ স্ত্রীলোক বা পুরুষের নিকট সন্তানকে ঘুমাইতে দেওয়া ভাল নহে। ইহাতে বালকের জীবনী শক্তির হানি হয় এবং সে দিন দিন শীর্ণ ও দুর্ব্বল হইতে থাকে।

শয়নের জন্য সন্তানকে হয় চুলের মাদুর নয় এদেশীয় কাটির মাদুর দিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। ইহার উপর ছোট ছোট দুই খানি চাদর বা এক খানি কাঁতা পাড়িতে হয়। বালিশও ঘোড়ার চুলের হইলে ভাল হয়। কিন্তু উহা ২ ইঞ্চের অধিক উচ্চ না হয়। বালিসের খোলটি চামড়ার হইলেই ভাল কিন্তু ওয়াড় কাপড়ের হইবে। এতদ্ভিন্ন শরীর ঢাকিয়া রাখিবার জন্য শীতকালে ফ্লানেলের চাদর অথবা সরু লেপ এবং গ্রীষ্ম কালে সুতি চাদর বা সূক্ষ্ম কাঁথার আবশ্যক হইয়া থাকে। আর যাহাতে শিশুর শয্যা সর্ব্বদা শুষ্ক থাকে তাহার উপায় বিধান করা উচিত।

ধনী লোকের মধ্যে কেহ কেহ মনে করেন যে সন্তানের বিছানা যত কোমল হয় ততই ভাল। এই ভাবিয়া কেহ নরম গদি কেহবা পালঙ্কের তোষকের উপর সন্তানকে শয়ন করাইয়া কৃতকৃতার্থ হন। কিন্তু ইহাতে সন্তানের হিতে বিপরীত হয়। কারণ নরম বিছানায় সর্ব্বদা শয়ন করাতে শিশুর অতিশয় ঘর্ম্ম হয়, ও তজ্জন্য তাহার শরীর ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে থাকে। এতদ্ভিন্ন তাহার মেরুদণ্ড কোমল শয্যার উপর সমভাবে না থাকাতে পৃষ্ঠদেশ বক্র হইয়া পড়ে। এই জন্যই বালকের শয্যা যাহাতে সর্ব্বত্র কঠিন ও সমতল হয় তাহা করা উচিত। তাহা হইলে শরীরের কোমল স্থান নতোন্নত হইবার আশঙ্কা থাকে না। এবং প্রথম হইতে এই রূপ শয্যায় শয়ন করা অভ্যাস হইলে মনুষ্যের কোন কালে আর কোমল শয্যার প্রয়োজন হয় না। এমন কি বিপাকে পড়িয়া যদি কখন কাহাকে কাঠের উপর বা মাটিতে শয়ন করিতে হয়, তাহা হইলেও সে সুখে নিদ্রা যাইতে পারে।

মাছি ও মশা নিবারণের জন্য একটি টাপা বা ছেলে-ঢাকা কিনিয়া দেওয়া উচিত। নতুবা অনেক সময় উহাদের দৌরাত্ম্যে সন্তানের ঘুমের ব্যাঘাত হয়।

নিদ্রাবস্থায় সন্তানকে উত্তর কি দক্ষিণ শিওরি করিয়া শোয়ানই ব্যবস্থা। পূর্ব্ব কি পশ্চিম হইয়া শয়ন করিলে স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ হানি হইবার সম্ভাবনা। ব্যারামের সময় আবার এই নিয়মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলা আবশ্যক।

য—

ভানুসিংহের কবিতা।

রাগিণী মল্লার।—

বাদর বরখন, নীরদ গরজন,
দামিনী চমকন ঘোর,
উপেখই কৈছে, (১) আও তু কুঞ্জে
নিতি নিতি মাধব মোর!
(২) ঐছন কুঞ্জে,] ন আসিও তুহু,
মিনতি করত অভাগী,
মাধব কাহেতু পাওব দুখরে,
দুখিনী হমার লাগি?
ঘন ঘন চপলা, চমকয় যব পঁহু, (৩)
বজর নাদ যব হোয়,
তুঁহুক বাত তব, সমরই (৪) মাধব
ডর অতি লাগত মোর!
গাত্র-বসন তব, ভীঁখত (৫) মাধব,
ঘন ঘন বরখত মেহ,
ক্ষুদ্র বালি (৬) হম, হমকো লাগয়
কাহে উপেখবি দেহ?
কত জ্বালা দুখ, সহলি শ্যাম তুঁহু,
হমার পীরিত লাগি,
সহলিরে গঞ্জন, দেশ বিদেশে
ভইলিরে কলঙ্কভাগী!
যাও যাও পহু, মথুরানগরে
মিটবে সব সুখ-আশ।

(১) কৈছে—কিরূপে (২) ঐছন—ঐরূপ
(৩) পহু—প্রভু (৪) সমরই—স্মরণ করিয়া
(৫) ভীঁখত—ভিজিছে (৬) বালি—বালিকা

জনম জনম তুঁহু, সিংহাসনপরি
করহ সুখে পহু বাস।
দূরদেশ রহি, লোক মুখে হম
শুনইব তুঝ যশ গান,
দূরদেশ রহি, মহিমা শুনি তব
ধন্য মানইব প্রাণ!
সভয়ে কাঁপবে কত শত রাজা
শুনই তোঁহারই নাম।
(১ পেখই তোঁহারে কত শত মানুখ,
সম্ভ্রমে করবে প্রণাম।
তব্ পহু কাহে, হমারই লাগয়
ছোড়ই মথুরা ধাম,
গোপ সাথ অব বাস করো তুঁহু,
করহ কলঙ্কিত নাম।
(২) বিসরো মাধব গোপিনী জনকো,
বিসরো ময়কো শ্যাম,
বিসরো মাধব, প্রেমলীলা সব,
সুখ-বৃন্দাবন ধাম।
যাক প্রাণ মম, শ্যাম তোঁহারই
বিরহক বিখময় (৩) বাণে;
তবহুঁ একলক্ষ, তব নামে পহু
সঁপইব কোন পরাণে?
কহত ভানু অব, প্রেমসিন্ধু পহু,
মাধব হমার বালা,
তোঁহার লাগয়, প্রেমক লাগয়
সব কছু সহবে জ্বালা!

(১) পেখই—দেখিয়া (২) বিসরো—বিস্মৃত হও
(৩) বিখময়—বিষময়

বঙ্গসাহিত্য।

গতবারে আমরা বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস প্রভৃতি বঙ্গীয় আদি কবি-কুলের মাহাত্মাই কীর্ত্তন করিয়াছি। আমাদের মত সমর্থন করিবার জন্য আমরা এবার তাঁহাদের মধ্যে প্রধান চারিটি কবির ঈষৎ উদ্ঘাটিত ভাণ্ডার হইতে চারিটি কবিতা পাঠক-সমাজে উপহার দিতেছি—

রাগিণী—কামোদ।

সজনি! ভাল করি পেখিল না ভেল।
মেঘ মাল সঙ্গে, তড়িত লতা জনু,
হৃদয়ে শেল দেই গেল।
আধ আচর খসি, আধ বদনে হাসি,
আধহি নয়না তরঙ্গ,
আধ উরজ হেরি, আধ আচর ভরি,
তব ধরি দগধে অনঙ্গ।
একে তনু গোরা, কনক কটোরা,
অতনুকা চলা উপাম,
মরি মরি দহে মন, জনু বুঝি ঐছন,
ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকতা পাঁতি, অধরু মিলায়ত,
মৃদুমৃদু কহতহিঁ ভাষা
বিদ্যাপতি কহ, অতয়ে সে দুঃখ রহ,
হেরি না পূরল আশা॥

রাগিণী—তুড়ি।

সোই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ।
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদনে ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নামে, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে॥
নাম পরতাপে যার, ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়।
যেখানে বসতি তার, নয়ানে দেখিয়া গো,
যুবতি ধরম কৈছে রয়।
পাশরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব কি হবে উপায়।
কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে; কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচয়।

রাগিণী—ভূপালী।

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।
তহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল ?।
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার।
ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে জরি যাত।
দশ দিশ দামিনি দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন ভার।
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।
গোবিন্দ দাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে যতন নিবার।

রাগিণী—ধানসী।

সুখের লাগিয়া, এ ঘর বান্ধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া সাগরে, সিনান করিতে,
সকলি গরল ভেল।
সখি হে কি মোর করমে লিখি।
শীতল বলিয়া, ও চান্দ সেবিনু,
রবির কিরণ দেখি।
নিচল ছাড়িয়া, উঠল উঠিতে,
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমি চাহিতে, দারিদ্র্য বেঢ়ল,
মাণিক হারানু হেলে।
পিয়াস লাগিয়া, জলদ সেবিনু,
বজর পড়িয়া গেল।
জ্ঞানদাসে কহে, কানুর পিরিতি,
মরণ অধিক শেল।

রাগিণী—তুড়ি।

কি পেখিনু যমুনার তীরে।
কালিয়া বরণ এক, মানুষ আকার গো,
বিকাইনু তাঁর আঁখির ঠারে।
নিতি নিতি আসি যাই, হেন কভু দেখি নাই,
কি খেনে দেখিনু আজ তারে।
গুরুয়া গরব কুল, নাশাইল কুলবতী,
কলঙ্ক চলিয়া আগে ফিরে।
কামের কামান জিনি, ভুরুর ভঙ্গিমা গো,
হিঙ্গুলে বেড়িয়া ছুটি আঁখি।
কালিয়া নয়ান বাণ, মরমে হানিল গো,
কালাময় আমি সব দেখি।
চিকণ কালার রূপে, আকুল করিল গো,
ধরণে না যায় মোর হিয়া।
কত চান্দ নিঙ্গাড়িয়া, মুখানি মাজিল গো,
যদু কহে কত সুধা দিয়া।

এইখানেই আমরা উপহার শেষ করিলাম, কেন না চৈতন্যদেবের সাময়িক কবিদের গগনভেদী সংকীর্ত্তন-শব্দে আমরা এতদূর অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছি যে, পাঠকের সহিত যতক্ষণ আমরা সেই সমারোহ-ক্ষেত্রে না পৌঁছিতেছি ততক্ষণ যেন আমাদের নির্জ্জীব ভাব তিরোহিত হইতেছে না। কোথায় বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের ঘুমন্ত স্বপ্নলহরী, আর কোথায় চৈতন্য-সহচরদের জাগ্রত উদ্দীপনাময় কীর্ত্তন-কোলাহল! কোথায় প্রেমের রোমাঞ্চকর আবেশ প্রমোদ, আর কোথায় ভক্তির উচ্ছ্বাসময় কাব্য কলাপ! বসন্তকালের সায়ংকালে একটি মহাপ্রান্তরে বিচরণ করিতেছি,—মলয় পবনের মৃদুল হিল্লোলে শরীর মন যেন ঢলিয়া পড়িতেছে, কোকিল পাপীয়ার সুর-লহরীতে হৃদয় যেন মোহে অভিভূত হইতেছে, এমন সময় সহসা গ্রামে আসিয়া উপনীত,—গ্রামে আজ বারোয়ারী পূজার মহাধূম, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যেন অদ্ভুত উৎসবে, অদ্ভুত উৎসাহে, অদ্ভুত উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া জীবনের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম তরঙ্গকে পর্ব্বতাকারে পরিণত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে! আমরা সেই স্বপ্নের উপচ্ছায়ারূপ প্রান্তর ছাড়াইয়া এখন নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছি; উৎসবময়, উৎসাহময়, কোলাহলময় নবদ্বীপে আসিয়া পৌঁছিয়াছি,—চৈতন্য দেবের মহিমা-ক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, আমরাও সংক্রা-

মক উৎসাহে উৎসাহান্বিত হইয়া পড়িয়াছি।

আমরা এখন বঙ্গদেশের যে সময়ে আসিয়া পড়িয়াছি, এরূপ সময় বঙ্গদেশে আর কখনই উদয় হয় নাই। যীশুখৃষ্ট জন্মাইবার ১৬০০ বৎসর পরে চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাবে ধর্ম্মসংস্করণ-স্রোতে দিগ্‌বিদিক আলোড়িত হইয়া উঠিল, এবং তাঁহার সহচরেরা তদীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিবার জন্য সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা গ্রন্থে দেশ ছাইয়া ফেলিল। "ঐ সময়েই তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি দুর্ব্বিগাহ ধীষণা-শক্তি সহকারে ন্যায়শাস্ত্রের নূতন রূপ পন্থা আবিষ্কৃত করেন, এবং ঐ সময়েই স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাপাণ্ডিত্য সহকারে তৎকাল-প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থাসকল বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব নামক অভিনব প্রকার স্মৃতিসংগ্রহ প্রচার করেন।" ইহাও একটি চমৎকার ব্যাপার যে, যে সময়ে বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়,সেই সময়েই ইউরোপে লুথরের আবির্ভাব। এবং যে সময়ে ইউরোপও ধর্ম্মবিপ্লবে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই সময়ে বঙ্গদেশও ধর্ম্মবিপ্লবে তোলপাড় হইতেছিল। উভয় ধর্ম্মবিপ্লবের গতিও এক প্রকার,ওদিকে লুথর খৃস্টধর্ম্ম হইতে কেথলিকদিগের আড়ম্বরময় ক্রিয়াকাণ্ড সকল ছাঁটিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এদিকে চৈতন্যদেবও বৈষ্ণবধর্ম্মের সারাংশটুকু ছাঁকিয়া লইয়া ও শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অর্থান্তর করিয়া শ্রীকৃষ্ণের দেবমাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। উভয় স্থানেই আবালবৃদ্ধ বনিতাকে নূতন মতে দীক্ষিত করিবার জন্য ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রচার হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা ও প্রচার-প্রণালী স্থির প্রতিষ্ঠ হইল। "তন্মধ্যে রূপ গোস্বামি-প্রণীত রাগময় কোষ, সনাতন গোস্বামি-প্রণীত রসময় কলিকা, জীব গোস্বামি-রচিত কড়চাই, বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্য-ভাগবত, লোচনকৃত চৈতন্যমঙ্গল ও কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত সমধিক প্রসিদ্ধ।" যদিও এই সময় বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনা বহুল হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু এই সময়ের গ্রন্থসমূহ পূর্ব্বতন আদি কবিদের রচনা অপেক্ষা অনেক বিষয়ে নিকৃষ্টতর। বিদ্যাপতি চণ্ডিদাসের রচনার সহিত চৈতন্য দেবের সাময়িক কোন কবির রচনা পাশাপাশি রাখিলেই তাহা অনায়াসে প্রতিপন্ন হইবেক।

রাই জাগো, রাই জাগো, শুকসারী বলে,
কত নিদ্রা যাও কাল, মাণিকের কোলে।
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরুণ কিরণ দেখি প্রাণ কাঁপে ডরে।
সারী বলে শুক তুমি গগনে উড়ে ডাক'
নব জলধর আনি অরুণেরে ঢাক'॥
বিদ্যাপতি কহে চাঁদ গেল নিজ ঠাঁই।
অরুণ কিরণ হবে উঠি ঘরে যাই"

—বিদ্যাপতি।

কাহারে কহিব দুঃখ, কে বুঝে অন্তর,
যাহারে মরম কহি সে বাসয়ে পর
আপনা বলিতে বুঝি নাহিক সংসারে,

এত দিনে বুঝিলাম ভাবিয়া অন্তরে,
মনের মরম কহি যুড়াবার তরে
দ্বিগুণ আগুণ সেই জ্বালি দেয় মোরে,
এতদিনে বুঝিলাম মনেতে ভাবিয়া,
এতিন ভুবনে নাহি আপনা বলিয়া,
এদেশে না রব একা যাব দূর দেশে,
সেই সে যুকতি কহে দ্বিজ চণ্ডিদাসে ॥"

—চণ্ডিদাস।

"প্রভুর সন্ন্যাস শুনি শচী জগন্মাতা,
হেন দুঃখ জন্মিল না জানি আছে কোথা,
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ক্ষণে পৃথিবীতে
নিরবধি ধারা পড়ে না পারে রাখিতে।
বসিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন
কহিতে লাগিল শচী করিয়া ক্রন্দন,
না যাইহ আরে বাপ মায়েরে ছাড়িয়া,
পাপিনী আছে যে সবে তোর মুখ দেখিয়া।"
(বৃন্দাবন দাসকৃত চৈতন্য ভাগবত।)

"শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নবদ্বীপে অবতরী,
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহারী,
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ,
চৌদ্দশত পঞ্চান্নে হৈলা অন্তর্দ্ধান,"
(কৃষ্ণদাস কবিরাজকৃত চৈতন্য চরিতামৃত।)

কিন্তু চৈতন্য দেবের সাময়িক কবিদের উৎকর্ষ অপকর্ষ যাহাই হউক না কেন, এইটি স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহাদিগকে আদর্শ করিয়া বঙ্গভাষায় কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কবিকঙ্কণের চণ্ডী প্রভৃতি প্রণীত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রভাব ভবিষ্যৎ কবিদের কাব্যতে যতদূর লক্ষিত হয় এতদূর আর বিদ্যাপতি বা চণ্ডিদাসের প্রভাব লক্ষিত হয় না। বিদ্যাপতি প্রভৃতি বসন্তকোকিলদের তানলয় বসন্তের সঙ্গে সঙ্গেই বিলীন হইয়া গেল, কিন্তু তাহাদের পরবর্ত্তী কবিদের ধরণধারণ অনেক দিন পর্য্যন্ত বঙ্গ কবিদের অনুকরণস্থল হইয়া রহিল!

চ—

সম্পাদকের বৈঠক।

ছিট্‌ওয়ালা সিভিলিয়ান। কটকে একটি সিবিলিয়ান সাহেব ছিলেন, তিনি বিলক্ষণ ছিট্‌ওয়ালা। তিনি একবার গবর্ণমেণ্টে কোন পত্র পাঠাইবার সময় সেই পত্রের যেখানে "আপনার বশম্বদ ভৃত্য" লেখা ছিল তাহার পরে আপনার নাম স্বাক্ষর না করিয়া তথায় আপনার প্রতিমূর্ত্তিটি আঁকিয়া দিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট সেই পত্র পাইয়া অবাক্। কিন্তু লেফ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর হইতে সামান্য সিবিলিয়ান পর্য্যন্ত সকলে ভাই ভাই। উৎকট ভর্ৎসনা ব্যতীত তাঁহার আর কোন দণ্ড হইল না।

হিজলি কাঁথীতে একজন সিবিলিয়ান ছিলেন। তিনি নিজ দৃষ্টান্ত দ্বারা ডার্‌ইনের মত যেমন প্রমাণিত করিয়াছিলেন

এমন আর কেহ নহে। সাহেবটী বিলক্ষণ বৃক্ষপ্রিয় ছিলেন। সর্ব্বদা গাছে বসিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। ছিটওয়ালা সাহেবের গল্প করিতে করিতে আমাদিগের একটি ছিটওয়ালা বাঙ্গালীর গল্প মনে পড়িল। কোন ছিটওয়ালা লোক একবার এক জনের বাটীতে অতিথি হইয়াছিলেন। রাত্রিতে গৃহস্থ তাঁহার মশারি খাটাইয়া দিয়াছিল। তিনি কিয়ৎক্ষণ মশারির ভিতর থাকিয়া হঠাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া প্রাঙ্গণে লাফাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সহিত সেই গৃহে যাহারা শয়ন করিয়াছিল, দৈবাৎ তাহার মধ্যে একজন সেই সময় জাগ্রত ছিল। তিনি লম্ফের শব্দ শুনিয়া এবং অতিথিকে অনেকক্ষণ গৃহ মধ্যে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া তাঁহার কি হইল দেখিবার জন্য প্রাঙ্গণে আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন অতিথি প্রাঙ্গণে নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন কি জন্য তিনি গৃহের বাহিরে আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। অতিথি উত্তর করিলেন একে ভববন্ধন, তাহাতে গৃহবন্ধন, তাহাতে আবার মশারিবন্ধন, ইহা আমার সহ্য হইল না, এই জন্য আমি এখানে আসিয়াছি। সাহেবটীর গৃহবন্ধন বোধ হয় ভাল লাগিত না, এই জন্য তিনি সর্ব্বদা গাছে থাকিতে ভাল বাসিতেন। গাছে থাকিলে যেমন অনাবৃত বায়ু সেবন হইতে পারে, তেমন আর ঘরের ভিতরে থাকিলে হয় না। সাহেব এরূপ বৃক্ষপ্রিয় ছিলেন যে বৃক্ষে বসিয়া কাছারী পর্য্যন্ত করিতেন ও আমলারা আঁকুসী দ্বারা গাছে নথী তুলিয়া দিত।

বাঁকুড়া জেলায় একজন সিভিলিয়ান সাহেব ছিলেন। ইহাঁর ছিট, ছিটমান যন্ত্রের উনপঞ্চাশ সংখ্যার অধিক ছিল। কিন্তু তিনি যে এরূপ গাঢ় ছিটওয়ালা ছিলেন তাহা প্রথমে কেহ অনুভব করিতে পারে নাই। ইনি তথায় জজের কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। ইনি বিবাহ করেন নাই। প্রথমে জিলায় আসিয়া থাকিবার জন্য স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া না করিয়া এসিস্‌টেণ্ট মাজিষ্ট্রেটের বাঙ্গালার বারাণ্ডার কিয়দংশ চাঁচ দিয়া ঘিরিয়া সেই খানে থাকিতেন। এবিষয়ে তাঁহার সিবিলিয়ান ভ্রাতাদিগের নিষেধ বাক্য কিছুই শ্রবণ করিতেন না। প্রথমে লোকে তাঁহার ছিট্ আছে ইহা অনুভব করিতে পারে নাই, মনে করিত যে অত্যন্ত কৃপণতা বশতঃ এইরূপ করিয়া থাকেন। কিছু দিন পরে তিনি স্বতন্ত্র একটী বাটী ভাড়া করিয়া দুইটী ব্যাঘ্র শাবক ক্রয় করিয়া পুষিলেন। ক্রমে তাহারা এমনি পোষ মানিল যে তিনি তাহাদিগের দ্বারা আপনার গাড়ী টানাইতেন। তখনও লোকে তাঁহার ছিটের অস্তিত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হয় নাই। লোকে মনে করিত যে বাহাদুরী দেখাইবার জন্য তিনি এই রূপ করিতেন। কিন্তু তাহার পর এমন এক কাজ করিলেন যাহাতে এক বারে প্রমাণ হইল যে তাঁহার ছিট ছিটমান যন্ত্রের উনপঞ্চাশ সংখ্যা অপেক্ষাও অধিক। তিনি একদিন তাঁহার অধীনস্থ মনসেফের বাসায় গিয়া বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের

অলঙ্কার দেখিতে চাহিলেন। মুনসেফ্ মনে করিলেন যে, সাহেব কৌতূহল বশতঃ তাহা দেখিতে চাহিয়াছেন। তিনি বাটীর ভিতর হইতে আপনার স্ত্রীর অলঙ্কার আনাইয়া দিলেন। সাহেব সেই অলঙ্কার আপনার নিকট কিছুদিন রাখিবার মানস প্রকাশ করিলেন। মুন্সেফ তাহাতে সম্মত হইলেন। পরদিন সাহেব, বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের বেশ ধরিয়া এবং নথ চন্দ্রহারাদি বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের অলঙ্কার পরিয়া কাছারি করিতে আইলেন। এই ঘটনার সংবাদ তৎক্ষণাৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট পৌঁছিল, কমিশন বসিল, সাহেবকে পেনসন দিয়া বিদায় করা হইল।

আর একজন ছিটওয়ালা সিবিলিয়ান সাহেব ছিলেন। তাঁহার কাছারির কর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিরাগ ছিল। তিনি মেদিনীপুরে তখন এসিসটেণ্ট মাজিস্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। একদিন অনেক ক্ষণ কাছারীতে না আসাতে আমলাগণ কাগজ স্বাক্ষর করাইবার জন্য তাঁহার বাটীতে গেল,দেখিল সাহেব তথায় নাই। তাহার পর সাহেবকে তাহারা চারিদিকে খুঁজিতে লাগিল। দেখিল তিনি অন্য কোন সাহেবের বাটীতে নাই। সহরের প্রান্তে একটী পুরাতন পরিত্যক্ত বাঙ্গালা ছিল, সেখানে তিনি আমলাদিগের হাত এড়াইবার জন্য লুকাইয়া বসিয়া আছেন। এই মহাত্মা একবার জিলার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের পরীক্ষকের পদে লোকাল কমিটি দ্বারা নিযুক্ত হওয়াতে তিনি নিয়োগপত্রের লেফাফার উপর এই কথাগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন।

Composition is vexation,
Translation as bad,
The Rule of Three puzzles me,
And Practice drives me mad.

যখন তিনি কলিকাতার অতি নিকট একটী জেলাতে জয়েণ্ট মেজিস্ট্রেটের কার্য্য করিতেন তখন একদিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁহার উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার সেরেস্তাদার সেই সুযোগে অনেক দিনের মুলতুবি কতকগুলি কাগজ তাঁহার স্বাক্ষর জন্য তাঁহার সম্মুখে ধরিল। সাহেব তাহা স্বাক্ষর করিবার জন্য কলমও হস্তে লইলেন। সেরেস্তাদার মনে করিল সাহেব এইবার স্বাক্ষর করিবেন এবং তন্নিবন্ধন হৃষ্টচিত্ত হইল, এমন সময়ে অকস্মাৎ সাহেব সেরেস্তাদারের কানের গোড়ায় আপনার মুখ আনিয়া মহা জোরে টূঁ করিলেন। এই আকস্মিক শব্দ প্রয়োগে সেরেস্তাদারের একপ্রকার ভেবাচাকা লাগিয়া গেল এবং কাগজ, দোয়াত, কলম, সকলই তাঁহার হাত থেকে পড়িয়া গেল। সাহেব সেরেস্তাদার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যেমন গাম্ভীর্য্যের সহিত কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উদ্যান পরিভ্রমণ করিতেছিলেন সেইরূপ গাম্ভীর্য্যের সহিত পুনরায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সাহেব যখন ঐ জেলায় ছিলেন তখন কোন ব্যক্তি একদিন তাঁহার ঘরে গিয়া দেখেন যে, সাহেবের সম্মুখস্থিত টেবিলের উপর যে সকল সরকারী কাগজ

ছিল তাহা কাঠের বা শীষার কাগজ-চাপা দিয়া চাপিয়া না রাখিয়া কুকুরের ছানা দিয়া চাপিয়া রাখিয়াছেন। কুকুরের ছানা তাহার উপর নিদ্রিত হইয়া নিস্পন্দভাবে কাগজ-চাপার কর্ম্ম করিতেছে!—ব

ঘোড়া খোসামুদে নয়।—মণ্টেন্ এই কথা বলিতেন যে রাজপুত্রেরা কোন বিদ্যায় পারক হইতে পারে না। যেহেতু শিক্ষকেরা প্রায় তাঁহাদের খোষামোদ করিয়া থাকেন! কেবল ঘোড়াচড়া বিদ্যায় তাঁহারা পারক হইতে পারেন। যেহেতু ঘোড়া চাটুকার নহে। সে যেমন এক সামান্য মনুষ্যের ছেলেকে ফেলিয়া দেয়, তেমনি রাজার ছেলেকেও ফেলিয়া দেয়।

প্রকৃত বদান্যতা।—বেথ্লিহেম চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ জন্য চাঁদা হইতেছিল এবং চাঁদা-সংগ্রহকারেরা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাটীতে চাঁদার জন্য উপস্থিত হইলেন। বাটীর দ্বার সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ ছিল না। বাটী প্রবেশের পূর্ব্বে তাঁহারা শুনিলেন—এক দু-মুখো দেশলায়ের কেবল একটি দিক ব্যবহার করিয়া তাহা ফেলিয়া দেওয়াতে সেই বৃদ্ধ মনুষ্য আপনার দাসীকে ভর্ৎসনা করিতেছে। কিয়ৎক্ষণ এই ঝগ্ড়ার আমোদ উপভোগ করিয়া চাঁদা সংগ্রহকারেরা বাটীর ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক গৃহস্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দাতব্য প্রার্থনা করিলেন। বৃদ্ধটি তৎক্ষণাৎ সিন্দুক খুলিয়া ৪০০ গিনি প্রদান করিলেন। চাঁদা সংগ্রহকারেরা দরজায় দাঁড়াইয়া যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা বৃদ্ধকে অবগত করাইলেন এবং এত টাকা দান করাতে আশ্চর্য্য প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন—"গৃহস্থালী এবং পরিমিত-ব্যয়িতার প্রতি আমার অতিশয় অনুরাগ, সেই অনুরাগ আমি এই রূপে চরিতার্থ করিয়া থাকি। কিন্তু দাতব্যের হিসাব স্বতন্ত্র। যাহারা পরিমিতব্যয়ী ও আপনার ব্যয়ের হিসাব রাখে, তাঁহাদিগের নিকট হইতে অধিক দাতব্য প্রত্যাশা করিও।"

অর্থহীন প্রশ্নের অর্থহীন উত্তর।—ডাক্তার র‍্যাড্‌ক্লিফ্‌কে এক জন রোগী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে অপরিমিত আহার-জনিত রোগ কিম্বা অপরিমিত পান-জনিত রোগ—এই দুই রোগের মধ্যে কোন্ রোগকে আরোগ্য করা অধিক কঠিন?—ডাক্তার উত্তর করিলেন যে, মদের পিপে কিম্বা গরু এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টিকে মনুষ্য শরীর হইতে নিষ্কাসিত করা অধিক কঠিন—ইহা বিবেচনা করিলে তুমি আপনা আপনি তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে।

টাকার বিনিময়ে গান।—ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্‌সিস্ স্বীয় প্রজাদিগের নিকট হইতে অধিক কর লইতেন। তাঁহার পরিজনেরা এক দিন তাঁহাকে বলিল যে লোকে এই জন্য তাঁহার নামে গান বাঁধিতেছে। তিনি উত্তর করিলেন—টাকার বিনিময়ে একটা গান বাঁধিতেও দিব না? আমাদের ইংরাজ রাজপুরুষেরা যদি ফ্রান্‌সিস্ রাজার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিতেন তাহা হইলে বড় সুখের হইত। তাঁহারা যদি বলিতে পারিতেন—"ভারতবর্ষ হইতে

আমাদের কত লভা হইতেছে, তাহার বিনিময়ে ভারতবর্ষবাসীদিগকে কি একটু মন খুলিয়া কাঁদিতেও দিব না?"—তাহা হইলে তাঁহাদের কেমন উদারতা প্রকাশ পাইত!

এক জনের স্কন্ধে অন্যের মাথা ঠিক্ লাগে না। ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেন্‌রি, ফ্রান্‌সের রাজা প্রথম ফ্রান্‌সিস্‌কে কোন অসন্তোষকর কথা বলিবার জন্য সর্ টমাস্ মুরকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। প্রথম ফ্রান্‌সিস্ অত্যন্ত কোপন-স্বভাব ছিলেন। ঐ প্রকার কোপন-স্বভাব রাজাকে নিতান্ত অতুষ্টিকর কথা বলিলে পাছে তাঁহার শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা দেন, সর্‌টমাস্ মুর এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করাতে অষ্টম হেন্‌রি বলিলেন যে, তোমার প্রতি এরূপ ব্যবহার করিলে লণ্ডনে যত ফরাসিস্ আছে আমি তাহাদের শিরশ্ছেদন করিব—সার টমাস মুর উত্তর করিলেন "মহারাজ এরূপ অনুগ্রহ বাক্য জন্য আমি আপনার নিকট যথেষ্ট বাধিত হইলাম কিন্তু আমার সন্দেহ হইতেছে যে সেই সকল ফরাসিস্‌দের মধ্যে কাহারও মাথা ঠিক্ আমার স্কন্ধে মানান হইবে কি না!"—

রোম-তীর্থযাত্রী।—সম্প্রতি যে সকল রোমান কাথলিক রোম নগরীতে তীর্থ যাত্রা করিতে গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে একটী ফরাসিস স্ত্রী ছিলেন তাহার তীর্থ যাত্রার বিবরণ এক ইটালীয় বার্ত্তাবহে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা এই;—স্ত্রীলোকটী অনেক দিন হইতে এক ভয়ানক পদ-রোগে আক্রান্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছিলেন—এমন কি, প্রধান প্রধান চিকিৎসকেরা পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, ক্ষত পা খানি কাটিয়া ফেলাই তাঁহার জীবন রক্ষার একমাত্র উপায়। তিনি তাঁহার জনৈক মিত্রের অনুরোধে একটি মাত্র ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় রহিলেন, সে ঔষধি পোপের পরিত্যক্ত এক খানি পুরাতন মোজা পরিধান করা। মোজা তাঁহার মিত্রের নিকটে ছিল ও স্ত্রীলোকটি তাহা অব্যর্থ ঔষধ মনে করিয়া তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে কৃত-নিশ্চয় হইলেন। এই মোজা পরিবার কতক দিন পরে তিনি আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন যে তিনি স্বচ্ছন্দে চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারেন, তাঁহার পায়ের পীড়ার চিহ্ন মাত্রও নাই। তিনি মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে এই পীড়া হইতে মুক্ত হইলেই রোম-যাত্রায় বাহির হইবেন, এইক্ষণে শীঘ্রই এই ব্রত রক্ষায় তৎপর হইলেন। পোপের সম্মুখে উপনীত হইয়া স্ত্রীলোকটি কৃতজ্ঞভাবে পোপদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন যে আপনার আশীর্ব্বাদে আপনার পরিত্যক্ত মোজা পরিয়া যে ভয়ানক পীড়ার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছি তজ্জন্য আমি কি প্রকারে আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব জানি না। পোপ তাঁহার সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া উত্তর করিলেন "তুমি বড়ই ভাগ্যবতী, আমার একটী মোজার গুণে তুমি আরোগ্য লাভ করিলে ও তোমার

রুগ্নপদ পূর্ব্ববৎ সুস্থ হইল। আমার দুঃখের কথা কি বলিব—আমি প্রত্যহ দুই মোজা পরিধান করিয়া থাকি তথাপি আমি চলৎ-শক্তি হীন—এমন কি উঠিয়া দাঁড়াইতেও পারি না ও চাকা-যুক্ত চৌকীতে বসিয়া আমাকে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে হয়!

ফিজি দ্বীপবাসী ও ইংরাজি আইন।

ফিজি দ্বীপের অসভ্য লোকদের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও আইনের প্রভাব কত দূর ফলোপধায়ী তাহা নিম্ন-লিখিত ঘটনাতে প্রকাশ পাইতেছে। চারি বৎসর পূর্ব্বে ফিজিদ্বীপ পুঞ্জের পশ্চিমস্থিত ওয়াইয়া নামক দ্বীপে রাবুসো ইয়োনি নামে তত্রস্থ জনপদের সরদার বাস করিতেন। সেই সময়ে ইংরাজ রাজ্য,ইংরাজি রীতি নীতি, আইন আদালৎ, তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল অভুতপূর্ব্ব ব্যাপার ফিজি-বাসীদের সহজে বোধগম্য হইবার নহে, ইহা বলা বাহুল্য। রাবুসো এই নূতন নাত্তা-নি-তু—(রাজ্য প্রণালী). অল্পই বুঝিতেন ও তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া দেশের পূর্ব্বকার রীতি অনুসারেই কার্য্য চালাইতেন। ওয়াইয়ার নামা এক যুবক, রমণীগণের অতি প্রিয়পাত্র ছিল। সে যে কেবল অবিবাহিত স্ত্রীলোকের মনোচোর হইয়াই ক্ষান্ত থাকিবে তাহা নহে কিন্তু পরদার-সেবাতেও বিলক্ষণ তৎপর ছিল। ফিজিবাসীগণ স্ত্রৈণ বলিয়া প্রখ্যাত। ক্রোধান্ধ স্বামীগণ তাহাদের সরদারের নিকট আসিয়া যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল। শ্রেষ্ঠী তাঁহার বৃদ্ধ মন্ত্রীগণের সহিত পরামর্শ করিয়া যুবকের উপর 'বুটুবাকা' দণ্ড-বিধান সাব্যস্ত করিলেন। ইহা ফিজীয়-দিগের চিরাভ্যস্ত শাসন-প্রণালী। তাহা এই—দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে ধরাশায়ী করিয়া সে যতক্ষণ পর্য্যন্ত অচেতন বা মুমূর্ষু হইয়া পড়ে ততক্ষণ তাহার উপরে সকলে মিলিয়া লম্ফ ঝম্প দিতে ও নৃত্য করিতে থাকে। এই 'বুটুবাক' দণ্ড বিধিপূর্ব্বক সমাধা হইলে তিন সপ্তাহ পরে যুবকের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল।

রাবুসো ধৃত হইল ও বিচারের পূর্ব্বে সোমো সোমো নামক স্থানে এক বন্দী-শালায় বন্দীকৃত হইল। রাবুসো ত এ সকল ব্যাপারের কিছুই অর্থ খুঁজিয়া পাইলেন না ও মনে করিলেন—এ বন্ধন-যন্ত্রণা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল। একদিন তাঁহার কারারক্ষকদের অনুমতি লইয়া একটু চলিয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। তাহারা তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়া এক বৃক্ষতলে গিয়া সকলে উপবেশন করিল। সরদার ফল পাড়িবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বৃক্ষের উপর আরোহণ করিলেন। সর্ব্বোচ্চ শাখার উপরে চড়িয়া তাঁহার রক্ষকদিগকে বলিয়া উঠিলেন—দেখ আমি বৃক্ষের উপর হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতেছি। বলিলেন তোমার শ্বেতাঙ্গ জজ্‌কে গিয়া বল যে আমি এখানকার সরদার। আমার বাপও সরদার ছিলেন। আমাকে চোরের ন্যায় কয়েদী করিয়া রাখিলে এ অপমান আমার সহ্য হয় না। যুবকের দণ্ড উপযুক্তই হই-

য়াছে, যেমন কর্ম্ম করিয়াছে তাহার ফল ফলিয়াছে। আমি সরদার, দেশের প্রথা অনুসারে তাহাকে শাসন করিবার অধিকার আমারই—এই বলিয়া তিনি বৃক্ষ হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠ দণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল ও অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হইল!

প্রাপ্ত গ্রন্থ।

১। বিশ্বদর্শন। প্রতি ঋতুতে প্রকাশ্য, সাময়িক পত্র ও সমালোচনা। শ্রী অমরেন্দ্র নাথ সোম কর্ত্তৃক সম্পাদিত—প্রথম সংখ্যা, গ্রীষ্মঋতু। ভবানীপুর হইতে প্রকাশিত। এই পত্র খানির সূচীপত্র দেখিয়া যতখানি আহ্লাদ হইয়াছিল প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া তত আহ্লাদ না হউক, আমরা ক্ষুব্ধ হই নাই স্বীকার করিতেছি। 'পতিতা কামিনী' শিরোনামা কবিতাটি দিব্য হইয়াছে এবং মণিপুরের বিবরণটি মন্দ হয় নাই। কিন্তু অর্থশূন্য শব্দাড়ম্বরময় 'অদ্ভুত পঞ্জিকা' ও উন্মত্ত প্রলাপময় 'কল্কীসংবাদ' আমাদের ভাল লাগিল না।

২। দুঃখসঙ্গিনী। গীতিকাব্য। ভারত যন্ত্রে শ্রী রামনৃসিংহ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

এই পুস্তকখানি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকার উচ্চদরের কবি না হউন, তাঁহার ভাবুকতা, লেখার প্রাঞ্জলতা ও পদ্যের লালিত্য প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে কবিতাখানির অনেক স্থলেই চর্ব্বিত চর্ব্বন এবং স্থানে স্থানে নিতান্ত দূষনীয় ভাব ও শব্দের ঘোরঘটা দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থল গুলি আমাদের ভাল লাগিয়াছে তাহা স্থানাভাবে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না বলিয়া ক্ষোভ রহিল।

৩। নলিনী ভূষণ নাটক। শ্রীপ্যারীলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা। এই নাটক খানিতে স্থানে স্থানে যে অমিত্রাক্ষর কবিতা আছে তাহা আমাদের ভাল লাগিল। প্যারীলাল বাবু নাটক লিখিবার চেষ্টা না করিয়া যদি কবিতা লিখেন তাহা হইলে অধিকতর সফলমনোরথ হইবেন আমাদের এই বিশ্বাস। এই নাটকখানিতে ইতর লোকের কথাবার্ত্তাগুলি সুন্দররূপে অনুকরণ করা হইয়াছে। আর একটি সুখের বিষয়, নাটকখানিতে স্বদেশবাৎসল্য জাজ্বল্যমান রহিয়াছে—কিন্তু একস্থলে নলিনী জাফরখাঁকে এক খণ্ড কাচের দ্বারা হত করিতে যাওয়ায় হাস্যজনক হইয়া পড়িয়াছে। কোন বাঙ্গালী-বীরত্বের বিদ্রূপকারী নলিনীর মুখের এইকথা গুলি বসাইতে পারেন—(বেঁটাইয়ার পরিবর্ত্তে) "কাচাইয়া দিব ওই পাষণ্ড যবনে!"

৩। প্রতিমাবিসর্জ্জন। বিয়োগান্ত নাটক। বিপিনবিহারী রায় দ্বারা ভিক্টোরিয়া যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র। ইহাতে এমন কিছুই নাই যাহার সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকারকে আমরা পরিতুষ্ট করিতে পারি। অধিক কথা বলিতে গেলে আমরা দোষের ভাগী ও হইব গ্রন্থকার ক্ষোভের ভাগী হইবেন মাত্র।

সূচীপত্র।

ভারতী

বোম্বাই রায়ৎ।

রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের বিশেষ গুণ এই যে ইহা ত্রিশ বৎসর কাল গবর্ণমেণ্টের উপর বন্ধনকারী—সেই কালের মধ্যে গবর্ণমেণ্ট খাজানা বৃদ্ধি করিতেও পারেন না ও খাজানা দিতে ত্রুটি না করিলে রায়ৎকে স্থানান্তরিত করিতেও পারেন না অথচ তাহা রায়তের উপর বন্ধনকারী নহে। রায়ৎ ইচ্ছা করিলে ফসলী সালের প্রারম্ভে তাহার উপভোগ্য জমির সম্পূর্ণ অথবা এক ক্ষেত্রের অন্যূন কিয়দ্ভাগ পরিত্যাগ করিতে পারে এবং অন্যান্য অনধিকৃত ক্ষেত্র আবাদের জন্য গ্রহণ করিতে পারে। এ নিয়ম রায়তের পক্ষে সামান্য হিতকরী নহে। এই বন্দবস্তে ত্রিশ বৎসর ইজারার যে লাভ তাহা সম্পূর্ণ রায়তের অথচ তন্নিবন্ধন দায়িত্ব হইতে সে মুক্ত। তাহাতে তাহার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই, কেননা ক্ষতির সম্ভাবনা দেখিলে নিজ স্বত্ব ছাড়িয়া দিবার তাহার কোন বাধা নাই। ছাড়িতে হইলে তাহার হস্তস্থিত সমস্ত ভূমি ছাড়িয়া দিতে হইবে তাহাও নহে—সে আপন ইচ্ছামত আপনার শক্তি-অনুসারে অল্প কিম্বা অধিক ভূমিখণ্ড রাখিয়া অবশিষ্ট ভাগে ইস্তফা দিয়া তাহার খাজানার দায় হইতে মুক্ত হইতে পারে। মনে কর, এক জন রায়তের দশটি ক্ষেত্র আছে, তাহার সমুদায়ে ১৫০ টাকা ও প্রত্যেকের জন্য ১৫ টাকা করিয়া খাজানা দিতে হয়। মনে কর, তাহার অবস্থা সচ্ছল—হাতে কিছু টাকা আসিয়াছে ও সেই টাকা দিয়া তাহার জমির স্থায়ী উন্নতি সাধনে সে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে—যথা, তাহার ভূমির এক ভাগে জলসেকের জন্য কুয়া খনন করা। এক্ষণে বিবেচনা কর, যদি তাহার সমগ্র ভূমির জন্য বৎসর বৎসর তাহাকে ১৫০ টাকা করিয়া খাজানা দিতে হয় তাহাতে তাহার সুবিধা অথবা যদি তাহার প্রত্যেক ক্ষেত্রের জন্য পৃথক্ খাজানা ১৫ টাকা নিরূপিত হয় ও সে তাহার যত গুলি ইচ্ছা রাখিতে ও ছাড়িয়া দিতে পারে তাহা হইলে তাহার সুবিধা হয়? পূর্ব্বোক্ত প্রকার নিয়ম হইলে হয়ত কোন আপদ বিপদে সে অত টাকা দিয়া উঠিতে অক্ষম হইতে পারে ও যে টাকা সে ভূমির উৎকর্ষ সাধনে ব্যয় করিয়াছে, ভূমির সঙ্গে সঙ্গে সে টাকাও তাহার নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। শেষোক্ত

প্রকার নিয়মে তাহার অবস্থা বুঝিয়া কতকগুলি ক্ষেত্র সে ইচ্ছামত ছাড়িয়া দিতে ও তন্নিবন্ধন খাজানার দায় হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয়। আর যে সকল ক্ষেত্র অধিক মূল্যবান্ ও যাহার উৎকর্ষ সাধনে তাহার অর্থব্যয় হইয়াছে তাহা রক্ষা করিতেও কৃতকার্য্য হইতে পারে। উল্লিখিত প্রকার দুই নিয়মের মধ্যে যে নিয়ম রায়তের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক, যাহাতে জমির উন্নতি সাধনের জন্য অর্থব্যয়ে তাহার অধিক প্রবৃত্তি জন্মে—অধিক সাহসের সঞ্চার হয়, সেই নিয়মটিই এই রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের অন্তর্গত। এদিকে ত্রিশ বৎসর অন্তর বন্দবস্ত পরিবর্ত্ত করিবার নিয়ম থাকাতে সরকারী খাজানার কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই। খাজানা দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তৎসমুদায়ই রায়তের ভোগ্য—জমির উপস্বত্বভাগী জমিদার কি পত্তনীদার আসিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতে পারে না। রায়ৎ তাহার নিজ স্বত্বের উপর সম্পূর্ণ অধিকারী—গবর্ণমেণ্টের খাজানা দিবার ব্যতিক্রম না ঘটিলে কেহই তাহাকে সে স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ তাহার সত্বে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ। রায়তের দেয় খাজনা নিয়মিত সময়ে গ্রহণ করা ভিন্ন তাহারা আর কিছুই করিতে পারে না। এই সময়ে খাজানার টাকা লইয়া প্রস্তুত থাকিলে রায়ৎ নিজের জমি আবাদ করিয়াছে কি না—ফসল ভাল কি মন্দ হইয়াছে—এসকল বিষয়ের তদারক করিবার কোন আবশ্যক নাই। নূতন বন্দবস্ত করিবার নিয়ম এই যে, রায়ৎ নিজ যত্ন ও পরিশ্রমে যাহা কিছু উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা বিচারস্থলে আনীত না হইয়া অন্যান্য কারণে জমি ও ফসলের মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া খাজানার হার নিরূপিত হইবে। রায়তের লাভের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া খাজানা বৃদ্ধি করিলে সে ভুমি কর্ষণ হইতে বিরত হইবে সুতরাং তাহাতে গবর্ণমেণ্টকেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। রায়ৎ অযথাবিধ খাজানা বৃদ্ধির আশঙ্কা না রাখিয়া ইচ্ছামত ভূমির উৎকর্ষ সাধনে তৎপর থাকিতে পারে। অতএব কে না স্বীকার করিবে যে রায়তওয়ারী বন্দবস্তে সরকারী খাজানা আদায়ের যেমন সুবিধা, তেমনি তাহা আবাদ কার্য্যের উন্নতি ও কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের নিদানভূত।

রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তে নিম্নলিখিত চারিটি প্রধান নিয়ম দৃষ্ট হইবে।

(১) প্রত্যেক রায়তের সহিত গবর্ণমেণ্টের পৃথক্ বন্দবস্ত।

(২) ত্রিশ বৎসর, কি অন্য কোন নিয়মিত কালের জন্য ইজারা দান—সেই ইজারার অন্তর্গত সমুদয় অথবা কিয়দংশ ভূমি রায়ৎ ইচ্ছামত বৎসরের শেষে ছাড়িয়া দিতে পারে কিন্তু খাজানা দিবার ক্রটি না হইলে গবর্ণমেণ্টের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই।

(৩) রায়ৎ নিজস্ব ইজারা বিক্রয় কিম্বা বন্ধক দ্বারা হস্তান্তরিত করিবার সম্পূর্ণ অধিকারী।

(৪) নিয়মিত কাল অতীত হইলে রায়তের স্বকৃত উন্নতি সাধনের উপর লক্ষ্য করিয়া খাজানার হার বৃদ্ধি হইবার নহে।

যে সকল রায়তের নিকট হইতে নিয়মিত সরকারী খাজানা গৃহীত হয় তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে—গতকুলী অথবা উপরী ও মিরাসদার। উপরী রায়তেরা রায়ৎওয়ারী বন্দবস্ত হইতে যাহা কিছু স্বত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তদ্ভিন্ন ভূমির উপর তাহাদের কোন স্থায়ী স্বত্ব নাই। কিন্তু মিরাসদার পূর্ব্ব হইতেই জমীর প্রকৃত মালিক রূপে পরিগণিত। তাহাদের স্বত্ব বংশপরম্পরাগত ও বিক্রয়ের পাত্র ও নিয়মিত খাজানা দিতে পারিলে তাহারা তাহাদের ভূমি হইতে পরিচ্যুত হইতে পারে না। মিরাস-স্বত্ব এরূপ প্রবল যে মিরাসদার যদি তাহার ভূমি ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যায় ত যখনি ফিরিয়া আসিয়া নিজ ভূমি প্রতিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবে তখনি তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে। এক্ষণে কেবল তামাদি বিষয়ক আইন প্রচলিত হইয়া তাহার সেই অধিকারের কিঞ্চিৎ খর্ব্বতা ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা দৃষ্ট হইবে যে জরীপি বন্দবস্তে উপরী রায়ৎদের প্রতি যে সকল অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে ফলে তাহাদের ও মিরাসদারদের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই—এই মাত্র প্রভেদ যে উপরী রায়ৎ একবার তাহাদের জমি ছাড়িয়া দিলে তাহা প্রতিগ্রহণের দাওয়া করিতে পারে না। মহারাষ্ট্র দেশে মিরাস ভূমি বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

রায়ৎওয়ারী জমির উপর যে নির্দ্ধারিত জমা তাহার প্রত্যেক টাকায় এক আনার হিসাবে এক অতিরিক্ত কর রায়তের নিকট হইতে গৃহীত হয়।—তাহার নাম 'লোকল ফণ্ড সেস'। তাহা লোকল ফণ্ডে জমা হয় ও পল্লীসমূহে বিদ্যাপ্রচার ও পথ নির্ম্মাণ ও সংস্করণ প্রভৃতি স্থানিক কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নিয়ম এই যে, এই টাকার দুই তৃতীয়াংশ শিক্ষা ফণ্ডে ও এক তৃতীয়াংশ রথ্যাফণ্ডে প্রযুক্ত হইবে। স্থানিক ফণ্ড নিম্নলিখিত ফণ্ডের সমষ্টি।—

রথ্যাফণ্ড।

শিক্ষাফণ্ড।

গোষ্ঠগৃহ ফণ্ড। (এই গৃহে অনিষ্টকারী গোমেষাদি ধৃত হইয়া রক্ষিত হয় ও তাহাদের ছাড়াইবার জন্য যে দণ্ড দিতে হয় তাহা হইতে এই ফণ্ড সংগৃহীত)

তরণ নৌকাফণ্ড।

টোল ফণ্ড।

পাইশাফণ্ড।

এই সকলের উৎপন্ন টাকা হইতে নিজ নিজ ব্যয় নির্ব্বাহিত হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সাধারণ লোকল ফণ্ডে জমা হয়।

এই সম্বন্ধে মুসলমান রাজাদের যে রীতি ছিল তদ্বিষয়ে Sir Henry Lawrence বলেনঃ—

"মুসলমান রাজাদের সমুদয় কার্য্যের প্রবর্ত্তন কেবলি স্বার্থপরতা। রাস্তা, সরাই, আবাদ—এ সকল কি প্রজাদের জন্য? না, তাহা নহে, সকলি রাজার চলাচলের

সুবিধার' জন্য। একটী বাদসাহি সরাই নির্ম্মাণে যে ব্যয় তাহাতে প্রজাদের জন্য দশটা সরাই নির্ম্মিত হইতে পারিত। এ-দেশের সকল স্থানেই এই নিয়ম। যে স্থান দিয়া রাজার পরিভ্রমণ করিবার সম্ভাবনা সেখানে সুবিস্তীর্ণ পথ ও অন্যান্য অশেষ-বিধ সুবিধা। অন্যত্র পথ, পানীয়, আ-শ্রমের জন্য প্রজাদের বৃথা ক্রন্দন। অযোধ্যার নবাব—জোয়ানপুর ও মহারাষ্ট্রের মুসলমান রাজাদেরও ঐরূপ পদ্ধতি। তা-হাদের প্রিয় বাসগৃহের সন্নিহিত স্থান সকলকে সজ্জিত ও শোভিত করা—তাহা-দের ক্রীড়াকাননে যাইবার জন্য পথ মুক্ত করা—তাহাদের পথের বিঘ্নকারী নদীর উপর সেতু বন্ধন করা—সুন্দর কূপ খনন ও ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষাদি রোপণ, এ সকল কার্য্যে তাঁহারা তৎপর ছিলেন কিন্তু সক-লই স্বার্থসাধন উদ্দেশে," কিন্তু হিন্দু-রাজারা যে প্রজাদের কল্যাণ উদ্দেশে পথ ঘাট নির্ম্মাণ—পান্থশালা স্থাপন—বাপী পুষ্করিণী খনন—ছায়া-বৃক্ষ রোপণ প্রভৃতি কার্য্যে উৎসাহী ছিলেন তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বে রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের বিষয় যাহা কিছু বলা গিয়াছে তাহাতে তাহার ভাল দিকটাই দেখান হইয়াছে কিন্তু তাহা শু-নিতে যেমন শ্রুতিমধুর, কার্য্যে তেমন ফলো-পধায়ী হইয়াছে কি না সন্দেহ।

রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের দোষ গুণ নিরূ-পণ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করা উচিত যে গবর্ণমেণ্টের খাজানার প্রকৃত লক্ষণ কি? কি হিসাবে তাহা নির্দ্ধারিত হইলে রায়তের সুখ সমৃদ্ধি সাধিত হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায়—চাস ও আবাদের খরচ বাদ দিয়া যে মুনফা অবশিষ্ট থাকে গবর্ণমেণ্টের খাজানা তাহার অর্দ্ধাংশ কি আরো কিঞ্চিৎ অধিক হইলে ক্ষতি নাই। কৃষকের পরিশ্রমের বেতন ও হল বলদ প্রভৃতি কৃষিসাধন জিনিসের মূল্য অবশ্য আবাদের খরচের মধ্যে ধরিতে হইবে। তাহা বাদ দিয়া অবশিষ্ট মুনফার অংশ সরকারী খাজানাতে নির্দ্ধারিত হওয়া উ-চিত—একথা রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের প্রধান প্রতিপোষকগণও স্বীকার করিয়া থাকেন। এইক্ষণে প্রশ্ন এই যে, ফলে সরকারী খা-জানা এই রূপ দাঁড়াইয়াছে কি না? তা-হার উত্তর 'না' বলিতে হইবে। ইহা নি-শ্চয় যে কৃষিকার্য্যের খরচ ও সরকারী দেনা বাদ দিয়া রায়তের অবশিষ্ট মুনফা কিছুই থাকে না। অনেক স্থলে সরকারী খাজানা দিবার জন্যও রায়ৎকে মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়। সে তাহার নিজের ও পরিবারের সম্বৎসরের মত গ্রাসাচ্ছাদন যোগাইবার জন্য যাহা কিছু কষ্টস্থষ্টে উপার্জ্জন করে তাহা 'মুনফা' বলা যাইতে পারে না—তাহা তাহার পরিশ্রমের বেতন। কোন এক শুভবর্ষে যদি তাহার অল্প মুনফা উদ্বৃত্ত হয় ত তাহা অন্য এক অনা-বৃষ্টি-জনিত অশুভ বৎসরে সকলি ব্যয় হইয়া যায়। কৃষক বৎসর বৎসর কায়ক্লেশে ভূমি কর্ষণ করিয়া প্রতি বৎসর আশা করিয়া থাকে—কবে সুদিন হইবে—মহা-

জনের দেনা পরিশোধ করিতে পারিবে—সে সুদিন আর দেখা দেয় না। স্বোপার্জ্জিত অর্থ সে যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া উঠে তাহা অনেক সময় তাহার সম্বৎসর উপজীবিকা চলিবার জন্য যথেষ্ট হয় না—অন্য স্থান হইতে ধার কর্জ্জ করিয়া তাহার সংসার খরচ নির্ব্বাহ করিতে হয়। রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের পরিণাম যদি এই হইল ত কোন্ মুখে তাহার প্রশংসা করা যায়। জরীপ্কর্ত্তারা মুখে যাহা বলুন, কার্য্যে তাহা প্রকাশ পায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই দেখা যাইতেছে যে গবর্ণমেণ্টের খাজানা রায়তের মুনফার অংশ নহে—বেচারী রায়ৎ তাহার নিজ বেতন হইতে ও কখন কখন মহাজনের নিকট হইতে ধার করিয়া তাহা যোগাইতে বাধ্য হয়।

পূর্ব্বকালে এপ্রদেশে নিয়ম এই ছিল যে, যে পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হইবে রাজা তাহার ভাগগ্রাহী। রাজার ষষ্ঠাংশ বৃত্তি ইহা আমাদের শাস্ত্রসম্মত বাক্য। ভাল বৎসরে প্রজার মঙ্গল অবস্থা হইলে রাজভাণ্ডার পূর্ণ হইত—মন্দ বৎসরে শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত জন্মিলে খাজানাও সেই পরিমাণে অল্প আদায় হইত। কোন বৎসর রায়ৎ তাহার জমি কারণবশত আবাদ করিতে না পারিলে তাহার জন্য খাজানা দিতে হইত না। কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল নাই। ভাল বৎসরই হউক, মন্দ বৎসরই হউক—সুবৃষ্টিই হউক অনাবৃষ্টিই হউক,—ফসল হউক আর নাই হউক—জমি আবাদ হউক কি পতিত থাকুক—নিয়মিত খাজানাটি রাজভাণ্ডারে আনিয়া দিতেই হইবে। নতুবা জমি নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। আগে কখন কখন কার্য্য-বিশেষের জন্য রায়ৎকে ধার দিবার প্রথা ছিল—কোন কারণে তাহার খাজানা হইতে নিষ্কৃতি দেওয়া যাইত, কিন্তু এক্ষণে সে নিয়ম বন্ধ হইয়াছে।

খাজানা আদায়-নিয়মের কঠোরতা, এই দুর্ভিক্ষের বৎসরে বিলক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট উল্লসিত হইয়াছেন, সেক্রেটরি অফ্ ষ্টেট্ মহা সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন যে, দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত রায়তের নিকট হইতে এবার প্রায় তাহার দেয় সমুদয় খাজানা আদায় করা যাইবে। করগ্রাহীর পক্ষে ইহা অতিশয় সন্তোষজনক সন্দেহ নাই কিন্তু করদাতার পক্ষে কতদূর তাহা সন্দেহ। সচরাচর সরকারী খাজানা দিতে যাহাদের গলদ্ঘর্ম্ম হয়, দুর্ভিক্ষের বৎসর অস্থি চর্ম্ম সার, সেই সকল রায়তের নিকট হইতে দুই বৎসরের খাজানা এক কালে আদায় করা সামান্য নিষ্ঠুরতার কার্য্য নহে। এই দ্বিগুণ কর দিবার সামর্থ্য-সাধনোপযোগী এবৎসর যে দ্বিগুণ ফসল হইয়াছে, কৈ তাহা ত শুনা যায় না। এই ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার কিরূপে সংসাধিত হইল বলা যায় না। এই প্রেসিডেন্সিতে সমুদয় সরকারী খাজানার সমষ্টি ২৷৷০ কোটি টাকারও অধিক—তাহার মধ্যে ২ কোটি ৩৩ হাজারেরও অধিক আগষ্ট মাসের শেষে আদায় করা হইয়াছে। প্রায় ২ কোটি ১৫ হাজার টাকা মাত্র ছুট

দেওয়া গিয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ আদায় হইবার প্রত্যাশা। ১৮৭৭—৭৮ সালেরও সমুদয় খাজানা সমাহৃত হইবে এই রূপ শুনা যাইতেছে।

পুণা সার্ব্বজনিক সভা রায়ৎদের অবস্থা বিষয়ে বিস্তর অনুসন্ধানের পর এই রূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের প্রথম সূত্রপাত হইবার সময় জমীর উপর যে গবর্ণমেণ্টের খাজানা নিরূপিত হয় তাহা অপেক্ষাকৃত লঘু, জমি ও কৃষিকার্য্যের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উদার ও পরিমিত ভাবে তাহার দর নির্ণীত হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম ত্রিশ বৎসর অতীত হইলে নূতন বন্দবস্ত জারী করিবার সময় এত অধিক পরিমাণে খাজানা বৃদ্ধি করা হইয়াছে যে তাহাতে মহারাষ্ট্র দেশের অধিকাংশ রায়তের ওষ্ঠাগত প্রাণ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, নূতন বন্দবস্তের নিয়ম এই যে, রায়তের বিনা যত্ন ও পরিশ্রমে জমী ও ফসলের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাজানা বৃদ্ধি করা বিধেয়। কিন্তু সুবিবেচনা ও দূরদর্শিতার সহিত সে নিয়ম রক্ষা না করিলে অনেক অনিষ্টের সম্ভাবনা। মনে কর ইংরাজি ১৮৩৫ শালের প্রারম্ভে প্রথম বন্দবস্তের সূত্রপাত হইল। ৩০ বৎসর অতীত হইলে ১৮৬৫ শালে দেখা গেল যে, সকল জিনিস আক্রা—জমির মূল্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে—রায়তের অবস্থা সচ্ছল হইয়াছে—তাহা দেখিয়া ঐ ত্রিশ বৎসরের শেষে পাঁচ বৎসরকার জিনিসের দরের সরাসরিতে যদি সরকারী খাজানা বর্দ্ধিত হয় তবে রায়ৎদের কি দুর্দ্দশা। ঐ বর্দ্ধিত মূল্য আগামী ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত অটল থাকিবে তাহার স্থিরতা কি? ১৮৬৪—৬৫ শালে রায়তের শ্রীবৃদ্ধি হইবার কারণ কি? না আমেরিকার যুদ্ধ-জনিত এদেশে তুলার ব্যবসায়ের উত্তেজনা। ইহা বিবেচনা করা উচিত যে এ উত্তেজন ক্ষণস্থায়ী—যুদ্ধসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইহা তিরোহিত হইবে। অতএব এই সম্ভবতঃ ক্ষণস্থায়ী মূল্য বৃদ্ধি অনুসারে আগামী ত্রিংশৎ বৎসরব্যাপী খাজানার দর নির্দ্ধারণ করা অন্যায়। এই রূপে অতীত ত্রিশ বৎসরের কোন এক ভাগের উপর লক্ষ্য করিয়া খাজানার দর বন্ধন করিলে তাহাতে যে ভ্রমোৎপত্তির সম্ভাবনা তাহা সহজে অনুধাবন করা যাইতে পারে। সেই কালের মধ্যে ৫ বিঘার ১০ বৎসরের সরাসরি দর যে আগামী ত্রিশ বৎসর কাল স্থায়ী থাকিবে তাহার কোন স্থিরতা নাই। বাস্তবিক পরীক্ষাতেও এই দেখা যাইতেছে যে, জিনিসের দরের কোন স্থিরতা নাই—নানা কারণে মধ্যে মধ্যে তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। যদি অতীত ত্রিশ বৎসরের সমুদায় কালের জিনিসের দরের সরাসরি লইয়া তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিশ বৎসরের সরাসরি জিনিসের মূল্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখা যায় ও সেই অনুসারে খাজানার দর নিরূপিত হয় তাহা হইলেও কতকটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যে মহাত্মাদের হস্তে এই বন্দবস্তের ভার সমর্পিত তাঁহারা তত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিতে

তৎপর নহেন। সুতরাং নূতন বন্দবস্তে মনঃকল্পিত নিয়ম অনুসারে খাজানা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহারা যে প্রজাপীড়ন দোষে দোষী হইয়াছেন ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায়। আর এক কথা এই যে, জিনিসের দর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের মূল্যও অধিক হয়, সুতরাং কৃষিকার্য্য চালাইবার খরচ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। এটিও মনে রাখা কর্ত্তব্য। নূতন বন্দবস্তের সময় জরীপ অধিকারীদিগের এই দুই বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। প্রথম—জমি ও ফসলের মূল্য বৃদ্ধি যাহা দৃষ্ট হইতেছে তাহা ভবিষ্যৎ ত্রিশ বৎসর কাল স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা কি না? দ্বিতীয়তঃ মূল্যবৃদ্ধির সমতুল্য খাজানার দরবৃদ্ধি বিধেয় নহে, কেননা জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি হইলে শ্রমের বেতন বৃদ্ধি, সুতরাং কৃষি কার্য্যের ব্যয় অধিক হইবে। এই সম্বন্ধে আর একটী বিষয় বক্তব্য এই যে, যে সকল তালুকে বর্দ্ধিত জমা স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে জমীর জরীপ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য পুনর্ব্বার নবানুষ্ঠিত হইয়া সেই দর ধার্য্য হয়। এই রূপ করাতে জমীর মূল্যের বিস্তর তারতম্য ঘটিয়া অনেক ভূস্বামী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৩০ বৎসরে বন্দবস্তের বচন পাইয়া রায়ৎ মনে করিতে পারে—আমি এই জমীর মালিক—নিয়মিত খাজানা দিতে পারিলে আর আমার কোন ভাবনা নাই। ত্রিশ বৎসর অন্তর, না হয় সেই দরের কিছু হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। এই রূপ ত্রিশ বৎসর কাল নিজ সম্পত্তি ভোগ করিয়া পরে যখন সে দেখে আমার ২০ বিঘা ভূমি এক্ষণে ২৫ বিঘা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ও পূর্ব্বাপর প্রচলিত খাজানা ত্রিগুণ কি চতুর্গুণ ধার্য্য হইয়াছে, তাহা না দিতে পারিলে আমার সমুদায় ভূমিসম্পত্তি ছাড়িয়া দিতে হইবে তখন তাহার কি যন্ত্রণা! রায়তের সর্ব্বনাশ ও গবর্ণমেণ্টের বচনের প্রতি তাহার হতশ্রদ্ধা—ইহা রাজা প্রজার উভয়েরই অনিষ্টকর সন্দেহ নাই।

যাহা বলা হইল তাহাতে পাঠকগণ রায়ৎওয়ারী বন্দবস্তের দোষ গুণ কতকটা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। এইক্ষণে এই বন্দবস্তের অধীনস্থ রায়তের অবস্থা যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রী স—

পূর্ব্বতন গ্রীকদিগের সামাজিক অবস্থা।

প্রাচীন গ্রীকদিগের সহিত আমাদিগের অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্যরূপ মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগের দেবদেবীর সহিত আমাদিগের দেব দেবীর, তাহাদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যার সহিত আমাদিগের জ্যোতির্ব্বিদ্যার, তাহাদিগের গণিতের সহিত আমাদের গণিতের, তাহাদিগের দর্শনশাস্ত্রের সহিত আমাদের দর্শন শাস্ত্রের কি

আশ্চর্য্য সাদৃশ্য তাহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু তাহাদিগের আচার ব্যবহার পরিচ্ছদ, আহার বিহারেও যে ভারতবর্ষবাসীদিগের সহিত কোন কোন বিষয়ে মিল আছে তাহা বোধ হয় অনেকে অবগত নহেন।

গ্রীকদিগের মধ্যে দুইটি প্রধান জাতি—এথিনীয় ও স্পার্টান। তন্মধ্যে এথিনীয়েরা সমস্ত গ্রীকজাতির আদর্শ-স্বরূপ—এথিনীয়দিগের আচার ব্যবহার বিবৃত করিলেই প্রায় সমস্ত গ্রীকজাতির আচার ব্যবহার বর্ণনা করা হয়। স্পার্টানদিগের সহিত কাহারও মিল নাই। তাহাদিগকে একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিলেও হয়। অতএব এই প্রস্তাবে স্পার্টানদিগের উল্লেখ করা যাইবে না। খৃষ্ট জন্মিবার চার শতাব্দি পূর্ব্বে প্রাচীন এথিনীয়দিগের আচার ব্যবহার রীতি নীতি আহার বিহার পরিচ্ছদ—এক কথায় তাহাদিগের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহাই এই প্রবন্ধে বিবৃত করা আমাদিগের উদ্দেশ্য।

আবাস।—নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ আবাসভূমির উপযোগিতানুসারে কেহবা প্রস্তর, কেহবা ইষ্টক কেহবা কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বাটীতে বাস করিত। তাহাতে শয়ন ভোজনের ও অন্যান্য গার্হ্যস্থ্য কার্য্য সম্পাদনের জন্য স্বতন্ত্র ঘর থাকিত। অনেক সময় একই ঘর নানা কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইত। কিন্তু বড় মানুষদিগের বাটী দুই মহলে বিভক্ত হইত। পুরুষদিগের জন্য এক মহল—স্ত্রীলোকদিগের জন্য আর এক মহল। প্রত্যেক মহল চতুষ্কোণ-আকারে নির্ম্মিত। তাহার অভ্যন্তরে এক একটি—প্রস্তরে বাঁধানো প্রাঙ্গণ। ঐ প্রাঙ্গণের মধ্যদেশে এক একটি ফোয়ারা থাকিত। উঠানের চারি ধারে থাম-ওয়ালা বারাণ্ডা—এই বারাণ্ডার ভিতর দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়। পুরুষদিগের মহলে আমোদ প্রমোদের জন্য—বন্ধুবান্ধবকে বসাইবার ও খাওয়াইবার জন্য—বৈঠকখানা ও খাবার ঘর থাকিত। অন্দর মহলের ঘরে প্রায় পরিবারের লোকেরা বাস করিত। রান্না ঘর, ভাঁড়ার ঘর—শোবার ঘর অন্দর মহলেই নির্ম্মিত হইত।—এতদ্ভিন্ন সুতা-কাটা—কাপড়-বুনা—এবং অন্যান্য গার্হ্যস্থ্য ব্যাপার সম্পাদনের জন্য অন্যান্য ঘর উহাদের সহিত সংলগ্ন থাকিত। সকল ঘরই দ্বার-বিশিষ্ট—কেবল পুরুষদিগের বৈঠকখানা-ঘর পর্দ্দা দ্বারা রুদ্ধ থাকিত। ঘরের জানালা-সকল অংশতঃ ছাদের দিকে ও অংশতঃ প্রাঙ্গণের দিকে উন্মুক্ত।—অন্দর মহলের পশ্চাদ্ভাগে একটি উদ্যান থাকিত। রাজপথের সম্মুখস্থ দ্বারটীর পার্শ্বে ইষ্টদেবের বিগ্রহ ও বেদিকা স্থাপিত হইত। রাস্তাগুলি, না পাথর দিয়া বাঁধানো—না তাহাতে আলো দেওয়া হইত। সুতরাং বর্ষাকালে রাস্তা অত্যন্ত অপরিষ্কার ও রাত্রে অত্যন্ত অন্ধকার হইত। আবর্জ্জনা-রাশি বাহির করিয়া লইবার জন্য উত্তম পয়ঃপ্রণালীও ছিল না। গার্হ্যস্থ্য ব্যবহারের জন্য নিকটস্থ সরকারি কূপ হইতে জল আনিতে হইত। গৃহসজ্জার মধ্যে টেবিল

—কৌচ—ভোজন-পাত্র প্রভৃতি ছিল। অবকাশ সময়ে ও আহার-কালে গ্রীকেরা চৌকির পরিবর্ত্তে কৌচ ব্যবহার করিত। কাচের জিনিস কিছুই ছিল না। ভোজন-পাত্র সকল মৃত্তিকা কাষ্ঠ কিম্বা ধাতুতে নির্ম্মিত হইত। দর্পণ পিত্তলের হইত। আমাদের দেশেও পূর্ব্বকালে এই পিত্তলের দর্পণই সাধারণে প্রচলিত ছিল।

বসন।—পরিধেয় বসন প্রধানতঃ দুই খণ্ড—একটি ভিতরের—আর একটি বাহিরের। ভিতরের পরিচ্ছদের নাম চিতোন—ইহা, সুতা কিম্বা পশমের কাপড়ে প্রস্তুত হইত—কাহারও কাহারও এই পরিচ্ছদ হাতা-বিশিষ্ট—কাহারও বা বাহু প্রবেশ করাইবার জন্য কেবল ছিদ্র থাকিত। এই পরিচ্ছদটি অতি শিথিলভাবে পরিহিত হইত। বাহিরের পরিচ্ছদের নাম হাইমেষন্—ইহা আমাদের চাদরের মত। এক্ষণকার ইংরাজি প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তিতে এই রূপ আচ্ছাদন সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ভাঁজ হাঁটু পর্য্যন্ত কিম্বা আরও নিম্নে ঝুলিয়া পড়ে এবং স্কন্ধে এই রূপ ভাবে জড়ান হয় যে বাম বাহু আচ্ছাদিত হইয়া দক্ষিণ বাহুটি মুক্ত থাকিতে পারে। এই চাদর লোকের রুচি, পদমর্য্যাদা বা ব্যবসায়-অনুসারে নানা প্রকারে পরিহিত হইত। মস্তকাবরণ দুই প্রকার ছিল। একটি মুসলমানদিগের অৰ্দ্ধ ডিম্বাকৃতি তাজ টুপির ন্যায়—আর একটি সচরাচর ইংরাজি টুপির ন্যায়।—কিন্তু এই মস্তকাবরণ সাধারণের মধ্যে ব্যবহার ছিল না। সাধারণ-আমোদালয়ে যাইবার সময় কিম্বা বেড়াইবার সময় লোকের মস্তক প্রায়ই অনাবৃত থাকিত। এই প্রথাটি অনেকটা অধুনাতন সাধারণ বাঙ্গালীদিগের ন্যায়। মাথার চুল খুব বড় করিয়া রাখা হইত এবং উচ্চশ্রেণীর লোকেরা অতীব যত্ন সহকারে কেশবিন্যাস করিতেন। কোন যুবক ১৮ বৎসরে পদার্পণ করিলেই তাহার দীর্ঘ কেশ ছাঁটিয়া দিয়া ধর্ম্মঘটিত অনুষ্ঠান সহকারে দেবতাদিগের নিকট উৎসর্গ করা হইত। এই ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম জীবনের একটি মহাকাল বলিয়া গণ্য হইত। ১৮ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত মাথার চুল ছোট রাখা হইত।

গ্রীকেরা বরাবর শ্মশ্রু ধারণ করিত—এবং ইহাকে পুরুষের একটি প্রধান অলঙ্কার বলিয়া মনে করিত। দাড়ি কামানো প্রথা যে একেবারেই ছিল না তাহা নহে কিন্তু সাধারণে তেমন প্রচলিত ছিল না। স্ত্রীলোকেরা এক্ষণকার ন্যায় নানা প্রকারে কেশবিন্যাস করিত।—তাহারা মস্তকে জাল থোলে, টুপি পাগড়ি প্রভৃতি নানা প্রকার মস্তকাবরণ ব্যবহার করিত। লোকে বাটীর বাহির হইলেই পাদুকা, খড়ম প্রভৃতি পরিধান করিত।

আহার।—সচরাচর গ্রীকেরা বড় সুখাহারী ছিল না। সর্ব্বসাধারণে যে সকল খাদ্য ব্যবহৃত হইত তাহা অতি সামান্য এবং সংখ্যাতেও অধিক নহে। দিনের মধ্যে দুই বার ভোজন করা সামান্যতঃ তাহাদের নিয়ম ছিল। এক বার মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে,

আর এক বার অপরাহ্ণে কিম্বা সন্ধ্যার সময়। এই অপরাহ্ণ কিম্বা সন্ধ্যার ভোজনটিই তাহাদিগের গুরুতর ভোজন। তাহাদের গ্রন্থে ইহাও উল্লেখ আছে যে প্রাতঃকালে তাহারা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া খাঁটি মদে রুটি ভিজাইয়া খাইত। প্রত্যূষে তাহারা আদালৎ প্রভৃতি সাধারণ সম্মিলন-স্থানে যাইত—এবং সেখান হইতে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া আহারে বসিত। তাহার পর বিশ্রাম করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত—কাজ কর্ম্ম সাঙ্গ হইলে অপরাহ্ণে আর এক বার ভোজন করিত, তাহার পর সন্ধ্যার সময় বন্ধু বান্ধব লইয়া আমোদ প্রমোদ করিত। নিত্য খাদ্যের মধ্যে গম কিম্বা জবের রুটিই প্রধান ছিল। এই রুটি কখন কখন ঘরে প্রস্তুত হইত কিন্তু অ্যাথেন্স্ নগরে প্রায়ই লোকে দোকান হইতে কিনিয়া আনিত। জবের রুটিই সমস্ত গ্রীসের দরিদ্র-শ্রেণীর মধ্যে সচরাচর ব্যবহৃত হইত—উহার মধ্যে যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল তাহাদের মধ্যে গমের রুটি প্রচলিত ছিল। দর্শন শাস্ত্র ও উদ্দীপক বাগ্মিতার ন্যায় অ্যাথেন্সের রুটিও বিখ্যাত ছিল। রুটির সঙ্গে তাহারা পনির—শাক্‌সবজি—প্যাঁজ রসোন কপি প্রভৃতি খাইত।—প্যাঁজ তাহাদের বড় প্রিয় খাদ্য ছিল। কিন্তু অ্যাথেন্‌সে এবং গ্রীসের অন্যান্য উপকূলস্থ প্রদেশে মৎস্য আহার আমাদের ন্যায় অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। যুদ্ধযাত্রী সৈন্য ও নাবিকগণের মৎস্য ও রুটিই প্রধান আহার ছিল। রুটি, পনির, পেঁয়াজ এবং শুষ্ক মৎস্য তাহারা সঙ্গে লইয়া যাইত। অন্য প্রকার খাদ্য যদি ক্রয় করিতে না পাইত, তাহা হইলে তাহারা উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিত। মৎস্য অপেক্ষা মাংস কম পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। কোন বৃহৎ ভোজে, নানা প্রকার মৎস্যের সঙ্গে মাংসও থাকিত—মাচ মাংস খাওয়া হইলে পর, ফলমূল ও মিস্টান্ন আসিত। মদ্যপানও হইত কিন্তু ভোজের সময় নহে। ছুরি কাঁটার ব্যবহার ছিল না। কিন্তু চামচের ব্যবহার ছিল। কাঁটার পরিবর্ত্তে টুক্‌রা টুক্‌রা রুটির সাহায্যে গ্রাস সকল মুখে নীত হইত। মাংস পূর্ব্ব-হইতে টুকরা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া আহার-স্থানে আনীত হইত।

আমোদ প্রমোদ।—জনসমাজপ্রিয় গ্রীক-জাতির মধ্যে ভোজের নিমন্ত্রণ, জীবনের একটি প্রধান বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত। আমাদের দেশের ন্যায় সকল অনুষ্ঠানেই ভোজ দিবার প্রথা ছিল। আমাদের দেশের ন্যায় তাহাদের বহুল দেব-দেবী ছিল, সুতরাং পর্ব্বাহও অনেক ছিল। বর্দ্ধিষ্ণু লোকেরা প্রত্যেক পর্ব্বাহে—স্বকীয় অভীষ্ট দেবদেবীর নিকট ছাগাদি পশু বলিদান না দিয়া ক্ষান্ত থাকিত না—সুতরাং বৎসরের মধ্যে অনেক গুলি ভোজ হইত। শুদ্ধ পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগের জন্ম-দিন উপলক্ষে নহে, অন্যান্য জীবিত কিম্বা মৃত মান্য ব্যক্তিগণের জন্ম-দিন উপলক্ষেও খাওয়ান হইত। এতদ্ভিন্ন যুবকদিগের মধ্যে পরস্পর চাঁদা করিয়া

খাওয়া চলিত। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ মস্তকে ফুলের মালা জড়াইয়া—দিব্য বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিত। ভোজনের সময় সকলে বালিস-যুক্ত কৌচের উপর হ্যালান্ দিয়া শুইত—ছোট ছোট টেবিল, কৌচের সম্মুখে স্থাপিত হইত। (পূর্ব্বকালে আমাদের দেশেও ছোট ছোট টেবিলে খাওয়া রীতি ছিল—এই টেবিল ত্রিপাদ-বিশিষ্ট। খৃষ্ট জন্মিবার চারি শতাব্দি পূর্ব্বে যখন মেগাস্থিনিস্ ভারত-বর্ষে আসিয়াছিলেন তখন তিনি এই ত্রিপাদ টেবিলের ব্যবহার দেখিয়াছিলেন।) কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি আসিবামাত্র ভৃত্যগণ তাহার পাদুকা খুলিয়া লইয়া, পা ধুয়াইয়া দিত। (এই প্রথাটিও আমাদের প্রথার ন্যায়—অতিথি আগন্তুক কাহারও বাটীতে আইলে তাহাকে পাদ্য দেওয়া হয়।) খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে পর কথাবার্ত্তা গান বাদ্য নৃত্য প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইত। অস্মদ্দেশের ন্যায় নিমন্ত্রিতব্যক্তিগণের সম্মুখে ব্যবসায়ী গায়ক দ্বারা গান বাদ্য নির্ব্বাহ হইত।—পারস্যদেশের প্রথানুরূপ মদ্যের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য ঐ নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে এক জন, পরিবেস্টা অথবা 'সাকীর' পদে নিযুক্ত হইতেন। তবে, পারস্য দেশের ন্যায় তিনি বোতল হইতে সকলকে মদ ঢালিয়া দিতেন না। তিনি প্রথমে একটি বৃহৎ পাত্রে মদ্য ঢালিয়া তাহাতে জল মিশ্রিত করিতেন মাত্র। তৎপরে ভৃত্যগণ একটা হাতার দ্বারা ঐ মদ্য প্রত্যেকের পান-পাত্রে পরিবেশন করিত। নিমন্ত্রিতগণ সকল সময় আপন ইচ্ছামত মদ্য পান করিতে পারিতেন না।—মদ্যপায়ীদিগের মধ্যে এই নিয়মটি অতি শুভকর সন্দেহ নাই! এই সকল ভোজের সময় স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত থাকিতে পাইত না।

ক্রীড়াবিনোদ। বিনোদজনক ক্রীড়ার মধ্যে—সরকারি ব্যায়ামশালায় সাধারণের ব্যায়াম চর্চ্চা, বালকদিগের সামান্য ক্রীড়া এবং ঘরে বসিয়া যে সকল খেলা হয় তাহাই ধরা যাইতেছে। "জিম্‌ন্যাষিয়ম্" অর্থাৎ ব্যায়াম-ভূমি সরকারি ব্যয়ে স্থাপিত হইত। একটি বিস্তৃত স্থান প্রাচীর দ্বারা ঘেরা হইত। ইহার মধ্যে কোথাও কোথাও তরু-পরি-শোভিত ভূমি থাকিত—এবং চতুর্দ্দিক স্তম্ভ-শ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত হইত। আবার তন্মধ্যে একসারি চতুষ্কোণ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইত, তাহাতে স্নানাগার এবং বালকদিগের জন্য সরকারি পাঠশালা থাকিত। ইহাতে বোধ হয় ঐ স্থানে বালকগণ সাহিত্য ও ব্যায়াম উভয়ই একত্রে শিক্ষা করিতে পারিত। যদিও সম্ভবতঃ ভিন্ন বয়স্ক লোকের জন্য এবং ভিন্ন প্রকার ব্যায়াম-চর্চ্চার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভূমি নির্দ্দিস্ট ছিল কিন্তু তথাপি বোধ হয় সে সকল এক স্থানেরই অন্তর্ভূত। বিদ্যালয়ে যুবকেরা, এক জন শিক্ষকের অধীনে শিক্ষা লাভ করিত।—অষ্টাদশ হইতে বিংশতি বর্ষ বয়স্ক বালকদিগের ব্যায়ামচর্চ্চা স্বতন্ত্র স্থানে হইত।—তদ্‌ভিন্ন সাধারণ লোকে, আমোদের জন্য কিম্বা ভবিষ্যতে আবশ্যক হইলে সৈন্যশ্রেণীর উপযুক্ত হইবার জন্য—নিজ নিজ বিবেচনা মত ব্যায়াম-চর্চ্চা করিত।

দৌড়ান—লাফান—ধনুর্ব্বাণ—বর্শা ছোঁড়া—গোলা-খেলা—ঘুসা-ঘুসি—কুস্তি ইত্যাদি নানা প্রকার ব্যায়াম ছিল—এবং উলঙ্গ হইয়া এই সকল ব্যায়াম-চর্চ্চা হইত বলিয়া—উহাদিগকে "জিমন্যাষ্টিক্" বলিত। এই সকল সরকারি ব্যায়াম-ভূমির সংলগ্ন স্তম্ভশ্রেণী-বিশিষ্ট বারাণ্ডায় প্রসিদ্ধ দার্শনিক, তার্কিক, আলঙ্কারিক ও বাগ্মী পণ্ডিতগণ আসিয়া একত্র হইতেন; এবং তাঁহাদের বাক্‌বিতণ্ডা এবং কথাবার্ত্তা শুনিবার জন্য—অনেক লোক জমা হইত। অধিকাংশ লোক দুই এক ঘণ্টা কাল আমোদ উপভোগ করিবার জন্য এই সকল ব্যায়াম-ভূমিতে অপরাহ্ণে আসিত। অ্যাথেন্সের বিভিন্ন উপনগরে এই প্রকার তিনটি প্রসিদ্ধ আড্ডা ছিল—যথা—অ্যাকাডেমি—লিসিয়ম এবং সিনোসার্গিস্।

অন্তর্গৃহ-ক্রীড়ামোদও নানা প্রকার ছিল। সায়াহ্ণ-ভোজনের পর যে সকল আমোদ-প্রমোদ হইত তন্মধ্যে হেঁয়ালি ভাঙ্গাও তাহাদের একটি প্রিয় আমোদ ছিল। প্রত্যেককে পালা অনুসারে হেঁয়ালি ভাঙ্গিতে হইত। যে ঠিক্ অর্থ করিতে না পারিত—তাহাকে দণ্ডস্বরূপ—জল না মিশাইয়া খাঁটি মদ্য খাইতে হইত। যে ঠিক্ বলিতে পারিত তাহার ভাগ্যে পুষ্পমালা মিষ্টান্ন—কিম্বা চুম্বন লাভ হইত।—(আমাদের দেশের এক্ষণে যেরূপ দুরবস্থা হইয়াছে তাহাতে যদি এইরূপ দণ্ড পুরস্কারের বিধি প্রবর্ত্তিত হয়—হয়তো অনেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক পুরস্কারের পরিবর্ত্তে দণ্ডকে আলিঙ্গন করিতে উৎসুক হইবেন।) কোটাবস্ নামক এক প্রকার খেলা ছিল।—তাহা এই—একটা বৃহৎ পাত্র, হয় তৌলযন্ত্রের ন্যায় লম্বমান থাকে, নয় জলের উপর ভাসাইয়া রাখা হয়—আর একটা ছোট পাত্র হইতে মদ্য ছিট্‌কাইয়া এত পরিমাণ সেই বৃহৎ পাত্রটিতে ফেলিতে হইবে যাহাতে উহা হয় নিম্নে নাবিয়া পড়িবে নয় জলে মগ্ন হইবে। আবার এক রকম খেলা ছিল—তাহা কতকটা আমাদের শতরঞ্চের মত।—পাশা-খেলাও খুব প্রচলিত ছিল। ছেলেরা আমাদের দেশের মত ঘুঁটি খেলিত। মুরগি ও কোকিলের লড়াই সমস্ত গ্রীসে অত্যন্ত প্রচলিত ছিল।

ছুটির দিন।—এমনি তো গ্রীকদিগের দৈনন্দিন নানা প্রকার আমোদ ছিল, তাতে আবার ছুটির মোর্‌ষোম্ পড়িলে তাহাদের আনন্দের আর ইয়ত্তা থাকিত না। ইংরাজদিগের ন্যায় সপ্তাহে সপ্তাহে তাহাদের কোন নিয়মিত ছুটি ছিল না। ছুটির এক একটা মোর্‌ষোম্ আসিত, তাহাতে একেবারে দুই তিন দিন ধরিয়া ছুটি হইত। আমাদের দুর্গাপূজা প্রভৃতিতে লোকের যেরূপ মনের ভাব হয় অনেকটা সেই রূপ হইত। পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক বিদ্বেষই থাকুক, জাতি-বৈরই থাকুক—ধর্ম্ম-ঘটিত বিবাদই থাকুক, এই সকল সাধারণ উৎসব-দিনে তাহারা সমস্তই বিস্মৃত হইত। গ্রীসের প্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা গ্রোট্ সাহেব বলেন——"প্রত্যেক নগরের, প্রত্যেক গ্রামের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধর্ম্মোৎসব ছিল—ঐ সকল

উৎসবে দেবদেবীর নিকট বলিদান হইয়া গেলে—খাওয়া দাওয়া—নাচ গান বাজনা—কুস্তি ব্যায়াম প্রভৃতি নানা প্রকার আমোদ আহ্লাদ আরম্ভ হইত। যদিও উৎসবগুলি স্থানীয়—তথাপি ভিন্নপ্রদেশবাসী লোকদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া আনা হইত। কোন গ্রীক উপনিবেশ এবং উহার রাজধানী সম্বন্ধে এই রূপ প্রচলিত প্রথা ছিল যে, কোন উপনিবেশে উৎসব উপস্থিত হইলে রাজধানী-নিবাসী, লোকদিগকে মর্য্যাদার স্থানে বসান হইত এবং তাহাদিগের মধ্যে এক জনকে বলি-মাংসের প্রথম আস্বাদ গ্রহণ করান হইত। অতএব যে সকল রাজ্য রাজনৈতিক সম্বন্ধে একত্র সম্মিলিত ছিল না—এই রূপ উৎসব উপলক্ষে যাতায়াত থাকায় তাহাদিগের পরস্পরের মধ্যেও বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃভাবের নিদর্শন পাওয়া যায়"।

সমস্ত গ্রীসের মধ্যে যে সকল সাধারণ উৎসব ছিল—যে সকল উৎসব থাকাতে রাজনৈতিক মহা অনৈক্যের মধ্যেও সমস্ত গ্রীসে একটি ঐক্যস্থল ছিল—সেই সকল উৎসবের মধ্যে ওলিম্পিক নামক উৎসবটি সর্ব্ব-প্রধান। চারি বৎসর অন্তর পিলপনিসসে আল্‌ফ্যুস্ নদী-তীরে ওলিম্পিক জ্যুস্‌দেবের দৈববাণী-প্রকাশ-স্থান "পুরাতন মন্দিরের সন্নিকট এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইত। অল্প হইতে আরম্ভ করিয়া এই উৎসবটির কার্য্য-পরিসর ক্রমশ বর্দ্ধিত হয় এবং অবশেষে উহা একটি গুরুতর ব্যাপার হইয়া উঠে। প্রথমে সেখানে শুধু দৌড়াদৌড়ির প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইত—ক্রমে উহাতে কুস্তি, ঘুসাঘুসি, ঘোড়-দৌড়, রথ-চালন প্রভৃতির প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবর্ত্তিত হয়। ওলিম্পিকের ন্যায় আরও কতকগুলি সাধারণ উৎসব ছিল। যথা, ডেলফির সন্নিকটে পিথিয়ান নামক উৎসব—করিন্থের নিকটে ইস্থমিয়ান এবং নিমিয়ান নামক উৎসব। এই শেষোক্ত দুইটি উৎসব দ্বিবৎসরান্তর অনুষ্ঠিত হইত। পদমর্য্যাদা যার যতই হউক না কেন, অলিম্পিক মেলায় পুরস্কার লাভ সকলেরই পক্ষে ইহজীবনের একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এই জন্য ইহাই গ্রীকদিগের জীবনের একটি প্রধান আকাঙ্ক্ষা-স্থল হইয়া পড়িয়াছিল—এবং এই পুরস্কার লাভের উপযুক্ত হইবার জন্য কত লোকে নিজ নিজ ব্যায়াম ভূমিতে কত দিন ধরিয়া শ্রমসহকারে আপনাদিগকে শিক্ষিত করিত। এথেন্‌স এবং অন্যান্য নগরের সাধারণ ব্যায়াম-শালায় যে সকল ব্যক্তি ওলিম্পিকের পুরস্কার-প্রার্থী রূপে মনোনীত হইত—তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত। এবং কত লোক আমোদ করিয়া অপরাহ্ণে তাহাদের শিক্ষা দর্শন করিতে আসিত। ওলিম্পিক মেলায় পুরস্কার লাভ করা এতদূর গৌরবের বিষয় ছিল,যে পুরস্কৃত ব্যক্তিগণ অল্পকাল মধ্যেই গ্রীক-জনসমাজে পদমর্য্যাদা ও খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিত—এমন কি কখন কখন রাজকীয় প্রধান প্রধান পদে আরূঢ় হইত। মল্ল-বিজয়ী যখন স্বগৃহে ফিরিয়া আসিতেন তখন মহা সমারোহ সহকারে তাঁহার

অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন হইত। প্রথমে তিনি বিজয়-রথে আরোহণ করিয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিতেন—তৎপরে লোকজনে পরিবৃত হইয়া মহাসমারোহে নগরের প্রধান মন্দিরে যাত্রা করিতেন। সেখানে গিয়া দেবতার নিকট বলি উৎসর্গ হইত এবং সেই মল্ল-বীরের গুণ কীর্ত্তন হইত।

যাহারা নিতান্ত দরিদ্র তাহারাই কেবল ঐ সকল উৎসব-ক্ষেত্রে গমন করিতে পারিত না—কেন না গৃহ হইতে দূরপ্রদেশে যাত্রা ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন সকল প্রদেশ হইতেই এক এক দল প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া তথায় প্রেরিত হইত। প্রতিনিধিগণ আপন আপন প্রদেশের নামে তত্রস্থ দেবতার নিকট বলি উৎসর্গ করিত এবং উৎসবের উন্নতি সাধন কল্পে দান করিত। এই সকল প্রতিনিধি-দল তাঁহাদিগের সঙ্গে স্বর্ণ-রৌপ্যের বাসন লইয়া যাইতেন এবং আপনাদিগের তাম্বুতে অপর প্রদেশবাসী লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মহা ভোজ দিতেন। এই সকল উৎসব উপলক্ষে গ্রীসের সর্ব্বাংশ হইতে অসংখ্য লোক আসিয়া জমিত এবং কোলাহল, মাতামাতি ও উৎসাহের আর সীমা থাকিত না। উৎসবের পূর্ব্বে ও পরে কত সপ্তাহ ধরিয়াই যে উৎসব প্রসঙ্গে কথা বার্ত্তা চলিত তাহা বলা যায় না। যদি নগরের অধিবাসী কোন ব্যক্তি ওলিম্পিকের পুরস্কারার্থী হইত—তাহা হইলে সেই নগরবাসীদিগের আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের আর ইয়ত্তা থাকিত না—কেন না, ঐ ব্যক্তি বিজয়ী হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় জন্মভূমিরও গৌরব বৃদ্ধি হইবে।

এথিনীয়দিগের আর একটি উৎসব আমোদের সময় ছিল—তাহা নাটকাভিনয়ের সময়। বৎসরের মধ্যে তিন চারি বার নাটকাভিনয় হইত। প্রত্যেক বারে দুই দিন ধরিয়া অভিনয় হইত এবং প্রত্যেক অভিনয়ে তিনটি করিয়া গম্ভীর ভাবের এবং একটি করিয়া স্যাটারিক নামক চপল ধরণের নাটক অভিনীত হইত। প্রথম প্রথম ঐ শেষোক্ত নাটকাভিনয় বাকস্ দেবের সম্মান উপলক্ষেই প্রবর্ত্তিত হয় এবং বাকস্ দেবের সঙ্গিগণের নাম স্যাটার হওয়ায় ঐ প্রকার নাটকের নাম স্যাটারিক হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে—ঐ সকল নাট্যালয়ে সর্ব্বসাধারণের অবারিত-প্রবেশ ছিল কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন দর্শকমণ্ডলীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন টিকেট্ ক্রয় করিয়া প্রবেশের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। যোত্রহীন নাগরিকগণ যাহাতে নিরাশ না হয় এই জন্য তাহাদের পক্ষে এই নিয়ম ছিল যে তাহারা টিকেটের জন্য আবেদন করিলেই সরকারি তহবিল হইতে মূল্য দিয়া তাহাদিগকে টিকেট্ ক্রয় করিয়া দেওয়া হইবে। এই প্রথাটির উল্লেখ করিয়া গ্রীক-ইতিহাসবেত্তা গ্রোট্ বলেন "ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঐ সকল উৎসব পূর্ব্বতন ধর্ম্মেরই অঙ্গ স্বরূপ; এবং তৎকালীন সাধারণ-বিশ্বাস এই ছিল যে, কোন দেবতার উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে সেই উৎসব সময়ে যদি অসংখ্য লোক-সমাগম

না হয় এবং সাধারণ-উপভোগ্য আমোদ-প্রমোদ না থাকে, তাহা হইলে সেই দেবতা প্রসন্ন হইবেন না। অতএব দরিদ্র পৌর-জনদিগের জন্য যে এই রূপ ব্যয় হইত তাহা রাজকীয় ব্যাপারের অঙ্গ না বলিয়া বরং তাহাদের ধর্ম্মের অঙ্গ বলাই আরও যুক্তি-সঙ্গত।"

যাহাতে প্রতি বৎসর ভাল ভাল নাটক রচিত হয় এবং রচিত হইয়া সুচারুরূপে অভিনীত হয় তজ্জন্য গ্রীকেরা অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিত। উৎকৃষ্ট নাটক-কারকে পুরস্কার দেওয়া হইত। এই পুরস্কার লাভের জন্য অনেক কবি প্রতি-যোগিতা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন। নগরের কোন ধনী ব্যক্তি অভিনেতা ও গায়কদিগকে শিক্ষা দিবার ব্যয়-ভার বহন করিতেন। তখন গ্রীসে এই রূপ কোন সাধারণ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে আমাদের দেশের ন্যায় প্রায়ই তত্রস্থ ধনীদিগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিই তাহার ব্যয়-ভার গ্রহণ করিতেন—সাধারণের সমবেত অর্থে তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না। বাকস্ দেবের পূজা উপলক্ষে বসন্ত-উৎসবে যে সকল অগণ্য নাটক অভিনীত হইত তাহার সকল গুলি প্রায়ই নবপ্রস্তুত ও তৎকালোপযোগী। এবং এই সকল গ্রীক নাটকের নমুনা আমরা যাহা পাইয়াছি তাহাতে তাহাদের রচনা-নৈপুণ্য ও ভাবুকতা দেখিয়া কে না মোহিত হইবে? বিশেষতঃ যে সময় গ্রীসে কঠোর ব্যায়াম চর্চ্চার রুচি অত্যন্ত প্রবল ছিল, সেই একই সময়ে সুকুমার দৃশ্য-কাব্যের অনুরাগ যে সাধারণের মধ্যে এরূপ জাগরূক থাকিবে ইহা অল্প আশ্চর্য্যের বিষয় নহে!

জ্যঃ—

অভিমান।

"অভিমান রাখিবার স্থান, পাইনে কোন সন্ধান, বুঝিবা হারাই প্রাণ,"—এই মর্ম্মভেদী অক্ষরময় দীর্ঘশ্বাস যিনি ফেলিয়া-ছিলেন তাঁহার মনোভাব অনুভব করিতে হইলে বিজন প্রান্তরে বসিয়া ভাবিতে হয়। কোলাহলময় সংসার-ক্ষেত্রে এমন স্থান নাই, এমন অবসর নাই যেখানে এবং যে সময়ে হৃদয়ের এই সকল নিগূঢ় অথচ ভয়ানক যাতনার প্রতিমা অন্যের মনে প্রতিফলিত হইতে পারে। কোন বিকট হত্যা-কাণ্ডে বা অবিচার-জনিত কোন পরিবারের সর্ব্বনাশে বা দুর্ভিক্ষ-জনিত নগরপল্লীর হাহাকারে, সংসারী ব্যক্তির মনে মমতার উদ্রেক হইতে পারে, কিন্তু যে সকল যাতনা হৃদয়ের নিভৃত প্রান্তে অবস্থিতি করিয়া তুষানলের মত হৃদয়ের প্রত্যেক শিরা উপশিরাকে ভস্মীভূত করিতে থাকে, যে সকল যাতনা ভূতকালকে হলাহলসিন্ধু ও

বর্ত্তমানকে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করিয়া ভবিষ্যৎকে প্রলয়-মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, যে সকল যাতনা মনের ও শরীরের গ্রন্থি সকলকে উচ্ছেদ করিয়া মানুষকে উদ্দেশ্য-বিহীন উন্মত্তের সমান করিয়া তুলে, যে সকল যাতনা যৌবনের উত্তপ্ত মানস-উচ্ছ্বাসকে উত্তর মহাসাগরের ন্যায় অনন্ত তুষারে জমাট্ করিয়া ফেলে, যে সকল যাতনার দীর্ঘশ্বাস কেবল গভীর নিশীথের বায়ুতরঙ্গে বিলীন হইয়া যায় এবং যাহার অদৃশ্য অশ্রুলহরী বিজন প্রদেশের ধরাতেই শুখাইয়া যায়, সে সকল যাতনার প্রতি মমতা অনুভব করিতে সংসারের অবকাশও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলার দুঃখে অনেকেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিবেন, কিন্তু অপরিচিতা রত্নাবলীর দুঃখ কেহই বুঝিবেন না, হত-প্রাণ ডেস্‌ডিমোনার দুঃখে অনেকেই কাতর হইবেন কিন্তু জীবন্মৃত অফিলীয়ার দুঃখ কেহই বুঝিবেন না, এমন কি, আত্মঘাতী কুন্দনন্দিনীর দুঃখে সকলেই হা হুতাশ করিবেন, কিন্তু নির্ব্বাসিত কুন্দনন্দিনীর দুঃখ কেহই বুঝিবেন না।

এই রূপ অনেক গুলি অলক্ষিত ও উপেক্ষিত যাতনার মধ্যে অভিমানের যাতনাও একটি ভয়ানক যাতনা। স্নেহ বা প্রণয়ের সম্পর্ক না থাকিলে কখনই অভিমানের উদয় হয় না, এবং স্নেহ বা প্রণয় থাকিলে শরৎকালীন মেঘের মতন মধ্যে মধ্যে অভিমানের উদয় হইবেই হইবে। যাহাকে যত পরিমাণে ভাল বাসা যায়, তাহার প্রকৃত বা কল্পিত অন্যায় ব্যবহারে তাহার প্রতি সেই পরিমাণে অভিমানও হইবে, এবং অভিমানের পরিমাণে ভালবাসাও পরিমিত হইবে। যে বায়রণ শত সহস্র লোকের তিরস্কার তৃণজ্ঞান করিয়া সদর্পে বিচরণ করিতেন, তিনিই আবার তাঁহার বাল্যপ্রণয়িনীর একটি কটু বাক্যে ভগ্নহৃদয় হইয়াছিলেন এবং যে নেপোলিয়ন শত্রুদিগের শত সহস্র কামানের অগ্নিকুণ্ড মধ্য দিয়া অক্ষত ভাবে আসিয়াছিলেন তিনিই আবার তাঁহার লুইসার একটি বিদ্রূপ-কটাক্ষে মরমের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে দগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। মানবহৃদয় কখনই এতদূর নীচাশয় হইতে পারে না যে, যার তার উপরে অভিমান করিতে প্রবৃত্তি হইবে, এবং মানবহৃদয় কখনই এতদূর উদাসীনও হইতে পারে না যে, ভালবাসার পাত্রের অন্যায় আচরণে তাহার অভিমান-স্রোত অনিবার্য্য হইবে না। মহান-প্রকৃতি জুলিয়স্ সিজরকে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া যখন তাঁহার কপট বন্ধুরা প্রতারণা করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের সন্নিবেশ-স্থলে লইয়া গেল, এবং সেই সন্নিবেশ-স্থানে যখন তাহারা লুক্কাইত ছুরিকা বাহির করিয়া তাঁহার প্রতি আঘাত করিতে লাগিল, তখন তিনি আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া আত্ম রক্ষণে যার পর নাই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে তাঁহার হৃদয়-সুহৃদ ব্রুটস্‌ও তাঁহাকে মারিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিয়াছেন, তখন তিনি কাতর স্বরে "ব্রুটস্! তুমিও এক জন, তবে আর সিজরের বাঁচিবার সাধ নাই" বলিয়া

শিশুর মত মুখাবৃত করিয়া আত্মরক্ষণে একেবারে বিমুখ হইলেন। ভুবন-বিজেতা জুলিয়স্ সিজর আজ আশৈশব ভালবাসার এই অস্বাভাবিক প্রতিদান দেখিয়া অভিমানে এতদূর অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে আত্মরক্ষণ সময়েও তিনি স্ত্রীলোকের মত অঞ্চলাবৃত হইয়া ধরাশায়ী হইলেন।

অভিমান একটি অমিশ্র মনের ভাব নহে। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে গেলে উপলব্ধি হইবে যে,দুঃখ ঔদাস্য এবং ঈষৎ রাগ—এই তিনটি স্বতন্ত্র ভাব একত্রিত হইয়া অভিমানে পরিণত হয়। যে রাগ অগ্নিময় এবং প্রতিবিধান করিতে তৎপর,আমরা সে রাগের কথা বলিতেছি না, কিন্তু মেঘদূতের "স্নিগ্ধ বিদ্যুতের"ন্যায় এক প্রকার কোমলতর রাগের কথা আমরা বলিতেছি। কিন্তু এই কোমলতর রাগ অবস্থা ও প্রকৃতি বিশেষে পরিশেষে প্রকৃত রাগে পরিণত হইতে পারে। অভিমানে দুঃখের ভাগটিই সর্ব্বাধিক—এবং তাহাই সম্ভাবিত। আমি যাঁহাকে আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব জ্ঞান করি, যাঁহার উপর আমার সকল সুখ, সকল শান্তির আশা নির্ভর করে এবং যিনিও আমার প্রেমে লীন হইয়া সেই সুখের আশাকে আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া তুলেন, তিনিই যদি সহসা আবার সেই বদ্ধপ্রতিষ্ঠ আশাতরুকে একেবারে উন্মূলিত করেন, তাহা অপেক্ষা আর পৃথিবীতে কি অধিক যাতনা আছে? প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলা, নির্ব্বাসিত সীতা ও অপমানিত ডেস্‌ডিমোনার দুঃখ ভাবিয়া দেখিলে কোন্ পাষাণ-হৃদয় না দ্রবীভূত হয়? কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেই দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে একটি ঔদাস্যের ভাব আছে। ইহাও অভিমানের একটি বিশেষ লক্ষণ। ঈষৎ অভিমান-স্থলে ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে,শতসহস্র অপর লোকের সঙ্গে আমি যতটুকু আত্মীয়তা করিতে সক্ষম, আমার স্নেহ বা প্রণয়ের পাত্রের উপর অভিমান হইলে তাহার শতাংশের একাংশও করিতে সক্ষম নহি। এমন কি, আমি হয় ত সেই শতসহস্র অপর লোকের সঙ্গে হাসিতে পারিব, গল্প করিতে পারিব, কিন্তু সেই স্থলে আমার অভিমানের পাত্রের আগমনে আমার হাসি শুখাইয়া যাইবে, গল্প ওষ্ঠেই বিলীন হইবে এবং আমোদ বিষাদে পরিণত হইবে। যিনি সকল অপেক্ষা আমার আপনার, অভিমানের সময় তাঁহাকেই সকল অপেক্ষা পর বলিয়া মনে হইবে। ইহা কেবল হৃদয়ের গভীর স্নেহ বা প্রণয়ের বিপরীত প্রতিক্রিয়া মাত্র। হৃদয় যাঁহাতে যত ঘোর ঘনিষ্ঠ ভাবে সংলগ্ন হয়, তাঁহার প্রকৃত বা কল্পিত বিরূপাচরণে তাঁহা হইতে হৃদয় তত সুদূরে প্রতিহত হইয়া আইসে। এই জন্যই প্রত্যাখ্যান-কালে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে "আর্য্যপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিতে করিতে থমকিয়া "পৌরব" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এই জন্যই নির্ব্বাসিতা জানকী রামকে লক্ষ্য করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন "এক্ষণে তোমাদের সেই রাজার নিকট এই প্রার্থনা করি, আমি এই রূপে পরিত্যক্ত হইলেও যেন তিনি তাপসনির্ব্বিশেষে আমার তত্ত্বাবধান ক-

রেন। এই জন্যই অপমানিত ডেস্‌ডিমো-নাকে যখন তাঁহার পরিচারিকা এমিলিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ভর্ত্তৃদারিকে! প্রভুর আমার কি হইয়াছে?" তিনি প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করিলেন "কাহার কি হইয়াছে?" এমিলিয়া বলিলেন "আমার প্রভুর কি হইয়াছে?"

ডেস্‌ডিমোনা।—"কে তোমার প্রভু?"

এমিলিয়া।—"কেন, মধুরভাষিণি! যিনি তোমার প্রভু?"

ডেস্‌ডিমোনা কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিলেন "কই আমার ত কেহই নাই।"

আবার এই ঔদাস্যের সঙ্গে সঙ্গে আ-মরা উপরে বলিয়াছি একটি কেমলতর ঈষৎ রাগের আভাসও বিদ্যমান থাকে। এই জন্য উল্লিখিত অভিমান-স্থলে শকুন্তলা দুষ্মন্তকে বলিয়াছিলেন "তপোবনে তাদৃশ অমায়িকতা দেখাইয়া ও ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে এরূপ দুর্ব্বাক্য কহিয়া প্রত্যাখ্যান করা তোমার উচিত নহে।" এই জন্যই সীতা লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন "আমার হইয়া সেই রাজাকে বলিও, তিনি যে স্বসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা করিয়াও অকারণে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ইহা কি রঘুবংশের অনুরূপ কর্ম্ম করা হইল?" এবং এই জন্যই ডেস্‌ডিমোনা ওথেলো কর্ত্তৃক অন্যায় তিরস্কৃত হইয়া ইয়াগোকে বলিয়াছিলেন "যাহারা শিশু-সন্তানদিগকে শিক্ষা দেয়, তাহারা অতিভদ্র-ব্যবহারে ও সহজ উপায়েই তাহা করিয়া থাকে—ওথেলো ত আমার প্রতি তাহাই করিতে পারিতেন, কেন না তিরস্কার-বিষয়ে বাস্তবিকই ত আমি শিশু-সন্তানের ন্যায়।"

আমরা সীতা শকুন্তলা ও ডেস্‌ডিমোনার অভিমান পরীক্ষা করিয়া অভিমান যে কি কি উপাদানে গঠিত তাহা দেখিলাম। কিন্তু সাধারণত অনেকেই মান এবং অভিমানকে একই পদার্থ মনে করে। ঈষৎ অভি-মানের ধরণ-ধারণ কতকটা মানের মত স্বীকার করি, কিন্তু এ উভয়েতে প্রকৃতিগত বিশেষ তারতম্য বিদ্যমান আছে। প্রণয় ও স্নেহ—এ উভয় স্থলে অভিমান সম্ভবে, কিন্তু মান—প্রণয়-স্থল ব্যতীত আর কোথাও সম্ভবে না; মান স্ত্রীস্বভাব-সুলভ কিন্তু অভিমান স্ত্রী কি পুরুষ উভয়েই করিয়া থাকে;—মানেতে প্রণয়ীর অনুরাগের উ-পর প্রণয়িনীর দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে মানের উদয় হয় না এবং অভিমানেতে অভিমানের পাত্রের অনুরাগের উপর অভি-মানীর সংশয় না জন্মিলে কখন অভি-মানের উদয় হয় না,—মানের উদ্দেশ্য আমাকে সাধুক্ এবং আমার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়া আমার অনুরাগের সম্মান রাখুক্। অভিমানের উদ্দেশ্য—আমার সংশয় ভঞ্জন হোক্ এবং আমার সর্ব্বস্ব আবার আমার হইয়া আমার মর্ম্মযাতনার উপশম করুন। মানের প্রকৃতি—স্বত্ব বজায় রাখা, অভিমা-নের প্রকৃতি—ভিক্ষা প্রার্থনা; মান লীলাময়, অভিমান বিষাদময়; মানের অন্তরতম প্রদেশে হাস্য লুকায়িত ভাবে, না হয় প্রকাশ্য ভাবে থাকে; অভিমান অশ্রুতেই আপ্লুত। প্রকৃত অভিমানের উদয় হইলে মনে যেকি ভয়ানক

আঘাত লাগে তাহা বিজ্ঞতাভিমানী সাংসারিক ঋষিতপস্বিরা কিছুই অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন যে রোগেই শরীর বিশুষ্ক হয়, ক্ষতিতেই মন ক্ষুণ্ণ হয় এবং শোকেই হৃদয় অভিভূত হয়। কিন্তু স্নেহ বা প্রণয়-পাত্রের একটি ঈষৎ কঠোর বচনে, একটি ঈষৎ নির্দ্দয় কটাক্ষে, একটি ঈষৎ নির্ম্মম ইঙ্গিতে হৃদয়ে যে কি ভীষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হইতে পারে, তাহা তাঁহাদের মলিন কল্পনায় কিছুমাত্র প্রতিফলিত হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ একটী বচনে, বা একটি কটাক্ষে অভিমানীর যে কত আশা কত ভরসা, এমন কি তাহার হৃদয় পর্য্যন্ত স্তরে স্তরে যে কিরূপে ভস্মীভূত হইয়া যায়, তাহা সেই অভিমানী ব্যতীত আর কেহই অনুভব করিতে পারে না। দুর্গেশ-নন্দিনী তিলোত্তমা যখন রাজপুত্র জগৎসিংহের সহিত কারাগারে দেখা করিতে গেলেন তখন রাজপুত্র নিশ্চয়ই জানিতেন যে তিলোত্তমা পতিতা হইয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি নির্দ্দোষী তিলোত্তমাকে তাঁহার হৃদয়-বৃন্ত হইতে উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এমন সময় এক দিন তিলোত্তমা রুগ্ন জগৎসিংহের সম্মুখে উপস্থিত। "রাজপুত্র কিঞ্চিৎ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন; অমনি তিলোত্তমার দেহ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত হইয়া স্থির হইল। ক্ষণ-প্রস্ফুটিত হৃৎপদ্ম সঙ্গে সঙ্গে শুকাইয়া উঠিল। রাজপুত্র কথা কহিলেন,

"বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা ?"

'তিলোত্তমার হৃদয়ে শেল বিঁধিল। * * * * রাজপুত্র পুনর্ব্বার কথা কহিলেন—'

"এখানে কি অভিপ্রায়ে ?"

এখানে কি অভিপ্রায়ে ?—কি প্রশ্ন! তিলোত্তমার মস্তক ঘুরিতে লাগিল; চারিদিকে কক্ষ শয্যা প্রদীপ প্রাচীর সকলই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবলম্বনার্থে প্রাচীরে মস্তক দিয়া দাঁড়াইলেন।"

কিন্তু সেই যবন কারাগারের এই মোহময় দৃশ্যের মাঝে যদি কোন সরল-হৃদয় সাংসারিক বিজ্ঞ পুরুষ থাকিতেন, তিনি সকলই আপনার অকাল্পনিক সরল ভাবে দেখিয়া তিলোত্তমাকে এই বলিয়া ঈষৎ বিদ্রূপ সহকারে বুঝাইতেন—"তোমার দুঃখের কারণ ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। রুগ্ন জগৎসিংহ হয় ত আপনার শরীরের কোন কষ্ট হেতু একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন, তাহাতে তোমার কষ্ট পাওয়া অন্যায়। আর বাস্তবিকই তুমি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা, তোমাকে বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা বলিয়া সম্বোধন করাতে কেনই বা তোমার মনে যাতনা উপস্থিত হইবে ? অবিবাহিত কুলকামিনীকে তিনি কখনই 'প্রিয়ে' বা 'প্রেয়সি' বলিয়া সম্বোধন করিতে পারেন না, তোমাকে তিলোত্তমা না বলিয়া বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা বলাতে বরং তাঁহার বুদ্ধির কার্য্য হইয়াছে, কারণ সেই শত্রুপুরী মধ্যে তোমার নাম প্রকাশ করিলে বিপদের সম্ভাবনা এবং এরূপ স্থলে অতদূর ঘোর ঘনিষ্টতা প্র-

কাশ করা মূর্খের কার্য্য। আর "এখানে কি অভিপ্রায়ে?" জিজ্ঞাসা করাতে যে তোমার মস্তক ঘুরিয়া গেল, ইহাতে বোধ হয় তোমার মস্তকের ঘূর্ণা-রোগ আছে, তাহা না হইলে তুমি সহসা সেই কারাগার মধ্যে কি অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইলে?—এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে তোমার মস্তক ঘুরিয়া যাইবে কেন? তুমি কি বল যে জগৎসিংহ যদি তোমার সঙ্গে কোন কথাই না কহিতেন তাহা হইলেই তাঁহার ভালবাসার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করা হইত? হা হতবুদ্ধি! তুমি আপনার কল্পনার দোষে আপনি কষ্ট পাইবে তা জগৎসিংহ কি করিবেন!" কিন্তু হে অন্তর্দেবতা! হে হৃদয়-সাক্ষী! ন্যায় শাস্ত্রের কূট তর্ক দ্বারা কি অভিমানের কারণ সিদ্ধ হইতে পারে? হৃদয়ের দ্বারা হৃদয় না বুঝিয়া কি বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা হৃদয় বুঝিতে পারা যায়? প্রণয়ীর হৃদয় আপনা আপনি যেরূপ দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পরিণত হয়, তাহার তুলনায় কি ন্যায়শাস্ত্রের কুটিলতম যুক্তিও অকিঞ্চিৎকর মনে হয় না? কিন্তু আরও দুঃখের বিষয় এই যে, আমি যাঁহার উপর অভিমান করিলাম, তাঁহার যদি আমার প্রতি কিছুমাত্র ভালবাসা না থাকে অথচ সে ভাবটি স্পষ্ট অক্ষরে প্রকাশ করিতে নিতান্ত নির্ম্মমতার কাজ মনে করেন, তাহা হইলে তিনিও তিলোত্তমার মত অবস্থাতে আমাকে ঐ সাংসারিক ব্যক্তির মত কূট তর্কে পরাস্ত করিয়া এবং পরিশেষে আমাকে কাল্পনিক প্রমাণ করিয়া অপ্রস্তুত করিতে চেষ্টা পাইবেন।

স্বীকার করি যে অনেক সময়ে অভিমানী ব্যক্তি নিজ কল্পনার প্রভাবে যে সকল বিভীষিকা সৃষ্টি করেন, হয় ত তাহাদের কোন প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, কিন্তু চর্ম্ম-চক্ষেই দৃষ্ট হোক্ বা কল্পনার চক্ষেই দৃষ্ট হোক্—বিভীষিকা বিভীষিকাই, ভয়ের কষ্ট উভয়েতেই সমান। জাগ্রৎ অবস্থায় আমার উপর যদি কেহ শরাঘাত করে, আর স্বপ্নে যদি আমি অনুভব করি আমার উপর কেহ শরাঘাত করিতেছে, এই দ্বিবিধ আঘাত-জনিত কষ্টের কি কিছুমাত্র তারতম্য থাকে? জাগ্রৎ অবস্থায় কোন বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া যে ভয় হয়, স্বপ্নাবস্থায় কি তাহার তিলমাত্র লঘুতর হয়?—তাহা হইলে অভিমানের কষ্ট, প্রকৃতই হোক্ আর কল্পিতই হোক্, তাহার কষ্ট বিদ্রূপের বিষয় কিরূপে হইতে পারে? দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক সময়ে অভিমানের পাত্রই আবার অভিমানীকে বিদ্রূপ করিতে ক্রটী করেন না। কিন্তু তাহা অপেক্ষা পৃথিবীতে দারুণতর যাতনা আর অল্পই আছে! অভিমানের অশ্রুর উত্তরে অস্ফুট হাস্যের প্রতিদান, অভিমানের দীন ভিক্ষার উত্তরে কঠোর বিদ্রূপ প্রয়োগ, অভিমানের সকরুণ চাহনীর উত্তরে তীব্র কটাক্ষ—পৃথিবি! তোমার হলাহল-সমুদ্রের তরঙ্গও ইহা অপেক্ষা দাহকারী নহে!

চ—

ভানুসিংহের কবিতা।

বার বার সখি বারণ করনু
　　ন আও মথুরা ধাম!
বিসরি প্রেম দুখ, রাজভোগ যথি (১)
　　করত হমারই শ্যাম।
কি কহিল রসনা? হমারই শ্যাম সো?
　　কি বুঝলি পাগল প্রাণ?
অবতক (২) ঘুচল ন ভাঁতি (৩) তুয়া মন!
　　সো কি হমারই শ্যাম?
শত শত দেশ পদানত যিনকো (৪)
　　শত শত মানুখ দাস,
শত শত রাজা রোষ-কটাখে
　　মনমে মানে তরাস,
দুখিনী গোপিনী, হম অবলা সখি,
　　সোকি হমারই শ্যাম?
বোল ত সজনি, মথুরা-অধিপতি
　　সোকি হমারই শ্যাম?
ধনকো শ্যাম সো, মথুরা পুরকো,
　　রাজ্য মানকো হোয়,
নহ পীরিত কো, ব্রজ কামিনীকো,
　　নিচয় কহনু ময় তোয়।
ন যাও সজনি, মথুরা নগরে
　　ভেটইতে সো শ্যাম,
সমরাইও না (৫) সখি, শ্যামক মনমে
　　দুখিনী হমার নাম।

বাত রাখ মঝু (৬) নিতান্ত সহিলো,
　　মথুরা পুর জনি (৭) যাহ,
দূর সঙেতু পেখিও শ্যামক (৮)
　　কৈছন আছয় নাহ। (৯)
জনি সখি দেখ সো, মনকো হরখে
　　করত সুখে পুর-বাস,
শপতি হমার লো, তব্ সখি ন আও
　　মথুরা পতিকো পাশ।
জনি দেখো তুঁহুঁ সোবি সহত সখি!
　　দারুণ বিরহক জ্বালা
তব্ সখি সঁপিও, শ্যামক চরণে
　　ইহ বন-কুসুমক মালা!
কহিও, রাধা, দুখিনী রাধা—
　　মথুরা-অধিপতি কান!
দুখজ্বালা তব, বারইতে (১০) সব
　　সঁপবে দে মন প্রাণ।
উরস পাতবে, অবশ মাথ তব
　　রাখব তছু পরি মাধা,
তোমইতে মন সবকছু করবে
　　যত কছু জানয় রাধা!
ভানু কহত— অয়ি—বিরহ কাতরা
　　মনমে বাঁধহ থেহ। (১১)
মুগধা বালা, বুঝহ বুঝলিনা,
　　হমার শ্যামক লেহ। (১২)

(১) যেখানে (২) এখন পর্য্যন্ত (৩) ভ্রান্তি (৪) যাঁহার (৫) স্মরণ করাইও না

(৬) আমার (৭) যদি (৮) দূর হইতে তুমি শ্যামকে দেখিও (৯) নাথ কেমন আছেন। (১০) নিবারণ করিতে (১১) ধৈর্য্য বাঁধো (১২) ভালবাসা।

তুকারাম।

তুকারাম মহারাষ্ট্র দেশের এক জন সাধু পুরুষ ও প্রখ্যাত কবি। তিনি ১৫১০ শকাব্দে (খৃষ্টাব্দ ১৫৮৮) পুণা নগরীর অনতিদূর দেহু নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তুকারাম সেই সময়কার লোক, যে সময়ে মহারাষ্ট্রের জনপদ অনেক কাল মুসলমানদের আধিপত্যে অবসন্ন থাকিয়া স্বাধীনতা প্রত্যাহরণের জন্য সহসা উত্তেজিত হইয়া উঠে ও যবন-অধিকারের ভিতরে এরূপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে যাহাতে শতাব্দীর মধ্যে মোগল সিংহাসন সমূলে কম্পমান হইয়া ভগ্ন দশা প্রাপ্ত হয়। তুকারাম মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজীর সমকালবর্ত্তী লোক—যে দুই শত বৎসর মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বাধীন রাজ্য উপভোগ করিয়াছিল, তাহার প্রারম্ভ কালের ধর্ম্ম ও নীতির ভাব তুকারাম ও শিবাজীর গুরু রামদাস এই দুই কবির জীবনে প্রতিফলিত দেখা যায়।

তুকারাম জাতিতে শূদ্র ও ব্যবসায়ে বনিক ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা বংশানুক্রমে পণ্ডরপুরের দেব বিঠোবা বা বিঠ্ঠলের পরম ভক্ত ছিলেন ও তথায় তাঁহারা সর্ব্বদাই তীর্থ করিতে যাইতেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে,বিশ্বম্ভর নামে তাঁহার কোন এক পূর্ব্বপুরুষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে চিরন্তন প্রথানুসারে পণ্ডরপুরে তীর্থযাত্রা করিবার উপদেশ দেন। সেই উপদেশ ক্রমে বিশ্বম্ভর মাসের মধ্যে দুই বার তথায় যাত্রা করিতে ব্রতী হইলেন। এইরূপে ১৬ বার তীর্থ দর্শন করিবার পর একদা রাত্রিতে তাঁহার স্বপ্ন হয়—যে বিঠোবা দেব ও রুক্মাইদেবীর স্বয়ম্ভু মূর্ত্তি দেহু গ্রামের এক আম্রবনে নিহিত আছে—তুমি গিয়া তাহা উদ্ধার কর—আর তোমার পণ্ডরপুরে তীর্থ পর্যাটনে যাইতে হইবে না। পরে বিশ্বম্ভর তাহা উদ্ধার করিয়া দেহু গ্রামে ইন্দ্রায়নী নদী তীরে এক ক্ষুদ্র মন্দির প্রস্তুত করিয়া যথাবিধি সেই মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবধি বিঠোবা-দেব বিশ্বম্ভরের কুল-দেবতা হইলেন।

তুকারাম, বহ্লোজীর তিন পুত্রের মধ্যে মধ্যম পুত্র। তাঁহার মাতার নাম কণকাই। বহ্লোজীর বৃদ্ধাবস্থায় তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সাওজীকে সংসারের ভার অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু সাওজী এক জন ভগবদ্ভক্ত পুরুষ, সংসারে বীতরাগ, কাজেই তুকারামের উপরেই কর্ম্মকাজের সমস্ত ভার ন্যস্ত হইল। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৩ বৎসর—কতক কাল পর্য্যন্ত তিনি সাংসারিক ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকিয়া পিতামাতার সন্তোষ সাধন করিলেন। তাঁহার দুই পত্নী ছিল—রখুমাই ও জীজাই, কনিষ্ঠ পত্নীর স্বভাব কিছু কর্কশ ছিল ও তিনি তাঁহার স্বামীর বৈরাগ্য ভাবের উপর কিছু বিরক্ত ছিলেন। কথিত আছে যে এক দিন তুকারাম কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার পাইয়াছিলেন। আখের গোছা ঘরে আ-

নিতে আনিতে পথিমধ্যে কতকগুলি বালক তাহার প্রার্থী হইল। তিনি একে একে বিতরণ করিতে লাগিলেন, পরিশেষে তাঁহার হস্তে একটি দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট রহিল। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখেন যে গৃহিণী কোথা হইতে সকল কথার সন্ধান পাইয়াছেন। স্বামীর এই রূপ আচরণে জীজাই রাগান্ধ হইয়া সেই ইক্ষু-গাছটি কাড়িয়া লইয়া পতির পৃষ্ঠোপরি এমন সজোরে প্রহার করিলেন যে তাহা দুই খণ্ড হইয়া গেল। তুকারাম ঐ দুই খণ্ড ইক্ষু হস্তে লইয়া শান্তভাবে কহিলেন—"প্রিয়ে, তুমি আমাকে এত ভাল বাস যে এই আখ-গাছটি একলা খাইতে ভাল লাগিবে না বলিয়া তাহা দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে!"

তুকারামের বিংশতি বৎসর বয়সে তাঁহার জ্যেষ্ঠা পত্নী রখুমাইর মৃত্যু হয়। ঐ বৎসর সন্তু নামক তাঁহার একটি পুত্রও মরিয়া যায়। তৎপূর্ব্বে তাঁহার পিতা মাতা ও ভ্রাতৃজায়ার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হন—তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁহাকে ছাড়িয়া তীর্থ যাত্রায় চলিয়া গিয়া তাঁহার শোককে দ্বিগুণিত করেন। ইহার উপর দুর্ভিক্ষ ও অন্ন-কষ্ট, এই সকল কারণে তিনি সংসারের উপর বিরক্ত ও সর্ব্বত্যাগী হইয়া ঈশ্বরারাধনায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে তাঁহার জীবনের পূর্ব্বার্দ্ধ অতিবাহিত হইল।

তুকারামকৃত কবিতাবলী "তুকারামের অভঙ্গ" বলিয়া পরিচিত। তাহা মহারাষ্ট্রীয় প্রাচীন সাহিত্যের এক প্রধান অঙ্গ, ইহা হইতে কবির নিজ জীবন চরিত অনেকটা সংগৃহীত হইতে পারে। একজন সন্ন্যাসী তুকারামকে তাঁহার বৈরাগ্য অবলম্বনের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি যে সকল অভঙ্গে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেলঃ—

১৩৩৩

শূদ্র জাতি, সংসার চালাই ব্যবসায়ে,
বিঠ্‌ঠল গৃহদেবতা, নমি তাঁর পায়ে।
এ সকল কথা কহা ভাল বড় নয়,
শুধাইছ, সেই হেতু কহিবারে হয়।
মা বাপের মৃত্যু হ'লে পড়িয়া সংসারে,
সহিনু কতই কষ্ট কহিব কাহারে?
ধন মান সঁপিলাম দুর্ভিক্ষের গ্রাসে,
অন্নাভাবে গৃহিণী মরিলা উপবাসে।
লজ্জায় শরমে শেষে হ'য়ে মর মর,
দুখে শোকে একেবারে হ'য়ে জর জর,
ব্যবসায়ে দেখিয়া দারুণ নোক্‌সান,
দেবতা মন্দিরে গিয়া কৈনু বাসস্থান,
এগারই দিনে আরম্ভিনু সঙ্কীর্ত্তণ,
কিন্তু অধ্যয়নে তত নাহি ছিল মন,
সাধুদের গুটিকত পবিত্র বচন,
মুখস্থ করিয়া নিনু করিয়ে যতন।
অন্য কেহ যদি কভু গাইতেন গান,
আমিও ভক্তির সাথে মিলাতেম তান।
লজ্জা দূর করি দিয়া, শুদ্ধ করি প্রাণ,
সাধুর চরণামৃত করিতাম পান।
পর-উপকার সদা করিবার তরে,
শরীরের প্রতি মায়া দিনু দূর ক'রে।
বন্ধুদের অনুরোধে দিলাম না কান,
সংসারের প্রতি আর রহিল না টান।

অপরের পরামর্শ না আনি শ্রবণে,
সত্য অসত্যের সাক্ষী করিলাম মনে,
স্বপ্নে মোর গুরু-মন্ত্র করিয়া শ্রবণ,
ঈশ্বরে অচলা ভক্তি করিনু স্থাপন।
কবিত্ব প্রতিভা শেষে স্ফূর্ত্তি পেল মনে,
অর্পণ করিনু হৃদি বিঠোবা চরণে—
নিষেধ* হইল শেষে কবিতা লিখায়,
বড়ই আঘাত তাহে পাইনু হিয়ায়।
গ্রন্থ মোর ফেলি জলে, গেলাম মন্দিরে,
দেবতা প্রসন্ন মোরে হইলা অচিরে।
সব কথা বিস্তারিয়া কহিবারে পাছে,
সময় বহিয়া যায়, এত কথা আছে।
এখন যে ভাব মোর দেখিছ সকল,
ভবিষ্যতে কি হইবে জানেন বিঠ্ঠল।
ভকতে না উপেক্ষা করেন নারায়ণ,
করুণা-সাগর তিনি জানিনু এখন।
পাণ্ডুরঙ্গে বলালেন যে কথা সকল,
তাই একমাত্র মোর রহিল সম্বল।

১৩৩৪

আমি অতি হীন পাপী শুন সাধু সবে,
এত ভাল বাস মোরে কেন বল তবে?
মনে জানিয়াছি গতি নাহিক আমার,
এক ভেবে কাজ করি, লোকে ভাবে আর।
কিছুতেই পূরিল না অভাব যখন,
বর্ত্তমান দশা তবে করিনু গ্রহণ।
অবশেষে ফুরাইয়া গেল মোর ধন,
অবশিষ্ট যাহা কিছু কৈনু বিতরণ।
দারা সুত ভাইদের করিয়া বর্জ্জন,
হইলাম হতবুদ্ধি বিষাদে মগন।
লোক মাঝে মুখ আর দেখাব না মনে,
কাটাই জীবন মম বিজনে কাননে।
পেটের জ্বালায় মন হইল কঠিন,
পেটের জ্বালায় হৈনু দয়া-মায়া-হীন।
যে যা বলে ব'সে থাকি আপনার মনে,
না শুনে 'হাঁ' দিয়া যাই সবারি বচনে।
পূর্ব্ব পুরুষেরা মোর ছিলা ভক্ত অতি,
তাই আমি বিঠোবার করিগো আরতি।
তুকা বলে "কারো কথা নাহি শুনি আর,
ভক্তদের এই গতি জানিয়াছি সার।"

১৩৩৫

হে দেব যা কিছু মোর আছিল বিভব.
আমার ভালরি তরে নিয়াছ সে সব।
দুর্ভিক্ষের কালে যত পড়িয়াছি ক্লেশে,
আমার ভালরি তরে হইয়াছে শেষে।
শোক পেয়ে তব প্রতি ভক্তি গেল দড়,
সংসারের উপরে বিরাগ হল বড়।
ভালই যে পত্নী মম হইলা কর্কশা,
ভাগ্য মোর লোক মাঝে এত যে দুর্দ্দশা।
ভালই যে জগতে পাইনু উপহাস,
গোমেষাদি ধন ধান্য সব হল নাশ।
লোক-লাজ না রাখিনু হইল মঙ্গল,
তোমারে করিনু হরি জীবন-সম্বল।
তোমার মন্দিরে আজি সঁপিলাম কায়া,
তেয়াগিয়ে পুত্র জায়া সংসারের মায়া।
"ভাগ্য মোর" তুকাবলে "করিনু ধারণ,
একাদশী ব্রত উপবাস জাগরণ।"

উপরে তুকারাম তাঁহার স্ত্রীকে কর্কশা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—নিম্নোদ্ধৃত

* তুকারাম শূদ্র বলিয়া একজন ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক তিনি কবিতা লিখনে নিষিদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার বিশেষ বিবরণ আগামী বারে প্রকাশিত হইবে।

কতিপয় লোকে তাঁহার সেই স্ত্রীর প্রতি-মূর্ত্তি পাঠকেরা অবিকল চিত্রিত দেখিতে পাইবেন।

৫৬৬

আমারি বেলায় উনি সংসারে বিরাগী,
নিজের ত বাকী নাই সুখ,
সব সুখ ঘরে আসে,
শুধু মোর ঘুচিল না দুখ।
ঘরে অন্ন নেই বলে,
বল দেখি যাই কার দ্বার?
পোড়া সংসারের তরে,
কত জ্বালা সহি বল আর?
অন্ন অন্ন কোরে রাত দিন,
ছেলে-গুলো খেলে যে আমায়!
মরণ তাদের হয়,
সকল বালাই ঘুচে যায়।
সকলি ঝেঁটিয়ে নিয়ে যান,
তিল মাত্র ঘরে থাকা ভার।
ঘরে যে গোবর দেবো,
একটীও গরু নাই তার।
তুকা বলে, "দূর পোড়ামুখী,
আপনি মাথায় নিলি ভার।
এখন তাহার তরে,
কাঁদিলে কি হবে বল্ আর।"

৫৬৭

বোধ হয় এ পাষণ্ড,
পূর্ব্ব জন্মে ছিল মোর অরি।
এ জনমে স্বামী হোয়ে,
বৈর সাধিতেছে এত করি।
কত জ্বালা স'ব আর,
কত ভিক্ষা মাগি পর দ্বারে।
বিঠোবার মুখে ছাই—
কি ভাল কোল্লেন এ সংসারে?
তুকাবলে "স্ত্রী আমার,
রাগিয়া কতই কটু ভাষে।
কভু বা কাঁদিয়া মরে,
কভু বা আপন মনে হাসে।"

৫৬৮

ঘরে দুটা অন্ন এলে,
ছেলেদের দেব কোথা খেতে।
হত ভাগা তা দেবে না,
সকলি পরেরে যা'ন দিতে!
তুকা বলে "অতিথিরে,
যখনি গো দিতে যাই ভাত।
রাক্ষসীর মত এসে,
হতভাগী ধরে মোর হাত।"
"না জানি যে পূর্ব্ব জন্মে,
কতই করিয়া ছিলি পাপ।"
তুকা বলে "এ জনমে,
তাই এত পেতেছিস্ তাপ।

৫৬৯

খাবার কোথায় পাবি বাছা,
বাপ তোর থাকেন মন্দিরে—
মাথায় জড়ান্ তিনি মালা,
ঘরে আর আসেন না ফিরে।
নিজের হোলেই হল খাওয়া,
আমাদের দেখেন না চেয়ে।
খর্ত্তাল বাজিয়ে শুধু,
মন্দিরে বেড়ান্ গেয়ে গেয়ে।
কি করিব বল্ দেখি,
কিছুই ত ভেবে নাহি পাই।
ঘরে না বসেন এক রত্তি,
চলে যান অরণ্যে সদাই।

তুকা বলে "ধৈর্য্য ধর,
এখনো সকল ফুরায় নাই।"

৫৭০

গেছে সে আপদ গেছে,
ঘরেতে থাকিবে তবু রুটি।
যা হোক্ তা হোক্ কোরে,
পেট ভরে খেতে পাব দুটি।
বোকে বোকে দিনু এল্যে,
জ্বালাতন হনু হাড়ে মাসে,
তুকা বলে "যদিও সে,
দিবা নিশি কত কটু ভাষে।
তুকারে তুকার স্ত্রী,
মনে মনে তবু ভাল বাসে।"

৫৭১

ঘরে আর আসেনা সে,
কোন পরিশ্রম নাহি কোরে।
নিজে না কি খেতে পায়,
রোজ রোজ সুখে পেট ভোরে।
না উঠিতে শয্যা হতে,
মিলি দল-বল-গুলা সাথে।
করতাল বাজাইতে,
আরম্ভ করেন অতি প্রাতে।
খেয়েছে লজ্জার মাথা,
জ্যান্তে তারা মড়ার মতন।
ঘরে আছে ছেলে পিলে,
তাদের ত না করে যতন।
স্ত্রী তাদের পোড়ে আছে—
হতভাগী লাজ-দুঃখ-ভরে।
অভিশাপ দিতে দিতে—
মাথায় পাথর ভেঙ্গে মরে।
"ভাগ্যে যাহা আছে তাহা,"
তুকা বলে "থাক সহ্য কোরে।"

৫৭২

হেথা কেন আসে লোক-গুলা,
তাদের কি কাজ নাই হাতে?
তুকা কহে "ঈশ্বরের তরে,
পৃথিবী মিলেছে মোর সাথে।
"দু চারিটা ভাল বাক্য,
তাতে কিবা ক্ষতি বৃদ্ধি আছে?
"কোথাও যায় না তারা,
ভালবেসে আসে মোর কাছে।
"এও সে বাসে না ভাল,
ভাগ্য কি বা আছে এর বাড়া,
"সকল লোকের পাছে,
কুকুরের মত করে তাড়া।"

তুকারাম সংসারাশ্রম হইতে অবসৃত হইয়া ভজন-পূজন-কীর্ত্তনে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। প্রত্যূষে স্নান করিয়া বিঠোবার মন্দিরে গমন ও দেবপূজাদি সমাপন করিয়া অরণ্যে প্রস্থান—এই তাঁর নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম। দেহূর তিন ক্রোশ পশ্চিমে "ভাণ্ডারী" নামক পাহাড় তাঁহার প্রিয় আবাসস্থান ছিল। তথায় সমস্ত দিবস ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকিয়া সন্ধ্যার সময় দেহূতে ফিরিয়া আসিয়া বিঠোবার মন্দিরে ভজনাদি করিতেন। কিন্তু তিনি যে একেবারে গৃহধর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। একবার তিনি ক্ষেত্র রক্ষণ কার্য্যের ভার লইয়া যে বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহার বিবরণ এই—

এক দিন তিনি ইন্দ্রায়নী-তীরে বসিয়া উপাসনা করিতেছেন এমন সময় তাঁহার নিকটে এক জন কৃষক আসিয়া উপস্থিত।

সে তুকারামকে বলিল "তুকারাম শেট, মিছা মিছি নিষ্কর্ম্মার ন্যায় ঘরে বসিয়া আছ, যদি আমার ক্ষেত রক্ষণ কর ত তুমি আধ মন করিয়া দানা পাইবে, তাহাতে তোমার পরিবারের ভরণ পোষণে সাহায্য হইবে—আর যদি কোথাও হরিনাম করিতে ইচ্ছা হয় তাহাও করিতে পারিবে।" তুকারাম তাহাতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাকে ক্ষেত্র রক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ক্ষেতকারী গ্রামান্তরে চলিয়া গেল। তুকারাম ক্ষেত্ররক্ষণ কালে দেখিলেন যে, দানার লোভে ঝাঁকে ঝাঁকে পক্ষীদল আসিয়া শস্যক্ষেত্রে উপদ্রব আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত প্রাণীকে তাড়াইয়া দেওয়া দোষের কার্য্য জানিয়া তিনি তাহাদের তাড়াইয়া দিতে বিরত হইলেন। তিনি ক্ষেত্র মধ্যে কাঠমঞ্চের উপর বসিয়া ধ্যানে মগ্ন, এদিকে পক্ষীরা অকুতোভয়ে শস্য খাইয়া যায়। এইরূপে এক মাস চলিয়া গেলে ক্ষেতকারী প্রত্যাগত হইয়া দেখে যে তাহার ক্ষেত্র বিহঙ্গকুলের বাসস্থান হইয়াছে। ইহা দেখিয়া সে ক্রোধভরে তুকারামকে তাঁহার অনবধানীতা জন্য বিস্তর তিরস্কার করিতে লাগিল, পরে গ্রামের পাঁচ জনকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিল। তাঁহারা ক্ষেতকারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার ক্ষেত্রে কত মন শস্য উৎপন্ন হয়? সে কহিল "দুই খণ্ডী"। তাঁহারা তদনুসারে দুই খণ্ডীর মূল্য ক্ষেতকারীকে দণ্ডস্বরূপ লিখিয়া দিতে তুকারামের প্রতি আদেশ করিলেন। তৎপরে পঞ্চায়তের মধ্যস্থগণ নিজ চক্ষে ক্ষেত্র তদারক করিতে গিয়া যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে অবাক্। দেখেন যে ক্ষেত্রটি শস্যে শস্যে ছাইয়া গিয়াছে। সেই শস্য সংগৃহীত হইলে তাহা হইতে ১৭ খণ্ডী দানা উৎপন্ন হইল। গ্রামবাসীরা বিচারে ধার্য্য করিলেন যে দুই খণ্ডী মাত্র ক্ষেতকারীর কথা মত তাহার প্রাপ্য—অবশিষ্ট ভাগ তুকারামকে দিতে হইবে। কিন্তু তুকারাম তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। এক ব্রাহ্মণের নিকট উদ্বৃত্ত দানা গচ্ছিত রহিল। অবশেষে দেহূর মন্দির ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল তাহার সংস্করণ কার্য্যে তাহা ব্যয়িত হইল।

এই রূপে তাঁহার দিন যায়। এখনো পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের গতি নিরূপিত ও বিশ্বাসের স্থিরতা সম্পাদিত হয় নাই। মাঘ মাসের দশমী শুক্লপক্ষের রাত্রিতে তাঁহার এক স্বপ্ন হয় তাহাতেই তাঁহার জীবন-স্রোত নিয়মিত হইল। সেই স্বপ্নে বাবাজি নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আবির্ভূত হন ও চৈতন্যের শিষ্য বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়া তুকারামকে "রাম, কৃষ্ণ, হরি" এই মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। সেই সময় অবধি তুকারামের হৃদয়-গ্রন্থি খুলিয়া গেল—সকল সংশয় ভঞ্জন হইল। তিনি যে অগাধ শান্তি ও আনন্দ লাভ করিলেন তাহা নিজেই কতিপয় শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন।

৩৭১

শুনদেব, মনে যাহা করেছি নিশ্চয়,
জীবন সঁপিনু পদে হইয়ে নির্ভয়।

সকলি করেছি ত্যাগ, তোমারেই চাই,
সংশয় আশঙ্কা ভয় আর কিছু নাই।
হে অনন্ত দেব মোর, আছিল সম্বন্ধ তোর,
তব সাথে বহু পূর্ব্বে যাহা।
মিলি যত সাধুগণ, আমাদের সে বাঁধন,
দৃঢ়তর করিলেন আহা।
আর কিছু নাই, শুধু ভক্তি ও জীবন,
যা আছে তোমারি পদে করেছি অর্পণ।
সাধুগণ সঁপিয়াছে, আমারে তোমারি কাছে,
আমি কভু ছাড়িব না ওতব চরণ।
তুমিই কর গো মোর লজ্জা নিবারণ।

এই ক্ষণে তুকারামের জীবনের সেই ভাগে অবতীর্ণ হওয়া যাইতেছে যখন তিনি অভঙ্গ রচনা আরম্ভ করিলেন। যে ঘটনায় তিনি ভারতী-বন্দনে জীবন উৎসর্গ করিলেন তাহা ১৩২০—২১ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে।

নাম-দেব পাণ্ডুরঙ্গে লোয়ে সঙ্গে করে,
একদা দিলেন দেখা স্বপ্নে তিনি মোরে।
আদেশ করিলা মোরে কবিতা রচনে,
মিছা দিন না যাপিয়া প্রলাপ বচনে।
ছন্দ কহি দিলা মোরে—গম্ভীর সে বাণী,
বিঠ্‌ঠলজী নিজ হস্তে ধরেন লেখনী।
কহিলেন পিঠ মোর চাপড়িয়া হাতে,
এক শত কোটি শ্লোক হইবে পূরাতে।

১৩২১

যদি মোরে স্থান দেও তব পদছায়,
দিবা নিশি সাধু সঙ্গে রহিব সেথায়।
যাহা ভাল বাসিতাম ছেড়েছি সকল,
তুমি মোরে ছাড়িও না শুনগো বিঠ্‌ঠল।
চরণের এক পাশে দেহ যদি স্থান,
শান্তি সুখে কাটাইব এ মম পরাণ।
নাম-দেবে মোর কাছে পাঠালে স্বপনে,
এই অনুগ্রহ তব গাঁথা র'ল মনে।

শ্রী স—

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, পৃথিবীতে মনুষ্যের অভিব্যক্তি আর মাতৃগর্ব্ভে মনুষ্যের অভিব্যক্তি, উভয়ের প্রকরণ-পদ্ধতি সামান্যতঃ একই প্রকার। পৃথিবীতে ধাতু-প্রস্তর উদ্ভিদ্, অধম জীব-প্রবাহ এবং সর্ব্বশেষে মনুষ্য উত্তরোত্তর-ক্রমে অভিব্যক্ত হয়; মাতৃগর্ব্ভে মনুষ্য উত্তরোত্তর জড়পিণ্ড উদ্ভিদ্ এবং নিকৃষ্ট জীবের পূর্ব্বাভাস-সূচক আকার ধারণ করিয়া সর্ব্বশেষে মনুষ্যের আকার ধারণ করে। পৃথিবীতে যুগযুগান্তর কাল ব্যাপিয়া মনুষ্যের জন্ম-প্রকরণ চলিতে থাকে, মাতৃগর্ব্ভে দশ মাসের মধ্যেই উহা নিষ্পন্ন হয়,তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। পৃথিবীতে মনুষ্যের জন্ম-প্রকরণ যে কয়টি বিশেষ বিশেষ সোপান-পংক্তিতে বিভক্ত, মাতৃগর্ব্ভেও মনুষ্যের জন্ম-প্রকরণ সেই কয়টি সোপান-পংক্তিতে বিভক্ত। উভয়ের মধ্যে এই যে একটি মূল সৌসাদৃশ্য

ইহাই এক্ষণে বিবেচ্য ; কালব্যাপ্তির ইতর বিশেষে তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে না। বিজ্ঞান যেমন পৃথিবীতে এবং মাতৃগর্ভে মনুষ্যের আকার-অভিব্যক্তির প্রকরণ-সাদৃশ্য অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান সেইরূপ পৃথিবীতে এবং মনুষ্যেতে জ্ঞান-অভিব্যক্তির প্রকরণ-সাদৃশ্য অন্বেষণ করিয়া পাইতে পারেন। তবে, বিজ্ঞানের অন্বেষণ-প্রণালী এবং তত্ত্বজ্ঞানের অন্বেষণ-প্রণালী উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, প্রথমটি আরোহ-প্রণালী, দ্বিতীয়টি অবরোহ-প্রণালী। তত্ত্বজ্ঞান বলেন "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" অসতের সত্তা হইতে পারে না, সতেরও অসত্তা হইতে পারে না। যে বস্তু পূর্ব্বে একেবারেই ছিল না তাহা চিরকালই না থাকিবার কথা—অতএব জ্ঞান-পদার্থকে যখন অভিব্যক্ত হইতে দেখা যাইতেছে তখন অভিব্যক্তির পূর্ব্বেও তাহা প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান ছিল, ইহা অবশ্য মানিতে হইবে। পশুদিগের ক্রোধ লোভ ভয় এ সকল আছে কিন্তু জ্ঞান নাই। ক্রোধ লোভ ভয় ইহারা জ্ঞানের শত্রুপক্ষ, এজন্য রিপু শব্দে উক্ত হয়। ইহা সত্বেও ক্রোধাদির মধ্যে জ্ঞানের পূর্ব্বাভাস লক্ষিত হইয়া থাকে। ক্রোধোদ্দীপনের সময় "কেন আমি ক্রোধ করিতেছি" এ জ্ঞান স্পষ্টরূপে আমাদের মনে স্থান পায় না ইহা সত্য, আমি মানিলাম ; কিন্তু ইহাও ত সত্য যে ক্রোধের কারণ আমার জ্ঞানে প্রতিভাত হওয়াতেই আমার ক্রোধ হইয়াছে—এমন ক্রোধ হইয়াছে মনে কর যে, তাহার প্রভাবে আমার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে। বলিতেছি বটে জ্ঞান লোপ পাইয়াছে, কিন্তু তলে তলে ক্রোধের কারণ-জ্ঞান মনে জাগরূক না থাকিলে ক্রোধ কিসের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইবে ? ক্রোধের কারণ-দৃষ্টি হইতেই যখন ক্রোধ উৎপন্ন হইয়াছে, তখন সেই কারণ-জ্ঞানের অভাবে তাহা কিরূপে বর্ত্তিয়া থাকিবে, কারণের অভাবে কার্য্য কিরূপে বর্ত্তিয়া থাকিবে ? অতএব প্রচণ্ড ক্রোধের উদ্রেকে যখন জ্ঞান বিলুপ্ত-প্রায় হয় তখন বাস্তবিক তাহা বিলুপ্ত হয় না ; হয় কেবল এই যে, পূর্ব্বে জ্ঞান পরিস্ফুট ভাবে বর্ত্তমান ছিল, এখন অপরিস্ফুট ভাবে কিম্বা প্রচ্ছন্ন ভাবে পরিণত হইয়াছে—এখন যে তাহা একেবারেই নাই এমন নহে। পশ্বাদি জন্তুরা ভয় ক্রোধ লোভ মোহ দ্বারা ক্রমাগতই চালিত হয়, এ জন্য তাহাদের জ্ঞান চিরকালই প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান থাকে, কোন কালেই সমুচিত পরিস্ফুটতা লাভ করিতে পারে না। জ্ঞান সমুচিত পরিস্ফুট হইলে তাহা আপনি আপনাকে জ্ঞান পদার্থ বলিয়া জানে, এবং জ্ঞানকে প্রাধান্য দিয়া তাহারই নিয়মাধীন হইয়া চলে, জ্ঞান তখন জ্ঞানের নিয়মাধীন হইয়া চলে, আপনি আপনার নিয়মাধীন হইয়া চলে, স্বাধীন হইয়া চলে, ক্রোধাদির দ্বারা অভিভূত হয় না। বৃক্ষলতা ক্রোধ বা লোভ বা ভয় ইহার কোন কিছু দ্বারাই চালিত হয় না, অথচ তাহারা জীবদিগের ন্যায় অন্ন আহার দ্বারা পরিপুষ্ট এবং

বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। নিদ্রাবস্থায় আমাদের জ্ঞান যদি শরীরের সহিত সংযুক্ত না থাকিত তাহা হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের কার্য্য, শরীরের বর্দ্ধন এবং পোষণ কার্য্য সকলই স্থগিত হইত। প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমাদের জ্ঞান যেমন প্রচ্ছন্ন-ভাবে শরীরাভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকিয়া শরীরের পুষ্টিসাধন-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তরুলতাতে জ্ঞান সর্ব্বদাই সেই ভাবে অবস্থিতি করে। মনুষ্যের এমনও সমাধি অবস্থা দেখা গিয়াছে,যে অবস্থায় তাহার শরীরের পোষণ-ক্রিয়া, শ্বাস-ক্রিয়া প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই স্থগিত হইয়া যায় অথচ তাহার জ্ঞান শরীরাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া শরীরকে জরার আক্রমণ হইতে অব্যাহত রাখে। মনুষ্য সর্ব্বতোভাবে তুষারাবৃত হইলেও কখন কখন ঐরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই শেষোক্ত অবস্থায় মনুষ্যের জ্ঞান যেমন ঐকান্তিক প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করে, ধাতু প্রস্তরে জ্ঞান সর্ব্বদাই সেইভাবে অবস্থিতি করে। এই রূপ মত সর্ব্বাংশে সত্য হউক্ বা না হউক্, বিজ্ঞান এবং তত্ত্বজ্ঞান উভয়ে মিলিয়া ইহার স্থূল তাৎপর্য্যটির পোষকতা করিতেছে। উভয়ে মিলিয়া বলেন যে, ভৌতিক মনুষ্য (অর্থাৎ মনুষ্যের বাহ্য অবয়ব) হঠাৎ সৃষ্ট হয় নাই—যুগযুগান্তের কাল ব্যাপিয়া ভৌতিক-বস্তু আকার-হইতে আকারান্তরে পদার্পণ করিয়া সর্ব্বশেষে মনুষ্যাকারে পরিণত হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞান বলেন যে, আধ্যাত্মিক মনুষ্য (অর্থাৎ জ্ঞান-ঘন আত্মা) হঠাৎ সৃষ্ট হয় নাই, প্রচ্ছন্ন ভাব হইতে উত্তরোত্তর অভিব্যক্তি লাভ করিয়া পরিশেষে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বিজ্ঞান বলিতেছেন জগতের ক্রম-পরিণাম-পদ্ধতি, এবং গর্ব্ভস্থ মনুষ্যের ক্রম-পরিণাম-পদ্ধতি এপিট ওপিট বলিলেই হয়। তত্ত্বজ্ঞান বলেন জগৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, মনুষ্য ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড; এমন কি মনুষ্য সমুদয় জগতের নূতন সংস্করণ-স্বরূপ। মনুষ্যেতে জড়ভাব আছে, উদ্ভিদভাব আছে, পশু-ভাব আছে, এবং তদ্ব্যতীত এমনি একটি বিশেষ ভাব আছে, যাহাতে সে আপনার সত্তাকে আপনি করতলে পাইয়া, সুনিশ্চিত প্রণালী অনুসারে আপনি আপনার উন্নতি সাধনকার্য্যে যত্নবান হয়। সে ভাবটি প্রজ্ঞার পরিস্ফুট ভাব। সৃষ্টির প্রথমাবস্থায় জগতে জড়-ভাবের প্রাদুর্ভাব-বশতঃ প্রাণ মন অহঙ্কার প্রজ্ঞা, অভিভূত অবস্থায় বর্ত্তমান ছিল। কাল-ক্রমে একটির পর আর একটি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে প্রজ্ঞা প্রাদুর্ভূত হইয়া নিম্নের সমস্ত ভাবগুলি সুচারুরূপে পরিচালনা করে। প্রজ্ঞার উন্মেষ হইলে আমাদের আপনার উপর আপনার একটা চিরস্থায়ী স্বত্ব উপলব্ধি হয়, তাই আপনার উন্নতির প্রতি আমাদের যত্ন হয়। ভূমির উপর চিরস্থায়ী স্বত্ব জন্মিলে তবেই ভূমির উন্নতি সাধনে আমাদের মন যায়—উহাও সেইরূপ। বিজ্ঞান সর্ব্ব জগতের মধ্যে বাহিরের মিল দেখিয়াই ক্ষান্ত থাকেন, তত্ত্বজ্ঞান ভিতরের মিল অন্বেষণ করেন। প্রত্যেক বস্তুই সমুদায় জগতের সর্ব্বসাধারণ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে; প্রত্যেক বস্তুর

মধ্যেই এমনি একটি নিয়ামক রহিয়াছে, যদ্দ্বারা তাহা সমুদায় জগতের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিতে বাধ্য হয়। এই যে নিয়ামক ইহা প্রজ্ঞা। আবার, প্রত্যেক বস্তুর এমনি একটি বিশেষ ভাব আছে, যাহা আর কাহারো নাই। সেই বিশেষ ভাবের গুণে প্রত্যেক বস্তুরই জগদভ্যন্তরে বিশেষ একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর এই যে বিশেষ ভাব ইহাই অহংভাব। সন্নিধান-বর্ত্তী বস্তু সকলের প্রভাবে প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে ক্রিয়া জন্মে; এই যে আভ্যান্তরিক ক্রিয়াক্ষেত্র ইহাই মন। এবং প্রত্যেক বস্তুর যে বহিরাবরণ তাহা তাহার শরীর—কি না ইন্দ্রিয়-সমষ্টি। এইরূপ করিয়া দেখিলে সকল জগতের মধ্যে একটি নিগূঢ় ঐক্য উপলব্ধি হইতে পারে।

সামুদ্রিক জীব।

(প্রথম প্রস্তাব)

কীটাণু।

এই সমুদ্র, এই জলময় মহা মরুপ্রদেশ, যাহা মনুষ্যদিগের মৃত্যুর আবাস, যাহা শত শত জলমগ্ন অসহায় জলযাত্রীর সমাধি-স্থান, তাহাই আবার কত অসংখ্য জীবের জন্মভূমি, ক্রীড়াস্থল! স্থল-প্রদেশ এই জল-জগতের তুলনায় কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র। মিস্লে (Michelet) কহেন, পৃথিবীতে জলই নিয়ম-স্বরূপ, শুষ্ক ভূমি তাহার ব্যতিক্রম মাত্র। পৃথিবীর এই চতুর্দ্দিক্-ব্যাপী, এই কুমেরু হইতে সুমেরু পর্য্যন্ত বিস্তৃত মহাপরিখা যদি শুষ্ক হইয়া যায়, তবে কি মহান্, কি গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়, কত পর্ব্বত, কত উপত্যকা, সামুদ্রিক-উদ্ভিদ-শোভিত কত কানন কত ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড জীব আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয়। এই সামুদ্রিক অরণ্যে কত প্রাণী ছুটিতেছে, সাঁতার দিতেছে, বালীর মধ্যে লুকাইতেছে, কেহবা বিশাল পর্ব্বতের গাত্রে লগ্ন হইয়া আছে, কেহবা গহ্বরে আবাস নির্ম্মাণ করিতেছে, কোথাও বা পরস্পরের মধ্যে মহা বিবাদ বাধিয়া গিয়াছে, কোথাও পরস্পর মিলিয়া স্নেহের খেলায় রত রহিয়াছে। আমাদের প্রসিদ্ধ কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় সমুদ্র বর্ণনা-স্থলে যে একটি লোম-হর্ষণ চিত্র দিয়াছেন তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"যতই তোমার ভাব ভাবিহে অন্তরে,
ততই বিস্ময়-রসে হই নিমগন ;
এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যাহার উপরে,
না জানি কি কাণ্ড আছে ভিতরে গোপন।

৪২

আজি যদি আসি সেই মুনি মহাবল,
সহসা সকল জল শোষেন চুম্বুকে ;
কি এক অসীমতর গভীর অতল,
আচম্বিতে দেখা দেয় আমার সমুখে !

৪৩

কি ঘোর গর্জ্জিয়া উঠে প্রাণী লাখে লাখ,
কি বিষম ছট্ ফট্ ধড়ফড় করে ;
হঠাৎ পৃথিবী যেন ফাটিয়া দোফাক্,
সমুদয় জীবজন্তু পড়েছে ভিতরে।

৪৪

কোলাহলে পূরে গেছে অখিল সংসার,
জীবলোক দেবলোক চকিত স্থগিত ;
আর্ত্তনাদে হাহাকারে আকাশ বিদার
সমস্ত ব্রাহ্মাণ্ড যেন বেগে বিলোড়িত।

৪৫

আমি যেন কোন এক অপূর্ব্ব পর্ব্বতে
উঠিয়া দাঁড়ায়ে আছি সর্ব্বোচ্চ চূড়ায় ;
বালুময় ঢালুভাগ পদমূল হ'তে
ক্রমাগত নেমে গিয়ে মিশেছে তলায়।

৪৬

ধুধু করে উপত্যকা, অতল অপার,
অসংখ্য দানব যেন তাহার ভিতরে,
করিতেছে হুড়াহুড়ি—তুমুল ব্যাপার,
মরীয়া হইয়া যেন মেতেছে সমরে।

৪৭

ফেরোগো ও পথ থেকে কল্পনা সুন্দরী
ওই দেখ যাদকুল নিতান্ত আকুল,
নিতান্তই মারা যায় মরুর উপরি,
হেরে কি অন্তর তব হয়নি ব্যাকুল ?

৪৮

সেই মহা জলরাশি আন ত্বরা ক'রে,
ঢেকে দাও এই মহা মরুর আকার,
অমৃত বর্ষিয়া যাক্ ওদের উপরে ;
শান্তিতে শীতল হোক্ সকল সংসার।"

ক্ষুদ্রতম অদৃশ্য কীটাণু হইতে বৃহৎ তিমি মৎস্য পর্য্যন্ত এবং আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ হইতে সহস্র হস্ত দীর্ঘ আল্‌জি (Algæ) নামক উদ্ভিদ পর্য্যন্ত এই সমুদ্রের গর্ব্ভে প্রতিপালিত হইতেছে। এই সমুদ্র-গর্ব্ভে যত প্রাণী আছে, স্থল-প্রদেশে তত প্রাণী নাই !

সমুদ্রে এক প্রকার অতি নিকৃষ্টতম শ্রেণীর প্রাণী দেখিতে পাইবে। তাহারা উদ্ভিজ্জ শ্রেণী হইতে এক সোপান মাত্র উন্নত। তাহাদের শারীর যন্ত্র এত সামান্য যে, সহসা তাহাদের প্রাণী বলিয়া বোধ হয় না। ইহারাই পৃথিবীর প্রাণী সৃষ্টির মধ্যে আদিম সৃষ্টি বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। পৃথিবী যত প্রাচীন হইতে লাগিল, ততই জটিল শরীর-প্রকৃতি-বিশিষ্ট জীবের উৎপত্তি হইল। অবশেষে তাহার উৎকর্ষের সীমা মনুষ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কেহ মনে করেন, এই খানেই আসিয়া শেষ হইল, আর অধিক অগ্রসর হইবে না, কিন্তু কে বলিতে পারে, এই মনুষ্যালয়ের উপর আর এক স্তর মৃত্তিকা পড়িয়া যাইবে না, ও এই মনুষ্য-সমাজের সমাধির উপর আর একটি উন্নততর জীবের উৎপত্তি হইবে না। পৃথিবীর প্রথম অবস্থায় উদ্ভিদ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না, তাহার মধ্যে

প্রথমে আবার নিকৃষ্টতম উদ্ভিদের জন্ম হয়।

যদি কিয়ৎপরিমাণে জল খোলা জায়গায় কোন পাত্রে রাখিয়া দেওয়া হয়, তবে শীঘ্রই দেখা যায়, তাহার উপর পীত ও হরিৎবর্ণের অতি সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়াছে, অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, সেগুলি আর কিছুই নহে, সহস্র সহস্র উদ্ভিদ্ পদার্থ ভাসিতেছে। তাহার পরেই সহস্র সহস্র কীটাণু দেখা যাইবে, তাহারা দলবদ্ধ হইয়া সাঁতার দিতেছে ও সেই উদ্ভিজ্জ আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিতেছে। এই উদ্ভিদ পদার্থ যাহা আমরা অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দেখিতে পাই না, তাহাই হয় ত তাহাদের নিকটে একটি বৃহৎ রাজ্য। পরে আর এক দল কীটাণু উত্থিত হইয়া প্রথমজাত কীটাণুদিগকে আক্রমণ করে, ও উদরসাৎ করিয়া ফেলে। প্রথমে উদ্ভিদ, পরে উদ্ভিদ-ভোজী জীব, তৎপরে মাংসাশী প্রাণী উৎপন্ন হয়।

কোন্ খানে উদ্ভিদ-শ্রেণী শেষ হইল ও জীব-শ্রেণীর আরম্ভ হইল, তাহা ঠিক নিরূপণ করা অতিশয় কঠিন। দেখা গিয়াছে যে, শৈবালের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে, অ্যাল্‌জি জাতীয় উদ্ভিদে, প্রাণি-জীবনের কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ বর্ত্তমান আছে; মনে হয় যেন তাহাদের চলনেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের গাত্রে চলন-শীল যে সূক্ষ্ম সূত্র লম্বমান থাকে, তাহার দ্বারা তাহারা ইতস্ততঃ চলিয়া বেড়ায়, তাহা দেখিয়া সর্ব্বতোভাবে মনে হয় যেন তাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক চলিয়া বেড়াইতেছে। কতকগুলি উদ্ভিদের অঙ্কুর এবং উদ্ভিদের উৎপাদনী আণবিক রেণুকণা (Fecundating corpuscles) জলে ভাসিবার সময় নিকৃষ্ট প্রাণীদিগের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে, আবার পুনরায় ফিরিয়া আসে ও পুনরায় সেদিকে ধাবমান হয়। এই রূপে আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, যেন তাহাদের চেষ্টা করিবার ক্ষমতা আছে। ইহাদের সহিত যদি সামুদ্রিক কতকগুলি নিকৃষ্ট জাতীয় জীবের তুলনা করা হয়, তবে কাহারা উদ্ভিদ্ ও কাহারা প্রাণী তাহা স্থির করা দুষ্কর হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বোক্ত নিকৃষ্ট জাতীয় জীবদিগকে ইয়ুরোপীয় ভাষায় জুফাইট (Zoophyte) অর্থাৎ উদ্ভিদ্জীব বা উদ্ভিদ্-প্রাণী কহে। কারণ ইহাদের মধ্যে অনেকের বাহ্য আকৃতি উদ্ভিদের ন্যায়, তাহাদের শরীর হইতে উদ্ভিদের ন্যায় শাখা বহির্গত হয়, এবং তাহাদের কোন কোন অঙ্গ নানা বর্ণে চিত্রিত এবং দেখিতে পুষ্পের ন্যায়। প্রবালদিগকে দেখিতে অবিকল উদ্ভিদের ন্যায়, মৃত্তিকায় বা পর্ব্বতে তাহাদের মূল-দেশ নিহিত থাকে, এবং গাত্র হইতে শাখা প্রশাখা বহির্গত হয়, এবং তাহাদের রঙ্গিল অঙ্গগুলি কাল-বিশেষে অবিকল পুষ্পের ন্যায় আকার ধারণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা এই প্রবালকে নিঃসংশয়ে উদ্ভিদ্ বলিয়া গণ্য

করিয়া গিয়াছেন, সম্প্রতি ইহা প্রাণী বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

এই নিকৃষ্টতম প্রাণীদিগের কি বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি আছে? ইহা স্থির করা এক প্রকার অসম্ভব। প্রথমতঃ ইহারা প্রাণী কি উদ্ভিদ্, তাহাই কত কষ্টে স্থিরীকৃত হইয়াছে, এক্ষণে ইহাদের বুদ্ধি বা মনোবৃত্তি আছে কিনা তাহা স্থির করিতে বোধ হয় অনেক বিলম্ব লাগিবে। শুক্তিরা ত জন্মাবধি এক শৈলেই আবদ্ধ থাকে। কীটাণুরাও একটি মাত্র ক্ষুদ্রতম স্থান ব্যাপিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। (Amibæ) অ্যামিবি কীটগণ, মিনিটের মধ্যে যাহারা শত বার আকার পরিবর্ত্তন করে, তাহারা ত জীবন্ত পরমাণু মাত্র। ইহাদের বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি আছে কিনা তাহা স্থির করা যে দুরূহ, তাহা বলা বাহুল্য।

উদ্ভিদ্‌জীবদিগের কঙ্কাল অতিশয় অপূর্ণ, স্নায়ুযন্ত্র অত্যন্ত অপরিস্ফুট। এই জাতীয় অধিকাংশ জীবের স্পর্শ ভিন্ন অন্য প্রকার অনুভূতি নাই, ইহারাই প্রাণি-জগতের শেষ শ্রেণীয় নিকৃষ্টতম জাতির অন্তর্ভূত। উদ্ভিদ্‌জীবেরা অনেক জাতিতে বিভক্ত।

লয়বেন হয়েক (Leuwenhoek) যখন অণুবীক্ষণ লইয়া সমুদ্রের এক বিন্দু জল পরীক্ষা করিতে গেলেন, তখন দেখিলেন, সেই এক বিন্দু জলের মধ্যে একটি নূতন জগৎ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। সেই নূতন রাজ্যের অধিবাসীদিগের সংক্ষেপ বিবরণ পাঠ করা যাক্।

রিজোপডা (Rizopoda) বা শীকড়-পদ কীটগণের বিশেষ প্রকৃতির মধ্যে, উহাদের পাক যন্ত্র নাই, জলজ উদ্ভিদ্‌গণের ন্যায় উহাদের গাত্রে যে সূক্ষ্ম সূত্র থাকে তাহা দ্বারা চলা-ফিরা করে, নিজ শরীর ইচ্ছাক্রমে বর্দ্ধিত ও শাখা প্রশাখায় বিভক্ত করিতে পারে। সময়ে সময়ে দেখা যায়, শাখা প্রশাখায় বিভক্ত অঙ্গগুলি ক্রমে গুটাইয়া আসে, ও ক্রমে তাহাদের শরীরের মধ্যে মিলাইয়া যায়। মনে হয় যেন আপনার শরীর আপনিই ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। এই জাতীয় কীটেরা আবার অন্যান্য কীট এবং অন্যান্য জন্তুদিগের গাত্রে লগ্ন হইয়া প্রাণ ধারণ করে। অনেক জাতীয় রিজোপডা আছে, তন্মধ্যে দুই তিনটির বিবরণ প্রকাশ করা যাইতেছে।

অ্যামিবি (Amibæ) নামক কীটাণুদিগের আঠাবৎ শরীর এমন স্বচ্ছ, এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রাখিয়া সময়ে সময়ে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহাদের শরীরের গঠন যে কি প্রকার তাহা কিছুই ভাবিয়া পাওয়া যায় না। অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে ইহারা এক বিন্দু জলের ন্যায়, কিন্তু মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ইহারা এত বিভিন্ন আকার ধারণ করে, যে ইহাদের আকৃতি কোন মতে নির্দ্ধারিত করা যায় না। ইহাদের শরীরে পাকযন্ত্র দেখা যায় না, তবে ইহারা কি করিয়া জীবন ধারণ করে? এই রূপ স্থির হইয়াছে, যে, খাদ্যদ্রব্য তাহারা শরীরের সহিত মিশাইয়া লয়। অণুবীক্ষণ দিয়া ইহাদের শরীরে মাঝে মাঝে উদ্ভিদের অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারা যেরূপ ইচ্ছামতে শরীর প্রসারিত ও কুঞ্চিত করিতে পারে, তাহাতে শরীরের সহিত খাদ্য মিশ্রিত করিবার ইহাদের অনেকটা সুবিধা আছে। কোন একটি উদ্ভিদাণুর উপরে নিজ শরীর প্রসারিত করিয়া পুনরায় কুঞ্চিত করিলে সহজেই তাহা তাহাদের শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যায়।

ফরামিনিফেরা (Foraminifera) নামক পূর্ব্বোক্ত জাতীয় আর এক প্রকার কীট আছে, তাহারা প্রায় চক্ষুর অদৃশ্য বলিলেও হয়. তাহাদের আয়তন এক ইঞ্চির ২ শতাংশ অপেক্ষা অধিক নহে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র কীটগণের দ্বারা কত বৃহৎ ব্যাপার সম্পাদিত হইয়াছে, ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পৃথিবীর অনেক স্থানের আবরণ কেবল মাত্র ইহাদেরি দেহে নির্ম্মিত হইয়াছে। আমাদের আবাস-গ্রহের তরুণাবস্থায় বোধ হয় এই কীটগণ অসংখ্য পরিমাণে সমুদ্রে বাস করিত। তাহাদের রাশীকৃত মৃত দেহে কত বৃহৎ পর্ব্বত সৃষ্টি হইয়া সমুদ্র-গর্ভ হইতে মাথা তুলিয়াছে। সমুদ্রের বালুকা অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, তাহাদের অর্দ্ধেক ইহাদের কঠিন গাত্রাবরণ। রুসিয়ার প্রকাণ্ড চূণের পর্ব্বতগুলি ইহাদেরি দেহে নির্ম্মিত। যে চা-খড়ির পর্ব্বত ফ্রান্স দেশস্থ শ্যাম্পেন হইতে ইংলণ্ডের মধ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহা এই জীবদেহের স্তূপ মাত্র। যে চা-খড়ির দ্বারা প্রায় প্যারিসের সমগ্র ভূভাগ নির্ম্মিত, তাহা ইহাদেরি দেহ-সমষ্টি। এই কীট-সমষ্টির উপরে কত বিদ্রোহ, কত বিপ্লব, কত রক্তপাত হইয়া গেছে, ও হইবে। এই কীট-সমষ্টির উপর সভ্যতার উন্নততম প্রাসাদ নির্ম্মিত। প্রকৃত কথা এই যে, এই ক্ষুদ্র কীটগণের মৃতদেহ-রাশির উপরে জগতের আর এক জাতীয় উন্নততর কীটাণু ক্রীড়া করিতেছে!

ডর্ব্বিগ্নি (D'orbigny) তিন গ্রাম বালুকার মধ্যে চারি লক্ষ চল্লিশ সহস্র ফরামিনিফেরার গাত্রাবরণ পাইয়াছেন। ইহাদের কত দেহ যে পৃথিবীর ভূভাগের আয়তন বর্দ্ধিত করিতে নিযুক্ত হইয়াছে তাহা কল্পনারও অগম্য। ইহাদের স্তূপে অ্যালেক্‌জান্দ্রিয়ার বন্দর ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, ইহাদের স্তূপে সমুদ্রের কত স্থানের তীরভাগ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রবাল এবং অন্যান্য দুই একটি সামুদ্রিক পদার্থের ন্যায় ইহারাও সমুদ্রের মধ্যে অনেক দ্বীপ নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই চক্ষুর অদৃশ্য পদার্থ সমুদ্রের বিশাল উদর পূর্ণ করিয়া ক্রমে ক্রমে কিরূপে দ্বীপ ও পর্ব্বত সমূহ নির্ম্মাণ করে ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ইহাদের দেহ আঠাবৎ পদার্থে নির্ম্মিত। স্বীয় গাত্রাবরণের মধ্য দিয়া ইহারা শাখা প্রশাখাবান্ অঙ্গ বহির্গত করে, এই অঙ্গ দ্বারা তাহারা চলা-ফিরা করিয়া থাকে। ইহাদের ঐ ক্ষুদ্রতম হস্তপদে আবার বিষাক্ত পদার্থ আছে। দেখা গিয়াছে, ইনফিউসোরিয়া (Infusoria) প্রভৃতি কীটের গাত্রে ইহাদের বিষাক্ত হস্ত লাগিলে তৎক্ষণাৎ তাহারা অচল হইয়া যায়। এই রূপে তাহারা শীকার করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র

কীটগণ নিষ্ঠুর মাংসাশী, ইহারা আবার কত কীটাণুর বিভীষিকা-স্বরূপ। ইহারা আবার আপনাদিগের ক্ষুদ্র কীটাণু-রাজ্যে আক্রমণ করে, সংহার করে, কতই গোলযোগ করে। ডুজার্দ্যাঁ (Dujardin) দেখিয়াছেন, ইহারা ইচ্ছা করিলে আপনার শরীর হইতে নূতন হস্তপদ নির্ম্মিত করিতে পারে, প্রয়োজন অতীত হইয়া গেলেই পুনরায় তাহা আপনার শরীরের সহিত মিশাইয়া ফেলে। ইহাদেরো শরীরে এপর্য্যন্ত পাকযন্ত্র দেখা যায় নাই। ইহাদের সুদৃশ্য গাত্রাবরণ নানা প্রকার। ইহাদের বিভিন্ন গাত্রাবরণ-অনুসারে ইহাদের জাতির ভিন্নতা নিরূপিত হয়।

সমুদ্রের নক্তালোকা (Noctiluca) নামক কীটের বিষয় দুই এক কথা বলা যাউক্। বাল্মীকি সমুদ্র বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে "স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল। উহা অতল স্পর্শ। ভীম অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে; উহাদের দেহ জ্যোতির্ম্ময়। সাগর-বক্ষে যেন অগ্নি-চূর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।" এখনকার নাবিকেরাও সমুদ্র ভ্রমণ করিবার সময়, সময়ে সময়ে দেখিতে পান, সাগর-বক্ষে যেন অগ্নিচূর্ণ প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে। দাঁড়ের আঘাতে এবং তরঙ্গের গতিতে তাহাদের উজ্জ্বলতা আরো বৃদ্ধি হইয়া উঠে। সমস্ত সমুদ্র যেন একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বলিয়া বোধ হয়। কখন ভাঁটা পড়িয়া গেলে দেখা যায় পর্ব্বত-দেহে, সামুদ্রিক তৃণ-সমূহে ও তীর-ভূমিতে যেন আগুন লাগিয়াছে। বাল্মীকির সময়ে যাহা লোকে অজগরের দেহজ্যোতি বলিয়া মনে করিত, বৈজ্ঞানিকেরা অসংখ্য ক্ষুদ্র কীটের-দেহ নিঃসৃত ফস্ফরীয় আলোক বলিয়া জানিয়াছেন। সেই কীটদিগের নাম নক্তালোকা। ঝটিকা-মত্ত অন্ধকার রাত্রে রজত ফেনময় অধীর তরঙ্গের দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া এই জ্বলন্ত কিরণ কি সুন্দর শোভাই ধারণ করে।

ইন্‌ফিউসোরিয়া (Infusoria) কীট অ্যামিবির ন্যায় পরিষ্কার বা লবণাক্ত, শীতল বা উষ্ণ সকল প্রকার জলেই বাস করে। সপ্তদশ শতাব্দীর বিখ্যাত বিজ্ঞানবিৎ লয়্‌বেনহয়েক ইহাদের প্রথম আবিষ্কর্ত্তা। এই চির-অস্থির কীটাণুগণ এত ক্ষুদ্র যে, একবিন্দু জলে ইহাদের কোটি কোটি বাস করিতে পারে। গঙ্গা প্রতিবৎসর এত ইন্‌ফিউসোরিয়া সমুদ্রকে উপহার দিতেছে যে তাহা একত্র করিলে ইজিপ্টের পিরামিড্ অপেক্ষা ছয় শত গুণ অধিক হয়। মরুপ্রদেশে উৎকৃষ্ট জীবগণ বাস করিতে পারে না, কিন্তু সেখানেও ইহারা অসংখ্য পরিমাণে জীবন ধারণ করিয়া আছে। পৃথিবীর উচ্চতম পর্ব্বতের পরিমাণ অপেক্ষা গভীরতর সমুদ্র-তলদেশে এই অসংখ্য জীবিত-কণা বাস করিতেছে। মনুষ্যের ন্যায় এই অদৃশ্য কীটাণুগণও এই মহান্ জগতের একটি অংশ। এই কীটাণুদিগকে জগৎ হইতে বাদ দাও, জগৎ এক বিষয়ে অসম্পূর্ণ হইল। এমন স্থান নাই, যেখানে ইহারা নাই। সমুদ্রে, নদীতে, পুষ্করিণীতে, এমন কি, আমাদের শরীরস্থ রসে ইহারা

সঞ্চরণ করে। অনেক স্থানে পৃথিবীর স্তর বহু দূর ব্যাপিয়া কেবল মাত্র ইহাদের দেহে নির্ম্মিত। ইহাদিগের দেহের নিমিত্তই গঙ্গা নীল প্রভৃতি নদীতীরস্থ কর্দ্দমে উর্ব্বরা শক্তি জন্মে। ইহাদের ক্ষুদ্রতম গাত্রাবরণ জমিয়া এক প্রকার প্রস্তর নির্ম্মিত হয়। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ কহেন—অনেক উচ্চ পর্ব্বত ইহাদেরি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র—বিন্দু জলে যাহারা কোটি কোটি বাস করিতে পারে—তাহাদের স্তূপে পর্ব্বত নির্ম্মিত হইয়াছে!

এই কীটাণুগণ, কেহ কেহ জলে, কেহ বা আর্দ্র শৈলে, কেহ কেহ বা অন্য জন্তুর শরীরে বাস করিয়া থাকে। এমন কি, স্ত্রীলোকের স্তন দুগ্ধেও ইহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে। পাঠকেরা যদি কেহ অণুবীক্ষণ দিয়া এই কীটাণুগণকে দেখিতে চান, তবে এক পাত্র জলে, ডিম্বের শ্বেতাংশ ফেলিয়া মুক্ত স্থানে রাখিয়া দিবেন, ইহাতে ফস্ফেট্ অফ্ সোডা বা কার্ব্বোনেট অফ্ সোডা অথবা নাইট্রেট কিম্বা অক্সালেট্‌স্ অফ অ্যামোনিয়া দিলে এই কীটাণুগণ অতি শীঘ্র শীঘ্র বর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে।

এই কীটাণুদিগের মধ্যে স্ত্রী পুরুষের প্রভেদ আছে। কিন্তু গর্ভ ভিন্ন অন্য কারণেও ইহারা জন্মলাভ করে। ইহাদের অসংখ্য সঙ্গিগণ হইতে একটি কীটাণুকে স্বতন্ত্র লইয়া যদি অণুবীক্ষণ দিয়া পরীক্ষা করা যায়, তবে দেখা যাইবে, ইহার দেহের মধ্যভাগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, এবং ক্রমে নিম্ন প্রদেশে কতকগুলি চলনেন্দ্রিয়-সূত্র দেখা যাইতেছে। অবশেষে ক্রমশঃ ঐ কীট একেবারে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এবং এইরূপে দুইটি কীটের জন্ম হয়। বিচ্ছিন্ন অংশটিরও মুখ এবং অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে যেমন "আত্মাবৈ জায়তে পুত্রঃ' এমন মনুষ্যের মধ্যে নহে। এইরূপে একটি ইন্‌ফিউসোরিয়া, যাহা কত যুগ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, তাহারি খণ্ডাংশ হয়ত আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। দেখা গিয়াছে এক মাসের মধ্যে দুইটি কীটাণুর বিচ্ছিন্ন শরীরে ১০লক্ষ ৪৮সহস্র কীটাণু জন্ম লাভ করিয়াছে। ৪২ দিনে একটি কীটাণু-শরীর হইতে এককোটি ছত্রি শলক্ষ চল্লিশ সহস্র কীটাণু জন্মিয়াছে।

এই অতি ক্ষুদ্র কীটাণুর গাত্রেও আবার ক্ষুদ্রতর কীটাণু সঞ্চরণ করিতেছে, বৃহত্তর কীটাণুর গাত্র তাহার নিবাস ও আহার-স্থান। ঘণ্টাকতক মাত্র এই কীটাণুদিগের জীবন কাল। কিন্তু একটি আশ্চর্য্য দেখা গিয়াছে, যাহাতে বায়ু না পায় এমন করিয়া যত্নপূর্ব্বক ইন্‌ফিউসোরিয়াকে ঢাকিয়া রাখ, যতদিন পরেই হউক না কেন, গাত্রে এক বিন্দু জল লাগিলেই পুনরায় বাঁচিয়া উঠিবে। এইরূপে এই দুই ঘণ্টার জীব শতবৎসর মৃত থাকিয়া আবার মুহূর্ত্তে বাঁচিয়া উঠিতে পারে।

এই কীটাণুদিগের আর একটি আশ্চর্য্য প্রকৃতি আছে। ইহাদের শরীরের কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেও ইহারা মরিয়া যায় না। মৃত অর্দ্ধাংশ অদৃশ্য হইয়া যায়, আর জীবিত অংশটি যেন অতি নিশ্চিন্তভাবে

পুনরায় খেলা করিয়া বেড়ায়, যেন তাহার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই, অথচ সে হয়ত তাহার পূর্ব্ব শরীরের ষোড়শ অংশে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে।

যে জলবিন্দুতে এই কীটাণুগণ সাঁতার দিয়া বেড়ায়, তাহাতে যদি আমোনিয়াসিক্ত একটি পালক ডুবান যায়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের গতি বন্ধ হইয়া যায়। চলিবার জন্য তাহারা হাত পা সঞ্চালন করিতে থাকে বটে কিন্তু চলিতে পারে না। ক্রমে তাহাদের শরীর গলিয়া যাইতে থাকে। আবার যদি তাহাতে ভাল জল দেওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাদের গলন বন্ধ হইয়া যায়, আবার অবশিষ্ট অংশ সুখে সাঁতার দিয়া বেড়ায়।

এক প্রকার ইন্‌ফিউসোরিয়া আছে, উদ্ভিদ অথবা প্রাণীগণের গলিত দেহে তাহাদিগকে পাওয়া যায়। কিন্তু যখনি অন্যান্য কীট তাহাদের স্থান অধিকার করে, তখনি তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়। অর্থাৎ অন্য জাতীয় কীটেরা তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে। আবার যখন সেই সমস্ত দ্রব্য এমন পচিয়া যায় যে আর অন্য কোন কীট তাহাতে থাকিতে পারে না, তখন তাহারা পুনরায় আবির্ভূত হয়। দাঁতে যে শ্বেত পদার্থ আছে, তাহাতেও লয়বেনহয়েক্ এই কীটাণু দেখিতে পাইয়াছিলেন। অনেক রোগগ্রস্ত প্রাণীর শরীরস্থ রসেও ইহাদের বসতি। এক প্রকার ইন্‌ফিউসোরিয়া আছে, তাহার শরীর স্ক্রুর ন্যায় পেঁচাল। ইহারা এমন আশ্চর্য্য বেগে ঘুরিতে থাকে যে, চোক দিয়া দেখা যায় না, এবং কেন যে অত বেগে ঘুরিতেছে তাহার কোন কারণ ভাবিয়া পাওয়া যায় না। আর এক প্রকার কীটাণু আছে, তাহাদের শরীর যেন তাহাদের নিজের নহে। ইহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর কীটসমূহ ইহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে তাড়না করিয়া বেড়ায়, এবং ধরিতে পারিলেই তাহাদের গাত্রে চড়িয়া বসে, এবং বেচারীর সমস্ত রক্ত শোষণ করে, এবং রহিয়া বসিয়া তাহাকেও ভক্ষণ করিয়া ফেলে। উকুন বা ছারপোকার মত একটুতেই ইহাঁরা সন্তুষ্ট নহেন, যতক্ষণে সমস্ত আহার্য্য না ফুরাইয়া যায় ততক্ষণ ইহাঁরা ছাড়েন না। এ কীটাণুদের শুদ্ধ এই এক যন্ত্রণা নহে, আর এক প্রকারের কীটাণু ইহাদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে, যেমন ইহারা কাছে আসে, অমনি তাহারা ইহার শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এবং অল্প সময়ের মধ্যে সে বেচারীর শরীরে ঘর-কন্না ফাঁদিয়া বসে, অবশেষে পুত্র পৌত্র লইয়া সুখে তাহার শরীর ভক্ষণ করিতে থাকে। একটি কীটাণুর শরীরের মধ্যে অমন পঞ্চাশটা ক্ষুদ্রতর ক্ষুদ্রতম কীটাণু পাওয়া গিয়াছে।

ভ—

করুণা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আহা, বিষণ্ন করুণাকে দেখিলে এমন কষ্ট হয় যে, ইচ্ছা করে প্রাণ দিয়াও তাহার মনের যন্ত্রণা দূর করি। কত দিন তাহাকে আর হাসিতে দেখি নাই। ভাল করিয়া আহার করে না, স্নান করে না, ঘুমায় না; মলিন, বিবর্ণ, ম্রিয়মান, শীর্ণ; জ্যোতিহীন চক্ষু বসিয়া গিয়াছে; মুখশ্রী এমন দীন, করুণ হইয়া গিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয় না যে, এ বালিকা কখনো হাসিতে জানিত। ভবির হস্তে যাহা কিছু অর্থ ছিল সমস্ত প্রায় ফুরাইয়া গিয়াছে, কি করিয়া সংসার চলিবে, তাহার কিছুই ঠিক নাই। পণ্ডিত মহাশয়ের সাহায্যে কোন মতে দিন চলিতেছে।

নিধি স্বরূপের উল্লেখ করিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল "সে বাবুটি কি করে বলিতে পার?"

নরেন্দ্র—কেন, বল দেখি?

নিধি—ও লোকটিকে আমারই ত বড় ভাল ঠেকে না।

নরেন্দ্র—কেন কি হইয়াছে?

নিধি—না কিছুই হয় নাই, তবে কি না—সে কথা থাক্,—বাবুটির বাড়ি কোথায়?

নরেন্দ্র—কলিকাতা।

নিধি—আমিও তাহাই ঠাওরাইয়াছিলাম, নহিলে এমন স্বভাব হইবে কেন?

নরেন্দ্র—কেন, কি হইয়াছে, বলই না।

নিধি—আমি সে কথা বলিতে চাহি না। কিন্তু উহাকে বাড়ি হইতে বাহির করিয়া দেও।

নরেন্দ্র অধীর হইয়া উঠিয়া কহিল—কি কথা. বলিতেই হইবে।

নিধি কহিল—যাহা হইয়া গিয়াছে তাহার আর চারা নাই, কিন্তু সাবধান থাকিও, ও লোকটি আর যেন বাড়ির ভিতরের দিকে না যায়।

নরেন্দ্র।—সে কি কথা, স্বরূপ ত বাড়ির ভিতরে যায় নাই। নিধি—সেকি তোমাকে বলিয়া গিয়াছে? নরেন্দ্র অবাক্ হইয়া নিধির মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিধি কহিল—আমিত ভাই আমার কাজ করিলাম, এখন তোমার যাহা কর্ত্তব্য হয়, কর। নরেন্দ্র ভাবিল, এ সকল ত বড় ভাল লক্ষণ নয়। স্বরূপ কয়দিন ধরিয়া ভাবিয়াছে যে, করুণা তাহার জন্য একেবারে পাগল। একথা নিধি সহসা তাহাকে কেন কহিল? বুঝিল, নিশ্চয় করুণা তাহাকে দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছে। স্বরূপ ভাবিল, তবে আমিও তাহার প্রেমে পাগল, একথাওত তাহাকে জানানো উচিত। স্থির করিল, সুবিধা পাইলে নিজে গিয়া জানাইবে।

জ্যোৎস্না রাত্রি। ছেলেবেলা করুণা যেখানে দিনরাত্রি খেলা করিয়া বেড়াইত সেই বাগানের ঘাটের উপর সে শুইয়া

আছে, অতি ধীরে ধীরে বাতাসটি গায়ে লাগিতেছে। সেই জ্যোৎস্না রাত্রির সঙ্গে, সেই মৃদুবাতাসটির সঙ্গে, সেই নারিকেল বনটির সঙ্গে তাহার ছেলে বেলাকার কথা এমন জড়িত ছিল, যেন তাহারা তার ছেলে-বেলাকারই একটি অংশ। সেই দিনকার কথাগুলি, শ্মশানে বায়ু-উচ্ছ্বাসের ন্যায় করুণার প্রাণের ভিতর গিয়া হু হু করিতে লাগিল। যন্ত্রণায় করুণার বুক ফাটিয়া, বুকের বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া অশ্রুর স্রোত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বাগানে আর দুই জন লোক লুকাইয়া আছে, নরেন্দ্র ও স্বরূপ। নরেন্দ্র চুপি চুপি স্বরূপের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়াছে, দেখিবে স্বরূপ কি করে। করুণা সহসা দেখিল একজন লোক আসিতেছে, চমকিয়া উঠিল, জিজ্ঞাসা করিল "কেও?" স্বরূপ কহিল "আমি স্বরূপচন্দ্র। নিধিকে দিয়া যে কথা বলিয়া পাঠান হইয়াছিল তাহা কি স্মরণ নাই?" করুণা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া চলিয়া যাইতেছে, এমন সময়ে নরেন্দ্র আর না থাকিতে পারিয়া বাহির হইয়া পড়িল। করুণা তাড়াতাড়ি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। নরেন্দ্র ভাবিল তাহাকে দেখিতে পাইয়াই করুণা ভয়ে পলাইয়া গেল বুঝি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্র কহিল "হতভাগিনি, বাহির হইয়া যা!" করুণা কিছুই কহিল না। "এখনি দূর হইয়া যা।" করুণা নরেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নরেন্দ্র মহা রুষ্ট হইল, অগ্রসর হইয়া কঠোর ভাবে করুণার হস্ত ধরিল, করুণা কহিল 'কোথায় যাইব?' নরেন্দ্র করুণার কেশগুচ্ছ ধরিয়া নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার করিতে লাগিল, কহিল "এখনি দূর হইয়া যা।" ভবি ছুটিয়া আসিয়া কহিল 'কোথায় দূর হইয়া যাইবে?' এবং স্মরণ করাইয়া দিল যে, ইহা তাহার পিতার বাটি নহে। নরেন্দ্র তাহাকে উচ্চতম স্বরে কহিল, 'তুই কি করিতে আইলি?' ভবি মাঝে পড়িয়া করুণাকে ছাড়াইয়া লইল, ও কহিল, "আমার প্রাণ থাকিতে কেমন তুমি করুণাকে অনুপের বাটি হইতে বাহির করিতে পার দেখি!" নরেন্দ্র ভবিকে যতদূর প্রহার করিবার করিল ও অবশেষে শাসাইয়া গেল যে 'পুলিষে খবর পাঠাইয়া দিইগে।' ভবি কহিল "ইহাতো আর মগের মুলুক নহে।"

নরেন্দ্র চলিয়া গেলে পর, করুণা ভবির গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "ভবি, আমাকে রাস্তা দেখাইয়া দে, আমি চলিয়া যাই।" ভবি করুণাকে বুকে টানিয়া লইয়া কহিল "সে কি মা, কোথায় যাইবে, আমি যত দিন বাঁচিয়া আছি, তত দিন আর তোমাকে কোন ভাবনা ভাবিতে হইবে না।" বলিতে বলিতে ভবি কাঁদিয়া ফেলিল। করুণা আর একটি কথা বলিতে পারিল না, তাহার বিছানার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, বাহুতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিন করুণা কিছু খাইল না, ভবি আসিয়া কত সাধ্য-সাধনা করিল, কিন্তু কোন মতে তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না।

সমস্ত দিন ওঁ কোন প্রকারে কাটিয়া গেল; সন্ধ্যা হইল, পল্লীর কুটীরে কুটীরে সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালা হইয়াছে, পূজার বাড়িতে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে। সমস্ত দিন করুণা তাহার সেই শয্যাতেই পড়িয়া আছে, রাত্রি হইলে পর সে ধীরে ধীরে উঠিয়া অন্তঃপুরের সেই বাগানটিতে চলিয়া গেল। সেখানে কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া রহিল, রাত্রি আরো গভীরতর হইয়া আসিয়াছে, পৃথিবীকে ঘুম পাড়াইয়া নিশীথের বায়ু অতি ধীর-পদক্ষেপে চলিয়া যাইতেছে, এমন শান্ত ঘুমন্ত গ্রাম যে, মনে হয় না, এ গ্রামে এমন কেহ আছে, যে এমন রাত্রে মর্ম্মভেদী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া মরণকে আহ্বান করিতেছে!

করুণার বিজন ভাবনায় সহসা ব্যাঘাত পড়িল। করুণা সহসা দেখিল নরেন্দ্র আসিতেছে। বেচারী ভয়ে থতমত খাইয়া উঠিয়া বসিল। নরেন্দ্র আসিয়া অতি কর্কশ স্বরে কহিল,আমি উহাঁকে প্রতি ঘরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, উনি কি না বাগানে আসিয়া বসিয়া আছেন! আজ রাত্রে যে বড়—বাগানে আসিয়া বসা হইয়াছে? স্বরূপ ত এখানে নাই?" করুণা মনে করিল, এইবার উত্তর দিবে, নিরপরাধিনীর উপর কেন নরেন্দ্রের এইরূপ সংশয় হইল, জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু কি কথা বলিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না, নরেন্দ্রের ভাব দেখিয়া সে ভয়ে আকুল হইয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। নরেন্দ্র কহিল "আয়, বাড়িতে আর এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পাইবি না।" করুণা একটি কথাও কহিল না, কিসের অলক্ষিত আকর্ষণে যেন সে অগ্রসর হইতে লাগিল। একবার সে মনে করিল বলিবে, ভবির সহিত দেখা করিয়া যাই, কিন্তু একটি কথাও বলিতে পারিল না। গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিল, ব্যাকুল হৃদয়ে দেখিল, সম্মুখে দিগন্ত-প্রসারিত মাঠে জন প্রাণী নাই। মনে করিল, সে নরেন্দ্রের পায়ে ধরিয়া বলিবে, তাহার বড় ভয় করিতেছে, সে যাইতে পারিবে না, সে পথ ঘাট কিছুই চিনে না, কিন্তু মুখে কথা সরিল না; ধীরে ধীরে দ্বারের বাহিরে গেল; নরেন্দ্র কহিল, "কালি সকালে তোকে যদি গ্রামের মধ্যে দেখিতে পাই তবে পুলিষের লোক ডাকাইয়া বাহির করিয়া দিব।" দ্বার রুদ্ধ হইল, ভিতর হইতে নরেন্দ্র তালা বন্ধ করিল। করুণার মাথা ঘুরিতে লাগিল, করুণা আর দাঁড়াইতে পারিল না, অবসন্ন হইয়া প্রাচীরের উপর পড়িয়া গেল।

কতক্ষণের পর উঠিল, মনে করিল, ভবির সহিত একবার দেখা হইল না? কতক্ষণ পর্য্যন্ত শূন্য নয়নে বাড়ির দিকে চাহিয়া রহিল। প্রাচীরের বাহির হইয়া দেখিল, তাহার সেই বাগানের গাছ-পালা নীরবে দাঁড়াইয়া আছে,দেখিল,দ্বিতীয় তলের যে গৃহে তাহার পিতা থাকিতেন, যে গৃহে সে তাহার পিতার সহিত কত দিন খেলা করিয়াছে, সে গৃহের দ্বার সম্পূর্ণ উন্মুক্ত, ভিতরে একটি ভগ্ন খাট পড়িয়া আছে, তাহার সম্মুখে নিস্তেজ একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। কত ক্ষণের পর নিশ্বাস ফেলিয়া

করুণা ফিরিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের পথে চলিতে আরম্ভ করিল। কতক দূর গিয়া আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল সেই বিজন কক্ষে একটি মাত্র মুমূর্ষু প্রদীপ জ্বলিতেছে। ছেলে-বেলা যাহারা করুণাকে সুখে খেলা করিতে দেখিয়াছে, তাহারা সকলেই আপন কুটীরে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। তাহাদের সেই কুটীরের সমুখ দিয়া ধীরে ধীরে করুণা চলিয়া গেল। আর একবার ফিরিয়া চাহিল, দেখিল তাহার পিতার কক্ষে এখনো সেই প্রদীপটি জ্বলিতেছে। সেই গভীর নীরব নিশীথে অসংখ্য তারকা নিমেষহীন স্থির নেত্রে নিম্নে চাহিয়া দেখিল—দিগন্ত প্রসারিত জনশূন্য অন্ধকার মাঠের মধ্য দিয়া একটি রমণী একাকিনী চলিয়া যাইতেছে।

বঙ্গসাহিত্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আমরা এখন বঙ্গসাহিত্যের মহাকাব্যরূপ সমুচ্চ শিখরে আসিয়া পৌছিয়াছি। এখান হইতে নিম্নতর প্রদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাস প্রভৃতির পদাবলীকে মৃদু-নিনাদিনী নির্ঝরিণী বলিয়া প্রতীতি হইতে থাকে এবং চৈতন্য দেবের ভক্ত কবিদিগের রচনাকে উপত্যকা-স্থিত অর্দ্ধস্ফুট বৃক্ষলতা-রাশি মনে হয়। এখানে সকলই মহান এবং বিস্তৃত; এখানে গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্যের সহিত মিলিত হইয়া এবং সৌন্দর্য্য বৈচিত্র্য দ্বারা রঞ্জিত হইয়া শিখরদেশের অতুল মহিমা বর্দ্ধিত করিতেছে। সকল দেশে এবং সকল ভাষাতে মহাকাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব। কারণ মহাকাব্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য উচ্চ-ভাবের দৃষ্টান্ত দ্বারা মহৎ শিক্ষাপ্রদান, এবং বর্ণনা ও উদ্দীপনা দ্বারা হৃদয়কে গম্ভীর ও উচ্চতর ভাবে উত্তেজিত করা। এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধন করিতে মহাকবিদিগকে দেশীয় পুরাণ হইতে সামাজিক রীতিনীতি পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া তন্মধ্য হইতে আদর্শ-প্রতিমা গঠন করিতে হয়, মনুষ্যপ্রকৃতির সবলতা ও দুর্ব্বলতা জ্বলৎ অক্ষরে বিবৃত করিতে হয় এবং স্বর্গমর্ত্ত্য পাতাল" পরিভ্রমণ করিয়া সুখ দুঃখের শ্রেয়তা ও প্রেয়তা বিশদরূপে প্রকটিত করিতে হয়। ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয়—এই মহাসত্যটিই মহাকাব্যের পত্তন-ভূমিতে নিহিত থাকিতে চাই। এই সত্যের বিস্তৃত বর্ণনায় এক এক খানি মহাকাব্য—কবিতা ও কল্পনার অনন্ত ভাণ্ডার রূপে পরিণত হয়। কেবল রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া দেখিলে এই সর্ব্ববাদী সত্যটি প্রতিপন্ন হইতে পারে।

কিন্তু এই দুই খানি গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব আছে। ইহাদের তুলনায় অন্য সকল মহাকাব্য সঙ্কীর্ণতর বোধ হয়। এমন কি, জগদ্বিখ্যাত পাশ্চাত্য মহাকাব্যগুলিও ইহাদের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। ব্যক্তিবিশেষের ক্রোধ বর্ণনা বা ব্যক্তিবিশেষের আংশিক দুর্দশা বা বৃক্ষবিশেষের ফল ভক্ষণ লইয়া আমাদের রামায়ণের বা মহাভারতের আয়তন বর্দ্ধিত হয় নাই—দশ জন বা পঞ্চদশ জন লইয়া কাব্য-কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই, দুএকটি মাত্র দেবতার সপক্ষতা বা বিপক্ষতার উপর মানুষিকী ঘটনার ফলাফল নির্ভর করে নাই, এবং পরিমিত স্থান ব্যাপিয়াও নায়ক নায়িকার ক্রিয়াকাণ্ড পরিসমাপ্ত হয় নাই। সুতরাং রামায়ণ এবং মহাভারতে কবির বর্ণনীয় প্রায় সকল সামগ্রীই আছে—বহির্জগৎ এবং অন্তর্জগতের সমস্ত উপাদানই কল্পনার আলোকে আলোকিত হইয়া স্তরে স্তরে রাশীকৃত আছে, সাংখ্য-দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে একাদশীর মাহাত্ম্য পর্য্যন্ত কীর্ত্তিত আছে এবং গার্হস্থ্য সামান্য নিয়ম-প্রণালী হইতে রাজনীতির চূড়ান্ত রহস্য পর্য্যন্ত বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। হোমর বর্জিল বা মিল্‌টন গুটিকতক প্রধান প্রধান রসেরই অবতারণা করিয়াছেন,কিন্তু রামায়ণ বা মহাভারতের আদ্যোপান্তে স্থানে স্থানে সকল প্রকার রসেরই অবতারণা আছে। ইহা ব্যতীত, রামায়ণ ও মহাভারতের উচ্চ ধর্ম্মনীতি, সকল প্রকার মহাকাব্যের ধর্ম্মনীতি হইতে উৎকৃষ্ট। এই সকল কারণবশতই রামায়ণ ও মহাভারত ভারতের শ্মশান-ক্ষেত্রে আর্য্যদের চির-স্মরণীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ-স্বরূপ আজও বিদ্যমান রহিয়াছে, এই সকল কারণবশতই বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারত বঙ্গজীবনের অপরিত্যজ্য প্রয়োজনের মধ্যে হইয়া পড়িয়াছে। কাশিদাসের মহাভারতের অগ্রে—কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রচারিত হয়, সুতরাং আমরাও অগ্রে রামায়ণের কথা কহিব।

মহাকবি কৃত্তিবাস যীশুখৃষ্ট জন্মিবার ১৬০০ বৎসর পরে বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু কোন্ সময়ে যে বাঙ্গালা রামায়ণ প্রচারিত হয় তাহা নিরূপণ করা সুকঠিন। যাহাই হউক, এই অবধি স্থির যে রামায়ণই বঙ্গসাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। সুতরাং ইহার ভাষা কবিকঙ্কণের মত মধুর অথবা কাশিদাসের মত ওজস্বী নহে,ইহাতে বিদ্যাপতি বা চণ্ডিদাসের পদাবলীর ন্যায় হিন্দী বা ব্রজভাষার আধিক্য নাই এবং চৈতন্য-ভক্ত কবিদের কৃত কাব্যের ন্যায় ইহাতে প্রতি শ্লোকে গ্রাম্যতা দোষ বা যতিঃপতন বা নিরর্থক বাক্যাড়ম্বরও নাই। কৃত্তিবাসের রামায়ণের উপন্যাসভাগ বিবৃত করিবার আবশ্যক নাই, কেন না, তাহা বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতার জীবন-সূত্রে গ্রথিত আছে—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এখনকার কৃতবিদ্য যুবকেরা পাশ্চাত্য সাহিত্য-মোহে মুগ্ধ হইয়া এবং অল্পশিক্ষিত কামিনী-কুল আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের বাগাড়ম্বরে প্রতারিত হইয়া রামায়ণ ও মহাভারতের প্রতি দারুণ ঔদাস্য প্রদর্শন করেন।

আমরা এই উভয় সম্প্রদায়ের মতামত সমালোচনা করিয়া কৃত্তিবাসের প্রকৃত গৌরব স্থাপনা করিতে চেষ্টা পাইব। মহা-কাব্য মাত্রেরই প্রথম দ্রষ্টব্য সামগ্রীটি তাহার উপন্যাস ভাগ। এ স্থলে পাশ্চাত্য সাহিত্যের স্তুতিবাদকেরা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে রামায়ণের উপন্যাস-ভাগের ঘটনাবলীর তুলনায় ইলিয়াড্ বা ইনিড বা প্যারাডাইজ্ লষ্টের উপন্যাসের ঘটনাবলী স্বল্পতর এবং অকিঞ্চিৎকর। একিলিজের ক্রোধ হইতে হেক্টরের দাহ পর্য্যন্ত শুদ্ধ যে ঘটনাগুলি ইলিয়াডে আছে তাহা রামায়-ণের এক লঙ্কাকাণ্ডের আয়তনও পূর্ণ করিতে পারে না। ইনিডে প্রকৃত প্রস্তাবে একটি রীতিমত উপন্যাসই নাই, কারণ ইনিডের অর্দ্ধেকই প্রায় গল্পারম্ভের পূর্ব্বে ইনিয়াস কি রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিলেন ও ভবি-ষ্যতে রোম-রাজ্য কিরূপ গরীয়ান্ হইবে সেই সব বর্ণনাতেই পরিপূর্ণ, আর অবশিষ্ট অর্দ্ধেক কেবল ডাইডোর উপাখ্যান ও টর্ন্নসের সহিত ইলিয়াসের যুদ্ধ ইত্যাদি-তেই পর্য্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। প্যারাডাইজ্ লষ্টের গল্পটি ইনিড অপেক্ষা বিস্তীর্ণ ও মহত্তর, কিন্তু আড়ম্বর ও বর্ণনা পরিত্যাগ করিলে শুদ্ধ উপন্যাসটি রামায়ণের এক একটি কাণ্ডেতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়।

কিন্তু দেশীয় সমগ্র মহাকাব্যের সহিত বিদেশীয় সমগ্র মহাকাব্যের তুলনা করা এখন অসাময়িক হইবে। রামায়ণ, কবিক-ঙ্কণ চণ্ডী ও মহাভারতের সমালোচনা না করিয়া শুদ্ধ রামায়ণ প্রসঙ্গে বিদেশীয় মহা-কাব্যগুলির কথা উত্থাপন করা অথবা আ-ধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য অপেক্ষা পূর্ব্বতন সা-হিত্য যে কি কি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল তাহা প্রদর্শন করা, এখন যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না। সুতরাং এ সকল মতামতের সমগ্র সমালোচনা এখন স্থগিত রাখিয়া কেবল রামায়ণের সহিত ইলিয়াডের তুলনা করি-য়াই আপাততঃ নিরস্ত হইব। কেন না, ইলিয়াড্ যেমন গ্রীক্ ভাষায় প্রথম মহাকাব্য, বাল্মীকি রামায়ণও সেই রূপ সংস্কৃত ভাষায় প্রথম মহাকাব্য, এবং কৃত্তিবাসের রামায়ণও তদ্রূপ বঙ্গসাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। পূর্ব্বেই আমাদের বলিয়া রাখা উচিত যে, সংস্কৃত রামায়ণ ও গ্রীক্ ইলিয়াড আমা-দের আলোচ্য বিষয় নহে—আমরা কৃত্তি-বাসের রামায়ণ ও ইংরাজিতে অনুবাদিত ইলিয়াডের সমালোচনা করিব। তাহার কা-রণ এই যে প্রথমত আমরা বঙ্গসাহিত্যের বিষয় লিখিতেছি, দ্বিতীয়ত অনুবাদিত ইলিয়াড পড়িয়াই কৃত্তিবাসের রামায়ণের প্রতি কৃতবিদ্যদলের বিরাগ জন্মিয়াছে— তৃতীয়ত বাল্মীকি ও হোমরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিষয়ে কোন মীমাংসা করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে আ-মরা এ কথা বলিতেও সঙ্কুচিত হইব না যে, কৃত্তিবাসের রামায়ণের সহিত ইংরাজিতে অনুবাদিত ইলিয়াডের তুলনা করিতে গেলে বাল্মীকির প্রতি অন্যায় ব্যতীত হোমরের প্রতি অন্যায় করা হইবে না, কেন না কৃত্তি-বাসের রামায়ণ সংস্কৃত আদর্শের এক প্র-কার অনুকরণ মাত্র, কিন্তু ইংরাজিতে

হোমরের অনেকটা অবিকল অনুবাদ আছে, সুতরাং ইংরাজি অনুবাদগুলিতে হোমরের প্রকৃত প্রতিমা যত দূর প্রতিবিম্বিত হইতেছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণে বাল্মীকির প্রকৃত প্রতিমা তত দূর প্রতিবিম্বিত হয় নাই।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইলিয়াডের উপন্যাসটি রামায়ণের উপন্যাস অপেক্ষা হ্রস্ব ও সংকীর্ণতর। সমস্ত গ্রীসদেশ যেরূপ আয়তনে ভারতবর্ষের একটি খণ্ডমাত্র, সমস্ত ইলিয়াড্‌ও সেইরূপ রামায়ণের একটি কাণ্ডমাত্র হইতে পারে। স্বীকার করি যে সংকীর্ণতা বা বিস্তীর্ণতার উপর লক্ষ্য করিয়া কবির কবিত্ব নিরূপিত হয় না, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, বহুল ঘটনাবলী কল্পনা-সূত্রে গ্রথিত করিয়া সমস্ত মহাকাব্যখানিকে একটি বিস্তৃত কল্পনা-রাজ্যে পরিণত করাও সামান্য কবিত্বের পরিচয় নহে। রামায়ণে ঘটনাবলী শুদ্ধ ঘটনাবলিরূপেই যদি বর্ণিত হইত তাহা হইলে আমরা এ কথা বলিতাম না, কিন্তু যখন দেখিতেছি যে প্রত্যেক ঘটনাবলী, প্রত্যেক ঘটনার ভগ্নাংশ পর্য্যন্ত—অপূর্ব্ব কল্পনা-আলোকে আলোকিত, তখন ইলিয়াডের তুলনায় রামায়ণের বিস্তীর্ণতাই একটি বিশেষ সুখ্যাতির বিষয়। এই বিস্তীর্ণতা হেতুই আমরা রামায়ণে যত প্রকার ক্ষুদ্রতম হইতে মহত্তম প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং চণ্ডাল হইতে দেবতাসদৃশ মানব প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন চিত্র দেখিতে পাই, তাহার শতাংশের একাংশও ইলিয়াডে দেখিতে পাই না। এমন কি, উপন্যাসের সঙ্কীর্ণতা বশতই ইলিয়াডে মানব-প্রকৃতির অর্দ্ধাংশ যে নারী-প্রকৃতি—সেই নারী-প্রকৃতির সম্যক্ চিত্র আমরা দেখিতে পাই না। কৌশল্যার পুত্রবাৎসল্য বা কৈকেয়ীর স্বার্থপরতা, মন্থরার কুটিলতা বা সুর্পনখার নীচ লালসা, তারার তেজস্বিতা বা সরমার মমতা,মন্দোদরীর উদারতা বা সীতার সহিষ্ণুতা—এসকল চমৎকার চিত্র ইলিয়াডের আমরা কোথাও দেখিতে পাই না। সমস্ত ইলিয়াডে কোন নায়িকাই নাই। ইলিয়াডের চার পাঁচ স্থলে যেথানে স্ত্রীলোকের অবতারণা হইয়াছে, সেখানে রমণি-প্রকৃতির দুই তিনটি অঙ্গ মাত্র অতি সঙ্কীর্ণ ভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে—কিন্তু তাহাতে কে সন্তুষ্ট হইতে পারে? উভয় মহাকাব্যের দেবদেবীর কথা আমরা এথানে কিছুমাত্র উল্লেখ না করিয়া কেবল মানব-প্রকৃতির চিত্র দেখিতেছি। এবং তাহা দেখিয়া কে না স্বীকার করিবে যে অশেষ প্রকার চিত্র প্রদর্শনে রামায়ণ অপেক্ষা ইলিয়াড নিকৃষ্টতর।

দ্বিতীয়তঃ—ইলিয়াডের উপন্যাসের অখণ্ডতা অপেক্ষা রামায়ণে উপন্যাসগত অখণ্ডতা বিশিষ্টরূপে রক্ষিত হইয়াছে। রামায়ণের উদ্দেশ্য রামের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করা,সুতরাং রামের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনগত সকল ঘটনাই রামায়ণে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু ইলিয়াডের উদ্দেশ্য কি? কবি কাব্যের প্রারম্ভেই সরস্বতী-বন্দনা স্থলে বলিতেছেন—"হে দেবি! গ্রীকদিগের সকল বিপদের উৎসস্বরূপ

একিলিজের মহাক্রোধ বর্ণনা কর !" সুতরাং একিলিজের ক্রোধ বর্ণনা করাই ইলিয়াডের উদ্দেশ্য। কিন্তু সে ক্রোধের কারণ কি? একিলিজ-কর্ত্তৃক যুদ্ধে বন্দীকৃত সুরূপা ব্রাইসিসকে আগামেম্‌নন কাড়িয়া লইয়াছিলেন বলিয়াই আগামেম্‌ননের উপর একিলিজের মর্ম্মান্তিক ক্রোধ হয় এবং এই ক্রোধ ভরেই তিনি গ্রীকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে ট্রোজানেরা গ্রীকদিগকে ক্রমাগত যুদ্ধে পরাজিত করিতে লাগিল, শেষে গ্রীকেরা নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলে তাহাদের প্রধান প্রধান রাজা ও মহৎ ব্যক্তিরা একিলিজকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য অনুনয় করিতে গেল, কিন্তু তবুও একিলিজ ফিরিলেন না। তাহার পর তাহার প্রিয় সুহৃৎ প্যাট্রোকোলস ট্রোজান-যুদ্ধে নিহত হন। এই সংবাদে একিলিজ ক্রোধান্ধ হইয়া গ্রীকদলে ফিরিয়া গেলেন ও তাঁহার সুহৃৎ-হন্তা হেক্টরকে বধ করিলেন। একিলিজ যখন গ্রীকদলে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার পূর্ব্ব-ক্রোধ-পাত্র আগামেম্‌নন্ তাঁহার নিকটে সকল দোষের মার্জ্জনা চাহিলেন ও ব্রাইসিস্‌কে প্রত্যর্পণ করিতে পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন। এই খানেই অর্থাৎ উনবিংশতি স্বর্গে উভয়ের আবার হৃদ্যতা সংস্থাপিত হইল। তবে আর বাকী পাঁচটি স্বর্গের আবশ্যকতা কই? যে ক্রোধ বর্ণনা করিতে কবি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সে ক্রোধের আরম্ভ হইতে উপশম পর্য্যন্ত সকল কথাইত বিবৃত করা হইল—তবে হেক্টরের মৃত্যু আমরা কোন্ প্রসঙ্গে ইলিয়াডে পাই? এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াই হেক্টরের মৃত দেহ লইয়া একিলিজের জঘন্য ব্যবহার অধিকতর জঘন্য বোধ হয়। আগামেমননের উপর একিলিজের বিজাতীয় ক্রোধ লইয়া মহাকাব্য আরম্ভ হইল এবং নির্দোষী হেক্টরের দারুণ দুর্দ্দশা লইয়া মহাকাব্য সমাপ্ত হইল, এ কতদূর যুক্তি-সঙ্গত বলিতে পারি না।

তৃতীয়তঃ, উপন্যাসোক্ত ব্যক্তি বিশেষকে ধরিলেও ইলিয়াড্ অপেক্ষা রামায়ণের শ্রেষ্ঠতা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এস্থলে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রকৃতি সমালোচনা করা আমাদের সাধ্যাতীত; আমরা কেবল ইলিয়াডের নায়ক একিলিজের সহিত রামের তুলনা করিয়া দেখিব। সকলে যদি এইটি স্বীকার করেন যে, মহাকাব্যের নায়ক কোন বিশেষ অথবা মহৎগুণের আদর্শস্থল হইবে, তাহা হইলে ইলিয়াডের নায়ক অপেক্ষা কোন মহাকাব্যের নায়ক আর নিকৃষ্টতর হইতে পারে না। সমরে দুষ্কর্ষতা ব্যতীত একিলিজের আর কোন গুণই নাই। তিনি যেমন উদ্ধত তেমনি নৃশংস, যেমন নির্য্যাতন-প্রিয় তেমনি কোপন-স্বভাব। অনেকে বলিতে পারেন যে এ সকল গুণ বীরের গুণ, এ সকল গুণ একিলিজেই শোভা পায়। কিন্তু এ সকল গুণ বীরেতে শোভা পাইলেও হেক্টরের মৃতদেহ লইয়া একিলিজ যেরূপ চণ্ডালের ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা মনে করিতে গেলে তাঁহার প্রতি আর তিলমাত্র

ভক্তি হয় না। প্রকৃত বীর পুরুষ কখনই পরাজিত ও মৃত প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না। যে হেক্টরের অপ্রতিহত শৌর্য্যে গ্রীকেরা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল; গ্রীকদের ইন্দ্রাণী, বিশ্বকর্ম্মা এবং রণদেবী মিনর্ভা সকলে মিলিয়া একিলিজকে সহায়তা না করিলে যে হেক্টর একিলিজের কাছে কখনই পরাভূত হইতেন না; একিলিজের নিকট যে হেক্টরের এইমাত্র অপরাধ হইয়াছিল যে তিনি স্বদেশ রক্ষার্থ স্বদেশ-বৈরি পেট্রোকোলসকে ন্যায়-যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন, সেই হেক্টর আজ পরাভূত হইয়া একিলিজের হস্তে বন্দী হইয়াছেন এবং আসন্ন কালে বিজেতাকে কাতর স্বরে বলিতেছেন—"আপনার আত্মার দোহাই, আপনার জন্মদাতার দোহাই, আমার এই কাতর ভিক্ষার পবিত্রতার দোহাই, আপনি আমাকে আপনাদের গ্রীস্‌দেশীয় শৃগাল কুক্কুর দিয়া ভক্ষণ করাইবেন না, আমার পিতামাতার শোকশান্তি হেতু আমার অন্তিম সৎকার করাইবেন, তাঁহাদের বহুমূল্য উপহার সকলের বিনিময়ে আমার দেহের জন্য আমি যেন একটি ভস্মাধারও প্রাপ্ত হই এবং হেক্টরের দেহাবশেষ যেন হেক্টরের দেশেই নিহিত হয়।" এই কাতর উক্তির উত্তরে একিলিজ সদর্পে এবং সক্রোধে বলিলেন—"রে অভিশম্পাত-গ্রস্ত হতভাগ্য! তাহা কখনই হইবে না। আমার জন্মদাতার দোহাই, তোর কাতর ভিক্ষার পবিত্রতার দোহাই—আমি কোন দোহাই শুনিব না, এমন কি, আমার ইচ্ছা হয় আমার দেশীয় শৃগাল কুক্কুরের সঙ্গে আমিও তোর মৃত দেহ ছিন্ন-ভিন্ন করি। কিন্তু না, সেই শৃগাল কুক্কুরের হস্তেই তোর মৃতদেহ সমর্পণ করিব।" তাহার পর হেক্টরের মৃত্যু হইলে একিলিজ তাঁহার মৃতদেহ নিজ বিজয়-রথের চাকাতে বাঁধিয়া পেট্রকলসের সমাধিমন্দিরের চতুর্দ্দিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। এই কি প্রকৃত বীরের উন্নত মন, এই কি প্রকৃত বীরের উদারতা! আমরা রামের প্রকৃতির সহিত একিলিজের প্রকৃতির তুলনা করিব না; কেন না, এমন দুই ভিন্ন প্রকৃতির মধ্যে কোনরূপ সৌসাদৃশ্য থাকিতেই পারে না। কিন্তু এস্থলে একটি বিখ্যাত লেখকের গুটিকতক কথা আমরা সমালোচনা না করিয়া থাকিতে পারি না। মনিয়র্ উইলিয়াম্‌স্ তাঁহার ভারতীয় মহাকাব্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন "রামের চরিত্রে প্রায়ই কোন দোষ লক্ষিত হয় না, কিন্তু এই দোষ-শূন্যতাই আমাদের পক্ষে কষ্টকর। নানা দোষ-সম্বলিত হইলেও একিলিজের প্রকৃতি যে রামের প্রকৃতি অপেক্ষা কতদূর স্বাভাবিক তাহা বলা যায় না। হেক্টরের মৃতদেহ লইয়া একিলিজ যে কঠোর নৃশংস ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা সম্ভবপর, কিন্তু পরাজিত রাবণের প্রতি রাম যে উদার ব্যবহার করিয়া ছিলেন তাহা তত সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।"

পাশ্চাত্য সমালোচকের কথা আমরা শিরোধার্য্য করিতে পারিলাম না। স্বীকার করি যে হেক্টরের মৃত দেহের প্রতি একিলিজের আচরণ একিলিজের অনুরূপই হইয়া-

ছিল, কিন্তু সমরশায়ী রাবণের প্রতি রামের ব্যবহার অস্বাভাবিক হইল কিসে?— একিলিজ যদি রামের মত কিম্বা রাম যদি একিলিজের মত পরাজিত শত্রুর সহিত ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে অস্বাভাবিকতার পরাকাষ্ঠা হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু রাম যদি রামেরই মত ব্যবহার করেন তাহা হইলে অস্বাভাবিকতা কোথায়? এ কি কখন সম্ভবপর হইতে পারে যে, যে রামের সমস্ত হৃদয় ধর্ম্মভাব ও কোমলতায় গঠিত, তিনি দশাননকে পরাজিত করিয়া, আপনার কার্য্য সিদ্ধ করিয়া, সমস্ত লঙ্কা নিঃশত্রু করিয়া, সীতা উদ্ধারের পথ নিষ্কণ্টক করিয়াও আবার সেই দশাননের প্রতি কোনরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন? প্রকৃত ইতিহাসেই আমরা ত দেখিতে পাই যে, পরাজিত ক্যারাক্‌টেকসের প্রতি মহারাজ ক্লডিয়স কি উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পরাজিত পুরুরাজকে সেকন্দর শা কতদূর সম্মান করিয়াছিলেন, পরাজিত ফরাসীরাজ জন্‌কে বিজয়ী ব্লাক্ প্রিন্স কি রূপ বিনীত ভাবে সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন—সে দিনের পরাজিত লুই নেপোলিয়নকে প্রুস্‌রাজ উইলিয়ম পর্য্যন্ত কিরূপে সমাদর করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়াও কি দশাননের প্রতি অমায়িক, প্রশান্ত, মমতাময় ও শাস্ত্রদীক্ষিত রামের ব্যবহার অস্বাভাবিক মনে হইতে পারে?—মনিয়র্ উইলিয়মস্ যাহাই বলুন না কেন, তাঁহার কথা আমরা অনুমোদন করিতে পারিলাম না।

রামায়ণের নায়ককে ছাড়িয়া দিয়া নায়িকা সীতা দেবীর প্রকৃতি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে শুদ্ধ ইলিয়াডে কেন, বোধ হয় কোন দেশের কোন কাব্যে সহিষ্ণুতা ও সতীত্বের এমন আর একটি মনোহারিণী প্রতিমা দেখিতে পাইব না। দুশ্চারিণী হেলেনের ত কথাই নাই—হেকুবা ও অ্যাণ্ড্রোম্যাকীর আভাস মাত্র আমরা ইলিয়াডে পাই, সুতরাং তাহাদের সমস্ত প্রকৃতি আমরা আলোচনা করিতেই অক্ষম—কিন্তু তাহা ব্যতীত অন্য স্থলে যে সকল নারী-প্রকৃতি আমরা দেখিতে পাই, তাহা সম্পূর্ণ সুন্দর হইলেও সীতা দেবীর সম্যক্ প্রতিরূপ হইতে পারে না। আত্মাভিমানিনী পেনিলাপি, পৌরুষিক আন্‌টিগণী বা ইলেক্‌ট্রা, পিতৃদ্রোহী ডেস্‌ডিমোনা বা লোভপরতন্ত্র ঈভের সহিত সীতা দেবীর তুলনা করিতে গেলে সীতা দেবীর উৎকৃষ্টতর প্রকৃতি আরও দেদীপ্যমান হয়। তিনি রূপে যেরূপ অসামান্যা, গুণেও তেমনি অদ্বিতীয়া।

চ—

তুকারাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তুকারাম তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন ভারতী-প্রসাদ কিরূপে উপলব্ধি করিলেন তাহা পাঠকগণ তাঁহার নিজমুখ হইতেই শ্রবণ করিয়াছেন। লোকের বিশ্বাস এই যে, তুকারাম কবি-নামদেবের অবতার বিশেষ। মুকুন্দরাজ, জ্ঞানদেব, নামদেব, মহারাষ্ট্র দেশের আদি কবির মধ্যে পরিগণিত। নামদেবের মৃত্যুকাল শকাব্দ ১২৫৬ (খৃষ্টাব্দ ১৩২৮)। নামদেব ও তুকারামের সম্বন্ধে মহীপতি তাঁহার "ভক্তলীলামৃত" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে নামদেব শত কোটি অভঙ্গ রচনায় কৃতসঙ্কল্প হইয়া ৯৪ কোটি ৪৯ লক্ষ অভঙ্গ রচিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন; তিনিই নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পূরণ করিবার উদ্দেশে তুকারাম হইয়া পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে তদনুসারে তুকারাম ৫ কোটি ১ লক্ষ ৩৪০০০ শ্লোক রচনা করেন কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তুকারাম-কৃত ৪,৬০০র অধিক সংখ্যক অভঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুকারাম এই সকল অভঙ্গ অধিকাংশ বিঠোবা-মন্দিরে রচনা করিতেন। কবিতা রচনার উপযোগী আরও একটি বিজন স্থান তাঁহার মনোনীত ছিল—সে স্থানটি এখনো কোন ভ্রমণকারী দেহু দর্শনে গেলে তাঁহাকে "তুকার আশ্রম" বলিয়া দেখাইয়া দেওয়া হয়।

এই সময় "ভজন ও কথকতা" এই দুই দ্বার দিয়া তুকারামের কবিত্ব-শক্তি বিশেষ স্ফূর্ত্তি পায়। ছন্দোময় বাক্যে ঈশ্বরের ভজনার নাম "ভজন"। এই সকল স্থলে ভজন-কর্ত্তা স্বরচিত কবিতা অথবা সঙ্গীতাবলি গান করেন ও পরে শ্রোতৃবর্গ সমস্বরে সেই গানে যোগ দেন। এই সকল কবিতা ও গীতের অর্থ বুঝাইয়া ব্যাখ্যা করিবার রীতি নাই। এই রূপ ভজনের সময় তুকারাম হয়ত অগণ্য অগণ্য অভঙ্গ সদ্য সদ্য রচনা করিয়া গান করিতেন, তাহা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়া থাকিবে। এই সকল অভঙ্গ লিপিবদ্ধ হইলে ইহাদের সংখ্যা প্রবাদ-অনুযায়ী কোটি না হউক, নিদান-পক্ষে লক্ষেও পৌঁছিতে পারিত। তুকারামের অভঙ্গ জনসমাজে সমাদৃত ও প্রখ্যাত হইবার অপর এক উপায় "কথকতা"। মহারাষ্ট্রদেশে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা ও ব্যাখ্যানের এক প্রধান সাধন কথকতা। ইহাতে কথক দেববন্দনাদি পাঠ করিবার পরে কোন একটি কবিতা কিম্বা বচন অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করেন। নানা গ্রন্থ হইতে উপদেশ প্রদান ও মধ্যে মধ্যে গল্প ইতিহাস ও কথাচ্ছলে শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করত কবিতাটির মর্ম্ম তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া কথকতার উদ্দেশ্য। সঙ্গীত কথকতার এক প্রধান অঙ্গ। কথক

কাব্য অথবা পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে যে সকল কবিতা ও বচন পাঠ করেন তাহা শ্রোতৃগণ তাঁহার পশ্চাতে আবৃত্তি করেন। মহারাষ্ট্রে কথকেরা বহুমানাস্পদ ও তাঁহাদের উপদেশ সাধারণ জনসমাজে ধর্ম্ম-প্রচারের বিশেষ উপযোগী। এই রূপ বক্তৃতা যতদূর ফলোপধায়ী হইতে পারে তুকারামের মুখে তাহার চতুর্গুণ ফল প্রসব করিত সন্দেহ নাই; কেননা তুকারামের বক্তৃতা কেবল মুখের নয়—তাঁহার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে তাহা নিঃসৃত হইত। তাঁহার পবিত্র চরিত্র—অকৃত্রিম ঈশ্বর-ভক্তি ও বিনা মূল্যে উপদেশ প্রদান—এই সকল কারণে তাঁহার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা বিশেষ রূপে আকৃষ্ট হইত।

তুকারামের কীর্ত্তি প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে দুষ্ট লোকের বিষদৃষ্টিও তাঁহার উপর নিপতিত হইল। কিন্তু তিনি যে সমূহ কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি মুহ্যমান হইবার নহেন, প্রত্যুত অগ্নি-পরীক্ষিত কাঞ্চনের ন্যায় তাঁহার স্বাভাবিক সাধুতা, সরলতা, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, নিস্পৃহতা আরো অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। শূদ্র হইয়া তিনি বেদোদ্বোধন করেন—গুরুর ন্যায় ধর্ম্মোপদেশ দেন—লোকেরা ভক্তি-ভরে তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করে—ইহা ব্রাহ্মণদের চক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। লোকের দোষ কি, তাহারা ব্রাহ্মণ শব্দের যথার্থ অর্থ অনুসারে শূদ্র তুকারামকেও ব্রাহ্মণের ন্যায় সেবা করিতে লাগিল; এমন কি, তুকারামের জীবনের শেষভাগে এক উচ্চকুলের ব্রাহ্মণ-পরিবার যাঁহারা গণেশের অবতার বিশেষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন তাঁহারা তুকারামের সহিত একাসনে আহার করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। এই সকল কারণে ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যে কাহারো কাহারো দ্বেষ ও ঈর্ষা জ্বলিয়া উঠিল ও তাঁহারা তুকারামের প্রতি বৈরসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। দেহু-গ্রামে মম্বাজী নামে এক জন গোঁসাই বাস করিতেন—তাঁহার হস্ত হইতে তুকারামের উপর অত্যাচারের প্রথম সূত্রপাত হয়। বিঠোবা-মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে মম্বাজীর একটী বাগান ছিল, তাহা তিনি কাঁটা-গাছের বেষ্টন দিয়া ঘিরিয়া লইলেন। একাদশীর দিন দেহুর এক উৎসবের দিন—সে দিন বিঠোবা-মন্দিরে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। তুকারাম দেখেন যে এই সকল কাঁটাগাছে লোকদিগের প্রদক্ষিণ-স্থান পর্য্যন্ত অধিকৃত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া তিনি স্বহস্তে তাহা উৎপাটিত করিয়া স্থান পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহাতে মম্বাজী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই সকল কণ্টক-যষ্টি দিয়া তুকারামকে উত্তম মধ্যম বিলক্ষণ প্রহার করিলেন। তুকারাম ঐ প্রহারকের প্রতি বিন্দু মাত্র কোপ প্রকাশ না করিয়া তাঁহার নিত্য নিয়মিত কর্ম্মে ব্যাপৃত রহিলেন, যেন কিছুই হয় নাই। অবশেষে তিনি তাঁহার শত্রুর উপর জয়ী হইলেন। "অসাধুং সাধুনা জয়েৎ" এই উপদেশ মত কার্য্য করিয়া সে জয় লাভ করিলেন। তুকারাম নিম্নলিখিত শ্লোকাব-

লীতে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

৩৫৫

ছাড়িব না ছাড়িব না, ছাড়িব না হে বিঠোবা তোমারি চরণ।

যতই যন্ত্রণা আসে, আসুক কি করিবে সে, না হয় হইবে মরণ।

শস্ত্রধারী আসি কেহ, খণ্ড করে যদি দেহ, তবু নাহি ডরি।

তুকা বলে "সাবধান,হোয়ে আছি আগু-য়ান, চিতে মোর শমগুণ ধরি"।

৩৫৬

বেস বেস বড় ভাল, বিঠোবা হে কল্লে ভাল, শাপে বর দান।

ক্ষমাগুন শেখাবারে, হানিলে এ দেহো-পরে কণ্টকের বাণ।

কটু কাটব্য গাঁলি, মোর পৃষ্ঠে দিলা ঢালি, তাহে পাই প্রাণ—

তুকাবলে "কৃপাকরি, সংহারিয়া ক্রোধ-অরি দিলে পরিত্রাণ"।

৩৫৭

তরিনু তরিনু দেব তরালে আমায়,

অদৃষ্টে যা ছিল ভাল, তাই মোর তাই হল, কি বলিব হায়!

যতনে সরল চিতে, কাঁটা তুলি নিজ হাতে, পথের আটক।

"কত সহি" তুকা বলে, "নাশি কিন্তু রিপুদলে, হৈনু নিষ্কণ্টক।

এরূপ সহিষ্ণুতার ফল অচিরেই ফলিল। মম্বাজীর ক্রোধানল আপনাপনি নিবিয়া গেল ও তিনি তুকারামের প্রতি বিরক্তি ভাব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুরক্ত ভক্তের মধ্যে গণ্য হইলেন।

পুণার নিকটবর্ত্তী বাঘোলী গ্রামস্থ রামেশ্বর ভট্ট নামক আর একজন ব্রাহ্মণ তুকারামের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তিনি তুকারামের বিরুদ্ধে নানা প্রকার অমূলক অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাঁহার প্রতি গ্রামাধিকারীদিগের বিদ্বেষ জন্মাইয়া দিলেন ও দেহুর পাটেলের নিকট হইতে তাঁহার গ্রামবহিষ্করণের এক অনুজ্ঞাপত্র বাহির করিলেন। তুকারাম মহা বিপদে পড়িয়া এই রূপে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

কি করিব কোথা যাব, গ্রামে লই কাহার শরণ?

গাঁয়ের মণ্ডল, করে গণ্ডগোল, কার কাছে ছুটি ভিক্ষা মাগি গো এখন।

নিয়ম ভঙ্গ দোষে, দোষী করে রোষে, আদালতে নিয়ে চলি, বলিয়া শাসায়,

মিলে লোকগুল, বুঝাইল ভুল, লাভে হতে ভিখারীর অন্ন মারা যায়।

এহেন অসৎ সঙ্গে রহিব না আর—

তুকা বলে "চল যাই, পাণ্ডুরঙ্গ দ্বার।"

রামেশ্বর ভট্ট তুকারামকে তাঁহার হীন জাতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বহুবিধ তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া কবিতা রচনা করিতে একেবারে নিষেধ করিলেন। তুকারাম বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—"আমি অল্প স্বল্প যাহা কিছু রচনা করিয়াছি সকলই পাণ্ডুরঙ্গের আদেশে, কিন্তু দেখিতেছি ব্রাহ্মণের আদেশও আমার শিরোধার্য্য, অতএব আপনার আজ্ঞানুসারে এখন হইতে আমি কবিতা রচনায় বিরত হইলাম—যে সকল

কবিতা আজ পর্য্যন্ত বিরচিত হইয়াছে তাহার কি করা যাইবে মহাশয় অনুমতি করুন।” রামেশ্বর ভট্ট তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী জলমগ্ন করিবার আদেশ করিলেন। তুকারাম অগত্যা তাহাতে সম্মত হইয়া দেহুতে গিয়া বিঠোবা দেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৎপরে তাঁহার গ্রন্থ দুই প্রস্তর ফলকের মধ্যে রাখিয়া কাপড়ে যত্নে বাঁধিয়া নিজ হস্তে ইন্দ্রায়ণী নদীতে নিক্ষেপ করিলেন। পরে লোকেরা আসিয়া বিদ্রূপ করিয়া বলিল “সন্ন্যাসি জি—আগে একবার তুমি খাতাপত্র নদীতে ডুবাইয়া সংসার ডুবাইয়া দিলে—এখন আবার তোমার কবিতাগুলি নদীতে ডুবাইয়া পরমার্থও ডুবাইলে—তোমার একূল ওকূল দুকূলই গেল।” এই সকল কথা তুকারামের বক্ষে বজ্রপাত তুল্য আঘাত করিল। তিনি অন্নপান পরিত্যাগ করিয়া বিঠোবা মন্দিরের প্রাঙ্গণে পড়িয়া রহিলেন ও যে পর্য্যন্ত তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ না হয় সে পর্য্যন্ত উঠিবেন না নিশ্চয় করিলেন। এই রূপে ত্রয়োদশ দিবস অতিবাহিত হইল।

তাঁহার আসন্ন কাল উপস্থিত—শত্রুদের উল্লাসের আর সীমা রহিল না। তাহারা মনে মনে কত দর্প করিতে লাগিল—এবার আর এই শূদ্রটার মুখ হইতে বেদবাণী শুনিতে হইবে না। কিন্তু স্বয়ং বিঠোবা তুকারামের সহায়—তাঁহার অভঙ্গ সহজে বিলুপ্ত হইবার নয়। ত্রয়োদশ দিবসে তাঁহার গ্রন্থ নদীর উপর ভাসিয়া উঠিল ও লোকেরা তাহা তুকারামের নিকট আনিয়া উপস্থিত করিল। এই উপলক্ষে তিনি যে সকল শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

২২৪২

অন্যায় করিনু ঘোর—মরমে বিঁধিছে অনিবারে,
লোকের গঞ্জনা শুনে, কত কষ্ট দিলেম তোমারে।
মোর দুখ ভাগী তুমি, মূঢ়মতি দীন আমি,
অনাহারে অনিদ্রায় তের দিন রহি
মম দুখে দুঃখী ক'রি তোমারে,শরমে মরি—
তাই গো দ্বিগুণ জ্বালা সহি।
আমার মরণ দায় ফেলি তব শিরে,
কাজেই বাঁচাতে তাই হলো মুমূর্ষুরে।
জল মধ্যে গ্রন্থ খানি ক'রে সংরক্ষণ,
তুকা বলে নিজ ভক্তে করিলে রক্ষণ।

২২৪৩

কৃপাময়ী মা আমার অনাথ শরণ,
বালকের বেশে মোরে দিলে দরশন।
প্রকাশি সগুণ মূর্ত্তি শান্ত কর চিতে,
আলিঙ্গন দিয়ে পরে তারিলে ভকতে।
বন্ধুর সহায় দিয়ে, সাধু সঙ্গে মিলাইয়ে,
উদ্ধার করিলে মোরে সব দুঃখ হতে।
তুকা বলে “অশরণে, ক্ষমাকর গো জননী—
যাচি কর পুটে।
মরিলেও তোমারে মা, আর কভু ফেলিব
না এহেন সঙ্কটে।

২২৪৪

সহিব অবাধে আমি সহস্র পীড়ন,
ফেলুক বিপদে ঘোর যতই দুর্জ্জন।
তোমায় আমার লাগি ফেলিব না দায়ে,

আমায় রেখ গো মাতা তব পদচ্ছায়ে।
এবার করেছি দোষ আমি যে চণ্ডাল,
জলে আগুলিয়ে গ্রন্থ রাখিলে কৃপাল।
মন্দমতি সে সময়ে না কৈনু বিচার,
তোমারে ডাকিতে মোর কিবা অধিকার।
জানি না আমি হে দেব কেমনে সহতে
আমার এ ক্ষুদ্র ভার কহি গো বহিতে।
হবার যা হয়ে গেছে বৃথা এ শোচনা,
তুকা বলে "জানিলাম ভবিষ্য-যোজনা"।

২২৪৫

কি জানিবে পাণ্ডুরঙ্গ, তব অন্ত এপামর,
কি না তুমি কর দেব, যদি ধৈর্য্য ধরে নর।
আমি অতি মূঢ়মতি উতলা হইনু,
তবু কৃপানিধি তব আশ্রয় লভিনু।
দেবের তুমি হে দেব, জীবের জীবন,
কেন তবে করি মোরা বৃথায় ক্রন্দন।
তুকা কহে সকাতরে—"পতিত এ জন,
তব দ্বারে ধন্না দিনু—অন্যায় কেমন।"

২২৪৬

কেন এত ডাকিলাম হরি হরি করি,
আঘাত কি করেছিল, পিঠে তীব্র ছুরি।
রোয়ে তুমি দুই ঠাঁই জলে আর স্থলে,
রক্ষণ করিলে গ্রন্থ তুকারে বাঁচালে।
মা-বাপে তাড়ান্ হেরি একটু অন্যায়,
তুমি কিন্তু কত সও কি বলিব হায়।
তুকা কহে "কৃপাময় কেমনে বাখানি,
তোমা হেন হিতকারী—নাহি মোর বাণী।"

২২৪৭

মা হতে মায়ালু তুমি, চাঁদ হতে তুমিছে শীতল।
তোমাতেই, আহা মরি বাস করে প্রেম সুনির্ম্মল।
তুমিত পুরুষোত্তম, উপমা কোথায়।
তোমার নামের গুণে পাপী ত'রে যায়।
অমৃত সৃজিলে নিজে তা হতে মধুর,
তব সৃষ্টি পঞ্চভূত এই বিশ্বাঙ্কুর।
স্তব্ধ হয়ে নমে প্রভু তুকা তব পায়,
অপরাধ ক্ষমা কর এই ভিক্ষা চায়।

২২৪৮

দুগুর্ণ অন্যায়ী আমি কত আর ক'ব,
বিঠ্ঠল আশ্রয় দেহ, আর কি চাহিব।
জানি গো যে এসংসার—দুস্তর ভয়াল,
থাকিতে না পারি ইথে তিষ্ঠে ক্ষণকাল।
বাসনার যে তরঙ্গ করে কত রঙ্গ,
সে কল্লোলে পড়ি যদি শান্তি হয় ভঙ্গ,
তুকা বলে "পাণ্ডুরঙ্গ, তুমিই ভরসা,
বিরাজি হৃদয়ে মোর ঘুচাও দুর্দ্দশা।"

দেহুতে এই সকল ঘটনা হইতেছে—এদিকে তুকা-বিদ্বেষী রামেশ্বর ভট্টের দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই। প্রবাদ এই রূপ যে, পুণার অনঘড্ নামক ফকীরের একটা পাতকুয়া ছিল, রামেশ্বর ভট্ট এক দিন তাহার জলে স্নান করিয়া দেখেন যে তাঁহার শীতল হওয়া দূরে থাকুক—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে; বোধ হইতে লাগিল যেন তাঁহার শরীর অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইতেছে—অনেক দিন এই রূপ দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর তাঁহার স্বপ্ন হইল যে তুকারামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা এ রোগের এক মাত্র ঔষধ। তুকারামের গ্রন্থোদ্ধারের কথাও ঐ সময় তাঁহার শ্রবণ-গোচর হইল।

অবশেষে তাঁহার কৃতাপরাধের জন্য বিস্তর অনুতাপ করিয়া তুকারামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তুকারাম তাহার এই উত্তর দেন—

১৭৫১

চিত্তশুদ্ধি হলে পরে শত্রু হয় মিত্র,
বাঘে নাহি খায় সাপে না দংশায়, এমনি বিচিত্র।
বিষ সে অমৃত, বিপদ সম্পদ, অনীতি সেও হয় নীত।
দুঃখ অমঙ্গল, প্রসবে শুভফল, অগ্নি জ্বালা হয় প্রশমিত।
প্রাণীতে প্রাণীর টান, ভাবে সবাই সমান, এই ত গো স্বাভাবিক রীত।
তুকা বলে "তোমাপরে তুষ্ট নারায়ণ, অনুভবে তাহা তুমি বুঝিলে এখন।"

এইক্ষণ অবধি রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের এক জন পরম ভক্ত শিষ্য হইলেন—বিদ্বেষ অনুতাপে পরিণত হইল—যাঁহাকে শূদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, তাঁহাকে দেবতা রূপে পূজা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে তাঁহার বোধগম্য হইল যে "ভগবন্ত জনের কোন জাতি নাই—যেমন শালগ্রাম প্রস্তর হইয়াও পূজার্হ, সেই রূপ ঈশ্বরানুরাগী পুণ্যাত্মার প্রতি নীচ জাতির দোষ অর্শে না। দশগ্রন্থী বৈদিক পণ্ডিতেরা শাস্ত্র পুরাণ ভগবদ্গীতা প্রত্যহ পাঠ করেন কিন্তু তাঁহারা সে সকলের সার অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই কলিযুগে ব্রাহ্মণেরা কর্ম্মকাণ্ডের কুচক্রে ও জাত্যভিমানে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। তুকা সামান্য ব্যবসায়ী বণিক নহেন—তিনি বিঠোবার চরণদাস—তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ভক্ত ও ত্যাগী পুরুষ আমি পৃথিবীতে আর কোথাও দেখি নাই*।" এই রূপ তুকার প্রতি রামেশ্বর ভট্টের ভাব আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইল ও তিনি যে সকল কবিতা জলমগ্ন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন তাহা নিজ হস্তে লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নদী হইতে তুকারামের গ্রন্থোদ্ধার ও রামেশ্বর ভট্টের বৈর-মোচনের পর তুকারাম এই সমস্ত অত্যাচার হইতে এক প্রকার অব্যাহতি পাইলেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও অকৃত্রিম দেবভক্তির জন্য তাঁহার নাম মহারাষ্ট্রময় প্রচারিত হইল। তাঁহার সুখ্যাতি মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবাজির শ্রুতিগোচর হওয়াতে তিনি তাঁহাকে স্বহস্তে এক পত্র লিখিয়া মহাসমারোহে রাজসভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। এই স্থলে বলা উচিত যে শিবাজীর ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল ও তিনি রামদাসের শিষ্য বলিয়া প্রকাশ্যরূপে পরিচিত ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি স্বকীয় রাজ্য রামদাসের হস্তে সমর্পণ করিয়া তাহা পুনর্ব্বার তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করত রামদাসের প্রতিনিধি রূপে শাসন কার্য্য আরম্ভ করেন—এই হেতু সন্ন্যাসীরা যে গেরুয়া বসন পরিধান করে মহারাষ্ট্রীয় জয়পতাকা সেই বর্ণের কাপড়ে প্রস্তুত হইত। তুকারামকে

*রামেশ্বর ভট্ট তুকারামের স্তুতি বিষয়ক যে কয়েকটি অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন তাহাতে এই রূপ ভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

রাজভবনে আনাইবার জন্য তাঁহার নিকট লোক জন অশ্ব রথ রাজ-ছত্র প্রভৃতি অনেক সরঞ্জাম প্রেরিত হইয়াছিল কিন্তু তুকারাম মহারাজের আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন না— তিনি সেই সকল সরঞ্জাম ফিরাইয়া দিয়া শিবাজী ও তাঁহার মন্ত্রীগণকে এক উপদেশ, পূর্ণ ছন্দোময় পত্র লেখেন তাহা নিম্নে অনুবাদিত হইল।

১৮৮৪

ভাল নাহি বাসি ছত্র ঘোটক মশাল,
ইথে কেন জড়াইছ আমারে ভূপাল!
ধন মান আড়ম্বর বড় ঘৃণা করি—
এ বিপদ হোতে মোরে রক্ষা কর হরি!

১৮৮৫

ভাল যা' না বাসি তাই চাও সঁপিবারে,
এ সঙ্কটে কেন সদা ফেলিছ আমারে?
সঙ্গী ও সংসার হতে অতি দূরে থাকি,
কথা নাহি ক'ব আর, রহিব একাকী।
মান দম্ভ লোকাচার ঘৃণা করি অতি,
এসব তোমারি থাক্ হে পাণ্ডরি-পতি।

১৮৮৬

ব্রহ্মা এ ব্রহ্মাণ্ড রাজ্য করিয়া প্রকাশি,
বিচিত্র শক্তির তাঁর করিলা আবাস।
পত্র প'ড়ে মনে হয় ভক্তি তব দড়,—
সুচতুর, বুদ্ধিমান গুরুভক্ত বড়।
লোকের ভাগ্যের সূত্র আছে তব হাতে,
"শিব" এই পুণ্য নাম সেজেছে তোমাতে।
করি ধ্যান আরাধনা যাগ যজ্ঞ আর,
স্ববশে এনেছ তুমি হৃদয় তোমার।
সাক্ষাৎ করিতে তুমি চেয়েছ রাজন,
উত্তরে মিনতি মম করহ শ্রবণ।
হীনশ্রী, অরণ্যবাসী, আসক্তি-বিহীন,
বস্ত্রাভাবে মলিন-কায়, অন্নাভাবে ক্ষীণ,
জীর্ণ হস্ত পদ অতি দেখিতে কুৎসিত,
আমারে দেখিয়া তুমি না হইবে প্রীত।
তুকা বলে "এই মম মনের কামনা,—
মোরে দেখিবার কথা বলোনা বলোনা।"

১৮৮৭

আমি যে তোমারে করি এতেক মিনতি,
জানিহ হরির কৃপা আছে তোমা প্রতি।
পাণ্ডুরঙ্গ পদে যার মন আছে লীন,
নহে সে কৃপার পাত্র নহে দীন হীন।
পাণ্ডুরঙ্গ রক্ষাকর্ত্তা সহায় আমার,
ছাড়ি তাঁরে অন্য কারে নাহি মানি আর।
তোমারে দেখিয়া মোর কি হইবে ফল,
সংসার-বাসনা যবে ছেড়েছি সকল।
বিসর্জ্জন করি দিয়া সব বাসনায়,
পেয়েছি নিবৃত্তি-গ্রাম অল্প খাজনায়।
পতিব্রতা যেই প্রেম রাখে পতি পরে,
মন মোর সেই মত বিঠোবার তরে।
বিঠ্ঠলি সমস্ত বিশ্ব আর কিছু নাই,
তোমার মধ্যেও তাঁরে দেখিবারে পাই।
তোমারে বিঠ্ঠল আমি করিতাম জ্ঞান,
অন্তরায় হল তায় তব পত্রখান।
রামদাস রয়েছেন সদ্‌গুরু অতি,
মন স্থির এক মাত্র কর তাঁর প্রতি।
মন যদি ধায় তব ভিন্ন ভিন্ন দিশে,
তাঁর পর ভক্তি তবে স্থির রবে কিসে।
তুকা কহে "শুন ওগো বুদ্ধির আগার!
ভক্তি এক মাত্র হয় ভক্তের উদ্ধার।"

১৮৮৮

যাইয়া তোমার কাছে কি হবে আমার,
মিছামিছি কষ্ট শুধু হইবেক সার।

খাবার অভাব হয় খাব ভিক্ষা কোরে,
বস্ত্র চাই ছিন্ন বস্ত্র আছে পথে পোড়ে।
শয্যা মোর পোড়ে আছে পথের পাষাণ,
আকাশেরে বস্ত্র করি, করি পরিধান।
বল তবে আর করি কিসের প্রত্যাশ,
বাসনা সে জীবনেরে করে শুধু হ্রাস। *
রাজার প্রাসাদে যায় মানের আশায়,
কহ দেখি মোরে, সেথা শান্তি পাওয়া যায় ?
মহতেরই তরে শুধু রাজার আলয়,
ক্ষুদ্র যে তাহার সেথা মান্য নাহি হয়।
বসন ভূষণ আদি আভরণ যত,
দেখা সে আমার পক্ষে মরণের মত।
এই কথা শুনি তব রোষ যদি হয়,
তবু হরি মোর পরে র'বেন সদয়।
হীনত্ব না ঘুচে করি যজ্ঞ উপবাস,
যত দিন মন রহে বাসনার দাস।
তুকা কহে লোক মাঝে তোমাদের মান,—
আমরা যে হরি-ভক্ত—দৈব-ভাগ্যবান।

১৮৮৯

এই এক মাত্র যোগ,করিও সাধন,—
যাহা ভাল তাহা ঘৃণা কোরোনা কখন।
যে কাজ করিলে হয় দোষ সংঘটন,
এমন কাজেতে মন দিওনা কখন।
দুর্জ্জন নিন্দুকে যদি করে যুক্তি দান,
তাদের কথায় কভু দিয়ো নাক' কান।
রাজ্যের রক্ষক কেবা করিও নির্দ্ধার,
পরীক্ষা তাদের করি বিচার অবিচার।
কি জানাব রাজা তুমি জানিছ সকল,
শরণ লভয়ে যেন অনাথ দুর্ব্বল।
এই যে মিনতি মোর রাখ যদি মনে,
সন্তুষ্ট হইব তাহে কি ফল দর্শনে।
কি সন্তোষ হবে বল সাক্ষাৎ হইলে,
দিন দিন আয়ুক্ষীণ, কবে যাবে চ'লে।
দুই এক কাজ মাত্র সার বোলে জানি,
আপনার ভ্রমে আমি রহিব আপনি।
এই এক সার কথা জানহ কল্যাণ,
একই আত্মা সর্ব্ব ভূতে রহেন সমান।
আত্মারাম নিরঞ্জনে রাখ সদা মন,
পূজ্য গুরু রামদাসে দেখহ আপন।
তুকা কহে"ধন্য ধন্য তুমিহে ভূপতি—
ত্রিলোক ব্যাপিয়া রহে তব কীর্ত্তি ভাতি।"

১৮৯০

চতুর মান রক্ষক তুমি প্রতিনিধি,*
সত্বগুণনিধি তোমা করেছেন বিধি।

*সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য শিবাজী আটজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া ছিলেন।

পেশোয়া অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী। মোরেশ্বর ত্রিম্বল পিংলে (ডাকনাম মোরোপন্থ) শিবাজীর পেশোয়া ছিলেন।

মজুমদার।—ইনি রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারী—ইহাঁকে সমস্ত হিসাব-পত্র তদারক করিতে হইত, সুতরাং ইহাঁর কার্য্যভার অতিশয় গুরুতর ছিল। কল্যাণী প্রদেশের সুবেদার আবাজী সোনদেও শিবাজীর মজুমদার ছিলেন।

সুর্ণীস।—ইনি দফ্‌তরদার ও পত্রব্যবহার (Correspondence)বিভাগের কর্ত্তা। ইঁহাকে সমস্ত চিটি পত্র দেখিতে শুনিতে হইত। সমস্ত দলিল দস্তাবেজ ইঁহার খাতায় লেখা থাকিত। ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া দিলে তবে সে সমস্ত মঞ্জুর হইত। আনাজি দত্তো শিবাজীর সুর্ণীস ছিলেন।

বাকানীস্—এই কর্ম্মচারীকে শিবাজীর নিজের দৈনিক বিবরণ ও চিটি পত্র রাখিতে হইত। শিবাজীর গৃহরক্ষক সৈন্যদল ও

শুন হে মজুমদার লেখনী-নিপুণ,
জানিবে পত্রের তুমি যত গুণাগুণ।

গার্হস্থ্য সমস্ত ব্যাপারের তত্ত্বাবধান-ভার ইঁহার উপর। এই কাজে দত্তোজি পন্থ নিযুক্ত ছিলেন।

সর্ণোবৎ অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ ও ইয়েসজি কঙ্ক পদাতিক দলের অধ্যক্ষ ছিলেন।

ডবীর—বৈদেশিক রাজকর্ম্মচারী। বিদেশীয় দূতগণের অভ্যর্থনা ও বিদেশীয় অপরাপর রাজকার্য্যের ইনি তদারক করিতেন। সোমনাথ পন্থ শিবাজীর ডবীর ছিলেন।

ন্যায়াধীশ অর্থাৎ বিচারপতি। নীরাজি রাওজি এবং গোমাজি নায়ক ন্যায়াধীশ ছিলেন।

ন্যায়শাস্ত্রী—স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্রের ব্যাখ্যা-কর্ত্তা। ধর্ম্ম, দণ্ড, বিজ্ঞান ও রাজ্য সম্বন্ধীয় জ্যোতিষী গণনার ভার ইঁহার উপর ছিল। প্রথমে শম্ভু উপাধ্যায়—পরে রঘুনাথ পন্থ শিবাজীর ন্যায়শাস্ত্রী হন।

ন্যায়াধীশ এবং ন্যায়শাস্ত্রী ব্যতীত উক্ত প্রত্যেক কর্ম্মচারীকেই সেনা-নায়কতা করিতে হইত, এই জন্য সর্ব্বদা তাঁহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য কাজে মনোযোগ দিতে পারিতেন না। এই হেতু তাঁহাদের প্রত্যেকের এক এক জন কারবারী অর্থাৎ সহকারী ছিল। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারীর অধীনে আট জন কনিষ্ঠ কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের নাম—

১ দেওয়ান অথবা কারবারী।
২ মজুমদার—হিসাব পত্র পর্য্যবেক্ষক।
৩ ফর্ণবীস—ডেপুটি হিসাব-তদারক-কর্ত্তা।
৪ সব্‌নিস্—দফ্‌তরদার।
৫ কর্কনিস (Commissary)
৬ চিটনিস—পত্র-ব্যবহার সম্পাদক।
৭ জামদার—নগদ টাকা ভিন্ন আর সকল মূল্যবান্ সামগ্রী ইহার হস্তে থাকিত।
৮ পোটনিস—খাজাঞ্চি।

পেশোয়া স্থর্নিস আর চিট্‌নিস্ ডবীর,
রাজাজ্ঞা স্থমন্ত আর সেনাপতি বীর।
তুমি হে পণ্ডিত রায় ভূষণ সভার,
বৈদ্যরাজ আদি সবে জান নমস্কার।
তোমরা পত্রের অর্থ জানিয়ে অন্তরে,
বিচার করিয়া তাহা বল নৃপতিরে।
সাত্বিক প্রণয় ভরা দৃষ্টান্তের কথা,
যা কহিনু যেন তার না হয় অন্যথা।
মহারাজে যথাস্থিত দিও এ সন্দেশ,
বাক্যের স্বরূপ অর্থ ক'য়ো সবিশেষ।
ভয়ে ভয়ে বুঝাও হে যদি বিপরীত,
তাহা হ'লে তোমাদেরি হইবে অহিত।
তুকা কহে "নমস্কার অধিকারিগণ—
জানাইবে মহারাজে, এই নিবেদন।

তুকারামের পত্র পাঠে শিবাজী কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং সন্তুষ্টই হইয়াছিলেন—এমন কি, তিনি নিজে সেই সাধুর আলয়ে গিয়া তাঁহার দর্শনেচ্ছু হইলেন। তখন তুকারাম দেহুর নিকটবর্ত্তী লোহ গ্রামে বাস করিতেছিলেন—মহারাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া বহুমূল্য মনিমানিক রত্নাদি আনিয়া তাঁহাকে উপহার দেন কিন্তু তুকারাম সে সমুদয় তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিলেন—বলিলেন "মহারাজ, রজত কাঞ্চন আমার চক্ষে মৃত্তিকা-সমান—এ সকল বস্তুতে আমার লোভ হয় না। আমাদের মোহ ও আশার অন্ত হইয়াছে—আমি হরির দাস, হরিই আমার আশ। মহারাজ, তুমি ভগবদ্ভক্ত হইয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত থাক, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।"

শিবাজী তুকারামের নিস্পৃহতা ও বৈর-

ভক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। মহীপতি বলেন যে, মহারাজা তুকারামের সাধু দৃষ্টান্ত ও সংসর্গগুণে সংসারের প্রতি এরূপ বীতরাগ হইয়াছিলেন যে তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। শিবাজীর মাতাঠাকুরাণী জিজাবাই এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবামাত্র ব্যাকুল অন্তরে তুকারামের নিকট গমন করিয়া আপনার একটী মাত্র পুত্রকে সদুপদেশ দ্বারা সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর মিনতি করিলেন। তুকারাম কহিলেন "ভয় নাই, তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।" রাত্রিকালে সংকীর্ত্তনের সময় শিবাজী রাজা সমাগত হইলে অবসর বুঝিয়া তুকারাম তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, যাহার যে ধর্ম্ম তাহা পালন করা তাহার কর্ত্তব্য—তদ্ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই। তিনি বলিলেন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মই প্রজাপালন, তাহা ছাড়িয়া মহারাজের সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করা কখনই উচিত নহে। এই উপদেশ পাইয়া শিবাজীর বিষয়-বৈরাগ্য দূর হইল এবং তিনি তাঁহার মাতার সঙ্গে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর শিবাজী তুকারামের সহিত একবার পুণায় গিয়া সাক্ষাৎ করেন। তথায় এক দিন তিনি তুকারামের কথকতা শ্রবণ করিতেছেন এমন সময় চাকন-দুর্গ রক্ষক এক জন মুসলমান সরদার তাঁহার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য এক দল পাঠান সৈন্য প্রেরণ করেন। মুসলমান-ইতিহাসে এই রূপ কথিত আছে যে পাঠানেরা আসিয়া একত্রিত লোকের মধ্যে কে শিবাজী তাহা চিনিতে পারে নাই। শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন এক জন লোককে পলায়নোদ্যত দেখিয়া শিবাজী-অনুমানে শত্রুদল তাহার পশ্চাতে ধাবমান হয়। এই অবসরে শিবাজী তথা হইতে অপসরণ পূর্ব্বক তাঁহার সিংহগড় দুর্গে গিয়া উপস্থিত হন। হিন্দুদিগের বিশ্বাস এই যে, তুকারামের পুণ্য ও প্রার্থনা-বলে শিবাজী শত্রুর চক্রান্ত হইতে রক্ষা পান।

শ্রীস—

ইংরাজদিগের আদব্-কায়দা।

ইংরাজদিগের এবং ইয়ুরোপীয় অন্যান্য দেশের আদব্-কায়দার কাছে আমাদের দেশের আদব্-কায়দা ঘেঁসিতেও পারে না। ইয়ুরোপে সকলি যেমন যন্ত্রে নির্ব্বাহিত হয়, তেমনি হৃদয়ের ভাবও ইয়ুরোপীয়েরা এমন যন্ত্রবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে, দুঃখ না হইলেও তাহারা দুঃখ প্রকাশ করিতে পারে, হাসি না পাইলেও হাসিতে পারে। ভদ্রতার ভাব হইতে যে সব নিয়ম প্রসূত তাহাকেই ত আদব্ কায়দা বলে? তোমার নিয়ম বাঁধা থাক্ বা না থাক্, যাহারা ভদ্র তাহারা কখনো অভদ্রতা করিতে পারে না। তাহারা স্বাভাবিক অবস্থায় পরের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করে

তাহাই ভদ্রতা। আমাদের হিন্দুজাতির অত আইন কানুন নাই, অথচ স্বাভাবিক ভদ্রতার ভাব এমন আর কোথাও দেখিবে না। আমাদের দেশে ত এত নিয়মের বাঁধা-বাঁধি নাই, তবুও ত মনিয়র উলিয়াম্‌স্‌ কহিয়াছেন, ভারতবর্ষের ছোট লোকেরাও এমন ভদ্র, শান্ত, প্রভুভক্ত, যে ইয়ুরোপে তাহার তুলনা পাইবে না। ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার আমাদের কাছে অনেক কারণে নূতন ও আমোদজনক লাগিবে।

ইংলণ্ডে প্রণামের স্থলে যেক্-হ্যাণ্ড করিবার সময় স্ত্রীলোকেরাই প্রথম হাত বাড়াইয়া দেন। তোমার অপেক্ষা মান মর্য্যাদায় যিনি বড় তাঁহার প্রতি তুমি প্রথমে হাত বাড়াইতে বা গ্রীবা নত করিতে পার না। যাহাদের সঙ্গে তুমি আলাপ পরিচয় রাখিতে ইচ্ছা কর না, তাহারা যদি তোমাকে প্রকাশ্যে অভিবাদন করে, তবে তুমি ফিরাইয়া না দিতেও পার। কিন্তু ইংরাজি আদব্-কায়দাজ্ঞ ব্যক্তি কহেন—তাহা অপেক্ষা অভ্যস্ত-উপেক্ষার সহিত তাহার প্রণাম ফিরাইয়া দেওয়াই ভাল। কিন্তু তাই বলিয়া কোন পুরুষ কোন অবস্থায় স্ত্রীলোকের অভিবাদন উপেক্ষা করিতে পারেন না। স্ত্রীলোক ইচ্ছা করিলে কোন পুরুষকে ওরূপ উপেক্ষা করিতে পারেন কিন্তু কোন অবিবাহিতা স্ত্রী বিবাহিতা স্ত্রীর অভিবাদন ওরূপ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। যদি কোন ব্যক্তি নিমন্ত্রণ-সভায় কোন মহিলাকে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন, তাঁহার সহিত অধিক গল্প করিয়া থাকেন বা আহার-স্থানে হাত ধরিয়া লইয়া গিয়া থাকেন, তবে তাহার পর দিন কোন প্রকাশ্য স্থানে দেখা হইলে সে মহিলা সে ভদ্র লোকটির প্রতি সম্মান-প্রদর্শনার্থ গ্রীবা নত করিতে পারেন। অনেক সাহেব ভারতবর্ষীয়দের অভিবাদন, মাথা কাঁপাইয়া বা টুপি ছুঁইয়া মাত্র ফিরাইয়া দেন, কিন্তু ভাল আদব্‌কায়দা অমন হোমিওপ্যাথিক-মাত্রায় প্রণাম করিতে পরামর্শ দেন না, সম্পূর্ণ রূপে টুপি না খুলিয়া যদি অভিবাদন করিতে চাও, তবে তাহার চেয়ে না করাই ভাল। যাহার সহিত যেক্-হ্যাণ্ড্ করিতে চাও, তাহার সহিত দেখা হইলে বাম হস্তে টুপি খুলিতে হইবে ও ডান হস্তে যেক্‌হ্যাণ্ড্ করিতে হইবে। পথে আসিতে আসিতে কোন পরিচিতা মহিলা যদি তোমার সম্মুখে আসিয়া পড়েন, তবে কথা কহিবার জন্য তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার পথ বন্ধ করিও না, যেদিকে তিনি যাইতেছেন তাহা তোমার গম্য পথের বিপরীত দিক হইতে পারে, কিন্তু মহিলার পাশে পাশে সে দিকেই তোমার যাওয়া উচিত, পরে কথা শেষ করিয়া তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা করিও। যে মহিলার সহিত তুমি কথা কহিবে না, তাঁহার সহিত যদি দেখা হয়, তবে, তিনি যদি ডান দিকে থাকেন তবে বাম হস্তে বা যদি বাম দিকে থাকেন তবে ডান হস্তে টুপি খুলিতে হইবে অর্থাৎ যে হস্ত মহিলা হইতে অধিক দূর, সেই হস্তে টুপি খুলিতে হইবে। ঘোড়ায় চড়িয়া যাইবার সময় যদি কোন পদাতিক মহিলার

সহিত সাক্ষাৎ হয়, তবে ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহার লাগাম ধরিয়া মহিলার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া কথা কহিবে, ঘাড় উঁচু করিয়া কথা কহিবার কষ্ট যেন মহিলাকে না দেওয়া হয়। কোন মহিলার সঙ্গে সঙ্গে চলিবার সময় তাঁহার হস্তে পুস্তক প্রভৃতি যাহা কিছু থাকিবে তাহা তুমি বহন করিবে। যদি চুরট খাইতে খাইতে পথে আইস, তবে কোন মহিলার সহিত কথা কহিতে হইলেই তাহা ফেলিয়া দিও। যেক্‌হ্যাণ্ড করিতে হইলে যাহাকে যেক্‌হ্যাণ্ড করিবে, তাহার খুব কাছে না আসিলে হাত বাড়াইও না, দূর হইতে হাত বাহির করিয়া আসিলে বড় ভাল দেখায় না। মহিলারা আসিলে ভদ্রলোকদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইবে, কিন্তু পুরুষেরা আসিলে মহিলাদিগকে উঠিতে হয় না। অগ্নিকুণ্ডের (Fire place) কাছাকাছি যাইবার জন্য তুমি এক চৌকি ছাড়িয়া আর এক চৌকিতে যাইতে পার না। গৃহের কর্ত্রী তোমাকে যদি কাহারো সহিত পরিচিত করিয়া দেন, তবে তুমি তাহার প্রতি গ্রীবা নত করিবে, তবে যদি সে ব্যক্তি কর্ত্রীর বিশেষ আত্মীয় বা পুরাতন বন্ধু হয়, ও কর্ত্রী যদি তাহার সহিত তোমার বিশেষ আলাপ করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যেক্‌হ্যাণ্ড করিতে পার। মহিলারা পুরুষের প্রতি হাত বাড়াইয়া দেন বটে, কিন্তু হাত নাড়েন না, মহিলার হস্ত লইয়া নাড়িয়া দেওয়া পুরুষের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যুবতীরা অবিবাহিত পুরুষের প্রতি কেবল মাত্র গ্রীবা নত করিবেন। যখন কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছ, যতক্ষণ থাকা প্রয়োজন ততক্ষণ থাকিয়াছ, এমন সময়ে যদি অন্য আগন্তুক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া পাঠায়, তাহা হইলে তখনি তুমি উঠিয়া যাইও না; যখন অভ্যাগতগণ চৌকিতে আসিয়া বসিল, তখন গৃহের কর্ত্রীর নিকট বিদায় লইয়া এবং নবাগতদিগকে অতি নম্র নমস্কার করিয়া চলিয়া যাইবে। হয় ত কর্ত্রী তোমাকে বসিবার জন্য অনুরোধ করিবেন, কিন্তু এক বার যখন উঠিয়াছ, তখন আবার বসিতে গেলে বড় ভাল দেখাইবে না। কাহারো সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় যদি ঘড়ি দেখিবার প্রয়োজন হয় তবে, "অন্য কাজ আছে এই জন্য ঘড়ি দেখিতেছি" এই বলিয়া কারণ দর্শাইয়া ও অনুমতি লইয়া তুমি ঘড়ি দেখিবে। কোন মহিলা বিদায় লইতে উঠিলে পুরুষেরও উঠিয়া দাঁড়াইতে হয়, এবং যদি তাঁহার নিজের বাড়ি হয় তবে গাড়িতে পৌঁছিয়া দিতে হয়। অভ্যাগত আইলে বিশেষ সম্ভ্রম দেখাইবার ইচ্ছা না থাকিলে মহিলারা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবেন না, যদি তিনি এক পদ মাত্র অগ্রসর হইয়া তাহাকে যেক্‌হ্যাণ্ড করেন ও সে না বসিলে না বসেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে। অভ্যাগতগণ বিদায় লইবার সময় উঠিলে মহিলাকেও উঠিতে হইবে, ও যতক্ষণ না তাঁহারা ঘর হইতে বাহির হইয়া যান, ততক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবেন, কিন্তু ঘরের সীমা পর্য্যন্ত

তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। নিজে যে চৌকিতে বসিয়া থাক, নিজে না বসিয়া সম্ভ্রম প্রদর্শনের জন্য সে চৌকি কাহাকেও বসিবার জন্য দিও না, তবে যদি অন্য চৌকি না থাকে সে এক আলাদা কথা। এইত গেল প্রণাম নমস্কার প্রভৃতি সম্ভ্রম প্রদর্শনের রীতি নীতি। এক্ষণে দেখা সাক্ষাৎ করিবার নিয়ম অনিয়মের বিষয় লিখি।

সকল সময়েই দর্শকদিগকে অভ্যর্থনা করাই ভদ্রতার নিয়ম। যদি তোমার হাতে সর্ব্বদা কাজ থাকে, তবে চাকরদিগকে বলিয়া রাখিও তাহারা আগন্তুকদিগকে বলিবে যে, প্রভু অমুক দিন বা অমুক সময় ব্যতীত কখনো ঘরে থাকেন না। যদি দৈবক্রমে ভৃত্য কাহাকেও ঘরের মধ্যে আনিয়া থাকে তবে যত অসুবিধাই হোক্ না কেন, তাহাকে অভ্যর্থনা করাই উচিত। কোন মহিলা আগন্তুকদিগকে অপেক্ষা করাইয়া রাখিবেন না। ছাতা এবং "ওভার-কোট্" "হলে" রাখিয়া দেখা করিতে যাইতে হইবে।

"মর্নিংকল্" অর্থাৎ দিনের বেলায় দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া বিকাল ৩টা হইতে ৫ টার মধ্যেই উচিত। কারণ আহারাদি ও সাজ-গোজ করিবার সময় দেখা করিতে গেলে বড় অসুবিধা হয়।

দেখা করিতে যাইবার সময় টুপি খুলিয়া টেবিল বা অন্য কোন দ্রব্যের উপর রাখা উচিত নহে, টুপি হাতে করিয়া রাখিতে হইবে, অথবা যদি রাখিতেই হয় তবে ভূমির উপর রাখা উচিত। "মর্নিং-কল্" করিতে যাইবার সময় সখের কুকুর সঙ্গে লইয়া ঘরে যাইও না, কারণ তাহারা চেঁচামেচি করিতে পারে, অথবা কোন লেডির গাউনের উপর বা মকমলের কৌচের উপর শুইতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ না করিতে পারে। অথবা গৃহের কর্ত্রীর সাধের বিড়ালটি হয়ত অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে ঘুমাইতেছে, তাহার সহিত অনর্থক একটা বিবাদ বাধাইতে পারে। যদি কোন মহিলা কাহারো সঙ্গে দেখা করিতে যান, তবে তিনি যেন তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছেলে-পিলে সঙ্গে লইয়া না যান। কারণ, যাহার সঙ্গে দেখা করিতে যান্ সে বেচারীর হয়ত বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে থাকে, পাছে তাঁহার "আল্‌বাম্" ছিঁড়িয়া ফেলে বা তাঁহার সাধের প্রস্তর-মূর্ত্তিটি অঙ্গহীন করিয়া ফেলে। তোমার যদি গাড়ি না থাকে তবে বাদলার দিনে কাহারো সঙ্গে দেখা করিতে যাইও না, কারণ তুমি যদি ভিজা কোটে ও কাদা মাখা জুতায় কাহারো ঘরের কার্পেটের উপর বিচরণ কর তবে গৃহের কর্ত্রীর বড়ই মন খারাপ হইয়া যাইবে। লোকাকীর্ণ ঘরে গেলে প্রথমে গিয়াই গৃহের কর্ত্রীকে সম্ভ্রম জানানো আবশ্যক, পরে অন্য কাজ। কোন মহিলা কাজ কর্ম্ম ছাড়া আর কোন কারণে ভদ্র লোকদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতে পারেন না। বন্ধুত্বের সাক্ষাতে বড় অধিক কালব্যয় করিও না, বড় জোর আধ ঘণ্টা কথাবার্ত্তা কহিবে। আদব্-কায়দাজ্ঞ ব্যক্তিরা কহেন যে, তুমি এত টুকু থাকিবে যাহাতে বন্ধুগণ তুমি এত শীঘ্র চলিয়া গেলে বলিয়া কষ্ট পান, কিন্তু দেরি করিতেছ বলিয়া মনে মনে তো-

মার বিদায় প্রার্থনা না করেন। কাহারো সামাজিক সাক্ষাৎ (অর্থাৎ যে সাক্ষাৎ বিশেষ নিয়মানুসারে করিতেই হয়, বন্ধুত্ব অথবা অন্য প্রকারের সাক্ষাৎ নহে) ফিরিয়া দিবার সময় ঘরের মধ্যে না গিয়া একটা কার্ড্ রাখিয়া গেলেও হয়। কিন্তু অমনি বাড়ির লোকেরা কেমন আছেন, সে সংবাদটা লইও। আবার,যে মহিলার সঙ্গে তুমি দেখা করিতে গিয়াছ তাঁহার সঙ্গে যদি তাঁহার ভগিনী বা কন্যাগণ থাকেন, তবে প্রত্যেককে আলাদা আলাদা কার্ড্ দিতে হইবে। অথবা যদি বাড়িতে অন্য অভ্যাগত উপস্থিত থাকেন, তবে কাহাকে কার্ড্ পাঠাইতেছ, তাহা বিশেষ করিয়া জানাইবার জন্য তোমার নামের উপর তাঁহার নাম লিখিও। কাহারো শোকে শোক প্রকাশ করিবার জন্য যে সাক্ষাৎকারের নিয়ম আছে, তাহা শোকের ঘটনা ঘটিবার পরে সপ্তাহের মধ্যে পালন করা উচিত। তোমার যদি বিশেষ আত্মীয় বন্ধু না হন তবে কার্ড্ পাঠাইয়া দিও। কাহারো আনন্দে আনন্দ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত সাক্ষাৎ করিতে হইলে কার্ড্ না পাঠাইয়া নিজে যাইও। যে বন্ধু বা আলাপীর বাড়িতে নিমন্ত্রণে গিয়াছ, বা যাহাদের নিমন্ত্রণের চিঠি পাইয়াছ, সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের সহিত দেখা করিও। দেশে আগমন ও বিদায়-বার্ত্তা জানানো ভিন্ন অন্য কোন কারণে চাকরের হস্তে কার্ড্ পাঠানো বড়ই অসম্ভ্রম প্রদর্শনের চিহ্ন।

কার্ডের উপর নাম ধাম সমস্ত লিখা থাকিবে। সাক্ষাৎ করিবার কার্ড্ খুব সাদাসিদা হওয়া উচিত, চক্‌চোকে কার্ডের "ফ্যাসান্" এখন আর নাই। নিজের নামের সহিত খেতাব প্রভৃতি যেন না থাকে, সাদাসিদা "ইটালিক্" অক্ষরে নাম লিখা থাকিবে, "রোমান" বা অন্য প্রকার ঘোর-ফের অক্ষরে যেন নাম লেখা না হয়। "কণ্টিনেণ্টে" অর্থাৎ ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে নামের পূর্ব্বে "মশিও" বা "মিষ্টর" বা "মিস্" প্রভৃতি লেখে না, ইংলণ্ডেও কেহ কেহ তাহার অনুকরণ করেন। নিজের হাতের লেখার অনুরূপ অক্ষরে নাম লিখিলে, হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তবে বড় বড় প্রতিভা-সম্পন্ন লোক,যাঁহাদের হাতের অক্ষর দেখিতে লোকের কৌতূহল জন্মে, তাঁহারা এরূপ করিতে পারেন ; জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ বা কার্লাইলের হাতের অক্ষরের কার্ড্ শোভা পায়, অন্য লোকের নহে। শোকগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের কার্ডের চারি দিকে কালো ঘের থাকিবে। অবিবাহিতা কুমারী যাঁহারা পিত্রালয়ে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের আর স্বতন্ত্র কার্ডের প্রয়োজন নাই। কার্ডে তাঁহাদের মাতার নামের নিম্নে নিজের নাম লিখা থাকিবে। যেমন

Mrs Charles Gilbert.

Miss Charles Gilbert.

কোন কোন বিবাহিত ব্যক্তি সস্ত্রীক দেখা করিতে আইলে উভয় নামের একটি কার্ড্ ব্যবহার করেন; যেমন Mr. & Mrs Stewart Austin.। পরিবারের কাহারো মৃত্যু হইলে ইংরাজেরা অনেক সময়ে

কার্ড্ পাঠাইয়া সেই সংবাদ দেন; সেই কার্ডে মৃত ব্যক্তির নাম, বয়স, জন্মস্থান, বাসস্থান, ও কবর-স্থান লিখিত থাকে। বিদায় লইবার কার্ডের এক কোণে P. P. C. (pour prendre congé) অথবা P. D. A. (pour dire adieu) এই অক্ষর তিনটী খোদিত থাকে।

বিদেশ হইতে নবাগত ব্যক্তি যদি তোমার বন্ধুর পরিচয়-পত্র (Letter of introduction) তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়, তবে তাহার পরদিন গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিও। দেখা করিয়া তাহার পরেই তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিবে। যদি তেমন ক্ষমতা না থাকে, তবে তাঁহাকে লইয়া সঙ্গীতালয় পশুশালা প্রভৃতি দেশে যাহা কিছু দেখিবার স্থান আছে লইয়া যাইও। যাহাকে কাহারো নিকট পরিচিত করিবার নিমিত্ত পরিচয়-পত্র লিখিবে, তাহার চরিত্রের বিষয় কিছু লিখিবার আবশ্যক নাই। চরিত্রের বিষয় কিছু না বলিলেও বুঝায় যে, যাহাকে তুমি তোমার বন্ধুর সহিত পরিচিত করিতে চাও, তাহাকে অবশ্য তোমার বন্ধুর পরিচয়ের যোগ্য মনে করিতেছ। শুদ্ধ এই লিখিলেই যথেষ্ট যে—"অমুক ব্যক্তি তোমার বন্ধু হইলেন, ভরসা করি তোমার অন্যান্য বন্ধুরা তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিবেন।"

প্রাচীন সিংহলের বাণিজ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এক্ষণে প্লিনির বিবরণ পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। প্লিনি সিংহলের দুই বিভিন্ন প্রকার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে একটী তাঁহার বা সিজরগণের সময় লইয়া, অপরটী প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কথা লইয়া। সিজরগণ প্লিনির ঠিক্ পূর্ব্বসময়েই ছিলেন। আমরা প্লিনি ও ষ্ট্রাবোর মুখে শুনিতে পাই, যে প্লিনি ও সিজরদিগের সময়ে আরব-সাগর দিয়া ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য ব্যাপার প্রবলরূপে চলিত। উঁহারা বলেন যে, যে সময় হইতে মিশর রোমকদিগের অধিকারভুক্ত হইল, সেই সময় হইতে বাণিজ্য-স্রোত এত প্রবল হইয়াছিল, যে দুই চারিখানি ক্ষুদ্র জাহাজের কথা দূরে থাকুক্, দলে দলে অসংখ্য জাহাজ প্রতিবৎসরে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং টাকার বিনিময়ে এতদ্দেশ-জাত দ্রব্যাদি লইয়া দেশে প্রতিগমন করিত। সম্রাট ক্লডিয়সের সময়ে সিংহল হইতে রোমে যে সকল দূত প্রেরিত হয়, তাহাদেরই কথা লইয়া প্লিনি সিংহলের বিষয় যাহা কিছু বলিয়াছেন। নিম্নলিখিত ঘটনার জন্য ঐ সকল দূত প্রেরিত হয়—এনিয়স্ প্লোক্যামস্ নামে জনৈক দাসত্ব-মুক্ত ব্যক্তি

লোহিত বা ভারত সাগরে শুল্ক আদায় করিত; একদা যেমন তিনি আরব দেশের তীরাভিমুখে যাইতেছিলেন,অমনি ঘটনাক্রমে উত্তর বায়ু তাঁহাকে উড়াইয়া লইয়া সিংহলান্তর্গত হিপ্‌পুরী বন্দরে ফেলে, তথায় রাজা তাঁহাকে কৃপা দৃষ্টিতে গ্রহণ করিয়া ছয়মাস কাল যথোচিত আতিথ্য করেন। তাঁহারই প্রস্তাবে রাজা সিজরের নিকট চারি জন দূত প্রেরণ করেন। এই দূতেরাই গিয়া বলিয়াছিল, যে সিংহলে পাঁচশতেরও অধিক্ নগর আছে। পালিসিমন্দু (Palæsimundu) নিকটবর্ত্তী বন্দর লইয়া সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবশালী। এই খানেই রাজভবন; এখানকার লোকসংখ্যা ২০০০০০ তন্নিকটেই মেনিস্‌বা হ্রদ, ইহার পরিধি ৩৭৫ মাইল, এবং ইহা হইতে দুইটী নদী বহির্গত হইয়াছে; একটী উত্তর দিকে; অপরটীর নাম পালিসিমন্দু, ইহা ত্রিমুখী হইয়া সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয়, যে এনিয়স্ প্লোক্যামস্, নিশ্চয়ই উত্তর পূর্ব্ব বায়ু দ্বারা সিংহলের উত্তরভাগে হিপ্‌পুরী বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হন। হিপ্‌পুরী বন্দরটী কোন্ স্থানে ছিল, তাহা আমরা নির্ণয় করিতে পারি না। পাঁচ শতেরও অধিক নগর মধ্যে পালিসিমন্দু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, ইহাতে এইরূপ নিশ্চয় হয়, যে তৎকালে সিংহল বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ছিল। গঙ্গা, দ্বীপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ নদী। এই দ্বীপের সকল বন্দরই বাণিজ্যোপযোগী; তথায় প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্তও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাই হউক এক সময়ে যে উহার বাণিজ্য বিলক্ষণ সুবিস্তৃত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। প্লিনির অবশিষ্টাংশের বিষয় কিছুই না বলিয়া আমরা উহা ত্যাগ করিলাম, কেন না উহা কেবল নাবিকগণের কথার উপর নির্ভর করিয়া লিখিত। উহাতে মিথ্যা গল্পের ভাগই অধিক থাকিবার সম্ভাবনা।

ক্লডিয়সের সময়ে, খ্রীষ্টীয় শকের প্রারম্ভে সিংহলের বাণিজ্যের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা দেখাইয়াছি, এক্ষণে ইহার পরবর্ত্তী সময়ের লেখক এরিয়ান কি বলেন, শুনা যাউক্। এই লেখক নিরো,কি আণ্টোনাইনিসের সময়ের লোক তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, তিনি কি বলেন, তাহা শুনা যাউক। এরিয়ান্ বনিক-বেশে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রণীত পেরিপ্লস্ গ্রন্থে মালাবার উপকূলের অবিকল বর্ণনা আছে। উহার ভিন্ন ভিন্ন বন্দরের বিশেষ বিবরণ, কি প্রকার বাণিজ্যে উহারা প্রসিদ্ধ,এ সকল স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে সিংহলের নিকটবর্ত্তী দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ ভাগস্থ কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুরের সমৃদ্ধিসম্পন্ন অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, এরিয়ান্ সিংহলে যান নাই, তথাপি তিনি তাহার বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তদ্বিষয়ে সকলের মনোযোগ দেওয়া উচিত। তাঁহার সময়ে সিংহলের পূর্ব্বতন নাম তাপ্রোবেন, পালিসিমন্দম নামে পরিবর্ত্তিত হয়। তৎকালে উহার উত্তরাংশ কৃষির গৌরবভূমি ছিল; বৃহৎ

বৃহৎ অর্ণবপোতে লোকে দূরদেশে বাণিজ্য-যাত্রা করিত; প্রবাল, বহুমূল্য প্রস্তর ও বস্ত্র এবং কচ্ছপ-পৃষ্ঠ ঐ দ্বীপে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। এই সংক্ষেপ বিবরণে প্রথমতঃ পালিসিমন্দম * নামের উৎপত্তি বিষয়ে বিতণ্ডা আবশ্যক করে। প্লিনি বলেন যে এই সুবৃহৎ নগরে দুই লক্ষেরও অধিক অধিবাসী ছিল। ইহাতে বোধ হয় যে, উহা ঐ দ্বীপের রাজধানী ছিল। এখানে বহুসংখ্যক বণিক ও নাবিক যাতায়াত করিত। তাহারা ঐ রাজধানীর নামানুসারে দ্বীপকেই পালিসিমন্দম্ কহিত। বর্ত্তমান সময়ে যেমন জাবাকে বটেভিয়া বলিয়া থাকে। টলেমি ঐ নামক কোন নগরের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু এনারিসমন্দম নামক একটী স্থানের কথা বলিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে সাল্‌মেসিয়স্ উভয়কে একই বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন। ঐ নগর দ্বীপের উত্তর ভাগে অবস্থিত ছিল; এক্ষণে অনেকে উহাকে আধুনিক জাফ্‌নাপত্তন (Jafnapatam) কহিয়া থাকেন। প্লিনির বিবরণ মতে উহা তৃণকমলী উপসাগরের তীরে হওয়াই অধিক সম্ভব, কেন না উহা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বন্দরস্থান। এরিয়ান দূর-বাণিজ্যার্থী বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোতের বিষয়ও উল্লেখ করিয়াছেন। যদিও এরিয়ান সিংহলের যথার্থ বিবরণ দিতে পারেন নাই, তথাপি এ দ্বীপের উত্তর ভাগ যে সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে কর্ষিত হইত, উহা যে বহুবিস্তৃত বাণিজ্য-স্থান, ইউরোপ, আর্য্যাবর্ত্তের গাঙ্গেয় প্রদেশ, মলক্কা ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপ সমূহ, এমন কি, চীন সাম্রাজ্যের সহিতও যে উহার বাণিজ্য চলিত, তাঁহার বিবরণ হইতে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক্ষণে টলেমির কথা। এই প্রসিদ্ধ ভূগোলবেত্তা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। ইঁহার ভূগোলের একটী পরিচ্ছেদ কেবলই সিংহলের কথা লইয়া। তিনি এত পরিষ্কাররূপে তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন, যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি তাঁহার সমসাময়িক যে সকল নাবিক ও বণিকদিগের নিকট ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাইয়াছিলেন এস্থলে তাঁহাদের নাম করা অপ্রাসঙ্গিক বোধ করা গেল না। টলেমি যে কেবল উপকূল ও বন্দরের বিষয় জানিতেন এমন নহে, তিনি দ্বীপের অন্তঃপ্রদেশের বিষয়ও জ্ঞাত ছিলেন, তবে উপকূল বন্দরের বিষয় যত পরিস্ফুটরূপে জানিতেন, উহা তত জানিতেন না। তিনি বলেন যে পূর্ব্বে উহাকে পালিসিমন্দী কহিত, কিন্তু তাঁহার সময়ে তথাকার অধিবাসীরা Salæ এবং অপরে Salice কহিত। ঐ স্থান ধান্য, মধু, আদা, বহুমূল্য প্রস্তরখণ্ড, স্বর্ণ, রৌপ্য, হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। দ্বীপের উত্তর ভাগে যেখানে ক্ষেত্রে জল দিবার মানসে হ্রদ খনন করা হইত, সেই খানে ধান্য জন্মিত। বহুমূল্য প্রস্তর ও ধাতু

* উহার ব্যুৎপত্তি করিতে গিয়া হ্যামিল্টন বলেন পালি বা বালি সীমান্ত হইতে ঐ নামের উৎপত্তি, অর্থাৎ বালির অধিকারের ঐ পর্য্যন্ত সীমা।

সকল কেবল দ্বীপের অন্তঃপ্রদেশেই পাওয়া যাইত। দ্বীপের দক্ষিণ ভাগ, যে স্থানকে টলেমি হস্তি-চারণ-স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন সেখানে হস্তিদন্ত পাওয়া যাইত। উত্তর ভাগে দুইটী বাণিজ্য-প্রধান নগর মাতুতবী ও তলকড়ী (Talacri) এবং অন্তঃপ্রদেশে বিচারালয় স্থান অমরগ্রাম (Amurogrammum) এবং রাজধানী মহাগ্রাম (Maagrammum) লইয়া ছয়টী নগরের উল্লেখ আছে। টলেমির এই সকল বিবরণ আধুনিক পর্য্যটকগণের লিখিত বিবরণের সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে উহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক। তাঁহাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ নামা নক্সের কথা উল্লেখ করি। ইনি একজন স্কটলণ্ডের অধিবাসী। ১৬৫৭ খৃঃঅব্দে সিংহলের তীরে জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে, তথায় প্রায় বিংশতি বৎসর কাল রুদ্ধ থাকেন। তৎপরে অনেক কৌশলে ওলন্দাজদিগের অধিকারে পলায়ন করিয়া কিছু দিন পরে স্বদেশে প্রতিগমন করেন। ভ্রমণকারীর যে সকল গুণ থাকা উচিত এই অসাধারণ মনুষ্যের তৎ সমুদয়ই ছিল; যেরূপ সুক্ষ্মানুসুক্ষ্মরূপে তিনি তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সহস্র ধন্যবাদ দিতে হয়। তিনি তদ্দেশের ভাষা সম্যক রূপে শিখিয়াছিলেন। যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ আজিও দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তৎসমুদায়ের প্রাচীন নাম অনুসন্ধান করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকগুলিই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণের সহিত টলেমির বিবরণ তুলনা করিলে দেখা যায় যে আজও তাহা সাধারণে জানে। ভূগোলবেত্তা টলেমি গঙ্গানামে দ্বীপের একটী প্রধান নদীর উল্লেখ করেন, তাহা যে নিশ্চয়ই মাবেলাগঙ্গা বা মহাবলিগঙ্গা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। টলেমি হস্তি-চারণ-স্থানের উপর হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে পর্ব্বতকে মালি (Malae) বলিয়াছেন, এক্ষণে তথাকার অধিবাসীরা তাহাকে মালেল (Malell) বলিয়া থাকে, কিন্তু ইউরোপীয়েরা তাহাকে Adam's Peak কহে। উহা দ্বীপের দক্ষিণ ভাগে। এখানে নানা স্থান হইতে তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে। টলেমির অমরগ্রাম ও নক্সের অমরবুর বা অমরপুর উভয়ই এক। নক্স বলেন, যে অত্রত্য অধিবাসিদিগের মধ্যে এই রূপ কিম্বদন্তী আছে, যে এখানে অনুক্রমে ৯০টী রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহারা বহুসংখ্যক দেবমন্দির স্থাপন করেন।

টলেমি সিংহলের পার্শ্ববর্ত্তী বহুসংখ্যক দ্বীপেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ঐ সকল বৃত্তান্ত পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, যে তৎকালে ঐ সকল স্থানে নাবিকেরা সর্ব্বদাই যাতায়াত করিত; এবং সিংহল তাঁহাদের বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল।

এক্ষণে আমরা ষষ্ঠ শতাব্দীর কথা বলিব। এই সময়ে সিংহল ভারতসাগরের প্রধান বাণিজ্যস্থান ছিল।* বাণিজ্য

* Macpherson, Annals of Commerce, Vol 1. page 225.

তরী সকল আসিয়ার নানা স্থান হইতে এখানে আগমন করিত। এখানকার বণিকগণও নানাস্থানে যাইয়া বাণিজ্য করিত। এই সকল বাণিজ্য-ব্যাপার কস্‌মাস্‌ দ্বারা সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। এই মৈশরীয় বণিক্‌ সম্রাট্‌ দ্বিতীয় জষ্টিনের সময়ে ৫৬০ খৃঃ অব্দে এক্সুম(Axume) রাজার অধিকারে বাস করিতেন। তিনি আরবীকোর নিকটস্থ এডুল (Adule) নামে ইথিয়োপিয়ার এক সুবিখ্যাত বন্দরে বাণিজ্যার্থে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সোপেটার (Sopater) নামে এক সিংহলীয় বণিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহারই মুখে সিংহল এবং তাহার বাণিজ্যের বিষয় শুনিয়া যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলেন তাপ্রোবেন ভারতসাগরের একটী বৃহৎ দ্বীপ; হিন্দুরা উহাকে সিংহলদ্বীপ (তিনি Silediva লিখিয়া গিয়াছেন, উহা যে "সিংহল দ্বীপের" অপভ্রংশ, তাহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে) বলিয়া থাকে। এখানে বহুমূল্য প্রস্তর (Hyacinth) পাওয়া যায়, ইহা পিপ্পলীর জন্মভূমি •মেলের (মালাবার) অতি সন্নিহিত; ইহার চতুঃপার্শ্বে বহুসংখ্যক দ্বীপ দৃষ্ট হয়; তাহার সকল গুলিই নির্ঝরিনী মালায় পরিশোভিত, সকল গুলিতেই নারিকেল বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দুইজন রাজা দ্বারা শাসিত, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের বিরোধী; তন্মধ্যে এক জন পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিকারী, সেখানে মূল্যবান প্রস্তর পাওয়া যায়। আর এক জন সিংহলের অবশিষ্ট ভাগের অধিকারী, সেই খানেই বাণিজ্যপ্রধান নগর ও বন্দর। এই কারণে তথায় তৎপার্শ্বস্থ স্থানের লোক সকল সর্ব্বদা যাতায়াত করিয়া থাকে। অধিবাসীরা আপন আপন রাজার ধর্ম্মাবলম্বী। এই দ্বীপে বহুসংখ্যক দেবমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটীতে এক অসাধারণ আকারের সমুজ্জ্বল প্রস্তর (Hyacinth) আছে। উহা ঐ পবিত্র মন্দিরের কোন এক চিহ্নিত সমুচ্চ স্থানে সংস্থাপিত থাকে। যখন উহা সূর্য্যকিরণে প্রভাসিত হয়, তখন উহার আলোক বহুদূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা এক বিস্ময়জনক অদ্ভুত ব্যাপার।

"ভারতবর্ষ, পারস্য, ইথিয়োপিয়া প্রভৃতি দেশসকলের সহিত উহার বাণিজ্যের সুগমতা আছে বলিয়া ঐ সকল দেশ হইতে সহস্র সহস্র অর্ণবপোত তথায় গমনাগমন করিয়া থাকে। ঐ দ্বীপবাসী বণিকদিগেরও অসংখ্য বাণিজ্য-তরী আছে। সিন (চীন) এবং অন্যান্য স্থান হইতে এখানে রেশম, মুসব্বর, লবঙ্গ, এবং দেশজাত অন্যান্য পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়া আবার মেল (মালাবার) ও কল্যান প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইত। মেল হইতে পিপ্পলী, কল্যাণ হইতে পিত্তল, তিল, ও বস্ত্রবয়নোপযোগী দ্রব্য সকল আমদানী হইয়া সিন্ধু, পারস্য, হোমারাইট (Homerite) আডুল (Adule) প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইত। তদ্বিনিময়ে সিংহল ঐ সকল দেশ হইতে যাহা পাইত, তাহা ও স্বদেশজাত দ্রব্যসকল, ভারতব-

র্ষের অভ্যন্তর প্রদেশে পাঠাইয়া দিত। সিন্ধুদেশ- সিন্ধুনদী (Indus) দ্বারা পারস্য হইতে বিচ্ছিন্ন। সিন্ধু (Sindus) অড়োট (Orrhota,) কল্যাণ (Calliana,) সিবর (Sibor) প্রার্ত্তি (Prarti,) মঙ্গরথ (Mangarath,) সালপত্তন (Salopatana,) নলপত্তন (Nalopatana,) এবং পদ্মপত্তন (Pudopatana) এই কয়েকটীই তৎকালে ভারতবর্ষের বাণিজ্যপ্রধান নগর ছিল। শেষোক্ত কয়টী মেল প্রদেশের অন্তর্গত। অহোরাত্রি পাঁচ দিন পর্য্যটন করিলে মেল হইতে সিংহলদ্বীপ (Siledive) বা তাপ্রোবেনে উপস্থিত হওয়া যায়। আরো দূরে মহাদেশের উপর মাবেলো (Mavallo) নগর। এখানে শঙ্খ উৎপন্ন হয়; পূর্ব্বদিকে সিন্ই চীন-সমুদ্রের সীমা। কেবার (Caber) নগরে প্রচুর পরিমাণে Alabandanum† প্রস্তর পাওয়া যায়।

'সিংহলে এক প্রকার বহুমূল্য প্রস্তর (Hyacinth) জন্মে। এখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য দেশের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে; ইহা একটী বিখ্যাত বাণিজ্যপ্রধান স্থান, একথা আমি সোপেটার ও তাঁহার সহচরগণের মুখে শুনিয়াছি।'

কস্মাস্ সোপেটরের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, আমরা তাহা বিবৃত করিলাম। এই বিবরণে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহল, আফ্রিকার পূর্ব্বোপকূল হইতে চীন পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগের বাণিজ্যের সাধারণ কেন্দ্রভূমি ছিল; এখানে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বাণিজ্য দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইত, এবং বণিকেরা স্ব স্ব দেশজাত দ্রব্যের বিনিময়ে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য লইয়া যাইত। শুদ্ধ যে এইরূপে ইহার বাণিজ্য চলিত তাহা নহে, এতৎস্থানবাসীরা স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যাদির আবার রপ্তানী করিত। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে এই সময়ে সিংহল দুইটী বিভিন্ন জাতির বাসস্থান ছিল, এবং দুইটী বিভিন্ন রাজা দ্বারা শাসিত হইত। বহুমূল্য প্রস্তর ও দারুচিনির জন্মভূমি পার্ব্বত্যস্থান বা অন্তঃপ্রদেশ দেশীয় রাজার অধিকারে, আর, বন্দর ও বাণিজ্যপ্রধান নগরগুলি লইয়া সমগ্র উপকূলভাগ বিদেশীয় রাজার অধিকারে। এই বিদেশীয় রাজারা বাণিজ্যার্থ এখানে আসিয়া অধিবেশন করিয়াছিল, উহারা ভিন্ন জাতীয়। লেখকের কথানুসারে আমরা উহাদিগকে পারস্যবাসী বলিয়া বুঝিতে পারি।

যে সকল বিদেশীয় জাতির সহিত বিবিধ বাণিজ্য-ব্যাপার চলিত, তন্মধ্যে আড়ুল (Adule) বন্দরে ইথিয়োপীয়েরাই বিশেষ উল্লেখের যোগ্য। কারণ এই সময়ে আক্সুমিটি (Axumitæ) রাজ্যের সৌভাগ্যাবস্থা, ভারতবর্ষজাত দ্রব্য সকল উহার অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে, স্বর্ণের বিনিময়ে তদ্দেশবাসীরা ঐ সকল দ্রব্য লইয়া যাইত। তাহার পরে হোমিরিটি (Homeritæ) জাতি। ইহারা আরেবিয়া ফেলিক্স (Arabia Felix) তীরে বাস করিত, এই দেশেই এডেন বন্দর;

† Reported by Mons. Dulens to be something between an amethyst and a ruby.

ইহা ভারতবর্ষাগত অর্ণবপোত সকলের অতি সুবিধার স্থান। তৎপরে পারস্যের ভূমধ্যসাগরতীরস্থ প্রদেশাধিবাসী ও পারস্যোপসাগরবাসীদিগের নাম করা যাইতে পারে।

সিন্ধু নদের মুখ হইতে মালাবার পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্যের সমগ্র উপকূল ভাগে সিংহলের বাণিজ্য বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। সিন্ধুদেশ হইতে সিংহলে মৃগনাভির আমদানী হইত। ভারতবর্ষের উপকূল ভাগের অনেকগুলি বন্দরের নামোল্লেখ করা হইয়াছে—যথা অড়োট, এক্ষণে উহাকে সুরাট কহে; কল্যাণ,—আজিও উহা বোম্বাইয়ের নিকট বর্ত্তমান আছে; সিবরের কথা বলা যায় না; মেল, এক্ষণে উহাকে মালাবার কহে। এই শেষোক্ত স্থান পিপ্‌পলীর জন্মভূমি। কস্‌মাসের সময়ে উহা সুবিস্তৃত বাণিজ্যের জন্য বিলক্ষণ বিখ্যাত ছিল। শঙ্খোৎপত্তিস্থান মাবেলোকে আমরা মান্নার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি। কস্‌মাস্ উহাকে মহাদেশের উপর বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এটী তাঁহার ভ্রম। উহাকে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ বলা যায়। কেবার বা কেবারো যে বর্ত্তমান ট্রাঙ্কুইবারের (Tranqueber) সন্নিকটবর্ত্তী ও কাবেরী নদীতীরস্থ স্থান, তদ্বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহ নাই।

কেবল যে দাক্ষিণাত্য হইতে সিংহলে দ্রব্য সকল আমদানী হইত তাহা নহে, বহুদূরস্থ দেশ ও দ্বীপ সকল হইতেও নানা প্রকার পণ্য দ্রব্য এখানে আনীত হইত। জিনিট্‌জা (Tzinitza) বা চীন হইতে রেশম ও নানা প্রকার মশলার আমদানী হইত। তাহারা জন্‌ক (Junk) নামে যে জাহাজ ব্যবহার করিয়া থাকে, বোধ হয় তাহা লইয়াই সমুদ্রে যাতায়াত করিত। তৎকালে চীনের সহিত যে ইহার বাণিজ্য চলিত, তাহা আমরা কস্‌মাসের কথা দ্বারা সপ্রমাণ করিয়াছি।

যাহা লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহল এক বহুবিস্তৃত বাণিজ্যস্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল।

এক্ষণে আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কথা বলিব। এই ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মার্কোপলো নামে জনৈক বিনিসীয় ইউরোপে ফিরিয়া যাইবার সময় সিংহল দেখিয়া যান। মার্কোপলোকে পূর্ব্বমহাদেশের কলম্বস বলা যাইতে পারে। চীনের ওদিকেও যে সমুদ্র আছে, ইউরোপীয়দিগের মধ্যে তিনিই প্রথমে তাহা দেখিয়াছিলেন, দেখিয়া সকলকে জানাইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া মহাদেশে আসিবার জন্য ১২৭১খৃঃ অব্দের শেষেই হউক বা ১২৭২ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই হউক বিনিস্ হইতে যাত্রা করেন। এবং ১২৯৫ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত এই মহাদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি এই দীর্ঘ সময়ের অনেকাংশ তাতারের প্রসিদ্ধ কব্‌লে খাঁর সভায় অতিবাহিত করেন। তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য ইতিপূর্ব্বে বহুকাল ঐ রাজার রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারাই ঐ উনবিংশবর্ষবয়স্ক মার্কোকে লইয়া আসেন। মার্কো শীঘ্রই রাজার বিশ্বাসভাজন হইয়া

উঠিলেন। রাজা তাঁহার সাম্রাজ্যের দূরস্থ নানা প্রদেশের বহুবিধ গুরুতর কার্য্যের ভার তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। ঐ সুবিধা পাইয়া মার্কো নানাবিধ প্রদেশের আচার ব্যবহারে ও উৎপন্ন দ্রব্যে বিলক্ষণ রূপে অভিজ্ঞাত হইতে লাগিলেন। তিনি যাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, অনেকে তাহা অতিরঞ্জিত ও গল্প বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু তাঁহার পরগামী ভ্রমণকারিগণের কথায়, ও নানাবিধ গবেষণায় অবশেষে তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণীকৃত হইয়াছে। তিরাবোশী নামে জনৈক প্রসিদ্ধ ইতালীয় ইতিহাস-বেত্তা তাঁহাকে সরলহৃদয়ে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন, এবং তাঁহার কথার সত্যতা বিষয়ে অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। রবার্টসন মার্কোপলোর বিষয় বলিতে গিয়া নানা কথার পর বলেন, যে, তিনি স্বয়ং জাবা, সুমাত্রা তন্নিকটবর্ত্তী বহুসংখ্যক দ্বীপ, সিংহল ও কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূল ভাগ দেখিয়া যে যে নাম করিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মার্কোপলো সিংহল সম্বন্ধে বলেন যে, ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্বীপ; লোকে রাজাকে সেন্দারনাজ্ (Sendernaz) কহে। নরনারী সকলেই পৌত্তলিক; সকলেই প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় থাকে। এখানে ধান্য, তিলতৈল, দুগ্ধ, মাংস, বৃক্ষস-মুৎপন্ন মদ্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদ্মরাগমণি, নীলকান্তমণি, প্রচুর পরিমাণে বকম কাষ্ঠ পাওয়া যায়। রাজার একপ্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব সুবৃহৎ পদ্মরাগমণি আছে; তাহা নিষ্কলঙ্ক, জ্বলন্ত অগ্নিনির্ব্বিশেষ, এবং মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রীত হইবার নহে। কবলে খাঁ একটী নগরের মূল্য পাঠাইয়া উহা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তাহাতে উত্তর দিলেন, যে 'সমগ্র পৃথিবীর রত্নরাজি আনিয়া দিলেও আমি উহা দিব না; চিরজন্মে কখনও উহার সহিত বিচ্ছিন্ন হইব না, কেননা, উহা আমার পূর্ব্বপুরুষের।' এখানকার অধিবাসীরা সৈনিক কার্য্যে অনুপযুক্ত, আবশ্যক হইলে সৈন্য ভাড়া করিয়া আনে।

মার্কোপলোর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পরে, সেণ্ট আলবানবাসী সার্ জন মণ্ডেভিল সিংহল দর্শন করেন। তিনি এমন বিশেষ কিছু বলেন নাই, অতএব আমরা তদ্বিবরণ লিখিতে ক্ষান্ত হইলাম।

প্রাচীন সিংহলের বাণিজ্য সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভিন্ন ভিন্ন লেখক কি বলিয়াছেন, আমরা তাহা দেখাইয়াছি; এক্ষণে দেখা যাউক বাণিজ্য প্রধানতঃ কোন্ জাতির হস্তে ছিল; কোন্ জাতি বাণিজ্যে বিশেষ আধিপত্য করিত। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে হিন্দুদের হস্তেই বাণিজ্য ন্যস্ত ছিল, তাহা সার্ জন আলেকজণ্ডার জনষ্টনের * কথায় বুঝা যায়। তিনি বলেন, যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরবজাতীয় হেসেম পরিবারের কতক গুলি লোক, কালিফ আবদল মেলিকের (Caliph Abdolmelic)

* Transactions of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, vol 1. part III, p. 537—543.

অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া, মালাবার, কঙ্কাল, পরে সিংহলে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। সিংহলে মুসলমানদিগের এই প্রথম উপনিবেশ। ইহার পূর্ব্বে যে দেশীয় বণিক্-দিগের হস্তে বাণিজ্য ছিল, তাহা আমরা অবশ্যই বলিতে পারি। ঐ মুসলমানেরা সিংহলের ত্রিণকমলী, জাফনাপত্তন, মানতত্তী, মান্নাব, কেন্দ্রনালী, পট্‌লাম্, কলম্বো, বার্ব্বেরিন্, এবং পয়েণ্ট ডি গল, এই কয়েক স্থানে কয়েকটী উপনিবেশ স্থাপন করে। মানতত্তী ও মান্নার, এই দুইটীই তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা আরব, মিশর, পারস্য, হিন্দুস্থান, মলক্কা, ও তন্নিকটবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জ, ও চীনের সহিত বাণিজ্য করিত। চীনদেশীয় বণিকেরা সিংহলে আসিয়া রেশমের বিনিময়ে মুসব্বর, জায়ফল, ও নানাপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য ক্রয় করিয়া, তাহা আবার আরব ও পারস্য হইতে আগত বণিকদিগকে বিক্রয় করিত; এই রূপে সিংহল সকল দেশের বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি ছিল। সিংহলের বণিকেরাও তৎকালে বিলক্ষণ ধনশালী ছিল। তৎকালে, তাহাদের ভাণ্ডার মান্নার হইতে মানবত্তী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এবং সিংহল ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী দেশজাত বহুমূল্য দ্রব্য সকলে পরিপূর্ণ ছিল।—যথা; ত্রিণকমলী হইতে ধান্য; জফনা হইতে বেগুনে রং; কেন্দ্রমালী হইতে শঙ্খ ও প্রবাল; পট্‌লাম হইতে পান, সুপারি; কলম্বো হইতে দারুচিনি ও বহুমূল্য প্রস্তর; বার্ব্বেরিন হইতে নারিকেল তৈল, ও পায়েণ্ট ডি গল্ হইতে হস্তিদন্ত আসিত। উহারা প্রণালী ও তীরে আধিপত্য রাখিবার জন্য পথে অস্ত্রশস্ত্রসম্বলিত জাহাজ রাখিয়া দিত। পূর্ব্বে যে প্রাচীন বৃহৎ বৃহৎ তড়াগ সকলের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহারা সে সকল বিশেষ যত্নে রক্ষা করিত। এই সময়ে কতকগুলি রেশম-তন্তুবায়, ভারতবর্ষ হইতে এখানে প্রথম আগমন করে; রাজা তাহাদিগকে কতকগুলি অসাধারণ অধিকার দিয়াছিলেন।

এই রূপ ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাল পর্য্যন্ত সিংহলের বাণিজ্য মুসলমানদিগের হস্তে বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহার পর উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কৃত হওয়ায়, ক্রমে পর্টুগিজ ও ওলন্দাজদিগের হস্তে উহার বাণিজ্য আসিয়া পড়ে; এই সময় হইতে উহার বাণিজ্য দিন দিন হ্রাস পাইতে আরম্ভ হয়; সে সকল লিখিবার আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা সংক্ষেপে প্রাচীন সিংহলের বাণিজ্যের অবস্থা দেখাইয়াছি; আবার ক্রমে প্রাচীন ভারতবর্ষের বাণিজ্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইব।

প্রঃ—



রুসিয়া।

পৃথিবীর সমুদয় দেশ অপেক্ষা রুসিয়া এখন সকল লোকেরই মনের অধিক স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর মনুষ্যের বাসোপযোগী অংশের প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ রুসিয়া-সাম্রাজ্য, কিন্তু ইহার অধিবাসি-সমষ্টি বঙ্গদেশের অপেক্ষা অধিক নহে। পৃথিবীর অপর সকল সভ্যজাতি যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে পদার্পণ করিতেছে, কেবল এই দুই জাতীই উৎসাহও উদ্যমপূর্ণ নব যৌবনে উপস্থিত।—যদিও আমেরিকানিবাসী সভ্যজাতিমণ্ডলী ইউরোপীয় জাতি হইতে উৎপন্ন, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের সম্পূর্ণরূপেই নব জীবন।—রুসিয়া-তুর্কির যুদ্ধ মনুষ্য জাতির ইতিহাসে একটি সুমহৎ ঘটনা। আমরা কেবল ইহার সূত্রপাত দেখিতেছি, কিন্তু ইহার সুনিবিড় ছায়া অতি দূর ভবিষ্যতে পড়িতেছে। ইহা ব্যতীত আর একটি কারণ বশত রুসিয়াসংক্রান্ত কোন বিষয়ই আমাদের নিকট ঔদাস্যভাজন নহে। রুসিয়ার সহিত আমাদের দেশের এত সৌসাদৃশ্য যে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়; যে সকল আর্য্য রীতিনীতি বৈদেশিক প্রভাব বশত এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, কিম্বা মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত, সেই সকল রীতিনীতি অতি অল্পকাল পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রুসিয়ায় পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল, এবং এক্ষণেও অতি অল্প মাত্রই বিলুপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মনুষ্যজাতির আদিম অবস্থার তত্ত্বানুসন্ধানে নিবিষ্ট লোকেরা রুসিয়ার ইতিবৃত্তে যথেষ্ট গুপ্ত রত্নেরখনি পাইবেন। বাস্তবিকই রুসিয়া-সাম্রাজ্য-গত অনেক ঘটনাই বিশেষ কৌতূহলজনক। এই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

১। যাতায়াতের বিধি।

কোন দেশের বিবরণ লিখিতে হইলে তথাকার রাস্তাঘাট ও যানাদি ভ্রমণকারীর চক্ষে প্রথমে পড়ে বলিয়া সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হয়, এবং যানাদির মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যদেশে লৌহপথকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়া থাকে। আমাদের এই প্রচলিত প্রথার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম করিতে ইচ্ছা নাই। (Almanach de Gather) দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে ইয়ুরোপে রুসিয়ার ব্যাপ্তি ১,৫৫৫,৭৭ বর্গমাইল এতদ্ব্যতীত ৪,৩২৮,৬৪০ বর্গমাইল এবং সর্ব্ব শুদ্ধ ৫,৮৮৪,৪১৬ বর্গমাইল স্থান সেণ্টপিটার্স বর্গের সম্রাটের ক্ষমতার অধীন। ক্রাইমিচায় যুদ্ধের সময় ইহার মধ্যে কেবল ৬০০ মাইলের উপর লৌহবর্ত্ম ছিল। সেই যুদ্ধের পর হইতে লৌহপথ ক্রমেই বাড়িতেছে এবং এক্ষণে দেড় লক্ষ মাইল স্থানের উপর বাষ্পীয় শকট গমনাগমন করে। লৌহবর্ত্মের সম্বন্ধে একটি অতি বিস্ময়কর কার্য্য বর্ণিত আছে। সেণ্টপিটর্স বর্গ হইতে মাস্কা পর্য্যন্ত লৌহ

পথ প্রস্তুত করিবার প্রস্তাব হইলে ইঞ্জিনীয়ারেরা প্রস্তাবিত পথের নক্সা করিয়া সম্রাটকে প্রদর্শন করায়, সম্রাটের কোন কারণবশতঃ এই বিশ্বাস হইল যে ইঞ্জিনীয়ারেরা স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অকারণ পথ বাঁকাচোরা করিয়াছে। ইঞ্জিনীয়ারদিগকে অর্থলিপ্সার জন্য শাস্তিবিধান করিতে এবং ভবিষ্যতে এবিষয়ে আর কোন কথা না হয়, এই জন্য সম্রাট একটি রুল ও একটি পেনসিল লইয়া উক্ত নগরদ্বয় মধ্যে একটি সরলরেখা টানিয়া দিয়া বলিলেন যে "এই রেখা অনুসারে পথ প্রস্তুত করিতে হইবে।" তদনুরূপ লৌহপথ হওয়ায় ত্বার [Tver] ব্যতীত অন্য কোন নগরের কিছুমাত্র সুবিধা হয় নাই। রুসিয়ার সম্রাটের এই এক বিচক্ষণতার উদাহরণ। এই ঘটনা বর্ত্তমান সম্রাটের পিতা নিকলাসের সময় হইয়াছিল। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে রুসিয়ার পরাভবের এক প্রধান কারণ গতিবিধির অসুবিধা। উক্ত যুদ্ধের পর হইতে রুসিয়ানেরা যুদ্ধ কৌশলের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া সমুদয় কলের গাড়ীর পথ নির্ম্মাণ করিয়াছে। কোন একটা লৌহপথ প্রস্তুত করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে বিজ্ঞ সেনানায়কদিগের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। অন্যান্য দেশে কোন স্বাধীন ব্যবসায়িক সম্প্রদায় লৌহপথ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইলে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু রুসিয়ার সম্রাট যেরূপ অনুজ্ঞা দেন সেইরূপই করিতে হইবে, এবং সর্ব্বাগ্রে শাসন তন্ত্রের সহিত সেই কার্য্যের ফলের সম্পর্ক বিশেষ করিয়া রাজপুরুষদিগকে বুঝাইয়া দিতে হয়, সুতরাং রুসিয়ার স্বাধীন ব্যবসায়িক সম্প্রদায়েরাও যে কোন লৌহপথ করে তাহাতে সম্রাটেরই প্রত্যক্ষ পক্ষে লাভ হয়। যাহা হউক, রুসিয়ার লৌহপথ সকল এরূপ কৌশলে সংস্থাপিত যে এক্ষণে রুসিয়া কোন শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অতি অল্পক্ষণমধ্যে আক্রান্ত স্থানে ইচ্ছানুরূপ সৈন্যসমবেত হইতে পারে, কিন্তু অন্যান্য দেশ অপেক্ষা রুসিয়ার বাষ্পীয় শকটের গতি মৃদু।

রুসিয়ার বাষ্পীয় জলযানের বন্দোবস্ত অন্যান্য দেশের মত নহে। তথাকার নদী সকল যদিও পৃথিবীর অপরাংশের নদী হইতে দৈর্ঘ্যপ্রস্থে বিশেষ নিকৃষ্ট নহে বটে, তবুও আমাদের দেশের নদীর ন্যায় তৎসমুদয় স্থানে স্থানে এত চড়া ও চোরাবালি পরিপূর্ণ যে তন্মধ্যে জাহাজাদির গতিবিধির বিশেষ সুবিধা নাই, কিন্তু ইহাতে রুসিয়ানেরা হতাশ্বাস হয় নাই। কাপ্তেনেরা নিজ নিজ বাষ্পীয় জলজানে বিনা ভাড়ায় ডননদীর উপকূল-নিবাসী কসাকদিগকে যাতায়াত করিতে দেয়। কোনস্থানে জলযান আটকাইয়া যাইলে এই কসাকেরা জলে নাবিয়া দড়ীদিয়া ষ্টীমার টানিয়া লইয়া যায়। এই সকল কসাকদিগের এক প্রস্ত কাপড়মাত্র আছে, সুতরাং তাহা জলে ভিজিয়া যাইলে কখন কাপড় পরিবর্ত্তন করিতে পারে না; কিন্তু তাহাতে ইহাদের বিশেষ অসুবিধা নাই; বাত ও শর্দ্দির সহিত ইহারা কখন পরিচিত হয় না। কিন্তু এই সকল নদীতে বাষ্পীয় জলযানের যাতায়াতের পক্ষে যে

রূপ অসুবিধা আছে, সেইরূপ ইহাতে একটি সুবিধাও আছে। ভল্গা প্রভৃতি নদীতে স্রোতের গতি এত মন্দ যে ছোট ছোট টানিবার ষ্টীমার (Tug) দ্বারা বড় বড় শষ্যাদিপুর্ণ জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। ইহাতে শষ্যবাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা, কেন না বন্দরে লইয়া যাইবার অনেক ভাড়া বাঁচিয়া যায়। আমাদের দেশীয় নদীর তীরে যেরূপ অপর্য্যাপ্ত প্রকৃতির শোভা, রুসিয়ায় সেরূপ নহে; সেখানে নদীর ধারে প্রায়ই সুন্দর দৃশ্য নাই,কেবল ভল্গার তীরে এক-স্থানে একশ্রেণী ক্ষুদ্র পর্ব্বত দ্বারা দৃশ্যটি অতিশয় মনোহর হইয়াছে। রুসিয়ায় ভাল চিত্রকরের দুর্ভিক্ষের এই বোধ হয় এক কারণ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে রুসিয়ার আয়-তন এত বৃহৎ যে ইহার অনেক অংশেই ধূমকলের বংশীধ্বনী কখন শ্রুতিগোচর হয় নাই। এই সকল স্থানে গমনাগমন বি-শেষ সহজ ব্যাপার নহে। রুসিয়ার রাস্তা ঘাট ও শকটাদি এইরূপ যে তাহাদের বিব-রণ পাঠ করিলে মনে হয় যেন উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের কোন প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছি। রুসিয়ায় ভ্রমণের উপযোগী শকটের মধ্যে টারেণ্টাসই সর্ব্বাপেক্ষা চলিত। ইহা এক প্রকার স্প্রিংবিহীন গাড়ী; ইহার ছাদ নাই, কারণ রুসিয়ার রাস্তা ঘাট এমনি উচ্চ-নীচু এবং সেই হেতু আরোহীগণ মধ্যে মধ্যে এরূপ সবলে উৎক্ষিপ্ত হয় যে মাথায় শক্ত আচ্ছাদন না থাকিলে গুরুতর আঘাত পাই-বার সম্ভাবনা। বৃষ্টির সময় এই সকল গাড়ী কাপড়ের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হয়। সেই সময় টারেণ্টাসের সহিত পশ্চিমের রথ কিম্বা বহেলীর সহিত বিশেষ প্রভেদ থাকে না। বহেলী কিম্বা রথে সচরাচর দুই কিম্বা চারিটি গরু কিম্বা ঘোড়া জোড়া হয়, কিন্তু তিন ঘোড়ার কম টারেণ্টাস টানা হয় না। রুসিয়ার রাস্তায় গমনাগমন করা সকল সম-য়েই প্রায় কষ্টকর, কিন্তু শীতকালে এক স্তর বরফ জমিয়া যাইলে গাড়ী চলার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। কিন্তু পথিককে এক বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হয়। রুসিয়ার শীতকাল অতি ভয়ানক,এবং শরীরের নাসি-কাদি অনাচ্ছাদিত অংশের উপর শীতের বিশেষ তীব্র আক্রোশ। এই রূপ শীতা-ক্রান্ত শরীরাংশের সময়ে প্রতিকার না করিলে উহা নিশ্চয়ই পচিয়া যায়। এই দুর্ঘটনার সম্ভাবনা যত অধিক, ইহার প্রতি-কারের উপায়ও সেইরূপ সহজ। শীতক্লিষ্ট শরীরে বরফ ঘসিলে আর কোন ভয় থাকে না। যখন বরফ গলিতে আরম্ভ হয় তখন রাস্তাপথ এরূপ কদর্য্য হয় যে যাতা-য়াত এক প্রকার বন্ধ হইয়া যায়। বিশেষ কার্য্য না থাকিলে কেহ বাটীর বাহির হয় না।

আমাদের দেশে অধিক দূর ভ্রমণ করিতে হইলে পোষ্ট আফিস কিম্বা পুলিসের লো-কের সাহায্যে ডাক বসাইতে হয়, রুসিয়া-তেও সেইরূপ। কিন্তু এদেশে যেমন ডাক বসাইবার উপদেশও টাকা দিলেই নির্ভাবনা, রুসিয়ায় সেরূপ নহে। মিঃ ওয়ালেস্ কহেন যে এক দিবস তিনি ও তাঁহার এক জন

রুসিয়ানবন্ধু অপরাহ্ণে একটি ডাকঘরে উপস্থিত হইলেন।—পূর্ব্বে সেই ডাকে উপযুক্ত সংবাদাদি পাঠান হইয়া ছিল।—উপস্থিত হইয়া নূতন ঘোড়া চাহোয়াতে সেই স্থানের কর্ম্মচারী বলিল যে পরদিন প্রাতঃকালে না হইলে নূতন ঘোড়া পাওয়া যাইবে না। তৎপরে মিঃ ওয়ালেস্ অন্যত্র হইতে ঘোড়া লইবার মানসে বাহির হইবেন এমন সময় সেই কর্ম্মচারী [এক জন বলিষ্ঠ ডনকসাক]—তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিল যে"আপনারা পথিকদিগের মন্তব্য লিখিবার পুস্তকে আমার নামে দোষারোপ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা কাটিয়া না দিলে যাইতে পাইবেন না।" এই বলিয়া বলপ্রয়োগ করিবার উদ্যোগ করিল। পথিকদ্বয় এইরূপে বিপদ্‌গ্রস্থ হইয়া স্থির করিলেন যে রুসিয়ান বন্ধু উভয়ের তৈজসপত্র রক্ষার নিমিত্ত সেই স্থানে থাকিবেন, ও মিঃ ওয়ালেস শান্তিরক্ষকদিগের সাহায্য-অনুসন্ধানে বহির্গত হইবেন। সেইরূপ কার্য্য করা হইল; কতক্ষণ পরে মিঃ ওয়ালেস্ শান্তিরক্ষার প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত ফিরিয়া আসিলেন। প্রধান কর্ম্মচারী কোন কার্য্যবশতঃ সেই গ্রামে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা আসিয়া দেখিলেন যে রুসিয়ান ভদ্রলোকটি ডাকঘরের কর্ম্মচারী ও অন্য দুই জন লোকে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন, এবং উহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য রিভল্‌ভর আওয়াজ করিছেন, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কেহই আহত হয় নাই। প্রধান কর্ম্মচারীকে দেখিবামাত্র কসাক কর্ম্মচারী রুসিয়ান ভদ্রলোকের নামে হত্যা করিবার উদ্যোগ প্রভৃতি নানা অপরাধের জন্য অভিযোগ করিল। কর্ম্মচারী অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে সকল বিষয়ের নিস্পত্তি করিয়া দিলেন। এরূপ তৎপরতা বিস্ময়কর ও এদেশে বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

রুসিয়ার কোন কোন প্রদেশে এক প্রকার উষ্ট্রের গাড়ী প্রচলিত আছে, তাহার প্রতিরূপ পশ্চিমে পাওয়া যায়। উষ্ট্রের দ্বারা কৃষিকার্য্যও চলিয়া থাকে।

শুকতারা।

কে তুমি ত্রিদিববাসী, ওলো সুলোচনে !
একাকিনী উষাকালে দাও দরশন ?
মেলিয়া অলস আঁখি, বসিয়া বিজনে,
কার পথ চেয়ে আছ, রমণীরতন ?
কি দেখিছ গগনের হৈমদ্বার খুলি,
দেখিবার কিবা আছে আঁধার সংসারে ?
কার ধ্যান কর তুমি নিশা গেলে চলি ?
কৃপা করি, সুরনারি, কহলা আমারে ?
একভাবে একবেশে একই সময়,
হাসি মুখে দাও দেখা ভুবনমোহিনী ;
হেরিয়া তোমার রূপ জুড়ায় হৃদয়,
তাই নিত্য আসি হেথা পোহালে যামিনী।

অপরূপ রূপরাশি, হে সুরসুন্দরি,
দেখি তোমা পাখীগণ উঠে কূজনিয়া ;
সহসা জগৎ যেন জাগে হাস্য করি ;
উল্লাসে প্রভাত বায়ু বেড়ায় খেলিয়া।

দিনের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী, তুমি লো ললনে,
নিরখি তোমারে তাই ধরণী হাসিল,
হাসিল কুসুম-কলি বিকচ বদনে,
শাখীশাখা লতাপাতা নাচিতে লাগিল।

অথবা কল্পনা তুমি—কবিতার সার,
উষায় উদয়শোভা আস' দেখিবারে,
সুখে খুলি এসময় সুরপুর-দ্বার,
অনিমেষ নেত্রে হের শোভা চারিধারে।

তুমি কি, গো, আশাদেবী ? যার মায়াবলে,
জল্লাদ-কুঠারতলে লোকে হাস্যমুখ ;
শোকদুঃখ পাসরিয়ে নিবশে কুশলে,
প্রবাসী সহজে ভুঞ্জে স্বদেশের সুখ ?

তাই কি তোমারে হেরে ফুটিল কমল,
নাথ বিনা ছিল যেই লীন সরোবরে ;
আঁধার সংসার পুনঃ হইল উজল ;
উদিত কতই আশা জাগ্রত অন্তরে !

সুনিদ্রিত শিশু যথা স্বর্গীয় স্বপনে,
সহসা হাসিয়া উঠে শান্ত শয্যাতলে ;
সেরূপ সরল হাসি বিমল বদনে,
হেরি, তব, সুহাসিনি, পুলকে সকলে।

যত সুখ মম মনে তোমা দরশনে,
নিজ রূপে হয় কি, গো, সে সুখ তোমার ?
অথবা পরের সুখে সুখী তুমি মনে,
তাই দাঁড়াইয়া থাক খুলি স্বর্গদ্বার ?
নাহি জানি কেবা তুমি—কার প্রাণধন,
একাকিনী হেনকালে গগন প্রাঙ্গনে ?
এ বিরলে বল তব কিবা প্রয়োজন ?
অনন্ত আকাশে একা বসি কি কারণে ?

প্রেমের ভিখারী তুমি হেন লয় মনে,
নবীনা যোগিনী সম রূপের আধার ;
অনায়াসে একাকিনী অনন্ত গগনে,
ভ্রমিছ প্রেমের আশে খুঁজি ত্রিসংসার ?

ভুঞ্জিয়া সমস্ত নিশা পতি সহবাসে,
আসি দাঁড়াইলে, প্রিয়া প্রাণেশে বিদায়,
সুরপুর মনোহর গবাক্ষের পাশে,
দেখিবারে নাথে, যত দুর দেখা যায়।

অথবা প্রাণেশ আশে যাপিয়া যামিনী,
আর গৃহে একাকিনী থাকিতে নারিলে ;
তাই কি রজনী শেষে, ওলো সিমন্তিনি,
বাহির হইয়া আসি পথে দাঁড়াইলে ?

হায় ! মূঢ়মতি আমি কি কহি তোমারে !
বিরহবেদনা, কি গো, আছে স্বর্গধামে ?
অমরে সে বিষে, কি গো, দহিবারে পারে,
নরলোক সবিষাদে কাঁদে যার নামে ?

বুঝেছি বুঝেছি আমি, ওলো, দয়াবতি !
নহে ও তোমার, হায় ! বিরহ অনল ;
মানবের দুঃখ দেখি কাঁদ তুমি, সতি !
প্রত্যহ প্রভাতে তব বহে চক্ষে জল।

ওই যে মুকুতারাশি শোভে দূর্ব্বাদল,
নিশির শিশিরবিন্দু কভু ওতো নয় ;
তোমার চক্ষের জল ঝরি অবিরল,
নিলীম প্রান্তর যেন সব মুক্তময়।
কল্পনা কহিছে কানে, "যখন ভুবন,
অনন্ত আঁধারময় ছিল নিরাকার,
রূপশূন্য রেখাশূন্য নিবিড় ভীষণ,
শূন্যময় ঘোরতর সব একাকার !

অনন্ত জগৎজ্যোতিঃ যিনি জ্যোতির্ম্ময়,
একটী স্ফুলিঙ্গ তাঁর প্রথম উঠিল;
অনন্ত আকাশে সেই প্রথম সময়,
অনন্ত আঁধারে সেই প্রথম ভাতিল?

সেই তো আদিম তারা, তুমি শুকতারা!
উদিল প্রথম দিন তোমা লয়ে ভালে;
অসীম আকাশে দীপ তুমি তারাকারা,
প্রথম আঁধারে রেখা তুমি উষাকালে!

সূর্য্যচন্দ্র আদি যত গ্রহতারাগণ,
উঠিয়া তোমার আগে তোমায় নমিল,
নাচিল তোমায় সবে করিয়া বেষ্টন,
আঁধার সংসার যবে নিয়মে পশিল।

উদিল প্রথম তরু তোমার গোচর,
নদনদী মেরুমরু তব পদতলে,
ঢুলালে তোমায় বায়ু প্রথম চামর,
প্রথম প্রসূন তোমা পূজে কুতূহলে।

প্রথম জীবের সৃষ্টি তোমার সদনে,
শিখিল প্রথম পাখী করিতে কূজন,
বন্দিল তোমায় নরে অস্ফুট বচনে,
সঞ্চরিল তব আগে জীবের জীবন।

প্রথম জীবের সুখে তুমিই হাসিলে,
যখন তোমার আগে হাসিল সকলে,
প্রথম জীবের দুঃখে তুমিই কাঁদিলে,
কাঁদিল কাতরে যবে তাহারা সকলে।

প্রথম প্রেমের গীত করেছ শ্রবণ,
প্রথম কেঁদেছ দেখি বিরহ-বেদনা;
প্রথম প্রেমের কলি করেছ দর্শন,
প্রথম দহেছ দেখি দারুণ ছলনা।

গোকুলের লীলা আদি নাহি অগোচর,
দেখেছ কালের স্রোত সত্যত্রেতাকলি,
ত্রিকাল তোমার কণ্ঠে—ঘটনা নিকর—
তোমার হৃদয়ে গাঁথা আছে সে সকলি।

কত হলো, কত গেল, সুরাসুর নর,
রাজ্যপাট গিরিনদী এ তিন ভুবনে,
ইন্দ্রপাত, চন্দ্রপাত—মরিল অমর,
তুমি কিন্তু একভাবে জাগিছ গগনে।

সময়প্রস্তরহৃদে লিখেছে সংহার,
তোমার কপালে কিন্তু নহি তার লেখা;
অনন্ত যৌবন তব—চিরজ্যোতিঃ তার,
কভু তব স্বচ্ছ ভালে না পড়িবে রেখা।

অমরে মরিয়া যাবে, মরিবে পবন,
শুখাবে অসীম সিন্ধু, ডুবিবে ধরণী,
হিমাদ্রী হইবে চূর্ণ, টলিবে ভুবন,
তখন রহিবে জাগি তুমি বিনোদিনি!

দেখিয়া তোমার মুখ জাগে মম মনে,
আদি ভারতের সেই শান্তি নিকেতন;
বৃক্ষমাঝে পর্ণগৃহ শোভিত-প্রাঙ্গণে,
সদা সুখে নিবসিত বিনম্র বদন!

অনন্ত আকাশে যথা তব শোভা পায়,
প্রান্তরে কুটীরগুলি দেখিতে তেমন,
উগ্রমূর্ত্তি, উচ্চ আশা, দম্ভস্ফীত কায়
কভু না জানিত, আহা! সে সুখ ভবন।

সভ্যতাসূর্য্যের করে ঝলসে নয়ন,
অসহ্য হয়েছে সভ্যতার কোলাহল,
অসন্তোষ, দ্বেষ, হিংসা পূরিল ভুবন,
শিহরে পরাণ হেরে অন্তর-গরল।

নাহিক মধুর হাসি, খল হাসি হাসে,
অরুণলোচন এবে সভ্যতা প্রভায়,
ছলনা, চাতুরী, হায়! সবে ভালবাসে,
অকপট সখ্যভাব নাহি স্থান পায়।

হয়েছে বিস্তর বটে নানা মত কায,
তুঙ্গে তুঙ্গে অট্টালিকা উঠেছে গগনে,
ছুটেছে বাষ্পীয় রথ—বায়ু পায় লাজ,
বিদ্যুৎ পড়েছে ধরা দাসত্ব বন্ধনে !

বেঁধেছে জলধি-জল—ছেয়েছে গগন,
অসংখ্য পোতের ধ্বজে প্রকাশি বিভব,
বিহঙ্গ যাইতে যথা না পারে কখন,
মেঘমালা ভেদ করি উড়িছে মানব।

কিন্তু সে বিকটঠাঠ, দন্ত-উচ্চ-মুখ,
ভাল মম নাহি লাগে জনতা ভীষণ,
নাহি চাই সভ্যতার আড়ম্বর সুখ,
কোমল মধুর মূর্ত্তি চাহে মম মন।

তাই দিবাকর ছাড়ি তোমা মম আশা,
তাই চাই জনশূন্য নিভৃত বিজনে,
তাই উষাকালে মম এত ভালবাসা,
শান্তিমূর্ত্তি আঁকা আছে যাহার বদনে।

সুখের কাল কি হায় ! রহে বহুক্ষণ,
দেখিতে দেখিতে আহা ! কি হলো তোমার,
তুমিও মনের দুঃখে মুদিছ নয়ন,
কোথায় চলিছ সতি ! নিঃশব্দে আবার ?

দেখিয়া তোমার ওই করুণ মূরতি,
ক্ষীণালোক দেহখানি—অস্ফুট দর্শন,
অশোক কাননে হায় ! জানকী যেমতি,
মলিন বসনে বসি বিষণ্ণ বদন।

বিস্তারি অনন্ত জ্যোতিঃ জলন্ত তপন,
সুদূরে মেলিল আঁখি উদয়অচলে,
তুমিও উষার সখি, করিলে গমন,
ঢাকিয়ে বদনখানি মেঘের অঞ্চলে।

বিচিত্র বিধির বিধি এপাপ সংসারে,
বড়র দাপটে দেখ অস্থির ভুবন,
ধীর নম্র শান্ত সাধু তিষ্ঠিবারে নারে,
উগ্রমূর্ত্তি-রুদ্রবেশ সতের শমন।

রহ রহ ! ক্ষণ দেখি পূরিয়া নয়ন,
মধুমাখা মুখখানি, গো সুরসুন্দরি,
প্রেমের প্রতিমা সম তোমার আনন,
স্বচ্ছদৃষ্টি-স্থিরজ্যোতিঃ লাবণ্য লহরী।

কি দিব উপমা আমি ওমুখের সনে,
কি আছে জগতে, বল, ওরূপের কাছে,
হেরেছে কি কভু কেহ ওরূপ নয়নে,
ধরার কি কব কথা ! ত্রিদিবে কি আছে।

শ্রীপঃ

করুণা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

পণ্ডিত মহাশয় সকালে উঠিয়া দেখিলেন, কাত্যায়নী ঠাকুরাণী গৃহে নাই। ভাবিলেন, গৃহিনী বুঝি পাড়ার কোন মেয়ে মহলে গল্প ফাঁদিতে গিয়াছেন। অনেক বেলা হইল, তথাপি তাঁহার দেখা নাই; তা মাঝে মাঝে প্রায়ই তিনি এরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় আর বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারিলেন না, যেখানে যেখানে ঠাকুরাণীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল, খোঁজ লইতে গেলেন। মেয়েরা চোক টে-

পাটিপি করিয়া হাসিতে লাগিল, কহিল, "মিন্সা এক দণ্ড আর কাত্যায়নীপিসিকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, কোথায় গিয়াছে বুঝি, তাই খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন; কিন্তু পুরুষমানুষের অতটা ভাল দেখায় না।" তাহার মানে, তাঁহাদের স্বামীরা অতটা করেন না, কিন্তু যদি করিতেন, তবে বড় সুখের হইত। যেখানে কাত্যায়নীর যাইবার সম্ভাবনা ছিল, সেখানে ত পণ্ডিত মহাশয় খুঁজিয়া পাইলেন না, যেখানে সম্ভাবনা ছিলনা, সেখানেও খুঁজিতে গেলেন, সেখানেও পাইলেন না। এই ত পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকুল হইয়া মুহুর্মুহু নস্য লইতে লাগিলেন। উর্দ্ধশ্বাসে নিধিদের বাড়ি গিয়া পড়িলেন। নিধি জিজ্ঞাসা করিল, ঘোষেদের বাড়ি দেখিয়াছেন, মিত্রদের বাড়ি দেখিয়াছেন, দত্তদের বাড়ি খোঁজ লইয়াছেন? এই রূপে মুখুয্যে চাটুয্যে, বাঁড়ুয্যে, ইত্যাদি যত বাড়ি জানিত, প্রায় সকল গুলিরই উল্লেখ করিল, কিন্তু সকল তাতেই অমঙ্গল উত্তর পাইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য ভাবিতে লাগিল। অবশেষে নিধি নিজে নরেন্দ্রের বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। শূন্য গৃহ যেন হাঁ হাঁ করিতেছে। বিষন্ন বাড়ির চারি দিক যেন কেমন অন্ধকার হইয়া আছে, একটা কথা কহিলে দশটা প্রতিধ্বনি যেন ধমক দিয়া উঠিতেছে। একটা চাকর রুদ্ধ দ্বারের সম্মুখে সোপানের উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছিল, নিধি তাহাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "গদাধর বাবু কোথায়?" সে কহিল "কাল রাত্রে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, আজো আসেন নাই, বোধ হয় কলিকাতায় গিয়া থাকিবেন।" নিধি ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে কহিল "যদি খুঁজিতে হয়, ত, কলিকাতায় গিয়া খোঁজগে।" পণ্ডিত মহাশয় ত একথার ভাবই বুঝিতে পারিলেন না। নিধি কহিল, "গদাধর নামে একটি বাবু আসিয়াছেন, দেখিয়াছ?" পণ্ডিত মহাশয় শূন্যগর্ভ একটি হাঁ দিয়া গেলেন। নিধি কহিল "সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে কাত্যায়নীপিসি কলিকাতা ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন।" পণ্ডিত মহাশয়ের মুখ শুকাইয়াগেল; কিন্তু তিনি একথা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। তিনি কহিলেন, তিনি নন্দীদের বাড়ি ভাল করিয়া দেখেন নাই, সেখানেই নিশ্চয় আছেন। এই বলিয়া নন্দী আদি করিয়া আর একবার সমস্ত বাড়ি অন্বেষণ করিয়া আসিলেন, কোথাও সন্ধান পাইলেন না। ম্লান বদনে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। নিধি কহিল "আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম যে, এরূপ ঘটিবে।" কিন্তু তিনি পূর্ব্বে কোন দিন এ সম্বন্ধে কোন কথা বলে নাই। সিন্দুক খুলিতে গিয়া পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন, কাত্যায়নী ঠাকুরাণী শুদ্ধ যে নিজে গিয়াছেন, এমন নহে, যত কিছু গহনাপত্র, টাকাকড়ি ছিল, তাহার সমস্ত লইয়া গিয়াছেন। দ্বার রুদ্ধ করিয়া পণ্ডিত মহাশয় সমস্ত দিন কাঁদিলেন। নিধি কহিল এসমস্তই নরেন্দ্রের ষড় যন্ত্রে ঘটিয়াছে, তাহার নামে নালিস করা হউক, আমি সাক্ষী তৈয়ার

করিয়া দিব।’ নিধি এরূপ একটা কাজ হাতে পাইলেই বাঁচিয়া যায়। পণ্ডিত মাহাশয় কহিলেন, যাহা তাঁহার ভাগ্যে ছিল হইয়াছে, তাই বলিয়া তিনি নরেন্দ্রের নামে নালিস করিতে পারেন না।

নিধিকে লইয়া পণ্ডিত মহাশয় কলিকাতায় আসিলেন। একদিন দুই প্রহরের রৌদ্রে পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রান্ত স্থূল দেহ, কালীঘাটের ভিড়ের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে একটি সেকেণ্ড ক্লাসের গাড়ি আসিয়া দাঁড়াইল। পণ্ডিত মহাশয়ের মন্দির দেখা হইয়াছে, কালীঘাট হইতে চলিয়া যাইবেন তাহার চেষ্টা করিতেছেন; গাড়ি দেখিয়া তাহা অধিকার করিবার আশয়ে কোন প্রকারে ভিড় ঠেলিয়া ঠুলিয়া, সেই দিকে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, গাড়ি হইতে প্রথমে একটি বাবু; ও তাঁহার পরে একটি রমনী হাসিতে হাসিতে,পান চিবাইতে চিবাইতে গাড়ি হইতে নামিলেন ও হেলিতে দুলিতে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন। পণ্ডিত মহাশয় সে রমনীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলেন, সে রমনীটি তাঁহারি কত্যায়নী ঠাকুরাণী! তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কাত্যায়নী তাঁহার উচ্চতম স্বরে কহিলেন, ‘কেরে মিন্সে? গায়ের উপর আসিয়া পড়িস্ যে? মরণ আর কি!’ এই রূপ অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা গালাগালি বর্ষণ করিয়া অবশেষে পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার চোখের মাতা খাইয়াছেন কি না ও বুড়া বয়সে এরূপ অসদাচরণ করিতে লজ্জা করেন কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত মহাশয় দুইটি প্রশ্নের কোনটির উত্তর না দিয়া হাঁ করিয়া দাড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, মনে হইল যেন এখনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন। কাত্যায়নীর সঙ্গে যে বাবু ছিলেন, তিনি ছুটিয়া আসিয়া, তাঁহার টিকের বাড়ি পণ্ডিত মহাশয়কে দুই একটা গোঁজা মারিয়া ও বিজাতীয় ভাসায় যথেষ্ট মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া, ইংরাজী অর্দ্ধস্ফুট স্বরে পাহারাওয়ালা পাহারাওয়ালা করিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন। পাহারাওয়ালা আসিল, ও পণ্ডিত মহাশয়কে ঘিরিয়া দশসহস্র লোক জমা হইল। বাবু কহিলেন, এই লোকটি তাঁহার পকেট হইতে টাকা তুলিয়া লইয়াছে। পণ্ডিত মহাশয় ভয়ে আকুল হইলেন, ও কাঁদো কাঁদো স্বরে কহিলেন “না বাবা আমি লই নাই,তবে তোমার ভ্রম হইয়া থাকিবে, আর কেহ লইয়া থাকিবে।” চোর, চোর, বলিয়া একটা ভারি কলরব উঠিল,চারিদিকে কতকগুলা ছোঁড়া জমিল, কেহ তাঁহার টিকি ধরিয়া টানিতে লাগিল,কেহ তাঁহাকে চিমটি কাটিতে লাগিল, পণ্ডিত মহাশয় থতমত খাইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার ট্যাঁকে যত টাকা ছিল, সমস্ত লইয়া বাবুটিকে কহিলেন, “বাবা, তোমার টাকা হারাইয়া থাকে যদি, তবে এই লও, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, তোমার পায়ে পড়িতেছি আমাকে রক্ষা কর।” ইহাতে তাঁহার দোষ অধিকতর সপ্রমাণ হইল, পাহারাওয়ালা তাঁহার হাত ধরিল। এমন সময়ে নিধি চোক্ মুখ রাঙা-

ইয়া ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধির এক স্যুট চাপকান পেণ্ট্‌লুন ছিল, কলিকাতায় সে চাপকান পেণ্ট্‌লুন ব্যতীত ঘর হইতে বাহির হইত না। চাপকান পেণ্ট্‌লুন পরা নিধি আসিয়া যখন গম্ভীর স্বরে কহিল, "কোন্‌ হ্যায় রে!" তখন অমনি চারিদিক স্তব্ধ হইয়া গেল। নিধি পকেট হইতে এক টুকুরা কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার নম্বর কত, ও সে কোন থানায় থাকে, এবং উত্তর না পাইতে পাইতে সম্মুখস্থ ছেক্‌রা গাড়ির কোচম্যানকে জিজ্ঞাসা করিল, লালদিঘির এণ্ড্রু সাহেবের বাড়ি জান? পাহারায়ালা ভাবিল, না জানি এণ্ড্রু সাহেব কে হইবে? ও দাড়ি চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে বাবু, বাবু করিতে লাগিল। নিধি তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সেই বাবুটিকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয়, আপনার বাড়ি কোথয়? নাম কি?" বাবুটি গোলমালে সট্‌ করিয়া সরিয়া পড়িলেন, এবং সে পাহারায়ালাটিও অধিক উচ্চবাচ্য না করিয়া ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া পড়িল। ভিড় চুকিয়া গেল, নিধি ধরাধরি করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে একটি গাড়িতে লইয়া গিয়া তুলিল, এবং সেই রাত্রেই দেশে যাত্রা করিল। বেচারী পণ্ডিতমহাশয়, লজ্জায় দুঃখে কস্টে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। নিধি কহিল, কত্যায়নীর নামে গহনা ও টাকা চুরির নালিশ করা যাক। পণ্ডিত মহাশয় কোন মতে সম্মত হইলেন না।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিত মহাশয় করুণার সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিলেন। তিনি কহিলেন, এগ্রামে থাকিয়া আর কি করিব। শূন্য গৃহ ত্যাগ করে কাশী চলিলাম। বিশ্বেশ্বরের চরণে এ প্রাণ বিসর্জ্জন করিব।" এই বলিয়া পণ্ডিতমহাশয় ঘরদুয়ার সমস্ত বিক্রয় করিয়া কাশী চলিলেন। পাড়ার সমস্ত বালকেরা তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি সকলকে আদর করিলেন। এমন একটি বালক ছিলনা, যে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলে নাই। এইরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিত মহাশয় গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। অনেক লোক দেখিয়াছি কিন্তু তেমন ভাল মানুষ আর দেখিলাম না।

নরেন্দ্রের বাড়িঘরসমস্ত নিলামে বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। নরেন্দ্র গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। কোথায় আছে, কে জানে!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র চলিয়া গেলে রজনী মনে করিল, আমিই বুঝি মহেন্দ্রের চলিয়া যাইবার কারণ! মহেন্দ্রের মাতা মনে করিলেন যে, রজনী বুঝি মহেন্দ্রের উপর কোন কর্কশ ব্যবহার করিয়াছ, আসিয়া কহিলেন— "পোড়ারমুখী, ভাল এক ডাকিনীকে ঘরে আনিয়াছিলাম!" রজনীর শ্বশুর আসিয়া কহিলেন, "রাক্ষসী! তুই এ সংসার ছারখার করিয়া দিলি!" রজনীর ননদ আসিয়া কহিলেন—"হতভাগিনীর সহিত দাদার কি কুক্ষণেই বিবাহ হইয়াছিল!' রজনী একটি

কথাও বলিল না। রজনীর নিজেরই যে আপনার প্রতি দারুণ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, সেই ঘৃণার যন্ত্রনায় সে মনে করিল, বুঝি ইহার একটি কথাও অন্যায় নহে, সে মনে করিল, যে তিরস্কার তাহাকে করা হইতেছে, সে তিরস্কার বুঝি তাহার যথার্থই পাওয়া উচিত। রজনী কাহাকেও কিছু বলিল না, একবার কাঁদিলওনা, এ কয়দিন তাহার মুখশ্রী অতিশয় গম্ভীর—অতিশয় শান্ত—যেন মনে মনে কি একটি সংকল্প করিয়াছে, মনে মনে কি একটি প্রতিজ্ঞা বাঁধিয়াছে। এই দুইমাস হইল মহেন্দ্র বিদেশে চলিয়া গিয়াছে, এই দুই মাস ধরিয়া রজনী যেন কি একটা ভাবিতেছিল, এত দিনে সে ভাবনা যেন শেষ হইল, তাই রজনীর মুখ অতি গম্ভীর, অতি শান্ত দেখাইতেছে।

সন্ধ্যা হইলে ধীরে ধীরে সে মোহিনীর বাড়িতে গেল। মোহিনীর সহিত দেখা হইল, থতমত খাইয়া দাঁড়াইল, যেন কি কথা বলিতে গিয়াছিল, বলিতে পারিল না, বলিতে সাহস করিল না। মোহিনী অতি স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রজনি? কি বলিতে আসিয়াছিস্?' রজনী ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে কহিল, 'দিদি আমার একটি কথা রাখতে হবে।' মোহিনী আগ্রহের সঙ্গে কহিল, 'কি কথা বল?' রজনী কতবার না বলি না বলি করিয়া অনেক পীড়াপীড়ির পর আস্তে আস্তে কহিল, মোহিনীকে একটি চিঠি লিখিতে হইবে। কাহাকে লিখিতে হইবে? মহেন্দ্রকে। কি লিখিতে হইবে! না তিনি বাড়িতে ফিরিয়া আসুন; তাঁহাকে আর অধিক দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হবে না। রজনী তাহার দিদির বাড়িতে থাকিবে। বলিতে বলিতে রজনী কাঁদিয়া ফেলিল।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

সকল জগতের মধ্যে মূল সাদৃশ্য যাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করিলাম, তাহা লইয়া অধুনাতন বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর আন্দোলন চলিতেছে। সে আন্দোলনের ভাবগতি দেখিলে বোধ হয় যেন সাংখ্যের অভিব্যক্তি-বাদ নূতন বেশে দেখা দিবার উপক্রম করিতেছে। বৈজ্ঞানিক মত এই যে, পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তু নিয়তই আকার হইতে আকারান্তর পরিগ্রহ করিতেছে। সমজাতীয় বস্তু যে সমজাতীয় আকার ধারণ করে, তাহা তাহাদের স্বভাব-গুণ। কিন্তু সেই যে স্বভাব-গুণ তাহাও চিরকাল সমান ভাবে টেঁকিয়া থাকিতে পারে না। জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহারও পরিবর্ত্তন অলঙ্ঘনীয় হইয়া উঠে। জগতের পরিবর্ত্তনের মধ্যে যে বস্তু আপ-

নাকে অব্যাহত রাখিতে সমর্থ হয়, সে বস্তু চারিদিকের সময়োচিত নূতন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া নূতন আকার ধারণ করিতে বাধ্য হয়। প্রথম প্রথম তাহাদের মধ্যে যে আকারভেদ ঘটে তাহা স্বজাতীয় ভেদ, কালক্রমে সেই ভেদ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া বিজাতীয় ভেদে পরিণত হয়। ইহার একটি উদাহরণ দিতেছি;—আর্য্যগণ যখন ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম অঞ্চলে একত্রে বাস করিতেন তখন তাঁহাদের আকার প্রকার একইরূপ ছিল। জগতের পরিবর্ত্তন, কাল-ক্রমে তাহাদের মধ্যে স্বজাতীয় ভেদ প্রবেশ করাইল; এখন সেই ভেদ এত বর্দ্ধিত হইয়াছে যে উক্ত জাতির দুই প্রান্ত ভাগ একই জাতির যে দুই বিভিন্ন শাখামাত্র তাহা বলিতে আমাদের মুখে বাধে; জাতির সে শাখাদ্বয় এখন জাতিদ্বয় হইয়া উঠিয়াছে। সকল বস্তুই এইরূপ সমজাতীয় অভিব্যক্তি হইতে ভিন্ন জাতীয় অভিব্যক্তিতে পরিণত হইতেছে।

সকল বস্তুই এই যে আকার হইতে আকারান্তর পরিগ্রহ করিতেছে,—কাহার উত্তেজনায় এরূপ করিতেছে? বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলেন বলের উত্তেজনায়। ইহাঁদের মতে তাপ জ্যোতি তড়িৎ চুম্বক ইত্যাদি যত কিছু চালক পদার্থ সমস্তই শুদ্ধ কেবল এক বলের বিশেষ বিশেষ পরিণাম মাত্র। এখানে এইটি বিশেষ করিয়া জানা উচিত যে, তাপ জ্যোতি ইহারা দুই বিভিন্ন অর্থে গৃহীত হইতে পারে। যে তাপ আমরা গাত্রে অনুভব করি, যে জ্যোতি আমরা চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করি,সে তাপ সে জ্যোতি স্বতন্ত্র,এবং যে তাপ যে জ্যোতি পরমাণুগণের স্পন্দনমাত্র তাহা স্বতন্ত্র। এই শেষোক্ত তাপ এবং জ্যোতি বলের পরিণাম বিশেষ, বিজ্ঞান ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু তাপ এবং জ্যোতিকে যদি মানসিক বোধ বলিয়া ধরা যায় তবে তাহারা যে শুদ্ধ কেবল বলের পরিণাম মাত্র একথায় বিজ্ঞান কখনই সায় দিবেন না। বিজ্ঞান এই কেবল জানেন যে, বলের যত কিছু পরিণাম সকলই জড়-রাজ্যের মধ্যেই বদ্ধ থাকে। বিজ্ঞান বলেন যে সমস্ত জড়-জগতের মধ্যে যে-পরিমাণ বল (কি না গতি-মাত্রা) বর্ত্তমান আছে তাহার সাকল্যে হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে না; জড়-জগতের একস্থানে যে পরিমাণে বলের হ্রাস হয়, অন্য কোন না কোন স্থানে সেই পরিমাণে তাহার বৃদ্ধি হইতেই হইবে; একস্থানে যদি বলের বিয়োগ হয়, তবে অপর কোন স্থানে তাহার সংযোগ হইতেই হইবে; আর তাহার বিয়োগ হইলেও জড়বস্তু হইতে বিয়োগ, সংযোগ হইলেও জড়বস্তুতে সংযোগ; জড়বস্তুকে ছাড়িয়া বলের কোথাও আর গত্যন্তর নাই।

তাপের যদি এইরূপ অর্থ কর যে, তাহা পরমাণুগণের পরস্পর বিচ্ছেদ-সাধক বিক্ষেপ শক্তি, তবে তাহাকেই বলের পরিণাম বিশেষ বলিতে পার, কিন্তু সেই শক্তি দ্বারা আমাদের মনে যে তাপ-বোধের উৎপত্তি হয় তাহা মনেরই পরিণাম-বিশেষ। বলরূপী তাপ শরীর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে, শারীরিক গতি-বিশেষে পরি-

গত হইতে পারে, এক জড় বস্তু হইতে অন্য জড় বস্তুতে সংক্রমিত হইতে পারে, কিন্তু জড়বস্তু ছাড়া হইয়া যে ক্ষণকালও তিষ্ঠিয়া থাকে এ সামর্থ্য তাহার নাই। শরীরের তাপ তাপমান-যন্ত্রের পারদে সংক্রমিত হইয়া পারদকে যখন উর্দ্ধগামী করে তখন পারদে যে পরিমাণে তাপ বৃদ্ধি হয়, শরীরের স্পৃষ্ট অংশে সেই পরিমাণে তাপের হ্রাস হয়, ইহাই বিজ্ঞান-সঙ্গত। এইরূপ যদি মনেতে যে পরিমাণে তাপের বোধ হইত, শরীরে সেই পরিমাণে তাপের হ্রাস হইত, তাহা হইলেই বলা যাইতে পারিত যে, বোধরূপী মানসিক তাপ বলরূপী শারীরিক তাপের পরিণাম বিশেষ। কিন্তু যখন দেখা যায় যে শরীরের তাপাংশ শরীরকে ছাড়িয়া তাপমান যন্ত্রের পারদে প্রবেশ করিতে পারে, (কেননা উভয়ই জড় বস্তু) কিন্তু শরীরকে ছাড়িয়া বোধে প্রবেশ করিতে পারে না, তখন অবশ্যই মানিতে হইবে যে মনেতে যে তাপ বোধ হয় তাহা মনেরই পরিণাম। ইহার তাৎপর্য্য এই যে শরীরের মধ্যে এইরূপ গতি হইলে মনেতে এইরূপ বোধ হইবে, এমনি একটি নিয়ম আছে; কিন্তু তাহা বলিয়া জল যেমন এক পাত্র হইতে অন্য পাত্রে যায়, অথবা গতিবল যেমন এক জড়পিণ্ড ছাড়িয়া অন্য জড়পিণ্ডে যায়, সেইরূপ শরীরের গতিরূপী তাপ শরীরকে ছাড়িয়া বোধরূপে পরিণত হইবে, ইহা কোন শাস্ত্রেই লেখে না।

আকার হইতে আকারান্তরে পরিণাম যাহা ইতিপূর্ব্বে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, এবং বল হইতে বলান্তরে পরিণাম, যাহা এখনো বলিবার অপেক্ষা আছে, উভয়ই বৈজ্ঞানিক গণনার অধিকার-ভুক্ত। এক পক্ষে আয়, অপর পক্ষে ব্যয়; এক পক্ষে ভাঙন, অপর পক্ষে গঠন; এই নিয়মটি উভয়েতেই দেখিতে পাইবে। প্রথমতঃ আকার হইতে আকারান্তরে পরিণাম ঐ নিয়মেই হইয়া থাকে। একটা স্বর্ণখণ্ডকে যদি দীর্ঘে বাড়াইতে চাও, তবে তাহাকে প্রস্থ এবং বেধে কমাইতে হইবে। এইরূপ আকার হইতে আকারান্তর-পরিণাম করিতে হইলে একদিকে যে পরিমাণে আয় অপর দিকে সেই পরিমাণে ব্যয় আবশ্যক। বল হইতে বলান্তর-পরিণামও ঐরূপ আয় ব্যয়ের নিয়ম-সাপেক্ষ। হস্তের বল দ্বারা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে সেই বল কাষ্ঠের পরমাণুগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাপরূপী পারমাণব বলে পরিণত হয়; এ স্থলে হস্তে যে বলের ব্যয় হইল, পরমাণু সমষ্টিতে সেই বলের আয় হইল; এইরূপ বুঝিতে হইবে। উপরে হস্তবল যেমন পারমাণব-বলে পরিণত হইল, সেইরূপ আবার পারমাণব বল রাসায়নিক বলে পরিণত হইতে পারে, আয় ব্যয়ের নিয়মানুসারে বল বলান্তরে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু বল বোধে পরিণত হয় এ কথা বলিলে' তাহা বৈজ্ঞানিক গণনার নিতান্ত বিপক্ষে দাঁড়ায়।

আধুনিক অভিব্যক্তি-বাদীগণের মধ্যে যাঁহারা মনে করেন যে জগৎ-সৃষ্টি শুদ্ধ কেবল বল এবং আকারের ক্রম-পরিণাম মাত্র তাঁহারা জগতের একটি প্রধান অভি-

ব্যক্তিকে গণনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। জগতে শুদ্ধ কি কেবল আকারের এবং গতি-বলের অভিব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয়? বোধের অভিব্যক্তি কি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিগোচর হয় না। বোধের অভিব্যক্তি কি বলের পরিণাম-বিশেষ? বল কি? না গতির বেগ; গতির বেগ বৈজ্ঞানিক গণনার বিষয়; কোন একটি জড়বস্তুতে যদি গতিবেগের আয় হয়, তবে অপর কোন এক বা একাধিক জড় বস্তুতে সেই পরিমাণ গতিবেগের ব্যয় হইয়াছে ইহা নিশ্চিত। অতএব সমস্ত জড়-জগতে যে থানে যত বল আছে, সমুদায়ের সমষ্টি অপরিবর্ত্তনীয়। এক জড় বস্তুতে গতিবেগের ব্যয় হইলে, অপর জড়বস্তুতে তাহার আয় হয়, বিজ্ঞানের ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হইল—এক জড়বস্তুর বল-ব্যয় হইয়া যদি অপর জড়বস্তুর বল বৃদ্ধি হইল, জড়বস্তুগত বল যদি জড়বস্তুতেই ক্ষপিত হইল, তবে তাহার উপর বোধের কিরূপে কোন স্বত্ব বর্ত্তিতে পারে। সমগ্র একই বস্তুর দুই স্বত্তাধিকারী হইতে পারে না। জড়বস্তু যদি বল-বিশেষের সম্যক্ স্বত্বাধিকারী হয়, মন তবে তাহা হইতে পারে না, মন যদি তাহার সম্যক্ স্বত্বাধিকারী হয়, তবে জড়বস্তু তাহা হইতে পারে না। বিজ্ঞানের এই যে সিদ্ধান্ত যে, বল জড়বস্তু হইতে জড়বস্তুতেই সংক্রমিত হয়, শুদ্ধ কেবল তাহাতেই প্রতিপন্ন হইতেছে যে জড়বস্তুকে ছাড়িয়া তাহা মনে সংক্রমিত হয় না, বোধে পরিণত হয় না। বলের পরিণাম-বিশেষ শরীরে সংক্রমিত হইলে মনেতে যে পরিণাম-বিশেষ উপস্থিত হয়, বায়ুস্পন্দন কর্ণে সংক্রমিত হইলে মনেতে যে শব্দ বোধ উপস্থিত হয় তাহা মনেরই পরিণাম, বলের নহে; বায়ুস্পন্দন বা শ্রুতিপটহের স্পন্দন যাহা সেই শব্দবোধের পূর্ব্ব-সূচনা তাহাই বলের পরিণাম।

সাংখ্যের অভিব্যক্তি-বাদ (Theory of Evolution) কেবল বল এবং সাকার বস্তুকেই সর্ব্বস্ব মনে করেন নাই, সাংখ্যদর্শন সৃষ্টির মূল উপাদান তিনটি ধরিয়াছেন—প্রকাশক চালক এবং বাধকধর্ম্মী সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ। বল সাকার বস্তুর চালক, অতএব রজোগুণপ্রধান, সাকার বস্তু বলের বাধক অতএব তমোগুণ প্রধান, মন উভয়েরই প্রকাশক অতএব সত্ত্বগুণ প্রধান।

আধুনিক ইউরোপীয় অভিব্যক্তিবাদ এবং সাংখ্যের অভিব্যক্তিবাদ, পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে উভয়ের মধ্যে প্রধান এই একটি প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হয়,—

সাংখ্য-মতে

বাধক চালক এবং প্রকাশক, তিন বস্তুর সহকারিতা ব্যতিরেকে কোন অভিব্যক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতে

শুদ্ধ কেবল বাধক এবং চালক বস্তু দ্বারা সকল অভিব্যক্তি সিদ্ধ হইতে পারে।

শেষোক্ত মত যে অসম্পূর্ণ তাহা ইতি পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। আকাশব্যাপী এক বস্তু হইতে ঐরূপ আর এক বস্তুতে

বল সঞ্চারিত হইতে পারে, কিন্তু আকাশাতীত যে বোধ তাহা বলের অগম্য প্রদেশ। আকার যেমন আকারান্তরেই পরিণত হইতে পারে, বল যেমন বলান্তরেই পরিণত হইতে পারে, তা ভিন্ন আকার বলে পরিণত হইতে পারে না, বলও আকারে পরিণত হইতে পারে না, সেইরূপ বোধই বোধান্তরে পরিণত হইতে পারে, আকার কিংবা বল কখনই বোধে পরিণত হইতে পারে না। একটা বড় গোলাকে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলিতে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহার আকারকে আকারান্তরে পরিণত করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহার আকারকে কখনই বলেতে পরিণত করা যায় না। আকারের ব্যয় দ্বারা আকারান্তরের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে, বৃহদাকার গোলার অংশ ব্যয় দ্বারা ক্ষুদ্রাকার গুলির পুষ্টিসাধন হইতে পারে; বল-ব্যয় দ্বারা বলান্তরের আয় বৃদ্ধি হইতে পারে,পিণ্ড-গত বলের ব্যয় দ্বারা পারমাণব বলের আয়-বৃদ্ধি হইতে পারে; ইহা বলিবামাত্রেই বুঝিতে পারা যায়।—কিন্তু তাহা বলিয়া আকারাংশের ব্যয় দ্বারা কি বলাংশের আয় সাধিত হইতে পারে, না বলাংশের ব্যয় দ্বারা আকারাংশের আয় সাধিত হইতে পারে? এরূপ প্রশ্ন প্রশ্নই নহে। এ যেমন,এমনি বোধই বোধান্তরে পরিণত হইতে পারে; ভূমির চতুর্দ্দিকে বেড়া দেওয়া যাইতে পারে এই বোধ যদি আমার থাকে, তবে ঠিক চক্রাকারে একটী বেড়া দেওয়া যাইতে পারে এই বোধান্তরে তাহা পরিণত হইতে পারে; পূর্ব্বোক্ত বোধের অভাবে শেষোক্ত বোধ কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না। বোধই বোধান্তরে পরিণত হইতে পারে, বল কিংবা আকার কখনই বোধে পরিণত হইতে পারে না। জগতের বল এবং আকারের [আকাশ-পূরণের] যেমন সাকল্যে হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবে না, বোধেরও সেইরূপ। এক বস্তু বা বস্তু-সমষ্টিতে যে পরিমাণে মনঃসমাধান করা হয়, অন্যান্য বস্তু হইতে সেই পরিমাণে মনকে প্রত্যাহরণ করা হয়; সুতরাং কোন এক বিষয়ে বোধের আধিক্য হইলে, অন্যান্য বিষয়ে বোধের অল্পতা হয়; দেখ—আয় ব্যয়ের নিয়ম এখানেও বলবৎ দেখা যাইতেছে। আরো এইরূপ দেখা যায় যে,অধিকায়ত জড় বস্তুকে স্বল্পায়ত করিলে তাহার প্রগাঢ়তা হয়, অল্পায়ত জড়-বস্তুকে অধিকায়ত করিলে তাহার ব্যাপ্তি হয়, কিন্তু তাহাতে তাহার মোট পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না; এইরূপ মনকে অনেক বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া যদি এক বিষয়ে সমাহিত করা যায় তাহা হইলে জ্ঞানের প্রগাঢ়তা হয়, এবং যদি এক বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া অনেক বিষয়ে বিক্ষিপ্ত করা যায় তাহাহইলে জ্ঞানের ব্যাপ্তি সাধিত হয়। সুতরাং ব্যাপ্তি বিষয়ে যদি জ্ঞানের আয় বৃদ্ধি হয়, তবে প্রগাঢ়তা বিষয়ে তাহার ব্যয় বৃদ্ধি বুঝিতে হইবে, এবং তাহার বিপরীত হইলে বিপরীত বুঝিতে হইবে; কিন্তু সাকল্যে জ্ঞানের হ্রাস বা বৃদ্ধি সম্ভবে না। আলস্যের আক্রমণে আমাদের মন এরূপ বিক্ষিপ্তভাব ধারণ করে যে, সে সময় তাহাকে কোন

বিশেষ বিষয়েতে নিবিষ্ট করা অসাধ্য হইয়া উঠে; কিন্তু সে সময়ে স্বপ্নবৎ কত শত অপ্রাসঙ্গিক বিষয় মনোরাজ্যে যাতায়াত করিতে থাকে; তাহার উপরে মনের বিক্ষেপ যদি আর কতিপয় মাত্রা বর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে বিশেষ কোন বিষয়েতে মন এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে না পারাতে কোন বিষয়ই তাহার ধারণা-সাধ্য হয় না, এই অবস্থায় আমাদের নিদ্রাকর্ষণ হয়, এবং বোধের প্রগাঢ়তা অতিমাত্র অল্প হইয়া যায়। এদিকে যেমন বোধের প্রগাঢ়তা কমিয়া যায়, ওদিকে তেমনি আবার তাহার ব্যাপ্তি বাড়িয়া উঠে। স্বপ্নকে এবিষয়ের সাক্ষী মানা যাইতে পারে। জাগ্রদবস্থায় যাহা কোন প্রকারেই মনে হইবার সম্ভাবনা নাই, এমনও সকল বিষয় স্বপ্নাবস্থাতে মনোনেত্রের গোচর হইয়া থাকে। বহুদিন হইল যাঁহারা মৃত হইয়াছেন স্বপ্নে তাঁহাদের প্রতিমূর্ত্তি অবিকল যেমন তেমনি প্রতিভাত হয়। স্বপ্নেতে এইরূপ বোধের ব্যাপ্তি-বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রগাঢ় নিদ্রার সময় আমাদের মন যে একেবারেই বিষয়-শূন্য হয়, ব্যাপ্তির অত্যন্ত আধিক্যই তাহার কারণ। অতএব নিদ্রাবস্থাই হউক স্বপ্নাবস্থাই হউক আর জাগ্রদবস্থাই হউক, কোন অবস্থাতেই সাকল্যে জ্ঞানের হ্রাসবৃদ্ধি সম্ভবে না। সাকার-বস্তু, বল এবং বোধ, এ তিনের কোনটিরই সাকল্যে হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভবে না। ইহাদের মধ্যে এইরূপ দৃষ্ট হয় যে, আকারই আকারান্তরে, বলই বলান্তরে, বোধই বোধান্তরে পরিণত হয়, এ ভিন্ন আকার কখন বোধ কিংবা বলে পরিণত হইতে পারে না, বল আকার কিংবা বোধে পরিণত হইতে পারে না, বোধ আকার কিংবা বলে পরিণত হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়াভ্যন্তরে যখন বল এবং আকার বলান্তর এবং আকারান্তরে পরিণত হয়, মনেতে তখন বোধ বোধান্তরে পরিণত হয়—বিজ্ঞানানুসারে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা যায়, ইহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া যদি বোধকে বল অথবা সাকার বস্তুর পরিণাম বলিতে সাহসী হও, তবে না বিজ্ঞান না তত্ত্বজ্ঞান কেহই তোমাকে সমাদর করিবেন না। বিজ্ঞান বলকে জড়-বস্তুগত ভিন্ন আর কোন প্রকার মনে করিতে পারেন না। বিজ্ঞান বল-বিষয়ে যাহা কিছু পরীক্ষা করেন, ভাবনা করেন, সিদ্ধান্ত করেন, সকলই জড় রাজ্যের ভিতর-প্রদেশে, তাহার বাহিরে যাইতে বিজ্ঞানের প্রয়োজনই হয় না। ভৌতিক বলকে যদি মানসিক বল, তবে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, মানসিক বোধকে যদি ভৌতিক বল, তবে তত্ত্বজ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ করিবে। অতএব অভিব্যক্তি-বাদ মানিতে হইলে শুদ্ধ কেবল বল এবং আকারের অভিব্যক্তি পর্য্যন্তই ক্ষান্ত থাকিলে চলিবে না; আকার হইতে আকারের অভিব্যক্তি কিরূপে হয়, বল হইতে বলের অভিব্যক্তি কিরূপে হয়, ইহার মীমাংসাকেই সর্ব্বস্ব জ্ঞান করিলে চলিবে না, বোধ হইতে বোধের অভিব্যক্তির প্রকরণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলে তবেই অভিব্যক্তি-বাদের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সম্ভবে।

গীত।।

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

সুর—"ভুলি ভুলি মনে করি,
ভোলে না যে পাপ মনো।"

বিরাজ সারদে কেন
এ ম্লান কমল বনে!
আজো কিরে অভাগিনী
ভাল বাস মনে মনে!
মলিন নলিন বেশ,
মলিন চিকণ কেশ,
মলিন মধুর মূর্ত্তি,
হাসি নাই চন্দ্রাননে।
মলিন কমল মালা,
মলিন মৃণাল বালা,
আর সে অমৃত জ্যোতি,
জ্বলেনাকো বিলোচনে।
কোলে যে করুণ স্বরে,
ঢুলে ঢুলে গান করে,
পদে সে পরিবাদিনী,
ঘুমাইছে অচেতনে।
জীবন-কিরণ রেখা,
অস্তাচলে দিল দেখা,
এ হৃদি কমল দেবী,
ফুটিবে না আর—
যাও বীণা ল'য়ে করে,
ব্রহ্মার মানস-সরে,
রাজহংস কেলি করে,
সুবর্ণ নলিনী সনে।

শ্রীবিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।

সম্পাদকের বৈঠক।

একটা বিবাদ।

প্রাণী এবং উদ্ভিদ্দিগের মধ্যে একটা ভারি বিবাদ বাধিয়াছে। উদ্ভিদ্ বলিতেছেন, যে পলা, জুফাইট্, স্পঞ্জ, ইহারা যদি প্রাণী হইল, তবে আমরা কেন হইব না? উভয় দলই নিজ নিজ প্রমাণ লইয়া আসিয়াছেন, বিজ্ঞান মহাফাঁপরে পড়িয়াছেন, তিনি তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না। আমরা এই বিবাদের বিবরণ নিয়ে প্রকাশ করিলাম।

বিজ্ঞান—তুমি বলিতেছ যে, "দেখ, আমাদের লজ্জাবতী লতার গায়ে হাত দাও, অমনি কুঁকড়িয়া যাইবে, কত উদ্ভিদ্ আছে যাহারা দিবসের রৌদ্রে উন্মুক্ত হয়, ও রাত্রের শীতল শিশিরের ভয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়। যে দিকে রৌদ্র ভাল পায়, উদ্ভিদেরা আস্তে আস্তে মাথা সেই দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে; যে দিকে ভাল মৃত্তিকা আছে, সেই দিকে শিকড় বিস্তার করে, তবে যে

উদ্ভিদের চৈতন্য নাই, কিসে প্রমাণ পাইলে?" কিন্তু ইহা কোন কাজেরই কথা নহে। কি কারণে হয়, সে পরের কথা। কিন্তু উহা যে চৈতন্যের চিহ্ন নহে, তাহা এক কথায় প্রমাণ হইবে। প্রাণী-দেহে চৈতন্যের কারণ স্নায়ু। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া তোমাদের শরীর তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা করিলাম, তবুও স্নায়ু খুঁজিয়া পাইলাম না।

উদ্ভিদ—কিন্তু আপনিত অনেক সামগ্রিক প্রাণীর গাত্রে স্নায়ু দেখিতে পান নাই। কত কীটের গাত্রে কেবল যে স্নায়ু দেখিতে পান নাই তাহা নহে, তাহাদের অন্যান্য প্রাণীদের ন্যায় কোন অঙ্গই নাই। অথচ একটু নাড়া দিলেই তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তাহারা আহার করে, এবং তাহাদের যে অনুভূতি নাই একথা আপনি বলিতে সাহস করেন নাই। কত জীবের উদ্ভিদের ন্যায় জন্ম হয়। তাহাদের শরীরে ফুল ফুটে, এবং তাহা হইতেই আর একটি নূতন প্রাণীর জন্ম হয়। অতএব দেখুন্ উদ্ভিদের সহিত প্রাণীদের কত ঐক্য।

প্রাণী—কই, তোমাদের ত আমাদের মত পাকযন্ত্র নাই।

উদ্ভিদ্—ও কথা কহিও না, অ্যামিবা কীটের পাকযন্ত্র আছে? রিজোপতা জাতীয় কোন্ কীটের পাকযন্ত্র আছে? এক প্রকার কীট আছে, তাহারা অন্য কীটের গাত্রে লগ্ন হইয়া থাকে। তাহাদের নিজের পাকযন্ত্র নাই, অন্য কীটের শরীরস্থ ভুক্ত দ্রব্য তাহাদের শরীরে সঞ্চারিত হয়।

প্রাণী—আমাদের শরীর যে প্রকারে গঠিত, তোমাদের শরীর বোধ হয় সেই একই প্রকারে গঠিত নহে।

উদ্ভিদ—হাঁ, আমাদের শরীরও সেই একই প্রকারে নির্ম্মিত। তোমাদের ন্যায় আমাদের শরীরও কোষ-সমষ্টি মাত্র। সেই প্রত্যেক কোষেরই জীবনী-শক্তি আছে।

প্রাণী—তোমাদের ত আমাদের মত চলৎশক্তি নাই।

উদ্ভিদ—অনেক প্রাণীরোত নাই। পলা, স্পঞ্জ প্রভৃতি অনেক প্রাণীরা এক স্থানেই থাকে। তাহা ছাড়া দুই একটি উদ্ভিদ দেখাইতেছি, যাহাদের কিয়ৎ পরিমাণে চলৎশক্তি আছে। কোন উদ্ভিদ্ পদার্থ পচিতে থাকিলে, তাহাদের গাত্রে ইথ্যালিয়ম নামক যে উদ্ভিদ্ পদার্থ জন্মে, যখন তাহারা ক্রমশ বর্দ্ধিত হইতে থাকে তখন তাহারা চলিতে থাকে। জলের মধ্যে এক প্রকার আণুবীক্ষণিক গোলাকার পদার্থ আছে তাহা ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে। অনেক দিনের পরে বিজ্ঞান মহাশয় জানিতে পারিয়াছেন যে, তাহা প্রাণী নহে, তাহা এক প্রকার উদ্ভিদ্। আকৃতিতে তোমাদের অনেক প্রাণীর আমাদের সহিত যে কত সাদৃশ্য আছে তাহা বলা বাহুল্য।

প্রাণী—আমরা আহার করি, তোমরা বাষ্প ও রসাকর্ষণ কর।

উদ্ভিদ্—তাহা কেন, পূর্ব্বে যে ইথ্যালিয়ম নামা উদ্ভিদের কথা বলিলাম.তাহারা জন্তুদিগের ও তরুদিগের দেহাংশ আহার করিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন, সম্প্রতি কতকগুলি মাংশাসী বৃক্ষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কি জানা হইয়াছে ?

প্রাণী—তোমাদের নিশ্বাস প্রশ্বাস আমাদের সহিত কত বিভিন্ন। তোমরা কার্ব্বণিক অ্যাসিড্ গ্যাস গ্রহণ ও অক্সিজন গ্যাস পরিত্যাগ কর, কিন্তু আমাদের ঠিক তাহারি উলট্।

উদ্ভিদ্—কিন্তু রাত্রেরবেলা আমরা ঠিক তোমাদের সমান হই। রাত্রের বেলা ত আমরা কার্ব্বণিক গ্যাস পরিত্যাগ ও অক্সিজন গ্রহণ করি। তদ্ভিন্ন, দুই একটি উদ্ভিদ্ পদার্থ, যাহাদের মধ্যে পীত পদার্থ নাই, ;তাহারাত তোমাদের ন্যায়ই নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

বিজ্ঞান—তাইত, বড় গোলযোগ দেখিতেছি! কিন্তু তোমরা নিরস্ত হও, আমি ভাল করিয়া এবিষয়ে অনুসন্ধান করিতেছি। কিছু দিনের মধ্য তোমাদের এ বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিব।

অসভ্য জাতির সভ্যতা—আধুনিক সভ্যতার ঠোঁটের জোর না থাকিলে তাহার এত গৌরব হইত না। তাহার ভিতরে যত কিছু গলদ আছে তাহা এখনকার সভ্যতাভিমানী লোকেদের লম্বা চৌড়া কথাতেই ঢাকিয়া যায়। তর্কে পরাজিত হইলে তাঁহারা প্রতিবাদীদিগকে "অসভ্য" "বর্ব্বর" ইত্যাদি মিষ্ট সম্ভাষণে নিরস্ত করেন। কিন্তু তাঁহাদের বিবেচনার জন্য আমরা দেশীয় অসভ্য সাঁওতালদের গুটিকতক ব্যাপার নিয়ে প্রকাশ করিতেছি।

সাঁওতালপ্রদেশে অনেকগুলি আদিম বাসীদের সম্প্রদায় আছে। তাহার মধ্যে পাহাড়ীয় নামে যাহারা প্রসিদ্ধ তাহারই এক প্রধান সম্প্রাদায়। কর্ণেল ড্যাল্টন বলেন যে লেফ্টনেণ্ট সর প্রবন্ধ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে পাহাড়ীয়রা পরজন্ম মানে। তাহারা বলে যে, যে কেহ ঈশ্বরের আজ্ঞাবর্ত্তী হইয়া চলে সে মৃত্যুর পর রাজা কিম্বা কোন প্রধান ব্যক্তি হইয়া পৃথিবীতে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করে।

তাহাদের বিবাহেতে ইংরাজদের মতন বিবাহসাধনা (কোর্টষিপ্) আছে। যতদিন পর্য্যন্ত বিবাহ সম্পন্ন না হইয়া যায় তত দিন পর্য্যন্ত বিবাহার্থীরা প্রকৃত প্রণয়ীর মত "প্রেমের আগুণে" জ্বলিতে জানে। বরকন্যা খুব স্বাধীন ভাবেই একত্রে থাকিতে পায়, কেননা গো মেষ চরান, খাওয়া দাওয়া এবং অন্য কাযকর্ম্ম সকল কার্য্যগতিকে এক সঙ্গেই হইয়া পড়ে। তাহাদের ভিতরে ন্যায়মত আদর আবদার পর্য্যন্ত মার্জ্জনার বিষয়,কিন্তু যদি [illegible] অন্যায় আচরণে তাহারা ধরা [illegible] হইলে তাহাদের দলের [illegible] সেই

অপরাধীদিগকে জাতঃপাত করিয়া দেয়, এবং অনেক রকম প্রায়শ্চিত না করিলে তাহাদিগকে আর জাতে লওয়া হয় না। উক্ত ড্যাল্‌টন সাহেব আরও বলেন যে সাঁওতালদের মধ্যে বিবাহপ্রথা আদান-প্রদান নিয়মানুসারেই চলে। বিবাহের সময় এক জন বিজ্ঞব্যক্তি আসিয়া সমবেত বরকন্যাকে এই বলিয়া সম্বোধন করে "হে বালক, হে বালিকা, আজ পর্য্যন্ত তোমরা উভয়ে উভয়েব রোগশোকে সান্ত্বনা করিবে। এতদিন অবধি তোমরা কেবল এক সঙ্গে খেলিয়া বেড়িয়াছ ও অন্য অন্য নানা কায করিয়াছ, কিন্তু এখন গৃহকার্য্যের সমস্ত ভার তোমাদের স্কন্ধে পড়িল। অতীথি সেবা করিবে, আর যখন কোন আত্মীয়কুটুম্ব তোমাদের বাড়ি আসিবে তখন তাহার পা ধূয়াইয়া দিবে, এবং তাহাকে বিশেষ সম্মান করিবে।" সাঁওতালেরা প্রায়ই একের অধিক বিবাহ করে না, এবং স্ত্রীর প্রতি তাহারা "অনুকরণোপযোগী" স্নেহমমতা প্রদর্শন করে। যদি স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বহেতু কেহ দ্বিতীয়স্ত্রী গ্রহণ করে, তাহা হইলে প্রথম স্ত্রীর প্রভাবই গৃহে অক্ষুন্ন ভাবে থাকে, এবং দ্বিতীয় স্ত্রীকে তাহার অধীনে থাকিতে হয়।

এক জন বালককে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় যে "তাপ ও শৈত্যের গুণের বিভিন্নতা কি?" সে কহিল "তাপে দ্রব্য বর্দ্ধিত হয় ও শীতে কমিয়া যায়।" প্রশ্নকর্ত্তা কহিলেন "উদাহরণ দেখাও।" সে কহিল শীত কালে দিন ছোট ও গরমি কালে দিন বড় হয়।

ফরাসী ও ইংরাজে যুদ্ধের সময়ে এক জন বৃদ্ধা ইংরাজস্ত্রী আর এক জনকে কহিল "ব্রিটিশরা যে যুদ্ধে জয়ী হইল ইহা কি আশ্চর্য্য নহে?" সে কহিল "হইবে না কেন? ইংরাজেরা যুদ্ধের আগে যে প্রার্থনা কার।" প্রথমটি কহিল "ফরাসিরাও ত করে।" আরেক জন কহিল "ছুট্, তাহাদের কথা বুঝিতে পারিবে কে?"

যখন আইরিষদিগের সহিত ইংরাজদিগের মিলন লইয়া তর্ক বিতর্ক চলিতেছিল, তখন জুনিয়র ব্যারিস্টরদিগের স্বভাব অনুসারে বেথেল নামক এক জন আইরিষ ব্যারিষ্টর সে বিষয়ে এক প্যাম্ফলেট লিখেন। পুস্তক প্রকাশের পর লাইসট্ এই ব্যারিষ্টরকে অতি বন্ধুভাবে বলিলেন "বেথেল, দেখ, মিলনের বিষয়ে যত প্যাম্ফলেট দেখিয়াছি, তোমার প্যাম্ফলেটে যেমন ভাল জিনিস দেখিয়াছি, এমন আর কিছুতে না।" সে আহ্লাদে হাত রগড়াইতে রগড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল "কি ভাল জিনিস দেখিছেন?" তিনি কহিলেন "আজ সকালে দেখিতেছিলাম, তোমার বইয়ের কাগজে ভাল ভাল মিষ্টান্ন মুড়িয়া এক জন মুদীর দোকান হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল।"

এক জন প্রাচীন জ্ঞানী কহিয়াছেন স্বর্ণের ভালমন্দ অগ্নির দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়, স্ত্রীলোকের ভালমন্দ স্বর্ণের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়, পুরুষের ভাল মন্দ স্ত্রীলোকের দ্বারা পরীক্ষা করিতে হয়।

বঙ্গসাহিত্য।

কি নাটক, কি মহাকাব্য, আমরা কোন কাব্যের নায়িকাকে সীতাদেবীর মত দারুণ পরীক্ষারূপ অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইতে দেখি নাই, এবং এইরূপ দুরন্ত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইতে দেখিয়া কাহাকেও এরূপ অক্ষত ও অক্ষুন্ন ভাবে সে পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইতে দেখি নাই। পৃথিবীতে বা স্বর্গে যত প্রকার কোমল সামগ্রী আছে, বিধাতা যেন সেই সকল কোমল সামগ্রীর কোমলতম অংশটুকু লইয়াই রামময়জীবিতাকে নির্ম্মান করিয়া ছিলেন, এবং পৃথিবীর যত প্রকার মর্ম্মভেদী যন্ত্রনা আছে সেই সকল যন্ত্রণা দ্বারা সীতাদেবীকে পরীক্ষা করিবার জন্যই যেন তিনি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সীতাদেবী পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণুতা-সহকারে এবং হিমাচলের ন্যায় অবিচলিত ভাবে সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়া রমনিহৃদয়ের প্রকৃত মহানতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, যতদিন মর্ত্তলোকে সতীত্বের সম্মান থাকিবে, যতদিন মর্ত্তলোকে সহিষ্ণুতার গরিমা থাকিবে, যতদিন মর্ত্তলোকে কোমলতার আদর থাকিবে, ততদিন বৈদেহীর মহিমাধ্বনি দেশবিদেশে কীর্ত্তিত হইবে।

চতুর্থতঃ। মনিয়র উইলমস্ এবং অন্য লোকেরা রামায়ণ এবং মহাভারত ইত্যাদি মহাকাব্যের বিরুদ্ধে আরও একটি বিশেষ নিন্দা ঘোষণা করেন। সেটি এই—তাঁহারা বলেন যে রাবণের দশমুণ্ড বা কুড়ি হস্ত বা কবন্ধ বা জটায়ু প্রভৃতির অস্বাভাবিক বর্ণনা দ্বারা রামায়ণের কবিত্ব নষ্ট হইয়াছে। এ সকল প্রলাপবাক্য আমাদের নিতান্ত অযৌক্তিক মনে হয়। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে অজানিত বস্তু-বিশেষের বর্ণনা করিতে হইলে কল্পনাই আমাদের প্রধান নেতা হইয়া উঠে। এবং সেই একেই বস্তু যদি ভিন্ন ভিন্ন কবির দ্বারা বর্ণিত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক কবির কল্পনাবিশেষে সে বস্তুও বিশেষ বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। সকলেরই মনে একটি দৃঢ় সংস্কার আছে যে স্বর্গ সুখের স্থান। সে সুখের বিশেষত্ব এই যে, তাহা পৃথিবীর সকল সুখ হইতে উচ্চতম এবং মহানতর। এই সহজ জ্ঞান হইতে পুরাণ, কোরাণ এবং বাইবেল-প্রণেতারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার স্বর্গের কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। সেই সকল প্রকার স্বর্গের ভিত্তিভূমি একই, কেবল কল্পনা বিশেষে

তাহাদের আকারপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত ও ভিন্ন ভিন্ন রাগে রঞ্জিত হইয়াছে। আমরা সামান্য কথাতেও দেখাইতে পারি যে পূর্ব্বে আমরাও জানিতাম যে ইংলণ্ডভূমি চিরকালই তুষারে জমাট হইয়া থাকে, এবং পূর্ব্বে ইংরাজরাও জানিতেন যে ভারতবর্ষ আপাদমস্তক স্থবর্ণে মণ্ডিত—নদীর উপকূলে স্বর্ণরেণু এবং পর্ব্বতের শিখরদেশে স্তুপাকৃত স্বর্ণ পাওয়া যায়। বাস্তবিক, যখন কোন বস্তুর আকারপ্রকার এবং প্রকৃতি আমরা ঠিক জানিনা; অথচ এইমাত্র জানি যে, সে বস্তু অন্য জানিত বস্তু হইতে ভিন্নতর, সেখানে কল্পনার দ্বারাই আমরা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠন করিয়া তুলি। দেশেবিদেশে প্রেতযোনি সংক্রান্ত সংস্কার হইতে তাহা সপ্রমান হইতে পারে। সেইরূপ রামায়ণপ্রণেতা কখন রাক্ষসদিগকে দেখেন নাই, অথচ এই মাত্র জানিতেন যে তাহারা ভীষণতায় যাবতীয় পরিজ্ঞাত ভীষণ বস্তু হইতে বিশেষরূপ ভীষণতর,তখন তাঁহাকে কাযেই কল্পনা সহকারে এমন একটী বস্তু নির্ম্মান করিতে হইয়াছিল যে, যে কোন পাঠক সেই বর্ণনা পাঠ করিবে তাহারই মনে ভীষণ ভাবের উদ্রেক হইবে। আবার সেই রাক্ষসকুলের যিনি রাজা, তিনি অবশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণতম হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? সকল দেশরই আদিমহাকাব্যে এই বিশেষত্বটি আমরা দেখিতে পাই। ক্রমে যত জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হইতে থাকে ততই সেইরূপ নানা প্রকার উৎকট কল্পনার অবসান হইয়া আসে। রামায়ণে যেমন আমরা দশমুখ এবং কুড়ি হস্ত রাবণকে দেখিতে পাই, ইলিয়াডেও আমরা সেইরূপ শতহস্ত ব্রায়েরিয়স্ ও শতমুখ হাইড্রাকেও দেখিতে পাই। রামায়ণে যেরূপ বিকটমূর্ত্তি কবন্ধ শ্রীরামচন্দ্রের ভীতি সম্পাদন করিতেছে, অডিশীতেও সেইরূপ কপালচক্ষু-সাইক্লাপদিগের পলিফিমস্ ইউলিসিসের ভীতি সম্পাদন করিতেছে—রামায়ণে পর্ব্বত-উৎপাটন যেমন অস্বাভাবিক, হিসীয়ডেও টাইটান কর্ত্তৃক পর্ব্বত উৎপাটন সেইরূপ অসম্ভব? দুর্য্যোধন যেরূপ মাতারদৃষ্টে প্রস্তরীভূত হইয়াছিলেন, একিলিজও সেইরূপ মাতাকর্ত্তৃক প্রস্তরিভূত হইয়াছিলেন,—অথচ কবির উদ্দেশ্য রক্ষার্থ উভয়েরই আবার শরীরের স্থানবিশেষে স্বাভাবিক কোমলতাও বিদ্যমান ছিল। রামায়ণে মারীচের রূপ পরিবর্ত্তন করা যেমন দুর্বোধ, অডিসীর প্রোটিয়সের রূপ পরিবর্ত্তন করাও সেইরূপ দুর্বোধ। মহাভারতে যেরূপ অর্জ্জুন বাণদ্বারা পৃথিবী ধারণ করিয়াছিলেন,সেইরূপ হিসয়ডে হরকুলিজ স্কন্ধদ্বারা সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যায় যে পূরাকালের কাব্যসমূহে উৎকট কল্পনার বাহুল্য আছে। রামায়ণে জটায়ু পক্ষী কথা কহিতেছে শুনিয়া অনেকে হাসিতে পারেন বটে, কিন্তু ইলিয়ডে একিলিজের ঘোটক (জ্যাণ্থস্) কেবল যে কথা কহিতেছে তাহা নয়,আবার একজন বিজ্ঞ দর্শনকারের মত ভবিতব্যের উপর বক্তৃতা পর্য্যন্ত দিতে ক্রটি করে নাই। তবে একথা

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইলিয়ড অপেক্ষা রামায়নে ঐ সকল উৎকট কল্পনার আধিক্য আছে—তাহার প্রধান কারণ এই যে, ভারতবর্ষীয় বৃক্ষতরু, ভারতবর্ষীয় নদনদী, ভারতবর্ষীয় পাহাড়পর্ব্বতের মত ভারতবর্ষীয় কল্পনাও প্রভূত মহানতা ব্যতীত কিছুতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। গ্রীকদিগের ও আমাদিগের দেবদেবীর চরিত্র সমালোচনাস্থলে আমরা এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিব, আপাততঃ এই খানেই ক্ষান্ত হইলাম। বোধ হয় একথা বলাই বাহুল্য যে কেবল দাক্ষিণাত্যের অসভ্য বর্ব্বর জাতি সমূহকে লক্ষ্য করিয়াই রামায়ণ প্রণেতা রামচন্দ্রের বাণরসৈন্য কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই কল্পনাতেই আমরা একটু দোষ ধরিতে পারি; কারণ বালী অঙ্গদ প্রভৃতি বাণরগণ এক এক বিষয়ে সভ্যজাতির উচ্চ আদর্শ।

আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি যে কৃত্তিবাসের লিপিপটুতা বা রচনাচাতুর্য্য সমধিক নহে, কিন্তু সেই হেতু আমরা একথা বলিতে প্রস্তুত নহি যে তাঁহার লিপিপটুতা বা রচনাচাতুর্য্যে ইংরাজি অনেক বিখ্যাতনামা কবি হইতে অথবা এখনকার অনেক "অদ্বিতীয়" বঙ্গ-কবি অপেক্ষা নিকৃষ্টতর।—পোপকৃত হোমরের অনুবাদ সঠিক না হইলেও, পোপের ইলিয়ডে পোপের ত অনেকটা রচনাচাতুর্য্য প্রকাশ হইতেছে—এখন সেই ইলিয়ডে বীরপুত্র হেক্টর সমরে নিহত হইলে বীরপ্রসবিনী হেকুবা এই এই বলিয়া কাঁদিতেছেন—

"Ah, why has heaven prolonged this hated breath,
Patient of horrors to behold thy death?
O Hector! late thy patrent's pride and joy,
The boast of nations, and the defence of Troy,
To whom her safety and her fame she owed;
Her chief, her hero, and almost her God!
O fatal change! become in one sad day
A senseless corse! inanimated clay!*

কিন্তু কৃত্তিবাস ইন্দ্রজিতের নিধনে

---

* হায়, কেনই বা ঈশ্বর এত দিনপর্য্যন্ত আমার এই ঘৃণিত এবং ভয়ানক যন্ত্রণা-সহিষ্ণু জীবন হেক্টরের মৃত্যু দেখিবার জন্য প্রসারিত করিয়াছেন। হা হেক্টর! তুমিই তোমার পিতামাতার অহঙ্কারস্থল, ও আনন্দ-স্বরূপ ছিলে, তুমিই সকল জাতির গর্ব্বস্থল ও ট্রয়ের রক্ষা-স্বরূপ ছিলে,—তোমার নিকটেই ট্রয় তাহার রক্ষা ও গৌরবের জন্য ঋণী রহিয়াছে, তুমিই তাহার নেতা-স্বরূপ, তুমিই তাহার বীরপুরুষ, তুমিই তাহার দেবতা! কিন্তু হায়—কি বিষম পরিবর্ত্তন! সেই হেক্টর, তুমি আজ এক দিনের মধ্যেই চেতনা-বিহীন মৃতদেহে—জীবন-বিহীন মৃতপিণ্ডে পরিণত হইয়া পড়িয়াছ।

মন্দোদরীর বিলাপ এইরূপে লিপিবদ্ধ করিতেছেন—

আমি নানা উপহারে, পূজিলাম মহেশ্বরে,
তোমা পুত্র পাইলাম কোলে।
কিছু দিন ছিল সুখ, এখন ঘটিল দুঃখ,
হেন পুত্র পড়ে রণস্থলে॥
কি মোর বসতি বাস, জীবনে কি ছার আশ,
কি করিবে ছত্র নবদণ্ড।
কি আর পুষ্পক রথ, বীর ভাগ আছে যত,
তোমা বিনা সব লণ্ডভণ্ড॥
ভুমিতলে লোটাইয়া, পুত্র শোকে বিনাইয়া
ক্রন্দন করিছে মন্দোদরী।
হায় পুত্র মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ,
আজি যে মজিল লঙ্কাপুরী॥
শচীসহ শচীপতি, সুখেতে করুণ স্থিতি,
সচ্ছন্দে-ভুঞ্জুক দিনপতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, হরষিত সুরবর,
লঙ্কার দেখিয়া এ দুর্গতি॥
ইন্দ্র আদি দেবগণে, তুমি জিনিয়াছ রণে,
তব ডরে কেহ নহে স্থির।
কি কহিব বিভীষণে, শত্রু আনে যজ্ঞস্থানে,
তেঁই সে বধিল রঘুবীর॥ ইত্যাদি।

এই সমস্ত বিলাপটি অতিসুন্দর কবিত্বতে আপাদমস্তক আপ্লুত। শোক, অভিমান, অথচ বীরপুত্রের প্রতাপ স্মরিয়া বীরপ্রসবিনীর অহঙ্কার এমন সুন্দরভাবে এই বিলাপটিতে গ্রথিত আছে যে ইহার সুখ্যাতি করিয়া আমাদের পরিতৃপ্তি হয় না। আমরা পোপ হইতে আরও অনেক স্থান তুলিতে পারিতাম, কিন্তু এখনকার মত এই খানেই ক্ষান্ত হইলাম।

আমরা আধুনিক বঙ্গকবিদের সহিত কৃত্তিবাসের ও অন্যান্য পুরাতন কবিদের তুলনা, সকল মহাকাব্যগুলি সমালোচনার পর করিব? এক্ষণে কেবল এইমাত্র বলিলেই হইবে যে মেঘনাদ-বধকাব্যের লক্ষ্মণের সহিত কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণের তুলনা করিলে কৃত্তিবাসের লক্ষ্মণে যেরূপ উচিতমত বীরত্ব ও মহানতা রক্ষিত হইয়াছে, মেঘনাদের লক্ষ্মণে সেইরূপ হীনতা ও কাপুরুষতা প্রদর্শিত হইয়াছে।—এক্ষণে আমরা কৃত্তিবাসের কবিত্ব দেখাইবার জন্য সীতাহরণে রামের বিলাপটি উদ্ধৃত করিয়া এবারের মত নিরস্ত হইলাম।

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে,
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে।
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ,
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥
বুঝি কোন মুনিপত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়॥
গোদাবরীনীরে আছে কমলকানন,
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ?
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া,
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া।
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস,
চন্দ্রকলা ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস।
রাজ্যচ্যুত আমারে দেখিয়া চিন্তান্বিতা,
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা।
রাজ্যহীন আমি যদি হইয়াছি বটে,
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥

আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে,
কৈকেয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এতদিনে।
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে,
লুকাইল তেমতি জানকী বনান্তরে।
কনকলতার প্রায় জানকদুহিতা,
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা।
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ,
দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ।
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার,
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার।
দশদিক শূন্য দেখি সীতার অভাবে,
সীতা বিনা অন্য কিছু হৃদয়ে না ভাবে।
দেখরে লক্ষ্মণ ভাই কর অন্বেষণ,
সীতারে আনিয়া দেহ, বাঁচাও জীবন।

আমি জানি পঞ্চবটী অতি পুণ্যস্থান,
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান।
তাহার উচিত ফল দিয়াছে আমারে,
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে।
শুন শুন মৃগ পক্ষী, শুন বৃক্ষ লতা,
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা।
যাইতে দেখেন যাকে জিজ্ঞাসেন তাকে,
দেখিয়াছ তোমরা কি এপথে সীতাকে॥
ওহে গিরি, এসময়ে কর উপকার,
কহিয়া বাঁচাও জানকীর সমাচার।
হে অরন্য! তুমি ধন্য, বন্য বৃক্ষগণ,
কহিয়া সীতার কথা রাখহ জীবন।
শ্রীরাম বলেন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ,
গোদাবরী জীবনেতে ছাড়িব জীবন।

অশ্রু-আবাহন।

গীত।

রাগিণী ললিত

পারিনে পারিনে আর, আয় ওরে অশ্রুজল,
দেখা দেয়ে অভাগারে, জুড়ায়ে মরমস্থল।
ছেলে বেলাকার, সখা যে আমার,
তুই সেই অশ্রুধার,
সাধের যে সাথী, ব্যথার যে ব্যথী
ছিলি যে সান্ত্বনা সার,
কতই যাতনা, মরম বেদনা,
পাইয়াছি বারবার,
তুই দেখাদিলে, সব গেছি ভুলে
ঘুচে গেছে শোকভার।
তবে বল হায়, পাসরি আমায়,
এখন লুকালি কোথা,
দুঃখের সময়, ছাড়িলি আমায়,
এ কেমন মমতা,
কত দিন ধরে, কত যে সাধিনু,
কত যে ডাকিনু তোরে,
এলিনে ত তুই, তবু একবার,
শুষ্ক নয়নপরে,
মৃত প্রায় তনু, পায় সে জীবন,
জলের পরশ পেয়ে,
ঝরি গেলে বারি, ফুটে শশী তারা,
সুনীল আকাশ ছেয়ে,
তুই অশ্রুজল, হ'লে নিদয়,
এ আঁধার কে ঘোচাবে,
অভাগা দুর্ভাগা, কোথা যাবে আর,
কোথায় শান্তি পাবে।

শ্রী সঃ

পূর্ব্বতন গ্রীকদিগের সামাজিক অবস্থা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

শিক্ষা।—গ্রীক-জনসমাজের নিয়মানুসারে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাহার পিতার সমক্ষে স্থাপিত হইত। সন্তানকে লালন পালন করিবেন কি না তদ্বিষয়ে পিতাকে ইচ্ছা প্রকাশ করিতে হইত। কেন না, সন্তান লালন পালন করা পিতার স্বেচ্ছাধীন ছিল। তিনি যদি সদ্য-প্রসূত সন্তানটিকে ভূমি হইতে তুলিয়া লইতেন, তাহা হইলেই বুঝা যাইত যে তাঁহার সন্তান পালন করিবার ইচ্ছা আছে। আর যদি তিনি না তুলিতেন তাহা হইলেই প্রকাশ পাইত তাঁহার ইচ্ছা নাই; সুতরাং সেই শিশুকে হয় প্রকাশ্যরূপে ফেলিয়া দেওয়া হইত—নয় দত্তক পুত্রাভিলাষী কোন ব্যক্তিকে দান করা হইত। পরিবারের অতিরিক্ত সংখ্যাবৃদ্ধি নিবারণের জন্য গ্রীকদিগের এই রূপ পদ্ধতি ছিল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার দশম দিবসে তাহার নাম-করণ হইত—সেই দিবস দেবতার নিকট বলি উৎসর্গ করা এবং বন্ধুবান্ধবকে ভোজ দেওয়া হইত। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে ধনী লোকের স্ত্রীরা যেমন সন্তানকে স্তনদান করেন না সেই রূপ তথায় ধনী লোকের স্ত্রীরা প্রায় সন্তানদিগকে স্বয়ং স্তন দিত না—দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রীরূপে নিযুক্ত করিত। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকাদিগকে একত্র রাখিয়া লালন পালন করা হইত। তাহাদের নানা প্রকার খেল্‌না ছিল; আমাদের দেশের ন্যায় তাহাদের পুতুলগুলি রং করা মাটিতে নির্ম্মিত হইত। চাকা ও লাঠিম বয়স্ক শিশুদিগের খেলা ছিল। গুবুরে পোকার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া বেড়ানো তাহাদের একটি সাধের আমোদ ছিল। আমাদের ন্যায় তাহাদের মধ্যে লুকাচুরি খেলাও প্রচলিত ছিল। শিশুগণ দোষ করিলে তাহাদিগকে বেত্রাঘাত কিম্বা অন্য কোন প্রকার শাসন না করিয়া চটি জুতা কিম্বা খড়ম প্রহার করা হইত। সুকুমার শিশুর গাত্রে পাদুকাঘাত আমাদের চক্ষে অত্যন্ত জঘন্য রীতি বলিয়া বোধ হয়। কোন শিশু অবাধ্য হইলে আমাদের দেশের ন্যায়—তাহাকে কখন কখন ভূতের ভয়ও দেখানো হইত। ছেলে-ঘুম-পাড়ানি গান, গল্প, ছড়া কল্পনা-প্রবণ গ্রীকদিগের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। পৌরাণিক উপন্যাসের মধ্যে যাহা কিছু বিস্ময়কর ও মনোহর তাহাই গল্পচ্ছলে শিশুগণকে শুনানো হইত। এবং ইহাই শিশুগণের প্রথম শিক্ষা ছিল। প্রায় ষষ্ঠ কিম্বা সপ্তম বর্ষ হইতে বালিকাদিগকে পৃথক্ রাখিয়া বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত। অর্থাৎ আমাদের দেশের সাধারণ প্রথানুরূপ বালকেরা প্রকাশ্য পাঠশালায় প্রেরিত হইত এবং বালিকাদিগকে গৃহে রাখিয়া গার্হস্থ্য কর্ম্মের

শিক্ষা দেওয়া হইত। বিদ্যালয়ে যাইবার পূর্ব্বে বালকেরা যদিও সম্ভবত মাতা কিম্বা ধাত্রীর নিকট হইতে কিছু কিছু বর্ণপরিচয় করিত কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে বিদ্যালয়েই তাহাদের শিক্ষা আরম্ভ হইত। কতকগুলি পাঠশালা যে ব্যায়াম-ভূমির অন্তর্ভুত ছিল তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে—কিন্তু ইহাও অনুমান হয়—সাহিত্যশিক্ষার জন্য কতকগুলি স্বতন্ত্র পাঠশালাও ছিল। বালকেরা সেখানে নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে পাঠ সাঙ্গ করিয়া ব্যায়াম-স্থানে গমন করিত।

অ্যাথেন্সে শিক্ষার দুইটি বিভাগ ছিল—একটি শরীরের জন্য ব্যায়াম-চর্চ্চা—আর একটি মনের জন্য বিদ্যানুশীলন।—ব্যায়াম চর্চ্চার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দিবসের মধ্যে কএক ঘণ্টা সরকারি শিক্ষকের অধীনে ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হইত।

ধনীদিগের সন্তানেরা এক জন দাসের সমভিব্যাহারে ঐ সকল পাঠশালা ও ব্যায়াম-শালায় গমন করিত। ঐ দাসদিগকে পেড্যাগগ্ বলিত। এই পেডাগগ্দিগের উপর বালকদিগের সাধারণ তত্ত্বাবধানের ভার ছিল এবং উহারাই এক প্রকার গৃহশিক্ষকের কাজ করিত। বিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা ব্যায়াম-শিক্ষার প্রাধান্য ছিল। বালকেরা পাঠশালায় প্রবেশ করিবার প্রথম দিন হইতেই—ব্যায়াম শিক্ষা আরম্ভ করিত। এবং পাঠশালায় অধিকাংশ সময় উহাতেই অতিবাহিত করিত। গ্রীকদিগের মধ্যে বিদ্যার নয়টি অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিল। এই নয়টি দেবতার অধীন সমগ্র বিদ্যাই গ্রীকদিগের শিক্ষনীয় ছিল। লিখন ও পাঠাভ্যাসের পরেই কবিদিগের বিশেষতঃ হোমরের পদাবলী বালকদিগকে কণ্ঠস্থ করিতে হইত এবং উঁহা বিশুদ্ধ উচ্চারণ সহকারে আবৃত্তি করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গীতেরও বিলক্ষণ অনুশীলন হইত। ১৬ বৎসর বয়সে বালকেরা পাঠশালা ত্যাগ করিত। যুবকদিগের জন্য এক দল উচ্চশ্রেণীর শিক্ষক ছিল। তাঁহাদিগকে লোকে আলঙ্কারিক বা তার্কিক বলিত। তাঁহারা যুবকদিগকে প্রবন্ধ রচনা ও বক্তৃতা করিতে শিক্ষা দিতেন। এবং তদ্ব্যতীত তৎকালে যে সকল বিজ্ঞানশাস্ত্র প্রচলিত ছিল তাঁহারা তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ফলত, যে সকল কর্ম্ম প্রত্যেক পৌরজনের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল, ভবিষ্যতে তৎ সাধনে সম্যক্ উপযুক্ত করিবার জন্য তাঁহারা যুবকদিগকে শিক্ষা দিতেন। সকলকেই একবার না একবার বাদী বা প্রতিবাদী হইয়া আদালতে হাজির হইতে হইত। কাহাকেও বা আদালৎ-সংক্রান্ত কোন কার্য্য করিতে হইত। সুতরাং প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত বুদ্ধি ও বিধিমতে বক্তৃতা করিতে না পারিলে কিম্বা সামান্য মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য আইন জ্ঞান না থাকিলে নিতান্ত দোষের বলিয়া গণ্য হইত। রাজ্যে উচ্চ পদবীতে আরোহণ করিবার জন্য যাঁহাদের আকিঞ্চন—কিম্বা যাঁহারা সরকারি ব্যাপারে কতৃত্ব করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে উ-

স্নিখিত শিক্ষকগণের উপদেশ অত্যন্ত কাজে লাগিত।

প্লেটো, আইসোক্রেটিস্ অ্যারিস্‌টটলের মতে, শারীরিক বল ও তৎপরতা, বিদ্যানুশীলন এবং বাক্‌পটুতা এই কয়টি এক সঙ্গে শিক্ষা দেওয়াই গ্রিশীয় শিক্ষা-প্রণালীর উচ্চ আদর্শ। মল্ল—সৈনিক, বিদ্বান্ এবং বাগ্মীর পক্ষে ঐ এক একটি বিশেষ বিশেষ গুণ না থাকিলেই নয়—এবং এথিনীয়দের যেরূপ অভ্যাস ছিল ও তাহাদিগকে যে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইত, তাহাতে ঐ সকল গুণেরই বিশিষ্টরূপ স্ফূর্ত্তি পাইবার কথা।*

এইরূপ নানাবিধ শিক্ষা-প্রকরণে এথিনীয়দিগের বুদ্ধিবৃত্তির শক্তি ও উদ্যম আশ্চর্য্যরূপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সময় মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয় নাই—লিখন পঠনের তত সুবিধা ছিল না—সংবাদ পত্রও ছিল না—তথাপি আপনাদিগের মধ্যে পরস্পর কথোপকথন করিয়া, জ্ঞানীদিগের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, উৎকৃষ্ট শিল্পের আদর্শ সকল আলোচনা করিয়া, নাট্যশালার অভিনয় দেখিয়া, প্রকাশ্য সাধারণ উৎসব-ক্রীড়ামোদে যোগ দিয়া এবং সকল অপেক্ষা অধিক—স্বাধীন পৌরজনের শ্রমসাধ্য কর্ত্তব্য ভার বহন করিয়া এথিনীয়দিগের সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষা লাভ হইত। মেকলে যথার্থই বলিয়াছেন যে †"এথিনীয়েরা প্রতি দিন প্রাতঃকালে ইচ্ছা করিলে সক্রেটিসের সহিত কথোপকথন করিতে পারিত, এবং প্রতিমাসে চার পাঁচবার পেরিক্লিসের কথা শুনিতে পাইত। ফিডিয়াসের গঠিত প্রতিমূর্ত্তি সকলের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতে পাইত এবং জ্যুক্সিসের চিত্র সকল দেখিতে পাইত—ইস্‌কাইলসের Chorus তাহাদিগের কণ্ঠস্থ ছিল—Rhapsodist নামক উপস্থিতভাষী কবিগণ রাস্তার এক কোণে এথিলিসের ঢাল কিম্বা আর্গসের মৃত্যু সম্বন্ধে কোন গাথা আওড়াইতেছে তাহা তাহারা শুনিতে পাইত। এথেন্‌স্‌নিবাসী প্রত্যেক লোকই—এক এক জন ব্যবস্থাপক, সন্ধি বিগ্রহ প্রভৃতি উচ্চ বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ—প্রত্যেকই এক এক জন সৈনিক—যুদ্ধ বিদ্যায় সুশিক্ষিত—প্রত্যেকই বিচারকর্ত্তা—বিরুদ্ধ দুই পক্ষের তর্কবিতর্ক প্রতিদিন বিচার করিতে হইত। ইহাই তো এক প্রকার শিক্ষা। এ যেরূপ শিক্ষা তাহাতে গভীর চিন্তাশীল সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত হওয়া যায় না বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের মনের সংবেদনা-বৃত্তি (Perceptions) সমূহের শক্তি বৃদ্ধি হয়—রুচি সূক্ষ্ম ও মার্জ্জিত হয়—মনের ভাব সকল অনর্গল প্রকাশ করা যায়—এবং ভদ্র ব্যবহারের শিক্ষা হয়।"

মিল্ বলেন‡—"পূর্ব্বকালের সামাজিক প্রণালী ও ধর্ম্মনৈতিক ভাবে অনেক দোষ

* Grote Xi 371-374.

† Macaulay's Essays. P. 401 (Boswell's 'Life of Johnson.')

‡ Mill's Representative Government—67

ও ত্রুটি থাকিলেও ইহা বলিতে হয় যে ডিক্যাস্টরি ও এক্লিসিয়া প্রভৃতি আদালৎ ও সাধারণ সভার কার্য্যে প্রত্যেক এথিনীয়কে যতটুকু যোগ দিতে হইত তাহাতেই তাহার বুদ্ধিবৃত্তির এত চালনা ও উন্নতি হইত যে সেরূপ কি পূর্ব্বকালে কি ইদানীন্তন কালে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।" বস্তুতঃ এথেন্সে সাধারণতন্ত্রের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাগ্মিতা উপার্জ্জন সাধারণের অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তর্কবিতর্ক করা শিক্ষিত এবং উচ্চাভিলাষী পৌরজন মাত্রেরই কাজ ও আমোদ হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল যুবক তর্ক করিতে ও প্রতিবাদিগণকে পরাস্ত করিতে শিখিয়াছিল—আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যেরূপ কোন "ক্লবের" গন্ধ পাইলেই সেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া উপস্থিত হয়—সেইরূপ তাহারা স্বীয় বিদ্যার আস্ফালন করিবার জন্য "ডিক্যাস্ত্রি" নামক আদালতে দলে দলে আসিত। প্রসিদ্ধ গ্রীক প্রহসন-লেখক অ্যারিস্‌টোফেনিস্‌ এই দলকে বিদ্রূপ করিয়াছেন। যদিও যুক্তির গভীরতা অপেক্ষা তাহাদের বক্তৃতায় অলঙ্কারের অধিক প্রাচুর্য্য থাকিত তথাপি তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। যে হেতু, জন-সাধারণ ব্যাপারে আগ্রহের সহিত যোগ দেওয়া প্রত্যেক এথিনীয় যুবকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল।

১৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ব্যায়াম চর্চ্চার বৃদ্ধি করা হইত। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রম কালে যুবকদিগের কুল-মর্য্যাদা ও অস্ত্রধারণের উপযোগী শারীরিক যোগ্যতা পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগের নাম পৌরজনের তালিকা মধ্যে সন্নিবেশিত হইত। তৎপরে তাহারা ইফিয়স্‌ এই নাম ধারণ পূর্ব্বক পৌরজনদিগের প্রকাশ্য সভায় একটী বর্ষা ও একখানা ঢাল উপহার প্রাপ্ত হইত। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি অনুষ্ঠান মহা গম্ভীর ভাবে সম্পন্ন হইত, এবং পৌরজনের নির্দ্দিষ্ট প্রধান প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলির বিশেষরূপ উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে শপথ গ্রহণ করিতে হইত। এই ইফিয়স্‌গণ রাজ্য সম্বন্ধে অনেক পরিমাণে স্বাধীনতা উপভোগ করিতে পাইত। কিন্তু দুই বৎসর ধরিয়া আটিকা প্রদেশ রক্ষণের জন্য তাহাদিগকে সৈনিক পদে থাকিতে হইত। সীমা প্রদেশ রক্ষণ ও আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষণ এই উভয় কার্য্য সম্পাদনের জন্য এই এফিয়স্‌—শ্রেণী হইতে এক দল লোক নির্ব্বাচিত হইত। অতএব এই দুই বৎসর কাল ধরিয়া—যুবক মাত্রকেই সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইত। ২০ বৎসরে পদার্পণ করিলেই—তাহারা একেবারে স্বাধীন হইত। তখন তাহারা সংসারে প্রবেশ পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় অভিরুচি অনুসারে কাজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত। যদি তাহাদিগের মধ্যে কাহারও পৈতৃক ধন থাকিত তাহা হইলে সে আমোদ প্রমোদ—বিদ্যানুশীলন—বা রাজকীয় পদের অনুসরণ যথা অভিরুচি করিতে পারিত। কারণ এথেন্সে সকল

বিষয়েরই যথেষ্ট সুবিধা ও সুযোগ ছিল। বিশেষতঃ যৌবন-সুলভ আমোদ প্রমোদ সম্ভোগ করিবার পক্ষে গ্রীকদিগের সামাজিক আচার ব্যবহার কিছুমাত্র প্রতিকূল ছিল না।

স্ত্রীলোক।—স্ত্রীলোকদিগের প্রতি গ্রীকদিগের ব্যবহার অনেকটা আমাদের দেশের ন্যায় ছিল। স্ত্রীলোকেরা গৃহেই যাহা কিছু শিক্ষা লাভ করিত—এবং পুরুষেরা তাহাদিগের নিকট এই মাত্র প্রত্যাশা করিত যে তাহারা সর্ব্বপ্রকার গৃহ-কার্য্যে দক্ষ হইবে এবং সুতাকাটা কাপড় বুনানি প্রভৃতি গার্হস্থ্য শিল্প কার্য্যেই নিপুণতা লাভ করিবে। তাহারা গৃহের ভিন্ন বিভাগে বাস করিত এবং প্রায় কখনই গৃহের বাহিরে যাইতে পাইত না। তবে আমাদের দেশের ন্যায় পূজা-উৎসব উপলক্ষে কখন কখন বাহির হইতে পাইত। বিবাহ হইয়া গেলে তাহারা আর একটু স্বাধীনতা লাভ করিত। এক জন দাসী সঙ্গে করিয়া তাহারা বাজার হাট্ করিতে কিম্বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারিত। বলা বাহুল্য যে দরিদ্র ঘরের স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা ছিল।

আমাদের দেশের ন্যায় গ্রীকেরাও বিবাহ-প্রথাকে ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিত। দেবতাদিগের পূজার্চ্চনার স্থায়িত্ব সম্পাদনই তাহাদের বিবাহ করিবার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। রাজ্যের হিতজনক বলিয়াও সন্তান উৎপাদন একটি কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইত। আমাদের দেশে যেমন শ্রাদ্ধ তর্পণাদির আশায় লোকে পুত্র কামনা করে, গ্রীকেরাও তদ্রূপ মনে করিত যে বংশ লোপ হইলে মৃত পূর্ব্বপুরুষদিগের কবরের প্রতি আর সমাদর ও যত্ন থাকিবে না—এবং দেবতা ও পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের এই রূপ প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হইলে তাহারা মহা বিপদ বলিয়া মনে করিত। এইরূপ কতকটা সংসার চালাইবার জন্য এবং কতকটা ধর্ম্মের উদ্দেশ্যে অধিকাংশ বিবাহ অনুষ্ঠিত হইত। যাহাকে প্রণয়-বিবাহ বলে অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষে প্রণয় হইয়া যে বিবাহ হয় তাহা প্রায় ঘটিত না। আমাদের দেশের ন্যায় প্রায় পিতাকর্ত্তৃক পুত্রের বিবাহ-সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইত। সাধারণতঃ বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিবার সময় কন্যার জাতি কুল এবং যৌতুকের পরিমাণ প্রভৃতির প্রতি যতটা দৃষ্টি রাখা হইত—তাহার রূপ গুণের প্রতি ততটা দৃষ্টি রাখা হইত না। রূপ গুণ জানিবার পক্ষে সেরূপ সুবিধাও ছিল না। স্ত্রীপুরুষের পদ-মর্য্যাদা ও অবস্থা সমান না হইলে প্রায় তাহাদের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইত না। নিকট জাতির সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু এক পরিবারের মধ্যে পরস্পর বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। বর অপেক্ষা কন্যার বয়স অনেক কম না হইলে তাহাদের মধ্যে প্রায় সম্বন্ধ স্থির হইত না। যৌতুক-দান-প্রথা গ্রীসের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। এই যৌতুকের উৎপাতে গ্রীকেরা অনেক সময় কন্যা সন্তান পালনে সম্মত

হইত না—অনেকে কন্যা সন্তান হইলে অস্মদ্দেশের লোকের ন্যায় আপনাদিগকে ভারগ্রস্ত বলিয়া মনে করিত। বিবাহ-কালে নানা প্রকার ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান হইত। বিবাহের কিছুকাল পূর্ব্বে বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে বলি উৎসর্গ করা হইত। বিবাহের দিনে কোন একটি বিশেষ কূপ হইতে জল আনিয়া বর কন্যাকে অভিষেক করা হইত। সন্ধ্যার সময় বিবাহ যাত্রা আরম্ভ হইত। বর ও কন্যা বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী সকলে মিলিয়া কন্যার বাটী হইতে নির্গত হইয়া মশালের আলোকে ও বাদ্য সহকারে মহা সমারোহে বরের বাটীতে যাত্রা করিত। বরের নিজ বাটীতে কিম্বা তাহার পৈতৃক বাটীতে বিবাহ-ভোজ সম্পন্ন হইত। এই বিবাহ-ভোজের সময় গ্রীকেরা প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া স্ত্রীপুরুষ একত্র ভোজন করিত। তবে স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক ভোজন-পীঠ বা টেবিল থাকিত। আমাদের আনন্দ-লাড়ুর ন্যায় এক প্রকার বৈবাহিক মিঠাই সর্ব্বসাধারণকে বিতরণ করা বিবাহের একটি প্রধান অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত ছিল। বিবাহকালে কন্যাকে অবগুণ্ঠিত করিয়া বিবাহ-স্থানে আনা হইত। এবং বিবাহশালার দ্বারে কতকগুলি বালিকা সমস্বরে মঙ্গল গীতি গান করিত। বিবাহের পর হইতে গার্হস্থ্য ব্যাপারের তত্ত্বাবধান ও সন্তানের প্রতিপালন-ভার সমস্তই বিবাহিতা স্ত্রীর উপর ন্যস্ত হইত। স্ত্রী স্বামীর সংসর্গে সকল সময় থাকিতে পাইত কিন্তু যখন বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমোদ আহ্লাদ হইত তখন স্ত্রী উপস্থিত থাকিতে পাইত না। কিম্বা স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিতে পারিত না। ভৃত্যগণ অর্থাৎ ক্রীত দাসেরা স্ত্রীরই কর্তৃত্বাধীনে থাকিত এবং পরিবারের কাহারও কিম্বা দাস-দাসীর পীড়া হইলে তাহার শুশ্রূষা-ভার গৃহকর্ত্রীর উপর অর্পিত হইত।

ইংরাজিতে যাহাকে গ্যালেণ্ট্রি বলে সেরূপ ভাব যেমন আমাদের দেশে নাই, তেমনি গ্রীসেও ছিল না। বরং স্ত্রীলোকের সমক্ষে পুরুষেরা আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য একটু গম্ভীর ভাব ধারণ করিত। এবং মনে করিত পুরুষদিগকেই স্ত্রীলোকের সম্মান করা উচিত। স্ত্রীদিগকে সামান্য গার্হস্থ্য কার্য্যেই ব্যাপৃত থাকিতে হইত এবং লেখা-পড়া ভাল করিয়া তাহাদিগের শিক্ষা হইত না—সুতরাং * স্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া স্বামী তেমন আমোদ পাইতেন না। এই অভাব নিবন্ধন গ্রীক-সমাজে হিটিরি

* "পূর্ব্বতন গ্রীকসমাজে অধিকাংশ পুরুষ বিবাহের পূর্ব্বে স্বীয় স্ত্রীর মুখ দেখিতে পাইত না। স্ত্রীরাও চিরকাল বাটীর প্রাচীরের মধ্যে রুদ্ধ থাকিত বলিয়া স্ত্রীসংসর্গে স্বামীরা তেমন আমোদ পাইত না। সুতরাং এই আমোদ-লালসা তৃপ্ত করিবার জন্য গ্রীক যুবকেরা এরূপ স্ত্রীলোকের সংসর্গ প্রার্থনা করিত যাহারা আত্মমর্য্যাদা হারাইয়াছে—যাহারা সম্পত্তিবিহীন বিদেশীয় কিম্বা যাহারা দাসত্ব হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে।" Schlegel's Dramatic Literature. Page 193.

নামক একদল অবিবাহিত স্ত্রী সম্প্রদায় সমুত্থিত হয়। তাহারা অত্যন্ত সুশিক্ষিত এবং বিবিধ গুণে বিভূষিত ছিল। তাহাদিগের গার্হস্থ্য কোন বন্ধন ছিল না—পুরুষদিগের সহিত তাহাদিগের অবারিত সংসর্গ। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ তৎকালে এতদূর প্রখ্যাত হইয়াছিল যে তাহাদের নাম আবহমান কাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। তাহারা রূপে গুণে অসামান্য এবং তাহাদিগের এক প্রকার অসাধারণ মোহিনী শক্তি ছিল। আগন্তুক সাধারণের বদান্যতায় তাহাদিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইত। তাহাদের জ্ঞানগর্ভ ও আমোদজনক কথোপকথন শুনিবার জন্য দেশের যাবতীয় জ্ঞানী পণ্ডিতেরা তাহাদিগের বাটীতে যাতায়াত করিত। এই হিটিরিদিগের মধ্যে অধিকাংশ বিদেশ হইতে আসিয়া এথেন্‌সে বাস করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হিটিরি-বৃত্তি অবলম্বন করিবে পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ সংকল্প করিয়া আসিত এবং কেহ কেহ বা ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া ঐ পথের পথিক হইত। ঐ সম্প্রদায়-ভুক্ত অ্যাস্‌পেসিয়া নামক সুপ্রসিদ্ধ স্ত্রীলোক প্রথমে বিদেশ হইতে আসিয়া এথেন্‌সে বাস করে—পরে এথেন্‌সের রাজা পেরিক্লিসের সহিত তাহার বিবাহ হয়। পূর্ব্বতন গ্রীকদিগের এই একটি বিশেষ ভাব ছিল যে তাহারা আমোদ আহ্লাদের একশেষ করিয়াও চরিত্রকে একেবারে ধ্বংশ হইতে দিত না। আমাদের দেশে আমোদপ্রিয় সম্প্রদায় যেরূপ একবারে অধঃপাতে যায় তাহারা সেরূপ যাইত না। ইন্দ্রিয়সুখ অপেক্ষা বুদ্ধিবৃত্তি-ঘটিত উচ্চতর আমোদের প্রতি তাহাদিগের অধিক আস্থা ছিল। এথিনীয় যুবকেরা পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোক সম্প্রদায়ের সংসর্গে অধিকাংশ সময় এবং অর্থ ব্যয় করিত। হিটিরি সম্প্রদায় ব্যতীত আর একটী নীচ বেশ্যা দল ছিল তাহারা ক্রীত দাস শ্রেণীস্থ। সমস্ত গ্রীসের মধ্যে কোরিন্থ নগরেই উহাদের সংখ্যা অধিক ছিল।

স্বঃ—

দিক্‌-বালা।

'কোথা গেলে কল্পনা! আইস আইস দেবি!
সুখ-রাত যায় যে গো বহিয়া।
দিক্ বালাগণ যেথা ঘুমাইছে সেই খানে
মোরে দেবী চলনা গো লইয়া।'

* * * *

'সেথায় কি তুমি কবি করিবে গমন
যেথা দিক্‌বালাগুলি মেঘময় পাখা তুলি
শূন্য করিয়াছে আবরণ?
উঠ তবে মেঘ-রথে—চল গো আকাশ পথে,
সেথা হ'তে দিক্-রাজ্য করিবে দর্শন।'

* * * *

শ্যামল নীরদ যানে, চড়িলেন দুই জনে
মেঘ খণ্ড ধীরে ধীরে উঠিল আকাশে।
নিশির শিশিরময় বিমল বাতাসে।
শূন্যে বায়ু-স্তরে স্তরে, মৃদু মৃদু জ্যোতি ক্ষরে,
দ্বিতীয়ার অর্দ্ধস্ফুট জ্যোছনার প্রায়।
আঁধার জলদ খানি— স্নিগ্ধ জ্যোতি সুর-রাণী
নিকষে সুবর্ণ-রেখা যেন শোভা পায়।

* * * *

দূর আকাশের পথ, গিয়াছে জলদ রথ,
নিম্নে চাহি দেখে কবি ধরণী নিদ্রিত।
নদনদী পরবত, অস্ফুট চিত্রের মত
পৃথিবীর পটে-যেন রয়েছে চিত্রিত।

সমস্ত পৃথিবী ধরি একটি মুঠায়,
অনন্ত সুনীল সিন্ধু সুধীরে লুটায়।
হাত ধরা ধরি করি দিক্‌-বালা গণ
দাঁড়ায়ে সাগর-তীরে ছবির মতন।

কেহবা জলদময় মাথায়ে জ্যোছনা
নীল দিগন্তের কোলে পাতিছে বিছানা।
মেঘের শয্যায় কেহ ছড়ায়ে কুন্তল
নীরবে ঘুমাইতেছে নিদ্রায় বিহ্বল।

সাগর-তরঙ্গ তার চরণে মিলায়,
লইয়া শিথিল কেশ পবন খেলায়।
কোন কোন দিক্‌বালা বসি কুতূহলে
আকাশের চিত্র আঁকে সাগরের জলে।

আঁকিল জলদ-মালা চন্দ্রগ্রহ তারা,
রঞ্জিল সাগর, দিয়া জ্যোছনার ধারা।
পাপিয়ার ধ্বনি কেহ শুনি দূর বনে
প্রতিধ্বনি সুন্দরীরে জাগায় যতনে।

শুকতারা প্রভাতের ললাটে ফুটিল
পূরবের দিক্‌দেবী জাগিয়া উঠিল।
লোহিতকমল করে পূরবের দ্বার
খুলিয়া—সিন্দূর দিল সীমন্তে উষার।
মাজি দিয়া উদয়ের কনক সোপান,
তপনের সারথীরে করিল আহ্বান।

সাগর-উর্ম্মির শিরে সোনার বরণ
মাথায়ে মাথায়ে দিল দিক্‌-বালাগণ।
পূরব দিগন্ত কোলে জলদ গুছায়ে
ধরণীর মুখ হ'তে আঁধার মুছায়ে

বিমল শিশির জলে ধুইয়া চরণ,
নিবিড় কুন্তলে মাখি কনক-কিরণ,
সোনার মেঘের মত আকাশের তলে,
কনক কমল সম মানসের জলে,

খেলিতে লাগিল সব দিক্‌বালাগণে
প্রফুল্লিত হয়ে নব প্রভাত পবনে।
ওই হিমগিরি পরে কোন দিক্‌বালা
রঞ্জিছে কনক-করে নীহারিকা মালা।

মুকুতা-মালিকা গাঁথি শিশিরের জলে
পরি দিক্‌বালাগণ সুকুমার গলে,
কুন্তলে মেঘের চূর্ণ মাখিয়া প্রচুর,
সীমন্তে কনক-বর্ণ মাখিয়া সিন্দূর,

কেহবা সরসী-জলে করিতেছে স্নান,
কেহবা নীরব কুঞ্জে গাইতেছে গান।
ওদিকে দেখেছ ওই সাহারা ভিতরে
অধিষ্ঠিত দিক্‌-দেবী বালুকার পরে।

অঙ্গ হতে বাহিরায় জ্বলন্ত কিরণ,
চাহিতে মুখের পানে ঝলসে নয়ন।
আঁকিছে বালুকাপুঞ্জে শত শত রবি
আঁকিছে দিগন্ত-পটে মরীচিকা-ছবি।

অন্যদিকে কাশ্মীর উপত্যকা-তলে
পরি শত বরণের ফুল মালা গলে

শত বিহঙ্গের গান শুনিতে শুনিতে
সরসী লহরী মালা গুনিতে গুনিতে
বসি আছে দিক্-বালা হরিত বসনে
শিশির মুকুতাময় হরিত আসনে।
ওইরে তুষার-ক্ষেত্র বিস্তৃত উত্তরে
তীব্র-শীত সমীরণ স্বনিছে অম্বরে।
কুজ্ঝটি-বসনে ঢাকি সর্ব্ব কলেবর,
অনন্ত তুষার শুভ্র বিছানার পর,
এখনও দিক্-বালা ঘুমে অচেতন,
এখনো দিবস সেথা মেলেনি নয়ন।
ওই হোথা দিক্‌দেবী বসিয়া হরষে
ঘুরায় ঋতুর চক্র মৃদুল পরশে।
ফুরায়ে গিয়াছে এবে শীত-সমীরণ,
বসন্ত পৃথিবী-তলে অর্পিবে চরণ।
পাখীরে গাহিতে কহি অরণ্যের গান,
মলয়ের সমীরণে করিয়া আহ্বান।
বনদেবীদের কাছে কাননে কাননে
কহিল ফুটাতে ফুল দিক্-দেবীগণে।
বহিল মলয়-বায়ু কানন ঘিরিয়া,
পাখিরা গাহিল গান কানন ভরিয়া।
ফুল-বালা সাথে আসি বন-দেবীগণ,
কহে দিক্-দেবীদের বন্দিয়া চরণ।
"বসন্তের বিহঙ্গেরা খুলেছে মনের দ্বার,
ছুটিছে মলয়-বায়ু লুঠিতে সুবাস-ভার।
তবু মা আজিও আহা না পেয়ে বরষা জলে,
একটি কুসুম-কলি ফুটেনা কানন-তলে।

ম্রিয়মান গাছ গুলি প্রখর তপন-করে,
শুকায়ে পড়িছে পাতা, কুসুম ঝরিয়া পড়ে।
এক দিন মেঘ যদি বরিষে বরষা-জল,
বসন্তের ফুলভারে হাসিবে কানন তল।"

শুনি দিক্‌বালাগণ কহিল "যাইতে হবে
সাগর-বালিকাদের পাশে,
চাহিব সলিল ধারা, সজল জলদ-রাশি
নিরমান করিবার আশে।

আয় তবে সজনিরা, সকলে মিলিয়া যাই,
অন্ধকার সাগরের তলে।
শুকালো কুসুমদের জীবন সঁপিতে হবে
ফোঁটা ফোঁটা বরিষার জলে।"—

"এস এস কবি আমরাও যাই
দেখিতে মুকুতা শালা।
দেখিবে কেমনে প্রবাস আলয়ে
রয়েছে সাগর-বালা।"

দেখিতে দেখিতে জলদের রথ
নামিয়া আসিল ধীরে।
দেখিতে দেখিতে উতরিনু আসি
সুনীল জলধি-তীরে।

ফের্ডিনাঁ ডে লেসেপ্ এবং সুয়েজের খাল।

সামান্য সামান্য ঘটনা হইতে কত অভাবনীয় মহৎ ব্যাপারের জন্ম হয়—সুয়েজের খাল তাহার দৃষ্টান্ত-স্থল। এখন সকলের মুখেই তো সুয়েজ-খালের কথা শুনা যায়—এবং বাস্তবিকও ইহার নির্ম্মাণে যন্ত্রবিদ্ শিল্পীদিগের শিল্পনৈপুণ্যের যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু কি রূপে এই মহৎ ব্যাপারের

প্রথম সুত্রপাৎ হইল এবং ফের্ডিনাঁ ডে লেসেপের মনে ইহার কল্পনা প্রথম উদয় হইল তাহা ঠিক্ জানিতে হইলে যে সময় ফরাশিস্‌রা মিসরদেশ জয় করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন বর্ত্তমান শতাব্দির সেই প্রাক্‌কালীন বর্ষগুলির প্রতি আমাদের মনশ্চক্ষুকে নিয়োগ করিতে হয়। যদিও নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিসরের জয়সাধনে কৃতকার্য্য হন নাই তথাপি বোধ হয় কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ দেশের ব্যাপারে তাঁহার বরাবর ঔৎসুক্য ছিল। তাঁহার পররাষ্ট্র-বিভাগের মন্ত্রী ট্যালের্‌াঁর পরামর্শ-অনুসারে নেপোলিয়ান্, ডেলেসেপ্ নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার প্রতিনিধি কার্য্যকারকরূপে "কায়রো" নগরে স্থাপন করেন। তাঁহার এই নিয়োগে পৃথিবীর একটি ভবিষ্য লম্ভোর সুত্রপাত হইল। লেসেপ্ অতি কার্য্যদক্ষ বিচক্ষণ লোক ছিলেন। মহম্মদ আলিকে মিসরের শাসনকর্ত্তার পদে অধিরোহণ করিতে সহায়তা করায় তিনি ফ্রান্সের একটি মহৎ উপকার সাধন করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন যে মহম্মদ আলি যখন প্রথম মিসরে আইসেন তখন অতি দরিদ্র ছিলেন। তিনি লেখাপড়া আদৌ জানিতেন না—কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল—এবং তাঁহার সৈনিক-সুলভ দৃঢ়তা ছিল। এই দুই গুণ থাকাতেই মাম্‌লুক্‌দিগের বিনাশের পর—তিনি ঐ উচ্চ পদে অধিরূঢ় হয়েন। ১লা মার্চ ১৪১১ খৃষ্টাব্দে ১৬০০ মামলুক "কায়রো" নগরে নিহত হয়—কেবল তাহাদের মধ্যে এক জন অশ্বারূঢ় হইয়া দুর্গ-প্রাকারের উপর দিয়া লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করে। লেসেপ্ কত কাল মিশরে থাকেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। ইহা নিশ্চয় যে তিনি ফ্রান্সের সহিত একেবারে সংশ্রব পরিত্যাগ করেন নাই। ভের্সাই নগরে ১৯ নবেম্বরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। এই পুত্রের নাম ফের্ডিনাঁ ডে লেসেপ্। ইনিই সুয়েজ খালের অনুষ্ঠান করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে উৎকৃষ্ট শিক্ষা প্রদান করেন—এবং দৌত্য কার্য্যে এবং যন্ত্রবিদ্যায় তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল। তাঁহার বুদ্ধির প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মিসরের বৃত্তান্ত শুনিতে লাগিলেন—এবং ঐ দেশের ব্যাপারে তাঁহার ঔৎসুক্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি ফরাসিস্ প্রতিনিধি কার্য্যকারকের পদে তথায় নিযুক্ত হইলেন। ফের্ডিনাঁ ডে লেসেপ্ তাঁহার পিতার পরিচয়-সূত্রে মহম্মদ আলির নিকট যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইলেন। মহম্মদ আলির অনেক ত্রুটি সত্ত্বেও তাঁহাকে মিসরের নবজীবনদাতা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আলির মৃত্যুর পর ইব্রাহিম পাশা তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। ইব্রাহিম পাশা যুদ্ধ ব্যাপারের জন্য প্রখ্যাত।—তাঁহার পর অ্যাবাস পাশা। তিনি অ্যালেকজাণ্ড্রিয়া হইতে কায়রো পর্য্যন্ত বাষ্পীয় শকটের লৌহপথ নির্ম্মাণ করেন। এই লৌহপথের নির্ম্মাণে মিসরের বাণিজ্য নব উদ্যম প্রাপ্ত হয়। তাহার পর

মহম্মদ আলির পুত্র সায়েদ পাশা ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মিসরের শাসনকর্ত্তার পদে অধিরূঢ় হয়েন। তিনিও মিসরের অনেক উন্নতি সাধন করেন।

সৌভাগ্যক্রমে মিসরের অনেক শাসন-কর্ত্তার সহিত লেসেপের ক্রমান্বয়ে আলাপ পরিচয় হয় এবং তথাকার বাণিজ্য-ব্যবসায়ের সুবিধা সম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি যখন সে দেশে ছিলেন তখন ভূমধ্যসাগর ও লোহিত-সাগরের মধ্যে পরস্পর যোগ করিয়া জাহাজ চলিবার একটি খাল নির্ম্মাণের কোন সুবিধা হইতে পারে কি না তাহাই তিনি ক্রমাগত চিন্তা করিতেন। কিন্তু এই কল্পনাটি একেবারে নূতন নহে। পূর্ব্বকালে ফ্যারাওদিগের রাজত্ব সময়ে নীল নদী এবং লোহিত সাগর যোগ করিয়া একটি খাল ছিল। যদিও বালুকায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে তথাপি ইতস্ততঃ এখনও তাহার চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কিন্তু লেসেপ্ যাহা কল্পনা করেন তাহা প্রকাণ্ড ব্যাপার। তিনি সমুদ্রে সমুদ্রে বরাবর যোগ করিয়া যাহাতে বড় বড় জাহাজ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে এই সঙ্কল্পটি মনে মনে ধারণা করেন। নদীর কিম্বা হ্রদের সহিত যোগ করিয়া খাল প্রস্তুত করা তো সহজ কথা—কিন্তু দুইটি সমুদ্রের দুই মুখ খুলিয়া দিয়া জল আনয়ন করা বড় সহজ ব্যাপার নহে। লেসেপ্ দেখিলেন, যেখানে পাহাড় পর্ব্বত নাই—এমন স্থল ব্যতীত এই সঙ্কল্পটিকে কার্য্যে পরিণত করাই একেবারে অসাধ্য।

অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিলেন যে তত্রস্থ মরুভূমির কিয়দংশ এবং লোহিত সাগরের সংলগ্ন কিয়দংশ স্থানে সমুদ্রের লবণাক্ত জলরাশি পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল—তাহার চিহ্নস্বরূপ তিনি দেখিতে পাইলেন যে এখানে ওখানে কতকগুলি গর্ত্ত যাহা বালিতে বুজিয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে এখনও লবণের এক একটি সূক্ষ্ম আবরণ পড়িয়া আছে।

তবে এত দিন কেন সুয়েজ খাল নির্ম্মিত হয় নাই—তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়—মিসর দেশের রাজনৈতিক অবস্থা তত অনুকূল ছিল না—ইউরোপের রাজাদিগের মধ্যে রেষারিষি প্রবল ছিল এবং সাধারণে এই একটি সংস্কার ছিল যে লোহিত সাগরের এবং ভূমধ্য সাগরের সমতল এক নহে। কিন্তু লেসেপ দেখিলেন উভয়েরই সমতল সমান—এবং তাঁহার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইল যে বাষ্প ও তাড়িৎ বার্ত্তাবহের সাহায্যে একটি প্রশস্ত খালের মধ্য দিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিলক্ষণ সুগমতা হইবে।

ইউরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাণিজ্যের সুবিধা করাই—সুয়েজ খাল নির্ম্মাণের প্রধান উদ্দেশ্য। কতিপয় শতাব্দি পর্য্যন্ত প্রাচ্য দেশের সহিত ইউরোপের বাণিজ্য অধিকাংশ এসিয়ার স্থলপথ দিয়া চলিত। বাণিজ্যদ্রব্য সকল প্রথমতঃ এসিয়ার স্থলপথ দিয়া আসিয়া পরে জাহাজে করিয়া বিনিস্ নগরে চালান হইত। পরে বিনিস্ হইতে ইউরোপের উত্তর

প্রদেশে নীত হইত। ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপের আবিষ্কার হইলে পর—এই বিরক্তিজনক ও বহুব্যয়-সাপেক্ষ বাণিজ্যের পথটি বন্ধ হইয়া যায়। তখন জাহাজ সকল একেবারে ভারতবর্ষে সোজা যাতায়াত করিতে লাগিল এবং এই রূপে পৃথিবীর বাণিজ্যে মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল। ক্রমে বিনিস্ সুরোম্বর্গ—ব্রুজ্ প্রভৃতি প্রাচ্য বাণিজ্যের অধিষ্ঠান-গুলির প্রাধান্য লোপ হইল। এই রূপ চলিতেছিল—এমন সময় আর একটি মহা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইল।

এপর্য্যন্ত উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিয়া বাণিজ্যের জাহাজগুলি যাতায়াত করিত—এবং ইদানীন্তন কালে অ্যালেক্স্যাণ্ড্রিয়া হইতে কায়রো পর্য্যন্ত লৌহপথ হওয়াতে পর্য্যটকদিগেরও অনেক পরিমাণে সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু লেসেপের সঙ্কল্পিত প্রস্তাবে প্রাচ্য বাণিজ্যে আর একটি মহা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবার সূচনা হইল। উত্তমাশা অন্তরীপের পথটি একেবারে উঠাইয়া দিয়া, বাণিজ্য-জাহাজ চলাচলের উপযুক্ত খাল নির্ম্মাণ করিয়া, আফ্রিকা প্রদেশকে একটি মহাদ্বীপে পরিণত করা তাঁহার সঙ্কল্প হইল।

দৌত্যকার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়া লেসেপ্ ইউরোপে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কিরূপে সুয়েজের যোজক-দেশ ভেদ করা যায় তাহারই চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। তিনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্যারিসে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে এই রূপ বলিয়াছিলেন, "১৮৪৯ হইতে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার বিষয় আছে তত্তাবৎই আমি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছিলাম। আমি দেখিলাম যে প্রতি দশবৎসরে বাণিজ্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইতেছে এবং ভাবিলাম যে এই সময় সুয়েজ-খাল নির্ম্মাণ করিলে ঐ বাণিজ্যের আরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে"। এই বিশ্বাসটি মনে বদ্ধমূল হইলে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ সাএদের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিরোহণের সময় তিনি মিসর দেশে যাত্রা করিকরিলেন। নানা প্রকারে তিনি সায়েদের উপকার সাধন করায় সায়েদের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল। এত দিনের পর তাঁহার আশা হইল যে তাঁহার সঙ্কল্পটি অনুষ্ঠান পরিণত করিবার জন্য সায়েদের নিকট অনুমতি পাইলেও পাইতে পারেন। সায়েদ যখন একবার লিবিয়ান মরুভূমির উপর দিয়া যুদ্ধযাত্রায় নির্গত হইয়াছিলেন, তখন লেসেপ্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রস্তাবটী উত্থাপন করেন এবং বলিলেন সাধারণের যোগে এই বৃহৎ ব্যাপারটি সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু শাসনকর্ত্তার অনুমতি পাইবার পূর্ব্বে শাসনকর্ত্তার পারিষদবর্গকে অগ্রে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক হইল। তাঁহার পারিষদগণ "মস্তিষ্কের চালনা অপেক্ষা অশ্বের চালনায় অধিক দক্ষ ছিলেন"। লেসেপ্ বলেন—"আমি কোন সুযোগ পাইয়া শাসনকর্ত্তার তাঁবুতে গিয়া উপনীত হইলাম।

আব্ড়ো-থাব্ড়ো শিলাখণ্ডের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত—কামান রাখিবার স্থান বিশিষ্ট দুর্গের ন্যায় একটি উচ্চ স্থানে ঐ শিবির সন্নিবেশিত ছিল। আমি কথায় কথায় বলিয়াছিলাম যে ঐ দুর্গের এমন একটি স্থান আছে যেখান হইতে অশ্বারূঢ় হইয়া লম্ফ প্রদান করিলে নীচে একটা বারাণ্ডায় গিয়া পড়া যায়। শাসনকর্ত্তামহাশয় এই কথায় সন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রস্তাবটি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন ঐরূপ ঘোড়ায় চড়িয়া তুমি এখনি তোমার তাঁবুতে গমন কর এবং প্রস্তাবিত খালের সমস্ত বিষয় লিখিয়া আমাকে দেখাও। মন্ত্রিগণ ও পারিষদ্গণ দ্বারা শাসনকর্ত্তা তখন পরিবেষ্টিত ছিলেন। আমি লম্ফ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম—এবং আমার অশ্ব এক লম্ফ দিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিল এবং ক্রম-নিম্ন-ভূমি দিয়া দ্রুতবেগে আমার তাঁবুতে গিয়া পৌঁছিল। আমার রিপোর্ট অনেক দিন হইতে প্রস্তুত ছিল আমি তাহা লইয়া শাসনকর্ত্তার তাঁবুতে পুনরায় উপস্থিত হইলাম। খালের সম্বন্ধে আমার মন্তব্য কথা দেড় পৃষ্ঠার মধ্যে সুস্পষ্ট রূপে আমি ব্যক্ত করিয়াছিলাম। তৎপরে যখন ঐ বিবরণ শাসনকর্ত্তা তাঁহার পারিষদগণকে পড়িয়া শুনাইলেন এবং তাঁহাদিগের পরামর্শ চাহিলেন তখন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন যে, "মহম্মদ আলির বংশের সহিত যাঁহার চিরকালের বন্ধুত্ব তাঁহার প্রস্তাব কখনই অননুমোদনীয় হইতে পারে না এবং প্রস্তাবটি গ্রাহ্য করা প্রার্থনীয় বটে।" ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তিনি খাল কাটিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে বিধিমতে ডমরুমধ্য স্থানের (Isthmus) তত্ত্বানুসন্ধান এবং কোন্ স্থান দিয়া খাল কাটিতে হইবে তাহার পথ নিরূপণ করিবার সময় উপস্থিত হইল। লেসেপ্ এবং আর তিন জন ফরাসিস্ যন্ত্রবিৎ শিল্পী এই কার্য্যে ব্রতী হইলেন। এই চারি জনের পানীয় জল এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য বহন করিবার জন্য ৬০টি উষ্ট্র এবং তদুপযুক্ত অনুচরগণের প্রয়োজন হইল। জীবন্ত ভেড়া ও মুর্গি অনেক সঙ্গে চলিল। তাঁহাদের পথের উল্লেখ করিয়া লেস্পে বলেন যে "তাঁহাদের সঙ্গে যেসব জন্তু গিয়াছিল তদ্ব্যতীত এই ভয়ানক মরুপ্রদেশে একটি মক্ষিকাও নাই"। তিনি বলেন যে "আমরা রাত্রিতে খাঁচা হইতে মুর্গিদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া ছাড়িয়া দিতাম—কারণ,আমরা বেশ জানিতাম যে প্রাতঃকাল হইলেই আমাদের জীব জন্তুগুলি যেখানেই থাকুক আমাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে। ঐ বিজন প্রদেশে কেহই পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে চাহিবে না—ওখানে একলা থাকাও যা' মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়াও তা'। আমরা যখন প্রাতঃকালে আমাদের তাঁবু উঠাইতাম—যদি কোন মুর্গি পিছনে পড়িয়া থাকিত—অমনি সে ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার খাঁচায় ঢুকিবার জন্য উষ্ট্রপৃষ্ঠে উড়িয়া আসিত।" —অনুসন্ধানের পর্য্যটন শেষ করিতে দুই মাস কাল লাগিয়াছিল। অবশেষে এই রূপ

স্থির হইল যে, খালের পথ নির্ণয় করিবার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন প্রদেশের সমবেত সুদক্ষ যন্ত্রবিৎ শিল্পীদিগের বিবেচনার উপর নির্ভর করা যাউক। তাঁহারাও রীতিমত অনুসন্ধান করিয়া লেসেপের সমভিব্যাহারে অ্যালেক্স্যাণ্ড্রিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিসরের শাসনকর্ত্তা পুরদ্বারে আসিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন। এই সময় একটি চমৎকার দৃশ্য উপস্থিত হইল। লেসেপ্ বলেন, "যখন সায়েদ শুনিলেন যে দেশদেশান্তর হইতে সমবেত শিল্পিগণ নীল নদীর জলের সাহায্য ব্যতীত খাল হইতে পারে বলিয়া মত দিয়াছেন তখন তিনি দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে আগ্রহের সহিত আলিঙ্গন করিলেন এবং অত্যন্ত হর্ষ প্রকাশ করিলেন"

এই ফরাসিস্ বীর খাল কাটিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ইউরোপে প্রত্যাগমন করিলেন এবং এতদুপলক্ষে একটি সম্ভূয়-সমুত্থান স্থাপন করিবার জন্য সাধারণের মনকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

তিনি পদে পদে যেরূপ বাধাবিঘ্ন প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন তাহাতে আর কেহ হইলে তখনি ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিত, কিন্তু তিনি কিছুতেই নিরাশ হইলেন না। কতকগুলি প্রতিপত্তিশালী ইংরাজ যন্ত্রশিল্পী এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন যে, খালে এবং খালের মুখে আদপে কাদা আসিয়া না জমে তাহার উপায় করিতে ও মাটি কাটাইতে এত অধিক ব্যয় হইবার সম্ভাবনা যে উহাতে কিছুমাত্র খর্চ্চা পোষাইবে না। আরও এই আপত্তি ও সন্দেহ উপস্থিত হইল যে এই ব্যাপারে সাহায্য করিলে ফরাসিস্ গভর্ণমেণ্টের হাতে গিয়া পড়িতে হইবে। পার্ল্যামেণ্টে ঐ সম্বন্ধে যে সব বক্তৃতা হইয়াছিল তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ৭ই জুলাই ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে লর্ড পামরষ্টন বলেন—"তুর্কির সহিত মিসরের বিচ্ছেদ আরও সহজে সাধন করা এই সঙ্কল্পিত ব্যাপারের রাজনৈতিক পরিণাম হইবে। আরও, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের আক্রমণ পক্ষে সুবিধা হইবে, এই দূর লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই ব্যাপারে ফরাসিরা হস্তক্ষেপ করিয়াছে। এবিষয় আমার বিশেষরূপে বলিবার আবশ্যক নাই, এই বিষয়ে যে কিছুমাত্র মনোযোগ দিয়াছে সেই স্পস্ট রূপে বুঝিতে পারিবে। আমার এই মাত্র বিস্ময় হইতেছে যে লেসেপ্ ইংরাজ মহাজনদিগের বিশ্বাস-প্রবণতার উপর এত দূর নির্ভর করিয়া আছেন যে তিনি মনে করিয়াছেন যে ইংলণ্ডের বাণিজ্য-প্রধান নগরগুলি পরিভ্রমণ করিবামাত্র ইংরাজদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া সেই-সংগৃহীত অর্থে এমন একটি ব্যাপার সাধন করিবেন যাহা ইংরাজদিগের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী।" দশ দিন পরে লর্ড পামারষ্টন আরও এই রূপ বলেন "ইংরাজ ধনীদিগের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যে সকল জল বুদ্‌বুদ্‌বৎ ব্যবসায়ের মৎলব্ বাহির হয়—আর যে সকল ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিলে আর যাহারই লাভ হউক ইংরাজদিগকে নিশ্চয় ক্ষতি-

গ্রস্ত হইবার কথা—সেই সকল মৎলবের মধ্যে ইহাও একটি” এই অযোগ্য কঠোর উক্তিগুলি যদিও সর্ব্বসাধারণের হৃদয়-গ্রাহী হয় নাই তথাপি কতকটা নৈরাশ্যের কারণ হইয়াছিল। এবং উহা যে লেসেপের মর্ম্মস্পৃক্ হইয়াছিল তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই খাল কাটিতে ইংরাজদিগের যে কত সুবিধা হইবার কথা আশ্চর্য্য তাহা পামরষ্টন্ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিবন্ধকাচরণে এই ব্যাপারের সমস্ত অনুষ্ঠান-ভার ফরাসিস্‌দিগের হাতে আসিয়া পড়িল এবং এই সুয়েজখাল—ফরাসিস্‌দিগের চিরন্তন কীর্ত্তি-প্রবাহ হইয়া রহিল!

লেসেপের প্রথম হইতেই ইচ্ছা ছিল যে পৃথিবীর সকল জাতিই সমানরূপে এই খালের ফল ভোগ করে। এই জন্য যে সম্ভূয় সমুত্থান সম্প্রদায় স্থাপিত হইল তাহার তিনি “সুয়েজের বানিজ্য-খালের বিশ্বজনীন কোম্পানি” এই নামটি প্রদান করেন। চুক্তিপত্রে এই রূপ সর্ত্ত ছিল যে—“কোন ব্যক্তি-বিশেষের কিম্বা জাতি-বিশেষের কোন রূপ প্রাধান্য না দিয়া বানিজ্য জাহাজ মাত্রেই নির্ব্বিশেষে এই খালে যাতায়াত করিতে পারিবেক”—আরও “এই কোম্পানি কোন জাহাজকে—কোন সম্প্রদায়কে কিম্বা কোন ব্যক্তিকে এরূপ কোন সুবিধা কিম্বা ক্ষমতা দিবেন না যাহা অন্য জাহাজদিগকে প্রদত্ত হয় নাই”—মিসরের শাসনকর্ত্তার সহিত এই রূপ বন্দবস্ত হইয়াছিল যে খালের দুই ধারের কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি ৯৯ বৎসরের জন্য—ঐ কোম্পানির অধিকারে থাকিবে। এই রূপে কোম্পানি স্থাপিত হইলে এবং ২৫ হাজার ফরাসিস্ স্বাক্ষরকারী এবং মিসরের গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক টাকা সংগ্রহ হইলে পর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে খালের কার্য্য আরম্ভ হয়। এই খালের উদ্দেশে আবার নানা আনুসঙ্গিক কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। বন্দর, দীপ-মন্দির, সহস্র সহস্র শ্রমজীবীদিগের বাসস্থান—ইত্যাদি অধুনাতন সভ্যতার যাহা কিছু উপকরণ তাহার সমস্তই এই মরুভূমিতে আনীত হইল—এরূপ মরুভূমি যে খানে পূর্ব্বে একটি ঘাস কিম্বা এক বিন্দু জলও পাওয়া যাইত না। কিন্তু সায়েদ এবং তাহার উত্তরাধিকারী ইস্মাএল যদি এই বৃহৎ ব্যাপারে যথোচিত সাহায্য না করিতেন তাহা হইলে কিছুই হইয়া উঠিত না। যেখানে কোম্পানিরা ইসমেলিয়া নামক নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সেই মধ্যবর্ত্তী স্থানে নীল নদী হইতে “মিঠে” জল আনিবার জন্য ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ আবার একটি খাল কাটিতে হইয়াছিল। এই খালটি কাটিবার জন্য—পাশা ৮০ হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া দেন। সামুদ্রিক খাল কাটিতে আরও বৃহৎ কাণ্ড উপস্থিত হইল। ২৮৫টা মৃত্তিকা কাটিবার যন্ত্র ১৮ হাজার অশ্ব-বল পরিমাণের বাষ্প-বলে চালিত হইয়া প্রতিমাসে ১২ হাজার টন কয়লা পুড়াইয়া কার্য্য করিতে লাগিল। এই বৃহৎ ব্যাপারটি সম্পন্ন করিবার জন্য যে কত শ্রম কত উদ্যম কত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল তাহা ভাবিতে গেলে আশ্চার্য্য হইতে হয়। মনে করিয়া দেখ, সমুদ্র হইতে

সমুদ্র পর্য্যন্ত ৯৯ মাইল দীর্ঘ এবং বৃহৎ জাহাজ চলিতে পারে এরূপ প্রশস্ত এবং গভীর একটি খাল কঠোর বালুময় মরুভুমি হইতে কাটিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে—এই প্রকাণ্ড ব্যাপারটি ভাবিতে গেলে কি মন স্তম্ভিত হইয়া যায় না ?—প্রতিমাসে ইহার যে মাটি কাটাই হইত তাহা পরিমাণে ২৭৬৩০০০ cubic yard হইবে—লেসেপ্ তাঁহার প্যারিসের শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট বলিয়াছিলেন—"যে মাটি কাটাই হইত তাহা পরিমাণে এত অধিক যে ম্যাড্‌লিন হইতে বাসটিঁই পর্য্যন্ত সমস্ত বুলবার (Boulevard) উচ্চে তত্রস্থ বাড়ির এক তালা পর্য্যন্ত একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে পারে" তিনি আরও বলেন—"যে সকল সাহসী পুরুষ ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত এই বৃহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিবার জন্য শ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদিগের যাহা উচিত প্রাপ্য তাহা যেন আমরা তাঁহাদিগকে দিই।"

খাল কর্ত্তনে ও তাঁহার আনুসঙ্গিক কার্য্য সকল শেষ করিতে সার্দ্ধ দশ বৎসর লাগিয়াছিল। লেসেপ্ এই সমস্ত কাল সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যখন যে বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, কিরূপে তাহা অতিক্রম করিতে হইবে বরাবর তাহার পরামর্শ ও উপদেশ দিয়া আসিয়াছিলেন। অবশেষে খাল খুলিবার দিন উপস্থিত হইল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে তৎকালীন ফ্রান্সের সাম্রাজ্ঞী য়ুজেনি এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে মহা সমারোহ সহকারে খাল খোলা হইল। এত দিনের পর লেসেপের মনস্কামনা পূর্ণ হইল—ও তাঁহার মহা-স্বপ্ন সফল হইল! যাহাতে জাহাজের অত্যন্ত ভীড় হইয়া গতিবিধি বন্ধ হইয়া না যায় এই আশঙ্কায় জাহাজের গতায়াত পক্ষে কতকগুলি কড়াক্কড় নিয়ম নির্দ্ধারিত হইল। তাহার মধ্যে এই একটি নিয়ম হইল যে ১৬ ঘণ্টা ধরিয়া জাহাজের গতিবিধি হইবে, তাহার অধিক নহে। দুই সমুদ্রের সমতল সমান নহে বলিয়া পূর্ব্বে যে আশঙ্কা হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত অমূলক। দুই প্রান্তের স্রোত প্রায় সমানরূপে প্রবাহিত হয়। তবে লোহিত সমুদ্র হইতে যে জল আইসে তাহার একটু স্রোতোবেগ অধিক। কিন্তু উত্তর দিক হইতে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাহার বেগে এই স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইয়া যায়। সুতরাং নৌচালনের কোন অসুবিধা হয় না। বালি ভাসিয়া আসিয়া খালকে বুজাইয়া ফেলিবে আর একটি এই যে ভয় ছিল তাহারও বিশেষ কারণ দেখা যায় না। "মিঠে'জলের যে খালটি কাটা হইয়াছে তাহার দুই ধারে বরাবর বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছে। এই বৃক্ষগুলি বড় হইলে মেঘকে ঘনীভুত করিয়া বৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আনিবার পক্ষে পরে সহায়তা করিতে পারে। অতএব আমাদের বিলক্ষণ ভরসা হয় যে অনতিকাল মধ্যে এই যে বিস্তীর্ণ মরুভুমি তাহাও ফলবতী হইয়া ফলেফুলে সুশোভিত হইবে। এই খাল খোলা অবধি এমন একবারও হয় নাই যে জাহাজের গতায়াত একেবারে স্থগিদ হইয়া গিয়াছে। বাণিজ্যের সুগমতা পক্ষে পূর্ব্বে

যে সকল আশা করা হইয়াছিল তাহার অধিক ফল লাভ হইয়াছে। বণিকেরা এবং পোত-স্বামীরা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন তাঁহাদের কত সুবিধা হইয়াছে। ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াত শীঘ্র হওয়ায় জিনিসের ভাংচুর ও ক্ষয় কমিয়াছে, সাধারণ ব্যয়ের লাঘব হইয়াছে এবং ইনস্যুর‍্যান্সের সাশ্রয় হইয়াছে। এই সকল সুবিধার বিনিময়ে কোম্পানিকে জাহাজের মাস্থল এবং অন্যান্য খর্চ্চা দিতে হয়। দিন দিন এত জাহাজের গতিবিধি বৃদ্ধি হইতেছে যে আর এ খালে সংকুলান হয় কি না সন্দেহ।—হয় তো আর কিছু দিন পরে ইহার পরিসর বৃদ্ধি করিবার কথা উত্থাপিত হইবে? সমুদ্রদিয়া পোর্ট সায়েদের নিকটবর্ত্তী হইলে দেখা যায় যে, সারি সারি জাহাজ দাঁড়াইয়া আছে এবং বন্দর ও খালের ভিতর প্রবেশ করিবার কখন্ তাহাদিগের পালা আইসে তাহারই জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। কোম্পানির নিয়মানুসারে সকল জাহাজ একত্র খুলিয়া যাইতে পারে না—একটি জাহাজের পর আর একটি পর্য্যায়ক্রমে খুলিয়া দিতে হয়। আবার বিপরীত দিক হইতে কোন জাহাজ আসিলে কোন কোন স্থানে অপর দিকের জাহাজকে কিছুকাল থামিতে হয়। সুয়েজ খালের বাণিজ্যবিবরণে দেখা যায় যে ৩৩টা জাহাজ এক দিনের মধ্যে খালের মধ্য দিয়া গিয়াছে। ২৭ জুলাই ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৪৩২টা জাহাজ খালের হয় এ দিক নয় ও দিক হইতে যাতায়াত করিতে দেখা গিয়াছে। যে সকল জাহাজ খাল দিয়া যাতায়াত করে তাহার অধিকংশই ইংরাজদিগের। যদি সর্ব্বশুদ্ধ ২৫টা জাহাজ হয় তবে তন্মধ্যে ১৮টা ইংরাজদিগের হইবে। ফলতঃ যে জাতির গবর্ণমেণ্ট খালের প্রস্তাবটিকে একেবার ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন সেই জাতিই এক্ষণে খালের অধিক ব্যবহার করিতেছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যে সকল জাহাজ খালের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে তন্মধ্যে ইংরাজদিগের ৮১০—ফরাসিস্‌দিগের ৮৩ ও অষ্ট্রীয়দিগের ৭০। এবং অন্যান্য জাতীয়দিগের অপেক্ষাকৃত অনেককম। এই সুয়েজের খালে ইংরাজদিগের বাণিজ্যের কত সুবিধা হইয়াছে তাহা লেসেপ্ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন 'মনে কর একটি জাহাজ বোম্বাই হইতে ছাড়িয়া সুয়েজখাল দিয়া লিবরপুলে আসিয়া উপনীত হইল এবং সেখানে তাহার তুলার বোঝাই নামাইয়া দিল। তখনই সেই তুলা মানচেষ্টারে চালান হইয়া কাপড়ে পরিণত হইয়া আসিল। ৯ দিন পরে সেই একই জাহাজ ঐ কাপড়ের বোঝাই লইয়া সুয়েজ খালের পথ দিয়া আবার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিল। এইরূপে দেখা গিয়াছে যে ৭০দিনের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে তুলা লইয়া তাহাকে কাপড়ের আকারে পরিণত করিয়া আবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া পাঠান যায়।” এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের কোন বিপদ হইলে এখান হইতে সিপাহিসৈন্য শীঘ্র চালান করিবার পক্ষে খালের পথ কেমন উপকারী তাহা এইবার বেশ দেখা গিয়াছে।

প্রথমে যখন খালের প্রস্তাব হয় তখন ৪ কোটি টাকা ইহার আনুমানিক ব্যয় নির্দ্ধারিত হয়—কিন্তু এক্ষণে ইহার নিয়মিত খরচ দ্বিগুণ পড়িয়া গিয়াছে—এতদ্ব্যতীত সুয়েজ বন্দর প্রভৃতিতে ইজিপ্টের অনেক ব্যয় হইয়াগিয়াছে। অংশ (share) দ্বারা এবং কর্জ করিয়া যে মূল ধন উঠান হয় তদ্ব্যতীত খাল পরিস্কার রাখিবার জন্য কর্দ্দম উঠাইতে ও খালের পাড় প্রস্তরাদির দ্বারা বাঁধাইতে বিপুল অর্থ অজস্র ব্যয় হইতেছে। বিশেষত পোর্ট সায়েদে খালের মুখ পরিস্কার করিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হয়। কারণ নীলনদ হইতে কর্দ্দমস্রোতে পরিচালিত হইয়া সমুদ্রের এই ভাগে আসিয়া সঞ্চিত হয়, এবং উত্তরের বাতাসে উহা তীরে নিক্ষিপ্ত হয়। এই সমস্ত কারণে নিজ খালের ব্যবসায়ে তেমন লাভ নাই—এই খালের পথটি উন্মুক্ত হওয়ায় অন্যান্য সাধারণ বাণিজ্যের যে প্রভূত উন্নতি হইতেছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং এই মহৎ উপকারের জন্য পৃথিবীর তাবৎ জাতিকেই সেই ফরাসিস মহাপুরুষ লেসেপ্‌কে অগণ্য নমস্কার করা উচিত।

কেন ভালবাসি।

আজ যদি চন্দ্রলোক হইতে কোন বীর পুরুষ আসিয়া সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেন, এবং সর্ব্বত্র এই কঠোর নিয়ম প্রচার করেন যে, সকল দেশের সকল প্রকার সাহিত্য হইতে প্রণয়ের কথা, প্রণয়ের কল্পনা, প্রণয়ের ব্যাপার মুহূর্ত্তমধ্যে অগ্নিসাৎ করিয়া ফেলিতে হইবে,—তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সমস্ত ভূলোকের সাহিত্যের অবস্থা কি হয়? তাহা হইলে মুহূর্ত্ত মধ্যেই কি এই বিশ্বব্যাপী সাহিত্যক্ষেত্র একেবারে উত্তপ্ত বালুকাময়ী মরুভূমিতে পরিণত হয় না? তাহা হইলে বাল্মীকি, হোমর, সেক্সপিয়ার,কালিদাস আর কি উপলক্ষও করিয়া অনন্ত জীবনের আশা করিতে পারেন? তাহা হইলে এই ভাবনাময়, এই যাতনাময় সংসারের মধ্যে মানবমণ্ডলী আর কোথায় গিয়া ক্ষণকালের জন্যও সন্তপ্ত হৃদয় সুশীতল করিবে? কিন্তু সেই বীরপুরুষ নিষ্ঠুরতায় এইরূপে অভ্যস্ত হইয়া যদি তাহার পর এই নিয়ম সর্ব্বত্র প্রচার করেন যে যদি কোন দেশে কোন স্ত্রীপুরুষ কোন সময়ে প্রণয়ের কথা কহে, বা প্রণয়ের চিন্তা মনে আনে, তাহাকে সেই দণ্ডেই ভস্মসাৎ করা হইবে—তাহা হইলে এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থা কি হয়? তাহা হইলে অসভ্য হটেণ্টট্ জাতি হইতে সুসভ্য আর্য্যজাতি পর্য্যন্ত দাহ-ভয়ে কোথায় অজ্ঞাতবাসে কাল হরণ করে? স্বর্গের দেবতা হইতে পাতালের অপ্সরা পর্য্যন্ত, সর্ব্বত্যাগী উদাসীন হইতে দারুণ সংসারী ব্যক্তি পর্য্যন্ত কত লোকের দেহাবশেষ ভস্ম যে কি ভয়ানক স্তূপাকৃত হয়

তাহা কল্পনাতেও ধারণা করা যায় না। যে প্লেটো তাঁহার কল্পিত সাধারণতন্ত্র হইতে কবিমাত্রকেই নির্ব্বাসিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাঁহাকেই ত সর্ব্বাগ্রে দগ্ধ হইতে হয়। ক্রমে বিশ্ব-বিজয়ী সেকেন্দরসা, সিজার, নেপোলিয়ন, ক্রমে ধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদ ও চৈতন্যদেব, ক্রমে মহাকবি সেক্সপিয়ার, দান্তে, ট্যাসো, সকলকেই সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়। কিন্তু যখন সেই চন্দ্রলোকের বীরপুরুষ দেখিবেন যে শত শত নরনারী আগ্রহের সহিত এবং উল্লাসের সহিত সেই প্রদীপ্ত অনলস্তম্ভকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছে, যখন তিনি দেখিবেন যে শত শত রমনীরত্ন সেই দারুণ অগ্নিশয্যাকে কুসুমশয্যা জ্ঞান করিয়া তাহাতে শয়ান হইয়া সহচরীবর্গকে উৎসব-ধ্বনিতে দিক্‌মণ্ডল বিদারিত করিতে বলিতেছে, এবং মন্দীভূত অগ্নিস্তম্ভে অমোঘ আহুতি প্রদানে উৎসাহ দিতেছে—তখন কি সেই বীরপুরুষ মুহূর্ত্তের জন্যও স্তম্ভিত হইয়া পড়িবেন না? কিন্তু যদি তিনি সেই উন্মত্ত নরনারীর মধ্যে কাহাকেও জিজ্ঞাসা করেন যে কেন তুমি অন্যের জন্য এই রূপে অবলীলাক্রমে আত্মবিসর্জ্জন করিতেছ, সে ব্যক্তি এইমাত্র বলিতে পারিবে যে প্রেমের মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াই আমি আজ আত্মবিসর্জ্জন করিতেছি। কিন্তু যদি তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন কেন তুমি সে মোহমন্ত্রে মুগ্ধ হইলে, তাহা হইলে সে ব্যক্তিকে ক্ষণকালের জন্যও নিরুত্তর হইতে হইবে। মনে কর সেই চন্দ্রলোকবাসী পুরুষ এই উদ্দীপ্ত কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য সকল সময়ের প্রকৃত ও কল্পিত প্রণয়ী ও প্রণয়িনী একত্রিত করিলেন, এবং প্রেম-বিহ্বলা রত্নাবলীকে সকলের সমক্ষে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন তুমি রাজা উদয়নের জন্য আত্মঘাতিনী হইতে গিয়াছিলে?"

রত্নাবলী। আমি যে ভয়ানক যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য আত্মঘাতিনী হইতে গিয়াছিলাম তাহা মনে করিতে গেলে এখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমি অজ্ঞাত-কুলশীলা সামান্য নারী হইয়াও রাজা উদয়নের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। সেই ঘোর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে গিয়াছিলাম।

চন্দ্রলোকবাসী। কিসের জন্য তুমি রাজা উদয়নের প্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলে? তুমি কি তাঁহাকে রাজা বলিয়া, বা অননুরূপ রূপবান বলিয়া বা অদ্বিতীয় গুণবান বলিয়া মনে মনে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলে?

রত্নাবলী। আমি যখন তাঁহাকে প্রথমে সেই মধুমাসে মদনোৎসবের দিন লতামণ্ডপে দেখিতে পাইলাম, তখন আমি জানিতাম না যে তিনিই রাজা উদয়ন,—আমি তখন জানিতাম না যে তাঁহার কোন গুণ আছে অথবা কোন গুণই নাই। আমি তাঁহার অলৌকিক রূপরাশি দেখিয়াই তাঁহাকে সাক্ষাৎ অনঙ্গদেব মনে করিয়াছি-

জাম। কিন্তু সে দেবভক্তি ক্ষণস্থায়ী-মাত্র, কারণ তথনই তাহা মর্ম্মান্তিক অনুরাগে পরিণত হইল, এবং প্রথমে আমি যাঁহাকে দেবতাভাবে প্রণাম করিয়াছিলাম, পরক্ষণেই তাঁহাকে মনুষ্যভাবে হৃদয়মন উৎসর্গ করিলাম।

চন্দ্রলোকবাসী। তুমি কেমন করিয়া বুঝিতে পারিলে যে তাঁহাকে উদয়ন বলিয়া না জানিয়াও তোমার দেবভক্তি ক্ষণমধ্যেই মনুষ্যপ্রেমে পরিণত হইল?

রত্নাবলী। তাঁহাকে প্রণাম করিয়াই আবার তাঁহাকে দেখিতে মন উৎকণ্ঠিত হইতে লাগিল, যত দেখি কিছুতেই নয়নের তৃপ্তি হয় না, অথচ কেহ আমাকে পাছে সেই অবস্থায় দেখিতে পায়, পাছে কেহ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারে, এই ভয়ে আমি আস্তে আস্তে সেস্থান হইবে প্রস্থান করিলাম। দেবভক্তিতে এত লজ্জা হইবে কেন?

চন্দ্রলোকবাসী।—তবে তুমি কি কেবল রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রেমের শিখায় হৃদয় দাহ করিয়াছিলে?

রত্নাবলী। তা ব্যতীতই বা আর কি বলিব? যখন রাজা বলিয়া জানি না, যখন তাঁর গুণ গরিমার কথা কিছুই জানি না, তখন কেবল এক অলৌকিক রূপরাশি দেখিয়াইত আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছিলাম।

চন্দ্রলোকবাসী। কেবল রূপেই কি তবে প্রেমের উদ্দীপন হয়?

রত্নাবলী। গুণ দেখিয়া শ্রদ্ধাভক্তি হইতে পারে, পদ বা পদবী দেখিয়া মনে সম্মান ভাবের উদয় হইতে পারে, কিন্তু রমণী-হৃদয় কেবল রূপেতেই বশীভূত হইয়া পড়ে। শুনিতে লজ্জাকর বটে, কিন্তু শকুন্তলা, মালতী প্রভৃতি অন্য অন্য সুপ্রতিষ্ঠ নারীকে জিজ্ঞাসা কর, আমার কথা সত্য কি না।

তখন ডেস্‌ডিমোনার সহচরী এমিলিয়া চন্দ্রলোকবাসী বীরপুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে বীরশ্রেষ্ঠ! আমি সিংহলদুহিতা সাগরিকার কথা কখনই শিরোধার্য্য করিতে পারিব না। রূপরাশিতে যে প্রেম উদ্দীপিত হয় তাহা ত অস্থিচর্ম্মগত পার্থিব প্রেম। রূপদৃষ্টিতেই সে প্রেমের উদয় হয় এবং রূপের অবসানেই সে প্রেমের অবসান হয়। যদি কেবল রূপরাশিতেই প্রেম উদ্দীপন হইত তাহা হইলে দেবী বীনস্ পর্য্যন্ত কেন এডনিসের প্রেমে নিরাশ হইয়া আপনাকে নিতান্ত হতভাগিনী জ্ঞান করিয়াছিলেন? তাহা হইলে উপদেবী ক্যালিপ্সো কেন ঘোর প্রেম-বিহ্বলা হইয়াও ইউলিসিস্ বা টেলিমেকস্‌কে আপনার রমণীয় দ্বীপে রাখিতে পারিলেন না? রূপরাশিতে নয়নের তৃপ্তি হইতে পারে, কিন্তু গুণ না দেখিলে মনের তৃপ্তি কিরূপে হইবে? আমার প্রিয়সখী ডেস্‌ডিমোনাকে জিজ্ঞাসা কর যে তিনি ওথেলোর কি রূপরাশি দেখিয়া বিনিস্ নগরের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রাজপুত্রদিগকে অবলীলাক্রমে পরিহার পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনে আলিঙ্গন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন? কোথায় গোলাপ-কলিকা-সমাকি-

সম বিনিসের রাজপুত্রগণ, আর কোথায় ভীষণরূপ মিশরদেশীয় পিশাচ-মূর্ত্তি! কিন্তু কে আজ সাহস করিয়া বলিতে পারে যে রত্নাবলী বা শকুন্তলার অনুরাগের অপেক্ষা ডেস্‌ডিমোনার অনুরাগ নিষ্প্রভ বা হীনপদবীগত। আমার কথায় রত্নাবলী বা শকুন্তলা চমৎকৃত হইলেও হইতে পারেন, কেননা তাঁদের দেশের কোন কবিই আজও পর্য্যন্ত কুৎসিত ব্যক্তিকে মর্ম্মগত ভালবাসার পাত্র রূপে প্রচার করিতে সাহস পান নাই। সংস্কারের বা অলঙ্কার শাস্ত্রের বশীভূত হইয়া তাঁহারা নায়কনায়িকা মাত্রকেই অলৌকিক রূপরাশি সম্পন্ন করিতেই বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। ইহা কি প্রকৃতির নিয়মের ব্যভিচার নহে?

চন্দ্রলোকবাসী। আমার বোধ হইতেছে যে পাশ্চাত্য প্রেমের গৌরব রক্ষা হেতু পূর্ব্বদেশীয় প্রেমের উপর তোমার কটাক্ষপাৎ নিতান্ত অন্যায়। রূপজাত প্রেম অস্থিচর্ম্মগত হউক বা না হউক, পাশ্চাত্য প্রেমের ইতিবৃত্তে সে প্রকার প্রেমেরও ত ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়। রোমিও এবং জুলিয়েটে, ফরডিনাণ্ড এবং মিরাণ্ডাতে কি সূত্রে প্রণয় সংঘটন হইল? প্যালামান্ এবং আরসাইটিতে বিবাদ হইবার কারণ কি? আবার, গুণে মুগ্ধ হইবার দেদীপ্যমান উদাহরণও ত কুমারসম্ভবেই রহিয়াছে। পর্ব্বতরাজদুহিতা যে তরুণবয়সে মহাদেবের আশায় অতি কঠোর তপস্যায় দেহমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি মহাদেবের রূপের পক্ষপাতিনী হইয়া করিয়াছিলেন? বৃদ্ধ বিরূপাক্ষ পঞ্চাননের গুণেই কি তিনি মুগ্ধ হইয়া ঐ কঠোর ব্রতে ব্রতী হন নাই? দময়ন্তী কি বিদর্ভপতি নলের গুণকীর্ত্তন শ্রবণেই বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে মাল্যদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন নাই। তবে পূর্ব্বাঞ্চলে গুণজাত প্রেমেরই বা অল্পতা কোথায়? আর গুণই যে প্রেমের নিয়ত ও অব্যবহিত কারণ তাহা নিশ্চয় কিরূপে বলিতে পারি?

স্যাফো। সত্যই ওকথা কখন নিশ্চয় বলা যায় না, কেননা স্ত্রীলোকদের মধ্যে আমার মত অদ্বিতীয় কবি পৃথিবীতে আর কে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু সেই আমিই আবার ফেয়নের প্রেমে নিরাশ হইয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া মৃত্যুকে ইচ্ছাপূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। যদি বল স্ত্রীলোক সহজেই হতভাগিনী, সুতরাং গুণের প্রকৃত আকর্ষণী শক্তি থাকিলেও পাত্রবিশেষে তাহার বিঘ্ন হয়—স্বীকার করিলাম; কিন্তু তাহা হইলে ইটালির জগদ্বিখ্যাত কবি ট্যাসো ও পিট্রার্ক কেন চিরকাল এক জন লিয়নোরা ও অপরটি লরার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া দেহপাত করিয়া ছিল?

চন্দ্রলোকবাসী। মনে কর যে কেবল রূপ বা কেবল গুণ প্রেমের নিত্য কারণ নহে। তবে একথার বোধ হয় অন্যথা নাই যে রূপ এবং গুণ উভয়ই একত্রিত হইলে প্রেম উদ্দীপন করিতে পারে।

টিটানীয়া। উহাও একটি ভুল সংস্কার।

রূপগুণের সমষ্টিও প্রেমের নিত্য কারণ নহে। বিখ্যাত মিলটনের জীবনী দেখিলে তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইবে। প্রকৃত প্রস্তাবে কথাটি এই যে, কেবল রূপ বা কেবল গুণ বা রূপগুণের সমষ্টিরও সহিত প্রেমের নিত্য সম্বন্ধ কিছুই নাই। আমি আমার নিজের জীবনগত ঘটনা হইতে তাহা সপ্রমাণ করিতে পরি। আমি পরীদিগের মহিষী, আমার নাম টিটানীয়া। আজন্ম আমি কখন মেঘে চড়িয়া, কখন চন্দ্ররশ্মি অবলম্বন করিয়া, কখন পতনশীল নক্ষত্র ধরিয়া শূন্যে শূন্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। মর্ত্ত্যলোকের কুঞ্জে কুঞ্জে বিচরণ করি এবং নদীর তরঙ্গদোলায় দুলিতে দুলিতে চারিদিক প্রদক্ষিণ করি। অনেক দিন হইল আমি এথেন্স্ নগরের একটি নিভৃত কুঞ্জে নিদ্রিত আছি—জনপ্রাণী কেহই সেখানে নাই। এই অবস্থায় সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র আমি দেখিলাম আমার পার্শ্বে প্রকৃত গর্দ্দভের মুখসে আবৃতমুখ এক জন পথিক বসিয়া একটি গ্রাম্যগীত মহাকোলাহল করিয়া ভগ্নস্বরে গাহিতেছে। তাহার গানেই আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল।—জানি না মনের কি ভাববশতঃ, হৃদয়ের কি উচ্ছ্বাসবশতঃ, অনঙ্গের কি মোহমন্ত্রবশতঃ আমি সেই পথিককে দেখিয়াই তাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িলাম। অবলাজাতির স্বাভাবিক লজ্জা ত্যাগ করিয়া,আমি মুক্তকণ্ঠে তাহাকে বলিলাম"হে ধীর মর্ত্ত্যবাসি! পুনরায় তোমার ঐ গীতটি গাও,কারণ তোমার রূপে আমার নয়ন যে রূপ বিমোহিত হইয়াছে, তোমার স্বরে আমার কর্ণও সেই রূপ মুগ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিকই তোমার রূপগুণে আমি এত দূর মুগ্ধ হইয়াছি যে এই প্রথম সাক্ষাতেই তোমাকে শপথ করিয়া না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে আমি তোমাকে ভালবাসি।" এই রূপে আমি তাঁহার রূপগুণের পক্ষপাতিনী হইয়া কত প্রকার বিভ্রম বিলাসে যে সময় অতিবাহন করিতে লাগিলাম, তাহার সেই সলোম গর্দ্দভমুখমণ্ডলে কতই যে চুম্বন-বৃষ্টি করিতে লাগিলাম, এবং তাহার সেই সুদীর্ঘ কর্ণদ্বয়ে কতই যে মালতী-মালা ঝুলাইতে লাগিলাম তাহা আর কি বলিব। পরে আর একবার নিদ্রার পর উঠিয়া দেখি যে আমার সে প্রেমের ভাব অবসান হইয়াছে। তখন গর্দ্দভমুখকে গর্দ্দভমুখ বলিয়া বোধ হইল, এবং লজ্জায় পরীসমাজে মুখ দেখাইতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম। আমার এ সকল গোপনীয় কথা জগতে কেহই কখন জানিতে পারিত না, কেবল কুটিলমতি অথচ সর্ব্বদর্শী সেক্‌সপিয়ারই আমাকে জগৎসমীপে অপ্রতিভ করিয়া ফেলিয়াছেন। সুরলোকে আমি তাঁহার সঙ্গে বিস্তর ঝগড়া করিয়া ছিলাম, কিন্তু তিনি বলিলেন "তোমার কথাতে মর্ত্ত্যলোকের অনেক নরনারীর কথাই প্রচার করা হইয়াছে, সুতরাং তোমার মত সকলেই যদি অপ্রতিভ হয় তাহা হইলে মর্ত্ত্যলোকও সুরলোক হইবে।" আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে মর্ত্ত্যলোকের অনেকে কেনই বা আমার মত অবস্থায় পড়িবে, কেননা নিদ্রাবস্থায় আমার চক্ষে

একটি দুষ্ট পরী একপ্রকার কুসুমরস লিপ্ত ড়াইয়া দিয়াছিল, তৎপ্রভাবেই নিদ্রাভঙ্গে আমি সেই বিকৃত পথিকের প্রেমে মুগ্ধা হইয়া পড়িয়াছিলাম,কিন্তু মর্ত্ত্যলোকে কেহই হয়ত সে ফুলটির নাম বা গুণ কিছুই জানে না, সুতরাং আমার মত তাহাদের অবস্থা হইবার সম্ভাবনাই নাই। তাহাতে তিনি বলিলেন যে "সে ফুলের নাম সকলে জানুক বা নাই জানুক, কিন্তু তাহার রস প্রায় সকল মানব-হৃদয়েই রক্তের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গিত হয়।" বাস্তবিক্ আমি সমস্ত ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম যে সেক্স্‌পিয়ার যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর কেহ দ্বিরুক্তি করিতে পারে না। তিনি সমস্ত প্রকৃতির সূক্ষ্ম টীকাকার, তাঁহার অমোঘ বাক্যের অন্যথা নাই। আমি কত স্থানে যে অযথাস্থলে প্রণয় সংস্থাপন দেখিয়াছি তাহা বলিবার নহে। দেখিয়াছি কত শত লোক চারুচন্দ্রাননার মুখের পানে না চাহিয়াও বিকট বদনার হস্তে এবং কত শত নারী অতুল-রূপ-গুন-সম্পন্ন লোকের ভালবাসায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া অপেক্ষাকৃত বর্ব্বরের হস্তে হৃদয় প্রাণ সমর্পণ করিতেছে। বাস্তবিক, যাহারা কখন প্রকৃত প্রস্তাবে বিমল অপার্থিব প্রেমে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা আপনা আপনি অবশ্যই অনেকবার আপনাকেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে—"কেন ভাল বাসি?" কিন্তু কথনই বোধ হয় হৃদয় হইতে প্রকৃত উত্তর পায় নাই। হয় ত এই উত্তর পাইবে "অমন রূপলাবণ্যে কে না মুগ্ধ হয়"—কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি প্রেম-উদ্দীপনের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে তাহার প্রণয়পাত্র অপেক্ষা অন্য কাহারো শতসহস্রগুণ রূপলাবণ্য দেখিত, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কি সরল হৃদয়ে বলিতে পারিত—"আহা, উহাকে আগে দেখিলে আর ইহাকে ভাল বাসিতাম না" কিম্বা "ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া উহারি শরণাপন্ন হই।" কখনই না। নীচপদবীগত লালসার স্থল ব্যতীত প্রকৃত প্রণয়স্থলে ওরূপ ভাব কাহারও মনে উদয় হইতে পারে না। তবে এটুকু অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, সকল স্থলে রূপলাবণ্যে প্রেমের উদ্দীপন না হইলেও, প্রেমের উদ্দীপন হইলে সকল স্থলে রূপলাবণ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভালবাসার অপেক্ষা কৌশলশীল চিত্রকর আর কোথাও নাই—সেক্সপিয়র বলেন যে প্রকৃত প্রণয়ী মিসরদেশীয় পিশাচী মূর্ত্তিতে হেলেনের সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। যদি জগৎশুদ্ধ লোক সেই প্রণয়ীর রুচির নিন্দা ঘোষণা করে, যদিও সকলে প্রত্যক্ষ প্রমাণে তাহাকে দেখাইয়া দেয় যে নিবিড় জলদখণ্ড কখন শতদলসমষ্টি হইতে পারে না, এবং বিকট দশনশ্রেণী কখন মুক্তাপংক্তি হইতে পারে না, তখন সেই ব্যক্তি প্রত্যক্ষপ্রমাণে একান্ত পরাজিত হইয়া শেষে এই বলিবে যে "অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধরিয়া প্রকৃত সৌন্দর্য্য হয় না,—আমার প্রণয়িনীর শ্রী ও লাবণ্য লোকাতীত।"—একথার আর উত্তর নাই, কেন না তাহার কথায় অর্থান্তর এই যে আমি উহাকে ভালবাসি, এবং তোমরাও যদি আমার মত উহাকে ভালবাসিতে,

তাহা হইলে তোমরাও উহার শ্রী ও লাবণ্য দেখিতে পাইতে। এমন কি,—যদি কেহ বলে "তোমার প্রণয়িনীর মুখশ্রী সুন্দর বটে, কিন্তু যদি চক্ষুদুটি আরও একটু বিশাল হইত, তাহা হইলে অতি উত্তম হইত," প্রণয়ী অমনি আগ্রহের সহিত উত্তর করিবে "তোমার ঐটি ভুল, কেন না ঐ মুখে ঐ চক্ষুই অতিশয় মানানসই হইয়াছে—উহা আবার ঈষৎমাত্র দীর্ঘ হইলেই মুখশ্রীর একেবারে সর্ব্বনাশ হইত।" কিন্তু সেই ভালবাসা ক্রমে যখন অবসান হয়, প্রণয় যখন তাহার মোহময় দর্পণখানি সরাইয়া লয়, তখন সেই প্রণয়িনীর সেই মুখেই সুরুচি আসিয়া যে কত দোষ দেখাইয়া দেয় তাহা আর বলা যায় না। প্রকৃত কথা এই যে, সহস্র তন্ত্রসম্পন্ন হৃদয়বীণার কোন্ তারে কখন কি প্রকার আঘাত লাগিলে যে প্রণয়ের তার বাজিয়া উঠে তাহা বলা অতি সহজ নহে। উর্ব্বশীকে পুরূরবা দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। উর্ব্বশী অমনি তাঁহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কেন,পৃথিবীতে কেহ কি আর কাহারো উপকার করে না? উপকার করিলে কৃতজ্ঞতার উদয় হইবে, কিন্তু প্রেমের সঙ্গে কৃতজ্ঞতার নিত্য সম্পর্ক কোথায়? আহত আইভানহোর রোগশয্যায় রেবেকা তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে করিতে দয়া ও মমতায় আর্দ্র হইয়া উঠিলেন—এবং দু একদিন অতীত না হইতেই ঘোর প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। কেন, পৃথিবীতে কেহ কি কাহারও রোগশয্যায় সেবাশুশ্রূষা করে না? এই ত গুণবতী ফ্লোরেন্স্ নাইটিঙ্গেল্ ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের পর রুসিয়াতে রুগ্নালয় হইতে রুগ্নালয়ে আহত সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষা করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু তিনি কয় জনের দুঃখে দুঃখী হইয়া শেষে প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন? মহাশ্বেতা সরোবরে স্নান করিতে গিয়া মুনিকুমার পুণ্ডরীকের সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া প্রেমের প্রমাদে পতিত হইলেন। কিন্তু সৌম্য-ঋষিমূর্ত্তি আর কেহ কি কখন দেখে নাই,—মহাশ্বেতারই মনে প্রেমের উদ্দীপন হইল কেন? সেকথা মহাশ্বেতাও জানেন না, কেননা তিনি আপনিই বলিয়াছেন "কি মুনিকুমারের রূপসম্পত্তি, কি যৌবনকাল, কি বসন্তকাল, কি সেই সেই প্রদেশ, কি অনুরাগ, জানিনা কে আমাকে উন্মাদিনী করিল।" অনেকে আবার বলেন, যে প্রেমের এমন এক আকর্ষণী শক্তি আছে যে এক জন আর এক জনকে ভালবাসিলেই, সেও সেই ভালবাসাতে মুগ্ধ হইবে। কিন্তু এরূপ প্রলাপবাক্য প্রকৃত প্রণয়ের ইতিবৃত্ত দ্বারাই খণ্ডন হইয়া যায়। আমরা পূর্ব্বেই স্যাফো, ট্যাসো, পিট্রার্ক, ইত্যাদি অনেক হতাস প্রণয়িদের উদাহরণ দিয়া দেখাইয়াছি যে প্রেমের বিনিময়ে প্রেম যে পাইতেই হইবে প্রকৃতির এমন কোন নিয়ম নাই। যে নেপোলিয়ন প্রায় সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন তিনিই আবার লুইসার প্রেমের একটি কণামাত্রও অধিকার করিতে সক্ষম হন নাই।

তবে কেন ভালবাসি? হৃদয়ের সকল উচ্ছ্বাস অপেক্ষা যে উচ্ছ্বাস মহাসমুদ্র অ-

পেক্ষাও বিশালতাময়, হিমালয় অপেক্ষাও মহৎভাবময়, এবং জ্যোৎস্না অপেক্ষাও কোমলতাময়, তাহার সহিত বহির্জগতের কোন পদার্থ বা কোন গুণেরই কি কোন প্রকার নিত্য সম্বন্ধ নাই? বাস্তবিকই, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে কিসের প্রভাবে যে ভালবাসার তন্ত্র বাজিয়া উঠে তাহা সহজে বুঝা যায় না। এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে রূপ-গুণ-বিশিষ্ট কত শতসহস্র লোক আছে, কিন্তু কেহই কি স্থির চিত্তে বলিতে পারে যে ঐ ব্যক্তিতেই আমার সমস্ত ভালবাসা অর্পিত হইবে, বা হইলেও হইতে পারে। কখনই নয়। তাহা হইলে ভালবাসার গরিমা থাকিত না। কখন কাহার সহিত কি রূপে প্রেমের মিলন হইবে তাহা কিছুই নির্দ্ধারিত নাই। সকলেই অনুভব করিয়া বুঝিতে পারেন যে সমস্ত দিন নানা বিষয়ক সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানা ভাবে, নানা আনন্দে মন তরঙ্গিত হইতে হইতে, হয়ত একটি গানে, হয়ত একটি গানের একটি পদে, হয়ত একটি পদের একটি কথাতে হৃদয়ের বীণা এমনি বাজিয়া উঠে, যে পুনঃ পুনঃ সেই গানটি শুনিতে মন লালায়িত হয়, ক্রমাগত শুনিয়াও শরীর লোমাঞ্চিত হয়, এবং গায়ক নীরব হইলেও গভীর নিশীথে যেন দিগন্ত হইতে অপ্সরাদের বীণাঝঙ্কারের সহিত সে গানের সুর-লহরী "কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিয়ে গো, আকুল করিয়ে দেয় প্রাণ।" সকলেই বোধ হয় অনুভব করিতে পারেন যে নানা কবির নানা কাব্য পড়িতে পড়িতে মনের অবস্থাবিশেষে এক জন সামান্য কবির কথাতেও মন এমন চঞ্চল হইয়া পড়ে, মরমের প্রত্যেক শিরা পর্য্যন্ত এমন বিকম্পিত হইয়া উঠে, যে শয়নে স্বপ্নে সেই কথাই যেন কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, এবং শয়নে স্বপ্নে সেই কথা গুলিই যেন ক্রমাগত আপনাআপনি উচ্চারিত না হইতে হইতে সমস্ত হৃদয় কোমল রসে দ্রবীভূত হইয়া যায়। সকলেই বোধ হয় অনুভব করিতে পারেন যে ঘোর ঝড়বৃষ্টিময় গভীর অন্ধকার রাত্রিতে নির্জনে বসিয়া বিগত বাল্যকালের আমোদপ্রমোদের সহস্র সহস্র কথা ভাবিতে ভাবিতে, মনের অবস্থা বিশেষে বিশেষ একটি আমোদের কথা মনে পড়িয়া হৃদয় এমনি আকুল হইয়া উঠে, যে মনে হয় বর্ত্তমানের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া যদি সেই বাল্যকাল ফিরিয়া পাই, অন্তত বাল্যকালের আমোদের সেই দিনটি ফিরিয়া পাই—অন্তত যদি সেই আমোদটুকু ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে জন্মশোধ চরিতার্থ হই। ভালবাসার প্রকৃতিও সেইরূপ। স্থানবিশেষে, কালবিশেষে, এবং আপনার মনের অবস্থাবিশেষে কি সূত্রে যে কেমন করিয়া প্রেমের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে তাহা নিরূপণ করিতে গিয়া বিহ্বল হইতে হয়। মহীসুর-পতি হাইদর আলি একটি দেশ অধিকার করিলে কোন কারণ বশতঃ তথাকার অধিবাসিদের উপর ক্রোধান্ধ হইয়া আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে হত্যা করিতে আজ্ঞা দেন। এই ভয়ঙ্কর আজ্ঞা

অর্দ্ধেক প্রতিপালিত হইতে না হইতেই তিনি সেই পুঞ্জীভুত নরমুণ্ডের মধ্যে একটী সুন্দর বালকের সদ্যচ্ছিন্ন মুণ্ড দেখিতে পান। তিনি তাহা অপেক্ষা শতগুণ সুন্দর মুখ দেখিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার তখনকার মনের অবস্থা বশতই হউক বা যে কারণেই হউক, সেই মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয় এতদূর বিগলিত হইয়া গেল যে তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার কঠোর আজ্ঞা রোধ করিয়া দিলেন। সেইরূপ এক জন, শতসহস্র রোরুদ্যমানা রমনীর মধ্য দিয়া অক্ষুণ্ণ ভাবে বিচরণ করিয়াও সহসা হয়ত একটী দীনবেশা বিজনবাসিনীর অশ্রুলহরীতে তাহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত প্রেম-প্রভাবে সিহরিয়া উঠিতে পারে। এক জনের সঙ্গে আজন্ম বাস করিয়াও, একত্রে ঘোর ঘনিষ্ঠ ভাবে বাস করিয়াও তাহার প্রতি সখ্যতা ব্যতীত আর কিছুই না হইয়া, এক জন নিতান্ত অপর ব্যক্তিতে হয় ত সহসা প্রেমের সমস্ত অনুরাগ অর্পিত হইতে পারে। আবার সেই চিরসহচর বা চিরসহচরীর সঙ্গে আজন্ম সখ্য ভাবে বাস করিয়া হয় ত কোন এক সময়ে, মনের কোন এক বিশেষ অবস্থাতে তাহার কোন কার্য্য, কোন ভাব, কোন কথা,—তাহার করুণ কটাক্ষ বা সরল হাস্য এমন অভাবনীয় রূপে হৃদয়াকাশে প্রেমের জ্যোৎস্না বিকাশ করিয়া দেয় যে, সে সময়ে বা সে স্থলে "কেন ভাল বাসি"—রূপ প্রশ্নটী নিতান্ত রহস্যময় প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়।

তুকারাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তুকারামের জীবন-বৃত্তান্ত লিখিবার এক সুবিধা এই যে, তাঁহার জীবনের অনেক গুলি ঘটনা তাঁহার স্বরচিত কবিতাবলীর মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি স্বকীয় জীবনচরিত নিজ হস্তেই এক প্রকার লিখিয়া রাখিয়াছেন, কেবল উপযুক্ত বিষয় সকল বাছিয়া লইলেই হইল। তুকারাম শত্রুর সহিত মিত্রবৎ আচরণ করিয়া কিরূপে ক্রোধ জয় করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখাইয়াছি—শিবাজীর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি আপনাকে নির্লোভ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন,—সুদুর্জয় কামরিপুও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে নাই, কিন্তু সে সংগ্রামেও তিনি জয়ী হইয়াছিলেন, তাঁহার অভঙ্গেই তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। একটী তরুণবয়স্কা রূপবতী রমণী তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল। এক দিন বিরলে সে আপনার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে তুকারাম যে উত্তর দেন তাহা এই দুই অভঙ্গে দৃষ্ট হইবে—

৫২৩

স্ত্রীসঙ্গ চাহি না দেব শুষ্ক তরু এ যে—
এ পাষাণ দেহ,
বল তাহে স্ত্রীসঙ্গ কি সাজে ?
তাহে আত্ম বিস্মরণ,
ভজন সাধন সব ঘুরে যায়।
ঘোর সে লালসা,
মজালে সহসা, রক্ষা পাওয়া দায়।
তাকানো সে মুখপানে মৃত্যুর সমান।
কামিনী লাবণ্য যেন দুঃখের নিদান :
তুকা কহে "সাধু হয় যদিও আগুন—
কাছে গেলে দহিবে সে, এই তার গুণ।"

৫২৪

পরস্ত্রীকে দেবপত্নী রুক্মিণী সমান।
এ দড় বিশ্বাস মোর, ইথে নহে আন।
যাও মা কি দিব তোরে কিবা মোর আছে,
বিষ্ণুদাস আমরা গো কেন কষ্ট মিছে ?
এ তব দুর্দ্দশা হেরি হৃদি দহে দুখে,
ছি ছি ছি ওকথা আর আনিও না মুখে।
তুকা কহে "হে সুন্দরি, পতি যদি চাও,
প্রণয়ী কতই পাবে, কেন তবে আমারে মজাও।"

তুকারামের চৌদ্দ জন শিষ্য ছিল—তাহাদের মধ্যে অনেকেই রামেশ্বর ভট্টের ন্যায় প্রথমে তাঁহার বিদ্বেষী, অবশেষে তাঁহারে গুরুরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার পদানত হইয়াছিল। এই শিষ্যবর্গের মধ্যে শিবাজী নামে লোহগ্রামবাসী এক জন কাংস্যকার ছিল। এই রূপ কথিত আছে যে, সে অত্যন্ত কৃপণ ও তুকারামের এক জন দ্বেষ্টা ছিল, কিন্তু কালক্রমে সে এরূপ তুকাভক্ত হইল যে, সকল কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া সেই সাধুর সহবাসে দিনপাত করাই তাহার এক মাত্র ব্যবসায় হইল। কাংস্যকারের স্ত্রী স্বীয় পতির এই রূপ ভাব পরিবর্ত্তনে রুষ্ট হইয়া তুকারামকে এই অনিষ্টের প্রতিশোধ দিতে কৃতনিশ্চয় হইল। সে এক দিন তুকারামকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক আপনার গৃহে আনাইয়া স্নানের সময় এমন উষ্ণজল তাঁহার গাত্রে ঢালিয়া দিল যে তাহাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর দগ্ধ হইয়া গেল, এবং তিনি জ্বালা নিবারণের জন্য কাতর স্বরে বিঠোবার স্তুতি আরম্ভ করিলেন। এই অগ্নিপরীক্ষাকালে তুকারামের অসামান্য ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা দেখিয়া কাংস্যকারপত্নীর কঠিন হৃদয়ও দ্রবীভূত হইল, এবং সেও তাহার পতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া তুকারামের সেবায় নিযুক্ত হইল।

তুকারামের প্রতি সময়ে সময়ে যে এই রূপ কত অত্যাচার আচরিত হইত, তাহার অসংখ্য উদাহরণ দৃষ্ট হয়, কিন্তু প্রায়ই অত্যাচারকারী দুষ্টদিগের অভীষ্ট সিদ্ধিতে কোন না কোন ব্যাঘাত জন্মিয়াছে। এক দিন তুকারামের সঙ্কীর্ত্তন শুনিতে দুই জন পণ্ডিতাভিমানী সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। তুকারামের হরিনামকীর্ত্তন তাঁহাদের রুচিকর হয় নাই—তাঁহারা রোষপরবশ হইয়া মহারাজ শিবাজীর শিক্ষক* পুনার দাদোজী কোণ্ড-

* দাদোজী কোণ্ডদেব মহারাষ্ট্রপতি শিবাজীর পিতা সাহাজীর একজন বিশ্বাসী ভৃত্য ও সুদক্ষ রেবেনিউ কর্ম্মচারী ছিলেন। শিবাজী লিখন পঠনে কখনই নিপুণতা লাভ করেন নাই, এমন কি, তিনি নাম স্বাক্ষর পর্য্যন্ত করিতেও অক্ষম ছিলেন। কিন্তু

দেবের নিকট তুকার বিরুদ্ধে এই বলিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিলেন যে দেখুন তুকারাম শূদ্র হইয়া বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে—অজ্ঞ ভাবুক জনেরা তাহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেছে, ব্রাহ্মণেরাও শূদ্রের পদে প্রণিপাত করিতে সঙ্কুচিত হইতেছে না, এ কি অন্যায় কথা—এখনি তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন। দাদোজী বিজ্ঞ ও চতুর ছিলেন; তিনি ঐ দুই সন্ন্যাসীকে বলিলেন আপনারা তাঁহার সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া যদি বাদানুবাদে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন তাহা হইলেই তাঁহার উচিত শাস্তি হইবে। এই বলিয়া তুকারামকে পূণায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত একত্রিত হইলেন। সকলেই তাঁহাকে সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিল। দাদোজী সন্ন্যাসীদের কথা না মানিয়া তুকারামের সহিত সাক্ষাৎ করত তাঁহাকে আদরের সহিত নগরে লইয়া আইলেন। তথায় সংকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সন্ন্যাসীরা কীর্ত্তনে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তুকার ভাব ও ভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং দাদোজী তাহাদিগকে তীব্র তিরস্কাররূপ দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিয়াদিলেন।

ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের একটী রোগ এই যে প্রথম প্রথম তাঁহারা এক ভাবে ধর্ম্মোপদেশ আরম্ভ করেন। কালসহকারে তাঁহাদের স্বর্গীয় ভাবের সহিত পৃথিবীর ধূলি মিশ্রিত হইয়া তাঁহাদের ভাবপরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। পৃথিবীর নামাঙ্কিত ধর্ম্মনেতাদের জীবনবৃত্ত পাঠে যতদূর জানা যায় তাহাতে এই দৃষ্ট হয় যে, প্রথমে তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে ব্রতী হন, ক্রমে যেমন তাঁহাদের খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তার হয় ও শিষ্যসংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, তেমনি তাঁহারা তাঁহাদের উচ্চ লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া লোকদিগকেও বিপথগামী করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের দৃষ্টি আপনার প্রতি নিপতিত হয়—তাঁহাদের অনুরাগপূর্ণ সরল চিত্তে অল্পে অল্পে ধূর্ত্ততা ও ভণ্ডামি প্রবেশ করে—ঈশ্বরের সিংহাসন তাঁহারা নিজে অধিকার করিতে উদ্যত হন—ঈশ্বর হইতে লোকের হৃদয় মন কাড়িয়া লইয়া আপনার দিকে তাহা আকৃষ্ট করিতে সচে-

---

ধনু-র্বিদ্যা, বল্লম চালনা, তলবার খেলা, অশ্বারোহণ প্রভৃতি ব্যায়াম কার্য্যে তিনি বিলক্ষণ কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি রাজকার্য্য ও শাস্ত্রোক্ত আচার ব্যবহারে কুশলতা লাভ করিয়াছিলেন। রামায়ণ মহাভারত ও পৌরানিক ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ জন্মিত, এবং তিনি কথকতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, এমনকি, তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পরে একবার তুকারামের কথা শুনিতে গিয়া তিনি যে সমূহ বিপদে পড়িয়াছিলেন তাহা পূর্ব্ব ভাগে বর্ণিত হইয়াছে। দাদোজীর মৃত্যুর কএক দিন পূর্ব্বে তিনি শিবাজীকে ডাকাইয়া তাঁহার রাজ্যের স্বাধীনতা সংস্থাপন—গো ব্রাহ্মণাদি রক্ষন, প্রজাপালন ইত্যাদি বিষয়ের উপদেশ দেন—শিবাজীর জীবন ও চরিত্রে যে সে উপদেশের ফল ফলিয়াছিল ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে।

ষ্ঠিত হন। ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের নাম করিয়া আত্ম গৌরব বর্দ্ধন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে! এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্তে নানা প্রকার প্রকৃতি-বহির্ভূত ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার প্রদর্শন দ্বারা লোক সকলকে চমকিত করা তাঁহাদের এক প্রধান কার্য্য হইয়া উঠে। মূককে বাচাল করা—অন্ধকে চক্ষুদান—ব্যাধিগ্রস্তকে আরোগ্য প্রদান—মৃত শরীরে প্রাণদান ইত্যাদি অদ্ভুত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান-চ্ছলে আপনাদিগকে ঈশ্বরের দূত অথবা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। পরে ইহাঁদের দেহত্যাগা-নন্তর মৃত্যুর ছায়াতে ইহাঁদের জীবনের ক্ষুদ্র ভাব, ক্ষুদ্র লক্ষ্য, ক্ষুদ্র কার্য্যও এরূপ দীর্ঘাকার ধারণ করে যে, শিষ্যবর্গ মিলিয়া মোহাবেশে অনায়াসে ইহাঁদিগকে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লন। এইরূপ পৃথিবীতে কত অবতারের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহারা পবিত্র-চরিত্র প্রকৃত সাধুপুরুষ, তাঁহারা জানিয়া শুনিয়া এইরূপ ভণ্ডামি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন এমন সম্ভবে না, কিন্তু যিনি যাহা বলুন—মানুষ দুর্ব্বল-হৃদয় অপূর্ণ জীব, তিনি প্রকৃত সাধু হইলেও লোকের শ্রদ্ধা অনুরাগ ও পূজা পাইলে মোহবশতঃ তাঁহার মস্তকও অনেক সময় ঘূর্ণিত হইবে তা-হাতে বিচিত্র কি? এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, তুকারাম আপনাকে এইরূপ ঐশী শক্তি-সম্পন্ন জ্ঞান করিতেন কি না? তাঁহার শি-ষ্যেরা তাঁহাকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন দেবতার অবতার বিশেষ জ্ঞান করিতেন, মহীপতি-রচিত তুকার জীবনবৃত্তে তাহার বহুতর নিদর্শন পাওয়া যায়। তুকারামের নিজের লেখায় তাঁহার দেবশক্তির কথার তাদৃশ উল্লেখ নাই—কিন্তু একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। তুকারাম যে তাঁহার নিজের অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করিতেন না তাহা বোধ হয় না—তৎ-কালে ওরূপ বিশ্বাস না হওয়াই আশ্চর্য্য। বিঠোবার উপর তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ও তিনি তাঁহার জীবনের সামান্য ঘটনাতেও ঈশ্বরের আদেশ দেখিতে পাইতেন—ইহার দৃষ্টান্ত তাঁহার অভঙ্গে অনেক পাওয়া যায়। স্বপ্নে তাঁহার ধর্ম্মদীক্ষা ও স্বপ্ন হইতে তাঁ-হার সরস্বতীর প্রসাদ উপলব্ধি হয়। নদী হইতে তাঁহার গ্রন্থোদ্ধার প্রভৃতি কএকটা ঘটনা কতকটা অলৌকিক বলিলেও বলা যাইতে পারে। তুকারাম যে ঘটনা বিশেষে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন তাহার স্পষ্টতর প্রমাণ তাঁহার অভঙ্গের আরো দুই এক স্থলে দৃষ্ট হয়। একটী অভঙ্গে একটী মৃত শিশুকে জীবন দানের কথা উল্লেখ আছে। মহীপতি এ ঘটনাটি এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।—

লোহগ্রামে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, এমন সময়ে একটি স্ত্রীলোক আপনার শিশুর মৃতদেহ আনিয়া তুকারামের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিল,তুমি যদি বাপু যথার্থই বিষ্ণু-ভক্ত হও তবে আমার এই ছেলেটিকে বাঁচাইতে পারিবে। তুকারাম তৎক্ষণাৎ একটি অভঙ্গ রচনা করিয়া নারায়ণের স্তব করিলেন, সকলে দেখিয়া অবাক্—শিশুটি সজীব হইয়া উঠিল।

সে অভঙ্গ এই—

২৩১৫

অচিন্ত্য তোমার শক্তি ওহে নারায়ণ,
নির্জীবে করিতে পার তুমি সচেতন।
তোমার অদ্ভুত লীলা আগে শুনা গেছে,
প্রত্যক্ষ কেননা হবে আমাদের কাছে।
কি সৌভাগ্য আমাদের তুমি প্রভু যবে,
আমরা তোমার দাস কি অভাব তবে ?
কৃপাময় তুকার হে রাখ এ মিনতি
প্রকাশো এখনি তব অদ্ভুত শকতি।

আর একটী ঘটনা এই। চিন্তামণিদেব নামক এক পূজারী ব্রাহ্মণ দেহুর অনতিদূর চিঞ্চবাদ গ্রামে বাস করিতেন। তুকা তাঁহার নিমন্ত্রণ পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। চিন্তামণিদেব তাঁহাকে যথেস্ট অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সহিত ভোজন করিতে বসেন। ভোজনের সময় তুকার আসন এক স্বতন্ত্র পংক্তিতে স্থাপিত হয়। ইহাতে তুকারাম ক্ষুব্ধ না হইয়া প্রস্তাব করেন, এই ভোজে গণেশ ঠাকুরের জন্য এক আসন পাতিয়া তাঁহাকে আহ্বান কর। চিন্তামণি উত্তর করিলেন দেবতাকে কিরূপে এই ভোজে আনয়ন করিবেন, এত আমার সাধ্য নয়। তুকারাম দুইটি আসন ও দুই পাত্র রাখিতে বলিয়া গণেশ ও বিঠোবাকে আহ্বান করিলেন। তাঁহার আহ্বানে দেবতারা আসিয়া তাঁহাদের নির্দ্দিস্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। মহীপতি বলেন তুকা আর চিন্তামণি ভিন্ন অপর কেহ দেবতাদের দর্শন পায় নাই—তাঁহারা কেবল দেখিতে পাইলেন যে ভোজ্য-পূর্ণ পাত্র ক্রমে আপনাপনি শূন্য হইয়া আসিতেছে।

এই বিষয়ক অভঙ্গ—

২৮৮২

ওহে চিন্তামণিদেব করি নিবেদন,
গণেশ ঠাকুরে কর ভোজে নিমন্ত্রণ ;
দেব কহে 'ওহে তুকা কি সাধ্য আমার,
'গ্রাসিয়াছে দেখ মোরে ঘোর অহঙ্কার।
প্রস্তুত হয়েছে অন্ন জুড়াইয়া যায়—
ব্রাহ্মণেরা সমাগত জ্বলিছে ক্ষুধায়।'
তুকা কহে 'তব পুণ্যে আনিব গণেশে,
'স্থির হও ধৈর্য্য ধর, দেখহ নিমেষে।"

১৫৭১ শকে তুকারামের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে প্রবাদ এই যে তিনি বিষ্ণুর পুষ্পক রথে আরোহণ করিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মহীপতি বলেন যে তুকারামের অন্তর্ধানের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে তিনি কথায় কথায় বৈকুণ্ঠ যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার শিষ্যদের প্রতি তাঁহার শেষ উপদেশ এই—

২৪৬০

শুন শুন যারা হরি ভকত,
রয়েছ এখানে ভাবুক যত,
তার্কিক সঙ্গ ছাড়িয়া দেও,
বিঠোবা চরণ ধরিয়া রও।
মতের চক্রে ভ্রমিও না আর,
ডুবিবে নরকে কহিনু সার।
কলির মাঝে তুকারাম দাস,
বিদায় লইয়ে যান নিজ বাস।

উপদেশ সমাপ্ত হইলে তাঁহার স্ত্রীকে বলিয়া পাঠাইলেন "আমি বৈকুণ্ঠে চলিলাম

তুমি আমার সঙ্গে আসিতে চাও ত এস।" তাঁহার স্ত্রী ওকথায় বিশেষ মনোযোগ না দিয়া উত্তর করিলেন "আমার পাঁচ মাস গর্ভ, ছোট ছোট ছেলে, ঘরে গরু বাছুর, সংসারধর্ম্ম ছেড়ে এখন তোমার সঙ্গে কেমন করে যাই বল দেখি।" তুকারাম মন্দির হইতে বাহির হইয়া চতুর্দ্দশ শিষ্যের সহিত ইন্দ্রায়নীর তীরে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইলে তুকার জন্য আকাশ হইতে পুষ্পক বিমান অবতীর্ণ হইল---তুকারাম দেবতাদের সঙ্গে রথারূঢ় হইয়া অদৃশ্য হইলেন। চতুর্দ্দিক হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। মহীপতির গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত আছে ও ইহার আভাস তুকারামের কয়েকটী অভঙ্গে লক্ষিত হয়। কিন্তু তুকারামের অভঙ্গ যে সকল পুস্তকরূপে সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে গদ্যে এইরূপ লিখিত আছে যে "১৫৭১শকে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া প্রাতঃকালে তুকারাম অদৃশ্য হন।' দেহুতে নদী হইতে উদ্ধৃত তুকার বংশজ মধ্যে যে গ্রন্থখানি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে তাহাতে তুকারামের মৃত্যু বিষয়ে এইমাত্র লিখিত আছে যে ১৫৭১ শকে বিরোধীনাম সংবৎসরে সীমগা (ফাল্গুন) বদ্য (কৃষ্ণপক্ষ) দ্বিতীয়া, বার সোমবার তে দিবসীঁ প্রাতঃকালীঁ তুকোবানীঁ তীর্থাস প্রয়াণং কেলে---শুভং ভবতু মঙ্গলং"অর্থাৎ১৫৭১শকে বিরোধী নাম সম্বৎসরে ফাল্গুন কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া সোমবার প্রাতঃকালে তুকারাম তীর্থ প্রয়াণ করিলেন---শুভমস্তু।"

তুকারামের এই রূপ সহসা অন্তর্ধান আর আমাদের কবি রামপ্রসাদ সেনের মৃত্যুর মধ্যে কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়।

তুকারামের আসন্ন কালে তাঁহাকে সর্ব্বদাই ধ্যানমগ্ন দেখা যাইত। এই কালের একটী প্রবাদ আছে যে তিনি আলন্দীর মন্দিরে গিয়া দেখিলেন যে মন্দিরের প্রাঙ্গণে এক বৃক্ষতলে এক পাল পক্ষী চরিতেছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাহারা উড়িয়া গেল। ইহা দেখিয়া তিনি বিষাদে মগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে এখনো আমার মনের মালিন্য অপনীত হয় নাই—এখনো জীবজন্তু আমাকে দেখিয়া শঙ্কিত হয়—যে অবস্থায় প্রাণী মাত্রে আমাকে দেখিয়া ভয় পাইবে না আমি এখনো সেই নিষ্কাম শান্তির অবস্থায় উপনীত হইতে পারি নাই। এই ভাবিয়া তিনি সেই বৃক্ষতলে শবের ন্যায় এরূপ নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন যে বিহঙ্গদল তাঁহাকে অচেতন পদার্থ জ্ঞানে তাঁহার গায়ে আসিয়া উড়িয়া বসিল। তুকারামের এই সময়কার রচনাতে---সংসার মায়াময়—জীবব্রহ্মে অভেদ—এই বৈদান্তিক ভাব প্রকটিত দেখা যায়, এবং তিনি ঈশ্বরে লীন হইয়া সংসার হইতে অপসৃত হইবার ভাব ব্যক্ত করেন।

১৫৯০

সংসারের গায়ে মাখা যতেক ব্যসন,
বিশুদ্ধ হয়েছি চিতে করিয়ে কীর্ত্তন।
নিষ্কলঙ্ক দেখি এবে এই ত্রিভুবন—
ভেদাভেদ জ্ঞান ধুয়ে পেয়েছি চেতন।
করিব অখণ্ড এবে ব্রহ্মপুরে বাস,
যেই স্থানে হয় সব পাপতাপ নাশ।

তুকা কহে "ভুলে সব একান্ত নিরত—
ব্রহ্মেতেই ব্রহ্মরস ভুঞ্জিব সতত"।

তুকারামের অন্তর্ধানের চতুর্থ দিবসে তাঁহার বিয়োগক্লিস্ট শিষ্যগণের নিকট তিনি আপনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এক জোড়া মন্দিরা যাহা সর্ব্বদাই তাঁহার হাতে থাকিত—এক খানি বস্ত্র ও কতকগুলি অভঙ্গ প্রেরণ করেন। সেই দিনে দেহুবাসিগণ হরি সঙ্কীর্ত্তন—ব্রাহ্মণ ভোজন প্রভৃতি উৎসবের কার্য্য মহা উল্লাসের সহিত অনুষ্ঠান করেন। দেহুতে এইরূপ প্রতিবর্ষে ফাল্গুনের পঞ্চমী ষষ্ঠীতে তুকারামের স্মরণার্থ উৎসবক্রিয়া মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

তুকারাম তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে যে সকল শ্লোকে আপনার অনুগত মণ্ডলী হইতে বিদায় লইয়া ছিলেন তাহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে—

১

দাও গো বিদায় এবে যাই নিজ ধামে,
এতকাল আছিলাম তোমাদের গ্রামে।
আর কি কহিব বল মনে রেখো মোরে,
আর না ভ্রমিতে হবে সংসারের ঘোরে।
বল সবে রামকৃষ্ণ বিঠ্‌ঠলের নাম,
বৈকুণ্ঠে পৃথিবী ছাড়ি যায় তুকারাম।

২

নিজ গ্রামে নিজ ধামে চলিনু এখন,
বিদায় দিয়েছে মোরে মিলে সাধুগণ।
মোর সুখ-দুখ-মর্ম্ম করেছে গ্রহণ,
কৃপাদৃষ্টি আমাপরে আছে বিলক্ষণ।
সাজায়ে মিস্টান্ন কত এসেছে লইতে,
বহুদিন পরে সুতে প্রবাস হইতে।
সেই পথে তাকাইয়ে আছি নিশিদিন,
সেই দিকে চিত্ত মোর শঙ্কা ভয়হীন।
তুকা কহে "আনিতে এসেছে লোক জন,
ডাকিছেন বাপ মায়ে দিতে আলিঙ্গন।
শিহরে অঙ্গ পুলক ভরে,
শুভ চিহ্ন সব আমার তরে।
স্মরেছেন মোরে মা বাপে আহা—
দেখা যাক্ ভাগ্যে আছে কি তাহা।
উৎকণ্ঠিত অতি হয়েছে হিয়া,
সুলক্ষণ তাহে দিতেছে কহিয়া।
তুকা কহে এবে কাজ হল শেষ,
আর কি থাকা যায় এখন বিদেশ।

৩

বাহিরে ও ঘরে মোর আছে যারা যারা—
এই আশীর্ব্বাদ—সুখে থাকগো তোমরা।
গুরু পূজ্য লোক মোর রয়েছেন যত,
প্রণতি তাঁদের মোর জানাইবে শত।
মধু-অন্বেষণ তরে অলি যায় উড়ে—
বস্ত্র ছিন্ন হলে পরে আর কি সে যুড়ে?
নদী যায় একবার সাগরেতে মিশে—
তার সেই স্রোত আর ফিরাইবে কিসে?
এই সব কথা গুলি মনে জেনো সার—
এই যে চলিল তুকা ফিরিবে না আর।

৪

শঙ্খচক্র ধরি করে আইলেন হরি,
কিবা শোভে কুণ্ডল মুকুটে আহা মরি।
মেঘশ্যামবর্ণ হরি পীতাম্বরধারী,
কহিছেন ভয় নাই; আর কিবা ডরি।
আমি গেলে সকলে কাঁদিবে উচ্চরবে—
কিন্তু আর ফিরিব না মনে জেনো সবে।
"যে ছিল গ্রামের রত্ন সে ছাড়িল দেহ,
মোদের সে বার্ত্তা তবু জানালে না কেহ"—

পাছে এই কথাবল ভয় করি ভাই,
পৃথ্বী ছাড়িবার আগে জানাইনু তাই।
লইয়া ধ্বজার বোঝা করি ভেরীরব—
পণ্ডরী পুরেতে যায় হরিভক্ত সব।

৫

তুকার পরীক্ষা হইল শেষ,
বিস্ময়ে পূরিল সকল দেশ।
প্রত্যহ দেবতা ভজন গান,
এই মাত্র তার অনুষ্ঠান।
বসিল তুকা বিমানে চড়ি,
সাধুগণ দেখে নয়ন ভরি।
ভক্তি তরে দেব ক্ষুধিত প্রাণ—
তুকারে বৈকুণ্ঠে লইয়া যান।

এই শেষ চরণের মূল অভঙ্গপাঠকদিগের কৌতুহল উদ্রেকের জন্য দেওয়া যাইতেছে—

তুকা উতরলা তুকী। নবল ঝালেঁ তিহীঁ লোকীঁ ॥ ১

নিত্য করিতো কীর্ত্তণ। হেঁচি ত্যাচেঁ অনুষ্ঠান ॥ ২

তুকা বৈসলা বিমানী। সন্ত প্যাহাতী লোচনীঁ ॥ ৩

দেব ভাবতো ভুকেলা। তুকা বৈকুণ্ঠাসী নেলা ॥ ৪

বোধ হয় এই শ্লোক হইতেই তুকারামের স্বর্গারোহণ কল্পিত হইয়াছে।

তুকারামের জীবনবৃত্তে যে সকল ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার ইন্দ্রিয়নিগ্রহ—বিষয় ত্যাগ—ধৈর্য্য ক্ষমা শান্তি—তাঁহার অচলা দেবভক্তি প্রকাশ পাইতেছে। তুকারাম যে বাস্তবিক এক জন ভগবদ্ভক্ত সাধু ছিলেন তাহা তাঁহার জীবনপুস্তকে সুস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত আছে। তাঁহার বৈরাগ্য কেবল মুখের নয়—বৈরাগ্যের প্রকৃত অর্থ তাঁহার জীবনে ফলিত হইয়াছিল। তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সর্ব্বত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য কষ্টে প্রথমে তাঁহার সংসার ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে, কিন্তু পরে যখন তাঁহার যশঃসৌরভ মহারাষ্ট্র মধ্যে বিস্তার পাইল—যখন লক্ষ্মী তাঁহার দ্বারে আসিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন, এবং সুদুর্লভ রাজপ্রসাদ তাঁহার হস্তগত হইল, তখন তিনি সমুদয় প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া কহিলেন—এ সকলে আমার কাজ নাই—আমি যে দুই একটী পদার্থ সার বলিয়া জানি তাহাতেই আমি অনুরক্ত থাকিব।—"আপনার ভ্রমে আমি রহিব আপনি" এই নিশ্চয় করিলেন। তিনি পার্থিব ধনমানের প্রার্থী ছিলেন না—রাজসম্মান তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হইত—তিনি জানিতেন "আমরা হরিভক্ত দৈব-ভাগ্যবান্।"

তিনি বলিয়া গিয়াছেন—

১

নম্রতা প্রভুর অমূল দান,
হয় না সহিতে ঈর্ষার বাণ।
মহাপুরে ভাঙ্গে বৃক্ষের কায়,
কোমল লতিকা বাঁচিয়া যায়।
সাগর তরঙ্গ আইসে ধেয়ে,
প্রণত হইলে যায় বহিয়ে।
তুকা কহে দেখ বিনয়ের ফল,
পায়ে পড়িলে ত চলে না বল।

২

দীনতা নম্রতা দেহ গো হরি,
বড়ত্বের মোরা ধার না ধারি।
পিপীলিকা যেই ক্ষুদ্র প্রাণী,
সে পায় মিছরী টুকরা খানি।
মহারত্ন ঐরাবতে
জ্বলে অঙ্কুশ আঘাতে।
মহত যে জন হয়,
কঠিন যাতনা সয়,
তুকারাম কহে শুন হে সার,
মৃদু যে যত লঘু ভার তার।

তুকারামের শ্লোকাবলী মহারাষ্ট্রীয় বৈষ্ণবদিগের বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু শুধু বৈষ্ণবদিগের মধ্যে কেন—মহারাষ্ট্র দেশের সাধারন জনপদের মধ্যে তাঁহার অভঙ্গ প্রখ্যাত ও আদরণীয়। তুকারাম যেরূপ ধর্ম্মোপদেষ্টা, যাঁহার জীবনে জীবন্ত ধর্ম্ম প্রতিভাত ছিল—তিনি যেরূপ কবি, যাঁহার লেখায় নীতি ও ভক্তি-সুধাপূর্ণ জ্বলন্ত বাক্য সকল আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়গ্রাহী, তাঁহার প্রতি অনুরাগ যে কোন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ তাহা নহে—তিনি মহারাষ্ট্র দেশের জাতীয় কবি। তাঁহার অভঙ্গ ব্রাহ্মণ শূদ্র কথক শ্রাবক সকলেরই মুখে। শিন্দে, হোলকর প্রভৃতি রাজপুরুষগণ তুকার অনুযাত্রী বলিয়া পরিচিত, ও মাসের মধ্যে নিয়মিত দিবসে সবান্ধবে তাঁহার শ্লোক কীর্ত্তন করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। নিম্নতর শ্রেণীর মধ্যে তীর্থকরীগণ মহা উল্লাসের সহিত তুকার অভঙ্গ গান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সংখ্যা অল্প নয়—প্রতি বর্ষে আষাঢ় ও কার্ত্তিক মাসে প্রায় লক্ষ লোক বিঠোবা দর্শনে পণ্ডরীপুর যাত্রা করেন।

ঈশ্বরে ধ্রুব বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাসানুযায়ী আচরণ, তুকার উপদেশের দুই প্রধান অঙ্গ। ভক্তিমার্গকেই তিনি মোক্ষলাভের প্রকৃত মার্গ জ্ঞান করিতেন। মুখে ধর্ম্ম ভানকারী অন্তরে ঘোর বিষয়ী যে সকল লোক কতকগুলি বাহ্যাড়ম্বরকেই ধর্ম্মসাধন মানিয়া চলেন, তাহাদিগকে তিনি দেখিতে পারিতেন না। তিনি বলিয়াছেন—

কথা অতি মিস্ট আর মন ভাল যার,
নেই বা রহিল গলে ফুলমালা তার।
আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ কোরেছে যে জন,
নেই বা সে শিরে জটা করিল ধারণ।
আসক্তি নাহিক যার পরস্ত্রীর প্রতি,
ভস্ম যদি না মাখে সে কি তাহাতে ক্ষতি।
নিন্দায় যে মূক আর অন্ধ পরধনে,
তুকা কহে সন্ন্যাসী কহিও সেই জনে।

পুনশ্চ—

কি ফল পূজিয়ে বল পিত্তল পাষাণ,
ভাবহীন হয়ে যদি রহিলে অজ্ঞান।
ভক্তিই সুখকারণ ভক্তিই তারণ,
ভক্তিই শাস্ত্রেতে কহে মোক্ষের সাধন।
জপমালা কণ্ঠমালা কি করিবে বল—
বিষয়ের জপে যদি মগন কেবল।
অক্ষরের অভিমানী হইয়ে পণ্ডিত—
কি হবে যদি না তুমি সাধো জীবহিত।
খোল করতাল ধরি গাও নিশি দিন,
কি ফল তাহাতে যদি অন্তরে মলিন।

তুকা কহে "ভক্তি বিনা দেবসেবা ক'রি,
বৃথা পণ্ডশ্রম খালি—পাইবে কি হরি?"

এই ক্ষণকার ধর্ম্মপ্রচারকেরা তুকারামকে তাঁহাদের জীবনের আদর্শ করিয়া চলিলে অনেক শুভ ফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। ত্যাগী শ্রদ্ধাবান্ শান্ত দান্ত ক্ষমাশীল—ঈশ্বর-ভক্তিই তুকারামের সর্ব্বস্ব ছিল—তাহাই তাঁহার জীবনের অন্ন পান—তাহাই তাঁহার উপদেশের সার—তাহারই গুণে মহারাষ্ট্রের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই নিকট তাঁহার অভঙ্গের এত আদর—এত গৌরব—তাহারই গুণে ঐ প্রদেশে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তুকারামের অভঙ্গ হইতে ঈশ্বরভক্তিসূচক কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইল।

সন্তানে মায়ের হাতে কেবা দেয় আনি।
আপনি জননী তারে লন কোলে টানি—
কাজ যাঁর তিনিই তা করিবেন, তবে
আমি কেন মিছামিছি মরি ভেবে ভেবে।
সন্তান না যদি চায় তবুও জননী,
রাখেন তাহার তরে মিস্টান্ন আপনি।
সন্তান যখন রহে খেলায় ভুলিয়া,
কাছে গিয়ে লন তারে বুকেতে তুলিয়া।
পীড়া তার হলে তিনি ব্যস্ত হন কত—
তুকা তাই কহে "শুন বন্ধুগণ যত—
"এত যত্ন কেন তবে শরীরের প্রতি,
মা থাকিতে আঘাত না পাবে এক রতি।"

এই শ্লোকটীতে ঈশ্বরের মাতৃভাব সুন্দর রূপে ব্যক্ত হইয়াছে।—নিম্নের কয়েকটী শ্লোকে কবির ঈশ্বরনিষ্ঠা প্রকাশ পাইতেছে।

নিজ হ'তে বাক্য কভু নাহি কহে নর,
প্রিয় ভগবন্ত যিনি তাঁরি সেই স্বর।
কোকিল যে করে সদা সুমধুর গান,
অন্য জন তারে সেই শিখাইল তান।
প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি যাহা আমি—
এ ক্ষমতা দিলা মোরে জগতের স্বামী।
তুকা কহে কে জানিবে তাঁহার শকতি,
পঙ্গু খঞ্জ জনেরেও দেন তিনি গতি।

—

লইনু সর্ব্বতোভাবে তোমার শরণ,
কায়মনোবাক্যে তব করিনু বন্দন।
হে দেব, অপর কিছু নাহি অভিলাষ,
তব পদে থাকে যেন বাঁধা তব দাস।
আমার হৃদয়পরে সেই গুরুভার—
তোমা বিনা ওহে নাথ কে করে উদ্ধার?
আমি হে তোমার দাস প্রভু তুমি আর—
বহুদূর হইতে এসেছি তব দ্বার।
তুকা কহে ধন্না দিয়ে বসিনু এখন,
হিসাব দেখিতে হবে দিয়ে দরশন।

ওহে পতিত-পাবন,
দীননাথ নারায়ণ,
তব রূপ হৃদি মাঝে
সদাই যেন বিরাজে,
ওহে ব্রহ্মাণ্ড নায়ক
ভক্ত-জন-প্রতিপালক।
জীবের জীবন তুমি প্রাণাধার,
দেব দেব তুমি তুকা কহে সার।

—

এই বর দান মাগি গো প্রভু,
যেন তোমা হারা না হই কভু।

তব গুণ গানে সঁপিয়া প্রাণ—
ভবের বিভব চাহি না আন।
ধন মান যশ না চাহি কৃপাল,
সাধু সঙ্গে যেন কেটে যায় কাল।
ছাড়ি যায় যবে তুকা ভববাস—
হয় যেন সুখী এ তব দাস।

———

পতিত যে পাপী আমি লয়েছি শরণ,
পাণ্ডুরঙ্গ কর মোর লজ্জা নিবারণ।
ভকতবৎসল তব অন্ত কেবা জানে,
তোমা বিনা কেবা তারে অভাগা এজনে।
কত কষ্ট পায় আহা দ্রৌপদী ভগিনী,
আপনার মত তারে রাখিলে আপনি।
প্রহ্লাদে বাঁচালে স্তম্ভে হয়ে অবতার,
আমারে ভুলিলে তবে একি অবিচার।
দারিদ্র্য ঘেরিল আসি সুদাম ব্রাহ্মণে,
তুমি তারে পাণ্ডুরঙ্গ উদ্ধারো যতনে।
তুকা কহে কায়মনে ধরিনু আধার,
পাপ নাশি তবদাসে দেওহে নিস্তার।

———

এই দেব তব পদে করি হে মিনতি,
কৃপাগুণে হোক্‌ মোর দেহের বিস্মৃতি।
তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানিবারে যাই,
জীবনের সুখ শান্তি নাহি অন্য ঠাঁই।
তোমার চরণ পানে বাঁধি নিজ ধাম,
সন্তোষ পাইব চিতে লভিব বিশ্রাম।
লজ্জা কিম্বা ভয় আর কাম ক্রোধ অরি—
বিনাশো জঞ্জাল সবে প্রভু কৃপা করি।
তব পদে প্রভু তুকা এই ভিক্ষা চায়—
সাধু সঙ্গে মিলাইয়ে তরাও তুকায়।

পৌত্তলিকতা বিষয়ে তুকারামের উক্তি—

স্থানেতে আবদ্ধ ক'রে পূজি গো তোমায়,
চৌদ্দ ভুবন কিন্তু অন্তরে লুকায়।
নাচায় ফিরায় তোমা লোকে দ্বার দ্বার,
রূপ রেখা হীন কিন্তু তুমি নিরাকার।
তোমা লাগি আমরা গো গাই কত গীত—
তুমি কিন্তু ওহে দেব শব্দের অতীত।
তোমা তরে আমরা গো পরি জপমালা—
তুমি কিন্তু সৃষ্টি হতে রয়েছ নিরালা।
তুকা কহে "এবে তুমি হয়ে পরিমিত—
প্রসন্ন হইয়ে মোর সাধ কিছু হিত।"

বৈদান্তিক মতের উপর তুকার উক্তি—

খণ্ডোবার ভিক্ষুক সে আছিল প্রথমে—
ভাগ্যগুণে সেনাপতি হল ক্রমে ক্রমে—
তবুও ভিক্ষার ঝুলি ঘুচিল না তার,
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে গণক ছিল, এমনি কপাল,
ক্রমে ক্রমে রাজ্যের সে হইল ভূপাল—
পাঁজি পড়া তবুও ত ঘুচিল না তার—
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে ছিল যে দাসী, কে জানিত কবে,
সেই দাসী ভাগ্যগুণে পাটরাণী হবে—
তবুও ত হীন কর্ম্ম ঘুচিল না তার—
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।
প্রথমে পাইল তুকা সাধুদের সঙ্গ,
ক্রমে পাণ্ডুরঙ্গ সাথে হল এক অঙ্গ।
তবু তাঁর গুণ গান ঘুচিল না তার,
পুরাণো স্বভাব কভু নহে ঘুচিবার।

ভক্তের লক্ষণ—

সেই জন ভক্ত, যেই দেহেতে উদাস—
সংসারে বিরাগ যার ছিন্ন আশাপাশ।
বিষয় তাঁহার নাই বিনা নারায়ণ,
মাতা পিতা নাহি চান নাহি ধন জন।

গোবিন্দ সহায় তাঁর হন পদে পদে,
আগুলে রাখেন তাঁরে সম্পদ বিপদে।
তুকা কহে এই জেনো ভক্তের লক্ষণ,
সত্য কাজে সদা যিনি থাকেন মগন।

সংসারের অনিত্যতা—

কোন জন দেখ জল বোয়ে মরে,
সুখে শোয় কেহ খাটের উপরে।
কালের চক্র যেমন ঘুরে,
লোকের কপাল তেমনি ফিরে।
কভু শুষ্ক রুটি বহু কষ্টে মেলে,
কভু চর্ব্ব্য চোষ্য পাই অবহেলে।
কেহ পদব্রজে ঘুরিয়ে মরে,
কেহ রথে বসে সুখে বিহরে।
কেহ রাজবেশে ভুষিত শরীর,
কারো পুরাতন ধূলি মাখা চীর।
কভু বা দারিদ্র্য কভু ধনরাশ,
কভু হীন সঙ্গ কভু সাধু সহবাস।
তুকা এই কথা বলে মনে জেন ঠিক,
পৃথিবীর সুখ দুঃখ সকলি অলীক।

ধর্ম্মনীতি ও ঈশ্বর বিষয়ক আর কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া এই প্রস্তাবের উপসংহার করা যাক।

সেই পাপ মনে যদি রহিল সংশয়,
পাপ পুণ্য দুই সে মনের ধর্ম্ম হয়—
ভাল চিন্তা পুণ্য অতি জানিও গো সবে,
বীজ যদি ভাল হয় ফল ভাল হবে।
তুকা কহে "মনেরে রাখিও শুদ্ধ সত্ব,
সেই অতি ভাল কাজ, সেই সার তত্ব।
ধন্য ধন্য সেই প্রাণী ক্ষমা যার অঙ্গে,
ধৈর্য্যবল ধরে যেই সকল প্রসঙ্গে।
পর-গুণদোষ-চর্চ্চা নাহি যাঁর ঠাঁই—
অহঙ্কার গর্ব্ব শূন্য যে জন সদাই।
অন্তর বাহির যার সমান নির্ম্মল,
পূণ্যতোয়া গঙ্গাসম হৃদয় কোমল।
তুকা কহে হেন জন দোসর আমার—
প্রণমি তাহার পদে শত শত বার।

সন্তপ্ত পীড়িত জনে যে দেখে আপন,
দীন হীনে করে যেই হৃদয়ে ধারণ।
নিজ দাস দাসী পরে,
পুত্রের বাৎসল্য ধরে।
সেই সাধু, সেই তীর্থ দেবের বসতি,
তার গুণ বাখানিব হেন কি শকতি।
তুকা কহে "সাক্ষাৎ সে ভগবন্ত মুরতি।"

সদুপায়ে ধনরাশি করি উপার্জন,
ভাল কোরে বুঝে সুঝে কোরো বিতরণ।
কটু বাক্য না কহে যে পরহিতে রত,
পরস্ত্রীরে দেখে যেই জননীর মত—
জীবজন্তু সবাপরে অতি দয়াবান্,
মরুভূমে তৃষাতুরে করে জল দান।
সদা শান্ত, নাহি করে পর অপবাদ,
গুরু জন সাথে কভু না করে বিবাদ।
সে লভে উত্তম গতি নাহি পায় দুখ,
পরম সৌভাগ্য তার ভুঞ্জে সদা সুখ।
তুকা কহে আশ্রমের রত্ন তারে মানি,
এহতে তপস্যা আর কি আছে না জানি।
সংসারের ধারি না ধার,
হরির জন সে সখা আমার।
ব্রহ্মানন্দে কাল যায়
বিষয়ে কি মন তৃপ্তি পায়।

না আসে চিন্তা স্বপনেও কভু,
নিশি দিন যায় সুখেতে প্রভু।
তুকারাম কহে "এযে ব্রহ্মরস,
কি বলিব আহা কেমন সরস।"

কৃপাময় যিনি তাঁরে না কর স্মরণ?
একাকী জগত যিনি করেন পোষণ,
উত্তাপে শুকালে তরু, দিয়ে বারিধার,
কে করে তাহাতে বল জীবন সঞ্চার।
কে বল মায়ের স্তনে যতনে ঢালিয়া,
পান হেতু দুগ্ধ দেন আগেতে ভাবিয়া।
তুকা কহে জান তাঁর নাম বিশ্বম্ভর,
ভক্তি ভরে তাঁর ধ্যান কর নিরন্তর।

সবাই বলে গো দেব আমি তব দাস,
তুমিই রাখিবে মোরে এই মম আশ।
অনাথের নাথ তুমি পতিত পাবন,
এই নাম জপি আমি কাটাব জীবন।
ভজন পূজন মোর মুখেই কেবল,
অন্তরের কথা প্রভু জানিছ সকল।
তুকা কহে তুমি ওহে করুণার সিন্ধু,
ভবপাশ নাশো মোর ওহে দীনবন্ধু।

শ্রীস—

রুসিয়া।

২। পুরাবৃত্ত

রুসিয়ার অধিবাসিগণ অতি প্রাচীনকাল হইতেই অনেকগুলি গর্ভ-জাতিতে বিভক্ত; অপরাপর দেশের ন্যায় এদেশেও ঐ সকল গর্ভ-জাতি পরস্পর চির-বিরোধী-ভাবাপন্ন। এই চিরপ্রবাহী যুদ্ধে কখন বা একজাতি কখন বা অন্য জাতি প্রাধান্য লাভ করিত। এরূপ একটি কিম্বদন্তী আছে যে কোন এক সময় এই অভ্যন্তরীণ জাতীয় যুদ্ধ এত ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল যে অনেককাল পর্য্যন্ত কোন জাতিরই প্রাধান্য না হইয়া কেবল বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। এই সময়ে রুসিয়ার এক প্রকার ফিউড্যালিস্‌ম্ (feudalism) প্রচলিত ছিল; রুসিয়ার বৈয়ারগণ* (Boyars) এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ থামাইবার অন্য কোন উপায় না পাইয়া এক দল বিদেশীয় যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করে। এই আমন্ত্রণানুসারে রুরিক স্বীয় দলবল সহিত রুসিয়ায় উপস্থিত হয়। এই সকল যোদ্ধা কোন্ জাত্যুদ্ভব এ বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন যে ইহারা স্কান্দেনেবীয় নর্ম্মান, এই মতানুসারে ইয়ুরোপের সকল মুকুটধারীই নর্ম্মান বংশোদ্ভব বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। অপর মতটি এই যে রুরিক ফিন্‌লণ্ড উপসাগরের উপকূলস্থ শ্লেভ জাত্যুৎপন্ন; এই মতটি অনেকটা স্বদেশানুরাগ ও জাতীয় গর্ব্বপ্রসূত। এই উভয় মতের পোষকতা করিয়া রুসীয় ভাষায় অগণ্য পুস্তক লিখিত হইয়াছে। রুরিক আসিয়া অনেক কালের পর সমর-

---

* বৈয়ার, পশ্চিম ইয়ুরোপের ব্যারনের (baron) প্রতিরূপ।

ক্রান্ত রুসিয়াকে শান্তি প্রদান করে। রুরিকের চারি পুত্র হয়; রুরিকের মৃত্যুর পর চারি ভ্রাতা বিজিত দেশকে চারি সমান ভাগে ভাগ করিয়া লয়। কালক্রমে ইহাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ রুস অন্য তিন জনকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইল। ইহারই নাম হইতে রুসিয়া নামের উৎপত্তি। কিন্তু সমস্ত রুসিয়া কখন, রুসের অধীনে ছিল না, ইহার সময়েও অনেকগুলি গর্ভজাতি ছিল, এবং ইহার বংশ হইতেও দুই চারিটি গর্ভজাতির উৎপত্তি। এইরূপে ক্রমে ক্রমে রুসিয়ার অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থান স্থাপিত হইল. ইহাদের প্রত্যেকের রাজা রুরিকের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেন। অনেক রাজপুত রাজাও ঐরূপ রামলক্ষ্মণের বংশোৎপন্ন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ জঙ্গীশ খাঁ ভিন্ন ভিন্ন মোগল্ দলের একতা সম্পাদন করিয়া তাহাদিগকে নিয়মবদ্ধ করেন। এই বৌদ্ধমতাবলম্বী মোগলেরা এসিয়ার অধিকাংশ লুটপাট করিয়া ইয়ুরোপে পর্য্যন্ত প্রবেশ করে। জঙ্গীশ খাঁ চীনদেশের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অর্দ্ধেক দেশ জয় করেন, তৎপরে সেনাপতিদিগের উপর অবশিষ্টাংশ জয় করিবার ভার অর্পণ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন। এরূপ অসভ্য জাতির যুদ্ধযাত্রা করিতে হইলে কোনরূপ কমিসরিয়ট বন্দোবস্ত করিতে হয় না, মেষের পালই তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব; সুতরাং পথে ইহাদের বিশেষ বাধা ঘটে না। অতি অল্পকাল মধ্যেই এই তাতার দল রুসিয়ায় আসিয়া হত্যা ও দাহনকাণ্ড আরম্ভ করিল, এবং অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে তাতার সাম্রাজ্য উত্তর মহাসাগর হইতে হিমালয়ের উত্তর সীমা পর্য্যন্ত ও কার্পেথীয় পর্ব্বতশ্রেণী হইতে এসিয়ার সর্ব্বপশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। রুসিয়ার পলফট্সি নামক গর্ভজাতি ইহাদের দ্বারা সর্ব্বপ্রথমে আক্রান্ত হয়; ঐ জাতির রাজা আক্রমণকারীদিগকে দূর করিবার জন্য গ্যালিসিয়ার অধিপতি সাহসী মিষ্টিস্ল্যাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করেন। মিষ্টিস্ল্যাক্ একজন বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তিনি বুঝিলেন যে, যে শত্রু আজ উঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, কাল তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবে। তদনুসারে বিবাদ অসত্বে ও তিনি আক্রান্ত জাতিকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন, এবং অন্যান্য রাজার নিকট সহযোগিতার প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার মন্ত্রণায় অধিকাংশ রুসীয় জাতি এক-চিত্ত হইয়া বিদেশীয় শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল. কিন্তু তাতারদিগের কর্ত্তৃক কাল্কা * নদীর উপকূলে সম্পূর্ণরূপ পরাভূত হইল। কিন্তু বিজেতৃবর্গ তাহাদের জয়ের সম্পূর্ণ ফল গ্রহণ না করিয়াই স্বদেশে ফিরিয়া গেল। ইহার তের বৎসর পর পর্য্যন্ত রুসিয়ায় ইহাদের আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। এই সময়ের পর আবার রুসিয়ায় তাতার অভ্যুপাত হয়। রুসীয়গণ এই অকস্মাৎ উপস্থিত জাতির বিষয় কিছুই বুঝিতে না পারিয়া নানারূপ

* এই নদীটি এজভ সাগরে পতিত হইতেছে।

অনুমান করিতে লাগিল। রুসিয়ার প্রাচীন সাধারণ কবিতা সমূহে বর্ণিত আছে যে হঠাৎ পূর্ব্বদিক হইতে বিকটাকার ভীষণ একজাতি আসিয়া উপস্থিত হয়; ইহারা শয়তানের পুত্র; হত্যা, দাহন ও দাসত্বে আনয়নই ইহাদের একমাত্র কার্য্য, রুসীয়দিগের কোন মহাগুরুতর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ইহরা শাস্তিরূপে বিহিত হইয়াছে।

এই সময়ে এবং ইহার বহুকাল পর পর্য্যন্ত রুসিয়া হইতে এত লোক দাসরূপে বিক্রীত হইবার জন্য দেশ দেশান্তরে প্রেরিত হইয়াছিল যে রুসীয় জাতিদিগের সাধারণ শ্লেভ (Slave) নাম হইতে ইংরাজি ও অন্যান্য ভাষায় ক্রীতদাসের একটি নাম শ্লেভ(Slave) হইয়া উঠিল*। কালক্রমে রুসিয়ার অধিকাংশ তাতারদিগর হস্তগত হয়। এই সময়ে ঐ জাতি মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন করে। তাতারদিগের স্বর্ণ দল (Golden Horde) নামক দলের খাঁ রুসিয়া সম্রাট বলিয়া পরিগণিত হইল এবং রুসিয়ার সমুদয় ক্ষুদ্র রাজগণ করপ্রদ হইল। এই সময় হইতে মস্কোর রাজবংশের প্রাধান্যের সূত্রপাত; ইহাদের সহিত তাতার রাজাদিগের আদানপ্রদান চলিতে লাগিল এবং অন্যান্য রাজাদিগের নিকট হইতে প্রাপ্য কর আদায় করিবার ভার খাঁ ইহাদের উপর অর্পণ করিলেন। এই ক্ষমতার অন্যায় ব্যবহার দ্বারা উক্ত রাজবংশ প্রভূত বলশালী হইল, পরে তাতার রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে ইহারা তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিল, এবং পরিশেষে দেশের অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া রুসিয়ার Tsar হইয়া উঠিল। এই সময়ে মস্কোবীরদিগের একটি অতি লোমহর্ষণ নৃশংস ব্যবহার বর্ণিত আছে। নিঝনি নগর মস্কোবীরদিগের কর্ত্তৃক অধিকৃত হইবার সময় স্বদেশস্বাধীনতা-রক্ষক তিনশত নাগরিক লোক নিকটস্থ নদীর সেতুর উপর হইতে নীচের জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাদের মধ্যে যাহারা সন্তরণ করিয়া কূলে উঠিবার চেষ্টা করে তাহারা কূলে ও নৌকায় অবস্থিত সৈনিকদিগের কর্ত্তৃক হত হয়। এখনও এই সেতুর নীচের জল অতি কঠোর শীতেও তরল থাকে। সাধারণ লোকেরা এই নৈসর্গিক ঘটনাটি সেই স্থানে মৃত লোকদিগের প্রেতাত্মার উপর আরোপ করে। এই ঘটনার স্মরণার্থ একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড অদ্যাপিও নিঝনিতে রক্ষিত আছে। অল্পকাল মধ্যে অপর সকল রাজা মস্কোর রাজপারিষদপদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। এই মস্কোবীর রাজবংশ এখনও রুসিয়ার সিংহাসন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। অনেক কাল পর্য্যন্ত

*It must not be thought that the word *slave*, as the name of a people comes from *slave* in its common sense of a *bondman*. It is just the other way, for this word *slave* got its sense of *bondman* because of the great number of bondmen of Slavonic birth who were at one time spread over all Europe.—Freeman's General Sketch of History, p. 15.

মস্কো রুসিয়ার রাজধানী ছিল। পরে প্রধান পীটর (Peter the Great) সেণ্ট পীটর্ষবর্গ নামক বর্ত্তমান রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু পীটরের অনেক পরপর্য্যন্তও মস্কোতে রাজাদিগের অবস্থিতি হইত। নেপোলিয়নের অভ্যুৎপাতের সময় (১৮১২-১৩ খৃঃ অ।) বিপক্ষ পক্ষকে কষ্ট দিবার জন্য রুসীয়েরা মস্কো নগরে অগ্নি প্রদান করে, সেই অবধি সেণ্টপীটর্ষবর্গ সম্রাটদিগের আবাস-নগর হইয়াছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে রুসিয়ার ধারা-প্রবাহী ইতিহাস অনুসরণ করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে; যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা না জানিলে পশ্চাল্লিখিত বিষয় সকল স্পষ্টরূপে অবধারণা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাই উপরে সন্নিবেশিত হইল। রুসিয়ার ইতিহাস বিষয়ে ম্যাকমিল্যান কর্ত্তৃক প্রকাশিত এক খানি অতি সুন্দর পুস্তক আছে।

৩। শাসন-তন্ত্র।

শাসন-কার্য্যের সৌকার্য্যার্থে প্রকৃত রুসিয়া (অর্থাৎ সাইবেরিয়া সার্কেসিয়া প্রভৃতি অধিকৃত প্রদেশবহির্ভূত রুসিয়া) ৪৬টি গবর্ণমেণ্টে বিভক্ত। এই এক একটি গবর্ণমেণ্ট সাধারণতঃ বিস্তৃতিতে বঙ্গদেশীয় দুইটি জেলার সমান। গবর্ণমেণ্ট আবার জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট একটি গবর্ণর, একটি বাইস-গবর্ণর ও একটি সাধারণ সভার দ্বারা শাসিত। এই সমস্ত গবর্ণর একটি প্রধান সভার অধীনস্থ। শাসনকার্য্য, ধর্ম্মরক্ষণ প্রভৃতি সকল বিষয়ের সর্ব্বময়কর্ত্তা, সম্রাট। তাঁহার ক্ষমতা বিভক্ত হইয়া তিনটি সভার উপর অর্পিত হইয়াছে। প্রথম সভার কার্য্য ব্যবস্থা সংস্থাপন করা—বস্তুতঃ ইহা অনেকটা আমাদের দেশের ব্যবস্থাপক সভার প্রতিরূপ; দ্বিতীয় মন্ত্রীর সভা, ইহার উপর সমস্ত শাসনকার্য্যের ভার অর্পিত হয়, তৃতীয়, বিচার সম্বন্ধীয় প্রধান সভা, পূর্ব্বে রাজার অনুপস্থিতি ও নাবালক অবস্থার সময় ইহার উপর সকল ক্ষমতা ন্যস্ত হইত। কিন্তু এক্ষণে ইহার কেবলমাত্র বিচারের ক্ষমতা আছে। অন্যান্য অনেক রাজ-তন্ত্র-শাসনপ্রণালী-বিশিষ্ট দেশেও অনেক লোকের উপর শাসনের ভার অর্পিত থাকে; সম্রাট কেবল সংশোধন ও তত্ত্বাবধারণ মাত্র করেন। রুসিয়ায় সেরূপ নহে; অতি ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের এক মাত্র কর্ত্তা সম্রাট, ইহার অনুমতি ব্যতিরেকে অত্যন্ত সামান্য কার্য্যও হইতে পারে না। আইনমত রাজা ও প্রজার মধ্যে শাসনাদি বিষয়ে অন্য মধ্যবর্ত্তী কিছু নাই। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে রুসিয়ার শাসন-প্রণালী অত্যন্ত Centralized * অথবা কেন্দ্রীভূত। এই প্রকার শাসনপ্রণালীর দোষ বিশেষ করিয়া বর্ণনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই। সকলেই বুঝিতে পারিবে যে শাসন-প্রণালী যত-

*সম্রাট, রাজা কিম্বা অন্য কোন প্রধান শাসনকর্ত্তা হইতে প্রত্যক্ষ-ভাবে বিক্ষিপ্ত ক্ষমতার দ্বারা চালিত শাসনতন্ত্রকে Centralized কহা যায়। অর্থাৎ centralized শাসনতন্ত্রে শুধু নামে নহে, কার্য্যেও এক ব্যক্তি সমস্ত শাসনকার্য্য চালাইবার চেষ্টা করে।

অধিক কেন্দ্রীভূত, দূর-প্রদেশে ততঅধিক অরাজক-ভাব ; কারণ, স্বীয় আবাসনগরে যত প্রভুত ক্ষমতা হয়, দুরান্তরে কথনই তদ্রূপ হইতে পারে না। ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত-স্থল তুর্কী সুলতান ইস্তাম্বুলে প্রবল প্রতাপ ; আর্মেনিয়াতে পাসাই সর্ব্বময়-কর্ত্তা—নিয়মিত রাজস্ব দিলেই নির্ভাবনা। রুসিয়ায় শাসনকার্য্যের এই রূপ বিভাগ সংস্থাপিত যে, দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, এদেশে Bureaucracyর বিশেষ প্রাদুর্ভাব। এই রূপ শাসনপ্রণালীর দোষ কিছু বলা উচিত ; কারণ আমাদের দেশে যে Bureaucracyর নাম গন্ধ নাই এরূপ নহে। এই প্রণালীর প্রধান দোষ এই যে এক ব্যক্তি এক বিভাগের কর্ত্তা ও তাহার দোষ গুণের জন্য দায়ী হওয়ায় তাহার দ্বারা অধস্থ কর্ম্মচারীদিগের দোষ প্রকাশ পায় না। অন্য কোন সূত্রে কোন কর্ম্মচারীরও দোষবাহির হইয়া পড়িলে ও তাহা সপ্রমাণ হওয়া দুঃসাধ্য। রুসিয়ার উচ্চ হইতে সামান্য পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মচারীই ঘুষখোর, কিন্তু ইহা নিরাকরণের বিশেষ কোন উপায় নাই। কোন রকম দোষের বিষয় সম্রাটের কর্ণগোচর হইলেও তৎপ্রতিকারে তিনি এক প্রকার নিরুপায়, কারণ দোষ প্রমাণ হওয়া অসম্ভব। এই জন্যই মহারাণী ক্যাথেরাইন এক জন কর্ম্মচারী তাঁহার নিকট দরিদ্রতা জানাইলে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি অপর সকলের ন্যায় কায কর না কেন ?" কর্ম্মচারী অন্য সকলের ন্যায় কার্য্য করা কি জিজ্ঞাসা করায় মহারাণী উত্তর করিলেন "কেন, লুট।" এই উক্তির আর টীকার প্রয়োজন নাই। রুসিয়ার শাসন-প্রণালীর আর একটি দোষ এই স্থানে উল্লেখ করা উচিত। এখানে নিয়মের এতদূর প্রাচুর্ভাব যে একটা সামান্য কার্য্য করিতে হইলেও অন্ততঃ ত্রিশতক্তা ফুলিস্ক্যাপে লিখা চলে। মিঃ ওয়ালেস্ কহেন যে কোন এক গবর্ণরের গৃহের অগ্নিকুণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়ার মেরামত করিবার প্রয়োজন হয় ; ঐ মেরামত করিতে ঊর্দ্ধ সংখ্যায় পাঁচসিকা লাগিত। এক্ষণে সকলেই বোধ করিবেন যে এক জন গবর্ণরের পদাভিষিক্ত লোককে স্বেচ্ছানুসারে পাঁচ সিকা খরচ করিতে দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রুসিয়ার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ওরূপ বিবেচনা করেন না। এই মেরামতের জন্য প্রথমতঃ গবর্ণরের সেক্রেটরি প্রধান ইঞ্জিনীয়ারকে সম্ভবতঃ—ব্যয়স্থির করিবার জন্য লিখেন, প্রধান ইঞ্জিনীয়ার অধীনস্থ কর্ম্মচারীকে অগ্নিকুণ্ড দেখিয়া প্রয়োজনীয় সংবাদ দিবার আদেশ করেন, এবং অধীনস্থ ইঞ্জিনীয়ারের রিপোর্ট পাইয়া সেক্রেটরিকে সম্ভবতঃ-ব্যয়ের হিসাব পাঠান। সেক্রেটরি উপরিস্থ কর্ম্মচারীকে উক্ত হিসাবের সহিত পত্র লিখেন। এইরূপ সোপানানুসারে হিসাব সম্রাটের নিকট উপস্থিত হয়। সম্রাট বিবেচনা করিয়া গবর্ণরকে পাঁচসিকা ব্যয় করিবার অনুমতি দেন। এইরূপে দশ বারোবারে ৩০।৪০ তক্তা কাগজ লিখার পর পাঁচ সিকা ব্যয়ে একটা অগ্নিকুণ্ড মেরামত করিবার অনুমতি বাহির হয়!! অবশ্য এরূপ কেহ মনে করিবেন না যে সম্রাটের নিকট

হইতে অনুমতি পাওয়া পর্য্যন্ত মেরামতের কার্য্য স্থগিত রহিয়াছিল। একখানিও পত্র লিখিবার পূর্ব্বেই কার্য্য সমাধা হইয়াগিয়াছিল; সম্রাটের অনুজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিলে শীতকালের মধ্যে অগ্নিকুণ্ড মেরামত হওয়া ভার হইত। যখন রুসীয় কর্ম্মচারী মাত্রেই চোর ও ঘুষখোর ছিল, তখন এরূপ করিলে সাজিত,কিন্তু যখন রুসীয়গণ তাঁহাদের দেশে ধর্ম্মনীতির বিশেষ প্রাদুর্ভাব বলিয়া অহঙ্কার করেন, তখন এইরূপ নিয়ম বিশেষরূপ দূষনীয় ও লজ্জাকর। রুসীয়শাসনপ্রণালী কেন, সকল বিষয়েরই একটি প্রধান দোষ এই যে দেশ কাল বিবেচনা না করিয়া ফরাশী,জার্ম্মনি ও ইংলণ্ড দেশ হইতে ব্যবস্থা,আচার ব্যবহার গণ্ডায় গণ্ডায় আনা হইয়াছে ;— ইহা নানা প্রকার গোলযোগের নিদানভূত। রুসিয়ার কোন একটি কার্য্য করিবার পূর্ব্বে পণ্ডিতমণ্ডলীর পরামর্শ লওয়া হয় ; এই সকল পরামর্শে তালমূদ ও কোরান হইতে আরম্ভ করিয়া মিল প্রভৃতির পর্য্যন্ত মত উদ্ধৃত ও সমালোচিত হয়। ইহাতে কার্য্যতঃ যে কি ফল ফলে সকলেই বুঝিতে পারিতেছে। আক্ষেপের বিষয় এই যে অনেকটা আমাদের দেশেও এইরূপ ভাব দেখা দিয়াছে। আমাদের উন্নতিশীল যুবকেরা দেশকালভেদ বিবেচনা না করিয়া বিলাতী লেখকদিগের মতানুসারে এদেশে কার্য্য চালাইতে চাহেন ; এই বৃক্ষের ফল রুসিয়ায় ও এদেশে বোধ হয় একইরূপ হইবে। সামাজিক রীতিনীতি সমালোচনার সময় এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ অর্পিত হইবে, এস্থানে আর বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

রুসিয়ার শাসন-প্রণালীর উন্নতির নিমিত্ত সম্রাট নিকলাস এক প্রকার স্বয়ংশাসন প্রণালী (Self-government) স্থাপিত করেন; ইহাতে বিশেষ কোন ফল হয় নাই, কারণ রাজকীয় বল ইহার পক্ষ নহে। এই প্রণালীটি রুসীয়দিগের উপযোগী না হওয়ায় ইহার নিস্ফলতার আর একটি কারণ। সকল সময়ে উপযোগিতা বুঝিতে পারা বড় সাধারণ বিচক্ষণতার কার্য্য নহে। এই স্বয়ংশাসন প্রণালীযন্ত্রের নাম zemstvo। ইহা এক প্রকার সভা, ইহার বিশেষ দোষ এই যে ইহার সভ্যের মধ্যে একটিও কার্য্যের লোক নাই; ইহারা অনেকটা আমাদের ন্যায় নিস্প্রয়োজনীয় তত্ত্বানুসন্ধায়ী ; যথার্থ কার্য্যের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ নাই। সেই জন্য ইহার দ্বারা কোন উপকার না হইয়া কেবল কর বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা অন্য কোন ফল না হউক, কর্ম্মচারীদিগের দোষ আর পূর্ব্ববৎ নাই, অনেক কমিয়া আসিয়াছে। ইহা হইতে একটি বিশেষ উপদেশ লাভ করা যায় এই যে কর্ম্মচারীদিগকে সাধারণের শাসনাধীনে রাখিলে অনেকটা ভাল হয় ; ফলতঃ কর্ম্মচারীদিগের দোষ নিবারণের এইটি কেবল এক মাত্র উপায়। সম্রাট নিকলাস স্বয়ং বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কর্ম্মচারীদিগের সাধুতার কিছুমাত্র উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হন নাই। কিন্তু ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের পর যখন তিনি ঐ কার্য্যের জন্য সাধারণের সাহায্য প্রার্থনা করেন,

সেই অবধি কর্ম্মচারীদিগের দোষ হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের শাসন কর্ত্তাদিগের এইটি মনে রাখা উচিত; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহাঁরা এইটি উপেক্ষা করিয়া নূতন মুদ্রা-যন্ত্র সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা দ্বারা সাধারণের মুখ বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইহা হইতে কেহ মনে করিবেন না যে রুসিয়ার মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা আছে। এক্ষণে এখানে যে বিধি লইয়া আমাদের দেশে মহা আন্দোলন চলিতেছে, রুসিয়ার মুদ্রাযন্ত্রসম্বন্ধীয় নিয়ম তাহা অপেক্ষা অনেক কঠিনতর। সাধারণতঃ রুসিয়ার বিচারকার্য্য অন্যান্য সভ্যদেশের ন্যায়; কেবল রাজবিদ্রোহ সম্বন্ধীয় দোষের এক প্রকার স্বতন্ত্র বিচার হয়। অনেক সময় ঐ দোষে অপরাধী বলিয়া কাহাকেও সন্দেহ হইলে তাহাকে কোন বিচারালয়ে না আনিয়া একেবারে একটি দূরস্থিত দুর্গে সম্রাটের ইচ্ছানুরূপ সময় পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ করে। অধিকাংশ সময় সম্বাদপত্রের সম্পাদকদিগের এই রূপ ঘটে। এক দিন কোন সম্বাদপত্রে গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্য কঠিন রূপে সমালোচিত হইল, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা মনে করিলেন বিদ্রোহের সূচনা হইতেছে, পরদিন সম্পাদক ও দুই এক জন প্রধান লেখককে আর কেহই দেখিতে পাইল না; তাহাদের বন্ধু বান্ধব তাহাদিগকে দুই এক দিন অনুসন্ধান করিয়া নিরস্ত হইল। তাহাদের আর কোন সম্বাদ পাওয়া গেল না। হয়ত তাহারা শ্বেত সাগরের উপকূলে কিম্বা দূর সাইবেরিয়াস্থ কোন দুর্গে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; পত্রের দ্বারাও বন্ধুদের তত্ত্ব লওয়া অসম্ভব।

সম্পাদকের বৈঠক।

১

গভীর গভীরতম হৃদয় প্রদেশে,
নিভৃত নিরালা ঠাঁই, লেশ মাত্র আলো নাই,
লুকানো এ প্রেমসাধ গোপনে নিবসে,
শুদ্ধ যবে ভালবাসা নয়নে তোমার,
ঈষৎ প্রদীপ্ত হয়, উচ্ছ্বসয়ে এ হৃদয়,
ভয়ে ভয়ে জড়সড় তখনি আবার।

২

শূন্য এই মরমের সমাধি-গহ্বরে,
জ্বলিছে এ প্রেমশিখা চিরকাল তরে,
কেহ না দেখিতে পায়, থেকেও না থাকা প্রায়,
নিভিবারো নাম নাই নিরাশার ঘোরে।

৩

যা হবার হইয়াছে—কিন্তু প্রাণনাথ!
নিতান্ত হইবে যবে এ শরীরপাত,
আমার সমাধি স্থানে, কোর নাথ কোর মনে,
রয়েছে এ কে দুঃখিনী হয়ে ধরাসাৎ।

৪

যতই যাতনা আছে দলুক আমায়,
সহজে সহিতে নাথ সব পারা যায়,
কিন্তু হে তুমি যে মোরে, ভুলে যাবে একেবারে
সে কথা করিতে মনে হৃদি কেটে যায়।

৫

রেখো তবে এই মাত্র কথাটী আমার,
এই কথা শেষ কথা, কথা নাহি আর,

(এ দেহ হইলে পাত, যদি তুমি প্রাণনাথ,
প্রকাশো আমার তরে তিলমাত্র শোক,
ধর্ম্মতঃ হবে না দোষী দোষিবে না লোক—
কাতরে বিনয়ে তাই, এই মাত্র ভিক্ষা চাই,
কখনো চাহিনে আরো কোন ভিক্ষা আর,)
যবে আমি যাব ম'রে, চির এ দুঃখিনী তরে,
বিন্দুমাত্র অশ্রুজল ফেল এক বার—
আজন্ম এত যে ভালবেসেছি তোমায়,
সে প্রেমের প্রতিদান, একমাত্র প্রতিদান,
তা বই কিছুই আর দিও না আমায়।

বায়রণ।

১

যাও তবে প্রিয়তম সুদূর সেথায়,
লভিবে সুযশ কীর্ত্তি গৌরব যেথায়,
কিন্তু গো একটী কথা, কহিতেও লাগে ব্যথা,
উঠিবে যশের যবে সমুচ্চ সীমায়,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমায়—
সুখ্যাতি অমৃত রবে, উৎফুল্ল হইবে যবে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমায়।

২

কতযে মমতা মাখা, আলিঙ্গন পাবে সখা,
পাবে প্রিয় বান্ধবের প্রণয় যতন,
এহ'তে গভীরতর, কতই উল্লাসকর,
কতই আমোদে দিন করিবে যাপন,
কিন্তু গো অভাগী আজি এই ভিক্ষা চায়,
যখন বান্ধব সাথ, আমোদে মাতিবে নাথ,
তখন অভাগী বলে স্মরিও আমায়।

৩

সুচারু সায়াহ্নে যবে ভ্রমিতে ভ্রমিতে,
তোমার সে মনোহরা, সুদীপ্ত সাঁজের তারা,
সেখানে সখা গো তুমি পাইবে দেখিতে—
মনে কি পড়িবে নাথ, এক দিন আমা সাথ,
বনভূমি ফিরে যবে আসিতে ভবনে—
ওই-সেই সন্ধ্যাতারা, দুজনে দেখেছি মোরা,
আরো যেন জ্বল জ্বল জ্বলিত গগনে।

৪

নিদাঘের শেষা শেষি, মলিনা গোলাপ রাশি,
নিরখি বা কত সুখী হইতে অন্তরে,
দেখি কি স্মরিবে তায়, যেই অভাগিনী হায়
গাঁথিত যতনে তার মালা তোমা তরে।
যে হস্ত গ্রথিত ব'লে তোমার নয়নে
হত তা সৌন্দর্য্য মাখা, ক্রমেতে শিখিলে সখা
গোলাপে বাসিতে ভাল যাহারি কারণে—
তখন সে দুঃখিনীকে কোরো নাথ মনে।

৫

বিষণ্ণ হেমন্তে যবে, বৃক্ষের পল্লব সবে
শুকায়ে পড়িবে খ'সে খ'সে চারি ধারে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমারে।
নিদারুণ শীত কালে, সুখদ আগুন জ্বেলে,
নিশীথে বসিবে যবে অনলের ধারে,
তখন স্মরিও নাথ স্মরিও আমারে।
সেই সে কল্পনাময়ী সুখের নিশায়,
বিমল সঙ্গীত তান, তোমার হৃদয় প্রাণ
নীরবে সুধীরে ধীরে যদি গো জাগায়—
আলোড়ি হৃদয়-তল, এক বিন্দু অশ্রুজল,
যদি আঁখি হ'তে পড়ে সে তান শুনিলে,
তখন করিও মনে, এক দিন তোমা সনে,
যে যে গান গাহিয়াছি হৃদি প্রাণ খুলে,
তখন স্মরিও হায় অভাগিনী ব'লে।

মূর।

আবার আবার কেন রে আমার,
সেই ছেলে বেলা আসে না ফিরে,

হরষে কেমন আবার তা হোলে,
সাঁতারিয়ে ভাসি সাগরের জলে,
খেলিয়ে বেড়াই শিখরী শিরে!
স্বাধীন হৃদয়ে ভাল নাহি লাগে,
ঘোরঘটাময় সমাজধারা,
না, না, আমি রে যাব' সেই স্থানে,
ভীষণ ভূধর বিরাজে যেখানে,
তরঙ্গ মাতিছে পাগল পারা!
অয়ি লক্ষ্মী, তুমি লহ লহ ফিরে,
ধন ধান্য তুমি যা দেছ মোরে,
জাঁকালো উপাধি নাহি আমি চাই,
ক্রীতদাসে মম কোন সুখ নাই,
সেবকের দল যাক্ না সোরে!
তুলে দাও মোরে সেই শৈল পরে,
গরজি ওঠে যা সাগর-নাদে,
অন্য সাধ নাই, এই মাত্র চাই,
ভ্রমিব সেথায় স্বাধীন হৃদে!
অধিক বয়স হয় নে ত মম,
এখনি বুঝিতে পেরেছি হায়,
এ ধরা নহে ত আমার কারণে,
আর মম সুখ নাহি এ জীবনে,
কবে রে এড়াব এ দেহ দায়!
একদা স্বপনে হেরেছিনু আমি,
সুবিমল এক সুখের স্থান,
কেন রে আমার সে ঘুম ভাঙ্গিল;
কেন রে আমার নয়ন মেলিল,
দেখিতে নীরস এ ধরা খান!
এক কালে আমি বেসে ছিনু ভাল,
ভালবাসাধন কোথায় এবে,
বাল্য সখা সব কোথায় এখন—
হায় কি বিষাদে ডুবেছে এ মন,
আশারো আলোক গিয়েছে নিবে!
আমোদ-আসরে আমোদ-সাথীরা,
মাতায় ক্ষণেক আমোদ রসে,
কিন্তু এ হৃদয়, আমোদের নয়,
বিরলে কাঁদি যে একেলা বোসে!
উঃ কি কঠোর, বিষম কঠোর,
সেই সকলের আমোদ রব,
শত্রু কিম্বা সখা নহে যারা মনে,
অথচ পদ বা বিভব কারণে,
আমোদ-আসরে মিশেছে সব!
দাও ফিরে মোরে সেই সখা গুলি,
বয়সে হৃদয়ে সমান যারা,
এখনি যে আমি ত্যেজিব তা হ'লে,
গভীর নিশীথ আমোদীর দলে,
হৃদয়ের ধার কি ধারে তারা!
সর্ব্বস্ব রতন, প্রিয়তমা ওরে,
তোরে ও সুধাই একটি কথা,
বল দেখি কিসে আর মম সুখ,
হেরিয়েও যবে তোর হাসি মুখ,
কমে না হৃদয়ে একটি ব্যথা!
যাক্ তবে সব, দুঃখ নাহি তায়,
শোকের সমাজ নাহিক চাই,
গভীর বিজনে মনের বিরাগে,
স্বাধীন হৃদয়ে ভাল যাহা লাগে,
সুখে উপভোগ করিব তাই!
মানব-মণ্ডলী ছেড়ে যাবো যাবো,
বিরাগে কেবল, ঘৃণাতে নয়,
অন্ধকারময় নিবিড় কাননে,
থাকিব তবুও নিশ্চিন্ত মনে,
আমারো হৃদয় আঁধারময়!
কেন রে কেন রে হ'ল না আমার,

কপোতের মত বায়ুর পাখা,
তা হ'লে তেজিয়ে মানব-সমাজ,
গগনের ছাদ ভেদ করি আজ,
থাকিতাম সুখে জলদে ঢাকা! বায়রণ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বঙ্গ-বিজেতা।—শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। সাপ্তাহিক সংবাদ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৹ মাত্র।

এই সুন্দর পুস্তক খানি যদিও আমরা অল্পদিন হইল পাইয়াছি তবুও ইহার সমালোচনা করা বাহুল্যমাত্র। কারণ, উপন্যাস-প্রিয় পাঠক মাত্রেই ইহার চমৎকারিতা ও পারিপট্যের সহিত বিশিষ্টরূপে পরিচিত আছেন।

মাধবীকঙ্কণ।—ঐ—ষ্ট্যানহোপযন্ত্রে মুদ্রিত।

এই পুস্তক খানিও বঙ্গবিজেতার ন্যায় এক খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু ইহাতে উপন্যাসের ভাগ অতি সঙ্কীর্ণ, এবং যতটুকু আছে তাহাও অতি অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ইহার উপন্যাসের ভাগ সামান্য হওয়াতে কোন ক্ষতি হয় নাই, যেহেতু ইহার ঐতিহাসিক উপাদানটুকু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। অরঙ্গজীবের ভ্রাতৃবিরোধ, তৎসাময়িক রাজপুতদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা, দিল্লীর সম্রাটদের আমোদ ও বিলাসপ্রিয়তা সকলই অতি মিষ্ট ও সরল ভাষায় পরিপাটীরূপে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

ভার্গববিজয় কাব্য।—শ্রী গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। আল্‌বর্ট প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৷৹ মাত্র। এই পুস্তকখানির ছন্দে গ্রথিত শব্দতালিকা দেখিয়া ইহাকে বাঙ্গলায় অমরকোষ বলিয়া আমাদের প্রথমে ভ্রম হইয়াছিল। শেষে গ্রন্থকারের স্বকৃত টীকার সাহায্যে পুস্তকের ভিতর কতকটা প্রবেশ করিতে পারিয়া বুঝিতে পারিলাম যে গ্রন্থখানি একখানি মহাকাব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে গ্রন্থকার অনুগ্রহ করিয়া সকল স্থানের টীকা করেন নাই, সুতরাং আমরা সকল স্থানের অর্থ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। যেমন—

"হাসিছে দিগ্বধূবৃন্দ তমোহা মিহিরে
হেরি উদয়াদ্রি চূড়ে, ভূষি সুভূষণে
বাল-বিভাবসু-বসু-রাজী-সুসম্পৃক্ত—
নির্নীর উদয়-নীরধর-খণ্ড-বাসা,
যথা স্বীয়া-সানুরতা-প্রিয়া, সমাগত
হেরি প্রাণ প্রিয়তম পতিরে (প্রবাসী)
সাগ্রহে সুপরিগ্রহি' মনোজ্ঞ বিগ্রহ
কৌসুম্ভ-রঞ্জিত তনু-অংশুক-সংপিহি
সিহরিয়া সান্দ্রানন্দ সন্দোহের সহ
সুহসিতাননে আসি সম্ভাষে, সুন্দরী।"

আমরা এই বিভীষিকাময় বীচিসঙ্কুল কাব্যাম্বুধি মন্থন করিতে অপারগতা স্বীকার করিলাম।

ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত। শ্রী প্যারিচাঁদ মিত্র প্রণীত। নূতন আর্য্য যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ✓০ আনা। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ খানির জন্য আমরা সরল হৃদয়ে গ্রন্থকারকে কৃতজ্ঞতা উপহার দিতেছি। যদিও মহানপ্রকৃতি ডেবিড হেয়ারের নামে বঙ্গবাসী মাত্রেরই দেহ লোমাঞ্চিত হয়, তবুও তাঁহার উদারতা ও মমতার অনেকগুলি কার্য্য বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অনবগত ছিলাম। পুস্তক খানি পাঠ করিয়া হেয়ারসাহেবকে দেবাদিস্ট প্রকৃত বঙ্গমিত্র বলিয়া মনে হয়।

এই গ্রন্থখানির উদ্দেশ্য অতি মহৎ, ভাষা অতি সরল, এবং মূল্যও অতি সামান্য। সুতরাং ভরসা করি ইহা বঙ্গবাসী মাত্রেই একবার পাঠ করিবেন।

কাশীমাহাত্ম্য।—শ্রী বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আনা। এই পুস্তকখানি খুলিয়া প্রথমেই দেখিলাম "হুগলী জেলার অন্তর্গত বলরামের গড় অর্থাৎ বলাগড় নিবাসী ৺ বলরাম ঠাকুরের কনিষ্ঠাত্মজ ৺ ভৃগুরাম মুখোপাধ্যায়, তস্য পুত্র ৺ কৃষ্ণরাম মুখোপাধ্যায়, তস্য পুত্র ৺ গৌরীচরণ মুখোপাধ্যায়, তস্য পুত্র ৺ দেবীচরণ মুখোপাধ্যায়, তস্য পুত্র ৺ রামধন মুখোপাধ্যায়, তস্য পুত্র শ্রী বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় প্রণীত।" পুস্তকখানিকে মকদ্দামার আর্জি মনে করিয়া আর পড়িতে সাহস হইল না।

আর্য্যদর্পণ।—শ্রী বৈদ্যনাথ বরাট দ্বারা সপ্রমাণ শুদ্ধ যুক্তিমূলক প্রণীত ও প্রকাশিত। কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ মাত্র। এই পুস্তকের টাইটেল পেজেই ত বরাটমহাশয় "দ্বারা সপ্রমাণ শুদ্ধ যুক্তি মূলক প্রণীত ও প্রকাশিত" পড়িয়া অর্থ নির্ণয়ে অপারগ হইলাম। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া গ্রন্থকারের চিন্তাশীলতা ও ভাবুকতা কতক সুখ্যাতির যোগ্য মনে হইল। তাঁহার পুস্তকের উদ্দেশ্য তিনি আপনি এইরূপে প্রকটিত করিয়াছেন— "এই সংক্ষিপ্ত আর্য্যদর্পণ একটি ক্ষুদ্ররক্ষ স্বরূপ, ব্রহ্মনির্ণয় ইহার মূল, আর্য্যধর্ম্ম সারযুক্ত স্কন্ধ, সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শাখা প্রশাখা ও পত্র, রূপক বর্ণনায় ঈশ্বরের সাকার সাকারত্ব—পুষ্প, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা ও বস্ত্র হরণ—ফল, এবং আর্য্য ভাষায় নারায়ণের স্তব—মধুর রস। এই সামান্য বৃক্ষটি আমার ন্যায় অজ্ঞ মালীর দ্বারা রোপিত হওয়ায় ইহাতে পোকামাকড় প্রভৃতি নানাবিধ দোষ জন্মিয়াছে।" কিন্তু আমাদের বোধ হয় এত পোকা মাকড় না জন্মাইতে দিয়া বিনীতস্বভাব মালীমহাশয় যদি বৃক্ষটিকে আদৌ উপড়াইয়া ফেলিতেন তাহা হইলে সাহিত্যক্ষেত্রের বিশেষ কোন ক্ষতি হইত না।

পদ্য লতা।—প্রথম ভাগ। শ্রীপবন চন্দ্র মারিক প্রণীত। বীডন যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহা এক খানি 'সুকুমারমতি শিশুদের পাঠ্য পদ্য গ্রন্থ'। কিন্তু ইহার প্রথম প্রবন্ধ "ঈশ্বরের মহাত্ম্যে" লিখিত আছে—

"চৈতন্য স্বরূপ তিনি, কিন্তু নিরাকার,
উপযুক্ত দিতেছেন সবার আহার।"

সুকুমারমতি শিশুরা ইহার ভাবার্থ কি বুঝিবে? আর যাহারা ভাবার্থ বুঝিতে পারিবে তাহারা সহজেই জিজ্ঞাসা করিবে যে প্রথম পংক্তিতে "কিন্তু" শব্দের সার্থকতা কোথায়?

আর এক স্থলে
"পরিশ্রম পরাঙমুখ যে জাতি হইয়া,
স্বভাবজ দ্রব্যে কিন্তু যথেচ্ছা খাইয়া,
উদর পুরণ করে পশুর মতন,
তাদের অসভ্য জাতি বলে সর্ব্বজন।"

শিশুদের জন্য ইহা অপেক্ষা ভাষা সরল হওয়া উচিত।

বোম্বাই রায়ৎ।

দ্বিতীয় ভাগ।

রায়তওয়ারী বন্দবস্ত ও তাহার দোষগুণ ভারতীর পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় সংক্ষেপে এক প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে, এইক্ষণে এই বন্দবস্তের অধীনস্থ প্রজাদিগের অবস্থা আলোচনা করা যাউক। ইহা কাহারো অবিদিত নাই যে বোম্বাই রায়তের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ফসলের মূল্যবৃদ্ধি—বিশেষতঃ তুলার ব্যবসার উন্নতি বশত ১৮৬০ শাল হইতে ১৮৭০ পর্য্যন্ত রায়তের যে শ্রীবৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যাইতেছিল তাহা জিনিসের দরের (পুনঃ) পতন ও স্থানে স্থানে খাজনাবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে। মহারাস্ট্রেই বল, গুজরাটেই বল, এদেশের কৃষিদল ঋণপাশে এরূপ জড়িত যে তাহা হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি লাভের উপায় নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। মহারাস্ট্রের মহাজনেরা অধিকাংশ মারওয়াড়ী, গুজরাটে অধিকাংশ বনিক-জাতীয় লোক উত্তমর্ণ ব্যবসায়ী, কোন রায়তের হয়ত বলদ গিয়াছে—বণিক অমনি তাহাকে নূতন বলদ কিনিবার জন্য টাকা ধার দিতে প্রস্তুত, অথবা কোন কুণবীর পুত্রের বিবাহ কিম্বা পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্য টাকার প্রয়োজন এই সকল উপলক্ষ্যে মহাজনের আশ্রয় ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। অনেক সময় রায়তের গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিবার সঙ্গতি হয় না—তাহা না দিলেও তাহার স্বত্ব নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়—অগত্যা তাহাকে বনিকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এইরূপে যে কোন কারণেই হউক, একবার সাহুকারের * ঋণজালে আবদ্ধ হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। মহাজনের নিকট ধার করিতে হইলে মাসে শতকরা দুই টাকা সুদের—নিদান পক্ষে এক টাকার হিসাবে ধার করিতে হয়। ধার করিতে হইলে রায়ত খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। সে নিজে ত লেখা পড়ার ধার ধারে না—হিসাব করিয়া ঋণের টাকা নির্ণয় করা—সে সকলি মহাজন ও তাহার আশ্রিত জনের কথার উপর নির্ভর। কখন কখন যে সুদ ভবিষ্যতে উৎপন্ন হইবে তাহা আগে হইতেই আসল টাকার সঙ্গে মিলিত করিয়া ঋণের সংখ্যা নিরূপিত হয়, অর্থাৎ রায়ত হয়ত ৮০ টাকা ধার করিতেছে কিন্তু তাহার ভাবি সুদ কসিয়া হয়ত তাহাকে এক শত টাকার খত লিখিয়া দিতে হয়—তাহার উপর নিয়মিত কাল অতীত হইলে নিয়মিত দরের সুদ সঞ্চিত হইতে থাকে। খত প্রস্তুত হইলে রায়ত হয়ত তাহার নীচে হলাকৃতি চিহ্নে নিজের নাম স্বাক্ষর করে। সেই সময়ে মহাজনের দোকানে যদি কেহ উপস্থিত থাকে কিম্বা রাস্তা হইতে লোক ডাকিয়া তাহাদের নাম

* মহাজনকে এদেশে সাহুকার বলে।

খতের উপর সাক্ষীস্বরূপ স্বাক্ষরিত হয়। অনেকস্থলে লেখক ও সাক্ষীর ব্যবসাই খত লেখা, সাক্ষর করা ও কোর্টে উপস্থিত হইয়া স্বাক্ষ্য প্রদান করা—ইহাদের সাক্ষ্যের কত মূল্য তাহা অনায়াসেই অনুধাবন করা যা-ইতে পারে। খত লিখিবার সময় রায়তের সঙ্গে সঙ্গে তাহার একজন জামীন উপস্থিত থাকে, ও কখনো বা তাহার বৃদ্ধ মাতা কিম্বা স্ত্রীকে সাহুকার তাহার ঋণপাশে বদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত থাকে না। তাহার কারণ এই, টাকা আদায়ের সুবিধা। বৃদ্ধ মাতার কি গৃহিণীর কারাবাস-ভয়ে রায়ত যেমন করি-য়াই হউক ঋণ শোধ করিতে তৎপর হয়। যখন আগামী বৎসরের ফসল প্রস্তুত হয়, আর গবর্ণমেণ্টের টাকা মুখী কিম্বা তলাটীর হস্তে গচ্ছিত হয়, তখন সাহুকার রায়তের দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। অনেক কা-কুতি মিনতির পর রায়ত আপনার সংসার খরচের জন্য যৎকিঞ্চিৎ হাতে রাখিয়া অব-শিষ্ট সুদের টাকা বলিয়া হয়ত মহাজনের হস্তে অর্পণ করে। দেনা বৃদ্ধি হইলে মহা-জন হয়ত সমস্ত ফসলই গৃহে লইয়া যায়, ও রায়ত যখন আপনার পরিবার পোষণের জন্য অল্প কিছু প্রার্থনা করে তখন সাহু-কার তাহাকে বুঝাইয়া দেয়—তোর ভাবনা কি? তোর যখন যাহা প্রয়োজন হইবে আমার দোকান হইতে সকলি পাইবি। পর বৎসরে শস্য বপন করিবার বীজ চাই, রায়ত অমনি মহাজনের দ্বারে গিয়া উপ-স্থিত। মহাজন তাহাকে বীজ ধার দেয়; ধারের নিয়ম এই যে, শস্য পরিপক হইলে ঋণের দ্বিগুণ ত্রিগুণ শস্য সুদ সমেত প্রত্য-র্পণ করিতে হইবে। এইরূপে বীজ বপনের জন্য—জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রতিবৎসর তাহাদের বনিকের দোকানে ধার করিতে হয়। পর বৎসর ফসল কাটিবার সময় উপস্থিত, কিন্তু এইরূপে গবর্ণমেণ্টের খাজনা দিয়া যাহা কিছু উদ্বৃত্ত হয় তাহা গত বৎ-সরের দেনার সুদ পরিশোধ করিতে গিয়া সকলি নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই সুদ ক্রমে মূল ধনের উপর সঞ্চিত হইয়া কর্জ্জ ক্র-মিক বাড়িয়া যায়, ও যখন খত তামাদি হই-বার উপক্রম হয় তখন মহাজন অবসর বু-ঝিয়া সুদের হিসাব করিয়া বর্দ্ধিত আকারে এক নূতন তমসুক প্রস্তুত করিয়া লয়। এ-বার কিন্তু সহজ তমসুকে সাহুকার সন্তুষ্ট নয়, তাহার সঙ্গে বন্ধক চাই—রায়তের ক্ষেত্র ও বসত বাটী বন্ধক লিখিয়া এক নূতন তমসুক লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয়। এই প্রকারে গরীব বেচারী আটে ঘাটে এরূপ বদ্ধ হইয়া পড়ে যে তাহার পলাইবার পথ থাকে না। অবশেষে যখন দেনা পরিশোধ করিবার আর তাহার কিছুমাত্র সঙ্গতি থাকে না, তখন মহাজন তাহার তমসুক লইয়া রায়তের বিরুদ্ধে আদালতে মকদ্দামা উপস্থিত করে। এই সকল মকদ্দামার অধিকাংশ রায়তের অবর্ত্তমানেই নিষ্পত্তি হয়। খতের লেখক ও এক স্বাক্ষরকারীর সাক্ষ্য লইয়া জজ স্ব-কীয় কোর্ট হইতে ডিক্রী বাহির করেন। সেই ডিক্রী জারী হইয়া রায়তের ঘর জমি সকলি অল্প মূল্যে নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়। অনেক সময় মহাজন নিজেই হয়ত তা-

হার সমুদয় সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লন। মহাজন রায়তের জমী লইয়া কি করিবেন, তিনি কিছু নিজ হাতে চাস করিতে পারেন না, সুতরাং রায়তকেই হয়ত তাহা ইজারা দিয়া পাট্টা লিখিয়া লন। যে রায়ত এক কালে ভূস্বামী ছিল সে হয়ত মহাজনের কোরপা প্রজা হইয়া সেই জমি উগভোগ করে, ও কখনো বা তাহার দাসত্ব করিয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে দিনপাত করিতে বাধ্য হয়।

রায়ত-মক্ষিকার উপর মহাজন-মাকড়সার-জাল অল্পে অল্পে কিরূপে বিস্তৃত হয় তাহা বলা হইল। কিন্তু এই ত গেল সাধারণ নিয়ম। এতৎব্যতীত কত সময় কত জাল তমসুক—হিসাবে কত প্রতারণা—মিথ্যা মকদ্দমা প্রভৃতি সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া মহাজন রায়তের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হয়; তাহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত আদালতের দফতরে দেখিতে পাওয়া যায়।

রায়তেরা যে বিষম ঋণভার-প্রপীড়িত তাহার উদাহরণ দক্ষিণ রায়তদের উপর যে কমিসন বসিবার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার রিপোর্টে অনেক সংগৃহীত দেখা যাইবে।

মহাজনদের খাতা হইতে কতকগুলি কৃষকের কর্জের হিসাব পর্য্যবেক্ষণে প্রকাশ পাইতেছে যে যে টাকা ধার দেওয়া গিয়াছে তাহার সমষ্টি ৪৯১৭ টাকা—যত টাকা শোধ হইয়াছে তাহার সমষ্টি ৫৯১৮ আর তাহা দিয়া এখনো ৫৯০৬ টাকা বাকি দেনা করিয়াছে। এতদ্ব্যতিরিক্ত মনে রাখিতে হইবে যে প্রজারা এই বলিয়া অনেক সময় হাহাকার করে যে খতপত্রে যত টাকা দেনা বলিয়া লিখিত আছে তাহার সম্পূর্ণ তাহারা পায় নাই, কিম্বা ধার শুধিতে তাহারা যত টাকা মহাজনকে গনিয়া দিয়াছে তাহা তাহাদের হিসাবে জমা হয় নাই।

ঐ রিপোর্ট হইতে আরো কতকগুলি দৃষ্টান্ত দেখাইলে রায়তদের দৈন্যাবস্থা পাঠকদিগের বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

কত্তিরে পরিবার, যাহারা পার্ণেজ গ্রামের পাটেলকী কর্ম্ম বংশপরম্পরা ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহারা দক্ষিণ দেশের নামাঙ্কিত পরিবার মধ্যে গণ্য ছিল। বার বৎসর হইল তাহাদের গৃহস্বামী ২০০ টাকা ধার করেন। তিনি ৩৩৫ টাকা প্রত্যর্পণ করেন, বাকি ৩৮৫ টাকার জন্য তাহার উপর মকদ্দামা আনা হয়, তাহাতে ভূমি সম্পত্তি—প্রায় ৪০ বিঘা জমি নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়, ও এক্ষণে তিনি দাসত্ব করিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। বালাজী আট টাকা ধার করিয়া ১৫টাকা দেনা পরিশোধ করেন। মহাজন তাঁহার উপর ৩০ টাকা ডিক্রী পাইয়া সেই ডিক্রীজারী করিয়া তাহার ৪০বিঘা জমি ও ১২ টা বলদ বিক্রী করাইয়া স্বয়ং তাহা কিনিয়া লন। শ্রীপতি এক মন দানা (দাম তার বড় জোর ৪ টাকা) ধার করিয়া প্রত্যর্পণ করেন। সুদের জন্য তাঁহাকে ১৫ টাকার খত সুদ শুদ্ধ লিখিয়া দিতে হয়। আবার দেনা শুধিবার জন্য উত্যক্ত হইলে সে দশ টাকা নগদ দিয়া ২৫ টাকার এক সু-

ত্তন খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। ২৫টাকা শুধিবার জন্য মহাজনের চাকরীতে নিযুক্ত হয়, ও অবশেষে মকদ্দমার হাঙ্গামে পড়িয়া তাহার বসতবাটী ও জমি ৬ টাকায় বিক্রয় হইয়া যায়। রাওজী ১৫ বৎসর পূর্ব্বে ৬০ টাকা ধার করে। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সে মহাজনকে ১০০ টাকা নগদ ২২৫ টাকার শস্য ৪ টা বলদ ১টা ঘোড়া ও তিনটা ক্ষেত্র বন্ধক দিয়াও এখনো সে দেনা হইতে নিষ্কৃতি লাভে সমর্থ হয় নাই। ১১ বৎসর পূর্ব্বে আনন্দজী দোকানের দেনার জন্য ২৫ টাকার একখত লিখিয়া দেয়, আর এক্ষণে তাহার আবশ্যক কতকগুলি জিনিস পত্র আছে কিন্তু হাতে নগদ টাকা নাই। সে তাহার মহাজনকে একটী ক্ষেত্র ৮ বলদ ও ৪ গো দান করিয়াছে। একে একে ৫০।১০০ ২০০।৩০০।৩৫০ টাকার খত লিখিয়া দিয়াছে ও এক্ষণে তাহার দেনা ৫০০ টাকায় বর্দ্ধিত হইয়াছে। লক্ষ্মণ ৮টাকার কাপড় কিনিয়া ঋণগ্রস্ত হয়—রামজী তাহার জামীন হয়। লক্ষ্মণ তিন টাকা শোধ দিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। সাহুকার রামজীকে পেড়াপীড়ি করাতে সে তিন বৎসর হইল ২২টাকার এক খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। গত বৎসরে সেই খতের সর্ত্তে তাহার উপর মকদ্দামা আনিয়া মহাজন খরচা সমেত এক ৫৬ টাকার ডিক্রী করিলেন। ডিক্রীজারী হইবার পরে সে ২২ টাকা নগদ দিয়া ৪৫ টাকার এক নূতন খত লিখিয়া দেয়। বিবিজান নামক একজন বৃদ্ধা বিধবা স্ত্রী তার পুত্রের বিবাহের জন্য অনেক বৎসর হইল ১৫০ টাকা কর্জ্জ করে। ১৩ বৎসর পূর্ব্বে এই দেনার জন্য সে ৩০০ টাকার এক বন্ধক খত লিখিয়া পাতকুয়া শুদ্ধ ২০ বিঘা জমি তাহার হস্তে বন্ধক রাখে। সেই অবধি মহাজন তার সমুদায় উপস্বত্ব ভোগ করিতেছে, সে হিসাবও দিবে না, জমি ফেরত দিতেও চায় না। বিশ বৎসর হইল আজু নামক এক ব্যক্তি ১৭ টাকা নগদ ও এক মন দানা ধার করিয়াছিল। সেই দেনা শোধ করিতে সে ভিন্ন ২ সময়ে ৫৬৭ টাকা দিয়াছে, অনেকগুলি খত লিখিয়া দিয়াছে তাহার দুইটির দরুণ ৮৭৫ টাকা এখনো পর্য্যন্ত অদেয় রহিয়াছে।

বোম্বাই রায়তের অবস্থা কতদূর শোচনীয় তাহা উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি হইতে সহজে প্রতীয়মান হইবে। এইরূপ ধার্য্য হইয়াছে * যে, কোন এক প্রদেশে ৬০০ জন রায়তের অবস্থা দেখিতে গেলে তাহাদের ঋণের পরিমাণ ৩ কোটি টাকারও অধিক দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ তাহাদের দেনা গবর্ণমেণ্টের সদর খাজনার ১৬গুণ ও মোট বার্ষিক উপস্বত্বের প্রায় ১॥০ গুণ হইবে। ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে বিগত ১৫ বৎসরের মধ্যে যে কালের প্রারম্ভে মহারণী স্বয়ং রাজ-ভার গ্রহণ করাতে সকলেই রায়তের ভাবী মঙ্গলের প্রত্যাশা করিতেছেন, যে কালের অভ্যন্তরে বিশুদ্ধ আইন ও আদালত সকল প্রতিষ্ঠিত হইল কোথায় তাহাতে রায়তদের শ্রীবৃদ্ধি হইবে-না তাহাদের ঋণভার শতগুণ

*Earmine and delt in India Ninetoneth century september. 1977.

বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে অনেক সময় মহাজনে ডিক্রীজারী করিয়া তাহার ঋণের ভূমি সম্পত্তি নিলামে বিক্রী করিয়া অল্প মূল্যে স্বয়ং কিনিয়া লয় তাহাতেও ডিক্রীর সমুদয় টাকা পরিশোধ হয় না। হতভাগ্য রায়তকে তাহার নিজের জমি অনেক খাজনা দিয়া মহাজনের নিকট হইতে পাট্টা লইয়া ভোগ করিতে হয়। না হয়ত জন্মভূমি ছাড়িয়া বিদেশে গিয়া তাহাকে নবজীবন আরম্ভ করিতে হয়। কথন কথন সে কতক বৎসরের জন্য হয়ত মহাজনের দাসত্ব স্বীকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হয়। কমিসনরগণ একজন রায়তের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে একজন রায়তের সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গেলে সে নিজে ও তাহার স্ত্রী বার্ষিক খাওয়া, তামাক ও একখানা করিয়া কম্বলের বিনিময়ে ১৩ বৎসর পর্য্যন্ত তাহার দেশ বিদেশ দাসত্ব স্বীকার করিয়া খত লিখিয়া দেয়।

কমিসনরগণ রায়তদের এইরূপ দুর্দ্দশার অনেক গুলি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৃহকার্য্য ও উৎসব ক্রিয়ার জন্য দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া ধার কর্জ্জ করা—গবর্ণমেণ্টের খাজনা আদায়ের কড়াক্কর নিয়ম—শস্য বিক্রয়ের উপযুক্ত বাজারের অভাব, এই সকল তাহার মধ্যে অবশ্য ধর্ত্তব্য।

রায়তদের দুরবস্থার প্রধান কারণ রায়তের অজ্ঞান ও ভীরুতা আর মহাজনের অত্যাচার। আদালত সকল এই অত্যাচারের এক অব্যর্থ হাতিয়ার। দুঃখের বিষয় যে আদালতে ন্যায় বিতরণ করিয়া কোথায় এই অত্যাচার নিবারণ করিবে, না তাহা হইতেই অন্যায় অত্যাচার আরো প্রশ্রয় পায়। আদালতের যে আইন ও কার্য্যবিধি তাহাতে গরীবের উপর ধনীর জয়—নিরীহ অজ্ঞানের উপর স্বার্থপর প্রখর-বুদ্ধির জয় এত ধরা কথা। ন্যায়ান্যায়-বিচারহীন বাদী যখন এক জন অজ্ঞান দীন হীন রায়তের বিরুদ্ধে মকদ্দমা উপস্থিত করে তখন সেই রায়তের পরাজয়ই অবশ্যম্ভাবী বলা যাইতে পারে। আইন আবার রায়তের উপর এরূপ খড়্গহস্ত যে মহাজনে একবার তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী বাহির করিতে পারিলেই তাহার যথাসর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইতে পারে—তাহার ঘর দ্বার ভূমি সম্পত্তি সমুদয়ই বিক্রীত হইয়া যায় ও অবশেষে হয়ত দেনার জন্য তাহাদের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। এদিকে আবার বিচারপতির হাতে যে অগাধ কর্ম্মভার, আদালতের যেরূপ কার্য্যপ্রণালী তাহাতে প্রত্যেক মকদ্দমার তন্ন তন্ন বিচার হইয়া উঠা এক প্রকার অসম্ভব—তাঁহারা ন্যায় অন্যায় না দেখিয়া আইনের প্রতিই দৃষ্টি করেন—তাঁহারা আইন মতে কার্য্য করিতে পারিলেই সন্তুষ্ট, সত্য-নির্ণয়ের জন্য সময় ব্যয় সময়ের অপব্যয়ই বিবেচনা করেন।

আদালতে যে অর্থী প্রত্যর্থী উপস্থিত হয়েন তাঁহারা আইনের চক্ষে উভয়েই সমান। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে রায়ত ও মহাজনের মধ্যে যে বিবাদ তাহা দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বলিষ্ঠ পাহালওয়ানের মল্ল যুদ্ধের ন্যায়।

মকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী যতই সহজ হউক না কেন, সামান্য রায়তের পক্ষে তাহাই নিতান্ত দুরূহ, তাহাতেই সে থত মত খাইয়া যায়। যদি কোন রায়ত মহাজনের বিরুদ্ধে দ্বন্দ-যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হয়—প্রথমতঃ তাহাকে গ্রাম ছাড়িয়া, কাজ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কত দূরে আসিয়া সংগ্রাম করিতে হইবে—তার পর স্ট্যাম্পের ব্যয় ও উকীল খরচা, কত কারণে মকদ্দমা স্থগিত হইতেছে ও তাহার পুনঃপুনঃ আদালতে আসিয়া কস্ট ভোগ—তার পর নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করা সেও তাহার পক্ষে সহজ নহে। এই সকল কারণে বুঝিতে পারা যায় মকদ্দমার সময় কেন প্রতিবাদিগণ প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে। নথি অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে শত করা ৯০ মকদ্দমা রায়তের অবর্ত্তমানেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। আর এই সকল ধার কর্জ্জের মামলায় শতের একটাতে যদি রায়তে জয়লাভ করিতে পারে তাহাই ঢের অর্থাৎ একশতের মধ্যে এক জন রায়ত যদি মহাজনের ষড়চক্রের বিরুদ্ধে জয়লাভে সমর্থ হয় তবে তার ভাগ্য বলিতে হইবে। এ অতি ভয়ানক কথা। ফৌজদারী মকদ্দমায় এ অপেক্ষা সুবিচারের সম্ভাবনা। যদি চুরির অভিযোগ আনিয়া কাহারো বিরুদ্ধে নালিশ করা যায় সে হয়ত দুই এক মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারে, কিন্তু সে বিচারের সময় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সাক্ষীদের জেরা করিতে পারে, শত্রুর অভিযোগ খণ্ডন করিতে পারে—আপনার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে সমর্থ হয়।

মকদ্দমার ব্যয়বাহুল্য হেতু যে রায়তেরা অনেক সময় মকদ্দমা চালাইতে অক্ষম হইয়া মিথ্যাবাদী বাদীর নিকটেও পরাভূত হয় তাহা রায়ত কমিসনরগণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে মকদ্দমার ব্যয়াধিক্য গরীব রায়তদের পক্ষে গুরু-ভার-জনক। এই ব্যয় যদি মকদ্দমার ন্যায্য খরচার অধিক না হইত তবে কিছু বলিবার থাকিত না। কিন্তু দেখিতে গেলে স্টাম্প ও কোর্ট ফী হইতে যে রাজস্ব উৎপন্ন হয় তাহা হইতে মূল ও আপীল কোর্টের সমুদয় খরচা বাদেও এই বোম্বাই প্রেসিডেন্সির জন্যই প্রায় ৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়।

মকদ্দমার ব্যয় বাহুল্য প্রতিপাদন করিবার জন্য এক্ষণকার আইন অনুসারে প্রতিবাদীর উপর কি কি খরচা পড়ে তাহা দেখাইলেই যথেস্ট হইবে। মনে কর এক খতের টাকা আদায়ের দাওয়া। প্রতিবাদীর বক্তব্য এই যে খতের টাকা সে পায় নাই। এই কথা সমর্থন করিবার জন্য তার চারি সাক্ষীর প্রয়োজন। সমন জারী হইয়াও তাহাদের মধ্যে এক জন সাক্ষী উপস্থিত হয় নাই। ইহাও অনুমান করা যাউক যে সেই মকদ্দমায় প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য এক জন উকীল নিযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ হইলে প্রতিবাদীর যে খরচ পড়িবে তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।—

	২৫ টাকার মকদ্দমায়	৫০ টাকার মকদ্দমায়
আরজীর উত্তর	,, ১	,, ৮
উকীল পত্রের উপর কোর্ট ফী	,, ৮	,, ৮
২ আনার হিসাবে ৪ সাক্ষীর সমন খরচ	,, ৮	,, ১
৩ আনার হিসাবে সাক্ষীর ভাতা খরচ	,, ১২	,, ১২
এক জন সাক্ষীর ওয়ারেণ্ট খরচ	,, ৪	,, ৮
নকলের জন্য কোর্ট ফী ইত্যাদি	,, ১২	,, ১২
উকীলের ফী	১ ,, ৪	২
সমষ্টি	৪ ,, ১	৬

উল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে প্রমাণ হইবে যে ২৫ টাকার মকদ্দমায় প্রায় দাওয়ার ষষ্ঠাংশ খরচ—৫০ টাকার মকদ্দমায় প্রায় অষ্টমাংশ। এক্ষণে যে ষ্টাম্প সংক্রান্ত আইন প্রবর্ত্তিত হইবার কথা হইতেছে তাহার বিধানানুসারে মকদ্দমার খরচ আরো বর্দ্ধিত হইবে। এই ব্যয়ভার লইয়া গরীব রায়তেরা চলৎশক্তি হীন। যাহাতে তাহারা আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিচারালয়ে সহজে উপস্থিত হইতে পারে তাহার জন্য মকদ্দমা সংক্রান্ত ব্যয়ের হ্রাস করা নিতান্ত আবশ্যক। নতুবা তাহাদের নিকট হইতে ন্যায়ের দ্বার এক প্রকার রুদ্ধ করা হয়। এইক্ষণকার আইন অনুসারে যে সকল খরচা বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই বহন করিতে হয় তাহা এইঃ—

১। কোর্টফী আইন অনুসারে আরজী দরখাস্ত-নকল প্রভৃতির উপর কোর্টফী।

২। শমন প্রভৃতির জন্য নির্দ্ধারিত কোর্ট ফী।

৩। সাক্ষীর ভাতা খরচ।

৪। ডাকের খরচ।

৫। উকীলের ফী।

৬। নকল লইবার খরচ।

ইহার প্রত্যেক বিষয়ে খরচ কমাইবার দিকে আইনকর্ত্তাদিগের লক্ষ্য থাকা উচিত। বিশেষতঃ অল্প টাকার মকদ্দমা সংক্রান্ত ফীর স্বল্পীকরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। দুই জন ধনীর মধ্যে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে উকীল মোক্তার আটর্ণীগণ ভূরি ভোজন করিয়া-লন তাহাতে তত ক্ষতি নাই কিন্তু ন্যায়-প্রার্থী গরীবের পথের কণ্টক তুলিয়া না দিলে তাহার আর কোন রূপে নিস্তার নাই। বরং গবর্ণমেণ্টের উচিত যে এই সকল লোকদের বিনা বেতনে উকীল পাই-বার সুবিধা করিয়া দেন—তাহা হইলে বাস্তবিকই তাঁহাদের রাজোচিত কার্য্য হয় ও তাঁহারা সহস্র সহস্র প্রজার আশীর্ব্বাদের পাত্র হয়েন। বিচারালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহই ষ্টাম্প ও কোর্টফী গ্রহণের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। অর্থী প্রত্যর্থীর নিকট হইতে টাকা লইয়া সাধারণ রাজস্ব বর্দ্ধিত করা কখন ন্যায়-পরায়ণ সুসভ্য গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য নহে।

আদালতে মকদ্দমা আনিবার দরুণ যে অর্থনাশ ও মনস্তাপ তাহা হইতে মুক্ত করি-বার এক সহজ উপায়, সালিসী বিচারের উত্তেজনা। গ্রামের পাঁচজনে মিলিয়া বিবাদ-ভঞ্জন-প্রথা এদেশের চিরন্তন প্রথা।

জাতি-সংক্রান্ত ও অন্যান্য বিবাদে এখনো পর্য্যন্ত ইহা প্রচলিত দেখা যায়। মহারাষ্ট্রীয় রাজত্ব কালে পঞ্চায়তের বিচারের উপর লোকেরদের বিশেষ আস্থা ছিল। এদেশে কথায় বলে "পঞ্চ পরমেশ্বর" অর্থাৎ পঞ্চের বিচার ঈশ্বরের বিচার সমান। Vox populi vox dei. মহারাষ্ট্রীয়দের আমলে সামান্যতঃ গ্রামের পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক সকল দেওয়ানী মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইত—হয় বাদী প্রতিবাদী স্বয়ং নয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই সকলের মীমাংসা পঞ্চায়তের হস্তেই সমর্পণ করিতেন। বেতনভুক্ কর্ম্মচারিগণ প্রায়ই সে সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এপ্রদেশে ইংরাজ রাজ্যের প্রারম্ভে কর্ত্তৃপক্ষগণ এই রীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। খৃষ্টাব্দ ১৮২৭ পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ পঞ্চায়তের উপরেই দেওয়ানী মকদ্দমার ভার নিক্ষেপ করিতেন,পঞ্চায়তের হুকুম অনুমোদন ও জারী করাই তাঁহাদের কার্য্য ছিল। ১৮২৭ এর দেওয়ানী আইন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে প্রচলিত হইলে পঞ্চায়ত সংক্রান্ত নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ হইয়া এক স্বতন্ত্র আইন (১৮২৭ এর ৭) সংসৃষ্ট হয়। লোকের মধ্যে পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ যাহাতে আপসে মিটিয়া যায় তাহার উত্তেজনা দেওয়াই ঐ আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ পঞ্চায়তের কার্য্যভার গ্রহণে আদিষ্ট। সত্য নিরূপণের জন্য যেরূপ প্রমাণ ও বিচারের আবশ্যক সেই সকল প্রমাণ সংগ্রহ করা ও সেইরূপ বিচার অবলম্বন করা পঞ্চায়তের ক্ষমতাধীন ছিল ও তাহাদের নিকট সাক্ষী হাজির করিবার ভার আদালতের উপর। তাহাদের ব্যবস্থার উপর ষ্টাম্প ছিল না ও তাহা আদালতে দাখিল হইলে ডিক্রীর সমান ফলোপধায়ী। তাহার উপর আপীল ছিল না। ১৮৫৯ এর ৮ আইন প্রচলিত হওয়া পর্য্যন্ত ঐ আইন জারী ছিল, ক্রমে তাহার নিয়ম সকল শিথিল হইয়া এই পঞ্চায়ত-প্রথা বিলুপ্তপ্রায় হইয়া অসিয়াছে।

সৌভাগ্য ক্রমে মহারাষ্ট্রীয় কতকগুলি দেশানুরাগী ব্যক্তি এই পুরাতন প্রথা পুনরুদ্দীপ্ত করিতে তৎপর হইয়াছেন ও তাঁহাদের যত্নে মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের স্থানে স্থানে সালিসী কোর্ট সকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল কোর্ট স্থাপন করিবার প্রযত্ন কয়েক বৎসর হইল পুণা জিলায় ইদাপুর নগরে প্রথম আরম্ভ হয়। এই সকল কোর্ট জন সাধারণের এত প্রার্থনীয় ও তখনকার আইন তৎস্থাপন পক্ষে এরূপ অনুকূল ছিল যে দুই বৎসরের মধ্যে পুণা, সাতারা, সোলাপুর, অহমদ নগর, ঘানা, রত্নাটগারী নামক, আহমদাবাদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরে সালিসী কোর্ট সকল স্থাপিত হয় ও তাহাদের শাখা আরো অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত হয়। জানুয়ারি ১৮৭৬ শালে পুণার 'লওয়াদ' কোর্টের কার্য্যারম্ভ হয়। পুণানগরবাসীদের এক সাধারণ সভাতে বিরেশী জন নানা শ্রেণীস্থ ভদ্রলোক কোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হয়েন। ইহাদের মধ্যে এক কিম্বা একাধিক জনকে বাদী প্রতিবাদিগণ ইচ্ছামত বাছিয়া লইয়া আ-

পনার বিবাদ নিষ্পত্তির ভার অর্পণ করিতে পারেন। বিচারকগণের পালায় পালায় অধিবেশন হয় ও তাঁহারা বিনা অর্থে কার্য্য করেন। এই পুণা কোর্টে দুই বৎসর মধ্যে প্রায় ৩সহস্র মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইয়াছে। এই ৩০০০ মকদ্দমা স্বল্প ব্যয়ে আপসে মিটিয়া গেল, আদালতে যাইতে হইলে কত অর্থ ও সময় ব্যয়—কত মিথ্যাসাক্ষী, কিরূপ মনঃপীড়া, এই সকল নিবারিত হইল—একি সামান্য লাভ!—এবিষয়ে পুণানিবাসী গণেশ বাসুদেব জোশী একজন প্রধান উদ্যোগী। এই দেশহিতৈষী ব্যক্তি ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া এই শুভ কার্য্যে দেশীয়দের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিতে ত্রুটি করেন নাই।

শ্রীস—

করুণা।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যাহ্ন। রৌদ্র ঝাঁঝাঁ করিতেছে। রাশি রাশি ধূলি উড়াইয়া গ্রামের পথ দিয়া মাঝে মাঝে দুই একটা গরুর গাড়ি মন্থর গমনে যাইতেছে। দুই এক জন মাত্র পথিক নিভৃত পথে হন্ হন্ করিয়া চলিয়াছে। স্তব্ধ মধ্যাহ্নে কেবল একটি গ্রাম্য বাঁশীর স্বর শুনা যাইতেছে, বোধ হয় কোন রাখাল মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া গাছের ছায়ায় বসিয়া বাজাইতেছে।

করুণা সমস্ত রাত চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত হইয়া গাছের তলায় পড়িয়া আছে। করুণা যে কোন কুটীরে আতিথ্য লইবে, কাহারো কাছে কোন প্রার্থনা করিবে সে স্বভাবেরই নয়। কি করিলে কি হইবে, কি বলিতে হয়, কি কহিতে হয়, তাহার কিছু যদি ভাবিয়া পায়। লোক দেখিলে সে ভয়ে আকুল হইয়া পড়ে—এক এক জন করিয়া পথিক চলিয়া যাইতেছে, করুণার ভয় হইতেছে, এইবার এই বুঝি আমার কাছে আসিবে, ইহার বুঝি কোন দুরভিসন্ধি আছে। বেলা প্রায় তিন প্রহর হইবে, এখনো পর্য্যন্ত করুণা কিছু আহার করে নাই। পথশ্রমে, ধূলায়, অনিদ্রায়, অনাহারে, ভাবনায় করুণা এক দিনের মধ্যে এমন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এমন বিষণ্ণ বিবর্ণ মলিন শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, যে দেখিলে সহসা চিনা যায় না।

ওই এক জন পথিক আসিতেছে, দেখিয়া ভাল মনে হইল না, করুণার দিকে তার ভারি নজর, বিদ্যাসুন্দরের মালিনী মাসীর সম্পর্কের একটা গান ধরিল, কিন্তু এই জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিপ্রহর রসিকতা করিবার ভাল অবসর নয় বুঝিয়া সেও গান গাইতে গাইতে পিছন ফিরিয়া চাহিতে চাহিতে চলিয়া গেল। আর এক জন আর এক জন

আর এক জন এইরূপ একে একে করিয়া কত পথিক চলিয়া গেল। এপর্য্যন্ত করুণা ভদ্র পথিক এক জনো দেখিতে পায় নাই—কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! ওই একজন প্যাণ্টলুন চাপ্‌কানধারী আসিতেছে, অনেক সময়ে ভদ্রলোকদের (ভদ্র কথা সাধারণ অর্থে যেরূপে ব্যবহৃত হয়) যত ভয় হয় এত আর কাহাদেরো নয়। ওই দেখ করুণা যে গাছের তলায় বসিয়াছিল সেই দিকেই আসিতেছে, করুণাত ভয়ে আকুল, মাটির দিকে চাহিয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। পথিকটিত বলা নয় কহা নয়, অতি শান্ত ভাবে আসিয়া সেই গাছের তলাটিতে আসিয়া বসিল কেন? বসিতে কি আর জায়গা ছিল না, পথের ধারে কি আর গাছ ছিল না? পথিকটি স্বরূপ বাবু। স্বরূপ বাবুর স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক টান ছিল তাহারই আকর্ষণ এড়াইতে না পারিয়া গাছের তলায় আসিয়া বসিয়া ছিলেন। তিনি জানিতেন না যে করুণাকে সেখানে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু যখন করুণাকে দেখিলেন, চিনিলেন। তখন তাঁহার বিস্ময়ের ও আনন্দের অবধি রহিল না। করুণা দেখে নাই, পথিকটি কে। সে ভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেখান হইতে উঠিয়া যাইবে যাইবে মনে করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। কিছুক্ষণত বিস্ময় ও আনন্দের তোড় সামলাইতে গেল, তার পর স্বরূপ অতি মধুর গদ গদ স্বরে কহিলেন "করুণা"। করুণা এই সম্বোধন শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল, পথিকের দিকে চাহিল—দেখিল স্বরূপ বাবু! তাহার চেয়ে একটা সাপ যদি দেখিত করুণা কম ভয় পাইত। করুণা কিছুই উত্তর দিল না। স্বরূপ অনেক কথা বলিতে লাগিল, এ কয় রাত্রি সে করুণার জন্যে কত কষ্ট পাইয়াছিল তাহার সমস্ত বর্ণনা করিল। সেই সুখ-রাত্রে তাহাদের প্রেমালাপের যখন সবে সূত্রপাত হইয়াছিল, এমন সময়ে ভঙ্গ হওয়াতে অনেক দুঃখ করিল, সে অতি হতভাগ্য, বিধাতা তাহাকে চির জীবন দুঃখী করিবার জনাই বুঝি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার কোন আশাই সফল হয় না। অবশেষে, করুণা নরেন্দ্রের বাড়ি হইতে যে বাহির হইয়া আসিয়াছে, ইহা লইয়া অনেক আনন্দ প্রকাশ করিল—কহিল, আরো ভালই হইয়াছে, তাহাদের দুই জনের যে প্রেম যে স্বর্গীয় প্রেম, তাহা নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে পারিবে আরো এমন অনেক কথা বলিল, তাহা যদি লিখিয়া লওয়া যাইত, তাহা হইলে অনেক বড় বড় নভেলের রাজপুত্র, ক্ষত্রিয়, বা অন্যান্য মহা মহা নায়কের মুখে স্বচ্ছন্দে বসানো যাইত, কিন্তু করুণা তাহার রসাস্বাদন করিতে পারে নাই।

স্বরূপ এলাহাবাদে যাইবে, তাই ষ্টেষণে যাইতেছিল পথের মধ্যে এই সকল ঘটনা। স্বরূপ প্রস্তাব করিল, করুণা তাহার সঙ্গে পশ্চিমে চলুক্ তাহা হইলে আর কোন ভাবনা ভাবিতে হবে না। করুণা কাল রাত্রি হইতে ভাবিতে ছিল, কোথায় যাইবে—কি করিবে কিছুই ভাবিয়া

পায় নাই—আজিকার দিনত প্রায় যায় যায়, রাত্রি আসিবে তখন কি করিবে, কত প্রকার লোক পথ দিয়া যাওয়া আসা করিতেছে, এই সকল নানান্ ভাবনার সময় এ প্রস্তাবটা করুণার মন্দ লাগিল না। ছেলে বেলা হইতে যে চিরকাল গৃহের বাহিরে কখনো যায় নাই সে এই অনাবৃত পৃথিবীর দৃষ্টি কি করিয়া সহিবে বল? সে একটা আশ্রয় পাইলে, লোকের চোখের আড়াল হইতে পারিলে বাঁচে। তার মনে হইতেছে যেন সকলেই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। তাহা ছাড়া করুণা এমন শ্রান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, যে আর সে সহিতে পারে না। একবার মনে করিল স্বরূপের প্রস্তাবে সায় দিয়া যাইবে। কিন্তু স্বরূপের উপর তাহার এমন একটা ভয় আছে, যে পা আর উঠিতে চায় না। করুণা ভাবিল এই গাছের তলায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকি, না খাইয়া না দাইয়া মরিয়া যাইব। কিন্তু রক্ত মাংসের শরীরে কত সহিবে বল—এ ভাবনা আর বেশীক্ষণ স্থান পাইল না। স্বরূপের প্রস্তাবে সম্মত হইল। সন্ধ্যা হইল। করুণা ও স্বরূপ এখন ট্রেণের মধ্যে।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বরূপ ও করুণা কাশীতে আছে। করুণার দুরবস্থা বলিবার নহে। সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকিয়া সে যে কি অবস্থায় দিন যাপন করিতেছে; তাহা সেই জানে। স্বরূপের ভ্রম অনেক দিন হইল ভাঙ্গিয়াছে; এখন বুঝিয়াছে করুণা তাহাকে ভাল বাসে না। সে ভাবিতেছে—একি উৎপাত—এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম—সকলি ব্যর্থ হইল? সে যে বিরক্ত হইয়াছে তাহা আর বলিবার নহে। সে মনে করিয়াছিল, এত দিন কবিতায় যাহা লিখিয়া আসিয়াছে, কল্পনায় চিত্র করিয়াছে, আজ সেই প্রেমের সুখ উপভোগ করিবে, কিন্তু সে কাছে আসিলে করুণা ভয়ে জড় সড় আড়ষ্ট হইয়া মরিয়া যায়, তাহার সঙ্গে কথাই কহে না। স্বরূপ ভাবিল "একি উৎপাত এ গলগ্রহ বিদায় করিতে পারিলে যে বাঁচি!" ভাবিল, দিন কতক কাছে থাকিতে থাকিতেই ভাল বাসা হইবে। স্বরূপ ত তাহার যথাসাধ্য করিল, কিন্তু করুণার ভালবাসার কোন চিহ্ন দেখিল না। করুণা বেচারীর ত আরাম বিশ্রাম নাই। একত সর্ব্বক্ষণ পরের বাড়ীতে, অচেনা পুরুষের সঙ্গে আছি বলিয়া সর্ব্বদাই আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইতেছে। তা ছাড়া স্বরূপের ভাব গতিক দেখিয়া সেত ভয়ে আকুল—সে কাছে বসিয়া গান গায়, কবিতা শুনাইতে থাকে, মনের দুঃখ নিবেদন করে—অবশেষে মহারুক্ষ ভাবে গাড়িভাড়ার টাকার জন্য নালিশ করিবে বলিয়া শাষাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণা যে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পায় না—ভয়ে বেচারী সারা হইতেছে। স্বরূপ রাত দিন খিট্ খিট্ করে, এমন কি করুণাকে মাঝে মাঝে ধমকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। করুণার কিছু বলিবার মুখ

নাই, সে শুধু কাঁদিতে থাকে। এইরূপে কত দিন যায়—স্বরূপের এলাহাবাদে যাইবার সময় হইয়াছে। সে ভাবিতেছে "এখন করুণাকে লইয়া কি করি। এইখানে কি ফেলিয়া যাইব? না এত করিয়া আনিলাম, গাড়িভাড়া দিলাম, এত দিন রাখিলাম, অবশেষে কি ফেলিয়া যাইব? আরো দিন কতক দেখা যাক্।" অনেক ভাবিয়া সাবিয়া করুণাকেত ডাকিল। করুণা ভাবিল, "যাইব কি না? কিন্তু না যাইয়াই বা কি করি? এখানে কোথায় থাকিব? এত দূর দেশে অচেনা জায়গায় কার কাছে যাইব? দেশে থাকিতাম তবু কথা থাকিত।" করুণা চলিল। উভয়ে ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইল। গাড়ি ছাড়িতে এখনো দেরী আছে। জিনিষ পত্র পুঁটুলি বোঁচকা লইয়া যাত্রীগণ মহা কোলাহল করিতেছে। কানে কলম গোঁজা রেলোয়ে ক্লার্কগণ ভারি উঁচু চালে ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ফর্ ফর্ করিয়া বেড়াইতেছেন। পান সোডাওয়াটার নানা প্রকার মিষ্টান্নের বোঝা লইয়া ফেরিওয়ালারা আগামী গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপত অবস্থা। এমন সময়ে এক জন পুরুষ করুণার পাশে সেই বেঞ্চে আসিয়া বসিল। করুণা উঠিয়া যাইবে যাইবে করিতেছে। এমন সময়ে তাহার পার্শ্বস্থ পুরুষ বিস্ময়ের স্বরে কহিয়া উঠিল—"মা তুমি যে এখানে?" করুণা পণ্ডিত মহাশয়ের স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিল। অনেক ক্ষণ কিছু বলিতে পারিল না, অনেক ক্ষণ নির্জ্জল নয়নে চাহিয়া চাহিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—"সার্ব্বভৌম মহাশয়, আমার ভাগ্যে কি ছিল?" পণ্ডিত মহাশয়ত আর অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন না। গদ্গদ স্বরে কহিলেন—"মা যাহা হইবার তাহা হইয়াছে তাহার জন্য আর ভাবিও না—আমি প্রয়াগে যাইতেছি আমার সঙ্গে আইস—পৃথিবীতে আর আমার কেহই নাই, যে কয়টা দিন বাঁচিয়া আছি, তত দিন আমার কাছে থাক, তত দিন আর তোমার কোন ভাবনা নাই।" করুণা অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতে লাগিল। এমন সময়ে নিধি আসিয়া উপস্থিত হইল। নিধি পণ্ডিত মহাশয়ের খরচে কাশী দর্শন করিতে আসিয়াছেন। পণ্ডিত মহাশয় তজ্জন্য নিধির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ আছেন তিনি বলেন, নিধির ঋণ তিনি এজন্মে শোধ করিতে পারিবেন না। করুণাকে দেখিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিল। কহিল—"ভট্টাচার্য্য মশায় একটা কথা আছে।" পণ্ডিত মহাশয় শশব্যস্তে উঠিয়া গেলেন। নিধি কহিল—"ঐ বাবুটিকে দেখিতেছেন?" পণ্ডিত মহাশয় চাহিয়া দেখিলেন—দেখিলেন স্বরূপ। নিধি কহিল "দেখিলেন—করুণার ব্যবহারটা একবার দেখিলেন—ছি-ছি, স্বর্গীয় কর্ত্তার নামটা একেবারে ডুবাইল?" পণ্ডিত মহাশয় অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন—অবশেষে হাত উল্‌টাইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন,

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ"

নিধি কহিল "আহা নরেন্দ্র এমন ভাল লোক ছিল। ওই রাক্ষসীই ত তাহাকে নষ্ট করিয়াছে।" নরেন্দ্র যে ভাললোক ছিল, সে বিষয়ে পণ্ডিত মহাশয়ের সংশয় ছিল না, এখন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহারো প্রমাণ পাইয়াছেন, কিন্তু এতক্ষণে কেন যে খারাপ হইয়া গিয়াছে তাহার কারণ টা জানিতে পারিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের স্ত্রীজাতির উপর দারুণ ঘৃণা জন্মাইল। পণ্ডিত মহাশয় ভাবিলেন—"আর না—স্ত্রীলোকেই তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে—স্ত্রীজাতিকে আর বিশ্বাস করিবেন না।" নিধি লাল হইয়া কহিল—"দেখুন দেখি মহাশয়—পাপাচরণ করিবার আর কি স্থান নাই?—এই কাশীতে?" একথা পণ্ডিত মহাশয় এতক্ষণ ভাবেন নাই—শুনিয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ একদৃষ্টে অবাক্ হইয়া নিধির মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন—ভাবিলেন—"সত্যইত!" একটা ঘণ্টা বাজিল মহা ছুটাছুটি চেঁচামেচি পড়িয়া গেল। পণ্ডিত মহাশয় বেঞ্চের কাছে বোঁচ্‌কা ফেলিয়া আসিয়াছিলেন তাড়াতাড়ি লইতে গেলেন—এমন সময় স্বরূপ তাড়াতাড়ি করুণাকে ডাকিতে আসিল—পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া সট করিয়া সরিয়া পড়িল। করুণা কাতর স্বরে পণ্ডিত মহাশয়কে কহিল "সর্ব্বভৌম মহাশয়, আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না।" পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন—"মা—অনেক প্রতারণা সহিয়াছি—মনে করিয়াছি, বৃদ্ধবয়সে আর কোন দিকে মন দিব না—দেবসেবায় কএকটি দিন কাটাইয়া দিব।" করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে পণ্ডিত মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল—কহিল—"আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না—আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন না!" পণ্ডিত মহাশয়ের নেত্রে অশ্রু পূরিয়া আসিল—ভাবিলেন—"যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে—ইহাকে ত ছাড়িয়া যাইতে পারিব না।" নিধি ছুটিয়া আসিয়া মহা একটা ধমক দিয়া কহিল—"এখানে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলে কি হইবে? গাড়ি যে চলিয়া যায়।" এই বলিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের হাত ধরিয়া হড় হড় করিয়া টানিয়া একটা গাড়ির মধ্যে পূরিয়া দিল। করুণা অন্ধকার দেখিতে লাগিল—মাথা ঘুরিয়া মুখ চক্ষু বিবর্ণ হইয়া সেই খানে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। স্বরূপের দেখা সাক্ষাৎ নাই, সে গোলেমালে অনেকক্ষণ হইল গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছে। অগ্নিময় অঙ্কুশের তাপে আর্ত্তনাদ করিয়া লৌহময় গজ হন হন করিয়া অগ্রসর হইল। ষ্টেসনে আর বড় লোক নাই।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই সময়ে মহেন্দ্রের নিকট হইতে যে সকল পত্র পাইয়াছিলাম,—তাহার এক খানি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

ভাই!—যে কষ্টে, যে লজ্জায়, যে আত্মগ্লানির যন্ত্রণায় পাগল হইয়া দেশ পরিত্যাগ করিলাম, তাহা তোমার কাছে গোপন করি নাই, সেই আঁধার রাত্রে বিজন পথ দিয়া যখন যাইতে ছিলাম—কোন কা-

রণ নাই—কোন উদ্দেশ্য নাই—কোন গম্য স্থান নাই—তখন কেন যাইতেছি, কোথায় যাইতেছি কিছুই ভাবি নাই—মনে করিয়াছিলাম এ পথের যেন অন্ত নাই, এমনি করিয়াই যেন আমাকে চির-জীবন চলিতে হইবে—চলিয়া—চলিয়া চলিয়া তবু পথ ফুরাইবে না—রাত্রি পোহাইবে না। মনের ভিতর কেমন এক প্রকার ঔদাস্যের অন্ধকার বিরাজ করিতেছিল তাহা বলিবার নহে। কিন্তু রাত্রের অন্ধকার যত হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল, দিনের কোলাহল যতই জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল ততই আমার মনের আবেগ কমিয়া আসিল। তখন ভাল করিয়া সমস্ত ভাবিবার সময় আসিল। কিন্তু তখনো দেশে ফিরিবার জন্য এক তিলও ইচ্ছা হয় নি। কত দেশ দেখিলাম—কত স্থানে ভ্রমণ করিলাম—কত দিন কত মাস চলিয়া গেল, কিন্তু কি দেখিলাম কি করিলাম, কিছু যদি মনে আছে! চোকের উপর কত পর্ব্বত, নদী, অরণ্য, মন্দির, অট্টালিকা, গ্রাম উঠিত কিন্তু সে সকল যেন কি; কিছুই নয়। যেন স্বপ্নের মত যেন মায়ার মত যেন মেঘের পর্ব্বত অরণ্যের মত। চোখের উপর পড়িত তাই দেখিতাম, আর কিছুই নহে। এই রূপ করিয়া যে কত দিন গেল তাহা বলিতে পারি না—আমার মনে হইয়াছিল এক বৎসর হইবে—কিন্তু পরে গণনা করিয়া দেখিলাম চার মাস। ক্রমে ক্রমে আমার মন শান্ত হইয়া আসিয়াছে। এখন ভবিষ্যত ও অতীত ভাবিবার অবসর পাইলাম। আমি এখন লাহোরে আসিয়াছি। এখানকার এক জন বাঙ্গালী বাবুর বাড়িতে আশ্রয় লইলাম, ও অল্প অল্প করিয়া ডাক্তারি করিতে আরম্ভ করিলাম। এখন আমার মন্দ আয় হইতেছে না, কিন্তু আয়ের জন্য ভাবি না ভাই, আমার হৃদয়ে যে নূতন মনস্তাপ উত্থিত হইয়াছে তাহাতে যে আমাকে কি অস্থির করিয়া তুলিয়াছে বলিতে পারি না। আমার নিজের উপর যে কি ঘৃণা হইয়াছে তাহা কি করিয়া প্রকাশ করিব? যখন দেশে ছিলাম তখন রজনীর জন্যে একদিনো ভাবি নাই—যখন দেশ ছাড়িয়া আসিলাম তখনো এক মুহূর্ত্তের জন্য রজনীর ভাবনা মনে উদিত হয় নাই—কিন্তু দেশ হইতে যত দূরে গিয়াছি, যত দিন চলিয়া গিয়াছে, হতভাগিনী রজনীর কথা ততই মনে পড়িয়াছে, আপনাকে ততই মনে পড়িয়াছে—আপনাকে ততই নিষ্ঠুর পিশাচ বলিয়া মনে হইয়াছে। আমার ইচ্ছা করে এখনি দেশে ফিরিয়া যাই তাহাকে যত্ন করি—তাহাকে ভাল বাসি—তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। সে হয়ত এত দিনে আমার কলঙ্কের কথা শুনিয়াছে। আমি তাহার কাছে কি বলিয়া দাঁড়াইব? না ভাই আমি তাহা পারিব না।! * * *

মহেন্দ্র”

আমি দেখিতেছি, যে সকল বাহ্য কারণে মহেন্দ্রের রজনীর উপর বিরাগ ছিল, সে সকল কারণ হইতে দূরে থাকিয়া মহেন্দ্র একটু ভাবিবার অবসর পাইয়াছে। যতই তাহার আপনার নিষ্ঠুরাচরণ মনে উদিত

হইয়াছে—ততই রজনীর উপর মমতা তাহার দৃঢ়মূল হইয়াছে। মহেন্দ্র এখন ভাবিয়াই পাইতেছে না তাহাকে কেন ভাল বাসে নাই—এমন মৃদু, কোমল, স্নিগ্ধ-স্বভাব, তাহাকে ভাল বাসে না এমন পিশাচ আছে? কেন, তাহাকে দেখিতেইবা কি মন্দ? মন্দ? কেন অমন সুন্দর স্নেহ-পূর্ণ চক্ষু! অমন কোমল ভাব-ব্যঞ্জক মুখ-শ্রী! ভাব লইয়া রূপ, না বর্ণ লইয়া? রজনীর যাহা কিছু ভাল তাহাই মহেন্দ্রের মনে পড়িতে লাগিল, আর তাহার যাহা কিছু মন্দ তাহাও মহেন্দ্র ভাল বলিয়া দাঁড় করাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ক্রমে রজনীকে যতই ভাল বলিয়া বুঝিল—আপনাকে ততই পিশাচ বলিয়া মনে হইল।

মহেন্দ্রের সেখানে বিলক্ষণ পশার হইয়াছে। মাসে প্রায় দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিত। কিন্তু প্রায় সমস্তই রজনীর কাছে পাঠাইয়া দিত, নিজের জন্য এত অল্প টাকা রাখিয়া দিত যে আমি ভাবিয়া পাই না, কি করিয়া তাহার খরচ চলিত।

অনেক দিন হইয়া গেছে মহেন্দ্রের বাড়ি আসিতে বড়ই ইচ্ছা হয়, কিন্তু সকল কথা মনে উঠিলে আর ফিরিয়া আসিতে পা সরে না। মহেন্দ্র একটা চিটি পাইয়াছে, পাইয়া অবধি বড়ই অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। ইহা সেই মোহিনীর চিঠি। চিঠির শেষ ভাগে লিখা আছে—"আপনি যদি রজনীকে নিতান্তই দেখিতে না পারেন—যদি রজনী এখানে আছে বলিয়া আপনি নিতান্তই আসিতে না চান্—তবে আপনার আশঙ্কা করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই, সে তাহার দিদির বাড়ি চলিয়া যাইবে। রজনী লিখিতে জানে না বলিয়া আমি তাহার হইয়া লিখিয়া দিলাম। সে লিখিতে জানিলেও হয়ত আপনাকে লিখিতে সাহস করিত না।"

ইহার মৃদু তিরস্কার মহেন্দ্রের মর্ম্মের মধ্যে বিদ্ধ হইয়াছে, সে স্থির করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া যাইবে।

রজনীর শরীর দিনে দিনে ক্ষীণ হইয়া যাইতেছে—মুখ বিবর্ণ ও বিষণ্ণতর হইতেছে। এক দিন সন্ধ্যাবেলা সে মোহিনীর গলা ধরিয়া বলিল, "দিদি—আর আমি বেশীদিন বাঁচিব না।" মোহিনী কহিল "সেকি রজনি, ওকথা বলিতে নাই।" রজনী বলিল "হাঁ দিদি আমি জানি, আর আমি বেশী দিন বাঁচিব না; যদি এর মধ্যে তিনি না আসেন তবে তাঁকে এই টাকা গুলি দিও। তিনি আমাকে মাসে মাসে টাকা পাঠাইয়া দিতেন কিন্তু আমার খরচ করিবার দরকার হয় নাই, সমস্ত জমাইয়া রাখিয়াছি।" মোহিনী অতিশয় স্নেহের সহিত রজনীর মুখ তাহার বুকে টানিয়া লইয়া বলিল "চুপ কর্, ওসব কথা বলিস্নে। মোহিনী অনেক কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া মনে মনে কহিল "মা ভগবতি, আমি যদি এর দুঃখের কারন হোয়ে থাকি তবে আমার তাতে কোন দোষ নাই।"

হাত অবসর পাইলেই রজনীর শাশুড়ি রজনীকে লইয়া পড়িতেন—নানা জন্তুর সহিত তাহার রূপের তুলনা করিতেন, আর

বলিতেন যে বিবাহের সম্বন্ধ হওয়া অবধিই তিনি জানিতেন যে এই রূপ একটা দুর্ঘটনা হইবে, তবে জানিয়া শুনিয়া কেন যে বিবাহ দিলেন সে কথা উত্থাপন করিতেন না। রজনী না থাকিলে মহেন্দ্র-বিয়োগে তাঁহার মাতার অধিকতর কষ্ট হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই, এই যে মাঝে মাঝে মন খুলিয়া তিরস্কার করিতে পান, ইহাতে তাঁহার মন অনেকটা ভাল আছে। মহেন্দ্রের মাতার স্বভাব যতদূর জানি তাহাতে ত এক এক বার আমার মনে হয়—এই যে তিরস্কার করিবার তিনি সুযোগ পাইয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় মহেন্দ্রের বিয়োগও তিনি ভাগ্য বলিয়া মানেন। মহেন্দ্রের অবস্থান-কালে, রজনী যে দিন কোন দোষ না করিত, সে দিন মহেন্দ্রের মাতা মহা মুস্কিলে পড়িয়া যাইতেন। অবশেষে ভাবিয়া ভাবিয়া দুই বৎসরের পুরাণো কথা লইয়া তাহার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া আসিতেন। কিন্তু এই ঘটনার পর তাঁহার তিরস্কারের ভাণ্ডার সর্ব্বদাই মজুত রহিয়াছে, অবসর পাইলেই হয়। ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের মা মহেন্দ্রকে এক লোভনীয় পত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার "বাবাকে" তিনি নিশ্চিন্ত হইতে কহিয়াছেন, ও সংবাদ দিয়াছেন যে, তাঁহার জন্যে একটি সুন্দরী কন্যা অনুসন্ধান করা যাইতেছে। এই চিঠি পাইয়া মহেন্দ্রের আপনার উপর দ্বিগুণ লজ্জা উপস্থিত হইয়াছে। "তবে সকলেই মনে করিয়াছে আমি রূপের কাঙ্গাল? রজনী দেখিতে ভাল নয় বলিয়াই আমি তাহার উপর নিষ্ঠুরাচরণ করিয়াছি? লোকের কাছে মুখ দেখাইব কোন্ লজ্জায়?" কিন্তু রজনীর আজ কাল অল্প তিরস্কারই অত্যন্ত মনে লাগে, আগেকার অপেক্ষাও সে কেমন ভীত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার শরীর যতই খারাপ হইতেছে ততই সে ভয়ে ত্রস্ত ও তিরস্কারে অধিকতর ব্যথিত হইয়া পড়িতেছে। ক্রমাগত তিরস্কার শুনিয়া শুনিয়া আপনাকে সত্য সত্যই দোষী বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে। মোহিনী প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা তাহার কাছে আসিত—প্রত্যহ তাহাকে যথাসাধ্য যত্ন করিত ও প্রত্যহ দেখিত সে দিনে দিনে অধিকতর দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। এক দিন রজনী সংবাদ পাইল, মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার কিসের আহ্লাদ? মহেন্দ্র ত তাহাকে সেই ঘৃণা-চক্ষে দেখিবে। তাহা হউক্—কিন্তু তাহার জন্য মহেন্দ্র যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে কষ্ট পাইতেছে, এ আত্মগ্লানির যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পাইল—যে কারণেই হউক মহেন্দ্র যে বিদেশে গিয়া কষ্ট পাইতেছে ইহা রজনীর অতিশয় কষ্টকর হইয়াছিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কাশীর ষ্টেষণে করুণা-সংক্রান্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছিল, এক জন ভদ্রলোক তাহা সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। স্বরূপকে দেখিয়া তিনি কেমন লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া গিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন

সকলে চলিয়া গেল এবং করুণা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল তখন তিনি তাহাকে একটা গাড়িতে তুলিয়া তাঁহার বাসাবাড়িতে লইয়া যান—তাঁহার কোথায় যাইবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু যাওয়া হইল না। করুণার মুখ দেখিয়া, এমন কে আছে যে তাহাকে দোষী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারে? মহেন্দ্রও তাহাকে সন্দেহ করে নাই—বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম সেই ভদ্র লোকটি মহেন্দ্র। লাহোর হইতে আসিবার সময় একবার কাশীতে আসিয়াছিলেন; কলিকাতার ট্রেণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে। করুণা চেতনা পাইলে মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। মহেন্দ্রের মুখে এমন দয়ার ভাব প্রকাশ পাইতেছিল যে করুণা শীঘ্রই সাহস পাইল। কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে কহিল এবং ঠিক সে যেমন করিয়া ভবিকে জিজ্ঞাসা করিত তেমন করিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, কেন নরেন্দ্র তাহার উপর অমন রাগ করিল? মহেন্দ্র বালিকার সে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না—কিন্তু এই প্রশ্ন শুনিয়া তাহার চক্ষে জল আসিয়াছিল। নরেন্দ্রকে মহেন্দ্র বেশ চেনে, সে সমস্ত ঘটনা বেশ বুঝিতে পারিল। পণ্ডিতমহাশয় যে কেন তাহাকে অমন করিয়া ফেলিয়া গেলেন তাহাও করুণা ভাবিয়া পাইতেছিল না, অনেক ক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া তাহাও মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল। মহেন্দ্র তাহার যথার্থ কারণ যাহা বুঝিয়াছিলেন তাহা গোপন করিয়া নানারূপে বুঝাইয়া দিলেন। এখন করুণাকে লইয়া যে কি করিবে মহেন্দ্র তাতাই ভাবিতে লাগিল। অবশেষে স্থির হইল তাহাদের বাড়িতেই লইয়া যাইবে। মহেন্দ্র করুণার নিকট তাহার বাড়ির বর্ণনা করিল—কহিল তাহাদের বাড়ীর সামনেই একটি প্রাচীর দেওয়া বাগান আছে, বাগানের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, পুষ্করিণীর উপরে একটি বাঁধানো সানের ঘাট, কহিল তাহাদের বাড়িতে গেলে করুণা তাহার একটি দিদি পাইবে, তেমন স্নেহশালিনী—তেমন কোমল-হৃদয়া—তেমন ক্ষমাশীলা (আরো অসংখ্য বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছিল) দিদি কেহই কখনো পায় নাই। করুণা অমনি তাড়াতাড়ি, জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে কি ভবীর দেখা পাইবে। মহেন্দ্র ভবীর সন্ধান করিবে বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন করুণা তাহাকে ভ্রাতার মত দেখিবে কি না, করুণার তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না। যাহা হউক, এত দিন পরে করুণার মুখ প্রফুল্ল দেখিলাম, এতদিন পরে সে তবু আশ্রয় পাইল। কিন্তু বারবার করুণা মহেন্দ্রকে পণ্ডিত মহাশয়ের তাহার উপরে রাগ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে।

অবশেষে তাহারা যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল, কাশী পরিত্যাগ করিয়া চলিল, কে কি বলিবে, কে কি করিবে, কখন কি হইবে এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে ও যদি কেহ কিছু বলে তবে তাহার কি উত্তর দিবে, যদি কেহ কিছু করে তবে তাহার কি প্রতি-

বিধান করিবে, যদি কখনো কিছু হয় তবে সে অবস্থায় কিরূপ ব্যবহার করিবে, এই সমস্ত ঠিক করিতে করিতে মহেন্দ্র গ্রামের রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল। লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া, সঙ্কোচে অভিভূত হইয়া পথিকদিগের চক্ষু এড়াইয়া ও কোন মতে পথ পার হইয়া গৃহের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। কতবার সাত পাঁচ করিয়া পরে প্রবেশ করিল। দাদাবাবুকে দেখিয়াই ঝি ঝাঁটা রাখিয়া ছুটিয়া বড় মাকে খবর দিতে গেল। বড়মা তখন রজনীর সুমুখে বসিয়া রজনীর রূপের ব্যাখ্যান করিতেছিলেন, এমন সময়ে খবর পাইলেন যে আর একটি নূতন বধূ লইয়া তাঁহার 'বাবা' ঘরে আসিয়াছেন। মহেন্দ্রের ও করুণার সহিত সকলের সাক্ষাৎ হইল, যখন সকলে মিলিয়া হুলু দিবার উদ্‌যোগ করিতেছেন এমন সময়ে মহেন্দ্র তাঁহাদিগকে করুণা-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া বলিল। সে সমস্ত বৃত্তান্ত মহেন্দ্রের মাতার বড় ভাল লাগে নাই; মহেন্দ্রের সমুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু সেই রাত্রে মহেন্দ্রের পিতার সহিত তাঁহার ভারি একটা পরামর্শ হইয়া গিয়াছিল ও অবশেষে রজনী পোড়ারমুখীই যে এই সমস্ত বিপত্তির কারণ তাহা অবধারিত হইয়া গিয়াছিল। এই কথাটা লইয়া মহেন্দ্রের পিতার অতিরিক্ত আনাতুয়েকের তামাকু ব্যয় হইয়াছিল ও দুই চারিজন বৃদ্ধ বিজ্ঞ প্রতিবাসিদিগের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু আর অধিক কিছু দুর্ঘটনা হয় নাই। রজনী তাহার দিদির বাড়ি যাইবার সমস্তই বন্দোবস্ত করিয়াছিল, তাহার শ্বশুর শাশুড়িরা এই বন্দোবস্তে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, কিন্তু রজনী বড় দুর্ব্বল বলিয়া এখনো সমাধা হইয়া উঠে নাই। এই খবরটি আসিয়াই মহেন্দ্র তাঁহার মাতার নিকট হইতে শুনিতে পাইলেন, আশ্চর্য্যের স্বরে কহিলেন, "দিদির বাড়ি যাইবে, তার অর্থ কি? আমি আসিলাম আর অমনি দিদির বাড়ি যাইবে?" মহেন্দ্রের মাও অবাক, মহেন্দ্রের পিতা কিছুক্ষণ অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, পরে ঠুঙ্গি হইতে চসমা বাহির করিয়া পরিলেন এবং মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিলেন, যেন তিনি মিলাইয়া দেখিতে চান যে এ মহেন্দ্রের সহিত পূর্ব্বকার মহেন্দ্রের কোন আদল আছে কি না, এ মহেন্দ্র ঝুঁটা মহেন্দ্র কি না। মহেন্দ্র অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ রজনীর ঘরে চলিয়া গেলেন ও কর্ত্তা গৃহিণীতে মিলিয়া ফুস্‌ফুস্ করিয়া মহাপরামর্শ করিতে লাগিলেন। রজনী মহেন্দ্রকে দেখিয়া মহা শশব্যস্ত হইয়া পড়িল, কেমন অপ্রস্তুত হইয়া গেল। সে মনে করিতে লাগিল, মহেন্দ্র তাহাকে দেখিয়া কি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে —তাহার তাড়াতাড়ি বলিবার ইচ্ছা হইল, যে, "আমি এখনি যাইতেছি, আমার সমস্তই প্রস্তুত হইয়াছে!" যখন সে এই গোলমালে পড়িয়া কি করিবে ভাবিয়া পাইতেছে না, তখন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে তাহার পার্শ্বে গিয়া বসিল। কি ভাগ্য! বিষণ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি নাকি আজই দিদির বাড়ি যাবে? কেন রজনি?" আর কি উত্তর দিবার যো আছে? "আমি তোমার কাছে

অনেক অপরাধ করিয়াছি, আমি তোমাকে কষ্ট দিয়াছি, কিন্তু তাহা কি ক্ষমা করিবে না ?" ওকি মহেন্দ্র, অমন করিয়া বলিও না, রজনীর বুক ফাটিয়া যাইতেছে। "বল— তাহা কি ক্ষমা করিবে না ?" রজনীর উত্তর দিবার কি ক্ষমতা আছে ? সে পূর্ণ উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া বলিল "একবার বল ক্ষমা করিলে ?" রজনী ভাবিল—সে কি কথা ! মহেন্দ্র কেন ক্ষমা চাহিতেছেন ? সে জানিত তাহারই সমস্ত দোষ, সেই মহেন্দ্রের নিকট অপরাধী, কেন না তাহার জন্যই মহেন্দ্র এত কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, গৃহ ত্যাগ করিয়া কত বৎসর বিদেশে কাল যাপন করিয়াছেন, সে কোথায় মহেন্দ্রের নিকট ক্ষমা চাহিবে, তাহা না হইয়া একি বিপরীত ! ক্ষমা চাহিবে কি ? সে নিজেই ক্ষমা চাহিতে সাহস করে নাই, সে কি ক্ষমার যোগ্য ? মহেন্দ্র রজনীর দুর্ব্বল মস্তক কোলে তুলিয়া লইল, রজনী ভাবিল এই সময়ে যদি মরি তবে কি সুখে মরি। তাহার কেমন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল, মহেন্দ্রের ক্রোড় তাহার নিকট যেন ভিখারীর নিকট সিংহাসন।

মহেন্দ্র তাহাকে কতকি কথা বলিল, সে সকল কথার উত্তর দিতে পারিল না ; সে ভাবিল এ মধুর স্বপ্ন চিরস্থায়ী নহে—এই মুহূর্ত্তে মরিতে পাইলে কি সুখী হই। কিন্তু এ অবস্থা কতক্ষণ রহিবে ? রজনীর এ সঙ্কোচ শীঘ্র দূর হইল। রজনী তাহার কোলে মাথা রাখিয়া কতক্ষণ কতকি কথা কহিল—কত অশ্রুজল কত কথা কত হাসি—সে বলিবার নহে। মহেন্দ্র যখন উঠিয়া যাইতে চাহিল তখন রজনী তাহাকে আর একটু বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিল, যাহা আর কখনো করিতে সাহস করে নাই। রজনীর একি পরিবর্ত্তন ? যে সুখ সে কখন আশা করে নাই, আপনাকে যে সুখ পাইবার যোগ্য বলিয়া মনে করে নাই, সেই সুখ সহসা পাইয়াছে, আহ্লাদে তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল—সে কি করিবে ভাবিয়া পাইতে ছিল না। সেই সন্ধ্যাবেলাই সে মোহিনীর বাড়িতে গেল, তাড়াতাড়ি তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে বসিল, মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল "কেন রজনি, কি হোয়েছে ?" সে মনে করিল মহেন্দ্র না জানি আবার কি অন্যায়াচরণ করিয়াছে। রজনী তাহাকে সকল কথা বলিতে লাগিল—শুনিয়া মোহিনীও আহ্লাদে কাঁদিতে লাগিল। রজনীর দুই এক মাসের মধ্যে যে কোন ব্যাধি বা দুর্ব্বলতা হইয়াছিল তাহার কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। আর কখনো রজনীর ঘরকন্নার কাজে এত উৎসাহ কেহ দেখে নাই—শাশুড়ি মহা উগ্রভাবে কহিলেন "হোয়েছে, হোয়েছে ঢের হোয়েছে, আর গিন্নিপনা কোরে কাজ নেই, দুদিন উপোস করে আছেন, সবে আজ ভাত খেয়েছেন, ওঁর গিন্নিপনা দেখে আর বাঁচিনে।" এই খানে একটা কথা বলা আবশ্যক—রজনী যে দুদিন উপোস করিয়াছিল সে দুদিন কাজ করিতে পারেনি বলিয়া তাঁহার শাশুড়ি মহা বক্তৃতা দিয়াছিলেন ও ভবিষ্যতে যখনি

রজনীর দোষের অভাব পড়িবে সেই তুই দিনের কথা লইয়া আবার বক্তৃতা যে দিবেন ইহাও নিশ্চিত—এবিষয়ে কোন পাঠকের সন্দেহ উপস্থিত না হয়।

দেখিতে দেখিতে করুণার সহিত রজনীর মহা ভাব হইয়া গেল। তুই জনের ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া মহা মনের কথা পড়িয়া গেল—তাহাদের কথা আর ফুরায় না। তাহাদের স্বামীদের কত দিনকার সামান্য যত্ন, সামান্য আদর টুকু তাহারা মনের মধ্যে গাঁথিয়া রাখিয়াছে, তাহাই কত মহান্‌ ঘটনার মত বলাবলি করিত, কিন্তু এবিষয়ে ত তুই জনেরি ভাণ্ডার অতি সামান্য, তবে কিযে কথা হইত তাহারাই জানে। হয়ত সে সব কথা লিখিলে পাঠকেরা তাহার গাম্ভীর্য্য বুঝিতে পারিবেন না, হয়ত হাসিবেন হয়ত মনে করিবেন এসব কোন কাজেরি কথা নয়—কিন্তু সে বালিকারা যে সকল কথা লইয়া অতি গুপ্ত ভাবে, অতি সাবধানে আন্দোলন করিয়াছে, তাহাই লইয়া যে সকলে হাসিবে—সকল কথা তুচ্ছভাবে উড়াইয়া দিবে তাহা মনে করিলে কষ্ট হয়। কিন্তু করুণার সঙ্গে রজনী পারিয়া উঠে না, সে এক কথা সাতবার করিয়া বলিয়া, সব কথা একেবারে বলিতে চেষ্টা করিয়া, কোন কথাই ভাল করিয়া বুঝাইতে না পারিয়া রজনীর এক প্রকার মুখ বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তাহারই কথা ফুরায় নাই,ত কেমন ক'রে সে রজনীর কথা শুনিবে! তাহার কি একটা আধটা কথা? তাহার পাখীর কথা, তাহার ভবির কথা, তাহার কাঠবিড়ালীর গল্প—সে কবে কি স্বপ্ন দেখিয়াছিল—তাহার পিতার নিকট তুই রাজার কি গল্প শুনিয়াছিল, এসমস্ত কথা তাহার বলা আবশ্যক। আবার বলিতে বলিতে যখন হাসি পাইত, তখন তাহাই বা থামায় কে? আর, কেনযে হাসি পাইল তাহাই বা বুঝে কাহার সাধ্য? রজনীবেচারীর বড় বেশী কথা বলিবার ছিল না, কিন্তু বেশী কথা নীরবে শুনিবার এমন আর উপযুক্ত পাত্র নাই। রজনী কিছুতেই বিরক্ত হইত না, তবে এক এক সময়ে অনামনস্ক হইত বটে, তা, তাহাতে করুণার কি ক্ষতি? করুণার বলা লইয়া বিষয়। করুণাকে লইয়া মহেন্দ্রের মাতা বড় ভাবিত আছেন। তাঁহার বয়স বড় কম নহে, পঞ্চান্ন বৎসর, এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞতায় তিনি ভদ্রলোকের ঘরে এমন বেহায়া মেয়ে কখনো দেখেন নাই, আবার তাঁহার প্রতিবেশিনীরা তাহাদের বাপের বয়সেও এমন মেয়ে কখনো দেখে নাই বলিয়া স্পষ্ট স্বীকার করিয়া গেল। মহেন্দ্রের পিতা তামাকু খাইতে খাইতে কহিতেন যে, ছেলে মেয়েরা সবাই খৃস্টান হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের মাতা কহিতেন "সে কথা মিছা নয়।' মহেন্দ্রের মাতা মাঝে মাঝে রজনীকে সম্বোধন করিয়া করুণার দিকে কটাক্ষপাত করিয়া কহিতেন "আজ বাগানে বড় গলা বাহির করা হইতে ছিল! লজ্জা করে না!" কিন্তু তাহাতে করুণা কিছুই সাবধান হয় নাই। কিন্তু এ ত করুণার শান্ত অবস্থা, করুণা যখন

মনের সুখে তাহার পিতৃভবনে থাকিত,তখন যদি এই পঞ্চান্ন বৎসরের অভিজ্ঞ গৃহিণী তাহাকে দেখিতেন তবে কি করিতেন বলিতে পারি না। আবার এক একবার যখন বিষণ্ণ ভাব করুণার মনে আসিত, তখন তাহার মূর্ত্তি সম্পূর্ণ বিপরীত। আর তাহার কথা নাই, হাসি নাই, গল্প নাই, সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে—রজনী পাশে বসিয়া "লক্ষ্মী দিদি আমার" বলিয়া কত সাধাসাধি করিলে উত্তর নাই। করুণা প্রায় মাঝে মাঝে এমনি বিষণ্ণ হইত, কতক্ষণ ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তবে সে শান্ত হইত। একদিন কাঁদিতে কাঁদিতে মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "নরেন্দ্র কোথায় ?" মহেন্দ্র কহিল "আমিত জানি না।" করুণা কহিল, "কেন জান না ?" কেন জানে না সে কথা মহেন্দ্র ঠিক করিয়া বলিতে পারিল না, তবে নরেন্দ্রের সন্ধান করিতে স্বীকার করিল। কিন্তু নরেন্দ্রের অধিক সন্ধান করিতে হইল না। নরেন্দ্র কেমন করিয়া তাহার সন্ধান পাইয়াছে। এক দিন করুণা যখন রজনীর নিকট দুই রাজার গল্প করিতে ভারি ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে ডাকে তাহার নামে একখানি চিঠি আসিল। এপর্য্যন্তও তাহার বয়সে সে কখনো নিজের নামের চিঠি দেখে নাই। এ চিঠি পাইয়া করুণার মহা আহ্লাদ হইল, সে জানিত চিঠি পাওয়া এক মহা কাণ্ড, রাজা রাজড়াদেরই অধিকার। আস্ত চিঠি ছিঁড়িয়া খুলিতে তাহার কেমন মায়া হইতে লাগিল, আগে সকলকে দেখাইয়া অনেক অনিচ্ছার সহিত লেফাফা খুলিল, চিঠি পড়িল, চিঠি পড়িয়া তাহার মুখ শুখাইয়া গেল, থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে চিঠি মহেন্দ্রকে দিল। নরেন্দ্র লিখিতেছেন—"তিন শত টাকা আমার প্রয়োজন, না পাইলে আমার সর্ব্বনাশ; না পাইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিব। ইতি।" করুণা কাঁদিয়া উঠিল। করুণা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল "কি হবে ?" মহেন্দ্র কহিল কোন ভাবনা নাই, এখনি টাকা লইয়া সে যাইতেছে। নরেন্দ্রের ঠিকানা চিঠিতে লিখা ছিল, সেই ঠিকানা উদ্দেশ্যে মহেন্দ্র চলিল।

প্রতিশোধ।

(গাথা)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

গভীর রজনী, নীরব ধরণী,
মুমূর্ষু পিতার কাছে,
বিজন আলয়ে, আঁধার হৃদয়ে,
বালক দাঁড়ায়ে আছে।

বীরের হৃদয়, ছুরিকা বিধানো,
শোণিত বহিয়ে যায়,
বীরের বিবর্ণ মুখের মাঝারে,
রোষের অনল ভায়!

পোড়েছে দীপের অস্ফুট আলোক,
আঁধার মুখের পরে,
সে মুখের পানে, চাহিয়া বালক,
দাঁড়ায়ে ভাবনা ভরে,

দেখিছে পিতার, অসাড় অধরে,
যেন অভিশাপ লিখা,
স্ফুরিছে আঁধার নয়ন হইতে,
রাগের অনল শিখা—

ঘুম হ'তে যেন চমকি উঠিল
সহসা নীরব ঘর,
মুমূর্ষু কহিলা, বালকে চাহিয়া,
সুধীর গভীর স্বর—

"শোনো বৎস শোনো, অধিক কি কব,
আসিছে মরণ বেলা,
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে,
না করিবে অবহেলা।"

এতেক বলিয়া, টানি উপাড়িলা,
ছুরিকা হৃদয় হোতে,
ঝলকে ঝলকে, উচ্ছসি অমনি,
শোণিত বহিল স্রোতে,

কহিল—'এই নে, এই নে ছুরিকা ;—
তাহার উরস পরে,
যতদিন ইহা, ঠাঁই নাহি পায়,
থাকে যেন তোর করে!

হা হা ক্ষত্র দেব, কি পাপ করেছি—
এ তাপ সহিতে হ'ল,
ঘুমাতে ঘুমাতে, বিছানায় পড়ি,
জীবন ফুরায়ে এল।'

নয়নে জ্বলিল দ্বিগুণ আগুণ,
কথা হোয়ে গেল রোধ,
শোণিতে লিখিলা ভূমির উপরে—
"প্রতিশোধ প্রতিশোধ!"

পিতার চরণ, পরশ করিয়া,
ছুঁইয়া কৃপাণ খানি,
আকাশের পানে, চাহিয়া কুমার,
কহিল শপথ বাণি!—

"ছুঁইনু কৃপাণ, শপথ করিনু;
শুন ক্ষত্র-কুল-প্রভু,
এর প্রতিশোধ, তুলিব তুলিব,
অন্যথা নহিবে কভু!

সেই বুক ছাড়া, এ ছুরিকা আর,
কোথানা বিরাম পাবে,
তার রক্ত ছাড়া, এই ছুরিকার,
তৃষা কভু নাহি যাবে।"

রাখিলা শোণিত-মাখা সে ছুরিকা,
বুকের বসনে ঢাকি।
ক্রমে মুমূর্ষুর ফুরাইল প্রাণ,
মুদিয়া পড়িল আঁখি॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভ্রমিছে কুমার, প্রতি দেশে দেশে,
ঘুচাতে শপথ ভার।

দেশে দেশে ভ্রমি, তবুওত আজি,
পেলে না সন্ধান তার।

এখনো সে বুকে ছুরিকা লুকানো,
প্রতিজ্ঞা জ্বলিছে প্রাণে,
এখনো পিতার শেষ কথা গুলি,
বাজিছে যেন সে কানে।

"কোথা যাও যুবা ? যেওনা যেওনা,
গহন কানন ঘোর,
সাঁজের আঁধার, ঢাকিছে ধরণী,
এস গো কুটিরে মোর !"

"ক্ষম গো আমায়, কুটীর স্বামী !
বিরাম আলয় চাইনা আমি,
যে কাজের তরে, ছেড়েছি আলয়,
সে কাজ পালিব আগে"—

"শুন গো পথিক, যেওনাকো আর,
অতিথির তরে মুক্ত এদুয়ার।
দেখেছ চাহিয়া, ছেয়েছে জলদ,
পশ্চিম গগন ভাগে।"

কতনা ঝটিকা, বহিয়া গিয়াছে,
মাথার উপর দিয়া,
প্রতিজ্ঞা পালিতে চলেছে তবুও,
যুবক নির্ভীক হিয়া।

চলেছে—গহন গিরিনদী মরু
কোন বাধা নাহি মানি।
বুকেতে রয়েছে ছুরিকা লুকানো
হৃদয়ে শপথ-বাণী।

"গভীর আঁধারে নাহি পাই পথ,
শুনগো কুটীর স্বামী—
খুলে দাও দ্বার আজিকার মত
এসেছি অতিথি আমি।"

ধীরে ধীরে ধীরে খুলিল দুয়ার,
পথিক দেখিল চেয়ে—
করুণার যেন প্রতিমার মত
একটি রূপসী মেয়ে।

এলো থেলো চুলে, বনফুল মালা
দেহে এলোথেলো বাস—
নয়নে মমতা, অধরে মাখানো
কেমন সরল হাস।

বালিকার পিতা রয়েছে বসিয়া
কুশের আসন পরি—
সম্ভ্রমে আসন দিলেন পাতিয়া
পথিকে যতন করি।

দিবসের পর যেতেছে দিবস,
যেতেছে বরষ মাস—
আজিও কেন সে কানন কুটীরে
পথিক করিছে বাস ?

কিকর যুবক, ছাড় একুটীর—
সময় যেতেছে চলি,
যেকাজের তরে ছেড়েছ আলয়
সেকাজ যেওনা ভুলি !

দিবসের পর যেতেছে দিবস,
যেতেছে বরষ মাস,

যুবার হৃদয়ে পড়িছে জড়ায়ে
ক্রমেই প্রণয়-পাশ।

শোণিতে লিখিত শপথ আখর,
মন হোতে গেল মুছি।
ছুরিকা হইতে রকতের দাগ
কেনরে গেলনা ঘুচি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মালতী বালার সাথে কুমারের
আজি বিবাহ হবে—
কানন আজিকে হতেছে ধ্বনিত
সুখের হরষ রবে।

মালতীর পিতা প্রতাপের দ্বারে
কাননবাসীরা যত,
গাইছে নাচিছে হরষে সকলে,
যুবক রমণী শত।

কেহবা গাঁথিছে ফুলের মালিকা,
গাহিছে বনের গান,
মালতীরে কেহ ফুলের ভূষণ
হরষে করিছে দান।

ফুলে ফুলে কিবা সেজেছে মালতী
এলায়ে চিকুর পাশ—
সুখের আভায় উজলে নয়ন
অধরে সুখের হাস।

আইল কুমার বিবাহ সভায়
মালতীরে লয়ে সাথে,
মালতীর হাত লইয়া প্রতাপ
সঁপিল যুবার হাতে।

ওকিও—ওকিও—সহসা প্রতাপ
বসনে নয়ন চাপি,
মূরছি পড়িল ভূমির উপরে
থর থর থর কাঁপি।

মালতী বালিকা পড়িল সহসা
মূরছি কাতর রবে!
বিবাহ-সভায় ছিল যারা যারা
ভয়ে পলাইল সবে।

সভয়ে কুমার চাহিয়া দেখিল
জনকের উপছায়া—
আগুনের মত দুনয়ন জ্বলে
শোণিতে মাখানো কায়া—

কিকথা বলিতে চাহিল কুমার,
ভয়ে হ'ল কথা রোধ,
জলদ-গভীর স্বরে কে কহিল
"প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—

হা রে কুলাঙ্গার! অক্ষত্র সন্তান,
এই কিরে তোর কায?
শপথ ভুলিয়া কাহার মেয়েরে,
বিবাহ করিলি আজ!

ক্ষত্রধর্ম্ম যদি প্রতিজ্ঞা পালন
হয়, কুলাঙ্গার, তবে
এচরণ ছুঁয়ে যে আজ্ঞা লইলি
সে আজ্ঞা পালিবি কবে!

নহিলে যদিন রহিবি বাঁচিয়া
দহিবে এমোর ক্রোধ।"
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার
"প্রতিশোধ-প্রতিশোধ"—

বুকের বসন হইতে কুমার
ছুরিকা লইল খুলি
ধীরে প্রতাপের বুকের উপরে
সে ছুরি ধরিল তুলি।

অধীর হৃদয় পাগলের মত,
থর থর কাঁপে পাণি—
কতবার ছুরি ধরিল সে বুকে
কতবার নিল টানি।

মাথার ভিতরে ঘুরিতে লাগিল
আঁধার হইল বোধ—
নীরব সে গৃহে ধ্বনিল আবার
"প্রতিশোধ প্রতিশোধ।"

ক্রমশঃ চেতন পাইল প্রতাপ
মালতী উঠিল জাগি
চারিদিক চেয়ে বুঝিতে নারিল
এসব কিসের লাগি।

কুমার তথন কহিলা সুধীরে
চাহি প্রতাপের মুখে
প্রতি কথা তার অনলের মত
লাগিল তাহার বুকে।

"একদা গভীর বরষা নিশীথে
নাই জাগি জন প্রাণী
সহসা সভয়ে জাগিয়া উঠিনু
শুনিয়া কাতর বাণী।

চাহি চারিদিকে—দেখিনু বিস্ময়ে
পিতার হৃদয় হোতে—
শোণিত বহিছে, শয়ন তাঁহার
ভাসিল শোণিত-স্রোতে।

কহিলেন পিতা অধিক কি কব
আসিছে মরণ বেলা—
এই শোণিতের প্রতিশোধ নিতে
না করিবে অবহেলা।

হৃদয় হইতে টানিয়া ছুরিকা
দিলেন আমার হাতে
সে অবধি সেই বিষম ছুরিকা
রাখিয়াছি সাথে সাথে।

করিনু শপথ ছুঁইয়া কৃপাণ
শুন ক্ষত্র-কুল-প্রভু—
এর প্রতিশোধ তুলিব—তুলিব
না হবে অন্যথা কভু।

কি তাহার নাম জানিতাম নাকো
ভ্রমিনু সকল গ্রাম——
অধীরে প্রতাপ উঠিল কহিয়া
"প্রতাপ তাহার নাম!

এখনি-এখনি ওই ছুরি তব
বসাইয়া দেও বুকে
যে জ্বালা হেথায় জ্বলিছে—কেমনে
কব তাহা এক মুখে?

নিভাও সে জ্বালা—নিভাও সে জ্বালা
দাও তার প্রতিফল—
মৃত্যু ছাড়া এই হৃদি-অনলের
নাই আর কোন জল।

কাঁদিয়া উঠিল মালতী কহিল
পিতার চরণ ধ'রে,
"ও কথা বলোনা—বোলোনা গো পিতা,
যেওনা ছাড়িয়ে মোরে!—

কুমার—কুমার—শুন মোর কথা,
এক ভিক্ষা শুধু মাগি,—
রাখ মোর কথা, ক্ষম গো পিতারে,
দুখিনী আমার লাগি!—

শোণিত নহিলে, ও ছুরির তব,
পিপাসা না মিটে যদি,
তবে এই বুকে, দেহ গো বিঁধিয়া,
এই পেতে দিনু হৃদি!"

আকাশের পানে, চাহিয়া কুমার,
কহিল্ল কাতর স্বরে,
ক্ষমা কর পিতা, পারিব না আমি,
কহিতেছি সকাতরে!

অতি নিদারুণ, অনুতাপ শিখা,
দহিছে যে হৃদি তল,
সে হৃদয় মাঝে, ছুরিকা বসায়ে,
বল গো কি হবে ফল?

অনুতাপী জনে, ক্ষমা কর পিতা!
রাখ এই অনুরোধ!"
নীরব সে গৃহে, ধ্বনিল আবার,
প্রতিশোধ!—প্রতিশোধ!—

হৃদয়ের প্রতি শিরা উপশিরা
কাঁপিয়া উঠিল হেন—
সবলে ছুরিকা, ধরিল কুমার,
পাগলের মত যেন।

প্রতাপের সেই, অবারিত বুকে,
ছুরি বিধাইল বলে।
মালতী বালিকা, মূর্চ্ছিয়া পড়িল,
কুমারের পদ তলে।

উন্মত্ত হৃদয়ে, জ্বলন্ত নয়নে,
বদ্ধ করি হস্ত মুঠি—
কুটীর হইতে, পাগল—কুমার,
বাহিরেতে গেল ছুটি,

এখনো কুমার, সেই বন মাঝে,
পাগল হইয়া ভ্রমে।
মালতী বালার, চির মূর্চ্ছা আর,
ঘুচিল না এ জনমে!

স্যাক্সন জাতি ও অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সন সাহিত্য।

এই প্রবন্ধে স্যাক্সন জাতির আচার ও ব্যবহার, ভাষা ও সাহিত্য বিস্তৃত-রূপে বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যে ভিত্তির উপর আধুনিক ইংরাজি মহা-সাহিত্য স্থাপিত আছে সেই আঙ্গ্লো স্যাক্সন ভাষা ও সাহিত্য পরীক্ষা করিয়া দেখিতে এবং যে ভিত্তির উপর সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর স্বরূপ ইংরাজ জাতি আদৌ স্থাপিত, সেই স্যাক্সনদের রীতি নীতি সমালোচনা করিয়া দেখিতে আজ আমরা প্রবৃত্ত হইলাম। কিড্‌মন, বিউল্ফ্, মাস, টেন প্রভৃতির সার সংগ্রহ করিয়া আজ আমরা পাঠকদিগকে উপহার দিতেছি।

রোমানেরা ব্রিটনে রাজ্য স্থাপন করিলে পর এক দল শেলট (celt) তাহাদের বশ্যতা স্বীকার না করিয়া ওয়েলস্ ও হাইল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় লইল। যাহারা রোমকদের অধীন হইল তাহাদের মধ্যে রোমক সভ্যতা ক্রমে ক্রমে বিস্তৃত হইতে লাগিল। রোমকদের অধিকৃত দেশে প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মিত হইল, দৃঢ় প্রাচীরে নগর সমূহ বেষ্টিত হইল—বাণিজ্য ও কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হইল—নর্দাম্বর্লণ্ডের লৌহ, সমার্সেটের শীষক, কর্ণওয়ালের টিনখনি আবিষ্কৃত হইল। কিন্তু বাহিরে সভ্যতার চাকচিক্য যেমন বাড়িতে লাগিল, ভিতরে ভিতরে ব্রিটনের শোণিত ক্ষয় হইয়া আসিতে লাগিল। রোমকেরা তাহাদের সকল বিষয়ের স্বাধীনতা অপহরণ করিল—তাহাদিগকে বিদ্যা শিখাইল—উন্নততর ধর্ম্মে দীক্ষিত করিল—সভ্যতা ও অসভ্যতার প্রভেদ দেখাইয়া দিল—কিন্তু কি করিয়া স্বদেশ শাসন করিতে হয় তাহা শিখাইল না। সুশাসনে থাকাতে জেতৃজাতির উপর তাহারা সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিল—কখনো যে বিপদে পড়িতে হইবে সে কথা ভুলিয়া গেল, সুতরাং আত্মরক্ষণের ভাব অন্তর্হিত ও পরপ্রত্যাশার ভাব তাহাদের চরিত্রে বদ্ধমূল হইল। এইরূপ অস্বাস্থ্যকর সভ্যতা সে জাতির সর্ব্বনাশ করিল। রোমকদের কর-ভারে নিপীড়িত হইয়াও তাহাদের একটি কথা বলিবার যো ছিল না। এক দল জমীদারের দল উত্থিত হইল—ও সেই সঙ্গে কৃষক দলের অধঃপতন হইল—কৃষকেরা জমীদারদের দাস হইয়া কাল যাপন করিতে লাগিল। এইরূপে রোমকদিগের অধিকৃত ব্রিটনেরা ভিতরে ভিতরে অসার হইয়া আসিল। রোমক পুঁথি পড়িতে ও রোমক ভাষায় কথা কহিতে শিখিয়াই তাহারা মনে করিল ভারি সভ্য হইয়া উঠিয়াছি ও স্বাধীন শেলট ও পিক্টদিগকে অসভ্য বলিয়া মনে মনে মহা ঘৃণা করিতে লাগিল। প্রায় চারি শতাব্দী ইহাদের এইরূপ মোহময় সুখ-নিদ্রায় নিদ্রিত রাখিয়া সহসা

এক দিন রোমকেরা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। গথেরা ইটালি আক্রমণ করিয়াছে, সুতরাং রোমকেরা নিজদেশ রক্ষা করিতে ব্রিটন ছাড়িয়া স্বদেশে চলিয়া গেল, আর ফিরিল না। অসভ্যতর শেল্‌ট পিক্ট, স্কট প্রভৃতি সামুদ্রিক দস্যুগণ চারিদিক হইতে ঝাঁকিয়া পড়িল—তখন সেই অসহায় সভ্য জাতিগণ কাঁপিতে কাঁপিতে জর্ম্মণী হইতে অর্থ দিয়া সৈন্য ভাড়া করিয়া আনিল। হেঙ্গেষ্ট ও হর্ষা তাহাদের সাহায্য করিতে সৈন্য লইয়া এবস্‌ফ্লিটে জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইল।

ইহারাই (Angles) আঙ্গল্‌স্। ব্রিটনেরা এবং রোমকেরা ইহাদিগকে স্যাকৃসন বলিত। ইহাদের ভাষার নাম Seo Englisce Spræc অর্থাৎ English Speech. হলাণ্ড হইতে ডেন্মার্ক পর্য্যন্ত ঐযে সমুদ্র-সীমা দেখিতেছ, মেঘময়, কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন আর্দ্র ভূমি বিস্তৃত রহিয়াছে—বহু শতাব্দী পূর্ব্বে উহা নিবিড় অরণ্যে আবৃত ছিল, সেই আরণ্য ভূভাগ অ্যাঙ্গল্‌স্‌দের বাসস্থান ছিল। এমন কদর্য্য স্থান আর নাই। বৃষ্টি ঝটিকা মেঘে সেই দেশের মস্তকের উপর কি যেন অভিশাপের অন্ধকার বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। দিবা-রাত্রি উন্মত্ত জলধি তীর-ভূমি আক্রমণ করিতেছে—এই ক্ষুভিত সমুদ্রের মুখে কোন জাহাজের সহজে নিস্তার নাই। এই সমুদ্রতীরে, তুষার কুজ্‌ঝটিকাচ্ছন্ন-ঝঞ্ঝা-ঝটিকা-ক্ষুব্ধ অন্ধকার অরণ্যে ও জলায় শোণিত-পিপাসু সমুদ্রিক দস্যুদল বাস করিত। এই মনুষ্যশিকারীরা জীবনকে তৃণ জ্ঞান করিত। সেই সময়কার রোমক কবি কহিয়াছেন "তাহারা আমাদের শত্রু; সমুদয় শত্রু অপেক্ষা হিংস্র, এবং যেমন হিংস্র তেমনি ধূর্ত্ত। সমুদ্র তাহাদের যুদ্ধ-শিক্ষালয়, ঝটিকা তাহাদের বন্ধু; এই সমুদ্র-ব্যাঘ্রেরা পৃথিবী লুণ্ঠন করিবার জন্যই আছে।" তাহারা আপনারাই গাহিত "ঝটিকা-বেগ আমাদের দাঁড়ের সহায়তা করে—আকাশের নিশ্বাস স্বরূপ বজ্রের গর্জ্জন আমাদের হানি করিতে পারে না—ঝঞ্ঝা আমাদের ভৃত্য—আমরা যেথানে যাইতে ইচ্ছা করি সে আমাদের সেই খানেই বহন করিয়া লইয়া যায়।" স্ত্রীলোক এবং দাসদের উপর ভূমি কর্ষণ ও পশুপালনের ভার দিয়া ইহারা সমুদ্র ভ্রমণ, যুদ্ধ ও দেশলুণ্ঠন করিতে যাইত। রক্তপাত করাই তাহারা মুক্ত স্বাধীন জাতির কার্য্য বলিয়া জানিত—স্বাধীনতা ও মুক্ত ভাবের ইহাই তাহাদের আদর্শ ছিল। নরহত্যা ও রক্তপাত তাহাদের ব্যবসায়, ব্যবসায় কেন, তাহাই তাহাদের আমোদ ছিল। Ragnar Lodbrog নামক গাথক গাহিতেছে—"অসি দিয়া আমরা তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিলাম;—আমার সুন্দরী পত্নীকে যখন প্রথম আমার পার্শ্বে শয্যায় বসাইলাম তখন আমার যেরূপ আমোদ হইয়াছিল, সেই সময়েও কি আমার তেমনি আমোদ হয় নাই?" যখন (Egil) এজিল ডেন্মার্কবাসী জার্লের কন্যার পার্শ্বে উপবেশন করিল, তখন সেই কন্যা তাঁহাকে "তিনি কখনো নেকড়িয়া বাঘদিগকে গরম গরম মনুষ্য মাংস খাইতে

দেন নাই ও সমস্ত শরৎকালের মধ্যে মৃতদেহের উপর কাক উড়িতে দেখেন নাই” বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়া দূরে ঠেলিয়া দিল। তখন এজিল এই বলিয়া তাহাকে শান্ত করে “আমি রক্তাক্ত অসি হস্তে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছি, নর-দেহ-লোলুপ কাকেরা আমার অনুসরণ করিয়াছে। দারুণ যুদ্ধ করিয়াছি এবং মনুষ্য আলয়ের উপর দিয়া অগ্নি চলিয়া গিয়াছে। যাহারা দ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত ছিল, তাহাদিগকে রক্তের উপর ঘুম পাড়াইয়াছি।” তখনকার কুমারীদের সহিত এই রূপ কথোপকথন চলিত। ইহাদের গ্রামবাসীদের সম্বন্ধে ট্যাসিটস্ বলেন যে ইহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ আপনার আপনার লইয়াই থাকে। এমন বিজনতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় জাতি আর নাই। প্রত্যেক গ্রামবাসী যেমন আপনার ভূমিটুকু লইয়া স্বতন্ত্র থাকে তেমনি আবার প্রত্যেক গ্রাম অন্য গ্রামের সহিত স্বতন্ত্র থাকিতে চায়। প্রত্যেক গ্রাম চারি ধারে অরণ্য বা পোড়ো-ভূমির দ্বারা ঘেরা থাকে—সে ভূমি কোন বিশেষ ব্যক্তির অধিকারভুক্ত নহে—সেই খানে দোষী ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হইত—এবং সেই খানে সকল প্রকার উপদেবতার আবাস বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল। যখন কোন নূতন ব্যক্তি সেই অরণ্য বা পোড়োভূমির মধ্যে আসিত তখন তাহাকে শৃঙ্গ বাজাইয়া আসিতে হইত। নিঃশব্দে আসিলে শত্রু জ্ঞান করিয়া যার ইচ্ছা সেই তাহাকে বধ করিতে পারিত। ইহাদের সকলেরই প্রায় একটু ভূমি থাকিত, এবং যাহাদের এইরূপ ভূমি থাকিত তাহাদের নাম (churl) কার্ল্ (মনুষ্য) ছিল। তাহাদিগকে Freenacked man (মুক্তস্কন্ধ) কহিত—অর্থাৎ তাহাদের কোন প্রভুর নিকট স্কন্ধ নত করিতে হইত না। তাহাদের আর এক নাম ছিল “শস্ত্রধারী” অর্থাৎ তাহাদেরই অস্ত্রবহন করিবার অধিকার ছিল। প্রথমে ইহাদের মধ্যে বিচারপ্রণালী ছিল না—প্রত্যেক মনুষ্য আপনার আপনার প্রতিহিংসা সাধন করিত। ক্রমে ন্যায় ও বিচার প্রচলিত হইল। তখনকার অপরিস্ফুট দণ্ডনীতি বলেন—চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ দাও, কিম্বা তার উপযুক্ত মূল্য দাও। যাহার যে অঙ্গ তুমি নষ্ট করিবে, তোমার নিজের সেই অঙ্গ দান করিতে হইবে, কিম্বা তাহার উপযুক্ত মূল্য দিতে হইবে। এ মূল্য যে দোষী ব্যক্তিই দিবে তাহা নহে, দোষী ব্যক্তির পরিবার আহত ব্যক্তির পরিবারকে দিবে। প্রত্যেক কুটুম্ব তাঁহার অন্য কুটুম্বের রক্ষক, এক জনের জন্য সকলে দায়ী, ও এক জনের উপর আর কেহ অন্যায়াচরণ করিলে সকলে তাহার প্রতিবিধান করিবেন। ইহাদের মধ্যে বিশেষ পুরোহিত কেহ ছিল না—প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনার পুরোহিত।

নিপীড়িত ব্রিটিষ জাতীয়েরা এই অ্যাঙ্গল্স্ সৈন্যদিগকে অর্থ দিয়া ভাড়া করিয়া আনিল। কিন্তু দেখিতে দেখিতে ঝাঁকে ঝাঁকে অ্যাঙ্গল্স্রা ব্রিটনে আসিয়া পড়িল। ব্রিটিষদিগের এত টাকা ও খাদ্য দিবার সামর্থ্য ছিল না; সুতরাং অবশেষে তাহাদেরই স-

হিত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। দারুণ হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল—ধনিগণ সমুদ্রপারে পলায়ন করিল। দরিদ্র অধিবাসীরা পার্ব্বত্য প্রদেশে লুকাইয়া রহিল, কিন্তু আহারাভাবে সেখানে অধিক দিন থাকিতে না পারিয়া বাহির হইয়া পড়িত, অমনি নিষ্ঠুর স্যাক্‌সনদের তরবারি-ধারে নিপতিত হইত। দরিদ্র কৃষকেরা গির্জ্জায় গিয়া আশ্রয় লইত—কিন্তু গির্জ্জার উপরেই স্যাক্‌সনদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রোধ ছিল। গির্জ্জায় আগুন ধরাইয়া দিয়া আচার্য্যদিগকে বধ করিয়া একাকার করিত, কৃষক বেচারীরা আগুন হইতে পলাইয়া আসিয়া স্যাক্‌সনদের তরবারিতে নিহত হইত। ফ্র্যাঙ্ক জাতিরা গল্‌ অধিকার করিলে ও লম্বর্ডিগণ ইটালি অধিকার করিলে জেতারাই সভ্যতর জিত জাতিদের মধ্যে লোপ পাইয়া যায়, কিন্তু ইংলণ্ডে ঠিক তাহার বিপরীত হয়—স্যাক্‌সনেরা একেবারে ব্রিটন জাতিকে ধ্বংশ করিয়া ফেলে। দুই শতাব্দী ক্রমাগত যুদ্ধ ও ক্রমাগত হত্যা করিয়া স্যাক্‌সনেরা ব্রিটনের আদিম অধিবাসীদের বিলোপ করিয়া দেয়। তখন ইংলণ্ড তাহাদেরই দেশ হইল। অল্প স্বল্প দুই একটি ব্রিটন যাহারা অবশিষ্ট ছিল তাহারা কেহ কেহ স্যাক্‌সন প্রভুর দাস হইয়া রহিল, কেহ কেহ বা ওয়েলস্‌ ও হাইলণ্ডের দুর্গম প্রদেশে পলাইয়া গেল। এখনো শেল্‌টিক ভাষা-প্রসূত এক প্রকার ভাষা ওয়েল্‌সে চলিত আছে।* ইংরাজি ভাষায় শেল্‌টিক উপাদান খুব অল্পই পাইবে। নবম হইতে দ্বাদশ শতব্দী পর্য্যন্ত কেবল কেল্‌টিক বা শেল্টিক কথা ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত ছিল।

রোমকেরা যখন ইংলণ্ড বিজয় করিয়া ছিলেন তখন অধিকৃত জাতিদিগের রাজভাষা লাটিন ছিল। কিন্তু অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন ভাষায় তখনো লাটিনের কোন চিহ্ন পড়ে নাই। ইংলণ্ডের কতকগুলি দেশের নাম কেবল রোমীয় ধাতু হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা ব্যতীত দুএকটি অন্য কথাও রোমীয় ধাতু হইতে প্রসূত হইয়াছিল, যেমন Cheese পনির কথা লাটিন Casens হইতে উৎপন্ন। স্যাক্‌সন munt (পর্ব্বত) কথা বোধ হয় লাটিন mons হইতে গৃহীত হইয়াছে। পর্ব্বত প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থের নামও যে অন্য ভাষা হইতে গৃহীত হইবে, ইহা কতকটা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু জর্ম্মান সমুদ্রের তীরে বা তাহার নিকটে একটিও পর্ব্বত নাই, সুতরাং সে দেশবাসীরা যে পর্ব্বতের নাম না জানিবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই।

জর্ম্মাণ জাতিরা যখন স্পেন গল ও ইতালি জয় করিয়াছিল, তখনো সে দেশের

* যে জাতিরা অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্‌সন দলভুক্ত নয়, অথচ অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্‌সনদের দেশের সীমায় বাস করিত, তাহাদিগকে স্যাক্‌সনেরা Wealhas বলিত, ইহা হইতেই Wales নামের উৎপত্তি। এই কারণ বশতই ইটালির জর্ম্মাণ নাম Welsch land. ঐ কারণেই আরো অনেক দেশকে জর্ম্মণেরা Welsh walloon, wallachia নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

ধর্ম্ম, সামাজিক আচার ব্যবহার, ও শাসন প্রণালীর পরিবর্ত্তন হয় নাই। কিন্তু জর্ম্মাণ জাতিরা ব্রিটন দ্বীপ যেরূপ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিল এমন আর কোন দেশ পারে নাই। রোমীয় সভ্যতার ধ্বংশাবশেষের উপর সম্পূর্ণরূপে জর্ম্মাণ সমাজ নির্ম্মিত হইল। ব্রিটিষ আচার ব্যবহার, ইতালীর সভ্যতা, সমস্ত ধ্বংশ হইয়া গেল, এবং এই সমতলীকৃত ভূমির উপর আর এক প্রকার নূতনতর ও উন্নততর সভ্যতার বীজ রোপিত হইল।

যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে স্যাক্‌সনদের রাজার প্রয়োজন হইল। পূর্ব্বে তাহাদের রাজা ছিল না। যখন কোথাও যুদ্ধ করিতে যাইত তখন একজনকে প্রধান বলিয়া লইয়া যাইত মাত্র। কিন্তু একটা দেশ অধিকার করিয়া রাখিতে হইলে ও ক্রমাগত তদ্দেশবাসীদের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ বাধিলে রাজা নহিলে চলে না। হেঙ্গেষ্টের উত্তরাধিকারীরা কেল্‌টের রাজা হইল। এই সকল যুদ্ধে স্যাক্‌সন জাতিদের মধ্যে দাস-সংখ্যা বাড়িয়া উঠিল। যুদ্ধে বন্দী হইলে উচ্চ শ্রেণীস্থদিগকেও দাস হইতে হইত,এবং মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও দাসত্ব অনেকে আহ্লাদের সহিত গ্রহণ করিত। ঋণ শুধিতে না পারিয়া অনেককে উত্তমর্ণের দাস হইতে বাধ্য হইতে হইত। বিচারে অপরাধী ব্যক্তির পরিবারেরা জরিমানা দিতে না পরিলে সে দোষী ব্যক্তিকে দাসত্ব ভোগ করিতে হইত। এইরূপে স্যাক্‌সনদের মধ্যে একটা দাসজাতি উত্থিত হইল। দাসের পুত্রও দাস হইত। ইহা হইতেই এই ইংরাজি প্রবাদ উৎপন্ন হয় যে, আমার গরুর বাছুর আমারি সম্পত্তি। দাস পলাইয়া গেলে পর ধরিতে পারিলে তাহাকে চাবুক মারিয়া মারিয়া খুন করিত বা স্ত্রীলোক হইলে তাহাকে দগ্ধ করিয়া মারিত। যখন ব্রিটনদের সহিত যুদ্ধ কতকটা ক্ষান্ত হইল, তখন তাহাদের আপনাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। নর্দাম্বরলণ্ডের রাজা ইয়ল্‌ফ্রিথ্ অন্যান্য অনেক ইংলিস রাজ্য জয় করিলেন। কেবল কেণ্টের রাজা ইথ্‌ল্‌বার্ট তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইয়ল্‌ফ্রিথের অকস্মাৎ মৃত্যুতে এই দুই রাজ্যের মধ্যে তেমন বিবাদ বাধিতে পারে নাই। এই সময়ে খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ধীরে ধীরে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিল। প্যারিসের খ্রীষ্টান রাজকন্যা বাক্‌টার সহিত ইথ্‌ল্‌বার্টের বিবাহ হইল। রাজ্ঞীর সহিত একজন খ্রীষ্টান পুরোহিত কেণ্টের রাজধানীতে আসিল। এই বিবাহ-বার্ত্তা শ্রবণে সাহস পাইয়া পোপ গ্রেগরি সেণ্ট অগষ্টিনকে ইংলণ্ডে ক্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিতে পাঠাইয়া দিলেন। কেণ্টের অধিপতি তাহাদের ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিলেন ও কহিলেন "তোমাদের কথাগুলি বেশ, কিন্তু নূতন ও সন্দেহজনক। তিনি নিজে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না, কিন্তু খ্রীষ্টানদিগকে আশ্রয় দিতে স্বীকার করিলেন। প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত অনেক যুঝাযুঝির পর খৃষ্টান ধর্ম্ম ইংলণ্ডে স্থান পাইল।

ইংলণ্ড-বিজেতাদের যে সকলেরই এক

ভাষা ও এক জাতি ছিল তাহা নহে। এই খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রবেশ করিয়া তাহাদের ভাষা ও জাতি অনেকটা এক করিয়া দিল। এই ভাষার ঐক্য সাহিত্যের অল্প উন্নতির কারণ নহে। খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অক্ষরে লিখা প্রচলিত ছিল না। খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রবেশ করিলে পর স্যাক্সনেরা নব উদ্যমে উদ্দীপ্ত হইল ও তাহাদের হৃদয়ের উৎস উন্মুক্ত হইয়া সঙ্গীত-স্রোতে অ্যাঙ্গ্লো-স্যাক্সন সাহিত্য পূর্ণ করিল। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার হওয়াতে স্যাক্সনদের মধ্যে রোমীয় সাহিত্য চর্চ্চার আরম্ভ হইল ও বাইবেলের কবিতার উচ্চ আদর্শ স্যাক্সনেরা প্রাপ্ত হইল। যুদ্ধোন্মাদে মত্ত থাকিয়া যে জাতি বিদ্যার দিকে মনোযোগ করিতে পারে নাই, খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সহিত শান্তি ও ঐক্যে অভিষিক্ত হইয়া সম্মুখে যে ইতালীয় বিদ্যার খনি পাইল তাহাতেই তাহারা মনের সমুদয় উদ্যম নিয়োগ করিল। খৃস্টধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিবার জন্য তাহারা অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সন ভাষায় বাইবেল ও অন্যান্য লাটিন ধর্ম্মপুস্তক অনুবাদ করিতে লাগিল। ইহাতে যে ভাষার ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আঙ্গ্লো স্যাক্সন ভাষায় লিখিত অধিক প্রাচীন পুস্তক পাওয়া যায় না। অ্যাল্‌ফ্রেডের সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত ভাষা Bec ledene (Book language) অর্থাৎ লিখিত ভাষা হইল। প্রাচীনতর পুস্তক যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারের পরে অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। প্রাচীনতম আঙ্গ্লোসাক্সন কাব্যের মধ্যে Lay of Beowulf প্রধান। ইহা কোন্ সময়ে যে রচিত হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন খৃস্টান ধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবিতা অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সন ভাষায় পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু ইহার ধরণ, ভাব অন্যান্য অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সন কবিতার সহিত এত বিভিন্ন যে এই গীতি সাধারণ স্যাক্সন প্রতিভা হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে হয় না। স্কান্দিনেবীয় পৌরাণিক কবিতার সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। গল্পটির সার মর্ম্ম এই, ডহাম গ্রেণ্ডেল বলিয়া এক রাক্ষস ছিল, সে নিকটস্থ জলার মধ্য হইতে বাহির হইয়া রাত্রে গুপ্ত ভাবে তথাকার রাজবাটির মধ্যে প্রবেশ করিত ও গৃহস্থিত ঘুমন্ত যোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট করিত; কেহ কেহ বলেন এই রাক্ষস জলার অস্বাস্থ্যজনক বাষ্পের রূপক মাত্র। বোউল্‌ফ নৃপতি তথায় গিয়া সেই রাক্ষসকে আহত ও নিহত করেন। তিনি ফেনগ্রীব (Foamy necked) জাহাজে চড়িয়া কিরূপে বিদেশায় রাজ সভায় আইলেন এবং তাঁহার অন্যান্য কীর্ত্তি ইহাতে স্কান্দিনেবীয় সাগার ধরণে লিখিত। বোউল্‌ফ এক মহাবীর পুরুষ। "তিনি উন্মুক্ত অসি দৃঢ় হস্তে ধরিয়া ঘোরতর তরঙ্গে ও শীতলতম ঝঞ্ঝায় সমুদ্র পর্য্যটন করিয়াছেন, ও তাঁহার চারিদিকে শীতের তীব্রতা সমুদ্রের ঊর্ম্মির সহিত যুদ্ধ করিয়াছে।" কিন্তু তিনি তাহাদিগের কুঠার দিয়া বিদ্ধ করিলেন। নয় জন সিন্ধুদৈত্য

(NICOR) বিনাশ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা হ্রথগার Hrothgar কে গ্রেণ্ডেল (Grendel) দৈত্যহস্ত হইতে নিস্তার করিবার জন্য অস্ত্রাদি কিছু না লইয়াই আসিলেন। আপনার শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রাসাদে শুইয়া আছেন—"নিশীথের অন্ধকার উত্থিত হইল, ওই গ্রেণ্ডেল আসিতেছে, সকলে দ্বার খুলিয়া ফেলিল"—এক জন ঘুমন্ত যোদ্ধাকে ধরিল, "তাহার অজ্ঞাতসারে তাহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিল, তাহাকে দংশন করিল, তাহার শিরা হইতে রক্তপান করিল, ও তাহাকে ক্রমাগত ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইয়া ফেলিল।" এমন সময়ে বোউলফ উঠিলেন, দৈত্যকে আক্রমণ করিলেন। "প্রাসাদ কম্পিত হইল * * উভয়েই উন্মত্ত। গৃহ ধ্বনিত হইল, আশ্চর্য্য এই যে যে মদ্যশালা এই সংগ্রাম-শ্বাপদদিগকে বহন করিয়া ছিল, সে সুন্দর প্রাসাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। শব্দ উত্থিত হইল, তাহা নূতন প্রকারের। যখন নর্থ ডেন্মার্কবাসীরা আপনাদের গৃহভিত্তির মধ্যে থাকিয়া শুনিল যে সেই ঈশ্বর-দ্বেষী আপন ভীষণ পরাজয়-সঙ্গীত গাহিতেছে, আঘাত-যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, তখন এক প্রকার ভয়ে তাহারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। * * সেই ঘৃণ্য হতভাগ্যের মৃত্যু-আঘাত পাইতে এখনো বাকি আছে—অবশেষে সে স্কন্ধে ভীষণ আঘাত পাইল—তাহার মাংসপেশী সমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল—অস্থির সন্ধিমূল বিভিন্ন হইল। সমরে বোউল্‌ফেরই জয় হইল।"* বিচ্ছিন্ন হস্ত-পদ গ্রেণ্ডেল হ্রদে গিয়া লুকাইল। "সেই হ্রদের তরঙ্গ তাহার রক্তে ফুটিতে লাগিল। হ্রদের জল তাহার শোণিতের সহিত মিশিয়া উষ্ণ হইয়া উঠিল। রক্ত-বিবর্ণ জলে শোণিতের বুদ্বুদ উঠিতে লাগিল।" সেই খানেই তাহার মৃত্যু হইল। কিন্তু গ্রেণ্ডেলের মাতা, তাহার পুত্রের মত যাহার "অতি শীতল সলিলের ভীষণ স্থানে বাস নির্দ্দিষ্ট ছিল" সে এক দিন রাত্রে আসিয়া আর এক জন যোদ্ধাকে বিনাশ করিল। বোউলফ্‌ পুনরায় তাহাকে বধ করিতে চলিলেন। একটি পর্ব্বতের নিকট এক ভীষণ গহ্বর ছিল—সে গহ্বর নেকড়িয়া বাঘ্রদের আবাস স্থান। পর্ব্বতের অন্ধকারে ভূমির নিম্ন দিয়া এক নদী বহিয়া যাইতেছে। বৃক্ষ সমূহ শিকড় দিয়া সেই নদী আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। রাত্রে সেখানে গেলে দেখা যায় সে স্রোতের উপর আগুন জ্বলিতেছে। সে অরণ্যে কেহ নেকড়িয়া বাঘ্র দ্বারা আক্রান্ত হইলে বরং তীরে দাঁড়াইয়া মরিয়া যাইবে তবুও সে স্রোতে লুকাইতে সাহস পাইবে না। অদ্ভুতাকৃতি পিশাচ (Dragon) ও সর্প সমূহ সেই স্রোতে ভাসিতেছে। বোউল্‌ফ্‌ সেই তরঙ্গে ডুব দিলেন; বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সেই রাক্ষসীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। সে তাঁহাকে মুষ্টিতে বদ্ধ করিয়া তাহার আবাস স্থানে লইয়া গেল। সেখানে এক বিবর্ণ আলোক জ্বলিতেছিল। সেই আলোকে সম্মুখাসম্মুখি দাঁড়াইয়া বীর সেই পাতালের বাঘিনী মহাশক্তি, নাগিণীকে দেখিলেন।

অবশেষে তাহাকে বধ করিলেন। তাঁহার মৃত্যু-ঘটনা নিম্ন লিখিত রূপে কথিত আছে। পঞ্চাশ বৎসর তিনি রাজত্ব করিলে পর এক ড্রাগণ (Dragon) আসিয়া "অগ্নি-তরঙ্গে" মনুষ্য ও গৃহ নষ্ট করিতে লাগিল। বো-উল্‌ফ্‌ এক লৌহ-চর্ম্ম নির্ম্মাণ করিলেন। এবং তাহাই পরিধান করিয়া একাকী যুদ্ধ করিতে গেলেন। "নৃপতির এমন উদ্ধত গর্ব্ব ছিল যে সেই পক্ষবান রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে অধিক সঙ্গী ও সৈন্য লইয়া যাইতে চাহিলেন না।" কিন্তু তথাপি কেমন বিষণ্ণ হইয়া অনিচ্ছার সহিত গে-লেন, কেন না এই বার তাঁহার অদৃষ্টে মৃত্যু আছে। সেই রাক্ষস অগ্নি উদ্গার ক-রিতে লাগিল। তাহার শরীরে অস্ত্র বিদ্ধ হইল না। রাজা সেই অগ্নির মধ্যে পতিত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা পাইতে লাগিলেন। উইগ্লাফ্‌ ব্যতীত তাঁহার অন্য সমস্ত সহচর বনে পলায়ন করিল। উইগ্‌লাফ অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের উভয়ের খড়্গাঘাতে সেই ড্রাগন বিচ্ছিন্ন-শরীর ও বিনষ্ট হইল। কিন্তু রাজার ক্ষতস্থান ফুলিয়া উঠিল ও জ্বলিতে লাগিল, "তিনি দেখিলেন তাঁহার বক্ষের মধ্যে বিষ ফুটি-তেছে।" তিনি মৃত্যুকালে বলিলেন, "পঞ্চাশ বৎসর আমি এই সকল প্রজাদিগকে পালন করিয়াছি। এমন কোন রাজা ছিল না যে আমাকে ভয় দেখাইতে বা আমার নিকট সৈন্য পাঠাইতে সাহস করিত। আমার যাহা কিছু ছিল তাহা ভালরূপ রক্ষা করিয়াছি, কোন বিশ্বাসঘাতকতা করি নাই, অন্যায় শপথ করি নাই। যদিও আমি মৃত্যু-আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি, এই সকল কারণে তথাপি আমার আনন্দ হইতেছে। 'প্রিয় উইগ্‌লফ! এখনি যাও, ঐ শ্বেত-প্রস্তর-শালা (দৈত্যের আবাস) অনু-সন্ধান করিয়া দেখ, গুপ্ত ধন পাইবে। আ-মার জীবন দিয়া ধনরাশি ক্রয় করিয়াছি, উহা আমার প্রজাদের অভাবের সময় কাজে লাগিবে। আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার প্রজা-দের জন্য এই যে ধন পাইয়াছি ইহার নিমিত্ত দেবতার নিকট ঋণী রহিলাম।' এই কাব্যের কবিতা যতই অসম্পূর্ণ হউক, ইহার নায়ক যে অতি মহান তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহাঁর চরিত্রে প্রতিপদে পৌরুষ প্রকাশ পাইতেছে। পরের উপকারের জন্য নি-জের প্রাণ দিতে ইনি কখনো সঙ্কুচিত হন নাই। সেই সময়কার সমাজের অসভ্য অবস্থায় এরূপ চরিত্র যে চিত্রিত হইতে পারিবে ইহা একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্‌সন কবিতা হৃদয়ের কথা মাত্র, আর কিছুই নহে। ইহাতে চিন্তার কোন সংস্রব নাই। ইহার কবিতা কতক-গুলি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথার সমষ্টিমাত্র— ছন্দও তেমনি ভাঙ্গা ভাঙ্গা, ঠিক যেন হৃদ-য়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সময় সকল কথা ভাল করিয়া বাহির হইতেছে না। "সৈন্যদল যাইতেছে, পাখিরা গাইতেছে, ঝিল্লীরব হইতেছে, যুদ্ধাস্ত্রের শব্দ উঠিতেছে— বর্ম্মের উপর] বর্ষাঘাতের ধ্বনি হইতেছে। ওই উজ্জ্বল চন্দ্র আকাশের তলে ভ্রমণ ক-

রিতে লাগিল। ভয়ানক দৃশ্য সকল দৃষ্টিগোচর হইল। * * প্রাঙ্গণে যুদ্ধ-কোলাহল উত্থিত হইল। তাহারা কাষ্ঠের ঢাল হস্তে ধারণ করিল। তাহারা মস্তকের অস্থিভেদ করিয়া অস্ত্র বিদ্ধ করিল। দুর্গের ছাদ প্রতিধ্বনিত হইল। * * অন্ধকার-বর্ণ অশুভদর্শন কাকেরা চারিদিকে উইলোপত্রের ন্যায় উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল।”

অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সন কবিতায় প্রেমের কথা নাই বলিলেও হয়;—কিন্তু বন্ধুত্ব ও প্রভুপ্রীতির সুন্দর বর্ণনা আছে। “বৃদ্ধ রাজা তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুচরকে আলিঙ্গন করিলেন—দুই হস্তে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন, বৃদ্ধ অধিপতির কপোল বাহিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইল, সে বীর তাঁহার এত প্রিয় ছিল। তাঁহার হৃদয় হইতে যে অশ্রুধারা উত্থিত হইল তাহা নিবারণ করিলেন না! হৃদয়ে মর্ম্মের গভীর তন্ত্রীতে তাঁহার প্রিয় বীরের জন্য গোপনে নিশ্বাস ফেলিলেন।”

কোন দেশান্তরিত ব্যক্তি তাহার প্রভুকে স্বপ্নে দেখিতেছে—যেন তাঁহাকে আলিঙ্গন, চুম্বন করিতেছে, যেন তাঁহার ক্রোড়ে মাথা রাখিতেছে। অবশেষে যখন জাগিয়া উঠিল যখন দেখিল সে একাকী, যখন দেখিল সম্মুখে জনশূন্য প্রদেশ বিস্তীর্ণ, সামুদ্রিক পক্ষীরা পক্ষবিস্তার করিয়া তরঙ্গে ডুব দিতেছে, বরফ পড়িতেছে, তুষার জমিতেছে, শিলাবৃষ্টি হইতেছে, তখন সে কহিয়া উঠিল—

“কতদিন আনন্দের সহিত আমরা মনে করিয়াছিলাম, মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুতেই আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না, অবশেষে তাহা মিথ্যা হইল, যেন আমাদের মধ্যে কখনো বন্ধুত্ব ছিল না। কষ্ট দিবার জন্য মানুষেরা আমাকে এই অরণ্যে এক ওক্ বৃক্ষের তলে এই গহ্বরে বাস করিতে দিয়াছে। এই মৃত্তিকার নিবাস অতি শীতল,আমি শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। গহ্বর সকল অন্ধকার, পর্ব্বত সকল উচ্চ, কণ্টকময় শাখা প্রশাখার নগর, একি নিরানন্দ আলয়! * * * আমার বন্ধুরা এখন ভূগর্ভে—যাহাদের ভাল বাসিতাম, এখন কবর তাহাদিগকে ধারণ করিতেছে। কবর তাহাদের রক্ষা করিতেছে,—আর আমি একাকী ভ্রমিয়া বেড়াইতেছি। এই ওক্ বৃক্ষতলে এই গহ্বরে এই দীর্ঘ গ্রীষ্মকালে আমাকে বসিয়া থাকিতে হইবে।”

অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সন কবিতার ছন্দ বড় অদ্ভুত। ইহার মিল নাই বা অন্য কোন নিয়ম নাই, কেবল প্রত্যেক দ্বিতীয় ছত্রে দুই তিনটি এমন কথা থাকিবে যাহার প্রথম অক্ষর এক, যেমন—

Ne wæs her tha giet, nym the heol-
    stirsceado
Wiht geworden; ac thes wida grund
Stood deop and dim, drihtne fremde,
Idel and unnyt.

অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সন খৃষ্টান কবিদিগের মধ্যে প্রধান ও প্রথম, কিড্‌মন (Cædmon)। অনেক বয়স পর্য্যন্ত কিডমন কবিতা রচনা করিতে পারিতেন না। এক দিন এক

নিমন্ত্রণ সভায় সকলে বীণা লইয়া পর্য্যায়ক্রমে গান গাইতে ছিল, কিড্‌মন্ যেই দেখিলেন, তাঁহার কাছে বীণা আসিতেছে, অমনি আস্তে আস্তে সভা হইতে উঠিলেন এবং বাড়ি প্রস্থান করিলেন। এক দিন রাত্রে এক অশ্বশালায় চৌকি দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, স্বপ্ন দেখিলেন একজন কে যেন আসিয়া তাঁহাকে কহিতেছে, "কিড্‌মন্, আমাকে একটা গান শুনাও। কিড্‌মন্ কহিলেন "আমি যে গাইতে পারি না।' সে কহিল "তাহা হউক, তুমি গাহিতে পারিবে।' কিড্‌মন্ কহিলেন "কি গান গাইব।" সে কহিল "সৃষ্টির আরম্ভ বিষয়ে।" ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে কিড্‌মন্ আবেস্ হিল্‌ডার নিকট গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন; আবেস্ মনে করিলেন কিড্‌মন্ দেবপ্রসাদ পাইয়াছেন, তিনি কিড্‌মনকে তাঁহার দেবালয়ের সন্ন্যাসী-দলভুক্ত করিয়া লইলেন। কৃত্তিবাস যেমন কথকতা শুনিয়া রামায়ণ লিখিতেন, তেমনি একজন কিড্‌মনকে বাইবল অনুবাদ করিয়া শুনাইত আর তিনি তাহা ছন্দে পরিণত করিতেন। আমাদের দেশের কবিদের সহিত, কিড্‌মনের স্বপ্ন আদেশের বিষয় কেমন মিলিয়া গিয়াছে।

সৃষ্টির বিষয়ে কিড্‌মন এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

গুহা-অন্ধকার ছাড়া ছিল না কিছুই!
এমহা অতলস্পর্শ আঁধার গভীর—
আছিল দাঁড়ায়ে শুধু শূন্য নিষ্ফল।
উন্নত ঈশ্বর তবে দেখিলা চাহিয়া
এই নিরানন্দস্থান! দেখিলা হেথায়
অন্ধকার, বিষণ্ণ ও শূন্য মেঘরাশি
রহিয়াছে চিরস্থির-নিশীথিনী ল'য়ে।
উত্থিত হইল সৃষ্টি ঈশ্বর আজ্ঞায়।
মহান্ ক্ষমতা বলে অনন্ত ঈশ্বর
প্রথমে স্বর্গ ও পৃথ্বী করিলা সৃজন।
নির্ম্মিলা আকাশ; আর এ বিস্তৃত ভূমি
সর্ব্বশক্তিমান প্রভু করিলা স্থাপন।
পৃথিবী তরুণ তৃণে ছিলনা হরিত,
সমুদ্র চিরান্ধকারে আছিল আবৃত,
পথ ছিল সুদূর-বিস্তৃত, অন্ধকার।
আদেশিলা মহাদেব জ্যোতিরে আসিতে
এমহা আঁধার স্থানে। মুহূর্ত্তে অমনি
ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল তাঁর। পবিত্র আলোক
এই মরুময় স্থানে পাইল প্রকাশ।

কিড্‌মন ইজিপ্টের ফ্যারাওর (Pharaoh) যুদ্ধে মৃত্যুবর্ণনা করিতেছেন—

ভয়ে তাহাদের হৃদি হইল আকুল!
মৃত্যু হেরি সমুদ্র করিল আর্ত্তনাদ,
পর্ব্বত-শিখর রক্তে হইল রঞ্জিত,
সিন্ধু রক্তময় ফেন করিল উদ্গার,
উঠিল মৃত্যু-আঁধার, গর্জ্জিল তরঙ্গ,
পলা'ল ইজিপ্ট-বাসী ভয়ে কম্পান্বিত।

*　　*　　*

সমুদ্র তরঙ্গ রাশি মেঘের মতন
ধাইয়া তাদের পানে, পড়িল ঝাঁপিয়া;
গৃহে আর কাহারেও হ'ল না ফিরিতে।
যেথা যায় সেথানেই উন্মত্ত জলধি—
বিনষ্ট হইয়া গেল তাহাদের বল,
উঠিল ঝটিকা ঘোর আকাশ ব্যাপিয়া,
করিল সে শত্রুদল দারুণ চীৎকার!

মৃত্যুর নিদাঘে বায়ু হল ঘনীভূত!

পাঠকেরা যদি মিলটনের সয়তানের সহিত কিড্‌মনের সয়তানের তুলনা করিয়া দেখেন তবে অনেক সাদৃশ্য পাইবেন।

কেনবা সেবিব তাঁরে প্রসাদের তরে?
কেন তাঁর কাছে হব দাসত্বে বিনত?
তাঁর মত আমিও বিধাতা হ'তে পারি।
তবে শুন—শুন সবে বীর-সঙ্গিগণ
তোমরা সকলে মোর কর সহায়তা,
তাহ'লে এযুদ্ধে মোরা লভিব বিজয়!
সুবিখ্যাত, সুদৃঢ়-প্রকৃতি বীরগণ
আমারেই রাজা বোলে করেছে গ্রহণ।
সুযুক্তি দিবার যোগ্য ইহারাই সবে,
যুঝিব ঈশ্বর সাথে ইহাদের ল'য়ে!

* * *

ইহাদেরি রাজা হ'য়ে শাসিব এদেশ,
তবে কি কারণে হব তাঁহারি অধীন?
কথনো—কথনো তাঁর হইব না দাস।

আর এক স্থলে—

উচ্চ স্বর্গধামে মোরে করিলেন দান—
ঈশ্বর যে সুখ-ভূমি, সে স্থানের সাথে
এ সঙ্কীর্ণ আবাসের কি ঘোর প্রভেদ।
যদি কিছুক্ষণ তরে পাইগো ক্ষমতা—
এক শীত-ঋতু তরে হই মুক্ত যদি
তাহা হ'লে সঙ্গিগণ লোয়ে—কিন্তু হায়—
চারিদিকে রহিয়াছে লৌহের বাঁধন!
এই ঘোর নরকের দৃঢ়মুষ্টি মাঝে
কি দারুণ রূপে আমি হয়েছি আবদ্ধ!
উর্দ্ধে; নিম্নে জ্বলিতেছে বিশাল অনল—
এমন জঘন্য দৃশ্য দেখিনি কখনো!

বীরের নৈরাশ্য সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে সয়তান স্থির করিলেন যদি ঈশ্বর-সৃষ্ট মনুষ্যের কোন অপকার করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি "এই শৃঙ্খলের মধ্যে থাকিয়াও সুখে ঘুমাইবেন।"

ইতিমধ্যে ডেনিষরা একবার ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল; কিন্তু অ্যালফ্রেড্ তাহাদিগকে দমন করেন। নবম শতাব্দীতে অ্যালফ্রেডের রাজত্ব কালে অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্সন ভাষা ও সাহিত্য চরম উন্নত সীমায় পৌঁছিয়াছিল। অ্যালফ্রেডের এই একমাত্র বাসনা ছিল, যে যাহাতে "মৃত্যুর পর তিনি তাঁহার সৎকার্য্যের স্মরণচিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারেন।" সে বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তিনি একজন বলবান যোদ্ধা ছিলেন, ও তখনকার ইংলণ্ডের অন্যান্য রাজ্য অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়াছিল, ইচ্ছা করিলে হয়ত তিনি সমস্ত ইংলণ্ড বশে আনিতে পারিতেন। কিন্তু সে দিকে তাঁহার অভিলাষ ধাবিত হয় নাই, শান্তিস্থাপনা, সুশাসন, ও নিজ প্রজাদের মধ্যে সুশিক্ষা প্রচার করাই তাঁহার এক মাত্র ব্রত ছিল। অ্যালফ্রেডের যে অসাধারণ প্রতিভা বা উদ্ভাবনী শক্তি ছিল তাহা নহে, তাঁহার সৎ ইচ্ছা ও মহান্ অধ্যবসায় ছিল। তিনি তাঁহার উচ্চ আশা ও স্বার্থ পরিতৃপ্ত করিতে কিছু মাত্র মন দেন নাই, প্রজাদের মঙ্গলই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি দুঃখ করিয়া বলেন, যে এমন এক দিন ছিল যখন বিদেশ হইতে লোকে ইংলণ্ডে বিদ্যা শিখিতে আসিত, কিন্তু এখন বিদ্যা শিখিতে গেলে বিদেশীদের নিকট

শিখিতে হয়। এই অজ্ঞতা দূর করিবার জন্য তিনি দেশীয় ভাষায় নানা পুস্তক অনুবাদ করিতে লাগিলেন। অ্যালফ্রেড যদিও অনেক ল্যাটিন পুস্তক অনুবাদ করিয়াছিলেন তথাপি তাঁর লাটিন অতি অল্পই জানা ছিল; অতি প্রশংসনীয় সরলতার সহিত ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন; "যদি আমার চেয়ে কেহ অধিক লাটিন জান, তবে আমায় কেহ দোষ দিও না, কারণ প্রত্যেক মনুষ্য তাহার যে পর্য্যন্ত ক্ষমতা আছে, সেই অনুসারেই কথা কহিবে ও কাজ করিবে।" তাঁহার অনুবাদের মধ্যে স্থানে স্থানে লাটিনের অজ্ঞতা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে। অ্যালফ্রেডই অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্সন ভাষায় গদ্যের প্রথম সৃষ্টিকর্ত্তা। তখনকার অজ্ঞলোকদের বুঝাইবার জন্য তাঁহার অনুবাদ যথাসাধ্য সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এক ছত্র ভাঙ্গিতে গিয়া তাঁহাকে দশ ছত্র লিখিতে হইয়াছিল। ইহাঁর সময় হইতেই ইংলণ্ডের Chronicle অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হয়। কিন্তু সে অতি শুষ্ক ও নীরস। তাহা ইতিহাসের কোন উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে নাই। তাহাতে তখনকার ব্যক্তিদিগের অবস্থার বিষয় কিছুই বর্ণিত হয় নাই, কেবল অমুক বৎসরে দুর্ভিক্ষ হইল, অমুক বৎসরে অমুক নগরে আগুন লাগিল, অমুক বৎসরে একটা ধূমকেতু উঠিল, ইত্যাদি কতকগুলি ঘটনার বিবরণ মাত্র লিখিত আছে।

আবার ডেনিষরা ইংলণ্ড আক্রমণ করে; এবার ইংলণ্ড তাহাদের হস্তগত হইল। ডেনিষদের সহিত স্যাক্সনদের ভাষা ও আচার ব্যবহারের বিশেষ কিছুই প্রভেদ ছিল না। কান্যুট প্রজাদের কিরূপ প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন, তাহা সকলেই জানেন। যাহা হউক, অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সন রাজত্বের শেষভাগে অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সন সাহিত্যের যথেষ্ট অবনতি হইয়া আসিয়াছিল। ধর্ম্মাচার্য্যগণ অলস বিলাসী অজ্ঞ, সাধারণ লোকেরা নীতি-ভ্রষ্ট ও ধূর্ত্ত হইয়া আসিতেছিল। এই সময় ইংলণ্ডে নর্ম্মান সভ্যতা-স্রোত প্রবেশ করিয়া দেশের ও ভাষার যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। যাহা হউক, ডেনিষরাজ্য শীঘ্রই বিলুপ্ত হইল।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রবেশ করিলে পর ইংরাজি ভাষায় অনেক রোমীয় কথা প্রবেশ করে। কিন্তু নর্ম্মান অধিকারের সময়েই অধিকাংশ লাটিন ধাতুজাত কথা ইংরাজি ভাষায় প্রচলিত হয়। অনেক ডেনিষ কথা ইংরাজিতে পাওয়া যায়।

যখন স্যাক্সনেরা তাহাদের আদিম দেশে ছিল তখন তাহাদের স্বভাব কিরূপ ছিল তাহা বর্ণনা করিয়াছি। যখন ইংলণ্ডে আসিয়া তাহারা একটা স্থায়ী বাসস্থান পাইল, তখন তাহাদের বিলাসের দিকে দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু সে কিরূপ বিলাস? মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আসিয়া যেরূপ বিলাসে মগ্ন হইয়াছিল, ইহা সে বিলাস নহে। যে বিলাসের সহিত সুকুমার বিদ্যার সংশ্রব আছে, ইহা সে বিলাস নহে। অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্সনদের শিল্প দেখ, নাই বলিলেও হয়; তাহাদের কবিতা দেখ, কেবল

রক্তময়। কবিতার যে অংশের সহিত শিল্পের যোগ আছে—ছন্দ, তাহা স্যাক্‌সন ভাষায় অতি বিশৃঙ্খল। লাটিন সাহিত্যের আদর্শ পাইয়াও তাহাদের কবিতার ও ছন্দের বিশেষ কিছুই উন্নতি হয় নাই। স্যাক্‌সনদের হৃদয়ে সুন্দর-ভাবের আদর্শ ছিল না বলিয়াই মনে হয়—তাহাদের বিলাস আর কি হইতে পারে? আহার ও পান। সমস্ত দিন রাত্রি পানভোজনেই মত্ত থাকিত। এড্‌গারের সময় ধর্ম্মমন্দিরে অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত নাচ গান পান ভোজন চলিত। পৃথিবীর প্রথম যুগের অসহায় অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া একটু অবসর পাইলেই, আর্য্যেরা, (আর্য্যেরা বলিলে যদি অতি বিস্তৃত অর্থ বুঝায় তবে হিন্দুরা) স্বভাবতই জ্ঞান উপার্জ্জনের দিকে মনোযোগ দিতেন, কিন্তু স্যাক্‌সনেরা তাহাদের অবসরকাল অতিবাহিত করিবার জন্য অদ্ভুত উপায় বাহির করিয়াছিল; সে উপায়টি—দিন রাত্রি অজ্ঞান হইয়া থাকা। তাহারা উত্তেজনা চায়, তাহারা ঋষিদের মত অমন বিজনে বসিয়া ভাবিতে পারে না—অসভ্য সঙ্গীত উচ্চৈঃস্বরে গাইয়া, যুদ্ধের নৃশংস আমোদে উন্মত্ত থাকিয়া তাহারা দিন যাপন করিতে চায়। রক্তপাত ও লুটপাট ছাড়া আর কথা ছিল না। দাস ব্যবসায় যদিও আইনে বারণ ছিল, কিন্তু সে বারণে কোন কাজ হয় নাই—নর্ম্মান রাজত্ব সময়ে দাস ব্যবসায় উঠিয়া যায়। গর্ভবতী দাসীদিগের মূল্য অনেক বলিয়া তাহারা স্ত্রী দাসী দিগের প্রতি জঘন্য আচরণ করিত। তবুও খৃষ্ট-ধর্ম্ম ইহাদের অনেকটা নরম করিয়া আনিয়াছিল। স্যাক্‌সনদের বুদ্ধি তখন তীব্র নহে। তাহাদের মধ্যে প্রতিভা-সম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্পই জন্মিয়াছে। তাহাদের কবিতার উপাখ্যান সমূহের ভালরূপ ধারাবাহিক যোগ নাই, তাহাদের কবিদের ঔপন্যাসিক ক্ষমতা তেমন ছিল না। স্যাক্‌সনদের মধ্যে বিদ্যা-প্রচার করিবার জন্য অনেক বার চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু সে বিষয়ে কেহই কৃতকার্য্য হয় নাই। স্যাক্‌সন ধর্ম্মাচার্য্যদের মধ্যে যে বিদ্যা চর্চ্চার আরম্ভ হয় তাহা কয়েক শতাব্দী মাত্র থাকে, তাহার পরেই আবার সমস্ত অন্তর্হিত হইয়া যায়। নর্ম্মানরা আসিয়া স্যাক্‌সন খৃষ্ট-পুরোহিতদিগের অজ্ঞতা দেখিয়া অতিশয় বিরক্ত হয়। অ্যাঙ্গ্লোস্যাক্‌সন সাহিত্য অতি সামান্য। অ্যালফ্রেডের গদ্যগ্রন্থ ও বোউলফ্‌ এবং অন্যান্য দুই একটি কবিতা লইয়াই তাহাদের সাহিত্যের যথা-সর্ব্বস্ব।

স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও বীরত্ব স্যাক্‌সন জাতীয়দিগের প্রধান গুণ। তাহাদের সমস্ত স্বভাব পৌরুষেই গঠিত। সকলেই আপনার আপনার প্রভু। রাজার সহিত প্রজার তেমন প্রভেদ ছিল না—স্যাক্‌সন রাজ্যের শেষাশেষি সেই প্রভেদ জন্মে। জর্ম্মণীতে ভীরুদিগকে পঙ্কে পুঁতিয়া বিনষ্ট করিত। স্যাক্‌সনেরা যাহাকে প্রধান বলিয়া মানে তাহার জন্য সকলি করিতে পারে। যে তাহার প্রধানকে না লইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে,

তাহার বড় অখ্যাতি। যে প্রধানের গৃহে তাহারা মদ্যপান করিয়াছে, যাহার নিকট হইতে বিশ্বাসের চিহ্ন তরবারি ও বর্ম্ম পাইয়াছে তাহার জন্য প্রাণদান করিতে তাহারা কাতর নহে—এভাব তাহাদের কবিতার যেথানে সেথানে প্রকাশ পাইয়াছে। স্যাক্সন জাতিদের কল্পনা ও সৌন্দর্য্য-প্রীতি ছিল না, তাহাদের চরিত্রে কার্য্যকরী বুদ্ধি ও পৌরুষ অতিমাত্র ছিল।

তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক।

অবরোহ-প্রণালীতে সৃষ্টি-তত্ত্ব আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া পথি-মধ্যে সাংখ্যের এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের অভিব্যক্তিবাদ লইয়া যে কিঞ্চিৎ কাল ক্ষেপণ করিলাম তাহা না করিয়া গম্যপথে অগ্রসর হইলে ভাল হইত, ইহা বলিতে পারি না। পথে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে পাথেয় সংগ্রহ করা আবশ্যক,আমরা তাহাই করিলাম। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে এই একটি অমূলক মত ক্রমশ প্রশ্রয় পাইতেছে যে, জড় হইতে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। আমরা বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছি যে জড় হইতে জ্ঞানের অভিব্যক্তি বিজ্ঞান-শাস্ত্র মাত্রেরই অনভিমত। বিজ্ঞান-শাস্ত্র কেবল জড় বস্তুর গতি অথবা গতি-চেষ্টা, আয়তন এবং বাধা বিষয়ক নিয়ম যত কিছু তাহাই নির্ণয় করিয়া থাকেন। এক প্রকার গতি অন্য প্রকার গতির উপর কার্য্য করিয়া কিরূপ গত্যন্তর উৎপাদন করে, এবং কেন করে, ইহা বিজ্ঞান সুনিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন; কিন্তু গতি হইতে বোধ গঠিত হয় ইহা কোন বিজ্ঞান বলেনও না বলিতে পারেনও না। বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এই যে, গতি জড়-পদার্থের স্থান পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কিছুই নহে; ও তাহা বহির্বস্তু হইতে বাধা প্রাপ্ত হইলে গত্যন্তরে পরিণত হয়, গতি গতিতেই পরিণত হয় তদ্ভিন্ন আর কিছুতেই পরিণত হইতে পারে না—সুতরাং বোধে পরিণত হইতে পারে না। কাজেই মানিতে হয় যে, বোধ জড়-পদার্থের গতি-পরিণাম নহে, তাহা অন্য কোন পদার্থের পরিণাম,—শেষোক্ত এই যে পদার্থ ইহাকে জ্ঞান-পদার্থ কহা যায়। এবিষয়ে সাংখ্যের মর্ম্ম এই যে, জ্ঞান, (সত্বগুণ) গতি (রজোগুণ) এবং জড় বাধা (তমোগুণ) তিনটিই কোনটি বা অভিভূত কোনটি বা প্রাদুর্ভূত এইরূপ-ভাবে সৃষ্টির সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, তাহার মধ্যে প্রথমটির (সত্বগুণের) প্রাচুর্ভাবই সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য। আলোক পদার্থে গতির প্রাদুর্ভাব, এবং জড়ত্বের অভিভব এত অধিক যে আলোক এক মুহূর্ত্তে শতসহস্র যোজনগামী হইলেও বাধা-প্রদ শক্তির অভাবে

অমন-যে তাহার প্রভূত বেগ তাহাতেও কাহারো গাত্রে একবিন্দু আঘাত লাগে না। গুরু-ভার জড় বস্তুতে গতির অভিভব এবং বাধার প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ধাতু প্রস্তরাদিতে জ্ঞানের অভিভব এবং জীবজন্তুতে (বিশেষত মনুষ্যতে) জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। গম্য পথের পাথেয় উল্লেখে যাহা আমরা ইতি-পূর্ব্বে ইঙ্গিত করিয়াছি তাহা এই যে,— পৃথিবীতে জ্ঞান উত্তরোত্তর-ক্রমে অভি-ব্যক্ত হয় ইহা সত্য কিন্তু তাহা বলিয়া জড় হইতে যে জ্ঞান অভিব্যক্ত হইবে ইহা কোন মতেই হইতে পারে না। সৃষ্টির মধ্যে যত জ্ঞান আছে সকলই জড় পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন, সেই পরিচ্ছদের বাধা অতিক্রম করিয়া জ্ঞান ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর অভিব্যক্তি লাভ করিবে ইহাই সৃষ্টির উদ্দেশ্য। জ্ঞানের অভিব্যক্তিই যদি সৃষ্টির উদ্দেশ্য তবে জড়-বাধার প্রয়োজন কি? এ বিষয়ের মীমাংসা আমরা পূর্ব্বে করিয়া চুকিয়াছি, আমরা বলিয়াছি যে,— "যে বিষয় যত গভীর যত উৎকৃষ্ট তাহার আবির্ভাব ততই কাল-সাপেক্ষ। জগৎ যেরূপ অতলস্পর্শ 'গভীর রচনা,' তাহার প্রকাশও সেইরূপ অনন্ত-কাল-ব্যাপী। কবি যদি আপন অন্তঃকরণের সকল ভাব এক কালেই প্রকাশ করিতে যা'ন তাহা হইলে তাঁহার সে ভাব ভাব-মাত্রই থাকিয়া যায়, আবির্ভাবে পৌঁছিতে পারে না। কবি আপ-নার মনের নিগূঢ় কথা আপাততঃ অপ্র-কাশ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিলে তবেই তাহা কাব্যরূপে আবির্ভূত হয়। কবির কাব্য এইরূপ যে ক্রমে ক্রমে পরিস্ফু-টতার দিকে অগ্রসর হয় তাহার মূল আদর্শ জানিবে ঈশ্বরের সৃষ্টি-প্রণালী। প্রকাশ হই-য়াছে, অপ্রকাশ রহিয়াছে এবং অপ্রকাশের মধ্য হইতে প্রকাশের উপক্রম হইতেছে এই তিন অবস্থার উপর ভর করিয়া সমুদায় সৃষ্টি গম্য-পথে অগ্রসর হইতেছে। ইহা দেখি-য়াই বোধ হয় সাংখ্য-দর্শন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে জগতের মূল উপাদান তিনটি—একটি প্রকাশক, আর একটি প্র-কাশের বাধা-জনক, আর একটি বাধার প্রতিপক্ষ—প্রচালক।" জ্ঞানের অভি-ব্যক্তি যদিও সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য, তথাপি তাহা এমন লঘু বিষয় নহে যে তাহা এক মুহূর্ত্তেই শেষ হইয়া যাইবে। জ্ঞান ক্রমে ক্রমে জড়-বাধা অতিক্রম করিয়া করিয়া অভিব্যক্তি হইতে অভিব্যক্তি লাভ করিবে, এ ভিন্ন অভিব্যক্তি-লাভের অন্য কোন উপায় নাই। জ্ঞানের অনন্ত অভি-ব্যক্তি সৃষ্টির মুখ্য এবং চরম উদ্দেশ্য তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু জড়-বাধা অতিক্রমণ ব্যতিরেকে সে অভিব্যক্তি সম্ভব না হওয়াতে জড়-বাধার নিতান্তই প্রয়ো-জন। এক কথায় এই যে সৃষ্টির মুখ্য প্রয়োজন যেমন জ্ঞানের অভিব্যক্তি, তাহার আনুষঙ্গিক প্রয়োজন সেইরূপ জড়ের বাধা এবং সেই বাধার প্রতিবিধান। গতি-ক্রিয়াকে জ্ঞান এবং জড় দুয়ের মধ্যবর্ত্তী সোপান বলিয়া ধরা যাইতে পারে। জড়-বাধা অতিক্রমণের জন্য জ্ঞান কর্ত্তৃক গতি

নিয়োজিত হয় এবং সেই গতি জড়-বাধা কর্ত্তৃক প্রতিহত হয়; পরিশেষে জ্ঞানেরই জয় হয়। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া,—জাগরণ সুপ্তি,উদ্যম অবসাদ, জীবন মৃত্যু, এইরূপ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া—জ্ঞান এক পা এক পা করিয়া উন্নতি-শিখরে অগ্রসর হইয়া থাকে।

জ্ঞানের অভিব্যক্তি-সাধনের প্রণালী এবং ক্রম-পদ্ধতি এক্ষণে বোধ গম্য হইবে;—মূলে এক অদ্বিতীয় নিরালম্ব অসীম জ্ঞান অসীম সত্য বর্ত্তমান; তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া জগতের বাধাক্রান্ত পরিমিত জ্ঞান ক্রমশই বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতেছে, অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে। অত্যন্ত অস্ফুট, প্রসুপ্ত, মোহাচ্ছন্ন যে জ্ঞান, সেও চুপ করিয়া নাই; সে-ও কোন না কোন গতি প্রয়োগ করিতেছে, কোন না কোন বাধা অতিক্রমণ করিতেছে;—এ-যে করিতেছে এ কেবল পরমাত্মার আশ্রয়-গুণে—নিজ-গুণে নহে। আমরা যখন নিদ্রায় অভিভূত থাকি, তখন আমরা চেষ্টা করিয়া জাগিতে পারি না; তবুও যে আমরা যথাসময়ে জাগ্রত হইয়া আপনাকে পুনঃপ্রাপ্ত হই সে কেবল পরমাত্মার আশ্রয়-গুণে। পরমাত্মার অধ্যক্ষতা এবং আশ্রয়ের গুণে, সৃষ্ট-জ্ঞান, গতি-প্রয়োগ দ্বারা জড়-বাধা অতিক্রম করিয়া উত্তরোত্তর আপনার অভিব্যক্তি সাধন করিতেছে—ইহাতেই সৃষ্টির উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইতেছে। জ্ঞানের অভিব্যক্তি-সাধনের ক্রম-পদ্ধতি এই রূপ;—পৃথিবী স্বীয় গতি-প্রভাবে সূর্য্যের আকর্ষণ-বাধা অতিক্রম করিয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল—এটি কি? না পরিণামে যে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইবে তাহার প্রথম সোপান। পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া উদ্ভিদ্‌গণ আকাশাভিমুখে উত্থিত হইল—এইটি দ্বিতীয় সোপান। সচেতন জীব পৃথিবীর শৃঙ্খল ছেদন করিয়া স্বস্ব প্রবৃত্তি অনুসারে চলা বলা করিতে লাগিল—এইটি তৃতীয় সোপান। মনুষ্য প্রবৃত্তির আকর্ষণ অতিক্রম করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল এইটি চতুর্থ সোপান।

এই চতুর্থ সোপানেই জ্ঞান আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি করে, এবং তাহার সেই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বোধ সমুচিত পরিস্ফুট হইলে আপনার অবিনাশিত্ব বিষয়ে নিঃশঙ্ক হয়। পশ্বাদির জ্ঞান আপনার স্বতন্ত্র-অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে; কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে কিছুই নহে তাহা বলিতে পারি না। প্রকৃতির সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই যখন উন্নতি-পথে পদ-নিক্ষেপ করিতেছে তখন পশ্বাদির জ্ঞান যে সে-পথে একেবারেই বিমুখ হইবে ইহা সম্ভবে না। কোন জাতীয় বন্য পশু অপেক্ষা সেই জাতীয় গ্রাম্য পশুকে অনেক বিষয়ে উন্নত দেখা গিয়া থাকে। তবুও মনুষ্যের এবং পশ্বাদির জ্ঞানোন্নতি উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে,মনুষ্য জানিয়া শুনিয়া উন্নতি-পথে চলে, পশ্বাদি জন্তুরা অজ্ঞাত-সারে উন্নতিপথে নীত হয়। ইহার কারণ এই যে, মনুষ্যের জ্ঞান আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকে. পশ্বাদির জ্ঞান তাহাতে অস-

মর্থ। পৃথিবীতে প্রথমে নিকৃষ্ট জন্তু এবং উত্তরোত্তর উৎকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর জন্তু সৃস্ট হইয়াছে, ইহাতে ত আর সংশয় নাই; এবং সৃষ্টির পূর্ব্বাপর যোগ আছে ইহাও ত সেই রূপ অকাট্য; অতএব পশু-বিশেষের জ্ঞান যে শরীর-চ্যুত হইলেই বিনষ্ট হয় ইহার প্রমাণাভাবে এই সিদ্ধান্তই যুক্তি সিদ্ধ হইতেছে যে, নিকৃষ্ট পশুর জ্ঞান মৃত্যুর পরে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট পশু-দেহ পরিগ্রহ করে; ক্রমে যখন প্রাকৃতিক জ্ঞান (অর্থাৎ ঐশ্বরিক জ্ঞান নহে—সৃস্ট-জ্ঞান) আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বোধে অধিকারী হয়, তখন তাহা মনুষ্য-দেহ পরিগ্রহ করে। এস্থলে পশু-জ্ঞান এবং মনুষ্য-জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ এই যে, পশু-জ্ঞান মৃত্যুর পূর্ব্বেও যেমন মৃত্যুর পরেও তেমনি অজ্ঞাত-সারে উন্নতি-পথে নীত হয়—মনুষ্য জ্ঞান মৃত্যুর পূর্ব্বেও যেমন মৃত্যুর পরেও তেমনি জানিয়া শুনিয়া উন্নতিপথে চলিতে থাকে।

জগতের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উন্নতি-পথে চলিতেছে, এবং সেই পথের অনুসরণেই সৃস্ট-জ্ঞান মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হইয়া আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বোধ প্রাপ্ত হইয়াছে,—আর কি এখন সে-জ্ঞান সর্ব্ব-সেব্য উন্নতি-পথ পরিত্যাগ করিতে পারে? যখন জ্ঞান পরিস্ফুট হয় নাই তখন তাহার ক্রমশই উন্নতি হইয়াছে, আর যেই তাহা পরিস্ফুট হইল অমনি তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে ইহাও কি কখন হইতে পারে? সৃস্ট-জ্ঞান উন্নতির উচ্চ সোপানে উত্তীর্ণ হইলে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বোধে সমুজ্জ্বল হয়; এবং যতই উচ্চতর সোপানে পদ-নিক্ষেপ করিবে তাহার সে ঔজ্জ্বল্য ততই বৃদ্ধি হইবে—ইহাই যুক্তি-সঙ্গত। তবে যদি এরূপ বল যে, বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইলে জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য ক্রমশ হ্রাসই হয় বৃদ্ধি ত কই হয় না; তাহার উত্তর এই যে, ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টির একটি মূল-নিয়ম সুতরাং অনতিক্রমণীয়; রাত্রিকালেও যেমন, বার্দ্ধক্য দশাতেও তেমনি, জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাইবেই, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার মূল যে উন্নতি তাহা বন্ধ হইতে পারে না। ভূমি-সম্পত্তির উপস্বত্বের সাময়িক হ্রাস বৃদ্ধিতে কিছুই আইসে যায় না, নিয়মিত রূপে স্থিত বৃদ্ধি হইতে থাকিলেই বলিতে পারা যায় যে, তাহার ক্রমশই উন্নতি হইতেছে। রাত্রি-অবসানে পর-দিবসে জ্ঞান উন্নতি লাভ করিবে, বার্দ্ধক্য-অবসানে পর-জীবনে জ্ঞান উন্নতি লাভ করিবে এটি বন্ধ হইতে পারে না। কথা এই ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জগতের প্রকৃত উন্নতি অপ্রতিহত-ভাবে চলিতেছে,—তা' নহিলে জগৎ এত দিনে কোন্-কালে বিনাশ পাইত। মনুষ্য-জ্ঞানের অভিব্যক্তি এবং অনন্ত উন্নতি বিষয়ে আমাদের এই যে স্থির-সিদ্ধান্ত ইহা আমরা অবরোহ প্রণালী অনুসারে প্রাপ্ত হইয়াছি—এটি যেন মনে থাকে। পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি "প্রত্যক্ষ হইতে অনুমানে আরোহণ—ইহাই আরোহ প্রণালী; প্রজ্ঞা হইতে যুক্তিতে অবরোহণ—ইহাই অবরোহ প্রণালী।" প্রজ্ঞার গোড়ার কথা এই যে জগতের যত কিছু

সত্য আমাদের জ্ঞানে প্রতিভাত হয় সকলই আপেক্ষিক; জগতের ভিতর এমন কোন সত্য নাই যাহা সম্পূর্ণ রূপে আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত—জগতের কোন বস্তুই পূর্ণ সত্য নহে। জগতের ভিতরকার আপেক্ষিক সত্যের মূলে জগতের উপরকার নিরালম্ব সত্য—অপূর্ণ সত্যের মূলে পূর্ণ সত্য—অবশ্যই আছে। অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের দিক্ পূর্ণতার দিক—এজন্য পূর্ণ সত্য জ্ঞান-স্বরূপ; প্রজ্ঞা তাই বলেন—পূর্ণ সত্য কেবল এক পরমাত্মা। প্রজ্ঞার এই মূল পত্তন হইতে প্রথম যুক্তি-সোপান যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা এই;—যিনি জ্ঞানেতে শক্তিতে সকল বিষয়েই পরিপূর্ণ তিনি যাহা করেন তাহার উদ্দেশ্য কখন কু হইতে পারে না—যিনি যত উৎকৃষ্ট তাঁহার উদ্দেশ্যও সেই পরিমাণে উৎকৃষ্ট; পরিপূর্ণ-স্বরূপের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ মঙ্গল। প্রজ্ঞা মূলক যুক্তির দ্বিতীয় সোপান এই,—পরমাত্মা আপনি পরিপূর্ণ মঙ্গল, তা' ভিন্ন আর কোন মঙ্গল আছে কি না? আর কোন মঙ্গল যদি না থাকিত তবে জগৎ সৃষ্ট হইত না;—সে মঙ্গল অপূর্ণ মঙ্গল—অপূর্ণ বটে কিন্তু অনন্তকাল পূর্ণতার দিকে তাহার গতি হইতে থাকিবে এই নিয়মের প্রভাবে অপূর্ণতার দোষাংশটি শোধিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি "পরমাত্মা যদি জীবাত্মার সকল অভাব এককালে পূরণ করেন, তিনি যদি তাহাকে এক কালেই পূর্ণতা প্রদান করেন, তবে তাঁহাতে আর জীবাত্মাতে কিছুই আর প্রভেদ থাকে না; তাহা হইলে এক অদ্বিতীয় পরমাত্মা ভিন্ন আর কেহই অবশিষ্ট থাকে না। * * * *

এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়া সৃষ্টি না করিলে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কোন মতেই রক্ষা পাইতে পারে না। সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মা জীবাত্মাকে পরিমিত করিবার জন্যই যে পরিমিত করিয়াছেন তাহা নহে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমর্থন করিবার জন্যই তাহাকে পরিমিত করিয়াছেন। পরমাত্মা একদিকে জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়া স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যে একটি অভাব তাহার ছিল তাহা পূরণ করিয়াছেন; আর এক দিকে তাহাকে অনন্ত উন্নতির যোগ্যতা প্রদান করিয়া অপূর্ণতা-নিবন্ধন তাহার যে একটি অভাব আছে তাহাও পূরণ করিয়াছেন,—জীবাত্মার অভাব পূরণ যতদূর করিতে হয় তাহা করিয়াছেন।" দেখ সৃষ্টির উদ্দেশ্য অবরোহ-প্রণালী অনুসারে কেমন সুন্দর-রূপে সপ্রমাণ হইতেছে। অতএব তত্ত্বজ্ঞান যে প্রামাণিক নহে ইহা আর বলিবার উপায় নাই। বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ এবং অনুমানকে সহায় করিয়া যে সিদ্ধান্তে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞান প্রজ্ঞা এবং যুক্তিকে সহায় করিয়া সেই সিদ্ধান্ত একেবারে অকাটা করিয়া দাঁড় করাইতেছেন;—সে সিদ্ধান্ত এই যে জগতের এবং তাহার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের (মনুষ্যের ত কথাই নাই) ক্রমাগতই উন্নতি—ক্রমাগতই উন্নতি। জগতের এই চরম উদ্দেশ্যটির প্রতি দৃষ্টি

রাখিয়া আরোহ প্রণালীতে স্মৃতি আলোচনা করিলে উভয় প্রণালীরই মান রক্ষা করা হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান কেবল শুষ্ক বিজ্ঞান না হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের সোপানতা প্রাপ্ত হয়।

সংক্ষেপে এক্ষণে আমাদের শেষ বক্তব্য বলিয়া প্রস্তাব সাঙ্গ করি ;——দলাদলির ভাব যেমন কার্য্যনাশক এমন আর কিছুই নহে; ভাল সামগ্রী পাইলেই তাহাকে দুই পায়ে দলাদলি করিয়া নষ্ট করে, এই জন্যইবা তাহার দলাদলি নাম হইয়াছে। এক দল আছেন যাঁহারা বিজ্ঞানকে খাট করিয়া তত্ত্বজ্ঞানকে বড় করিতে চা'ন, এক দল আছেন যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানকে খাট করিয়া বিজ্ঞানকে বড় করিতে চা'ন; যেখানে এইরূপ কোন না কোন দলীয় ভাবের আধিপত্য দেখা যায় সেই খানেই সত্য ভয়ে ভয়ে মানে মানে অত্যন্ত কুণ্ঠিত ভাবে কথঞ্চিৎ প্রকারে প্রাণ-ধারণ করে। বলিতে কি আমরা দলীয় ভাবকে বড় ডরাই। আমরা বলি—তত্ত্বজ্ঞান এবং বিজ্ঞান দুয়েরই যথোচিত সম্মান করিয়া স্মৃতি-তত্ত্বের আলোচনা কর; কিন্তু দলাদলি নামে যে একটি ভয়ানক জন্তু আছেন তিনি অমনি বলেন "তাও কি কখন হয় ?" আমরা দলাদলির কথা অগ্রাহ্য করিয়া প্রণালী পূর্ব্বক দেখাইলাম যে, বিজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান কাহারো সহিত বিবাদ না করিয়া, সখ্য ভাবে সত্য অন্বেষণ করিলে আমরা ইষ্ট লাভে কখনই বঞ্চিত হই না।

"স্মৃতি" এই গ্রন্থের রচয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর বসু বেদ পুরাণ তন্ত্র দর্শন প্রভৃতি অনেক শাস্ত্র ঘাঁটিয়া সে সমুদায়ের প্রকৃত অভিপ্রায় এবং মর্ম্ম বিবৃত করিয়াছেন—এজন্য তিনি আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন। শাস্ত্রের অর্থ আবিষ্কারে তিনি অশেষ বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবিষয়ে কাহারো দ্বিরুক্তি হইতে পারে না; দোষের মধ্যে তাঁহার গ্রন্থে সেকালের ঘটা কিছু অতিরিক্ত পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ; গ্রন্থকারের অভিপ্রায় কিছু এরূপ নয় যে, শাস্ত্রের নাম শুনিলেই সকল কথা অবিচারে শিরোধার্য্য করিতে হইবে, আর শাস্ত্রোক্ত মত হইলেই তাহা যেন তেন প্রকারেণ সমর্থন করিতে হইবে; কিন্তু তাঁহার লেখা দেখিলে অনভিজ্ঞ লোকের হঠাৎ সেইরূপ ভ্রম জন্মিতে পারে। শাস্ত্রোক্তি সমর্থন করা অগ্রে সত্যান্বেষণ তাহার পরে, এরূপ ভ্রমেতেও অনিষ্ট আছে। শাস্ত্রের মধ্যে অনেক সত্য আছে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার মধ্যে অসত্য যে নাই তাহা নহে ; শাস্ত্রোক্ত বচন, সত্য হইলেও তাহা যে শাস্ত্রোক্ত বলিয়াই সত্য এমন নহে, যৌক্তিক বলিয়াই তাহা সত্য। স্মৃতির গ্রন্থকার শাস্ত্রের বচন মাত্রকেই প্রমাণের যথা-সর্ব্বস্ব গণ্য করিয়াছেন, তাহার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে কিছুমাত্র আয়াস পা'ন নাই, এ প্রণালীতে চলিলে শাস্ত্রের মতই নির্ণীত হইতে পারে, সত্য নির্ণীত হওয়া দুষ্কর। যদি শাস্ত্রের মত নির্ণয় করা গ্রন্থকারের কেবল মাত্র উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে

পারি। শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ যিনি সাংখ্যের গ্রন্থকার তিনি তাঁহার গ্রন্থটি অতি সুপ্রণালী অনুসারে রচনা করিয়াছেন। নামে এবং কার্য্যে (বয়সে কেবল নয়) তিনি প্রাচীন কালের ব্যক্তি, কিন্তু তাঁহার লেখার ধরণ দিব্য এ-কালোচিত—তাহাতে সত্যান্বেষণেরই প্রাধান্য। ইহাঁর ন্যায় অপক্ষপাতী শ্রমশীল সদ্বুদ্ধি এবং যথাবৎ অধীত-শাস্ত্র ব্যক্তিগণ যদি সংস্কৃত দর্শন-শাস্ত্র-সকল বঙ্গ ভাষায় রীতিমত বিবৃত করিয়া প্রকাশ করেন তাহা হইলে বঙ্গ-ভাষা অচিরাৎ নূতন-বিধ এক অমূল্য রত্নের আকর হইয়া উঠে। কিন্তু কৈ! ভাল বস্তুকে ভাল করিয়া দেখাইবার রীতি আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে বলিলেও হয়;—এখনকার রীতি আর এক রূপ,—গোড়ায় যাহা বাস্তবিক ভাল তাহাকে অতি-ভাল করিবার জন্য কত যে বিচিত্র পরিচ্ছদ পরানো হয়—দেখিলে হাসিও পায় দুঃখও হয়। নিরপেক্ষ ভাবে, যথার্থ সত্য জিজ্ঞাসুভাবে, শাস্ত্রালোচনা করা কাহাকে বলে যাঁহারা জানিতে চান, তাঁহারা একবার বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সাংখ্যদর্শন পাঠ করুন তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইবে; আর আমাদের ন্যায় যাঁহারা অধুনাতন বঙ্গ সাহিত্যের অসারতা এবং বৃথা আড়ম্বর দেখিয়া তীব্র মনোবেদনা অনুভব করেন তাঁহারা ঐগ্রন্থ খানি পাঠ করুন তাঁহাদের হৃদয় জুড়াইবে।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বঙ্গাঙ্গনা কাব্য। প্রথম খণ্ড, শ্রী রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সত্য প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য এক টাকা।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা আমাদের পক্ষে একটি কঠোর কর্ত্তব্য বিশেষ। প্রাপ্ত গ্রন্থ সমূহের শুদ্ধমাত্র প্রাপ্তি স্বীকার করিলে গ্রন্থকার মহাশয়েরা কখনই তৃপ্ত হইবেন না, আবার তাহাদের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে গেলে ভারতীতে স্থান কুলাইবে না। সুতরাং সংক্ষিপ্ত সমালোচনা ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় আমরা প্রাপ্ত গ্রন্থের মোট দোষ গুণ ব্যক্ত করা ব্যতীত বিস্তৃতরূপে দোষ গুণ প্রদর্শন করিতে পারি না! মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে এরূপ প্রণালী অনুসারে অনেক সময়ে আমরা অনেক গ্রন্থকারের প্রতি অনিচ্ছা ক্রমেও অন্যায় করিয়া ফেলি। একখানি পুস্তক সমস্তটা পড়িয়া হয়ত আমরা মোটের উপর প্রীতি লাভ করি, আর একখানি পুস্তকের সমস্তটা পড়িয়া হয়ত মোটের উপর আমরা বিরক্ত হই. কিন্তু প্রথম শ্রেণীর অনেক পুস্তকের অনেক স্থল হয়ত খুব কদর্য্য হইতে পারে আবার দ্বিতীয় শ্রেণীর অনেক পুস্তকের অনেক স্থানে হয়ত সুন্দর হইতে পারে। আমরা সংক্ষিপ্ত সমালোচনস্থলে

এই দোষ গুণের সমন্বয় করিতে যতদুর সাধ্য চেষ্টা করি—কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইদানিন্তন গ্রন্থ-সমূহে দোষের ভাগ এত অধিক যে সরল ভাবে সমালোচনা করিতে গেলে ইচ্ছা না থাকিলেও কতকটা কঠোর হইয়া পড়িতে হয়। যদিও আমরা জানি যে ক্ষেত্র মাত্রই নব উর্ব্বরতা লাভ করিলে তাহাতে ভাল দ্রব্যের সহিত আগাছাও উৎপন্ন হয়—ফরাসী বিপ্লব-প্রসূত নব স্বাধীনতার সময় অনেক ভাল কার্য্যের সহিত অনেক জঘন্য কার্য্যও সম্পাদিত হইয়াছিল—ইংরাজি সাহিত্যে ড্রাইডেন্ ও পোপ কর্ত্তৃক নব প্রণালী উদ্ঘাটিত হইলে থিওবোল্ড্ ও সিবর প্রভৃতিও কবিতা রচনা করিয়া সকলকে জ্বালাতন করিয়াছিল, তবুও ঐ-সকল অশুভ অপরিত্যজ্য ও অবশ্যম্ভাবী বলিয়া যে দমনীয় নহে তাহা আমরা স্বীকার করি না। সুতরাং বাঙ্গলা সাহিত্য নবজীবন পাইয়া যে সকল অসার প্রলাপে দিক্‌বিদিক্ ধ্বনিত করিতেছে তাহা নিবারণ করিতে চেষ্টা পাওয়া নিতান্ত অন্যায় নহে।

এই যে "বঙ্গাঙ্গনা' নামক গ্রন্থখানি সমালোচনা করিতে বসিয়াছি, ইহার নিন্দা না করিয়া যদি নিরপেক্ষ ভাবে মৌনী হইয়া থাকি তাহা হইলে আমরা ভরতী দেবীর কাছে ঘোর অপরাধী হইব। আমরা এই পুস্তকের সমস্তটুকু পড়িতে অক্ষম হইলাম, কিন্তু ইহার একটি প্রসঙ্গ আদ্যোপান্ত পড়িতে পারিয়াছি—সে প্রসঙ্গটি এই—"জনৈক বঙ্গবিধবা শ্রীল শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট নিম্ন লিখিত পত্রিকা খানি লিখিয়াছিলেন——বুঝিতে হইবে যে এই পত্র খানি কবির কপোল-প্রসূত মাত্র—তিনি এই পত্রের আকারে বঙ্গীয় বিধবাদিগের অবস্থা ও মনের ভাব বর্ণনা করিতেছেন।—পত্রের আরম্ভ টুকু এই—

নবীনা যোগিনী আমি হ'য়েছি সংসারে,
এনবীন সুবয়সে ফেলিয়াছি দূরে
কঙ্কণ বলয়, কাঞ্চি অলঙ্কার যত!
মুছি সিন্দুরের বিন্দু। শঙ্খের বলয়া
ভাঙ্গি—আহা প্রাণেশ সমাধি স্থলোপরে।
পরিছি ধবল বস্ত্র, লোহিত ত্যজিয়া।
একাহার নিরামিষ! কৃতাঞ্জলি পুটে
এক মনে জপিতেছি মুদ্রিত নয়নে—
মহামন্ত্র— "রক্ষা কর হে বিদ্যাসাগর!"

আমরা সহৃদয় পাঠকমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে ইহা অপেক্ষা সত্যের অবমাননা ও কল্পনার ব্যভিচার আর কি হইতে পারে? দেশবিদেশ সকলেই স্বীকার করে যে বঙ্গীয় বিধবারা ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতার আদর্শ স্থল। কিন্তু আদর্শস্থল না হইলেও "রক্ষা কর হে বিদ্যাসাগর'—রূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত বিধবা নারীই কি বঙ্গীয় বিধবাকুলের মুখপাত্র? একথা কেহই বোধ হয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। এই ত গ্রন্থকারের সত্যপ্রিয়তা,—কিন্তু তাঁহার কবিত্বের একটি দেদীপ্যমান উদাহরণ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না—সেই বিধবা রমণীই আবার লিখিতেছেন—

————হে বিদ্যাসাগর,
এক রত্ন যত্ন করি দিয়াছ মোদেরে—
বিধবা বিবাহ-গ্রন্থ! বহুবাশিনী মোরা!
পেয়ে সে দুর্ল্লভ বস্তু মন্থন বিহনে,
ভাবিলাম না জানি মথিলে লাভ কত!
তেঁই আরম্ভিনু দেব, মথিতে তোমারে
এত যত্নে মানস—অনন্ত, সুরাসুর—
আশ্বাস-বিষাদ, শৈল মৈনাক—লেখনী;
না হই বঞ্চিত যেন পতি-রত্ন লাভে!

রূপক ভাঙ্গিয়া সাদাসিধা আমরা এই বুঝিতে পারিলাম যে বিদ্যাসাগররূপ সাগর-গর্ব্ভে লেখনীরূপ "মৈনাক শৈল" প্রোথিত করিয়া মন্থন করিলে "পতি-রত্ন" উৎপাদিত হইলেও হইতে পারে—বিধবা লেখিকার আশা যা তাহাই হউক! কিন্তু আমাদের সে আশাও নাই, সে ইচ্ছাও নাই, কারণ ঐ লেখনী-স্বরূপ "মৈনাক শৈল" যদি "ষ্টীল্‌পেন্‌" হয় তাহা হইলে বিনা প্রয়োজনে ব্রাহ্মণ-রক্তপাত করিবার আবশ্যক কি? আর "মৈনাক শৈল" না—মন্দর শৈল দ্বারা সমুদ্র-মন্থন হইয়াছিল? অধিক আর কি বলিব!

জয়পাল। ইতিহাস মূলক নাটক। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র প্রনীত। আলবর্ট যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ১ টাকা।

এই গ্রন্থখানি সম্পর্কে আমাদের বলিবার বিশেষ কিছুই নাই—ইহাতে সুখ্যাতির বিষয়ও কিছু নাই, নিন্দার বিষয়ও কিছু নাই—ইহা কতকগুলি কাগজ সমষ্টিমাত্র।

ঋগ্বেদ সংহিতা। সংস্কৃত টীকা বাঙ্গালা অনুবাদ এবং বাঙ্গালা টীপ্‌নীর সহিত শ্রীযুক্ত রমানাথ সরস্বতী এম্‌ এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইতেছে আমাদিগের প্রাচীন অমূল্য সম্পত্তি গুলি যতই প্রকাশিত হয় ততই মঙ্গল। এই বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সমাপন হইলে এদেশের একটী বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। এখন বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র কেবল অসার পুস্তকের সংখ্যাই বৃদ্ধি করিতেছে, এই সময়ে যিনি লোকহিতকর গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট অবশ্যই ঋণী থাকিবেন। রমানাথ বাবু সংস্কৃত কলেজের এক জন উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র এবং বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ। ইনি স্বাধীন বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হইয়া ঋগ্বেদ ব্যাখ্যা করিতেছেন, স্থানে স্থানে সায়ণ ভাষ্যের দোষ দর্শাইয়া অর্থসঙ্গতি বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন এবং যে যে স্থল ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত সম্বন্ধ তৎসমুদায় নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগে বিশদ করিতেছেন। আমরা রমানাথ বাবুর এই প্রশংসনীয় কার্য্যে অতিমাত্র প্রীতিলাভ করিলাম। যে যে স্থল সায়ণের সহিত অনৈক্য সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় সেই সেই স্থল উদ্ধৃত করিয়া পাঠক বর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করা সহজ নয় এজন্য দুঃখিত হইলাম। কিন্তু গ্রন্থের মধ্যে এমন কোন কোন স্থল আছে যাহাতে আমরা সায় দিতে পারি না, বিস্তৃত সমালোচনার অবসর পাইলে তাহা প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল।

মেকলের ভারতবর্ষ প্রবাস।

ইংরাজি কাব্য-সমাজে মেকলের নাম বহু সমাদৃত ও ইংলণ্ডের ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে তিনি এক জন অগ্রগণ্য। ভারতবাসীদের নিকটেও তিনি অপরিচিত নহেন। মেকলের যে ভারতবর্ষের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ অথবা ভারতবর্ষীয়দের উপর বিশেষ মমতা ছিল তাহা বোধ হয় না। তিনি নিজেই স্পষ্ট বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার যে ভারতবর্ষে আগমন সে কেবল অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশে। এদেশের ভাষা রীতি নীতি তাঁহার হৃদয়গ্রাহী ছিল না। এখানকার লোকদিগকে তিনি কিরূপ চক্ষে দেখিতেন তাহা তাঁহার (Warren Hastings) বিষয়ক প্রস্তাবে বঙ্গবাসীদের চরিত্র-বর্ণনেই অবগত হওয়া যায়। ভারতবর্ষ-প্রবাস-কালে তিনি ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখেই দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া থাকিতেন এবং পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোচনাতেই তাঁহার অবকাশ-কাল অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু ইহা সত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি ভারতবর্ষের প্রেমে পড়িয়া না হউক কর্ত্তব্যের অনুরোধেও ভারতবর্ষের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন আমরা এখনো পর্য্যন্ত কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার সেই সকল কাজের ফলভোগ করিতেছি ও তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে ঋণী। এই প্রখ্যাত লেখক ও ইতিবৃত্তবেত্তা ভারতবর্ষ বিষয়ক যাহা কিছু লিখিয়াছেন—ভারতবর্ষের জন্য যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা জানিবার জন্য পাঠকগণের কৌতূহল হইতে পারে। এই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য অধিক আয়াসের প্রয়োজন নাই। এডিনবর রিবিউ নামক প্রখ্যাত বৈলাতিক মাসিক পত্রিকায় মেকলের রচিত Lord Clive এবং Warren Hastings নামক যে প্রস্তাব দ্বয় সন্নিবেশিত হয় তাহা পাঠ করিলেই এদেশ সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা পাঠকেরা প্রায় সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন। সেই রূপ যদি তাঁহারা মেকলের এদেশে আগমন ও অবস্থান-বার্ত্তা জানিবার অভিলাষ করেন তাহা হইলে "মেকলের জীবন-বৃত্ত" যাহা তাঁহার ভাগিনেয় ট্রেবেলিয়ন কর্ত্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পাঠেই তাঁহাদের সে বাসনা পূর্ণ হইবে। যাঁহারা ততটুকু কষ্ট নিতেও সমর্থ বা স্বীকৃত নন তাঁহাদের জন্য এই প্রস্তাবটী লিখিত হইতেছে। ইহাতে মেকলে তাঁহার ভারতবর্ষ-প্রবাস-বৃত্তান্ত নিজ হস্তে যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেখাইলেই যথেষ্ট হইবে। মেকলে তাঁহার ভগিনীদিগকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি যাবজ্জীবন অবিবাহিত ছিলেন—তাঁহার ভগিনীগণের প্রতিই তাঁহার সমুদয় ভালবাসা—সমুদয় মমতা নিহিত ছিল।

সকল বোন্‌দের মধ্যে 'হানা' তাঁহার বিশেষ সোহাগের বোন্ ছিলেন ও তাঁহাকে তিনি ভারতবর্ষে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। মেকলে তাঁহার ভগিনীদের যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন সেই সকল পত্র হইতে তাঁহার জীবনের অনেক উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এদেশে মেকলের কর্ম্ম হইবার প্রস্তাব হইলে প্রথমে তিনি তাঁহার ভগিনী হানাকে যে পত্র লেখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

লণ্ডন

অগস্ত ১৭—১৮৩৩

প্রিয় ভগিনি

আমি তোমাকে যে বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহা তোমার ও মারগ্রেটের (will be one of agitating interest) অত্যন্ত উৎকণ্ঠার কারণ হইবে—সুতরাং ইহা আমার পক্ষেও তাই।

নূতন ইণ্ডিয়া আইনে এই নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছে যে প্রধান মন্ত্রি-সভা Supreme Counsil যাহার হস্তে আমাদের ভারতবর্ষীয় রাজ্য-শাসনের সমুদয় ভার তাহার মেম্বরদের মধ্যে এক জন মেম্বর এমন লোকের মধ্য হইতে মনোনীত হইবে যাহারা কোম্পানির চাকর নয়। সেই পদটী আমাকে দেবার কথা হইতেছে—আমার পাইবার খুবই সম্ভব—এক রূপ নিশ্চয় বলিলেই হয়।

এ কর্ম্মে লাভ বিস্তর। এটী বিলক্ষণ মান সম্মানের পদ। বেতন বৎসর ১ লক্ষ টাকা। যাহারা কলিকাতা ভাল জানেন যাঁহারা সেখানকার উচ্চ দলের সঙ্গে মিশিয়াছেন, বড় বড় পদের কর্ম্ম করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে সেখানে বার্ষিক ৫০০০০ টাকা হইলেই বেশ জাঁক জমকের সহিত থাকা যাইতে পারিবে, আর বাকি টাকা সুদ শুদ্ধ সকলি জমিবে। অতএব আশা হয় যে ৩৯ বৎসর বয়সে পূর্ণ যৌবন স্ফূর্ত্তি থাকিতে থাকিতে আমি ৩ লক্ষ টাকা লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে পারিব। ইহা হইতে আর অধিক ধন আমি কোন কালে প্রত্যাশা করি নাই।

আমি টাকা বড় ভাল বাসি না—তার জন্য উৎসুকও নহি। কিন্তু যদিও যত দিন যাচ্চে টাকা জমাবার প্রতি আমার লক্ষ্য ক্রমেই কমে আসছে, আবার প্রতি দিনই তেমনি বেসী জানতে পারছি যে যে ব্যক্তি মহৎ হতে কি লোকের উপকার করতে চায় তার পক্ষে টাকার স্বচ্ছলতা কতক প্রয়োজনীয়। এখন আমি দেখছি যে যত দিন আমার হাতে কোন চাকরি আছে তত দিন কেবল আমি সাধারণের কাজে নিযুক্ত থাকতে পারব। সরকারী চাকরী ছেড়ে দিলেই আমাকে পার্লেমেণ্টের জায়গা ছেড়ে দিতে হবে। কেন না কোন রকমে ত উদর পোষণ টা হওয়া চাই—আর আমার লেখার জোরেই তা হবার সম্ভাবনা; এরূপ কারো সাধ্য নয় যে সংসার চালাবার মত যতটা আবশ্যক লিখে ওঠে অথচ রাজকার্য্যেও উচিত মত যোগ দিতে পারে—এ দুইই একত্রে এক সময়ে হয়ে উঠে না। এবারকার পার্লেমেণ্টের অধিবেশনের মধ্যে আমি Edinborongh Reviewর জন্য এক ছত্রও

লিখে উঠিতে পারিনি আর আমার যদি চাকরী না থাকত ত কিছুই উপার্জ্জন করতে পারতুম না। * * ভদ্রলোকের মত দিনপাত করতে হলে আমার লেখা আবশ্যক—এপর্য্যন্ত যেমন লিখে এসেছি তা নয়—কিন্তু নিয়মিত প্রত্যহ লেখা আবশ্যক। কলম চালনায় বৎসর ২০০ পৌণ্ডের অধিক আমার কখন আয় হয় নি। ৫০০ পৌণ্ডের কমে আমার উপযুক্ত-মত জীবিকা নির্ব্বাহ হতে পারে না। আমার নিজেরই কুলিয়ে ওঠে না আবার তাতে আমার উপর অন্যান্য কত লোকের জীবিকা নির্ভর করছে। আমার পরিবারের অবস্থা দেখতে গেলে ক্রমেই আরো অন্ধকার দেখাচ্ছে।

রাজকার্য্য সম্বন্ধেও আমার নিজের অবস্থা ভাল বোধ হচ্ছে না। মন্ত্রীদলের মধ্যে দলাদলি উপস্থিত। যাদের অল্প রাজনীতিতে অভিজ্ঞতা আছে—সংবাদ-পত্র পড়েই যাদের বিদ্যা—তারাও এটা দেখতে পাচ্ছে। আর এ বিষয়ে সাধারণের যতটুকু জ্ঞান তার চেয়ে আমার অনেক বেসী। আমি দেখছি তারা শীঘ্রই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। আমার এখনকার এই পদে আমি যে আর ছ মাসও টিকে থাকতে পারব তার এত অল্প সম্ভাবনা যে তোমাকে সত্য বলছি যে আমি এটা ৫০০ টাকার জন্য এখনি বেচে ফেলতে প্রস্তুত। যদি আর অধিক দিন আমি এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকি তা হলে ভয় হয় পাছে আমার চরিত্রের উপর কোন কলঙ্ক এসে পড়ে। যদি কর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে বিপক্ষদলের সঙ্গে যোগ দিই তা হলে এই তিন বৎসরের মধ্যে আমি যে সকল বন্ধু লাভ করেছি তাদের ত্যাগ করতে হয়। ইংলণ্ডে এখন দিনকতক আমি আমার সম্মুখে আর কিছুই দেখছিনে—কেবল দারিদ্র্য—লোকের অনাদর ও বন্ধুবিচ্ছেদ।

যদি এ সকল বিপত্তি হতে মুক্ত হবার আর কোন উপায় না থাকত তা হলে না হয় সাহস ক'রে সে সব অতিক্রম করতে প্রস্তুত হতুম। মানুষে সকল অবস্থাতেই মান রক্ষা ক'রে ধর্ম্মপথে থেকে চলতে পারে। আমাকে যদি গারদখানায় থাকতে হত ত আমার বিশ্বাস এই যে আমি আমার আপনার মনের মধ্যে থেকেই আমার অসুখ নিবারণের কোন না কোন উপায় করে নিতে পারতুম। কিন্তু যদি আসন্ন বিপদ হতে কোন রকমে উদ্ধার হতে পারা যায় তা অবিশ্যি হতে ইচ্ছা করি। যে কাজটা আমাকে দিতে চাচ্ছে সেটা নিলে এখানকার দলাদলির হাঙ্গমে থেকে কতক সময়ের জন্য নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আমি যখন ফিরে আসব তখন ঐ সকল গোল এক প্রকার মিটে যাবে— নতুন দলের সৃষ্টি হবে—নতুন নতুন বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ চলবে। তখন আমি আমার বন্ধুগণ হতে বিচ্ছিন্ন না হয়ে—মত পরিবর্ত্তনের গ্লানি সহ্য না করেও আমার মনের মত পক্ষ অবলম্বন করতে পার্ব্বো। আরো ইতিমধ্যে আমার পরিবারদের দারিদ্র্য কষ্টও দূর করতে পারব। তখন ন্যায়োপার্জ্জিত অর্থ সঞ্চয় ক'রে এতটা ধনী হয়ে ফিরে আসতে পারব যে আমি আপ-

নাকে নর্থহম্বর লাণ্ডের ড্যুক কিম্বা ওয়েষ্ট মিনিষ্টরের মারকিসের মত ধনী মনে করব —তখন কোন জন-হিতকর কার্য্যে আমার কর্ত্তব্যের পথ হতে ভ্রষ্ট হবার কিছুমাত্র প্রলোভন থাকবে না। ভারতবর্ষে আমার যে কাজ করতে হবে তাতে কিছু গুরুতর পরিশ্রম কি কষ্ট নেই—তা খুব উঁচু ও মানের কাজ। সে দেশে যতদূর ভাল ও জমকাল থাকা যায় তা থাকতে পারা যাবে আর আমার কিছু এত কাল অনুপস্থিত থাকতে হবে না যে আমার বন্ধুরা কি এখানকার আর আর লোকে আমাকে ভুলে যাবে।

তোমাকে যা লিখলুম আর যারা যারা এই বিষয় জানে তারা সকলেই আমাকে এ কর্ম্মটা অস্বীকার না করতেই পরামর্শ দিচ্ছে। আর আমাকে ছেড়ে তাদের বাস্তবিকই কষ্ট হবে এ জেনে শুনেও তাহারা আমাকে ওরূপ পরামর্শ দিয়েছে ঠিক বলতে পারি। কিন্তু আমার নিজের কষ্ট কত না হবে। যদিও চারি দিক ভেবে কর্ত্তব্যের অনুরোধে এ বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে কিন্তু আমার সে কি ভয়ানক যন্ত্রণা—যে আমি আমার দেশ ও পরিবারদের এত ভাল বাসি। আমি তা কি করে সহ্য করব। আমার এ প্রবাসটা সুখের হবে কি না আর প্রথম ধাক্কাটা চলে গেলে সে প্রবাস বাস্তবিক আমোদজনক হবে কি না তা অনেকটা তোমার উপর নির্ভর। আমি যেমন আশা করছি যদি এই কর্ম্মটা পাওয়া যায় তবে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে কি না? এতে তোমার যে কত ত্যাগস্বীকার করতে হবে তা আমি জানি। তোমায় কত প্রিয় অমূল্য বন্ধন হতে কতক দিনের জন্য বিযুক্ত থাকতে হবে তা আমি জানি। আমি জানি যে ভারতের রাজসভা ও সেখানকার সমাজের আমোদ প্রমোদ, তুমি যে সমাজের এক জন প্রধান ভূষণ হবে, তা তোমার পক্ষে বিশেষ কিছুই লোভনীয় নয়। যদি তোমাকে আমার কিছু ঘুষ দেবার থাকে তা এই যে আমার সঙ্গে গেলে এখন যেমন তোমাকে ভাল বাসি তার চেয়েও যদি পারি তোমাকে আরো ভাল বাসব।

আমি——কে জিজ্ঞাসা করিয়াছি সেখানে তোমার ও আমার শরীর কেমন থাকবে। সে বল্লে আমার জন্য তার অল্পই ভাবনা হয় আর তোমার জন্যও কিছুই নয়। সে মনে করে সে দেশে তোমার শরীর খারাপ হবার যেমন সম্ভাবনা ভাল থাকবার তেমনই সম্ভাবনা।

এসব খুব গোপনীয় কথা, এ চিটি অবশ্য তুমি মারগ্রেটকে দেখাতে পার আর মারগ্রেট তার স্বামিকে বলতে পারে কেননা স্বামির ন্যায্য অধিকারের প্রতি আমি হস্তক্ষেপ করিতে চাই না। কিন্তু এটা যেন আর কারো কানে না যায়। আমার পিতা আমা ভিন্ন আর কারো কাছ থেকে এ কথা শুনতেপেলে দুঃখিত হবেন —আর তাঁর এরূপ হওয়াও স্বাভাবিক। আর বাইরে এর একটুও আভাস প্রকাশ হলে আমাকে মহাগোলে পড়তে হবে। এমন হতে পারে যদিও খুব সম্ভব নয়—যে

India House এ বিষয় নিয়ে এখনো গোলোযোগ করিতে পারে। আর যে পর্য্যন্ত Directorরেরা তাদের অভিপ্রায় প্রকাশ না করে ও রাজার সম্মতি না নেওয়া হয় সে পর্য্যন্ত যারা না জানে তাদের আমি এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই না।

আমি যা লিখেছি এখন এটা ভাল করো বিবেচনা কর। এবিষয়ে একটা স্থির না হওয়া পর্য্যন্ত তোমাকেও লিখতুম না যদি না জানতুম যে তোমার এবিষয়ে মন স্থির করবার জন্য সময় আবশ্যক। যদি ভারতবর্ষে যেতে তোমার মনকে কোন মতেই লওয়াতে না পার তা হলে আমার অবর্ত্তমানে যাতে তুমি এদেশে সুখে থাকতে পার—যাতে পরের অনুগ্রহের উপর তোমাকে নির্ভর করে না থাকতে হয় বরং অন্যের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণের সঙ্গতি থাকে আমি তার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু আমার জীবনের এই সঙ্কট-স্থলে যদি আমার ভাল বাসা বোনটী তাঁর ভাল বাসার কঠোর প্রমাণ যা আমি চাচ্ছি তা দিতে সম্মত হন তবে আমি এই মাত্র বলতে পারি যে এর জন্য তাঁকে ভবিষ্যতে মনস্তাপ পেতে হবে না। পেতে হবে না যদি তিনি তাঁর সেই ভালবাসা ভাইটির যত্ন ও মমতা পেয়ে কয়েক বৎসরের প্রবাসের কষ্ট ভুলে থাকতে পারেন।

বেচারী মারগ্রেট! তাঁর মনে খুবই লাগবে। তাঁর সঙ্গে ভাই পরামর্শ কর। আর তিনি তাঁর সুবুদ্ধি ও গাঢ় অনুরাগ থেকে যে পরামর্শ দেন তার লাভ যেন আমরা দুজনেই পাই। আগামী সোমবার হয়ত তোমার সঙ্গে গিয়ে মিলতে পারব। আমাদের স্কটলণ্ড ভ্রমণ এই সকল কারণে সংক্ষেপে সারতে হবে। নাতালের ছুটিতে এই নূতন সভাসদের ইংলণ্ড ছাড়িবার কথা। আগামী এপ্রেলে ভারতবর্ষে তাঁর কাজ আরম্ভ।

এখন ভাই তবে বিদায়। তুমি জাননা এই পত্রের উত্তর কত অধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করে থাকব।

এই পত্রখানি লিখিতে লেখকের মনে যেমন প্রগাঢ় ও বিচিত্র ভাবের উদয় হইতে ছিল ইহা পাঠ করিয়া হানার হৃদয়ে সহসা কত ভাবনা চিন্তার তরঙ্গ উত্থিত হইল তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারে। ইউরোপ হইতে ভারতবর্ষে যাতায়াতের এক্ষণে যেরূপ সুবিধা হইয়াছে তখন সেরূপ ছিল না। এখন যে সকল ইংরাজ পরিবারের গৃহকর্ত্তা ভারতবর্ষকে তাঁহার কোন এক সুবুদ্ধি পুত্রের কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া অনায়াসে কল্পনা করেন চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা তাঁহারই নিকট জরা মৃত্যুর আলয় বিজন গহন বলিয়া প্রতীয়মান হইত। তখনকার কালে ভারতবর্ষে প্রবাসের যে কষ্ট তাহা এক্ষনে অনুধাবন করা সুকঠিন। একটী বালিকা যে কখন আপনার ক্ষুদ্র দ্বীপের বাহির হয় নাই ছয় মাসের দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা তাহার পক্ষে কত না কষ্টকর বলিয়া বোধ হইবে। আর তখন মেকলে ও তাঁহার ভগিনী যদি দেখিতে পাইতেন যে কত জিনিস যা তাঁহারা ছাড়িয়া যাইতেছেন তাহা স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আর দেখিতে

পাইবেন না তাহা হইলে তাঁহারা যে কোন কারণেই হউক দেশত্যাগী হইতে সম্মত হইতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু হানার কর্ত্তব্য-জ্ঞান এই সকল চিন্তা ও সংশয়ের উপর জয়লাভ করিল ও সৌভাগ্য ক্রমে তিনি তাঁহার প্রবাসোন্মুখ ভ্রাতার সহগামিনী হইতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহাকে সঙ্গিনী না পাইলে মেকলে হয়ত এই দূর দেশে একাকী আসিতে কখনই সাহস করিতেন না।

ইহার তিন মাস পরে মেকলে তাঁহার ভগিনী হানাকে যে পত্র লেখেন তাহাতে লেখেন যে ডাইরেক্টরদের মত নির্ণয়ের আর এক সপ্তাহ কাল বিলম্ব আছে, কিন্তু প্রায় সকলই স্থির, তাহাদের প্রতিকূল মত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই পত্রে তাঁহার ভ্রমণের জন্য কত ব্যয় হইবে তাহার এক তালিকা দেওয়া হইয়াছে, পরে একজন ভাল দাসী সঙ্গে লইবার কথায় মেকলে বলিতেছেন।—

"এক জন ভাল দাসী যেন ভাল করে দেখে শুনে পছন্দ করে নিও। এ পর্য্যন্ত এই নিয়ম ছিল যে যে সকল মহিলা এখান হইতে ভারতবর্ষে আপনাদের সঙ্গে দাসী নিয়ে যাবে তাদের সেই দাসীকে দুই বৎসরের মধ্যে ফেরত পাঠাবার জন্যে জামীন দিতে হবে। তার কারণ এই যে এদেশ থেকে দাসীরা গিয়ে ওখানে যেমন দুর্ব্যবহার করে এমন আর কোন দলের লোকে করে না। দেশীয়দের সঙ্গে তারা প্রায়ই অপমান-সূচক অভদ্র ব্যবহার করে থাকে।—যারা পরের চাকরী করে। এখানে জীবন কাটায় তারা যখন প্রথমে সেদেশে গিয়েই অসংখ্য লোককে আপনার পদানত দেখতে পায় তখন যে ওরূপ ব্যবহার করবে তা বড় আশ্চর্য্য নয়। আবার সেখানকার ইংরাজ সমাজের অবস্থা এই রূপ যে এই সকল রমণী হয়ত কোন ধনী ইংরাজের উপপত্নী হয়ে জমকাল পালকী চড়ে বেড়িয়ে বেড়ায়—তারা আপনার কলঙ্কিত চরিত্র ও মন্দ স্বভাব থেকে আপনাদের দেশের উপর কলঙ্ক আনে। এই সকল কারণে কোম্পানি এই নিয়ম জারী করেছে যে যারা চাকরাণী সঙ্গে নিয়ে যাবে তারা নিজের খরচে তাদের ফেরত পাঠাবে। এখন আর সে নিয়ম নেই। কিন্তু এর দোষ বুঝতে পারছ, দাসী সঙ্গে নিতে হলে কত সাবধানে তাকে বেছে নেওয়া উচিত। দেখছ এর উপর আমার সুখ দুঃখ কতটা নির্ভর করছে। সে দেশে আমাদের চাকরের সংখ্যা প্রায় ৬০।৭০ জন হবে। তাদের মধ্যে সুশৃঙ্খলা রক্ষা সহজ নয়—সে দাসী যদি উগ্রস্বভাবা দুঃশীলা হয় ত সে শৃঙ্খলা কখনই রক্ষিত হবে না। সে যদি দেমাকে লঘুচেতা হয় তা হলে হয়ত সে এমন সকল লোকের সঙ্গে মিশবে যাদের সংসর্গে তার ধর্ম্ম অর্থ সকলি নষ্ট হবে। তুমি জান আমি ধর্ম্মোপদেষ্টা নই কিন্তু এক জন নিরীহ ছুকরীকে তার অজ্ঞাতসারে সেই সকল প্রলোভনের মধ্যে নিয়ে ফেলা—যারা এদেশে কোন শান্ত পরিবারের মধ্যে কি পাকশালায় থেকে বেস ভাল থাকতে পারত তাকে ঐ সকল

প্রলোভনের মধ্যে ফেলে তার মাথা ঘুরিয়ে দেওয়া এ যে কি কুকর্ম্ম তা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি।"

ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে মেকলে তাঁহার আর এক জন বন্ধুকে এই রূপ লেখেন। এর আগে একটা কোন পাকা খবর জানতে পারি নি বলে এখনো পর্য্যন্ত আপনার স্নেহপূর্ণ পত্রের উত্তর দিতে পারি নি। গত কল্য ডাইরেক্টরেরা আমাকে ইণ্ডিয়া কৌন্‌সলের এক জন সভ্য রূপে নিযুক্ত করেছে। ১৯ জন আমার পক্ষে—৩ জন মাত্র আমার বিপক্ষে মত দিয়েছে।

আমি বুঝতে পারছি আমার এতে অনেকটা ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে। কিন্তু যে সকল কারণে আমি এই কাজ নিতে প্রস্তুত হয়েছি তাহাও অলঙ্ঘনীয়। আমার যত দিন যাচ্ছে অধিক ধনোপার্জনে প্রবৃত্তি ততই কমে আসছে। কিন্তু তেমনি আবার প্রতিদিনই টাকার প্রয়োজন অধিক অনুভব করছি। সাধারণের হিতের জন্য যাঁরা কাজ করে তাদের জীবিকার উপযোগী অর্থ আবশ্যক—তা ছাড়া তারা ধর্ম্মপথে থেকে চলতে পারে না। আমার অবস্থা যেরূপ তাতে কেবল আমার দূরবাসে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ হতে পারে। উপায় এক চাকরী করা কিম্বা কলম ধরা। এপর্য্যন্ত আমি যে বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগ দিয়েছি সে কেবল আমার আমোদের জন্য। বৎসরের মধ্যে এক মাস কাল আমোদে কাটানই আমার উদ্দেশ্য ছিল। আমি এ'কে কখন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় মনে করি নি। আমার লেখার বিষয় আমি আপনিই যেচে নিয়েছি—সময় ইচ্ছামত দিয়েছি—আমার পরিশ্রমের যে মূল্য তা আমি আপনিই নির্ণয় করেছি। গ্রন্থব্যবসায়ীর দাস হয়ে থাকা—মনের উচ্ছ্বাসের নিবৃত্তি নয় শূন্য তহবিল পূর্ণ করা, অনিচ্ছুক কল্পনাকে চাবুক মেরে দৌড় করান, পাতা পোরাবার জন্যই লেখা—এ রকম মনে করাও আমার পক্ষে কষ্টজনক। যদি আমার চাকরী ছেড়ে দিতে হয় তবে এভিন্ন আর উপায় নাই। আর শুধু টাকার জন্য চাকরী করা এ আমার পক্ষে আরো ভয়ানক যন্ত্রণা। এখন দিন কতক আমি যে কর্ম্মে নিযুক্ত রয়েছি তাতে অনেকে হয়ত ভগ্নহৃদয় হয়ে যেত। গবর্ণমেণ্টের অনুচরদের মধ্যে আমি এক জন অবিনীত বিদ্রোহীর মধ্যে গণ্য। গত সেসনের মধ্যে আমি দুই বার এই কর্ম্মে জবাব দিয়েছি। যদি লক্ষ্মী আমার প্রতি সদয় থাকত তাহলে আমি কখন এরূপ করতুম না। আপনার কি বলুন—শত্রুরাও আপনাকে এ বলে দোষ দিতে পারে না যে আপনি টাকার জন্য চাকরীর প্রত্যাশী—আর আপনি জনহিতের জন্য যে সুখস্বচ্ছন্দতা বলিদান করেছেন তার কিছু উপযুক্ত বেতন পান না, আপনি আমার ভাব কি বুজবেন? লোকে আমাকে মনে করতে পারে যে আমি তাদের জন্য যা কিছু করছি তাতে আমার কোন নীচ লক্ষ্য আছে। House of Commons এ দু একবার যখন আমি লোকের অরুচিকর বিষয় সমর্থন কর-

বার চেষ্টা করেছি তখন ঐ ভেবে আমার বুদ্ধি কলুষিত ও ধৈর্য্য লোপ হয়েছে।

কেবল যদি আমার ঐ রকম অবস্থা হত তাহলে ও আমার আত্মসুখ ও কর্ম্মিষ্ঠতার প্রতি লক্ষ্য করে মনে করতুম যে কতক বৎসরের পরিশ্রমে যদি স্বাধীনতা উপার্জ্জন করতে পারি ত মন্দ হয় না। কিন্তু আরো ভাবনার বিষয় আছে আমি সংসারের মধ্যে একলা নই। আমি যাদের অত্যন্ত ভাল-বাসী এমন পরিবারের সুখ দুঃখ আমার উপর অনেকটা নির্ভর করছে। আমার পিতাকে তাঁর এই বৃদ্ধবয়সে যদি পরের অনুগ্রহের উপর ফেলে রাখতে না চাই—যদি চাই যে আমার ছোট ভাইটির ভালরূপ শিখিবার হানি না হয়—আমার ভগ্নি যাদের আমি এত ভালবাসী যে কোন ভাই তার কোন বোন্‌কে এমন ভাল বাসে কি না সন্দেহ—তাদের যদি মেয়ে শিখিয়ে কি চাকরী করে দিনপাত করতে হচ্ছে এ না দেখতে চাই তাহলে আমার একটা কিছু করা আবশ্যক—একটা কোন চেষ্টার প্রয়োজন। এখন একটা অবসর এসেছে যাতে আমার বৃদ্ধ পিতার শেষ দিন গুলো সুখে কেটে যায়—আমার ভাইয়ের ভালরূপ শিক্ষা হয়—অমার ভগ্নিদের জন্য সংস্থান হয়—আমার আপনার দুটো গ্রাস আচ্ছা-দনের উপায় হয় এমন একটা সুবিধা হ-য়েছে। ৩৯।৪০ বৎসর বয়সে ৩ লক্ষ টাকা হাতে করে ইংলণ্ডে ফিরে আসতে পারব এমন আশা হচ্ছে। আমার পক্ষে এই যথেষ্ট। এর চেয়ে অধিক চাই না।

যদি এদেশের রাজকার্য্যের কথা বল তবে অবিশ্যি আমার কতক বৎসর নষ্ট হচ্ছে। কিন্তু আবার তা বলি যদি আ-পনার অনুগ্রহে আমি অল্পবয়সে পার্লমেণ্টে প্রবেশ করতে না পারতুম—যদি চাকরির নিয়মিত পথ দিয়ে চলতে হত—আমার আপনার চেষ্টায় উঠতে হত—তবে ৪০ বৎসর বয়সে House of commonsএ যাইবার আমার কোন সম্ভাবনাই থাকত না। যদি দেশীয়দের নিকট আমি কোন খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করে থাকি—যদি সরকারী ওপার্লমেণ্টের কাজে আমার কোন অভি-জ্ঞতা জন্মে থাকে ও বড় বড় কার্য্য পরি-চালনে নিপুণতা লাভ করে থাকি—এসব আমার উপরি লাভ মনে করা উচিত।

আর যে কয় বৎসর আমায় বিদেশে যা-পন করতে হবে যদিও ইংলণ্ডের রাজকার্য্য সম্বন্ধে সে কয় বৎসর ক্ষতি মনে করা যায় কিন্তু আমার আত্মোন্নতি কিম্বা লোকোপ-কার সম্বন্ধে তা বৃথা নষ্ট হয় না। আমি মনে করি কোন রাজনীতিজ্ঞ পুরুষের পক্ষে আমার ভারত রাজ্যের সদৃশ প্রশস্ত ক্ষেত্র অল্পই আছে। আমার পক্ষপাতী বন্ধুরা বলেন যে সে রাজ্যের রাজকার্য্যে নিযুক্ত হয়ে আমাকে হীনতা স্বীকার করতে হয়েছে, কিন্তু তাঁরা যাই বলুন আমি মনে করি যে আমি যত দূর হস্ত প্রসারণ করছি তা আ-মার বিদ্যা বুদ্ধির অতীত। আমি সত্য সত্যই মনে করি যে আমি যে ভার বহন করতে প্রবৃত্ত হয়েছি তাহা আমার পক্ষে ভয়ানক গুরুতর। ভারত সম্বন্ধীয় বিষয়ে

আপনার মত অল্পলোকেই উচিত মত মনোযোগ দিতেছে—তাই আপনি আমার এই ভাবে সম্পূর্ণ প্রবেশ করতে পারেন সন্দেহ করি না।

এক্ষণে আপনার মমতাপূর্ণ পত্রের জন্য আপনাকে হৃদয়ের সহিত ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারছি নে। আপনার কাছে আমি যে যে বিষয়ের জন্য ঋণী—সে পত্র তাহার একটী ক্ষুদ্র বিষয় মাত্র। এই অল্প বয়সে যে আমি আমার দেশের কার্য্যে কৃতীত্ব লাভ করতে পেরেছি—দু একটী সাধু পক্ষ অবলম্বন করে জয়ী হতে পেরেছি—এখন যে আমার পরিবারদের ভগ্নদশা হতে উদ্ধার করতে সমর্থ হচ্ছি আর যারা আমার প্রাণ হতে প্রিয়তম তাদিগকে অধীনতা ও দারিদ্র্য-কষ্ট হতে রক্ষা করতে পারছি, আমার যৌবন অতিক্রম হতে না হতেই স্বামি ন্যায়পথে থেকে আপনার জন্য যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জনের আশা করতে পারচি—এ সকলই আপনার অনুগ্রহে। আমার কেবল এই মিনতি আপনি বিশ্বাস করুন যে এখনই হোক আর আগেই হোক আমি যতটা মনে করচ্ছি তার সহস্র ভাগের এক ভাগও প্রকাশ করে বলতে পারিনি।

আর দুই এক মাস পরেই মেকলে আপনার ভগিনীর সমভিব্যাহারে পোতারোহণে ভারতবর্ষ যাত্রা করিলেন। শ্রীস—

বিয়াত্রীচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য।

ইতালিয়ার এই স্বপ্নময় কবির জীবন গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিয়াত্রিচে (Beatrice)। বিয়াত্রীচেই তাঁহার সমুদয় কাব্যের নায়িকা, বিয়াত্রীচেই তাঁহার জীবন কাব্যের নায়িকা! বিয়াত্রীচেকে বাদ-দিয়া তাঁহার কাব্য পাঠ করা বৃথা, বিয়াত্রীচেকে বাদ দিলে তাঁহার জীবন-কাহিনী শূন্য হইয়া পড়ে। তাঁহার জীবনের দেবতা বিয়াত্রিচে, তাঁহার সমুদয় কাব্য বিয়াত্রীচের স্তোত্র। বিয়াত্রিচের প্রতি প্রেমই তাঁহার প্রথম কবিতার উৎস উৎসারিত করিয়া দেয়। তাঁহার প্রথম গীতি-কাব্য "ভীটা নুওভা"র (VITA NUOVA) প্রথম হইতে শেষপর্য্যন্ত বিয়াত্রীচেরই আরাধনা ইহার কিয়দ্দূর লিখিয়াই তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল;—তাঁহার মনঃপূত হইল না; পাঠকের চক্ষে বিয়াত্রীচেকে দূর-স্বর্গের অলৌকিক দেবতার ন্যায় চিত্রিত করিয়াও তিনি পরিতৃপ্ত হইলেন না। এই কাব্যের শেষ ভাগে তিনি লিখিতেছেন—

" এই পর্য্যন্ত লিখিয়াই আমি এক অতিশয় আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম—সেই স্বপ্নে যাহা দেখিলাম তাহাতে এই স্থির করিলাম যে, আমি সেই প্রিয় দেবীর বিষয় যাহা লিখিতেছি তাহা তাঁহার যোগ্য নহে—যে পর্য্যন্ত ইহা অপেক্ষা যোগ্যতর

কবিতা না লিখিতে পারিব সে পর্য্যন্ত আর লিখিব না। ইহা নিশ্চয়ই যে, তিনি (বিয়াত্রীচে) জানিতেছেন, আমি তাঁহার বিষয়ে যোগ্যতর কবিতা লিখিবার ক্ষমতা প্রাপ্তির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি। সমুদয় জীবের প্রাণদাতা ঈশ্বর-প্রসাদে আর কিছু দিন যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে তাঁহার বিষয়ে এমন লিখিব, যাহা এপর্য্যন্ত কোন মহিলার সম্বন্ধে কেহ কখনো লেখে নাই।" এই স্থির করিয়াই তিনি তাঁহার মহাকাব্য "ডিভাইনা কামেডিয়া" (Divina Commedia) লিখেন, ও বিয়াত্রিচে সম্বন্ধে এমন কথা বলেন, যাহা কোন মহিলা সম্বন্ধে কেহ কখন বলে নাই।

দান্তে তাঁহার নয় বৎসর বয়স হইতেই বিয়াত্রীচেকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁহার প্রেম সাধারণ ভালবাসা নামে অভিহিত হইতে পারে না। বিয়াত্রীচের সহিত তাঁহার প্রেমের আদান প্রদান হয় নাই, নেত্রে নেত্রে নীরব প্রেমের উত্তর প্রত্যুত্তর হয় নাই। অতিদূর সাক্ষাৎ—দূর আলাপ ভিন্ন বিয়াত্রীচের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও আলাপ হয় নাই। অতি দূরস্থ দেবীর ন্যায় তিনি দূর হইতে সসম্ভ্রমে বিয়াত্রীচেকে দেখিতেন, অতি দূর হইতে তাঁহার গ্রীবানমিত নমস্কারে আপনাকে দেবানুগৃহীত মনে করিতেন। যে সভায় বিয়াত্রীচে আছেন, সে সভায় গেলে তিনি কেমন অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তিনি কথা কহিতে পারিতেন না, তাঁহার শরীর কাঁপিতে থাকিত। বিয়াত্রীচেকে তিনি তাঁহার প্রেমের কাহিনী বলেন নাই, বলিতে সাহস করেন নাই, বা বলিবার আবশ্যক বোধ করেন নাই। তিনি আপনার প্রেমের স্বপ্নেই আপনি মগ্ন থাকিতেন, তাঁহার প্রেম জাগ্রত রাখিবার জন্য বিয়াত্রীচের প্রতিদান আবশ্যক ছিল না। তাঁহার কাব্য পড়িলে বিয়াত্রীচেকে মানুষ হইতে উচ্চ-পদবী-গত মনে হয়, তাঁহার নিকট হইতে অনুগ্রহ ভিন্ন প্রেম-প্রত্যাশা করিবার ইচ্ছা মনে এক মুহূর্ত্তও স্থান পায় না। যদিও "ভিটা নুওভা" কাব্যের নায়িকাই বিয়াত্রীচে, কিন্তু পাঠকেরা বিয়াত্রীচের মুখ হইতে একটি কথাও শুনিতে পান নাই, বিয়াত্রীচে সর্ব্বদাই তাঁহাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন। রূপক প্রভৃতির দ্বারা বিয়াত্রীচেকে দান্তে এমন একটি মেঘময় অস্ফুট আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যে, পাঠকের চক্ষে সেই অস্ফুট মূর্ত্তি অতি পবিত্র বলিয়া প্রতিভাত হয়। দান্তে তাঁহার প্রেমার্দ্র হৃদয়ে মনে করিতেন, "যে ব্যক্তিই বিয়াত্রীচের নিকট আসিত তাহারই হৃদয়ে এমন গভীর ভক্তির উদ্রেক হইত যে তাঁহার মুখের দিকে নেত্র তুলিতে তাহার সাহস হইত না।" দান্তে বলেন যখন মনুষ্যেরা তাঁহার দিকে চাহিত "তখনি তাহারা কেবল একটি মাধুর্য্য ও মহত্ত্ব অনুভব করিত।" দান্তে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন, সমস্ত পৃথিবী বিয়াত্রীচের পূজা করিতেছে, দেবতারা তাঁহাকে আপনাদের মধ্যে আনিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। দান্তের ডিভাইনা কামেডিয়ায় নরকের দ্বার-রক্ষকেরা বিয়াত্রীচের নাম শুনিয়াই অমনি

সসম্ভ্রমে দ্বার খুলিয়া দিতেছে—দেবতারা বিয়াত্রীচের নাম শুনিয়া অমনি স্বর্গযাত্রীদ্বয়কে সহর্ষে আহ্বান করিতেছেন। বিয়াত্রীচের মৃত্যুর পর দান্তে অশ্রুপূর্ণ নয়নে দেখিলেন, যেন সমস্ত নগরীই রোদন করিতেছে। বিয়াত্রীচের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ বর্ণনাই ভিটা নুওভার আরম্ভ—

"যখন আমার জীবনের আরম্ভ হইতে নয় বার মাত্র সূর্য্য তাঁহার কক্ষ প্রদক্ষিণ করিয়াছে, এমন সময়ে আমার হৃদয়ের মহান্ মহিলা আমার চক্ষের সমক্ষে অবিভূ‍্ত হইলেন। * * * তখন তাঁহার জীবনের আরম্ভ মাত্র এবং আমার বয়স নবম বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার শরীরে সুন্দর লোহিত বর্ণের পরিচ্ছদ,একটি কটিবন্ধ ও বাল্যবয়সের উপযুক্ত কতকগুলি অলঙ্কার। সত্য বলিতেছি তাঁহাকে দেখিয়া সেই মুহূর্ত্তেই আমার হৃদয়ের অতি নিভৃত নিলয়স্থিত মর্ম্ম পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, এবং তাহার প্রভাব আমার শরীরের শিরায় শিরায় প্রকাশিত হইল। সে (মর্ম্ম)কাঁপিতে কাঁপিতে এই কথাগুলি বলিল ঐ দেখ, আমা অপেক্ষা সরলতর দেবতা আমার উপর আধিপত্য করিতে আসিয়াছেন; * * সেই সময় হইতে প্রেম আমার হৃদয়-রাজ্যের অধিপতি হইল। * * * দেবতাদিগের মধ্যে কনিষ্ঠ দেবতাটিকে (বিয়াত্রীচেকে) দেখিবার জন্য প্রেমের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া বাল্যকালে কতবার তাহার অন্বেষণে ফিরিয়াছি। সে এমন প্রসংশনীয়; তাহার ব্যবহার এমন মহৎ যে কবি হোমারের উক্তি তাহার প্রতি প্রয়োগ করা যাইতে পারে—অর্থাৎ "তাহাকে দেখিয়া মনে হয় সে দেবতাদের মধ্যে জন্মলাভ করিয়াছে, মানুষের মধ্যে নহে।" বিয়াত্রিচের পিতা একটি ভোজ দেন, সেই ভোজে দান্তের পিতা তাঁহার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যান; সেই সভাতেই দান্তের সহিত বিয়াত্রীচের উক্ত প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দ্বিতীয় সাক্ষাৎ এই রূপে বর্ণিত হয়। "উপরি-উক্ত মহান্ মহিলার সহিত সাক্ষাতের পর নয় বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, এমন সময়ে নিষ্কলঙ্ক-শুভ্র-বসনা, সখীদ্বয়-পরিবেষ্টিতা সেই বিস্ময়-জনক মহিলা আর একবার আমার সম্মুখে আবির্ভূ‍্ত হইলেন। তিনি রাজপথ দিয়া যাইবার সময় আমি যেখানে সসম্ভ্রমে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই দিকে নেত্র ফিরাইলেন, এবং তাঁহার সেই অনির্ব্বচনীয় নম্রতার সহিত এমন শ্রীপূর্ণ নমস্কার করিলেন যে, আমি সেই মুহূর্ত্তেই সৌন্দর্য্যের সর্ব্বাঙ্গ যেন দেখিতে পাইলাম। * * এইবার প্রথম তাঁহার কথা শুনিতে পাইলাম, শুনিয়া এমন আহ্লাদ হইল যে, সুরামত্তের ন্যায় আমার সঙ্গীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ছুটিয়া আসিলাম। আমার নির্জ্জন গৃহে আসিয়া সেই অতিশয় ভদ্র-মহিলার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা আসিল ও এক আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলাম। সেই স্বপ্নের বিষয় সেই সময়কার প্রধান প্রধান কবিদের জানাইব স্থির করিলাম। যাঁহারা যাঁহারা প্রেমের অধীন আছেন তাঁহাদের বন্দনা করিয়া

ও তাঁহাদের এই স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ-ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিয়া এই স্বপ্নের বিষয়ে একটি কবিতা লিখিব স্থির করিলাম। সেই কবিতাটি (Sonnet) এই—

প্রেম বন্দী হৃদি যাঁরা, সুকোমল মন,
যাঁরা পড়িবেন এই সঙ্গীত আমার,
তাঁরা মোর অনুনয় করুন শ্রবণ,
বুঝায়ে দিউন্ মোরে অর্থ কি ইহার ?
যেকালে উজ্জ্বল-তারা উজলে আকাশ,
নিশার চতুর্থ ভাগ হোয়ে গেছে শেষ,
প্রেম মোর নেত্রে আসি হোলেন প্রকাশ,
স্মরিলে এখনো কাঁপে হৃদয় প্রদেশ!
দেখে মনে হোল যেন প্রফুল্ল আনন ;
মোর হৃদ্‌পিণ্ড রহে করতলে তাঁর ;
বাহু পরে শান্ত ভাবে করিয়া শয়ন
ঘুমাইয়া রয়েছেন মহিলা আমার—
অবশেষে জাগি উঠি, প্রেমের আদেশে
সভয়ে জ্বলন্ত-হৃদি করিলা আহার!
তার পরে চলি গেলা প্রেম অন্য দেশে
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি বিষণ্ণ-আকার!

এই স্বপ্নের পর হইতে সেই অতি শ্রীমতী মহিলার চিন্তাতেই ব্যাপৃত ছিলাম। ক্রমে ক্রমে আমার স্বাস্থ্য এমন নষ্ট হইয়া আসিল, যে, আমার আকার দেখিয়া বন্ধুরা অতিশয় চিন্তিত হইলেন ; আবার যে গূঢ় কথা সকল-কথা অপেক্ষা আমি লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি, কেহ কেহ অসদভিপ্রায়ে তাহাই জানিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া যুক্তি ও প্রেমের পরামর্শে উত্তর দিলাম যে, প্রেমের দ্বারাই আমার এই অবস্থা হইয়াছে। আমার আকারে প্রেমের চিহ্ন এমন স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছিল যে, সে গোপন করা বৃথা। কিন্তু যখন তাহারা জিজ্ঞাসা করিল—"কাহার প্রেমে বিচলিত হইয়াছ ?" আমি তাহাদের দিকে চাহিলাম, হাসিলাম, আর উত্তর দিলাম না।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বিয়াত্রীচে দান্তেকে অভিবাদন করিলে দান্তে কি আনন্দ অনুভব করিতেন! কিন্তু একবার দান্তের নামে এক অতি মিথ্যা নিন্দা উঠে, সেই নিন্দা "সেই অতি কোমলা, পাপের বিনাশয়িতা, পুণ্যের রাজ্ঞী-স্বরূপার" কানে গেল। দান্তে কহিতেছেন, এবার যখন তিনি আমার সম্মুখ দিয়া গেলেন তখন আমার সুখের এক মাত্র কারণ সেই সুন্দর নমস্কার হইতে বঞ্চিত করিলেন। যেখানে যখন তাঁহাকে দেখিয়াছি তাঁহার সেই অমূল্য নমস্কারের আশায় আমি পৃথিবীর শত্রুতা ভুলিয়াছি, আমার হৃদয়ে এমন একটি উদারতা জন্মিত যে, পৃথিবীতে যে আমার যাহা কিছু দোষ করিয়াছে সমুদায় মার্জ্জনা করিতাম।" এ নমস্কার হইতে, তাঁহার সেই প্রেমের এক মাত্র পুরস্কার হইতে যখন তিনি বঞ্চিত হইলেন, তখন তিনি অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইলেন, জনকোলাহল ভেদ করিয়া যেখানে একটি নির্জন স্থান পাইলেন সেই স্থানেই তীব্রতম অশ্রুজলে রোদন করিতে লাগিলেন। এই রূপে প্রথম উচ্ছ্বাস-বেগ নিবৃত্ত হইলে তাঁহার নির্জন গৃহে গিয়া "কাতর শিশুর" ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

এক বার কোন বন্ধুর বিবাহ-সভায় তিনি আহূত হন। তাঁহার বন্ধুকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নব বধূর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিবেন স্থির করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল, তিনি দেখিলেন তাঁহার অতি নিকটেই বিয়াত্রীচে। তিনি এমন এক প্রকার অভিভূত হইয়া পড়িলেন যে মহিলারা তাঁহার আকার দেখিয়া বিয়াত্রীচের সহিত চুপে চুপে কথা কহিতে লাগিলেন, ও তাঁহাকে উপহাস করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নিজ গৃহে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—"যদি এই মহিলা (বিয়াত্রীচে) আমার অবস্থা জানিতেন, তবে আমার আকার দেখিয়া কখনো তিনি এরূপ উপহাস করিতেন না, বরং তাঁহার দয়া হইত।"

দান্তে তাঁহার সেই অভিলষিত নমস্কার আর এপর্য্যন্ত পান নাই। এক বার কতক গুলি মহিলা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যাঁহাকে তুমি ভালবাস, তাঁহার দর্শন মাত্রেই তুমি যদি অমন অভিভূত হইয়া পড়, তবে তোমার ভালবাসিবার ফল কি?" তিনি উত্তর দিলেন "তাঁহার একটি নমস্কার পাওয়াই এপর্য্যন্ত আমার ভালবাসিবার এক মাত্র লক্ষ্য ও ফল ছিল, তাঁহার নমস্কারই আমার ইচ্ছার এক মাত্র গম্যস্থান ছিল—কিন্তু তিনি যখন তাহা না দিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তখন তাহাই হউক—প্রেম আমাকে এমন আর একটি সুখে নিবিষ্ট করিয়াছেন, যাহা কোন কালেই শেষ হইবে না।" তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন সে কোন সুখ? দান্তে কহিলেন "আমার মহিলার প্রশংসা গান।" তাঁহার মহিলার প্রশংসা গান নিম্নে অনুবাদিত হইল—

"রমনি! তোমরা বুঝ প্রেমের ব্যাপার—
মহিলার কথা মোর করহ শ্রবণ—
বোলে ফুরায় না কভু প্রশংসা তাঁহার—
মন খুলে বোলে তবু জুড়াইবে মন!
পৃথিবীতে যত কিছু আছেগো মহান্—
তাহা হোতে মহত্তর চরিত তাঁহার
হেন দীপিয়াছে প্রেমে এ মোর পরাণ,
চির-বল অর্পিয়াছে বচনে আমার!
সাধ যায় করি তাঁর হেন যশো গান
সমস্ত পুরুষে তাঁর পদতলে আনি—
কিন্তু থাক্—গাবনাকো সে সমুচ্চ তান
গাহিতে ক্ষমতা যদি না থাকে কি জানি!
আমার এ ভালবাসা অতি সুকোমল,
গাব তাই অতিশয় সুকোমল তানে—
সুকোমল হৃদি ওগো মহিলা সকল!
যে গান লাগিবে ভাল তোমাদের কানে!
স্বর্গের দেবতা এক কহিলা ঈশ্বরে—
"দেখ প্রভু, দেখ চেয়ে এই পৃথ্বীতলে—
মানব হইতে এক হেন জ্যোতি ক্ষরে
নিম্ন দেশ পৃথিবীরে সে জ্যোতি উজলে!
স্বর্গের অভাব প্রভু নাই কিছু আর,
শুধু ওই জ্যোতি, ওই বিমল কিরণ!
তাই দেব অনুনয় শুনগো আমার,
দেবতার মাঝে তারে কর আনয়ন।"
আমাদের প্রতি দয়া হইল বিধির—
কহিলেন "ধৈর্য্য ধর, আসুক্ সময়—
পৃথিবীতে এক জন আছেগো অধীর

কখন হারায় তারে সদা তার ভয়।"

*　　*　　*

প্রেম কহে তার পানে করি নিরীক্ষণ

*　　*　　*

ঈশ্বর নূতন সৃষ্টি করিলা সৃজন!
মুকুতার মত পাণ্ডু বরণ তাহার—
প্রকৃতির পূর্ণতম-শিল্প সেই জন,
কহি তারে পূর্ণতম আদর্শ শোভার!
সুন্দর নয়নে তার সদাই জাগ্রত
এমন প্রেমের জ্যোতি, এমন উজ্জ্বল
যে জ্যোতি দর্শক আঁখি করায় মুদিত—
সে জ্যোতি ঢালয়ে হৃদে আলোক বিমল।
হাসিতে চিত্রিত যেন প্রেমের আকার—
এক দৃষ্টে কে তাকাবে সে হাসি তাহার?
তোমারে কহি, হে গান, সন্তান প্রেমের,
তুমিত যাইবে বহু মহিলার কাছে,
বিলম্ব করোনা কভু, বল তাঁহাদের—
"দেবীগণ, মোর শুধু এক কাজ অছে—
তাঁহার চরণে যাওয়া, যাঁর মহা যশে
ভাণ্ডার আমার এই পূর্ণ রহিয়াছে।"
যদিবা বিলম্ব তব হয় দৈববশে,
দেখো যেন রহিও না তাহাদের কাছে—
অসাধু যাদের জানো, মন ভাল নয়—
কেবল রমণী আর প্রেমিকের কানে
খুলিও হে গীত তুমি তোমার হৃদয়!
মহিলা আমার বসি আছেন সেখানে
সেখানে তোমারে তাঁরা যাবেন লইয়া—
তাঁরে মোর কথা তুমি দিও বুঝাইয়া!

একবার দান্তে অত্যন্ত পীড়িত হন, [সেই] সময় সহসা কেমন তাঁহার মনে [হইল], বিয়াত্রীচের মৃত্যু হইবে। কল্পনা তাঁহাকে পাগলের মত করিয়া তুলিল, কল্পনায় তিনি দেখিতে লাগিলেন, কেহ তাঁহাকে কহিতেছে, "তোমার মৃত্যু হইবে" কেহবা কহিতেছে "তুমি মরিয়াছ।" তিনি দেখিলেন যেন সূর্য্য অন্ধকার, তারকারা রোদন করিতেছে, ভয়ানক ভূমিকম্প হইতেছে, তাঁহার চারিদিকে পাখীরা মরিতেছে ও পড়িতেছে—এই বিপ্লবের মধ্যে কে যেন-তাঁহাকে কহিল "জাননা তোমার অনুপম মহিলা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন?" তিনি যেন বিয়াত্রীচের মৃত্যুকালীন প্রশান্ত মুখ দেখিতে পাইলেন। সেই অজ্ঞান অবস্থায় এমন কাতর স্বরে মৃত্যুকে আহ্বান করিলেন যে, শয্যাপার্শ্বস্থ সুশ্রূষাকারিণী রমণী ভয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। অবশেষে জাগ্রত হইয়া ইহা স্বপ্ন জানিতে পারিয়া সুস্থির হইলেন!

এক দিন তিনি মনে করিলেন, এপর্য্যন্ত তিনি তাঁহার মহিলার বিষয় যাহা কিছু লিখিয়াছেন, সমুদয় অপূর্ণ হইয়াছে। ক্ষুদ্র গীতির মধ্যে ভাব প্রকাশ করিয়া পরিতৃপ্ত না হইয়া তিনি একটি বৃহৎ কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন—

কত কাল আছি আমি প্রেমের শাসনে,
এমন গিয়াছে সোয়ে অধীনতা তাঁর,
প্রথমে যা দুখ বোলে করেছিনু মনে
এখন তা' ধরিয়াছে সুখের আকার।
যদিও গো বলহীন হয়েছে পরাণ,
গেছে চলি তেজ যাহা ছিল এই চিতে,
তবু হেন সুখ প্রেম করেন গো দান
মৃত্যুমূল্য দিয়ে চাই সে সুখ কিনিতে!

প্রেমের প্রসাদে মোর হেন শক্তি আছে,
প্রত্যেক নিশ্বাস ধরি প্রার্থনা আকার—
অনুগ্রহ-ভিক্ষা চায় মহিলার কাছে—
অতি দীন ভাবে অতি নম্রভাবে আর!
তাঁরে দেখিলেই আসে সে ভাব আমার।

এই কয় ছত্র লিখিয়াই সহসা গান থামিয়া গেল—সহসা ইহার নিম্নে লাটিন ভাষায় এই কথাগুলি লিখিত হইল "যে নগরী লোকে পূর্ণ ছিল সে আজ কি নির্জ্জন হইয়াছে! সমস্ত জাতির মধ্যে যে জাতি মহত্তম ছিল সে জাতি আজ কি বিধবার আকার ধারণ করিয়াছে!" বিয়াত্রীচের মৃত্যু হইয়াছে—এই সংবাদ শুনিয়াই সহসা যেন তাঁহার সঙ্গীত থামিয়া গেল। এমন একটি মহান ঘটনা শুনিলেন যেন তাহা আর চলিত ভাষায় লিখা যায় না, গ্রাম্য ভাষায় লিখিলে তাহা যেন অতি লঘু হইয়া পড়ে। এই নিদারুণ দুঃখে তাঁহার আর কি সান্ত্বনা হইতে পারে? তিনি বিয়াত্রীচের মৃত্যু ও জন্মতিথি মিলাইয়া তখনকার জ্যোতিষ গণনার অনুসারে স্থির করিলেন—বিয়াত্রীচের মৃত্যুর সহিত নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় ত্রিমূর্ত্তির (Holy Trinity) কোন না কোন যোগ আছে। —এই কল্পনাতেই তাঁহার কত সুখ হইল! তিনি নগরের প্রধান প্রধান লোকদিগকে পত্র লিখিলেন, তাহাতে বিয়াত্রীচের মৃত্যুতে নগরের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহাই ব্যাখ্যা করিলেন—তাঁহার বিশ্বাস হইল, যেন বিয়াত্রীচের মৃত্যুতে সমস্ত নগরী অভাব অনুভব করিতেছে, অথবা যদি না করে, তবে প্রকৃত পক্ষে তাহাদের যে অভাব হইয়াছে, এ বিষয়ে তাহাদের চেতনা জন্মাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য কর্ম্ম।

ক্রমে ক্রমে দুঃখের অন্ধকার তাঁহার হৃদয়ে গাঢ়তর হইতে লাগিল—যখন অশ্রুজল শুকাইয়া গেল তখন স্থির করিলেন অশ্রুময় অক্ষরে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিবেন। এই ভাবিয়া, যাহারা তাঁহার দুঃখ বুঝিতে পারিবে, তাঁহার দুঃখে যাহারা সহজে মমতা করিতে পারিবে, সেই রমণীদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

এ নয়ন কাঁদিয়া কাঁদিয়া যন্ত্রণায়,
জীর্ণ হোয়ে পড়িয়াছে গেছে শুকাইয়া,—
নিভাতে এ জ্বালা যদি থাকে গো উপায়
(যেন জ্বালা অতিধীরে যেতেছে লইয়া
ক্রমশঃ এ দেহ মোর কবরের পানে,)
তবে তাহা মৃত্যু, কিম্বা প্রকাশি এ ব্যথা!
যখন মহিলা মোর আছিলা এখানে
আর কারে বলি নাই এ মর্ম্মের কথা,
হে রমণি তোমাদের কোমল হৃদয়ে
মরমের কথা মোর ঢেলেছি কেবল।
যখন গেছেন তিনি স্বরগ আলয়ে—
রাখিয়া আমার তরে শোক-অশ্রুজল—
তখন যা' কিছু মোর বলিবার আছে
হে রমণি বলিবগো তোমাদেরি কাছে।

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন—বিয়াত্রীচে উচ্চতম স্বর্গে গিয়াছেন, সেখানে যাইতে তাঁহার কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই! ঈশ্বর তাঁহাকে আপনি ডাকিয়া লইলেন—ঈশ্বর দেখিলেন—এই যন্ত্রণাময় পৃথিবী এমন সুন্দর প্রাণীর বাসযোগ্য নহে। সঙ্গীতটি এই বলিয়া সমাপ্ত করিলেন—

যাও তুমি, হে করুণ সঙ্গীত আমার,
যাও সেথা যেই খানে রমণীরা আছে,
আগে তুমি যেতে সেথা বহি সুখভার,
কত সুখ পেতে, রহি তাহাদের কাছে!
এখনো তাদেরি কাছে করগো প্রয়াণ,
বিষণ্ণ ও শূন্য তুমি শোকের সন্তান!

এই রূপে প্রথম বৎসর কাটিয়া গেলে পর একবার একটি স্থান দেখিয়া সহসা তাঁহার পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগ্রত হইয়া উঠিল। সেই খানে দাঁড়াইয়া তিনি অতি বিষণ্ণ বদনে পুরাতন কথা ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিষাদ আর কেহ দেখিতে পাইতেছে কিনা, তাহাই দেখিবার জন্য চারিদিকে নেত্রপাত করিলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন—একটি বাতায়ন হইতে অতি সুন্দরী এক যুবতী তাঁহাকে এমন মমতার সহিত নিরীক্ষণ করিতেছেন যে, দয়া যেন তাঁহার নেত্রে স্পষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। এই মমতা পাইয়া দান্তের হৃদয় গলিয়া গেল, অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এই মমতা পাইয়া কেবল কৃতজ্ঞতা নহে, ঈষৎ প্রেমের ছায়াও তাঁহার তরুণ হৃদয়ে পতিত হইল! সেদিন চলিয়া গেলেন—কিন্তু আবার তাহাকে দেখিতে কেমন বাসনা হইল, আর এক দিন সেই খানে গেলেন—আবার তাহাকে দেখিতে পাইলেন—দেখিলেন তাঁহার বিয়াত্রীচের ন্যায় তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ। পাণ্ডুবর্ণকে দান্তে "প্রেমের বর্ণ" নাম দিয়াছেন। দান্তে কহিলেন "আমার চক্ষু তাহাকে দেখিলে কেমন আনন্দ অনুভব করে।" পর ক্ষণেই আবার চক্ষুকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন "চক্ষু! তোর অশ্রুজল দেখিয়া কত লোকে অশ্রু ফেলিয়াছে, তুই আজ কি ভুলিয়া গেলি যে, যে মহিলার (বিয়াত্রিচের) জন্য তুই রোদন করিতেছিস্, সেই মহিলার কথা স্মরণ করিয়াই ঐ রমণী তোর দিকে চাহিতেছেন?" কিন্তু ঐ তিরস্কার বৃথা! আপনাকে ভৎর্সনা করিলেন কিন্তু শোধন করিতে পারিলেন না। যে দিকে মন ধাবিত হয় তাহার অনুকূলে কখনো যুক্তির অভাব হয় না।—অবশেষে স্থির করিলেন—প্রেম তাঁহাকে শান্তি দিবার জন্যই উক্ত মহিলাকে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন—অতএব তাঁহার হৃদয়ের অভাব এই মমতাময়ী মহিলাই পূর্ণ করিবেন। এই রূপে নূতন-প্রেম যখন তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময়ে কল্পনার স্বপ্নে এক দিন যেন প্রত্যক্ষ সেই লোহিত-বসনা বিয়াত্রিচেকে দেখিতে পাইলেন—ভস্মাচ্ছন্ন পুরাতন প্রেমের বহ্নি আবার জ্বলিয়া উঠিল ও নূতন প্রেম অঙ্কুরেই শুকাইল!

ভিটানুওভা কাব্যে বিদেশীয় পথিকদিগকে সম্বোধন করিয়া নিম্ন-লিখিত গীতিটি লিখিত আছে—

ধীরে যাইতেছ চলি, ওগো যাত্রীদল
যেন কোন্ দূর বস্তু করি কল্পনা,—
মোদের দহিছে যেই বিষাদ অনল
তোমাদের পরশেনি যেন সে যাতনা!
তোমাদের নিজদেশ এতই কি দূরে?
এ শোকার্ত্ত নগরীর যাও মধ্য দিয়া
বোধ হয় তবু যেন জাননা এ পুরে

কি মহান্ শোকানল দহিতেছে হিয়া !
তবু যদি এক বার দাঁড়াও হেথায়,
কিছুক্ষণ মোর কথা শোন মন দিয়া—
তা হলে বিদায় কালে বিষম ব্যথায়
যাবে চলি উচ্চ স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া !
তিল মাত্র যার কথা করিলে বর্ণন,
তিল মাত্র যার কথা করিলে শ্রবণ,
মানুষ কাঁদিতে থাকে ব্যথিত অন্তর;
সেই বিয়াত্রিচে হারা অভাগা নগর !

"ভিটানুওভা" কাব্যে ইহার পরে আর একটি মাত্র গীতি আছে। তাহাতে কবি কহিতেছেন, তাঁহার মন স্বর্গে গিয়াছিল, সেখানে দেখিলেন বিয়াত্রীচেকে দেবতারা পূজা করিতেছেন। সে বিয়াত্রীচেকে দেখিয়া কবি এমন বিস্মিত হইয়া গেলেন, যে, ভাবিলেন তাঁহাকে বর্ণনা করিতে গেলে এমন গভীর কথার প্রয়োজন হয়, যে সে কথার অর্থ তিনি নিজেই বুঝিতে পারেন না। তাহার পরেই বিয়াত্রীচে সম্বন্ধে যোগ্যতর কবিতা লিখিবেন স্থির করিয়া ভিটানুওভা কাব্য শেষ করিলেন !

বিয়াত্রীচে সম্বন্ধে যোগ্যতর কাব্য "ডিভাইনা কমিডিয়া" (Divina Commedia) "ভিটা নুওভা" লেখা শেষ হইলে তাহার অনেক দিন পরে তাহা লিখিত হয়। এই কাব্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে দান্তের কবিতার বহির্ভুক্ত জীবনের বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়া লই।

দান্তের প্রকৃত নাম দুরান্তে আলিঘিয়ারি (Durante Alighieri)। তাঁহার সময়ে দুই দল ছিল। গুয়েলফ ও ঘিবেলীন (Guelf and Ghibelline) শ্বেত ও কৃষ্ণ, অর্থাৎ কুলীন ও সাধারন অধিবাসী; ইহাদের উভয় দলের মধ্যে প্রায়ই বিপ্লব চলিত, একদল ক্ষমতাশালী হইলে অপর দল নিপীড়িত হইত। দান্তে Guelf অর্থাৎ কুলীন দলভুক্ত ছিলেন। তাঁহার সময়ে গুয়েলফ দলই ক্ষমতাশালী ছিল। ভিটানুওভা কাব্যে দান্তের প্রেমের কাহিনী পড়িলে মনে হয় না, দান্তে বাহিরের কোন বিষয়ে লিপ্ত ছিলেন—মনে হয় তাঁহার চক্ষে সমুদয় জগতের সমষ্টি বিয়াত্রীচে, এ সংসারে আর কিছু নাই কেবল বিয়াত্রীচে, এ সংসারে আর কিছু করিবার নাই—কেবল বিয়াত্রীচের আরাধনা! যখন তিনি বিয়াত্রীচের প্রতি-হাস্যে প্রতি-উপেক্ষায় শিশুর ন্যায় রোদন করিতে ছিলেন, প্রতি ক্ষুদ্র নমস্কারে দরিদ্রের রত্ন পাইতেছিলেন, তখন তিনি রাজ্য-শাসন সম্বন্ধেও দারুণ লিপ্ত ছিলেন। ক্যাম্প্যালডিনো (Campaldino) সমরে তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন, ক্যাপ্রোনার যুদ্ধে তিনি উপস্থিত ছিলেন। গুয়েল্‌ফ দলের মধ্যে যখন আত্মবিবাদ উপস্থিত হয় তখন তিনি বিশেষ উদ্যমের সহিত তাহাদের মধ্যে একদলের সহায়তা করিতেছিলেন। বিয়াত্রীচের মৃত্যুর পর শাসন কার্য্য ভিন্ন তাঁহার অন্য কোন কার্য্য ছিল না। রাজকার্য্যে নগরীর মধ্যে তিনি এক জন বিখ্যাত লোক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি রাজ্যের প্রধান শাসক দল ভুক্ত হইলেন। কিন্তু এই পদে তিনি দুই মাস কাল মাত্র ছিলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যে তাঁহার এত শত্রু হইয়াছিল যে শীঘ্রই

তাঁহাকে ! তাঁহার জন্মভূমি ফ্লোরেন্স নগরী হইতে জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইতে হইল। এই নগরে প্রবেশাধিকার পাইবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে যখন তাঁহার কবিত্বের খ্যাতি চারি দিকে ব্যাপ্ত হইল—তখন ফ্লোরেন্স-বাসীরা তাঁহাকে অনুতপ্ত বেশে দোষ স্বীকার করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। চিরজন্ম নির্ব্বাসনে পরপ্রত্যাশী হইয়া তাঁহাকে কালযাপন করিতে হইয়াছিল। এই রূপে যখন বিয়াত্রীচেকে লইয়া হৃদয়ে তাঁহার ঝটিকা চলিতেছিল, তখন বাহিরের রাজ-বিপ্লব ঝটিকায় তিনি যে উদাসীন ছিলেন তাহা নহে। অনেক দিন রাজ্য সম্বন্ধে মগ্ন থাকিয়া বিয়াত্রীচের উদ্দেশে যোগ্যতর কবিতা লিখিতে পারেন নাই। কিন্তু কোন বিশেষ সময়ে সহসা তাঁহার খ্যাতি মান যশের দুরাশা ছুটিয়া গেল ও মহাকাব্য এই রূপে আরম্ভ করিলেন—

জীবনের মধ্য পথে দেখিনু সহসা
ভ্রমিতেছি ঘোর বনে পথ হারাইয়া—
সে যে কি ভীষণ অতি দারুণ গহন—
স্মৃতি তার ভয়ে মোরে করে অভিভূত!
সে ভয়ের চেয়ে মৃত্যু নহে ভয়ানক!

জীবনের মধ্য পথে, অর্থাৎ যখন তিনি তাঁহার পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে পৌঁছিয়াছেন —তিনি এই কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। ভীষণ অরণ্য আর কিছুই নহে—সে তাঁহার রাজ-শাসন-কার্য্য, খ্যাতি প্রতিপত্তির নিমিত্ত সংগ্রাম। অর্দ্ধ অজ্ঞানের মত হইয়া যখন তিনি এই বনে ভ্রমণ করিতেছেন এমন সময়ে একটি চিতাবাঘ দেখিতে পাইলেন—এবং এই রূপ পর্য্যায় ক্রমে একটি সিংহ ও ক্ষুধাতুরা এক নেকড়িয়া ব্যাঘ্রী দেখিতে পাইলেন। এ সমস্তই রূপক মাত্র, চিতাব্যাঘ্র সুখতৃষা, সিংহ দুরাশা, ও নেকড়িয়া ব্যাঘ্রী লোভ। এই রূপে এই সকল রিপুদিগের দ্বারা ভীত হইয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিতে ছিলেন,

হেন কালে সহসা দেখিনু এক জন
বহুদিন মৌন রহি ক্ষীণ স্বর তাঁর—
"জীবিত বা মৃত আত্মা যে হওনা কেন
দয়াকর মোরে" আমি সমুচ্চে কহিনু
সে অরণ্য মাঝে যবে হেরিনু তাঁহারে!

ইনি আর কেহ নহেন—কবি বর্জ্জিলের প্রেতাত্মা। তিনি দান্তেকে স্বর্গ ও নরক প্রদর্শন করাইতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দান্তে ভয় প্রকাশ করিলেন—

মহাছায়া কহিলেন "মিথ্যা আশঙ্কায়
হৃদয় হোয়েছে তব বৃথা অভিভূত—
পশু যথা ভয় পায় সন্ধ্যার আঁধারে
হেরিয়া অলীক ছায়া,—তেমনি মানুষ
মহান সংকল্প হোতে হয়গো বিরত
বৃথা ভয়ে। এ আশঙ্কা করিবারে দূর—
কহি তোরে কোথা হতে এলেম হেথায়—
প্রথমে কাহার কথা করিয়া শ্রবণ
তোরে দয়া হোল মোর, কহি তোরে তাহা।
পর লোকে থাকে যারা সংশয় আঁধারে—

তাহাদের মধ্যে মোর নিবাস কহিনু।
একদা রমণী এক আহ্বানিলা মোরে—
হেন পূণ্যময় মূর্ত্তি এমন সুন্দরী
দেখেই অমনি তাঁর মাগিনু আদেশ—
অতিশয় মৃদু আর অতি সুকোমল
দেবতার স্বরে সুর বাঁধি, কহিলেন—
"অয়ি উপছায়া! তুমি যাহার সুযশ
যদিন প্রকৃতি রবে, রহিবে বাঁচিয়া—
এই অনুনয় মোর করহ শ্রবণ!—
বন্ধু এক মোর (নহে বন্ধু সম্পদের)
মহারণ্যে নিদারুণ বাধা বিঘ্ন পেয়ে—
ভয়ে অভিভূত হোয়ে পড়েছেন তিনি।
ভয় করি পাছে হন হেন পথহারা
আর তাঁরে একেবারে ফিরাতে না পারি!
উদ্দীপনা-বাক্যে তব,যে কোন উপায়ে,
ফিরাইয়া আন, তবে লভিব বিরাম!
আসিয়াছি স্বর্গ হোতে বিয়াত্রীচে আমি
প্রেম-উত্তেজনে আমি কৈনু অনুরোধ,

বর্জ্জিল সেই বিয়াত্রীচের অনুরোধেই দান্তেকে ভ্রষ্ট-পথ হইতে ফিরাইতে আসিয়াছেন। দান্তে বর্জ্জিলের সহিত নরক-দর্শন করিতে যাইতে আহ্লাদের সহিত সম্মত হইলেন। তৃতীয় স্বর্গে দান্তে নরকের তোরনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তোরণে অস্ফুট অক্ষরে লিখা আছে—

মোর মধ্য দিয়া সবে যাও দুঃখদেশে;
মোর মধ্য দিয়া যাও চির-দুঃখভোগে;—
চিরকাল তরে যারা হোয়েছে পতিত,
মোর মধ্য দিয়া যাও তাহাদের কাছে!
ন্যায়ের আদেশে আমি হয়েছি নির্ম্মিত—
অনন্ত জ্ঞান ও প্রেম স্বর্গীয় ক্ষমতা—
আমারে পোষণ করা কার্য্য তাহাদের!
মোর পূর্ব্বে আর কিছু হয়নি সৃজিত—
অনন্ত-পদার্থ ছাড়া, তাই কহিতেছি
হেথায় অনন্ত কাল দহিতেছি আমি।
"হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এদেশে।"

কবি বর্জ্জিল ভীত দান্তেকে সান্ত্বনা করিয়া এক স্থানে লইয়া গেলেন—সেখানে

দীর্ঘশ্বাস, আর্ত্তনাদ, ক্রন্দন, বিলাপ—
তারকা-অবিদ্ধ শূন্য করিছে ধ্বনিত,
শুনিয়া, প্রবেশি সেথা উঠিনু কাঁদিয়া।
নানাবিধ ভাষা আর ভয়ানক কথা.
যন্ত্রণার আর্ত্তনাদ, ক্রোধের চিৎকার
করতালি,—কঠোর ও ভগ্নকণ্ঠ ধ্বনি—
নিরেট সে আঁধারের চারদিক ঘেরি
ঘূর্ণ-বায়ে রেণু সম ফিরিছে সতত!

এই রূপে আরম্ভ করিয়া কাব্যের প্রথম খণ্ড, অর্থাৎ ইনফর্ণো, অর্থাৎ নরক—ক্রমাগত নরকের বর্ণনা; পরে পর্গেটরী—অর্থাৎ যাহাদের পরিত্রাণ পাইবার আশা আছে তাহাদের বাসভূমি—পরে স্বর্গ। ক্রমাগত একই পদার্থের বর্ণনার বিবরণ পাঠক দিগের নিদ্রাকর্ষক হইবে, এই নিমিত্ত তাহা হইতে বিরত হইলাম। পর্গেটরী কাব্যের শেষ ভাগে বিয়াত্রীচের সহিত কবির সাক্ষাৎ হইল।—বর্জ্জিল ও দান্তে উভয়েই বিস্ময়ে দেখিলেন একটি আশ্চর্য্য রথে বিয়াত্রীচে আসিতেছেন। সুরবালারা তাঁহার চারিদিকে এমন পুষ্প-বৃষ্টি করিতেছেন যে তাঁহার আকার অতি অস্ফুট ভাবে দেখা যাইতেছে, দান্তে সে পুষ্পরাশির মধ্যে তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিতে পান নাই, চিনিতেও পারেন

নাই—তিনি কহিতেছেন,

আঁখি মোর দেখে তাঁরে পারেনি চিনিতে,
তবু তাঁর দেহ হোতে এমন একটি
বিকীরিত হতেছিল শুভ্র পুণ্য-জ্যোতি,
তাহার পরশে যেন পুরাতন প্রেম
হৃদয়ে আমার পুন উঠিল জাগিয়া।
সেই পুরাতন স্বপ্ন কত শত দিন
যে স্বপ্নে হৃদয় মোর আছিল মগন—
যখনি উঠিল জাগি স্বর্গীয় কিরণে,
অমনি আকুল হয়ে ফিরিয়া ধাইনু
কবি বর্জ্জিলের পানে, শিশু সে যেমন
ভয় কিম্বা শোক-ভারে হোলে বিচলিত,
অমনি মায়ের বুকে যায় লুকাবারে।
ভাবিনু কাতর স্বরে কহিব তাঁহারে—
"প্রতি রক্তবিন্দু মোর কাঁপিছে শিরায়,
পুরাণ সে অগ্নি পুন উঠেছে জ্বলিয়া।"
হা—বর্জ্জিল কোথা—হোয়েছেন অন্তর্ধান;
প্রিয়তম পিতা তুমি বর্জ্জিল আমার!

দান্তেকে বর্জ্জিলের এই সহসা অন্তর্ধ্যানে ব্যথিত হইয়া কাঁদিতে দেখিয়া বিয়াত্রীচে কহিলেন যে, "দান্তে কাঁদিও না, ইহা অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর ছুরিকা তোমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইবে ও তাহার যন্ত্রণায় তোমাকে কাঁদিতে হইবে।" সুরবালারা পুষ্পবৃষ্টি স্থগিত করিলেন ও পুষ্প-মেঘ-মুক্ত স্বর্গা প্রকাশ পাইলেন। বিয়াত্রীচে সেই উচ্চ রথের উপরি হইতে কহিলেন "চাহিয়া দেখ, আমি বিয়াত্রীচে।" বিয়াত্রীচের সেই "অটল মহিমায়" দান্তে "জননীর সম্মুখে ভীত সন্তানের" ন্যায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। বিয়াত্রীচে তখন তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিলেন, অল্পবয়সে দান্তের হৃদয় ধর্ম্মে ভূষিত ছিল, বিয়াত্রীচে তাঁহার যৌবনময় চক্ষের আলোকে তাঁহাকে সর্ব্বদাই সৎপথে লইয়া যাইতেন। কিন্তু তিনি যখন তাঁহার মর্ত্ত্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর দেহ ধারণ করিলেন, যখন ধূলি-আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া পুণ্য ও সৌন্দর্য্যে অধিকতর ভূষিত হইলেন, তখন তাঁহার প্রতি দান্তের সে ভালবাসা কমিয়া গেল। বিয়াত্রীচের তীব্র ভৎর্সনায় তিনি অতিশয় যন্ত্রণা পাইলেন। পরে অনুতাপ-অশ্রু বর্ষণ করিয়া ও স্বর্গের নদীতে স্নান করিয়া তিনি পাপ-বিমুক্ত হইলেন। তখন তিনি তাঁহার প্রিয়তমা সঙ্গিনীর সহিত স্বর্গ দর্শনে চলিলেন। যখন স্বর্গনরক পরিভ্রমণ করা শেষ হইল, তখন কবি কহিলেন—

জাগি উঠি স্বপ্ন যদি ভুলে যাই সব,
তবু তার ভাব যেমন থাকে মনে মনে,
তেমনি আমারো হোল, স্বপ্ন গেল ছুটে
মাধুরী তবুও তার রহিল হৃদয়ে

প্রশ্নোত্তর।

লেখকের প্রতি জিজ্ঞাসা।

১২৮৫ সালের শ্রাবণ মাসের ভারতীতে "তত্ত্বজ্ঞান কতদূর প্রামাণিক" এই প্রস্তাবের এক স্থলে এই ভাবে বলিয়াছেন যে নিকৃষ্ট পশু জ্ঞান মৃত্যুর পরে অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট

পশু দেহ ধারণ করে ও জ্ঞানের ক্রমিক অভিব্যক্তির জন্য অবশেষে মনুষ্য দেহ পরিগ্রহ করে। এই ক্রমোন্নতি নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্য অথবা মনুষ্যের জ্ঞান উন্নত হইতে উন্নত অবস্থায় নীত হয়। এই স্থলে একটী জটিল প্রশ্ন প্রোথিত রাখিয়াছেন, তাহা পুনর্জন্ম স্বীকার এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য-জন্ম-কৃত জ্ঞানের অভিব্যক্তি অনুযায়ী (সাধারণ কথায় মনুষ্যজন্মকৃত পাপ পুণ্যের অনুযায়ী) মনুষ্যের অবনত বা উন্নত অবস্থা প্রাপ্তি। স্বভাব ক্রমিক উন্নতিশীল,তাহার ভিতর যে পূর্ণ-ভাব বা পূর্ণ জ্ঞান নিহিত আছে অনন্ত কাল ধরিয়া তাহার অভিব্যক্তি হইবে। ইহলোকে থাকিয়া আমার জ্ঞান যত দূর অভিব্যক্ত হইল আমার দেহনাশের পর পরজীবনে সেই জ্ঞানের অভিব্যক্তির জন্য তাহাকে আবার মানব দেহ পরিগ্রহ করিতে হইবে কিনা? একটি বালক জন্মিয়াই মরিয়া গেল কিম্বা পাঁচ মাস বা এক বৎসর পরে মরিল, তাহার জ্ঞানের অভিব্যক্তির জন্য আবার তাহাকে জন্মপরিগ্রহ অর্থাৎ মানব দেহ ধারণ করিতে হইবে কি না? আরো মনে করুন অনেক মানুষ পশু ভাবেই জীবন কাটাইয়া গেল, কেবল দেহে ভিন্ন, নচেৎ পশুর কার্য্যে এবং সেই সকল মনুষ্যের কার্য্যে কোন বিশেষ রহিল না, সেই সকল মনুষ্য মৃত্যুর পরে আবার মনুষ্য হইয়া জন্মিবে কিনা? অনুগ্রহ করিয়া যদি এই বিষয় আপনার ভারতীতে বিবৃত করেন তবে অপর প্রশ্ন উত্থাপন করিতে সাহসী হইব।

উত্তর।

উপরি লিখিত প্রশ্নের মীমাংসা এইরূপ হইতে পারে;—জগৎ সংসার ক্রমাগতই উন্নতি-পথে চলিতেছে সত্য কিন্তু তাহা বলিয়া কোন সময়ে কাহারো যে কিছুমাত্র অবনতি হয় না ইহা তাহার তাৎপর্য্য নহে। "ক্রমাগত উন্নতি-পথে চলিতেছে" ইহার তাৎপর্য্য এই;—উন্নতি-পথের ক হইতে ঙ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ঙ-হইতে গ-পর্য্যন্ত অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে এমন ব্যক্তি অনেক আছে; কিন্তু অবনতির একটা না একটা সীমা আছে, উন্নতির সীমা নাই। হিন্দু জাতির ত এক্ষণে বিলক্ষণই অবনতি হইয়াছে কিন্তু সে কত টুকু? হিন্দু জাতির সহস্র অবনতি হইলেও তাহা আফ্রিকা-বাসী অসভ্য জাতির পার্শ্বস্থানে পৌঁছিবে না ইহা বেদবাক্য। হিন্দু জাতি ক হইতে ঙ পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল এখন নয় ঘ কিংবা গ পর্য্যন্ত অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে কিন্তু খ-য়ে আর ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। মনে কর হিন্দু জাতি আরো কিছুকাল পরে গ হইতে ঞ পর্য্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছে তখন তাহার অবনতি হদ্দ ঝ কিংবা জ পর্য্যন্তই হইতে পারিবে, সে অবনতি তখনকার পক্ষেই অবনতি কিন্তু এখনকার পক্ষে উন্নতি। মনুষ্য যখন একবার স্বাধীনতা গ্রামে পৌঁছিয়াছে তখন সেই গ্রামের মধ্যে তাহার অবনতির সীমাও নির্দ্ধারিত আছে ইহাই সম্ভব; মনুষ্য যখন সুপরিস্ফুট জ্ঞান-রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে তখন তাহার উন্নতি অবনতি তাহার জ্ঞাতসারে হইবে

ইহাই সম্ভব। মনুষ্যের অন্তরতম জ্ঞান স্বভাবতই পৃথিবীর বন্ধন হইতে মুক্ত এ জন্য মনুষ্য আপনাকে স্বাধীন জীব মনে করে; সেই স্বাধীনতাকে যে ব্যক্তি যত পরিস্ফুট করিবে সে তত উন্নতি লাভ করিবে, এবং যে যত তাহা না করিবে সে তত পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে, কিন্তু স্বাধীন জ্ঞান হারাইয়া পূর্ব্বে আমি ছিলাম এখন আমি তাহা জানি না এরূপ ভাব তাহার হইবে ইহা সঙ্গত বোধ হয় না। মনুষ্যের অপার্থিব আত্মা মৃত্যুর পরে লোকান্তর প্রাপ্ত হইবে ইহাই সঙ্গত। মনুষ্যের পার্থিব ভাবের অভ্যন্তরে একটি অপার্থিব ভাব লুক্কায়িত আছে ইহা মনুষ্যের শৈশব কালেও দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুর মুখের হাসা তাহার মনের স্বর্গীয় অমায়িক ভাব ব্যক্ত করে, সে ভাবটি অপার্থিব বলিয়া বোধ হয়। এ জন্য শিশুর মৃত্যু হইলে তাহার পুনর্জ্জন্ম হইবে ইহা আমি বলিতে প্রস্তুত নহি,—তবে ইহাও স্থির করিয়া বলিতে পারি না যে মনুষ্যের পক্ষে পুনর্জ্জন্ম একেবারেই অসম্ভব। অপরিস্ফুট জ্ঞানের পরিস্ফুটতা সাধনের জন্য পৃথিবীতে পুনর্জ্জন্মের প্রয়োজন হয় কি না তাহা স্থির করা আমার সাধ্য নহে। কিন্তু আমার অসাধ্য বলিয়া আমি এরূপ মনে করি না যে, মনুষ্য কোন কালেই ঐ প্রশ্নের একটি স্থির-সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিবে না। ভূতত্ত্ব বিদ্যার ভবিষ্যতে যতই উন্নতি হইবে ততই পার্থিব উন্নতির নিয়ম-প্রণালী আমাদের বোধায়ত্ত হইবে; জন-সমাজ-বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইবে, জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতির নিয়ম-প্রণালী ততই আমাদের বোধায়ত্ত হইবে; জগতের উন্নতি-প্রণালী বিষয়ে মনুষ্য যখন সবিশেষ বিজ্ঞতা লাভ করিবে, তখন সেই প্রণালী অনুসারে মনুষ্যের উন্নতি-প্রকরণ স্থির করিতে পারিবে। আপাততঃ "মনুষ্যের উন্নতি অনন্ত" এই পর্য্যন্তই কেবল নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।

কাল্পনিক এবং বাস্তবিক দুই ভাবের দুই প্রকার লোক।

যে দুই শ্রেণীর লোকের কথা উল্লেখ করিতেছি সে দুয়ের মধ্যে যেমন ভাব-বৈষম্য এমন আর কোথাও দেখা যায় না। এক জন সত্য বা মঙ্গলের অনুশীলনে আপনাকে ভুলিয়া যান—ইনি বাস্তবিক-ভাবের লোক; আর এক জন সত্যেরও আন্দোলন করিয়া থাকেন মঙ্গলেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন কিন্তু আপনাকে কখনই ভুলেন না—ইনি কাল্পনিক-ভাবের লোক। আপনাকে ভোলা না ভোলা কাহাকে বলে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তবে তার্কিক ব্যক্তিগণ তাহা না বুঝিতে পারেন, সুতরাং ইহাঁদের জন্য একটু কষ্ট স্বীকার আবশ্যক। আপনাকে ভোলা ইহার অর্থ এই যে, সত্য মঙ্গল প্রভৃতি মহদ্ভাব সকল সমুদায় জগতের সাধারণ সম্পত্তি—একটি বালুকণা-

তেও সত্য আছে মঙ্গল আছে—যখন সমুদয় জগতের সাধারণ সম্পত্তি তখন তাহা আমাদের আপনা আপনা অপেক্ষা ব্যাপক —অর্থাৎ আমরা প্রতি জনে সত্য এবং মঙ্গলের অন্তর্গত, সত্য এবং মঙ্গল আমাদের অন্তর্গত নহে—শাখা বৃক্ষের অন্তর্গত, বৃক্ষ শাখার অন্তর্গত নহে। সত্যের অভ্যন্তরে যখন আমরা প্রতিজনে বাস করিতেছি, তখন সত্যকে পাইয়া আপনাকে ভুলিতে কোন হানি নাই। একটা কৌটার ভিতর নানা বিধ রত্ন রহিয়াছে, সেই কৌটাটি পাইয়া কি কি রত্ন তাহার মধ্যে আছে তাহা ভুলিলামই বা তাহাতে হানি কি? কিন্তু যদি তাহার মধ্যেকার কোন একটি বিশেষ রত্নের প্রতি আমাদের এত লোভ হয় যে, সেইটির কুহকে পড়িয়া অন্য-গুলিকে ভুলিয়া যাই, তাহা হইলেই ক্ষতির সম্ভাবনা। আমরা প্রতিজনই যখন সত্যের অন্তর্গত তখন সত্যকে পাইলে আপনাকেও সেই সঙ্গে পাওয়া হয়; এ জন্য শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি আপনাকে ছাড়িয়া সত্যের অনুশীলন করিতে আপনার জন্য কিছু মাত্র চিন্তা করেন না; তিনি জানিতেছেন আমি সত্যের অভ্যন্তরে বাস করিতেছি—সত্যকে পাইলে আমি সত্যের মধ্যে আপনাকে না পাইব এমন নয়—আমি আপনাকে শূন্যে বিসর্জ্জন দিতেছি না—তবে আর চিন্তা কি? আপনার বিষয়ে যিনি এই রূপ নিশ্চিন্ত, তিনি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সত্যের অনুশীলন করেন মঙ্গলের অনুষ্ঠান করেন—সত্য এবং মঙ্গলের সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করেন—ইহাকেই বলে সত্যের অনুশীলনে এবং মঙ্গলের অনুষ্ঠানে আপনাকে ভোলা। কাল্পনিক ভাবের ব্যক্তিরা সত্যেরই অনুশীলন করুন আর মঙ্গলেরই অনুষ্ঠান করুন, তাঁহাদের কার্য্য-গুলির মধ্যে বিষবীজ-একটি-যে মাটি চাপা থাকে তাহাই সর্ব্বনাশের মূল; আপাততঃ তাহা এমনি সূক্ষ্ম যে ধরিতে ছুঁইতে পাওয়া যায় না—নাই বলিলেই হয়; কিন্তু কালে তাহা একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া উঠে;—কি? না স্বার্থ।

কাল্পনিক ব্যক্তিরা লক্ষণে ধরা পড়েন। প্রথম লক্ষণ—তাঁহাদের কথা-গুলি এমনি ধরণের যে তদ্দ্বারা তাঁহাদের কার্য্যের পরিচয় যত পাও আর না পাও, গুণের পরিচয় বিলক্ষণই পাইবে। যাঁহারা বাস্তবিক-ভাবের লোক তাঁহারা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই কার্য্যটি বুঝিয়া তাহার নামটিও সেই রূপ দিয়া থাকেন,—কাল্পনিক ভাবের লোকেরা তিল-প্রমাণ কার্য্যের তাল-প্রমাণ নাম দিতে না পারিলে কোন মতেই সুস্থির থাকিতে পারেন না।

দ্বিতীয় লক্ষণ দেশ কাল পাত্র বিবেচনা বর্জ্জিত অসঙ্গত অনুকরণ। সত্য এবং মঙ্গলের এমনি একটি বল আছে যে, তাহা শ্রদ্ধাবান্ মনুষ্যকে অবস্থার উপযুক্ত করিয়া গঠিয়া তুলে। এই দেশের লোককে এই দেশের উপযুক্ত করিয়া গঠিয়া তুলে, এই কালের লোককে এই কালের উপযুক্ত করিয়া গঠিয়া তুলে, ঠিক যেটি চাই সেইটির মতন করিয়া গঠিয়া তুলে। কিন্তু সত্য এবং মঙ্গল যাঁহাদের মনে নয় কেবল

মুখেই; অনুকরণ ভিন্ন তাঁহাদের আর গতি নাই। অমুক দেশে অমুক লোক অমুক কার্য্য করিয়া লোকের মহোপকার সাধন করিয়াছে অতএব আমিও অবিকল সেই রূপ প্রথা অবলম্বন করি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট; এই রূপ ভাবিয়া আর এক জনের আঁচল ধরিয়া চল—অনভিজ্ঞ লোকে এখনি তোমাকে দ্বিতীয় সেই ব্যক্তি মনে করিবে, যদি নিরপেক্ষ সত্য এবং মঙ্গলের হস্ত ধারণ করিয়া চল তাহা হইলে লোকে তোমার মর্ম্ম-গ্রহ করিতেই পারিবে না, কিন্তু ইহাতে একটা কাজ হইবে, উহাতে কেবল আড়ম্বরই সার। বাস্তবিক-ভাবের লোক কি প্রণালীতে কার্য্য করেন তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি,—মনে কর তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে যে, তিনি দেশীয় চাসা লোকদিগের কৃষিপদ্ধতির উন্নতি সাধন করিবেন। প্রথমে চাসাদিগের কার্য্য-প্রণালী শিক্ষা করিতেই হয় ত তাহাঁর দুই বৎসর কাটিয়া যাইবে। চাসাদের মধ্যে ভাল মন্দ আছে, ভাল চাসাদিগের চাসপদ্ধতি কিরূপ তাহা শিক্ষা করিতে হয়-ত তাঁহার আর তিন বৎসর কাটিয়া যাইবে। তাহার পর ভাল কৃষিকার্য্য শিক্ষা যাহাতে সাধারণে প্রচলিত হয় তাহার জন্য উদ্যোগ করিতে আর দুই বৎসর যাইবে। তাহার পর তাঁহার উদ্যোগ সফল হইতে হয় ত এক বৎসর লাগিবে। এইরূপ অনেক বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমে তিনি যদি আমাদের দেশের উৎকৃষ্ট কৃষিপদ্ধতি সাধারণে চালাইতে পারেন, তবে আপনার পরম সৌভাগ্য মনে করেন। তাহার পর তাহা অপেক্ষা কৃষিকার্য্যের আরো উন্নতি সাধনের চেষ্টা তাঁহার পক্ষে শোভা পায়। তাহা তাঁহার অভিপ্রায় হইলে তিনি বিদেশীয় কৃষি-প্রণালী উত্তম রূপে শিক্ষা করেন; স্বদেশীয় কৃষিকার্য্যের কোন্‌টি ভাল, কোন্‌টি মন্দ এদেশের পক্ষে বিদেশীয় কৃষিকার্য্যেরই বা কোন্‌টি ভাল কোন্‌টি মন্দ তাহা তিনি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করেন; এদেশীয় কৃষিকার্য্যের যাহা ভাল তাহা তিনি নড়াইতে চা'ন না, বিদেশীয় কৃষিপ্রণালীর ভাল অংশ এদেশের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ না হইলে তবেই তাহা এদেশে প্রচলিত করিতে চেষ্টা পা'ন। তিনি জানেন পত্তন-ভূমিটি স্বদেশীয় হওয়া চাই। ব্যঞ্জন নয় বিদেশী হউক, অন্নটি স্বদেশী হওয়া চাই। তুমি সহস্র কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও আমাদের দেশীয় মূল কৃষি-প্রণালীর উপর বিদ্যা চালাইতে গিয়াছ কি অমনি ঠকিয়াছ। আমাদের দেশের প্রকৃতি স্বয়ং যাহা চাসাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন তাহার উপর কাহারো বিদ্যা খাটে না। বাস্তবিক-ভাবের ব্যক্তি আপনার দেশীয় প্রকৃতির পত্তন-ভূমির উপর বিদেশীয় উচ্চ অঙ্গের রীতি-নীতি গুলি স্থাপন করিতে চেষ্টা পা'ন, তা' ভিন্ন বিদেশীয় বেশ ভূষা বা কোন প্রকার বাহিরের চাকচিক্য তাঁহার একবার মনেও আইসে না—তাঁহার মন আসলের দিকে, নকলের দিকে নহে,—বাস্তবিক ভাবের দিকে, কাল্পনিক ভাবের দিকে নহে।

কাল্পনিক ভাবের তৃতীয় লক্ষণ নাম-

পরায়ণতা অর্থাৎ কার্য্য অপেক্ষা নামের প্রতি অধিক দৃষ্টি। তাই কাল্পনিক ভাবের লোক উপরি-উক্ত ঐ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে দেব গড়িতে গিয়া নিশ্চয়ই বানর গড়িয়া ফেলেন। বাস্তবিক আমাদের দেশের কৃষি-কার্য্য কিরূপ প্রণালীতে চলে তাহা একটু ধৈর্য্য ধরিয়া শিক্ষা করেন সে দিকে তাঁহার মন যাইবে না; কার্য্যার্থে বৎসর বৎসর পরিশ্রম করিতেছেন, অথচ লোকে তাঁহার কার্য্যের কিছুই দেখিতেছে না জানিতেছে না এ অবস্থা তাঁহার পক্ষে কঠোর কারা-বাস-তুল্য। তাঁহার দুইটি জপ-মালা—মুখে একটি মনে একটি; মুখের জপমালা এই কৃষকদিগের কিসে ভাল হয়,মনের জপ-মালা এই লোকে আমাকে কিসে জানে। সুতরাং একটু রহিয়া বসিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করাকে তিনি বৃথা সময় নষ্ট মনে করেন, কেন না ততক্ষণে তিনি ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড করিয়া তুলিতে পারিতেন; কাজ কতদিনে হয় তাহার ঠিকানা নাই—আদৌবেই হয় কি না তাহাও সন্দেহ, কিন্তু তাহা বলিয়া হাঁক ডাক কেন থামিয়া থাকে,—এইরূপ ভাবিয়া কোথাও কিছু নাই একেবারেই তিনি হয়-ত বিদেশীয় কৃষি-প্রথা এদেশে প্রচলিত করণার্থে ইংলণ্ডগমনে কৃতসংকল্প হ'ন। তিনি অমুক দেশে গিয়াছেন, অমুক স্থানে বাস করিতেছেন, অমুক স্থানে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, যখন যাহা করিতেছেন সকলি সংবাদ-পত্রে টাট্‌কা টাট্‌কা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাহার পর দেশে ফিরিয়া আই-লেন; লোকের আশা-চক্ষু তাঁহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে কবে বৈলাতিক "স্বর্গ রাজ্য" এ দেশের মুখ-শ্রী উজ্জ্বল করিবে। তাঁহার ভাবী মহোপকারী কার্য্য-কলাপ উপলক্ষে সংবাদ-পত্রীয় নানা মুনির নানা ভবিষ্যৎবাণী ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে এবং তাঁহার কার্য্যাভিষন্ধির ছিটাফোঁটা ইঙ্গিত আভাস সাদরে গৃহীত হইয়া ফেনিত প্রতিফেনিত হইতেছে। এইরূপ শব্দাশব্দি ও ফেণাফেনি ব্যাপার যত উচ্চে উঠিবার তাহা উঠিয়া ক্রমে ক্রমে নরম পড়িয়া আ-সিতে লাগিল। সংবাদ-পত্রের উৎসাহ আনন্দ অল্প অল্প করিয়া বিলাপে পরিণত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহার মহত্ব কীর্ত্তন করিয়াছিলেন তাঁহারা লজ্জার অনুরোধে এখন আর তাহার প্রতিবাদ করিতে পারেন না, নিতান্ত মৌন থাকা-টাও ভাল দেখায় না, সুতরাং এখন এক যা বলিবার আছে তাহাই তাঁহারা বলেন ও আক্ষেপ করেন—তাহা এই যে, অমন যে এক জন উপযুক্ত লোক ও-ব্যক্তি শুদ্ধ কেবল বাঙ্গালিদের দোষে কোন কাজই করিতে পারিল না, একজন লোক ওকে সাহায্য দিবে না, একা ও-ব্যক্তি কি করিবে? প্রকৃত কথা এই যে, যাঁহারা কাজের লোক তাঁহারা আপনার কাজের গুণে লোকের নিকট হইতে সাহায্য আকর্ষণ করেন, অন্যেরা যদি তাহা না পারে সে তাহাদেরই দোষ, সে দোষ গরিব বাঙ্গালি জাতির ঘাড়ে চাপাইলে কি হইবে? শূন্য-গর্ভ আড়ম্বরী ব্যক্তিকে কেহ না চিনে এমন

নয় ;—কাজের লোকেরা পূর্ব্ব হইতেই ঠিক দিয়া বসিয়া আছে যে এ-ব্যক্তির দ্বারা কোন কাজ হইবে না ; ভাবের লোকেরা ভাব ভঙ্গী দেখিয়াই বুঝিয়াছে যে যত গর্জ্জে তত বর্ষে না; কেবল গল্পের লোকেরা তাঁহার নিকট-হইতে অনেক অদ্ভুত ব্যাপারের প্রত্যাশা করেন ; "এমন কি ভবিষ্যতে যাহা তিনি করিবেন, বর্ত্তমানেই তাঁহা কর্ত্তৃক তাহার অর্দ্ধেকের উপর অনুষ্ঠিত" হইয়াছে ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পা'ন।

কাল্পনিক ব্যক্তিদিগের নিকট-অনুকরণই সকল রোগের মহৌষধি; সকল উন্নতির মূল, সকল অপেক্ষা প্রধান কর্ত্তব্য।—কেন না অনুকরণের পথ অবলম্বন করিলে বড় লোকের দোহাই দিয়া অনায়াসে বড় হওয়া যায় —সেক্স্পিয়ারের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালি নাটক লিখিলে বাঙ্গালি সেক্স্পিয়র হওয়া যায়! মিল্টনের অনুকরণ করিয়া বাঙ্গালি পদ্য লিখিলে বাঙ্গালি মিল্টন্ হওয়া যায়! আহা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিবার যেমন সহজ উপায় অনুকরণ এমন আর কিছুই নহে! অনুকরণ-পন্থিদিগের স্বপক্ষে এই কেবল এক বলিবার আছে যে, সকল দেশের লোকই সমান;—একথা যথার্থ কথা, কেন না সকল মনুষ্যই মনুষ্য ; কিন্তু তাহা বলিয়া মনুষ্যের মধ্যে বাস্তবিক যে একটা জাতি-ভেদ আছে কাজের সময় তাহা কি উপেক্ষিলে চলে ? জল এবং বায়ু উভয়ে সমান, কেন না উভয়ই ভৌতিক বস্তু ; কিন্তু তাহা বলিয়া কি জলপানের পরিবর্ত্তে বায়ুপানের বিধি দিতে পারা যায়। যে দেশের যে প্রকৃতি সেই প্রকৃতিকে ছাড়িয়া সে দেশের কার্য্য যদি সুনির্ব্বাহ হইতে পারিত, তাহা হইলে আমাদের দেশে ওক গাছ এবং বিলাতে আম্র কাঁটালের গাছ সুবর্দ্ধিত হইতেও পারিত। আমাদের দেশে যদি কখন ওক গাছ জন্মে তবে সে তেমনি ওক গাছ—যেমন সেক্স্পিয়রের বাঙ্গলা অনুবাদ সেক্স্পিয়র গ্রন্থ; তেমনি আবার বিলাতে যদি আম্র গাছ জন্মে তবে সে তেমনি আম্র গাছ—যেমন শকুন্তলার ইংরাজী অনুবাদ শকুন্তলা।

কাল্পনিক ভাবের লোকেরা অন্যের চক্ষে ধূলি দিতে গিয়া আপনার চক্ষে আপনি ধূলি প্রদান করিয়া থাকেন ;—এই তাঁহাদের প্রধান শাস্তি। তিনি আপনাকে বাহিরে যেরূপ জানান, ক্রমে ক্রমে আপনাকে সেই রূপ ঠাহরান। পূর্ব্বে তিনি নাম চাহিতেন, কাজ চাহিতেন না, এক্ষণে তিনি নাম যথেষ্ট পাইয়াছেন,—নামের অনুরূপ কাজ করিতে চাহেন; কিন্তু নামের জন্য কাজ করাই তাঁহার চির কালের অভ্যাস, কাজের জন্য কাজ করা তাঁহার অনভ্যস্ত। যদিও তাঁহার এক্ষণে যথার্থই কাজ করিবার ইচ্ছা কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় না; নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেও তাঁহার কষ্ট বোধ হয়, কেন না এতাবৎ কাল তিনি ক্রমাগতই নাম-সাধনার্থে নানাপ্রকার কাজ করিয়া আসিয়াছেন—এক্ষণে কাজের সে উত্তেজকটি নাই—নাম যতদূর হইবার তাহা হইয়াছে তাহা আর কাজকে অপেক্ষা করে না, সুতরাং এক্ষণে তাঁহার কাজ বন্ধ হইয়া

এক প্রকার নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

বাঙ্গালি জাতি এক্ষণে কাল্পনিকতা-পথের বিষম একটি সঙ্কট স্থানে পৌঁছিয়াছে, সে পথে যত অগ্রসর হইবে ততই ঠেকিয়া ঠেকিয়া তাহাকে পশ্চাদ্গমন করিতে হইবে; এ পথ হইতে যত শীঘ্র পশ্চাদ্গমন করা যায় ততই ভাল। বাস্তবিক ছাড়িয়া কাল্পনিক,আসল ছাড়িয়া নকল, এই দিকে এখন বাঙ্গালি জাতির এমনি একটা টান পড়িয়াছে যে তাহাকে সামলানো ভার; বাঙ্গালি-জাতি দেখিয়া-শিখিবার জাতি নহে, না ঠেকিলে তাহার শিক্ষা কিছুতেই হইবে না—এ একটি সামান্য বিপদ নহে। এই বিষয়টিতে বাঙ্গালি জাতির যদি একটু চেতন হয়, তাহা হইলে এ জাতি অনেক বিঘ্ন বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় কই? তাহা যে-দিন হইবে সে দিন বাঙ্গালির স্কন্ধ হইতে বৃহৎ একটা বোঝা নাবিয়া যাইবে—তাহার শরীর মন লঘু হইবে—প্রকৃতি-জননীর ক্রোড়ে আসিয়া স্নিগ্ধ হইয়া বাঁচিবে,—তখন বুঝিবে দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনা-শূন্য অনুকরণ হনুকরণ নামেরই যোগ্য।

সামুদ্রিকানুমিতি-বিদ্যা।

সামুদ্রিকানুমিতি-বিদ্যা কি? তাহার পরিচয় দিতে হইতেছে। নচেৎ পাঠকবৃন্দ একে আর বুঝিতেও পারেন।

পূর্ব্বে এদেশে এক প্রকার বিদ্যা ছিল, যদ্দ্বারা মনুষ্যের অপ্রত্যক্ষ ধর্ম্ম বা অন্তরের পদার্থ গুলি অনুমান করা যায় বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, তাহাই তৎকালের সামুদ্রিক-বিদ্যা। গায়কেরা গান-কালে মুখভঙ্গী করিলেই লোকে বলে "লোকটার বড় মুদ্রাদোষ!" ইহার দ্বারাই বুঝিয়া দেখ, মুদ্রা শব্দের অর্থ কি? মুদ্রা শব্দের অর্থ দৈহিক ভঙ্গী। প্রত্যেক মনুষ্যের বাহ্য আকার বা মুদ্রাবিশেষ অবলম্বন করিয়া যে বিদ্যা তাহাদের অন্তর্গত অপ্রত্যক্ষ ফলাফল অনুমানে প্রবৃত্ত হইত তাহাই তৎকালের সামুদ্রিক বিদ্যা।

এই বিদ্যার অনেক শাখা-প্রশাখা ছিল। কর চরণাদির রেখা ও অঙ্গবিশেষের সন্নিবেশ-বিশেষ দেখিয়া এক শাখা লোকের ভাগ্য নির্ণয় করিয়া দিত। ইহা এখন দৈবজ্ঞ বা গণকদিগের প্রতারণার প্রধান উপকরণ হইয়া অতি বীভৎস অবস্থায় আছে।

আর এক শাখা মনুষ্যদেহের গঠন-ভঙ্গী অনুসারে আয়ুঃ এবং স্বাভাবিক কার্য্যাদি দেখিয়া লোকের প্রকৃতি অনুমান করাইত। এই প্রকার দেহ হইলে এত পরিমাণ আয়ু, অমুক অঙ্গ অমুক প্রকার হইলে অমুক রোগ হইবার সম্ভাবনা, এই রূপ বর্ণ, এই রূপ স্বর, এই রূপ চাল্ চল্তি, এই রূপ স্বভাব হইলে তাহার প্রকৃতি অমুক প্রকার,—এমন নাক, এমন চোক, এমন চাউনি হইলে তাহার মনোবৃত্তি এই রূপ,—

ইত্যাদি বহু প্রকারের মুদ্রানুমান ইহার অন্তর্গত। পূর্ব্বকালের বৈদ্যেরাই এই শাখা লইয়া প্রভুত্ব করিতেন।

এই বিদ্যার সকল পুস্তক এক্ষণে সুপ্রাপ্য নহে। যাহা পাওয়া যায় তাহা হইতে কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়া মধ্যে মধ্যে পাঠকগণকে উপহার দিব, দেখিবেন, পূর্ব্বকালের লোকের বিশ্বাস ও অনুসন্ধিৎসা প্রভৃতি মানস প্রবৃত্তি সকল কিরূপ ছিল।

এদেশে যখন জ্ঞান-চর্চ্চার স্রোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয় তখনকার একটি বাক্য আছে। "ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, সর্প-দেব-জন বিদ্যা——" [ছান্দোগ্য শ্রুতি] এতদ্বাক্যস্থ জন-বিদ্যাও উল্লিখিত সামুদ্রিক বিদ্যার নামান্তর। মনুষ্যদিগের অবয়ব-সংস্থান বা গঠনভঙ্গী ও বোধক চিহ্ন উপলক্ষ করিয়া তাহাদের ভাবী শুভাশুভ ও মানসিক সদসদ্বৃত্তি অনুমান করানই এই জন-বিদ্যার কার্য্য। সুতরাং জন-বিদ্যা আর সামুদ্রিকানুমিতি-বিদ্যা একই বস্তু। অপিচ, দ্বৈপায়ন-জাতির Physiognomy আর ভারতীয় জাতির সামুদ্রিকানুমিতি প্রায় সমধর্ম্মাক্রান্ত বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই বিদ্যার মূল এই যে—

"ফলকীটানুমানবদপবরকান্তর্নিহিত দীপালোকানুমানবচ্চ"

ফল-কীট—অনেক দেশে আমের ভিতর পোকা হয়। ভিতরে পোকা থাকিলে তাহার বাহ্য লক্ষণ কিরূপ হয় তাহা সকলের জানা থাকিবার সম্ভাবনা নাই। যিনি তাহা না জানেন, তিনিই সেই কীটাম্র কিনিয়া ঠকেন, পরন্তু অভিজ্ঞ আম্র ব্যবসায়ীরা ঠকে না। তাহারা দেখিলেই বুঝিতে পারে যে ইহার ভিতর কীট আছে। ফল-ব্যবসায়ীরা যেমন বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া অন্তরস্থ গুণাগুণ অনুমান করিতে পারে; এই রূপ, লোকচরিত্রজ্ঞ ব্যক্তিরাও মনুষ্যের বহিরাকার দেখিয়া অন্তরস্থ সারাসার অনুমান দ্বারা বুঝিতে পারেন।

অপবরক *। দীপের সচ্ছিদ্র আবরণ পাত্রের নাম অপবরক। তন্মধ্যে নীল, পীত, লোহিত, যে কোন রঙ্গের দীপ নিহিত থাকুক, বহিরাগত প্রভা দেখিয়া বুঝা যায়, ইহার মধ্যে অমুক রঙ্গের দীপ আছে। "দীপধর্ম্মিতয়া লোকৈর্জ্ঞায়তেঽন্তর্গতং মনঃ" মনুষ্যের মন দীপস্বরূপ, আর দেহ তাহার অপবরক স্বরূপ। চোখ, মুখ, কাণ, নাক, ললাট, আর অনন্ত-ছিদ্র ত্বক্‌ দ্বারা নিরন্তর তাহার প্রভা বাহির হইতেছে। অতএব চোক্‌ মুখের ভাবভঙ্গী দেখিয়াও অন্তর্গত মানস-বৃত্তির অনুমান হইতে পারে। এই জন্যই কবি-উক্তি আছে, "আকার-সদৃশী প্রজ্ঞা"।

"আকারোভাবসূচকঃ।"—উল্লিখিত আকার শব্দটি গঠন-ভঙ্গী লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে,পরন্তু গঠন-ভঙ্গী ভিন্ন আর এক প্রকার আকার আছে তাহা ভাব অ-

* পুরাকালে লাঠন ছিল না কিন্তু লাঠনের আকার মৃন্ময় কি ধাতুময় পাত্রের সর্ব্বাঙ্গে ছিদ্র করিয়া বায়ু-প্রবাহ-কালে তাহা ব্যবহার করিত তাহার নাম ছিল অপবরক।

র্থাৎ আগন্তুক অন্তরভিপ্রায়ের অনুমাপক। সুতরাং এই আকারকে আগন্তুক আকার বলা যায়। এতাবতা আগন্তুক আকার ও স্বাভাবিক আকার এই দুই প্রকার আকার এই সামুদ্রিক-বিদ্যার অভিমত। গঠন ভঙ্গীর নাম স্বাভাবিক আকার, আগন্তুক আকার কি তাহা বলা যাইতেছে।

অন্তরে কোন ভাবের উদয় হইলে তন্নিবন্ধন কতক গুলি বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। মুখের সঙ্কোচ, ভ্রাজিষ্ণু আনাশ, মালিন্য, ভ্রুকুঞ্চন, রোমাঞ্চ, দৃষ্টিবৈলক্ষণ্য ইত্যাদি। এই সকল লক্ষণকে আকার বলে, প্রকারও বলে। এতদ্ভিন্ন ইঙ্গিত, ভাবভঙ্গী, আকার-প্রকার, গতিক-গাতিক ইত্যাদি অন্যান্য নামও আছে। এতদ্ভিন্ন মনুষ্যের কার্য্য ও কার্য্যচেষ্টা দেখিয়াও অন্তর অনুমান করা যাইতে পারে, ইহা সামুদ্রিক-বিদ্যা বিশ্বাস করিতেন। তদ্ভিন্ন আর এক পদার্থ আছে, তাহার নাম ভ্রাজিষ্ণুতা। ইহা ক্রিয়াজাত তেজ অথবা দৈহিক কান্তি-বিশেষ। মনুষ্য দান, ধর্ম্ম, অধ্যয়ন প্রভৃতি যে কোন ক্রিয়ায় রত থাকে, তাহা হইতে শরীরে বিশেষতঃ মুখে এক প্রকার তেজ বা কান্তি উৎপন্ন হয়। এই কান্তির দ্বারা মনুষ্য সুখী কি দুঃখী, ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক, ক্রূর কি সরল, সমস্তই অনুমিত হইতে পারে বলিয়া সামুদ্রিকগণের বিশ্বাস ছিল। বস্তুতঃ মনুষ্য ধনী হউন, মানী হউন, জ্ঞানী হউন, ধার্ম্মিক হউন, অধার্ম্মিক হউন, বেশ-পরিবর্ত্তন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকিলেও অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট ধরা পড়িয়া থাকেন। পরীক্ষক মনুষ্যেরা তাঁহার ভ্রাজিষ্ণুতা দেখিয়াই জানিতে পারেন, তিনি সুখী কি দুঃখী, ধার্ম্মিক কি অধার্ম্মিক।

বাক্য ও বাক্য উচ্চারণের স্বর দ্বারাও কখন কখন মন জানা গিয়া থাকে। ফল. এই সকল দ্বারা মনুষ্যের আগন্তুক বা সাময়িক মনোভাব লক্ষ্য হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতি বুঝা যাইতে পারে না। গঠন-ভঙ্গী নামক আকার, আর কার্য্যরুচির দ্বারাই প্রকৃতি অনুমান করা যায়, অন্যান্য লক্ষণ গুলি তাহার সাহায্য করে বটে।

প্রত্যেক মনুষ্যের প্রকৃতি ভিন্ন বলিয়া গঠন-ভঙ্গী ভিন্ন, অথবা গঠন-ভঙ্গী ভিন্ন বলিয়া প্রকৃতি ভিন্ন এই দুই প্রকারই বলা যাইতে পারে। গঠন-ভঙ্গীর সঙ্গে মানব প্রকৃতির যে কি এক অনির্ব্বচনীয় কার্য্য কারণ সম্বন্ধ আছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মনুষ্যের আয়ু ও প্রকৃতি-বোধক সামুদ্রিকাংশ বৈদ্যদিগেরই বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে বৈদ্যের গৃহীত সামুদ্রিকাংশ হইতে সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতি অনুমানের বিষয় ব্যক্ত করিব, পশ্চাৎ অন্যান্য অংশ ক্রমে বিবৃত করিব।

প্রকৃতি।

কিরূপ আকার বিশিষ্ট মনুষ্যের কিরূপ প্রকৃতি তাহা বুঝিতে হইলে প্রকৃতি কি? অগ্রে তাহাই জানিতে হয়। এই জন্যই সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতির লক্ষণ ও তাহার উৎপত্তি-কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

"শুক্রশোণিতসংযোগে যোভবেদ্দোষ উৎকটঃ। প্রকৃতির্জায়তে তেন———।"

যদ্যপি স্বভাব ও প্রকৃতি প্রায় একই কথা, তথাপি ইহার মূলভাব নিশ্চয়ের জন্য শুক্র-শোণিত-সংযোগ হইতে ইহার সূত্র-পাত হয়, সুতরাং স্বভাব ও প্রকৃতির মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, ইহাই দেখাইবার নিমিত্ত সামুদ্রিক শাস্ত্রে প্রকৃতি ও স্বভাব পৃথক নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনুষ্যের স্বভাব অভ্যাস-বলে উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু প্রকৃতি সেরূপ নহে। প্রকৃতি একবারে শুক্র-শোণিত-সংযোগ দশাতেই সঞ্চরিত হয়। উপরোক্ত সংস্কৃত বচনটির অর্থ এইরূপ—

যখন শুক্র শোণিতের সংযোগ হয়,তখন স্ত্রী ও পুরুষের যে দোষটি প্রবল থাকে, সেই দোষই তদুৎপন্ন সন্তানের প্রকৃতি-নির্ম্মাণের কারণ।

সকল রক্তে ও সকল শুক্রে সন্তান হয় না। কিরূপ শুক্র শোণিতের যোগে সন্তান হয় তাহা সুশ্রুত নামক বৈদ্যক গ্রন্থে আছে। ফল, যে আর্ত্তব শোণিতের সন্তান-জনকতা শক্তি আছে তাহার নাম জীবরক্ত। আর যে শুক্রের তাদৃশ সামর্থ্য আছে তাহার নাম বৈজিক শুক্র। এই দুই পদার্থের পরীক্ষা আছে তাহা আনয়ন করা এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হয় বলিয়া পরিত্যক্ত হইল। স্ত্রী পুরুষ যখন মিথুন-ধর্ম্মে আসক্ত হয়, তখন তাহাদের উভয়েরই কোন না কোন দোষ প্রবল হইয়া থাকে। যে দোষের প্রাবল্য অবস্থায় জীবরক্ত ও বীজ শুক্র মিলিত হইবে সেই দোষই সেই মিলিত শুক্র শোণিত স্পর্শ করিবেক। সুতরাং সেই দোষদুষিত শুক্র শোণিত হইতে শরীরাঙ্কুর, তদ্দ্বারা ক্রমে অবয়ব সকল গঠিত হইতে থাকিবে। এইরূপ প্রকৃতির সঙ্গে গঠনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়াই ভবিষ্যতে গঠন দেখিয়া প্রকৃতি অনুমান করা যাইতে পারে। এই জন্যই যাবৎ শরীর তাবৎ প্রকৃতি,এই জন্য লোকে বলিয়া থাকে "টাক্ প্রকৃতি গোদ, তিন মরলে শোধ।"

মানব-প্রকৃতির সংখ্যা।

কত প্রকারের মানব প্রকৃতি আছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। তবে প্রধান প্রধান কার্য্য দেখিয়া কতকগুলি প্রধান প্রধান প্রকৃতি এবং তাহাদের এক একটি শ্রেণী কল্পনা করা যাইতে পারে। পূর্ব্বে যে দোষ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার অর্থ ধাতুর উপাদান। ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাকদশায় সর্ব্বাগ্রে এক প্রকার রস জন্মে। সেই রস হইতে রক্ত, ক্রমে অন্যান্য ধাতু। সুতরাং ভুক্তাহার জনিত রস অন্যান্য ধাতুর উপাদান। বৈদ্যেরা তাহাকে দোষ নামে ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই দোষ ত্রিবিধ। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা। দোষ যদি ত্রিবিধ হইল, তবে তাহার এক একটি বা দুই দুইটি, অথবা তদধিক দোষের প্রাবল্য অনুসারে প্রকৃতিগত সংখ্যা এক প্রকার কল্পনা করা যাইতে পারে। এই আশয়ে উক্ত হইয়াছে—

"দোষৈঃ পৃথক্ দ্বিশশ্চৈব প্রকৃতিঃ সপ্তধা মতা।

পৃথক পৃথক, বা দুই দুই দোষের যোগে প্রকৃতি উৎপন্ন হয় বলিয়া তাহা সপ্ত প্রকার। অর্থাৎ সাত প্রকার প্রকৃতির মনুষ্য আছে। ইহার নাম গণনা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

১। বাত প্রকৃতি।

২। পৈত্ত প্রকৃতি।

৩। শ্লৈষ্মিক প্রকৃতি।

৪। বাতপিত্ত প্রকৃতি।

৫। বাতশ্লেষ্ম প্রকৃতি।

৬। পিত্তশ্লেষ্ম প্রকৃতি।

৭। বাত পিত্ত শ্লেষ্ম প্রকৃতি।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্যের ভিন্ন ভিন্ন আকার ও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব হইয়া থাকে বিচক্ষণ বৈদ্যেরা আকার প্রকার ও স্বভাবাদি পর্য্যালোচনা করিয়া প্রকৃতি নির্ণয় করতঃ চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কিরূপ ঔষধ কিরূপ দেহের বিশেষ উপকারী হইবে তাহা তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারিলেই বুঝিতে পারেন। আমরাও বাহ্য আকার ও বাহ্য চেষ্টা দেখিয়া বুঝিতে পারি যে এ ব্যক্তির অন্তর-চেষ্টা এইরূপ। যে হেতু ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বাহ্য আকার আন্তরিক চেষ্টা পরস্পর বিভিন্ন। এক্ষণে প্রত্যেক প্রকৃতির মনুষ্যের আকার প্রকার ও মানসিক প্রবৃত্তি প্রভৃতির কথা বলা যাইতেছে।

বায়ু-প্রকৃতি।

"জাগরূকঃ শিতদ্বেষী দুর্ভগঃ স্তেনো মৎসর্য্যনার্য্যো গান্ধর্ব্বচিত্তঃ স্ফুটিতকরচরণোতিরুক্ষ শ্মশ্রুনখকেশঃ ক্রোধী নখদন্তখাদী চ ভবতি।

অত্র শ্লোকঃ।

অধৃতিরদৃঢ়সৌহৃদঃ কৃতঘ্নঃ কৃশপরুষোধমনীততঃ প্রলাপী।

দ্রুতগতিরটনোঽনবস্থিতাত্মা বিয়দপি গচ্ছতি সম্ভ্রমেণ সুপ্তঃ॥

অব্যবস্থিতমতিশ্চঞ্চলদৃষ্টির্মন্দরত্নধনসঞ্চয়মিত্রঃ।

কিঞ্চিদেব বিলপত্যনিবদ্ধং মারুতপ্রকৃতিরেষ মনুষ্যঃ॥'

বাহ্য আকার——হাত পা ফাটা ও রুক্ষ অর্থাৎ খস্ খসে; দাড়ি গোঁপ চুল ও নখ রুক্ষ অর্থাৎ অস্নিগ্ধ, কৃশ অথচ কর্কশাঙ্গ শিরা-জড়িত অর্থাৎ হাত পা প্রভৃতিতে বড় বড় শিরা দৃষ্ট হয়,—চক্ষু ছোট,—দৃষ্টি চঞ্চল অর্থাৎ মিটমিটে বা উল্‌ক ফুলকো চাউনি,—এবম্প্রকারেব মনুষ্য বায়ুপ্রকৃতি। এই প্রকৃতির মনুষ্যেরা নিম্ন-লিখিত স্বভাবাপন্ন হয়।

রাত্রি জাগিতে পটু, ঠাণ্ডা ভাল বাসে না,—কথায় কথায় ক্রোধ হয়,—নখ কামড়ায়,—দাঁতে দাঁত কামড়ায়,—সকল কার্য্যেই অধৈর্য্য,—ধীরে ধীরে হাঁট্‌তে পারে না,—অকারণে দ্রুত গমন করে,—এক স্থানে অনেক ক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না, ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে, শরীর সুব্যবস্থায় রাখিতে পারে না,—(অর্থাৎ হয় হাত নাচাচ্চে নাহয় পা নাচাচ্চে ইত্যাদি,) অনেক কথা কয়,—বকিতে ভাল বাসে, অনর্থকও বলে—

মিথ্যাও বলে,—মধ্যে মধ্যে অনাসন্ন কথাও বলে, ধন উত্তম বস্তু ও বন্ধু এসকল দৃঢ় রক্ষা করিতে পারে না।

পূর্ব্বোক্ত আকার ও এই বাহ্য চেষ্টা দেখিয়া এতাদৃশ বায়ু-প্রকৃতি ব্যক্তিদের মানসিক বৃত্তি যে কি রূপ, সামুদ্রিক বিদ্যা বলেন, তাহাও অনুমান করিতে পারে। এই বায়ুপ্রকৃতি মানবের অন্তর্বৃত্তি সকল প্রায় নিম্নলিখিত প্রকার হইয়া থাকে।

যথা—চুরি করিবার ইচ্ছা,—মাৎসর্য্য,—অনার্য্য প্রবৃত্তি,—(এ করিলে কি হয়? উহা কেন? উহা কিছুই নহে ইত্যাদি আকারের মনোভাব),—নৃত্য গীতাদি ভালবাসা,—কৃতঘ্নতা অর্থাৎ অন্যের কৃত উপকার অগ্রাহ্য বা মনে না করা,—অব্যবস্থিতচিত্ত, (অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ)—বিতথাভিনিবেশ অর্থাৎ মনে মনে রাজা হওয়া উজির হওয়া ইত্যাদি। এই বায়ু-প্রকৃতি মনুষ্য চঞ্চল, কৃতঘ্ন, মিথ্যাবাদী, বহুভাষী, অটনশীল হয়। ইহারা স্বপ্নেও স্থির থাকিতে পারে না। ইহারা ঘুমাইয়া প্রায় আকাশে ভ্রমণ করে। এতদ্ভিন্ন আরও কতকগুলি স্বভাব দৃষ্ট হয়, তাহা—

"বাতিকাশ্চাজগোমায়ুশশাখূষ্ট্রশুনাস্তথা।
মৃগকাকখরাদীনামনূকৈঃ কীর্ত্তিতা নরাঃ॥"

ছাগল, শৃগাল, খরগোস্, ইন্দুর, উট, কুক্কুর মৃগ, কাক ও গর্দ্দভ প্রভৃতির স্বভাবের সমতুল্য।

পিত্ত-প্রকৃতি।

পিত্ত-প্রকৃতির বাহ্য আকার ও স্বভাব যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা প্রকটিত করিতেছি।

"স্বেদনো দুর্গন্ধঃ পীতশিথিলাঙ্গস্তাম্রনখনয়নতালুজিহ্বৌষ্ঠপাণিপাদতলো দুর্ভগোবলীপলিতখালিত্যজুষ্টো বহুভুগুষ্ণদ্বেষী ক্ষিপ্রকোপপ্রসাদো মধ্যমবলোমধ্যমায়ুশ্চ ভবতি।

অত্র শ্লোকঃ।

মেধাবী নিপুণমতির্বিগৃহ্য বক্তা
তেজস্বী সমিতিষু দুর্নিবারবীর্য্যঃ।
সুপ্তঃ সন্ কনকপলাশকর্ণিকারান্
সম্পশ্যেদপি চ হুতাশবিদ্যুদুল্কাঃ॥

"ন ভয়াৎ প্রণমেদনতেষ্বমৃদুঃ প্রণতেষ্বপি সান্ত্বনদানরুচিঃ।
ভবতীহ সদা ব্যথিতাস্যগতিঃ স ভবেদিহ পিত্তকৃতপ্রকৃতিঃ॥"

পিত্তপ্রকৃতি মনুষ্যের বাহ্য লক্ষণ এইরূপ—

সর্ব্বদা ঘর্ম্ম হয়,—শরীরে দুর্গন্ধ—বর্ণ পীত,—অঙ্গ সকল শিথিল—নখ রক্তবর্ণ,—নেত্রক্ষেত্র তালুদেশ জিহ্বা ওষ্ঠ হস্ততল ও পদতল লোহিত বর্ণ,—অল্প বয়সে শরীরের মাংস চর্ম্ম লোল হওয়া ও টাক পড়া কি চুল পক হওয়া,—বহু ভোক্তা, গরম ভাল বাসে না, ঠাণ্ডা ভাল বাসে—শীঘ্রই কোপ হয় আবার শীঘ্রই প্রসন্ন হয়,—মধ্যম পরিমাণের বল,—আয়ুঃও মধ্যম।

এই পিত্ত-প্রকৃতি মনুষ্যের মেধা (স্মরণ শক্তি), বুঝিবার শক্তি, বক্তৃতাশক্তি অধিক। তেজস্বিতা ও সভায় অনিবার্য্যতা গুণ থাকে। স্বপ্নাবস্থায় সুবর্ণ ও সুবর্ণবর্ণ

পত্র পুষ্পাদি এবং বিদ্যুৎ ও উল্কাদি দেখে। ইহারা ভীত হইয়া কাহারও নিকট নত হয় না। যাহারা নত না হয় তাহাদের প্রতি পিত্ত-প্রকৃতির লোকেরা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ; পরন্তু যাহারা নত তাহাদিগকে সান্ত্বনা ও দান করিতে ইচ্ছুক।

এইরূপ স্বভাব ও বাহ্য লক্ষণ দেখিলে সে ব্যক্তিকে পিত্ত-প্রকৃতি বলিয়া জান। এবং তাহাদের নিম্ন-লিখিত প্রকারের সাধারণ মানস বৃত্তি আছে বলিয়া অবধারণ কর। যথা——

প্রভুত্ব ইচ্ছা, দানেচ্ছা,—পরোপকারেচ্ছা সুন্দরী স্ত্রী ও সুখ-ভোগেচ্ছা ইত্যাদি।

এই প্রকৃতির মানবেরা নিম্ন-লিখিত প্রাণীর কোন কোন গুণ প্রাপ্ত হয়। যথা—

"ভুজঙ্গোলূকগন্ধর্ব্বযক্ষমার্জারবানরৈঃ।
ব্যাঘ্রর্ক্ষনকুলালূকৈঃ পৈত্তিকাস্তুনরাঃস্মৃতাঃ।

সর্প, উলূক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, মার্জার, বানর, ব্যাঘ্র, ভল্লূক, নকুল (বেজী) প্রভৃতি।

ক্রমশঃ।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ

অন্তিম বাসনা।

অস্তাচলে গেল গো দিনমণি
আইল রজনী
উঠিল শশধর রজত-রুচি।
জীবনের সুখের দিন—হায়
এমনি চলি যায়
রঙ্গ-ভঙ্গ যায় চকিতে ঘুচি॥
ত্বরায় গো ফুরায় খুসি-হাসি—
পোড়া অদৃষ্ট আসি
অন্তিম জবনিকা ফেলিতে বলে।
খেলা-ধুলা সকলি অবসান—
বন্ধুজন-বয়ান
ভাসে গো অবিরাম নয়ন-জলে॥
ভাব এক এমনি—মরি হায়
কি যেন মৃদু বায়—
যাবে চলি' আমার উপর দিয়া।
মনে হ'বে জীবন-যাত্রা মোর
হইয়ে-এ'ল ভোর,
বিশ্রাম করিবারে চাহিবে হিয়া॥

প্রিয় বন্ধু-সকল তোমরা কি
কাঁদিবে পাশে থাকি
গেছি আমি এ দুখ প্রাণে না স'য়ো?
তবে মোর আত্মা যে-আকাশে
'যেথানে থাক্-না সে
কাঁদিবে তোমাদের দোসর হ'য়ো॥
তুমি-ও হে ফেলিও এক বিন্দু
অধিক নহে বন্ধু
একটি-ফোঁটা শুধু নয়ন-লোর।
ফুল তুলি একটি প্রাণ-প্রিয়
মোর মাথায় দিও
সাধ-মিটায়ো চেয়ো শয়নে মোর॥
পীরিতির সোহাগে ঢলঢল্
সে তব অশ্রু-জল
মোরে তা' সঁপি দিতে কর' না লাজ।
ত্রিভুবনে আছয়ে যত মণি
সবার সেরা গণি'
রাখিব করি' তারে মুকুট-সাজ॥

করুণা।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

মহেন্দ্র দেশে আসিয়া অবধি মোহিনীর বড় খোঁজ খপর পাওয়া যায় না। মহেন্দ্র ত তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পায় না,—এক দিন কি অপরাধ করিয়াছিলাম তাহার জন্য কি দুই জনের এজন্মের মত ছাড়াছাড়ি হইবে? সে মনে করিল হয় ত মোহিনী রাগ করিয়াছে—হয়ত মোহিনী তাহাকে ভাল বাসে না। পাঠকেরা শুনিলে বোধ হয় সন্তুষ্ট হইবেন না যে, মহেন্দ্র এখনো মোহিনীকে ভাল বাসে। কিন্তু মহেন্দ্রের সে ভালবাসার পক্ষে যে যুক্তি কত, তাহা শুনিলে কাহারো আর কথা কহিবার যো থাকিবে না। সে বলে মানুষকে ভাল বাসিতে দোষ কি? আমিত মোহিনীকে তেমন ভাল বাসি না, আমি তাহাকে ভগিনীর মত, বন্ধুর মত ভাল বাসি—আমি কখনো তার অধিক তাহাকে ভাল বাসি না—এই কথা এত বিশেষ করিয়া ও এত বার বার বলিত যে তাহাতেই বুঝা যাইত তদপেক্ষাও অধিক ভাল বাসে—সে আপনার মনকে ভ্রান্ত করিতে চেষ্টা করিত, সুতরাং ঐ এক কথা তাহাকে বার বার বিশেষ করিয়া বলিতে হইত, ঐ এক কথা বার বার বলিয়া তাহার মনকে বিশ্বাস করাইতে চাহিত, তাহার মন এক এক বার অল্প অল্প বিশ্বাস করিত। সে বলিত আপনার ভগিনীর মত বন্ধুর মত যদি মোহিনী মাঝে মাঝে আমাদের বাড়িতে আসে তাহাতে দোষ কি? বরং না আসিলেই দোষ।—কেন, মোহিনী ত আর সকলের সঙ্গেই দেখা করিতে পারে, তবে আমার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবে না কেন? যেন সত্য সত্যই আমাদের মধ্যে কোন সমাজ-বিরুদ্ধ ভাব আছে—কিন্তু তাহা ত নাই—নিশ্চয় তাহা নাই—তাহা থাকা অসম্ভব। আমি রজনীকে প্রেমের ভাবে ভাল বাসি—সকলের অপেক্ষা ভাল বাসি—আমি মোহিনীকে কেবল ভগিনীর মত ভাল বাসি। মহেন্দ্র এই রূপে সকল কথা মনের মধ্যে তোলা পাড়া করিত। এমন কি, রজনীকেও তাহার এই সকল যুক্তি বুঝাইয়াছিল, রজনীর বুঝিতে কিছুই গোল বাধে নাই, সে বেশ স্পষ্টই বুঝিয়াছিল। সে নিজে গিয়া মোহিনীকে ঐ সমস্ত কথা বুঝাইল, মোহিনী বিশেষ কিছুই উত্তর দিল না। মনে মনে কহিল "সকলের মন জানি না, কিন্তু আমার নিজের মনের উপর আমার বিশ্বাস নাই।" মোহিনী ভাবিল, আর না, আর এখানে থাকা শ্রেয় নহে। মোহিনী কাশী যাইবার সমস্ত বন্দোবস্ত করিল, বাড়ির লোকেরা তাহাতে অসম্মত হইল না।

কাশী যাইবার সময় করুণা ও রজনীর সহিত এক বার দেখা করিল। করুণা কহিল "তুমি কাশী যাইতেছ, যদি আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয় তবে তাঁহাকে বলিও আমি ভাল আছি।" করুণা জানিত যে, পণ্ডিত মহাশয় নিশ্চয় তাহার

কুশল সংবাদ পাইবার জন্য আকুল আছেন; করুণা যাহা মনে করিয়াছিল তাহা মিথ্যা নহে। নিধির পীড়াপীড়িতে রেলের গাড়িতে চড়িয়া পণ্ডিত মহাশয়ের এমন অনুতাপ হইয়াছিল যে অনেক বার তিনি চীৎকার করিয়া গাড়ি থামাইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, "গাড়োয়ান" যখন কিছুতেই ব্রাহ্মণের দোহাই মানিল না, তখন তিনি ক্ষান্ত হন। কিন্তু বার বার কাতর স্বরে নিধিকে বলিতে লাগিলেন "কাজটা ভাল হইল না।" দুই চার বার এই রূপ বলিতেই নিধি মহা বিরক্ত হইয়া বিলক্ষণ একটি ধমক দিয়া উঠিল; পণ্ডিত মহাশয় নিধিকে আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না, কিন্তু গাড়ির কোণে বসিয়া এক ডিবা নস্য সমস্ত নিঃশেষ করিয়াছিলেন ও তাঁহার চাদরের এক অংশ অশ্রুজলে সম্পূর্ণ রূপ ভিজাইয়া ফেলিয়াছিলেন। কেবল গাড়িতে-নয়, যেখানে গিয়াছেন নিধিকে বার বার ঐ এক কথা বলিয়া বিরক্ত করিয়াছেন। কাশীতে ফিরিয়া আসিয়া যখন করুণাকে দেখিতে পাইলেন না তখন তাঁহার আর অনুতাপের পরিসীমা রহিল না। নিধিকে ঐ এক কথা বলিয়া এমন বিরক্ত করিয়া তুলিয়া ছিলেন যে সে এক দিন কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সমস্ত উদ্যোগ করিয়াছিল।

মোহিনী কহিল "তোমাদের পণ্ডিত মহাশয়কে ত আমি চিনি না, যদি চিনা শুনা হয়, তবে বলিব।" করুণা একেবারে অবাক্ হইয়া গেল, পণ্ডিত মহাশয়কে চিনে না? সে জানিত পণ্ডিত মহাশয়কে সকলেই চিনে—সে মোহিনীকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিল কোন্ পণ্ডিত মহাশয়ের কথা কহিতেছে, কিন্তু তাহাতেও যখন মোহিনী পণ্ডিত মহাশয়কে চিনিল না তখন করুণা নিরাশ ও অবাক্ হইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে রজনীর কাছে বিদায় লইয়া মোহিনী কাশী চলিয়া গেল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

বর্ষা কাল। দুই তিন দিন ধরিয়া বাদলার বিরাম নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, কলিকাতার রাস্তায় ছাতির অরণ্য পড়িয়া গিয়াছে। সসঙ্কোচ পথিকদের সর্ব্বাঙ্গে কাদা বর্ষণ করিতে করিতে গাড়ি ছুটিতেছে।

মহেন্দ্র নরেন্দ্রের সন্ধানে বাহির হইয়াছেন। বড় রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাইয়া একটি অতি সঙ্কীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুটা একটা খোলার ঘর ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পড়িতেছে ও তাহার দুই প্রৌঢ়া অধিবাসিনী অনেক ক্ষণ ধরিয়া বকাবকি করিয়া অবশেষে চুলাচুলি করিবার বেন্দাবস্ত করিতেছে। ভাঙ্গা হাঁড়ি—পচা ভাত আমের আঁটি ও পৃথিবীর আবর্জ্জনা গলির যেখানে সেখানে রাশীকৃত রহিয়াছে। একটি দুর্গন্ধ পুষ্করিণীর তীরে আস্তাবলরক্ষকের মহিলারা আঁচল ভরিয়া তাঁহাদের আহারের জন্য উদ্ভিজ্জ সঞ্চয় করিতেছেন। হুঁচট খাইতে খাইতে—কখনো বা একহাঁটু কাদায়, কখনো বা এক হাঁটু ঘোলা জলে জুতা ও পেণ্টলুনটাকে পেন্সন দিবার ক-

ল্পনা করিতে করিতে—সর্ব্বাঙ্গে কাদামাথা দুই চারিটা কুকুরের নিকট হইতে অশ্রান্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতে মহেন্দ্র গোবর আচ্ছাদিত একটি অতি মুমূর্ষু বাটিতে গিয়া পৌঁছিলেন। দ্বারে আঘাত করিলেন, জীর্ণ শীর্ণ দ্বার বিরক্ত রোগীর মত মৃদু আর্ত্তনাদ করিতে করিতে খুলিয়া গেল। নরেন্দ্র গৃহে ছিলেন, কিন্তু বৎসর কয়েকের মধ্যে পুলিষের কনষ্টেবল ছাড়া নরেন্দ্রের গৃহে আর কোন অতিথি আসে নাই—এই জন্য দ্বার খুলিবার শব্দ শুনিয়াই নরেন্দ্র অন্তর্ধান করিয়াছেন। দ্বার খুলিয়াই মহেন্দ্র আবর্জ্জনা ও দুর্গন্ধময় এক প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিলেন। সে প্রাঙ্গণের এক পাশে একটা কূপ আছে, সে কূপের কাছে কতকগুলা আমের আঁটি হইতে ছোট ছোট চারা উঠিয়াছে। সে কূপের উপরে একটা পেয়ারা গাছ ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। প্রাঙ্গণ পার হইয়া সঙ্কুচিত মহেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। এমন নিম্ন ও এমন সেঁৎসেঁতে ঘর বুঝি মহেন্দ্র আর কখন দেখে নাই, ঘর হইতে এক প্রকার ভিজা ভাপ্স গন্ধ বাহির হইতেছে। বৃষ্টির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ভগ্ন জানালায় একটা ছিন্ন দরমার আচ্ছাদন রহিয়াছে। সে গৃহের দেয়ালে যে এককালে বালি ছিল, সে পাড়ায় এইরূপ একটা প্রবাদ আছে মাত্র। এক জায়গায় ইঁটের মধ্যে একটি গর্ত্তে খানিকটা তামাক গোঁজা আছে। গৃহসজ্জার মধ্যে একখানি অবিশ্বাসজনক তক্তা (যদি তাহার প্রাণ থাকিত তবে তাহা ব্যবহার করিলে পশুনৃশংসনিবারিণী সভায় অনেক টাকা জরিমানা দিতে হইত) তাহার উপরে মললিপ্ত মসীবর্ণ একখানি মাদুর ও তদুপযুক্ত বালিশ ও সর্ব্বোপরি স্বকার্য্যে অক্ষম দীনহীন একটি মশারি। গৃহে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্র একটি দাসীকে দেখিতে পাইলেন। সে দাসীটি তাঁহাকে দেখিয়াই ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মৃদু ভৎর্সনার স্বরে কহিল, "কেন গো বাবু, মানুষের গায়ের উপর না পড়িলেই কি নয়?" মহেন্দ্র তাহার নিকট হইতে অন্তত দুই হস্ত ব্যবধানে ছিলেন ও তাহার দুর্গন্ধ বস্ত্র ও ভয়জনক মুখশ্রী দেখিয়া আরো দুই হস্ত ব্যবধানে যাইবার সংকল্প করিতেছিলেন—কিন্তু মহেন্দ্রের যে তাহার কাছে যাওয়াই লক্ষ্য ছিল, ইহা কল্পনা করিয়া সে দাসীটি মনে মনে মহা পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। যাহা হউক এই দাসী গিয়া ভীত নরেন্দ্রকে অনেক আশ্বাস দিয়া ডাকিয়া আনিল। নরেন্দ্র মহেন্দ্রকে দেখিয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হইল না, সে যেন তাঁহারি প্রতীক্ষা করিতেছিল। কিন্তু মহেন্দ্র নরেন্দ্রকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল—এমন পরিবর্ত্তন সে আর কাহারো দেখে নাই। অনাবৃত দেহ, অল্পপরিসর জীর্ণ মলিন বস্ত্রে হাঁটু পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত। মুখশ্রী অত্যন্ত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, চক্ষু জ্যোতিহীন, কেশপাশ অপরিচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল, সর্ব্বদাই হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ণ এমন মলিন হইয়া গিয়াছে যে আশ্চর্য্য হইতে হয়—তাহাকে দেখিলেই কেমন এক প্রকার ঘৃণা ও সঙ্কোচ উপস্থিত হয়। নরেন্দ্র

অতি শান্তভাবে মহেন্দ্রকে তাঁহার নিজের ও তাঁহার সংক্রান্ত সমস্ত লোকের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন—কাজ কর্ম্ম কিরূপ চলিতেছে তাহাও খোঁজ লইলেন। মহেন্দ্র নরেন্দ্রের এই অতি শান্ত ভাব দেখিয়া অত্যন্ত অবাক্ হইয়া গিয়াছেন—মহেন্দ্রকে দেখিয়া নরেন্দ্র কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। মহেন্দ্র আর কিছু না বলিয়া নরেন্দ্রের চিঠিটি তাহার হস্তে দিল, সে অবিচলিত ভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল "হাঁ মশায়—সম্প্রতি অবস্থা মন্দ হওয়াতে কিছু দেনা হইয়াছে, তাই বড় জড়াইয়া পড়িয়াছি।" মহেন্দ্র কহিলেন—'তা আপনার স্ত্রীর নিকট সাহায্য চাহিবার অর্থ কি? উপার্জ্জনের ভার ত আপনার হাতে। আর তিনি অর্থ পাইবেন কোথা?' নির্লজ্জ নরেন্দ্র কহিল—"সে কি কথা? আমি সন্ধান লইয়াছি, আজ কাল সে খুব উপার্জ্জন করিতেছে! দিন কতক স্বরূপ বাবু তাহাকে পালন করিয়া ছিলেন, শুনিলাম আজ কাল আর কোন বাবুর আশ্রয়ে আছে।" মহেন্দ্র ইচ্ছা পূর্ব্বক কথাটার মন্দ অর্থ না লইয়া কিঞ্চিৎ দৃঢ় স্বরে কহিলেন, "আপনি জানেন তিনি আমার বাটিতেই আছেন। নরেন্দ্র কহিলেন, "আপনারই বাটিতে? সেত ভালই।" মহেন্দ্র কহিলেন—"কিন্তু তাঁহার কাছে অর্থ থাকিবার ত কোন সম্ভাবনা নাই।" নরেন্দ্র কহিলেন "তা যদি হয় তবে আমার চিঠির উত্তরে সে কথা লিখিয়া দিলেই হইত।" মহেন্দ্র যেরূপ ভাল মানুষ, অধিক গোলযোগ করা তাহার কর্ম্ম নয়—বকাবকি করিতে আরম্ভ করিলে তাহার আর অন্ত হইবে না জানিয়া মহেন্দ্র প্রস্তাব করিলেন, নরেন্দ্র যদি তাঁহার কুঅভ্যাস গুলি পরিত্যাগ করেন তবে তিনি তাঁহার সাহায্য করিবেন। নরেন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল, কহিল, 'কুঅভ্যাস কি মশায়? নূতন কুঅভ্যাস ত আমার কিছুই হয় নাই, আমার যা' অভ্যাস আছে সেত আপনি সমস্ত জানেন।" এই কথায় ভালমানুষ মহেন্দ্র কিছু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল, সে তেমন ভাল উত্তর দিতে পারিল না। নরেন্দ্র পূর্ব্বে এত কথা কহিতে জানিত না, বিশেষ মহেন্দ্রের কাছে কেমন একটু সঙ্কোচ অনুভব করিত, সম্প্রতি দেখিতেছি সে ভারি কথা কাটাকাটি করিতে শিখিয়াছে। তাহার স্বভাব আশ্চর্য্য বদল হইয়া গিয়াছে! মহেন্দ্র শীঘ্র শীঘ্র তাহার সহিত মীমাংসা করিয়া লইয়া তাহাকে টাকা দিলেন; ও কহিলেন, ভবিষ্যতে নরেন্দ্র যেন তাঁহার স্ত্রীকে অন্যায় ভয় দেখাইয়া চিঠি না লেখেন। মহেন্দ্র সেই আর্দ্র বাষ্পময় ঘর হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলেন, ও পথের মধ্যে একটা ডাক্তারখানা হইতে এক শিশি কুইনাইন কিনিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। দ্বারের নিকট দাসীটি বসিয়া ছিল, সে মহেন্দ্রকে দেখিয়া অতি মধুর দুই তিনটি হাসা ও কটাক্ষ বর্ষণ করিল, ও মনে মনে ঠিক দিয়া রাখিল, সেই কটাক্ষের প্রভাবে মলয়-সমীরণে, চন্দ্র-কিরণে মহেন্দ্র বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ কাল রজনী ভারি গিন্নি হইয়াছে। এখন তাহার হাতে টাকা কড়ি আসে। পাড়ার অধিকাংশ বৃদ্ধা ও প্রৌঢ়া গৃহিনীরা রজনীর শাশুড়ির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া শিং ভাঙ্গিয়া রজনীর দলে মিশিয়াছেন। তাঁহারা ঘণ্টাখানেক ধরিয়া রজনীর কাছে দেশের লোকের নিন্দা করিয়া,উঠিয়া যাইবার সময় হাই তুলিতে তুলিতে পুনশ্চ নিবেদনের মধ্যে আবশ্যক মত টাকাটা শিকিটা ধার করিয়া লইতেন এবং রজনীর স্বামীর, রজনীর উচ্চবংশের, ও চোখের জলমুছিতে মুছিতে রজনীর মৃত লক্ষ্মীস্বভাবা মাতার প্রশংসা করিয়া শীঘ্র সে ধার গুলি শুধিতে না হয়—এমন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেন। কিন্তু এই পিসি-মাসী-শ্রেণীর মধ্যে করুণার দুর্নাম আর ঘুচিল না, ঘুচিবে কিরূপে বল? মাসী যখন সন্তোষজনক রূপে ভূমিকাটি শেষ করিয়া রজনীর কাছে কাজের কথা পাড়িবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে হয়ত করুণা কোথা হইতে তাড়া তাড়ি আসিয়া রজনীকে টানিয়া লইয়া বাগানে চলিল। মাঝে মাঝে তাঁহারা করুণার ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন "তুমি কেমন ধারা গা?" সে যে কেমন ধারা, করুণা তাহার কোন হিসাব দিতে চেষ্টা করিত না। কোন পিসির বিশেষ কথা, বিশেষ অঙ্গভঙ্গী বা বিশেষ মুখশ্রী দেখিলে এক এক সময় তাহার এমন হাসি পাইত যে সে, সামলাইয়া উঠা দায় হইত, সে রজনীর গলা ধরিয়া মহা হাসির কল্লোল তুলিত, রজনী শুদ্ধ বিব্রত হইয়া উঠিত। তাহা ছাড়া রজনীর গিন্নিপনা দেখিয়া সে এক এক সময়ে হাসিয়া আর বাঁচিত না!

কিছু দিন হইতে মহেন্দ্র দেখিতেছেন, বাড়িটা যেন শান্ত হইয়াছে-করুণার আমোদ আহ্লাদ থামিয়াছে। কিন্তু সে শান্তি প্রার্থনীয় নহে—হাস্যময়ী বালিকা হাসিয়া খেলিয়া বাড়ির সর্ব্বত্র যেন উৎসবময় করিয়া রাখিত, সে এক দিনের জন্য নীরব হইলে বাড়িটা যেন শূন্য শূন্য ঠেকিত, কি যেন অভাব বোধ হইত। কয় দিন হইতে করুণা এমন বিষণ্ন হইয়া গিয়াছিল, সে এক জায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত, কাঁদিত. কিছুতেই প্রবোধ মানিত না। করুণা যখন এই রূপ বিষণ্ন হইয়া থাকে, তখন রজনীর বড় কষ্ট হয়—সে বালিকার হাসি আহ্লাদ না দেখিতে পাইলে সমস্ত দিন তাহার কেমন কোন কাজই হয় না। নরেন্দ্রের বাড়ি যাইবে বলিয়া করুণা মহেন্দ্রকে ভারি ধরিয়া পড়িয়াছে। মহেন্দ্র বলিল—সে বাড়ি অনেক দূরে; করুণা বলিল, তাহোক্! মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়ি বড় খারাপ; করুণা কহিল, তা হোক্! মহেন্দ্র কহিল, সে বাড়িতে থাকিবার জায়গা নাই; করুণা উত্তর দিল তাহোক্। সকল আপত্তির বিরুদ্ধে এই "তাহোক্" শুনিয়া মহেন্দ্র ভাবিলেন, নরেন্দ্রকে একটি ভাল বাড়িতে আনাইবেন ও সেই খানে করুণাকে লইয়া যাইবেন। নরেন্দ্রের সন্ধানে চলিলেন। বাড়ি ভাড়া দিবার সময় হইয়াছে বলিয়াই হউক

বা মহেন্দ্র তাঁহার বাড়ির ঠিকানা জানিতে পারিয়াছে বলিয়াই হউক্—নরেন্দ্র সে বাড়ি হইতে উঠিয়া গিয়াছেন। মহেন্দ্র তাঁহার বৃথা অন্বেষণ করিলেন, পাইলেন না। এই বার্ত্তা শুনিয়া অবধি করুণার আর হাসি নাই, বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ সময়ে সহসা এক একটা কথা শুনিলে যেমন বুকে আঘাত লাগে, করুণার তেমনি আঘাত লাগিয়াছে। কেন, এত দিনেও কি করুণার সহিয়া যায় নাই ? নরেন্দ্র করুণার উপর কত শত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছে, আর আজ তাহার এক স্থানান্তর সংবাদ পাইয়াই কি তাহার এত লাগিল ? কে জানে, করুণার বড় লাগিয়াছে। বোধ হয় ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া হইয়া তাহার হৃদয় কেমন জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আজ এই একটি সামান্য আঘাতেই ভাঙ্গিয়া পড়িল। বোধ হয় এবার বেচারী করুণা বড়ই আশা করিয়াছিল, যে, বুঝি নরেন্দ্রের সহিত আবার দেখা সাক্ষাৎ হইবে, তাহাতে নিরাশ হইয়া সে পৃথিবীর সমুদয় বিষয়ে নিরাশ হইয়াছে, হয়ত এই এক নিরাশা হইতেই তাহার বিশ্বাস হইয়াছে, তাহার আর কিছুতেই সুখ হইবে না! করুণার মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল—যে ভাবনা করুণার মত বালিকার মনে আসা প্রায় অসম্ভব, সেই মরণের ভাবনা তাহার মনে হইল। তাহার মনে হইল এসংসারে সে কেমন শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে আর পারিয়া উঠে না, এখন তাহার মরণ হইলে বাঁচে। এখন আর অধিক লোক জন তাহার কাছে আসিলে তাহার কেমন কষ্ট হয়—সে মনে করে আমাকে এই খানে একলা রাখিয়া দিক, আপনার মনে একলা পড়িয়া থাকিয়া মরি —সে, সকল লোকের নানা জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়া উঠিতে আর পারে না, সে সকল বিষয়েই কেমন বিরক্ত, উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। রজনী বেচারী কত কাঁদিয়া তাহাকে কত সাধা সাধনা করিয়াছে ; কিন্তু এই আহত লতাটি জন্মের মত ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে, বর্ষার সলিল-সেকে, বসন্তের বায়ুবীজনে আর সে মাথা তুলিতে পারিবে না!

কিন্তু একি সংবাদ ? মহেন্দ্র নরেন্দ্রর সন্ধান আবার পাইয়াছে শুনিতেছি! মহেন্দ্র করুণা ও নরেন্দ্রের জন্য একটি ভাল বাড়ি ভাড়া করিয়াছে। নরেন্দ্র মহেন্দ্রের ব্যয়ে সে বাড়িতে বাস করিতে সহজেই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু এক বার মন ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাতে আর স্ফূর্ত্তি হওয়া সহজ নহে—করুণা এই সংবাদ শুনিল, কিন্তু তাহার অবসন্ন মন আর তেমন জাগিয়া উঠিল না। করুণা মহেন্দ্রদের বাড়ি হইতে বিদায় হইল —যাইবার দিন রজনী করুণার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কতই কাঁদিতে লাগিল, করুণা চলিয়া গেলে সে বাড়ি যেমন কেমন শূন্য শূন্য হইয়া গেল। সেই যে করুণা গেল, আর সে ফিরিল না, সে বাড়িতে সেই অবধি করুণার সেই সুমধুর হাসির ধ্বনি এক দিনের জন্যও আর শুনা গেল না!

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পীড়িত অবস্থায় করুণা নরেন্দ্রের নিকট আসিল। মহেন্দ্র প্রায় মাঝে মাঝে করুণাকে দেখিতে আসিতেন; করুণা কখনো খারাপ থাকিত, কখনো ভাল থাকিত, এমনি করিয়া দিন চলিয়া যাইতেছে। নরেন্দ্র করুণাকে মনে মনে ঘৃণা করিত, কেবল মহেন্দ্রের ভয়ে এখনো তাহার উপর কোন অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু নরেন্দ্র প্রায় বাড়িতে থাকিত না—দুই এক দিন বাদে যে অবস্থায় বাড়িতে আসিত, তখন করুণার কাছে না আসিলেই ভাল হইত। তাহার অবর্ত্তমানে পীড়িতা করুণাকে দেখিবার কেহ লোক নাই! কেবল সেই দাসীটি মাঝে মাঝে আসিয়া বিরক্তির স্বরে কহিত, "তোমার কি ব্যামো কিছুতেই সার্‌বে না গা? কি যন্ত্রণা!"

নরেন্দ্রের উপর এই দাসীটির মহা আধিপত্য ছিল; নরেন্দ্র যখন মাঝে মাঝে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইত, তখন ইহার যত ঈর্ষা হইত, এত আর কাহারো নয়। এমন কি নরেন্দ্র বাড়ি ফিরিয়া আসিলে তাহাকে মাঝে মাঝে ঝাঁটাইতে ক্রুটি করিত না, মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর ইহার অভিমানই বা দেখে কে? করুণার উপরেও ইহার ভারি আক্রোশ ছিল, করুণাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া জ্বালাতন করিয়া মারিত। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের সহিত ইহার মহা মারামারি বাধিয়া যাইত—দুজনেই দুজনের উপর গালাগালি ও কিল চাপড় বর্ষণ করিয়া কুরুক্ষেত্র বাধাইয়া দিত। কিন্তু এইরূপ জনশ্রুতি আছে, নরেন্দ্র তাঁহার বিপদের দিনে ইহার সাহায্যে দিন যাপন করিতেন।

নরেন্দ্রের ব্যবহার ক্রমেই স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। যখন তখন আসিয়া মাতলামী করিত, সেই দাসীটার সহিত ভারি ঝগড়া বাধাইয়া দিত। করুণা এই সমস্তই দেখিতে পাইত, কিন্তু তাহার কেমন এক প্রকারের ভাব হইয়াছে, সে মনে করে, যাহা হইতেছে,. হউক, যাহা যাইতেছে চলিয়া যাক! দাসীটা মাঝে মাঝে নরেন্দ্রের উপর রাগিয়া করুণার নিকট গর্‌গর্‌ করিয়া মুখ নাড়িয়া যাইত, করুণা চুপ করিয়া থাকিত, কিছুই উত্তর দিত না! নরেন্দ্র আবশ্যক মত গৃহ-সজ্জা বিক্রয় করিতে লাগিল। অবশেষে তাহাতেও কিছু হইল না—অর্থ সাহায্য চাহিয়া মহেন্দ্রকে একখানা চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল। করুণা বেচারী কোথায় একটু নিশ্চিন্ত হইতে চায়, কোথায় সে মনে করিতেছে, যে যে যাহা করে করুক্‌ আমাকে একটু একেলা থাকিতে দিক্‌; না; তাহাকে লইয়াই এই সমস্ত হাঙ্গাম! সে কি করে, মাঝে মাঝে লিখিয়া দিত। কিন্তু বারবার এমন কি করিয়া লিখিবে? মহেন্দ্রের নিকট হইতে বারবার অর্থ চাহিতে তাহার কেমন কষ্ট হইত, তদ্ভিন্ন সে জানিত অর্থ পাইলেই নরেন্দ্র তাহা কুকর্ম্মে ব্যয় করিবে মাত্র।

একদিন সন্ধ্যার সময় নরেন্দ্র আসিয়া মহেন্দ্রকে চিঠি লিখিবার জন্য করুণাকে

পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "পায়ে পড়ি, আমাকে আর চিঠি লিখিতে বলিও না।" সেই সময় সেই দাসীটি আসিয়া পড়িল—সেও নরেন্দ্রের সঙ্গে যোগ দিল—কহিল "তুমি অমন একগুঁয়ে মেয়ে কেন গা! টাকা না থাক্‌লে গিলবে কি?" নরেন্দ্র ক্রুদ্ধ ভাবে কহিল "লিখিতেই হইবে! করুণা নরেন্দ্রের পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল 'ক্ষমা কর, আমি লিখিতে পারিব না।' 'লিখিবি না? হতভাগিনী, লিখিবি না?' ক্রোধে রক্ত বর্ণ হইয়া নরেন্দ্র করুণাকে প্রহার করিতে লাগিল। এমন সময় সহসা দ্বার খুলিয়া পণ্ডিত মহাশয় প্রবেশ করিলেন; তিনি তাড়াতাড়ি গিয়া নরেন্দ্রকে ছাড়াইয়া দিলেন, দেখিলেন দুর্ব্বল করুণা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পণ্ডিত মহাশয় নিধির টানা টানিতে গাড়িতে উঠিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন কখনই ভাল ছিল না। তিনি প্রায়ই মাঝে মাঝে মনে করিতেন, তাঁহার স্নেহভাগিনী করুণার দশা কি হইল! এইরূপ অনুতাপে যখন কষ্ট পাইতেছিলেন, এমন সময়ে দৈবক্রমে মোহিনীর সহিত সত্য সত্যই তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, তাহার নিকট করুণার সমস্ত সংবাদ পাইয়া আর থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি কলিকাতায় আসিলেন; প্রথমে মহেন্দ্রের কাছে গেলেন, সেখানে নরেন্দ্রের বাড়ির সন্ধান লইলেন, বাড়িতে আসিয়াই নরেন্দ্রের ঐ নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখিতে পাইলেন।

সেই মূর্চ্ছার পর হইতে করুণার বারবার মূর্চ্ছা হইতে লাগিল। পণ্ডিত মহাশয় মহা অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি যে কি করিবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। এই সময়ে তিনি নিধির অভাব অত্যন্ত অনুভব করিতে লাগিলেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মহেন্দ্রকে ডাকিতে গেলেন। মহেন্দ্র ও রজনী উভয়েই আসিল। মহেন্দ্র যথাসাধ্য চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। করুণা মাঝে মাঝে রজনীর হাত ধরিয়া অতি ক্ষীণ স্বরে কথা কহিত, পণ্ডিত মহাশয় যখন অনুতপ্ত হৃদয়ে করুণার নিকট আপনাকে ধিক্কার দিতেন, যখন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন "মা, আমি তোকে অনেক কষ্ট দিয়াছি," তখন করুণা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে অতি ধীর স্বরে তাঁহাকে বারণ করিত। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, নরেন্দ্রকে ডাকিয়া দিবে, সে কহিত "কাজ নাই।" সে জানিত নরেন্দ্র কেবল বিরক্ত হইবে মাত্র!

আজ রাত্রে করুণার পীড়া বড় বাড়িয়াছে। শীয়রে বসিয়া রজনী কাঁদিতেছে। আর পণ্ডিত মহাশয় কিছুতেই ঘরের মধ্যে স্থির থাকিতে না পারিয়া বাহিরে গিয়া শিশুর ন্যায় অধীর উচ্ছ্বাসে কাঁদিতেছেন। নরেন্দ্র গৃহে নাই। আজ করুণা একবার নরেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিবার জন্য মহেন্দ্রকে অনুরোধ করিল। নরেন্দ্র যখন গৃহে আসিলেন, তাঁহার চক্ষু লাল—মুখ ফুলিয়াছে

কেশ ও বস্ত্র বিশৃঙ্খল। হতবুদ্ধি প্রায় নরেন্দ্রকে করুণার শয্যার পার্শ্বে সকলে বসাইয়া দিল। করুণা কম্পিত হস্তে নরেন্দ্রের হাত ধরিল, কিন্তু কিছু কহিল না।

কবিতা-পুস্তক।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

সকল পুস্তকের উদ্দেশ্যই হয় জ্ঞান না হয় আমোদ না হয় উভয়ের সম্মিশ্র। এখানে আমোদ শব্দটি আমরা অতি প্রশস্তভাবে ব্যবহার করিতেছি। ডিকুইন্সি বলেন যে উচ্চ অঙ্গের কাব্য বা নাটক পড়িয়া আমরা আমোদ পাই—এ কথা বলিতে গেলে সে সকল কাব্য বা নাটকের অবমাননা করা হয়; তিনি বলেন আমাদের হৃদয়ের নিভৃত বিজনে অনেক মহান্ ভাব এমন সুষুপ্ত ভাবে অবস্থান করে যে প্রাত্যহিক জীবনের কোন ঘটনাই তাহাদিগকে জাগাইয়া দিতে পারে না,—কিন্তু প্রকৃত কবিদের কাব্য পাঠ করিতে করিতে সেই সকল ভাব জাগরিত হইয়া উঠে এবং আমরা এই দীন হীন ক্ষুদ্র জীব হইতে যে প্রকৃত পক্ষে কত দূর উচ্চপদবীগত তাহার প্রতি তখন আমাদের চেতন হয়। এস্থলে সেই সকল কাব্য গুলিকে আমোদ বা জ্ঞানপ্রদ বলা অপেক্ষা শক্তিপ্রদ বলা উচিত। কিন্তু ডিকুইন্সীর উত্তরে আমরা বলি যে ঐ শক্তিপ্রদ গুণটি উচ্চ-অঙ্গের জ্ঞান ও আমোদের সমষ্টি বলিলে কোন দোষ হয় না। এ বিষয়ে তর্ক না তুলিয়া আমরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম যে সকল পুস্তকের উদ্দেশ্যই প্রশস্ত ভাবে জ্ঞান কিম্বা আমোদ কিম্বা উভয়ের সমষ্টি। এই সিদ্ধান্তটি মনে রাখিলে অনেক পুস্তকের সমালোচনা সহজ হইয়া পড়ে।—এই সিদ্ধান্তটির উপর দৃষ্টি রাখিয়াই আমরা বলিতে বাধ্য হইলাম যে বঙ্কিম বাবুর কবিতা-পুস্তক আমাদিগের ভাল লাগিল না—জ্ঞানের কথা এস্থলে উল্লেখ করাই বাহুল্য মাত্র, কিন্তু আমোদ—সাধারণ, সামান্য, অকিঞ্চিৎকর আমোদ পর্য্যন্ত এ পুস্তকের কোন স্থল পাঠ করিয়া আমরা পাইলাম না—বঙ্কিম বাবুর কোন গ্রন্থই যে এরূপ নীরস, নির্জীব, স্বাদ-গন্ধহীন—কিছুই না—হইবে, তাহা আমরা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই।

প্রথম কবিতা পৃথ্বীরাজ-মহিষী সংযুক্তার বিষয়। বিষয়টি অতিশয় উচ্চ ও মহৎ। পৃথ্বীরাজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন—সেই দুঃস্বপ্ন যবন কর্ত্তৃক ভারত বিজয়ের আভাস মাত্র, ক্রমে সেই স্বপ্ন প্রকৃত ঘটনায় পরিণত হইল—ঘোরির মহম্মদ আসিয়া স্থানেশ্বরে হিন্দুরাজকে পরাভব করিলেন, সংযুক্তা নিরুপায় হইয়া চিতারোহণ করিলেন।—এই বিষয়টির উপর যদি এক জন প্রকৃত কবির কল্পনা খেলিতে

পাইত, তাহা হইলে ইহাকে সূর্য্যকিরণ-সংযুক্ত স্ফাটিকের ন্যায় নানা বর্ণে সুরঞ্জিত করিতে পারিত, কিন্তু বঙ্কিম বাবু যেন পরীক্ষা স্থলে "সংযুক্তা কে ছিল"—"স্থানেশ্বরেব যুদ্ধে কি হইল" এবং "সংযুক্তা কি রূপে মরিল"—এই তিনটি প্রশ্নেব উত্তব দিতেছেন। সমস্ত কবিতাটিতে এমন একটি ভাব নাই, এমন একটি কথা নাই, যাহাতে হৃদয় নাচিয়া উঠে, যাহাতে ধমনী দিয়া রক্ত প্রবলতব বেগে প্রবাহিত হয়—যাহাতে আর্য্য গৌরবেব কণামাত্রও কল্পনার চক্ষে বিভাসিত হয়।—অনর্থক শব্দ আড়ম্বরে কবিতাটিব কায়া বৃদ্ধি হইয়াছে—অসঙ্গত-মেদ-স্ফীত রোগীর ন্যায় ইহাব লাবণ্য-শ্রী নাই—জীবনের আভাস মাত্রও আছে কি না সন্দেহ। পৃথীরাজ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সিহরিয়া উঠিলেন,—মহিষীকে স্বপ্নের কথা ও আশঙ্কিত উৎপাতেব কথা বলিয়া দুঃখে ও ভয়ে নিবেদন করিলেন

"বাব বাব বুঝি এই বার শেষ।
পৃথ্বীরাজ নাম বুঝি না রয়।"
তখন
"শুনি পতিবাণী, যুড়ি দুই পানি
জয় জয় জয় বলে রাজরানী
জয় জয় জয় পৃথ্বীরাজে জয়
জয় জয় জয় বলিল বামা,
কার সাধ্য তোমা করে পরাভব,
ইন্দ্র চন্দ্র যম বরুণ বাসব,
কোথাকার ছার তুরক্ক পহ্লব,
জয় পৃথ্বীরাজ প্রথিত নামা॥

* * *

এত বলি বামা দিল করতালি
দিল করতালি গৌরবে উছলি"। ইত্যাদি।

আর্য্য মহিষীর সহস্রবার সঘনে "জয় জয়" করাতে আমাদের শৈশব কালের একটি কথা মনে পড়ে——ভূতের স্বপ্ন দেখিয়া সহসা জাগিয়া পড়িয়া যখন ভয়সূচক ক্রন্দন করিয়া উঠিতাম, তখন ঐরূপ সঘনে বারংবার "রাম রাম" উচ্চারণ করিয়া ভীত ধাত্রী প্রেতযোনিকে খেদাইতে চেষ্টা করিতেন। পৃথীরাজের মত বীবপুরুষের পক্ষে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ভীত হওয়া এবং তাঁহার রানী সংস্রাব পরে সহস্র "জয় জয়" ধ্বনি করিয়া আশ্বাস প্রদান করা যে কতদূব কল্পনার ব্যভিচাব তাহা আব কি বলিব! সিজরের মৃত্যুর পূর্ব্বআভাসস্বরূপ তাঁহার মহিষী যখন নানা প্রকার দুঃস্বপ্ন, নানা অমঙ্গল-লক্ষণ দেখিয়া সিজরকে রোমের সাধারণ সভাস্থলে যাইতে নিষেধ করিতে লাগিলেন তখন সিজর এই বলিয়া উত্তর দিলেন—"ভীরুরাই প্রকৃত মৃত্যুর পূর্ব্বে শত সহস্রবার মরিয়া থাকে—কিন্তু বীরপুরুষ একবার ব্যতীত আর মৃত্যু আস্বাদন করে না।" সে যা হউক, সংযুক্তা হিন্দুমহিলা হইয়া কেমন করিয়া "ইন্দ্র" ও "বাসব" ভিন্ন ভিন্ন দেবতা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন? কিন্তু সংযুক্তার এই শিক্ষার দোষ মার্জ্জনীয় হইলেও তাঁর এরূপ স্থলে ঘন ঘন করতালি দেওয়া মার্জ্জনীয় হইতে পারে না—তাঁহার ঘোর করতালি "দেখিয়া হাসিল ভারতশান্তি"—তিনি ত স্বচক্ষে রানীর ঐরূপ উন্মাদ অবস্থা

দেখিয়া হাসিবেনই—আমরা কল্পনার চক্ষে দেখিয়াই হাসি সম্বরণ করিতে পারিতেছি না;—ওরূপ করতালির উপর করতালি অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারই সাজে—রাজ রানীর ত কথাই নাই——কোন ভদ্র কুলনারী সহসা ওরূপ করিলে তাঁহাকে লোকে উন্মাদ মনে করিবে না ত আর কি করিবে।

দ্বিতীয় কবিতাটি 'আকাঙ্ক্ষা'—অর্থাৎ রাধিকা-সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে কি কি হইতে অভিলাষ করিতেছেন এবং শ্যামসুন্দর তাহার কি কি উত্তর দিতেছেন তাহার একটা তালিকা। আমাদের মতে উত্তর-প্রত্যুত্তর-কবিতাতে প্রায়ই বড় একটা প্রকৃত কবিতা থাকিতে পারে না; কারণ উত্তরগুলি প্রায়ই হৃদয় অপেক্ষা বুদ্ধি-সাপেক্ষ—এরূপ স্থলে কেমন করিয়া খুব জবাব দিব ইহাই কবির উদ্দেশ্য হয়। প্রাচীন হরু ঠাকুর বা রাম বসু প্রভৃতি প্রকৃত কবিরা প্রশ্ন কবিতায় যতখানি কবিত্ব দেখাইয়াছেন, উত্তর কবিতায় তাহার শতাংশের একাংশও দেখাইতে পারেন নাই। স্বীকার করি যে তাহাদের উত্তরে কতকটা কারিগুরি, বাক্যবিন্যাসের কারিগুরি, দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা ব্যতীত প্রকৃত কবিতার আভাস মাত্রও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্কিম বাবুর 'সুন্দর সুন্দরী' দেখিয়া শুকশারীর পুরাতন কবিতাটি আমাদের মনে পড়িল—

শুক বলে আমার কৃষ্ণ কদম তলায় থানা,
শারী বলে আমার রাধা করে আনাগনা,
নইলে কিসের থানা,
শুক বলে আমার কৃষ্ণ গিরি ধ'রে ছিল,
শারী বলে আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল,
নইলে পারবে কেন?,

কিন্তু 'শুক শারীর' কবিতার সহিত 'সুন্দর সুন্দরীর' কবিতার এই প্রভেদ—যে প্রথমটি উত্তর কাটাকাটির দৃষ্টান্ত, দ্বিতীয়টি মনস্তুষ্টিকর উত্তর প্রত্যুত্তরের দৃষ্টান্ত। সুন্দরী শ্রীকৃষ্ণকে নানা বস্তু হইতে অভিলাষ করিতেছেন, সুন্দরও তাহাই তুইতে উত্তরে অভিলাষ করিতেছেন,—কিন্তু সুন্দরী, রমণী-প্রকৃতি-সুলভ লজ্জায় সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারিতেছেন না, সুন্দর সুরসিক পুরুষের মত কেবল সুন্দরীর অভিলাষের উপর মাত্রা চড়াইতেছেন।

সুন্দরী বলিলেন

কেন না হইলে তুমি চাঁদের কিরণ,
ওহে হৃষীকেশ,
বাতায়নে বিষাদিনী, বসিত যবে গোপিনী,
বাতায়ন পথে তুমি লভিতে প্রবেশ,
আমার প্রাণেশ!

সুন্দর উত্তর করিলেন

কেন না হইনু আমি চন্দ্রিকার লেখা,
রাধার বরণ,
রাধার শরীরে থেকে, রাধারে ঢাকিয়ে রেখে
ভুলাতাম রাধা রূপে অন্য জন মন,
পর ভুলান কেমন।

সুন্দরী বলিলেন—

কেন না হইলে তুই কানন কুসুম,
রাধা প্রেমাধার—
না ছুতেম অন্য ফুলে, বাঁধিতাম তোরে চুলে,

মোর প্রাণাধার।

সুন্দর উত্তর করিলেন

কেন না হইনু হায় কুসুমের দাম,
কণ্ঠের ভূষণ;
এক নিশা স্বর্গ সুখে, বঞ্চিয়া রাধার বুকে,
ত্যজিতাম নিশি গেলে জীবন যাতন,
মেখে শ্রীঅঙ্গে চন্দন।

দুঃখের বিষয় আমরা 'তথাস্তু' বলিতে পারিলাম না।

তৃতীয় অধঃপতন সঙ্গীতটিতে বঙ্কিম-ভাবের(?) রসিকতার চূড়ান্ত হইয়াছে। কিন্তু বিষয়ের দোষে রস মারা পড়িয়াছে,—হাসিতে হাসিতে অধঃপতনে যাইতেছি কখনও যেন আর কাঁদিতে হইবে না—এ ভাব কি ভয়ানক ভাব! মানুষ মরিতেছে তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া হাস্য পরিহাস আমোদ-প্রমোদ——আমোদ প্রমোদ করিবার আর কি স্থান নাই। কবিতাটিতে উত্তম রসিকতা প্রকাশ হইয়াছে; কিন্তু বিষয় নাকি অধঃপতন—নাম শুনিলেই গা কাঁপে—এ স্থানে রসিকতার হাস্যবদন দেখিয়া, অমাবস্যা রজনীতে শ্মশান মধ্যে এক জন সুন্দরী রমণীকে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিতে দেখিয়া—কাহারো যে হাসি পাইবে, সহৃদয় মানব প্রকৃতিতে ত এরূপ লেখে না; তবে যদি গ্রন্থকার দানব-প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া কবিতাটি রচিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহা বিকট হাস্য হাসাইবার মত—ঘোরতর একটি অধঃপতনের পাথেয় সম্বল হইয়াছে—ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

চতুর্থ—'সাবিত্রী'——এই কবিতাটির স্থানে স্থানে দুএকটী সুন্দর বর্ণনা আছে—যখন যমরাজ শোকাতুরা সাবিত্রীর সম্মুখীন হইতেছে কবি লিখিতেছেন

'হেরে আচম্বিতে এ ঘোর-শঙ্কটে,
ভয়ঙ্কর ছায়া আকাশের পটে
ছিল যত তারা তাহার নিকটে,
ক্রমে ম্লান হ'য়ে গেল নিবিয়া,*
সে ছায়া পশিল কাননে,—অমনি
পলায় শ্বাপদ, উঠে পদধ্বনি,
বৃক্ষ শাখা কত ভাঙ্গিল আপনি,
সতী ধরে শবে বুকে আঁটিয়া॥

কিন্তু গ্রন্থকার যে সত্যবানকে জীবন দান না করিয়া সাবিত্রীকে পর্য্যন্ত মারিয়া ফেলিলেন কেন—তাহা ত আমরা বুঝিতে পারি না। কোথায় সতীত্বের অমোঘ প্রভাবে যমহস্ত হইতেও পতিব্রতা সতী মৃত স্বামীকে ফিরিয়া লইবেন,—না সাবিত্রীও এ দেশীয় শত সহস্র স্ত্রীর মত যমের নিকটে সহমরণের বর প্রার্থনা করিয়া পতির সঙ্গেই সহমরণে অন্তর্ধান হইলেন। যদি কোন পুরাণে এরূপ কথা থাকিত তা হইলেও বুঝিতাম যে গ্রন্থকার কি করিবেন,—কিন্তু তাহা নয়, বঙ্কিম বাবু স্বেচ্ছামত পুরাণের উৎকর্ষ সাধন করিতে গিয়া দেশীয় একটি অতি সুন্দর কাহিনীর সুন্দরতম অংশটুকু একেবারে মৃত্তিকাসাৎ করিয়াছেন। আমরা স্বীকার করি যে স্বামীর সহিত ইচ্ছা পূর্ব্বক সহমরণে যাওয়া বিশেষ অনুরাগের লক্ষণ।

* ছায়ার নিকট তারা ম্লান হইয়া নিভিয়া গেল—ইহা কিরূপ সঙ্গত বুঝিতে পারি না। ছায়া কি দিবাকর তুল্য?

কিন্তু তাহা মহান সতীত্বের পরাকাষ্ঠা নহে;—অসতীর অগ্রগণ্যা ক্লিয়োপেট্রাও আন্‌টনীর মৃত্যুর পর ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন,—তিনিও মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ইরাস্ নামক সহচরীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন "ত্বরায়—ত্বরায়—রে শান্ত ইরাস্—আর বিলম্ব করিস না—আমি যেন শুনিতে পাইতেছি আমাকে আনটনী ডাকিতেছেন, আমি যেন দেখিতে পাইতেছি তিনি আমার এই আত্ম-বিসর্জ্জনরূপ মহৎ কার্য্য দেখিবার জন্য জাগিয়া উঠিতেছেন"। স্বীকার করি যে এ কথা-গুলি সেক্‌সপিয়ারের, কিন্তু সেক্‌সপিয়র ইতিহাসের মূলোচ্ছেদ করিয়া কপোলকল্পিত কতকগুলি প্রলাপ বাক্য কহেন নাই—তিনি ইতিহাসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও কল্পনা-প্রাচুর্য্য খুবই দেখাইয়াছেন—বঙ্কিম বাবু বিপরীত প্রথা অবলম্বন করিয়া বিপরীত ফল উৎপাদন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আণ্টনী ক্লিয়োপেট্রার স্বামী ছিল না—কিন্তু তাহাতে কি এ'ল গেল—তাহাতে আরও সপ্রমাণ হইতেছে যে সতী স্ত্রী না হইলেও অনুরাগের ঝোঁকে এক জন অসতীও সহমরণে যাইতে পারে; মনে কর—ক্লিয়োপেট্রার শেষ দশায় যখন আণ্টনীর সহিত প্রণয় হইল—তখন আণ্টনীর যদি বিবাহই হইত, তাহা হইলেই কি ক্লিয়োপেট্রার পূর্ব্বের বেশ্যাবৃত্তি ভুলিয়া তাঁহার ইচ্ছামৃত্যু দেখিয়াই তাঁহাকে সতী ও পতিব্রতা কহিতাম?—সহমরণে যাওয়াই কি সাবিত্রীর অলৌকিক পাতিব্রত্যের পরাকাষ্ঠা মনে করিতে হইবে?—পুরাণে তাহা বলে না। পুরাণে এই কথাই বলে যে সাবিত্রী আপনার সতীত্ব-প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া এই সঙ্কল্প করিলেন যে সতীত্বের অলৌকিক মাহাত্ম্যে যমের হস্ত হইতে পর্য্যন্ত আমার মৃত স্বামীকে ফিরাইয়া আনিব। সেই সঙ্কল্প অনুসারে তিনি একাকিনী চতুর্দ্দশীর ভীষণ নিশীথ-যোগে বিকট অরণ্যে মৃত পতিকে ক্রোড়ে লইয়া, যমরাজের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন—যমরাজ সাবিত্রীকে দেখিয়া প্রীত হইলেন—প্রীত হইয়া অবশেষে সত্যবানকে সতী স্ত্রীর আলিঙ্গনে প্রত্যর্পণ করিলেন।—পুরাণের এ কথা কেহ বিশ্বাস করিবেন না বটে, কিন্তু ইহার ভিতর একটি ভাব আছে—এবং সেই ভাবের প্রভাবে সাবিত্রীর গল্পটী ভারতবাসিনীদের হৃদয়ের শিরা এবং উপশিরায় ঘোর ঘনিষ্ট ভাবে বিজড়িত আছে। দুই তিন সহস্র সতী স্ত্রী মৃত পতির সহিত সহমরণে গিয়াছে—কিন্তু কেহই তাহাদের সহমরণকে সতীত্বের যার পর নাই মাহাত্ম্য লক্ষণ মনে করে না। পুরাণের সহিত বাল্যক্রীড়া করা আমাদের মতে যুক্তি-সঙ্গত নহে।

পঞ্চম—"আদর"—এ কবিতাটি মন্দ নহে—ইহার প্রথম কথা-গুলিই অতি সুন্দর হইয়াছে—

"মরুমাঝে যেন একই কুসুম,
পূরিত সুবাসে,
বরষার রাত্রে যেন একই নক্ষত্র,
আঁধার আকাশে,

নিদাঘ সন্তাপে যেন একই সরসী,
বিশাল প্রান্তরে,
রতন শোভিত যেন একই তরণী
অনন্ত সাগরে,
তেমনি আমার তুমি প্রিয়ে সংসার
ভিতরে,

কিন্তু গ্রন্থকার কিছু বাড়াবাড়ি করিতে গিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া পড়িয়াছেন—তিনি আরো বলিতেছেন

সুশীতল ছায়া তুমি নিদাঘ সন্তাপে,
রম্য বৃক্ষতলে,
শীতের আগুন তুমি, তুমি মোর ছত্র
বরষার জলে।

এই কথাগুলি পড়িয়া বাউলদের একটি পুরাণ গান আমাদের মনে পড়িল—
"গৌর আমার নাকের নথ, কণ্ঠের কণ্ঠমালা
গৌর আমার কানের দুল, হাতের বাজু বালা
গো-উ-র হ-রি।

ষষ্ঠ—"বায়ু"—এই কবিতাটি একটি প্রহেলিকা স্বরূপ। ইহার শীর্ষে "বায়ু" শব্দটি না থাকিলে ইহা একটি সুন্দর হেঁয়ালী হইতে পারিত। বায়ু বলিতেছে—

"আমিই রাগিণী, আমি ছয় রাগ,
কামিনীর মুখে আমিই সোহাগ,
বালকের বাণী অমৃতের ভাগ,
মম রূপান্তর !"

"কামিনী সোহাগ" বা "বালকের বাণী" যে বায়ুরই রূপান্তর তাহা এক জন কবি অপেক্ষা এক জন বৈজ্ঞানিক বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। এই জন্যই কবি ক্যাম্প্‌বেল বলিয়াছেন যে "কঠোর বিজ্ঞান শাস্ত্র আসিয়া প্রকৃতির মুখ হইতে মোহিনী অবগুণ্ঠন তুলিয়া লয় এবং সকল বস্তুকেই পাঞ্চভৌতিক নিয়মের অধীন করিতে চাহে"। —আমরা বিজ্ঞানের অবমাননা করিতে চাহি না—কিন্তু কবির কল্পনা হইতে বিজ্ঞানের তন্ন তন্ন দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য রাখা উচিত। কিন্তু বায়ুর আরও বক্তব্য আছে—সে বলিতেছে

আমি বাক্য, ভাষা আমি,
সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী
মহির ভিতর—"

এত কথা—আরও বিস্তর বিস্তর কথা পর্য্যায়ক্রমে না বলিয়া বায়ু ত এক কথা বলিতে পারিত—"আমি সংসারের জীবন—সংসারে যাহা কিছু আছে আমি না থাকিলে কিছুই থাকিত না।" বায়ু অতিশয় বাচাল, তাই আরো বলিতেছে—

"উড়াই খগে গগনে—"

গ্রন্থকার মনে করিলেন যে বায়ুর এ কথা সহজে কেহ বিশ্বাস করিবে না, অথবা বুঝিতে পারিবে না,—তিনি সেই জন্য পাঠকদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া নীচে টীকার ছলে বলিয়াছেন "Vide Reign of Law, by Duke of Argyll—chap VII. Flight of Birds." কিন্তু গ্রন্থকার এস্থলে টীকা না করিয়া বায়ু কেমন করিয়া "সাহিত্য বিজ্ঞান স্বামী" হইল তাহা বুঝাইয়া দিলে আমরা প্রকৃত পক্ষে উপকৃত হইতাম।

সপ্তম—"আকবর সাহের খোষ রোজ" এ কবিতাটি কতক সুশ্রাব্য হইয়াছে—কিন্তু ইহাতে আবার কল্পনার যতদূর

ব্যভিচার হইয়াছে এমন আর কুত্রাপি হয় নাই। একটি ক্ষত্র-কুলনারী আকবর সার খোষ রোজ দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি "খোষরোজের'" অশ্লীল ব্যাপার দেখিয়া ঘৃণায় ও ক্রোধে সে স্থল হইতে পলাইতে চেস্টা করিলেন। কিন্তু পথ না দেখিতে পাওয়ায় যখন তিনি কাতর স্বরে রোদন করিতেছেন তখন আকবর সা সেইখানে আসিয়া পড়িল এবং রমণীর রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া রমণীর ধর্ম্মনাশ কামনায় সবলে তাঁহাকে ধরিয়া টানিতে লাগিলেন—তখন রমণী নিরুপায় হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

"শুকাল বামার বদন নলিনী
ডাকে ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মা দুর্গে,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি বাঁচাও জননী,
ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি মে দুর্গে——"

এত "ত্রাহির" আদ্য শ্রাদ্ধ হইলেও পাষণ্ড যখন কিছুই শুনিল না, তখন রূপসী ছুরিকা বাহির করিয়া আকবর সাকে বধ করিতে কৃতসংকল্প হইল। সম্রাট আশ্চর্য্য হইয়া এবং প্রীত হইয়া নিরস্ত হইলেন। তখন আর্য্যকুলনারী অসি নামাইলেন—

হাসিয়া রূপসী, নামাইল অসি,
বলে মহারাজ এ বড় রস—
রমণীর রণে হার মান তুমি
পৃথিবী-পতির বাড়িল যশ!
দুলায়ে কুণ্ডল, অধরে অঞ্চল,
হাসে খল খল ঈষৎ হেলে,
বলে মহাবীর এই বলে তুমি
রমণীরে বল করিতে এলে?

সহৃদয় পাঠকমাত্রকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি যে এই কল্পিত ছবিখানি কতদূর বীভৎসকর! ইহা কি একটি রোষান্বিতা অগ্নিশিখাবৎ ক্ষত্রকুলনারীর প্রতিমা, না লীলাময়ী যবন-বেগমের বিভ্রমবিলাসের মূর্ত্তি?——থাক্—আর আমরা পারি না—"মন এবং সুখ" ইত্যাদি নানা বিষয়ক কতক গুলি যে কবিতা আছে তাহা সকলই এক ছাঁচে ঢালা, সুতরাং সে গুলির সমালোচনা করা বাহুল্য—"ললিতা" ও "মানস" নামক কবিতা দুটি গ্রন্থকার পঞ্চদশ বয়সের সময় লিখিয়াছিলেন—সুতরাং শৈশবরচনা প্রায় সকলই যেমন হইয়া থাকে, এ দুটিও সেই রূপ।

সমস্ত কবিতাপুস্তকের মধ্যে তিনটি গদ্য-পদ্যই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। উপসংহার কালে আমরা একটিমাত্র কথা বলিব—বঙ্কিম বাবু উপন্যাস লিখিয়া যতদূর প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন, এই নিকৃষ্ট কবিতা খানির প্রভাবে তাঁহার সে যশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে ভাল এক জন উপন্যাস-লেখক ভাল কবি হইতে পারেন না। সর্ ওয়াল্টর স্কটের কবিতাগুলি পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান সমালোচকদের মতে ছন্দগ্রথিত উপন্যাস মাত্র। কিন্তু তাহা না হইলেও সকল ব্যক্তিতে সর্ ওয়াল্টর স্কটের প্রতিভা সম্ভাবিত নহে। কবি এবং উপন্যাস-লেখক ভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত,—তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি ভিন্ন ভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, এক জন কেবল ঘটনাগুলি এমন করিয়া সাজাইতে চাহেন যে তাহাতে উদ্দেশ্য-সাধন হইতে পারে—অপর জন ঘটনার প্রতি ঈষৎ মাত্র দৃষ্টি রাখিয়া কেবল ভাবের বিকাশের দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখেন।—স্কটের লেডী অফ্ দি লেকের সহিত বাইরণের "জওয়ারের" তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের কথার সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে।

বোম্বাই রায়ৎ।

তৃতীয় ভাগ।

এক দিকে এই সকল সালিসী কোর্ট আর এক দিকে কঠোর আইনবদ্ধ আদালত। বিনা ব্যয়ে আপসে বিবাদ ভঞ্জন একের কার্য্য—অপরের কার্য্য বিবাদানল প্রজ্বলিত করিয়া অর্থী প্রত্যর্থী উভয়েরই অর্থনাশ করা। একবার আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে আর শান্তি নাই—বিরাম নাই। ইহার চূড়ান্ত হইতে যে কালবিলম্ব হয় তাহাতে কত ধূর্ত্ততা প্রবঞ্চনা মিথ্যা সাজাইবার সময় পাওয়া যায়। প্রথম কোর্টে মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে জিলা জজের নিকট আপীল—তার পর বোম্বাই হাইকোর্টে—কখনো বা বিলাতে রাণীর বিচারালয় পর্য্যন্ত না গিয়া পরাজিত পক্ষ ক্ষান্ত হয় না। ইহাতে কত বিলম্ব ও অর্থব্যয়, বাদী প্রতিবাদীর মধ্যে কি ভয়ানক বিবাদ বিদ্বেষ প্রদীপ্ত হয়। ইহা অপেক্ষা সালিসী কোর্টের সহজ ও শান্তিময় প্রণালী কত প্রার্থনীয়। বোম্বাই অঞ্চলের একজন জিলা জজ সালিসী কোর্ট ও আদালতের কার্য্যপ্রণালীর সম্মিলন প্রস্তাব করিয়া East Indian Association সভায় এক প্রবন্ধ* পাঠ করেন। তাঁহার মতে এই উভয় কোর্ট একত্রে মিলিয়া কার্য্য করিলে তাহা হইতে অনেক শুভফল প্রসূত হইতে পারে। তিনি বলেন ইহার প্রত্যেক কোর্টেরই দোষ গুণ লক্ষিত হয়। এই উভয় কোর্টের বিচারক বিদ্যা বুদ্ধিতে সমান নহে। পঞ্চায়তের একজন মেম্বর সুশিক্ষিত মুন্সফের তুল্য বিচক্ষণ বুদ্ধিমান কার্য্যদক্ষ আইনজ্ঞ হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না। কিন্তু তেমনি আবার আর কতকগুলি বিষয়ে পঞ্চায়ত কোর্টের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে। পঞ্চায়তের লোকেরা গ্রামের মধ্যে থাকিয়া আপনার গ্রামের বৃত্তান্ত সকল জানিতেছে শুনিতেছে—গ্রামবাসীদিগের চরিত্র রীতি নীতি তাহারা বিশেষ রূপে অবগত। হয়ত সাক্ষীদের হাব ভাব দেখিয়া তাহারা সাক্ষ্য ভাল করিয়া ওজন করিতে পারিবে, সাক্ষ্যের সত্যাসত্য সহজে নির্ণয় করিতে সমর্থ হইবে। তাহারা মোটামুটি বিচার করিয়া যেরূপে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিবে মুন্সেফ হয়ত সহস্র আইন খাটাইয়া তাহাতে কৃতকার্য্য হইবেন না। আর এক দিক্ দেখিতে গেলে মুন্সেফ হয়ত তাহাদের অপেক্ষা বিচারক্ষম বহুদর্শী, মুন্সেফ হয়ত অপক্ষপাতে বিচার করিয়া দিবেন—পঞ্চায়তের পক্ষপাত-দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই ক্ষণে এই দুই কোর্ট পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিতেছে বলিয়া তাহারা তাদৃশ ফলোপ-

* "The Panchayat; a remedy for Agrarian disorders in India." read before The East India Association by Mr. William Wedderhwm (Bombay Civil Service)

ধায়ী হয় না, কিন্তু তাহারা সম্মিলিত হইলে তাহাদের পরস্পরের দোষ খণ্ডন ও উপকারিতা বর্দ্ধন প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই রূপে উভয় কোর্টে মিলিয়া কার্য্য করা আমাদের প্রাচীন প্রথার অনুযায়ী, পূর্ব্বে মহারাষ্ট্র দেশে বাদী প্রতিবাদী প্রথমে পঞ্চায়তের নিকটে যাইয়া আপনাদের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য আবেদন করিত—সে বিচার মনের মত না হইলে অসন্তুষ্ট পক্ষ রাজকর্ম্মচারী ন্যায়াধীশের শরণাপন্ন হইত। এখনো কতকটা এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। প্রত্যেক বড় বড় গ্রামে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী সমূহে এক একটী পঞ্চায়ত কোর্ট স্থাপিত হউক। তাঁহাদের নিকট প্রথমতঃ সামান্য দেশ-সম্বন্ধীয় মকদ্দমার বিচার হইবে। তাঁহারা যতগুলি মকদ্দমা আপসে মিট মাট করিয়া দিতে পারেন তাহা সাধ্যমত করিয়া দিবেন—অবশিষ্ট গুলি যাহা সহজে নিষ্পত্তি হওয়া দুষ্কর তাহা মুন্সফের বিচারালয়ে আনীত হইবে। মুন্সফ কোর্ট এক স্থানে আবদ্ধ থাকিবে না—মুন্সফ গ্রামে গ্রামে সরকিট ভ্রমণ করিয়া বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। যে গ্রামে পঞ্চায়ত কোর্ট প্রতিষ্ঠিত, তথায় উপস্থিত হইলে তিনি পঞ্চায়তের মধ্যে তাহার সভাপতি হইয়া বিচারাসনে বসিবেন ও তাহাদের সাহায্যে গুরুতর মকদ্দমা সকলের নিষ্পত্তি করিবেন। যাহাতে অর্থী প্রত্যর্থী পঞ্চায়তের ব্যবস্থা অমান্য করিয়া অকারণে আদালতে মকদ্দমা আনিতে না পারে তাহার জন্য ঐ সকল মকদ্দমার উপর ষ্টাম্প কর নির্দ্ধারিত করা আবশ্যক। আর মুন্সফ কোর্টের কার্য্য-প্রণালী সুশৃঙ্খল রূপে চলিতেছে কি না ও তাহার বিচার-কার্য্য ভাল মন্দ কিরূপ হইতেছে তাহার তত্ত্বাবধানের ভার জিলা জজের উপর থাকিবে। জিলা জজ ও তাঁহার সহকারিগণ মধ্যে মধ্যে সরকিট গমন করিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

এই পঞ্চায়ত-প্রথা প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের অশেষ হিত সাধিত হয়, বোধবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই তাহা স্বীকার করিবেন। কিন্তু এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট মনোযোগী না হইলে কিছুই হইবে না। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতীত এই মৃতপ্রায় তরু পুনরুজ্জীবিত হওয়া সম্ভব নহে। পঞ্চায়ত সভার সভাসদদিগকে কোন সম্মানসূচক পদবী প্রদান করা মন্দ নয়। তাহা হইলে জমীদার, উচ্চশ্রেণীর বণিক, পেনসনভুক লোক যাঁহাদের হাতে অগাধ সময় পড়িয়া আছে তাহা কিরূপে কাটাইবেন ভাবিয়া পান না, তাঁহারা স্থানীয় সভার সভাসদ হইবার প্রার্থী হইতে পারেন। এইরূপ সভা লোকের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া জনসমাজে শান্তিরক্ষণে বিশেষ সহায়তা করিতে পারে তাহার আর সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ রাইয়ত কমিসনরগণ প্রস্তাব করিয়াছেন যে ছোট ছোট দেশ সম্বন্ধীয় মকদ্দমার বিচার জন্য কতকগুলি বিশেষ কোর্ট স্থাপিত হওয়া উচিত। সরকিট কোর্টের ন্যায় স্থানে স্থানে তাহাদের অধিবেশন হইবে ও এই সকল কোর্টের তত্ত্বাবধানে প্রচলিত আদালতের মুন্সফ প্রভৃতি বিচা-

রকগণ নিযুক্ত থাকিবে। রাইয়তদিগকে আপনাদের ঘরবাড়ী কৃষিকার্য্য ছাড়িয়া দূরস্থিত আদালতে যাইতে বাধ্য করা তাহাদের উপর সামান্য অত্যাচার নয়। সরকিট কোর্টে ইহার অনেকটা উপশম হইতে পারে। তদ্ভিন্ন তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে বিচারের সৌকর্য্য ও বিলম্ব হ্রাসের সম্ভাবনা। অবিচারের নীচেই বিচারে কালবিলম্ব দূষণীয়। এইক্ষণকার বিচার-প্রণালীতে বিলম্ব ও দীর্ঘসূত্রতা বিশেষ প্রশ্রয় পায় বলিয়া বাদী প্রতিবাদী অনেক সময় সুবিচারের ফল হইতে বঞ্চিত হয়। এই সকল অমঙ্গল নিবারণ উদ্দেশে কমিসনরগণ বলেন যে বিচারকেরা ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রধান২ গ্রামে গিয়া আদালত খুলিবেন ও সেই সময়ে গ্রামের অধীনস্থ পল্লীসমূহের সমুদায় মকদ্দমা তাঁহাদের কোর্টে উপস্থিত করিতে হইবে। গ্রামের মণ্ডলেরা প্রতিবাদীদিগকে আনিয়া হাজির করিতে আদিষ্ট হইবে—কার্য্য-প্রণালী যতদূর সহজ হইবার তাহা হইবে এবং প্রতিবাদীর যদি আপনার পক্ষে কিছু বলিবার থাকে সে তাহা ব্যক্ত করিবে, এইরূপ হইলে অনেক জাল প্রতারণা মিথ্যাসাক্ষ্য উঠিয়া যাইবে, প্রতিবাদিগণ মন খুলিয়া আত্মপক্ষ সমর্থনে সক্ষম হইবে, সাক্ষীরাও অকুতোভয়ে অন্যের পক্ষ হইয়া সাক্ষ্যদান করিতে পারিবে। প্রতিবাদিগণের প্রবাস যাপনের কষ্ট দূর হইবে। এইক্ষণে যে সকল মকদ্দমার বহুকষ্টে দীর্ঘকালে মীমাংসা হয় তাহা অনতিপরিশ্রমে অল্প সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি হইবে—বিচারে ন্যায় ও ত্বরা উভয়ই রক্ষা পাইয়া অর্থী প্রত্যর্থীর সন্তোষ সাধন করিবে।

অধুনাতন আদালতে কার্য্য-প্রণালী রাইয়তের পক্ষে বিষম সঙ্কটাবহ তাহার আর সন্দেহ নাই। দাবীদার আসিয়া তাহার দাওয়ার আরজী দাখিল করিলে পর প্রতিবাদীর প্রতি কোর্টে হাজির হইবার সমনজারী হয়, কিন্তু অনেক সময় এই সমন যথাস্থানে পৌঁছে কিনা সন্দেহ। এমন হইতে পারে যে বেলিফ বাদীর টাকায় ক্রীত, সে সমন জারী না করিয়াও কোর্টে মিথ্যা রিপোর্ট প্রেরণ করিল। ডিক্রীজারীর সময় রাইয়ত হয়ত প্রথম জানিতে পারিল যে তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত—সে অমনি দৌড়িয়া কোর্টে গিয়া নিবেদন করিল "দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি এ মকদ্দমার কিছুই জানি না।" সে আপনার কথা সমর্থন করিতে পারে না পারে তাহ দৈবের উপর নির্ভর। রাইয়ত যদি বা সমন পাইল, তাহাকে কোর্টে আসিয়া দাওয়ায় উত্তর দিতে হইবে—উকীল নিযুক্ত করিতে হইবে—সাক্ষীর ডাকিবার খরচা দিতে হইবে, এই সকল বিভীষিকা দেখিয়া সে আদালতে ঘেঁসিতেই সঙ্কুচিত হয়। অতএব অধিকাংশ মকদ্দমা যে প্রতিবাদীর অবর্ত্তমানে নিষ্পত্তি হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? তদনন্তর রাইয়তের উপর একবার ডিক্রী করিয়া লইতে পারিলেই মহাজনের কার্য্যসিদ্ধ হইল। সে যে সদ্য সদ্য ডিক্রীজারী করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে কিন্তু

সে সেই ডিক্রী রাইয়তের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া সময়ে সময়ে তাহার নিকট হইতে টাকা শস্য গ্রহণ করে, অথবা তাহাকে আপনার দাসত্বে নিযুক্ত করে। তৎপরে ইচ্ছা হইলে আবার সম্পূর্ণ ডিক্রীজারী করিয়া লয়। এইরূপ প্রবঞ্চনায় আইন তাহার সহায়, কেন না আইনানুসারে ডিক্রীর টাকা কোর্টে আনিয়া অথবা কোর্টকে জানাইয়া ডিক্রীদারকে দিতে হইবে। কিন্তু রাইয়ত ত এ নিয়মের কিছুই জানে না। সে একবার আপনার যথাসর্ব্বস্ব বেচিয়া কিনিয়া ডিক্রীর টাকা শুধিয়াছে—তাহার উপর আবার ডিক্রীজারীর সংবাদ পাইয়া কোর্টে গিয়া কাঁদিয়া পড়ে "দোহাই ধর্ম্মাবতার, আমি ডিক্রীর সব টাকা শুধিয়াছি—বাদীর আর এক-পয়সাও পাওনা নাই।" বিচারক কি করিবেন—তাঁহার হাত পা বদ্ধ—হয়ত বলিতে বাধ্য হন "তুই আপসে বাদীকে টাকা দিয়াছিস্—কোর্টে হাজির করা হয় নাই—এখন আর আমি এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারি না"—এই বলিয়া তাহাকে দূর করিয়া দেন। দৈবাৎ কখন এই অত্যাচার ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্ণগোচর হইলে ফৌজদারীতে ইহার বিচার হইতে দেখা যায় ও তখন মহাজন তাহার দুষ্কৃতির উপযুক্ত দণ্ড প্রাপ্ত হয়।

উল্লিখিত বিবরণ পাঠে সহজে প্রতীতি হইবে, দরিদ্র প্রতিবাদীর স্বায়-লাভ কিরূপ দুর্ঘট। প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাহার যন্ত্রণাভোগ। প্রথমতঃ মকদ্দমার ব্যয়বাহুল্য হেতু তাহার পক্ষে আদালতের দ্বার ত একপ্রকার রুদ্ধ বলিলে হয়। যদি কখন প্রবেশ করিতে পায় ত আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া জয়লাভ করাও তাহার পক্ষে সহজ নহে। আর তাহার বিরুদ্ধে একবার যদি ডিক্রী বাহির হইল তাহা হইলে আর তাহার নিস্তার নাই। তখন হইতে তাহার মন্দভাগ্য উদয়—তাহার সুখশান্তি সকলি অস্তমিত হইল—সেই অবধি সে হয়ত মহাজনের দাসত্বে তাহার সমুদায় জীবন অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়।

রাইয়তেরা প্রায়ই অজ্ঞান—লেখাপড়া কিছুই জানে না—আপনাদের হিতাহিত কিছুই বুঝে না। সামান্য হিসাব-জ্ঞান না থাকায় অনেক সময় তাহারা প্রতারিত হয়। তাহারা বুঝে, এক লেখায় দাঁড়ায় আর একপ্রকার। রাইয়ত যে টাকা কর্জ্জ করিতে চায় ও যাহার জন্য সে খত লিখিয়া দেয় অনেক সময় তাহা পূরাপুরি প্রাপ্ত হয় না—কখনো বা একেবারে কিছুই পায় না। অনেক সময় মহাজন দেনার টাকা অথবা শস্য পাইয়াও তাহা রাইয়তের হিসাবে জমা করিয়া লন না। দেনার টাকা পাইলে তাহার রসিদ দিবার ত নিয়ম নাই, সুতরাং দেনা শুধিয়াও তাহা আদালতে সপ্রমাণ করা রাইয়তের পক্ষে সামান্য কঠিন ব্যাপার নহে ও কাজেই দেনা বারবার পরিশোধ করিয়াও অনেক সময় তাহার নিস্তার নাই।

রাইয়তের উপর মহাজনের যে অত্যা-

চার—আদালতে যে সকল ঋণ সম্বন্ধীয় মকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহা হইতে তাহার রাশি রাশি প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে। বোম্বাই হাইকোর্ট রিপোর্ট পাঠ করিলে পাঠকেরা তাহার কতক আভাস প্রাপ্ত হইতে পারেন। এবিষয়ে তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্ত নিম্নলিখিত মকদ্দমাটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ইহা হইতে রাইয়তের ব্যবহার-জ্ঞান সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। *

এই মকদ্দমার পত্তন একটী বন্দকখতের উপর। দুইজন রাইয়ত মহাজনের নিকট হইতে ৩০০ টাকা কর্জ্জ করিয়া প্রায় বিশ বিঘা জমি বন্ধক দিয়া ১৮৬২ সালে এক খত লিখিয়া দেয়। খতের করার এই যে সুদের পরিবর্ত্তে রাইয়তেরা উৎপন্ন শস্তের অর্দ্ধভাগ মহাজনের বাটীতে প্রতিবর্ষে আনিয়া উপস্থিত করিবে। প্রতিবর্ষে ২০টাকা করিয়া ৩০০ টাকা পরিশোধ করিতে হইবে। ১৫ বৎসরের পূর্ব্বে সে ঋণ পরিশোধ হইয়া গেলেও মহাজনকে ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত শস্তের অর্দ্ধভাগ বর্ষে বর্ষে আনিয়া দিতে হইবে আর খতের তারিখ হইতে চারি মাসের মধ্যে যদি সরকারী দফতরে মহাজনের নামে জমি দাখিল করা না হয় তাহা হইলে সেই জমি মহাজনের নিকট ১০০ টাকায় বিক্রীত হইবে। অবশিষ্ট ২০০ টাকা একবৎসর পরে চাহিবা মাত্র সুদ শুদ্ধ আনিয়া দিতে হইবে। রাইয়ত যদি বার্ষিক শস্তার্দ্ধভাগ দিতে অক্ষম হয় অথবা জমি মহাজনের নামে করারমত দাখিল করা না হয় কিম্বা প্রতিবর্ষে ২০ টাকা দিবার ব্যতিক্রম ঘটে, কি জমি পতিত রাখা হয় তাহা হইলে একশত টাকার মূল্যে সেই জমির উপর মহাজনের সম্পূর্ণ অধিকার হইল। শস্তার্দ্ধভাগের মূল্য যতই হউক না কেন—আসল টাকার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক হইলেও তাহা কখনই অদেয় থাকিবে না।

এই খতের চারিজন জামীন। তাহারাও দেনা পরিশোধের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। তাহাদের দুইজনে আপনাদেরও জমি বন্ধক দিয়া এই অঙ্গীকার করে যে মূল ঋণী দেনা পরিশোধে অক্ষম হইলে জামীনদারদের সেই জমি শুদ্ধ একশত টাকার মধ্যে বিক্রীত গণ্য করা যাইবে। অপর দুই ব্যক্তি এই করার করে যে উক্ত বন্ধক জমি হইতে ঋণ আদায় না হইলে আমরা যেমন করিয়া হউক আমাদের ঘর বলদ কৃষিযন্ত্র গৃহসামগ্রী সমস্ত বেচিয়াও তোমার টাকা পরিশোধ করিব।

মহাজনেরা ১৮৬৪ সালে ৫০০ টাকা মায় খরচা আদায় করিবার জন্ত নালিশ করে ও তাহাদের আবেদন এই যে আসল ঋণী ও জামিনদের জমীর স্বত্বের উপর তাহাদের ক্রয়াধিকার আদালত হইতে নিরূপিত হয় ও সেই সকল জমি ও ফসলে তাহাদের দখল দেওয়া হয়। আর বন্ধকীকৃত ঘর বলদ কৃষিযন্ত্র গৃহসামগ্রী বেচিয়া তাহার ৫০০ টাকা আদায় করা হয়।

---

* Bombay High Court Reports Vol 8.

প্রতিবাদিগণ উত্তর দেয় আমরা এ খত লিখিয়া দিই নাই, আর একটী খত লিখিয়া দিয়াছি—যাহার করার অপেক্ষাকৃত সহজ। তাহাতে আমরা শস্যের কতক ভাগ দিতে স্বীকৃত হইয়াছি বটে কিন্তু আমাদের দোষ নাই—আমরা সেই ভাগ বাদীদের দিতে প্রস্তুত হইলেও তাহারা তাহা গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই।

মুন্সেফের বিচারে বন্ধক খত সাব্যস্ত হইল ও তিনি নির্ণয় করিলেন যে মূল ঋণিগণ তাহাদের করার মত কার্য্য করিতে সমর্থ হয় নাই সুতরাং তাহাদের জমীর উপর বাদীদের সম্পূর্ণ স্বত্ব জন্মিয়াছে, ও তাহারা খরিদার রূপে জমি দখলের অধিকারী। আদালতের ডিক্রী হইল যে ১০০ টাকা মূল্যে বাদীদিগকে সেই জমি দখল দিতে হইবে। আরো হুকুম হইল যে ঋণী ও তাহার অভাবে জামীনদের মহাজনদিগকে মূল ঋণের অবশিষ্ট ২০০ টাকা ও ও সুদের হিসাবে ৩০০ টাকার শস্য দেওয়া বিধেয়।

জিলা জজের নিকট আপীলে সেই হুকুমনামা বাহাল রহিল।

পরে প্রতিবাদীরা এই ডিক্রীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করিল।

চীফ জষ্টিস সাহেব বলিলেন ;—

আমরা এই Equity কোর্টের বিচারাসনে বসিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে এই কোর্ট হইতে এই বন্ধক খত সদৃশ অন্যায় ও কঠোর করার পূর্ণ খত অনুমোদিত ও কার্য্যে পরিণত হওয়া কখনই উচিত নহে। ইহা সত্য যে যে স্থলে প্রতারণা নাই সে স্থলে উপযুক্ত মূল্যের অসদ্ভাবে কোন চুক্তি রহিত করা অথবা তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে না দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু মূল্যের স্বল্পতার সঙ্গে যখন প্রবঞ্চনা—প্রতারণা—যথার্থ মূল্য গোপন, বিষয়ের অযথা বর্ণন, অর্থের নিতান্ত প্রয়োজন—জড়বুদ্ধি কিম্বা অজ্ঞান ইহার কিছু না কিছু সম্মিলিত দেখা যায় তখন Equity কোর্টের বিবেচনা-যোগ্য সে এরূপ করার গ্রাহ্য হইবে কি না—তাহা কার্য্যে পরিণত করা উচিত কি না? এই সকল কারণে অনেক সময় অল্প মূল্যের বিক্রী রহিত করা আবশ্যক হইয়া পড়ে।

আমরা এরূপ কোন সাধারণ নিয়ম বাঁধিয়া দিতে চাহি না যে জানিয়া শুনিয়া কোন ব্যক্তি কোন করারে প্রবিষ্ট হইলে তাহার কঠোরতা নিবন্ধন সে তাহা হইতে মুক্তিলাভের অধিকারী হইবে। কিন্তু এই মকদ্দমায় যখন দেখা যাইতেছে যে অজ্ঞান রাইয়ত যাহারা লেখাপড়া কিছুই জানে না—আপনাদের নাম স্বাক্ষর করিতেও যাহারা অক্ষম, তাহারা যে সময়ে আপনাদের কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য কর্জ্জ করিতে উদ্যত, তাহাদের তখনকার টাকার নিতান্ত প্রয়োজন দেখিয়া মহাজনেরা এমন কঠোর করার তাহাদের স্কন্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে—যখন দেখিতে পাই রাইয়তেরা লিখিয়া দিয়াছে যে তাহারা শস্যের নিয়মিত অর্দ্ধাংশ যোগাইতে অক্ষম হইলে ও অন্যান্য কারণ উপস্থিত হইলে তাহারা

আপনাদের জমি অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে প্রস্তুত—এত অল্প মূল্যে যে তাহা ঋণের তৃতীয়াংশ মাত্র—যে ঋণের টাকা জমির বার্ষিক উপস্বত্বের অর্দ্ধাংশেরও অধিক নহে —আর এরূপ করিয়াও তাহারা ঋণের অবশিষ্ট দুই তৃতীয়াংশের জন্য সুদ শুদ্ধ দায়ী—যখন দৃষ্ট হইতেছে যে বার্ষিক উৎপন্ন শস্য দিবার কোন ত্রুটি না হইলেও, করার মত অপরাপর কার্য্য করিতে সক্ষম হইলেও, মূল টাকা পরিশোধ করিতে পারিলেও ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা শস্যার্দ্ধভাগ দানে বাধ্য, তখন এই অন্যায় পীড়নকারী কঠোর-করার-পূর্ণ খত রহিত করা নিতান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি, কেন না ইহাতে ঋণিগণ একপ্রকার প্রতারিত হইয়াছে অনুমান না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। আমরা কোন মতে বুঝিতে পারি না কেমন করিয়া কোন মনুষ্য সহজ বুদ্ধিতে এইরূপ লিখিয়া দিতে সম্মত হইবে যদি তাহারা কি লিখিয়া দিতেছে তাহা ভাল করিয়া স্পষ্ট জানিতে পারে ও তাহার ফলাফল বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়। যদিও জিলাজজের মতে আমরা মত দিতে বাধ্য হইতেছি যে এই খত রাইয়তেরা লিখিয়া দিয়াছে—এই খত তাহারা লিখিয়া দিয়াছে ইহা যদিও সত্য হয় তথাপি লিখন পঠনে অসমর্থ অবোধ লোকের নিকট একবার এইরূপ লেখা পাঠ করিলেই যে তাহা তাহাদের বোধগম্য হইবে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না—এই সকল অসাধারণ দুরূহ করার তাহাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

এই বলিয়া এই ঘোর অন্যায় কঠোর বন্ধক খত হাইকোর্ট হইতে অগ্রাহ্য হয় ও রায়তেরা তাহাদের যথার্থ দেনার টাকা দিয়া নিষ্কৃতি লাভ করে। যদি হাইকোর্টে এই মকদ্দমার আপীল না হইত তবে গরীব বেচারী রাইয়তদিগকে কি অত্যাচারই ভোগ করিতে হইত।

দুষ্টবুদ্ধি মহাজনেরা গরীব রাইয়তের উপর শাঠ্য সকল বিস্তার করিতে না পারে এই জন্য কমিসনরগণ এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রত্যেক তমসুক হয় কোন রেজিষ্ট্রার কি কোন গবর্ণমেণ্টের উচ্চ কর্ম্মচারীর সমক্ষে লিখিত পঠিত ও স্বাক্ষরিত হয়। এই রূপ কোন নিয়ম প্রচলিত হইলে কেবল যে রাইয়তের লাভ তাহা নহে। কিন্তু অনেক সময় সদাশয় মহাজনেরও তাহা কার্য্যকর হইতে পারে। অনেক মকদ্দমায় এই রূপ দেখা যায় যে, যে সকল খত সত্য সত্যই লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে ঋণী তাহা অস্বীকার করে ও গ্রামস্থ লোকদিগকে আপনার পক্ষে ডাকিয়া তাহা লিখিত ও স্বাক্ষরিত হয় নাই ইহা আদালতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা পায়। উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইলে এই রূপ মিথ্যা শপথের পথ অবরুদ্ধ হয়। কোন্ পক্ষ সত্য তাহা আপীলে নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন—কারণ প্রথম কোর্টের জজ সাক্ষীদের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া তাহাদের সাক্ষ্যের সত্যাসত্য কতকটা নিরূপণ করিতে সক্ষম হয়েন—আপীল কোর্টে সুকৌশল-গ্রথিত শিক্ষিত সাক্ষীদলের অসত্যজাল আবিষ্কৃত

হওয়া সহজ নহে। অনেক সময় এই রূপ ঘটে যে ঋণী খত লিখিয়া দিবার সময় নাবালক ও আপনার হিতাহিত বোধে অসমর্থ, খতের মর্ম্ম তাহারা কিছুই বুঝে না, তথাপি ছলবল কৌশলে তদুপরি তাহাদের নাম স্বাক্ষরিত হয়। যখন সেই খতের দাবীতে মকদ্দমা উপস্থিত হয় তখন ঋণী অজ্ঞান আলস্য ভয় নিরাশা বশতঃ বিচারালয় হইতে দূরে থাকে, সুতরাং অবর্ত্তমানে তাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী হইয়া যায়, করারের প্রকৃত স্বরূপ প্রচ্ছন্ন থাকে। যদি কোন নিযুক্ত কর্ম্মচারীর সমক্ষে তমসুক লিখিয়া দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে নাবালকের উপর এরূপ অত্যাচার স্থান পায় না। এক দিকে অবোধ রাইয়ত ধূর্ত্ত মহাজনের প্রবঞ্চনা হইতে নিষ্কৃতি পায়, অন্যদিকে মহাজনের ন্যায্য টাকা মিথ্যা সাক্ষ্যে ডুবিয়া যাইবার আশঙ্কা দূর হইয়া সুদের দর কমিয়া যায়, তাহাতে রাইয়তের মঙ্গলেরই সম্ভাবনা। যদি মহাজনের ন্যায্য পাওনা ডুবিয়া যাইবার ভয় দূর হয়—যদি ঋণের পরিমাণ সহজে সপ্রমাণ হইবার উক্তরূপ কোন উপায় নির্দ্ধারিত হয়—তবে যে সকল স্বল্প সম্পত্তি সম্পন্ন মহাজন এক্ষণে ভয়ে অগ্রসর হইতে চায় না তাহারা বড় বড় মহাজনের প্রতিস্পর্দ্ধী হইতে সাহসী হইবে ও এই প্রতিস্পর্দ্ধিতায় সুদের দর আপনা হইতে কমিয়া গিয়া পরিণামে রাইয়তের কল্যাণ সাধিত হইবে।

কেহ কেহ পরামর্শ দেন যে এই ক্ষণে মহাজনেরা ঋণীর নিকট হইতে অপরিমিত সুদ গ্রহণ করেন তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। তাঁহাদের মতে সুদের এক নিয়মিত দর বন্ধন করা উচিত, তাহা অপেক্ষা অধিক দরের সুদ ধার্য্য হইলে আদালতে তাহা অগ্রাহ্য হইবে। এই রূপ সুদের সীমা বন্ধনকারী কোন আইন করা তাঁহাদের অভিপ্রেত। হিন্দু শাস্ত্রে অপরিমিত সুদ গ্রহণ করা নিষেধ। মনু লিখিয়াছেন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতি সুদ দিয়া টাকা ধার করিতে পারেন কিন্তু সুদ নিয়া টাকা ধার দিতে পারিবেন না। যথা—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবাপি বৃদ্ধিং নৈব প্রযোজয়েৎ
কামং তু খলু ধর্ম্মার্থং দদ্যাৎ পাপীয়সেঽল্পিকা

ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় বৃদ্ধি যোজনা করিবেন না কিন্তু যে পাপবুদ্ধি চাহিবে তাহাকে ধর্ম্মার্থে অল্প সুদ ইচ্ছামত দিতে পারিবেন -

দশম অধ্যায়—১১৭।

সুদের প্রতিরোধক আরো কতকগুলি নিয়ম আছে, যথা—

বশিষ্টবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেৎ বিত্তবিবর্দ্ধিনীং
অশীতিভাগং গৃহ্লীয়ান্মাসাদ্বার্দ্ধুষিকঃ শতে ॥ ১৪০

দ্বিকং শতং বা গৃহ্লীয়াৎ সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্
দ্বিকং শতং হি গৃহ্নানো ন ভবত্যর্থকিল্বিষী ॥ ১৪১

দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কং চ পঞ্চকং চ শতং সমং।
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্লীয়াদ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ ॥ ১৪২

অষ্টম অধ্যায়।

বৃদ্ধি ব্যবসায়ী ব্যক্তি বিত্ত বর্দ্ধনকারী

বশিষ্ঠ-বিহিত সুদ গ্রহণ করিতে পারিবেন অর্থাৎ মাসে শতের অশীতি ভাগ গ্রহণ করিবেন।

সতের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া শতকরা দুয়ের হিসাবে গ্রহণ করিবেক,—যে ব্যক্তি শতকরা দ্বিক গ্রহণ করেন, তিনি অর্থ-দোষে দোষী হয়েন না।

বর্ণানুক্রমে শতকরা দ্বিক ত্রিক চতুষ্ক অথবা পঞ্চক মাসিক বৃদ্ধি গ্রহণ করিবেক অর্থাৎ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দ্বিক, ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে ত্রিক, বৈশ্যের নিকট হইতে চতুষ্ক এবং শূদ্রের নিকট হইতে পঞ্চক।

সুদ গ্রহণ সম্বন্ধে হিন্দু-শাস্ত্রের এক বিশেষ নিয়ম এই যে, এককালে সুদ শুদ্ধ দেনা গ্রহণ করিলে মূলধন অপেক্ষা অধিক সুদ গৃহীত হইবে না।

যথা মনু—

কুসীদবৃদ্ধি দ্বৈগুণ্যং নাত্যেতি সকৃদাহৃতা।
ধান্যে সদে লবে বাহ্যে নাতিক্রমতি পঞ্চতাং॥১৫১
কৃতানুসারাদধিকা ব্যতিরিক্তা ন সিধ্যতি।
কুসীদপথমাহুস্তং পঞ্চকং শত মর্হতি॥১৫২

অষ্টম অধ্যায়।

ঋণের টাকা এককালে আহৃত হইলে তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষা অধিক সুদ গৃহীত হইবে না—ধান্য, ফল, লোম অথবা বাহক জন্তু সম্বন্ধে ঋণের পঞ্চগুণ অতিক্রম করিবেক না।

নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করিলে তাহা অসিদ্ধ—তাহাকে কুসীদপথ কহে। ঊর্দ্ধ সংখ্যা শতকরা পঞ্চক মাত্র ঋণীর নিকট হইতে প্রাপ্য।

উক্ত নিয়মকে "দাম দুপট" কহে ও এপ্রদেশের আদালত সকলে ঐ নিয়ম প্রচলিত। ঋণ আদায় করিবার সময় মহাজন কখন আসল অপেক্ষা সুদের টাকা অধিক লইতে পারে না—আসলের দ্বিগুণ পর্য্যন্ত 'সকৃদাহৃত' সুদের সীমা। হিন্দুশাস্ত্রের এই নিয়ম ছাড়িয়া দিলে এক্ষণকার আইন অনুসারে সুদের দর অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় চুক্তি অনুসারে নিরূপিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে আইনকর্ত্তাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত কি না এই লইয়া অনেক সময় অনেক তর্ক বিতর্ক শুনা যায়। কমিসনরদিগের মত এই যে আইন দ্বারা সুদের দর নির্দ্ধারিত হওয়া যুক্তিসিদ্ধ নহে।—আইন দ্বারা সুদের দর বাঁধিয়া দিলে তাহাতে যে ঋণীদিগের লাভের সম্ভাবনা নাই, তাহা পরীক্ষায় প্রমাণীকৃত হইয়াছে। বার্ত্তাশাস্ত্রেরও সিদ্ধান্ত এই যে, এবিষয়ে আইন বাঁধিতে গেলে ফলোপধায়ী হইবে না। ঋণীর টাকার প্রয়োজন ও তাহাকে ধার দিবার মত মহাজনের অর্থের প্রাচুর্য্য—এই দুয়ের উপর সুদের দর নির্ভর করে। যদি আইনের দ্বারা সুদের দর বাজার-দর অপেক্ষা অধিক স্থিরীকৃত হয়, তাহা সুতরাং কোন কার্য্যেরই হইবে না। যদি বাজার দর অপেক্ষা সুদের দর অল্প নির্দ্ধারিত হয় আর এইরূপ নিয়ম করা যায় যে, ঐ নির্দ্ধারিত দরের ঊর্দ্ধে সুদ গৃহীত হইবে না, তাহা হইলে হয়ত ধার কর্জ্জ একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়।

অথবা কাহারো টাকা কর্জ করিবার যদি নিতান্তই আবশ্যক হয়, তবে সে নিয়মিত দরের অপেক্ষা এত অধিক সুদ দিতে বাধ্য হয়, যাহাতে আইন ভঙ্গের আশঙ্কা না রাখিয়াও মহাজনে তাহাকে ধার দিতে প্রবৃত্ত হইতে পারে। সুদের দর বৃদ্ধির জন্য যে মহাজনেরই দোষ এরূপ মনে করা অন্যায়। যদি মহাজনেরা মিলিয়া এইরূপ চক্রান্ত করে যে, চলিত দর অপেক্ষা অধিক দরে সুদ না পাইলে টাকা ধার দিব না, তাহা হইলে উত্তমর্ণের ব্যবসায়ে এত অধিক লাভ দেখিয়া অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী আসিয়া সে চক্রান্ত ভাঙ্গিয়া দিবে সন্দেহ নাই। সামান্যতঃ বিবেচনা করিতে গেলে ঋণ-প্রার্থীকে নিজ স্বার্থ বুঝিয়া দর করিতে দিলেই ভাল হয়—মহাজনের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে, তাহাতে দরের সাম্যভাব আপনাপনিই দাঁড়াইবে। কিন্তু একটী কথা এই যে, যে স্থলে চুক্তি-শাস্ত্রের নিয়ম খাটাইলে অন্যায় করা হয়, সে স্থলে কি কর্ত্তব্য। একজন রাইয়ৎ যদি নিতান্ত গরজে পড়িয়া কর্জ করিতে আসে, আর মহাজন তাহার গরজ বুঝিয়া তাহার নিকট হইতে কোন অন্যায় কঠোর সর্ত্ত লিখাইয়া লন, তবে সে সর্ত্ত হয়ত আদালতে অগ্রাহ্য হইবে। এই প্রকার অল্প টাকার ধার কর্জকারী রাইয়তের মহাজনের সহিত এরূপ অধীনতা সম্বন্ধ—একের উপর অন্যের অন্যায় ব্যবহার এরূপ সহজ-সাধ্য যে, এই সকল রাইয়তের রক্ষার জন্য কোন বিশেষ আইন করিলে অন্যায় হয় না। ৫০০ টাকার অনধিক দেনার মকদ্দমায় শতকরা ৯টাকার হিসাবে কিম্বা অন্য কোন নিয়মিত দরে সুদ ধরিয়া দেওয়া ও তদতিরিক্ত টাকা অগ্রাহ্য করা—কোর্টের এইরূপ সম্পূর্ণ অধিকার থাকা উচিত। এইরূপ হইলে মহাজনের অত্যাচার হইতে রায়তেরা অনেকটা নির্ব্বৃতি লাভ করে। যে সকল লোকেরা ৫০০ টাকার অধিক টাকা ধার কর্জ করে, তাহারা প্রায়ই আপনার হিতাহিত বুঝিতে সক্ষম, আর যে সকল মহাজনের অধিক টাকার কারবার, তাহাদের ভদ্রতা সততার উপরও বিশ্বাস করা যাইতে পারে, সুতরাং এই সকল লোকের জন্য কোন বিশেষ আইন আবশ্যক করে না—তাহাদের পরস্পর চুক্তিই তাহাদের উপর বন্ধনকারী।

বোম্বাই প্রদেশে রাইয়তওয়ারী বন্দবস্ত প্রচলিত বলিয়া সুদের কতকটা বর্দ্ধিতাকার দৃষ্ট হয়। এই বন্দবস্তে সদর খাজনা সময়ে সময়ে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা থাকাতে রাইয়তের ভুস্বত্বের অনিশ্চিত মূল্য—টাকা ধার দিবার সময় মহাজন তাহার উপর দৃষ্টি রাখিয়া অপেক্ষাকৃত অধিক দরে সুদ লইতে বাধ্য হয়।

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে দেনার টাকা আদায় করিবার ১২ বৎসর পর্য্যন্ত মেয়াদ ছিল, ঐ মেয়াদ অতীত না হইলে ঋণীর নিকট হইতে নূতন খত করিয়া লইবার রীতি ছিল না। তখনকার আইন অনুসারে শতকরা ১২ টাকার অধিক সুদ আদালতে অগ্রাহ্য হইত ও আসলের অধিক সুদ এককালীন পাইবার নিয়ম ছিল

না, সুতরাং কোন মহাজন ১০০ টাকা কর্জ দিয়া এককালে তাহা আদায় করিতে গেলে বার বৎসর অন্তে তিনি উর্দ্ধ ২০০ টাকার ডিক্রী পাইতে পারিতেন। এক্ষণে ঐ বিষয়ে তামাদির নিয়ম ৩ বৎসর, কাজেই রাইয়তেরা প্রায় দুই বৎসর অন্তর সুদ সমেত নূতন খত লিখিয়া দিতে বাধ্য হয়। অতএব ১০০ টাকার খত, শতকরা ২৫ টাকা মায় সুদ তাহা উল্লিখিত প্রকারে পুনঃ পুনঃ নবীকৃত হইয়া ১২ বৎসরের শেষে ঋণীর স্কন্ধে ১১৩৯ টাকার বোঝা নিক্ষেপ করিবে। রাইয়ত কমিসনর মধ্যে শম্ভুপ্রসাদ নামক একজন দেশীয় কমিসনর তামাদি সংক্রান্ত ৩ বৎসরের নিয়ম রাইয়তের ঋণভারগ্রস্ত হইবার এক প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তিনি রাইয়ত ও মহাজনের অনেকানেক পরীক্ষিত হিসাব হইতে স্বমত সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল হিসাব হইতে জানা যায় যে-১৮৫৯ এর পর থেকে প্রজাদিগের ঋণভার ক্রমিকই বৃদ্ধি পাইতেছে। যথা—

১৮৫৯ এর পূর্ব্বে কর্জ্জের টাকার সমষ্টি	...	২৬০০
সুদ	... ...	১৪৬০
		৪০৬০
দেনা শোধ	... ...	৩৪৬০
বাকী	... ...	৬০০

১৮৫৯ এর পরে কর্জ্জের টাকার সমষ্টি	...	২৯৩০
সুদ	... ...	৪৪২০
		৭৩৫০
দেনা শোধ	... ...	২৭৪০
বাকী	... ...	৪৬১০

শম্ভুপ্রসাদের মতে তামাদির পূর্ব্বকার মত দীর্ঘ মেয়াদ হইলে রায়তের বিস্তর উপকারের সম্ভাবনা। অন্যান্য কমিসনরেরা কিন্তু এই কথা বলেন যে, যদিও তামাদির নিয়ম পরিবর্ত্তনে রাইয়তের কতকটা অসুবিধা হইয়াছে, তথাপি তাহাদের হিসাব ১২ বৎসর ফেলিয়া রাখা অপেক্ষা ৩ বৎসর অন্তর দেনার নূতন বন্দবস্ত করাই শ্রেয়স্কর ও তাঁহারা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন যে অন্যান্য বিহিত উপায় অবলম্বিত হইলে আগেকার ১২ বৎসর মেয়াদে প্রত্যাবর্ত্তন অনাবশ্যক হইবে।

প্রচলিত নিয়মানুসারে মারওয়াড়ীর অনুগ্রহের উপর রাইয়তের সকল নির্ভর। মারওয়াড়ীর হস্তেই খত রক্ষিত হয়, রাইয়ত তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবসর পায় না। মারওয়াড়ী আপন ইচ্ছামত হিসাব প্রস্তুত করে, রাইয়ত তাহা গৃহে লইয়া গিয়া সময়মত পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারে না। অনেক সময় এমন দেখা গিয়াছে যে, রাইয়ত ঘোরতর কষ্টে পড়িয়া তাহার ভূমি সম্পত্তি মহাজনের নিকট বন্ধক রাখিয়াছে—অনেক বৎসর পরে তাহার অবস্থা একটু ভাল হইলে সে অথবা তাহার সন্তান সন্ততিগণ আপনাদের বন্ধক

বিষয় ছাড়াইয়া লইবার জন্য যত্নশীল হয়, কিন্তু তখন মহাজন অথবা তাহার বংশজ লোকেরা বহু কাল ভুক্ত বিষয় ছাড়িয়া দিতে সম্মত নহে। রাইয়ত আদালতে যাইতে বাধ্য হয়। মহাজন উত্তর দেয়—"এ সম্পত্তি বাদীর নহে—ইহা ত আমাদেরই হস্তে বংশ পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে—আমরা বন্ধকের কিছুই জানি না।" খত মহাজনেরই হস্তে রক্ষিত—বাদী সে বন্ধক কি রূপে সপ্রমাণ করিবে? এই সকলের প্রতিবিধান করা নিতান্ত আবশ্যক। এই প্রকার অন্যায় নিবারণের একটী সহজ উপায় আমাদের মনে হইতেছে। যে সকল ষ্ট্যাম্প কাগজের উপর খত লিখিত হয়, তাহার যদি দুই ভাগ পরস্পর সংযুক্ত থাকে—মধ্যে ছিদ্রময় রেখা (যেমন চেক বহিতে সচরাচর দৃষ্ট হয়)—আর যখন তাহার এক ভাগে খত লিখিত হয় তখন যদি তাহার সারাংশ অপর ভাগে লিখিবার নিয়ম থাকে, তাহা হইলে সেই শেষোক্ত ভাগটী খত হইতে ছিঁড়িয়া লইয়া রাইয়তকে দেওয়া যাইতে পারে। এইরূপ হইলে মূল খতের এক প্রস্ত রাইয়তের হস্তে রক্ষিত হয়। এই দুই ভাগ সহজে মিলাইয়া দেখিবার জন্ত দুয়ের উপরই সমান নম্বর থাকা আবশ্যক ও এইরূপ নিয়ম করা উচিত যে এক প্রস্তের উপর ঋণীর নাম ও অপর প্রস্তের উপর মহাজনের নাম স্বাক্ষরিত হইবে। যদি রাইয়তের হস্তস্থিত কাগজে কোন ভুল কি মিথ্যা বিষয় সন্নিবেশিত হয়, তাহা সহজে ধরা পড়িবে ও ঋণী তাহা মহাজনের নিকট হইতে তখনি শোধন করিয়া লইতে পারিবে। মহাজন রাইয়তকে মিথ্যা লিখিয়া দিতে সাহসী হইবে না, কেন না যদি সে তাহার খতের দাবীতে প্রকৃত ঋণের অধিক টাকার জন্ত নালিস করিতে যায়, তাহা হইলে তাহার নিজনাম স্বাক্ষরিত অপর প্রস্ত আদালতে উপস্থিত হইলেই তাহার প্রতারণা আবিষ্কৃত হইবে। এখনকার নিয়ম অনুসারে দেনার টাকার কতক ভাগ পরিশোধ করিলে তাহা কখন কখন মূল খতের পৃষ্ঠে লিখিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু সে খত মহাজনের নিকটেই থাকে—ঋণী কখন তাহা দেখিতে পায় না ও কর্জের টাকা লইয়া "এখন খত কাছে নাই পরে লিখিয়া দিব" এই বলিয়া মহাজন অনেক সময় ওজর করিয়া কাটায়। কিন্তু খতের অপর প্রস্ত ঋণীর হাতে থাকিলে আর এরূপ হইতে পারে না—টাকা দিবার সময় সে তাহার সংখ্যা সেই কাগজের উপর লিখিয়া দিতে মহাজনকে সহজেই বাধ্য করিতে পারে। এইরূপ হইলে রাইয়ত তাহার নিজের হিসাব সহজেই বুঝিতে পারে ও মহাজন কর্তৃক তাহার প্রতারিত হইবার তাদৃশ সম্ভাবনা থাকে না। ইহাতে আর এক প্রকার প্রবঞ্চনার দ্বার রুদ্ধ হয়। কখন কখন এরূপ ঘটে যে, খতের মেয়াদ অতীত হইলে পরেও রাইয়তের ধার শুধিবার সঙ্গতি নাই, মহাজনেও তাহাকে বিরক্ত করিতেছে ও আদালতে যাইবার জন্ত ব্যস্ত, তখন রাইয়ত অনেক বলিয়া কহিয়া পুরা-

তন খতের পরিবর্ত্তে তাহাকে এক নূতন খত লিখিয়া দেয়। এই সকল স্থলে নূতন খত লিখিয়া লইয়াও প্রলুব্ধ মহাজন তাহাতে পুরাতন দেনার পরিশোধ স্বীকার করেন না। পুরাতন খতের পরিবর্ত্তে নূতন খত লিখিত হইয়াছে রাইয়তের তাহা সপ্রমাণ করিবার কোন উপায় নাই। যদি নূতন খতে পুরাণ ঋণের কোন উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে মহাজন এই দুই খতের পৃথক টাকা আদায় করিয়া লইতে সক্ষম হয়—তাহার বিরুদ্ধে ঋণীর কোন কথা কহিবার উপায় থাকে না। আবার ইহার বিপরীতে কথন কথন দেখা যায় যে ঋণী তাহার ঋণভার হইতে মুক্ত হইবার জন্য মিথ্যা করিয়া বলে যে পুরাতন দেনার পরিবর্ত্তে সে নূতন খত লিখিয়া দিয়াছে। উল্লিখিত প্রণালী অবলম্বিত হইলে, রাইয়ত ও মহাজন উভয়েরই এই প্রকার অসত্য ব্যবহারের দ্বার রুদ্ধ হইবে, সুতরাং মিথ্যা মকদ্দমা উঠিয়া ন্যায়ের আদালতকে কলঙ্কিত করিতে পারিবে না।

এক্ষণকার আইনের বলে মহাজনের কর্জ্জ আদায় করিবার যেরূপ সুবিধা, রাইয়ত তাহার পাকচক্র হইতে সে পরিমাণে সুরক্ষিত নহে, এই বিষয় লইয়া কমিসনরগণ অনেক কথা কহিয়াছেন। তাঁহাদের মতে প্রচলিত আইন মহাজনের অত্যাচারের বিশেষ পোষকতা করে। পূর্ব্বকার দেশীয় প্রথানুসারে মহাজন রাজার নিকট হইতে ঋণ আদায় করিবার বিশেষ কোন সাহায্য পাইত না। তখনকার ঋণ আদায়ের প্রথা স্বতন্ত্র ছিল। মহাজন ইচ্ছামত ঋণীকে কারারুদ্ধ করিয়া ও খাটাইয়া লইতে পারিতেন। ঋণ আদায়ের জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইত তাহা এই:—

"তাগাদা" অর্থাৎ ঋণীকে টাকার জন্যে বার বার তাগাদা করিয়া উত্ত্যক্ত করা—

"মোহস্‌সলী" অর্থাৎ তাগাদা করিবার জন্য ঋণীর নিকট দূত পাঠান ও ঋণীকে তাহার খোরাক যোগাইতে বাধ্য করা—

"ধন্না" ঋণীর দ্বারে ধন্না দিয়া বসিয়া থাকা—

"ত্রাগা" অর্থাৎ টাকা না পাইলে ঋণীকে আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখান—

ইত্যাদি অনেক প্রকার নিয়ম ছিল; ইহাতে যেমন ঋণীর উপর পীড়ন তেমনি মহাজনেরও সামান্য কষ্টভোগ নহে। মহাজনের টাকার জন্য রাইয়তের বলদ কৃষিযন্ত্র প্রভৃতি ক্রোক করিয়া তাহাকে নিঃসম্বল করিবার নিয়ম দেশীয় রাজত্ব কালে প্রচলিত ছিল না। ঋণের জন্য বংশ পরম্পরা ভোগ্য ভূমি সম্পত্তি বিক্রীত হইত না। মহারাষ্ট্র দেশে কখনই এরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। সেখানকার রাইয়তেরা অধিকাংশই মিরাসদার বলিয়া গণ্য ছিল ও মিরাসী স্বত্বের নিয়মই এই যে রাইয়ত সে স্বত্ব হইতে কখনই বঞ্চিত হইবার নয়—ছাড়িয়া দিলে যখনি ইচ্ছা তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারিত। ১৮২৭ সালের আইনে মহাজনের ঋণ আদায় সম্বন্ধে নিজস্ব ক্ষমতা প্রত্যাহৃত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে আদালত সকল স্থাপিত হয়। তথাপি তখনকার

আইন ঋণীর পক্ষে অনেক সুবিধাজনক ছিল—সুদের দরের সীমা নিরূপিত ছিল, মহাজনেরা তদতিরিক্ত সুদ গ্রহণ করিতে পারিত না; অপিচ কৃষকের স্বীয় জীবিকা ও কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, তাহার ক্রোক ও বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিল। কাল সহকারে এই সকল নিয়ম পরিবর্ত্ত হইল। বর্ত্তমান আইন সম্বন্ধে কমিসনরগণ নিম্নলিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন;—

ঋণ আদায় করিতে হইলে হয় ঋণীর উপার্জ্জিত ও অর্জনীয় বিষয় বিক্রয়, নয় তাহার ও তাহার পরিবারের কায়িক পরিশ্রম গ্রহণ করা—এই দুই উপায় অবলম্বিত হইতে পারে। যে আইনে অবাধে এই সকল উপায় নিয়োজিত হয়, তাহা পারত পক্ষে মহাজনেরই বিশেষ অনুকূল। এদেশের আইন এবিষয়ে মহাজনের যেন পক্ষপাতী। আর কোন আধুনিক আইন তেমন আছে কি না সন্দেহ। এই আইন মতে ঋণী সপরিবারে মহাজনের নিকট ধন প্রাণে যেরূপ আবদ্ধ, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যদিও আইনে দাসত্বের কোন স্পষ্ট উল্লেখ নাই, তথাপি যখন অশক্ত ঋণীকে বন্দীখানায় প্রেরণ করা মহাজনের ইচ্ছাধীন, তখন পক্ষান্তরে দাসত্বই প্রশ্রয় পাইতেছে বলিতে হইবে। কেন না অনেক দেনদার কারাবাস অপেক্ষা মহাজনের দাসত্ব অল্প যন্ত্রণাদায়ক জ্ঞান করিয়া তাহাতেই ব্রতী হইবে সন্দেহ নাই। কারাবাস ভয়ে যে অনেক সময় রাইয়তকে মহাজনের দাসত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাহার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এইত ঋণের জন্য ঋণীর কায়িক দায়িত্বের কথা বলা হইল। তাহার বৈষয়িক দায়িত্ব সম্বন্ধে দৃষ্ট হইবে যে, আইনে মহাজনের হস্তে ঋণীর বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া লইবার অগাধ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে। ঋণীর নিজের কিম্বা তাহার স্ত্রী-পুত্র পরিবারের একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুও সে ক্ষমতার বহির্ভূত নয়। ঋণীর পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিবার কোন বাধা নাই, একবার মাত্র তাহাকে হৃতসর্ব্বস্ব ও নিঃসম্বল করিয়া ছাড়িয়া দিলেই যে, সে নিস্তার পাইল তাহা নহে, কিন্তু যখনি আবার সে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করে, অমনি মহাজন আসিয়া তাহা নিঃশেষ করিয়া লইতে পারে। এইরূপে তাহাকে পুনঃ পুনঃ পীড়ন করিবার ক্ষমতা আইন কর্ত্তৃক মহাজনের হস্তে অর্পিত। সভ্যজাতির আইনে মহাজনকে যতদূর আশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহার অধিক প্রদত্ত হইয়াছে। যে সাধারণ সর্ব্ববাদী সম্মত আইন অনুসারে দেউলিয়া হইয়া ঋণের দায় হইতে নিষ্কৃতি লাভের নিয়ম আছে, এদেশের রাইয়তের ভাগ্যে সে লাভ টুকুও নাই। এবিষয়ে আর কোন দেশে ভারতবর্ষের আইনের ন্যায় কঠোর আইন আছে কি না সন্দেহ। মুসার বিধানেও "ঋণী সাতবৎসর চাকরী করিয়া মুক্তি-লাভে সমর্থ হইত।"

কমিসনরগণ যখন এদেশীয় আইনের

উপর উক্তরূপ দোষারোপ করিয়াছিলেন, তখন নূতন দেওয়ানী কার্য্য বিধি আইন (Civil Procedure Code) প্রচলিত হয় নাই, আইন-প্রস্তুত-কারী-জাঁতায় পেশিত হইতেছিল মাত্র। এই আইনের গুণে পূর্ব্বকার ঋণ সম্বন্ধীয় কঠোর নিয়ম সকল অনেকাংশে সংশোধিত হইয়াছে। ঋণী মহাজনের নানাবিধ অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। এক্ষণে আর তাহার হলবলদ প্রভৃতি আবশ্যক সামগ্রী সকল ডিক্রীজারীদ্বারা ক্রোক ও বিক্রয় করিবার নিয়ম নাই।—দেনার দরুণ কারাবাসের মেয়াদ স্বল্পীকৃত হইয়াছে—যাহাতে রাইয়তের ভূসম্পত্তি প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অনেক অল্প দরে বিক্রীত হইতে না পারে তাহার বিহিত উপায় সকল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে ও সে যাহাতে অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে ঋণবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে তাহার উপযোগী (Insolvency) নিয়ম সকল রচিত হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। দেনার জন্য রাইয়তের জমী হস্তান্তর হইতে দেওয়া উচিত কি না, এবিষয়ে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়। অনেকানেক বিদ্বানের মত এই যে, স্থাবর সম্পত্তি একশ্রেণীর লোকের মধ্যে বাঁধিয়া রাখিবার নিয়ম কখন হিতাবহ হইতে পারে না। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় ভূমির ব্যবস্থাও প্রতিজনের স্বেচ্ছাধীন রাখা কর্ত্তব্য। প্রকৃতির নিয়মই এই যে বলীর হস্তে দুর্ব্বলের পরাজয়—ধনীর নিকট দরিদ্রের পরাজয়। ধনবান্ জমীদার নির্ধন রাইয়তের স্থান অধিকার করিলে মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গল নাই। যে সকল লোক আপনাদের বিষয় আপনারা রক্ষা করিতে অক্ষম—বিষয়ের উন্নতি সাধনে অসমর্থ তাহাদের ঠেকা দিয়া রাখিবার প্রয়োজন কি? তাহাতে কি দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে? গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বৃদ্ধি হইবে? আধুনিক ব্রিটিশ রাজ্যের নিয়মই এই যে যাহারা ইহার নবোত্থিত ঘটনাস্রোতের সহিত সন্তরণ করিয়া কার্য্য করিবে, তাহাদেরই জয়। লক্ষ্মী তাহাদের প্রতিই প্রসন্ন। ধন সঞ্চয় করিলেই ভূমি সম্পত্তি করিবার স্বাভাবিক স্পৃহা উদ্দীপ্ত হয়, তাহা কি কতকগুলি কৃত্রিম নিয়ম দ্বারা নির্ব্বাপিত করা উচিত? রাইয়ত আবহমান কাল হইতে একখণ্ড ভূমি কর্ষণ করিয়া আসিতেছে বলিয়াই কি তাহার স্বত্ব চিরস্থায়ী রাখিতে হইবে? সে যদি ঋণভারে এরূপ আক্রান্ত হইয়া পড়ে যে গবর্ণমেণ্টের খাজনার জন্যও তাহাকে মহাজনের শরণাপন্ন হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার দ্বারা কি কৃষিকার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে—সে জমী তাহার হস্ত হইতে মহাজনকে দিলে কি ভাল হয় না?

ইহার বিপক্ষ দলের লোকেরা বলেন, এরূপ যুক্তি যেমন শ্রুতিমধুর, কার্য্যে তেমন ফলোপধায়ী দেখা যায় না। বার্ত্তা-শাস্ত্রের সমুদয় নিয়ম এদেশে খাটে না। দেখিতে হইবে যে অমুক নিয়ম এদেশের সামাজিক অবস্থার উপযোগী কি না। জাতিভেদ প্রথা—চিরন্তর দেশাচার—কুলাচার সকল দিক্

ভাবিয়া তাহার ফলাফল নিরূপণ করিতে হইবে। অহিফেন সেবন অনিষ্টকারী সত্য, কিন্তু তাহা একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। ভূমির উপর দেশীয়দের মমতা এরূপ প্রগাঢ়—সামাজিক নিয়ম ও কুলাচারের সঙ্গে তাহা এরূপ অনুস্যুত, যে তাহা ভগ্ন করিয়া সেই ভূমি পরহস্তগামী করা সামান্য কঠোর কার্য্য নহে। এতৎ সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের একান্নবর্ত্তী পরিবারের নিয়ম বিবেচনা-যোগ্য। এক পরিবারের মধ্যে প্রতিজনে স্ব স্ব অংশ হস্তান্তর করিবার অধিকারী অথবা এইরূপ স্থলে পরিবারস্থ সমস্ত লোকের সাধারণ সম্মতি আবশ্যক কি না—এবিষয়ে হিন্দু আইন শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় মতভেদ দৃষ্ট হইবে। বোম্বাই অঞ্চলে বৈধ বিক্রয়ের জন্য সর্ব্বসম্মতি আবশ্যক, এই নিয়ম হিন্দু শাস্ত্র সম্মত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। একত্রিত পরিবারের অবিভক্ত স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে অপর কোন ব্যক্তি প্রবিষ্ট হইলে সমূহ অনিষ্টের সম্ভাবনা। এক পরিবারের বসতিবাটীর একভাগ ক্রয় করিয়া তাহাতে যদি একজন ভিন্ন জাতীয় আগন্তুক আসিয়া বাস করে, তাহা হইলে হয়ত সমুদায় পরিবারকে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য করিতে পারে।

তুমি বলিতেছ ধন হইলেই ভূমি সম্পত্তি করিবার ইচ্ছা জন্মে, কিন্তু তাহা না করিলেই বা ক্ষতি কি? সেই ধন বাণিজ্য ব্যবসায়ে পরিচালিত হইলে কি দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না? আরো জিজ্ঞাস্য এই, যখন মহাজন রাইয়তের যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করাইয়া তাহার ভূমি দশমাংশ মূল্যে কিনিয়া অধিকার করে, তখন তাহারা কি সেই ভূমির উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হয়? কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধন, বাপী পুষ্করিণী খনন—ভূমির সারবত্তা বর্দ্ধন—মহাজন জমীদার কি এই সকল কার্য্যে মনোযোগী হন? তাঁহাদের যত্নে কি ভূমির মূল্য বৃদ্ধি—কৃষির উন্নতি—কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতে দেখা যায়? অনেক সময় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। মহাজন সেই পুরাতন রাইয়তকেই নিযুক্ত করেন—ভূমি ও ফসলের অবস্থা সমানই থাকে—কৃষি কার্য্যের উন্নতি নাই, কেবল কৃষকের অবস্থান্তর উপলক্ষিত হয়—পূর্ব্বে যে ব্যক্তি স্বয়ং ভূস্বামী ছিল, সে এক্ষণে মহাজনের খেতুত হইয়া সেই ভূমি কর্ষণ করে ও আপনার শ্রমজাত সমস্ত দ্রব্য প্রভুর চরণে ঢালিয়া দেয়। এই সকল মহাজনের অর্থোপার্জনশক্তি ভিন্ন এমন আর কি শক্তি—কি ঔদার্য্য—পৌরজনোচিত এমন কি গুণ আছে, যেজন্য দেখিয়া রাজা রাইয়তের সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে প্রবৃত্ত হইবেন?

যে সকল প্রদেশে রাইয়তওয়ারী বন্দবস্ত প্রচলিত, রাজাই সেখানকার ভূস্বামী—রাজাই জমিদার। তিনি যাহাকে ইচ্ছা ভূমি দান করিতে পারেন। তিনি যদি এরূপ নিয়ম করেন যে কোন মহাজন রাইয়তকে তাহার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবে না, তাহাতে কাহারো কোন কথা কহিবার অধিকার নাই। রাজা বলিতে পারেন, আমি কোন মধ্যবর্ত্তী ভূস্বামী চাহি না। তুমি

হয় নিজে ভূমি কর্ষণ কর কিম্বা অন্য কোন কৃষককে তোমার স্থান অধিকার করিতে দেও। যদি তোমার স্বত্ব বিক্রয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহা মহাজনের নিকট করিও না। যে ব্যক্তি স্বয়ং কৃষিকার্য্য চালাইতে অক্ষম, সে যেন ভূম্যধিকারী না হয়।" রাজা এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন যে তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোন রাইয়ত তাঁহার অধিকৃত ভূমি হস্তান্তর করিতে পারিবে না। তিনি এইরূপ নিয়ম প্রচার করিতে পারেন যে, যতটুকু ভূমির উপস্বত্ব হইতে একটী পরিবারের সচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাতে কোন মহাজনের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার থাকিবে না। সেই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমীর ফসল ও তাহা চাস করিবার উপযোগী হল বলদ প্রভৃতি এবং রাইয়তের বসতিবাটীর উপর ডিক্রীজারী করিয়া তাহা কেহ নিলামে বিক্রী করাইবার অনুমতি পাইবে না। তাহার অতিরিক্ত ভূমি এবং কেবল ততটুকু মাত্র কোর্টের আদেশক্রমে নিলামের পাত্র হইতে পারে। *

রাইয়তকে ঋণভার হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে সকল উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ও তদ্ভিন্ন অন্যান্য উপায় বিবেচনা পূর্ব্বক অচিরাৎ অবলম্বন করা গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের আইন-সভা হইতে প্রজাদিগের মতামতের অপেক্ষা না রাখিয়া তাহাদের জন্য বর্ষে বর্ষে ভূরি ভূরি আইন বর্ষণ হইতেছে। ইহা হইতে দেশীয় সংবাদপত্রের মুখবন্ধ করিয়া এক ভয়ঙ্কর আইনের সৃষ্টি হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে রাজস্ব-বর্দ্ধনকারী ভীষণ-দর্শন আইন-রাক্ষস সকল প্রসূত হইতেছে। কিন্তু ১৮৭৫ সালে যে কমিশন বসে, তাহার দ্বারা বোম্বাই রাইয়তের শ্রীবৃদ্ধি সাধনোপযোগী যে সকল উপায় সূচিত হয়, তাহা বিধিবদ্ধ করিয়া আইন প্রস্তুত করিতে এত বিলম্ব হইবার কারণ কি? রাজাই যখন জমীদার—জমীদারের অধিকারের সঙ্গে জমীদারের কর্ত্তব্য ভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে। শুদ্ধ নিয়মিত খাজানা আদায় করিয়া রাজ-ভাণ্ডার স্ফীত করিতে পারিলেই যে তিনি সে ভার হইতে মুক্ত হইলেন তাহা নহে—রাইয়তের সুখ দুঃখের প্রতি তাঁহার বিশেষ-রূপ দৃষ্টি করা আবশ্যক। তিনি যদি মহাজনের অত্যাচার হইতে রাইয়তকে উদ্ধার করিতে চাহেন, তবে তিনি নিজেই মহাজনের স্থান গ্রহণ করুন। গবর্ণমেণ্ট হইতে যদি রাইয়তদিগকে প্রয়োজন মত অল্প সুদে টাকা ধার দিবার নিয়ম জারী হয়, তাহা হইলে বিস্তর শুভফল প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এইরূপ নিয়ম জারি করিবার বিশেষ কোন প্রতিবন্ধক নাই। যেখানে মহাজন বৎসরে শতকরা ৩৬টাকার হিসাবে সুদ না লইয়া ক্ষান্ত হয় না, সেখানে গবর্ণমেণ্ট তাহার ষষ্ঠাংশ সুদ গ্রহণ করিলেও ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না। মহাজনের টাকা আদায় করিবার যে বিঘ্ন বিপত্তি, গবর্ণমেণ্টের তাহার শতাংশের একাংশও

* The land and the law in India. By Raymond West.

নহে। গবর্ণমেণ্ট মহাজনের স্থান অধিকার করিলে রাইয়ত প্রবঞ্চনার ভয় হইতে মুক্ত হয়। জাল খত, হিসাবে গোল, সকলি ঘুচিয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট রাইয়তের মহাজন হউন, গবর্ণমেণ্ট আবার তাহাদের কোষাধ্যক্ষ হউন। রাইয়ত অনেক পরিশ্রমে অল্প স্বল্প যাহা কিছু জমাইতে পারিবে, তাহা সে গবর্ণমেণ্টের হস্তে গচ্ছিত রাখিয়া নিঃশঙ্ক হউক। এক্ষণে যেমন Saving's Bank স্থানে স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বত্র বিস্তারিত হউক, যাহাতে ক্ষুদ্র পল্লীর রাইয়ত পর্য্যন্ত তাহার ফলভাগী হইতে পারে।

ব্রিটিশ শাসন যদি অসংখ্য অসংখ্য রাইয়তের কল্যাণকর না হইল, তবে আর কি হইল। পরিশ্রমী মিতাচারী বিনীত রাইয়ত, মোগল, মহারাষ্ট্রী, পিণ্ডারীদিগের লুটপাট দৌরাত্ম্যের মধ্যে যদি উন্নতশির থাকিয়া আত্মরক্ষণে সমর্থ হইত, তাহা হইলে ব্রিটিশ রাজ্যের আশ্রয়ে তাহাদের কত কল্যাণের সম্ভাবনা। কত বৎসর যুদ্ধ বিপ্লবের নামগন্ধ পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে—অন্যায় অত্যাচারের স্থানে বিশুদ্ধ ন্যায়ের আদালত সকল স্থাপিত হইয়াছে—বাণিজ্য ব্যবসা প্রবৃত্ত হইয়াছে—অনিয়মিত করের পরিবর্ত্তে ভূমির পরিমিত খাজানা নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা সত্ত্বেও রাইয়তের এরূপ দুর্দ্দশা কেন? চতুর্দ্দিক্ হইতেই তাহার আর্ত্তনাদ শ্রবণ করা যায়। সে দুরূহ ঋণভারে আক্রান্ত। মহাজনের দৌরাত্ম্যে তাহারা ধন প্রাণে মারা যাইতেছে। মহাজন আদালতের সাহায্য লইয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে—তাহার বসতিবাটী—ধন ধান্য—পশু—পরিবার বস্ত্র পর্য্যন্ত ডিক্রীজারী করিয়া লুটিয়া লইতেছে। তাহার পিত্রার্জ্জিত ভূমি সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করিয়া তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতেছে—তাহাকে চিরদাসত্বে নিযুক্ত অথবা কারাবদ্ধ করিয়া পীড়ন করিতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার ঔষধ কি? এই সকল অত্যাচার নিবারণের উপায় কেন অচিরাৎ অবলম্বিত হয় না?

আমাদের বিবেচনায় সকল অপেক্ষা রাইয়তের কল্যাণ সাধনের উৎকৃষ্ট উপায় তাহাকে শিক্ষা দান। শিক্ষাদান ব্যতীত আর আর সমস্ত উপায় ব্যর্থ হইবে। যতদিন রাইয়তেরা অজ্ঞান জালে আবৃত থাকিবে, যতদিন না তাহারা আপনার হিতাহিত বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারিবে, ততদিন তাহাদের নিস্তার নাই। তাহার মঙ্গল উদ্দেশে যতই কর না কেন, শিক্ষার অভাবে সে তাহার সম্যক্ লাভ গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইবে। কাল যদি গবর্ণমেণ্ট আইনের বলে তাহার সমুদায় দেনা পরিশোধ করিয়া দেন, রাইয়ত সেই অজ্ঞানান্ধ থাকিলে পরশ্ব আবার হয়ত ঋণপাশে বদ্ধ হইয়া পূর্ব্বদশা প্রাপ্ত হইবে। শিক্ষাদানই এই সকল দুর্গতি নিবারণের একমাত্র ঔষধ। যেমন উচ্চশ্রেণীর লোকদের হিতকারী উচ্চ শিক্ষা দানে গবর্ণমেণ্ট ব্রতী হইয়াছেন, সেইরূপ নিম্নশ্রেণীস্থিত সাধারণ জনগণের উপযোগী সহজ লিখন পঠন

শিক্ষা প্রচারেও তাঁহাদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্তে গ্রামে গ্রামে ও ক্ষুদ্র পল্লীসমূহেও বিদ্যালয় পাঠশালা সকল স্থাপিত হউক। শুদ্ধ লেখাপড়া শিক্ষা নয়, অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় কৃষিবিদ্যা শিক্ষাও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্থানে স্থানে কৃষিবিদ্যালয়—স্থানে স্থানে উন্নত কৃষিকার্য্যের উৎসাহ বর্দ্ধনকারী আদর্শক্ষেত্র সকল (Model farms) প্রতিষ্ঠিত হউক—অসংখ্য অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হউক—তাহার বুদ্ধিবৃত্তি সকল মার্জ্জিত হউক—তাহাদের অবস্থার উপযোগী শিক্ষালাভের উপায় সকল কল্পিত হউক। তাহা হইলে রাজা প্রজা উভয়েরই কল্যাণ—তাহা হইলেই ব্রিটিশ রাজ্যের কীর্ত্তিস্তম্ভ ভারতবর্ষে এরূপ বদ্ধমূল হইবে যে তাহা কোনকালেই বিলুপ্ত হইবে না।

লিখিতে লিখিতে "বোম্বাই ঋণগ্রস্ত রাইয়ত রক্ষণকারী বিল্" আমাদের হস্তগত হইল। এই বিল্ সম্প্রতি কর্ক্রেল্ সাহেব ভারতবর্ষীয় আইন সভায় উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হইতেছে যে, রাইয়ত-কমিসনের পরিশ্রম ব্যর্থ যায় নাই, তাঁহারা রাইয়তদিগের ঋণ মোচনের যে সকল উপায় উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তাহা লইয়া কর্ত্তৃপক্ষদের মধ্যে আন্দোলন চলিতেছে ইহা এক শুভ চিহ্ন। প্রস্তাবিত আইন সেই আন্দোলনের ফল স্বরূপ পরিগণিত হইতে পারে।

কর্ক্রেল সাহেবের বক্তৃতা হইতে জানা যাইতেছে যে গতবর্ষে বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট, ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সাহেব কর্ম্মত্যাগ করিবার কিছু পূর্ব্বে, কমিসনের সমুদায় রিপোর্টখানি সমালোচন করিয়া ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টে এক পত্র লেখেন। মহারাষ্ট্রীয় রাইয়তদের ঘোরতর ঋণভার ও তৎকারণ বিষয়ে কমিসনরগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট তাহার সহিত একমত হইয়াছেন, কিন্তু প্রচলিত খাজানার আকার অথবা সেই খাজানা আদায়ের কঠোর নিয়মাবলী যে রাইয়তদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন নাই।

ভূমি সম্পর্কীয় খাজানার আকার ও রাজস্ব আদায় বিষয়ে কমিসনরগণ যে সকল অস্ফুট মত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় কার্য্যে পরিণত করা কঠিন। তাহা করিতে হইলে ফসলে খাজানা গ্রহণ করিবার প্রাচীন প্রথা অবলম্বন করিতে হয়। এই অবনতিকারক প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তনে গবর্ণমেণ্ট কখনই সম্মতি দিতে পারেন না। আর যদি খাজানার কোন নিয়মিত দর বাঁধিয়া না দেওয়া যায়, তাহা হইলে রাইয়তের কি দেয়, তাহা লইয়া গোল উঠিবার সম্ভাবনা। গবর্ণমেণ্ট ও রাইয়তের এই অনিশ্চিত সম্বন্ধ থাকিলে তাহা হইতে যে অমঙ্গল নিরাকৃত হইবার কথা হইতেছে, তদপেক্ষাও অধিক অমঙ্গল প্রসূত হইবে।

এক্ষণকার আইন ও আদালতের ছায়ায়ে রাইয়তের যে অবস্থান্তর লক্ষিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট এই অভিপ্রায়

প্রকাশ করেন যে, রাইয়তের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার দুই প্রধান কারণ,—এক দেনা আদায় সম্বন্ধীয় মকদ্দমায় তামাদি মেয়াদের স্বল্পীকরণ ও রাইয়তের বিরুদ্ধে মকদ্দমার একতরফা নিষ্পত্তির সুলভতা। অতএব তাঁহারা কমিসন রিপোর্টে প্রস্তাবিত বিষয়ের মধ্যে এই সকল বিষয় অনুমোদন করিয়াছেন।

১। রাইয়তেরা মহাজনদিগকে যে সকল কর্জ্জখত লিখিয়া দেয়, তাহা একজন গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারীর সমক্ষে লিখিত ও রেজিষ্টরি করা হয়।

২। দেনার টাকা পাইলে রাইয়তকে অবশ্য তাহার রসিদ দিতে হইবে। রাইয়তের ইচ্ছামত তাহাকে মধ্যে মধ্যে হিসাব দেখাইতে ও লিখিয়া দিতে হইবে।

৩। দেনার মকদ্দমা উপস্থিত হইলে আদালতে যাহাতে তাহার সুবিচার হয় তাহার উপায় বিধান করা।

১৮৫৯ সালের পূর্ব্বে দেনার জন্য যে তামাদি আইন প্রচলিত ছিল, বোম্বাই গবর্ণমেন্ট তাহা পুনঃ স্থাপন করিবার পরামর্শ দেন।

দেনার জন্য গ্রেপ্তার ও কারাবাস উঠাইয়া দেওয়া ও স্থাবর সম্পত্তির উপর ডিক্রীজারী করিয়া তাহা নিলাম হইতে মুক্ত রাখা—এই দুই প্রস্তাব তাঁহাদের মনঃপূত হয় নাই।

ইহার পর আবার এই বর্ষে বোম্বাই গবর্ণমেন্ট নিম্নলিখিত বিষয় সকল আইনে বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব করেন।

প্রথমত (ক) যে কোন মকদ্দমা উপস্থিত হউক না কেন, প্রতিবাদী উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, কোর্ট তাহার সম্পূর্ণ বিচার করিতে বাধিত হইবে।

(খ) যদি কোন ব্যক্তি কোর্টে আসিয়া পৈতৃক ঋণ শুধিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে সে অন্য কথা, কিন্তু তাহা না হইলে কেহ পৈতৃক ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য নয়।

(গ) চক্রবৃদ্ধি সুদ (Compound Interest) অগ্রাহ্য, আসল টাকার অধিক সুদ কেহ এককালীন দিতে বাধ্য হইবে না।

দ্বিতীয়ত (ক) কোন ঋণী উপস্থিত হইয়া ঋণ পরিশোধে অসামর্থ্য জানাইলেই সে তাহা হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হইবে, তাহাকে কোর্টে গ্রেপ্তার করিয়া আনিবার আবশ্যক নাই।

(খ) যে জমী দেনার জন্য বন্ধক রাখা না হয়, আর সেই বন্ধক খত আইন মত রেজিষ্টরি করা না হয়, কোর্টের হুকুমে সে জমীর নিলাম হইবে না।

প্রস্তাবিত আইনে যে সকল বিষয় বিধিবদ্ধ হইবার কথা হইতেছে তাহা এই;—

১। প্রতিবাদী গ্রেপ্তার না হইয়াও যদি কোর্টে আসিয়া ঋণ মুক্তির জন্য আবেদন করে, তবে তাহার অবস্থানুসারে তাহাকে দেউলিয়া স্থির করা কোর্টের ক্ষমতা থাকিবে।

২। যে জমী দেনার জন্য বন্ধক রাখা হইয়াছে তাহা ব্যতীত অপর কোন জমী দেনার ডিক্রীতে নিলামের পাত্র নহে।

৩। স্থাবর সম্পত্তির বন্ধক সম্বন্ধীয় চুক্তি লিপিবদ্ধ ও রেজিষ্টরি করিতে হইবে।

উপরি উক্ত আইন এইক্ষণে কেবল মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত কয়েকটী তালুকে আবদ্ধ—ইহার ফলাফল দেখিয়া ভবিষ্যতে ইহা অন্যান্য স্থানে বিস্তারিত হইবে এইরূপ আশা করা যাইতে পারে।

মেকলের ভারতবর্ষ প্রবাস।

(২)

খ্রীষ্টাব্দ ১৮৩৪ ফেব্রুয়ারি মাসে মেকলে ভারতবর্ষ প্রয়াণোদ্দেশে তাঁহার হানা ভগিনী সমভিব্যাহারে পোতারোহণ করেন। ইংলণ্ড ছাড়িয়া অবধি এদেশে পদনিক্ষেপ পর্য্যন্ত তাঁহাদের সমুদ্র ভ্রমণের বিশেষ কোন বর্ণনীয় ঘটনা নাই। এই সমুদ্র ভ্রমণের কথা উল্লেখ করিয়া মেকলে এক স্থানে লিখিয়াছেন—"আমার সহযাত্রীদের বিশেষ বিবরণ হানার নিকট হইতে পাইবে, এ আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি। কেন না হানা সকলেরই সঙ্গে আশ্চর্য্য মিশিতে পারিত—সন্ধ্যার সময় পুরুষদের সহিত নৃত্য করা—সকাল বেলায় মহিলাদের সঙ্গে উপকথা ও বক্তৃতাদির গ্রন্থ পাঠ—এই তার কাজ। ঘরের কোন স্ত্রীলোকের সহিত আমার কখন সাক্ষাৎ হইলে আমি বিনয় রক্ষার মত দু চারিটি কথা কহিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতাম, কিন্তু তাহাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ যত অল্প হয় তাহার চেষ্টার ত্রুটি করিতাম না। আহারের সময় ভিন্ন আমার জনমানবের সঙ্গে একটু কথা কওয়াও প্রায় ঘটিত না। আমার হাতে যত সময় পড়িয়াছিল এতটা সময় আর কখনো আমার ইচ্ছামত কাটাইবার সুযোগ পাইয়াছি কি না সন্দেহ। আর ইহাও আহ্লাদের সহিত বলিতে পারি যে আমি আপনিই আপনাতে সন্তুষ্ট থাকিতাম—কাজের অভাব বোধ হইত না। আমি আমার সমুদ্র ভ্রমণের সমুদায় কাল প্রগাঢ় ও দিন দিন নূতন আনন্দের সহিত নিরবধি গ্রন্থপাঠ করিতাম। গ্রীক লাতিন স্পানীয় ইতালীয় ফরাসিস ইংরাজী ছোট বড় মধ্যম রাশি রাশি পুস্তক গলাধঃকরণ করিতাম।"

১০ই জুনে জাহাজ মান্দ্রাজ আসিয়া নোঙর করিল। ভারতবাসীদের মধ্যে মেকলের প্রথম পরিচয় এক নাবিকের সঙ্গে—সে সেই উত্তরঙ্গ সমুদ্রের উপর দিয়া তাহার ক্ষুদ্র নৌকা বাহিতে বাহিতে জাহাজে আসিয়া উপস্থিত। "তাহার মস্তকে ত্রিকোণাকৃতি একটি টুপি ভিন্ন আর কোন পরিধেয় বস্ত্র ছিল না। সে আমাদের মধ্যে কেমন ভদ্র ও অসঙ্কুচিত ভাবে বিচরণ করিতেছিল—তাহার কৃষ্ণবর্ণ ও অনাবৃত দেহ দেখিয়া আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই।" তৎপরে অন্যান্য দূত আ-

সিয়া সংবাদ দিল যে গবর্ণর জেনেরাল সাহেব নীলগিরি পর্ব্বতে উতকামুণ্ড নগরে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ সে স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। সে সময়কার কর্ম্মের ভীড় এমনি যে কৌন্সিল সভার অধিবেশন আবশ্যক—ইংলণ্ড হইতে নবাগত সভ্য তথায় না গেলে চলে না। মেকলের তাঁহার ভগিনীর জন্য ভাবনা হইল যে কি করিয়া এই প্রখর গ্রীষ্মের সময় তাঁহাকে লইয়া দুই শত ক্রোশ পথ অতিক্রম করেন। সৌভাগ্যক্রমে কলিকাতা হইতে সুবিখ্যাত বিশপ উইলসনের নিকট হইতে তিনি এক পত্র পাইলেন যে তাঁহারা ভ্রাতা ভগিনীতে তাঁহার বাটীতে ভারতবর্ষ প্রবাসের প্রথম কয়েকদিন যাপন করেন। হানা এই সুযোগে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন ও তথায় তিনি বিশপের ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। গবর্ণর জেনেরলের স্ত্রী তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন ও ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে ভাব দৃঢ়ীভূত হইল। মেকলে মান্দ্রাজে নামিয়া নূতন দেশ, নূতন লোকের মধ্যে পড়িয়া তাঁহার ভগিনীর বিচ্ছেদ যন্ত্রণা বিস্মৃত হইলেন।

প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাঁহার পক্ষে সকলি নূতন ও কৌতূহলময় বোধ হইল। তিন মাস সমুদ্র যাপনের পর প্রথমে ডাঙ্গায় নামাই এক প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন। তার পর আবার সকলি নূতন দৃশ্য। কাল মাথার উপর সাদা পাগড়ী পরিচ্ছদ নূতন প্রকার। ঘর বাড়ী গাছ পালা জলবায়ু তাঁহার স্বদেশের মত কিছুই নয়। এই আশ্চর্য্য দৃশ্যের প্রত্যেক অঙ্গই তাঁহাকে আনন্দে অভিষিক্ত করিল ও তাঁহার স্মৃতি-ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করিল। তাঁহার মানস-ক্ষেত্রে কতই ভাব কতই ছবি আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রথমে উঠিয়াই ১৫ তোপধ্বনির অভিবাদনে তাঁহার স্মরণ হইল যে তিনি জেতৃজাতি ও রাজপুরুষের একজন। কোন পদচ্যুত রাজা কি নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাঁহার মনে হইত—আমার সম্মুখে এমন একজন রাজা দেখিতেছি যিনি পুরাকালে প্রথম শ্রেণীর ইউরোপীয় রাজ্যের ন্যায় এক বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেন। বরগণ্ডীয় ডুকের সহিত ফরাসির রাজার যেরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার সহিত মোগল সম্রাটেরও হয়ত সেইরূপ সম্বন্ধ ছিল। একটুকু বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন ভিন্ন তিনি হয়ত দিল্লীর সম্রাটের আর কোন ধার ধারিতেন না। সেই রাজা এক্ষণে রাজ্যচ্যুত পঞ্চম চারলস্ অথবা স্বীডেনের রাণী ক্রিষ্টিনার ন্যায় একটুকু অকিঞ্চিৎকর জাঁকজমক ভোগ করিয়াই সন্তুষ্ট। ইঁহাদের রাজসভা কতকগুলি শূন্য আড়ম্বরেই পূর্ণ, কতকগুলি অকর্ম্মণ্য শস্ত্রধারী অবৈতনিক সৈন্য সামন্ত ইঁহাদের নিশানতলে নিযুক্ত—আর ইংরাজ রাজাকে আপনার ভ্রাতা অথবা মিত্র বলিয়া সম্ভাষণ করত শোক কিম্বা অভিনন্দন সূচক পত্র লিখিবার অধিকার ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন অধিকার নাই।

মান্দ্রাজে নামিবার এক সপ্তাহের মধ্যে

তিনি ভ্রমণে বাহির হয়েন—রাত্রে পরিভ্রমণ—দিবসে প্রখর রৌদ্রের সময় বিশ্রাম, এই তাঁহার যাত্রার নিয়ম। ভারতবর্ষ দেখিয়া তাঁহার মনে যে সকল ভাব প্রথমে উদয় হইয়াছিল তাহা তাঁহার ভগিনী মার্গরেটের পত্রে প্রতিবিম্বিত দেখা যায়। সেই পত্রের কতক কতক নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"১৭ই জুনের বিকাল বেলায় আমি মান্দ্রাজ পরিত্যাগ করিলাম। আমার লোকজন মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ ৩৮ জন। 'আমি এক পাল্কীতে, আমার ভৃত্য আমার পিছনের আর এক পাল্কীতে। সে একজন মিশ্রবর্ণ (Half caste)। ছাড়িবার সময় বলিল যে সে একজন রোমান কাথলিক পরে ক্রুসের আকারে পরাবর্ত্তন করিয়া চোক উল্টাইয়া বলিল যে সে তাহার রক্ষণকারী সেন্টের শরণাপন্ন হইয়াছে। তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস এই যে আমাদের যাত্রা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে। আমার স্মৃতিপথে গিল্‌হ্বার চাকর উদয় হইল, সে তাহার মনিবের একটী বাক্স লুটিবার ফন্দি করিতেছিল। তাহার সঙ্গীদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ফিরিয়া আসিলে তাহার মনিব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোথা গিয়াছিলে? সে উত্তর করিল আমি চর্চে গিয়া আমাদের শুভ যাত্রার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলাম। আমি কিন্তু ভুল বুঝিয়াছিলাম। আমার ভৃত্যের চরিত্র নিতান্ত মন্দ নয়। আমি যতদূর দেখিয়াছি সে একজন সচ্চরিত্র ব্যক্তি, দেশীয় ভাষা ভাল জানে—কেহ অধিক দাম চাহিলে তাহার সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করিতে পারে আর অলস বেয়ারাকে ধমকান—বিছানা প্রস্তুত করা—ভাত তয়ার করা এসকল কাজে নিপুণ। কিন্তু তার একটী রোগ আছে—সে কথায় কথায় নানা পরামর্শ দিয়া আমাকে জ্বালাতন করে, এর জন্য একদিন দেখিতেছি বিলক্ষণ শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। তার নাম শুনে আমি না হেসে থাকতে পারি না—তাহার নাম কি জান? পীটর প্রিম।

ভ্রমণের অর্দ্ধেক পথ দিনের আলোতেই পরিভ্রমণ করিলাম, সেই সময়ের মধ্যে যাহা কিছু দেখিলাম তাহা আমার আশানুরূপ কিছুই নহে। এ প্রদেশের কত অল্প ভাগ আবাদ, দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। ইংলণ্ডের হাইলণ্ড অপেক্ষা এখানকার লোক সংখ্যা অধিক বোধ হয় না। শুনিতে পাই যে ভারতবর্ষের পল্লীগ্রাম সমুদয় রাস্তা হইতে দূরে দূরে অবস্থিত, আর এখন যে জমী পতিত শুষ্ক মরুভূমি তুল্য দৃষ্ট হইতেছে তাহা বর্ষান্তে ধান্যে আচ্ছাদিত হইবে।"

১৯ এ জুনে তিনি মহীসুরের সীমায় প্রবেশ করিয়া পরদিন প্রাতে বাঙ্গালোরে উপনীত হইলেন ও তথায় প্রধান সেনাপতির আলয়ে তিন দিন অবস্থিতি করিলেন। তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহীসুর যাত্রা করেন। মহীসুরের বিবরণ লিখিতে লিখিতে মেকলে একস্থানে শ্রীরঙ্গপট্টনের বর্ণন করিয়াছেন।—

শ্রীরঙ্গপট্টন দেখিবার জন্য আমার

অনেকদিন হইতে বড়ই কৌতূহল ছিল। এই সহরটি ভারতবর্ষের অনেকানেক প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার স্থান। ইহা ভারতের সর্ব্বাগ্রগণ্য রাজার আবাসভূমি। শৈশবকাল হইতে আমি প্রায় প্রতিদিনই ইহার কথা শুনিতাম। শ্রীরঙ্গপট্টন-বিজয়ের একটি চিত্র ক্লাকামের এক দোকানের জানালার উপর অবলম্বিত ছিল, আমার মনে পড়ে আমি বাল্যকালে তাহা অতি কৌতূহলের সহিত দেখিতাম। ঐ স্থান দেখিবার অবসর পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম আর যদিও অনেক আশা করিয়া গিয়াছিলাম সে আশা ভঙ্গ হয় নাই।

সহরটি জনশূন্য প্রতীয়মান হইল, কিন্তু ইহার দুর্গ, ভারতবর্ষের দুর্গ সকলের মধ্যে যাহা প্রখ্যাত, তাহা অক্ষত রহিয়াছে। চেলসীর কাছ দিয়া যে টেম্‌স নদী গিয়াছে, তাহা যতটা প্রশস্ত এখানকার নদীও তদ্রূপ—ইহা দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া প্রাচীর বেষ্টন করিয়াছে। প্রাচীরের ঊর্দ্ধভাগে একটী মসজিদের স্তম্ভদ্বয় দৃষ্টিগোচর হয়। মসজিদটি সুরক্ষিত ও সুরক্ষিত হইবার উপযুক্ত বটে কিন্তু টিপুর প্রাসাদ ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। যে বন্দিগৃহে ইংরাজ কয়েদিগণ অবরুদ্ধ ছিল তাহার গবাক্ষ গুলি আমি অতীব কৌতূহলের সহিত নিরীক্ষণ করিলাম। ও সেই জলদ্বার দেখিলাম যাহা নদীতে গিয়া পড়িয়াছে—যেখানে Duke of Wellington তখন Colonel Wellesley সদ্যঃপাতি টিপুর মৃতদেহ দেখিতে পাইয়াছিলেন যাহার উত্তাপ তখনো যায় নাই। যে স্থানে ইংরাজ সৈন্যগণ সমূহ শঙ্কটের মধ্যে যুদ্ধ করিয়া দুর্গ প্রবেশ করিয়াছিল তাহা এখনো দৃষ্ট হয়। এই নগর ১৫ বৎসর মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যেই রাজপ্রাসাদ ভগ্নপ্রায় লক্ষিত হইতেছে। ইহার প্রাঙ্গণ বনজঙ্গলে আবৃত। ইহার দরবারশালা যাহা এক সময় এমন নামাঙ্কিত ছিল তাহা এখনো তাহার পূর্ব্ব মহত্ত্বের চিহ্ন কতক প্রকাশ করিতেছে। ইহা অনেক গুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ স্তম্ভের উপর রক্ষিত, স্তম্ভ সকল কাল পাথরের পায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বে এই সকল স্তম্ভ সোনার কাজে অনুরঞ্জিত ছিল—এক এক স্থানে এখনো পর্য্যন্ত তাহার চাকচিক্য দেখা যাইতেছে। আর কতিপয় বর্ষের মধ্যে এই প্রকাণ্ড গৃহের চিহ্নমাত্রও বিদ্যমান থাকিবে না। আশ্চর্য্য যে ইংরাজেরা তাহাদের পরাজিত সুলতানের পূর্ব্ব গৌরবের এই স্মৃতিচিহ্ন অধিক [illegible] সহিত রক্ষা করে নাই। Lord Wellesley র সাধারণ রীতি এরূপ ছিল না। তাঁহার সুরুচি ও উদারতার চিহ্ন অন্যত্রে প্রত্যক্ষ করিলাম। টিপু তাঁহার পিতার এক সমাধি মন্দির ও সেই সঙ্গে এক মসজিদ নির্ম্মাণ করেন—এই সকল গৃহ গবর্ণমেণ্ট যত্নের সহিত রক্ষা করিতেছেন। দুর্গ হইতে দোধারি ঝাউ ও পুষ্প বৃক্ষ পরিশোভিত এক সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া এই সমাধি মন্দিরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। ইহা অতি সুন্দর ও ইহার সহিত আমাদের দেশের ভালরূপ

খোদিত প্রস্তরের "গথিক চ্যাপেলের" সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। ইহার মধ্যে কবরত্রয় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত কোরাণ মন্ত্রময় অতি চমৎকার চাদরে আচ্ছাদিত। মধ্যে হাইদর—দক্ষিণে টিপুর মাতা—বামে স্বয়ং টিপু শয়ান।

মহীসুর অবস্থানকালে সিংহাসনচ্যুত রাজার সহিত মেকলের সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার মুখশ্রী—কথোপকথন—প্রাসাদ—অলঙ্কার—সৈন্য হস্তী—সভাসদ প্রভৃতি তিনি এক পত্রে বিস্তারিত বর্ণন করিয়াছেন। ২৪ এ জুন সন্ধ্যার সময় আবার তিনি যাত্রা আরম্ভ করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নে নীলগিরি আরোহণ আরম্ভ করেন। পর্ব্বতের উচ্চদেশে আরোহণ করিয়া তিনি এক বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানে ১ ক্রোশ পর্য্যন্ত একটা হনুমান ছাড়া আর কোন জনমানুষের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয় নাই। হঠাৎ একটা রাস্তা ফিরিয়া দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে চতুর্দ্দিকে মনোহর হরিতবর্ণ পাহাড় শ্রেণী, মধ্যে একটী সরোবর, তাহার ধারে ধারে লাল খোলার বাটী, তাহার মধ্য হইতে একটী সুন্দর ভজনমন্দির শোভা পাইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা যে বড় গৃহ তাহা গবর্ণর জেনেরালের বাসগৃহ—প্রস্তরময় প্রশস্ত ও সুন্দর। মেকলে ইহাতে প্রবেশ করিয়া সহসা গবর্ণর জেনেরলের সম্মুখে উপনীত হইলেন। দেখিলেন লাট সাহেব একটা কার্পেট্ বিছান পুস্তকগৃহে অগ্নির ধারে বসিয়া আছেন। মেকলেকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ ও সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। মেকলেও তাঁহার গুণগানে ত্রুটি করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন-যাহা দেখিলাম তাহাতে আমি তাঁহার যতদূর ব্যখ্যা শুনিয়াছি তাঁহাকে তাহার যোগ্যই বোধ হইল—যেন সততা—সরলতা—বদান্যতা মূর্ত্তিমান।Lord William Bentinck এর প্রথম দর্শনে তাঁহার যেরূপ ভাব মনে হইয়াছিল তাঁহার সহিত অনেককাল একত্র সহবাস ও কার্য্যালাপে সেই ভাব আরো দৃঢ়ীভূত হয়। মেকলে তাঁহাকে কত ভাল বাসিতেন ও ভক্তি করিতেন, তাহার আভাস তাঁহার রচনার স্থানে স্থানে পাওয়া যায় ও কলিকাতার Town Hall এর সম্মুখস্থ ময়দানে যে প্রতিমূর্ত্তি বিরাজিত, তাহার পাদপীঠোপরি যে প্রশংসাবাদ লিখিত আছে, তাহা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাইতে পারে।

মেকলে তাঁহার বন্ধু এলিস্‌কে এই সময়ে যে পত্র লেখেন তাহা এই;—

উতকামণ্ড
১ জুলাই ১৮৩৪

উতকামণ্ড কোথায় তাহা জানিবার জন্য ম্যাপ দেখা বৃথা—কোন মানচিত্রে এখনো ইহা স্থান পায় নাই। এ একটা নূতন আবিষ্ক্রিয়া—এখানে ইউরোপীয় লোকেরা স্বাস্থ্যলাভ উদ্দেশে আগমন করে। ইহা সাগর পৃষ্ঠ হইতে ৭০০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত।

লণ্ডন যখন উননের মত গরম, আমি এই Equator এর ১৩ ডিক্রী উত্তরের ঘরের সব দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া কাষ্ঠাগ্নির উত্তাপ সেবন করিতেছি। আমার

শয্যা রাশি রাশি কম্বলে আচ্ছাদিত ও আমার কৃষ্ণকায় ভৃত্যেরা চতুর্দ্দিকে কাশির জ্বালায় অস্থির। তাহাদের মধ্যে একজন শীতে এরূপ জড়সড় হইয়াছে যে আর দিনকতক সূর্য্য দেখা না দিলে আমি আমার এই গৃহে এমন একটী দৃশ্য দেখিতে পাইব যাহা সেক্সপিয়র বলিয়া গিয়াছেন ইংরাজদের চক্ষে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন—সে কি না ভারতবাসীর মৃতদেহ। *

মান্দ্রাজ হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত শত মাইল আমি মানবপৃষ্ঠেই ভ্রমণ করিলাম। সর্ব্বশুদ্ধ তাহা মন্দ লাগে নাই। মহীসুরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে তাঁহার সাজসজ্জা চিত্রশালা দেখাইবার জন্য মহাব্যস্ত। তার মধ্যে ছ সাতটা চিত্র আমাদের দেশের গ্রাম্য পান্থশালায় যে সকল ছবি সচরাচর দৃষ্ট হয় তাহা অপেক্ষা নিতান্ত মন্দ নয়। কিন্তু সকলের সেরা ছবি বলিয়া তিনি আমাকে যাহা দেখাইলেন তাহা Duke of Wellington এর ছবি, ইহা অবশ্য কোন সময়ে ইংলণ্ডের কোন বিপনীমস্তকে শোভা পাইয়াছিল।

* * * * *

আমি এখানে সুখে আছি। গবর্ণর জেনেরলের মত সাদাসিদে ভাল মানুষ আর আমি দেখি নাই। যে সকল প্রধান প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার সঙ্গে এখানে আসিয়াছে, তাঁহারা বুদ্ধিমান বটে কিন্তু আমি লণ্ডনে যে সমাজে বিচরণ করিয়াছি, বিদ্যা বুদ্ধিতে ইহারা সে সমাজের লোকদের সমতুল্য নহে। তথাপি আমি যে ভাবিয়াছিলাম এদেশে আমার মনের মত লোক পাইব তাহা মিথ্যা নহে, আর সকলেই বলিতেছে যে কলিকাতায় এবিষয়ে আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবার আরো অধিক সম্ভাবনা। যাই বল, লণ্ডনেই হউক আর যে কোন স্থানেই হউক, আত্মসুখের জন্য অন্যের উপর যত কম নির্ভর করিতে হয় ততই ভাল। সমুদ্রের উপর সঙ্গহীন হইয়া আমার আপনাকে আপনি সুখী রাখিবার ক্ষমতা আমি পরীক্ষাতেই জানিতে পারিয়াছিলাম। আমি অপর্য্যাপ্ত অধ্যয়ন করিতাম, কিছুতেই আশ মিটিত না—ইলিয়াড, অডিসি, বরজিল, হরেস, সীজারের টীকা, বেকন—দান্তে—পিত্রাক্—আরিয়ষ্টো—ডনকিকসোট—গিবনের রোম—মিলের, ভারতবর্ষ—ভলটেয়রের সমুদয় ৭০ খণ্ড গ্রন্থ, সিসমণ্ডির ফ্রান্স আর ৭ প্রকাণ্ড কাণ্ড বায়োগ্রাফিয়া ব্রিটানিকা ইত্যাদি। আমার গ্রীক লাটিনে এখনো মরিচা ধরে নাই। ইলিয়াড আগেকার মত তত ভাল লাগিল না—অডিসি আরো বেশী ভাল লাগিল। হরেস পড়িয়া বড়ই আমোদ হইল—বরজিলে তেমন নয়। নরচরিত্র বর্ণনাই বল আর দেবদেবী বর্ণনাই বল —এ দুয়েতেই কেমন তাঁহার রচনা নৈপু-

* Tempest Act 2. Sc. 2.
Any strange beast there makes a man. When they will not give a doit to relieve a lame beggar, they will lay out ten to see a dead Indian.

ণ্যের অভাব বোধ হইল। Virgil এর শেষ ছয় সর্গ যাহা তিনি সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তাহা প্রথম ছয় সর্গ অপেক্ষা ভাল লাগিল, কবি যখন ইতালি প্রদেশে বিচরণ করেন, তখন তাঁহাকে আমার বেস ভাল লাগে। তাঁহার দেশবর্ণনা—তাঁহার জাতীয় অনুরাগ,—কথায় কথায় স্বদেশের গুণগান—তাহার ইতিবৃত্ত পুরাবৃত্তের সমালোচন এই সকল সমধিক প্রশংসনীয়। এই বিষয়ে তিনি অনেক সময়ে Sir Walter Scott কে আমার মনে উদিত করিয়া দিতেন, যদিও তাঁহাদের উভয়ের প্রকৃতিগত সাদৃশ্য অল্পই।

টাসোর জেরুজলম আমার পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল লাগিল। আরিয়ষ্টো খুবই ভাল লাগিল। আর দান্তে কে প্রথমেও যেমন এখনও তেমনি মনে করি অর্থাৎ তিনি মিলটন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কবি—হোমরের সহিত সমান সমান যান, কেবল সেক্স-পিয়র তাঁহাকে ছাড়াইয়া অনেক এগিয়ে গিয়েছেন।

কলিকাতা পৌঁছিয়াই আমি হিরডোটস পড়িতে আরম্ভ করি। তুমি তার অনুবাদ কর না কেন?—তুমি তা বেস করতে পার যে, আর তার ভাল অনুবাদ অনেক আসল রচনার সঙ্গে সমকক্ষ হইতে পারে। আমার ইচ্ছা যে তুমি এ বিষয়টা একবার ভেবে দেখ। এই কাজে প্রত্যহ ১৫ মিনিট ব্যয় করিলে ইহা ৫ বৎসরে নিঃশেষিত হয়। ইহার টীকাগুলি অত্যন্ত কৌতুহলজনক করা যাইতে পারে। তুমি এইক্ষণে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিব্রত রহিয়াছ, তোমার যেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি, তাহাতে সে সকল শোভা পায় না।

আমি আমার কর্ম্মকাজ আরম্ভ করিয়াছি। প্রমাণ-শাস্ত্র বিষয়ে আমার যে ক্ষুদ্র বই রচিত হইতেছে; তাহা দেখিলে ইংলণ্ডের জজদের চক্ষু স্থির হয়। এতে আমার অনেক পরামর্শ দাতা জুটিয়াছে। একজন মান্দ্রাজী আমাকে আইন শাস্ত্রের উপর একটী প্রস্তাব লিখিয়া পাঠাইয়াছে। এই বুদ্ধিমান লোকটী লেখেন "এ দেশে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার কুরীতি প্রচলিত আছে, মহাশয়ের তাহা অবিদিত নাই। জজ কোন্ কথা বিশ্বাস করিবেন ভাবিয়া উঠিতে পারেন না। মহাশয় যদি লোকদিগকে সত্য সাক্ষ্য দেওয়াইতে পারেন তাহা হইলে মহাশয়ের নাম চিরস্থায়ী হইবে ও কোম্পানি বাহাদুরের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। মানুষকে কেমন করে সত্য সাক্ষ্য দেওয়াইতে হয় তার উপায় আমি জানি—আপনার নাম ও কোম্পানির লাভের জন্য তাহা আমি মহাশয়ের নিকট নিবেদন করিতেছি। যে ব্যক্তি মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে মহাশয় তাহার ডান পায়ের বুড় আঙ্গুল কাটিয়া ফেলিবেন, তাদ্দ্বারা মহাশয়ের কীর্ত্তি প্রসারিত হইবে"—ইহা কি আইনজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা নয়?

এই খানে থামা যাক্। ইংলণ্ডে চিঠি লিখতে গেলে মনে হয় যেন আমার কলম আর থামতে চায় না।

*　*　*　*　*

নীলগিরিতে মেকলে জুন ও জুলাই মাস অতিবাহিত করিলেন। তিনি লেখেন—

এখনো পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে আমি মূর্ত্তি পূজার বিশেষ কিছু দেখি নাই। আর যাহা কিছু দেখিয়াছি তাহা যদিও অর্থহীন, কিন্তু তাহার সহিত বীভৎসভাব কিম্বা অশ্লীলতার সংশ্রব নাই। উতকামণ্ডে এরূপ কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। এই ছয় সপ্তাহের মধ্যে আমি এমন কিছুই দেখি নাই যাহাতে এদেশকে 'হীদেন' দেশ বলিয়া মনে হইতে পারে। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী নীচের ক্ষেত্র হইতে আসিয়া এখানে বসতি করিয়াছে। ইউরোপীয় পর্য্যটকদের পরিচর্য্যা করাই তাহাদের ব্যবসা। জাতি ও ধর্ম্ম নিয়া তাহাদের বড় গোলযোগ করিতে দেখা যায় না। এই সকল পাহাড়ের আদিমবাসী তোড়া নামক এক অদ্ভুত জাতি আছে। দিনকতক হইল তাহাদের মধ্যে অন্তেষ্টি ক্রিয়ার এক মহাউৎসব হইয়া গিয়াছে। সে দিন আমার সভার দিন না হইলে আমি তাহা দেখিতে যাইতাম। কিন্তু পরে যাহা শুনিলাম তাহাতে বোধ হয় না যে না যাইবার দরুণে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। প্রেতাত্মার কল্যাণোদ্দেশে বলদ বলিদানেই সেই অনুষ্ঠানের পর্য্যবসান। বলির জন্তুরা ভয়ানক চীৎকার করিতেছিল। যে পর্য্যন্ত না একটা ইঙ্গিত করা হইল সে পর্য্যন্ত লোকেরা দাঁড়াইয়া হাসিতেছিল ও কথা কহিতেছিল। ইঙ্গিত শুনিবামাত্র স্ত্রীলোকেরা উচ্চৈঃস্বরে রোদন আরম্ভ করিল। আমি এই পৃথিবীতে ৩৩ বৎসর জীবিত থাকিয়া অবশ্য এতটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছি যে বলদেরা আহত হইবার সময় চীৎকার ধ্বনি করে আর স্ত্রীলোকে ইচ্ছা করিলেই চক্ষে জল আনিতে পারে।"

যখন মেকলে নীলগিরিতে বাস করিতেছিলেন তখন বর্ষাকাল। পর্ব্বতের উপর মেঘমালা সঞ্চরণ করিতেছে—বারিধারা অজস্র ঝরিতেছে। তিনি বলেন "আমার সম্মুখে ১০০ হাত দেখিতে পাইতাম এমন সময় অতি বিরল। সমুদয় মাসের মধ্যে আমি দুই ঘণ্টা চলিয়া বেড়াইবার অবকাশ পাই নাই।"

"অবশেষে Lord William এর নিকট হইতে বিদায় লইলাম। পথের মধ্যে আমার বেয়ারাদের ডাক বসান গেল—আমার পালকী প্রস্তুত—পরদিন ছাড়িবার কথা, এমন সময় এমন একটী ঘটনা উপস্থিত হইল যে, তাহা হইতে এদেশীয়দের রীতি নীতি চরিত্র বিষয়ে তোমার কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা জন্মিতে পারিবে।*

আমার নূতন চাকর একজন খৃষ্টান কিন্তু তেমনি খৃষ্টান, এদেশের মিসনরিগণ যাদের জন্মদাতা। এখানকার ইংরাজদের কতকগুলি চাকর মিলিয়া তাহার ধর্ম্মের

* ইংরাজেরা আমাদের দেশের লোকের নীতি চরিত্র বিষয়ে এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করেন!!

জন্য তাহার উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিল। অবশেষে তাহারা Lord William এর একজন পাচকের ঈর্ষানল প্রজ্জলিত করিয়া তুলিল। তাহার বাস্তবিক কারণ থাকুক বা না থাকুক আমি ঠিক বলিতে পারি না। এদিকে এক চমৎকার নাট্যাভিনয় উপস্থিত—উক্ত পাচক ওথেলোর স্থান অধিকার করিল—তাহার কুৎসিতা কর্কশা পত্নী ডেস্‌ডিমোনা—একজন করনলের ভৃত্য ইয়াগো আর আমার চাকর Cassio। রুমালের বদলে একটা মিছরির টুকরা আমার বাক্স হইতে ডেস্‌ডিমোনার হাতে গিয়া পড়িয়াছিল ও তিনি তাহা চুষিতে ধরা পড়িয়াছিলেন। যদি এই অভিনয়ে আমার কিছু সাজিবার থাকে তাহা Roderigo, যাহাকে Shakespeare 'নির্ব্বোধ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, আর যার থলিতেও পয়সা ছিল অনুমান হয়।

আমার ছাড়িবার পূর্ব্ব দিবসে সন্ধ্যার সময় এক দঙ্গল লোক আসিয়া আমার বাঙ্গলা আক্রমণ করিল। তাহাদের সঙ্গে দেশীয় জজ আসিয়া উপস্থিত। তাহারা যে কি বকাবকি আরম্ভ করিল আমি তাহার একটা কথাও বুঝিতে পারিলাম না। সেই জজ একটু ইংরাজি জানিতেন, আমি তাঁহাকে আমার ঘরে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, যে বৃত্তান্তটা কি, তিনি আমাকে সব বুঝাইয়া দিলেন। আমার চাকরের বিরুদ্ধে তাহারা যে অভিযোগ করিয়াছিল তাহার সত্যতার প্রতি এখনো আমি সন্দিগ্ধ। তাহার চরিত্রের উপর যে আমার বড় বিশ্বাস ছিল তাহা নহে, আর যাহারা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা পাইতেছিল, তাহাদিগকে সত্যবাদী বলিয়াও আমার বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তখন আমার ভৃত্যটিকে হারানো আমার পক্ষে এত অসুবিধাজনক যে কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিয়া তাহাদের মামলার আপসে নিষ্পত্তি করিয়া দিতে আমি সম্মত হইলাম। সামান্যতঃ দেখিতে গেলে ইহা বড় কষ্টসাধ্য ছিল না, কেন না এদেশের ছোট লোকেরা এ সকল বিষয়ে বড় কিছু মনে করে না। স্বামী যিনি, তিনি কতক টাকা পাইলে খুসী হইয়া চলিয়া যাইতেন কিন্তু আমার ভৃত্যের নির্যাতনকারী দল আসিয়া মধ্যস্থ হইল—তাহাদের নিতান্ত ইচ্ছা যে তাহার অপরাধের বিচার হয়—তাহার মুখে চুন কালি পড়ে—সে উত্তম মধ্যম কশাঘাত পায়—তাহার সম্মুখে তাহারা ঢাক বাজাইয়া নৃত্য করিতে পারে— গাধার পৃষ্ঠে পুচ্ছমুখীন চড়াইয়া তাহাকে সহরময় ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতে পারে।

আপসে মিটমাট হইবার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া আমি জজকে তৎক্ষণাৎ এই মকদ্দমার বিচার করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু লোকেরা তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল—এর বিচারটা শীঘ্র নিষ্পত্তি না হয় এই তাহাদের মর্ম্মান্তিক বাসনা। আমি তাহাদের কত বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম—বলিলাম কল্যই আমার যাত্রার দিবস নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আমার ভৃত্য দোষীই হউক নির্দ্দোষীই হউক, আমার সঙ্গে যাইতে না পাইলে তাহার কর্ম্মটী যায়। আমি যত

ভদ্রতার সহিত যুক্তি প্রদর্শন করিয়া তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতে যাই, তাহারা ততই অবাধ্য হইয়া উঠে। তাহারা কিছুতেই বুঝিবে না। বলিতে কি, বলবান কর্ত্তৃক বিমর্দ্দিত হওয়া তাহাদের এমন অভ্যাস যে বিনয়কে তাহারা দুর্ব্বলতার চিহ্ন জ্ঞান করে। জজ বলিলেন আর কোন সাহেবকে তিনি ছোট লোকদের সহিত এরূপ ভদ্র ব্যবহার করিতে দেখেন নাই। কিন্তু আর আমি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহাদের ভয়ানক বিদ্বেষ ও নির্লজ্জ অন্যায়াচরণ দর্শনে আমার গা জ্বলিয়া গেল। আমি বসিয়া তথাকার সেনাপতিকে সন্ধ্যার মধ্যেই যাহাতে এই মকদ্দমার বিচার হয় তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া এক পত্র লিখিলাম। তাহাই হইল। কোর্ট বসিল ও সমস্ত রাত্রিই এই মকদ্দমার গোল চলিতে লাগিল। অবশেষে জজের রায়ে আমার ভৃত্য নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইল। আমি তখন জানিতাম না, পরে শুনিলাম যে এই সুযোগ্য বিচারপতি এই মামলা উপলক্ষে ২০ টাকা ঘুস খাইয়াছিলেন।

ডেস্‌ডিমোনার স্বামী গত কল্য যে টাকা লইতে অস্বীকার করিয়াছিল, এক্ষণে তাহা সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু এখন আমি তাহাকে এক পয়সা দিতেও সম্মত হইলাম না। যে সকল দুরাত্মা এই গোলযোগ বাধাইয়াছিল তাহাদের রাগের আর সীমা রহিল না। আমার ভৃত্য পরদিন ১১টার সময় ছাড়িবে ও আমি তাহার পশ্চাতে দুটোর সময় ছাড়িব এই ধার্য্য হইল। আমি চাহিয়া দেখি, না কতকগুলি লোক তাহাকে তাহার পালকীর মধ্য হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছে—তাহার পাগড়ী ছিড়িয়া ফেলিয়াছে—তাহাকে প্রায় বিবস্ত্র করিয়া ফেলিয়াছে—ও বোধ হইল যেন তাহারা তাহাকে ছিড়িয়া কাটিয়া খাইতে উদ্যত। আমি একটা লাঠি হাতে তাহাদের মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া পড়িলাম। তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার আর অন্য কোন উপায় ছিল না ও আমার মনে হইল যে, শুধু তাহার নয়, আমারো জীবন সংশয়। আমি গরীব বেচারীকে কষ্টস্বষ্টে ধরিয়া রহিলাম—তাহার স্বদেশীয়দের ন্যায় সেও নিতান্ত ভীরু স্বভাব, দেখিলাম সে মূর্চ্ছাপ্রায় হইয়াছে। একজন সেনা নাপিত যে আমার ক্ষৌর কর্ম্ম করিত, সে দৌড়িয়া কতকগুলি পুলিসের লোক ডাকিয়া আনিল। আমি আমার বেয়ারাদের বলিলাম ফের্, এখনি আমাকে সেনাপতির বাড়ীতে নিয়ে চল্। সেখানে আমার অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয় নাই। যখন করনল সাহেব জজ আর কৌন্সলের সাহেব বাদী, তখন বিচারে কালবিলম্ব হইবার কোন কথাই নাই। আমি তিন কথায় আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিলাম। তিন মিনিটের মধ্যে বিদ্রোহীগণ বন্দীশালায় প্রেরিত হইল আর আমার ভৃত্য একজন সিপাই সঙ্গে করিয়া রাস্তায় গিয়া নিরাপদে উত্তীর্ণ হইল।"

পরদিন প্রত্যূষে মেকলে পাহাড় হইতে নামিতে লাগিলেন।

"প্রায় একঘণ্টাকাল নীচে নামিয়া আমরা মেঘ ও কুয়াসা হইতে মুক্ত হইলাম—আমাদের সম্মুখে মহীসুরের ক্ষেত্র, যেন হরিত পল্লবের সমুদ্র—তাহার উপর সূর্য্য মহা গৌরবে প্রকাশ পাইতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়া আমার স্বভাব নয়, আমিও কিন্তু এসময়ে আনন্দাশ্রু বিসর্জন না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। পালকীর মধ্য হইতে লাফাইয়া পড়িয়া পদব্রজে চলিতে লাগিলাম। দুই ঘণ্টার মধ্যে প্রায় ৩০০০ ফীট নামা গেল। প্রত্যেক পথ পরিবর্ত্তনে নিম্নস্থিত অসীম জঙ্গলের নূতন নূতন ভাগ দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইল। এই বিস্তীর্ণ জঙ্গল, স্বভাবজনিত—পৃথিবীর সঙ্গে যাহার সমান বয়স, তাহার সহিত আমাদের দেশের ভাল ভাল কৃত্রিম উদ্যানের সাদৃশ্য দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। পাহাড়ের উপত্যকায় অবতরণ করিয়া আমরা এমন শোভাময় কাননের মধ্যদিয়া চলিলাম যে তাহা ঈডন কাননের একভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এত বড় বড় বৃক্ষ আমি কখন দেখি নাই। এমন কত শত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাদপ দেখিলাম যাহার ক্ষুদ্রতম বৃক্ষও আমাদের দেশের প্রকাণ্ড ওকের সহিত তুলনা হইতে পারে। তৃণ ও বনফুল সকল আমার মাথার সঙ্গে সমান উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, সূর্য্যের সঙ্গে এতদিন আমার দেখা সাক্ষাৎ নাই, এখন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আবার আমি পালকী হইতে নামিয়া ফিরিয়া দেখিলাম যে আমরা যে পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা আমার ১০ ক্রোশ পিছনে পড়িয়া আছে, এখনো সেই মেঘ বৃষ্টি কুয়াসায় পূর্ণ—যাহার মধ্যে আমি এতদিন বাস করিতেছিলাম।

"১৬ই মঙ্গলবার মান্দ্রাজে জাহাজে চড়িলাম। কলিকাতায় যাইবার পথে আমি পোর্টুগীস ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলাম আর যতটা আবশ্যক বোধ করি তাহা এক প্রকার শিখিয়াও লইলাম। লুসিয়াড পড়িলাম ও আবার আর একবার পাঠ করিতেছি। কামোয়েন্‌স্‌কে আমার যত ভাল কবি বলিয়া মনে ছিল, তাহা বোধ হইল না। কিন্তু এই সকল বিষয়ে প্রথমেই আমার যেরূপ মন্তব্য দাঁড়ায় তাহা এতবার ভ্রমাত্মক দেখিয়াছি যে এখনো আমার আশা হয় যে এত বিচক্ষণ লোকে যাহা ভাল বলিয়াছে আমিও তাহাদের মতের সহিত মিলিতে পারিব। বিদেশীয় ভাষায় যে কোন বিখ্যাত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি তাহার প্রথম পাঠে কখনই আমি আশানুরূপ উৎকর্ষ গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেবল দান্তের কাব্য ও ডন কিক্সোট্‌ ঐ নিয়মের বহির্ভূত—তাহাদের প্রথমে পড়িয়াই আমার আশাতীত উৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইয়াছিল।"

তাঁহার পোর্টুগীস অধ্যায়নের বড় সময় রহিল না, এক সপ্তাহের মধ্যেই জাহাজ গঙ্গাসাগরে আসিয়া পড়িল। তিনি কলিকাতায় লাট সাহেবের বাটীতে উত্তীর্ণ হইয়া তথায় ছয় সপ্তাহ কাল বাস করিলেন।

সেখানে তাঁহার ভগিনী সুখস্বচ্ছন্দে রহিয়াছেন দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। নবেম্বর মাসে তাঁহারা পৃথক বাড়ী করিয়া জাকজমকে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের বাটী কলিকাতার সকল বাটীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত, এইক্ষণে তাহা Bengal Clubএ পরিণত হইয়াছে।

পিত্রার্কা ও লরা।

এ কথা বোধ হয় বলাই বাহুল্য যে দান্তের মত পিত্রার্কাও একজন প্রখ্যাত-নামা ইতালীয় কবি ছিলেন। দান্তে যেমন তাঁহার মহাকাব্যের মহান ভাব দ্বারা সমস্ত ইউরোপমণ্ডল উত্তেজিত করিয়াছিলেন, পিত্রার্কাও তেমনি তাঁহার সুললিত গীতি ও গাথা দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু দান্তে ও পিত্রার্কে আবার অনেক বিষয়ে এমন সৌসাদৃশ্য ছিল যে সকল বিষয় উল্লেখ করিতে হইলে আমাদের এই প্রবন্ধটী অতি দীর্ঘকায় হইয়া পড়ে, সেই জন্য কেবল তাঁহাদের প্রণয়ের কথাই বর্ণনা করিতেছি।

দান্তের যেমন বিয়াত্রীচে, পিত্রার্কার তেমনি লরা। দান্তের ন্যায় তাঁহার লরাও অপ্রাপ্য, অনধিগম্য, দান্তের ন্যায় তিনিও দূর হইতে লরাকে দেখিয়াই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। পিত্রার্কারও লরার সহিত তেমন ভাল করিয়া কথা বার্ত্তা, আলাপ পরিচয় হয় নাই। লরার ভবনে পিত্রার্কা কখনও যাইতে পান নাই, লরার নিকট হইতে তাঁহার প্রেমের কিছুমাত্র প্রত্যুপহার পান নাই। পিত্রার্কা কহিয়াছেন, লরা সঙ্গীত ও কবিতার প্রতি উদাসীন। তাঁহার সমক্ষে তাহার মুখশ্রী সর্ব্বদাই দৃঢ় ভাব প্রকাশ করিত। পিত্রার্কা তাঁহার অসংখ্য চিঠির মধ্যে একবার ভিন্ন কখনো লরার নামোল্লেখ করেন নাই, বোধ হয়, বন্ধুবর্গের প্রতি সাধারণ চিঠিপত্রে লরার নাম ব্যবহার করিতে তিনি কেমন সঙ্কোচ বোধ করিতেন, বোধ হয় মনে করিতেন তাহাতে সে নামের গৌরব হানি হইবে। লরার যৌবনের অবসান, লরার মৃত্যু, তাঁহার প্রতি লরার ঔদাসীন্য কিছুই তাঁহার মহান্ প্রেমকে বিচলিত করিতে পারে নাই। বরঞ্চ লরার মৃত্যু তাঁহার প্রেমকে নূতন বল অর্পণ করে, কেননা এ পৃথিবীতে লরার সহিত তাঁহার সম্পর্ক অতি দূর ছিল, লরার প্রেম তাঁহার অপ্রাপ্য ও তাঁহার প্রেম লরার অগ্রাহ্য ছিল, কিন্তু লরা যখন দেহের সহিত সমাজ বন্ধন পরিত্যাগ করিয়া গেলেন, তখন পিত্রার্কা অসঙ্কোচে লরার আত্মার চরণে তাঁহার প্রেম উপহার দিতেন ও লরা তাহা অসঙ্কোচে গ্রহণ করিতেছেন কল্পনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। পিত্রার্কা কহিতেছেন—

যে রাত্রে লরা এই পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিলেন, তাহার পররাত্রে তিনি স্বর্গ হইতে এই শিশিরে (শিশিরাক্ত পৃথিবীতে) নামিয়া আসিলেন, তাঁহার অনুরক্ত প্রেমিকের নিকট আবির্ভূত হইলেন ও হাত বাড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—'সেই স্ত্রীলোক, যাহাকে দেখিয়া অবধি তোমার তরুণহৃদয় জন-কোলাহল হইতে বিভিন্ন পথে গিয়াছে, তাহাকে চেন?' যখন আমার অশ্রুজল তাঁহার বিয়োগ-দুঃখ সূচনা করিল, তখন তিনি কহিলেন, 'যতদিন তুমি পৃথিবীর দাস হইয়া থাকিবে, ততদিন কিছুতেই সুখী হইতে পারিবে না। পবিত্র-হৃদয়েরা জানেন, মৃত্যু, অন্ধকার-কারাগার হইতে মুক্তি। যদি আমার আনন্দের এক সহস্রাংশও তুমি জানিতে, তবে আমার মৃত্যুতে তুমি সুখ অনুভব করিতে!' এই বলিয়া তিনি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বর্গের দিকে নেত্র ফিরাইলেন। তিনি নীরব হইলে আমি কহিলাম, 'ঘাতকদিগের দ্বারা প্রযুক্ত যন্ত্রণা ও বার্দ্ধক্যের ভার কি সময়ে সময়ে মৃত্যু-যন্ত্রণাকে তীব্রতর করে না?' তিনি কহিলেন "স্বীকার করি, যন্ত্রণা ও সম্মুখস্থ অনন্তকালের আশঙ্কা মৃত্যুর পূর্ব্বে অনুভব করা যায়, কিন্তু যদি আমরা ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করি, তবে প্রাণত্যাগ নিশ্বাসের ন্যায় অতি সহজ হয়! আমার বিকশিত যৌবনের সময় যখন তুমি আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসিতে, তখন জীবনের প্রতি আমার অত্যন্ত মায়া ছিল, কিন্তু যখন আমি ইহা পরিত্যাগ করিলাম, তখন নির্ব্বাসন হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার আমোদ অনুভব করিতে লাগিলাম। তখন তোমার প্রতি দয়া ভিন্ন অন্য কষ্ট পাই নাই!' আমি বলিয়া উঠিলাম 'সেই সত্যপ্রিয়তা যাহা তুমি পূর্ব্বে জানিতে এবং সর্ব্বান্তর্যামীর নিকট থাকিয়া এখন যাহা অধিকতর জান, সেই সত্য-প্রিয়তার নামে জিজ্ঞাসা করিতেছি, বল, আমার প্রতি সেই দয়া কি প্রেমের দ্বারাই উত্তেজিত হয় নাই?' আমার এই কথা শেষ না হইতে হইতেই দেখিলাম, সেই স্বর্গীয় হাস্য, যাহা চিরকাল আমার দুঃখের উপর শান্তি বর্ষণ করিয়া আসিয়াছে, সেই হাস্যে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তিনি নিশ্বাস ফেলিলেন ও কহিলেন "চিরকাল তুমি আমার প্রেম পাইয়া আসিয়াছ ও চিরকালই তাহা পাইবে। কিন্তু তোমার প্রেম সংযত করিয়া রাখা আমার উচিত মনে করিতাম!' মাতা যখন তাহার পুত্রকে ভর্ৎসনা করেন, তখন যেমন তাঁহার ভালবাসা প্রকাশ পায় এমন আর কখনো নয়। কতবার আমি মনে মনে করিয়াছি—উনি উন্মত্ত অনলে দগ্ধ হইতেছেন, অতএব উহাঁকে আমার হৃদয়ের কথা কখনো বলিব না! হায়, যখন আমরা ভালবাসি অথচ শঙ্কায় ত্রস্ত থাকি, তখন এ সব চেষ্টা কি নিষ্ফল! কিন্তু আমাদের সম্ভ্রম বজায় রাখিবার ও ধর্ম্মপথ হইতে ভ্রষ্ট না হইবার এই একমাত্র উপায় ছিল। কতবার আমি রাগের ভান করিয়াছি, কিন্তু তখন হয়ত আমার হৃদয়ে প্রেম যুঝিতে-

ছিল! যখন দেখিতাম তুমি বিষাদের ভরে নত হইয়া পড়িতেছ, তখন হয়ত তোমার প্রতি সান্ত্বনার দৃষ্টি বর্ষণ করিতাম, হয়ত কথা কহিতাম! দুঃখ এবং ভয়েই নিশ্চয় আমার স্বর পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল, তুমি হয়ত তাহা দেখিয়াছ! যখন তুমি রোষে অভিভূত হইয়াছ তখন হয়ত আমি আমার একটী দৃঢ়-দৃষ্টির দ্বারা তোমাকে শাসন করিতাম! এই সকল কৌশল, এই সকল উপায়ই আমি অবলম্বন করিয়াছিলাম। এইরূপে কখনো অনুগ্রহ, কখনো দৃঢ়তার দ্বারা তোমাকে কখনো সুখী কখনো বা অসুখী করিয়াছি, যদিও তাহাতে শ্রান্ত হইয়াছিলে, কিন্তু এইরূপে তোমকে সমুদয় বিপদের বাহিরে লইয়া গিয়াছিলাম, এইরূপে আমাদের উভয়কেই পতন হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলাম—এবং এই কথা মনে করিয়া আমি অধিকতর সুখ উপভোগ করি!' যখন তিনি কহিতে লাগিলেন, আমার নেত্র হইতে অশ্রু পড়িতে লাগিল—আমি কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিলাম—যদি আমি তাঁহার কথা স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক বিশ্বাস করিতে পারি, তবে আমি আপনাকে যথার্থ পুরস্কৃত জ্ঞান করি!—আমাকে বাধা দিয়া তিনি কহিলেন, বলিতে বলিতে তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া আসিল 'হা—অবিশ্বাসী, সংশয় করিতেছ কেন? যদিও আমার হৃদয়ে যেমন ভালবাসা ছিল আমার নয়নে তেমন প্রকাশ পাইত কি না, সে কথা আমার রসনা কখনই ব্যক্ত করিবে না, কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি—তোমার ভালবাসায়, বিশেষতঃ তুমি আমার নামকে যে অমরত্ব দিয়াছ তাহাতে যেমন সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এমন আর কিছুতে না। আমার এই একমাত্র ইচ্ছা ছিল তোমার অতিরিক্ততা কিছু শমিত হয়। আমার কাছে তোমার হৃদয়ের গোপন-কাহিনী খুলিতে গিয়া তাহা সমস্ত পৃথিবীর নিকট খুলিয়াছ এই কারণেই তোমার উপরে আমার বাহ্য-ঔদাসীন জন্মে। তুমি যতই দয়ার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষা করিয়াছ, আমি ততই লজ্জা ও ভয়ে নীরব হইয়া গিয়াছি। তোমার সহিত আমার এই প্রভেদ ছিল—তুমি প্রকাশ করিয়াছিলে, আমি গোপন করিয়াছিলাম—কিন্তু প্রকাশে যন্ত্রণা যে বর্দ্ধিত হয় ও গোপনে তাহা হ্রাস হয় এমন নহে।' তাঁহার অনুরক্ত তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার আর কত বিলম্ব আছে? লরা এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, 'যতদূর আমি জানি তাহাতে তুমি আমার বিয়োগ সহিয়া অনেক দিন পৃথিবীতে থাকিবে।" পিত্রার্কা লরার মৃত্যুর পর ছাব্বিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন।

এইরূপে পিত্রার্কা লরার দৃঢ়তা, তাঁহার প্রতি উদাসীনতার মধ্য হইতেও তাঁহার আপনার ইচ্ছার অনুকূল অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সহজেই মনে করিতে পারেন যে, লরার তাঁহার প্রতিই এত বিশেষ উদাসীনতার কারণ কি, তিনি ত তাহার বিরক্তি-জনক কোন কাজ করেন নাই। অবশ্যই লরা তাঁহাকে ভাল বাসে। এই মীমাংসা অনেকে বুঝিতে না পারুন,

কিন্তু ইহার মধ্যে অনেকটা সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। লরা যদি তাঁহাকে ভাল না বাসিত, তবে অন্য লোকের সহিত যেরূপ মুক্তভাবে কথা বার্ত্তা করিত. তাঁহার সহিতও সেইরূপ করিত; একথটার মধ্যে অনেকটা হৃদয়-তত্ত্বজ্ঞতা আছে, কিন্তু ইহা যে ঠিক সত্য, তাহা বলা যায় না, লরা যে তাঁহাকে ভাল বাসিত, তাহার কোন প্রমাণ নাই। পিত্রার্কা যেরূপ প্রকাশ্যভাবে কবিতা দ্বারা তাঁহার প্রণয়িণীর আরাধনা করিতেন, তাহাতে লরা তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়া বিবেচনার কাজ করিয়াছিল—পিত্রার্কার সহিত সামান্য কথোপকথনেও তাহার উপর লোকের সন্দিগ্ধ-চক্ষু পড়িত, সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ লরার স্বামী অতিশয় সন্দিগ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে লরা অতিশয় সুগৃহিণী ছিল বলিয়াইত স্থির হইয়াছে। যদি সত্য সত্যই লরা মনে মনে পিত্রার্কাকে ভাল বাসিতেন, তবে আমরা লরার একটী মহান্ মূর্ত্তি দেখিতে পাই—ভাল বাসিয়াছেন অথচ প্রকাশ করেন নাই—পিত্রার্কার প্রেমে কিছুমাত্র উৎসাহ দেন নাই—বরং তাঁহার প্রেমের স্রোত ফিরাইতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন—প্রেম তাঁহাকে তাঁহার কর্ত্তব্য পথ হইতে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারেন নাই, বরং বোধ হয় তাঁহাকে কর্ত্তব্য পথে অধিকতর নিয়োজিত করিয়াছিল।

জন কোলাহল হইতে দূরে থাকিবার জন্য পিত্রার্কা ভোক্লুসের উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই উপত্যকার দৃশ্য অতিশয় সুন্দর। এখানকার মোহিনী বিজনতার মধ্যে থাকিয়া, পিত্রার্কার হৃদয় হইতে যে প্রথম কবিতা উৎসারিত হয় তাহা লরার উদ্দেশে প্রেম-গীতি। প্রকৃতির প্রতিসৌন্দর্য্যের মধ্যে তিনি যেন লরার সত্তা অনুভব করিতেন।

প্রতি উচ্চ-শাখা ময় সরল কানন,
প্রতি স্নিগ্ধ ছায়া মোর ভ্রমণের স্থান;
শৈলে শৈলে তাঁর সেই পবিত্র-আনন
দেখিবারে পায় মোর মানস-নয়ন।
সহসা ভাবনা হ'তে উঠি যবে জাগি,
প্রেমে মগ্ন মন মোর বলেগো আমায়
'কোথায় ভ্রমিছ ওগো, ভ্রমিছ কি লাগি?
কোথা হোতে আসিয়াছ, এসেছ
　　　　　　　　কোথায় ?''
হৃদে মোর এই সব চঞ্চল-স্বপন
ক্রমে ক্রমে স্থির চিন্তা করে আনয়ন,
আপনারে একেবারে যাই যেন ভুলি
দহেগো আমারে শুধু তারি চিন্তাগুলি।
মনে হয় প্রিয়া যেন আসিয়াছে কাছে
সে ভুলে উজলি উঠে নয়ন আমার,
চারিদিকে লরা যেন দাঁড়াইয়া আছে
এ স্বপ্ন না ভাঙ্গে যদি কি চাহিগো আর ?
দেখি যেন (কেবা তাহা করিবে বিশ্বাস ?)
বিমল সলিল কিম্বা হরিত কানন
অথবা তুষার-শুভ্র উষার আকাশ
তাঁহারি জীবন্ত-ছবি করিছে বহন!

* * * *

দুর্গম-সংসারে যত করিগো ভ্রমণ,
ঘোরতর মরু মাঝে যতদূর যাই,

কল্পনা ততই তার মুরতি মোহন
দিশে দিশে আঁকে যেন দেখিবারে পাই।
অবশেষে আসে ধীরে সত্য সুকঠোর
ভাঙ্গি দেয় যৌবনের সুখস্বপ্ন মোর!

কখনো বা সেই মনোহর শৈলের প্রতি নির্ঝর তটিনী বৃক্ষলতায়, তিনি তাঁহার বিষণ্ণ-মর্ম্মের নিরাশা সঙ্গীত গাহিয়া গাহিয়া বেড়াইতেন—

বিমল বাহিনী ওগো তরুণ-তটিনী!
উজ্জ্বল-তরঙ্গে তব, প্রেয়সী আমার—
ভক্ত হৃদয়ের মম একমাত্র দেবী
সৌন্দর্য্য তাঁহার যত ক'রেছেন দান!
শুনগো পাদপ, তুমি, তব দেহ পরে
ভর দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন সে দেবী,
নত হ'য়ে প'ড়েছিল ফুল পত্রগুলি
বসনের তলে; বক্ষ সুবিমল তার
পরশিয়াছিলে তব সুধা আলিঙ্গনে!
তুমি বায়ু সেইখানে বহিতেছ সদা
যেই থানে প্রেম আসি দেখাইলা মোরে
প্রিয়ার নয়নে শোভে ভাণ্ডার তাহার!
শুনগো তোমরা সবে আর একবার
এই ভগ্ন-হৃদয়ের শেষ দুঃখ গান!

অবশ্য ফলিবে যদি ভাগ্যের লিখন!
অবশ্যই অবশেষে প্রেম যদি মোর
অশ্রুময় আঁখিদ্বয় করেগো মুদিত,
ভ্রমিবে যখন আত্মা স্বদেশ আকাশে
তখন দেখোগো যেন এই প্রিয়-স্থানে
অভাগার শেষ-চিহ্ন হয়গো নিহিত!
মরণের কঠোরতা হবে কত হ্রাস,
যদি এই প্রিয় আশা, সেই ভয়ানক
অনন্তের পথ করে পুষ্প-বিকীরিত!
এই কাননের মত সুশীতল ছায়া
কোথা আছে পৃথিবীতে, শ্রান্ত আত্মা যেথা
এক মুহূর্ত্তের তরে করিবে বিশ্রাম!
নাহিক এমন শান্ত হরিত-কবর
যেথানে সংসার-শ্রমে পরিশ্রান্ত-দেহ
ঘুমাইবে পৃথিবীর দুখ শোক ভুলি!

বোধ হয় একদিন সে মোর প্রেয়সী
স্বর্গীয়-সুন্দরী সেই নিষ্ঠুর-দয়ালু—
একদিন এইখানে আসিবে কি ভাবি,
যেই থানে একদিন মুগ্ধ নেত্র মোর
উজ্জ্বল সে নেত্র পরে রহিত চাহিয়া!
হয়ত নয়ন তাঁর আপনা আপনি
খুঁজিয়া খুঁজিয়া মোরে চারিদিক পানে
আমার কবর সেই পাইবে দেখিতে!
হয়ত শিহরি তার উঠিবে অন্তর,
হয়ত একটি তার বিষাদ-নিশ্বাস
জাগাইবে মোর পরে স্বর্গের করুণা!

* * * *

এখনো সে মনে পড়ে—যবে পুষ্প-বন
বসন্তের সমীরণে হইয়া প্রিনত
সুরভি কুসুম রাশি করিত বর্ষণ,
তখন রক্তিম-মেঘে হইয়া আবৃত
বসিতেন প্রকৃতির উপহার মাঝে।
কভুবা বসনে তাঁর কভুবা কুন্তলে
প্রকৃতি কুসুম-গুচ্ছ দিত সাজাইয়া।
চারিদিকে তাঁর, কভু তটিনী-সলিলে,—
কভুবা তৃণের পরে পড়িত ঝরিয়া
পুষ্প বন হ'তে কত পুষ্প রাশি রাশি!

চারিদিকে তরু লতা কহিত মর্ম্মরি
"প্রেম হেথা করিয়াছে সাম্রাজ্য বিস্তার !"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পিত্রার্কার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, বা এক একবার বিশ্বাস হইত যে লরা তাঁহাকে ভালবাসে। অনেক কবিতাতেই তাঁহার এই বিশ্বাস প্রকাশ পাইত। অনুরাগের নেত্র অনুরাগের কাহিনী যেমন পড়িতে পারে, যুক্তিকে তাহার নিকট অনেক সময় পরাস্ত মানিতে হয়। লরার দৃঢ়-দৃষ্টির মধ্যে হয়ত পিত্রার্কা প্রেমের আভা দেখিতে পাইয়াছিলেন, যুক্তি এখন তাহা অনুধাবন করিতে পারিতেছে না, হয়ত তখনো পারিত না। এক সময়ে পিত্রার্কা যখন দূর-দেশে ভ্রমণ করিবার জন্য যাইতেছিলেন, তখন লরাকে দেখিয়া তিনি কহিতেছেন—

সুকোমল ম্লান ভাব কপোলে তাঁহার
ঢাকিল সে হাসি তাঁর, ক্ষুদ্র মেঘ যথা !
প্রেম হেন উথলিল হৃদয়ে আমার
আঁখি কৈল প্রাণপণ কহিবারে কথা !
তখন জানিনু আমি স্বরগ আলয়ে
কি করিয়া কথা হয় আত্মায় আত্মায় ;
উজলি উঠিল তাঁর দয়া দিকচয়ে
আমি ছাড়া আর কেহ দেখেনিগো তায় !

* * * *

সবিষাদে অবনত নয়ন তাঁহার
নীরবে আমারে যেন কহিল সে এসে,
"কে গো হায় বিশ্বাসী এ বন্ধুরে আমার
লইয়া যেতেছে ডাকি এত দূর-দেশে ?"

শীতের পত্রহীন তরুশাখায় বসিয়া সন্ধ্যাকালে বিহঙ্গম বিষণ্ণ-সঙ্গীত গাহিতেছিল, কবির হৃদয়ের স্বরে তাহার স্বর মিলিয়া গেল, তিনি গাহিয়া উঠিলেন—

হারে হতভাগ্য বিহঙ্গম সঙ্গীহীন !
সুখ-ঋতু অবসানে গাহিছিস্ গীত !
ফুরাইছে গ্রীষ্ম ঋতু ফুরাইছে দিন
আসিছে রজনী ঘোর আসিতেছে শীত !
ওরে বিহঙ্গম, তুই দুখ-গান গাস্
যদি জানিতিস্ কি যে দহিছে এ প্রাণ
তা হ'লে এ বক্ষে আসি করিতিস্ বাস,
এর সাথে মিশাতিস্ বিষাদের গান !
কিন্তু হা—জানি না তোর কিসের বিষাদ,
ভ্রমিস্‌রে যার লাগি গাহিয়া গাহিয়া,
হয়ত সে বেঁচে আছে বিহঙ্গিনী প্রিয়া,
কিন্তু মৃত্যু এ কপালে সাধিয়াছে বাদ !
সুখ দুঃখ চিন্তা আশা যা' কিছু অতীত,
তাই নিয়ে আমি শুধু গাহিতেছি গীত !

যখন তাঁহার লরার বর্ত্তমানে প্রকৃতির মুখশ্রী আরো উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিত, তখন তিনি গাহিতেন—

কি সৌন্দর্য্য-স্রোত হোথা পড়িছে ঝরিয়া !
স্বর্গ দিতেছেন ঢালি কি আলোক-রাশি !

* * * *

চরণে হরিত-তৃণ উঠে অঙ্কুরিয়া
শত বর্ণ-ময় ফুল উঠিছে বিকাশি !
হর্ষময় ভক্তি ভরে সায়াহ্ন-বিমান
সমুদয় দীপ তার ক'রেছে জ্বলিত,
প্রচারিতে দিশে দিশে তার যশোগান
পাইয়া যাহার শোভা হোয়েছে শোভিত !

আবার কখনো বা সন্ধ্যাকালে একাকী বিজনে বসিয়া ভগ্নহৃদয়ে নিরাশার গীতি গাহিতেছেন।—

স্তব্ধ সন্ধ্যাকালে যবে পশ্চিম আকাশে।
রবি অস্তাচল-গামী প’ড়েছে ঢলিয়া,
বৃদ্ধ যাত্রী কোন এক অজ্ঞাত প্রবাসে,
শ্রান্ত-পদক্ষেপে একা যেতেছ চলিয়া।
তবু যবে ফুরাইয়া যাবে শ্রম তার,
তখন গভীর ঘুমে মজিয়া বিজনে
ভুলে যাবে দিবসের বিষাদের ভার,
যত ক্লেশ সহিয়াছে সুদূর-ভ্রমণে!
কিন্তু হায় প্রভাতের কিরণের সনে
যে জ্বালা জাগিয়া উঠে হৃদয়ে আমার,
রবি যবে ঢলি পড়ে পশ্চিম গগনে,
দ্বিগুণ সে জ্বালা হৃদি করে ছার খার!

প্রজ্বলন্ত রথচক্র নিম্ন পানে যবে
লয়ে যান সূর্য্যদেব, অসহায় ভবে
রাখি রাত্রি-কোলে, যার দীর্ঘীকৃত ছায়া
প্রত্যেক গিরি শিখর সমুন্নত কায়া
উপত্যকা পরে দেয় বিস্তারিত করি;
তখন কৃষক হল ল’য়ে স্কন্ধোপরি,
ধরি কোন গ্রাম্যগীত অশিক্ষিত স্বরে,
চিন্তা ঢালি দেয় তার বন্য-বায়ু পরে!

* * * *

চিরকাল সুখে তারা করুক্ যাপন!
আমার আঁধার দিনে হর্ষের কিরণ
এক তিল অভাগারে দেয়নি আরাম,
এক মুহূর্ত্তের তরে দেয়নি বিরাম।
যে গ্রহ উঠিয়া কেন উজ্জ্বলে বিমান
আমার যে দশা তাহা রহিল সমান।

দগ্ধ হোয়ে মর্ম্মভেদী মর্ম্ম-যন্ত্রণায়
এ বিলাপ করিতেছি, দেখিতেছি হায়—
অতি ধীর পদক্ষেপে স্বাধীনতা সুখে
হল-যুগ-মুক্ত বৃষ ধায় গৃহ-মুখে।
আমি কি হবনা মুক্ত এ বিষাদ হ’তে,
সদাই ভাষিবে আঁখি অশ্রু-জল-স্রোতে!
তার সেই মুখপানে চাহিল যখন
কি খুঁজিতেছিল মোর নয়ন তখন?
এক দৃষ্টে চাহিনু স্বর্গীয় মুখপানে
সৌন্দর্য্য অমনি তার বসি গেল প্রাণে
কিছুতে সে মুছিবে না যত দিনে আসি
মৃত্যু এই জীর্ণ-দেহ না ফেলে বিনাশি।

এই বলিয়া আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করি, যে, পিত্রার্কা তাঁহার সমসাময়িক লোকদিগের নিকট হইতে যেমন আদর পাইয়াছিলেন, এমন বোধ হয়, আর কোন কবি পান নাই। এক দিনেই তিনি প্যারিস ও রোম হইতে লরেল-মুকুট গ্রহণ করিবার জন্য আহূত হন। তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করেন, এবং যে দেশে গিয়াছিলেন সেই থানেই তিনি সমাদৃত হইয়াছিলেন। নৃপতিরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিতেন। তিনি যে রাজসভায় বাস করিতেন, কখনো তাঁহাকে অধীনভাবে বাস করিতে হয় নাই, তিনি যেন রাজ-পরিবার মধ্যে ভুক্ত হইয়া থাকিতেন। লরার নামকে তিনি অমরত্ব প্রদান করিলেন বলিয়া তিনি মনে মনে যে সন্তোষময় গর্ব্ব অনুভব করিতেন, তাঁহার সে গর্ব্ব সার্থক হইল। পাঁচশত বৎসরের কালস্রোত পৃথিবীর স্মৃতি পট হইতে লরার নাম মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই।

তাঁহার নামের সহিতই চিরকাল লরার নাম যুক্ত হইয়া থাকিবে; পিত্রার্কাকে স্মরণ করিলেই লরাকে মনে পড়িবে, লরাকে স্মরণ করিলেই পিত্রার্কাকে মনে পড়িবে।

গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার আবির্ভাব কাল।

ইতি পূর্ব্বে আমরা প্রাচীন ভারতের শিল্প সংগ্রহ করিয়া পাঠকবর্গের নয়নাগ্রে উদিত করিতেছিলাম, প্রতিকূলবশতঃ মধ্যে তাহা স্থগিত হইয়াছিল, পুনরায় তাহা ধরা গেল।

পূর্ব্বকালের লোকেরা যেরূপে কাল নির্ণয় করিত, তাহার কিয়দংশ মাত্র ব্যক্ত করা হইয়াছিল, পরন্তু যাহাতে শিল্প-সংযোগ আছে তাহার কিছুই ব্যক্ত করা হয় নাই, এক্ষণে তাহাই বক্তব্য।

কাল-জ্ঞানের নিমিত্ত যখন নাড়ীর গতি শ্বাস প্রশ্বাস, বর্ণোচ্চারণ ও সূর্য্যের ছায়া প্রভৃতি অবলম্বিত হইত, সহজেই বুঝা যায় যে তখন পর্য্যন্তও কোন প্রকার কালজ্ঞানোপযোগী যন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই। এই বীজ-ভূত কালের অব্যবহিত পরেই বিবিধ যন্ত্রের সৃষ্টি হয়। যে কিছু কালজ্ঞান-সাধন-শিল্প সমস্তই গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যামূলক। সুতরাং গণিত জ্যোতির্বিদ্যা এদেশের কত পুরাতন তাহা নির্ণয় করিয়া পশ্চাৎ তদুৎপন্ন শিল্পগুলির বর্ণন করিব।

গণিত ও জ্যোতির্জ্ঞানশাস্ত্র যে এদেশের কত পুরাতন তাহা নিঃসন্দিগ্ধ নির্ণয় করা সুকঠিন। 'বেলি' নামক ফরাশীস্ দেশীয় একজন জ্যোতির্বেত্তা ব্যক্ত করিয়াছেন যে "৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুদিগের যে সকল জ্যোতির্গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল তাহা অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়।" কেসিনি প্লেফেয়ার প্রভৃতি ইউরোপীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিতদিগকেও বেলির এই মতের পোষকতা করিতে দেখা যায়। যিনি ভরতখণ্ডীয় শাস্ত্রেরই আধুনিকত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত কোন উপায় অবশিষ্ট রাখেন নাই, সেই বেণ্টিলি সাহেবও নিজ শেষ রচিত গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন যে "প্রায় ৩২৯০ বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুরা চন্দ্রের সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ভোগ নিরূপণ করিয়াছিলেন।" অজ্ঞান বশতঃ বা বুদ্ধি-পক্ষাঘাত বশতঃ অন্যে স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমরা দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ ও সর্ব্ব প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থেও গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার বীজ নিহিত আছে। গণিত-বিদ্যার মূল সূত্র স্বরূপ অঙ্ক ও অঙ্কস্থাপন বিধি সর্ব্বাগ্রে আর্য্য জাতির হৃদয় হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল, ইহা শুক্ল যজুর্বেদের সপ্তদশ অধ্যায়ের একটী নিগদ বাক্যের দ্বারা নির্ণয় হয়। যথা—

"একা চ দশ চ দশ চ শতঞ্চ শতঞ্চ

সহস্রঞ্চ সহস্রঞ্চাযুতঞ্চাযুতঞ্চ নিযুতঞ্চ নিযুতঞ্চ প্রযুতঞ্চার্বুদঞ্চ ন্যর্বুদঞ্চ সমুদ্রশ্চ মধ্যঞ্চান্তশ্চ পরার্দ্ধঞ্চ।"

তৎকালে গণিতবিদ্যার সূত্রপাত না থাকিলে যজুর্বেদ কোন ক্রমেই এরূপ সংখ্যা ও সংখ্যাস্থাপনের পরিচায়ক বাক্য ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেন না।

এখন সকল দেশেই গ্রহণ গণনা হইতেছে, কিন্তু ইহার প্রসূতি এই ভারতবর্ষ। ঋগ্বেদের ৪র্থ অষ্টকের ২য় অধ্যায়ের ১২ বর্গের একটী ঋকে লিখিত আছে যে, অত্রি-গোত্রীয় ঋষিরাই সর্ব্বাগ্রে সূর্য্যগ্রহণ গণনার মূল আবিষ্কার করেন, তৎপূর্ব্বে আর কেহ তাহা জানিত না। যথা—

"যং বৈ সূর্য্যম্ স্বর্ভানুস্তমসাবিধ্যদাসুরঃ।
অত্রয়স্তমন্ববিন্দন্ নহ্যন্যে অশক্নুবন্॥"

[আসুরোঽসুরকুলজঃ স্বর্ভানুঃ রাহুঃ যং সূর্য্যং তমসা নিজচ্ছায়য়া অবিধৎ বিদ্ধমকরোৎ তং তথাবিধং সূর্য্যং অত্রয়োঽত্রিগোত্রজা ঋষয়োঽন্ববিন্দন্ প্রাপ্তবন্তঃ। সূর্য্যমণ্ডলবেধবিষয়কং তত্ত্বজ্ঞানং প্রাপ্তবন্ত ইত্যর্থঃ। নহি অন্যে জনা অশক্নুবন্ সূর্য্যমণ্ডলবেধকারকং বাধাতথ্যোনাবাগন্তুং শক্তা নাংভুবন্ ইত্যর্থঃ।]

এইরূপ, ঋগ্বেদের প্রথমাষ্টকের ২য় অধ্যায়ে তাৎকালিক ঋষিগণের মলমাস পরিচয় পাওয়া যায়, যে মলমাস গণণা লইয়া ইউরোপে কত হুলস্থুল ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। যথা—

"বেদ মাসো ধৃতব্রতো দ্বাদশ প্রজাবতঃ বেদায় উপজায়তে।"

[ধৃতব্রতঃ বরুণদেবঃ প্রজাবতঃ কালস্য সর্ব্বাধারত্বাৎ প্রজাঃ সন্তি এষু তান্ দ্বাদশ মধু মাধবাদিভিশ্চৈত্র বৈশাখাদিভির্ব্বা-নামভিঃ প্রসিদ্ধান্ মাসঃ ঋানান্ বেদ জানাতি। তথা উপজায়তে দ্বাদশমাসানামন্তত মস্য কস্যচিৎ উপ সমীপে জায়তে প্রাদুর্ভবতি। বেদ জানাতি তমপি ইতি শেষঃ।]

এই মলমাস বিষয়ক জ্ঞানটী অল্প জ্যোতিষ্ক তত্ত্বের কার্য্য নহে। মলমাস কি? তাহা এস্থলে বুঝাইয়া দিতেছি, দেখুন, ঋগ্বেদের সময়ে লোকের কি পর্য্যন্ত গণিত বিদ্যার জ্ঞান ছিল।

"যস্মিন্মাসে ন সংক্রান্তিঃ সংক্রান্তিদ্বয়মেবব
মলমাসঃ সবিজ্ঞেয়ো মাসঃ স্যাত্ত্ু ত্রয়োদশঃ।"
[বৈদিক-কাঠকগৃহ্য]

একচন্দ্রভোগ্য মাসের মধ্যে যদি সংক্রান্তি অর্থাৎ সূর্য্যসংক্রম না হয়, অথবা আদ্যন্তে দুইবার সংক্রম হয়, তাহা হইলে সেই চন্দ্রের মাসটি মলমাস, ইহা দ্বাদশের অতিরিক্ত ত্রয়োদশ মাস বলিয়া গণ্য।

এইরূপ কৃষ্ণযজুঃ সংহিতাতে "মধুর্মাধবঃ শুক্রঃ শুচির্নভা নভস্য" ইত্যাদি ক্রমে ১২টী সূর্য্যভোগ্য সৌর মাসের নির্ণয় আছে। এই সকল দেখিলে কাহার না প্রতীতি হইবে যে পুরাতন ঋষিদিগেরও গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় জ্ঞান ছিল? তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, তৎকালের কোন বিদ্যারই উত্তম পাটী, সুশৃঙ্খলা, ও বিস্তীর্ণতা ছিল না। ক্রমে কাল যত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে ততই পল্লবিত হইয়াছে। বিশেষরূপে

মনোনিবেশ পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে প্রতীত হয় যে অন্যান্য দেশ যখন অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, ভারতবর্ষ তখন সমধিক প্রোজ্জ্বল বিদ্যালোকে পরিপূর্ণ। পুরাতন গ্রীস্ রাজ্যে যখন এই শাস্ত্রের আলোচনার কোন প্রসঙ্গই ছিল না, এদেশে তখন ইহার বিশেষ উন্নতি।

দুই শত বৎসরাধিক হয় মাত্র ইউরোপে যে শাস্ত্রের আলোচনারম্ভ হইয়াছে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা তাহা ... সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জ্ঞাত ছিলেন। কথিত আছে যে, রোমরাজ্য পতনের পরেও ইউরোপ অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন ছিল। অনন্তর আরব দেশ হইতে তথায় শাস্ত্র সকল সংগৃহীত হইলে ক্রমে তাহা তদ্দেশীয়দিগের বুদ্ধিগোচরে আইসে। ইউরোপ যেমন আরবের শিষ্য, আরবও তেমনি ভারতবর্ষের শিষ্য। আরব যে ভারতবর্ষের ছাত্র তাহা তাহাদিগকে নিজমুখে স্বীকার করিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণের নিকট হইতে আরববাসীদিগের উপদেশ গ্রহণ করিবার বিবরণ অনেক আরবী গ্রন্থে সুস্পষ্ট উল্লিখিত আছে। আরব ভাষায় রচিত "আয়মুল্ অম্বা ফিতব কাতুল্ অত্বা" নামক গ্রন্থে এই অঙ্গীকার বিশেষরূপে ব্যক্ত আছে। এই গ্রন্থ ন্যূনাধিক ৬৫০ বৎসরের পূর্ব্বের রচিত। ইহাতে লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা আরবের অন্তঃপাতী বোগদাদের রাজ সভাতে গমন পূর্ব্বক জ্যোতিষ ও চিকিৎসাদি বিবিধ বিদ্যার উপদেশ শ্রবণ করাইতেন। কঙ্ক নামক একজন ভারতীয় পণ্ডিত ৬৯৪ শকে অলমন্‌সুর বাদশাহের সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি ঔষধ ও রোগ নিরূপণ বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তৎকালে ইহার সঙ্গে যে সকল পুস্তক ছিল, তন্মধ্যে এক পুস্তক "বিহৎসিন্দহিন্দ" নামে খ্যাত ছিল।

এই "বিহৎসিন্দহিন্দ" পুস্তকখানি কি? অনেকে অনুমান করেন যে উহা সংস্কৃত "ব্রহ্মসিদ্ধান্ত"। আবার কেহ বলেন, উহা বরাহমিহির কৃত "বৃহৎসংহিতা"।

উক্ত আরবী গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে তথায় ভারতবর্ষ হইতে আর একজন পণ্ডিত গমন করেন, তাঁহার নাম 'বাথর'। আমাদের বিবেচনা হয়, ইনিই আমাদের আচার্য্য ভাস্কর। কেননা পূর্ব্বোক্ত আরবী গ্রন্থ অনুসারে তদীয় গ্রন্থ সকল প্রায় ১১৫০ শকে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, এবং ইহার সহিত ভাস্করাচার্য্যের বর্ত্তমানকালের বিরোধ হয় না। ভাস্কর স্বয়ং তাঁহার গোলাধ্যায় পুস্তকে লিখিয়াছেন যে তাঁহার "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" গ্রন্থ ১০৭২ শকে সমাপ্ত হয়। যথা—

"রসগুণপূর্ণমহীসম শক-নৃপসময়েঽভবন্মমোৎপত্তিঃ।
রসগুণবর্ষেণ ময়া সিদ্ধান্ত শিরোমণী রচিতঃ"॥

অর্থাৎ শক-রাজার ১০৩৬ বৎসরে আমার জন্ম হয়, আমার ৩৬ বৎসর বয়সে মৎপ্রণীত এই সিদ্ধান্ত শিরোমণি রচনা করিলাম।

ভাস্করাচার্য্যের "করণ-কুতূহল" নামে আর এক গ্রন্থ ছিল, তাহা ১১০৫ শকে সমাপ্ত হয়। অতএব উক্ত বাথর যে ভাস্করাচার্য্য তাহা অসম্ভাবিত নহে।

"আয়নুল অম্বা" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, ৭০৭।৮ শকে "হারূনল্‌অল্‌রশীদ" নামক বাদশাহের একবার উৎকট পীড়া হয়, কোন প্রকারে প্রতীকার না হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষ হইতে "মঙ্ক" নামক একজন সুবিখ্যাত চিকিৎসককে লইয়া যান এবং তাঁহারই চিকিৎসায় তিনি রোগ মুক্ত হন। এই মঙ্ক আরবদেশে থাকিয়া মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়া সম্মান প্রাপ্ত হন এবং আরবী ও পারসিক ভাষাতে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া দেন।

এই মঙ্ক যে কে, তাহা এখন অনুমান করা দুঃসাধ্য। এতদ্ভিন্ন অনেক জ্যোতির্বেত্তা ও চিকিৎসা-বিশারদ ব্যক্তিরা আরবের রাজসভায় গমনাগমন করিয়াছিলেন। ইহাঁদেরও বিবরণ উক্ত গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে। ইহাঁদের সঙ্গে যে সকল বৈদ্য গ্রন্থ ছিল, উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সেই সকল পুস্তকের মধ্যে এক গ্রন্থের নাম "সরক," অপর দুই গ্রন্থের নাম "সস্রদ্" ও "যিদান"। 'সরিক' বা 'সরক' এতদ্দেশীয় 'চরক' আর 'সস্রদ্' ও 'যিদান' 'সুশ্রুত' ও "নিদান" হইবার সম্ভাবনা। পরন্তু মাধব করের নিদান না হইয়া অন্য কাহার নিদান হইতে পারে।

প্রায় ১১১৯ শকের একজন আরবী গ্রন্থকর্ত্তা 'তারা খুল হোকমা' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, হিন্দুদিগের তিন প্রকার জ্যোতিষ, তন্মধ্যে কেবল সিন্দহিন্দ জ্যোতিষ আরবদেশীয়েরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও লেখেন যে, আরবীয়েরা 'বিয়াফর' নামক এক সঙ্গীত গ্রন্থ ও 'কলিল্‌ দমম' নামক এক নীতি গ্রন্থ ভারতবর্ষ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থানুসারে বিয়াফরের অর্থ বিদ্যাফল, আর কলিল দমন্ বা দনম্, যাহা ইউরোপে বিদপাই ও পিলপাই নামে খ্যাত আছে তাহা অতি পুরাতন পঞ্চ-তন্ত্র হইতে সংগৃহীত বলিয়া প্রতীত হয়। কেননা, উভয় গ্রন্থের ঐক্য দ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে যে তাহার প্রথমাধ্যায়ে করটক ও দমনক নামক দুই শৃগালের গল্প আছে। এই দুই শব্দ বিকৃত হইয়া কলিল দমন্ হইয়া থাকিবেক।

এদেশীয়দিগের নিকট আরবীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার বৃত্তান্ত যে কেবল আরবীগ্রন্থে পাওয়া যায় এমত নহে। প্রাচীন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। মহাত্মা আর্য্যভট্ট সংস্কৃত দশ গীতিকা নামক গণিত গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে 'আমি ম্লেচ্ছ ছাত্রগণের সুখ বোধের নিমিত্ত স্বতন্ত্র গণিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, এক্ষণে অভিজ্ঞদিগের নিমিত্ত ইহা করিতেছি।' *

'তারিখুল্‌ হোকমা' গ্রন্থে আরও লিখিত আছে যে, ভারতবর্ষ হইতে যে এক গণিত গ্রন্থ পাওয়া যায় তাহা অল্‌খুবা রেজ্‌মি' নামক একজন আরবী গ্রন্থকর্ত্তা

* 'ম্লেচ্ছাস্তেবাসি বোধায়' ইত্যাদি আর্য্য-গীতির প্রারম্ভে দেখ।

আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশীয় দিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। আরবীগ্রন্থকর্তৃগণ প্রায় একবাক্যে স্বীকার করেন যে উক্ত অলখুব রেজমি, অল্‌মান মুনের রাজ্যকালে ও তাহারাও পূর্ব্বে অনূ্যন ৭৩৫ শকে জীবিত ছিলেন, তিনি বহুতর আরবীদিগকে হিন্দু গণিত বিদ্যায় শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং ইনিই সর্ব্বাগ্রে বীজগণিত প্রচার করেন।

এই সকল দেখিয়া স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, আরবীয়েরা গ্রীশদিগের অপেক্ষাও সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষ হইতে গণিত শাস্ত্র প্রাপ্ত হয়, কারণ, খবারেজ্‌মীর অনেককাল পরে আবুল্‌ফা অনবুজ্জানী নামক পণ্ডিত, যিনি প্রায় ৮০৫২ শকে গণিত বিদ্যাধ্যয়ন আরম্ভ করেন,তিনি ডায়াফেন্‌টেস্ নামক গ্রীক্ গণিতবেত্তার গ্রন্থ আরবীভাষায় আনীত করিয়া আরবীয়দিগকে গ্রীশীয় গণিত শিক্ষা দেন, এবং আরবীয়েরা আলমান্‌সুরের রাজ্যকালে প্রায় ৬৯৪ শকে হিন্দুদিগের নিকট হইতে জ্যোতিষশাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন। ইঁহার রাজত্বের পরি, কতিপয় রাজার রাজ্যাবসানে, যখন হারুন্ অলরশীদ্ তদ্দেশে রাজা হন, তখনও তদ্দেশীয়েরা প্রথমতঃ গ্রীক্‌দেশীয় জ্যোতিবিদ্যা-উপদেশ গ্রহণ করেন এবং তখনই আল্‌মেজিষ্ট নামক গ্রীক্ ভাষার গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদিত হয়।

অনুধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই জানা যায় যে, গণিত বিদ্যার বীজগণিত অংশটই এদেশের অতি আদিম। এই দেশেই সর্ব্বপ্রথমে বীজগণিত শাস্ত্রের উন্নতি হয়। গ্রীক্‌দেশীয় যত বীজগণিত আছে, তন্মধ্যে ডায়োফেণ্টেসের গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। ডায়োফেণ্টস্ রোম-সম্রাট জুলিয়ানের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। আর এ দেশীয় বীজগণিত যত আছে, তন্মধ্যে আর্য্যভট্টের গ্রন্থই সর্ব্বাধিক প্রাচীন। এই আর্য্যভট্ট * ব্রহ্মগুপ্তাদি অপেক্ষা বহুল পুরাতন। ইহার জীবন কাল গ্রীক্‌দেশীয় ডায়াফেণ্টেসের জীবন হইতে অল্প দুরবর্ত্তী নহে। অবিয়, দেখ যে, অনূ্যন ১৫০০ শত বৎসরের আর্য্যভট্ট, আর ডায়োফেণ্টস, এই দুই ব্যক্তির

* আরবদেশীয় পুরাতন গ্রন্থকারগণ কহেন যে, ৬৯৪।৫ শকে খলিফঅল্ মানসুরের অধিকার কালে তত্রস্থ পণ্ডিতেরা তিনপ্রকার হিন্দু জ্যোতিষের সমাচার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে এক প্রকার জ্যোতিষ শিক্ষা করেন, অপর দুই প্রকারের নাম মাত্র শুনিয়াছিলেন। তাহার একপ্রকার অর্যবহর বা আর্যভর। এই অর্যভর অবশ্যই আর্য্যভট্ট। প্রধান পুরাতন জ্যোতিবের্ত্তা ব্রহ্মগুপ্ত ৫৫০ শকে এবং বরাহমিহির ৪২৭ শকে জীবিত ছিলেন। ইহাদের পূর্ব্বকালিক বিষ্ণুচন্দ্র, ত্রাসেন, দুর্গসিংহ। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে আর্য্যভট্টের নাম ও বচন উল্লেখ করায় সপ্রমাণ হইতেছে যে আর্য্যভট্ট ১৪০০ চতুর্দ্দশ শত বৎসরেরও পূর্ব্বের লোক। ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি শালিবাহন রাজার শক গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু আর্য্য তাহার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। তিনি যৌধিষ্টিরাব্দ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে অনুমান হয় যে বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে অথবা শালিবাহন শক প্রচারের পূর্ব্বে আর্য্যভট্ট।

মধ্যে কি পরিমাণ কাল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই উভয় ব্যক্তির গ্রন্থ তুলনা করিলে প্রতীত হয় যে, ডায়োফেন্টেসের সময়ে গ্রীক্‌দেশে কেবল গণিতবিদ্যার সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল। আর আর্য্যভট্টের সময়ে এদেশে উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ইহাঁর সময়ে যে সকল কঠিন কঠিন সমীক্রিয়া ও কুট্টক গণিত এবং অন্যান্য বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয় তাহা ডায়োফেন্‌টসের মনেও উদিত হয় নাই। ২০০ বৎসর পূর্ব্বে যে সকল বীজগণিত বিষয়ক সিদ্ধান্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের অবিদিত ছিল, এবং ইউলর নামক বিখ্যাত ফরাসিস্ পণ্ডিত, যিনি ১০০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই পরলোক গত হইয়াছেন, তিনি যে কুট্টক প্রশ্নের সিদ্ধান্ত বহু আয়াসে করিয়া গিয়াছেন এবং তিনি যে সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে অক্ষম হইলে ১৬৮৮ শকে লেগ্রেঞ্জ নামক পণ্ডিত অতিকষ্টে তাহার সিদ্ধান্ত করেন, এইরূপ অপরাপর কঠিন প্রশ্ন, যাহা ১০০ বৎসর, বা ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপস্থ পণ্ডিতেরা গণনা করিয়াছেন, আমাদের পুরাতন আর্য্যভট্ট সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর করিয়া গিয়াছেন। ১২০০ বৎসর পূর্ব্বের ব্রহ্মগুপ্ত, আর ৭৫০ বৎসরের ভাস্করাচার্য্য তত্তাবতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যভট্টের সময়ে যখন গণিতবিদ্যার এতাদৃশ উন্নতি ছিল, তখন অবশ্য তাঁহার অনেক পূর্ব্ব হইতেও উহার আংশিক চর্চ্চা চলিয়া আসিয়াছিল সন্দেহ নাই।

ভারতবর্ষে যে বহু পূর্ব্বে গণিত-বিদ্যার প্রচার ছিল, সংস্কৃত কাব্য ইতিহাসাদি গ্রন্থেও তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নলোদয় কাব্যের ৪র্থ উচ্ছ্বাসে, রাজা ঋতুপর্ণের গণনা বিদ্যার প্রভাব দেখিয়া নলরাজা বিস্ময়াপন্ন হন। এই আখ্যায়িকা মহাভারত হইতে গৃহীত। রাজা ঋতুপর্ণ একটী বৃক্ষের তাবৎ ফলপত্রাদি গণনা করিয়াছিলেন, প্রচ্ছন্ন সারথি নল তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। মহাভারতেও ঠিক এইরূপ ভঙ্গী [illegible]। নলোদয়ের টীকাকার আনকর মিশ্র অঙ্কবিদ্যাকে গণনার এক সামান্য অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'যতোঽয়ংরাজা ফলগণনাদক্ষ, অতঃপাশ গণনা সোবিদোঽপি স্যাৎ" এই রাজা যখন ফল গণনায় নিপুণ, তখন অবশ্য ইনি অক্ষগণনায়েও নিপুণ।

প্রাচীনকালের অক্ষক্রীড়ায় বোধহয় কোন বিশেষ প্রকারের গণনার প্রয়োজন হইত, সেই জন্যই গণনাবিশারদেরাই অক্ষনিপুণ হইতে পারিতেন। যুধিষ্ঠির পাশক্রীড়ায় রাজ্য হারাইয়া অবশেষে মহর্ষি বৃহদশ্বের নিকট অক্ষবিদ্যা শিক্ষা করেন। গণিত সম্বন্ধ না থাকিলে সামান্য পাশা খেলার উপর এরূপ লিখনভঙ্গী আসিতে পারে না। ঋতুপর্ণ রাজা যে বৃক্ষের ফল পত্র গণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চিত কোন প্রকার অঙ্কবিদ্যার সাহায্য ছিল।

সম্প্রতি যশোদানন্দন সরকার আর্য্যভট্টের দশ গীতির গণিতাংশ ইংরাজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, কুতূহলপরতন্ত্র পাঠকবৃন্দ তাহা দেখিলে লিখিত

বৃত্তান্ত সমূলক কি অমূলক বুঝিতে পারিবেন। যাহা হয় না বলিয়া লোকের এখনও বিশ্বাস আছে, সে সমস্তই তাহাতে দেখিতে পাইবেন।

* ১ অবধি ৯ পর্য্যন্ত অঙ্কমূর্ত্তি "একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রমযুতং তথা।" ইত্যাদি দশ গুণোত্তর গণিত সংখ্যা সর্ব্বাগ্রে ভারতবর্ষেই সৃষ্ট হয়, ইহা লিওনার্ডের গ্রন্থে ও এসিয়াটিক্ রিসর্চ্চ গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে এ সকল বিস্মৃত হও, প্রকৃত প্রস্তাব অর্থাৎ ভারতীয় কাল-জ্ঞান-সাধন শিল্পের প্রতি মনোযোগ কর। বহু শত বৎসর পূর্ব্বে এ দেশে কাল নির্ণয়ের নিমিত্ত যে সকল যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল, আগামী পত্রিকায় তাহা ব্যক্ত করিব।

৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বাথর্ বা ভাস্করাচার্য্যের বচন ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সূর্য্যসিদ্ধান্তের প্রমাণ দিব। প্রমাণগুলি ও যন্ত্রগুলি যে বহু পুরাতন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তই এই স্বতন্ত্র প্রস্তাব লিখিত হইল।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

লীলা।

(গাথা)

"সাধিনু—কাঁদিনু—কতনা করিনু—
ধন মান যশ সকলি ধরিনু—
চরণের তলে তার—
এত করি তবু পেলেম না মন
ক্ষুদ্র এক বালিকার!
না যদি পেলেম—নাইবা পাইনু—
চাইনা চাইয়া তারে!
কি ছার সে বালা!—তার তরে যদি
সহে তিল দুখ এ পুরুষ-হৃদি,
তা হলে পাষাণো ফেলিবে শোণিত
ফুলের কাঁটার ধারে!
এ কুমতি কেন হোয়েছিল বিধি,
তারে সঁপিবারে গিয়াছিনু হৃদি!
এ নয়ন-জল ফেলিতে হইল
তাহার চরণ-তলে?
বিষাদের শ্বাস ফেলিনু, মজিয়া
তাহার কুহক বলে?
এত আঁখিজল হইল বিফল,
বালিকা হৃদয়, করিব যে জয়
নাই হেন মোর গুণ?
হীন রণধীরে ভালবাসে বালা;
তার গলে দিবে পরিণয় মালা!
একি লাজ নিদারুণ!
হেন অপমান নারিব সহিতে,
ঈর্ষ্যার অনল নারিব বহিতে,
ঈর্ষ্যা?—কারে ঈর্ষ্যা? হীন রণধীরে?
ঈর্ষ্যার ভাজন সেও হল কিরে
ঈর্ষা যোগ্য সেও কি মোর?
তবে শুন আজি—শ্মশান-কালিকা
শুন এ প্রতিজ্ঞা মোর!

আজ হোতে মোর রণধীর অরি—
শত নৃকপাল তার রক্তে ভরি
করাবো তোমারে পান,
এ বিবাহ কভু দিবনা ঘটিতে
এ দেহে রহিতে প্রাণ!
তবে নমি তোমা—শ্মশান-কালিকা!
শোণিত-লুলিতা—কপাল মালিকা!
কর এই বর দান—
তাহারি শোণিতে মিটায় গো তৃষা
যেন মোর এ কৃপাণ!"
কহিতে কহিতে বিজন-নিশীথে
শুনিল বিজয় সুদূর হইতে
শত শত অট্ট হাসি—
একেবারে যেন উঠিল ধ্বনিয়া
শ্মশান শান্তিরে নাশি!
শত শত শিবা উঠিল কাঁদিয়া
কি জানি কিসের লাগি!
কুস্বপ্ন দেখিয়া শ্মশান যেন রে
চমকি উঠিল জাগি!
শতেক আলেয়া উঠিল জ্বলিয়া—
আঁধার হাসিল দশন মেলিয়া,
আবার যাইল মিশি!
সহসা থামিল অট্ট হাসি ধ্বনি
শিবার রোদন থামিল অমনি
আবার ভীষণ সুগভীর তর
নীরব হইল নিশি!
দেবীর সন্তোষ বুঝিয়া বিজয়
নমিল চরণে তাঁর।
মুখ নিদারুণ—আঁখি রোষারুণ—
হৃদয়ে জ্বলিছে রোষের আগুন
করে অসি খর ধার!

গিরি-অধিপতি রণধীর সাথে
লীলার বিবাহ হবে,
হরষে রোয়েছে আমোদে মাতিয়া
গিরিবাসীগণ সবে।
অস্তে গেল রবি পশ্চিম শিখরে,
আইল গোধূলী কাল,
ধীরে ধরণীরে ফেলিল আবরি
ক্রমশঃ আঁধার জাল।
ওই আসিতেছে লীলার শিবিকা
নৃপতি-ভবন পানে
শত অনুচর চলিয়াছে সাথে
মাতিয়া হরষ গানে।
জ্বলিছে আলোক—বাজিছে বাজনা
ধ্বনিতেছে দশ দিশি।
ক্রমশঃ আঁধার হইল নিবিড়
গভীর হইল নিশি।
চলেছে শিবিকা গিরিপথ দিয়া
সাবধানে অতিশয়,
বন মাঝ দিয়া গিয়াছে সে পথ
বড় সে সুগম নয়।
অনুচরগণ হরষে মাতিয়া
গাইছে হরষ গীত—
সে হরষধ্বনি—[illegible]ন কোলাহল
ধ্বনিতেছে চারিভিত।
থামিল শিবিকা, অনুচরগণ
সহসা সভয় গণি
সহসা সকলে "দস্যু দস্যু" বলি
করি কোলাহলধ্বনি।
শত বীর-হৃদি উঠিল নাচিয়া
বাহিরিল শত অসি,
শত শত শর মিটাইল তৃষা
বীরের হৃদয়ে পশি।

আধার ক্রমশঃ নিবিড় হইল
　　বাধিল বিষম রণ
লীলার শিবিকা কাড়িয়া লইয়া
　　পলাইল দস্যুগণ।

* * * * * *

কারাগার মাঝে বসিয়া রমণী
　　বরষিছে আঁখি জল।
বাহির হইতে উঠিছে গগনে
　　সমরের কোলাহল।
"হে মা ভগবতী—শুন এ মিনতি
　　রাখ এ মিনতি মোর!
দুখিনীর আর কেহ নাই মাগো
　　তারো এ বিপদে ঘোর!
যদি সতী হই, মনে মনে যদি
　　তাঁহারি চরণ সেবি—
পতি বোলে যারে করেছি বরণ
　　বাঁচাও তাঁহারে দেবি!
মোর তরে দেবি এ শোণিত-পাত!
　　আমি মা—অবোধ বালা,
জনমিয়া আমি মরিনু না কেন
　　ঘুচিত সকল জ্বালা!
মোর তরে তিনি হারাবেন প্রাণ?
　　না-না মা রাখ একথা—
ছেলবেলা হোতে অনেক সহেছি—
　　আর মা দিওনা ব্যথা!"
কহিতে কহিতে উঠিল আকাশে
　　দ্বিগুণ সমর-ধ্বনি—
জয় জয় রব, আহতের স্বর
　　কৃপাণের ঝনঝনি!
সাঁজের জলদে ডুবে গেল রবি,
　　আকাশে উঠিল তারা;
একেলা বসিয়া বালিকা সে লীলা
　　কাঁদিয়া হোতেছে সারা!
সহসা খুলিল কারাগার দ্বার—
　　বালিকা সভয় অতি,—
নিদারুণ হাসি হাসিতে হাসিতে
　　বিজয় পশিল তথি।
অসি হোতে ঝরে শোণিতের ফোটা,
　　শোণিতে মাখানো বাস,
শোণিতে মাখানো মুখের মাঝারে
　　স্ফুরে নিদারুণ হাস!
অবাক্ বালিকা;—বিজয় তখন
　　কহিল গভীর রবে—
"সমর-বারতা শুনেছ কুমারী?
　　সে কথা শুনিবে তবে?"
"বুঝেছি—বুঝেছি-জেনেছি—জেনেছি!
　　বলিতে হবেনা আর,—
না—না, বল বল—শুনিব সকলি
　　যাহা আছে বলিবার।
এই বাঁধিলাম পাষাণে হৃদয়,
　　বল কি বলিতে আছে!
যত ভয়ানক হোক্‌না সে কথা
　　লুকায়োনা মোর কাছে!"
"শুন তবে বলি" কহিল বিজয়
　　তুলি অসি খর ধার—
"এই অসি দিয়ে বধি রণধীরে
　　হরেছি ধরার ভার!"
"পামর নিদয়—পাষাণ-পিশাচ!"
　　মূরছি পড়িল লীলা,
অলীক বারতা কহিয়া বিজয়
　　কারা হোতে বাহিরিলা।
সমরের ধ্বনি থামিল ক্রমশঃ,
　　নিশা হোল সুগভীর।

বিজয়ের সেনা পলাইল রণে—
জয়ী হল রণধীর।
* * * * *
কারাগার মাঝে পশি রণধীর
কহিল অধীর স্বরে—
"লীলা!—রণধীর এসেছে তোমার
এস এ বুকের পরে!"
ভূমিতল হোতে চাহি দেখে লীলা
সহসা চমকি উঠি,
হরষ আলোকে জ্বলিতে লাগিল
লীলার নয়ন দুটি।
"এস নাথ এস অভাগীর পাশে
বোস একবার হেথা,
জনমের মত দেখি ও মুখানি
শুনি ও মধুর কথা!
ডাক নাথ সেই আদরের নামে
ডাক মোরে স্নেহভরে
এ অবশ মাথা তুলে লও সখা
তোমার বুকের পরে!"
লীলার হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধানো
বাহিছে শোণিত-ধারা—
রহে রণধীর পলক বিহীন
যেন পাগলের পারা
রণধীর-বুকে মুখ লুকাইয়া,
গলে বাঁধি বাহুপাশ,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল বালিকা,
"পুরিল না কোন আশ!
মরিবার সাধ ছিল না আমার
কত ছিল সুখ আশা,
পারিল না সখা করিবারে ভোগ
তোমার ও ভালবাসা!
হায়রে হা পামর, কি করিলি তুই?
নিদারুণ প্রতারণা!
এতদিন কার সুখ সাধ মোর
পূরিল না পূরিল না!"
এত বলি ধীরে অবশ বালিকা
কোলে তার মাথা রাখি,
রণধীর মুখে রহিল চাহিয়া
মেলিয়া অবাক্ আঁখি!
রণধীর ক্রমে শুনিল সকল
বিজয়ের প্রতারণা।
বীরের নয়নে উঠিল জ্বলিয়া
রোষের অনল-কণা!
'পৃথিবীর সুখ ফুরালো আমার,
বাঁচিবার সাধ নাই।
এর প্রতিশোধ তুলিতে হইবে,
বাঁচিয়া রহিব তাই!'
লীলার জীবন আইল ফুরায়ে
মুদিল নয়ন দুটি,
কারাগার হোতে রণধীর তবে
বাহিরে আইল ছুটি।
দেখে বিজয়ের মৃতদেহ সেই
রয়েছে পড়িয়া সমর-ভূমে!
রণধীর যবে মরিছে জ্বলিয়া
বিজয় ঘুমায় মরণ ঘুমে!
শত ভাগে তার কাটিয়া শরীর
দলি তারে পদতলে,
পাগলের মত পড়ে রণধীর
বিপাশা নদীর জলে।
তটিনী-সলিল উছসি উঠিল
ডুবি গেল রণধীর,
মরণের কোলে ঘুমায়ে পড়িল
আহত-হৃদয়-বীর!

গেটে ও তাঁহার প্রণয়িনীগণ।

গেটের বোধ হয় বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। যিনি জর্ম্মাণ-সাহিত্যের অহঙ্কার ও অলঙ্কার স্বরূপ,—যিনি "ফষ্ট" নামক নাটক লিখিয়া মানব হৃদয়ের সূক্ষ্মতম শিরা পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন, যিনিই প্রথমে ইউরোপমণ্ডলে আমাদের শকুন্তলার আদর বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তাঁর আর নূতন পরিচয় কি দিব?—কিন্তু তিনি অদ্বিতীয়রূপে সূক্ষ্মদর্শী ও বহুদর্শী হইয়াও জীবনে কতদূর দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা দেখাইবার জন্য পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার প্রেম-কাহিনী আজ উদ্ঘাটিত করিতেছি—

গেটে তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভাল বাসিয়া আসিয়াছেন, অথচ বিয়াত্রীচে বা লরার ন্যায় তাঁহার একটি প্রণয়িনীরও নাম করিতে পারিলাম না। দান্তে ও পিত্রার্কের প্রেম প্রেমের আদর্শ, আর গেটের প্রেম পার্থিব অর্থাৎ সাধারন। শুদ্ধ যে গেটের দুর্ব্বল প্রেম নিরাশা ও উপেক্ষা সহিয়াই স্থির থাকিতে পারে না এমন নহে, সে প্রেমের প্রধান স্বভাব এই যে, তাহার আশা পূর্ণ হইলেই সে আর থাকিতে পারে না। গেটের প্রেম এক দ্বারে নিরাশ হইলে অমনি আর এক দ্বারে যাইত, আবার আশা পূর্ণ হইলেও থাকিত না। গেটের পক্ষে আশাপূর্ণতা ও নৈরাশ্য উভয়ই সমান কার্য্য করিত; এ প্রেমের উপায় কি? গেটের জীবনে এক একটি প্রেম-আখ্যান শেষ হইলে, অমনি তাহা লইয়া তিনি নাটক রচনা করিতেন, দান্তে বা পিত্রার্কার ন্যায় কবিতা লিখিতেন না। বাস্তব ঘটনাই নাটকের প্রাণ, আদর্শ জগৎই কবিতার বিলাসভূমি। যাহা হইয়া থাকে, নাটককারেরা তাহা লক্ষ্য করেন—যাহা হওয়া উচিত কবিদের চক্ষে তাহাই প্রতিভাত হয়। গেটে তাঁহার নিজের প্রেম নাটকে গ্রথিত করিতে পারিতেন, সাধারণ লোকেরা তাহাতে তাঁহার নিজ-হৃদয়ের আভাস পাইত। কিন্তু বিয়াত্রীচের প্রতি-অভিবাদনে, দান্তের হৃদয়ে যে ভাবতরঙ্গ উঠিত, তাহা তিনি কবিতাতেই প্রকাশ করিতে পারিতেন, তাহা দান্তে ভিন্ন আর কাহারো মুখে সাজিত না।

গেটে কহেন, বাল্য কালে তিনি ফুলের পাপড়ি ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা কিরূপে সজ্জিত আছে—পাখীর পালক ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া দেখিতেন তাহা ডানার উপর কিরূপে গ্রথিত আছে। বেটিনা তাঁহার প্রণয়িনীদের মধ্যে এক জন। তিনি বলেন, রমণীর হৃদয় লইয়াও গেটে সেইরূপ করিয়া দেখিতেন। তিনি তাহাদের প্রেম উদ্রেক করিতেন—এবং প্রেম-কাহিনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য কল্পনার সাহায্যে নিজেও কিয়ৎ পরিমাণে প্রেম অনুভব করি-

তেন, কিন্তু সে প্রেম তাঁহার ইচ্ছাধীন, প্রয়োজন অতীত হইলেই সে প্রেম দূর করিতে তাঁহার বড় একটা কষ্ট পাইতে হয় নাই। গেটে নিজেই কহেন, যদি বা প্রেম লইয়া তাঁহার হৃদয়ে কখনো আঘাত লাগিত, সে বিষয়ে একটা নাটক লিখিলেই সমস্ত চুকিয়া যাইত।* যত খানি পর্য্যন্ত ভাল বাসিলে কোন আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই, গেটে তত খানি পর্য্যন্ত ভাল বাসিতেন, তাহার ঊর্দ্ধে আর নহে।

বাল্যকাল হইতেই গেটের সকল শ্রেণীর লোকদের রীতিনীতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার ভাব ছিল। এই কারণে তিনি এক এক সময় অত্যন্ত নীচ শ্রেণীর লোকদের সহিত মিশিতেন। তিনি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে এক বার এই রূপ এক শ্রেণীর লোকদের মধ্যে একটি রাত্রিভোজে উপস্থিত ছিলেন। অভ্যাগতগণ বার বার মদ্য প্রার্থনা করিলে দাসীর পরিবর্ত্তে একটী বালিকা আসিল। সে মৃদু হাস্যে নমস্কার করিয়া কহিল—"দাসী অসুস্থা, শুইতে গিয়াছে, আপনাদের কি প্রয়োজন, আমাকে অনুমতি করুন।" এই রমনীকে দেখিয়া গেটের হৃদয় অতিশয় মুগ্ধ হইল—তিনি তাহাকে অতিশয় সুন্দরী দেখিলেন—তাহার বসন, ভূষণ, গঠন, তাহার টুপিটি পর্য্যন্ত তাঁহার বড় ভাল লাগিল। গেটে এই প্রথম প্রেমে পড়িলেন। গেটে তাহার বাড়িতে যাইবার কোন ছুতা না পাইয়া গির্জ্জায় গিয়া উপাসনার সময় তাহাকেই দেখিতেন। কিন্তু তথাপি উপাসনা ভঙ্গ হইলে পর তাহার সহিত কথা কহিতে বা তাহার সঙ্গ লইতে সাহস করিতেন না! এবং অন্য প্রেমিকদের ন্যায় দূর হইতে তাহার নমস্কার পাইয়াই পরিতৃপ্ত হইতেন—পরিতৃপ্ত না হউন্ সুখী হইতেন। এই রমনীর নাম গ্রেষেণ। যে বাড়িতে তাহাকে প্রথমে দেখিয়াছিলেন সেই বাড়িতে কোন উপায়ে পুনরায় তাহার সহিত একবার মিলন ধার্য্য করিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। যেন এক জন রমনী এক জন যুবাকে লিখিতেছে, এই রূপ ভাবের এক খানি প্রেমের পত্র তাহাকে পড়িয়া শুনাইলেন। সে শুনিয়া কহিল—"সুন্দর হইয়াছে বটে। কিন্তু এমন সুন্দর চিঠি যদি সত্য সত্য লেখা হইত, তবে বেশ হইত।" গেটে কহিলেন, "বাস্তবিক সে যুবা যদি এই চিঠিখানি পাইয়া থাকে আর যে মহিলাকে সে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসে সেও তাহাকে এই রূপ

*ম্যানফ্রেডের সমালোচনায় গেটে লিখিয়াছেন যে, বাইরণ ফ্লোরেন্সে এক বিবাহিতা মহিলার প্রেমে পড়েন, কিন্তু এই প্রেমবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া স্বামী আপন স্ত্রীকে হত্যা করে, কিন্তু সেই রাত্রেই বিছানার উপরে তাহারো মৃতদেহ দৃষ্ট হয়, বাইরণ সেই রাত্রেই ফ্লোরেন্স ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। মান্ফ্রেডে যে রমণীর প্রেতাত্মার কথা বর্ণিত আছে সে পূর্ব্বোক্ত মহিলা। গেটে লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু এ গল্পটির কোন মূল নাই, সম্পূর্ণ কাল্পনিক। গেটে নিজের সাদৃশ্য মনে করিয়াছিলেন, বাইরণও আপনার জীবনের ঘটনা হইতেই উক্ত নাটক লিখিয়া থাকিবেন।

ভাল বাসে, তাহা হইলে সে কি সুখীই হইত!" গ্রেষেণ কহিল "হাঁ কথাটা শুনিতে যেমনই হউক্—নিতান্ত অসম্ভব নহে।" গেটে কহিলেন "আচ্ছা মনে কর, এক জন যে তোমাকে চেনে, মাথায় করিয়া পূজা করে, ভাল বাসে, সে যদি তোমার সম্মুখে এই চিঠি খানি দেয়, তবে তুমি কি কর?" গ্রেষেণ ঈষৎ হাসিয়া, একটু ভাবিয়া চিঠিটা লইল ও তাহার নীচে আপনার নাম সই করিয়া দিল। গেটে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গেলেন। সে কহিল—"না—চুম্বন করিও না—উহা ত সচরাচর হইয়া থাকে, ভাল বাসিতে হয় ত ভালই বাস।" প্রেমিকের এরূপ সাহসিকতা আমাদের কাছে কেমন কেমন লাগে বটে—কিন্তু ইয়ুরোপীয়দের চক্ষে এরূপ দৃশ্য ও তাহাদের কর্ণে এরূপ কথাবার্ত্তা চিরাভ্যস্ত। গেটের জীবনচরিত পড়িবার সময় অবশ্য কতকটা তাঁহাদের দেশীয় আচার ব্যবহারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে হইবে। পরে গেটে সেই চিঠিটি লইয়া কহিলেন "এ চিঠি আমার কাছেই রহিল—সমস্ত গোল চুকিয়া গেল, তুমি আমাকে বাঁচাইয়াছ!" গ্রেষেণ কহিল "আর কেহ না আসিতে আসিতে এই বেলা তুমি চলিয়া যাও।" গেটে কোন মতে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিলেন না। কিন্তু সে স্নেহের সহিত তাঁহার দুই হস্ত ধরিয়া এমন দয়ার্দ্র ভাবে কহিল যে, গেটের চক্ষে জল আসিল, গেটে কল্পনায় দেখিলেন তাহারো চক্ষে যেন জল আসিয়াছে। অবশেষে তাহার হস্ত চুম্বন করিয়া চলিয়া আসিলেন। গেটে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন; নানাবিধ ভোজে, নানা প্রমোদ স্থানে, তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন। গেটে এক দিন গ্রেষেণদের বাড়িতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আছেন, সহসা তাঁহার মনে পড়িল তিনি তাঁহাদের দ্বারের চাবি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কহিলেন—তাঁহার বাড়ি ফিরিয়া যাওয়া অনর্থক, অনেক গোল মাল না করিয়া বাড়িতে প্রবেশ করা অসম্ভব। তাহারা সকলে কহিল—"বেশ ত —এস, আমরা সকলে মিলিয়া আজ এই খানেই রাত্রি জাগরণ করিয়া কাটাইয়া দিই।" গেটের তাহাতে কোন আপত্তি ছিল না। এমন কি, আমাদের এক এক বার সন্দেহ হয়, তিনি ইচ্ছা করিয়াই বা চাবি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন! কাফি পান করিয়া সকলে রাত্রি জাগরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আস্তে আস্তে তাস খেলা বন্ধ হইল, গল্প ক্রমে ক্রমে থামিয়া আসিল, গৃহের কর্ত্রী তাঁহার চৌকির উপর ঘুমাইতে আরম্ভ করিলেন, অভ্যাগতগণ ঢুলিতে লাগিলেন। গেটে এবং গ্রেষেণ জানালার এক ধারে বসিয়া অতি মৃদুস্বরে কথা বার্ত্তা কহিতেছিলেন, ক্রমে গ্রেষেণেরও ঘুম আসিল, তাঁহার মস্তকটি সে ধীরে ধীরে গেটের কাঁধে রাখিল, ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। গেটেও অল্পে অল্পে ঘুমাইয়া পড়িলেন। এই রূপে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। কিন্তু

তিনি যে এই রূপ নীচ শ্রেণীর লোকদিগের সহিত মিশেন ইহা তাঁহার পিতার কানে গেল। তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই মনোবেদনায় গেটে অত্যন্ত পীড়িত হইলেন, এমন কি, তাঁহার মস্তিষ্কের পীড়া জন্মিবার উপক্রম হইয়াছিল। তিনি গ্রেষেণ ও তাহার বন্ধুদের ভাবনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহার বন্ধুকে গ্রেষেণের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—বন্ধুটি ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"সে বিষয়ে তোমার বড় একটা ভাবিতে হইবে না—সে কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই; সে দিব্য স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে। সে স্পষ্টই স্বীকার করিল যে, "হাঁ আমি তাঁহাকে অনেক বার দেখিয়াছি বটে, এবং দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি—কিন্তু সর্ব্বদাই বালকটির ন্যায় তাঁহার প্রতি আমি ব্যবহার করিতাম—আর আমার তাঁহার প্রতি ভগিনীর মত ভালবাসা ছিল।" এই রূপে অতি গম্ভীরা গৃহিনী-ভাবে গ্রেষেণ যাহা যাহা বলিয়াছিল, তাঁহার বন্ধু সমস্ত বলিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু শেষ কথাগুলি আর গেটে শুনিলেন না—গ্রেষেণ যে তাঁহাকে ক্ষুদ্র বালকটি মনে করিত তাহাই তাঁহার প্রাণে বিঁধিয়া গেল। ওকথাটা তাঁহার বড়ই খারাপ লাগিল—তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, গ্রেষেণের উপর হইতে তাঁহার সমস্ত ভাল বাসা চলিয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার বন্ধুকে স্পষ্টই বলিলেন, এখন হইতে সমস্তই চুকিয়া বুকিয়া গেল। গেটে গ্রেষেণের কোন সম্পর্কে আর রহিলেন না—তাহার নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করিতেন না। এমন কি, পূর্ব্বে তিনি তাহার মুখশ্রী যেরূপ চক্ষে দেখিতেন, এখন তাহা বিপরীত ভাবে দেখিতে লাগিলেন—এত দিনে তাহার যথার্থ ভাব বুঝিতে পারিলেন—তাহার মমতাশূন্য নীরস মুখশ্রী তাঁহার চক্ষে পরিস্ফুট হইল। কিন্তু হৃদয়ের আঘাত যন্ত্রণা শীঘ্র নিবৃত্ত হইবার নহে। তিনি কহিলেন—"যে সকল বন্ধুদের ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হয়, তোমার চরিত্র তাহারা সংশোধন করিতে চাহিতেছে তাহাদের দ্বারা কোন ফল জন্মে না—এক জন স্ত্রীলোক যাহার ব্যবহারে সহসা মনে হইতে পারে সে তোমাকে নষ্ট করিতেছে সেই স্ত্রীলোকই অলক্ষিত ভাবে তোমার চরিত্র সংশোধন করে।" তিনি তাঁহার লিখিত উপাখ্যানের এক স্থানে লিখিয়াছেন—"কুমারীরা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালকদের অপেক্ষা আপনাকে মহা বিজ্ঞ মনে করে—আর তাহাদিগকে প্রথমে যে বেচারী ভালবাসা জানায়—তাহাদের নিকট তাহারা মহা দিদিমার চালে চলিতে থাকে।" একথাটা সত্য—এবং অনেক অশ্রুজলের মধ্য হইতে তিনি এসত্যটি উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। গেটের প্রেম বহুদিন অলস ও নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে নাই—আনষেন্ নামক আর একটি সুশ্রী বালিকা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। গেটের এই বারকার প্রেম-কাহিনীতে আমরা প্রেমের আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাইব।

আনষেন্ অল্পবয়স্ক, সুন্দরী, প্রফুল্ল এবং প্রিয়দর্শন ছিল। গেটে স্বীয় মোহিনী শক্তির বলে তাহার প্রেম আকর্ষণ করিয়াছিলেন, এবং সে প্রেমকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। কিন্তু তেমনি গেটে সে বালিকার প্রেমের উপর অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করিতেন। তিনি নিজেই স্বীকার করেন— যে কারণেই হোক্ তাঁহার মন খারাপ হইলেই তিনি সেই বেচারীর উপরে আক্রোশ প্রকাশ করিতেন,—কেন? না সে প্রাণপণে তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিত বলিয়া। তাঁহাকে সন্তুষ্ট রাখা তাহার ব্রত ছিল, এই সুমহৎ অপরাধে তিনি তাহার প্রতি ক্রমাগত অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন। অনর্থক অসূয়া ও অকারণ সন্দেহে তিনি আপনাকে ও তাহাকে সর্ব্বদাই অসুখী করিতেন। এই সকল প্রণয়ের অত্যাচার আনষেণ্ অনেক দিন পর্য্যন্ত সহ্য করিয়াছিল, প্রশংসনীয় ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছিল; কিন্তু আর সহিল না। ক্রমাগত জ্বালাতন হইয়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতের পর আঘাত পাইয়া অবশেষে তাহার ধৈর্য্য টুটিয়া গেল। অন্যায় অত্যাচারে তাহার প্রেম ক্রমে ক্রমে বিনষ্ট হইয়া গেল। এদিকে গেটে তাহাকে সত্য সত্য মনের সহিত ভালবাসিতেন। আনষেণ্ যখন বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল তখন গেটের চৈতন্য জন্মিল। এত দিন আনষেণ্ তাঁহাকে সাধিয়া আসিতে ছিল, এখন তাঁহার সাধিবার পালা পড়িল। তিনি তাহার প্রেম পুনর্জীবিত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আর হয় না, আনষেণের মন আর ফিরিবার নহে. একেবারে তাঁহার উপর হইতে তাহার প্রেম চলিয়া গিয়াছে। কিছুদিন পরে আন্‌সেনের বাসভূমি লিপ্‌সিক্ হইতে তাঁহার জন্মভূমি ফ্র্যাঙ্কফোর্টে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। তখন অ্যান্‌সেনের সহিত চিঠি লেখালিখি সুরু করিলেন—লিখিলেন—"আমাকে মনে রাখিবার জন্য অনুরোধ করিবার বোধ হয় আবশ্যক নাই; যে ব্যক্তি সার্দ্ধ দুই বৎসর প্রায় তোমাদের পরিবার মধ্যে ভুক্ত হইয়া বাস করিয়াছিল, যে ব্যক্তি অনেক সময় তোমার অসন্তোষের কারণ হইয়াছিল সত্য কিন্তু তথাপি তোমার প্রতি সর্ব্বদাই অনুরক্ত ছিল, সহস্র ঘটনা বোধ হয় তাহাকে তোমার স্মৃতিপথে উদিত করিয়া দিবে—অন্ততঃ তুমি তাহার অভাব অনুভব করিবে—তুমি না কর আমি অনেক সময় করিয়া থাকি।" দিন কতক গেটে তাহার সহিত চিঠি লেখালিখি করিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার মন আর বিচলিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে তাহার বিবাহ-বার্ত্তা শুনিয়া কহিলেন—

"আমি তোমার লেখা আর দেখিতে চাহি না— তোমার কণ্ঠস্বর আর শুনিতে চাহি না—আমি যে স্বপ্নে মগ্ন রহিয়াছি তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি আমার আর একটি মাত্র পত্র পাইবে, এ অঙ্গীকার আমি নিশ্চয় পালন করিব এবং এই রূপে আমার ঋণের এক অংশ মাত্র পরিশোধ দিব, অবশিষ্ট টুকু আমাকে মার্জ্জনা করিও।" আর একটি পত্র লিখিয়া-

ছিলেন—তাহাতে কহিয়াছিলেন "আমার নিজের বিষয়ে বিশেষ কিছুই বক্তব্য নাই—আমি সবল সুস্থ শরীরে পরিশ্রম করিয়া অতি সুখশান্তিতে কাল যাপন করিতেছি—তাহার প্রধান কারণ—এখন আর আমাকে কোন স্ত্রীলোকে পায় নি।" এই রূপে গেটে তাঁহার হৃদয়-জ্বালা শান্তি করিতে আন্‌ষেণের দ্বারে নিরাশ হইয়া কল্পনার দ্বারে আশ্রয় লইলেন—একটা নাটক লিখিয়া ফেলিলেন। এই নাটকের নাম "প্রেমিকের খেয়াল।" এরিডনকে (গ্রন্থের নায়ককে) তাঁহার প্রণয়িনীর সখী কহিলেন—"অ্যামীন (নায়িকা) তোমাকে এত ভাল বাসে যে, কোন স্ত্রীলোক তেমন ভাল বাসে নাই" নায়িকাকে তাহার সখী কহিল "যে পর্য্যন্ত তাঁহার অসুখের সত্য কোন কারণ না থাকিবে সে পর্য্যন্ত তিনি একটা না একটা কারণ কল্পনা করিয়া লইবেন; তিনি জানেন যে, তুমি তাঁহা অপেক্ষা আর অধিক কিছুই ভাল বাসো না—তুমি তাঁহাকে সন্দেহের কোন কারণ দাও না বলিয়াই তিনি তোমাকে সন্দেহ করেন। এক বার তাঁহাকে দেখাও যে তাঁহাকে না হইলেও তোমার চলে। তাহা হইলে এখনকার একটি চুম্বন অপেক্ষা তখনকার একটি দৃষ্টিতে অধিকতর সন্তুষ্ট হইবেন।" এই খানেই গেটের দ্বিতীয় প্রেমাভিনয়ের যবনিকা পড়িয়া গেল।

এক সময়ে গেটে গোল্‌ড্‌স্মিথের "বাইকার" নামক উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময়ে তিনি শুনিলেন, ষ্ট্র্যাস্‌বর্গের নিকটে অবিকল প্রিম্‌রোস্ পরিবারের ন্যায় এক পাদ্রী পরিবার বাস করেন। তিনি কৌতূহল বশত তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিলেন। দেখিলেন—পাদ্রির কনিষ্ঠা কন্যা ফ্রেড্‌রিকার সহিত সোফিয়ার অনেক সাদৃশ্য আছে। সে পরিবারের মধ্যে গেটে দুই দিন বাস করিলেন—এবং সেখানে তাঁহার অতুল্য মোহিনী শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় ফ্রেড্‌রিকার জন্য নিঃশ্বাস ফেলিয়া আসিলেন—বোধ হয় ফ্রেড্‌রিকাও তাঁহার জন্য নিশ্বাস ফেলিয়াছিল। কিছু দিন পরে আবার সহসা এক সন্ধ্যাকালে তাহাদের সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। অলিভিয়া ও ফ্রেড্‌রিকা দুই বোনে দ্বারের কাছে বসিয়াছিল। আদরের সহিত তিনি সেখানে আহূত হইলেন। আলোতে আসিবা মাত্র অলিভিয়া তাঁহাকে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল—সে গেটের অদ্ভুত পরিচ্ছদ দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। ফ্রেড্‌রিকা কহিল "কই—আমিত হাসিবার মত কিছুই দেখিতে পাই নাই"—কিন্তু ফ্রেড্‌রিকা দেখিতে পাইবে কেন?

এই কাহিনী শেষ করিবার পূর্ব্বে ইহার অন্তর্ভুক্ত আর একটি উপাখ্যান বলিয়া লই। গেটে ইতিপূর্ব্বে এক ফরাসী শিক্ষকের নিকট নৃত্য শিখিতেন। তাঁহার শিক্ষকের দুই কন্যা ছিল, দুই জনই যুবতী ও রূপবতী—ইহাদের মধ্যে কনিষ্ঠাটি আর এক জনের প্রেমাসক্তা। জ্যেষ্ঠা লুশিন্দা তাঁহার

প্রেমে পড়িল, কিন্তু তিনি কনিষ্ঠা এমিলিয়ার প্রেমে পড়িলেন। এক সময়ে লুশিন্দা রোগ-শয্যায় শয়ান ছিল—তাহার ঘরের পার্শ্বে এমিলিয়া ও গেটে বসিয়াছিলেন। এমিলিয়া গেটের নিষ্ফল প্রেম লইয়া কথোপকথন করিতেছিল। কিছুক্ষণ পরে এমিলিয়া গেটেকে কহিল—"তোমাতে আমাতে তবে এই পর্য্যন্ত।" গেটেকে দ্বার পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া এমিলিয়া কহিল "আমাদের এই শেষ দেখা। তোমাকে যাহা কখনো দিই নাই ও দিব না, আজ তাহা দিলাম।" এই বলিয়া গেটের গলা ধরিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিল। উন্মত্ত গেটে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন—এমন সময়ে লুশিন্দা তাহার রোগ-শয্যা হইতে বিশৃঙ্খল-বসনে ছুটিয়া আসিয়া এমিলিয়াকে কহিল "তুমি একলা কেবল উঁহার নিকট হইতে বিদায় লইতে পারিবে না।" এমিলিয়া গেটেকে ছাড়িয়া দিল—লুসিন্দা গেটের বক্ষ জড়াইয়া ধরিল—ও তাহার স্বর্ণবর্ণ কেশপাশ দিয়া তাঁহার মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। লুশিন্দা অনেক ক্ষণ নীরবে এই অবস্থায় রহিল—গেটে ত কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে লুশিন্দা গেটেকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যাকুল-নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আবার কিয়ৎক্ষণ পরে ছুটিয়া গিয়া চুম্বনে চুম্বনে তাঁহাকে যেন প্লাবিত করিয়া দিল; পরিশেষে কহিল—"এখন আমার অভিশাপ শুন—আমার পরে প্রথম যে তোমার ঐ অধর চুম্বন করিবে—চিরকাল তাহার দুঃখের পর দুঃখ হউক! যদি সাহস হয় তবে পুনরায় চুম্বন করিও—কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি ঈশ্বর আমার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। এখন তুমি বিদায় হও—যত শীঘ্র পার, বিদায় হও!" গেটে বিদায় হইতে কিছুমাত্র কালবিলম্ব করিলেন না।

এখন আমরা পুনরায় ফ্রেডরিকার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করি। পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় মিলন কালে গেটে ফ্রেডেরিকার সহিত গ্রাম-পথে ভ্রমণ করিতেছেন—দিন গুলি অতি শীঘ্র ও অতি সুখে চলিয়া যাইতেছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত সেই অভিশাপের ভয়ে গেটে কখনো ফ্রেডরিকাকে চুম্বন করেন নাই। এই খানে পুনরায় পাঠকদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বৈদেশিকের জীবন চরিত্র পড়িবার সময় আপনাকে কতকটা তাহাদেরই রীতি নীতি প্রথা সহাইয়া লওয়া প্রয়োজনীয়। তাহাদের কার্য্য তাহাদেরই আচার ব্যবহারের সহিত তুলনা করিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। এক প্রকার তাস খেলা আছে, হারিলে চুম্বন দণ্ড দিতে হয়—গেটে এই চুম্বনের পরিবর্ত্তে কবিতা উপহার দিতেন—কিন্তু যে মহিলার তাঁহার নিকট হইতে চুম্বন প্রাপ্য থাকিত তাঁহার যে মর্ম্মে আঘাত লাগিত তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু গেটে অধিক দিন এরূপ সামলাইয়া চলিতে পারেন নাই। একটি নাচের উৎসবে গেটে ফ্রেডেরিকার সহিত নাচিয়াছিলেন—গেটের নাচ ফ্রেডেরিকার বড় ভাল লাগিয়াছিল। নাচ শেষ হইলে উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নির্জ্জনে গিয়া আলিঙ্গন ক-

রিয়া কহিলেন, উভয়ই উভয়কে মনের সহিত ভাল বাসেন। দিনে দিনে উভয়ের ভালবাসা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—অবশেষে গেটের বিদায় লইবার সময়, আত্মীয়দের সম্মুখেই ফ্রেড্রিকা তাঁহাকে চুম্বন করিল। গেটে ফ্রেড্রিকার প্রেমকে বরাবর পালন করিয়া আসিয়াছিলেন—কিছুই বলা কহা হয় নাই, অথচ এক প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল যেন তিনি বিবাহ করিবেন। কিন্তু গেটে জানিতেন তাঁহার বিবাহ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বিদায় হ'ব হ'ব সময়ে ঐকথা তাঁহার স্মরণ হইল। তখন ফ্রেড্রিকাকে দেখিলে তাঁহার মন কেমন অসুস্থ হইত—ফ্রেড্রিকা হইতে দূরে থাকিতে পারিলেই একটু শান্ত হইতেন। বিদায়কালে গেটে অশ্বে আরোহণ করিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন—ফ্রেডেরিকা তাঁহার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মনে মনে বিবাহ করিব না জানিয়াও বালিকার প্রেমকে প্রশ্রয় দেওরা যে অন্যায় হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু ফ্রেডরিকা তাঁহাকে কিছুমাত্র তিরস্কার বা তাঁহার নামে কোন দোষারোপ তা'সে করে নাই। গেটের হৃদয় হইতে প্রেম যেরূপ ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়াছিল, ফ্রেড্রিকারও সেই রূপ হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না। যাহা হউক্ অবিবাহিত অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু হয়। গেটে ফ্রেডরিকা সম্বন্ধে কহেন—

"প্রেমেণ আমার নিকট হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল—আনমেণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল—কিন্তু এই প্রথম আমি নিজে দোষী হইয়াছিলাম। আমি একটি অতি সুন্দর হৃদয়ের অতি গভীরতম স্থান পর্য্যন্ত আহত করিয়াছিলাম। অন্ধকারময় অনুতাপে সেই অতি আরামদায়ক প্রেমের অবসানে কিছু কাল যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম, এমন কি, তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মানুষকে ত বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, কাজে কাজেই অন্য লোকের উপরে মনোনিবেশ করিতে হইল।"

এখন গেটে শারলোট্ নামক এক রমণীর প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। কেজ্নার নামক যুবার সহিত ষারলোটের বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। উভয়ই উভয়ের প্রেমে আসক্ত। কেজ্নারের প্রণয়ে অসূয়া বা সন্দেহ কিছুমাত্র ছিল না; যাহাকে সে ভাল মনে করিত তাহারই সহিত ষার্লোটের আলাপ করাইয়া দিত। এই রূপে গেটের সহিত ষার্লোটের প্রথম আলাপ হয়। প্রেমিক-যুগলের সহিত গেটের প্রণয়-সম্বন্ধ ক্রমেই পাকিয়া উঠিতে লাগিল। ষার্লোট ব্যতীত তিনি আর থাকিতে পারেন না। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ওয়েট্স্লারের উর্ব্বর ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যদি কাজ কর্ম্ম হইতে অবসর পাইতেন তবে কেজ্নারও তাঁহাদের সহিত যোগ দিতেন। এই রূপ ধীরে ধীরে তাহারা পরস্পরের সহিত এমন মিলিত হইয়া গেল যে, এক জনকে নহিলে যেন আর এক জনের চলিত না। যতখানি উপযুক্ত, অলক্ষিতভাবে গেটের তদপেক্ষা প্রেম জন্মিয়া গিয়া-

য়াছিল। কিন্তু স্বার্লোটের মন কেজ্‌নার হইতে গেটের প্রতি ধাবিত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে তাহাদের বিবাহের সময় হইয়া আসিতেছে—গেটে দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়েও প্রেম দিন দিন বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে—গেটে দেখিলেন এইবেলা হইতেই দূরে পলায়ন করা সৎপরামর্শ। দূরে প্রস্থান করিলেন ও এই বিষয় লইয়া তাঁহার বিখ্যাত উপাখ্যান "যুবা ওরার্থরের যন্ত্রণা" লিখিয়া ফেলিলেন। লেখাও শেষ হইল আর তাঁহার প্রেমও শেষ হইল। এখন তিনি আবার নূতন পথে যাইবার বল পাইলেন।

নূতন পথে যাইতে তাঁহার বড় বিলম্ব হয় নাই। লিলি নামক এক ষোড়শবর্ষীয়া বালিকার (আমাদের দেশে যুবতী) সহিত তাঁহার প্রণয় জন্মিল। সে বালিকার অনেকগুলি অনুরাগী বা বিবাহাকাঙ্খী ছিল। তাহাদের সকলকেই তাহার প্রেমে বন্দী করিবার দিকে লিলির বিশেষ যত্ন ছিল, কিন্তু দৈবক্রমে আপনি গেটের প্রেমে জড়াইয়া পড়িল —একথা সে নিজেই গেটের কাছে স্বীকার করিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের প্রেম বাড়িয়া উঠিল ইহা বলা বাহুল্য। অবশেষে তাঁহাদের অবস্থা এমন হইয়া উঠিল যে সুদূর বিচ্ছেদের কথা মনে করিতেও কষ্ট হইত; উভয়ের উভয়ের উপর এমন বিশ্বাস জন্মিয়া গেল যে, অবশেষে তাঁহারা বিবাহের বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উভয়েরই কর্ত্তৃপক্ষের তাহাতে অমত হইল। অবশেষে এক জন রমণী মধ্যস্থা হইয়া উভয় পক্ষকেই সম্মত করাইল। যত দিন কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সম্মত হন নাই তত দিন গেটে বড়ই যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন, কিন্তু সম্মত হইলে পর তাঁহার মনের নূতন প্রকার পরিবর্ত্তন হইল। তখন সমস্ত নূতনত্ব চলিয়া গেল। যখন লিলিকে হস্তপ্রাপ্য মনে করিলেন তখন লিলির উপর আর টান থাকিবে কেন? লিলির নিকট হইতে বিদায় না লইয়া তিনি আস্তে আস্তে ফ্র্যাঙ্কফোর্ট ত্যাগ করিয়া চলিলেন। তিনি বলেন তিনি লিলিকে ভুলিতে পারেন কিনা—এবং লিলির উপর বাস্তবিক তাঁহার কতখানি প্রেম আছে, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বিদেশে যাইতেছেন। কিন্তু এই পরীক্ষার কথা যখনি তাঁহার মনে আসিয়াছে, তখনি বুঝা গিয়াছে বাস্তবিক তাঁহার প্রেম নাই। যদি তাঁহার প্রেমের তেমন গভীরতা থাকিত তবে কি পরীক্ষার কথা মনেই আসিত? কিছু দিন বিদেশে থাকিয়া আবার তিনি ফ্র্যাঙ্কফোর্টে ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে লিলির আত্মীয়বর্গ লিলির প্রেম বিনষ্ট করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু লিলি কহিল, সে গেটের জন্য সমস্ত ত্যাগ করিতে পারে—এমন কি, গেটে যদি সম্মত হন, তবে সে তাঁহার সঙ্গে আমেরিকায় যাইতে পারে। কি সর্ব্বনাশ—গেটে তাঁহার বাড়ি ঘর ছাড়িয়া কোথা এক সাত সমুদ্র পার আমেরিকা—সেইখানে যাইবেন! তাও কি হয়? লিলি গেটের জন্য সমস্ত করিতে পারে, কিন্তু গেটে তাহার জন্য বড় একটা ত্যাগ স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। ত্যাগস্বীকার করা দূরে থাকুক,

কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে না হইলেও তিনি লিলিকে বিবাহ করেন কিনা সন্দেহ। আবার গেটে আস্তে আস্তে পলাইবার চেষ্টা দেখিলেন। এক বার লিলির ঘরের জানালার সম্মুখে দাঁড়াইলেন—দেখিলেন যেখানে পূর্ব্বে প্রদীপ জ্বলিত, সেইখানেই জ্বলিতেছে—লিলি পিয়ানো বাজাইয়া তাঁহারই রচিত একটি গান গাহিতেছে—তাহার প্রথম ছত্র।

"হায়—কি সবলে মোরে করিয়াছে আকর্ষণ!"

এ গানটি কিছুকাল পূর্ব্বে তিনিই লিলিকে উপহার দিয়াছিলেন। যাহা হউক—গেটে লিলির সবল আকর্ষণ ত ছিঁড়িলেন।

যে ব্যক্তি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এক জনের পর আর এক জনকে ভাল-বাসিয়া আসিয়াছিলেন, ও ভালবাসা পাইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার প্রেমের কথা আর কত বলিব। তাঁহার ছিয়াত্তর বৎসর বয়সের সময় মাডাম জিমানোস্কা তাঁহার প্রেমে পড়েন!

গেটের এই প্রেম-কাহিনী সমুদয়ে পাঠকেরা যে মহাকবি গেটের হৃদয় জানিতে পারিবেন মাত্র তাহা নহে—প্রেমের বিচিত্র মূর্ত্তিও দেখিতে পাইবেন।

ফুলবালা।

আজি পূরণিমা নিশি,
তারকার মাঝে বসি
অলস-নয়নে শশি
মৃদু-হাসি হাসিছে।
পাগল পরাণে ওর,
লেগেছে ভাবের ঘোর,
যামিনীর পানে চেয়ে
কি যেন কি ভাবিছে!
কাননে নিঝর ঝরে
মৃদু কল কল স্বরে,
অলি ছুটা-ছুটি করে
গুন্ গুন্ গাহিয়া!
সমীর অধীর-প্রাণ
গাইয়া-উঠিছে গান
তটিনী ধরেছে তান,
ডাকি উঠে পাপিয়া!

সুখের স্বপন মত
পশিছে সে গান যত—
ঘুমঘোরে জ্ঞান-হত
দিক-বধূ শ্রবণে,—
সমীর সভয় হিয়া—
মৃদু মৃদু পা টিপিয়া
উঁকি মারি দেখে গিয়া
লতা-বধূ-ভবনে!
কুসুম-উৎসবে আজি
ফুলবালা ফুলে সাজি,
কত না মধুপ রাজি
এক ঠাঁই কাননে!
ফুলের বিছানা পাতি
হরষে প্রমোদে মাতি
কাটাইছে সুখ-রাতি
নৃত্য-গীত-বাদনে!

ফুল-বাস পরিয়া
হাতে হাতে ধরিয়া
নাচি নাচি ঘুরি আসে কুসুমের রমণী!
চুল গুলি এলিয়ে
উড়িতেছে খেলিয়ে
ফুল-রেণু ঝরি ঝরি পড়িতেছে ধরণী!
ফুল-বাঁশী ধরিয়ে
মৃদু তান ভরিয়ে
বাজাইছে ফুল-শিশু বসি ফুল-আসনে।
ধীরে ধীরে হাসিয়া
নাচি নাচি আসিয়া
তালে তালে করতালি দেয় কেহ সঘনে!
কোন ফুল রমণী
চুপি চুপি অমনি
ফুল-বালকের কানে কথা যায় বলিয়ে;
কোথাও বা বিজনে
বসি আছে দুজনে
পৃথিবীর আর সব গেছে যেন ভুলিয়ে!
কোন ফুল-বালিকা
গাঁথি ফুল-মালিকা
ফুল-বালকের কথা এক মনে শুনিছে,
বিব্রত শরমে,
হরষিত মরমে,
আনত আননে বালা ফুল দল গুণিছে!

দেখেছ হোথায় অশোক বালক
মালতীর পাশে গিয়া,
কহিছে কতকি মরম-কাহিনী
খুলিয়া দিয়াছে হিয়া!
ভ্রূকুটি করিয়া নিদয়া-মালতী
যেতেছে সুদূরে চলি,
মৃদু-উপহাসে সরল প্রেমের
কোমল-হৃদয় দলি!
অধীর-অশোক যদিবা কখনো
মালতীর কাছে আসে,
ছুটিয়া অমনি পলায় মালতী
বসে বকুলের পাশে!
থাকিয়া থাকিয়া সরোষ ভ্রূকুটি
অশোকের পানে হানে—
ভ্রূকুটি সে-গুলি বাণের মতন
বিঁধিল অশোক-প্রাণে।
হাসিতে হাসিতে কহিল মালতী
বকুলের সাথে কথা,
মলিন-অশোক রহিল বসিয়া
হৃদয়ে পাইয়া ব্যথা!
মন দলিবার চাতুরী যতেক—
সকলি মালতী জানে—
অশোক হৃদয় বিঁধিতে লাগিল
তীখন তীখন বাণে!
দেখ দেখি চেয়ে মালতী হৃদয়ে
কাহারে সে ভাল বাসে!
বল দেখি মোরে, হৃদয় তাহার
রয়েছে কাহার পাশে?
ওই দেখ তার হৃদয়ের পটে
অশোকেরি নাম লিখা!
অশোকেরি তরে জ্বলিছে তাহার
পিরীতি-অনল-শিখা!
এইযে নিদয়-চাতুরী সদত
দলিছে অশোক-প্রাণ—
অশোকের চেয়ে মালতী-হৃদয়ে
বিঁধিছে তাহার বাণ!
মনে মনে করে কত বার বালা,—

অশোকের কাছে গিয়া—
কহিবে তাহারে মরম-কাহিনী
হৃদয় খুলিয়া দিয়া!
ক্ষমা চাবে গিয়া পায়ে ধোরে তার,
খাইয়া লাজের মাথা—
পরাণ ভরিয়া লইবে কাঁদিয়া—
কহিবে মনের ব্যথা!
তবুও কি যেন আটকে চরণ
সরমে সরে না বাণী,
বলি বলি করি বলিতে পারেনা
মনো-কথা ফুল-রাণী!
মন চাহে এক ভিতরে ভিতরে—
প্রকাশ পায় যে আর,
সামালিতে গিয়া নারে সামালিতে
এমন জ্বালা সে তার!
মলিন-অশোক ম্রিয়মান মুখে
একেলা বসিয়া রহিল সেথা,
নয়নের বারি নয়নে নিবারি
হৃদয়ে লুকায়ে হৃদয়-ব্যথা!
দেখেনি কিছুই, শোনে নি কিছুই
কে গায় কিসের গান,
রহিয়াছে বসি, বহি আপনার
হৃদয়ে বিঁধানো বাণ!
কিছুই নাহি রে পৃথিবীতে যেন,
সব সে গিয়েছে ভুলি!
নাহি রে আপনি—নাহি রে হৃদয়
রোয়েছে ভাবনা গুলি!
ফুল-বালা এক, দেখিয়া অশোকে
আদরে কহিল তারে!
কেনগো অশোক—মলিন হইয়া
ভাবিছ বসিয়া কারে?
আজিকার এই সুখের নিশীথে
মলিন কেন বয়ান?
তা হবেনা ভাই আইস হেথায়
গাহিতে হইবে গান!
এত বলি তার ধরি হাত খানি
আনিল সভার পরে—
"গাওনা অশোক—গাও" বলি তারে
কত সাধাসাধি করে।
নাচিতে লাগিল ফুল-বালা দল—
ভ্রমর ধরিল তান—
মৃদু মৃদু মৃদু বিষাদের স্বরে
অশোক গাহিল গান।

গান—

গোলাপ ফুল—ফুটিয়ে আছে
মধুপ হোতা যাস্‌নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে
কাঁটার ঘা খাস্‌নে!
হেথায় বেলা, হোথায় চাঁপা
শেফালী হোথায় ফুটিয়ে—
ওদের কাছে মনের ব্যথা
বলিবি বল ফুটিয়ে!
ভ্রমর কহে "হোথায় বেলা
হোথায় আছে নলিনী—
ওদের কাছে বলিবনাকো
আজিও যাহা বলিনি!
চাবি দিয়া যা রেখেছি হৃদে
গোলাপে তাহা খুলিব,
তাহার পরে তখন নয়
কাঁটার ঘায়ে জ্বলিব!"
বিষাদের গান কেনগো আজিকে?
আজিকে প্রমোদ-রাতি!

হরষের গান গাওগো অশোক
হরষে প্রমোদে মাতি!
হরষে এলিয়ে প'ড়েছে জোছনা।
হরষে বহিছে মৃদুল বায়—
হরষে নাচিছে লতা পাতা ফুল
হরষে সরসী উথলি যায়!
সবাই কহিল "গাওগো অশোক
গাওগো প্রমোদ গান
নাচিয়া উঠুক কুসুম-কানন
নাচিয়া উঠুক প্রাণ!"
কহিল অশোক "হরষের গান
গাহিতে বোল' না আর—
কেমনে গাহিব? হৃদয়ে আমার
বাজিছে বিষাদ তার।
এতেক বলিয়া অশোক বালক
বসিল ভূমির পরে—
কে কোথায় সব, গেল সে ভুলিয়া
আপন ভাবনা ভরে।
কিছু দিন আগে—কি ছিল অশোক!
তখন আরেক ধারা,
নাচিয়া ছুটিয়া এখানে সেখানে
বেড়াত অধীর পারা!
নবীন যুবক, শোহন-গঠন,
সবাই বাসিত ভাল—
যেখানে যাইত অশোক যুবক
সেখান করিত আলো!
কিছু দিন হ'তে এ কেমন ভাব—
কোথাও না যায় আর।
একলা-টি থাকে বিরলে বসিয়া
হৃদয়ে পাষাণ ভার!
অরুণ-কিরণ হইতে এখন
বরণ বাহির করি
রাঙায় না আর ললিত বসন
মোহিনী তুলিটি ধরি;
পূরনিমা-রেতে জ্যোছনা হইতে—
অমিয় করিয়া চুরি
মধু নিরমিয়া নাহি রাখে আর
ভাণ্ডার-ঘর পুরি!
ক্রমশ নিভিল চাঁদের জ্যোছনা
নিভিল জোনাক পাঁতি—
পূরবের দ্বারে উষা উঁকি মারে,
আলোকে মিশাল রাতি!
প্রভাত-পাখীরা উঠিল গাহিয়া
ফুটিল প্রভাত-কুসুম-কলি—
প্রভাত শিশিরে নাহিবে বলিয়া
চলে ফুল-বালা পথ উজলি'।
তার পর-দিন রটিল প্রবাদ
অশোক নাইক ঘরে
কোথায় অবোধ কুসুম-বালক
গিয়েছে বিষাদ-ভরে!
কুসুমে কুসুমে পাতায় পাতায়
খুঁজিয়া বেড়ায় সকলে মিলি—
কি হবে—কোথাও নাহিক অশোক
কোথায় বালক গেল রে চলি!
কহে কলপনা "খুঁজি চল গিয়া
অশোক গিয়াছে কোথা—
সুমুখে শোভিছে কুসুম কানন
দেখ দেখি কবি হোথা!
ঘাড় উঁচু করি হোথা গরবিনী
ফুটেছে ম্যাগনোলিয়া—
কাননের যেন চখের সামনে
রূপরাশি খুলি দিয়া!

সাধাসাধি করে কত শত ফুল
চারি দিকে হেথা হোথা—
মুচকিয়া হাসে গরবের হাসি
ফিরিয়া না কয় কথা!
মনে ঠিক দিয়া আছেন গরবে
আমিই সরেশ ফুল।
সকল কানন বেড়ালে খুঁজিয়া
মোর না মিলিবে তুল!
সোনার কমলে তবুত সকলে
সবচেয়ে সেরা বলে?
সেই খেদে হায় ম্যাগনোলিয়া
ভিতরে ভিতরে জ্বলে!
হাসিয়া ভ্রমর কোহে যায় কানে
উপহাস করি কত—
নলিনীর মত ফুল না দেখিনু
খুঁজিনু কানন যত!
ফুস্ ফাস্ কোরে বায়ু বোলে যায়
গরবীর কানে কানে,
এত আছে ফুল নলিনীর মত
না দেখিনু কোনখানে!
মরমে মরমে জ্বলিয়া জ্বলিয়া
চুপ করি থাকে বালা—
কেহই তাহার নহেক আপন,
কাহারে কহিবে জ্বালা।
হোদে দেখ কবি সরসী ভিতরে
পদ্ম কেমন ফুটেছে!
এপাশে ওপাশে পড়িছে হেলিয়া—
প্রভাত সমীর উঠেছে!
ঘোমটা ভিতরে লোহিত অধরে
মধুর কোমল হাসি
বিলায় ছড়ায় হেথায় হোথায়
সৌরভ রাশি রাশি!
নিরমল জলে নিরমল রূপে
পৃথিবী করিছে আলো
পৃথিবীর প্রেমে তবু নাহি মন,
রবিরেই বাসে ভাল!
কানন বিপিনে কত ফুল ফুটে
কিছুই বালা না জানে
হৃদয়ের কথা কহে সুবদনী
সখীদের কাণে কাণে।
হোথায় দেখেছ লজ্জাবতী লতা
লুটায়ে ধরণী পরে,
ঘাড় হেঁট করি কেমন রয়েছে
মরম-সরম-ভরে।
দূর হোতে তার দেখিয়া আকার
ভ্রমর যদিবা আসে
সরমে সভয়ে মলিন হইয়া
সোরে যায় এক পাশে!
গুণ গুণ করি যদিবা ভ্রমর
শুধায় প্রেমের কথা—
কাঁপে থর থর, না দেয় উত্তর,
হেঁট করি থাকে মাথা!
ওই দেখ হোথা রজনীগন্ধা
বিকাশে বিশদ বিভা,
মধুপে ডাকিয়া দিতেছে হাঁকিয়া
ঘাড় নাড়ি নাড়ি কিবা!
চমকিয়া কহে কল্পনা বালা—
দেখিয়া কানন ছবি,
ভুলিয়ে গেলাম যে কাজে আমরা
এসেছি এখানে কবি!
ওই যে মালতী বিরলে বসিয়া
সুবাস দিয়াছে এলি,

মাথার উপরে আটকে তপন
প্রজাপতি পাখা মেলি!
এস দেখি কবি ঐ খানটিতে
দাঁড়াই গাছের তলে,
শুনি চুপি চুপি, মালতী-বালায়
ভ্রমর কি কথা বলে!
কহিছে ভ্রমর "কুসুম-কুমারি—
বকুল পাঠালে মোরে,
তাই লো মালতী এসেছি হেথায়
বারতা শুনাতে তোরে!
অশোক বালক কিযে হইয়াছে
সে কথা বলিব কারে!
তোর মত হেন মোহিনী বালারে
উপেখিতে সে কি পারে?
তবু তার তরে অপেখিয়া তুই
র'বি কি হেথায় বোন?
পরাণ সঁপিয়া অশোক তবুকি
পাবে নাকো তোর মন?
ভাবে একা বসি—বারতা পুছিলে
করিয়া থাকে সে চুপ,
কি কুখনে আহা দেখিল ও তোর
মন-মজানিয়া রূপ!"
চমকি উঠিল মালতী-বালিকা
ঘুম হ'তে যেন জাগি,
অবাক্ হইয়া রহিল বসিয়া
কি জানি কিসের লাগি!
"চলিয়া গিয়াছে অশোক কুমার?"
কহিল ক্ষণেক পর
"চলিয়া গিয়াছে অশোক আমার
ছাড়িয়া আপন ঘর?
তবে আর আমি—তবে আর আমি
থাকিব কিসের আশে?
যাইব অশোক গিয়েছে যেথানে
যাইব তাহার পাশে!
বনে বনে ফিরি বেড়াব খুঁজিয়া
শুধাব' লতার কাছে,
খুঁজিব কুসুমে খুঁজিব পাতায়
কোথায় অশোক আছে!
খুঁজিয়া খুঁজিয়া অশোকে আমার
যায় যদি যাবে প্রাণ—
আমা হ'তে তবু হবেনা কখনো
পিরীতির অপমান!"
ছাড়ি নিজ বন চলিল মালতী
চলিল আপন মনে
অশোক বালকে খুঁজিবার তরে
ফিরে কত বনে-বনে!
"অশোক" "অশোক" ডাকিয়া ডাকিয়া
লতায় পাতায় ফিরে
ভ্রমরে শুধায় ফুলেরে শুধায়
"অশোক এখানে কিরে?"
হোথায় নাচিছে অমল সরসী
চল দেখি হোথা কবি—
নিরমল জলে নাচিছে কমল
মুখ দেখিতেছে রবি!
রাজহাঁস দেখ সাঁতারিছে জলে
শাদা শাদা পাখা তুলি,
পিঠের উপরে পাখার উপরে
বসি ফুল-বালা গুলি!
চল দেখি কবি শুধাই হোথায়
"অশোক হেথা কি আছে?"
হোথায় বসিয়া ফুলবালা গণ,
চল উহাদের কাছে!

এখানেও নাই, চল যাই তবে—
ওই নিঝরের ধারে,
মাধবী ফুটেছে, শুধাই উহারে
বলিবারে যদি পারে।
বেগে উথলিয়া পড়িছে নিঝর—
ফেন গুলি ধরি ধরি
ফুল শিশুগণ করিতেছে খেলা
রাশ রাশ করি করি!
আপনার ছায়া ধরিবারে গিয়া
না পেয়ে হাসিয়া উঠে—
হাসিয়া হাসিয়া হেথায় হোথায়
নাচিয়া খেলিয়া ছুটে!
ওগো ফুলশিশু! খেলিছ হোথায়
শুধাই তোমার কাছে,
অশোক বালকে দেখেছ কোথাও,
অশোক হেথা কি আছে?
এখানেও নাই এস তবে কবি
কুসুমে খুঁজিয়া দেখি—
ওই যে ওখানে গোলাপ ফুটিয়া
হোথায় রোয়েছে,—এ কি?
এ কে গো ঘুমায়—হেথায়—হেথায়—
মুদিয়া দুইটি আঁখি
গোলাপের কোলে মাথাটি সঁপিয়া
পাতায় শরীর রাখি!
এই আমাদের অশোক বালক
ঘুমায়ে আছে গো হেথা!
দুখিনী ব্যাকুলা মালতী-বালিকা
খুঁজিয়া বেড়ায় কোথা?
চল চল কবি চল দুই জনে
মালতীরে ডাকি আনি,
হরষে এখনি উঠিবে নাচিয়া
কাতরা কুসুম রাণী!
সে আবার কোথা বেড়ায় ঘুরিয়া
আনিগে তাহারে খুঁজি
হয়ত এখন মাধবী কাননে
ফুল করিতেছে পুঁজি।

* * * *

কোথাও তাহারে পেনুনা খুঁজিয়া
এখন কি করি তবে?
অশোক বালক না যায় কোথাও
বুঝায়ে রাখিতে হবে!
গোলাপ-শয়নে ঘুমায় অশোক
দুখ তাপ সব ভুলি,
চল দেখি সেথা কহিব আমরা
সব কথা তারে খুলি!
দেখ দেখ কবি—অশোক-শিয়রে
ওই না মালতী হোথা?
গোলাপ হইতে লয়েছে তুলিয়া
কোলে অশোকের মাথা।
কতযে বেড়ানু খুঁজিয়া খুঁজিয়া
কাননে কাননে পশি!
কখন্ হেথায় এসেছে বালিকা?
রোয়েছে হোথায় বসি!
ঘুমায়ে রোয়েছে অশোক বালক
শ্রমেতে কাতর হোয়ে,
মুখের পানেতে চাহিয়া মালতী
কোলেতে মাথাটি লোয়ে!
ঘুমায়ে ঘুমায়ে অশোক বালক
সুখের স্বপন হেরে,
গাছের পাতাটি লইয়া মালতী
বীজন করিছে তারে।
নত করি মুখ দেখিছে বালিকা

দুইটি নয়ন ভরি,
নয়ন হইতে শিশিরের মত
সলিল পড়িছে ঝরি !
ঘুমায়ে ঘুমায়ে অশোকের যেন
অধর উঠিল কাঁপি !
"মালতী" "মালতী" বলিয়া বালার
হাত-টি ধরিল চাপি !
হরষে ভাসিয়া কহিল মালতী
হেঁট করি আহা মাথা—
"অশোক—অশোক—মালতী তোমার
এই যে রয়েছে হেথা।"
ঘুমের ঘোরেতে পশিল শ্রবণে
"এইযে রোয়েছে হেথা !"
নয়নের জলে ভিজায়ে পলক
অশোক তুলিল মাথা !
একিরে স্বপন ? এখনো একিরে
স্বপন দেখিছ নাকি ?
আবার চাহিল অশোক বালক
আবার মাজিল আঁখি !
অবাক্ হইয়া রহিল বসিয়া
বচন নাহিক সরে—
থাকিয়া থাকিয়া পাগলের মত
কহিল অধীর স্বরে !
"মালতী—মালতী—আমার মালতী"—
মালতী কহিল কাঁদি
"তোমারি মালতী—তোমারি মালতী !"
অশোকে হৃদয়ে বাঁধি !
"ক্ষমা কর মোরে অশোক আমার—
কত না দিয়েছি জ্বালা—
ভাল বাসি বোলে ক্ষমা কর মোরে
আমি যে অবোধ বালা !

তোমার হৃদয় ছাড়িয়া কখন
আর না যাইব চলি,—
দিবস রজনী রহিব হেথায়
বিষাদ ভাবনা ভুলি !
ওহৃদয় ছাড়ি মালতীর আর
কোথায় আরাম আছে ?
তোমারে ছাড়িয়া দুখিনী মালতী
যাবে আর কার কাছে ?"
অশোকের হাতে দিয়া দুটি হাত
কত যে কাঁদিল বালা !
কাঁদিছে দুজনে বসিয়া বিজনে
ভুলিয়া সকল জ্বালা !
উড়িল দুজনে পাশাপাশি হোয়ে
হাত ধরাধরি করি—
সাজিল তখন পৃথিবী জগৎ
হাসিতে আনন ভরি !
গাহিয়া উঠিল হরষে ভ্রমর
নিঝর বহিল হাসি—
দুলিয়া দুলিয়া নাচিল কুসুম
ঢালিয়া সুরভি-রাশি !
ফিরিল আবার অশোকের ভাব
প্রমোদে পূরিল প্রাণ—
এখানে সেখানে বেড়ায় খেলিয়া
হরষে গাহিয়া গান !
অশোকে মালতী মিলিয়া দুজনে
জোনাকের আলো জ্বালি
একই কুসুমে মাথায় বরণ,
মধু দেয় ঢালি ঢালি !
বরষের পরে এল হরষের যামিনী
আবার মিলিল যত কুসুমের কামিনী।
জ্যোছনা পড়িছে ঝরি সুমুখের সরসে—

টল মল ফুল দলে,
ধরি ধরি গলে গলে,
নাচে ফুল বালা দলে,
মালা দুলে উরসে—
তখন সুখের তানে মরমের হরষে
অশোক মনের সাধে গীত-ধারা বরষে।

গান

দেখে যা—দেখে যা—দেখেযালো তোরা
সাধের কাননে মোর
(আমার) সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া,
মলয় বহিছে সুরভি লুটিয়া রে—
(সেথা) জ্যোছনা ফুটে
তটিনী ছুটে
প্রমোদে কানন ভোর।
আয় আয় সখি আয় লো হেথা
দুজনে কহিব মনের কথা,
তুলিব কুসুম দুজনে মিলি রে—
(সুখে) গাঁথিব মালা,
গণিব তারা,
করিব রজনী ভোর!
এ কাননে বসি গাহিব গান,
সুখের স্বপনে কাটাব প্রাণ,
খেলিব দুজনে মনেরি খেলা রে—
(প্রাণে) রহিবে মিশি
দিবস নিশি
আধো আধো ঘুম-ঘোর!

ব্রহ্ম-দেশীয় নাটক ও নাটকাভিনয়।

কোন জাতির সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখিলেই সে জাতির সভ্যতার অবস্থা আমরা কিয়ৎ পরিমাণে অবগত হইতে পারি। ব্রহ্মবাসীদিগকে—চলিত-ভাষায় — মগদিগকে আমরা নিতান্ত অসভ্য মনে করি। কিন্তু যে জাতির মধ্যে নাটক ও নাটকাভিনয়ের জ্বলন্ত অনুরাগ বিদ্যমান, সে জাতিকে অসভ্য বলা কতদূর সঙ্গত একবার ভাবিয়া দেখা উচিত।

নাটকাভিনয় ব্রহ্মবাসীদিগের একটি জাতীয় অনুষ্ঠান। ব্রহ্ম দেশের সমস্ত অধিবাসীর মনের উপর ইহার প্রবল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়; কি ইতর কি ভদ্র, নাটকাভিনয় দর্শন করিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র ও লালায়িত। "পুয়ে" অর্থাৎ নাটকাভিনয় দেখিবার জন্য নাট্যশালায় এত লোকের সমাগম হয় এবং এত অধিক লোকের সমাগম সত্বেও এরূপ নিস্তব্ধভাবে ও সুশৃঙ্খলরূপে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয় যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। দর্শকেরা অভিনয় দর্শনে একেবারে মুগ্ধ হইয়া যান—কখন বিপন্ন ধার্ম্মিকদিগের দুর্দ্দশায় মমতা প্রকাশ করেন—কখন বা নাটকস্থ হাস্যোদ্দীপক অংশের অভিনয়ে উচ্চ হাস্যে গগনতল বিদীর্ণ করেন।

অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের পরি-

চ্ছদ অতি সুন্দর ও জমকালো। কিন্তু রঙ্গ-ভূমির স্থান ও আনুষঙ্গিক দৃশ্য প্রভৃতি নিতান্ত সাদাসিধা ও সামান্য। নাট্যগৃহ বাঁস দিয়া নির্ম্মিত ও তাহার ছাদ তৃণ-দ্বারা আচ্ছাদিত কিন্তু অতি উজ্জ্বল বর্ণের রেশম ও অন্যান্য বস্ত্রে মণ্ডিত। গৃহের মধ্য স্থলে অভিনয়-মঞ্চ। অভিনয়-মঞ্চের মধ্য স্থলে একটি বৃক্ষের শাখা রোপিত—ইহা সমস্ত বন-দৃশ্যের স্থলাভিষিক্ত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই একটি মাত্র বৃক্ষশাখায়, ব্রহ্মবাসী দর্শকদিগের কল্পনা-চক্ষে সমস্ত অরণ্যের চিত্র প্রতিভাত হয়। এই বৃক্ষশাখার চতুর্দ্দিকে দীপাবলী স্থাপিত হয় ও কদলী-বৃক্ষের গুঁড়ির উপর সরা রাখিয়া—তাহাতে পিট্রোলিয়ম তৈল দিয়া প্রদীপ জ্বালানো হয়। খ্যাত-নামা দর্শকদিগের বসিবার জন্য উচ্চ বংশ-মঞ্চ সকল পার্শ্ব ভাগে নির্ম্মিত হয়—ও সাধারণ দর্শকগণ চক্রাকারে ঘেঁসা-ঘেঁসি করিয়া ভূমি-তলেই উপবেশন করে। নাট্যশালার পশ্চাদ্ভাগে বাদ্য-স্থান এবং এই বাদ্য-স্থানের পশ্চাৎদিকে অভিনেতৃগণের পরিচ্ছদ-পরিবর্ত্তনের স্থান ও প্রবেশ-প্রস্থানের পথ।

নাটকীয় ঘটনা-বিন্যাস বিষয়ে ব্রহ্ম-দেশীয়দিগের বিভিন্ন নাটকের মধ্যে পরস্পর বিলক্ষণ সাদৃশ্য উপলব্ধি হয়। নাটকীয় পাত্রের মধ্যে—কোন রাজকুমারীর প্রেমাকাঙ্ক্ষী কোন রাজপুত্র—মহারাজা রাজপুত্রের পিতা—কঠোর সুবিজ্ঞ মন্ত্রিগণ—রাজার বিনীত পারিষদগণ—এবং রাজকুমারীর সখীগণ—এই সকলই প্রতি নাটকে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। নাটকাভিনয়ের মধ্যে মধ্যে রাজ-দরবার—সমারোহে রাজ-যাত্রা ও নৃত্য হইয়া থাকে। রাজকুমারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তাঁহার একটি অনুচর থাকে—সে আমাদের বিদূষকের কাজ করে। রাজকুমারীর সখীগণের সহিত তিনি উপস্থিত-মতে যে সকল রসিকতা করেন তাহাতেই দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে মহা হাসি পড়িয়া যায়। ব্রহ্মদেশীয় ভাষার প্রকৃতি এইরূপ যে উহার একটি কথার অর্থ, উচ্চারণের তারতম্যে অনেক বদলিয়া যায়। এই জন্য ঐ ভাষা দ্ব্যর্থ ও শ্লেষাত্মক বাক্য-রচনার পক্ষে অতীব অনুকূল। নাটকের কথাবার্ত্তাগুলি বেশির ভাগ সাধারণ কথোপকথনের ন্যায়—মাঝে মাঝে স্বগত-উক্তি, সমবেত সঙ্গীত ও নৃত্যের যোজনা থাকায়—কথাবার্ত্তার "এক-ঘেয়েত্ব" নষ্ট হয়। কোন কোন নাটকের স্থানে স্থানে এরূপ সরল অকৃত্রিম কবিত্ব আছে ও নাটকের ঘটনা-বিন্যাস অতীব অদ্ভুত ও অলৌকিক হইলেও এবং নাটকীয় পাত্র বিশেষের চরিত্রে অসঙ্গতি-দোষ সত্ত্বেও এরূপ চমৎকার দৃশ্য সকলের সংস্থান আছে যে, ভাল অভিনয় হইলে সভ্যতর দেশের সুশিক্ষিত লোকদিগেরও চিত্ত কিয়ৎপরিমাণে আকৃষ্ট হইতে পারে। তাহার উদাহরণ-স্বরূপ একটি নাটক আমরা নিম্নে অবিকল অনুবাদ করিয়া পাঠকগণের বিচারের উপর নির্ভর করিতেছি।

রজত-গিরি।

(ব্রহ্মদেশীয় নাটক)

*পাত্রগণ।

পাঞ্চালের রাজা।—(পিঙ্গালা)

রাজকুমার সুধনু (থুদানু)— পাঞ্চাল-রাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী।

ধর্ম্মরাজ (দূমরাজা)—অপ্সরা নগরীস্থ রজত-গিরির রাজা।

মুকুন্দ (মোজলিন্দ)—এক জন শীকারী।

পাবক (পামুক)—সন্ন্যাসী।

মোহক (মোক)—দৈবজ্ঞ।

আর এক জন সন্ন্যাসী।

মন্ত্রীগণ—রাজকর্ম্মচারী—দৈত্য (বেলু)—রক্ষক ও অনুচর ইত্যাদি।

রাজকুমারী দামিনী (দয়ামিনায়)—ধর্ম্ম-রাজের কন্যা।

ছয় জন রাজকুমারী—দামিনীর ভগিনী।

মালা। (মালা)—পাঞ্চাল-প্রাসাদের পরিচারিকাদিগের প্রধান।

মানিনী (মানিঙ্গয়া) মুকুন্দের স্ত্রী।

কুমারী পরিচারিকাগণ ইত্যাদি।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—পাঞ্চাল রাজার প্রাসাদের একটি শালা। মন্ত্রিগণ-পরিবৃত রাজা সিংহাসনাসীন—সেই শালার দূরস্থ এক বিভাগে রাজকুমার কাঞ্চন-শয্যায় নিদ্রিত; অনুচরগণ পাহারা দিতেছে।

রাজা।

সুবিশ্বস্ত মন্ত্রিগণ! বল দেখি সবে—
তোমরাত চিরকাল আনন্দের সাথে
করিয়াছ সেবা মোর—যথা গ্রহ তারা
গগন-প্রাঙ্গন মাঝে উল্লাস-আনন্দে
চন্দ্রমার চারিদিকে বেড়ায় ঘুরিয়া—
এবে বল দেখি সবে, যে অবধি আমি
আছি সিংহাসনে—অসন্তোষ কারে বলে
জেনেছে কি প্রজাগণ ক্ষণ কাল তরে?

মন্ত্রিগণ।

কভু না কভু না প্রভু!

রাজা।

তবে শোন বলি—
পরামর্শ চাই আমি একটি বিষয়ে।
আমাদের নয় শুধু—সমস্ত প্রজার
ভাল মন্দ তদুপরি করিছে নির্ভর।
তোমরা তো জান ভাল সুধনু কুমারে,
জম্বুদ্বীপ*-এক সীমা হ'তে সীমান্তর
যাঁহার সুযশ কীর্ত্তি হয়েছে প্রচার।
বল সবে মন্ত্রিবর, বল গো তোমরা—
আমাদের পুত্র সে যে সূর্য্যসম তেজে—
কেননা এখনি হবে অভিষেক তার?

প্রথম মন্ত্রী।

এ প্রস্তাবে এদাসের পূর্ণ অভিমত।
সুবিখ্যাত সূর্য্য বংশ হ'তে জন্ম যাঁর,

---

*আমাদিগের পাঠকগণের পাঠ-সুখকর করিবার জন্য ব্রহ্মদেশীয় নামগুলি অস্মদেশীয় আকারে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে।

* জম্বুদ্বীপ এই কথাটি মূলেও আছে।

মহা মহা গজপতি যাঁর পদে নত,
মহা তেজী অশ্ব যিনি করেন দমন,
মহা মহা ধনু যিনি বাঁকান্ হেলায়,
সর্ব্ব-মহীপতি চেয়ে প্রতাপ যাঁহার,
এমন বীরেরে দিতে সিংহাসন ছাড়ি
বিলম্ব কিসের প্রভু ? মহা-সমারোহে
যৌব-রাজ্যে আজি তিনি হোন্ অভিষেক।
[রাজা ও মন্ত্রিগণের প্রস্থান]

রাজকুমার।

(নিদ্রা হ'তে জাগিয়া)

অবসন্ন দেহ মোর হীরক-শয্যায়
আছে বৃথায় শয়ান। জনম বৃথায়
মোর রাজ-গৃহে—হায় ! বৃথা রাজ্য-ধন।
দুঃখ-ভারে অবসন্ন—ঐশ্বর্য্য-বিভব
না পারে জুড়াতে মোর হৃদয় যাতনা।
হ্যারো ওই বাতায়নে প্রিয়তমা মোর
রূপবতী সখী মাঝে আলো করি দিক
আছেন দাঁড়ায়ে—কিন্তু সেযে গো স্বপন !
স্বপ্ন গেছে ছুটি, এবে জাগ্রৎ শূন্যতা
হাসিতেছে আমা-পানে বিদ্রূপের হাসি।
মনে হল—"শুয়ে আমি সোনার শয্যায়,
পাশে আছে প্রিয়া মোর গভীর নিদ্রায়"
(এ পোড়া হৃদয়ে আহা নিদ্রাতেই সুখ)
অস্ত গেলে দিনমণি পঙ্কজ মলিন—
প্রিয়ার বিরহে আমি হয়েছি তদ্রূপ—
অবসন্ন ম্রিয়মান মৃতের সমান।

অনুচর।

কেঁদনা কেঁদনা প্রভু—মুছ অশ্রুজল।
স্বর্গের অপ্সরা যথা কেশ-গুচ্ছ-দাম
ভাল বাসে জড়াইতে পারিজাত দিয়া,
কিন্তু যতক্ষণ আসি বসন্ত-পবন
নাহি করে সে কুসুমে জীবন প্রদান
না পারে তুলিতে তাহা—সেই রূপ প্রভু
সময় হইলে সিদ্ধ হবে মনস্কাম,
হৃদয়ের প্রেম-জ্বালা জুড়াবে আপনি।
(প্রস্থান)

২ দৃশ্য—অরণ্য। (মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ।

ওরে আমার প্যাঁচা-মুখী, খ্যাঁদা-নাকি, শুয়োর-চখি, থ্যাবড়া-ঠোঁটি প্রাণ প্রিয়সী ! ওঠ্—আমাকে কি কিছু খেতে টেতে দিবি ? আমি পাহাড়ে শীকার কত্তে যাচ্চি, লক্ষ্মী আমার শীগ্‌গির ওঠো।

মানিনী।

হতভাগা আপ্ত-গর্জ্জে মিন্‌সে কোথাকারে! কিসের জন্যে এত তাড়াতাড়ি ? দেখ্‌চিস্‌নে আমি শীতে থর্‌থর্ ক'রে কাঁপ্‌চি, গায়ে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া, এতে কি শীত আট্‌কায় ? আবার তাতে এই দুপুর রাত্তির, ব্যাপার খানা কি বল্ দিকি ? আর আমি তোর জ্বালা সইতে পারি নে। যত দিন না তুই ভাল ব্যাভার শিখ্‌বি, নাথিয়ে নাথিয়ে তোর দফা নিকেস্ কর্‌ব, হতভাগা মিন্‌সে কোথাকারে! এই নে এক ঘটি জল, আর এই নে এক কুন্‌কে চাল, এখন এই নিয়ে জঙ্গলে দৌড়ো, যদি আজকের খাবার মত কিছু শীকার করে না আন্‌তে পারিস্ তো টের্‌টা পাবি, গালাগালি দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দেব।

(প্রস্থান)

মুকুন্দ।

দেখ্‌রে সবাই, চলে মুকুন্দ শীকারী
রূপবতী প্রিয়সীর কোমল আজ্ঞায়
ধনুর্ব্বাণ হাতে করি অরণ্যের মাঝে।
আসুক সহস্র শত্রু নাহি করি ভয়।

(সমবেত বাদ্যকারীগণের প্রতি)

যথা ঘোর ইরম্মদ গগন বিদারি
ভূকম্পে কাঁপায় সব পৃথিবী জলধি
সেইরূপ বজ্ররবে বাজা তূরি-ভেরী!

(ঘোর বাদ্য—মুকুন্দের প্রস্থান—কিঞ্চিৎ পরে পুনঃপ্রবেশ—কোমল বাদ্য।)

মুকুন্দ।

কি সুখ ভ্রমিতে হেন ছায়াময় বনে!
তারা সম জুঁই যথা সুরভি নিশ্বসে,
মলয়-সমীর বহে মাতিয়া চৌদিকে,
ইন্দ্রধনু রঙ্গে আঁকা বিহঙ্গ-মিথুন
উড়ি উড়ি বসে কিবা এ শাখে ও শাখে—
বিশ্রাম করি না কেন হেথা ক্ষণকাল।

(চমকিয়া)

ওকি! ব্যাঘ্র-গরজন অদূর পাহাড়ে!
আহাহা মানিনি তুই আছিস্ একাকী,
হৃদয় ব্যাকুল হয় ভাবি যবে তোরে।
হিংস্রজন্তু মুখ হতে রক্ষা পাইবারে
চলিতে হইবে মোরে আরো কিছু পথ।

(পদ্মসরোবরে পৌঁছিয়া)

একি! একি! কি সুন্দর মনোহর স্থান!
নিশ্চয় হইবে কোন ইন্দ্রজাল-ভূমি।
সুন্দর সরসী-ধারে জীব জন্তু কত
তৃষ্ণা নিবারিতে আসে—পদ-চিহ্ন তাই।
জুঁথি জাতি পঙ্কজিনী অসংখ্য ফুলের
মিশ্রিত সুরভি-ভার বহিছে মলয়—
জুড়াইছে আহা কিবা ঘর্ম্মাক্ত শরীর!
শুক-পাখি ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চক্রাকারে—
মানিকের চক্র যেন ঘুরিছে গগনে।
নানাজাতি পাখি কিবা গাইতেছে গান,
জুড়াইয়া যাইতেছে হৃদি মন প্রাণ।
ইচ্ছা করে মানিনি রে! থাকিতিস হেথা
আমাসনে ভুঞ্জিতিস স্বরগীয় সুখ
এ স্বচ্ছ সরসী-তীরে—যাহার সলিলে
শত শত হিরা জ্বলে ভানুর কিরণে,
পঙ্কজ-মুকুল-ঊর্ম্মি যাহার উরসে
শুভ্র, নীল—যেন কত মুকুতা মানিক।
প্রসারিত বট বৃক্ষ শীতল ছায়ায়
শুইয়া আহ্বানি এবে কোমল নিদ্রায়।

(নিদ্রা)

৩ দৃশ্য — অপ্সর-ভূমি কিম্বা রজত-গিরি-দেশ।

রঙ্গভূমির একপার্শ্বে রাজা ধর্ম্মরাজ এবং অপর পার্শ্বে তাঁহার ৭ কন্যা।

প্রথম রাজকুমারী।

চির-সহচরি সবে প্রাণের ভগিনী!
ভুঞ্জিতেছি এক সাথে শান্তি-সুখ মোরা
অপ্সর নগরে; এবে এসেছে সময়
উতরিয়া মর্ত্ত্যধামে—যথা চির-রীতি—
পঙ্কজ-সরসী-মাঝে,পদ্মে দিয়া লাজ,
খেলিব মনের সুখে; আয় ভাই তোরা
পিতৃ-রাজ অনুমতি লই এই বেলা।

দ্বিতীয় রাজকুমারী।

অনুপমা রূপবতী ভগিনি আমার!
লও গিয়া অনুমতি রাজার নিকট,

আমরা সবাই বোন ভাল বাসি তোমা
প্রাণের সমান—চল হব অনুগামী।
(সকলে রাজার নিকট গমন।)

প্রথম রাজকুমারী।

পিতৃ-দেব! মহারাজ! বংশের তিলক!
অপ্সর প্রদেশ-স্বামী, মহা ধনুর্ধর!
সুমেরু অচল-সম অটল প্রকৃতি!
—কন্যাগণ তব পদে করিছে প্রণতি।
দাও অনুমতি পিতঃ যাব মর্ত্ত্য ধামে,
পঙ্কজ-সরসী-তীরে উপবন-ছায়ে
খেলিব মনের সুখে; ক্লান্ত হলে দেহ
জুড়াইব গিয়া সেই সরসী-সলিলে।

রাজা।

ইচ্ছা হয় যাও সবে প্রাণের প্রতিমা।
কিন্তু মনে থাকে যেন, মর্ত্ত্য সেই দেশে
মলিন মানবগণ করয়ে বসতি।
শান্তি-সুখ নাহি তথা হেথাকার ন্যায়,
বিপদ হইতে তিল নাহিক নিষ্কৃতি।
দেখো সাবধান! প্রতি পদ বিবেচিয়া
দেব-বুদ্ধিবলে তবে করিবেক কাজ।
শিরোধার্য্য করি এই উপদেশ মোর
যাও সবে, কিন্তু এস শীঘ্র দেশে ফিরি।

প্রথম রাজকুমারী।

অনুমতি দিলে পিতঃ—প্রণমি তোমায়।
লঘু গতি সবে মোরা বিলম্ব না জানি,
ত্বরায় আসিব ফিরি শ্রীচরণ-তলে।
(প্রস্থান।)

৪ দৃশ্য।—পদ্ম-সরোবর।

(বট-বৃক্ষতলে মুকুন্দ নিদ্রিত ও
৭ রাজকুমারীর প্রবেশ)

প্রথম রাজকুমারী।

সুরম্য সরসী ওরে! কোমল সুন্দর
কত ভাব জাগে হৃদে হেরি তোর জল,
আনন্দের উৎস তুই—স্ফটিক দর্পন!
এই যে বহিছে বায় মৃদুমন্দ-গতি—
সুরভি ফুলেরি উহা আকুল নিঃশ্বাস।
কোন্ বিধি বল্ দেখি সৃজিল রে তোরে?
(ভগিনীগণের প্রতি)
আয় বোন খুলে ফেলি' রত্ন অলঙ্কার,
হীরকের কর্ণদূল মণি-মুক্তা-হার,
খেলি সবে মনসুখে এই সরোবরে।
অর্দ্ধ অঙ্গ ঢাকা রবে স্ফটিক তরঙ্গে—
রজত নীরদে যেন চপলা খেলিবে।
(অপ্সরাগণের অবগাহন ও
মুকুন্দের জাগরণ।)

মুকুন্দ।

শুভ লগ্নে সুনিশ্চিত্ত জনম আমার!
নারী-রত্ন মহারত্ন কথায় যে বলে
মর্ম্ম তার বুঝিলাম এত দিন পরে।
সামান্য মানবী নহে, দেবকন্যা এযে!
কর্ণ-দুল কণ্ঠ হার কিবা ধরে শোভা,
প্রভাত-শিশির সম জ্বলিছে মুকুতা!
সমস্ত গগনে যাঁর রজত-মহিমা—
এমন চন্দ্রমা সেও হোথা পায় লাজ।
অসাড় হতেছে দেহ, ইন্দ্রিয় অবশ,
এ দৃশ্য মানবে কভু পারে গো সহিতে?
(অচেতন হইয়া ভূমে পতন ক্রমে
চেতন লাভ)

সৌন্দর্য্য-আদর্শ ওযে—নাহিক উপমা—
হাসিয়া উড়ায় যেন চিত্রকর-তূলি।
পারি যদি ধরিবারে একটি সুন্দরী,
রাজপুত্রে ভেট দেই এই দণ্ডে আমি।
পুরস্কার কত পাব—নাহি তার শেষ,
দারিদ্র্য-ঘুচিবে মোর চিরকাল-তরে।
হয়েছে! পাবক নামে পবিত্র গোসাঁই
করেন বসতি এই সরোবর ধারে—
তাঁর কাছে আছে এক সম্মোহন-ফাঁসি,
ধরা পড়িবেক তাহে ত্রিদিবের পাখি।
এই ব্যালা যাই তবে—বিলম্বে কি কাজ?

(প্রস্থান)

৫ দৃশ্য—পদ্মসরোবর-তীরস্থ বনে সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসী পাবক এবং মুকুন্দের প্রবেশ)

পাবক।

যে জন্য এসেছ বাছা জানি আমি সব,
একটি উপায় আছে ও কার্য্য সাধিতে।
দৈত্য-রাজ দেয় মোরে সম্মোহন ফাঁসি,
কমণ্ডলু ভিতরে তা আছে অনাদরে।
তাহে মোর নাহি কাজ—অস্পৃশ্য আমার,
ইচ্ছা হয় লয়ে তুমি—সাধ তব কাজ।

মুকুন্দ।

বড় দয়া তব—লও কৃতজ্ঞ-প্রণাম।

(সম্মোহন ফাঁসি লইয়া প্রস্থান)

৬ দৃশ্য—পদ্ম-সরোবর।

(অপ্সরাদিগের জল-ক্রীড়া—মুকুন্দের প্রবেশ ও সম্মোহন ফাঁসি নিক্ষেপ করিয়া রাজকুমারী দামিনীকে ধৃত করন—অবশিষ্ট ও অপ্সরা উড্ডীয়মান হইয়া অপ্সর-দেশে পলায়ন।)

দামিনী।

কি বিপদ ভাগ্যে মোর হ'ল অকস্মাৎ!
রক্ষা কর রক্ষা কর—কোথা গেলে বোন?
এ দারুণ কষ্ট হতে মুক্ত কর মোরে।
বৃথা এবে যুঝাযুঝি—সর্ব্ব অঙ্গ হ'ল
পাষান-প্রতিমা সম কঠিন অবশ!
কোথা গেলি রক্ষা কর—এই বেলা আয়—
নহিলে মরিল তব প্রাণের ভগিনী!

মুকুন্দ।

বৃথা বাক্য ছেড়ে দাও অপ্সর-ঈশ্বরী,
ও কথা কি সাজে তব চারু ওষ্ঠাধরে?
বিপদ ভাবিছ যারে নহে তো বিপদ—
বরঞ্চ সে পূর্ব্বজন্ম-সুকৃতির ফল।
এ দেশের রাজা যিনি মহা-পরাক্রম,
যাঁর পরে অদৃষ্টেরো নাহিক প্রভাব,
শত শত মহীপতি যাঁর পদে নত,
সে রাজার আছে এক পুত্র গুণবান।
অভাবের মধ্যে শুধু একটি অভাব—
স্ত্রীরত্ন চাইকো তাঁর নাশিতে আঁধার।
মোহন ফাঁসিতে তাই ধরেছি তোমায়
করিতে তাঁহার সেই সিংহাসন-ভাগী।

দামিনী।

শোন মোর কথা ওগো দয়ালু শীকারী!
অপ্সর দেশের রাজা—রজ-গিরি-স্বামী—
তাঁর কন্যা আমি হই জাতিতে অপ্সরা,
তুমি মোরে বল দেখি, তোমাদেরই মাঝি,
কেমনে অপ্সরা হয়ে মানবেরে ভজি?

অতএব ছাড় মোরে করি অনুনয়,
ঘৃণিত বিবাহে জেদ্ কোরো না গো তুমি।

মুকুন্দ।

সুন্দরী অপ্সরা-রাণী কেন দুঃখ কর,
অদৃষ্ট প্রসন্ন তব—সুকৃতির ফল।
এমন প্রবল রাজা বিক্রমে কেশরী
হৃদয়ে বিভবে তাঁর হবে অধিকারী।
এস এস সুন্দরি গো হও অনুগামী,
ভবিষ্য-পতির গৃহে চলহ এখনি

(দামিনীকে লইয়া
মুকুন্দের প্রস্থান)

৭ দৃশ্য—পাঞ্চাল রাজার
প্রাসাদ-শালা।

(রাজকুমার ও মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ।

মহান্ রাজকুমার! যাঁহার মহিমা
শত শত নৃপতিরে করে অতিক্রম,
যাঁর পদতলে তারা সদা নতশির,
অনুপম অতুলন ধরে যাঁর রূপ
নয়ন-রঞ্জন সর্ব্ব কুসুমের গুণ!—
করহ শ্রবণ—আমি ভ্রমিতে ভ্রমিতে
এক অরণ্যের মাঝে, দিব্য রম্য স্থান—
হরিণ হরিণী যথা চরে অবিরাম—
আইলাম অকস্মাৎ পদ্ম-সরোবরে।
হেরিলাম সাত দেবী অতুল রূপসী
পক্ষি ঝাঁক সম উড়ি নাবিল সে তীরে।
উহার একটি, ধ'রে এনেছি গো জালে,
দুর্লভ সে উপহার সঁপিব ও পদে।
দামিনী দেবীরে প্রভু লও দয়া করি,
অপ্সর-রতন তিনি অতুল রূপসী,
তপত কাঞ্চন সম নির্ম্মল নির্দ্দোষী।

রাজকুমার।

সুযোগ্য মুকুন্দরাম! আন ত্বরা করি
তব চারু উপহার মম সন্নিধানে।

(মুকুন্দের প্রস্থান
ও দামিনীকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

রাজকুমার।

হা! কি হেরি এ নয়নে! ও মুখ নেহারি
নয়ন-রঞ্জন শশি, লাজে অধোমুখে
মেঘ-ঘোমটার মাঝে লুকাবে এখনি!
রচে যারে শিল্পী কত সুন্দর আকারে—
হেন কাঞ্চনেরো কান্তি হোথা হার মানে।
পদ্ম-সম পবিত্র বা প্রভাত-শিশির!
কিবা আহা গণ্ডস্থল অতি সুকোমল—
প্রজাপতি-পক্ষে যেন সুকুমার রেণু।
মুখে কি সুরভি শ্বাস! মরি কি সুন্দর
এলায়ে পড়েছে কেশ যামিনী-বরণ।
কণ্ঠ স্বরে আহা কিবা সঙ্গীত উথলে,
মধুর লাবণ্য ক্ষরে প্রত্যেক গতিতে!
উনিই আমার যোগ্য হৃদয়-ঈশ্বরী
ওঁরেই করিব আমি অর্দ্ধ অঙ্গ-ভাগী।

পাত্রমিত্রগণ।

সত্য বটে হেন রূপ দেখি নাই কভু,
গুণেতেও অতুলনা হেন মনে লয়।

রাজকুমার।

মোহিনি ললনে ওগো অপ্সর-কুমারি!
পঙ্কজ-মুকুল সম ও তব কপোলে
লজ্জার রক্তিম রাগ—ঈষৎ বিকাশে।
পূর্ব্ব জন্মে পুণ্য যাহা করেছি সঞ্চয়

তাহারি সুফল এই কহিনু তোমারে।
তাহারি কারণে দুই বিভিন্ন অদৃষ্ট
এক সূত্রে, এক গ্রন্থে, হতেছে বন্ধন।
এখনও বিমুক্ত আমি—দাও অভিমতি—
যখন বসিব ওগো পিতৃ-সিংহাসনে
তুমিও বসিবে তাহে হয়ে রাজ-রাণী।

দামিনী।

কি ক'রে হইবে তাহা রাজপুত্র ওগো!
জাতিতে পৃথক মোরা—দূর দেশবাসী,
আকাশ পাতাল ভেদ আমা-তোমা-সনে।
অপ্সর প্রদেশে জন্ম, জাতিতে অপ্সরা,
রজ-গিরি-রাজা যিনি তাঁহারি দুহিতা।
কেমনে মিলিব বল মর্ত্ত্য রাজা সনে,
অধঃপাত হবে, মান খোয়াব তাহলে।
অতএব রাজপুত্র করি অনুনয়
দাও ছেড়ে যাই চলে পিতার আলয়।

রাজকুমার।

তা হবে না তা হবে না হৃদয়-রতন!
পৃথিবীতে আছে যত সুন্দর সামগ্রী
তা সবার তুমি যে গো অমূল্য সমষ্টি।
জীবন যায় বা যদি তাহাও স্বীকার,
তোমা সম রত্ন তবু ছাড়িব না কভু।
করিও না পরিতাপ প্রাণ প্রিয়তমা
হৃদয়ে রাখিতে তোমা নিতান্ত বাসনা।

(হস্তগ্রহণ)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

(প্রথম ও দ্বিতীয় অঙ্কের মধ্য কালে দামিনীর সহিত রাজকুমারের বিবাহ—দামিনী গর্ভবতী ও শত্রু-সৈন্য কর্ত্তৃক পাঞ্চাল দেশ আক্রমণ।)

ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

পারিস্ নগর-প্রবাসী কোন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনশীল শ্রেষ্ঠ কুলোদ্ভব হিন্দু যুবক সম্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি মহাশয়কে যে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলেন ও সেই পত্র-সম্বলিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভারতবর্ষীয়দিগের দ্বারা তৎ-লাভের বিশিষ্ট উপায় বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় যে একটি যুক্তিগর্ভ উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা গত আশ্বিন মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকটিত হইয়াছে। এই* প্রবন্ধটি শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেরই মনোযোগের সহিত পাঠ করা উচিত। তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অতি উপাদেয় ও সময়ের উপযোগী।

তিনি বলেন "ইহা অতি সুখের বিষয় যে শিক্ষিত ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আজ কাল একটি স্বাধীনতার ভাব উদ্বোধিত হইতেছে এবং এই স্বাধীনতার ভাব আমরা ইংরাজদিগের নিকট হইতেই শিক্ষা পাইয়াছি। ইংলণ্ডের সংশ্রবে যদি আমরা আর কোনও উপকার না পাইয়া থাকি অন্তত এই উপকারটি আমাদের সকলকেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এই যে

* শীঘ্রই ইহা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইবে।

জাতীয় স্বাধীনতার ভাব ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত হইতেছে, ইহাতে আমাদের যতই আহ্লাদ হউক না কেন— আমাদের আর একটি দিক আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। যে সকল নিয়ম পালন না করিলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, সেই সকল নিয়ম পালন পক্ষে কত দূর চেষ্টা হইতেছে? এখন তো কেবল স্বাধীনতা বিষয়ে সভায় মহা আড়ম্বরে বক্তৃতা হইতেছে—সংবাদ পত্রে অনর্গল লেখা চলিতেছে এবং কবিতা নাটকের ছড়াছড়ি হইতেছে—কিন্তু কাজে কি হইতেছে? আমাদিগের স্বদেশ-বৎসলদিগের দেশানুরাগ কি শুদ্ধ বাক্যেই বদ্ধ থাকিবে? বক্তৃতা কবিতা প্রভৃতির উপকারিতা আছে বটে কিন্তু উহাই কি যথেষ্ট?--উহার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য চাই। যে সকল কার্য্যাত্মক উপায়ে স্বাধীনতা লাভ হইতে পারে, তাহা অবলম্বন করা আবশ্যক। স্বাধীনতা লাভের যে সকল নির্দ্দিষ্ট অকাট্য নিয়ম আছে অগ্রে তাহার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।" অবিকল অনুবাদ না করিয়া আমরা তাঁহার প্রবন্ধের প্রথমাংশের স্থূল মর্ম্ম ব্যক্ত করিলাম। এবং এ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। কিন্তু তার পরেই তিনি এই মর্ম্মে বলিতেছেন যে "জোর যার মুলুক তার" কিম্বা "বল যার অধিকার তার" এই নিয়মটি উদ্ভিদ্ জগতে, জীব জগতে, এমন কি সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে কার্য্য করিতেছে। বলবান দুর্ব্বলের স্থান অধিকার করিবেই করিবে। ডার্‌উইনের প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের নিয়মই এই। এই নিয়মটি যেমন প্রকৃতির মধ্যে, তেমনি মনুষ্য সমাজে বিলক্ষণ খাটে। ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য-স্থল। যাঁহার বল আছে তাঁহারই অধিকারের কথা মুখে আনিবার অধিকার আছে। "Only he dares speak of right or rights who has might,' exclaims she in her Book of Revelations which we term History.' প্রকৃতি জননী; অথবা ইতিহাসের এই শাসন-বাক্য যিনি লঙ্ঘন করিতে সাহসী হন তিনি তাহার ফল-ভোগ করেন—অবাধ্য শিশুর ন্যায় বেত খাইয়া আবার সিধা পথে, ফিরিয়া আইসেন।" কিন্তু আমরা লেখক মহাশয়ের এই মতের সহিত সম্পূর্ণরূপে সায় দিতে পারি না। "জোর যার মুলুক তার"—এই নিয়ম উদ্ভিদ্‌জগতে, পশু জগতে এবং পশুবৎ অপূর্ণ পূর্ব্বতন মানব-সমাজে খাটিতে পারে কিন্তু সভ্য সুপ্রতিষ্ঠ মনুষ্য-সমাজে এ নিয়ম শোভা পায় না। এই নিয়মের নেতৃত্ব ও ঔচিত্য স্বীকার করিলে সভ্য-সমাজের একেবারে ভিত্তিমূলে আঘাত করা হয়। এই নিয়মানুসারে সম্পূর্ণরূপে চলিতে গেলে অরাজকতা বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়া সমাজ-বন্ধন একেবারে ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া যায়। এ নিয়মকে প্রশ্রয় দিলে চৌর্য্য দস্যুতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এক জন বলবান দস্যু এক জন দুর্ব্বলের ধন বলপূর্ব্বক অপহরণ করিলে সেই ধনে কি ঐ দস্যুর অধিকার জন্মে? "বল যার অধিকার

তার" এই নীতি-সূত্রটি মানিতে গেলে ঐ দস্যুর অপহৃত ধনে অধিকার আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি ইহা স্বীকার করিবেন? সেই রূপ যদি কোন বলবান জাতি কোন দুর্ব্বল জাতির দেশ কাড়িয়া লয়, তাহা হইলে সেই জাতি কি দস্যুতা অপরাধে অপরাধী নহে? এক জন সামান্য দস্যুর সহিত তাহার প্রভেদ কি?—সংখ্যায় অধিক এই মাত্র। ব্যক্তিগত সম্পত্তি-অধিকারের যে মূল-নিয়ম, জাতি-গত সম্পত্তি-অধিকারেরও যে সেই একই মূল-নিয়ম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে দেশের যে অধিবাসী, সেই দেশ সেই অধিবাসীদিগের স্বাভাবিক ন্যায্য সম্পত্তি। এই রূপ যদি দেশ-অধিকারের ন্যায়-সঙ্গত একটি স্বাভাবিক নির্দ্দিষ্ট সীমা না থাকে, বলই যদি অধিকারের নিয়ম হয়—তাহা হইলে পৃথিবীতে যুদ্ধ বিগ্রহের আর অবধি থাকে না। যুদ্ধানল চিরকালই প্রজ্জ্বলিত থাকে—"সভ্যতা" বলিয়া একটি শব্দ আর মানব-ইতিহাসে কুত্রাপি স্থান পায় না।

মানব সমাজের সভ্যতা বা উন্নতির ইতিহাসকে তিনটি কালে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম।—সংগ্রাম-প্রধান কাল।

দ্বিতীয়।—স্বার্থ প্রধান কাল।

তৃতীয়।—ন্যায়-ধর্ম্ম-প্রধান কাল।

আর এক কথায়——

প্রথম।—তামসিক কাল।

দ্বিতীয়।—রাজসিক কাল।

তৃতীয়।—সাত্ত্বিক কাল।

সাঙ্গ্রামিক কালের বহু পূর্ব্বের যে কাল, সে কাল মনুষ্য-সমাজের ইতিহাসে ধর্ত্তব্যই নহে—যেহেতু সে সময়ে মনুষ্যের সমাজ-বন্ধন আদৌ হয় নাই। যখনি রীতিমত যুদ্ধ বিগ্রহ আরম্ভ হইয়াছে, তখনই বুঝা যাইতেছে মনুষ্যদিগের মধ্যে একটি সম্মিলনের ভাব উৎপন্ন হইয়াছে, কারণ বিনা সম্মিলনে বৃহৎ যুদ্ধ ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে না। যখনি মনুষ্যের মধ্যে পরস্পর সম্মিলন আরম্ভ হইয়াছে, তখনই বলিতে হইবে সমাজ বন্ধন-কার্য্যও আরম্ভ হইয়াছে। সাঙ্গ্রামিক কালে, কোন কোন জাতির মধ্যে কোন কোন বলবান পুরুষ উত্থিত হইয়া কতক সংখ্যক লোককে আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিয়া শুদ্ধ আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিবার জন্যই কিম্বা কোন নীচ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্যই, অন্য জাতির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত, তখন প্রধানতঃ শারীরিক বলেরই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এই যুদ্ধ-বিগ্রহে সে সময়ে মনুষ্য-সমাজের অনেক উপকার সাধিত হইয়াছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ দ্বারা মানব-সমাজের বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে প্রথম সংমিশ্রণ আরম্ভ হইল, বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলের বৃদ্ধি হইল, পরস্পরের ভাল পরস্পর অনুকরণ করিতে লাগিল, জেতৃজাতি বিজিত জাতির নিকট কতকটা উপকার লাভ করিল, এবং বিজিত জাতিও জেতৃ-জাতির নিকট অনেক বিষয়ে উপকৃত হইল। সংগ্রামের অনেক অশুভ ফল সত্ত্বেও সকল কালেই বিশেষতঃ অসভ্যকালে

ইহারও যে বিশিষ্ট উপকারিতা আছে তাহা কেনা স্বীকার করিবে। এই যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতেই বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে সম্মিলন আরম্ভ হয়, বাণিজ্যের সূত্রপাত হয়, জাতীয় স্বার্থভাবের প্রথম সঞ্চার হয় এবং এইরূপে জন সমাজ সভ্যতার দ্বিতীয় সোপানে উত্থিত হয়।

সভ্যতার এই দ্বিতীয় কাল, জাতীয় স্বার্থের কাল। সাংগ্রামিক কালের লোকে যেরূপ প্রধানতঃ নীচ প্রবৃত্তির অধীন হইয়াই অন্য জাতির সহিত সংগ্রাম করে, যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ করে, রক্তের পিপাসু হইয়াই রক্তপাত করে, একালের লোক সেরূপ করে না। একালে যুদ্ধ-বিগ্রহ উচ্চতর স্বার্থের অধীন। স্বজাতীয় ধন লাভের পন্থা করিবার জন্য, বাণিজ্যের সুবিধা করিবার জন্য, এক কথায় উচ্চতর স্বার্থের জন্য যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ আবশ্যক হয়, তবেই এই কালের লোক যুদ্ধ বিগ্রহে প্রবৃত্ত হয়।

ক্রমে পৃথিবীতে যত জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হয় ততই ব্যক্তিগত নীচ প্রবৃত্তি সকল মন্দীভূত হয়, জাতিগত অতিরিক্ত স্বার্থপরতার হ্রাস হয়, তখন এক জাতির স্বার্থ অপর জাতির স্বার্থের সহিত বিরোধী হয় না, প্রত্যুত সকল জাতির এক স্বার্থ হইয়া উঠে, তখন ন্যায় ধর্ম্ম মঙ্গলের অখণ্ড রাজত্ব পৃথিবীতে স্থাপিত হয়, তখন আর শারীরিক বলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না, তখন পৃথিবীর সকল জাতিই পরস্পরের সহিত সৌহার্দ্দ্য-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া পৃথিবীতে নির্ভয়ে সুখে সঞ্চরণ করে। কিন্তু এই ন্যায়-ধর্ম্ম-প্রধান কাল, এই সাত্বিক কাল, এই সত্যকাল, এই স্বর্গীয় কাল, পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে। এত বিলম্ব যে, সে এখন আমাদের কল্পনাতেও আইসে না। কিন্তু সমস্ত মানব-সমাজের গতি যে ঐ দিকে, তাহার নিদর্শন এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে।

সমগ্র পৃথিবী যত দিন না সভ্যতার এক সমভূমিতে দণ্ডায়মান হইবে ততক্ষণ এই ন্যায় ধর্ম্মের কাল পৃথিবীতে সম্পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইবে না। পৃথিবীর একাংশে যদি এই জ্ঞান ধর্ম্মকাল আবির্ভূত হয়, আর অন্যভাগে যদি সাংগ্রামিক কাল কিম্বা স্বার্থ-কাল বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে যে অংশে জ্ঞান ধর্ম্ম কালের আবির্ভাব হইয়াছে সে কাল সেখানে কখন বহুদিন স্থায়ী হইতে পারে না। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষ তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষে ধর্ম্ম-মূলক সভ্যতার প্রথম আভাস প্রকাশ পাইয়াছিল। তৎকালীন হিন্দুগণ এই সার বুঝিয়াছিলেন যে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন ন্যায়-ধর্ম্মের বর্ম্মে তাঁহারা সুরক্ষিত আছেন, বিদেশীয় লোক আসিয়া যে তাঁহাদিগের দেশ আবার আক্রমণ করিবে, এ কথা তাঁহাদের মনে আদৌ উদয় হয় নাই, তাঁহারা দিব্য নিশ্চিন্ত ছিলেন—পার্থিব বিষয়ে বড় মনোযোগ দিতেন না—পারমার্থিক বিষয় লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। বিদেশীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁহারা পূর্ব্ব হইতে রীতিমত

প্রস্তুত ছিলেন না—সুতরাং তাঁহারা বিদেশীয়দিগের হস্তে সহজে পরাভূত হইলেন। এই আক্রমণের ফল এই হইল—বৈদেশিকেরা সুসভ্য হিন্দুদিগের সংশ্রবে সভ্যতা-সোপানের এক ধাপ উপরে উত্থিত হইল—এবং সুসভ্য হিন্দুগণের সভ্যতা ও উন্নতি বৈদেশিকদিগের অত্যাচারে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

সভ্যতার ইতিহাস-পাঠে এই একটি বিষয় শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর কোন অংশের কোন জাতি পৃথিবীর অন্যান্য জাতিদিগকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া—আপনি একাকী অত্যন্ত দ্রুতগতি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না—তাদৃশ দ্রুতগতি অগ্রসর হইতে গেলেই আবার পতন হয়। সমগ্র পৃথিবীকে সভ্যতার সমভূমিতে আনয়ন করিবার জন্য প্রকৃতি-দেবীর নিয়ত চেষ্টা। গ্রীকেরা যখন সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় উত্থিত হয়—রোমকেরা আসিয়া তাহাদিগের দেশ জয় করে—এবং গ্রীকদিগের সংশ্রবে রোমকদিগের সভ্যতা বৃদ্ধি হয়; আবার যখন রোমকেরা সভ্যতার চূড়ান্ত সীমায় উত্থিত হয়—গথ্ ভাণ্ডাল প্রভৃতি উত্তর প্রদেশীয় জাতিগণ তাহাদিগকে জয় করে—এবং বিজিত রোমকদিগের সংশ্রবে তাহারা আবার সভ্যতা-পথের পথিক হয়। এইরূপ পৃথিবীর ইতিহাসে এক দিকে পতন, আর এক দিকে অভ্যুদয়,এক দিকে অবনতি আর এক দিকে উন্নতি নিয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন পাত্রে জল রাখিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিলে যেমন পাত্রস্থ নিম্ন তলের জল-রাশি কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইলে উপরি ভাগে উত্থিত হয়—তাহার স্থান আবার অব্যবহিত উপরিস্থ অপেক্ষাকৃত শীতল জল-স্তবক আসিয়া অধিকার করে—এইরূপ প্রক্রিয়ায় ক্রমে ক্রমে সমস্ত জল-রাশির উষ্ণতা সমান হইয়া পড়ে—সেই রূপ সভ্যতা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর সর্ব্বাংশে সমানরূপে বিস্তৃত হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

"বল যার, অধিকার তার" এই নীতিসূত্রটির বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া আমরা অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি। যদিও ইদানিন্তন ইউরোপে এই নিয়মটি পূর্ব্বতন সাংগ্রামিক কালের ন্যায় প্রবল নহে, তথাপি এই নিয়মটির কার্য্য এখনও সেখানে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। এখন শুদ্ধ যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ হয় না, জাতীয় স্বার্থের উদ্দীপনায় যুদ্ধানল প্রজ্জলিত হয়। ফ্রান্সের ভূতপূর্ব্ব সম্রাট্ তৃতীয় নেপোলিয়ন একবার এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, ইউরোপের সকল রাজ্যের নির্দ্দিষ্ট সৈন্যদলের (Standing army) সংখ্যার লাঘব করা হউক, কিন্তু তাহাতে কেহই সম্মত হয়েন নাই, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই ফরাসিস্ জর্ম্মাণ যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। অতএব দেখা যাইতেছে 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়ম এখনও মনুষ্য-সমাজ হইতে তিরোহিত হয় নাই।

কিন্তু লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধের স্থানে স্থানে এই নিয়মটি সম্বন্ধে যেরূপ ভাবে লিখিয়াছেন তাহাতে হঠাৎ এইরূপ প্রতীতি

হয় যেন তিনি ঐ নিয়মটির উৎকৃষ্টতা ও চিরস্থায়িতা প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি এক স্থলে বলিয়াছেন। * * * * "In these Nature once more asserts her eternal law—once more gives the Hero who reigns not by the so-called right of conventional inheritance but of Might which alone gives you the right!"

* * * * *

"And look how the nation blooms and flourishes once more under the sway of its just rightful king, because chosen by Nature on account of his acknowledged might and therefore his inviolable right to rule." আমরা এই বলাধিকারের নিয়মকে উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিতে পারি না—এই নিয়মানুসারে চলিতে কাহাকে উপদেশ দিতে পারি না। মানব-সমাজের অপূর্ণতা হেতুই এই নিয়মটির অস্তিত্ব—ইহাকে আমরা কখন অনন্ত কালের (Eternal Law) নিয়ম বলিতে পারি না। ন্যায়ের নিয়মই অনন্ত কালের নিয়ম। বলাধিকার-নিয়মের উৎকৃষ্টতা স্বীকার করিলে আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—যুদ্ধ বিগ্রহের আর অবধি থাকে না—সুতরাং সভ্যতার গতি একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। বলই যদি অধিকারের নিয়ম হয়, তাহা হইলে কোন রাজ্যেরই শাসন-কার্য্য স্থায়ী পত্তন ভুমিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। দণ্ডে দণ্ডে রাজ-শাসনের পরিবর্ত্তন হয়। আজ এক রাজা এক রাজাকে বলপূর্ব্বক সিংহাসনচ্যুত করিল—কল্য আর এক জন প্রবলতর রাজা আসিয়া বলপূর্ব্বক তাহার স্থান আবার অধিকার করিল—প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করিয়া আছে—যখনই তাহার ক্ষমতা হইবে অমনি সে আর এক জনের বস্তু বলপূর্ব্বক অপহরণ করিবে। এই জন্যই সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে এই সাধারণ নীতিটি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে—যে দেশের যে চিরন্তন রীতি, সেই রীতি-অনুসারে সাধারণ প্রজাদিগের ব্যক্ত কিম্বা অব্যক্ত সম্মতি-ক্রমে সেই দেশের রাজা কিম্বা শাসনকর্ত্তা কিম্বা শাসনকর্ত্তৃগণ সেই দেশের শাসন-ভার প্রাপ্ত হয়েন। যতক্ষণ না তাঁহারা ন্যায়ের নিয়ম লঙ্ঘন করেন ততক্ষণ তাঁহারা স্বীয় অধিকার হইতে বিচ্যুত হইতে পারেন না—অন্য দেশের লোক আসিয়া যদি কোন দেশের প্রজাদিগের বিনা সম্মতিতে সেই দেশ আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহারা সেই দেশের অনধিকার-প্রবেশী শত্রু বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহারা বলপূর্ব্বক ঐ দেশ অধিকার করিলেও—ঐ দেশে তাহাদিগের যে ন্যায্য অধিকার—ন্যায্য স্বত্ব বর্ত্তিয়াছে এরূপ বলা যাইতে পারে না। রাজনীতি-সম্বন্ধে এইরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা নিরূপিত হইয়াছে বলিয়াই পূর্ব্বতন সাংগ্রামিক কাল অপেক্ষা ইদানিন্তন সভ্য-সমাজে যুদ্ধ বিগ্রহের ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। লেখক মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন;—"Abundant blessings flow to the conquered inspite of the

bloody resistance they might offer or curses and imprecations they might heap on their hated conquerors."—অনেক সময় পরাজিত জাতি জেতৃ-জাতির নিকট বহুবিধ উপকার প্রাপ্ত হয় সত্য—তাহা আমরাও স্বীকার করি এবং সে বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখও করিয়াছি। কিন্তু তাই বলিয়া "বল যার অধিকার তার" এই নিয়মটিকে কখনই উৎকৃষ্ট নিয়ম বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। এক জন দস্যু এক জন দুর্ব্বলের ধন অপহরণ করিয়া দীন দুঃখীগণকে দান করিতে পারে, তাহা বলিয়া সে যে দস্যুতা-অপরাধে অপরাধী নহে কিম্বা সে যে সমাজের নিকট দণ্ডনীয় নহে, এ কথা কেহই স্বীকার করিবে না। জগৎ-বিধাতার কার্য্য-প্রণালীই এইরূপ যে তিনি অশুভ ঘটনা হইতেও কিঞ্চিৎ শুভ উদ্ধার করেন। তাহা বলিয়া যাহা অন্যায় তাহা কখনই ন্যায় হইতে পারে না। যদি লেখক মহাশয়ের বলিবার অভিপ্রায় এই হয় যে, সমস্ত পৃথিবীতে—এমন কি তাহার সভ্যতম অংশ ইউরোপেও যে নিয়ম এখনও কার্য্যতঃ প্রচলিত রহিয়াছে তাহারই কথা তিনি বলিতেছেন, কোন্ নিয়মকে মনুষ্যসমাজের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত করা উচিত, সে বিষয় তিনি বলিতেছেন না, তাহা হইলে তাঁহার মতের সহিত আমাদিগের কিছুমাত্র অমিল নাই। ইহা সত্য যে, সমস্ত পৃথিবীতে এখনও 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়মটি কার্য্যতঃ প্রচলিত রহিয়াছে। সভ্যতাভিমানী ইউরোপ মুখে এই নিয়মটি স্বীকার করেন না বটে কিন্তু কার্য্যতঃ এই নিয়মানুসারে অনেক সময়ে চলিয়া থাকেন। তবে অসভ্যদিগের সহিত তাঁহাদিগের এই প্রভেদ যে, অসভ্যেরা স্পষ্টাপষ্টি এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হয়, আর তাঁহারা তাহার উপর একটি ন্যায়ধর্ম্মের আবরণ দিয়া স্বীয় অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখেন। তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া এই যে একটি ন্যায়-ধর্ম্মের আবরণ দিতে হয়, ইহাও অপেক্ষাকৃত উন্নতির লক্ষণ বলিতে হইবে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে বলাধিকারের নিয়ম ক্রমশই খর্ব্ব হইয়া আসিতেছে। ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যতই মনুষ্যসমাজে সভ্যতার বাস্তবিক উন্নতি হইবে ততই 'বল যার অধিকার তার' এই নিয়মটির উপর "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" এই নিয়মটি জয়লাভ করিবে। ইউরোপীয় সভ্যতার এক্ষণে এতটুকু উন্নতি হইয়াছে যে, ইউরোপীয়েরা জ্ঞানত বুঝিয়াছেন যে ন্যায়ের নিয়মই শ্রেষ্ঠ নিয়ম, তবে অপূর্ণতা হেতু রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে স্বার্থ-অন্ধ হইয়া কার্য্যতঃ প্রায়ই এই নিয়মের ব্যভিচার করেন। এবার আমরা স্থানাভাব-প্রযুক্ত এই খানেই শেষ করিলাম। লেখক মহাশয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন ভারতীর আগামী সংখ্যায় তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

গঞ্জিকা।

দাড়ি-তত্ত্ববিবেক।

ভুরিতানন্দ গোস্বামীর জনৈক প্রবীণ চেলা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রথম অধ্যায়।

জন্মেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন প্রভো, আপনি দাড়ি রাখিয়াছেন কেন?

বৈশম্পায়ন উত্তর করিলেন, মহারাজ, আপনি অতি অন্যায় প্রশ্ন করিতেছেন। প্রথমতঃ দাড়ি রাখিয়াছি কেন এ জিজ্ঞাসা করিবার কাহারও অধিকার নাই। যদি এ প্রশ্নের উত্তর আজিকে আপনাকে দেওয়া যায়, তাহা হইলে ক্রমেই আপনার প্রশ্রয় বাড়িবে;—আজ জিজ্ঞাসা করিলেন দাড়ি রাখিয়াছ কেন, কাল জিজ্ঞাসা করিবেন কাণ রাখিয়াছ কেন? পরশু জিজ্ঞাসা করিবেন নাক রাখিয়াছ কেন? প্রকৃতি-বিকৃতির জ্ঞান থাকিলে এ প্রশ্ন করিতেন না।

আমাদের দেশের কোন লোক চীনের দেশে গিয়া যদি নাক ঘসিয়া চীনদিগের নাকের সঙ্গে সমান করিতে চেষ্টা করে, পরে সে,দেশে ফিরিয়া আসিয়া যদি আমাদের কাহাকে জিজ্ঞাসা করে আপনি নাক ঘসেন নাই কেন—সে যেরূপ প্রশ্ন এও মহারাজ সেইরূপ। মনুষ্যগণ স্বাভাবিক বিষয়ে তৃপ্ত না হইয়া প্রকৃতির বিকৃতি ইচ্ছা করে। কোন কোন লোক আপনার কুকুরের লেজ ও কাণ কাটিয়া দিয়া থাকে, ভাবে আমার কুকুর বড় রাগী হইবে। কিন্তু লেজ ও কাণ কাটিয়া দিলে কে না রাগে? লক্ষ্মণ যদি স্যূর্পনখার নাসিকা ছেদন না করিতেন তাহা হইলে লঙ্কাকাণ্ড আদৌ উপস্থিত হইত না। দায়্‌রা সোপর্দ্দের মোকদ্দমা উঠিতে পারে এমন কাজ কেন? বিকৃতি-প্রিয় লোকে কুকুরের লেজ কাটিয়া ফেলে কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে লেজে ও বাকি কুকুরে অনেক তারতম্য আছে। বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে লেজই পাকা-মাল। কুকুরের ভয় হইলে লেজটা নিচের দিকে গুটাইয়া লয়, রাগ হইলে লেজটা খাড়া করে, সোহাগ হইলে লেজটা নাড়ে। লেজটা কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া অপেক্ষা কুকুর ফেলিয়া দিয়া লেজ রাখা অনেক ভাল। এইরূপ বিকৃতি-প্রিয় লোক দাড়ি ছেদন করিয়া পুরুষত্বের বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে। অতএব দাড়ি রাখিয়াছ কেন, এ প্রশ্নের উত্তর-দায়ক আমি হইতে পারি না বরং মহারাজ আমিই জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারী—আপনি দাড়ি ছেদন করিয়াছেন কেন? যে ছেদন করে প্রমাণের ভার তার শিরে। প্রমাণ সম্বন্ধের আইনে যেরূপ বিধান আছে তাহাতে কোন বিষয়ের কৃতকর্ম্মাকেই প্রমাণ দিতে হয়; অতএব দাড়ি যে ছেদন করে তাহাকেই কারণ বিন্যাস করিতে হইবে। ইহা দ্বারাই দাড়ি

ধারণ কেন এই জিজ্ঞাসার অধিকার নিরূপিত হইতেছে।

আর এক কথা, দাড়ি রাখিয়াছেন কেন, এই বাক্যের মধ্যে রাখা শব্দটি অপ্রসিদ্ধ। এই স্থলে রাখা শব্দটি আদৌ প্রয়োগ হইতে পারে না। রাখা এই বাক্য যদি ব্যবহার করা যায় তো "নাক রাখা" "কাণ রাখা" কেনইবা না ব্যবহার করা যাইবে?

অতএব দাড়ি রাখা কিম্বা না রাখার পরিবর্ত্তে দাড়ি ছেদন কিম্বা না ছেদনের কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। এতক্ষণে প্রকৃত প্রশ্নে উপনীত হওয়া গেল। এক্ষণে দাড়ি ছেদন করা কিম্বা না করা ইহার কোন্ পক্ষে অধিক ক্লেশ বা সুবিধা তৌল করিয়া দেখা যাউক। দাড়ি ছেদন না করিবার পক্ষে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হয় তাহা এই—প্রথমতঃ, ছেদন না করিলে মুসলমানের মত দেখায়। দ্বিতীয়ত, দাড়ি থাকিলে দাড়ি ধরিয়া মারিবার সুবিধা। তৃতীয়তঃ আহারের ব্যাঘাত। চতুর্থতঃ পুত্র প্রভৃতি স্নেহের পাত্রদিগের মুখ-চুম্বনের অসুবিধা। এই কয়েকটি অসুবিধার প্রকৃতি আলোচনা করিতে হইবে।

প্রথম অসুবিধার উত্তর—মুসলমান জাতি এদেশে আসিবার পূর্ব্বে সমস্ত হিন্দুজাতির প্রায় শ্মশ্রুচ্ছেদন নিষেধ ছিল। মুসলমান এ দেশের রাজা হইলে পর, কাহাকে প্রণাম করি, কাহাকে সেলাম করি—ইহা লইয়া সর্ব্বদা গোলযোগ উপস্থিত হইত। মুসলমানজাতি রাজপুরুষ—দাড়ি ছেদন প্রসঙ্গে তাহারা কেন সম্মত হইবে?—সুতরাং আমাদের হিন্দুজাতিকেই দাড়ি ছেদন করিয়া হিন্দুর পরিচয় দিতে হইয়াছিল। এই নিমিত্তই সচরাচর আমাদের মধ্যে ছেদনের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ দাড়ি ধরিয়া মারিবার বিষয়ে এই বক্তব্য যে, আকবর শা প্রভৃতি বড় বড় রাজাদেরই আজানুলম্বিত দাড়ি ছিল।—যাহারা দেড়ে তাহারা যে একের চেয়ে দেড় গুণে বড় তাহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব যারা মারনে ওয়ালা তাদেরি দাড়ি ছিল—যাদের দাড়ি ছিল না তারাই মার খানে-ওয়ালা। ধূম দেখিলেই যেমন অগ্নির সত্তা উপলব্ধি হয়, সেইরূপ দাড়ি দেখিলেই বলের সত্তা উপলব্ধি হয়—এই হেতু প্রায়ই দেড়ের দাড়ি দেখিবা মাত্র অদেড়ের নাড়ি ছাড়িয়া যায়; অতএব দেড়ের দাড়ি পর্য্যন্ত হাত উঠিতে পারে, অদেড়ের এরূপ ভরসা কোথায়? তৃতীয়ের উত্তর এই, আহারের অসুবিধা মনঃকল্পিত মাত্র। আস্য-কুহরের যেরূপ আয়তন তাহাতে লোমে বাধিয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। চতুর্থ আপত্তি সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, লম্বমান দাড়ির কোমল অগ্রভাগ ও ছিন্ন দাড়ির কুটকুটে অগ্রভাগের ঘর্ষণ—এ দুয়ের বিস্তর প্রভেদ। চামরের কোমল অগ্রভাগের সহিত ব্রুশের কঠিন অগ্রভাগের যেরূপ প্রভেদ ইহারও সেইরূপ।

এক্ষণে ছেদনে কি কি ক্লেশ তাহার প্রকৃতি আলোচনা করা যাউক।

প্রথমতঃ ক্ষৌর কর্ম্ম করা অভ্যাস থা-

কিলে দুই এক দিন ক্ষৌর না করিলেই দাড়ি কুট্‌কুট করে। ইহাকে বলে স্বকৃত চুল্‌কানি!

দ্বিতীয়তঃ প্রাতঃকালে নাপিত সম্মুখে বসিয়া ক্ষুর শাণায়—পরে বাম হাত দিয়া মুখে জল দিতে আরম্ভ করে। ব্যাটা যে ভাবে মুখ-খানা চট্‌কায়, মনে হ'লে বড় ঘৃণা হয়। বিশেষতঃ বাঁ হাতে চুলের টিকি ধরিয়া ঘাড় নোয়াইয়া যেরূপ ভাবে মাথাটা এদিক্ ওদিক্ নাড়ায়—বোধ হয় যেন আমার মাথা আমারই নয়।

তৃতীয়তঃ—অতি তীক্ষ্ণ ক্ষুর-ধারের উপর কেন যে বাহার বা দেশাচারের অনুরোধে কোমল কণ্ঠ-নলী সমর্পণ করা হয় বুঝা যায় না। নাক নয়—কাণ নয়—যে তাহা এক দিন কাটিয়া ফেলিলেও চলে—কেন না, পৃথিবীতে নাক-কাণ-কাটা লোকের অভাব নাই, কিন্তু এক জন অস্ত্রধারীর হস্তে দশ মিনিট্ কালের জন্যও কি কণ্ঠ নিরুদ্বেগে গচ্ছিত রাখা যাইতে পারে? শাস্ত্রে আছে "নদীনাঞ্চ নখীনাঞ্চ শৃঙ্গীনাং শস্ত্রপাণিনাং বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।" কোন ধারেই যাওয়া উচিত নয়—কি কূপের ধার—কি ক্ষুরের ধার—কি টাকার ধার—সকল ধারেই বিপদের সম্ভাবনা—অতএব কোন্ বুদ্ধিতে এরূপ শানিত ক্ষুর-ধারের উপর যাওয়া হয়?

চতুর্থতঃ কোন প্রকার সাংক্রামিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে কামাইয়া আসিয়া সেই ক্ষুরে যদি আমাকে কামায়—তো আমাতেও ঐ রোগ সংক্রামিত হইতে পারে। আপনার ক্ষুরে কামানো সকলের পক্ষে সকল অবস্থায় সহজ নহে—এতদ্ব্যতীত নাপিতের গায়ের দুর্গন্ধ অতীব কষ্টজনক। ছেদনের সুবিধা এবং অসুবিধা এই দুই কর্দ্দে যে যে বিষয়ের উল্লেখ করা গেল তুলনায় ছেদনের ক্লেশ কত অধিক তাহা বলা যায় না। স্ত্রীপুরুষের শরীরের বাহ্য লক্ষণের মধ্যে মুখমণ্ডলের গোঁপ-দাড়ি ও তাহার অভাবই প্রধান। অতএব স্ত্রীপুরুষের পরিচয়ের প্রধান লক্ষণ যে গোঁপ-দাড়ি তাহা ছেদন করা পুরুষত্বের বিলক্ষণ হানিকর কি না? যাত্রার দলে যারা স্ত্রী সাজে তাহাদিগের দাড়ি গোঁপ ছেদন না করিলে চলে না—তবেই পুরুষের মেয়ে সাজিবার প্রয়োজন হইলে তাহারা আপনার মুখকে অন্য-রূপ করে। সামান্যতঃ দেখা যায় যে, প্রকৃতির অভ্যন্তরে পুরুষজাতিই অধিক সুশ্রী এবং পূর্ণতার দিকে প্রবণ,—পুরুষ শব্দের অর্থই পূর্ণ। অতএব পূর্ণতার কতক অংশ বাদ দিয়া পুরুষ বলিয়া পরিচয় দেওয়া অতি অজ্ঞানের কর্ম্ম সন্দেহ নাই।

স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ-জাতি স্বভাবত যে সুশ্রী তাহা তো প্রকৃতিতে পড়িয়া আছে—কে না জানে ময়ূরী অপেক্ষা ময়ূর সুশ্রী—মুরগী অপেক্ষা মোরগ সুশ্রী— চটকী অপেক্ষা চটক সুশ্রী—সিংহী অপেক্ষা সিংহ সুশ্রী? কেহ বলিতে পারেন যে চুল সম্বন্ধে এরূপ কথা কেন না চলে? উত্তর—যেহেতু পুরুষ-শরীরের দাড়ি-গোঁপ স্ত্রী অপেক্ষা অতিরিক্ত বস্তু—সেই হেতু পুরুষ-শরীরে তাহার কারণও অতিরিক্ত বলিতে হইবে। উত্তর

শরীরের কারণ সমান থাকিলে কার্য্যও সমান হইত।

প্রথমতঃ দাড়ি ছেদনের প্রয়োজনই নাই, বরং ইহাতে শোভা বর্দ্ধন হয়, এবং অনেক সময় ইহা সর্দ্দি কাশি নিবারণ করিয়া গলা-বন্দের কাজ করে। এই দাড়ি যাহারা পয়সা খরচ করিয়া ছেদন করে তাহাদের অপেক্ষা আহাম্মক আর দুনিয়ায় নাই। ক্ষৌর কার্য্যের জন্য মাসের মধ্যে অন্ততঃ চার পয়সা করিয়া নাপিতকে দিতে হয়, তাহা জমাইলে দেশের কত উপকার সাধিত হইতে পারে বলা যায় না। সমস্ত হিন্দুজাতিকে না ধরিয়া যদি বাঙ্গালীদিগের জন-সংখ্যা ধরা যায়—যদি বাঙ্গালীদিগের জন-সংখ্যা এক কোটি হয়, আর ক্ষৌর কর্ম্মের জন্য প্রত্যেক বাঙ্গালীর যদি ৪ পয়সা মাসে খরচ হয়—তাহা হইলে এই চার পয়সা বাঁচাইলে ৬২৫০০০,টাকা মাসে পাওয়া যায়, এই টাকা সাধারণ হিতোদ্দেশে ব্যয় করিলে দেশের কত না উন্নতি সাধন হয়! গবর্ণমেণ্ট যে এত ট্যাক্সের জন্য উৎপাত করেন, দাড়ি ছেদন নিষেধের আইন করিয়া এই টাকা সহজে উঠাইয়া লইতে পারেন, কারণ ঐ টাকা ত এমনেও নাপিতকে দিতে হয়। আর এক কথা, সংস্কার-প্রিয় নব্য সম্প্রদায়দিগকে উৎপীড়ন করিবার জন্য প্রবীণ সম্প্রদায়ের যে দুইটি মহাঅস্ত্র আছে তাহা নাপিত ও ধোপা বন্ধ করা, দাড়ি ছেদন না করিলে উহার একটি অস্ত্র হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। এই সকল কারণেই মহারাজ আমি দাড়ি ছেদন করি নাই।

জন্মেজয় কহিলেন, ভগবন্ আপনার যুক্তিগর্ভ বিচার শ্রবণ করিয়া আমার বিলক্ষণ জ্ঞান লাভ হইল ও আমি কৃতার্থ হইলাম। আজ হইতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি আমিও দাড়ি রাখিব—ওঁ বিষ্ণু—দাড়ি ছেদন করিব না!

ইতি শ্মশ্রু তত্ত্ব-বিবেক গ্রন্থে শ্মশ্রু-ছেদন নামকোহয়ং প্রথমোধ্যায়ঃ।

মুক্তকণ্ঠতা।

বৃদ্ধ রাজা লিয়ার রাজকার্য্য হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া কাল কাটাইবার জন্য গনরীল্, রিগান্ ও কর্ডিলীয়া নামক কন্যাত্রয়কে ডাকিলেন, এবং তাহাদিগকে সমস্ত রাজ্য বিভাগ করিয়া দিবার সংকল্প প্রচার করিলেন। কন্যারা রাজ-সমক্ষে উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, "আজ হইতে আমি রাজ্য-ভার পরিত্যাগ করিব, এখন বল, তোমাদের মধ্যে কে আমাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্নেহ মমতা কর, কেন না সেই অনুসারে আমি তাহাকেই আমার রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অংশ দিব।" এই কথা শুনিবা মাত্র জ্যেষ্ঠা গনরীল বলিল, "আর্য্য, আমি আপনাকে যতদূর ভাল বাসি, কথা দ্বারা তাহা প্রকাশ করা যায় না। * * * যে জীবন ঈশ্বরের অনুগ্রহ, অনন্ত সুস্থতা ও অতুল সৌন্দর্য্য দ্বারা বিভূষিত, সে জীবন অপেক্ষাও

আমি আপনাকে অধিকতর ভালবাসি।” মধ্যম কন্যা রিগান্ বলিলেন, “আর্য্য, যে উপাদানে আমার জ্যেষ্ঠ ভগিনী গঠিত আমিও সেই উপাদানে গঠিত। কিন্তু আমি যতদূর বলিতে পারি, তিনি ততদূর বলিতে পারিলেন না, আমি এ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, আপনাকে ভালবাসা ব্যতীত আমার আর অন্য কোন আমোদ আহ্লাদই ভাল লাগে না।” বৃদ্ধ রাজা উল্লসিত হইয়া তাঁহার রাজ্যের তিন ভাগের দুই ভাগ কন্যা-দ্বয়কে দিলেন। এবং পরিশেষে কনিষ্ঠ কন্যা কর্ডিলীয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎসে, তোমার ভালবাসা বিষয়ে তুমি কি বলিতে পার?

কর্ডিলীয়া। আর্য্য, কিছুই বলিতে পারি না।

লিয়ার। কিছুই না?

ক। কিছুই না!

লি। কিছুই নার ফল কিছুই না, তা জান? আর কি বলিতে হয় বল?

ক। আর্য্য, আমি অভাগিনী, আমি আমার হৃদয়ের কথা মুখে প্রকাশ করিতে পারি না। আপনি আমার পিতা,—কন্যা পিতাকে যতদূর ভাল বাসিতে পারে, আমি ততদূরই আপনাকে ভালবাসি। তাহার অধিকও নয়, তাহার কমও নয়। * * * * আমার ভগিনীরা যদি অখণ্ড হৃদয়ের সহিত আপনাকেই ভাল বাসেন তবে তাঁহারা আদৌ বিবাহ করিয়াছিলেন কেন?

লি। এই কি তোমার হৃদয়ের কথা?

ক। হাঁ পিতঃ।

লি। তুমি এত অল্প-বয়স্ক, অথচ এত দূর নিষ্ঠুর?

ক। আর্য্য, অল্পবয়স্কা হ'লেও আমি সত্যবাদিনী।

লি। তবে সত্যবাদিত্বই তোমার সর্ব্বস্ব হোক! আজ হইতে তুমি আর আমার কন্যা নও। তোমার সঙ্গে আজ হইতে আমার সকল সম্পর্ক রহিত হইল।

এই বলিয়া বৃদ্ধ রাজা রাজ্যের অপর অংশ টুকুও অপর দুই কন্যাকে ভাগ করিয়া দিলেন এবং সরলহৃদয়া কর্ডিলীয়াকে একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। কিছু দিন পরে ঐ দুই ভাগ্যবতী কন্যা সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিয়া পিতাকে নানা প্রকার যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করিল, এমন কি, উহাদের নৃশংস ব্যবহারে লিয়ার উন্মত্ত হইয়া ঘোর ঝড় ঝটিকাতে, ঘোর বজ্র বৃষ্টিতে কন্যাদের গৃহে দুই দণ্ডের জন্য আশ্রয় পর্য্যন্ত পাইলেন না—সেই ঘোর ঝড় ঝটিকাতে, সেই ঘোর বজ্র-বৃষ্টিতে, বৃদ্ধ দুর্ব্বল রাজাধিরাজ বিশাল প্রান্তর-মধ্যে পরিত্যক্ত বন্য পশুর ন্যায় নিরাবরণে উন্মত্ত হইয়া বিচরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পরিশেষে পরিত্যক্ত কর্ডিলীয়া আসিয়াই পিতাকে উদ্ধার করেন, এবং বহু যত্নে ও বহু প্রয়াসে পিতার উন্মত্ততার কিঞ্চিৎ উপশম করেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বৃদ্ধ রাজার উপর আমাদের মমতার উদ্রেক হইলেও কি তাঁহাকে আমরা

ঘোর নির্ব্বোধ, তোষামোদপ্রিয় ও ক্ষমা-শূন্য মনে করি না? কিন্তু যে যাহাই মনে করুক, সমাজ! তুমিও কি লিয়ারকে অপরাধী মনে করিবে? তুমি ভাবিয়া দেখদেখি তুমি তাঁহা অপেক্ষা কত সহস্র গুণে নির্ব্বোধ তোষামোদপ্রিয় ও ক্ষমা-মার্জ্জনাশূন্য! তুমি ভাবিয়া দেখদেখি তুমি এইরূপ কত সহস্র মিস্টভাষিণী গনরীলকে তোমার বক্ষে স্থান দিয়া কত সহস্র সত্য-বাদিনী কর্ডিলীয়াকে দূরে নিক্ষেপ কর। তুমি যদি জানিতে যে কেবল তোমারই ঐ নির্বুদ্ধিতা, তোষামোদপ্রিয়তা ও ক্ষমা-শূন্যতা হেতু কত লোক সহস্র আবরণে হৃদয় আবরিত করিয়া রাখে, তুমি যদি জানিতে যে কেবল তোমারি ভয়ে কত কঠোর মর্ম্ম-যাতনা মর্ম্মের নিভৃত নিলয়ে নিলীন হইয়া থাকে, কত আর্ত্তনাদ জনকোলাহলের মধ্যে নিস্তব্ধ থাকিয়া হিমালয়ের বিজন কন্দরে প্রতিধ্বনিত হয়, কত মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস দিবসে অবরুদ্ধ থাকিয়া নিশীথ-পবনে তরঙ্গিত হইতে থাকে, তাহা হইলে তুমি বৃদ্ধ রাজাকে কোন দোষেই দোষী করিতে পারিতে না।

ইংলণ্ডের কাল্পনিক কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি শেলীর কথা মনে হইলে কার না হৃদয় ব্যথিত হয়? তিনি যখন অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন, যখন তাঁর বয়স ত্রয়োদশ বৎসর মাত্র, তখনই অলৌকিক প্রতিভা ও ন্যায়শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হেতু বাইবেল-বর্ণিত রক্ত-পিপাসু ঈশ্বরের বিষয়ে তাঁহার অনেক সংশয় জন্মায়। সেই সকল সংশয় ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত তিনি ঐ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই প্রবন্ধে তিনি বাইবেল-বর্ণিত ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রচলিত যুক্তিসমূহ অগ্রাহ্য করিয়া উৎকৃষ্ট-তর যুক্তি প্রদর্শনের জন্য কৃতবিদ্য খ্রীষ্টানদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন মাত্র। ত্রয়োদশ বৎসরের বালকের এই হুহঙ্কার দেখিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে যুক্তি দ্বারা নিরস্ত না করিয়া বিদ্যালয় হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু তবুও তাঁহার সরল মুক্তকণ্ঠতা নির্ব্বাপিত হইল না। অষ্টাদশ বৎসর বয়সে তিনি একখানি কবিতা লিখিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার মত প্রচার করিলেন। সেই কবিতা প্রচার হইলে সমস্ত ইংলণ্ড শেলীর বিপক্ষে খড়্গ-হস্ত হইল—পরিশেষে ইংলণ্ডের প্রধানতম বিচারালয়, তাঁহার বক্ষ হইতে তাঁহার পুত্র কন্যাকে পর্য্যন্ত ছিনিয়া লইলেন —ভগ্নহৃদয় শেলী বিশ বৎসর বয়সে উত্ত্যক্ত হইয়া জন্মের মত ইংলণ্ডের নিকট বিদায় লইয়া ইতালীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু ষ্টুয়ার্ট মিলের কি হইল? তিনি মুক্তকণ্ঠে কোথাও আপনার প্রকৃত নাস্তিকতা প্রচার করা দূরে থাকুক, প্রকাশ পর্যন্ত করেন নাই, কোথাও ধর্ম্ম বিষয়ক তাঁহার নিজের কোন মতই জীবদ্দশায় প্রকাশ করেন নাই—পিতৃ-উপদেশ অনুসারে তিনি ধর্ম্মবিষয়ে মনের বিশ্বাস আমরণ সন্তর্পণে গোপন করিয়া আসিয়াছিলেন, অথচ সকলেই মিলের তর্ক বিতর্কের গূঢ় উ-

দ্দেশ্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল। তিনি গোপনে সাধারণের মনকে যত দূর নাস্তিকতা-প্রবণ করিয়াছিলেন, শেলীর মুক্তকণ্ঠতা তাহা করিতে পারে নাই, পারিবারও সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শেলী ইংলণ্ড হইতে জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইলেন, আর মিল ইংলণ্ডের মহাসভার সভ্য পর্য্যন্ত নির্ব্বাচিত হইলেন।

সমাজ!—তুমি কি তবে লিয়ার অপেক্ষাও শতগুণে নির্ব্বোধ, তোষামোদপ্রিয় ও ক্ষমাশূন্য নহ? কে না জানে যে, কপটতা অপেক্ষা জগতে আর কষ্টকর কিছুই নাই, যে, কপটতা-হেতু হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়, বিবেক-বুদ্ধি কলুষিত হয়, একটি মিথ্যার উপরোধে সহস্র মিথ্যার অনুবর্ত্তী হইতে হয়, কে না জানে একটি কপট ব্যক্তিকে আমরণ নাটকাভিনয়ের অভিনেতৃ-ব্রতে দীক্ষিত হইতে হয়, স্বভাবের সহজ উচ্ছ্বাসকে বহু প্রয়াসে অবরুদ্ধ রাখিয়া বিকৃত ভান ধারণ করিতে হয়, তবে কিসের জন্য একটি মনুষ্যও জীবনের কোন ভাগেই কপটতা গরল পোষণ করিবে? সমাজ! তুমিই তাহার উত্তর দাও। অবশ্য স্বীকার করি যে সংসারে এমন অনেক লোক আছে যাহারা ইয়াগোর মত কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য দুর্ভেদ্য ছলনা-আবরণে আপনাদিগকে আবরিত করিয়া রাখে, স্বীকার করি যে, সংসারে আবার এমনও অনেক লোক আছে যাহাদের প্রকৃতিই এমনি বিকৃত যে কপটতাতেই তাহাদের আনন্দ ও তদ্দ্বারা অন্যকে প্রতারণা করিয়াই তাহাদের গৌরব—কিন্তু তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেও সংসারের কোন্ ব্যক্তি হৃদয়ের শিরা ও উপশিরা পর্য্যন্ত সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারে? যেখানে মনুষ্য সেই খানেই হৃদয়, যেখানে হৃদয় সেই খানেই দুর্ব্বলতা, কিন্তু যেখানে দুর্ব্বলতা সেই খানেই কি মার্জ্জনা আছে? মনের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে কত শুভকর, কত অশুভকর, কত পবিত্র, কত অপবিত্র ভাব উদয় হইতেছে—কিন্তু সকলেই কি তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিতে পারে? বরঞ্চ আমরা অমানিশার গভীর নিস্তব্ধ কালে মনের সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারি. বরঞ্চ তরঙ্গাহত সমুদ্র-তীরে দাঁড়াইয়া তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-উচ্ছ্বাস মিশাইতে পারি, তবু সমাজের সমক্ষে প্রকৃত আত্ম-পরিচয় দিতে পারি না। কেন না, সমাজ! তোমার বিবেচনা নাই, তোমার ক্ষমা নাই। ইহা ত সচরাচর দেখিতে পাই যে, যে লোক আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়া, আত্মীয় বিসর্জ্জন করিয়া, হিতাহিত জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া সমাজের মনোরক্ষা করিতে পারে, সেই সমাজের পূজ্য দেবতা। ইহা ত প্রত্যহই দেখিতে পাই যে, যিনি লৌকিকতার প্রচলিত অভিধানের কৌশলময় বাক্যাবলী কণ্ঠস্থ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, যিনি হৃদয়ের ভীষণ রৌরব অপ্রকাশিত রাখিয়া স্বর্গের প্রশান্ত ভাব মুখমণ্ডলে প্রকাশ করিতে পারেন,—যিনি আন্তরিক অকপট মত ও বিশ্বাসের বিরোধী হইয়া পথের সামান্য ভিখারীদের কটাক্ষ ও ইঙ্গিতের ক্রীড়নক

রূপে জীবনের প্রধান কার্য্যসমূহ পর্য্যন্ত বিধিবদ্ধ করিয়া লইতে পারেন,—তিনিই সমাজের পূজ্য দেবতা! যখন এই সকল শুনিতে পাই; দেখিতে পাই, অনুভব করিতে পাই, তখন আর মুক্তকণ্ঠ হইয়া আমরা কি কিছু বলিতে সাহসী হইতে পারি? এইরূপে কপটতার দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া মুক্তকণ্ঠতা আপনা-আপনিই সঙ্কুচিত হইয়া আইসে, লোকে হৃদয়ের ভিতর হৃদয় লুকাইতে অভ্যাস করে, এবং দিন দিন মিথ্যা কথার ন্যায়-শাস্ত্র ও অলঙ্কার-শাস্ত্র উৎকর্ষ লাভ করে। আমরা সকল সাহিত্যে এবং সকল দেশেই শিশুদিগের, কৃষকদিগের ও অসভ্য জাতিদিগের সরলতার প্রশংসাই শুনিতে পাই, কিন্তু সভ্য-সমাজ যদি ক্ষমা-মার্জ্জনা জানিত, তাহা হইলে সরলতা আর অবস্থা-বিশেষে বা লোক-বিশেষে আবদ্ধ থাকিত না। শিশুরা ভবিষ্যতের কথা ভাবিতেই পারে না, কৃষকেরা সরলতার ফলাফল বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে না, এবং অসভ্য জাতিরা তাহা উপলব্ধি করিতে পারিলেও সে বিষয়ে দৃকপাতও করে না। কিন্তু আমরা ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে পারি, সরলতার ফলাফল সহজেই জানিতে পারি এবং তাহা জানিতে পারিয়া আমাদিগকে তাহার প্রতি দৃকপাতও করিতে হয়। কিন্তু সমাজ যদি মুক্তকণ্ঠতার সহায়তা করিতে জানিত, সমাজ যদি হৃদয়ের দুর্ব্বলতা মার্জ্জনা করিতে জানিত, সমাজ যদি প্রকৃত অপরাধের বিবেচনা পূর্ব্বক শাস্তি দিতে জানিত, তাহা হইলে অনেক সময়ে ও অনেক স্থলে মনুষ্যকে আর মনুষ্যের চক্ষে প্রহেলিকারূপ জটীল পদার্থ হইয়া দাঁড়াইতে হইত না। যাঁহারা ক্ষমা-হীন সমাজপরায়ণ তাঁহারা যদি একবার ভাবেন যে ঈশ্বর যদি তাঁহাদের সকল অপরাধের,সকল প্রকার দুর্ব্বলতার সমুচিত শাস্তি দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উপায় কি হয়, যদি একবার ভাবেন যে তাঁদের হৃদয়ের সহস্র আবরণ একবার ছিন্ন হইলে কত বিভীষিকা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, আর তখন কতদূর তাঁরাই আবার সমাজের উদার বিবেচনা ও প্রশস্ত মার্জ্জনার ভিখারী হইয়া পড়েন,তাহা হইলে প্রত্যেক মনুষ্যের কি এক স্ফূর্ত্তিময় স্বাধীন ভাব, পরস্পরের কি এক হৃদ্যতার ভাব, এবং সমস্ত সংসারের কি এক প্রশান্ত ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

সকল দেশের সাহিত্যেই স্ত্রীলোককে কপট-পটু ও ছলনাময়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা এই যে, স্ত্রীলোক যদি ছলনাময়ীই হয়—সে কাহার দোষে? সভ্যতা নিবন্ধন স্ত্রীলোকদের শারীরিক নির্যাতন অপেক্ষাকৃত অনেক কমিয়াছে বটে,—কিন্তু অবস্থা বিশেষে তাহাদের দুর্ব্বলতার মার্জ্জনা কোথায়?

যাহাই হউক, মনুষ্যসমাজে মুক্তকণ্ঠতা বিষয়ে অনেক স্থলে এখন শুভকর পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে। বিজ্ঞানবিষয়ে মুক্তকণ্ঠতার জন্য কোপরনিকস্ বা গেলেলীয়ো যে সময়ে নানা প্রকার নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, বা ধর্ম্ম-বিষয়ে মুক্তকণ্ঠতার জন্য

রিড্‌লি বা ল্যাটিমর যে সময়ে জ্বলন্ত অনলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সে সময় আর ইউরোপে নাই, এমন কি, বঙ্গদেশেও রাজা রামমোহন রায়ের সময় নাই—কিন্তু এই বঙ্গদেশে যদি এইরূপ সকল বিষয়ে মুক্তকণ্ঠতার মার্জ্জনা থাকিত, তাহা হইলে কি সুখের, কি সৌভাগ্যের বিষয় হইত! তাহা হইলে চর্ম্মচক্ষু দিয়া লোকে লোকের মন দেখিতে পাইত, হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস মিশিত এবং সকল হৃদয়ই স্বাধীনতার বলে বলীয়ান হইতে পারিত। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে সভ্য ইংরাজেরাই আমাদের একটি বিষয়ে সরল মুক্তকণ্ঠতার বিঘ্ন করিয়াছেন—তাঁহারা এত দিন পরে আবার আমাদের রাজনৈতিক বিষয়ে মুক্তকণ্ঠতার পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়াছেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাদিগের রাজনৈতিক দুঃখ যন্ত্রণা হইলে আমরা রোদন করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু এখন সে রোদনের অধিকার, সে অশ্রুপাতের সান্ত্বনা পর্য্যন্ত আর আমাদের নাই—মর্ম্মদাহ হইলে মর্ম্মের স্তরে স্তরেই সে আগুণ জ্বলিবে, তাহার স্ফুলিঙ্গ মাত্রও আর প্রকাশ পাইতে পারিবে না।

বঙ্গ-সাহিত্য।

আমরা পর্য্যায়ক্রমে বঙ্গ-সাহিত্যের প্রধান প্রধান কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসের কবিতা ও কবিত্ব-শক্তির সমালোচনা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু কোন প্রবাসী বহুদিন পরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে স্বদেশের আজন্ম-পরিচিত জলবায়ুর প্রভাবে যেমন তাহার হৃদয় নাচিয়া উঠে, আজ কবিকঙ্কণের বিষয় লিখিতে আমাদেরও সেইরূপ একটি অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপলব্ধি হইতেছে। এখন যদিও আমরা আর সেই শ্যামল যমুনার মৃদুতরঙ্গ দেখিতে পাইতেছি না, সেই ব্রজাঙ্গনার কণ্ঠস্থ বনফুল-মালার সুরভি-উচ্ছ্বাস উপভোগ করিতে পারিতেছি না, এখন যদিও সেই দুর্জ্জয় দুর্গ বেষ্টিত অযোধ্যার রাজগৌরব আমাদের নেত্রপথ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে ও সরযূর ধীর প্রবাহ দিগন্তে মিশিয়া গিয়াছে, তবুও আমরা নিরানন্দ নহি। এখন আমরা বঙ্গদেশের ভিতরে থাকিয়া ও অজয়-নদের উপকূলে বসিয়া তিন শত বৎসর পূর্ব্বের দেশীয় বাজার বিপনী, দেশীয় গৃহস্থ আশ্রম, দেশীয় আচার ব্যবহার সকলি যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইতেছি। শুদ্ধ তাহা নহে, কবিকঙ্কণের অপূর্ব্ব কবিতা পড়িতে পড়িতে আমরাও যেন কালের উজান প্রবাহে ভাসিয়া গিয়া সেই জনকোলাহলে মিশিতে পারিতেছি, ব্রাহ্মণদিগের বেদপাঠ হইতে মুসলমানদের কোরাণ পাঠ পর্য্যন্ত, গৃহস্থ-বাটীর সতাসতীনের গণ্ডগোল হইতে বাঙ্গাল নাবিকদের রোদন পর্য্যন্ত, হাটবাজারের বেসাতীর ধরণধারণ হইতে সওদাগরীর বিপুল ব্যাপার

পর্য্যন্ত পাঠ করিতে করিতে আমাদের হৃদয় নানাপ্রকার রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। কবিকঙ্কণের লেখনীর কেমন একটি মোহিনী শক্তি আছে, চিত্রকার্য্যে তাঁহার মত রং ফলাইতে অদ্যাবধি আমরা বঙ্গদেশে কোন কবিকেই দেখিতে পাই নাই। তাঁহার ছন্দভঙ্গ দোষ আছে, গ্রাম্যতা দোষ আছে, অতিশয়োক্তি দোষ আছে,এমন কি,দুই একস্থলে কল্পনার ব্যভিচারও আছে বটে, কিন্তু তাঁহার নর-নারী-প্রতিমা-মাত্রেই সজীব, তাহাদের শিরায় শিরায় যেন উষ্ণ শোনিত-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহার বর্ণিত বহির্জগতও প্রকৃত জগতের প্রতিবিম্বস্বরূপ, এবং তাঁহার কল্পনার পরিধি দিগন্তব্যাপী। তিনি প্রাচীন পরম্পরাগত দুইটি গল্প অবলম্বন করিয়া যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহা রামায়ণ ও মহাভারতের মত বঙ্গসাহিত্যের একটি স্তম্ভ-স্বরূপ,বিপুল অথচ বিচিত্র,বজ্রায়স সদৃশ সারবান্ অথচ স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর উদ্দেশ্য ভগবতীর মহিমা কীর্ত্তন ;—কিন্তু কবিকঙ্কনের ভগবতী ঠিক পুরাণের ভগবতী নহেন। পুরাণের ভগবতীর কথা মনে হইলে আমাদের হৃদয়ে ভক্তি-মিশ্রিত ভয়ের সঞ্চার হয়। যিনি সকল দেবতার শক্তি সমন্বিতা ও সকল দেবতার আরাধ্যা, যাঁহার অধিষ্ঠান পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমাচলের শিখরস্থিত কৈলাশপুরিতে এবং যাঁহার আরোহণ পশুশ্রেষ্ঠ কেশরীপৃষ্ঠে, অসুর-উৎপীড়িত দেবতাদের যিনি একমাত্র ভরসা-স্বরূপ ও সমস্ত স্বর্গমণ্ডলের যিনি একমাত্র রক্ষাকর্ত্রী, সে দেবতা কবিকঙ্কণের ভগবতী নহেন। কবিকঙ্কণের ভগবতী কেবল দয়া ও দাক্ষিণ্য, কেবল স্নেহ ও মমতায় গঠিত। এক এক সময়ে তিনি ভক্তের অরাতী-বিনাশ সংকল্প করিয়া পুরাণের চণ্ডীভাব ধারণ করিতে গিয়াছেন বটে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তিনি মনুষ্য মধ্যে মানুষ-জননী হইয়া ভক্তকে হৃদয়ে তুলিয়া লইয়াছেন। পুরাণের ভগবতীর কাছে কেবল ব্রহ্মা বিষ্ণু বাসবেরই বর প্রার্থনা করিতে সাহস হয়, কবিকঙ্কনের ভগবতীর কাছে যেমন তেমন প্রকারে কোন প্রাণীই আব্দার করিতেও সঙ্কুচিত হয় না। পুরাণের ভগবতী তেজোময় দেবতা, কবিকঙ্কনের ভগবতী স্নেহময়ী জননী। ধনপতি সদাগর সিংহলরাজ কর্ত্তৃক সিংহলে কারারুদ্ধ হইয়া আছেন, তাঁহার কোন সংবাদই পাওয়া যাইতেছে না,তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র শ্রীমন্ত পিতৃ-অন্বেষণে বহির্গত হইলেন, খুল্লনা পরম চণ্ডীপরায়ণা, সুতরাং আপন দ্বাদশবর্ষীয় বালকটিকে উদ্দেশে চণ্ডীর হস্তে সমর্পণ করিয়া দিলেন। শ্রীমন্ত শ্রীদুর্গাকে স্মরণ করিয়া বঙ্গদেশ হইতে সিংহল যাত্রা করিলেন। সাগর মধ্যে কালিদহে তিনি কমলেকামিনী দেখিলেন, সিংহলরাজকে গিয়া তিনি কমলে কামিনীর বিবরণ দিলেন, কিন্তু রাজা স্বচক্ষে তাহা দেখিতে আসিলে তিনি কমলে কামিনী দেখাইতে পারিলেন না। রাজা শ্রীমন্তকে প্রতারক ভাবিয়া মশানে তাঁহাকে বধ করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। নিরপরাধী বালক মশানে আপনাকে নিরুপায় দেখিয়া

এবং সম্মুখে খরসান খড়্গ দেখিয়া মাতৃ-উপদেশ অনুসারে বিপদে বিঘ্নবিনাশিনীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। কোথায় সমুদ্র-গর্ভে সিংহল-দ্বীপ, আর কোথায় হিমাচল-শিখরে কৈলাশপুরী, কিন্তু হৃদয়-উচ্ছ্বসিত আরাধনা ভক্তবৎসল দেবতার নিকটে কখনই অরণ্যে রোদন হয় না। সিংহলে শ্রীমন্তের কাতরোক্তি শুনিয়া কৈলাসে ভগবতী উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; প্রিয়সখী পদ্মাকে তিনি ব্যাকুল ভাবে বলিতে লাগিলেন—

——"পদ্মা, আজি দেখি বড় অমঙ্গল,
মুখ হৈতে খসে পান, সচকিত হয় প্রাণ,
আসন করয়ে টল মল।
আইস পদ্মা প্রিয়সখী, খড়ি পেতে দেখ দেখি
মন স্থির নহে কি কারণ,
অধর ভুজঙ্গ নরে, কে মোর স্মরণ করে
গ'ণে ঝাট কর নিরূপণ,
কপালে টনক নড়ে, অঙ্গে ধুতি নাহি পড়ে
স্পন্দন করয়ে ডানি আঁখি,
হেন মনে অনুমানি, কিবা মোর হয় হানি,
আজি বড় অমঙ্গল দেখি॥"

পদ্মা স্বর্গলোক, চন্দ্রলোক, প্রভৃতি চৌদ্দ লোকের বার্ত্তা গণনা করিয়া শেষে ভগবতীকে বলিল "তোমারি ব্রতের দাসী খুল্লনার" পুত্র শ্রীমন্ত সদাগর

"মায়ের বচনে সাধু বাপের কারণ,
বহিত্র সাজিয়া আইল দক্ষিণ পাটন,
কালীদহে দেখে সাধু কামিনী কুঞ্জরে,
বিবাদ করিল গিয়া রাজার গোচরে,
হারিলেক সেই সাধু সাক্ষীর বচনে,
তারে বলি দেয় রাজা দক্ষিণ মশানে,
জীবনে কাতর তব দাসীর নন্দন,
সঙ্কট দেখিয়া করে তোমার স্মরণ॥"

তখন

কোপেতে লোহিত আঁখি, চণ্ডীকা বলেন সখী
শুন পদ্মা আমার বচন,
রাজারে করি সংহার, ছিরায় দিব রাজ্যভার
ঝাট কর সেনার সাজন,
গায়ে আরোপিল টাঙ্গি, তবক বেলক সাঙ্গি
ভুষণ্ডী ডাঙ্গস খরসান,
যমদণ্ড ভিন্দীপাল, টাঙ্গ টাঙ্গী করতাল
অসিপত্র কামান কৃপান।
চণ্ডী কৈল অট্ট হাস, দেবগণে লাগে ত্রাস,
নিনাদে ভরিল ত্রিভুবন,
যেন দৈত্য-রণ কালে, মেলি যত দিকপালে,
দিল তারে নিজ প্রহরণ।
চণ্ডীকার ক্রোধ দেখি, দেবগণ হৈয়া দুঃখী
কোলাহল হৈল সুরপুরে।

তখন দেবরাজ ইন্দ্র নিতান্ত ভীত হইয়া নারদ-মুনিবরকে ভগবতীর কাছে প্রেরণ করিলেন,

"চণ্ডীকারে জিজ্ঞাসা করেন মহামুনি,
কহ গো এমন বেশে কোথায় সাজনি?
তোমার ক্রোধের কালে প্রলয় সমান,
কার তরে হেন বেশে ক'রেছ প্রয়াণ?

ভগবতী সমস্ত বৃত্তান্ত মহামুনিকে বলিলে পর, মুনিবর ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন যে "যে রণসজ্জা দেখিলে ত্রিভুবন কম্পিত হয়, আজ একটি সামান্য মনুষ্য বধ করিতে সেই রণসজ্জা?" নারায়ণী ঈষৎ লজ্জিত হইলেন, এবং মহামুনির উপদেশ মতে

একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণী রূপ ধারণ করিলেন—
জরাধি ব্রাহ্মণী অস্থি চর্ম্ম বিলোচনা,
মায়াকাশ শ্বাস ভ্রমে চপল লোচনা,
বাতে হইল কাঁকলি, জঘন হইল ভেড়ি,
উছাটের ঘায়ে চণ্ডী যান গড়াগড়ি,
বাম কক্ষে নিল মাতা রঙ্গণ চুপড়ি,
সব্য করে নিল মাতা সিদ্ধ বেত্র লড়ি,
করে নিল কুসুম চন্দন দুর্ব্বাধান,
বেদমন্ত্রে শ্রীমন্তেরে করিতে কল্যাণ।"

তাহার পরে মশানে আসিয়া
"কাঁকে ঝুড়ি হাতে লড়ি, উচ্চৈস্বরে বেদ পড়ি
বিনয়ে বলেন ধীরে ধীরে,
করযুত কৃত গর্ব্বা, কুসুম চন্দন দুর্ব্বা,
আরোপিল কোটালের শিরে
কোটাল আইলাম তোমার সন্নিধান,
তুমি বড় ভাগ্যবান, এই হেতু মাগি দান,
ব্রাহ্মণীর করহ সম্মান।
জরাযুত হইল তনু, বসি যে ধরিয়া জানু
ভূমি ধরি উঠি যে যতনে,
হেন জন নাহি কোলে, হাতেতে ধরিয়া তোলে
দোসর সাক্ষাৎ বন্ধু জনে।
নাতিটী হ'য়েছি হারা, দেখিলাম তার পারা
আইলাম তোমার সন্নিধান,
চিনিনু আপন নাতি, কোটাল পাইলে কথি,
বাপের পূন্যেতে কর দান।
শিশুমতি মোর নাতি, নাহি জানে চাতাতি,
নহে খণ্ড বাটপাড় চোর,
শুনহ আমার বানি, ইথে নাহি হবে হানি,
কৃপা করি নাতি দেহ মোর।"

কিন্তু কোটাল রাজাজ্ঞা লঙ্ঘনের ভয়ে বৃদ্ধব্রাহ্মনীর কোন অনুনয়বিনয় শুনিল না। তখন ব্রাহ্মনী সদর্পে হতাশ হৃদয় শ্রীমন্তকে ক্রোড়ে লইয়া মশানে বসিলেন, এবং ভৈরব হুহুঙ্কারে দিক্‌মণ্ডল আলোড়িত করিয়া তুলিলেন। দেবীর হুহুঙ্কার শ্রবনে ডাকিনী দানারা আসিয়া মশান মন্থন করিতে লাগিল, এবং আগত রাজসৈন্যদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিল।—শেষে সিংহলরাজ আপনি যুদ্ধে আসিলেন এবং তিনিও পরাস্ত হইলেন। তখন রাজার যেন দিব্য চক্ষু উন্মীলন হইল এবং তিনি কুঠার গলে বান্ধিয়া যোড়-করে ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। কোমল হৃদয় ভগবতী সদয় হইয়া রাজার মৃত সৈন্যদলের প্রাণ দান পর্য্যন্ত করিলেন। পরিশেষে রাজকন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ দিয়া, শ্রীমন্তের পিতাকে মুক্ত করিয়া স্বীয় সেবিকা খুল্লনার হস্তে সকলকে সমর্পণ করিলেন।

কালকেতুর উপাখ্যানটিও অতিশয় সুন্দর। ভগবতী ভক্ত কালকেতু জাতিতে ব্যাধ বলিয়া পশুপক্ষী শীকার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। কিন্তু তবুও দারিদ্র্য বশতঃ তিনি ও তাঁহার ধর্ম্মশীলা পত্নী ফুল্লরা বিষম কষ্টে দিন যাপন করিতেন। মমতাময়ী ভগবতী তাঁহাদের দুঃখে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া নানা অলঙ্কার পরিয়া ষোড়শী কুলকামিনী রূপে তাঁহাদের কুটীরে আবির্ভূত হইলেন। এবং অনেক ছলনার পর কালকেতুকে গুজরাটের অধিপতি করিয়া দিলেন।

পূর্ব্বে যখন কালকেতু ব্যাধ ছিলেন,

তখন ফুল্লরা সেই মাংস লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইত। সেই বিক্রয়ের কড়ি হইতে সংসার চলিত। কিন্তু বার'মাসে বিক্রয়ের কিরূপ অসুবিধা হইত, ও সমস্ত বৎসর উভয়ের কি রূপ দারিদ্র্য-কষ্ট হইত, ফুল্লরা ভগবতীর নিকটে এই রূপে সেই বার মাসের দুঃখ ও কষ্ট বর্ণনা করিতে লাগিলেন—

বৈশাখে বসন্ত ঋতু খরতর খরা,
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা,
পদ পোড়ে খরতর রবির কিরণে,
শিরে দিতে নাহি আটে খাঁয়ার বসনে,
বৈশাখ হইল বিষ, বৈশাখ হইল বিষ,
মাংস নাহি খায় লোকে করে নিরামিষ।
সুপাপিস্ট জ্যৈষ্ঠ মাস প্রচণ্ড তপন,
রবি-করে করে সর্ব্ব শরীর দাহন,
পসরা এড়িয়া জল খাইতে না পারি,
দেখিতে দেখিতে চীলে করে আধা সারি,
পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস, পাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠমাস,
বঁইচির ফল খায় করি উপবাস।
আষাঢ়ে পূরিল মহী নবমেঘ জল,
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল,
মাংসের পসরা লয়ে ভ্রমি ঘরে ঘরে,
কিছু খুদ কুঁড়া মিলে উদর না পুরে,
বড় অভাগ্য মনে গনি, বড় অভাগ্য মনে গনি
কত শত খায় জোঁক, নাহি খায় ফনি।
শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী
সিতাসিত দুই পক্ষ একই না জানি,
মাংসের পসরা লয়ে ফিরি ঘরে ঘরে;
আচ্ছাদন নাহি গায়ে স্নান বৃষ্টিনীরে,
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
লঘু বৃষ্টি হইল কুঁড়ায় আইসে বাণ।
ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল,
নদনদী একাকার আট দিকে জল,
কত নিবেদিব দুঃখ, কত নিবেদিব দুঃখ,
দরিদ্র হইল স্বামী, বিধাতা বিমুখ।
আশ্বিনে অম্বিকা পুজা করে জগজ্জনে,
ছাগল মহিষ মেষ দিয়া বলিদানে,
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা,
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা,
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে,
দেবীর প্রসাদে মাংস সবাকার ঘরে।
কার্ত্তিক মাসেতে হৈল হিমের জনম,
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ,
নিযুক্ত করিল বিধি সবার কাপড়,
অভাগী ফুল্লরা পরে হরিণের ছড়,
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
জানু, ভানু, কৃশানু, শীতের পরিত্রাণ।
মাস মধ্যে মার্গশীর্ষ নিজে ভগবান,
হাটে মাঠে গৃহে গোঠে সবাকার ধান,
উদর পূরিয়া অন্ন দৈবে দিল যদি,
যমসম শীত তাহে নিরমিল বিধি,
অভাগ্য মনে গনি, অভাগ্য মনে গনি,
পূরানো দোপাটা গায় দিতে টানাটানি।
পৌষেতে প্রবল শীত সুখী সর্ব্বজন,
তুলা তনূনপাৎ তৈল তাম্বূল তপন,
করয়ে সকল লোক শীত নিবারণ,
অভাগী ফুল্লরা মাত্র শীতের ভাজন,
হরিণ বদলে পাই পুরানো খোসালা,
উড়িতে সকল অঙ্গে বরিষয়ে ধূলা,
বৃথা বনিতা জনম, বৃথা বনিতা জনম,
ধূলি ভয়ে নাহি মেলি নয়নে নয়ন।

নিদারুণ মাঘমাস সদাই কুজঝটি,
আন্ধারে লুকায়ে মৃগ নাপায়ে আখেটি,
ফুল্লরার আছে কত কর্ম্মের বিপাক,
মাঘ মাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক,
নিদারুণ মাঘ মাস, নিদারুণ মাঘ মাস,
সর্ব্বজন নিরামিষ কিম্বা উপবাস।
সহজে শীতল ঋতু এ ফাগুণ মাসে,
পীড়িত তপস্বীগণ বসন্ত বাতাসে,
শুন মোর বাণী, শুন মোর বাণী,
কোন্ সুখে আমোদিনী হইবে ব্যাধিনী,
ফাল্গুনে দ্বিগুণ শীত খরতর খরা,
খুদ সেরে বান্ধা দিনু মাটিয়া পাথরা,
কতবা ভুগিব আমি নিজ কর্ম্মফল,
মাটিয়া পাথর বিনা না ছিল সম্বল,
দুঃখ কর অবধান, দুঃখ কর অবধান,
আমানি খাবার গর্ত্ত দেখ বিদ্যমান।
মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ,
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ,
বনিতা পুরুষ দোঁহে পীড়িত মদনে,
ফুল্লরার অঙ্গ পোড়ে উদর দহনে,
দারুণ দৈব দোষে, দারুণ দৈব দোষে,
একত্র শয়নে স্বামী যেন যোল কোশে॥

বাস্তবিক এই বর্ণনাটীর মত কৌশলময়ী রচনা, এমন অল্প কথায় এত প্রকার ভাব বিন্যাস আমারা বঙ্গসাহিত্যে কোথাও আর পাই নাই। কবিকঙ্কণের কল্পনা-সমুদ্র কেবল ভাব-তরঙ্গময়, ইদানীন্তন কবিদের কল্পনা প্রায়ই কেবল শব্দফেণময়। আমরা উদাহরণ স্বরূপ এখনকার এক জন সুপ্রসিদ্ধ কবির একটী বর্ণনার সঙ্গে কবিকঙ্কণের একটী বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিব। সেই সুপ্রসিদ্ধ কবি একটী মায়াকানন এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

মোহিনী মোহকর মহীরুহ রাজি
প্রকাশিল সুন্দর কিসলয়ে সাজি।
ধাবিল সমীরণ মলয় সুগন্ধি;
চুম্বনে ঘন ঘন কুসুম আনন্দি।
কাঁপিল ঝর ঝর তরুশিরে সাধে,
শিহরিত পল্লব মর মর নাদে।
হাসিল ফুলকুল মঞ্জুল মঞ্জুল,
মোদিত মৃদুবাসে উপবন ফুল্ল।
কোকিল হরষিল কুহুরবে কুঞ্জ;
শোভিল সরোবরে সরোজিনী পুঞ্জ।
নাচিল চিতসুখে ময়ূর কুরঙ্গ;
গুঞ্জরে ঘন ঘন মধুপানে ভৃঙ্গ।
সুন্দর শতদল প্রিয়তর আভা;
সুবয় অরধ অরধ শশী শোভা;
শোভিল সুতরুণ স্থল জল অঙ্গে;
বিরচিলা হ্লাদিনী মায়াবন রঙ্গে।

কিন্তু কবিকঙ্কণ কালীদহের উদ্যানটী এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

শুন কর্ণধার ভায়া, দেখরে সকল নেয়া,
মনোহর কমল উদ্যান।
ধন্য সিংহলের রাজা, কিবা করে শিব পূজা,
কিবা পূজা করে ভগবান।
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, শতদল বিকসিত,
কহ্লার কুমুদ কোকনদ।
হেন মোর হয় জ্ঞান, দেবতার এ উদ্যান,
দেখি বহু কুসুম-সম্পদ॥
নাহি জানি কিবা হেতু, এককালে ছয় ঋতু,
গ্রীষ্ম হিম শিশির বসন্ত।

সঙ্গে মকরকেতু, বরষা শরৎ ঋতু,
বিরহী জনেরে করে অন্ত ॥
রাজ-হংস করে কেলি, কৌতুকে মৃণাল তুলি,
প্রিয়মুখে করে আরোপন।
চঞ্চু পুটে বিন্ধে মাছে, সারস সারসী নাচে,
উড়ে বৈসে খঞ্জনী খঞ্জন ॥
ডাহুক ডাহুকী ডাকে, চক্রবাকী চক্রবাকে,
বদনে বদনে আলিঙ্গন।
সঙ্গে চারি পাঁচ জানি, তাণ্ডব করয়ে কামী,
মন্দ মন্দ মেঘের গর্জ্জন ॥
হেন লয় মোর মতি, দেবতার এই কীর্ত্তি,
অপরূপ দেখি কালীদহে।
কণক কুমুদ ফুটে, কান্তি কারু নাহি টুটে,
চিত্র গন্ধ লয়ে বায়ু বহে।

এখন, সহৃদয় পাঠক মাত্রকেই জিজ্ঞাস্য এই যে এই দুইটি বর্ণনার কোনটি পড়িলে সমস্ত শরীর পুলকিত ও হৃদয় মুগ্ধ হয়।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

দুঃখিনী। প্রথম খণ্ড। শ্রীহরিশচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা বি, পি, এম্‌স্ যন্ত্রে মুদ্রিত। শকাব্দা ১৮০০।

ইহা একখানি পদ্যগ্রন্থ। একদা কোন মেঘাচ্ছন্ন অমানিশাতে পথভ্রান্ত হইয়া পথিক একটী বনের ভিতর উপস্থিত হন। তিনি সেই কাননের ভীষণ ভাব ও বজ্রের গম্ভীর নিনাদে ভীত হইয়া বনদেবীকে স্মরণ করেন। পরে বনদেবী তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিলে—তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। এমন সময়ে বিদ্যুতালোকে বন উজ্জ্বলিত হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন একটী রমণী অচেতন হইয়া ভূমে পতিত আছেন। পথিক অনেক যত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে জানিতে পারিলেন তিনি ভারত-জননী। এই বিপদের সময় সম্মুখে আত্মীয় জন দেখিয়া ভারত-জননীর শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল—তিনি পথিককে আপনার দুঃখের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বাল্মীকির জন্য শোক করিলেন—ব্যাসদেবের জন্য শোক করিলেন—মৃত সকল সন্তানের জন্যই শোক প্রকাশ করিলেন, অধিক কি

আয় রে ক্ষেত্রমোহন এ বঙ্গ ভবনে;
কলে পাথাটানা, আর কল ময়দার—
কে সৃজিবে এবে ?

বলিয়া দুঃখ করিতে ক্রুটী করিলেন না। যাহা হউক, এ পুস্তক খানির ভাষা প্রাঞ্জল এবং স্থানে স্থানে ভাবও সুন্দর বটে। হরিশ বাবু যত্ন করিয়া লিখিলে এক জন মন্দ কবি হইবেন না।

বারইয়ারি পূজা—প্রহসন—জনৈক পাণ্ডা কর্ত্তৃক প্রণীত। কলিকাতা গণেশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ আনা।

পল্লীগ্রামে বারইয়ারী পূজা যেরূপ

কুৎসিত নিয়মে সম্পন্ন হয় এবং "পাণ্ডাগণ" সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া যে সকল ঘৃণিত কার্য্য করিয়া থাকেন—তাহাই অবলম্বন করিয়া পুস্তক খানি লিখিত হইয়াছে। এই ঘৃণিত পদ্ধতি যতই আমাদের দেশ হইতে উঠিয়া যায় ততই দেশের মঙ্গল।

সভ্যতা সোপান। দৃশ্য সমাজ চিত্র। প্রজাহিতাকাঙ্ক্ষিনা কেনচিদ্বাঙ্কবেন প্রণীতম। কলিকাতা গুপ্ত প্রেস। মূল্য চারি আনা।

বাঙ্গালীগণ পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে গিয়া—তাহার দোষ গুলি শিখিয়া লন এবং তাহা হইতে যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হয় গ্রন্থকার তাহাই চিত্রিত করিয়াছেন। টামস গ্রউটের চরিত্রটী সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে।

কল্পদ্রুম। মাসিক পত্র। শ্রীদ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ১২৮৫ সাল ভাদ্রমাস।

এই মাসিক পত্রের এই খানিই প্রথম সংখ্যা,—সম্পাদক মুখবন্ধে বলিয়াছেন "পতিত মনুষ্যগণকে পরিত্রাণ করিবার জন্য ঈশ্বরকেও মর্ত্তভূমে আসিতে হইয়াছিল, এক্ষণে আবার সেই মনুষ্যের উপকারার্থে কল্পতরুকে স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে হইতেছে"—আমরাও ব্যাকরণের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া "আগচ্ছ বরদে দেবি" বলিয়া কল্পদ্রুমকে কৃতাঞ্জলিপুটে আহ্বান করিতেছি। মর্ত্তলোকের আব্ হাওয়া স্বর্গের গাছ গাছড়ার পক্ষে নিতান্ত শুভকর না হইলেও, পণ্ডিতবর বিদ্যাভূষণের যত্নে যে কল্পদ্রুম অমৃত ফল প্রসব করিবে তাহা আমাদের ভরসা আছে।

প্রকৃতি-রঞ্জন। মাসিক পত্র। মাহবৈশাখ। রাজকীয় যন্ত্রে মুদ্রিত।

এখানি এক খানি সুন্দর মাসিক পত্র। প্রকৃতিক "অশিক্ষিত বা সামান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বোধগম্য" এমন পরিপাটী এক খানি মাসিক পত্রের এত দিন অভাব ছিল। 'প্রকৃতিরঞ্জন' সে অভাব দূর করিয়াছে। ইহার প্রবন্ধগুলি যেমন সরল ভাষায় লিখিত, তেমনি হৃদয়-গ্রাহী।

ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

পূর্ব্ব সংখ্যার ভারতীতে আমরা "বল যার অধিকার তার" এই নিয়মটির বিষয় আলোচনা করিয়াছি—এক্ষণে লেখক মহাশয় ভারতবর্ষীয়দিগের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ পক্ষে যে সকল অবশ্য-পালনীয় নিয়মের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তিনি বলেন—বাণিজ্য, শিল্প, রাজনৈতিক ভাব (Political spirit) ও বিজ্ঞান—এই গুলিই ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষ অভাব — রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের এই গুলিই মুখ্য নিয়ম ও সাধন —এই গুলিই আমাদের সকল রোগের মহৌষধি।

কিন্তু প্রথমেই এই প্রশ্ন উঠিতে পারে, ভারতবর্ষীয়দিগকে একটি সমগ্র জাতি বলা যায় কি না? ভারতবর্ষীয় বলিলে ভারতবর্ষবাসী মুসলমান ও খৃষ্টান পর্য্যন্ত তাহার অন্তর্ভুক্ত হয় কি না? যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া শুদ্ধ হিন্দুজাতিকেই ধরা যায়—তাহা হইলেও এক্ষণে হিন্দুগণের যেরূপ অবস্থা, তাহাদিগকে কি এক জাতি বলিয়া মনে হয়? যে জাতির মধ্যে একতা-সূত্রে নিবদ্ধ হইয়াছে—যাহারা সকলে এক ভাবে, এক উৎসাহে উত্তেজিত হয়—যে জাতির মধ্যে এক জনের বিপদ উপস্থিত হইলে সাধারণ-বিপদ বলিয়া সকলে মনে করে, সেই জাতির জাতীয়তার প্রকৃত ভিত্তিস্তন-ভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বলিতে হইবে —যতক্ষণ তাহা না হইবে ততক্ষণ সে জাতি জাতি-নামের যোগ্য নহে। সমস্ত হিন্দুজাতির মধ্যে এখন একতা নাই—এখন হিন্দুজাতিকে একটি সমগ্র জাতি বলিয়াই যেন বোধ হয় না। লৌকিক আচার ব্যবহার ভাষা প্রভৃতিতে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ প্রত্যেক প্রদেশ হইতে ভিন্ন। এক্ষণে পঞ্জাবি, হিন্দুস্থানী, বাঙ্গালী, মান্দ্রাজি, মহারাষ্ট্রী প্রত্যেককেই এক একটি স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া বোধ হয়। যত দিন না এই বিভিন্ন জাতিদিগের মধ্যে বিজাতীয় বৈষম্যগুলি দূরীকৃত হইয়া একতা-সূত্রে নিবদ্ধ হইবে, ততদিন আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত হইব না, স্বাধীনতার অধিকারী হইব না, ততদিন আমাদিগের স্বাধীনতার আশা দুরাশা মাত্র। এই একতার অভাবেই আমরা স্বাধীনতা হারাইয়াছি,এবং পৃথিবীর অনেক জাতিই এই একতার অভাবেই স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হইয়াছে। অতএব সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একতার অভাবই প্রধান অভাব। এই একতা-সাধন পক্ষে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি যে অতীব কার্য্যকারী তাহাতে সন্দেহ নাই—কোন জাতির মধ্যে বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যের রীতিমত উৎকর্ষ সাধন হইলে, সে জাতির মধ্যে শুধু যে একতার সুবিধা হয় তাহা নহে, কিন্তু একত্র

হইয়া সাধারণ স্বার্থ রক্ষার্থ কি করিয়া কার্য্য করিতে হয়, কি করিয়া কার্য্যে সফলতা লাভ করা যায়—তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বন করিবারও ক্ষমতা জন্মে।

সহস্র বৎসর দাসত্ব-ভারে প্রপীড়িত হইয়া স্বাধীনতার স্বাভাবিক ভাব—স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি—স্বাভাবিক স্পৃহা আমরা হারাইয়াছি। আমরা হৃদয়ের দ্বারা এক্ষণে স্বাধীনতার আস্বাদ পাই না—এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা স্বাধীনতার উপকারিতা ও আবশ্যকতা আমাদিগকে বুঝিতে হইতেছে। হৃদয়ের স্বাভাবিক উত্তেজনায় এক্ষণে আমরা একত্র হইতে পারি না—এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা একতার উপকারিতা বুঝিয়া তবে আমাদিগকে ঐক্য-সাধনে চেষ্টা করিতে হয়। অতএব একতা-সাধন পক্ষে এক্ষণে জ্ঞানানুশীলন যে সর্ব্ব প্রথমে প্রয়োজন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

মনুষ্য-প্রকৃতিতে বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের, জ্ঞানের সহিত ভাবের একটি স্বাভাবিক যোগ আছে। ইহারা পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করে। আমরা যদি প্রথমে জ্ঞানের কথায় কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হই—আর যদি পুনঃ পুনঃ সেই কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে থাকি—ক্রমে তাহা আমাদিগের ভাবের সহিত মিশ্রিত, হৃদয়ের সহিত জড়িত হইয়া যায়—ইহাই মানব-প্রকৃতির নিয়ম। আমরা যদি এক্ষণে জ্ঞান দ্বারা একতার উপকারিতা বুঝিয়া তাহার সাধনায় প্রবৃত্ত হই—ক্রমে আমরা ভাব দ্বারা চালিত হইয়া একত্র হইতে সমর্থ হইব। আমরা ভাবের সহজ পথ হারাইয়াছি—এক্ষণে আমাদিগকে দুরূহ জ্ঞানের পথ দিয়া ভাবের পথে উপনীত হইতে হইবে। সাধারণ জ্ঞানানুশীলন ও শিক্ষা এই জন্য নিতান্ত আবশ্যক। উচ্চতর বিজ্ঞান-চর্চ্চাও যে একতা-সাধনের বিলক্ষণ সহায়তা করে, বিজ্ঞান-প্রসূত বাষ্পীয় শকট, তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি তাহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তাহাদিগের সাহায্যে ভারতবর্ষের দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকলের মধ্যে পরস্পর যাতায়াত কেমন সহজ হইয়া পড়িয়াছে—বাণিজ্য-ব্যাপারের কেমন সুগমতা হইয়াছে—এই রূপে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশীয় জাতিদিগের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময় ও ভাবের বিনিময় দ্বারা একতার পথ কেমন অল্পে অল্পে উন্মুক্ত হইতেছে। তবে, এই সকল বাষ্পীয় শকট, তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি যদি আবার আমাদিগের স্বজাতীয় বিজ্ঞান চর্চ্চার ফল হইত—যদি স্বজাতীয় ধনে ও স্বজাতীয় চেষ্টায় ঐ সকল ব্যাপার আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে আর আমাদের সুখের সীমা থাকিত না—তাহা হইলে আমাদের উদ্দেশ্য আরও সফল হইত—দেশের শ্রী সৌভাগ্য আরও বর্দ্ধিত হইত—ভারতবর্ষের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইত। এক্ষণে "পর দীপ-মালা নগরে নগরে, তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে।" অতএব বিজ্ঞান-চর্চ্চা যে জাতীয় উন্নতির প্রধান সোপান ও রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা লাভের বিশিষ্ট উপায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই একতা-সাধনের পক্ষে আমাদের

দেশে অনেক গুলি বাধা আছে এবং আরও নূতন নূতন বাধা উপস্থিত হইতেছে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণের মধ্যে অন্য বিষয়ে যতই কেন বিভিন্নতা থাকুক না, তাহাদিগের ধর্ম্ম এক ছিল। হিন্দুধর্ম্ম হইতে নানা সম্প্রদায় উত্থিত হইয়াছিল বটে—কিন্তু সে সমুদায় হিন্দুধর্ম্মের শাখা-প্রশাখা বলিয়া পরিগণিত। বৌদ্ধধর্ম্ম যদিও হিন্দুধর্ম্ম হইতে প্রসূত, তথাপি হিন্দুধর্ম্মের অব্যবহিত অধীনতা স্বীকার না করায় উহা ভারতবর্ষে বহুদিন তিষ্ঠিতে পারে নাই। আমাদিগের সনাতন ধর্ম্মদর্পণে যে উপধর্ম্ম-মলা পড়িয়াছে, তাহা মার্জ্জিত করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের বিশুদ্ধতা সম্পাদন কর তাহাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু নিরর্থক কোন নূতন ধর্ম্ম আনিয়া একতার বিঘ্ন সাধন করা স্বদেশবৎসলদিগের পক্ষে যুক্তিসিদ্ধ নহে। সেই জন্য এক্ষণে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মকে একটি নূতন বিজাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত সন্দেহ নাই। ভাষার বিভিন্নতা আর একটি একতার ব্যাঘাত—কিন্তু ইহাকে আমরা তত গুরুতর বলিয়া মনে করি না—কেন না, হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহারতঃ সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা হইয়া পড়িয়াছে। কি বাঙ্গালী—কি বোম্বাইবাসী—কি মান্দ্রাজি—প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা থাকিলেও সাধারণ হিন্দুস্থানী ভাষায় ইহাঁদের পরস্পরের মধ্যে অনায়াসে কথোপকথন চলিতে পারে। তবে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে সাধারণের মধ্যে হিন্দুস্থানী ভাষার যাহাতে আরও অধিক চালনা ও শিক্ষা হয় তৎপ্রতি দেশহিতৈষী মাত্রেরই যত্ন করা বিশেষ আবশ্যক। এক কথায়—আচার ব্যবহারে, ভাবে, ধর্ম্মে, জ্ঞানে যতই ভারতবর্ষ একতার দিকে অগ্রসর হইবে, ততই হিন্দুগণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবে।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পক্ষে আমাদিগের দুই প্রকার অভাব আছে। সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ অভাব এবং ভারতবর্ষের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক প্রদেশের বিশেষ বিশেষ অভাব। সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ অভাবের মধ্যে একতার অভাব দেদীপ্যমান—এবং বিজ্ঞান ধর্ম্ম শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি এই একতা-সম্পাদনের বিশিষ্ট উপায়—সুতরাং এ সকলও সমস্ত ভারতবর্ষের সাধারণ অভাবের মধ্যে ধর্ত্তব্য—এবং এই সকল অভাব মোচনার্থ ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশকেই সাধারণরূপে মনোযোগ দিতে হইবে—কিন্তু এই সাধারণ অভাব ব্যতীত প্রত্যেক প্রদেশের আবার বিশেষ বিশেষ অভাব আছে—যে প্রদেশের যে বিশেষ অভাব তৎ-মোচনার্থ সেই প্রদেশবাসীদিগের বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ আবশ্যক। পঞ্জাবীদিগের শরীরে বল আছে, মনের তেজ আছে—হয়তো জ্ঞানের অভাবই তাহাদিগের মুখ্য অভাব। বোম্বাইবাসীদিগের মধ্যে বাণিজ্য-ব্যবসায়ের তেমন অভাব নাই—হয়তো মানসিক তেজের অভাব। হিন্দুস্থানীদিগের শারীরিক বলের অভাব নাই, হয়তো বুদ্ধির অভাব। বাঙ্গালী-

দিগের বুদ্ধির অভাব নাই—তাহাদিগের শারীরিক বল সাহস ও একতার নিতান্ত অভাব। এই রূপ প্রত্যেক জাতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অভাব, এবং এই সকল অভাব মোচনার্থ প্রত্যেক জাতির বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ আবশ্যক। অন্যান্য প্রদেশের কি কি বিশেষ অভাব তাহা আমরা নিশ্চয় রূপে অবগত নহি—বঙ্গদেশের যে বিশেষ অভাব, প্রথমে তাহার আলোচনায় আমরা প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা বলবতী হইয়াছে —এই স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবার জন্য প্রথমেই কি আবশ্যক? অন্য ভারতবাসীদিগের পক্ষে যাহাই হউক, বাঙ্গালীদিগের মুখ্য ও বিশেষ অভাব কি? রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের মুখ্য ও প্রথম সাধন কি?

কে না জানে, বাঙ্গালীজাতি শরীরের দুর্ব্বলতা ও ভীরুতার জন্য জগদ্বিখ্যাত। শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ভীরুতাই বাঙ্গালি জাতির কলঙ্ক। এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা হইতে চরিত্রের আর যে সকল দোষ স্বভাবতই প্রসূত হইতে পারে, তাহার সমস্তই বাঙ্গালী জাতিতে বর্ত্তিয়াছে। আলস্য,জড়তা, নিরুৎসাহ, অনুদারতা, ক্ষুদ্রতা, বৃথা-অভিমান প্রভৃতি শারীরিক দুর্ব্বলতার যে সকল অবশ্যম্ভাবী ফল, তাহা বাঙ্গালী জাতির মধ্যে বিলক্ষণ দৃষ্ট হয়। অতএব এই অভাবটি যত দিন না মোচন হইবে ততদিন বাঙ্গালী জাতির কোন আশা নাই। এই অভাব মোচন না হইলে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বিজ্ঞান চর্চ্চাই হউক—বাণিজ্য শিল্পের অনুশীলনই হউক বা রাজনৈতিক উদ্যমের পরিচয় দিয়া (Political spirit) সভায় বক্তৃতারই ধূমধাম হউক, বাঙ্গালীর প্রকৃত অভাব কিছুতেই ঘুচিবে না—তাহারা কখনই প্রবল জাতিদিগের মধ্যে গণ্য হইবে না—তাহারা কখনই রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হইবে না। এক্ষণে শারীরিক উন্নতির উপর আমাদিগের সকল উন্নতি নির্ভর করিতেছে। শরীর দুর্ব্বল হইলে —কি বিজ্ঞান, কি বাণিজ্য, কিছুতেই সম্যক্ রূপে উৎকর্ষ লাভ করা যায় না। মাড়োয়ারিরা বাণিজ্য-ব্যাপারে যেরূপ শারীরিক কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করে, তাহা কি দুর্ব্বল বাঙ্গালীর সাধ্য?—সাধ্য নাই বলিয়া কেঁয়ে মাড়োয়ারিরা বাঙ্গালার সকল বিপণীতেই বাণিজ্য-ব্যাপারে বাঙ্গালীদিগকে অতিক্রম করিয়া তাহাদিগের স্থান ক্রমে ক্রমে অধিকার করিতেছে। বিজ্ঞানের কথা যদি বল —এত দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে তো বিজ্ঞানের আলোচনা হইতেছে—কৈ তাহা হইতে স্থায়ী ফল কি ফলিয়াছে? স্থায়ী ফল ফলিতেছে না কেন, তাহার কারণ কোন পূর্ব্ব সংখ্যার ভারতীতে যেরূপ চিত্রবৎ বিবৃত হইয়াছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবে। "খর্ব্বকায় রুগ্ন শীর্ণ কতকগুলি লোকের কাছে কত দূর আশা করা যায়? শারীরিক বলের অভাবে তাহাদের মনের মহত্ত্ব জন্মিবে কোথা হইতে? তাহারা অত্যাচারে,অভাবে,শিশু ও অবলার ন্যায় ক্রন্দন করিতে পারে, পুরুষের মত,

বীরের মত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পারে না। আধ ঘণ্টা কঠিন বিষয় চিন্তা করিলে মাথা ঘুরিয়া যাইবে, দুই চারিটি চিন্তা-সাধ্য পুস্তক লিখিলে মাথার পীড়া হইবে। তবে এখন নূতন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার করিবে কি করিয়া? যাঁহারা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত, তাঁহারা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানান্বেষণে ব্যস্ত থাকেন, কত রাত্রি নিদ্রাহীন নেত্রে তারকার দিকে চাহিয়া থাকেন, কত দিবস আহার ত্যাগ করিয়া সূর্য্যগ্রহণের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এ সকল কি আমাদের দৃষ্টি-অভাবে চসমা-চক্ষু, রাত্রি-জাগরণে অজীর্ণ রোগী, বিশ্রাম-অভাবে রুগ্ন দেহ, বায়ুর দোষে শীর্ণ-ধাতু বি এ এমের কর্ম্ম?"—যদি তর্কের খাতিরেও আপাতত স্বীকার করা যায় যে, জ্ঞানানুশীলন শারীরিক বলের উপর নির্ভর করে না, তথাপি ইহা কে স্বীকার করিবে যে বিনা শারীরিক বলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত বা রক্ষিত হইতে পারে? রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ পক্ষে বাহুবল অর্জ্জনই প্রথম সাধন। শারীরিক বলই রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রথম পত্তন-ভূমি। তবে, বাহুবল ও জ্ঞানবলের মধ্যে জ্ঞানবল যে উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, বাহুবলের সীমা আছে, জ্ঞানবলের সীমা নাই। এখনকার যুদ্ধ-বিগ্রহে বাহুবলের অপেক্ষা জ্ঞানবলের উপরেই অনেকটা জয়-পরাজয় নির্ভর করে সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া এক্ষণে বাহুবলের প্রয়োজন যে একেবারে চলিয়া গিয়াছে তাহা নহে—বরং দুই পক্ষের মধ্যেই যদি জ্ঞানবল সমান থাকে—এবং উহার এক পক্ষে বাহুবলের আধিক্য থাকে, তাহা হইলে সে স্থলে যে পক্ষে বাহুবলের আধিক্য, সে পক্ষ যে জয় লাভ করিবে তাহা এক প্রকার নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে। অতএব বিজ্ঞান-অনুশীলনই কি বাঙ্গালীর পক্ষে যথেষ্ট?—বিজ্ঞান হইতে আমরা বন্দুক লাভ করিতে পারি বটে, কিন্তু সেই বন্দুক ঘাড়ে করিয়া ১০। ২০ ক্রোশ অবিশ্রান্ত অগ্রসর হইয়া ভীষণ বিপক্ষ, সৈন্যের সম্মুখবর্ত্তী হওয়া কি শারীরিক বল ও সাহসের কর্ম্ম নহে? লেখক মহাশয় তো এক স্থলে আপনিই বলিয়াছেন যে—"Nay history proves more—It proves that even if the conquering race occupy an inferior scale of civilization, even if it be destitute of those arts and sciences which are generally recognized as the inevitable concommitants of a civilized life and have no other qualities to recommend itself but manly courage, abounding energy and undisguised frankness, its hammering down the tottering remnants of a highly civilized but exceedingly corrupt nation is of rare service to humanity as a whole. It is hardly necessary to allude to those whom we mean. We mean of course the Franks, the Goths

and the Vandals." অতএব তিনি এই স্থলে আপনিই প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পক্ষে বিজ্ঞান শিল্পই মুখ্য সাধন নহে—এবং ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য-স্থল। কিন্তু তিনি আর এক স্থলে বিজ্ঞানকে স্বাধীনতা লাভের মুখ্য সাধন বলিতেছেন—"Thus science—that which our present wise and benevolent Ruler has already proposed seems to be the chief remedy—yea the panacea to say to all the frightful maladies which our dear country is so intensoly suffering from. Following his advice, let us direct our efforts to a thorough cultivation and as much as possible to a wide 'diffusion of Science. It is Science,it is 'Culture' in the German sense of that word that should now engage our best energies, inorder that we may in due time reap its golden fruits which are:—National Prosperity, National Liberty, and as the full mature outcome of all, a free vigorous and noble National Literature."—অতএব উদ্ধৃত দুই স্থল যে পরস্পর বিরোধী তাহা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইতেছে। এবং লেখক মহাশয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের যে সকল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার মধ্যে শারীরিক বল ও সাহস এবং ধৈর্য্য বীর্য্য প্রভৃতি বীর-ধর্ম্মকে একেবারেই ধরেন নাই বলিয়াই এই বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। আমরা বলি—সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ পক্ষে বিজ্ঞান ও বাহুবল উভয়ই আবশ্যক। ফ্রাঙ্ক, ভাণ্ডাল, গথ প্রভৃতি বিজ্ঞান-শিল্প-বিহীন অসভ্যেরা যদি কেবল পৌরুষ সাহস, অপরিমিত উদ্যম এবং অপ্রচ্ছন্ন সরলতার বলে জগদ্বিজয়ী রোমকদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়া থাকে, তবে বাঙ্গালিজাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য কি বিজ্ঞান শিল্পই বিশিষ্ট উপায়—মুখ্য সাধন—সকল রোগের মহৌষধি? যদি জগদ্বিজয়ী রোমকদিগের স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে পৌরুষ সাহস প্রভৃতিই নিতান্ত আবশ্যক হয় এবং সেই সকল গুণের অভাবই তাহাদিগের পতনের কারণ হয়, তাহা হইলে চির দাসত্ব পীড়িত হীনবল ভীরু বাঙ্গালি জাতির পক্ষে কি ঐ সকল গুণের অর্জ্জন-চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে আরও প্রয়োজন নহে? বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যকে আমরা অনাদর করিতে বলিতেছি না—অনাদর করা দূরে থাকুক, বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যকে আমাদের সভ্যতা ও উন্নতির প্রধান সোপান বলিয়া মনে করি। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, কেবলমাত্র বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যের বলে কোন জাতি এপর্য্যন্ত স্বকীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই।

স্বাধীনতা লাভের পক্ষে এখন শারীরিক বল ও সাহসের নিতান্ত প্রয়োজন। লেখক

মহাশয় লর্ড লিটনকে এই জন্য সাধুবাদ দিয়াছেন যে, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণের দিন এই মর্ম্মে বক্তৃতা করেন যে, হিন্দুদিগের শিক্ষা ও উন্নতির পক্ষে বিজ্ঞান যেমন উপকারী, এমন আর কিছুই নহে। কিন্তু আমরা বলি, লর্ড লিটন মুখে মাত্র এই বক্তৃতা করিয়া যত না আমাদিগের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন, তদপেক্ষা আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব লেফটেনেণ্ট গভর্ণর ক্যাম্বেল সাহেব বিদ্যার্থীদিগের জন্য ব্যায়ামচর্চ্চা ও কর্ম্মার্থীদিগের জন্য অশ্বারোহণ শিক্ষার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়া আমাদিগের অধিক কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে জ্ঞানানুশীলনে যেরূপ সকলে মনোযোগী হইতেছেন, শারীরিক বল, সাহস, উদ্যম, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণসকল যে উপায়ে বাঙ্গালিরা অর্জ্জন করিতে পারে, তাহারও প্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া শিক্ষিত বঙ্গবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ধৈর্য্য বীর্য্য দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণসকল যে অনেক পরিমাণে শারীরিক বলের উপর নির্ভর করে তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। যদিও কেবল সুশিক্ষার প্রভাবেই অনেক সময় আমাদিগের কর্ত্তব্য-বোধ ও অন্যান্য উচ্চতর স্পৃহা মনে উদ্বোধিত হইয়া আমাদিগকে পুরুষোচিত মহৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে শারীরিক বল আমাদিগের সহায় না থাকিলে আমরা সেই সকল কার্য্যে আশানুরূপ ফল লাভে সমর্থ হই না, আমাদিগের উচ্চ স্পৃহা সকলকে কার্য্যে সম্যক্‌রূপে পরিণত করিতে পারি না। শিক্ষিত বঙ্গবাসীগণ অনেক সময় "বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া" করিয়া জগতের সমক্ষে যে হাস্যাস্পদ হয়েন তাহার কারণ কি?—কারণ আর কিছুই নহে—শিক্ষার প্রভাবে আমাদিগের মনে নানা প্রকার উচ্চ স্পৃহা উদিত হয়—কর্ত্তব্য-বুদ্ধি দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সেই সকল স্পৃহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আমরা অনেক বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করি কিন্তু কার্য্যকালে আমাদের স্বাভাবিক দৈহিক দুর্ব্বলতা-প্রসূত জড়তা আসিয়া আমাদিগকে সেই সকল অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিতে দেয় না—কিম্বা সমাপ্ত হইলেও তাহাদিগকে স্থায়ী করিতে দেয় না।

এক্ষণে বঙ্গবাসীগণ কি উপায়ে শারীরিক বল ও সাহস সঞ্চয় করিবেন ভাবিতে গেলে নিরাশ হইতে হয়। আমাদের দেশের জল-বায়ু, ভূমি ও ভৌগোলিক সংস্থান সকলই শারীরিক বলের বিরোধী—মন্‌টেস্‌কু হইতে আরম্ভ করিয়া বকল ও টেন পর্য্যন্ত সকলেই জাতীয় চরিত্রের উপর বাহ্য প্রকৃতির কত দূর প্রভাব তাহার ব্যাখ্যা করিয়া আসিয়াছেন—এই বাহ্য প্রকৃতির প্রভাব ভাবিতে গেলে বাঙ্গালীরা যে কোন কালে বীর-জাতি হইবে এরূপ আশা মন হইতে একেবারে দূর করিতে হয়। কিন্তু বাহ্য প্রকৃতিকেও জয় করিতে পারে এরূপ আর একটি প্রবলতর শক্তি মনুষ্যের অন্তরে নিহিত আছে—সেটি মনের শক্তি—

ইচ্ছার শক্তি—অধ্যবসায়ের শক্তি—এই শক্তির প্রভাবেই মনুষ্যগণ বাহ্য প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতের কঠোর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাহার মধ্যেও সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইয়াছে—নীরস মরুভূমিকেও প্রফুল্ল উদ্যানে পরিণত করিতে পারিয়াছে—অপার সাগরকেও আয়ত্তের মধ্যে আনিতে সক্ষম হইয়াছে। আমরা যখন জ্ঞান দ্বারা বুঝিয়াছি যে, শরীরের দুর্ব্বলতাই আমাদিগের জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ—তখন যদি আমরা ইচ্ছাকে বলবতী করিয়া অধ্যবসায়-সহকারে—যে সকল সামাজিক প্রথা আমাদের শরীরের বল-নাশক, সেই সকল সামাজিক প্রথাকে উন্মূলিত করিয়া—স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন ও ব্যায়াম চর্চ্চা প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিয়া শারীরিক বলের সাধনা করি—তাহা হইলে কি আমরা জল বায়ু ভূমি প্রভৃতির প্রাকৃতিক প্রভাবকে কিয়ৎপরিমাণে অতিক্রম করিতে পারি না?—বকল্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জাতীয় চরিত্রের উপর জল্ বায়ুর প্রভাব যত দূর প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ততদূর বাস্তবিক কিনা তাহা অধুনাতন কোন কোন চিন্তাশীল লেখক সন্দেহ করিয়া থাকেন। বিখ্যাত লেখক Bagehot তাঁহার 'Physics and Politics" গ্রন্থের ১৮৩ পৃষ্ঠায় বলেন, "Climate and physical surroundings, in the largest sense, have unquestionably much influence; they are one factor in the cause, but they are not the only factor; for we find most dissimilar races of men living in the same climate, and affected by the same sarroundings; and we have every reason to believe that those unlike races have so lived as neighbours for ages." প্রসিদ্ধ জাতিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত Wallace সাহেব বলেন Papuan ও Malay জাতি একই গ্রীষ্ম-প্রধান প্রদেশে যুগ-যুগান্তর হইতে পাশাপাশি রহিয়াছে অথচ তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রকার বিভিন্নতা বিদ্যমান। তাঁহার গবেষণায় আরও প্রকাশ পায় যে, জন্তুদিগের পক্ষেও প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভাব, সকল স্থানে ও সকল অবস্থায় বলবৎ নহে। তিনি বলেন—"Borneo closely resembles New Guinea, not only in its vast size and freedom from volcanoes but in its variety of geological structure, its uniformity of climate, and the general aspect of the forest-vegetation that clothes its surface. The Moluccas are the counterpart of the Philippines in their volcanic structure, their extreme fertility, their luxuriant forests, and their frequent earthquaqes; and Bali, with the east end of Java, has a climate almost as arid as that of Timor. Yet between these corresponding groups of islands, con-

structed, as it were, after the same patern, subjected to the same climate, and bathed by the same oceans, there exists the greatest possible contrast, when we compare their animal productions. Nowhere does the ancient doctrine—that differences or similarities in the various forms of life that inhabit different countries are due to corresponding physical differences or similarities themselves—meet with so direct and palpable a contradriction. Borneo and New Guinea, as alike physically as two distinct countries can be, are zoologically as wide as the poles asunder; while Australia with its dry winds, its open plains, its stony deserts and its temperable climate yet produces birds and quadrupeds which are closely related to those inhabiting the hot, damp, luxuriant forests which everywhere clothe the plains and mountains of New Guinea" —অতএব বাঙ্গালী যুবকগণ যদি অধ্যবসায়-সহকারে ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রভৃতি উপায়ের অনুসরণ করেন; তাহা হইলে কেনই বা না বাহ্য প্রকৃতির প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া শারীরিক বল-সঞ্চয়ে সমর্থ হইবেন? কিন্তু এই প্রকার অধ্যবসায়ের পূর্ণ ফল যাঁহারা অচিরাৎ দেখিতে চাহেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই নিরাশ হইবেন—কেন না, যে নিয়মে আমরা পূর্ব্বপুরুষের দোষগুণের উত্তরাধিকারী হই, সেই কৌলিক নিয়মের প্রভাবে আমরা আমাদিগের অধ্যবসায় সত্ত্বেও—পূর্ব্বপুরুষদিগের দুর্ব্বল শারীরিক গঠন ও প্রকৃতির উত্তরাধিকার হইতে একেবারেই অব্যাহতি পাইব না, পরন্তু ক্রমে ক্রমে ব্যক্তিগত চেষ্টা ও অধ্যবসায় কৌলিক অধিকারের প্রভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে।

প্রত্যেক ব্যক্তি কিম্বা জাতির উন্নতির মূলে—এমন কি, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রধানতঃ দুইটি মূল নিয়ম দৃষ্ট হয়। একটি কৌলিক গুণ-প্রবাহের নিয়ম (Principle of Heredity) আর একটি উপযোগিতার নিয়ম (Principle of Adaptibility). এই দুইটি নিয়মই মনুষ্য-সমাজে একত্র কার্য্য করিতেছে। প্রথমোক্ত নিয়মটির প্রভাবে আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের দোষ-গুণের উত্তরাধিকারী হই, এবং শেষোক্ত নিয়মটির অনুযায়ী আমাদিগের নিজ চেষ্টায় আপনাদিগকে অবস্থা ও ঘটনার উপযোগী করিয়া লইতে সমর্থ হই। যাহা বরাবর হইয়া আসিয়াছে তাহাই রক্ষা করিবার জন্য এবং তাহারই স্থায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একটি নিয়ম সতত চেষ্টা করে, অপর নিয়মটি দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে আমাদিগকে অবস্থা ও ঘটনার উপযোগী করিয়া অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তনের দিকে—উন্নতির দিকে লইয়া যায়—এক কথায় একটি রক্ষণশীল—আর একটি পরিবর্ত্তনশীল বা উন্নতিশীল। এই দুই নিয়মে সমাজের শ্রেণীগত সাদৃশ্য রক্ষিত

হয় ও ব্যক্তিগত বিভিন্নতা সম্পাদিত হয়। নূতন নূতন ঘটনা ও অবস্থা-স্রোতে আমরা একেবারে ভাসিয়া না যাই, কৌলিক নিয়ম আসিয়া তাহার প্রতিরোধ চেষ্টা করে এবং কৌলিক নিয়মানুসারে যে দোষ-প্রবাহ বংশপরম্পরাক্রমে প্রবাহিত হইবার কথা, উপযোগিতার নিয়ম আসিয়া তাহার পরিশোধন চেষ্টা করে; এইরূপে এই দুই নিয়মের ঘাত-প্রতিঘাতে মনুষ্য-সমাজ উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

আমরা বাঙ্গালি-জাতি যেমন একদিকে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে দয়া, ধর্ম্ম,তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভৃতি সদ্গুণের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সেইরূপ আর এক দিকে তাঁহাদিগের ভীরুতা, নির্ব্বীর্য্যতা প্রভৃতি দোষেরও উত্তরাধিকারী হইয়াছি। এইক্ষণে এই দোষগুলি আমাদিগের চরিত্র হইতে অপনীত করিবার জন্য বাহিরের ঘটনাবলী ও অবস্থা কতদূর অনুকূল ও উপযোগী দেখা আবশ্যক। বলিষ্ঠ সাহসী ইংরাজ-জাতির সংশ্রব ও দৃষ্টান্ত একদিকে যেমন এই উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে উপযোগী, সেইরূপ আর একদিকে ইংরাজি সভ্যতা তাহার প্রতিকূল কি না তাহা আমাদিগের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। Mill মিল তাঁহার সভ্যতা নামক প্রবন্ধে এই মর্ম্মে বলেন যে, ইংরাজি সভ্যতার প্রভাবে ইংরাজদিগের বীর্য্য দিন দিন হ্রাস হইতেছে। তিনি বলেন—"There has crept over the refined classes, over the whole class of gentlemen in England, a moral effeminacy, an inaptitude for every kind of struggle. They shrink from all effort, from every thing which is troublesome and disagreeable. The same causes which render them sluggish and unenterprising, make them, it is true for the most part, stoical under inevitable evils. But heroism is an active, not a passive quality, and when it is necessary not to bear pain but to seek it, little needs be expected from the men of the present day. They can not undergo labour, they can not brook ridicule, they can not brave evil tongues: They have not hardihood to say an unpleasant thing to any one whom they are in the habit of seeing, or to face even with a nation at their back, the coldness of some little coterie which surrounds them."

যদি বলিষ্ঠ ইংরাজজাতিকেও ইংরাজি সভ্যতা দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে চির-দুর্ব্বল বাঙ্গালি জাতি তো উহার দ্বারা আরও দুর্ব্বল হইবার কথা। এখনও ইংরাজদিগের প্রকৃতিতে কুল-পরম্পরাগত এত খানি সার সঞ্চিত আছে,অ্যাঙ্গ্লো স্যাক্সন রক্তের এত অধিক তেজ আছে যে, তাহারই বলে তাহারা ইংরাজি সভ্যতার দৌর্বল্যজনক প্রভাব কথঞ্চিৎ অতিক্রম করিতে সমর্থ

হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালিজাতির সে সারও নাই, সে তেজও নাই, অথচ সেই ইংরাজি সভ্যতার সমস্ত ভার তাহাদিগের দুর্ব্বল স্কন্ধে চাপানো হইয়াছে। বাঙ্গালিজাতির পুরুষ পরম্পরায় অর্জ্জিত অন্তরের সারবত্তা ও শারীরিক বল নাই বলিয়াই তাহারা কোনও বিদেশীয় জাতির প্রভাব এ পর্য্যন্ত অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় নাই। যখন মুসলমানদিগের আধিপত্য ছিল, তখন আমরা মুসলমানদিগের সভ্যতায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলাম, এক্ষণে আবার ইংরাজি সভ্যতায় সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। মুসলমানদিগের আমলে তাহাদিগের অনুকরণে চাপকান কাবা পরিয়াছিলাম, এক্ষণে আবার একেবারেই হ্যাট্ কোট্ পেণ্ট্‌লুন পরিতে আরম্ভ করিয়াছি!

কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, মুসলমানি সভ্যতা ইংরাজি সভ্যতা অপেক্ষা আরও দৌর্ব্বল্যজনক। মুসলমানদিগের তুলনায় ইংরাজের সংশ্রব আমাদের পক্ষে যে অনেক উপকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমান সভ্যতার সহিত আলস্য ও বিলাসের মূর্ত্তিমান প্রতিরূপ-আতর গোলাব তাকিয়া গদি প্রভৃতি যেন একেবারে জড়িত, এবং ইংরাজি সভ্যতা-গত বিলাস সামগ্রীর মধ্যেও অপেক্ষাকৃত কার্য্যতৎপরতা ও উদ্যমের ভাব লক্ষিত হয়। ইহা কে না স্বীকার করিবে যে, ইংরাজদিগের সংসর্গে, শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে আমাদিগের কার্য্য-তৎপরতা ও শ্রমশীলতা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। কিন্তু ইহা আমাদিগের স্বাভাবিক নহে, সুতরাং ইহার উপর নির্ভর করা যায় না। শারীরিক বল ও স্ফূর্ত্তি হইতে স্বাভাবিক ভাবে যে উদ্যম-তৎপরতা প্রসূত হয়, তাহাই অপেক্ষাকৃত অধিক ফলপ্রদ ও স্থায়ী। ইংরাজি সভ্যতার প্রভাবে আমাদের এত অভাব বৃদ্ধি হইয়াছে যে, আর অল্পে সন্তুষ্ট হইবার যো নাই। জীবিকার উপায় করিবার জন্য আকুল হইয়া সকলকে ইতস্ততঃ বেড়াইতে হইতেছে, এমন কি, উহার জন্য আমাদিগের যুবকদিগকে সাত সমুদ্র পার হইয়া দূর দেশে যাইতে হইতেছে। এত উদ্বেগ ও এত চিন্তা বাঙ্গালীর দুর্ব্বল শরীরে কি সহ্য হইবে? এক্ষণে ইংরাজদিগের শাসনে আমাদিগের মধ্যে যেরূপ এক দিকে কার্য্য-তৎপরতা, উদ্যম ও স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তি হইতেছে—সেইরূপ আর এক দিকে আমাদিগের দৈহিক বল-সঞ্চয়ের প্রতি লোকের কি সেরূপ যত্ন ও মনোযোগ দেখা যায়? মুসলমানদিগের আমলে তেমন সুশাসন ছিল না—দস্যুদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল, সুতরাং সকলকে দায়ে পড়িয়া শারীরিক বল ও সাহস অর্জনের চেষ্টা করিতে হইত। তখন লেখা পড়ারও এত চাপ ছিল না, সুতরাং শরীরের প্রতি অনেকটা লোকের দৃষ্টি থাকিত। বিপদের সহিত সংগ্রাম না করিলে কখনই সাহস ও আত্ম-নির্ভরের শিক্ষা হয় না। কিন্তু এক্ষণে আমাদের বিপদের লেশমাত্র আশঙ্কা নাই। আমরা শান্তির ক্রোড়ে দিব্য আরামে শুইয়া আছি। রাজপুরুষদিগের উপর সমস্ত নির্ভর, আপনার উপর কিছুই নির্ভর

করিতে হয় না। পুলিসের এমনি শাসন, জীবন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য আমাদিগের নিজের কোন চেষ্টা পাইতে হয় না। এই জন্য শারীরিক বল ও সাহস অর্জ্জনের নিমিত্ত আমাদিগের কোন প্রয়োজনই বোধ হয় না। তাতে আবার লেখা পড়ার এত চাপ যে, এতদ্দেশীয় যুবকেরা শরীরের প্রতি মনোযোগ দিতে অবকাশ পান না এবং রাজপুরুষদিগেরও সে দিকে দৃষ্টি নাই। আমরা এ কথা বলি না যে, অরাজকতা হউক, অশান্তি হউক, লেখা-পড়া দেশ হইতে উঠিয়া যাউক, কেবল শারীরিক বল অর্জনে লোকের চেষ্টা হউক। তাহা আমাদিগের বলিবার অভিপ্রায় নহে। আমরা বিলক্ষণ জানি যে, জ্ঞান-বিরহিত, শারীরিক বল পশুতেই শোভা পায়—তাহা মনুষ্যের উপযুক্ত নহে, এবং ইহাও বিলক্ষণ জানি যে, যদি কোন জনসমাজে অরাজকতা অশান্তি থাকে,জীবন-সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্তই সকলকে আকুল হইতে হয়, তাহা হইলে সে সমাজের অন্তর্ভূত কোন ব্যক্তি শিল্প বাণিজ্য বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারে না, সুতরাং সভ্যতা ও উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আমাদিগের বলিবার অভিপ্রায় এই যে,যেহেতু আমাদিগের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা শারীরিক বল ও সাহস অর্জ্জনের অনুকূল নহে, সেই জন্যই আরও, দেশের লোক ও রাজপুরুষদিগের এই বিষয়ে অধিক মনোযোগী হওয়া উচিত। আমরা এক্ষণে যে শান্তি উপভোগ করিতেছি তাহা নির্জ্জীবের শান্তি—তাহা মৃতদেহের শান্তি—তাহা বলবান জীবন্ত পুরুষের শান্তি নহে। শান্তিকে রক্ষা করিবার জন্যও বলের প্রয়োজন। যদি আমাদিগের নিজের বল না থাকে, তাহা হইলে শান্তি রক্ষার জন্য চিরকালই পরের উপর নির্ভর করিতে হইবে। যে শান্তি রক্ষার জন্য পরের উপর নির্ভর করিতে হয়, সে শান্তির স্থায়িত্ব কোথায়? আজ যদি ইংলণ্ড আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান, আমাদিগের এতটুকুও কি বল-সঞ্চয় হইয়াছে যে, আমরা নিজ বলে আপনাদিগের মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে পারি? সত্য, ইংলণ্ডের প্রসাদে আমরা তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ পাইয়াছি—বাষ্পীয় শকট পাইয়াছি, বাষ্পীয় আলোক লাভ করিয়াছি,কিন্তু ইংলণ্ড যদি আজ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যান—তা হইলে উহার অবশিষ্ট আর কি থাকে? তাড়িৎ-বার্ত্তাবহ প্রভৃতি কি তড়িতের ন্যায় তিরোহিত হয় না? এবং বাষ্পীয় শকট প্রভৃতি কি বাষ্পের ন্যায় বায়ুতে বিলীন হইয়া যায় না? ইংলণ্ডের কামান বন্দুক বেয়নেট, শত্রুর আক্রমণ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিতেছে সত্য—কিন্তু ইংলণ্ড আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে কি আমরা শিশুর ন্যায় একেবারে অসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়ি না?

আমরা ইংলণ্ডের নিকট আর কিছুই চাহি না—আমাদিগের বাহ্য সুখ-সমৃদ্ধি হোক্ বা না হোক্ তাহাতে ক্ষতি নাই। তিনি যদি আমাদিগের মৃতবৎ নির্জ্জীব দেহে এতটুকু বল-সঞ্চার করিতে পারেন যে আমরা

আপনার উপর নির্ভর করিতে পারি—আপনাকে আপনি রক্ষা করিতে পারি—আপনার উন্নতি আপনারাই সাধন করিতে পারি—তাহা হইলেই আমরা তাঁহার নিকট প্রকৃত উপকার লাভ করিব—এবং তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হইব।—তিনি যদি আমাদিগের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লন—তিনি যদি উপযুক্ত দেশীয় লোকদিগকে রাজ্যের উচ্চ পদে অভিষিক্ত করিতে কৃপণতা করেন—তিনি যদি ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে অনৈক্য-বীজ বপন করেন—তিনি যদি দেশীয় বাণিজ্যের প্রতি বিদ্বেষ-কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন—তিনি যদি দেশীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করেন—তিনি যদি দেশীয়দিগকে পদে পদে অবিশ্বাস করেন—তিনি যদি আমাদিগকে চিরকাল শৈশব দশায় রাখিতে চেষ্টা করেন—তাহা হইলে আমরা কি কখন স্বাধীনতা-লাভের উপযুক্ত হইতে পারি? স্বীকার করি আমাদিগের নিজের চেষ্টা, নিজের অধ্যবসায়ের উপর অনেকটা নিজের উন্নতি নির্ভর করে কিন্তু আমরা সহস্র বৎসরের অধীনতায় একেবারে চিররোগীর ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি—আমাদিগের দুর্ব্বল চেষ্টায় কত দূর হইতে পারে? তাহাতে যদি আবার কোন উচ্চতর প্রভু-শক্তি আসিয়া আমাদিগের উন্নতির পথে সহায়তা করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত তাহাতে কণ্টক রোপণ করেন, তাহা হইলে কি আমরা এক পদও অগ্রসর হইতে পারি? লেখক মহাশয় এক স্থলে বলিয়াছেন "Do you think if we *deserve* libety, that is so say, if we have slowly but surely developed those conditions which alone entitle a nation to that grand golden privilege, England would be willing to withhold us from it—England, the land of noble heroic patriots?"

লেখক মহাশয়ের ন্যায়, স্বাধীনতার জন্মভূমি ইংলণ্ডও অনেক সময়ে আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়া থাকেন যে, অগ্রে উপযুক্ত হও, তবে তোমাদিগকে আমি উচ্চ অধিকার প্রদান করিব—কিন্তু উপযুক্ত হইবার অবসর না দিলে কেহ কখন কি উপযুক্ত হইতে পারে?—পিতা যদি তাঁর দুর্ব্বল সন্তানকে অষ্টে-পৃষ্ঠে বন্ধন করিয়া রাখিয়া তাহাকে বলেন যে, অগ্রে তুমি উপযুক্ত হও তবে তোমাকে আমি পদচারণা করিতে দিব—সে যেরূপ আশ্বাস-বাক্য ইহাও তদ্রূপ। শিশুকে পদচারণা শিক্ষা দিবার সময় শিশু পদে পদে স্খলিত-পদ হয়—কিন্তু এই রূপ পদস্খলনের ওজর করিয়া যদি তাহাকে বলা হয়—তোমার এখনও উপযুক্ত বল হয় নাই, যখন বল হইবে তখন পদচারণা করিও—এ যেরূপ কথা উহাও সেই রূপ। সমস্ত হিন্দুজাতি জেতৃজাতির ইচ্ছামাত্র ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে—লেখক মহাশয় এই রূপ বিভীষিকা দেখাইয়াছেন, কিন্তু চিরকাল শৈশব দশায় থাকা অপেক্ষা একেবারে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হওয়াই কি প্রার্থনীয় নহে?

ইংলণ্ডের একবার ভাবা উচিত, কি মহান

ভার বিধাতা তাঁহার স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন—বিংশতি কোটি মানবের সুখ-শান্তি-স্বাধীনতা তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি প্রথমে জয় করিবার উদ্দেশে এখানে আসেন নাই—বাণিজ্যের জন্যই আসিয়াছিলেন—মুসলমানের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আমরা তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহার হস্তে আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব সমর্পন করিয়াছি বলিলেও হয়। একবার তিনি স্মরণ করিয়া দেখুন, যে পলাশির যুদ্ধে সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি প্রবেশ লাভ করিতে পারিলেন, সে যুদ্ধে কাহার সাহায্যে তিনি জয় লাভ করিলেন ?—আমরা দাসত্ব-অত্যাচারে প্রপীড়িত হইবার জন্য তাঁহাকে ডাকি নাই, দাসত্ব-অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্যই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছিলাম—এই মহৎ সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার জন্যই বিধাতা ভারতবর্ষকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, অতএব ইংলণ্ড আমাদিগের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা ও আশা উদ্দীপিত করিয়া যেন তাহা আবার কঠোর ফুৎকারে নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা না পান—এখন তিনি যেন না বলেন যে, অগ্রে উপযুক্ত হও, পরে তোমাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিব। তিনি আমাদিগকে অগ্রে স্বাধীনতার অবসর দিন—স্বাধীনতা-স্ফূর্ত্তির পরিসর দিন—স্বাধীনতার শিক্ষা দিন—তাহার পরে বলুন "অগ্রে স্বাধীনতার জন্য উপযুক্ত হও, পরে তাহার আকাঙ্ক্ষা করিও"।

ব্রহ্ম-দেশীয় নাটক ও নাটকাভিনয়।

রজত-গিরি।

(ব্রহ্মদেশীয় নাটক)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

১—দৃশ্য—পঞ্চাল রাজার প্রাসাদ—শালা।

(মন্ত্রিগণ-পরিবৃত রাজা আসীন)

রাজা।

পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ! তোমরা সকলে
যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ—কর অবধান!
উজীনের লোক আসি, পঞ্চাল সীমায়
করিয়াছে আক্রমণ—আজ্ঞা এই মোর,
সৈন্যগণ-নেতা হয়ে কুমার সুধনু
এখনি করুন্ যাত্রা অরাতি-বিরুদ্ধে—
হেন নির্ম্মূলিবে যেন ফেরে না কেহই
দোসর-নিধন-বার্ত্তা দিতে নিজ দেশে।—

(রাজার প্রস্থান)

(রাজকুমারের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী।

সিংহ-রাজ সম রাজকুমার মহান!
তুচ্ছিয়া শকতি তব শত্রু দুঃসাহসী
উড়ায়েছে এই রাজ্যে বিদ্রোহ-পতাকা।
আমাদের প্রভু তব পূজনীয় পিতা
মোরে পাঠায়েছে তেঁই বলিতে তোমায়

তাঁর আজ্ঞা এই—যেন হয়ে সৈন্য-নেতা
এই দণ্ডে শত্রুকুলে করহ নির্ম্মূল।

রাজকুমার।

রাজাজ্ঞা এখনি আমি করিব পালন।
অশ্ব গজ পদাতিক করহ প্রস্তুত।
যুদ্ধ-আয়োজন-সজ্জা কর বিধিমতে,
মুহূর্ত্ত বিলম্ব কভু করিব না হেথা।

(মন্ত্রিগণের প্রস্থান।)

(দামিনীর প্রবেশ।)

রাজকুমার।

সুচারু শশাঙ্কসম ভবিয্য-মহিষী!
এমনি সৌন্দর্য্য তব—নাহি প্রয়োজন
মণি মুক্তা অলঙ্কারে ভূষিতে শরীর,
প্রত্যেক গতিতে তব এমনি লাবণ্য—
বায়ু ভরে মৃদু মন্দ দোলে যে পদ্মিনী
সেও হার মানে—এবে শোন মোর কথা।
কর্ত্তব্যের অনুরোধে অরাতি-বিরুদ্ধে
যাইতেছি হেথা হ'তে, করো না বিলাপ,
সহচরিগণ মাঝে মনের আনন্দে
নিরাপদে থাক প্রিয়ে প্রাসাদ-ভিতরে।

দামিনী।

হা! নাথ বুঝিবা এবে হয়েছ বিস্মৃত
আমি যে মানব নহি, জাতিতে অপ্সরা—
ফেলে গেলে হেথা মোরে, কার পানে চাব?
কার মুখ হেরি পাব সান্ত্বনা আরাম?
তা হবে না ওগো নাথ—ছাড়িব না কভু,
যেথায় যাইবে তুমি আমিও যাইব,
তাড়াইলে তব পদ জড়ায়ে ধরিব।
নিষ্ঠুর সোয়ামি ওগো! এইকি সময়?
গর্ভে ধরিয়াছি তব প্রিয়তম সুতে—
এই সময়ে কি নাথ ত্যজিবে আমারে?
নিতান্ত যাইবে যদি—একটু দাঁড়াও,
আঁখি-ভ'রে দেখে লই জনমের তরে।
চ'লে যদি যাও নাথ আমায় ফেলিয়ে
কি আগুন জ্বালিবে যে এ মোর হৃদয়ে
শত বার পুড়ে যদি বিশ্ব হয় খাক্,
শীতল সে অগ্নি তবু মোর জ্বালা কাছে।
মরিলেই ভাল ছিল—কেন না মরিনু,
প্রাণ হল ওষ্ঠাগত—বদ্ধ হল বাক্—

(ক্রন্দন)

রাজকুমার।

উপায় নাহিক প্রিয়ে, মুছ অশ্রুধার,
হাঁসি মুখে দাও প্রিয়ে আমারে বিদায়।
কোরো না বিলাপ—করি শত্রু-দলে জয়
মুহূর্ত্তে ফিরিব আমি যুদ্ধ-ক্ষেত্র হতে।
যত দিন আমি প্রিয়ে না আসি স্বদেশে,
ইন্টদেবে পূজা দিও আমার উদ্দেশে।

দামিনী।

এস এস মৃত্যু মোরে লও দয়া করি,
দুঃখভার হতে মোরে মুক্ত কর আসি।
হৃদয়ে হৃদয় মোর পড়িছে ঢলিয়া
বৃক্ষ হতে পক্ব ফল পড়ে যথা খসি!

(পালঙ্কে মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

(পতাকাধারী ও সেনা-নায়কগণ
সমভিব্যাহারে
মন্ত্রিগণের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী।

প্রস্তুত সকলি প্রভু শাস্ত্র-বিধি-মতে
সুসজ্জিত সৈন্যগণ যুদ্ধ-যাত্রা তরে

বড়ই অধৈর্য্য—প্রভু চল, ত্বরা করি, *
লয়ে যাও তাহাদের যুদ্ধ-ক্ষেত্র-মুখে।

রাজকুমার।

সুভীষণ সৈন্য-দল—শত শত বীর—
পদ-ভরে যার ধরা আমূল কম্পিত,
হেন সৈন্য দল-নেতা কেনা হতে চায়?
আগমন-বার্ত্তা মম ঘুষুক কামান।
(দামিনীর প্রতি)
বিদায় হই গো প্রিয়ে—ফিরিব ত্বরায়!
হৃদি হতে ওষ্ঠে শ্বাস আসিতে যে দেরি—
তার আগে আমি পুন দেখিব তোমায়।
(প্রস্থান)

২ দৃশ্য—জঙ্গলে সেনা—নিবেশ

(সেনানায়কগণ ও মন্ত্রিগণ-পরিবেষ্টিত রাজকুমার)

প্রথম মন্ত্রী।

সুসংবাদ আনিয়াছি প্রভু সন্নিধানে।
যে দিন করেছ প্রভু যুদ্ধ-যাত্রা হেথা
যে ফুল এসেছ ফেলি, হয়েছে প্রফুল্ল—
রাজবালা করেছেন সন্তান প্রসব।
বহুমূল্য নক্ষত্রসম মনোহর,
বিপদ আপদ হতে মুক্ত একেবারে।

রাজকুমার।

মিত্রগণ! এ সংবাদে হলেম প্রসন্ন,
লও কৃতজ্ঞ—প্রসাদ—রাখিলাম নাম
* মঙ্গল তাহার, এবে তোমাদের হাতে
যাই সঁপি পুত্র দারা বিশ্বাসের ভরে।
(প্রস্থান।

* মূলে—মুং কিয়াউ।

৩ দৃশ্য—পঞ্চাল রাজ প্রাসাদ-শালা।

রাজা।

সুবিশ্বস্ত বন্ধুগণ! পড়িলে বিপাকে
যাহাদের সুবুদ্ধির লইগো আশ্রয়—
কর অবধান——আমি হীরক পালঙ্কে
আছি শুয়ে, দেখিলাম শত শত অসি
নিষ্কোষিত সমুদ্যত জিহ্বা-সকলকি
চকিত চপলা সম চমকে চৌদিকে।
দেখিলাম আরো, মম অস্ত্র তিন পাকে
অজগর সম আছে জড়ায়ে প্রাচীরে।
মোহক দৈবজ্ঞে এবে আনো ত্বরা করি,
কি সূচনা করিতেছে, বলুক গণিয়া।
(মন্ত্রিগণের প্রস্থান)

মোহক দৈবজ্ঞকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

মোহক।

(স্বগত) সুঘটনা বলি এরে—হয়েছে সুযোগ।
রাজকুমার উদ্ধত আমার উপরে
বরিষেছে নানাবিধ অপমান রাশি,
প্রতিশোধ দিতে তার এই তো সময়।
স্ত্রীকে তার বড় ভাল বাসেন কুমার,
শুধ-শুদ্ধ আমি এবে করিব আদায়
হ'রে তার প্রাণ। (প্রকাশ্যে) এবে শোন মহারাজ।
দাসেরে করিবে মাপ, সত্য-অনুরোধে
শুনিতে যদ্যপি হয় অপ্রিয় সংবাদ।
তব স্বপ্ন সূচে যাহা শোন গো রাজন—
চক্রান্ত করিবে শত্রু তোমার বিরুদ্ধে,
পদে-পদে বিপদ ঘটিবে ক্রমাগত,
অবশেষে মৃত্যু আসি গ্রাসিবে রাজন।

রাজা।

সত্যই কি হবে হেন? নাহি কি উপায়
খণ্ডিতে অশুভ এই, আচার্য্য মশায়?

মোহক।

একটি উপায় আছে, শুন গো রাজন—
কঠোর অদৃষ্ট তাহা করিছে আদেশ।
শত শত গো-মহিষ কালিকা * মন্দিরে
বলিদান দাও—আর সকলের শেষে
দিতে হবে বলি প্রভু দামিনী বালারে।

রাজা।

বৃথায় সংগ্রাম করা অদৃষ্টের সনে।
ভীষণ বিপত্তি ঐই খণ্ডিবার তরে
যে পণ চাহিবে, এবে দিতেই তা হবে।
অতএব গো-মহিষ কর আয়োজন,
বানাও মন্দির এক, কাঞ্চন-মণ্ডিত,
তাহার মাঝারে দিব্য যজ্ঞবেদী এক;
কালিকা দেবীরে তাহে করহ স্থাপন।
তার পর রূপবতী অপ্সর-দুহিতা
আমাদের বধূমাতা যাইবেন তথা।

(প্রস্থান।)

৪ দৃশ্য—পাঞ্চাল রাজপ্রাসাদে
—রাজকুমারী দামিনীর ঘর।

(রাজকুমারী নবকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া
পালঙ্কে আসীন)

মন্ত্রিগণের প্রবেশ।

আইলাম রাজাজ্ঞায় তোমার নিকটে।
কুসংবাদ আছে এক—বলিতে ডরাই।
প্রভুর আদেশ এই—শোন রাজবালা,
বলিদান হবে তব কালিকা-মন্দিরে।

দামিনী।

শুনিতে তো ভুলি নাই? অথবা নিশ্চয়
হইয়াছে ভ্রম তব—একি কভু হয়?
ভালবাসেন রাজা মোরে প্রাণের সমান,
পারেন কি দিতে তিনি মরণ আদেশ?

মন্ত্রিগণ।

হা! রাজকুমারি ওগো। রাজ-আজ্ঞা যাহা
ঠিক বলিয়াছি মোরা—নাহি তাহে ভুল।

দামিনী।

হা! কি দশা হল মোর। আমার এ দুখ—
অসীম জলধি চেয়ে অপার অগাধ।
অভাগা পত্নীরে তাঁর ভ্রূক্ষেপ না করি
চলিয়া গেলেন নাথ যুদ্ধক্ষেত্র মাঝে,
আজ্ঞা হ'ল এবে মোর মরনের তরে।
—আর তো নাথেরে কভু পাব না দেখিতে।

(ক্রন্দন)

নাহি জানি পূর্ব্ব জন্মে কি পাপ করেছি
তারি তরে ভুগিতেছি এ ঘোর বিপত্তি—
অপ্সরা কুমারী হয়ে কি কুক্ষণে আমি
আইলাম মর্ত্ত্য দেশে মরিবার তরে।

(সন্তানের প্রতি)

নির্দ্দোষের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়-রঞ্জন!
জন্মশোধ হৃদে ধরি আয় বাছা তোরে।
আরো আয় বুকে ঘেঁসি—জুড়াক্ হৃদয়।
প্রকৃতির শুভ্র উৎস মাতৃস্তন হ'তে
পান কর বাছা এই শেষ বার তরে—
কেমনে ছাড়িব তোরে?—জনকেরে তোর?
কি যে জ্বালা জ্বলে হৃদে বলিব কেমনে,
বিধাতা গো কেন এত আমা পরে বাম?
এত কেন ষড়যন্ত্র অবলা বিরুদ্ধে?

* মূলে—থীতনাত—রাজাদিগের ভাগ্যের উপর এই দেবতার বিশেষ প্রভাব।

আমি যে বাসিগো ভাল প্রাণের সমান
স্বামী-পুত্র-ধনে,——বল কেমনে এখন
ছাড়িয়া উভয়ে যাই ফিরিয়া স্বদেশে
একটি না দিয়া শেষ বিদায়-চুম্বন ?
কেঁদনা কেঁদনা বাছা—যাইবার আগে
পূর্ণ বক্ষ হ'তে দুধ গালিয়া পাত্রেতে
তোর তরে আমি বাছা যাইব রাখিয়া।
যে ফুলে মালিকা গেঁথে পরি গো খোঁপায়—
তাচেয়ে সুন্দরতর আমার যে নাথ
আসিবেন ফিরি যবে---বলিবেন আর
"কোথায় দামিনী মোর"—বলিস্ তাহারে
তাঁরি তরে সহিলাম এসব যন্ত্রণা।
তো-হ'তে ছিঁড়িয়া বাছা যেতে হবে এবে।
ঐ দেখ্ মেঘ রাশি জমেছে আকাশে,
বহু দূর পথ আর, রয়েছে সম্মুখে।
পরিয়া আবার সেই পরী-পরিচ্ছদ,
দীর্ঘ পক্ষ বিস্তারিয়া আবার সেরূপ,
উধাও উড়িব পুনঃ সেই শূন্য মাঝে,
ইন্দ্রধনু রঙ্গে যাহা রঞ্জিত কেমন।
মৃদুমন্দ অনিলের কোমল পরশে
দুই ফাঁক হবে সেই মেঘ-যবনিকা,
প্রবেশিব তার মাঝে আমি ধীরে ধীরে !

[বাদ্যকরদিগের প্রতি জনান্তিকে]

ঊর্দ্ধগতি হয়ে যবে উঠিব আকাশে,
কোমল সঙ্গীত যেন চরে মোর সাথে।
বিদায় লইরে বাছা এই শেষ বার—
তুমিও দাও গো নাথ অন্তিম বিদায়।
একবার আসি' যদি হেথা প্রাণনাথ
বিদায় চুম্বন মোর করিতে গ্রহণ,
কি সুখের হত আহা—না চলে চরণ,
থাকিলেও মৃত্যু হেথা কি করি এখন।

(প্রস্থান—ধীরে ধীরে যাত্রা, ও যাত্রা কালীন তিনি তিন বার ফিরিয়া আসিয়া পুত্রকে চুম্বন)

৫ দৃশ্য—অরণ্যমাঝে সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসী ও দামিনীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী।

কে তুমি গো অনুপম রূপসী ললনা ?
বলয় প্রকোষ্ঠে শোভে, কণ্ঠে স্বর্ণহার,
মুক্তা-মালা দিয়া গাঁথা কৃষ্ণ কেশপাশ,
লুব্ধ আঁখি একবার হেরিলে ও রূপ—
ফিরিতে না চায় আর—ফেলে না পলক।
কোন্ স্বর্গধাম হ'তে বল গো রূপসী
নাবিলে মরত দেশ ? নিষ্ঠুর অদৃষ্টে
কেন বা আশ্রম মাঝে আনিল তোমায়?
নৃশংস পতির কোপ এড়াইতে কি গো
ভ্রমিতেছ পলাইয়া—কিম্বা অভাগিনী
রাজপুত্রী কোন, জয়ী পিতৃ শত্রু হ'তে
প্রাণ ভয়ে পলাইয়া এসেছ হেথায় ?
সত্য বল মোরে বাছা নাহি কোন ভয়।

দামিনী

তোমারে বলিব পিতঃ সমস্ত খুলিয়া
আমার এ জীবনের দুখের কাহিনী—
শোন তবে প্রভু আমি বিবাহিত নারী,
রাজপুত্র স্বামী মোর, প্রাণ হ'তে প্রিয়,
যৌবরাজ্যে শীঘ্র তাঁর হবে অভিষেক,
দেশবৈরী যুঝিবারে যেতে হল তাঁরে,
আমি রহিলাম পড়ি—পতি নাই ঘরে—
মহারাজ পিতা তাঁর—পরামর্শ পেয়ে
কুলোকের, আদেশিলা মম বলিদান

কালিকা সমীপে, তাই বাঁচাইতে প্রাণ
যাইতেছি পলাইয়া। তাই তব দ্বারে।
রাজপুত্র-স্বামী মোর শুনিবেন যবে
আমি নিরুদ্দেশ, তিনি তখনি আমার
সন্ধান করিতে ধ্রুব আসিবেন পিছে।
খুঁজিতে খুঁজিতে যবে আসিবেন হেথা,
দিও তাঁরে অঙ্গুরীটি ও গো তপোধন!
আরো দিও মন্ত্র-পড়া এ শিকড়টুকু,
বিপদ সম্পদে নাথে রক্ষিবে সতত।

সন্ন্যাসী।

আচ্ছা, দিব বাছা—কিন্তু যাইবার আগে,
বলে যাও কোন্ পথে বলিব যাইতে।

দামিনী।

প্রথমেতে এক দানা প্রচণ্ড ভীষণ,
অরণ্য গভীরে তার বিরোধিলে পথ,
—জটিল অরণ্য মাঝে পড়ি আটকিয়া
বাহিরিতে করিবেন বহু যোঝাযুঝি।
কাটিলে এ ফাঁড়া, উষ্ণ দ্রব ধাতু-স্রোত
পুন আটকিবে পথ, তার মধ্য হ'তে
ভীম সর্পদৈত্য এক তুলিবেক ফণা,
পা দিয়া তাহারে যেন করেন দলন।
হয়ে পরাভূত দৈত্য যন্ত্রণার দায়ে
এলাইয়া পাক হবে সটান বিস্তৃত—
সেই সেতু দিয়া নাথ যাবেন অক্লেশে।
দেখিতে পাবেন শেষে সাত্রোক যুগল,
শিমুল বৃক্ষেতে বসি আছে উচ্চদেশে,
খাদ্যের সন্ধানে তারা পিতার প্রাসাদে
আসে প্রতিদিন, নাথে বোলো তপোধন!
এই সব কথা যাহা কহিনু তোমায়।

সন্ন্যাসী

কোরো না সন্দেহ বাছা কহিব তাঁহারে।

দামিনী

বিদায় হইগো—লও কৃতজ্ঞ-প্রণাম।
(প্রস্থান)

৬ দৃশ্য—রজত-গিরি-রাজার প্রাসাদ।

(রাজা আসীন—কোমল বাদ্যের সহিত দামিনীর প্রবেশ)

রাজা

একি! দেখি রে কি পুনঃ আমার দামিনী?
বল বাছা বল বল বন্দি ছিলে যবে
মর্ত্যমাঝে, কি উপায়ে পলাইলে হেথা?

দামিনী।

পিতা ওগো! পূর্ব্ব জন্মে করেছি সুকৃতি,
পাঞ্চাল রাজপুত্র সাথে একত্র মিলিয়া,
তাই বুঝি এ জনমে লিখিল বিধাতা
ভাগ্যবতী পত্নী হব সুধনু রাজার—
কিন্তু সুখ ক্ষণস্থায়ী—বীরশ্রেষ্ঠ স্বামী
দেশবৈরী নাশিবারে গেলা ফেলি মোরে।
স্বামীর আশ্রয়-ছায়া হারালাম যেই—
রাজা তাঁর পিতা, শুনি কুলোকের বাণি
কালী কাছে বলি মোর করিলা আদেশ।
এই কথা শুনি আমি, সময় বুঝিয়া
পলায়ে এলাম হেথা শ্রীচরণ তলে।

রাজা।

পাত্র মিত্র অনুচর! করহ প্রস্তুত
কুমারীর থাকিবার যোগ্য আয়োজন।
দাস দাসী এক দল কর নিয়োজিত,
কটাক্ষে পালয়ে যেন উঁহার আদেশ।

মন্ত্রিগণ।

রাজ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলাম সবে।
(প্রস্থান)

৭ দৃশ্য—পাঞ্চাল প্রাসাদের বহিঃ প্রাঙ্গণ।

(পরিচারিকাগণের নেতা হইয়া মালার প্রবেশ)

মালা

ওলো সহচরী তোরা! শোন্ বলি কথা,
জয়ী রাজপুত্র দেশে এসেছেন ফিরি,
গুয়া পান আর ভাল খাবার করিয়া
আয় গিয়া ভেট দেই তাঁর পদ তলে।

(সেনানায়কগণ সমভিব্যাহারে রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার।

দমনিয়া শত্রুদলে অতুল প্রতাপে,
প্রতিমুহু শুনিতেছি কখন আবার
হেরিব নয়নে মোর প্রাণের দামিনী!
এস এস মালা এস—কিন্তু এ কিরূপ?
তোমাদের কর্ত্তৃরাণী সকলের শেষে
আসিবেন কিগো হেথা ভেটিতে পতিরে?
কে করেছে বন্দী তাঁরে প্রাসাদ-প্রাচীরে?
"মঙ্গল" কুমার মোর সেই বা কোথায়?
পিতৃ কোলে ঝাঁপাইতে কাঁদিছে না কি সে?
কিন্তু কেন ম্লান এত হেরি তোমা মালা?
এলায়ে পড়েছে কেশ কেন অযতনে?

মালা।

প্রস্তুত হওগো প্রভু শুনিবার তরে
এক অশুভ সংবাদ—গেছ চলি যেই—
দুষ্ট কয়েক ব্রাহ্মণ—চক্রান্ত করিয়া
মহারাজে ব'লেক'য়ে কালিকা সমীপে
রাজকুমারীর বলি করেন সুস্থির।
এসংবাদ শুনে তিনি—পক্ষ বিস্তারিয়া
গিয়াছেন পলাইয়া জনমের তরে।

রাজকুমার

বল বল মালা ওগো—পলালে দামিনী
পুত্রের কি দশা হ'ল বল ত্বরা করি।

মালা

দুষো না রাণীরে প্রভু, অতি অনিচ্ছায়
গিয়াছেন চলি, যথা নব-পক্ষ-ধারী
পক্ষীর শাবক অল্প উড়ি পক্ষভরে
বহুক্ষণ এক স্থানে করে ঝটাপটি—
সেই রূপ তিনি "যাব কিনা যাব" ভাবে
বহুক্ষণ ধরি প্রভু ছিলেন হেথায়।
অবশেষে পাত্র ভরি নিজ দুগ্ধ দিয়া—
দ্রব-মুক্তা ফল-সম—মিশায়ে তা-সহ
অশ্রু-ধারা ফোঁটা, তিনি উধাও হইয়া
সুদূর আকাশ মাঝে হলেন অদৃশ্য।
মোরা রহিলাম যারা পিছনে পড়িয়া,
পালিলাম শিশুটিকে করিয়া যতন।
সে অবধি বরাবর স্বর্ণ-দোলা পরে
শিশুটি ঘুমায় যবে—থাকি মোরা জাগি।

রাজকুমার।

শোন বীরগণ! সবে কর অবধানঃ—
দুর্দ্দান্ত অরাতিদল আক্রমিয়া যবে
যুদ্ধানল জ্বালাইল সমস্ত পাঞ্চালে,
করিলাম যাত্রা আমি তোমাদের সাথে
স্বদেশ রক্ষার তরে—সেই অবকাশে
রাজা পরামর্শ পেয়ে ধূর্ত্ত দৈবকের,
করিলেন দামিনীর মরণ আদেশ
নিতান্ত অন্যায় রূপে—নিশ্চয় এ কথা
প্রবাদ-আকারে লোকে ঘোষিবে জগতে।
শতবার পৃথ্বী যদি হয় গো বিনষ্ট,

এ কথা তবু না কভু হবে তিরোহিত।
স্বর্গের বিহঙ্গী সম আহা সে রূপসী
অযোগ্য মরতে ত্যজি গেছেন উড়িয়া।
যাইব সন্ধানে তাঁর যা থাকে অদৃষ্টে।
ব্রহ্মাণ্ড হউক ধ্বংশ শত শত বার,
পারিবে না টলাইতে এ মম সঙ্কল্প।
সাজ, সবে সৈন্যগণ—বাজাও দুন্দুভি,
সসৈন্যে যাইব আমি প্রিয়ার উদ্দেশে।
বল গিয়া মহারাজে যত দিন আমি
দামিনীরে নাহি পাই, ফিরিব না দেশে।

(প্রস্থান)

৮ দৃশ্য।—সন্ন্যাসীর আশ্রম।

(সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

সন্ন্যাসী।

কি হেতু বিষম এই সৈন্য কোলাহল ?
একি দেখি ! চতুরঙ্গে ভীম সৈন্যদল
অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত আসিছে এ দিকে,
মুহূর্মুহ কাঁপে ধরা তার পদ-ভরে।

(রাজকুমারের প্রবেশ)

সন্ন্যাসী।

মহাবল-পরাক্রান্ত হে রাজকুমার।
কোন দূর দেশ হতে, কিশের উদ্দেশে
সসৈন্যে হইল তব হেথা সমাগম ?

রাজকুমার।

পঞ্চাল রাজার পুত্র আমি গুরুদেব !
সুধনু নামেতে খ্যাত একবার যবে,
শত্রু নিধনিতে যাই স্বদেশ ছাড়িয়া,
মহারাজ পিতা মোর দুষ্টের কথায়
দিলেন আমার স্ত্রীর মরণ আদেশ।
সে কথা শুনিয়া সতী গেছেন পলায়ে।
প্রেম-আশা ভরে তাই রজ-গিরি দেশে
দ্রুতগতি যাইতেছি প্রিয়ার উদ্দেশে।
আশ্রম-সৌন্দর্য্য হেরি হইয়া মোহিত
এলাম দেখিতে তাই আরো সন্নিকটে।

সন্ন্যাসী।

দুই দিন হ'ল আজ—একটি ললনা
রূপেতে উর্ব্বসী সম—হরিণীর প্রায়
আইসে হেথায়, বলে রাজকুমারী সে,
না জানি কি দেশ——বুঝি রজগিরি নাম।
পূর্ব্বজন্ম ফলে বুঝি হে রাজকুমার,
আলাপ তাহার সাথে তব সংঘটন।
কিন্তু সে সুকৃতি-ফল এবে অবসান,
তা সহ সৌভাগ্য তব—জানিবে নিশ্চয়।
বিবেচনা কর বৎস কতটা প্রভেদ
মানব ও অপ্সরার প্রকৃতির মাঝে,
উভয়ে কেমনে বল হইবে মিলন ?
প্রেমে অন্ধ হয়ে বাছা বিঘ্নপূর্ণ পথে
যাইতেছ বহু কষ্টে,—কিন্তু কিবা ফল
তাহে—বিবেচনা ক'রে দেখ গো রাজন।
রূপে গুণে অনুপম এমন যুবক,
তোমার উচিত হয় বিবাহ করিতে
উৎকৃষ্ট ললনা এক উমার সমান।
সুবুদ্ধির কাজ কর,—ত্যজি তার আশা
এই বেলা যাও ফিরি আপনার দেশে।

রাজকুমার।

যা বলিলে মানি ওগো পবিত্র গোসাঞি,
তোমা হেন ঋষি-মুখে বেশ শোভা পায়,
কিন্তু মুহূর্ত্তেক তরে আমি তপোধন
তাহার সন্ধানে কভু হব না বিরত।
স্বর্গ মর্ত্ত্য যদি গো বা রসাতলে যায়,
—ইন্দ্র দেব হানে যদি বজ্র মম শিরে,

অদমিত তবু আমি খুঁজিব প্রিয়ায়।
রেখো না বিলম্বি মোরে ওগো তপোধন,
ব'লে দাও কোন পথে গিয়াছেন প্রিয়া।

সন্ন্যাসী।

যাবে যদি যাও তবে—কিন্তু গো রাজন,
যাইবার আগে লও অঙ্গুরিটি এই—
দিয়াছেন প্রিয়া তব—আর এ শিকড়,
নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে তোমা বিঘ্নময় পথে,
পূর্ণ করিবেক তব সর্ব্ব মনোরথ।
বহু দূর পথ তব—পথের মাঝারে
ভীষণ দৈত্যের হাতে পড়িবে প্রথম,
তার পরে পাবে এক অরণ্য দুর্গম।
শেষে দ্রব-ধাতু-স্রোত পাইবেক পথে,
সর্প-দৈত্য এক তথা রহে অবিরাম।
এ সমস্ত বিঘ্ন হ'তে হইলে গো পার,
বহুদূরে দেখিবেক সিমুলের গাছে—
সাত্রোক-যুগল এক। উড়িলে তাহারা,
অনুসরি গতি তার পাবে রজ-গিরি—
বলিলাম যাহা—শোনা দামিনীর কাছে—
করেছিল অনুনয় তোমারে বলিতে—
যাও তবে বৎস এবে করি আশীর্ব্বাদ,
সিদ্ধ হোক্ মনোরথ—পূর্ণ হোক্ আশ।

রাজকুমার।

প্রণাম লও গো পিতঃ—হইনু বিদায়।
(প্রস্থান)

৯ দৃশ্য।—ঘোর তমসাবৃত অরণ্য।

বটবৃক্ষতলে রাজকুমারের অবস্থান—
একটা দৈত্যের প্রবেশ।

দৈত্য।

এই তো হেথায় আমি—দৈত্য মোর সম
ভীম-দরশন কেবা?—হয়েছে সময়,
যাব এবে হিমালয়—অরণ্যের মাঝে—
(বাদ্যকরদিগের প্রতি
বাজা তোরা বীর-বাদ্য দুন্দুভি দামামা,
তোল্ খুব্ গণ্ডগোল—আকাস ছাইয়া
পড়িবে সকল চোথ তবে আমা পরে।
সূর্য্যের সহস্র রশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে
যেনরে আমার শিরে হয়েছে পতিত।
(রাজকুমারকে দেখিয়া)
হা হা বেশ! এযে মানুষের গন্ধ পাই।
বড় ভোজ জুটে গেছে, বড় মজা আজ।
(রাজকুমারের নিকটে গমন)
(ধীর বাদ্য)

রাজকুমার।

(উঠিয়া)

হতভাগা দৈত্য ওরে! স্পর্দ্ধা এত তোর!
সূর্য্যবংশ অবতংশ বীরের সহিত
আসিস্ যুঝিতে তুই—নাহি প্রাণে ভয়?
হীরক্ ভূষিত এই স্বর্ণ বাণ দিয়া
অপদার্থ প্রাণ তোর হরিব এখনি!
(বাণ দ্বারা দৈত্যকে হনন—বিজয়-ভেরীর ঘোর রোল—রাজকুমারের অগ্রসর হওন, ও অরণ্যের বংশ-বনে তাঁহার আটক)
পারি না পারি না আর—অবসন্ন দেহ,
যে দিকে ফিরি না কেন লতিকার জাল
দুর্গম জটিল—মোর আটকিছে গতি।
—হাঁ। হাঁ। সেই মহামন্ত্র শিকড়ের গুণ
পরীক্ষা করিনা কেন, এই তো সময়।
(শিকড়ের গুণে বন হইতে নির্গত হইয়া অগ্রসর)
রজত গিরির ও গো অপ্সরা রূপসী!

কি কস্ট না সহিতেছি তোমার কারণে।
পরবত পথে যাই কিম্বা বনমাঝে,
দৈত্য কিম্বা হিংস্র ব্যাঘ্রে নাহি করি ভয়,
অমূল্য রতন ওগো, তোমারি কারণে—
প্রেমের অধীন তব যুঝিছে নিয়ত।

(তপ্ত দ্রব ধাতু স্রোতের নিকট আগমন)

ওকি দেখি হোথা? তপ্ত দ্রব ধাতু-নদী
ফুটিতেছে টগ-বগি, তার মধ্য হ'তে
ভীম সর্প দৈত্য এক তুলিয়া মস্তক
হাঁ করি আমার পানে রয়েছে তাকায়ে।
—মন্ত্র-মূ... এইবার করি গো বাহির,
সে ঔষধি গুণে দৈত্য-পৃষ্ঠ মাড়াইয়া
অনায়াসে নির্ব্বিঘ্নে তরিব ঘোর নদী।

(দৈত্য-পৃষ্ঠে নদী পার হইয়া শিমুল বৃক্ষ তলে আগমন—বৃক্ষোপরি সাত্রোক্ পক্ষিযুগল)

স্ত্রী সাত্রোক্।

প্রিয়তম ভাই ওগো! জনম অবধি
একত্র রয়েছি—কভু হইনি পৃথক্,
এক বাসা মাঝে দোঁহে আছি চিরকাল,
—খাদ্য অন্বেষণে বল কোথা আজ যাই?

পুরুষ সাত্রোক্।

জান না কি তুমি বোন্ ধর্ম্ম-রাজ বালা—
দামিনী সুন্দরী গৃহে এসেছেন ফিরি?
সেই উপলক্ষে বোন্ অপ্সর প্রাসাদে
রাজকীয় মহাভোজ বসিবে আজিকে।
অতএব যাই চল রজ-গিরি দেশে,
সে ভোজের অংশভাগী হইব আমরা।

(রাজকুমার নিজ শরীরের উপর মন্ত্র পড়া শিকড় চূর্ণ ছড়াইয়া অদৃশ্য হইলেন—ও একটি সাত্রোকের পক্ষ মধ্যে উপবেশন করিলেন—সাত্রোক্দ্বয় উড্ডীয়মান)

১০ দৃশ্য।—রজতগিরির প্রাসাদ। প্রাঙ্গণস্থ কূপ।

(৭ জন পরিচারিকার জল উত্তোলন)
(রাজকুমারের প্রবেশ)

রাজকুমার।

স্বর্গের দেবতা সবে—কর অবধান,
দামিনীর সঙ্গে দেখা ভাগ্যে যদি থাকে,
কোনরূপ চিহ্ন তার কর প্রদর্শন।
যদি এই সাত জন রূপসীর মাঝে
স্বর্ণ কুম্ভ এক জন না পারে তুলিতে,
তবেই জানিব মম অদৃষ্ট প্রসন্ন।

(৬ জন বালিকার কুম্ভ উত্তোলন—সপ্তম বালিকা তুলিতে অক্ষম)

সপ্তম পরিচারিকা।

সুন্দর যুবক ওগো—আইস নিকটে,
অক্ষম তুলিতে কুম্ভ—দাও গো তুলিয়া।

(রাজকুমারের কুম্ভ উত্তোলন ও তন্মধ্যে অঙ্গুরী নিক্ষেপ)

(প্রস্থান)

১১ দৃশ্য।—দামিনী রাজকুমারীর ঘর।

(সহচরী সমভিব্যাহারে হাত ধুইতে ধুইতে কুম্ভ মধ্যে রাজকুমারীর অঙ্গুরী দর্শন)

দামিনী।

ওমা! একি! ওমা! অবসন্ন হল দেহ—
উলটপালট চিন্তা—দেহ মন দুই
অসাড় অবশ—মম প্রাণনাথ
এত দিন পরে বুঝি আইলেন হেথা।
—ধন্য বীর হিয়া তব! ধন্য অধ্যবসা!
অতিক্রমি সব বাধা উত্তরিলা আসি
আমার নিকটে—কি না স'হেছেন নাথ
আমার উদ্দেশে—ভাবি হৃদয় ব্যথিছে!

(ধর্ম্মরাজের প্রবেশ)

রাজা।

কেন বাছা ম্লান মুখ দেখি গো তোমার,
বজ্রাহত লতা যেন লুণ্ঠিত ধরায়?

দামিনী।

প্রিয়তম পিতঃ ওগো—এই অঙ্গুরীয়
অঙ্গুলি হইতে আমি ছাড়িনি কখন,—
কিন্তু সাধিতে উদ্দেশ্য আমি একবার
ত্যজিয়াছিলাম ওরে অঙ্গুলি হইতে।
ফিরিয়া পেলাম এবে যেমনি গো আমি
কুম্ভ মধ্যে দিছি হাত—অমনি আঙ্গুলে
আপনি আসিল উঠি; অভ্রান্ত সূচনা
আমার প্রাণের স্বামী এসেছেন হেথা।
মধুর বিস্ময়ে হেন হয়ে অবিভূত
অবসন্ন হব তাহে আশ্চর্য্য কি পিতঃ?

রাজা।

(অনুচরদিগের প্রতি)

কূপ হ'তে কুম্ভ এই কে আনিল বল!

একজন পরিচারিকা।

দাসীরে করিবে মাপ—ওগো মহারাজ,
কুম্ভ উঠাইতে মোর হয় নি শকতি—
একটি যুবক ছিল কূপের নিকটে,
তাঁহার সাহায্য প্রভু যাচিলাম আমি,
আমা হ'য়ে তবে তিনি তুলিলেন উহা।

রাজা।

আনো তারে ত্বরা করি দরবার গৃহে!

(প্রস্থান)

১২ দৃশ্য — প্রাসাদস্থ দরবার শালা।

সিংহাসনে রাজা আসীন—মন্ত্রিগণ সমভি-
ব্যাহারে রাজকুমারের প্রবেশ।

রাজা।

কে তুমি যুবক ওগো—রূপ-গুণবান,
সিংহসম সুসাহসী, কিবা মন্ত্রবলে
আসিয়া পড়িলে এই রক্ত গিরি দেশে?
সমস্ত খুলিয়া বল—কোরো না গোপন।

রাজকুমার।

বলি শোন মহারাজ, পঞ্চালের রাজা
তাঁর পুত্র আমি, তাঁর উত্তরাধিকারী।
পূর্ব্বজন্ম সুকৃতির শুভি পুণ্য ফলে
পতিরূপে লভি তব চারু দুহিতায়,
সে মিলনে জন্মিয়াছে পুত্ররত্ন এক।
কিন্তু আমাদের সুখ ক্ষণস্থায়ী অতি।
গৃহছাড়ি একবার শত্রুর বিরুদ্ধে
করিয়াছিলাম যাত্রা, এহেন সময়
দুষ্টের মন্ত্রণা পেয়ে পিতা মহারাজ
করিলেন স্থির মম প্রাণের দামিনী
কালিকা-মন্দিরে শীঘ্র হবে বলিদান।
শুনিয়া সংবাদ হায় দামিনী আমার
এসেছেন পলাইয়া তাঁর নিজ দেশে।

ধূলি কণা গণি প্রাণে প্রেম তুলনায়।
আমি করিয়াছি যাত্রা তাঁহার উদ্দেশে,
পদানত তাই এবে শ্রীচরণ তলে।

রাজা।

পাত্র মিত্র মন্ত্রিগণ! কর অবধান।
বলিছেন ইনি মম দুহিতার প্রেমে
হইয়া চালিত এবে এসেছেন হেথা।
উচ্চ হেন পুরস্কার লভিবার তরে,
দেখাইতে হবে প্রেম সত্য কত দূর,
আরো দিতে হবে ওঁর গুণের পরীক্ষা।
অতএব শীঘ্র আনো অস্ত্রাগার হ'তে
প্রখ্যাত ধনুক সেই, যাহার ছিলায়
ত্রিশ মন গুরুভার ঝোলে অবিরত।
পারে কি না দেখা যাক বিদেশী যুবক
বাঁকাইতে সেই ধনু দুর্নম্য কঠিন।

(প্রস্থান

১৩ দৃশ্য—প্রাসাদ প্রাঙ্গণ।

(রাজা, মন্ত্রিগণ, এবং রাজকুমারের প্রবেশ)

প্রথম মন্ত্রী।

এই লও ধনু যুবা,—রাজ আজ্ঞা এই—
বাঁকাইয়া ধনুকেরে দাও গো পরীক্ষা।

(রাজকুমারের ধনুগ্রহণ)

রাজকুমার।

এসেছে অদৃষ্ট এবে চূড়ান্ত সীমায়,
সফল হইগো যদি বাঁকাইতে ধনু,
দামিনী আমার হবে চিরকাল তরে,
নতুবা খোয়াব আমি সরবস্ব ধন।

(ধনু বাঁকাইতে চেষ্টা ও
তাহা বক্রকরণ)

প্রথম মন্ত্রী।

রাজপক্ষি পক্ষ সম সুবক্র ধনুক—
লৌহসম সুকঠিন—ইঁহার হস্তেতে
তৃণ যেন মহারাজ! বাখানি যুবারে!

রাজা।

পরীক্ষা এখনো কিন্তু হয় নাই শেষ।
অশ্বশালা হ'তে আনো দুষ্ট অশ্ব এক,
আর এক বন্য হস্তী যাহার মস্তকে
কঠোর অঙ্কুশ আজো হয়নি পরশ,
জ্বল জ্বল চক্ষু দুটি ঘোষিছে যাহার
অদমিত বন্য তেজ, চড়ি তদুপরি
যুবা করুক দমন। শুনিলে আদেশ?

মন্ত্রিগণ।

এ বিষম পরীক্ষায় আছ কি প্রস্তুত?

রাজকুমার।

ধনুকের পরীক্ষা কি হয় নি যথেষ্ট?
আচ্ছা বেশ মহারাজ অশ্ব গজ আনো,
কিছুতেই পিছপাও হব নাকো আমি।

(অশ্ব গজ আনয়ন)

(নাট্যশালার বাদ্যকরদিগের প্রতি)

উৎসাহ-জনন সুর ভীম বজ্রনাদে
বাজাও তোমরা, ঘোর প্রতিধ্বনি তায়,
যেন ব্যাপি চারিদিকে কাঁপায় ধরণী
আমূল পর্য্যন্ত তার থর থর করি।

(অশিক্ষিত অশ্বের উপর আরোহণ
করিয়া রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন,
পরে অবরোহণ)

বন্য হস্তি শিরে এবে করি পদার্পণ।

(হস্তীর উপর আরোহণ)

শস্ত্রযুক্ত চরণের ইঙ্গিত নির্দ্দেশে
চলিছে যে দিকে আমি ফিরাইছি ওরে।

(অবতরণ)

প্রথম মন্ত্রী।

(রাজার প্রতি)

এ পরীক্ষাতেও প্রভু যুবক উত্তীর্ণ।

রাজা।

দুহিতা আমার যত তাদের সম্মুখে
সাত ভাঁজ যবনীকা হিরক-খচিত
হোক লম্বমান, আর তার মাঝে দিয়া
প্রত্যেকে অঙ্গুলি এক করুক বাহির,
একে একে অতি সাবধানে ; ইহার মাঝারে
ব'লে যদি দিতে পারে দামিনী অঙ্গুলী,
তবেই জানিব আমি নিশ্চয় যুবক
দামিনীর পানিগ্রহে ন্যায্য অধিকারী।

(যবনিকা নিক্ষেপ, সকল রাজকুমারীর একে একে যবনিকা মধ্য দিয়া অঙ্গুলী বাহির করণ)

রাজকুমার।

স্বর্গের দেবতাগণ ! হইয়া সহায়,
দয়া করি পাঠাওগো হেন নিদর্শন,
নির্ব্বাচিতে পারি যাতে যথার্থ অঙ্গুলি।

(দামিনীর অঙ্গুলী বাহির করন, ও তাহার উপর একটি মধুমক্ষিকার উপবেশন)

ধ্রুব এই নিদর্শন (অঙ্গুলী গ্রহণ) এত দিন পরে।
পরশি ও চারু হস্ত আমার শরীর
হতেছে লোমাঞ্চ। ইহাতেই বুঝিতেছি
আমার এ নির্ব্বাচন হয়েছে সফল।
দাও এবে মহারাজ মোর পুরস্কার।

রাজা।

অর্জিলে সাহসী বীর নিজগুণ-বলে
পুরস্কার তব এবে, কর আলিঙ্গন।

(যবনিকার পশ্চাৎ হইতে দামিনীকে বাহির করিয়া সম্মুখে আনয়ন)

তোমার প্রত্নীকে দেখ, উহার বয়ান
লজ্জার রক্তিম রাগে রেঙ্গেছে কেমন!
কি আর বলিব দোঁহে—আশীর্ব্বাদ করি
চিরজীবী হ'য়ে থাক সুখে কাল হরি।

সমাপ্ত

প্রাচীন ভারতের শিল্প।

পুরাতন কালে এ দেশে কি কি শিল্প ছিল তাহা অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত আমরা "প্রাচীন ভারতের শিল্প প্রচার" এই শীর্ষক দিয়া যে সকল প্রস্তাব লিখিয়াছি তাহাতে কালজ্ঞান-সাধন শিল্পের কিয়দংশ মাত্র ব্যক্ত হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশ, যাহাতে বিশেষ নৈপুণ্য ও শিল্প সংযোগ আছে তাহা এতৎপ্রস্তাবে সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত করিব এবং ভবিষ্যতে অন্যান্য শিল্পের কথাও বলিব। আন্দোলন ও

অনুসন্ধান দ্বারা পুরাতন পিতৃ-পুরুষদিগের গুণপনা যতই প্রকটিত হয় ততই মনে-স্ফূর্ত্তি ও জাতীয় গৌরবের প্রতি দৃষ্টি পরিচালিত হয়। এই নিমিত্তই এতদ্বিধ প্রস্তাব লেখা ভারতীর অভিপ্রেত।

৭৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী বাথর বা ভাস্করাচার্য্যের লিপি ও তাহার বহুপূর্ব্ববর্ত্তী সূর্য্যসিদ্ধান্তের রচনাবলী উপলক্ষ্য করিয়া অতি পুরাতন কালনির্ণায়ক যন্ত্র গুলির কথা বলিব বটে, পরন্তু সেই সকল বিলুপ্ত-চিহ্ন যন্ত্রাবলীর আকার প্রকার ও নির্ম্মাণ-পরিপাটী যথাযথ রূপে ব্যক্ত করা এক্ষণে অসম্ভব। সে সকল যন্ত্র এখন অনাবশ্যক, তথাপি কুতূহল বশত যদি কেহ তাহা নির্ম্মাণ করিতে চাহেন তবে তাহাদের স্বতন্ত্র চেষ্টার আবশ্যক হইবে।

পুরাতন জ্যোতিগ্রন্থে লিখিত আছে, কালবিনির্ণয়ের নিমিত্ত পূর্ব্বে ত্রিবিধ প্রণালীর যন্ত্র ছিল। ছায়া যন্ত্র ঘটী যন্ত্র ও স্বয়ম্বহ যন্ত্র। যথা—

"কালস্য দিনগতাব্দেঃ সূক্ষ্মজ্ঞাননিমিত্তং স্বয়ম্বহগোলাতিরিক্তানি স্বয়ম্বহ-যন্ত্রাণি সাধয়েৎ গণকঃ শিল্পাদি স্বকৌশল্যেন কারয়েৎ।" [রঙ্গনাথ]

"ছায়াযন্ত্রৈরনেকধা।"

[সূর্য্যসিদ্ধান্ত]

"ঘটার্দ্ধস্তনাকারং যন্ত্রং ঘটীযন্ত্রম"

[রঙ্গনাথ]

অতএব কালের সূক্ষ্ম নির্ণয় করা পূর্ব্বকালের লোকের অসাধ্য ছিল না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ছায়া-যন্ত্র।—ছায়া-যন্ত্র চারি প্রকার ছিল।

শঙ্কু (১)
যষ্টি (২)
ধনু (৩)
চক্র (৪)

যন্ত্রযষ্টি নামক ছায়াযন্ত্রটী এক্ষণে শ্বেতদ্বীপীয় ভাষায় "স্যণ্ডাইল্" নাম ধারণ করিয়া আছে। অন্যান্য ছায়াযন্ত্রের নির্ম্মাণ-পদ্ধতি এবং গণিতাদি বিচার, যাহা সিদ্ধান্ত শিরোমণি গ্রন্থে লিখিত আছে, গুরূপদেশ ব্যতীত তাহা সুপরিপাটীক্রমে বুঝান যায় না। সুতরাং তাহা অঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। পরন্তু কাশীস্থ বেধালয় বা মানমন্দিরে এই সকল যন্ত্র ভগ্নাবভুগ্ন অবস্থায় বিরাজ করিতেছে, বুদ্ধিমান্ পর্য্যটকগণ তাহা হইতে কথঞ্চিৎ আভাস পাইতে পারেন।

সিদ্ধান্তশিরোমনি গ্রন্থে "শঙ্কু" নামক ছায়াযন্ত্রের বিষয় এই রূপ বর্ণিত আছে।

"সমতলমস্তকপরিধিঃ
ভ্রমসিদ্ধো দন্তিদন্তজঃ শঙ্কুঃ।
তচ্ছায়াতঃ প্রোক্তং
জ্ঞানং দিগ্দেশকালানাম্॥"

শঙ্কু নামক যন্ত্র হস্তিদন্ত দ্বারা নির্ম্মিত, এবং তাহার শিরোভাগ ও পরিধি সমতল। এই যন্ত্রের দ্বারা দিঙ্নির্ণয়, ও কালনির্ণয় হয়।

শুনা যায়, পূর্ব্বকালের লোক সকল অতি সরল ছিল। তাহা মিথ্যা না হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা যে চমৎকারি বা আ-

শ্চর্য্যজনক বিদ্যা সম্বন্ধে কুটিল ছিলেন তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। সেই কারণেই আমাদের দেশ হইতে জ্যোতির্বিদ্যা, মায়াবিদ্যা (ভোজবাজী) যোগ ও শিল্প লুক্কায়িত হইয়াছে। সূর্য্যসিদ্ধান্তকার কালনির্ণায়ক বহুতর যন্ত্রের বিষয় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বলিয়া অবশেষে বলিলেন,—

"শঙ্কুযষ্টিধনুশ্চক্রৈশ্ছায়াযন্ত্রৈরনেকধা।
গুরূপদেশাৎবিজ্ঞেয়ং কালজ্ঞানমতন্দ্রিতৈঃ।"

"গুরোর্নির্ব্যাজকথনাৎ অতন্দ্রিতৈরভ্রমৈঃ পুরুষৈঃ কালজ্ঞানং বিজ্ঞেয়ং সূক্ষ্মাত্বেনাবগন্তব্যম্"

গুরু যদি অকপটে উপরোক্ত যন্ত্রের উপদেশ করেন তবেই তদ্দ্বারা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম রূপে কালনির্ণয় করিতে পারিবেক। নচেৎ পারিবেক না। যাহাই হউক, কালনির্ণয়ের নিমিত্ত যে পূর্ব্বে ৪।৫ প্রকার ছায়াযন্ত্র ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

ঘটী-যন্ত্র। এই ঘটী-যন্ত্র অনেক প্রকারের ছিল। তন্মধ্যে কতকগুলি নিরপেক্ষ অর্থাৎ স্বয়ংবহ, এবং কতক গুলি সাপেক্ষ অর্থাৎ অনির্ব্বহ। সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমনি গ্রন্থে এই দ্বিবিধ যন্ত্রেরই নির্ম্মাণপদ্ধতি ও তাহার কার্য্যকারিতা প্রভৃতি বর্ণিত আছে। পূর্ব্বোক্ত ছায়াযন্ত্র সকল নির্ম্মল দিবাতেই কার্য্যকারী হয়, রাত্রে কি মেঘাচ্ছন্ন দিনে হয় না। এই নিমিত্ত সর্ব্বকাল-সাধারন যন্ত্রের আবশ্যকতা বিধায় সাপেক্ষ ও নিরপেক্ষ এই দ্বিবিধ ঘটী-যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা উল্লিখিত গ্রন্থ দ্বয়ে স্পষ্ট লিখিত আছে।

জলযন্ত্র কপালযন্ত্র, রেণুযন্ত্র প্রভৃতি সাপেক্ষ ঘটী যন্ত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এবং ময়ূর যন্ত্র ও বানর যন্ত্র প্রভৃতি নিরপেক্ষ স্বয়ংবহ যন্ত্র বলিয়া গণ্য।

জলযন্ত্র বা কপাল যন্ত্র কিংবা রেণুযন্ত্র অদ্যাপি প্রচলিত আছে। যাহাকে তামী ঘড়ি ও বালি ঘড়ি বলে তাহাই জলযন্ত্র ও রেণুযন্ত্র। ময়ূর ও বানর প্রভৃতি যন্ত্র এক্ষণে নাই সুতরাং ইহাদেরই বিবরণ ব্যক্ত করা আবশ্যক।

সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপদেশ এই যে,—

তোয়যন্ত্রকপালাদ্যৈর্ময়ূরনরবানরৈঃ। সসূত্ররেণুগর্ভৈশ্চ সম্যক্ কালং প্রসাধয়েৎ॥

এই শ্লোকের মধ্যে যে "ময়ূর" ও "বানর" যন্ত্রের উল্লেখ আছে, আচার্য্য রঙ্গনাথ ইহার অর্থ বিশদ করিয়া বলিয়াছেন যে,—

"ময়ূরাখ্যং স্বয়ম্বহযন্ত্রং নিরপেক্ষং
বানর যন্ত্রং স্বয়ম্বহং নিরপেক্ষম্"
এতৈঃ সম্যক্ রেণুগর্ভৈঃ। সূত্রসংহিতা
রেণবো ধূলয়োগর্ভে মধ্যে যেষাং তৈঃ।
সূত্রপ্রোতাঃ ষষ্টিসংখ্যাকা মৃদ্ঘটিকা ময়ূরোদরস্থা মুখাৎ ঘটিকান্তরেণ স্বতএব নিঃসরন্তীতিলোকপ্রসিদ্ধ্যা তাদৃশৈর্যন্ত্রৈরিত্যর্থঃ। এবং ময়ূরাদি স্বয়ংবহসাধনানি বহবঃ—"ইত্যাদি।

যন্ত্রটি ময়ূরাকৃতি, তাহার উদরে সূত্রগ্রথিত-মৃন্ময় ঘটিকা সূচক ৬০টি অংশ থাকে। প্রত্যেক ১ দণ্ড অন্তর তাহার মুখ দিয়া সেই সূত্র গ্রথিত এক এক অংশ আপনা আপনি নির্গত হইতে থাকে। ইহার নাম ময়ূরযন্ত্র। বানরযন্ত্রও এইরূপ। উদরে

বালুকা-প্রপূরিত থাকিলে মুখ দিয়া প্রতি-দণ্ডে এক ঝলক করিয়া বালুকা নির্গত হয়।

এই স্বয়ম্বহ যন্ত্র-নির্ম্মাণ অতিকষ্ট-সাধ্য ব্যাপার এবং সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে সুলভ নহে। পরন্তু এই স্বয়ম্বহ প্রক্রিয়া কেবল পারদ, সূত্র, আরা ও তৈলাক্ত জল, এই কএক বস্তুর দ্বারাই সাধিত হইত কিন্তু কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া উহার যোজনা করা হইত তাহা এক্ষণে আর আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। সূর্য্যসিদ্ধান্তকার বলিয়াছেন, স্বয়ংবহক্রিয়ার প্রয়োগ অতি দুর্লভ। যথা—

"পারদারাম্বু সূত্রাণি শুল্বতৈলজলানি চ।
বীজানি পাংসবস্তেষু প্রয়োগাস্তেঽপি দুর্লভাঃ।" সিদ্ধান্তশিরোমণি গ্রন্থে কএকটি স্বয়ংবহ যন্ত্রের নির্ম্মাণোপায় লিখিত আছে, আমরা তাহা সুস্পষ্ট হৃদ্বোধ করিতে অসমর্থ। প্রদর্শনের জন্য কএকটি শ্লোক এস্থলে উদ্ধার করিয়া দিতেছি, আশা করি, শিল্পনিপুণ বুদ্ধিমান পাঠকেরা চেষ্টা করিলে তাহা খাটাইয়া লইতে পারিবেন।

শ্লোক—

লঘুকাষ্ঠজ সমচক্রে
সমসুষিরারাঃ সমান্তরা নেম্যাং।
কিঞ্চিদ্বক্রা যোজ্যাঃ
সুষিরস্যার্দ্ধে পৃথক্ তাসাম্।
রসপূর্ণে তচ্চক্রং
দ্ব্যাধারাক্ষস্থিতং স্বয়ং ভ্রমতি॥
উৎকীর্য্য নেমিমথবা
পরিতোমদনেন সংলগ্নম্।
তদুপরি তালদলাদ্যম্
কৃত্বা সুষিরে রসং ক্ষিপেৎ তাবৎ॥
যাবচ্চক্রৈকপার্শ্বে
ক্ষিপ্তজলং নান্যতোযাতি
পিহিতছিদ্রং তদতঃ
চক্রং ভ্রমতি স্বয়ং জলাকৃষ্টম্॥ ইত্যাদি।

এই সকল স্বয়ংবহ প্রক্রিয়া এদেশ হইতে অনেক দিন লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। পাছে কেহ শিখিয়া লয় এই ভয়ে একাকী লুকায়িত হইয়া ইহার নির্ম্মাণ করা হইত। গ্রন্থকারেরাও লুকায়িত হইয়া নির্ম্মাণ করার উপদেশ দিতেন। যথা—

"একাকী যোজয়েদ্বীজং যন্ত্রে বিস্ময়কারিণি।"

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

চমৎকারজনক স্বয়ংবহ যন্ত্রে বীজ অর্থাৎ পারদাদি সংযোগ করিবার সময় একক হইবেক। এই প্রকারের দৌরাত্ম্যে এদেশ হইতে অনেকবিধ বিদ্যার মূলোচ্ছেদ হইয়া রহিয়াছে ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে।

শিল্পসংহিতা নামক একখানি পুরাতন পুস্তক আছে, তাহাতে ময়ূর ও নরযন্ত্র ও বানর যন্ত্রের বিষয় অন্যরূপ প্রথায় উল্লিখিত হইয়াছে। ময়ূরযন্ত্রটি ধাতুময়। উহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, দণ্ড পরিবর্ত্তিত হইলেই পক্ষ প্রসারিত করিয়া ডাকিবে। আর নরযন্ত্রের বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি, দেখুন যে, নরযন্ত্রটির সহিত এক্ষণকার ক্লক্ ওয়াচ্" এর কি তারতম্য।

কল্পিতাঙ্গাং বিষুবতীমাকাশে চাহুমানতঃ,

ষদ্‌গত্যনুগতশ্চক্রবৎ পরিভ্রমতে গ্রহঃ।
তদ্দৃষ্টান্তানুগতে চক্রে প্রত্যক্ষং কালমান-কৃৎ, যন্ত্রং কুর্য্যাৎ পরিধ্যংশাৎ চতুর্ব্বিংশ-তিভাগতঃ।
অহোরাত্রিপ্রমাণঞ্চ প্রত্যক্ষং জায়তে নৃণাম্॥

শিল্পসংহিতা, ২৪ অং

ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আকাশকল্পিত বিষুব রেখা দৃষ্টে লৌহাদি ধাতুতে বিষুববৎ রেখানুরূপ কল্পিত যন্ত্র করিবেক অর্থাৎ সেই রেখাযন্ত্রকে এমত কৌশলে রাখিবেক যে, যেন নিরন্তর সেই যন্ত্র দক্ষিণ ও বামে দোহুল্যমান হয় এবং যাহার গমনানুরূপ গ্রহ নক্ষত্রাদির চক্রাকারে গতি হয়। এতদ্দৃষ্টান্তে অনুমান দ্বারা কাল-নির্ণয়ক যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবেক। ৩৬০ অংশে বিভক্ত আকাশমণ্ডলের পরিধিকে ২৪ অংশে ভাগ করিয়া দিবারাত্রি কালের নিরূপণ করিবেক। অর্থাৎ ১২ ভাগে দিবা ও ১২ ভাগে রাত্রি। অপিচ,

"বিষুবাখ্যং লৌহযন্ত্রং সব্যাসব্যভ্রমাত্মকম্।
যৎপ্রভাবাচ্চক্রমুখে ভ্রমতে নাড়িকণ্টকম্।

ঐ

'দক্ষিণ বাম ভ্রমাত্মক কল্পিত বিষুবাখ্য লৌহযন্ত্র' বোধহয় ইহাই এক্ষনকার পেণ্ডুলম্ অথবা হেয়ার্‌স্প্রিং', ইহারই প্রভাবে যন্ত্রোপরি নাড়ীবোধক কণ্টকের চক্রবৎ ভ্রমি হয়। আরও লিখিত আছে।

লৌহমুদ্রাং সঙ্কুচিতাং মনুষ্যাখ্যাং প্রকল্পয়েৎ।
পৃষ্ঠকস্থাঞ্চ তাং মুদ্রাং সূক্ষ্মশৃঙ্খলবেষ্টিতাম্।
গতানুগতমন্তব্য পূর্ণংজ্ঞাত্বা ষড়ঙ্গুলম।
ততঃ স্বাভাবিকং কুর্য্যুর্ব্বিলোমেন চ শিল্পিনঃ।

ঐ *

মনুষ্যাখ্য লৌহমুদ্রাকে সঙ্কুচিত অর্থাৎ জড়াইয়া কৌটার ভিতর রাখিয়া সূক্ষ্ম শৃঙ্খল দ্বারা বেষ্টন করত দ্বিতীয় কীলকে অর্থাৎ খুটিতে বান্ধিবেক। এই লৌহমুদ্রা আর মেন স্প্রীং এবং সূক্ষ্ম শৃঙ্খল আর চেইন তুল্য পদার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে। বিষুবযন্ত্র অর্থাৎ পেণ্ডুলম বা হেয়ার স্প্রীংয়ের বলে ষড়ঙ্গুল-প্রমাণ সূক্ষ্ম শৃঙ্খল যখন ঐ মনুষ্যাখ্য লৌহযন্ত্রের বেষ্টন হইতে শিথিল হয় তখন তাহা অন্য কীলকে জড়াইবেক, শিল্পি তাহা অনুমান দ্বারা অনুভূত করিয়া পুনর্ব্বার তন্নিয়মে বিলোমপ্রকারে ঐ যন্ত্রের সূক্ষ্ম শৃঙ্খলকে জড়াইয়া দিবেক। ঐ ছয় অঙ্গুল পরিমিত শৃঙ্খলের অনুলোম গতিতে অহোরাত্রের গতাগত দণ্ডাদি নির্ণয় হইবেক।

শিল্পসংহিতার ২৪ অধ্যায়ে এবং ২৮ অধ্যায়ে এই রূপ ঘটীযন্ত্রের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অবশেষে এই রূপ উক্তির দ্বারা অধ্যায় সমাপ্ত করা হইয়াছে—

এষা ঘটী কালপরীক্ষণায় প্রকল্পিতা বিশ্বকৃদাত্মজেন।
সম্যক্ সুবিজ্ঞায় হিতায় জন্তোঃ শিষ্যান্ সমাদিশ্য গতোম্বরে পুনঃ।"

[শিল্পসংহিতা, ২৮ অং]

ব্রহ্মার পুত্র বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক এই কাল-

* এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ ও পুরাতন পুস্তক আমরা দেখি নাই। খণ্ডিত শ্লোক পাইয়া ইহা লিখিলাম; যদি কৃত্রিম না হয় তবে আশ্চর্য্য বটে।

পরীক্ষা কারক ঘটীযন্ত্র কল্পিত হইয়াছিল। শিল্পিবর বিশ্বকর্ম্মা সম্যক্ প্রকারে জ্ঞাত হইয়া মানবহিতার্থে পৃথিবীস্থ শিষ্যদিগকে ইহা শিক্ষা প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার অম্বর-পথে গমন করিয়াছিলেন।

শিল্পসংহিতা যদি বাস্তবিক পুরাতন হয় তাহা হইলে এই ঘটীনির্ম্মাণ-প্রথা বিস্ময়কর বটে। না হইলেও পূর্ব্বোল্লিখিত ময়ূর ও বানর প্রভৃতি স্বয়ংবহ যন্ত্র গুলি প্রাচীন ভারতের সামান্য কীর্ত্তির বিষয় নহে।

অপিচ, সূর্য্যসিদ্ধান্ত হইতে যে "পারদাম্বু সূত্রাণি" বচন উদ্ধৃত করা হইয়াছে, এই শিল্পসংহিতায় তাহাকে কালনির্ণায়ক না বলিয়া গ্রীষ্মাদি নির্ণায়ক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা—তুঙ্গবীজপ্রযুক্তিযোগাৎ তদ্বন্নির্ণীয়তে ঘর্ম্মঃ।"

[তুঙ্গবীজং পারদম্]

পারদ দ্বারা গ্রীষ্ম ও বাত্যা নির্ণয় করিবার কৌশল যদি শিল্পসংহিতা অবগত থাকেন, আর তাহা যদি অনধিক ৪০০ বৎসরের পুরাতন গ্রন্থও হয়, তাহা হইলে "থর্ম্মোমেটর ও বেরোমেটরের নির্ম্মাতাকে পুরাতন বস্তুর নূতন নাম প্রদান করিতে অত্যন্ত পটু বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি।

"প্রসাদাৎ কস্যচিদ্ভূয়ঃ
প্রাদুর্ভবতি কালতঃ।" ইত্যলম্।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত।

শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

মেকলের ভারতবর্ষ-প্রবাস।

মেকলে বলিয়াছেন যে এদেশে যে সকল বড় বড় ইংরাজের সহিত তাঁহার আলাপ হয় তাঁহারা লণ্ডন সমাজের বিদ্বজ্জনগণের সমস্পর্দ্ধী হইতে পারেন না। তাঁহার এ কথা বলিবার অধিকার ছিল। মেকলের সমসাময়িক নানা রত্নে যে সমাজের ভূষণ ছিল এ দেশে যে তাহার প্রতিরূপ দর্শন দুর্লভ, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। তিনি পার্লমেণ্ট সভায় যে সকল সুবক্তার সহিত বাগযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বীয় বাগ্মিতার পরিচয় দিতেন, যে সকল কবি বিদ্বান ও রসিক পুরুষদের Holland গৃহের ভোজনশালায় একত্রিত দেখিতেন, তাঁহাদিগকে মনে করিয়া এই ভারতবর্ষে প্রবাস তাঁহার নিকট কি নীরস, কি শূন্য প্রতীয়মান হইত। এই সকল লোকের কথা তাঁহার পত্রাবলির মধ্যে মধ্যে কথিত আছে। ইহাদের মধ্য হইতে Sidney Smith ও কবি Rogers, এই দুই জনকে বাছিয়া লইয়া দেখা যাউক তাহাদের বিষয় মেকলে কি বলেন। সিড্‌নি স্মিথ্ ইংলণ্ডের এক জন ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে তাঁহার ব্যবসায়ানুরূপ গাম্ভীর্য্য প্রকটিত ছিল না। তিনি রসিকতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার

কথা মেকলে তাঁহার এক পত্রে লিখিয়াছেন, যথা—

"কাল অমুকের গৃহে ভোজন করিলাম। সেখানে রামমোহন রায়ের* সঙ্গে দেখা হইবার কথা ছিল কিন্তু আর আর যে সকল বিদ্বান ও রসিক লোকের সমাগম হইয়াছিল তাঁহাদের পাইয়া তাঁহার অদর্শনের ক্ষোভ অনেকটা দূর হইল। দর্শনীয় পুরুষের মধ্যে প্রধান দুই জন উপস্থিত ছিলেন, রজস্ ও সিডনি স্মিথ। আমি এদের পৃথক্ পৃথক্ অনেকবার দেখিয়াছি, কিন্তু এই দুই জনকে আর কখন একসঙ্গে এক মজলিসে দেখি নাই! এ দেখায় একটা নূতনত্ব ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটু কৌতূহল মিশ্রিত ছিল, কেন না সকলেই জানিত ইহারা পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী, আর তাঁহারা পরস্পরের প্রতি যে সকল খরতর বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতেন তাহা সকলেরই মুখস্থ। কে একজন বলিয়াছে যে সভার মধ্যে একজন রসিক পুরুষ থাকিলে আমোদ আছে, কিন্তু দুজন রসিকের মিলন অসহনীয়। একথা সত্য। আশ্চর্য্য এই সে রাত্রে তাঁহাদের দ্বন্দ্ব,যুদ্ধে প্রবৃত্তি হয় নাই। যখন একজন শ্রোতৃবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন তখন অন্যজন চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আর ইহা বলা বাহুল্য যে সিডনি স্মিথ্ রাজার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন আর বেচারা রজস্ প্রায়ই নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলেন। কখন কখন মজলিস দুই দলে বিভক্ত হইতেছিল, ও তাঁহারা প্রত্যেকে এক এক দলকে পাইয়া বসিতে ছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে আমার অনেক কথা হইল। * * * আমি সিড্‌নি স্মিথকে বলিলাম আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়া রামমোহন রায়কে না দেখিবার ক্ষোভ অনেকটা মিটিল। সিড্‌নি বলিয়া উঠিলেন, কি? ক্ষোভ মিটিল? আপনি আমার অপমান করিতে চান? আমি ইংলণ্ডের একজন পুরোহিত, রাজ পুরোহিত,এমন বড় মানুষের বাড়ীর পুরোহিত—আর আমার সঙ্গে এক জন ভিখারী বামনের তুলনা? তাতে আবার সে জাতিচ্যুত,পতিত হয়েছে,আপনার ধর্ম্ম হ'তে ভ্রষ্ট হয়ে অন্য একটা ধর্ম্ম হাতড়ে বেড়াচ্ছে—খুঁজে পাচ্ছে না—শুনেছি না কি সে ম্লেচ্ছ, আবার গোপনে গোমাংস ভক্ষণ করে। যদি প্রাচীন কালের বৈদিক নিয়ম উচিত মত প্রচলিত থাকিত তা হলে তার কানে সিসে ঢালিয়া দেওয়া যাইত কি না বল দেখি?

সিড্‌নি স্মিথের দ্রুত হাস্যময় চীৎকারধ্বনি—তাঁহার পুরোহিতোচিত হৃষ্টপুষ্ট কায়, আর রজর্সের মৃদু মন্দ অথচ সুদৃঢ় স্বর ও শবাকার মুখ—এদুই যেমন পরস্পর বিভিন্ন এমন আর কিছুই নহে। তাঁহারা যেসকল কথা বলেন তাহার মধ্যে যেরূপ

* রামমোহন রায় তখন বিলাতে। তিনি সেখানকার সমাজে বহু সমাদরে গৃহীত হইয়াছিলেন। সকলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ব্যগ্র। যে দেশের লোকেরা সেক্সপিয়রের মতে মৃত হিন্দু দেখিবার জন্য লালায়িত, তাহাদের জীবন্ত হিন্দু দেখিবার জন্য না জানি কত কৌতূহল হইয়া থাকিবে!

প্রভেদ—তাঁহাদের বলিবার ধরণ ও ভাব-ভঙ্গীতেও সেই রূপ। রজর্সের কথাবার্ত্তা আশ্চর্য্য ঘসামাজা ও কৃত্রিম মনে হয়। তিনি যাহা বলেন তাহা বোধ হয় যেন অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ও তাহা ছাপাইতে গেলে অধিক সংশোধনের আবশ্যক করে না। সিড্‌নি উপস্থিত বক্তা—প্রসঙ্গের ঝোঁকে যা মনে আসে তাই বলেন আর তাঁর হাস্য পরিহাসের অন্ত নাই।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেকলে তাঁহার ভগিনীদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। যাঁহারা তাঁহার লেখা দেখিয়াই তাঁহাকে জানেন, অথবা তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যে তাঁহার চরিত্র পাঠ করেন, তাঁহারা হয়ত সহজে বিশ্বাস করিতে পারেন না যে তাঁহার মনে ভালবাসার ন্যায় কোন কোমল ভাব স্থান পাইত। তাঁহাদের হয়ত তাঁহাকে কঠোর-হৃদয় প্রখর-বুদ্ধি তার্কিক বলিয়াই মনে হইতে পারে। কিন্তু যাঁহারা এরূপ মনে করেন তাঁহারা তাঁহার চরিত্রের কোমল ভাগটী অবগত নহেন। পরিবারের প্রতি মেকলের প্রগাঢ় মমতা ছিল। বাহিরের লোকের সহিত যদিও তিনি বড় মিশিতেন না তথাপি তাঁহার দুই একটী হৃদয়সখা ছিল, তাহাদের প্রতি তিনি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। সকল অপেক্ষা যিনি তাঁহার প্রিয় সুহৃৎ ছিলেন তাঁহার নাম Ellis। বয়সে তিনি মেকলে হইতে বার বৎসর বড়। যদিও তাঁহারা একই কালেজের সহাধ্যায়ী কিন্তু কালেজে তাঁহাদের আলাপ পরিচয় হয় নাই। অনেক বৎসর পরে সমান কর্ম্মক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রণয়ের সূত্রপাত হয়। তাঁহারা উভয়েই ব্যারিষ্টরের ব্যবসায় অবলম্বন করেন। উভয়েরই প্রাচীন গ্রীক লাটিন ভাষার উপর অটল অনুরাগ। রুচি ও চরিত্রের সাদৃশ্য-গুণে তাঁহাদের পরস্পর এরূপ প্রগাঢ় প্রণয়ের সঞ্চার হইল যে তাহা জীবনের সমুদয় পরিবর্ত্তনের মধ্যে অক্ষত—সুখ দুঃখে অবিচলিত ছিল। মেকলে যেখানেই থাকুন, তাঁহার বন্ধুকে তাঁহার নিয়মিত পড়া শুনার হিসাব দিতে ভুলিতেন না, ও তিনি যে রাশি রাশি গ্রন্থ গলাধঃকরণ করিতেন তাহার বিস্ময়জনক তালিকা তিনি যে এলিসকে পত্র লিখিতেন তাহাতে দৃষ্ট হইবে। এলিস বিবাহিত ছিলেন—১৮৩৯ সালে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। মেকলে যখন পত্নী-শোক-কাতর প্রাণসখার অশ্রুজলের সহিত আপনার অশ্রুজল মিশাইলেন তখন অবধি তাঁহার প্রণয়-বন্ধন আরো দৃঢ় ও অকাট্য হইল। মেকলে প্রথমে পরলোকগামী হয়েন—তাঁহার মৃত্যুর পর এলিস আর অধিক দিন জীবিত ছিলেন না, বন্ধুবিচ্ছেদে ম্রিয়মান হইয়া এক বৎসর পরেই তিনি তাঁহার অনুগামী হইলেন।

মেকলে যদিও চিরকাল অবিবাহিত ছিলেন তথাপি গার্হস্থ্য জীবন তাঁহার অতীব আদরণীয় ছিল। তিনি স্ত্রীপুত্রহীন হইয়াও বিশেষ রূপে গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা ভগিনীদিগকে সুখী করিবার জন্য তিনি কায়মনে তৎপর ছিলেন ও তাঁহাদের সংসর্গে স্বর্গের সুখ অনুভব করিতেন।

তিনি যে আত্মোন্নতির প্রতি যত্নশীল ছিলেন সে কেবল আপনার জন্য নয়, কিন্তু পিতা ও ভগিনীদিগের সন্তোষ সাধন তাঁহার এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি এক স্থানে স্পষ্টই বলিয়াছেন—"পৃথিবীতে আমার নাম হইবে—লোকে আমাকে মান্য করিবে—এ অভিলাষ আমার অহঙ্কারের সহিত তত সন্নিস্ট নয় যত তোমাদের ভালবাসার সঙ্গে জড়িত, আমার মান সম্ভ্রমের অভিলাষও এইরূপে এক কোমল ভাব ধারণ করিয়াছে। আমার প্রিয় মাতা আমাকে যেরূপ স্নেহ করিতেন—তিনি ছেলেবেলা অবধি আমার অভ্যুন্নতির প্রতি যেরূপ মনোযোগ দিতেন, তাহা হইতেই আমার এই ভাবের উৎপত্তি। আমি যাহাদের ভালবাসি তাহারা যাহাতে সুখে থাকে, বাল্য কাল হইতে আমার তাহাই ইচ্ছা, এই ইচ্ছা ও আমার যশোলিপ্সা—এই দুই ভাব এরূপ সম্মিলিত হইয়াছে যে সে দৃঢ়বন্ধন কখন ছিন্ন হইবার নহে।"

এই বিষয়ে মেকলেকে আরো বলিতে দেওয়া যাক্, তিনি নিজের ভাব নিজে যেরূপ ব্যক্ত করিতে পারিবেন আমরা বাহির হইতে তেমন পারিব না। দাস-ব্যবসায়ের বিপক্ষাচারী মহাত্মা Wilberforceএর মৃত্যু উপলক্ষে তিনি তাঁহার ভগিনী হানাকে লিখিতেছেন—

তবে Wilberforce গিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান জাজ্বল্যমান, তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল ছিল, যাতনায় নিতান্ত অবসন্ন না হইলে আর তাঁহার প্রফুল্লতা নষ্ট হয় নাই। মৃত্যুশয্যায় তিনি যে সকল কথা বলিলেন তাহাতে বোধ হইল তাঁহার অনেক দিন বাঁচিবার সাধ ছিল। যে ব্যক্তির সংসারের আকর্ষণ এত অল্প, যাহার পরলোকে এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, যাহার অর্থনাশ, শরীরক্ষয় হইয়াছে তাহার ওরূপ হওয়া আশ্চর্য্য বলিতে হইবে। এ কি প্রলোভন বল দেখি, যাহা আমাদের বর্ত্তমান এত প্রকার যন্ত্রণা সত্ত্বে, ভবিষ্যৎ সুখের আশা সত্ত্বেও আমাদিগকে জীবনের প্রতি এত আসক্ত করে! আমি তাহাকে যথার্থ ভালবাসিতাম—অর্থাৎ লোকের মধ্যে যেমন সচরাচর ভালবাসা হয়,—কিন্তু সে কতটুকু? পৃথিবী একজন লোককে হারাইয়া কতটুকু শোক করে? বড় বড় বিদ্বান সাধু পুরুষ ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া যে অভাব রাখিয়া যান তাহা কত শীঘ্র পূরণ হয়। আমি ভাবিতেছিলাম আমার কোন পরিচিত লোক মরিয়া গেলে আমার ভাব কি রূপ হয়? আমাদের নিজের স্বার্থপরতা দেখিয়া শেখা উচিত অন্যেরা আমাদের জন্য কত কাল শোক করিবে। যদি কল্যই আমার মৃত্যু হয়, তবে যাহাদের সঙ্গে আমি একত্রে প্রতি সপ্তাহে পানভোজন করিয়া থাকি তাহারা আমার অভাবে একটী সুস্বাদু সামগ্রীও অনাস্বাদে ফেলিয়া রাখিবে না—স্যাম্পেন পান করিতে করিতে কোন ললনাকে লক্ষ্য করিয়া একটী হাসিও কম হাসিবে না। অন্যের প্রতি আমারও ভাব ঐরূপ। শেলীর সে সুন্দর কবিতাগুলি কি?

Oh world ! farewell !
Listen to the passing bell,
It tells that thou and I must part
With a light and heavy heart!

সমুদয় জগতে এমন দশ জন নাই যার অভাবে আমার ক্ষুধামান্দ্য হয়, কিন্তু দুটি একটি এমন আছেন যাদের বিয়োগে আমার হৃদয় ভগ্ন হইয়া যায়। পৃথিবীর ভাব যতই দেখিতেছি, যত অধিক লোকের সঙ্গে পরিচিত হইতেছি ততই আমার ভালবাসা আরো সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ হইতেছে। ভগিনীদের উপর আমার মমতা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে, আমার দুই একটী পরীক্ষিত পুরাতন বন্ধুর প্রতি আমি ততই আসক্ত হইতেছি।"

আমরা দেখিতেছি মেকলের ভারতবর্ষ আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থোপার্জ্জন দ্বারা নিজের স্বাধীনতা ও পরিবারের সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করা। ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি তাঁহার ইংলণ্ডবাসিনী ভগিনী দ্বয়কে লেখেন—

আমার টাকা কড়ার বিষয় মন্দ চলিতেছে না। আমার যত ব্যয় হইবে মনে করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে আমার নির্ব্বাহ হইবে দেখিতেছি। যত কাল আমার এদেশে থাকা হইবে তাহার মধ্যে প্রতি বৎসর প্রায় ৭০,০০০ করিয়া জমিবে।

নাতালের সময় (Christmas) আমার পিতা ও তোমাদের সকলের জন্য ১০।১২০০০ টাকা বাড়ী পাঠাইতে পারিব। এতে যে আমার কি আনন্দ হইতেছে বলিতে পারি না। ইহাতে আমি প্রবাসের সমুদয় যন্ত্রণা—ঈশ্বরই জানেন সে কি বিষম যন্ত্রণা —সহ্য করিতে পারিতেছি। আর কয়েক বৎসরের মধ্যে—তোমাদের আমার এই পত্র প্রাপ্তির ৫ বৎসরের মধ্যেই—হয়ত আমি বাড়ী গিয়া তোমাদের সহিত মিলিতে পারিব। আমরা আপনার আলাদা বাড়ী করিয়া সুখসচ্ছন্দে বাস করিতে পারিব, আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন চিন্তা থাকিবে না—কাহারো ঋণপাশে বদ্ধ থাকিব না—আর রাজ্যের মধ্যে যে কোন পরিবর্ত্তন হউক তাহাতে আমাদের সৌভাগ্য অক্ষত থাকিবে। ইহা নিশ্চয় জেন, প্রিয় ভগিনীগণ! তোমাদের উপর ভালবাসা আমার সমানই থাকিবে। আমি কি তোমাদের ভুলিতে পারি। তোমাদের সুখ উদ্দেশেই আমি এদেশে পদার্পণ করিয়াছি—তোমাদের ভুলিয়া যাইব—এত হতেই পারে না।"

মেকলের ভগিনীগণের উপর যে মমতা তাহা ভ্রাতৃস্নেহের আদর্শ-স্বরূপ। আমাদের মধ্যে ভাইবনের যে ভালবাসা তাহা ক্ষণপ্রভার ন্যায় অস্থায়ী। তাহার প্রধান কারণ এই যে ভ্রাতা ভগিনীর একত্র সহবাস অল্প কালের জন্য, ভগিনী যে অল্প বয়সে পতিগৃহে বাস করিতে যান, তাহাতে ভ্রাতা ভগিনীর বাল্য-প্রণয় বদ্ধমূল হইবার সময় পায় না। পিতৃগৃহের একরূপ ভাব—একরূপ শিক্ষা, পতিগৃহে হয়ত তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পিতৃগৃহে সুশিক্ষিতা কন্যা অশিক্ষিত পতির হস্তে পড়িয়া পতিগৃহে বধূজন-সুলভ নির্যাতন ভোগ করিয়া যে কি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় তার ভূরি ভূরি

দৃষ্টান্ত আমাদের পরিবারের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। স্ত্রী-চরিত্র স্বামীর দোষগুণ স্পর্শে নূতনরূপে সংরচিত হয়। যেমন আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "যাদৃক্‌-গুণেন ভর্ত্রা স্ত্রী সংযুজ্যেত যথাবিধি তাদৃক্‌ গুণা সা ভবতি সমুদ্রেণেব নিম্নগা" অর্থাৎ নদী যেমন সমুদ্রের সহিত মিলিয়া লবণাক্ত হয়, স্ত্রীও সেইরূপ ভর্তার সহিত সংযুক্ত হইয়া ভর্তৃগুণ-সম্পন্না হয়েন। এই কারণে ভ্রাতা ভগিনীর বাল্যপ্রণয় অধিক-কাল স্থায়ী হয় না। শুধু আমাদের মধ্যেই কেন, ভ্রাতা ভগিনীর প্রণয় সর্ব্বত্রই দুর্লভ। ভ্রাতা ভগিনীকে যতই ভাল বাসুন না কেন, সে ভালবাসার সম্পূর্ণ প্রতিদান কখনই সম্ভবে না। ভগিনীর হৃদয় শীঘ্রই অন্যের হইয়া পড়ে। এই কারণে মেকলেরও অনেক সময় কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে। তিনি একে একে তাঁহার ভগিনীদিগকে হারাইলেন। তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার ভগিনী মারগ্রেটের বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। তাহাতে তিনি দুঃখ করিয়া লিখেন—

"ভাই বোনের ভালবাসা যতই নিঃস্বার্থ সুখময় সুকোমল হউক না কেন, তাহা অন্য অনুরাগের বলে এরূপ অভিভূত হইবার সম্ভাবনা যে বিবেকী ব্যক্তি কখন তাহার উপর আত্মসুখ-সেতু নির্ম্মাণ করিবেন না। কন্যা পিতৃগৃহ হইতে বিযুক্ত হইয়া অন্যত্র গমন করিবে, রক্তের যে স্বাভাবিক টান তাহা ছাড়িয়া অন্য বন্ধনে আবদ্ধ হইবে এ নিয়ম অকাট্য। ইহা পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। ইহা মানবপ্রকৃতিতে বদ্ধমূল। প্রেমের অদূরদর্শিতা বশত এই সামাজিক নিয়ম আমার কষ্টজনক হইতেছে বলিয়া ইহার জন্য আক্ষেপ করা নিতান্ত অমূলক স্বার্থপরতার কার্য্য।

আমার এক্ষণে আর একটী বাজী হারিবার বাকি আছে। যদি কখন সে আশঙ্কিত ঘটনা উপস্থিত হয় তাহার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া থাকি। যদি আর কাহারো হৃদয় গার্হস্থ্য দুঃখের জন্য সৃষ্ট হইয়া থাকে সে আমারই। আমার ভাগ্যে যখন সে ঘটনা উপস্থিত হইবে তখন হইতে পৃথিবীতে আমার এক যশোবাসনা ভিন্ন আর কোন সম্বল থাকিবে না। কিন্তু সকল রোগেরই ঔষধ আছে, এমন পীড়া নাই কাসে করিয়া ও দায়ে পড়িয়া যাহা সহ্য করা না যায়। আমিই বা কি—আমার ন্যায় আমার পিতৃপুরুষেরা—কত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি জীবন-যুদ্ধিতে বাজি জিতিবার আশয়ে দ্বিগুণ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছে, আর তাহা হারাইয়া তাহাদের দ্বিগুণ জ্বালা সহ্য করিতে হইয়াছে।"

স্বদেশ ছাড়িবার দুই বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মারগ্রেট ভগিনীর বিবাহ হইয়া যায়, তাঁহার ভারতবর্ষে আসিবার অনতিবিলম্বেই তাঁহার ভগিনী হানাও পরহস্তগতা হইলেন। এই বিবাহ যদিও মেকলের সম্পূর্ণ অভিমত ছিল, বরটি যদিও তাঁহার সম্পূর্ণ মনের মতন হইয়াছিল, তথাপি এমন শুভ ঘটনাতেও তিনি সর্ব্বতোভাবে সুখী হইয়াছিলেন বলা যায় না। এই উপলক্ষে

তিনি তাঁহার মারগ্রেট ভগিনীকে যে পত্র লেখেন তাহাতে তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ পাইতেছে—

"আমি তোমাকে যে বিষয় লিখিতে বসিয়াছি তাহা হানার পত্রে কতকটা অবগত হইয়া থাকিবে। হানার বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে—এ বিবাহে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। তার জন্য যদি আমাকে এদেশে বর খুঁজিতে হইত তাহা হইলে এমন বর খুঁজিয়া পাইতাম না। ইঁহাকে পাইয়া হানা সুখী হইবে তাহা আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। ট্রেবেলিয়ানের বয়স ২৮ বৎসর। তিনি হেলিবরিতে শিক্ষালাভ করিয়া এদেশে আসিয়াছেন। এখানে তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি কার্য্যকুশলতা, উদার রাজনীতিজ্ঞান ইত্যাদি কারণে তিনি তাঁহার সমবয়স্ক লোকদের অপেক্ষা সমধিক সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি Sir Edward Colebrook এর অধীনে কার্য্যারম্ভ করেন। লোকটা বিদ্বান ও লোকপ্রিয় বটে, কিন্তু তাঁর চরিত্র নিতান্ত মন্দ। এই ব্যক্তি ট্রেবেলিয়নকে আপনার জুয়া ব্যবসায়ে দীক্ষিত করিবার চেস্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু যুবকের মন তাহাতে অবনত হইবার নহে। যখন তাঁহার ২১ বৎসর বয়ঃক্রমমাত্র আর Sir Edward এদেশের প্রায় সর্ব্বোচ্চপদে আরূঢ় ছিলেন, তখন সেই অল্পবয়সে তিনি সার এডওয়ার্ডের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ উপস্থিত করেন। তাহার উপর দিয়া এক প্রবল ঝটিকা বহিয়া গেল। তাঁহাকে প্রায় সকলেই তিরস্কার করিতে লাগিল, অনেকে তাহার সহিত আলাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিল। কিন্তু তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়া ছিলেন। কতক সপ্তাহ ধরিয়া বিচার চলিয়া তাঁহার অবশেষে জয় লাভ হইল। Sir Edward অপমানের সহিত কর্ম্মচ্যুত হইলেন। এখনকার গবর্ণমেণ্ট ও বিলাতের ডাইরেকটরগণ তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল। তখন অবধি তাঁহার উন্নতির দ্বার মুক্ত হইল ও সকলেই ভাবিল তাঁহার ভাগ্য ফিরিয়াছে। লাট সাহেব তাঁহাকে বলিলেন তোমার কি ইচ্ছা বল আমি তাহাই পূর্ণ করিতে প্রস্তুত। Lord William সহজে কাহারো বশীভূত হন না, কিন্তু ট্রেবেলিয়নের উপর তাঁহার যথেস্ট অনুগ্রহ। তিনি যে তাহার অন্ধ পক্ষপাতি তাহা নহে, কিন্তু তিনি বাস্তবিক তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া তাহাকে চিনিয়াছেন। * * *

তাঁহার যেমন গুণ, রূপও তেমনি, বিশেষতঃ অশ্বপৃষ্ঠে তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখায়। তিনি চঞ্চল বলিষ্ঠ ও সকল অপেক্ষা ভয়ানক উৎসাহজনক শিকার—যে বরাহশিকার তাহাতে বিলক্ষণ পটু। তাঁহার মুখশ্রী উত্তম ও উৎসাহানলে পূর্ণ—আমার বড়ই ভাল লাগে। কার কোন্ কুলে জন্ম তাহা জানিবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ নাই, কিন্তু বলিতে কি—ইংলণ্ডের এক প্রাচীন উচ্চকুলে ইঁহার জন্ম।

তাঁহার বয়সের ২০ হইতে ২৫ বৎসর

পর্য্যন্ত তিনি এক সুদূর বিজন প্রদেশে অবস্থিত ছিলেন। সেখানে রাজকার্য্য ও শীকারেই তাঁহার সমস্ত সময় চলিয়া যাইত। একজন ইংরাজ স্ত্রী কি পুরুষের মুখ দর্শনও হয়ত তাঁহার ভাগ্যে ঘটিত না। ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া তিনি কথা কহেন না। তিনি ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের চিন্তাতেই ব্যস্ত। কোর্ট্‌সিপ করিবার সময়ও তাঁহার আর কোন কথা নাই, বাষ্পপোতের চলাচল, দেশীয়দের শিক্ষাদান, চিনির করের সুব্যবস্থা, দেশীয় ভাষায় আরব্য অক্ষরের স্থানে রোমক অক্ষরের প্রয়োগ, ইত্যাদি বিষয়েই তিনি কথোপকথন করিতেন।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভালবাসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি তাহা প্রথম হইতেই দেখিয়াছিলাম। যদিও ওসব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া আমার স্বভাব নয়, তথাপি হানার সুখের প্রতি আমি উদাসীন থাকিতে পারি না। পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে তিনি কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন তাহার প্রতি স্বভাবতই আমার দৃষ্টি পতিত হইত। আমার বোধ হয় তাঁহার ভাব তিনি নিজে বুঝিবার আগেই আমি বুঝিয়াছিলাম, আর তাহাতে ব্যাঘাত দিবার ইচ্ছা করিলে আমি সহজেই কৃতকার্য্য হইতাম, কেন না টেবেলিয়ানের প্রতি একটু বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলেই তিনি ভগ্নোদ্যম হইতেন। কিন্তু প্রিয়তমা মারগ্রেট! এরূপ স্বার্থপরতা আমার মনে স্বপ্নেও উদয় হয় নাই! আমার প্রিয় হানাটিকে তাহার মনোমত পতি বরণ করিতে বাধা দেওয়া অপেক্ষা আমি তাহাকে সন্ন্যাসিনী-বন্দিশালায় পুরিয়া রাখি না কেন! অতএব আমি তাহাদের পরস্পর মিলন ও অনুরাগ বর্দ্ধনে সাহায্যদানেই যত্নবান হইলাম। আমার নিজের কষ্ট তোমাদের আর বলিয়া কি হইবে? তোমার সহিত যখন আমার বিচ্ছেদ হইল তখনই আমার হৃদয় ভগ্নপ্রায় হইয়াছিল; কিন্তু যখন তোমাদের হারাইলাম তখন আমার হানা ছিল, আমার আর আর পরিচারকেরা ছিল, আমার বন্ধু ছিল—আমার দেশ ছিল। এখন আমার আপনার মনের বল ভিন্ন আর কিছুই নাই, আর আমার কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছি এই আত্মপ্রসাদটুকু আছে। এর জন্য দুঃখ করিয়া কি হইবে? আমার কষ্টের কারণ আমি আপনিই। বিবেক ও দূরদর্শিতার উপদেশ আমি অগ্রাহ্য করিয়াছি। পাশার কি দান পড়িবে তাহা বিবেচনা না করিয়া বাজি রাখিয়া আমার সুখ বিসর্জ্জন দিয়াছি। খড়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়াছি, বালির উপর ঘর বাঁধিয়াছি, আর এক্ষণে তাহার ফল ভোগ করিতেছি। আমার যে শাস্তি তাহা আমাকে ভোগ করিতেই হইবে। কেবল আমার কষ্টে অন্যে কষ্ট না পায় সেইটি দেখিয়া চলিতে হইবে।

হানা আমার সঙ্গে সাধ্যমত সদ্ব্যবহারে ত্রুটি করেন নাই। তিনি প্রস্তাব করিতেছেন আমরা সকলে মিলিয়া এক পরিবারের মত থাকিব, আর Trevelyan যদিও অন্যান্য

প্রেমিকের ন্যায় তাঁহার দেবীর একান্ত সেবার প্রার্থী, তবুও তিনি ঐ প্রস্তাবে আহ্লাদের সহিত সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দেশের ন্যায় এখানে ওরূপ একত্র বাস তেমন কিছু আশ্চর্য্য নয়। এখানে অনেক সময় ওরূপ ঘটিয়া থাকে, আর ইংলণ্ডে উক্ত রূপ প্রণালী অবলম্বনের পক্ষে মহা বিঘ্নকারী যে চাকরদের লইয়া গণ্ডগোল এখানকার সংসারে তাহার কোন আশঙ্কা নাই। ইহাতে আমাদের এক বিশেষ সুবিধা এই হইবে যে আমরা উভয়েই অনেক টাকা বাঁচাইতে পারিব। ট্রেবেলিয়ন শীঘ্রই তাঁহার ফর্লোরি ছুটি পাইবেন কিন্তু আমার স্বদেশে যাত্রার সময় উপস্থিত না হইলে তাহা নেবেন না স্থির করিয়াছেন।

আমার পিতাকে অবশ্য আমি খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া লিখিব। কিন্তু আমার মনের আসল ভাব তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। ছেলেবেলায় যে সকল কবিতা কণ্ঠস্থ করিতাম তাহার একটি আমার মনে পড়িতেছে—এই কয়ছত্রে আমার জীবনবৃত্ত বর্ণিত দেখিতে পাইবে—

There were two birds that sat on a stone:
One flew away, and there was but one—
The other flew away, and then there was none;
And the poor stone was left all alone.

পাথরেতে বসে ছিল ছোট দুটি পাখী,
একটী উড়িয়া গেল—একটী রইল বাকি,
অন্যটীও উড়ে গেল, কেহ না রহিল,
বেচারী পাথর খানি একলা পড়িল। ”

আর এক স্থানে তিনি কহিতেছেন—

“আমার যেন সকল বস্তুতে বিরাগ ও অবিশ্বাস জন্মিতেছে। আমার যে বুদ্ধির তারতম্য ঘটিয়াছে তাহা নহে, কিন্তু বোধ হইতেছে যেন বুদ্ধিবৃত্তিতে আমার আর আর সমুদায় প্রবৃত্তি বিলীন হইয়া লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমার বিজ্ঞানস্পৃহা তেমনি রহিয়াছে, বরং এই সকল শোচনীয় ঘটনার মধ্যে আরো বলবতী হইয়াছে, অন্য দেশের অন্য কালের উচ্চমনা লোকদের সহিত আলাপ-তৃষ্ণা তেমনিই রহিয়াছে, বর্ত্তমান ভুলিয়া দূরস্থ অতীত ভবিষ্যৎ ঘটনার সহিত মিশিয়া যাইবার ক্ষমতা তেমনিই অনুভব করিতেছি। গ্রন্থঅধ্যয়ন আমার একমাত্র সম্বল হইয়া পড়িতেছে। আমি যদি আমার ইচ্ছামত কালক্ষেপ করিতে পারিতাম তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সকল পুস্তকালয় আমরা একত্রে দেখিয়া আসিয়াছি তাহার কোন একটার মধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া সকলি ভুলিয়া থাকিতাম। গ্রন্থঅধ্যয়ন আমার একমাত্র কাজ—ইহা ভিন্ন একদণ্ডকাল কাটাইতে প্রবৃত্তি হয় না। ”

তাঁহার হানা ভগিনীর বিবাহের কিছু দিন পরেই তাঁহার আর একটা নিদারুণ শোকের কারণ উপস্থিত হইল। তাহা তাঁহার ভগিনী মারগ্রেটের মৃত্যু। এমন

গুণবতী সতী স্ত্রীর এত অল্পবয়সে মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার আত্মীয় বন্ধু সকলেই শোকাকুল হইয়াছিল। মেকলের হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা আর বলিবার নহে। তিনি তাঁহার বন্ধু এলিসকে সে সময়ে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার নিম্নলিখিত উদ্ধৃতাংশে তাঁহার শোকের উচ্ছ্বাস প্রতীয়মান হইবে। "গতমাসে আমি যে দারুণ ব্যথা পাইয়াছি এমন আর কখন পাই নাই। কষ্ট যে কি জিনিস তাহা আগে জানিতাম না। জানুয়ারির প্রারম্ভে বাড়ীর পত্রে আমার কনিষ্ঠা ভগিনীর মৃত্যুসংবাদ পাইলাম। তারে আমি যে কত ভালবাসিতাম কি বলিব। তার মত যে আর কাউকে ভাল বাসিতাম না তা নয়, কেন না যে বোনটি আমার কাছে ছিল তাহাকেও আমি তেমনি ভালবাসি। কিন্তু আমায় যে যে ভালবাসে, মানুষকে মানুষে ততটা ভালবাসতে পারে কি না সন্দেহ। এখন কালেতে করিয়া যদিও আমার মনস্তাপের কতকটা উপশম হইয়াছে, তথাপি সে বিষয়ে লিখিতে গেলে আমার শোকানল জ্বলিয়া উঠে। আমি যে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ি নাই সে কেবল আমার বিদ্যানুরাগের দরুণ। আমি বই পড়িতে যে ভালবাসি সে আমার ভাগ্য বলিতে হইবে। কাল্পনিক জগতে বাস করা—প্রেতাত্মার সহিত আলাপ করা সামান্য সুখের নয়।

* * *

কাজকর্ম্ম ও বই নিয়াই আমার সমস্ত সময় কাটিয়া যায়। লোকদের সঙ্গে মেশামেশা আমার বড় হইয়া উঠে না। আমার হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছে তাহা হইতে এখনো আমি সুধরিয়া উঠি নাই, আর কখন যে সম্পূর্ণ সুধরিয়া উঠিব তাহা মনে হয় না। আমি দেখিতেছি যে আথেনস নগরী আমাদের জন্য যে বিদ্যারত্ন রাখিয়া গিয়াছে তাহার সম্ভোগে আমি যেমন মনের কষ্ট ভুলিতে পারি এমন আর কিছুতেই পারি না। গ্রীক লাটিন বিদ্যার উপর আমার অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

* * *

আমার শরীর মন্দ নাই। আমার ভগিনী ভগিনীপতি* ও তাহাদের কন্যাটি ভাল আছে। কন্যাটিকে আমার সর্ব্বদা লালন পালন করিতে হয়। তার উপর আমার যেমন ভালবাসা জন্মিতেছে, জ্ঞানী ব্যক্তি আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও ততটা ভালবাসা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন কি না সন্দেহ। আমি এক্ষণে একটু সারিয়া উঠিতে আরম্ভ করিতেছি। এই বৎসরের প্রারম্ভে আমি যে ব্যথা পাইয়াছি তাহার চিহ্ন আমরণ আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। সাহিত্যই আমার প্রাণ রক্ষা ও আমার মনের প্রফুল্লতা সম্পাদন করিয়াছে। এখনো কর্ম্মকাজ শেষ হইলে আমি একটা বই হাতে না করিয়া একলা থাকিতে সাহস করি না। ইংলণ্ডে ফিরিয়া গিয়া আমি কি রূপে জীবন ধারণ করিব বলিতে পারি না। রাজনীতির চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্য অনুশীলনেই জীবন ব্যয় করিতে

আমি এক প্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। কোন বৃহৎ ঐতিহাসিক রচনায় আমার জীবন কাটিয়া যায় এই আমার ইচ্ছা।

* * *

তোমার গার্হস্থ্য সুখের ভাণ্ডার এমন পূর্ণ যে তাহা মনে করিয়া আমার হিংসা হয়। আমার ভাগ্যে যে তাহার কিছুই নাই এমন নয়। হানার মেয়েটিকে আমি তার বাপের মতই ভালবাসি। তাকে কথা কহিতে শেখান, তাকে লালনপালন করা প্রত্যহ এক ঘণ্টা আমার নিয়মিত কাজ। এখনী সে বা—পা—মা পর্য্যন্ত বলিতে শিখিয়াছে। আর যখন বিবেচনা করা যায় যে তার বয়স ৮ মাস বৈ নয় তখন তাহাকে সেক্সপিয়র কিম্বা নিউটনের সমান প্রতিভাশালিনী বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

* * *

আবার তোমার পত্র পাইয়াছি। তোমার পত্র পাইলে আমি সর্ব্বদাই আনন্দিত হই। আমাদের মিলনের দিন আসিতেছে মনে করিয়া আমি যেমন সুখী হই এখন অল্প বিষয়েই এমন সুখ আছে। বাড়ী যাবার সুখলাভের জন্য কয়েক বৎসর প্রবাসের কষ্ট ভোগ সত্য সত্যই প্রার্থনীয়। কিন্তু বাড়ী গিয়া যে সুখের প্রত্যাশা ছিল তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল না—এখন আমার আর সে বাড়ী নাই। কিন্তু যে শোকের তীব্রতা কমিয়া গিয়াছে তাহা জাগ্রত করিবার প্রয়োজন কি ?"

মেকলে তাঁহার ভারতবর্ষ-প্রবাস-কালে আর কিছু করুন আর না করুন কতকগুলি ভাষা শিখিয়া লইয়া ছিলেন আর অনেকগুলি গ্রন্থ চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া পাঠ করিয়া ছিলেন। তিনি যখন স্বদেশ পরিত্যাগ করেন তখন তিনি গ্রীক লাটিন স্পানিষ ইতালীয় ফরাসি ইংরাজি এই কয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কলিকাতা হইতে মান্দ্রাজ যাত্রা কালীন তিনি পোর্টুগীজ ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন ও স্বদেশে ফিরিবার সময় পথে জর্ম্মন ভাষা অধ্যয়ন করেন। তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছেন যে এমন কোন ভাষা নাই যাহা তিনি প্রত্যহ দশ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া চার মাসের মধ্যে আয়ত্ত করিতে না পারেন। তিনি বলেন, এক নূতন ভাষা শিখিতে হইলে আমি প্রথম বাইবেল পাঠ আরম্ভ করি, তা পড়িতে আর অভিধানের আবশ্যক হয় না। এইরূপে কতকদিন পড়িয়া গেলে—ব্যাকরণের সাধারণ নিয়ম জ্ঞান ও অনেকগুলি শব্দের অর্থ বোধ আপনাপনি হইয়া পড়ে। তার পরে একটা কোন ভাল নামাঙ্কিত গ্রন্থ আরম্ভ করা যায়। এইরূপে তিনি স্পেন পোর্টুগল জর্ম্মনি দেশের ভাষা সকল সহজে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যদিও তিনি ইউরোপের প্রায় আধুনিক সমস্ত ভাষাই শিক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু লাটিন গ্রীকের উপরেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিশেষতঃ প্রধান প্রধান গ্রীক লেখকদের রচনা পাঠে তিনি যেরূপ আমোদ সম্ভোগ করিতেন এমন আর কিছুতেই করিতেন না। তাহাদের সহিত আলাপনে তিনি তাঁহার সমুদয়

কষ্ট বিস্মৃত হইতেন। প্লেটোর রচিত গ্রন্থাবলী তাঁহার অতীব হৃদয়গ্রাহী ছিল ও তিনি বলিয়াছেন যে প্লেটোর প্রতিভা প্রশংসার অতীত। সক্রেটিসের চরিত্রের প্রতি কিন্তু তাঁহার তাদৃশ শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি বলেন "তাঁহাকে যে কেন লোকেরা বিষ প্রয়োগের দণ্ডবিধান করিল তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। তিনি প্রোটাগোরস প্রভৃতি লোকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, আমার সহিত সেরূপ ব্যবহার করিলে আমি তাঁহাকে কখনই ক্ষমা করিতাম না।"

ক্রমশঃ

সাগর-সঙ্গমে।

(গাথা)

স্থান—সমুদ্রতীর, সময়—প্রাতঃকাল।

প্রথম সর্গ।

"যাতনার জ্বালা সহে না যে আর,
হৃদয় ছিঁড়িয়ে ফেলিব আজ,
সংসারের সাধ, জীবনের সাধ,
সকল সাধেতে হানিব বাজ!
সুখে কাজ নাই, সাধে কাজ নাই,
কাজ নাই এই জীবনে মোর,
দিগন্তে ঝাঁপিয়ে বহো গো জলধি!
সঁপিব এ প্রাণ হৃদয়ে তোর!
উঠিব পড়িব ভাসিয়ে যাইব,
উঠিবে পড়িবে তোমার ঢেউ,
কত যে সহেছি, কেমনে রহেছি,
জানিতে কভু না পারিবে কেউ,
অপার—অগাধ সলিলে তোমার
আমি যে ভাসিয়ে যেতেছি কোথা—
জানিবেনা কেউ—শুনিবেনা কেউ,
সুধাবেনা কেউ সে সব কথা।"
এই কথা বলি অভাগা বিজয়
ঝাঁপায়ে পড়িতে যেতেছে জলে,
সহসা তাহার পিছন হইতে
কে যেন তাহারে ধরিল বলে।
"কি কর কি কর, জ্ঞান-বোধহীন!
ছি ছি ছি তোমার নাহি কি লাজ,
এই এ বয়সে মনের হুতাশে—
হতাশে করিছ একি এ কাজ?
চল চল ফিরে আমার কুটীরে,
আমিই তোমার জননী মত,
সেবিব পালিব, যতনে রাখিব,
সাধিব তোমার বাসনা যত।"
নয়ন ফিরায়ে বিজয় নেহারে
পিছনে দাঁড়ায়ে কে এক নারী,
জননী সমান নারীর প্রধান,
পুণ্য-জ্যোতি ভায় নয়নে তাঁরি।
অর্দ্ধ বয়সী, পরমা রূপসী,
দেবী ভগবতী যেন রে হায়,
বচনে বরিষে অমৃতের ধারা,

উষার সুষমা নয়নে ভায়।
স্নান করি সবে উঠেছেন দেবী,
এখনো সজল এলানো কেশ,
সজল তাঁহার উজল মুরতি,
সজল তাঁহার বিমল বেশ।
"ক্ষম গো জননি" কহিল বিজয়,
"জীবনে আমার নাহি যে সাধ,
আমি কারো নই, কেহ নাহি মম,
অদৃষ্টে আমার সেধেছে বাদ।
মরিল ভগিনী, মরিল জননী,
জনক হইল পাগল প্রায়,
লোকের কথায়, মনের ব্যথায়,
ত্যেজিলেন তিনি আমারে হায়।
হৃদয় যাতনে, পিতৃ নির্যাতনে,
শূন্যময় সব হইল জ্ঞান,
এখন হেথায়, সাগর বেলায়
এসেছি কেবল তেজিতে প্রাণ!"
"ছি ছি ছি ও কথা" কহে মহামায়া,
"ব'লনা ব'লনা বাছারে আর,
মম বাসে আয়, জননীর প্রায়,
লাঘবিব তোর হৃদয় ভার!
আমিও যে হায় সাগর বেলায়
বাঁধিয়ে অদূরে কুটীর মম,
দুহিতাটি লোয়ে, নির্ব্বাসিত হোয়ে,
রহিয়াছি চির-দুঃখিনী সম!
কাঙ্গালিনী বেশে রোহেছি হেথায়,
কাঙ্গালিনী আমি নহি রে ধনে,
দুহিতা লাগিয়ে সকল ত্যেজিয়ে
প্রাসাদ ছাড়িয়ে রহেছি বনে।
চৌদ্দ বর্ষে তার জীবন সংশয়,
চৌদ্দ বর্ষ রহি সাগর তীরে,
ব্রত উদ্‌যাপিয়ে, দামিনী লইয়ে
আবার স্বদেশে যাইব ফিরে!
দ্বাদশ বৎসর হোয়েছে অতীত,
বাকী নাই দুটি বরষ বই—
ওই যে দামিনী, স্নান সমাপিয়ে
সাগর সলিলে দাঁড়ায়ে ওই—"
নেহারে যুবক দামিনীর পানে,
দ্বাদশবর্ষীয়া রূপসী বালা,
দ্বিতীয়ার শশী পড়িয়াছে খসি,
আধো ফোটো রূপে সাগর আলা।
আ-নাভী মগন সাগর সলিলে,
ঝাঁপিয়ে তরঙ্গ পড়িছে গায়,
ঢল ঢল ঢল জলধি কমল,
টলমল করে স্রোতের ঘায়!
পলকে পলকে দামিনী দলকে,
অধরে মধুর হাসির ছটা,
রূপের সাগরে অমৃতের ঢেউ,
লহরে লহরে তুলিছে ঘটা।
হেথায় হোথায়, সাগরের বায়,
কোথায় অলকা যেতেছে ছুটি,
ভাবেতে গলিয়ে পড়িছে ঢলিয়ে
টানা টানা বাঁকা নয়ন দুটি।
সরলতা সনে মাধুরী মিশায়ে,
চারুতার তুলি ধরিয়ে করে,
সরু সরু মরি ভুরু দুটি যেন,
এঁকে কে দিয়েছে নয়ন পরে!
লহরী লীলায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়
উজল রূপের উজল ছায়,
শ্যামল সাগর হ'য়েছে রে যেন
কষিত তরল হিরণময়!
দেখিয়ে বিজয়—হরষ হৃদয়,

পলক পড়ে না নয়নে আর,
"এই রূপ হেরি, সকল পাষরি"
ভাবিল "বহিব জীবন ভার!—
কেনই ত্যেজিব এছার জীবন,
ওরূপ যদি রে দেখিতে পাই—
শোকের সময় নেহারি ও রূপ,
অনলে উজল করিব ছাই!
চল চল তবে, মাতঃ মহামায়া,
(কহিল বিজয় আনত মুখে)
এ ছার জনম, এ ছার জীবন,
তোমারি কুটীরে কাটাব সুখে!"
এই কথা বলি সকলে মিলিয়ে,
করিল গমন কুটীর পানে,
আগে আগে যান দেবী মহামায়া,
পিছনে দামিনী বিজয় সনে।

দ্বিতীয় সর্গ।

নারীর-প্রধান জননী সমান,
দেবতা-প্রধান জননী মত,
দেবী মহামায়া বিজয়ের প্রতি
জননীর স্নেহ দেখান কত।
বিজয় দামিনী এক সাথে রয়,
এক বৃন্তে যেন দুইটি ফুল,
ফুটিতে লাগিল, শোভাতে বাড়িল,
জগতে যেন রে অসমতুল!
বিজলির প্রায় দিন বোহে যায়,
বিজলির মত বিজয় মনে,
থাকিয়ে থাকিয়ে হরষের আলো
চমকে উঠিতে লাগিল প্রাণে।
বাড়িতে লাগিল দামিনী রূপসী,
বাড়িতে লাগিল রূপের ছটা,
দ্বিতীয়ার শশী, তৃতীয়ার শশী,
ক্রমে পূরণিমা জোছনা ঘটা।
ঘোর অমানিশা-আঁধার উপরে
সুধীরে যেমন অরুণ ওঠে,
কৃষ্ণপক্ষ পরে সুধীরে যেমন,
শশীর জোছনা ক্রমশঃ ফোটে—
শীতের প্রভাব ছাড়িয়া যেমন,
সুধীরে বহে সে মলয় বায়,
সুধীরে তেমতি বিজয়-হৃদয়ে
প্রেমের আলোক প্রকাশ পায়।
শুখালো ক্রমশঃ নয়নের নীর,
ঘুচিল ক্রমশঃ বিষাদ ভার,
আকাশে সুষমা, ধরায় সুষমা,
সুষমার মাঝে জীবন তার।
এ উহার পানে তাকাইয়া রয়,
কেন যে তাকায় জানে না কেউ,
উভের পরশে উভের হৃদয়ে
বোঝেনা কি এক ওঠে যে ঢেউ!
সাগর-বিজনে সুখের স্বপনে,
আধো আধো যেন ঘুমের ঘোরে,
দুইটি বরষ কাটালে দুজনা,
দুজনে জানেনা কেমন ক'রে।
সাগর বেলায়, দুজনে খেলায়,
সুখের মেলায় দুজনে মাতে,
উভয়ে সোঁপেছে উভয়ে হৃদয়,
উভের পরাণ উভের হাতে।
এক দিন প্রাতে প্রশান্ত উষাতে,
মৃদুল মলয় বহিছে ধীরে,
অফুটো অফুটো অরুণ আলোকে,
দাঁড়ায়ে দামিনী সাগর তীরে।
কাটিয়ে কাটিয়ে বিশাল তরঙ্গ,
সাঁতারে বিজয় জলধি-জলে,

উঠিছে পড়িছে খেলাতে ডুবিছে,
দামিনীরে ভয় দেখাবে বোলে।
দামিনী হাসিছে, দামিনী ভাবিছে
কখনো দামিনী কাঁদিছে যেন,
পূর্ণিমা নিশিতে শারদ আকাশে
জোছনা জলদে বিবাদ হেন।
দূর হোতে এক ডাকিনী-রূপিণী,
নেহারে বিজয় হরষে ভাসে,
নেহারে দামিনী, কুসুম-কামিনী
গ্রথিত তাহার প্রেমের ফাঁসে।
দেখি তাহা বুড়ি, যায় গুড়ি গুড়ি
দামিনীর বাড়ি ভিখারী বেশে,
হাতে লাঠি ধরি, আই ঢাই করি,
কুটীরে অতিথি হইল এসে।
বলে "ওগো কে গো আছ গো হেথায়,
সাগর-সঙ্গমে কুটীর-বাসী,
ক্ষুধার জ্বালায় প্রাণ জ্বোলে যায়,
পরাণ বাঁচাও, হেথায় আসি।"
শুনি মহামায়া যান দ্রুতগতি,
অতিথি সেবার মহান কার্যে
রোহিণীরে করি অশেষ যতন,
আনিল তাহারে কুটীর মাঝে।
দিন যত যায়, রোহিণী সেথায়,
আদরে রহিল সেবিকামত,
দামিনীর সনে, বিরলে বিজনে,
উপকথা রাশি কহে সে কত।
পূজার লাগিয়ে মহামায়া যবে
উপনীত হন সাগর-বেলা,
বেল জুঁই যাতি, ফুল নানা জাতি,
নে যায় রোহিণী ভরিয়ে ডালা।
দিন যত যায়, রোহিণী সেথায়,
রহিল কতই আদর ভরে,
দূর এক বনে তাপস আশ্রমে,
রহেছে বিজয় মাসেক তরে।
বুঝে এক দিন বিধবা রোহিণী,
ইনিয়ে বিনিয়ে দেবীর কাছে,
কহিল "জননি, করেছ তুমি কি,
বিজয়ে কি হেথা রাখিতে আছে।
গিয়াছে বটে সে তাপস-আশ্রমে,
আসিতে তাহারে দিও না আর,
দামিনী আমার কামিনীর সার,
সঁপিবে কি তাঁরে হাতেতে তার?
বরঞ্চ জ্বলন্ত অনল মাঝারে,
দামিনীরে তব ফেলিয়ে দাও,
তবুও গো দেবি বিজয়ের হাতে,
সোঁপোনা তাহারে, মাথাটি খাও!
কুলে শীলে জেতে, মানিনু জননি,
বিজয় কুমার সমান বটে,
কিন্তু মাতঃ! কভু শোন নি কি কানে
উহার যে গুণ সকলে রটে?
মথুরা-নিবাসী বিজয় কুমার,
আলয়, আমার বাটীর গায়,
বালক বিজয় মায়েরে ছাড়িয়ে
আমারি নিকটে থাকিত প্রায়!
ক্রমে ক্রমে ক্রমে যৌবন-সোপানে
যখন চরণ ঠেকিল তার,
হইয়ে অধীর পরের নারীর
চাপালে মাথায় কলঙ্ক ভার!
জানিতে পারিল ভগিনী বিজয়া,
প্রচার করিল মায়ের আগে,
জননী তখন কঠোর বচন
কহিল বিজয়ে অসহ রাগে।

ক্রোধান্ধ বিজয় শাণিত কৃপাণে
শুধিল বোনের দ্বেষের ধার,
দুহিতার শোকে আত্ম-বিসর্জ্জন
সহজে করিল জননী তার!
বিজয়ের নামে কলঙ্কের ঢেউ,
ভূধর-প্রমাণ উঠিল বেগে,
শোকার্ত্ত জনক না পারিয়ে আর,
দূর কোরে তারে দিয়েছে রেগে।
সরলা সুমতি তুমি, মহামায়া,
না জানি তাহার অশেষ গুণ,
দিয়েছ তাহার আবাস হেথায়,
ডাকিয়ে এনেছ আপন খুন।
তোমার দামিনী—ভুবনমোহিনী,
অমীয় প্রকৃতি সরলা বালা,
জেনেছ কি দেবি, বিজয়েরে সেবি,
ঘটিবে তাহার কত কি জ্বালা?
বিজয় আমার নহেত অরাতি,
আপন গ্রামের আপন লোক,
দামিনীর কথা ভেবে পাই ব্যথা,
তাই প্রকাশিনু মনের ঝোঁক।"
কহিয়ে রোহিনী ফেলিল নয়নে
টেনে টুনে জল দু এক ফোঁটা,
কহিল "কালিকা করেন এ যেন,
দামিনীর পানে না চায় ওটা।
পুত্র-শোকে আমি আছি জ্বরজ্বর,
প্রতাপ আমার বিবাগী হোয়ে,
কোথায় চলিয়ে গিয়েছে ফেলিয়ে,
সুখী এবে শুধু দামিনী লোয়ে।"
বলিয়ে রোহিনী লইয়ে বিদায়,
চলিল রোহিনী আপন বাস,
ফুঁসিতে লাগিল মহামায়া সতী
বহিতে লাগিল অনল-শ্বাস।
এমন সময় সরলহৃদয়
দামিনী আসিল মায়ের কাছে,
কুসুম-কানন করিয়ে উজাড়,
কুসুমের সাজে সাজিয়া আছে!
কবরীটি গাঁথা মালতী মালায়,
অলকা ঝলকে যূথিকা ফুলে,
অস্ফুট বেলার প'রেছে মালিকা,
পোড়েছে সে মালা চরণ-মূলে।
কুসুম পরাগে সুরভিত বাস,
কামিনী-পাপড়ী পোড়েছে গায়,
কুসুমে সেজেছে কুসুম-বালিকা,
কে তোরা হেথায় দেখিবি আয়।
হাসি-মাখা মুখ করে ঢল ঢল,
হরষে চপল নয়ন দুটি,
হেথায় হোথায়, হৃদয়ে মাথায়,
আকুল ভ্রমরা বেড়ায় ছুটি।
"এই দেখ গো মা সেজেছি, কেমন,
উজাড় করিয়ে কুসুম-বন,
গোলাপের কাঁটা ফুটিল যে কত,
কিছুই আঘাতে দেইনি মন।
ভ্রমরের সনে করিয়ে সমর,
এই মা টগর এনেছি তুলে,
ফুঁ দিয়ে উড়ায়ে প্রজাপতিদলে
ছিনিয়ে এনেছি মাধবী ফুলে।
নাড়া দিনু যত বকুলের শাখা,
পড়িল কুসুম ধরণী ছেয়ে,
আবার—আবার এনেছি কাহারে,
নেহারো ও গো মা এদিকে চেয়ে—
তাপস-কুটীর তেয়াগি বিজয়
আসিতে ছিলেন মাসেক পরে,

সাগর বেলায় নিরখি তাহায়
এক সাথে মোরা আসিনু ঘরে।”
কহিতে কহিতে ঢুলে পড়ে আঁখি,
গুরুগুরু করে হৃদয় মাঝ,
অধরে ঈষৎ বিকশিত হাসি,
বিজয় কুমার এসেছে আজ।
বিজয়েরে ফিরে দেখি মহামায়া
দাবানল পারা জলিয়ে ওঠে,
থর থর থর কাঁপিছে অধর,
নয়নের কোণে আগুন ছোটে।
বজ্রভৈরবনাদে কহে মহামায়া,
বামেতর হাত রাখিয়ে বুকে—
“দামিনী, তোমারে করিনু বারণ,
বিজয়ের নাম এনো না মুখে।
দিব না তাহার চরণ পরশে,
কলঙ্কিতে এই কুটীর মম,
তুমিও দামিনী পাষরিবে তায়,
ভাবিয়ে তাহারে পিশাচ সম।
বিজয়—বিজয়! কহিনু তোমারে,
যাও ছাড়ি এই কুটীর মোর,
আমাদের মাঝে উঠুক ভূধর,
বহুক সাগর তুফানে ঘোর।”
বলি মহামায়া—কঠোর মুরতি,
ভ্রূকুটি হানিল দুহিতা পানে,
স্তম্ভিত দামিনী বজ্রাহত প্রায়,
কি সে যে কি হ’ল, কিছু না জানে।
শূন্যে চাহি রয়, পড়ে না পলক,
চলে না চরণ, নড়ে না হাত,
সঘনে শুধুই বহে ঘন শ্বাস,
হৃদয় হোয়েছে রুধির সাৎ।
অবশ হাতের মালতীর ফুল,
ঝর ঝর ঝর প’ড়িছে ঝোরে,
খসিছে আঁচল, খসুক আঁচল,
ভ্রূক্ষেপ নাই তাহার পরে।
হৃদয়ে কপোলে বসিছে ভ্রমর,
বসুক ভ্রমর আপন মনে,
কুটীর যে কোথা, দামিনী যে কেবা,
কেবা যে বিজয় কেই বা জানে!

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

প্রকৃতি-তত্ত্ব।—শ্রীশ্রীরাম পালিত প্রণীত। বাল্মীকি যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ॥০। এখানি একখানি ছন্দে গ্রথিত পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক। স্থূল প্রকৃতি-তত্ত্বসমূহ ইহাতে সুন্দর রূপে বিবৃত হইয়াছে, এবং কবিতা-আকারে ইহা প্রচারিত হওয়াতে সেই তত্ত্বসমূহ সহজেই লোকের কণ্ঠস্থ হইবার সম্ভবনা। বালক বালিকাদিগের পক্ষে এ পুস্তক খানি একটি বহুমূল্য রত্ন, বিজ্ঞান যে কি বস্তু এই পুস্তক পাঠে অতি অবলীলা ক্রমে তাহাদের বোধগম্য হইবে।

কুপিতকৌশিক নাটক।—সংস্কৃত হইতে সঙ্কলিত—৩০টী গীত সমেত। বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৹ আনা।

পুরাকালের রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানটি মুখে বলিলেও চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করে,

তাহাতে আবার এই নাটক খানি প্রখ্যাত সংস্কৃত নাটক চণ্ডকৌশিক হইতে সঙ্কলিত, সুতরাং ইহা যে আমাদের বিশেষ প্রীতিপ্রদ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা অনেক অনুবাদ অপেক্ষা এইরূপ সঙ্কলন ভালবাসি, কারণ ইহার দ্বারা মূল সংস্কৃতের উচ্চ ভাবগুলি সহজেই বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে মূল বিস্তার করিতে পারে। কিন্তু সঙ্কলনকার নাটকখানিকে দেশীয় যাত্রার উপযোগী করিতে গিয়া স্থানে স্থানে কল্পনার অত্যন্ত ব্যভিচার করিয়াছেন। চণ্ডমূর্ত্তি মহামুনি বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের ত্যাগ-স্বীকার দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত বলিতেছেন 'উঃ! ব্যাটার মনের কি দৃঢ়তা!—ধন্য ধৈর্য্য! ধন্য মহা নুভাবতা! তা যা হোক্, আমাকে কিন্তু ব্যাটার কতদূর দৌড় দেখিতে হইবে!'— নাটক খানির ৩০টী গীতের কোনটিই আমাদের ভাল লাগিল না। আমাদের মতে "নিশা অবসান হল, ভানুরশ্মি প্রকাশিল। ভয়ঙ্কর রাত্রিঞ্চর জন্তু সবে লুকাইল" ইত্যাদি গীতের ভাষাই নয়।

গোষ্ঠী কথা।— বুধোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত মূল্য ।০—এই পুস্তক খানি আমরা অতি আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। বাস্তবিক এইরূপ একখানি পুস্তক এতদিন পর্য্যন্ত বঙ্গসাহিত্যের পুস্তকালয়ে অভাবের মতন ছিল! প্রাচীন লোকদের হাস্যকর কথা ও হাস্যকর ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থকার আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন।

ভারতীয় গ্রন্থাবলী। অর্থাৎ প্রাচীন ভারতবর্ষের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, তাহাদের কাল নির্ণয় এবং সংক্ষিপ্ত সমালোচন। প্রথম খণ্ড। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।

এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে করিতে প্রতি পত্রে গ্রন্থকারের গবেষণা, চিন্তাশীলতা ও দেশানুরাগের ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। বিস্তর বিস্তর নাটক ও কবিতার পরিবর্ত্তে যদি এইরূপ গ্রন্থ দিন দিন প্রচারিত হয় তা হইলে বঙ্গ সাহিত্যের সমৃদ্ধির আর সীমা থাকিবে না। কিন্তু গ্রন্থকার দুএকস্থলে নিতান্তই স্খলিতপদ হইয়াছেন। তিনি ইউরোপীয়দিগকে আর্য্যবংশোদ্ভব প্রমাণ করিবার জন্য শব্দশাস্ত্র মন্থন করিতে গিয়া এই স্থির করিয়াছেন যে "বীরা" হইতে Beer, "সুরা" হইতে Sherry এবং "মদিরা" হইতে Medeira উৎপন্ন হইয়াছে। আমাদের এক জন বন্ধু রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে নলদময়ন্তী বনবাস-কালে সুন্দরবনে সমুদ্রের ধারে ছিলেন, কারণ Diamond Harbour শব্দটি, অর্থাৎ দময়ন্তী ও her (তাহার) বর—সেই বিষয়ের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।—গ্রন্থকারের মতের সহিত অন্য অন্য বিষয়েও আমাদের অনেক স্থলে অনৈক্য আছে—স্থানাভাবে তাহা প্রদর্শন করিতে পারিলাম না।

বন-কুসুম। দ্বিতীয় স্তবক। পদ্যগ্রন্থ। শ্রীশীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। এই কবিতা পুস্তকের অনেক গুলি কবিতা আমাদের ভাল লাগিল। গ্রন্থকার পরে যে এক জন সুকবি হইবেন তার সন্দেহ নাই।

———

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

উন্নতি বলে কাহাকে—না নিকৃষ্ট সঙ্গ হইতে উৎকৃষ্ট সঙ্গে, নিকৃষ্ট শ্রেণী হইতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীতে, প্রবেশ করা। উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে হইলে নিম্ন শ্রেণীকে যে-কোন নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় তাহাকেই বলে উন্নতির নিয়ম। উন্নতির নিয়ম রীতিমত আয়ত্ত করিতে হইলে সে নিয়মের প্রয়োজন কি তাহা সর্ব্বাগ্রে জানা আবশ্যক। রাজ-নিয়ম লিপিবদ্ধ করিবার প্রচলিত প্রথা যেমন—হেতুবাদ অগ্রে বিন্যাস করিয়া তবে বক্তব্য-যাহা তাহা বলা—এখানকার প্রথাও সেইরূপ মনে করিয়া উন্নতি-নিয়মের হেতুবাদটির প্রতি অগ্রে প্রণিধান করা যাউক্; সেটি এই;—যাহা মঙ্গল তাহাই প্রয়োজন, জগৎ-সৃষ্টি যার পর নাই মঙ্গল-ব্যাপার এ জন্য জগৎ-সৃষ্টি প্রয়োজন; অপূর্ণ বস্তুরই সৃষ্টি হইতে পারে, পূর্ণ যিনি তিনি নিত্যকালই পূর্ণ রূপে বর্ত্তমান আছেন, তিনি স্রষ্টা, তিনি সৃষ্ট হইতে পারেন না; সুতরাং সৃষ্ট যাহা কিছু তাহা অপূর্ণ হইতেই চায়; জগতের অস্তিত্বই অপূর্ণতা-নিবন্ধন। অগ্রে জগতের অস্তিত্ব সাধন হইলে তবে ত তাহার মঙ্গল-সাধন হইবে; অপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াই জগৎ আপনার অস্তিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, আর পূর্ণতার দিকে গতি প্রাপ্ত হইয়াই মঙ্গল প্রাপ্ত হইয়াছে। যেহেতু একেবারেই জগতের অপূর্ণতা ঘুচিয়া গেলে এক অদ্বিতীয় পূর্ণস্বরূপই থাকেন তদ্‌ভিন্ন আর কোন কিছুই থাকে না,—জগৎ থাকে না; অতএব জগতের পক্ষে এই নিয়মই সর্ব্বতোভাবে কল্যাণ-জনক যে, তাহা ক্রমশই অপূর্ণতা হইতে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবে, কোন কালেই পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারিবে না।

জগতের নিয়ম-পুস্তক হইতে উন্নতি-নিয়মের উপরি-উক্ত হেতুবাদটি উদ্ধৃত করা হইল। এখন—নিয়ম-পুস্তকটি পাওয়া যায় কোথায়? দূরে কোথাও নয় মনুষ্য আপনার মনোমন্দিরে তত্ত্ব করিলেই তাহার সন্ধান পাইতে পারে। মনুষ্যকে কে বলিয়া দিতেছে যে, জড়-জগৎ অপেক্ষা উদ্ভিদ-জগৎ, তদপেক্ষা জীব-জগৎ, নিকৃষ্ট জীব অপেক্ষা মনুষ্য, বৈষয়িক মনুষ্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক মনুষ্য—উন্নত; অথবা যাহা একই কথা, দেহ অপেক্ষা প্রাণ, তদপেক্ষা মন, তদপেক্ষা বুদ্ধি, তদপেক্ষা আধ্যাত্মিক আনন্দ—উন্নত, এ কথা কে বলিয়া দিতেছে? মনুষ্যের মনোমধ্যে পূর্ণতার একটি আদর্শ যাহা বিদ্যমান আছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া কে তাহার কত নিকট-

বর্ত্তী কেবা কত দূরবর্ত্তী মনুষ্য তাহা বুঝিতে পারে; এবং সেই আদর্শ-নেত্রে স্পষ্ট দেখিতে পায় যে সমস্ত প্রকৃতি পূর্ণতারই অভিমুখে যাত্রা করিতেছে।

প্রকৃতি যদি ক্ষণকালের জন্য স্থির হইয়া দাঁড়ান, আর সেই-সময় কেহ যদি আপনার চিত্ত-পটে তাঁহার একখানি আতপ-চিত্র তুলিয়া ল'ন, তবে তাহার দৃশ্যটি এইরূপ হয়;—পরমাত্মার মহিমা যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছে সেইটি তাবতের মধ্য-প্রদেশ; সেই জ্যোতির্ম্ময় মধ্য-প্রদেশ হইতে একটি ক্রমশঃ-প্রসারিত পরিধি-পরম্পরা জ্যোতি হইতে ছায়া, ছায়া হইতে অন্ধকার, অন্ধকার হইতে প্রগাঢ় অন্ধতামিশ্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এ যা দেখা যাইতেছে ইহা প্রকৃতির স্থির-মূর্ত্তি—বাস্তবিক প্রকৃতি কোন কালেই স্থির নহেন, প্রকৃতির আদ্যোপান্ত সমস্ত নিয়তই বিচলিত হইতেছে;—ঐ যে জ্যোতির্ম্ময় মধ্য-প্রদেশ তাহা আরো জ্যোতির্ম্ময় হইবার দিকে যাত্রা করিতেছে, এবং দূর-দূরস্থিত সমস্ত পরিধি-পরম্পরা তাহার দৃষ্টান্তের অনুগামী হইতেছে।

প্রকৃতির ঐ যে চিত্র,উহার কোন স্থানেই নিরপেক্ষ ভাব নাই, পূর্ণ-ভাব নাই; প্রকৃতির মধ্যে যাহা ভাল তাহা অপেক্ষাকৃত ভাল, যাহা মন্দ তাহা অপেক্ষাকৃত মন্দ। ভাল-র সম্বন্ধেই—মন্দ-যাহা তাহা মন্দ; মন্দের সম্বন্ধেই—ভাল-যাহা তাহা ভাল;—প্রকৃতির ভিতরকার ভাল-মন্দ এ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সম্বন্ধ ছাড়িয়া বিচার করিলে প্রকৃতির সকলই ভাল সকলই মন্দ; সকলই ভাল—কেন না প্রত্যেক বস্তুর কোন না কোন ভাল গুণ আছে; সর্প যে এমন হিংস্র জীব সে-ও আপনাকে আপনি হিংসা করে না—শুধু তা নয়, আপনাকে আপনি আন্তরিক ভালবাসে; তবে ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারে এমন কোন একটা ভালগুণ সর্পেতেও বিদ্যমান আছে? তা যদি হয়, তবে পৃথিবীর কোন্ বস্তুতে তাহা নাই? মনুষ্যের পক্ষে কোন বস্তু হয় ত অত্যন্ত হেয়, পশু বা উদ্ভিদের পক্ষে তাহাই হয়ত আবার অত্যন্ত উপাদেয়। অতএব পক্ষাপক্ষ বিবেচনা না করিলে প্রকৃতির সকলই ভাল। আবার সকলই মন্দ—কেন না যত কেন ভাল হউক না তাহার উপরে আরো এত ভাল আছে যে তাহার তুলনায় পূর্ব্বের ভাল নিতান্ত মন্দ হইয়া দাঁড়ায়। অতএব ইহার সম্বন্ধে উহা ভাল, উহার সম্বন্ধে ইহা মন্দ—এইরূপ শুদ্ধ কেবল সম্বন্ধের উপরেই জগতের ভাল-মন্দ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

প্রকৃতির আতপ-চিত্র যাহা ইতি-পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার আদ্যোপান্ত সমস্তই সম্বন্ধ-সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে; প্রকৃতির মধ্য-স্থান হইতে চরম সীমা পর্য্যন্ত জ্যোতির্ম্মণ্ডল হইতে ছায়ামণ্ডল তথা হইতে অন্ধকারমণ্ডল পর্য্যন্ত, যেথানে যাহা আছে সম্বন্ধ-ছাড়া কেহই নহে; তবে কাহারো সহিত কাহারো দূর সম্বন্ধ, কাহারো সহিত কাহারো নিকট সম্বন্ধ এই যা প্রভেদ। জগতের মধ্যে প্রত্যেকের

সহিত প্রত্যেকের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং পরমাত্মার সহিত সকলের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, সেই সম্বন্ধ-সূত্র অবলম্বন করিয়াই, নিম্ন নিম্ন মণ্ডল কাল-ক্রমে উচ্চ উচ্চ মণ্ডলে নীত হয়। সে সম্বন্ধ-সূত্র কিপ্রকার তাহা দেখা যাউক।

এক দিকে সাম্য অপর দিকে বৈষম্য এই দুইটির উপর ভর করিয়া সম্বন্ধের অবস্থিতি। প্রথমতঃ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে বৈষম্য না থাকিলে তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ থাকিতে পারে না,—আর কোন বৈষম্য না থাকে স্থান-বৈষম্যও ত থাকিবে, তাহাও যদি না থাকে তবে দাঁড়াইবে এই যে, দেখিতেছি এক বস্তু বলিতেছি দুই বস্তু; কেন না সাম্যের পরাকাষ্ঠাও যা, একত্বও তা, একই কথা। শুদ্ধ কেবল একের উপর ভর করিয়া সম্বন্ধ দাঁড়াইতে পারে না, দুই বা ততোধিক বস্তুর মধ্যেই সম্বন্ধ বাধিতে পারে। এ ত গেল বৈষম্য—আবার মূলে সাম্য না থাকিলেও সম্বন্ধ সম্ভবে না। আমি সম্পূর্ণ পৃথক্ তুমি সম্পূর্ণ পৃথক্ তোমাতে আমাতে সম্বন্ধ কি? একটা কিছু তোমার আমার মধ্যে সাধারণ না থাকিলে সম্বন্ধ দাঁড়াইবে-যে—তা কিসের উপর? হয় এক পিতামাতার পুত্র, নয় এক পরিবারে বা দেশে বা পৃথিবীতে বাস, নয় এক ভাবের ভাবুক, যাহাই হউক না কেন, এক কোন কিছু গোড়ায় থাকা চাই নহিলে "সম্বন্ধ" কথাটাই অপ্রসিদ্ধ হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে সম্বন্ধ-মাত্রই সাম্য এবং বৈষম্য এই দুই উপাদানে বিনির্ম্মিত।

সম্বন্ধ যদিও সাম্য-বৈষম্য উভয়ের কোনটিকেই ছাড়িয়া-থাকিতে পারে না কিন্তু তথাপি কোন সম্বন্ধ অপেক্ষা কোন সম্বন্ধ সাম্য-প্রধান কিম্বা বৈষম্য-প্রধান হইতে পারে; ঐরূপ অপেক্ষাকৃত সাম্য-প্রধান সম্বন্ধকে আমরা সংক্ষেপে সাম্য-সম্বন্ধ বলিব, এবং তাহার বিপরীত পক্ষকে বৈষম্য-সম্বন্ধ বলিব; যথা—গ্রহনক্ষত্রবাসী লোকদিগের অপেক্ষা ইংরাজদের সহিত আমাদের সাম্য-সম্বন্ধ, তদপেক্ষা স্বদেশীয় লোকদিগের সহিত আমাদের সাম্য-সম্বন্ধ, স্বদেশীয় অন্য লোক অপেক্ষা ভ্রাতৃগণের সহিত আমাদের সাম্য-সম্বন্ধ ইত্যাদি, আবার ইহার বিপরীত পথে চলিলেই পরপর বৈষম্য-সম্বন্ধ হইতে বৈষম্য-সম্বন্ধে উপনীত হই। বৈষম্য-সম্বন্ধ দুইরূপ—সম্বন্ধ বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যাহার নিম্ন পদবী তাহার নিকট একরূপ, আর যাহার উচ্চ পদবী তাহার নিকট একরূপ; প্রথম প্রকারের বৈষম্য-সম্বন্ধকে গরীয়ান সম্বন্ধ বলা যাইবে, দ্বিতীয় প্রকারের বৈষম্য সম্বন্ধকে লঘীয়ান সম্বন্ধ বলা যাইবে। স্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে সাম্য-সম্বন্ধ, উচ্চ শ্রেণীর প্রতি নীচ শ্রেণীর গরীয়ান সম্বন্ধ, নীচ শ্রেণীর প্রতি উচ্চ শ্রেণীর লঘীয়ান সম্বন্ধ, এই তিন প্রকারের সম্বন্ধ প্রকৃতির আদ্যোপান্ত সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

দুই বস্তুর মধ্যে চিরকালই যে একই প্রকার সম্বন্ধ সমান ভাবে বর্ত্তমান থাকিবে তাহা হইতে পারে না। পূর্ব্বে যাহাদের মধ্যে বৈষম্য-সম্বন্ধ ছিল এখন তাহাদের মধ্যে সাম্য-সম্বন্ধ এবং কালে ততোধিক সাম্য-সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে,

আবার তাহার বিপরীতও হইতে পারে, কিন্তু কোন সম্বন্ধ এমন হইতে পারে না যে, চিরকাল তাহা যেখানকার সেইখানে স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবে। এ যা বলা হইল ইহার উদাহরণ সর্ব্বত্রই পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে যেটি সর্ব্বদা সকলের চক্ষে পড়ে সেইটি উল্লেখ করিলেই এখানকার পক্ষে যথেষ্ট হইবে—সেটি গুরু-শিষ্যের সম্বন্ধ। গুরু শিক্ষার দাতা, শিষ্য শিক্ষার গৃহীতা, প্রথমে উভয়ের মধ্যে এইরূপ সম্বন্ধ থাকে; শিক্ষাদান সমাপ্ত হইলে উভয়ের মধ্যে সেরূপ সম্বন্ধ আর থাকে না; তখন পূর্ব্ব-সম্বন্ধ স্মরণ করিয়া গুরুর নিকট শিষ্য যে কৃতজ্ঞ ও নম্র ব্যবহার করে তাহাতে ইহা বুঝায় না যে এখনও উভয়ের মধ্যে উপরিউক্ত দাতা-গৃহীতার সম্বন্ধ বলবৎ রহিয়াছে; তবে কি? না সংস্কার বশতঃ শিষ্যের হৃদয়ে সে সম্বন্ধ এমনি বদ্ধমূল হইয়াছে যে, তাহার হৃদয় তাহা কিছুতেই ভুলিতে পারে না—ভুলিতে চাহেও না—ভোলাও উচিত নহে। কিন্তু হৃদয়ের ভাব যাহাই হউক না কেন—পূর্ব্বে যেরূপ উভয়ের মধ্যে বিদ্যা-ঘটিত বৈষম্য-সম্বন্ধ ছিল, এক্ষণে তাহা আর নাই, তাহার স্থলে সাম্য-সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে। এইরূপ উচ্চ-শ্রেণীর সহিত বৈষম্য সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে যতই সাম্য-সম্বন্ধে পরিণত হয় ততই নিম্ন শ্রেণীর উন্নতি সাধিত হইতে থাকে।

উন্নতি-বিষয়ের তথ্য-নির্ণয় করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য—কেন না মনুষ্যই উন্নতির আদর্শস্থল।

মনুষ্য কতকগুলি সম্বন্ধের অধীন; তাহার মধ্যে ছয়টি সম্বন্ধ সর্ব্বপ্রধান—তিনটি বৈষম্য-সম্বন্ধ এবং তিনটি সাম্য-সম্বন্ধ; এবং একটি বৈষম্য-সম্বন্ধের পর একটি সাম্য-সম্বন্ধ এইরূপ পর্য্যায় ক্রমে উহারা পরপর অভিব্যক্ত হয়। যথা,—

সম্বন্ধ	ভাবের দিক্	জ্ঞানের দিক্
বৈষম্য	বিষয় সুখ	স্বার্থ
সাম্য	দম্পতি-প্রেম	সংসার ধর্ম্ম
বৈষম্য	বাৎসল্য	শক্তি
সাম্য	সৌহার্দ্দ	সৌন্দর্য্য
বৈষম্য	ভক্তি	শ্রেয়
সাম্য	অমায়িক প্রেম	সামঞ্জস্য

বিষয়ের সহিত—শরীর অন্নবস্ত্র বাসস্থান প্রভৃতি ভোগের উপকরণ-সামগ্রীর সহিত—মনুষ্যের যে সম্বন্ধ, তাহা বিষয়-সুখের সম্বন্ধ। বিষয়-সুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—স্বার্থ। বিষয়-সুখ স্বার্থ-দ্বারা নিয়মিত হইলে তবে তাহা রীতিমত চরিতার্থতা লাভ করে। স্বার্থ কি না স্বীয় অর্থ—আপনার প্রয়োজন। আপনার প্রয়োজন বুঝিয়াই বিষয়-সুখ সম্ভোগ করা কর্ত্তব্য। বিষয়-সুখ অবিচারে উপভোগ করা অজ্ঞানের কার্য্য; স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া—ফলাফল বিবেচনা করিয়া—বিষয়-সুখ উপভোগ করাই জ্ঞানের কার্য্য। বিষয় সুখের অন্ধ উত্তেজনা একদিকে এবং স্বার্থের

বিজ্ঞ পরামর্শ একদিকে—পূর্ব্বোক্ত উত্তেজনা যদি শেষোক্ত পরামর্শের সহিত সঙ্গত হয় তবেই তাহাকে কার্য্যে পরিণত করা নচেৎ তাহাতে ক্ষান্ত থাকাই বিধেয়। বিষয়-সুখের জন্যই আমি, এই ভাবটি মূঢ় ভাব; আমার জন্যই বিষয়-সুখ, এই ভাবটি সজ্ঞান ভাব; প্রথমটি অনর্থের ভাব, দ্বিতীয়টি স্বার্থের ভাব। বিষয়-সুখ এরূপে উপভোগ করা উচিত যাহাতে স্বার্থ আছে। এ বস্তু উপকার-জনক ইহা সেব্য, ও বস্তু অপকার-জনক উহা ত্যজ্য—স্বার্থের এই পরামর্শগুলি শুনিয়া চলিলে বিষয়-সুখ নিরুদ্বেগে এবং নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে নচেৎ তাহার পদে পদে বিপদ। বিষয়-সুখের এই যে সম্বন্ধ ইহাকে বৈষম্য-সম্বন্ধ বলি কেন? না যেহেতু বিষয়-সামগ্রীর সহিত মনুষ্যের যে সম্বন্ধ তাহা লঘীয়ান সম্বন্ধ; বিষয়ের নিকট হইতে মনুষ্য কেবল সুখ আদায় করে, তা' ভিন্ন দুপক্ষের মধ্যে সুখের আদান প্রদান চলিতে পারে না, সুতরাং সাম্য-সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না।

ইহার এক ধাপ উপরেই দাম্পত্য-সম্বন্ধ। বিষয়-সুখের সম্বন্ধে কেবল এক পক্ষের সুখই—আপনার সুখই সর্ব্বস্ব, দাম্পত্য সম্বন্ধে এক পক্ষের সুখদুঃখ এবং অপর পক্ষের সুখদুঃখ একই সুখদুঃখ। দম্পতি-প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—সংসার-ধর্ম্ম। অন্যের নিকট হইতে তুমি যেরূপ ব্যবহার চাও তাহার প্রতিও তুমি সেইরূপ ব্যবহার করিবে—ইহাই সংসার-ধর্ম্মের সার মর্ম্ম। পরস্পর পরস্পরের উপযুক্ত হইবে, এবং পরস্পর হিত-ব্যবহার বিনিময় করিবে—ইহাই সংসার-ধর্ম্ম। এইরূপ সংসার-ধর্ম্ম দ্বারা নিয়মিত হইলেই দম্পতি-প্রেম যথার্থ পথে চলে। এস্থলে এইটি মনে রাখা উচিত যে, কোন-একটি ভাব উপরের ধাপে অবস্থিতি করে বলিয়া তাহাতে নীচের ধাপের ভাব নাই-যে তাহা নহে, সে ভাব আছে, তবে কি না তাহার উপর আর একটি নূতন ভাব আবির্ভূত হইয়া তাহার মুখ-শ্রী নূতন করিয়া তুলিয়াছে। দম্পতি-প্রেমের মধ্যে বিষয়-সুখ—যাহা কেবল আপনার-মাত্র সুখ—তাহা আছে কিন্তু তাহার উপর "একের সুখ অন্যের" এই নূতন একটি ভাব আবির্ভূত হইয়া বিষয়-সুখকে এক ধাপ উচ্চে তুলিয়াছে। এমনি আবার সংসার-ধর্ম্মের মধ্যে স্বার্থ-ভাব নাই—যে তাহা নহে—স্বার্থভাব আছে, কিন্তু ধর্ম্মের অনুমোদিত সেই যে স্বার্থ তাহা পরার্থের সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত হইয়া নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে,—ধর্ম্মের নিয়ম পুস্তকে আপনার স্বার্থ এবং পরের স্বার্থ উভয়ের একই অর্থ।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা সাম্য সম্বন্ধ ইহা ত স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাম্যই বল আর বৈষম্যই বল প্রকৃতির অভ্যন্তরে উভয়ই আপেক্ষিক, অর্থাৎ সহস্র সাম্য হইলেও তাহার মধ্যে কোন না কোন প্রকার বৈষম্য থাকিতেই চায়, আর সহস্র বৈষম্য হইলেও তাহার মধ্যে কোন না কোন প্রকার

সাম্য থাকিতেই চায়; দাম্পত্য যে এমন সাম্য-সম্বন্ধ তাহার মধ্যেও বৈষম্য থাকা নিতান্তই প্রয়োজন, সে বৈষম্য এইরূপ,—আমি যাহাকে ভালবাসি তাহার অবশ্য এমনি একটি গুণ থাকিবে যাহা আমাতে নাই; যদি কেবল আমার আপনার গুণ-গুলিই অন্যেতে দেখি, তাহা অপেক্ষা অধিক আর কিছুই না দেখি, তবে তাহাকে ভালবাসা আমার পক্ষে বাহুল্য। আপনার প্রতি আপনার ভালবাসা ত আছেই—আর একজন যদি সকল বিষয়ে ঠিক আমারই মত হয়, তবে তাহাকে ভালবাসায় তা অপেক্ষা অধিক কি আর আমার লাভ? কারণ ব্যতীত কার্য্য হইতে পারেনা—আমি আপনাকে ছাড়িয়া পরকে যে ভালবাসিব তাহার অবশ্য একটা কারণ চাই—সে কারণ এই যে, আমাতে আমি যাহা পাই না—তাহাতে আমি তাহা পাই। আমার আপনার যে কিছু গুণ আছে তা'র ত আর আমার অভাব নাই, অন্যেতে তাহা অপেক্ষা নূতন কোন গুণ দেখিলে তবে ত তজ্জন্য আমার একটা অভাব বোধ হইবে—ভালবাসা জন্মিবে। এখন—দাম্পত্য-সম্বন্ধে যদি বৈষম্য না থাকিলেই নয় তবে তাহাকে সাম্য-সম্বন্ধ বলি কেন? সাম্য সম্বন্ধের অর্থ এই যে, এ পক্ষের যেমন কতকগুলি গুণ আছে যাহা ও-পক্ষের নিকট নূতন, ও পক্ষেরও তেমনি কতকগুলি গুণ আছে যাহা এপক্ষের নিকট নূতন; ইহার এই গুণগুলি উহার অভাব পূরণ করে, এবং উহার ঐ গুণগুলি ইহার অভাব পূরণ করে। পর-পক্ষের অভাব-পূরণের যোগ্যতা এ পক্ষেরও যেমন ও-পক্ষেরও তেমনি—ঠিক সমান, এই কারণেই দাম্পত্য সম্বন্ধকে সাম্য-সম্বন্ধ বলা হইয়াছে। দুই পক্ষ যদি অবিকল একই প্রকার হয়, উভয়ের মধ্যে যদি এরূপ কোন গুণ বৈচিত্র না থাকে যাহা লইয়া আদান প্রদান চলিতে পারে, তাহা হইলে উভয়ের সংসর্গে উভয়ের কোন উন্নতি হইতে পারে না; এ অবস্থায় উভয়ের মধ্যে দম্পতি-প্রেম কথনই সম্ভবে না।

ইহার আর এক ধাপ উপরে বাৎসল্য সম্বন্ধ। পুত্র-কন্যার প্রতি পিতামাতার যে সম্বন্ধ তাহা বাৎসল্য সম্বন্ধ। বাৎসল্য সম্বন্ধের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—শক্তি। পুত্র-কন্যাকে কোন মতে মানুষ করিয়া তোলা পিতা-মাতার মনোগত অভিপ্রায়; তাঁহারা তাহাদিগকে আপনাদের শক্তির অধীনে আনিতে পারিলে তবেই সে শুভ অভিপ্রায় ফলদায়ক হয়। বাৎসল্য যেমন দাম্পত্য হইতে প্রসূত, শক্তিও সেইরূপ সংসার-ধর্ম্ম হইতে প্রসূত; সংসার-ধর্ম্মের সার মর্ম্ম পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি যে, আমি যেমন অন্যের নিকট প্রত্যাশা করি অন্যের প্রতি আমিও যেন সেইরূপ ব্যবহার করি, তাৎপর্য্য তাহার আর-কিছু নহে কেবল পরস্পরের প্রতি আন্তরিক একটি সদিচ্ছা। পিতা মাতার আপনাদের মধ্যে আন্তরিক সেই যে সদিচ্ছা, তাহারই প্রভাবে সন্তানের উপর তাঁহাদের শক্তি সঞ্চারিত হয়। ধর্ম্মের মধ্যে যেমন স্বার্থ সংভুক্ত রহিয়াছে সেইরূপ শক্তির মধ্যে

ধর্ম্ম সংভুক্ত রহিয়াছে—কেন না ধর্ম্মের শক্তিই শক্তি, অধর্ম্মের শক্তি অশক্তি বই নয়। সহাইয়া সহাইয়া শক্তি প্রকটন পূর্ব্বক পুত্র-কন্যাকে উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তোলা পিতামাতারই কার্য্য; ইহাতে পুত্র কন্যার কিছুমাত্র কষ্টও বোধ হয় না অথচ শিক্ষা লাভ হয়। এইরূপ ধর্ম্ম-গর্ত্ত শক্তি দ্বারা নিয়মিত হইলেই বাৎসল্য যথার্থ পথে পদনিক্ষেপ করে। বাৎসল্য সম্বন্ধ বৈষম্য-সম্বন্ধ ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, কেন না পিতার প্রতি পুত্রের ভাব এবং পুত্রের প্রতি পিতার ভাব পরস্পর বিভিন্ন। বিষয়-সুখের সম্বন্ধ প্রথম বৈষম্য সম্বন্ধ—ইহাতে শুদ্ধ কেবল আদানেরই ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, বিষয় হইতে আমি রসাকর্ষণ করিব তাহাকে আমি পাল্‌টা কিছু দিব না—এই সে ব্যাপার। দাম্পত্য সম্বন্ধ প্রথম সাম্য-সম্বন্ধ, ইহাতে আদান-প্রদানের তুল্যতা দেখিতে পাওয়া যায়—ভালবাসা যেমনটি দেওয়া তেমনিটি পাওয়া এই তাহার ভাব। বাৎসল্য-সম্বন্ধ দ্বিতীয় বৈষম্য-সম্বন্ধ, ইহাতে প্রদানেরই ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়, সংসার-ধর্ম্ম সাধন করিয়া পিতামাতার যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা পুত্র কন্যাগণেরই জন্য।

ইহার আর একধাপ উপরে সৌহার্দ্দ সম্বন্ধ—ইহা দ্বিতীয় সাম্য সম্বন্ধ। সৌহার্দ্দের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—সৌন্দর্য্য। সমবয়স্ক সঙ্গীগণের মধ্যে যেমন সৌন্দর্য্যের অনুশীলন হইতে পারে, গুরু-লঘু ব্যক্তির মধ্যে তেমনটি কখন সম্ভবে না। সৌন্দর্য্য এমন বস্তু নহে যাহা একাকী ভোগ করিয়া তৃপ্ত থাকা যায়; একটি সুন্দর রচনা বা ছবি বা গীত দেখিলে শুনিলে বন্ধু-সকলকে তাহা দেখাইতে শুনাইতে মন যায়। স্বামী বা স্ত্রী দুপক্ষের হইয়া অথবা উভয়ে একত্রে মিলিয়া সংসার-ধর্ম্ম অনুশীলন করিলে তবে যেমন তাহা তৃপ্তিজনক হয়; সেইরূপ বন্ধুবর্গের চক্ষুর সহিত চক্ষু এবং মনের সহিত মন মিলাইয়া সৌন্দর্য্য অনুশীলন করিলে তবেই তাহা তৃপ্তিজনক হয়। ধর্ম্ম যেমন স্বার্থ নহে অথচ স্বার্থ, সৌন্দর্য্য সেইরূপ শক্তি নহে অথচ শক্তি। ধর্ম্মের মধ্যে স্বার্থ, সৌন্দর্য্যের মধ্যে শক্তি, থাকে,—কিন্তু সুশাসনে। সন্তানের উপর পিতা মাতার যে শক্তি-সঞ্চার হয় তাহা অবাধে হয়, বন্ধুবর্গের মধ্যে পরস্পর যে শক্তি-সঞ্চার হয় তাহা পরস্পর কর্ত্তৃক বাধা-যুক্ত। বন্ধুবর্গের সকলেই পরস্পরের উপর স্ব স্ব প্রকৃতি-সুলভ শক্তি চালনা করিবে, এইটির প্রতি কেহ হস্তারক না হইয়া আপনার শক্তি-চালনা করিলে তাহাই বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে শোভা পায়। সৌহার্দ্দের উপর অনিয়ন্ত্রিত শক্তির প্রভুত্ব খাটে না কিন্তু সৌন্দর্য্যের প্রভুত্ব সম্পূর্ণই খাটে। স্বামী-স্ত্রীর একতম পক্ষ যে-গুণ দ্বারা অন্যতমের মনোনীত হয়, আর পাঁচ জনের চক্ষে সে-গুণ হয়ত গুণই নহে,—এইরূপ-যে গুণ, যাহা স্বামীই কেবল স্ত্রীতে দেখিতে পায় অথবা স্ত্রীই কেবল স্বামীতে দেখিতে পায়, তদ্ভিন্ন আর কেহ দেখিতে

পায় না, ইহাকে সৌন্দর্য্য বলে না,—সৌন্দর্য্য বলে তাহাকেই যদ্দ্বারা জন সাধারণের মন আকৃষ্ট হয়। সৌহার্দ্দ রীতিমত উপভোগ করিতে হইলে বন্ধুগণের মনস্তুষ্টি জন্মাইতে পারে এমন কোন একটি লোক-রঞ্জন গুণের অনুশীলন চাই,—আপনার যেটি ভাল লাগে তাহাই ভাল এভাব বন্ধু-মণ্ডলীর মধ্যে কোন-প্রকারেই শোভা পায় না। যত প্রকার মনোরঞ্জন বিদ্যা আছে—সঙ্গীত-বিদ্যা, চিত্র-বিদ্যা, স্থপতি-বিদ্যা, এ সমস্তই সৌন্দর্য্যের সন্তান-সন্ততি! সুন্দর মনের ভাব, শোভন দৃশ্য, শোভন বাক্য, শোভন সঙ্গীত, শোভন ব্যবহার, এই সমস্ত সৌহার্দ্দের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী। অশোভন ব্যবহারে, অশোভন বাক্যে, অশোভন দৃশ্যে, সৌহার্দ্দ কুণ্ঠিত হয়; সৌন্দর্য্য দ্বারা নিয়মিত হইলে তবেই সৌহার্দ্দ রীতিমত চরিতার্থ হইতে পারে।

এখন সৌহার্দ্দের সম্বন্ধকে সাম্য সম্বন্ধ বলিবার কারণ কি দেখা যাউক্। সুহৃন্মণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত প্রত্যেক ব্যক্তির তুলা-মূল্যের আদান-প্রদান চলিতে থাকে; ইহাতে করিয়া মণ্ডলীটির উচ্চ নীচ ভাব-গুলি ক্রমে ক্রমে সমভূম হইয়া গিয়া উহার একটি বিশেষ লক্ষণ দাঁড়ায়; এবং সেই লক্ষণটি মণ্ডলীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিতেই সমানরূপে বর্ত্তে। ইহারই জন্য সৌহার্দ্দ সম্বন্ধকে সাম্য-সম্বন্ধ বলা হইয়াছে। দাম্পত্য-সম্বন্ধে একতম-পক্ষ দম্পতির স্থলাভিষিক্ত অথবা প্রতিনিধি হইতে পারে—এই প্রকার সাম্য; সৌহার্দ্দ-সম্বন্ধে প্রত্যেকে সুহৃন্মণ্ডলীর প্রতিনিধি হইতে পারে—এই প্রকার সাম্য।

ইহার আর এক ধাপ উপরেই ভক্তির সম্বন্ধ—ইহা তৃতীয় বৈষম্য-সম্বন্ধ; কেন যে বৈষম্য সম্বন্ধ তদুপলক্ষে নূতন কিছুই বলিবার নাই—বাৎসল্যের সম্বন্ধ যে কারণে ইহাও সেই কারণে বৈষম্য-সম্বন্ধ। ভক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রেয়। শ্রেয় দ্বারা ভক্তি নিয়মিত হইলেই তাহা রীতিমত চরিতার্থতা লাভ করে। অর্থাৎ যাহা শ্রেয় যাহা মহৎ তাহাতে ভক্তি সমর্পণ করা হইলেই ভক্তি রীতিমত চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে। শ্রেয়ের বশ হইলে তবেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী গুরু ব্যক্তিদিগকে রীতিমত ভক্তি করিতে পারা যায়; শুভাকাঙ্ক্ষী শব্দের অর্থই এই যে তিনি শ্রেয় চাহেন। যিনি আমাদের শ্রেয় চাহেন না—শুদ্ধ কেবল আনুগত্য চাহেন, তাঁহাকে আমরা ভক্তি করিলে অপাত্রে ভক্তি সমর্পণ করা হয়,—এ সব স্থলে ভক্তি কিছুকাল পরেই অভক্তিতে পরিণত হয়। শ্রেয়ঃ সাধন করিলে যাঁহার নিকট আদর-ভাজন হওয়া যায় তাঁহাকেই ভক্তি করা উচিত—তাহা হইলে ভক্তি শ্রেয়-দ্বারা নিয়মিত হইয়া সাধককে নিম্ন শ্রেণী হইতে উচ্চ শ্রেণীতে তুলিয়া লয়। সমকক্ষ সঙ্গীগণের মনোনীত হইলেই শ্রেয় হয় না, উচ্চশ্রেণীর মনোনীত হওয়া চাই তবেই বিষয়-বিশেষ শ্রেয়োগুণ-সম্পন্ন হয়। সৌন্দর্য্যকে যেমন উচ্চ মূল্যের শক্তি বলা যাইতে পারে, শ্রেয়কে সেইরূপ উচ্চ মূল্যের সৌন্দর্য্য বলা যাইতে পারে; এমন

কি, উচ্চ মূল্যের কবিতাতে শ্রেয়েরই সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে প্রতিফলিত হইয়া থাকে।

ইহার আর এক ধাপ উপরে অমায়িক প্রেম, অর্থাৎ যে প্রেম মায়ার শৃঙ্খলে বদ্ধ নহে। অমায়িক দৃষ্টিতে দেখিলে—পর যে সেও আপনার হয়, ক্ষুদ্র দৃষ্টিতে দেখিলে—আপনার যে সেও পর হয়। পর্ব্বতশিখর হইতে নিম্নস্থিত লোকালয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কুটীর ও প্রাসাদের মধ্যে যেমন বিশেষ কোন প্রভেদ লক্ষিত হয় না, জগতের অতীত প্রদেশ হইতে জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উচ্চ নীচের তারতম্য সেই রূপ মনে অধিকার পায় না। জগতের মায়া-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া এবং পরমাত্মার সহিত যুক্ত হইয়া, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যখন প্রেম প্রসারিত হয় তখন তাহাই অমায়িক প্রেম শব্দে উক্ত হয়। অসীমের সহিত সসীমের যে প্রেম-সম্বন্ধ তাহাই অমায়িক প্রেমের সম্বন্ধ। অমায়িক প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সামঞ্জস্য। জগতের যে স্থানে আমরা আছি সেইস্থানে থাকিয়াই আমরা যদি সমস্তের সহিত আপনার সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারি, তাহা হইলে কাহারো সহিত আমাদের আর বিবাদ থাকে না,—তাহা হইলে পদ্মপত্রে জল যেমন নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থান করে, সংসারে আমরা সেই ভাবে বিচরণ করি। প্রকৃতির যে একটি চিত্র ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার মধ্য-প্রদেশ-হইতে দূরদূরস্থিত অনন্ত পরিধি-পরম্পরা পর্য্যন্ত সামঞ্জস্যের কোথাও একটু ত্রুটি হইবার জো নাই। যেখানে যেটি চাই সেখানে সেইটি রহিয়াছে; যে-সময়ে যেটি চাই সেই সময়ে সেইটি আবির্ভূত হইতেছে; যেমনটি যেখানে শোভা পায় তেমনিটি সেইখানে স্থান গ্রহণ করিতেছে। প্রকৃতির মধ্য-দেশ বলিয়া যে স্থান উল্লেখ করা হইয়াছে, যেখানে, বলা হইয়াছে, পরমাত্মার মহিমা সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট-রূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহা কি উপাদানে নির্ম্মিত তাহা একবার ভাবিয়া দেখা যাউক। জগতের মধ্যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সামগ্রী কি? না চেতন পদার্থ; তাহা যদি হইল তবে সেই উপাদানেই প্রকৃতির মধ্যস্থল বিনির্ম্মিত। প্রকৃতির সেই মধ্য-দেশ সমুদায়-আত্মার সঙ্গম-স্থান। যদিও আমরা বলি আমাদের আত্মা শরীরের অভ্যন্তরে বাস করিতেছে কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহা সর্ব্বথা সম্ভব নহে। ঘটের অভ্যন্তরে জল আছে ইহা সম্ভব বলি কেন—না ঘটও আকাশ-ব্যাপী জলও আকাশব্যাপী। আত্মার প্রভাব শরীরাভ্যন্তর হইতে প্রকটিত হয় এই অর্থেই বলা যায় যে আত্মা শরীরাভ্যন্তরে বাস করে; কিন্তু আত্মা আকাশের অতীত বস্তু—সুতরাং অনাকাশ প্রদেশেই তাহার অবস্থিতি; প্রকৃতির মধ্যদেশই সেই অনাকাশ প্রদেশ। জগতের সমুদায় আত্মা প্রকৃতির সেই মধ্য-স্থানে—পরমাত্মার সেই অভয় ক্রোড়ে—নিরাপদে বিধৃত রহিয়াছে।

প্রকৃতির সেই মধ্যদেশকে আধ্যাত্মিক জগৎ বলা যাইতে পারে। ভৌতিক জগৎ আমাদের শরীরের বাসস্থান, আধ্যাত্মিক জগৎ আমাদের আত্মার বাসস্থান। মনুষ্যের আত্মা পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্ম-জগতে—মনুষ্যের অমায়িক আনন্দ দেবতাগণের সহিত দেবলোকে—মনুষ্যের বুদ্ধি মনুষ্যগণের সহিত বিজ্ঞান-রাজ্যে—মনুষ্যের মন পশ্বাদির সহিত মনো-রাজ্যে—মনুষ্যের প্রাণ উদ্ভিদগণের সহিত জীবন-রাজ্যে এবং মনুষ্যের শরীর ভূত-গ্রামের সহিত ভৌতিক জগতে বাস করিতেছে; জগতের আদ্যোপান্ত সমস্তই মনুষ্যের বাসস্থান। সমস্ত জগতের সহিত মনুষ্যের সহিত আদান-প্রদান চলিতেছে; জগৎ যেমন মনুষ্যের হিতসাধন করিতেছে মনুষ্য তেমনি জগতের হিতসাধন করিতেছে,—সমস্ত জগতের সহিত মনুষ্যের এ যেমন সাম্য-সম্বন্ধ, অন্য কোন জীবেরই এরূপ সম্ভবে না। যেমন সুহৃন্মণ্ডলীর প্রভাব তদভ্যন্তরস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিতে সংক্রমিত হইয়া সকলকে এক আত্মা সদৃশ করিয়া তোলে, সেইরূপ সমস্ত জগতের প্রভাব মনুষ্যের উপর কার্য্য করিয়া তাহাকে সকলের সহিত যোগযুক্ত—সকলের ভাবের ভাবুক— করিয়া তোলে; আবার উপযুক্ত হইলে যেমন সুহৃন্মণ্ডলীর প্রত্যেকেই সমস্ত মণ্ডলীর প্রতিনিধি রূপে গৃহীত হইতে পারে, সেইরূপ—উপযুক্ত হইলে, মনুষ্য, সমস্ত জগতের প্রতিনিধি রূপে গৃহীত হইতে পারে; যথা,—মনুষ্যের শরীর ভৌতিক জগতের, মনুষ্যের প্রাণ উদ্ভিদ্ জগতের, মনুষ্যের মন পশ্বাদি জগতের, মনুষ্যের আধ্যাত্মিক আনন্দ দেবলোকের এবং মনুষ্যের আত্মা পরমাত্মার প্রতিনিধি স্বরূপ। সমস্তের সহিত আত্মার যেখানে সামঞ্জস্য সাধিত হয়, সেই নির্বিবাদ এবং নিরাপদ স্থান হইতেই সমস্ত জগৎ এবং তাহার মূলাধার পরমাত্মার প্রতি প্রেম প্রসারিত হইয়া মোক্ষানন্দে পরিপ্লুত হয়।

উপরে বিষয়-সুখ এবং স্বার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া অমায়িক প্রেম এবং সামঞ্জস্য পর্য্যন্ত যে ছয়টি ধাপ প্রদর্শিত হইল সমস্ত জড়াইয়া মনুষ্যের একটি উন্নতি-সোপান প্রস্তুত রহিয়াছে। প্রত্যেক ধাপেই দেখা যায় যে, বিভিন্ন-প্রকৃতি দুই পক্ষের পরস্পর সংসর্গে উভয়ের অভাব সম বা বিষমভাবে পূরণ হইয়া উভয়েই উন্নতি লাভ করে। সে উন্নতি যে কি রূপ তাহার বিশেষ বিবরণ অতঃপর প্রদর্শিত হইতেছে।



মেকলের ভারতবর্ষ-প্রবাস।

মেকলে যেরূপে তাঁহার প্রবাস যাপন করিতেন তাহা তাঁহার পত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন "মাসগুলো কেমন শীঘ্র চলিয়া যাইতেছে। আবার শীতকাল উপস্থিত, সকালে কুয়াসা—বনাতের কাপোড়—কড়াই সুঁটি, নূতন আলু এই সকল এখানকার শীতের আনুসঙ্গিক জিনিস। আমার জীবনস্রোত এক প্রকার সমান বহিয়া যাইতেছে। কোন সময় কি বই পড়ি আর আমার ছোট ভগিনীটির উত্তরোত্তর বয়োবৃদ্ধি—এই দুয়েতেই আমার দিবস গণনার সাহায্য হয়। নতুবা বৎসরের এক ভাগ ও অপর ভাগের মধ্যে কিছুই প্রভেদ দেখিতে পাইতাম না। গ্রীক লাটিন গ্রন্থ অধ্যয়ন—প্রাতর্ভোজন, কাজকর্ম্ম—একটা বই হাতে করিয়া সায়াহ্নে ভ্রমণ, রাত্রিভোজন—কাফি পান, শয়ন, এতেই আমার একদিনের জীবন বৃত্তান্ত দেখিতে পাইলে।"

৮ মার্চ ১৮৩৭

"এক্ষণে আমার কর্ম্মের ভীড় অত্যন্ত। কতক দিন থেকে আমি কাজকর্ম্মে ভারি ব্যস্ত রহিয়াছি। যাহা হোক্ আমার হস্তে যে গুরুভার নিহিত ছিল তাহা এক প্রকার শেষ হইয়াছে। আর এক মাসের মধ্যে আমাদের পীনাল কোড গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইবে। এই ফৌজদারী আইন শতকোটি লোকের জন্য—ইহার সূত্র সকল সমর্থন ও ব্যাখ্যা করিয়া টীকা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার ভালমন্দ ঈশ্বরই জানেন যখন শুধু এই বই খানির প্রতি দৃষ্টি করি তখন ইহার বিশেষ কিছু গুণ দেখিতে পাই না, কিন্তু ইংরাজি ফরাসিস্ কোড সকলের তুলনায় ইহাকে প্রাধান্য দিতে হয়। আমার শরীর পূর্ব্ববৎ সুস্থ আছে—সময় দ্রুত বেগে চলিয়া যাইতেছে। এক দিন আর দিনের সঙ্গে এমন সমান যে আমার অভ্যাসক্রমে কোন সময় কোন বই পড়ি তাহা সেই বইয়ের মধ্যে পেনিসল দিয়া টুকিয়া না রাখিলে কালের গতি নিরূপণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইত। অমুক ঘটনা কোন সময় হইয়াছে তাহা জানিতে হইলে আমি ভাবিয়া দেখি সে দিন আমি কি বই পড়িতে ছিলাম—বইয়ের পাতা উল্টাইয়া তারিখ দেখিয়া দিন স্থির করি—তখন দেখিয়া অবাক হই যে আমি যাহা দু-তিন মাসের ঘটনা মনে করিতে ছিলাম তাহা হয়ত এক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছে।"

মেকলের ন্যায় পেটুক পাঠক কেহ কুত্রাপি দৃষ্টি করে নাই। ভাগ্যে তিনি গ্রন্থ-কীট ছিলেন তাই তিনি তাঁহার প্রবাস কাল কথঞ্চিৎ যাপন করিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। তাঁহার না এদেশ পছন্দ হইত না তিনি এ দেশের লোকেদের সঙ্গেই

মিশিতেন। ইহা প্রসিদ্ধই আছে ইংরাজেরা বিদেশে গিয়া আপনাদের দ্বীপোচিত ক্ষুদ্রভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহাদের চক্ষে তাঁহাদের দেশই সকল দেশের আদর্শ, তাঁহাদের সমাজই সকল সমাজের আদর্শ। সেই আদর্শ হইতে যাহা কিছু ভিন্ন তাহাই ধিক্কার-যোগ্য। মেকলে তাহাতে আবার ইংরাজের ইংরাজ। তিনি এ দেশের যাহা কিছু সমস্তই আপনার সেই ক্ষুদ্র মানদণ্ড দিয়া মাপিয়া দেখিয়া তাহার গুণদোষ নির্ণয় করিতেন। এ দেশের কিছুই তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি বলেন—"এ দেশের বায়ুর একটা বিশেষ দোষ দৃষ্ট হয়। মানুষের হস্তরচনার উপর ইহার বড়ই নিগ্রহ। লৌহে মরিচা পড়ে, ছুরির ধার নষ্ট হয়, সূতা ক্ষয় হয়, কাপড় ছিঁড়িয়া যায়, গ্রন্থ সকল জীর্ণ হয় ও তাহাদের মলাট খসিয়া পড়ে, কাষ্ঠ পচিয়া যায়, মাদুর ছিন্ন ভিন্ন হয়। প্রচণ্ড সূর্য্য, এই বিস্তীর্ণ জলাদেশের বাষ্প, আর উইপোকার অসংখ্য সৈন্যদল গৃহের উপর এই তিনের এরূপ দৌরাত্ম্য যে তিন বৎসর অন্তর গৃহসংস্কার আবশ্যক হইয়া পড়ে। আমাদের বাড়ীর তিন মাস আগে এই দশা হইয়াছিল আর যদি আমরা বর্ষার পূর্ব্বে রীতিমত বন্দবস্ত করিবার ত্রুটি করিতাম তাহা হইলে হয়ত আমার মাথার উপর ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িত। এই জন্য আমরা ছয় সপ্তাহ কাল আমাদের গৃহ ও পুষ্পোদ্যান ছাড়িয়া অন্যত্র বাস করিতে বাধ্য হইলাম। এখানে দেশীয় রান্নার দুর্গন্ধে, দেশীয় বাদ্যধ্বনির জ্বালায় আমরা মারা যাই আর কি। আমরা এক্ষণে আমাদের গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছি, ইহার পর যে ছাড়িতে হইবে সে একেবারে স্বদেশ যাত্রার জন্য জাহাজে উঠিবার সময়——ইহা মনে করিয়াও আনন্দ হইতেছে।" তিনি এক স্থলে এ দেশের খাদ্য সামগ্রীর বর্ণন করিয়া বলিতেছেন "এখানকার ফল বিশ্রী। তাহাদের মধ্যে যা অত্যন্ত সুস্বাদু তাহা আমাদের এপ্রিকট কিম্বা গুজবরি (টেপারীর) চেয়েও অধম।" আশ্চর্য্য যে এ দেশের ফলের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার ভাল বোম্বাই আম মনে পড়িয়া জিহ্বায় জল আসে নাই। "ছেলেবেলায় ভাবিতাম যে কলাই বুঝি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল ও খর্জ্জুর রস অপেক্ষা সরস কিছুই নাই। আমার পিতা এই সকল দ্রব্য আস্বাদন করিয়াছেন বলিয়া আমার কেমন হিংসা হইত। কিন্তু এখন দেখিতেছি যেমন দূর হইতে মনে করা যায় তেমন কিছুই নয়। কলা আমাদের দেশের পচা পেয়ারার মত। একজন অন্ধ এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ জানিতে পারে না ইহা আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। মান্দ্রাজে একটী গ্রামে এক রাত্রি বাস করিয়া ছিলাম। সেখানে তাল-রস চাখিয়া দেখিলাম। ইহা চাখিবার আমার বড়ই সাধ ছিল। সকালে আমাকে উঠাইয়া আমার চাকর আমাকে একটা পাত্রে করিয়া টাটকা রস আনিয়া দিল। আমি পান করিলাম—দেখি যে জিহ্বার বিষয় মধ্যে আমার ভাগ অল্প

থাকিলে যেমন স্বাদ তাহারও তেমনি আস্বাদ। ”

মেকলে চৌরঙ্গির একটা সেরা বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন “ আমার একটা সুন্দর উদ্যান আছে। ইহা সবুজ তৃণ পরিচ্ছদে সুশোভিত, চারিধারে বেড়াইবার কাঁকরের রাস্তা, মধ্যে মধ্যে ফুল গাছ ছড়ান। বর্ষার পরে এখন ইহা বেশ সুন্দর দেখিতে হইয়াছে আর শুনিতে পাই সম্বৎসর ইহার হরিদ্বর্ণ অপনীত হয় না। আমার লাইব্রেরি হইতে সিড়ি দিয়া এই বাগানে উত্তীর্ণ হওয়া যায় ও ইহা এমত ছায়া-সুলভ যে বেলা ১০টা পর্য্যন্ত এখানে আরামে বেড়ান যায়।” শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি এই সুরম্য স্থানে সূর্য্যোদয়ের পর দুই ঘণ্টা বই হাতে করিয়া বেড়াইয়া বেড়াতেন। প্রত্যহ প্রাতে তাঁহার ছোট পুঁটি আসিয়া তাঁহার পাঠ ভঙ্গ করিত। রুটির টুকরা ছড়াইয়া দিয়া কাকদের খাওয়ান তাহার কাজ ছিল ও যখন সে বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রুটি বিতরণ করিত তখন তাহাকে বড় বড় পাখীদের উৎপাত হইতে রক্ষা করিতে তাহার মাতুলের সামান্য পরিশ্রম হইত না। যখন সূর্য্যের উত্তাপ তাঁহাকে গৃহের মধ্যে তাড়াইয়া দিত, তখন তিনি স্নান ভোজন প্রভৃতি নিত্য নিয়মিত ক্রিয়া সমাপন করিয়া আফিসের কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিতেন।

কৌন্সিলের দিনে কিম্বা অন্য কোন বিশেষ প্রসঙ্গে তাঁহার গৃহের বাহির হইতে হইত, তদ্ভিন্ন অন্যান্য দিবসে তিনি প্রায় তাঁহার লাইব্রেরিতে থাকিয়া তাঁহার পড়া শুনা ও অপর কার্য্য করিতেন। কখন বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎ প্রতিসাক্ষাৎ করিতেই তাঁহার সকালটা কাটিয়া যাইত কিন্তু ওরূপ সময়ব্যয় তাঁহার নিতান্ত বিরক্তিজনক বোধ হইত। ভাগ্যক্রমে তাঁহার বন্ধুগণ প্রায়ই গৃহে অনুপস্থিত থাকিতেন ও তখন কেবল তাঁহার নামের এক কার্ড পাঠাইয়া দিয়াই নিস্তার পাইতেন। মধ্যাহ্নভোজনের পর তিনি তাঁহার ভগিনীর সঙ্গে বসিয়া হয় গ্রীক্ হইতে অনুবাদ, নয় কোন ফ্রেঞ্চ বই পাঠ করিতেন। সায়াহ্নে তাঁহারা দুজনে গাড়ী করিয়া গঙ্গাতীরে ভ্রমণে বাহির হইতেন ও সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রাত্রিভোজনে বসিতেন। ভোজনের সময় প্রায়ই বহু সংখ্যক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিত। এই সকল আঙ্গ্লো ইণ্ডিয়ান প্রথানুরূপ ভোজের উপর মেকলে অতিশয় বিরক্ত ছিলেন। “এর চেয়ে আর কিছুই বিরক্তিজনক হইতে পারে না, যে, যে যার পাশে বসিয়া আছে সে তার সঙ্গে ভিন্ন অন্য কারো সঙ্গে কথা কয় না। যেরূপ কথাবার্ত্তা চলে তাহা নিতান্ত নীরস ও অর্থশূন্য। অভ্যাগতের মধ্যে সকল অপেক্ষা যিনি বড় বিবি আমাকে সর্ব্বদাই তার পার্শ্বে বসিতে হয় অর্থাৎ যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধা, কুৎসিতা গর্ব্বিতা তাঁহার সংসর্গে সকল অপেক্ষা আমার যন্ত্রণা ভোগ। ”

ভারতবর্ষপ্রবাস-কালে মেকলে স্বদেশ

স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট পাইতেন, স্বদেশে ফিরিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইতেন। তিনি লিখিতেছেন "ইংলণ্ডের জন্য আমার প্রাণ যে কি ছট্ ফট্ করে, প্রবাস-যাপন আমার পক্ষে যে কি কষ্টজনক তাহা তোমাকে কি বলিব। আমার মনে হয় যে আর আমি কিছুই চাই না, কেবল আর একবার স্বদেশ দেখিয়া মরি। এই দূর দেশে প্রবাস অল্প কষ্টদায়ক নহে। যে ইহা পরীক্ষা করিয়া না দেখিয়াছে সে ইহার কিছুই বুঝিতে পারে না। জীবনের চিরাভ্যস্ত আচারব্যবহারের পরিবর্ত্তন, পুরাতন বন্ধু বান্ধবের বিচ্ছেদ, ভালবাসার সমুদায় জিনিস ১৫০০০ মাইল দূরে ফেলিয়া আসা—এ সকল আমার পক্ষে নিতান্ত অসহ্য যন্ত্রণা। যতই অর্থ, যতই প্রভুত্বের প্রলোভন আসুক না কেন, পুনর্ব্বার এরূপ কষ্ট স্বীকারে আমি কোন ক্রমেই সম্মত হইব না। কিন্তু ইহাও দেখিতেছি যে অনেকে এরূপ কষ্টকে কষ্টই মনে করে না। কোম্পানির কর্ম্মচারীদের মনের ভাব আমার সঙ্গে মেলে না। তার কিন্তু কারণ আছে। তাহারা যে অল্প বয়সে এ দেশে প্রেরিত হয়, যখন তাহারা অপরিপক্ক স্কুলের ছাত্র, পৃথিবীর কিছুই জানেনা, তখন তাহাদের ওরূপ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। তাহারা গৃহের বাহির হইয়া স্বাধীন ক্ষেত্রে সহসা প্রবেশ করিয়া স্বাধীনতা-ঐশ্বর্য্য-ভোগে তাহারা গৃহ-বিচ্ছেদের কষ্ট বিস্মৃত হইয়া যায়। কতক বৎসরের মধ্যে এ দেশের জল বায়ু তাহাদের এক প্রকার সহ্য হইয়া যায়। ও ক্রমে এদেশ স্বদেশ অপেক্ষাও তাহাদের মনোনীত হয়। কিন্তু ৩৩ বৎসর বয়সে এদেশে আগমন স্বতন্ত্র কথা।"

অক্টোবর ১৮৩৬ সালে তিনি কলিকাতা হইতে তাঁহার পিতাকে লেখেন ঃ—

সে দিন আপনার পত্রে আপনার শারীরিক মানসিক কুশল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি। আগামী পরশ্ব দিন আপনার ছোট নাত্নীটির প্রথম বৎসরের জন্ম দিন। এই উপলক্ষে আমার এখানে একটা পুতুল নাচ হইবে। ইহা দেশীয়দের মধ্যে অত্যন্ত প্রচলিত। ইংলণ্ডে যেমন Punch এর প্রদর্শন, ইহাও তেমনি, কেবল তার চেয়ে এতে নাট্যাভিনয়ের ভাগ অধিক ও এ দেশী আড়ম্বর পূর্ণ। আমাদের পাড়াপড়শির বন্ধুদের ছেলে পিলেদের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে আর বড় বড় লোকেরা বড় বড় খানা দিয়া যে আমোদে সময় কাটায় তা অপেক্ষা আমোদজনক হইবে সন্দেহ নাই।

আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমার পীনালকোড গবর্ণমেণ্টে প্রেরিত হইবে। জানিয়া শুনিয়া খুন ও রাজ্য সম্বন্ধীয় গুরুতর অপরাধ ভিন্ন অন্যান্য অপরাধে আমরা প্রাণদণ্ড উঠাইয়া দিয়াছি। এই আইন প্রচলিত হইলে ভারতবর্ষে দাসত্ব এক প্রকার উঠিয়া যাইবে। চাকরির জন্য কেহ কাহারো উপর দেওয়ানি কোর্টে দাওয়া করিতে পারিবে, কিন্তু একজন আর একজন স্বাধীন পুরুষের প্রতি যা না পারে

প্রভু তাহার কোন দাসের উপর এরূপ কোন অন্যায়াচরণ করিতে পারিবেক না।

আমাদের ইংরাজি বিদ্যালয় সকল সুন্দর চলিতেছে। যত লোক বিদ্যা শিক্ষার জন্য অভিলাষী তাহাদের সকলদের শিক্ষাদান কঠিন, স্থল বিশেষে অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। কেবল এক হুগলী সহরে ১৪০০ বালক বিদ্যাভ্যাস করিতেছে। হিন্দুদের উপর এই শিক্ষার আশ্চর্য্য ফল ফলিতেছে। কোন হিন্দু ইংরাজি শিক্ষা পাইলে তাহার ধর্ম্মের প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা চলিয়া যায়। কেহ কেহ দেশাচারের অনুরোধে ধর্ম্ম পালন করে, কিন্তু অনেকে একেশ্বরবাদী হইয়া পড়ে। কেহবা খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে যদি আমাদের শিক্ষা-প্রণালী আরো অধিক কাল স্থায়ী হয়, তাহা হইলে এই বঙ্গদেশের ভদ্র পরিবারের মধ্যে ৩০ বৎসর পরে আর একজন পৌত্তলিকও দৃষ্ট হইবে না। আর ইহাতে আমাদের মিসনরিদের ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারের কোন চেষ্টাই আবশ্যক হয় নাই। কাহারো বিশ্বাসের স্বতন্ত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে হয় নাই। জ্ঞান ও সত্যের প্রচারেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে। ইহা অতীব সন্তোষজনক।

আপনার নিকট এই পত্র পৌঁছিবার ছয় মাসের মধ্যে আমি স্বদেশে ফিরিবার উদ্যোগ আরম্ভ করিব। গৃহ প্রত্যাগমন আশায় আমার মনে যে কি বিচিত্র ভাবের উদয় হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। এ আশা হয়ত নিরাশয়ে পরিণত হইবে। ইহার আনন্দ ভোগের জন্য আরো কয়েক মাস প্রবাস যাপন করা হয়ত সুবুদ্ধির কাজ হয়। আমার মনে হয় স্বদেশ গিয়া আমার কষ্টের কোন কারণ থাকিবে না—ইংলণ্ড দেশে ইংরাজদের মধ্যে বাস করা, আমার চির-পরিচিত দৃশ্য সন্দর্শন করা, আমার মাতৃ ভাষায় শব্দ শ্রবণ করাই আমার পক্ষে যথেস্ট। আর আমি কিছুই চাই না।"

তাঁহার স্বদেশে ফিরিবার সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে আর অধিক কাল তাঁহার প্রবাসে কস্ট ভোগ করিতে হইবে না। ১৮৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি লিখিতেছেন "আমার ছাড়িবার দিন সন্নিকট। এদেশ হইতে এই হয়ত তোমাকে শেষ পত্র লিখিব। আমাদের যাত্রার জন্য জাহাজ স্থির হইয়াছে। লণ্ডন ও কলিকাতার মধ্যে যে সকল চলন্ত হোটেল সমুদ্রের উপর দিয়া যাতায়াত করে এ জাহাজখানি তাহার মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। দ্রুতগতির জন্য তত না হউক কিন্তু খাওয়া দাওয়ার বন্দবস্ত ও যাত্রীদের সুখস্বচ্ছন্দতা বিষয়ে ইহা প্রখ্যাত। কেপে গিয়া কতক কাল বিশ্রাম করিতে হইবে, তাই হয়ত পৌঁছিতে আমার মে মাসের শেষ কি জুনের আরম্ভ। ইংলণ্ড পৌঁছিবার আগে আমার জর্ম্মণ ভাষায় ভাল রূপ ব্যুৎপত্তি লাভের ইচ্ছা আছে। ইহার মধ্যে আমি অবসর মত এ ভাষা অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়াছি। লুথরের বাইবেল অনুবাদের প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে আর শিলরের ইতিহাসও চলিতেছে। জর্ম্মণ বইএর মধ্যে আমি গল্তে

শিলর লেসিঙ্গ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ লেখকদের গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়াছি। পথের মধ্যে সে সমুদয় শেষ করিবার ইচ্ছা আছে।

আমাদের পীনল কোড্ আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। ইহাতে আমার গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইহার দোষ যতই থাকুক ইহাতে শ্রম ও যত্নের ক্রটি করি নাই। ইহা ভারতবর্ষের উপযোগী হউক বা না হউক আমি দেখিয়াছি ইহার রচনা আমার মানসিক উন্নতির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছে।"

এদেশ হইতে বিদায় লইবার কিছু পূর্ব্বে তিনি লিখিতেছেন "এ বৎসর (১৮৩৭) বর্ষাকাল নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। আমাদের বাড়ী তবুও অপেক্ষাকৃত ভাল—হানা আমাদের সকল অপেক্ষা সুস্থ রহিয়াছেন। পুঁটির মধ্যে মধ্যে অসুখ করিয়া থাকে। Trevelyan পীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছে, গঙ্গাসাগরে মধ্যে মধ্যে ষ্টীমার করিয়া ভ্রমণ করা তাঁহার স্বাস্থ্য রক্ষার একমাত্র উপায়। আমার একবার কঠিন জ্বর হইয়াছিল। ভাগ্যি দুই এক ঘণ্টার অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই—আর আমি সাবধানে থাকিয়া পুনরায় তাহা আসিতে দিই নাই। কিন্তু এই ব্যামর দরুণ প্রায় ১৫ দিবস পর্য্যন্ত আমি অশক্ত ও দুর্ব্বল ছিলাম। এদেশে এই আমার প্রথম হয়ত শেষ পীড়া ভোগ করিতে হইল। এই মারাত্মক জলা ভুমির মধ্যে আর এক বৎসর কাটাইতে হইবে না ইহা আমার পরম সৌভাগ্য। যদি ও তিনি আর এক বৎসর অধিক থাকিলে আর এক লক্ষ টাকা অধিক জমাইতে পারিতেন কিন্তু প্রাণভয়ে সে লোভ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তাঁহার হাতে যে সমস্ত কাজ ছিল তাহা যত শীঘ্র পারেন সমাপন করিলেন। কৌন্সল সভার আসন, আইন কমিসন ও শিক্ষা কমিটির আসন পরিত্যাগ করিয়া ১৮৩৮ সালের প্রারম্ভে তিনি ট্রেবিলিয়নদের সমভিব্যাহারে স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

যাহা বলা হইল তাহাতে মেকলের প্রবাস জীবনের এক ভাগমাত্র প্রদর্শিত হইল। তিনি যে সকল লোকোপযোগী কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, শিক্ষা ও আইন সম্বন্ধে ভারতবর্ষ তাঁহার নিকট হইতে যে সকল মঙ্গলের উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বলিবার এখনকার অবশিষ্ট আছে।

তাঁহার প্রবাস জীবনে এমন কিছুই নাই যাহাতে তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার উদয় হয়। বরং এমন কতকগুলি বিষয় আছে যাহাতে তিনি আমাদের বিরাগ ভাজনই হইতে পারেন। আমরা জানি আমাদের দেশের প্রতি তাঁহার কিছুমাত্র মমতা ছিল না। তিনি কেবল অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্তে ভারতবর্ষে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। এ দেশের লোকদিগকেও যে তিনি সমধিক প্রীতি করিতেন, তাহা বোধ হয় না। বিশেষতঃ বঙ্গজাতির প্রতি অকারণ নিন্দা প্রয়োগ করিয়া তিনি আমাদের মধ্যে আপনার নামকে চিরকলঙ্কভাগী করিয়া রাখিয়া ছেন। আমরা তাঁহার সে অপরাধ কখনই ভুলিব না, কখনই মার্জ্জনা করিতে

পারিব না। কিন্তু তাঁহার এই সকল বহু দোষ সত্ত্বেও যে সকল কার্য্যের জন্য তিনি আমাদিগকে তাঁহার ঋণ-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন, আর কোন সময়ে সে সমুদয় প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসঃ

কাতন্ত্র-জীবনী।

উপক্রমণিকা।

অধুনাতন সময়ে রত্নপ্রসবিত্রী ভারত ভূমিতে আর সেই পূর্ব্বকালীন ভুবনোজ্জলকারী প্রভাকরসদৃশ দেবভাষার গগনস্পর্শী প্রদীপ বর্ত্তমান নাই; সেই মেদিনীবিস্ময় প্রশংসনীয় সর্ব্ববিদ্যাদর্শ সর্ব্বাদিম ভারতীয় ধর্ম্ম, পুরাণ, ন্যায়, দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, চিকিৎসা, সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্র, যাহা একদা পৃথিবীস্থ যাবতীয় জাতিরই শিক্ষার প্রধান অবলম্বনীয় ছিল,—ক্রমে লোপ নিবন্ধন তাহা এখন নির্ব্বান প্রায়। কিন্তু এই ঘোরান্ধকার আর্য্যভাষাতে এখনো এতাধিক রত্নরাজি বিদ্যমান আছে, যাহা সংগ্রহ করিয়া বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ বসুন্ধরাস্থ বিদ্বজ্জনের শির্ষস্থানে আরোহণ করিয়া, সকলকে চমৎকৃত করিতেছেন।

মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভুবনমুগ্ধকারী ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের মাহাত্ম্য-বর্ণন জন্য কখন কখন পুরাবৃত্ত রূপ দুই একটী ক্ষীণালোক প্রজ্বলন করিয়া সাধারণ্যে পুনঃ ভারতের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছেন। ইহা ভারতভূমির পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

যদিও কাতন্ত্র (১) সেই ভারতীয় রত্ন রাজির একটী উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ কিন্তু কাতন্ত্র সম্বন্ধীয় পুরাবৃত্ত সংগ্রহে এ পর্য্যন্ত কোনও পাশ্চাত্য কি প্রাচ্য মহাত্মাকে হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যাইতেছে না। এই জন্যই কাতন্ত্ররচয়িতাগণ বিশিষ্ট-গুণান্বিত হইয়াও এখন সর্ব্বত্র পরিচিত নহেন। তাই আমরা কাতন্ত্রপ্রণেতাগণ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

ইতিহাস ব্যতীত নিঃসন্দিগ্ধ রূপে চিত্তে পুরাতত্ত্ব অবগত হওয়া বড়ই সুকঠিন ব্যাপার। দুর্ভাগ্যবশতঃ পুরাকালে আমাদের দেশে ইতিহাস-লিখন-প্রথা প্রচলিত না থাকাতে, ভারতের কত অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক ঘটনা অতীত কাল-গর্ত্তে যে বিলীন হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। এই জন্যই এখন একটী বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলে, শরীরের শোণিত শুষ্ক করিয়া শ্রম করিলেও প্রকৃত তত্ত্ব পাওয়া দুর্ঘট।

(১) ইহার অপর দুই নাম "কলাপ" এবং "কুমার"। এখন কাতন্ত্র, "কলাপ ব্যাকরণ" নামেই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

কাতন্ত্র ও তদ্ব্যাখ্যা-রচয়িতাগণের জীবনী, কাতন্ত্রের টীকা প্রভৃতিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভাবে যে কিছু বর্ণিত আছে, তাহা ব্যতীত আর কোথাও তৎসম্বন্ধে আর কিছু পাওয়া যায় না। তবে তাঁহাদের সময় নিরূপণ ও আনুসঙ্গিক প্রমাণ বিষয়ে অন্যান্য গ্রন্থেও সাহায্য পাওয়া যাইবে। এতদ্ব্যতীত কাতন্ত্র-ব্যবসায়ীদের মধ্যে চির-প্রচলিত কিংবদন্তী দ্বারা যে সকল ঘটনা রক্ষিত হইয়াছে তাহা হইতেও মাঝে মাঝে দুই একটী বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা গৃহীত হইবে।

কাতন্ত্র-প্রণেতাদের মধ্যে মহাত্মা সর্ব্ববর্ম্মা, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ কাত্যায়ণ বররুচি মুনি, সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ দুর্গসিংহ, এই তিন জন মহামহোপাধ্যায়কেই সমান জ্ঞান করিতে হইবে; ইহাঁরা সকলেই দেব-ভাষা-সমুদ্র মন্থন করিয়া ব্যাকরণামৃত উদ্ধৃত করতঃ পৃথিবীর বিস্ময় প্রশংসার স্থল হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের একজনের অভাব হইলেই, কাতন্ত্র, সংস্কৃত ব্যাকরণ মধ্যে এত উচ্চ আসন লাভ করিতে পারিত না (২) এবং অধুনাতন সময়েও ভারতীয় সংস্কৃতবিদ্ পণ্ডিতগণের ঘরে ঘরে এত সমাদর পাইত না। কাতন্ত্র একটী ভারতীয় অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র স্বরূপ; তন্নিবন্ধনই এই সংস্কৃত-বিলোপকারী ঊনবিংশ শতাব্দির ঘোরান্ধকারেও স্বীয় দীপ্তিতে বিদ্বজ্জনের নয়নে স্থান পাইতেছে; অন্যথা রাশি রাশি দেব-গ্রন্থের ন্যায় এত দিন কাতন্ত্রও অদৃশ্য হইয়া যাইত।

কাতন্ত্রের নানা সদ্গুণ সন্দর্শনে এবং ইহা ব্যাকরণ-শিক্ষার্থীদের পক্ষে বিশেষ উপাদেয় গ্রন্থ জ্ঞানেই সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের জনৈক ভুবনবিখ্যাত পণ্ডিত, গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিতগণ, এবং মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীপতি, ত্রিলোচন, তর্ককেশরী রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি বিদ্যাবিশারদ মহোদয়গণ, কাতন্ত্রকে বহু সম্মান করিয়া ব্যাখ্যা, টীকা, পরিশিষ্ট বিরচণে কাতন্ত্রের অঙ্গ এক একটী অমূল্য দেব আভরণে বিভূষিত করিয়াছেন। (৩)

সর্ব্ববর্ম্মা, কাত্যায়ন, দুর্গসিংহ এবং প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কাতন্ত্র টীকাকারদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সন্নিবেশিত করাই এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। পর পর অধ্যায়ে তাহাই প্রকটিত হইতেছে।

প্রথম অধ্যায়।

সর্ব্ববর্ম্মা।

ব্যাকরণ শাস্ত্র বিশারদ সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্র (কলাপ সূত্র) প্রণয়ন করেন। (৪)

* (২) অনেক পণ্ডিত এখনকার সংস্কৃত ব্যাকরণ মধ্যে পাণিনির পরেই কাতন্ত্রের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া থাকেন।

(৩) ইহার বিস্তারিত বিবরণ যথা স্থলে বিবৃত হইবে।

(৪) দেব দেবং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনং কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সর্ব্ববর্ম্মিকং। দুর্গসিংহ।

পুরাকালে শালিবাহন নামক বসুধাধিপকে অবিলম্বে ব্যুৎপন্ন করিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইয়া, আচার্য্য সর্ব্ববর্ম্মা কুমার নামক ভগবান ভবানীপুত্রের আরাধনা করেন। কুমারদেব তদীয় আরাধনায় বশীভূত হইয়া, নিজ ব্যাকরণ জ্ঞান আবির্ভাবের নিমিত্ত সিদ্ধোবর্ণ সমন্নায় (৫) এই পদ্যপাদরূপ সূত্র সর্ব্ববর্ম্মাকে প্রদান করেন (৬) সর্ব্ববর্ম্মা তাহা অবলম্বন করিয়াই কাতন্ত্র প্রণয়ন করেন।

কাতন্ত্র প্রণয়ন সম্বন্ধে একটী প্রাচীন উপখ্যান এইঃ—কোন রাজা [শালিবাহন] মহিষীর সহিত সলিলে যাইয়া জলক্রীড়া করিতেছিলেন; জলসিঞ্চনে সেই রাণী রতিরসে আত্মহারা হইয়া, নৃপতিকে বলিলেন "মোদকং (৭) দেহি দেব!" অর্থাৎ হে দেব আমাকে উদক (জল) দিও না। মূর্খতা নিবন্ধন রাজা সেই স্বরঘটিত পদ বুঝিতে না পারিয়া রাজ্ঞীকে মোদক (মোয়া) প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই প্রজ্ঞাবতী রাণী "আমার যে পতি নৃপতি তিনি মূর্খ" এই বলিয়া নিন্দা করিলেন। শালিবাহন ভার্য্যার সমুদয় কথা গুরু সর্ব্ববর্ম্মার নিকট আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন (৮)। তন্নিবন্ধনই সর্ব্ববর্ম্মা তাহার শিক্ষার জন্য কাতন্ত্র প্রণয়ন করেন।

এতৎসম্বন্ধে অপর কিম্বদন্তী এইঃ—যখন সর্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া কুমারের আরাধনা করেন, তখন কুমার যে ময়ুরটীতে আরোহণ করিয়া তাঁহার নিকট অধিষ্ঠান হয়েন সেই শিখির কলাপ দেশে "সিদ্ধিবর্ণ সমন্নায়" এই কাতন্ত্রের প্রথম সূত্রটী লিখা থাকে। ঐ শ্লোকটী দৃষ্টিমাত্রই সর্ব্ববর্ম্মার অন্তরে ব্যাকরণ প্রণয়ন জ্ঞান অঙ্কুরিত হয়। এবং সেই সূত্রটী শির্ষস্থানে

(৫) অনুষ্টুপ ছন্দের নিয়মানুসারে এই সূত্রটীকে প্রথম অথবা তৃতীয় পাদে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। অনুষ্টুপের লক্ষণ যথা—

শ্লোকে ষষ্ঠং গুরুজ্ঞেয়ং সর্ব্বত্র লঘুপঞ্চমং
দ্বিচতুঃ পাদয়োহ্রস্বং সপ্তমং দীর্ঘমন্যয়োঃ।
কালিদাস।

(৬) পুরাকিল শ্রীশালিবাহনাভিধানং বসুধাধিপং ঝটিতি ব্যুৎপাদয়িতুং প্রতিশ্রুতবতা সর্ব্ববর্ম্মণাচার্য্যেন কুমারাভিধানো ভগবান ভবানীসুতঃ সমারাধিতঃ। সচ তদারাধনাধীনতামুপগতো নিজ ব্যাকরণজ্ঞানমাবির্ভাবয়িতুং পদ্যপাদরূপং সূত্রমিদমাদিদেশ। ইতি কলাপচন্দ্রঃ।

(৭) নিষেধার্থ মা শব্দের সহিত উদকং শব্দের সন্ধি পাইয়া (মা+উদকং)=মোদকং পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

(৮) রাজা কশ্চিৎ মহিষ্যা সহ সলিলগতঃ খেলয়ন্ পানিতোয়ৈঃ সিঞ্চংস্তা ব্যাহৃতা সা রতিরসতয়া মোদকং দেহি দেব।

মূর্খত্বাৎ তন্নবুদ্ধ্বা স্বরঘটিতপদং মোদকস্তেন দত্তো রাজ্ঞী প্রাজ্ঞী ততঃসা নৃপতিমপি পতিং মূর্খমেণং জগর্হ ॥১
ভার্য্যায়া ভাষিতঞ্চৈব নিশম্য শালিবাহনঃ*।
সর্ব্বং নিবেদয়ামাস গুরবে সর্ব্ববর্ম্মণে ॥২
কলাপচন্দ্র।

* শালবাহনঃ ইতি বা পাঠঃ।

রাখিয়া কাতন্ত্র প্রণয়ন করেন। উল্লিখিত উপাখ্যান ত্রয়ের দ্বিতীয় উপাখ্যানটী অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। উনবিংশ শতাব্দির দেবাদর্শী লোকগণ হয়ত অপর দুইটী উপাখ্যানে দেব-সংশ্রব দেখিয়া কিছু আপত্তি করিতে পারেন। কিন্তু প্রথম উপাখ্যান হইতে কুমারানুগ্রহ বিষয়ক অংশটুকু বাদ দিলে তাহার অন্যান্য সত্যের প্রতি আপত্তি করার কোনও কারণ নাই। তৃতীয় উপাখ্যানটী হইতে আমরা এই সার সংগ্রহ করিতে পারি——যখন সর্ব্ববর্ম্মা ভগবান্ কার্ত্তিকের আরাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন হয়ত সেই সময়ে দৈবাৎ একটী শিখী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল। কুমারবাহক শিখীকে অবলোকন করিয়া "আমার নিকট অদৃশ্য ভাবে কুমার দেব স্বীয় বাহনে উপস্থিত হইয়াছেন" হয়ত সর্ব্ববর্ম্মা এইরূপ মনে করিয়াছিলেন; আর শিখীর কলাপস্থিত চিহ্নটী সন্দর্শনে তাহা কুমার-লিখিত ব্যাকরণাভাষ স্বরূপ কোন বর্ণ কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাই কুমার-প্রসাদ বিবেচনা করিয়া তদবলম্বনে সাহসী হইয়া কাতন্ত্র বিরচন করিয়াছিলেন। যে হিন্দুসন্তানগণ ঘট পট প্রস্তর বৃক্ষ ও মৃৎপুত্তলীদিগকে দেবতা কল্পনা করিয়া ভক্তি সহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন তাঁহাদের পক্ষে কুমারারাধনা কালে তাঁহার প্রকৃত বাহন—শিখির আগমন দর্শন করিয়া তাহা "কুমার অধিষ্ঠান" মনে করা অসম্ভব নহে। উল্লিখিত কাল্পনিক যুক্তিসদৃশ কোন একটী ঘটনা না ঘটিলে, "সর্ব্ববর্ম্মা একজন গণ্ডমূর্খ ছিলেন; তিনি কেবল কুমারের অনুগ্রহে কাতন্ত্রের ন্যায় একখানি অতুৎকৃষ্ট ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন" একথা এখন কে বিশ্বাস করিবে?

সংবৎ-আবিষ্কারক উজ্জয়িনী-অধিপতি বিক্রমাদিত্য-নিহন্তারক (৯) এবং শকাব্দা-আবিষ্কারক শালিবাহন নৃপতি ব্যতীত, ভারত ইতিহাসে (বসুধাধিপ পদোপযুক্ত) অন্য কোন শালিবাহন নৃপতির নাম লক্ষিত হয় না। সুতরাং আমরা সর্ব্ববর্ম্মার শিষ্য শালিবাহন রাজাকে এবং শকাব্দা আবিষ্কারক শালিবাহনকে একি ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম।

শকাব্দা-আবিষ্কারক শালিবাহনের অধ্যাপক সর্ব্ববর্ম্মার সময় নিরূপণ করা তত কঠিন নহে। শক আরম্ভের কিছু পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হয় এবং কাতন্ত্র সূত্রও শকের পূর্ব্বেই প্রণয়ন করেন। কেননা যখন শালিবাহন অল্প বয়স্ক এবং অশিক্ষিত ছিলেন সেই কালেই সর্ব্ববর্ম্মা তাঁহার অধ্যয়নের জন্য কাতন্ত্র প্রণয়ন করেন। ইতিহাসে উল্লেখ আছে, শালিবাহন বিক্রমাদিত্যকে স্বীয় পরাক্রমে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত করিয়া দাক্ষিণাত্য জয় পূর্ব্বক এত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন যে ঐ দেশে বিক্রমাদিত্যের সংবৎ উঠাইয়া দিয়া আপন

(৯) রাজাবলী ৭ পৃষ্ঠা, মৃত্যুঞ্জয় শর্ম্মা প্রণীত "রাজতরঙ্গ" ৫২ পৃষ্ঠা এবং মার্শম্যান সাহেবের "ভারতইতিহাস" পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

নামে শক স্থাপিত করিলেন (১০) ইহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে যখন তিনি সুশিক্ষিত বুদ্ধিমান, পরিণতবয়স্ক এবং প্রবল-প্রতাপান্বিত হইয়া ছিলেন তখনি বিক্রমাদিত্যের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছিলেন,তাহা না হইলে বিক্রমাদিত্যের ন্যায় একজন প্রাতঃস্মরণীয় সুশিক্ষিত এবং ভুবনবিখ্যাত নৃপতি একটি অবোধ ও সামান্য নৃপতির সহিত কখনি ধর্ম্মযুদ্ধ করিতেন না। ইহাতে দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে কাতন্ত্র বিক্রমাদিত্যের পরলোক প্রাপ্তিরও কিছু পূর্ব্বে (শালিবাহনের অশিক্ষিত অবস্থায়) রচিত হইয়াছে।

বিক্রমাদিত্যের সংবৎ নামক অব্দের প্রায় ১৩৫ বৎসর পর শালিবাহনের শকাব্দা আরম্ভ হয়। কথিত আছে মহারাজ বিক্রমাদিত্য এবং তাঁহার পুত্র বিক্রমসেন-সর্ব্বসমেত ৯৩ বৎসর রাজত্ব করেন ;—(১১) ইহার মধ্যে বিক্রমসেন অতি অল্প দিন রাজত্ব করেন। আমরা আনুমানিক এই ৯৩ বৎসর রাজত্বকাল হইতে যদি বিক্রম সেনের রাজত্ব কাল অন্ততঃ ২০ বৎসরও বাদ দিই, তবে বিক্রমাদিত্য ৭৩ বৎসর রাজত্ব করেন ইহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কেননা তিনি সংবতের আরম্ভ হইতে সিংহাসনে আরোহণ করেন ১২। তিনি ৭৩ সংবতে শালিবাহনের হস্তে ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত হইলে শকাব্দার ৬২ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকপ্রাপ্ত হয়েন এমত স্বীকার করিতে হইবে। যখন শালিবাহন মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে নিহত করেন, তখন অবশ্য শালিবাহন পরিণতবয়স্ক এবং সুশিক্ষিত হইয়া ছিলেন। কাতন্ত্র যখন শালিবাহনকে বুৎপন্ন করিবার জন্য বিরচিত হইয়াছিল, তখন বিক্রমাদিত্যের পরলোক প্রাপ্তির অন্যূন ২০। ৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে কাতন্ত্র বিরচিত হইয়াছে তাহার কোনও ভুল নাই। সুতরাং কাতন্ত্র শকাব্দার প্রায় ৮০। ৯০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃস্টের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে বিনির্ম্মিত হইয়াছে। এই সমুদয় যুক্তিতে আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হইতেছে আচার্য্য সর্ব্ববর্ম্মা খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির পূর্ব্বার্দ্ধে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

যদি আমরা উল্লিখিত যুক্তিতে পদস্খলিত না হইয়া থাকি তবে কাতন্ত্রের বয়ঃক্রম এখন ১৯০০ বৎসরের কিছু ন্যূন।

অনেকে সর্ব্ববর্ম্মাকে ক্ষত্রিয়বংশজ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের মতকে একেবারে অযৌক্তিক জ্ঞান করিতে পারি না; কেননা " বর্ম্মা " বা

(১০) মার্শম্যান সাহেবের "ভারতইতিহাস " পঞ্চম অধ্যায় দেখ। রাজতরঙ্গে লিখিত আছে " বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্যাবধি ১৩৫ একশত পঁইত্রিশ বৎসর হইলে শালিবাহন রাজার সন্তানেরা তাঁহার শক প্রবৃত্তি করিল। রাজতরঙ্গ ৫৩ পৃষ্ঠা।

(১১) রাজতরঙ্গ ৫৩ পৃষ্ঠা এবং রাজাবলি ৭ পৃষ্ঠা দেখ।

(১২) মার্শম্যান সাহেব কৃত " ভারত ইতিহাস " পঞ্চম অধ্যায় দেখ।

" বর্ম্মণ " উপাধি ক্ষত্রিয়গণের নামের প-রেই ব্যবহার হইয়া থাকে (১৩) কিন্তু যদি " বর্ম্মা " শব্দ উপাধি না হইয়া নামের অঙ্গ বিশেষ (যেমন কালিদাস, সুশর্ম্মা, চন্দ্রগুপ্ত) হইয়া থাকে তবে আর এ সিদ্ধান্ত অব্যর্থ হইবে না। টীকাকারগণ অনেক স্থলে নামের পূর্ব্বে আচার্য্য শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন দেখিয়া কেহ কেহ সর্ব্ববর্ম্মাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন। আচার্য্য শব্দ যে কেবল ব্রাহ্মণকে বুঝাইবে তাহা নহে; শিক্ষাগুরু এবং বেদাধ্যাপক মাত্রকেই আ-চার্য্য বলা যায়, সুতরাং ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের লোকও আচার্য্য শব্দে অভি-হিত হইতে পারেন। যখন সর্ব্ববর্ম্মার জাতি সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না তখন তাঁহার বর্ণ ঠিক করা সহজ নহে; তবে অনুমানের আশ্রয় লইলে নামান্তে " বর্ম্ম " শব্দ দেখিয়া সর্ব্ববর্ম্মাকে ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়াই অধিক প্রত্যয় জন্মে।

অনেকে শালিবাহনকে দাক্ষিণাত্যের রাজা দেখিয়া, তাঁহার গুরু সর্ব্ববর্ম্মাকেও তদ্দেশনিবাসী বলিয়া থাকেন। রাজ-তরঙ্গের মতে শালিবাহনের বাসস্থান নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণ তীরস্থ প্রতিষ্ঠান নগরে বর্ত্ত-মান ছিল (১৪)। অন্যান্য ইতিহাসের মতে কেবল প্রতিষ্ঠান নগরে বিক্রমাদিত্যের সহ শালিবাহনের ধর্ম্মযুদ্ধ হইয়াছিল (১৫)।

সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্রের সন্ধি, চতুষ্টয় এবং আখ্যাত এই অংশত্রয়ের সূত্র প্রণয়ন করেন। কৃত সূত্র তিনি প্রণয়ন করেন না (১৬)। সর্ব্ববর্ম্মাকৃত অন্যান্য গ্রন্থ আছে কি না, জানা যায় নাই। কেহ কেহ কাতন্ত্র-সম্মত গণ (ধাতুপাঠ) সর্ব্ববর্ম্মা কৃত বলিয়া অনুমান করেন।

সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্র সূত্র অতি সুন্দর প্রণালীতে প্রণয়ন করিয়াছেন। কাতন্ত্রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও অনায়াস-বোধগম্য সূত্র অন্যান্য ব্যাকরণে প্রায় দৃষ্ট হয় না। " তত্র চতুর্দ্দশাদৌস্বরাঃ " " দশ সমানাঃ " " পূর্ব্বো হ্রস্বঃ " পরোদীর্ঘঃ। প্রভৃতি সূত্র সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও সহজে বু-ঝিতে পারেন। বলিতে কি সর্ব্ববর্ম্মার ন্যায় অতিসরল অথচ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর সূত্র বিরচনে প্রায় কোন বৈয়া-করণই কৃতকার্য্য হয়েন নাই। কাত্যায়ন

(১৩) শর্ম্মবৎব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষ-ত্রিয়স্যতু। গুপ্ত দাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ। বিষ্ণুপুরাণ।

(১৪) "বিক্রমাদিত্য কিছুকাল পরে আ-পন পরমায়ুর শেষ জানিয়া নর্ম্মদানদীর দক্ষিণ তীরস্থ প্রতিষ্ঠান নগরের শালিবাহন রাজার সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন।

৺ মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্ত্তী " রাজতরঙ্গ " ৫২ পৃষ্ঠা।

(১৫) রাজাবলী ৭ পৃষ্ঠা ও মার্শমানের " ভারতইতিহাস, ৫ ম অধ্যায় দেখ।

(১৬) বৃক্ষাদিবদমীরূঢ়াঃ কৃতিনা ন কৃতাকৃতঃ।

দুর্গসিংহ।

মুনি কাতন্ত্রের কৃৎ প্রকরণের সূত্র বিরচন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার সূত্র সর্ব্ববর্ম্মা-প্রণীত সূত্রের ন্যায় তত সরল হয় নাই। সর্ব্ববর্ম্মাকৃত সূত্র সমূহে বৈয়াকরণিক লক্ষণ সকল (১৭) ও সুন্দর রূপ রক্ষিত হইয়াছে। কাতন্ত্রের এতগুলি গুণ থাকিলেও একটী দোষ লক্ষিত হয়, কাতন্ত্রের সূত্রগুলি ভারি বিশৃঙ্খল ভাবে লিখিত হইয়াছে। একটী অধিকারে একদা অনেক গুলি সূত্র রাখিবার জন্য যে যে সূত্র পূর্ব্বে থাকা উচিত তাহা পরে যোজিত হইয়াছে এবং পরের সূত্রগুলি পূর্ব্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে অবশ্য পৌনরুক্তি ও বাহুল্যাংশ গুলি বর্জ্জিত হইয়াছে কিন্তু শিক্ষার্থীদের পক্ষে কিছু অসুবিধা, কেননা একটী বৃত্তি সমুদয় ভাল রূপ কণ্ঠস্থ না থাকিলে প্রতি সূত্রে, টীকার সাহায্য ব্যতীত নিজে নিজে পদ প্রভৃতি সাধন করা প্রায়শই ঘটিয়া উঠে না। এবং এই জন্যই সমুদয় কাতন্ত্র ভালরূপ অভ্যাস না থাকিলে অন্যান্য ব্যাকরণে অগাধ বিদ্যা থাকিলেও কাতন্ত্রের নিয়মে সহজে পদ প্রভৃতি সাধিতে পারা যায় না। কাতন্ত্র-সূত্র গুলি এইরূপ বিশৃঙ্খল হওয়াতে একটী বিশেষ উপকারও দেখা যায়; শিক্ষার্থীদিগের বাধ্য হইয়া বিশেষ মনোযোগ করিয়া কাতন্ত্র-সূত্র অভ্যাস করিতে হয়, অন্যথা যাহারা কাতন্ত্র অধ্যয়নকালে একটুক মনোযোগের ত্রুটী করেন, তাঁহাদের বিষম বিভ্রাটে পতিত হইতে হয়। অন্যান্য ব্যাকরণের একটী সূত্র স্মরণ না থাকিলেও শ্রেণীবদ্ধতা নিবন্ধন তাহা অনায়াসে অনুসন্ধান করিয়া লওয়া যাইতে পারে কিন্তু কাতন্ত্রের একটী সূত্র খুজিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে। বোধ হয় মহাত্মা সর্ব্ববর্ম্মা ব্যাকরণ শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্যই কাতন্ত্র সূত্রচয় এত অশ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। যদি এমত হয় তবে তাঁহার উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় এবং তাঁহার উদ্দেশ্য অনেক সফলও হইতেছে। কেননা প্রায়শই দেখা যায় মুগ্ধবোধ প্রভৃতি ব্যাকরণঅধ্যায়ী অপেক্ষা কাতন্ত্রাধ্যায়ীদের ব্যাকরণে অধিক ব্যুৎপত্তি জন্ম; তবে স্থল-বিশেষে ইহার ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়।

কাতন্ত্রের তিনটী নাম;—কলাপ, কুমার, কাতন্ত্র।

১। শিখীর কলাপস্থিত সূত্র সন্দর্শনে, সর্ব্ববর্ম্মার অন্তরে ব্যাকরণ প্রণয়ন জ্ঞান জন্মে এবং তাহাতে সাহসী হইয়াই কাতন্ত্র বিনির্ম্মিত হয়; এই জন্যই ইহার নাম কলাপ। (১৮)

২। ভগবান্ কুমার, নিজ ব্যাকরণ জ্ঞান সর্ব্ববর্ম্মাকে প্রদান করেন; এবং তদবলম্বনেই সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্র প্রণয়ন করেন, এই জন্য ইহার নাম " কুমার "। (১৯)

---

(১৭) অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্গুরু নির্ণয়ং।
নির্দ্দোষং হেতুমত্যর্থং সূত্রমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

(১৮) এবং (১৯) ইহার বিবরণ পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

৩। সর্ব্ববর্ম্মা ঈষৎ তন্ত্রে (অল্পসূত্রে) এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন এই জন্য ইহার নাম কাতন্ত্র (২০) সর্ব্ববর্ম্মা এবং বোপদেব সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মুখে একটা অস্বাভাবিক উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়;—তাঁহারা বলেন সর্ব্ববর্ম্মা এবং বোপদেব অভিন্ন ব্যক্তি। যখন সর্ব্ববর্ম্মা বৃদ্ধবয়সে পুণ্যোপার্জন জন্য বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বনবাসী হইবার উপক্রম করেন তখন তাঁহার কতিপয় শিষ্য তাঁহাকে বলিলেন "প্রভো! আপনি যে কাতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা অতি বিস্তীর্ণ তাহা অধ্যয়ন করাতে বহু সময় অতিবাহিত হয়, এবম্প্রকার সুবিস্তীর্ণ গ্রন্থ পাঠ করা অনেকের ভাগ্যেই ঘটিয়া উঠে না। অতএব আপনি লোকের হিতের নিমিত্ত একখানি সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।" সর্ব্ববর্ম্মা তাহাদের বাক্যে সম্মত হইয়া বোপদেবের নাম গ্রহণানন্তর মুগ্ধবোধ বিরচন করিলেন। তিনি সেই সময়ে সতত ঈশ্বরচিন্তাতে ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া মুগ্ধবোধ-সূত্রের দৃষ্টান্ত স্থলে ঈশ্বরের নাম প্রয়োগ করিয়াছেন যেমন "লক্ষ্মীশ" "রাম" "হরি" ইত্যাদি। আমাদের নিকট এই কিংবদন্তীটী নিতান্তই অমূলক বলিয়া বোধ হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সর্ব্ববর্ম্মা খৃীঃ পুঃ প্রথম শতাব্দির পূর্ব্বার্দ্ধে প্রাদুর্ভূত হয়েন। ভরতচন্দ্র শিরোমনির মতে বোপদেবের ১১৮২ শকে (১২৬০ খৃষ্টাব্দে) জন্ম হয় এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে বোপদেব ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন; আর এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (২১) সুতরাং সর্ব্ববর্ম্মা বোপদেবের প্রায় ১২। ১৩ শত বৎসরের পূর্ব্বের লোক। সর্ব্ববর্ম্মা এই ১২। ১৩ শত বৎসর জীবিত থাকিয়া পরে বোপদেব নাম গ্রহণ করিয়া মুগ্ধবোধ প্রণয়ন করিয়াছেন নিতান্ত মস্তিষ্ক-বিহীন লোক ব্যতীত ইহা এখন কে বিশ্বাস করিবে?

বোপদেবের কৃত একমাত্র মুগ্ধবোধ নহে। তাঁহার প্রণীত রাম ব্যাকরণ, কাব্যকামধেনু, কবিকল্পদ্রুম, কবিকল্পদ্রুমের টীকা, শত শ্লোক চন্দ্রিকা, ভাগবতের টীকাত্রয় (হরিলীলা, মুক্তাফল, পরমহংস প্রিয়া) প্রভৃতি গ্রন্থ আছে। (২২)

(২০) কাতন্ত্রস্যেতি। "অত্রি" কুটুম্ব ধারণে চুরাদাবিনন্তঃ তত্রান্তে ব্যুৎপাদ্যান্তে অনেনেতি "স্বর বিন্দু গমি গ্রহামনিতি" করণে অন্ প্রত্যয়সচায়মনেকার্থত্বাৎ ধাতূনাং ব্যুৎপাদনেপিবর্ত্ততে তেন তন্ত্রমিহ সূত্রমুচ্যতে, ঈষত্তন্ত্রং কাতন্ত্রং, কুশব্দস্য তন্ত্র শব্দ পরে কাত্বীষদর্থেঽথ ইতি ঈষদর্থে কাদেশঃ।

ত্রিলোচন কৃত "কাতন্ত্র পঞ্জিকা"

(২১) শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রণীত "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" নামক প্রস্তাব দেখ। ঐ প্রস্তাবে হেমাদ্রি ও বোপদেবকে এক সময়ের লোক বলা হইয়াছে। হেমাদ্রি দাক্ষিণাত্যের দেবগিরীশ্বর মহাদেবর মন্ত্রী ছিলেন।

(২২) রামদাস বাবুর "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" নামক প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

আমাদের বোধ হয় বোপদেব প্রথম মুগ্ধবোধ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত দেখিয়া তাঁহার শিষ্যদের প্রার্থনায় বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনকালে সংক্ষিপ্ত করিয়া "রাম ব্যাকরণ" প্রনয়ন করিয়াছিলেন। কালে লোকে সেই ঘটনা বিকৃতিভাবাপন্ন করিয়া এখন পূর্ব্বোক্ত অমূলক কিম্বদন্তী আকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে। একটুক বিবেচনা করিলে আমাদের এই অনুমানই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া উপলব্ধি হইবে; কেন না মুগ্ধবোধ অপেক্ষা রামব্যাকরণ অতি সংক্ষিপ্ত এবং তাহাতে মুগ্ধবোধ অপেক্ষা ঈশ্বরের নামের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্রের কেবল কতকটী সূত্র প্রণয়ন করেন। কেবল সেই সূত্রের সহিত মুগ্ধবোধের তুলনা করিলে মুগ্ধবোধ কাতন্ত্র অপেক্ষা অষ্ট গুণ বৃহৎ হইবে। দুর্গসিংহ পরে ব্যাখ্যা ব্যাবৃত্তি ও বক্তব্যাদি সংযোগ করিয়া কাতন্ত্রের অবয়ব বৃদ্ধি করেন। সর্ব্ববর্ম্মাকৃত কাতন্ত্র-সূত্র হইতে মুগ্ধবোধ অনেক বড়, অতএব কাতন্ত্রকে সংক্ষিপ্ত করিতে গিয়া তিনি তদপেক্ষা প্রায় অষ্ট গুণ বৃহৎ মুগ্ধবোধ প্রণয়ন করিয়াছেন ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে!! এই সকল কারণে পূর্ব্বোক্ত কিংবদন্তীটী যে একান্ত অস্বাভাবিক ও অমূলক তাহা বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে।

বোপদেব, অম্বষ্ঠ কুলোদ্ভব ছিলেন (২৩) সর্ব্ববর্ম্মা ক্ষত্রিয় কি ব্রাহ্মণ ছিলেন সুতরাং সর্ব্ববর্ম্মা এবং বোপদেব কখনই এক ব্যক্তি হইতে পারে না।

অধ্যাপক এগ্‌লীং সাহেব কাতন্ত্র সম্বন্ধে বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন; তিনি বলেন "কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণের নিয়-

(২৩) শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন, বোপদেবকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (রামদাস বাবুর "বোপদেব ও শ্রীমদ্ভাগবত" শির্ষক প্রস্তাব দ্রষ্টব্য) কিন্তু তৎসম্বন্ধে তিনি কোন ভাল প্রমাণ দেন নাই। নিম্নলিখিত প্রমাণগুলি দেখিলে, তাহাকে অম্বষ্ট (বৈদ্য) বলিয়াই অধিক বিশ্বাস হয়।

বিদ্বদ্ধনেশ্বরচ্ছাত্রো ভিষক্ কেশবনন্দনঃ।
বোপদেবশ্চকারেদং বিপ্রো বেদপদাস্পদং॥*

বিশ্ব প্রকাশ অভিধানপ্রণেতা মহেশ্বর কবীন্দ্র তাঁহার, তাঁহার ভ্রাতা বোপদেবের এবং জনক কেশবের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ঃ—

তস্যাভবৎসূনুরুদারবাচো
বাচস্পতিঃ শ্রীললনাবিলাসী।
সদ্বৈদ্যবিদ্যানলিনীদিনেশঃ
কৃষ্ণস্ততঃ সৎকুমুদাকরেন্দুঃ॥
যদ্ভ্রাতৃজঃ সকল বৈদ্যকতন্ত্ররত্নরত্নাকর
শ্রীযমবাপ্যচ কেশবোভূৎ।

বিশ্বপ্রকাশের অবতরনিকা

* এ শ্লোকটীতে বিপ্র শব্দ আছে বলিয়াই বোপদেব ব্রাহ্মণ নহেন, ব্রাহ্মণেরা ভিষক শব্দে কখনই পরিচয় দেন না। বোপদেব অন্যান্য স্থলে বিপ্র শব্দ প্রয়োগই করেন নাই, যথা "বিদ্বদ্ধনেশ ছাত্রেন ভিষক্ কেশব সুনুনা।

(কবিকল্পদ্রুম)

মানুসারে কাতন্ত্র রচিত হইয়াছে" (২৪)। কাতন্ত্র সূত্রের সহিত কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণের সূত্র-সাদৃশ্য দেখিয়া হয়ত অনেকে এগলীং সাহেবের কথা প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন; কেননা পালি ব্যাকরণ-রচয়িতা কাত্যায়ন বুদ্ধদেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত (২৫) সুতরাং তিনি খ্রীঃ পূঃ ৫৫০ কালে বর্ত্তমান ছিলেন। পরকীয় সর্ব্ববর্ম্মা যে, সে আদর্শের অনুসরণ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু অনেক কারণে আমরা এগলীং সাহেবের কথার উপর নির্ভর করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। বুদ্ধদেবের সময়ে "গাথা" নামক ভাষা প্রচলিত ছিল। এই গাথা ভাষাই পরিবর্ত্তিত হইয়া খ্রীঃ পূঃ ১৫০ বর্ষে অশোক রাজার সমকালে "পালী" নামে বিখ্যাত হয় (২৬) 'সুতরাং পালীভাষা বুদ্ধদেবের ৪০০ শত বৎসর পরে আরম্ভ হয়। একটী ভাষা ন্যূন কল্পে একশত বৎসর পর্য্যন্ত পরিপুষ্ট না হইলে সেই ভাষায় একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণের সৃষ্টি হওয়া অতীব অসম্ভব ব্যাপার। আমাদের বোধ হয় যখন পালীভাষা সর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত হয় তখনি কাত্যায়ন পালী ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন; অন্যথা তিনি অসম্পূর্ণ ভাষাতে পালী ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ কখনি প্রণয়ন করিতে পারিতেন না। পালী ভাষা আরম্ভের একশত বৎসর পরেও যদি কাত্যায়নের ব্যাকরণ-প্রণয়ন-কাল অনুমান করিয়া লওয়া যায় তবে ঐ ব্যাকরণ বুদ্ধদেবের ৫০০ বৎসর পরে নির্ম্মিত হইয়াছে এমত স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের বিবেচনায় কাত্যায়নের পালী ব্যাকরণের ন্যায় একখানি অত্যুৎকৃষ্ট সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ব্যাকরণ, একটি ভাষা অন্যূন ৩০০। ৪০০ বৎসরের পরিপক্ক না হইলে, তাহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। যাহা হউক আ-

(২৪) শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন কৃত "ঐতিহাসিক রহস্য" দ্রষ্টব্য। কাত্যায়ন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে, রামদাস বাবু কাতন্ত্রের সদৃশ কাত্যায়নের পালি ব্যাকরণের কয়েকটী সূত্র উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন।

(২৫) "ঐতিহাসিক রহস্য" দেখ।

(২৬) সাহিত্য প্রবেশ (৯ম সংস্করণ) ২৪৩ পৃষ্ঠা দেখ। সাহিত্য প্রবেশ প্রণেতা বলেন "প্রথমতঃ পল্লীর সাধারণ লোক কর্ত্তৃক সংস্কৃতের সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় উহা পালীভাষা নামে বিখ্যাত হইয়া থাকিবে। তিনি বলেন ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে গাথা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছিল। অন্য একজন লেখক বলেন "সিংহলে গিয়া মাগধী ভাষা পালী নাম গ্রহণ করে" (৫ম ভাগ বান্ধব ২০ পৃষ্ঠা)

চন্দ্রগুপ্ত খ্রীষ্টের ২৯২ বৎসর পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হন। তৎপরে, তদীয় পুত্র মিত্রগুপ্ত ও তদনন্তর পৌত্র অশোক রাজত্ব করেন। ১৮০০ শকের ৪১৭। ৪১৯ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অশোক সম্বন্ধে একটী অপূর্ব্ব প্রস্তাব লিখা হইয়াছে।

মরা মানিয়া লইলাম, কাত্যায়নের পালী ব্যাকরণ যেন পালী ভাষা সৃষ্টির ১০০ বৎসর পরেই নির্ম্মিত হইযাছে; তবে ঐ ব্যাকরণ কাতন্ত্র হইতে মাত্র ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। সর্ব্ববর্ম্মার ন্যায় একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ যুগযুগান্তরের পরিবর্দ্ধিত পরিবর্ত্তিত এবং পরিমার্জ্জিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভুবনমণ্ডন সংস্কৃত ব্যাকরণ সমূহের (২৭) আদর্শকে উপেক্ষা করিয়া ৪০।৫০ বৎসরের অপরিপক্ক পালী ভাষোৎপন্ন নিয়ম অনুসারে একখানা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন, যাহার মস্তিষ্ক আছে বোধ হয় তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও একথা অন্তরে স্থান দিবেন না। অতএব অধ্যাপক এগ্‌লীং সাহেব "কাত্যায়নের পালিভাষার ব্যাকরণ অনুসারে কাতন্ত্র রচিত হইয়াছে" এ কথা বলিয়া বাস্তবিকই বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইনি এই প্রকার ভ্রমে পতিত হইয়া কেবল সর্ব্ববর্ম্মার মহতী প্রতিভার অবমাননা করিয়াছেন।

পরন্তু পালীভাষায় ব্যাকরণ-প্রণেতা কাত্যায়ন বুদ্ধদেবের শিষ্য কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইযাছে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে পালী ভাষার আরম্ভের ১০০ বৎসর পরে যদি তিনি পালী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া থাকেন তবে উহা ৫০০ বৎসর পরে বিনির্ম্মিত হইয়াছে। তিনি বুদ্ধদেবের শিষ্য হইলে পালী ব্যাকরণ প্রণয়নের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৫০০ বৎসর হইযাছিল!! এই জঘন্য যুগে লোকের পরমায়ু ৫০০ বৎসর হইতে পারে ইহা কে বিশ্বাস করিবে? সুতরাং পালী ব্যাকরণ প্রণেতা যে বুদ্ধদেবের শিষ্য ইহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব। বোধ হয়, সমাজে বিশেষ আদৃত হইবার জন্য পালী ভাষার ব্যাকরণ প্রণেতা কাত্যায়ন কিম্বা অন্য কেহ তৎপ্রণেতা কাত্যায়নকে বুদ্ধদেবের শিষ্য বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। এ দেশে এবম্প্রকার প্রথা নিতান্ত অলৌকিক বিষয় নহে। অনেকেই জানেন এ দেশের প্রায় সমস্ত পুরাণপ্রণেতাগণই আপনাদের পুরাণকে সমাজে বিশেষ সম্মানিত করিবার জন্য ব্যাস নাম ধারণ করিয়াছেন কিন্তু সমগ্র পুরাণ যে এক লেখনী হইতে নিঃসৃত নহে বিবেচক পুরাণজ্ঞগণ তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন। (২৮)

(২৭) আপিশলি, কাশ্যপ, গার্গ্য, গালব, চাক্রবর্ম্মণ, ভরদ্বাজ, শাকটায়ন, শাকল্য, সেনক, স্ফোটায়ন, পানিনি এবং দাক্ষায়ণ (ব্যাড়ি) প্রভৃতি বহু সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণগণ সর্ব্ববর্ম্মার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।

(২৮) অধিকাংশ পুরাণ বেদব্যাসের নামে প্রচারিত হইযাছে সেই রূপ মধুসূদন মিশ্র মহানাটক বিরচন করিয়া হনুমানের নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এষ শ্রীল হনূমতা বিরচিতে শ্রীমন্মহা নাটকে বীর শ্রীযুত রামচন্দ্র চরিতে প্রত্যুদ্ধৃতে বিক্রমৈঃ। মিশ্র শ্রীমধুসূদনেন কবিনা সং-

পূর্ব্বোক্ত যুক্তি সকল পর্য্যালোচনা করিলে পালী ব্যাকরণ প্রণেতাকে বুদ্ধদেবের ৭।৮ পুরুষেরও অধস্তন লোক বলিয়া বিলক্ষণ প্রতীতি হয়; সুতরাং এ কাত্যায়ন বুদ্ধদেবের শিষ্যানুশিষ্য হইতেও অনেক পরকীয় লোক। আমরা বোধ করি এ কাত্যায়ন সর্ব্ববর্ম্মারও পরকীয় লোক এবং সর্ব্ববর্ম্মার কাতন্ত্রের নিয়মানুসারেই তাঁহার পালী ভাষার ব্যাকরণ রচিত হইয়াছে। আমাদের যুক্তি এগলীং সাহেবের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া পড়িল। আমরা এই স্থলেই সর্ব্ববর্ম্মার জীবনীর পরিসমাপ্তি করিলাম।

ছিন্নমুকুল।

প্রথম পরিচ্ছেদ—ভূমিকা।

বোম্বাই সহরের পারেল পাহাড়-শিখরস্থ একটি অট্টালিকাকক্ষে চারুশীলা রুগ্ন-শয্যায় শয়ান—নিকটে ভগিনী সুশীলা আসীন। তখন প্রাতঃকাল পাহাড়ের নিম্নদেশে দূরে সুনীল সমুদ্র সুধীর ভাবে তরঙ্গিত হইয়া, বক্ষ-স্থিত নৌকা সমূহকে বিলাস ভাবে মৃদুমন্দ দোলাইয়া, লীলাচ্ছলে বেলা [illegible]পাইয়া পড়িতেছিল। সূর্য্য উঠিয়াছে, তাহার সহস্র কিরণমালা বিদ্যুত পুঞ্জের ন্যায় সেই সমুদ্রে চমকিতেছিল। গাছের শিখরে শিখরে, দূরস্থ সুনীল পর্ব্বতের শিখরে শিখরে, প্রাতঃসূর্য্যের হেমাভ রশ্মি জ্বলিতেছিল। তটেই বোম্বাই সহর, পাহাড় হইতে সেই মহানগরীর বিচিত্র রমণীয়তা আরো দ্বিগুণ রমণীয় বোধ হইতে ছিল। এখনো যেন সহর সম্পূর্ণ জাগ্রত হয় নাই, এখনো বৈষয়িক কোলাহল আরম্ভ হয় নাই, এখনো প্রকৃতির প্রাকৃতিক শোভাই চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সুশীলা ভগিনীর সেই রুগ্ন মূর্ত্তি দেখিয়া সাশ্রু নয়নে তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে মাঝে মাঝে মুক্ত বাতায়ন দিয়া এক এক বার নিম্নস্থ সহরের প্রতি, এক এক বার সেই সূর্য্য-রশ্মি-শোভিত সমুদ্রের প্রতি চাহিতেছিলেন। সুশীলা দ্বাবিংশতির অধিক হইবেন না, দেখিতেও সুশ্রী, চক্ষু নাসিকা ওষ্ঠাধর সকলি সুগঠন। কিন্তু তাঁহার বিধবার বেশ, এবং তাঁহার সেই যুবতী-মুখে প্রৌঢ়ার বিজ্ঞতা ব্যাপ্ত হওয়ায় তাঁহার সেই সৌ-

---

সর্ভসজ্জীকৃতে যতোঽস্বঃ প্রথম বিদেহ তনয়ালাভাভিধানো মহান্।

মহানাটক ১ম অঙ্ক।

এই শ্লোকটী দেখিয়া মহানাটক হনুমানের প্রণীত বলিয়া অনেকের সংস্কার আছে। এই প্রকার উদাহরণ অনেক দেখান যাইতে পারে।

ন্দর্য্যের তেমন আকর্ষণী শক্তি ছিল না। সহসা তাঁহার সেই সৌন্দর্য্য কাহারো চক্ষে লাগিত কি না সন্দেহ। ইহাঁরা দুই জনেই এলাহাবাদের মৃত ব্রাহ্ম তারাকান্ত মুখোপাধ্যায় নামক এক জন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির কন্যা। চারুশীলা বিবাহের পর হইতে স্বামীর সহিত আসিয়া বোম্বাই ছিলেন, সুশীলা বাল্যকাল হইতেই পিত্রালয়ে বাস করিতেন। হঠাৎ সুশীলা এক দিন শুনিলেন যে বাণিজ্যে দেউলে হইয়া ভগিনীপতির মৃত্যু হইয়াছে, চারুশীলাও শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছে। শুনিয়া সুশীলা বোম্বাই আসিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বাঙ্গালির মেয়ে—একাকী এত দূর আসিতে সাহসী হইবে কি করিয়া? সুশীলার আর আপনার কেহই ছিল না। ভাগ্যে পূজার ছুটিতে তাঁহার দূর সম্পর্কীয় দেবর হিরণকুমার এলাহাবাদে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন, তিনি সুশীলার বিপদ দেখিয়া সঙ্গে করিয়া বোম্বাই লইয়া আসিলেন।

কত দিন পরে আজ দুই ভগিনীতে সাক্ষাৎ—সেই চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় স্বামীর সহিত চারুশীলা বোম্বাই চলিয়া আসেন, তখন সুশীলা দশম বর্ষীয়া মাত্র। সেই অবধি আর তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। তাহার পর এই অল্প দিনের মধ্যে দুজনের জীবনে কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! সেই বিদায়ের সময় জীবনের সবে আরম্ভ মাত্র, তখন জীবনে কতই সুখের আশা ছিল, ইহার মধ্যেই সকল ফুরাইয়াছে, ইহার মধ্যেই দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে, দুজনেই বিধবা হইয়াছেন। এখন এই অবস্থায় দুজনের দেখা হইয়া] তাঁহারা কত কাঁদিতেছিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে দুজনে কতই দুঃখের কথা কহিতেছিলেন, সে সকল এস্থলে বলা বাহুল্য মাত্র। অশ্রু মুছিতে মুছিতে একবার সুশীলা বাটীর সন্নিধানস্থ উদ্যানে দৃষ্টিপাত করিলেন—দেখিলেন উদ্যানে দুইটি বালক বালিকা খেলিতেছে। কিছু দূরে হিরণকুমার দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছেন। হিরণকুমার অষ্টাদশবর্ষীয়, তাহার বর্ণ উজ্জ্বল, চক্ষু সুদীর্ঘ, দৃষ্টি শান্ত অথচ জ্যোতির্ম্ময়। যৌবনের প্রাক্কালে যে সকল মনের গুণ স্ফূর্ত্তি পাইয়া মানুষের [বাহ্য] প্রকৃতিকেও স্ফূর্ত্তিময় করিয়া তোলে, সেই সকল গুণের প্রাচুর্য্য বশতঃ যেন হিরণকুমারের মুখে, তাঁহার সমস্ত শরীরে একটি [অলৌকিক] তেজের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল। হিরণকুমার দেখিলেন বালকটি কখনো [illegible] কোদাল লইয়া মাটি কাটিতেছে [illegible] দৌড়িয়া গাছের কোন শুষ্ক শাখা ভাঙ্গিতেছে, কখনও বা কোন জল-পাত্র হস্তে লইয়া ফুল গাছের গোড়ায় জল ঢালিতেছে। বালকটি দশমবর্ষীয়, শরীর সুগোল সুঠাম হৃষ্টপুষ্ট, মুখাবয়ব সুন্দর, কৃষ্ণ ভ্রূযুগের নীচে চঞ্চল চক্ষুদ্বয় যেন জ্বলিতেছে কুঞ্চিত কেশরাশি উন্নত ললাট বেষ্টন করিয়া তাহার গরিমা বৃদ্ধি করিতেছে। মুখশ্রী দেখিলে বালকটিকে সরল উদারচেতা, এবং কিছু উদ্ধতস্বভাব ব-

লিয়া বোধ হয়। বালিকাটি কিছু কৃশ, ক্ষুদ্র মস্তকে নিবিড় কেশজাল তাহার স্কন্ধদেশের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত আবরিত করিয়াছে। মধ্যে মধ্যে তাহা স্থানভ্রষ্ট হইয়া বক্ষে কপোলে ছড়াইয়া পড়ায় তাহার ক্ষুদ্র মুখখানির মধুরতা আরো বৃদ্ধি করিতেছে। তাহার চক্ষু দুটি ঘননীল, দৃষ্টি প্রশান্ত এবং করুণ, দৃষ্টিতে যেন কেমন সঙ্কুচিত—কেমন শশঙ্কিত ভাব, চক্ষের পল্লব দুটি যেন কিসের ভাবে সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত, তাহাদের যেন সেই দীর্ঘায়তন চক্ষুর সমস্ত আয়তন বিকাশ করিবার সামর্থ্যই নাই। মুখ খানিতে শৈশবের প্রফুল্ল ভাব নাই, কেমন যেন ঈষৎ বিষন্ন ভাবে আবরিত। সমস্ত মূর্ত্তিতে একটি ভয়ের ভাব, একটি বিষন্ন ভাব, একটি করুণ ভাব বিকীরিত রহিয়াছে।

সহসা ইতস্ততঃ চাহিয়া বালক বালিকার নিকটে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল "কনক আয় আয় দেখবি কেমন ফুল ফুটেছে?" বালিকা আস্তে আস্তে বলিল "কোথায়"? "ঐ দিকে"—এই কথা বলিয়াই বালক কনকের হস্তাকর্ষণ পূর্ব্বক সেই দিকে তাহাকে লইয়া চলিল। বালিকা দুর্ব্বল, ভ্রাতার সঙ্গে সমান দৌড়িতে পারিল না, কস্টে খানিক দূর আসিয়া পড়িবার উপক্রম করিল, অমনি বালক "তুই চলতে পারিসনে—তুই থাক" বলিয়া মনের বেগে সেই প্রস্ফুটিত ফুলবৃক্ষের নিকট দৌড়িল—তাহার আর বিলম্ব সহে না। বালকটি কিছু চঞ্চলচেতা, যখনি যা মনে আসে তখনি তাহা না করিয়া থাকিতে পারে না। বালক হইতে বালিকাটি আবার সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন, সে যেন দৌড়িতে জানে না, যেন চলিতে জানে না, একস্থানে দাঁড়াইয়া নিস্তব্ধ অনিমেষ লোচনে, সমুদ্র-ক্রীড়া দেখিতেই সেই সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা নিমগ্ন ছিল। তাহা দেখিতে দেখিতে তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে কতকি ভাবের উদয় হইতেছিল কে বলিবে। সহসা একটি পুষ্পবৃক্ষস্থিত প্রজাপতির প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। সে অতি ধীরে ধীরে, অতি ভয়ে ভয়ে পদক্ষেপ করিয়া যে গাছে প্রজাপতি বসিয়াছিল সেই গাছের নিকট আসিল, এক দৃস্টে প্রজাপতির দিকে চাহিয়া রহিল, পরে কি ভাবিয়া কে জানে সে আস্তে আস্তে তাহার ক্ষুদ্র হাতটি তুলিয়া প্রজাপতির গাত্র স্পর্শ করিতে গেল, অমনি প্রজাপতিটি উড়িয়া আর একটি বৃক্ষে গিয়া বসিল। বালিকার মুখকান্তি অমনি আরো বিষন্নতর হইয়া পড়িল, যেন মনে মনে বলিতে লাগিল "প্রজাপতি, তুমি পলাইলে কেন, আমি আদর করিয়া ছুঁইতে গেলাম তবে পলাইলে কেন?" বালিকা ক্ষুণ্ণমনে সেখানে হইতে সরিয়া একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুলের নিকট গেল, বিষন্নভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই ফুলটি দেখিতে লাগিল। দেখিতেও ভয়, কে যেন এখনি আসিয়া তাহার দেখায় বাধা দিবে, কে যেন তাহার সেই ভালবাসার ফুলটি তাহার দেখা বন্ধ করিবার জন্যই তুলিয়া লইবে। বালিকাটি ফুলপানে চাহিয়া

চাহিয়া ধীরে ধীরে সেই ফুলটির বৃন্তে আপন কুসুম-হস্ত রাখিল, ধীরে ধীরে সেই ফুলটি তুলিয়া হস্তে লইয়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিল। ফুল তুলিবার সময় বালক দেখে নাই, হঠাৎ এদিকে দৃষ্টি পড়ায়, ভগিনীর হস্তে ফুল দৃস্টে, সক্রোধে ছুটিয়া আসিয়া কম্পিত স্বরে বলিল "আমার গোলাপ ছিঁড়িলি কেন" অমনি বালিকাটি ভয়ে জড়সড় হইয়া কাঁদ, কাঁদ, ভাবে ভ্রাতার মুখ পানে চাহিয়া রহিল, কি যেন বলিতে গেল কিন্তু পারিল না, কথা আটকিয়া গেল। আবার আরক্ত নয়নে তাহার ভ্রাতা বলিল "তুই যে বড় আমার ফুল ছিঁড়িলি!" বালিকা তেমনি করুণ দৃষ্টিতে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। নীরবে ছলছল নেত্রে কত ক্ষমা প্রার্থনা করিল,কিন্তু কোন কথা ফুটিয়া বলিতে পারিল না। একবার অতি মৃদুস্বরে, অতিধীরে, অতি অস্ফুটস্বরে বলিল "আর তুলিব না" সে কথা ক্রুদ্ধ বালকের কর্ণে প্রবেশ করিল না। ভগিনীকে মৌনদৃস্টে উত্তরোত্তর বালক আরো ক্রুদ্ধ হইয়া, কেন ফুল ছিঁড়িলি বলিতে বলিতে সরোষে বালিকাকে মারিতে হস্তোত্তলন করিল, কিন্তু কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া অমনি তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। সেই ব্যক্তিটি হিরণকুমার। তিনি এতক্ষণ দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছিলেন। বালক বালিকাকে মারিতে উদ্যত দেখিয়া তাঁহার বালিকার প্রতি মমতা হইল,হিরণকুমার থাকিতে না পারিয়া, ছুটিয়া আসিয়া বালকের হাত চাপিয়া ধরিলেন। বালক আশ্চর্য্য হইল, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, সে কখনো কিছুতে বাধা পায় নাই, যখনি যাহা মনে করিয়াছে তখনি তাহা করিয়াছে, সহসা আজ বাধা পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল, সরোষে হাত ছাড়াইবার চেস্টা করিল, কিন্তু চেস্টা নিষ্ফল হওয়ায় আরো মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি বালকটিকে কিছু উদ্ধতস্বভাব বলিয়া বোধ হয়। বালক এদিকে সরল, এদিকে উদার, কিন্তু কাহারো প্রভুত্ব সে সহ্য করিতে পারে না, কিছুতে বাধা প্রাপ্ত হইলে সে অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠে, সে মিস্ট কথার দাস কিন্তু বল পূর্ব্বক কেহ তাহাকে কিছুই করাইতে পারে না, সে অতি অল্পতেই ক্রুদ্ধ হয়, কিন্তু সে অতি অল্পক্ষণের নিমিত্ত। ছেলেবেলা হইতে সে বাপ মায়ের অতিশয় আদুরে, সে তাঁহাদের নিকট হইতে কখনো কোন বিষয়ে কোন ভৎর্সনা খায় নাই, যখনি তাহার সহিত তাহার ভগিনীর বিবাদ হইয়াছে সে পিতামাতার কাছ হইতে তাহার পক্ষেই সমর্থন পাইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহার উদ্ধত স্বভাব আরো বর্দ্ধিত হইয়া পড়িয়াছে। তা না হইলে তাহার পিতামাতা যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতে জানিলে এই উদার বালকটির স্বভাব অতি নির্দ্দোষ হইতে পারিত। যাহা তাহার অদৃস্টে কখনো হয় নাই তাহা আজ হওয়াতে সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। হিরণকুমার তাহার হস্ত ধরায় সে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করিল, এই ঘটনাটি তাহার শিরায় শিরায় বিঁধিল।

যখন দেখিল সে হাত ছাড়াইতে অক্ষম, তখন সে আর কিছু না করিয়া, মৌনভাবে আরক্ত লোচনে হিরণের দিকে চাহিয়া রহিল। পাছে হাত ছাড়িলে বালক আবার বালিকাকে মারে, সেই ভয়ে হিরণ হাত না ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বলিলেন " আর মারবে না বল!" বালক এই কথায় আরো ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল " মারবো।"

হিরণ। "তবে তোমার হাত ছাড়িব না"

বালক। " হাত ছাড়িয়া দেও, তুমি হাত ধরিবার কে?" হিরণ আবার বলিলেন "বল মারিবে না, তাহা হইলে এখনি ছাড়িয়া দিব।" বালক আর একবার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া অক্ষম হইলে সক্রোধে বলিয়া উঠিল "আমার বোন আমি মারিব— তুমি বলিবার কে?" বালককে এইরূপ ক্রোধান্ধ দেখিয়া, হিরণকুমার মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বালক তাহাতে আরও যেন অপমানিত হইয়া নীরবে গর্জ্জিতে লাগিল। বালিকা এতক্ষণ ভয়ে এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল, এখন আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া হিরণকে বলিল " দাদার হাত ছেড়ে দাও"—হিরণ হাত ছাড়িয়া দিল। বালক তখন গম্ভীর ভাবে আরক্ত অথচ অশ্রুময় লোচনে নিস্তব্ধে বাগান হইতে প্রস্থান করিল। অন্য সময় হইলে সে হয় তো মাতার নিকট আসিয়া কত অভিযোগ করিত—কিন্তু আজ তাহা করিল না, একাকী আজ শয়নগৃহে আসিয়া অনেকক্ষণ শুইয়া রহিল। হিরণ বালিকাকে কোলে লইয়া উদ্যান হইতে আসিলেন। বালিকা আসিতে আসিতে বলিল "কেন তুমি দাদার হাত ধরিলে?"

ইহার অনেক ক্ষণ পরে বালক বালিকা দুইটি মাতার রুগ্ন কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। বালকটি অন্য দিনের ন্যায় তত প্রফুল্ল নহে—যেন কিছু ম্রিয়মান, তাহা দেখিয়া পীড়িতা মাতা কিছু ব্যাকুল ভাবে তাহাকে কাছে ডাকিলেন। কাছে বসিলে চারুশীলা সেই দুর্ব্বল রুগ্নহস্তে ধীরে ধীরে তাহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিলেন "কেন রে প্রমোদ, আজ যে তোর মুখখানি শুকিয়ে গেছে।" বালক কথা কহিল না। ততক্ষণ বালিকা কনকলতা ভয়ে ভয়ে গৃহের একটি পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহাকে তাহার মাতা কিছুই বলিল না—একবার চাহিয়াও দেখিলেন না। মাতার পক্ষপাতিতা দেখিয়া সুশীলা তাহাকে ডাকিয়া কোলে বসাইয়া চারুশীলাকে বলিলেন "দিদি, এটি বুঝি তোমার ফেল্‌না মেয়ে?" চারুশীলার সেই রুগ্ন ওষ্ঠে একটু হাসির রেখা পড়িল। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল—কত চিকিৎসক আসিয়া দেখিল কিছুতেই চারুশীলা আরোগ্য লাভ করিতে পারিলেন না। ১৫।১৬ দিন কষ্টে বাঁচিয়া ভগিনীর হস্তে সন্তানগুলি সঁপিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—পথহারা।

আট দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। আজ শরৎ কালের এই প্রশান্ত অপরাহ্ন সময়ে পূর্ণযৌবনা স্ত্রীলোকের মত ভাগি-

রথী হেলিতে দুলিতে কানপুরের ক্রোড়-দেশ দিয়া আপনার আবেশেই বহিয়া যাই-তেছে। অস্তপ্রায় সূর্য্যের সহস্র কিরণে আকাশের সহস্র জলদখণ্ড সুরঞ্জিত হইয়া গঙ্গার বক্ষে প্রতিফলিত হইতেছে।

সেই শোভাময়ী ভাগীরথীর অপর পারে একটি নিবিড় বনশ্রেণী দীর্ঘভাবে দূর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। বন-শ্রেণী কোথাও সঙ্কীর্ণ, কোথাও বি-স্তৃত—কোথাও নিবিড়। সেখানে কো-থাও অশ্বত্থ বটের বিশাল শাখায় বসিয়া নানা বর্ণের পক্ষিগণ ঘোর কলরব করি-তেছে—কোথাও ঝোপঝাপের মধ্য দিয়া কখনো দুই একটি বন্য শৃগাল, বন্য বরাহ ছুটিয়া যাইতেছে। অনেক দূর পর্য্যন্ত মনু-ষ্যের বসতির চিহ্ন কিছুই নাই—যে দিকে চাও কেবলি বনশ্রেণী। সহসা আজ অপরাহ্নে—এই নিভৃত নিস্তব্ধ অরণ্য বন্দু-কের গর্জ্জনে প্রতিধ্বনিত হইয়া উ-ঠিল। দুই একটি বন্য পশু যাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে বিচরণ করিতে দেখা গিয়াছিল, তাহারা সভয়ে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে লুকাইল, ভীতিস্বরে কোলাহল করিয়া পক্ষি-গণ নিকটস্থ ঝোপ ঝাপ হইতে উড়িয়া স্থানান্তরে গিয়া বসিল। দেখিতে দেখিতে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষস্থিত দুইটি সুন্দর পক্ষীর মধ্যে একটি সেই বন্দুকের গুলি-বিদ্ধ হইয়া বৃক্ষচ্যুত পল্লবের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে ভূমে লুটাইয়া পড়িল ; আর একটি প্রাণ-ভয়ে উড়িয়া দূরস্থিত আর এক বৃক্ষের উপর গিয়া বসিল। উহার অনুসরণ করিয়া দুইটি বন্দুক-ধারী যুবা পুরুষ আবার সেই বৃক্ষের নিকট আসি-লেন। যুবকের মধ্যে এক জন সেখানে আসিয়া অঙ্গুলি প্রদর্শন করিয়া বলি-লেন "প্রমোদ, ঐ দেখ! ঐ বসিয়া আছে, লক্ষ্য করিয়া মার।"

আট বৎসর পূর্ব্বে পারেল পাহাড়ে আমরা যে দুরন্ত বালক প্রমোদকে খে-লিতে দেখিয়া আসিয়াছিলাম সেই বাল-কই এখনকার এই পরিণতবয়স্ক যুবা-পুরুষ হইয়া উঠিয়াছেন। সেই বাল্য-কালের সৌন্দর্য্য তাহার মূর্ত্তিতে এখন পরি-স্ফুট ভাবে প্রকাশ পাইতেছে, তাহার সৌ-ন্দর্য্যে তখন যাহা কিছু অভাব ছিল, এখন যৌবনে তাহা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু এখনো প্রমোদের মনোবৃত্তির কিছু-মাত্র বিকার হয় নাই, বাল্য-কালের দুরন্ত চঞ্চলচেতা প্রমোদ হইতে, এখনকার যুবা প্রমোদ স্বভাবে অতি অল্পই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বাল্যকালের মত যদিও আর প্রমোদ কোদাল পাড়ে না, ফুল তুলিলে ভগিনীকে মারে না, কিন্তু তথাপি এখনো প্রমোদ সেই প্রমোদ। তাহার বাল্য ক্রী-ড়ার পরিবর্ত্তে প্রমোদ যৌবনে এখন নানা-বিধ ব্যায়ামের খেলার অনুরাগী, অতিশয় শিকারপ্রিয়, কলেজে ঝগড়া করিতে বড় পটু। প্রমোদের দৌরাত্ম্যে কলেজের কোন ছাত্রের দুষ্টমি করিয়া পার পাই-বার যো নাই। প্রমোদ দুষ্ট ছাত্রের যম। এক কথায়—তখনকার সেই উদার চঞ্চল বালক, এখনকার উদার দুরন্ত যুবা। প্র-

মোদ এখন কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়েন, ছুটিতে কখনো কখনো এলাহাবাদে বাড়ী আসেন মাত্র। চারুশীলার মৃত্যুর পর সুশীলা, প্রমোদ ও কনকলতাকে সঙ্গে লইয়া এলাহাবাদে আসিয়াছিলেন। এবার আশ্বিন মাসে পূজার ছুটীতে প্রমোদ বাড়ী না গিয়া একটি বন্ধুর সহিত এই কানপুরে বেড়াইতে আসিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রমোদ বড় শীকারপ্রিয়। কানপুরে আসিয়া গঙ্গার এ পারে শীকারোপযুক্ত স্থান দেখিয়া প্রমোদ শীকার আশায় এই জঙ্গলে বন্ধুর সহিত আসিলেন। বন্য পশু বধ করা তাঁহাদের অদৃষ্টে ঘটিল না, বন্দুকের শব্দে কেহই আর বাসস্থান হইতে নির্গত হইল না, বরং দুই একটি বিচরণশীল পশুও সে শব্দে বাসস্থানে লুকাইল, সুতরাং পাখী মারিয়াই তাঁহাদের সাধ মিটাইতে হইল। যে বৃক্ষে সেই পলাতক পক্ষীটি আশ্রয় লইয়াছিল তাহার তলে থাকিয়া প্রমোদ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া আবার বন্দুক ছুঁড়িলেন। কিন্তু গুলি তাহার গাত্র স্পর্শ করিবার অগ্রেই সে ভীতমনে সে বৃক্ষ হইতে উড়িয়া গেল। মারিতে না পারিয়া প্রমোদ ক্ষুণ্ণ মনে সেখান হইতে অন্য স্থানে আসিলেন। দুই জনে যে কত পাখী ধ্বংশ করিলেন তাহার নির্ণয় নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহাদের রক্ত-পিপাসা মিটিল না। তাঁহারা আবার সে স্থান ছাড়িয়া অন্য দিকে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে একটি বৃক্ষে প্রমোদ সেই পলাতক পাখীটিকে দেখিতে পাইলেন। এত পক্ষী মারিয়াও সেইটিকে বধ করিতে না পারায় প্রমোদ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন, সুতরাং সেইটিকে দেখিয়াই, সেই বৃক্ষ লক্ষ্য করিয়া দুই জনে ছুটিলেন। বৃক্ষতলে আসিয়া অতি ধীরে তাহার প্রতি বন্দুক ছুড়িলেন। কিন্তু এবারও লক্ষ্য করিতে দেখিতে পাইয়া পাখিটি অন্য বৃক্ষে উড়িয়া গেল। প্রমোদের আরো ক্ষোভ জন্মিল। তিনি মনের আবেগে, সেই পলাতক পক্ষীর অনুসরণ করিয়া, সে যে বৃক্ষে বসিল আবার সেই দিকে দৌড়িলেন। যাইতে যাইতে সে অন্যত্র গিয়া বসিল, আবার তিনিও পথ বদলাইয়া সেই দিকে দৌড়িলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত, কিন্তু শীকারের উৎসাহে যুবারা এত মত্ত ছিলেন যে তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। শ্রম-ক্লান্ত ঘর্ম্মাক্ত, তথাপি উৎসাহের সহিত সেই পক্ষীর উদ্দেশে, অন্য কোন দূরবর্ত্তী বৃক্ষের দিকে গমন করিলেন। তাঁহারা যখন বৃক্ষতলে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন অন্ধকার হইয়া আসিল, তখন আর পাখীটিকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা বিশ্রাম করিবার জন্য হতাশচিত্তে সেই বৃক্ষতলে বসিলেন। দেখিতে দেখিতে অগণ্য নক্ষত্রমালা আকাশে ফুটিতে লাগিল, গাছের কোলে খদ্যোত-পুঞ্জ জ্বলিতে আরম্ভ করিল, তাঁহারা তখন বাড়ী ফিরিয়া যাইবার মানসে বৃক্ষতল হইতে উঠিলেন। কানপুরে আসিয়া তাঁ-

হারা এই অল্পদিনের জন্য যে বাড়ীতে ছিলেন, এই জঙ্গল ছাড়াইয়া নদী পার হইয়া পরপারে তাঁহাদের সেই বাড়ী। বাসস্থানে যাইবার জন্য তাঁহারা উ-ঠিয়া, অন্ধকারে পথ চিনিয়া চিনিয়া চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণ চলিয়া চলিয়া বুঝিলেন, সেই অপরিচিত নূতন স্থানে পথ চিনিয়া বাড়ী যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে কত দুরূহ। দেখিলেন তাঁহারা যত চলিতেছেন, কিছুতেই জঙ্গল ছাড়াইতে পারিতেছেন না, যে পথে যান আবার ঘুরিয়া সেই জঙ্গলেই আসিয়া পড়িতেছেন। অনেক ক্ষণ এইরূপে পথহারা শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া সেই অরণ্য মধ্যে দুই বন্ধুতে ঘু-রিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ ঘু-রিয়া অবশেষে ক্লান্ত হতাশ চিত্তে প্রমোদ বলিলেন "কি বিপদ! ক্রমে আরো আঁধার হ'য়ে এল, আমরা নদীতীর হ'তেও অনেক দূরে, কোন পথে গেলে যে তীরে পৌঁছিব তারো ঠিক নেই, কি করা যায়? আজ আমাদের এখানেই থাক্‌তে হবে নাকি!" যামিনীনাথ বলিলেন "আমার তো আর চলিবারও শক্তি নাই, অত্যন্ত অবসন্ন হ'য়ে পড়েছি, তুমি যদি শীকারে ওরূপ উন্মত্ত না হইতে তাহা হইলে আমাদের এ দুর্দ্দশা ঘটিত না" কথা কহিতে কহিতে তাঁহাদের কর্ণ সেই অরণ্যবাসী পশুর রবে ধ্বনিত হইতে লাগিল। অন্ধকারময় ঝোপ ঝাপ ভেদ করিয়া, দুই একটি করিয়া, বন্য ব-রাহ, তাঁহাদের নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। তাহাদের দেখিয়া অজ্ঞাতভাবে প্রমোদের শীকার-লালসা তখনো জ্বলিয়া উঠিল, প্রমোদ সেই অন্ধকারেই লক্ষ্য করিয়া হস্তস্থিত বন্দুক ছুঁড়িলেন। অমনি বন্য পশুগণ চীৎকার করিতে করিতে ভীত মনে স্ব স্ব বাসস্থানে পলায়ন করিল, বৃক্ষস্থিত নিদ্রিত পক্ষিগণ ঘুমাইতে ঘুমাইতে সে শব্দে চমকিত হইয়া একবার অস্পষ্ট স্বরে ডাকিয়া উঠিল, পক্ষীদের সভয় চমকে এক বার বৃক্ষ পত্র কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু পর-ক্ষণেই আবার সকল থামিয়া গেল, সহসা অরণ্যটি নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। এদিকে তাঁহারা পরিশ্রমে কাতর, ক্ষুধা তৃষ্ণায় আকুল হইয়া, প্রতিপদে বৃক্ষ ও লতা জালে বাধা প্রাপ্ত হইতে হইতে চলিতে লাগিলেন, সেই অন্ধকারময় জনশূন্য অরণ্যে এই অসহায় অবস্থায় পথহারা হইয়া তাঁহারা চলিতে লাগিলেন। ক্রমে নিতান্ত অবসন্ন ক্লান্ত হতাশ হইয়া, অগত্যা একটি বৃক্ষতলে বসিয়া পড়িলেন। সহসা এই সময় এই নীরব নৈশ গগনে সঙ্গীত-ধ্বনি উথলিয়া উঠিল, তাঁহাদের কর্ণকুহর সহসা মুগ্ধ হইয়া গেল। এই অসময়ে মনুষ্য-কণ্ঠ শুনিয়া তাঁহাদের জীবনে জীবন যেন ফিরিয়া আসিল। সেই ধ্বনি ক্রমে বাতাসে তাঁহা-দের দিকেই আসিতে লাগিল। গানটী শুনিতে তাঁহারা এক মনে সেই দিকে কান পাতিলেন। প্রথমে সুরমাত্র, পরে অস্পষ্ট, ক্রমে স্পষ্ট কথাগুলি তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল, তাঁহারা শুনিলেন—

"সুশীতল মহীরুহ সুশীতল ছায়
তেয়াগি অনলকুণ্ডে ঝাঁপিতে যে চায়,

রমণীয় বেলা তুমি করি পরিহার,
উন্মত্ত সাগর মাঝে যেতে সাধ যার,
দুর্গ ছাড়ি সহিবে যে ঝটিকা পীড়ন,
যাক সে এ বন ছাড়ি যথা তার মন।
এমন সুখদ কানন বাস,
পশেনা হেথায় শোকের শ্বাস,
হেথায় শান্তি বিরাজমান,
কলহের হেথা নাহিক স্থান,
এ ছেড়ে কি বৈজয়ন্তে কারো মনধায়"।

এই সময় অস্ফুট জ্যোৎস্নায় অরণ্যটি ঈষৎ উজ্জ্বল হইল, ঘোর আঁধারের বিকট মূর্ত্তি যেন শমিত হইল, সেই অস্ফুট চন্দ্রালোকে তাঁহারা দেখিলেন, অদূরে এলায়িত কুন্তল-রাশি-শোভিতা রমণীমূর্ত্তি, সেই বন উজ্জল করিয়া আছে। তাহার মধুময় গানে, এই নিস্তব্ধ রজনীর নিস্তব্ধতা, এই অরণ্যের ভীষণতা দূর করিতেছে। রমনী গাহিয়া গাহিয়া এই বনমধ্যে ভ্রমিতে লাগিল, নিস্তব্ধ নিস্পন্দ ভাবে যুবকেরা তাহাকে দেখিতে লাগি-লেন। সহসা যেন মোহ ভাঙ্গিল, সহসা তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রমণীকে কি জিজ্ঞাসা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা তাহার নিকটে আসিলেন। এই বনমধ্য হইতে এই নিশীথ সময়ে মনুষ্যকে সহসা বাহির হইতে দেখিয়া রমনী আশ্চর্য্য ভাবে গান বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে? তোমরাই কি তবে কিছু আগে বন্দুক ছুড়িতেছিলে?" সেই সময়, সেই অব-স্থায়, সেই স্বরে প্রমোদের হৃদয়তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল, তাঁহার কথা বন্ধ হইয়া গেল, প্রমোদ আর সে কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। প্রমোদের সঙ্গী যামিনীনাথ বলিলেন "হাঁ, আমরাই শীকার করিতে আসিয়া পথ হারা-ইয়াছি, তুমি বোধ হয় এইখানকার বাসেন্দা, তুমি বলিতে পার, কি করিয়া এখান হইতে নির্গত হইব?" রমণী বলিল "তো-মরা কোথায় যাইবে" যামিনীনাথ উত্তর করিলেন "নদীতীরে পৌঁছিলে আমরা বাড়ী যাইতে পারি।" রমণী এই কথায় "সঙ্গে এস" বলিয়া নিস্তব্ধে পথ দেখা-ইয়া চলিল। উহাঁরা তাহার অনুসরণ করি-লেন। শীঘ্রই রমণীর সহিত তাঁহারা তীরে আসিয়া পঁহুছিলেন। তীরে আসিয়া রমণী বলিল "তবে আমি যাই, পথ পাই-লেতো?" কিন্তু তাঁহারা দেখিলেন সে রাত্রে নদীতে একখানিও খেয়া নৌকা নাই, পার হইয়া যাইবার কিছুই উপায় দেখিলেন না। অনেক দূরে কানপুরের সেতু, সে পথ রমণী বলিয়া দিতে অক্ষম হইল, সুতরাং তাঁহারা সে পথ চিনিয়া সেতু পর্য্যন্ত এ সময় কি করিয়া যাইবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। রমণী তাঁহা-দিগকে চিন্তিত দেখিয়া বলিল "সেতু ছাড়া কি তোমরা বাড়ী যাইতে পারিবে না?" যামিনী বলিল "আমাদের অদৃষ্টে আজ কি হইয়াছে জানি না, এই অরণ্যে রাত্রি কাটান ভিন্ন দেখিতেছি আর কোন উপায় নাই। সেতু কোথায় জানি না, গঙ্গায় এক খানিও নৌকা নাই, সুতরাং এই খানে আজ বাস করা ভিন্ন আমাদের কি উপায় আছে।" রমণী তাহাদের অবস্থা বুঝিয়া তাহার হৃদয়ে করুণার উদয় হইল।

রমণী বলিল “যদি আমাদের কুটীরে তোমরা থাকিতে চাও তো আমি লইয়া যাইতে পারি।” যুবকেরা মহা আহ্লাদিতচিত্তে তাহাতে সম্মত হইলেন। যুবতী তখন কেন তাঁহারা এখানে আসিলেন, কি করিয়া পথ হারাইলেন, তাহাদের নাম কি, এই সকল জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পথ দেখাইয়া চলিল, যুবারা এক একটি করিয়া তাহার উত্তর, দিতে দিতে সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিজন-কুটীর।

অরণ্য-প্রান্তে একটি কুটীরে তাঁহারা রমণীর সহিত আসিয়া পঁহুছিলেন। কুটীর দীপশূন্য অন্ধকারময়। রমণী কুটীরদ্বারে যুবাদিগকে রাখিয়া গৃহে গিয়া একটি প্রদীপ জালিল। যুবকেরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সহসা দীপালোক বিভাসিত, প্রফুল্লকুসুম-কান্তি-সদৃশ প্রহাস্য রমণী মূর্ত্তি দেখিয়া, তাঁহারা অবাক হইয়া দাঁড়াইলেন, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্থিরদৃষ্টে সেই বন্য-কুটীর-বাসিনী বনদেবীর পানে চাহিয়া রহিলেন। রমণী চতুর্দশ বর্ষীয়া, আলুলায়িত নিবিড় কুন্তল-জাল মধ্যে শ্বেতপদ্মবৎ মুখখানি ঢল ঢল করিতেছে। বালিকা যথার্থই বনবালা, যুবতী-স্বভাব-সুলভ লজ্জা সে মুখে নাই, বিলাসভঙ্গি সে মুখে কিছুমাত্র নাই। ওষ্ঠাধর নির্দ্দোষ-বালিকার উপযুক্ত হাসিতে পূর্ণ। যুবকেরা সেই রমণীর বনদেবী মূর্ত্তি নিস্তব্ধে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে কাহার কি মনে হইতেছিল কে জানে, কিন্তু দেখিলে মনে হয় দুজনেই মুগ্ধ। কুটীরে আর কেহই ছিল না। বালিকা কুটীরের আর একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ হইতে কিছু খাদ্য সামগ্রী আনিয়া তাঁহাদিগকে আহার করিতে অনুরোধ করিল। তাঁহারা দুজনেই খাইতে বসিলেন, কিন্তু প্রমোদ প্রায় কিছুই খাইলেন না। যদিও কিছু পূর্ব্বে তিনি ক্ষুধা তৃষ্ণায় সমান অবসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু এখন তাহা তাঁহার ঘুচিয়া গিয়াছিল। ঘোর বিস্ময়ে পড়িয়া তাঁহার হৃদয় এত নানা ভাবে পূর্ণ হইয়াছিল যে তখন ক্ষুধা তৃষ্ণা সকলি বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

আহারান্তে বনবালা তাঁহাদের নিকট বসিয়া নিতান্ত সরল ভাবে কত কি গল্প করিতে লাগিল। তাঁহারা শুনিলেন, বালিকার পিতা নৈমিষারণ্যে মানৎরক্ষা করিতে গিয়াছেন, রাত্রেই আসিবার কথা আছে। বালিকা বলিল “পিতা যতক্ষণ না আসেন ততক্ষণ তাঁহার অপেক্ষায় আমি থাকিব। আপনাদের জন্য শয্যা প্রস্তুত, আপনারা শ্রান্ত হইয়াছেন ইচ্ছা করিলে এখনি শুইতে পারেন”। বলা বাহুল্য, নিদ্রার নাম গন্ধও এখন তাঁহাদের ছিল না, কিন্তু রমণীর কথায় অগত্যা তাঁহারা রমণী-প্রদর্শিত গৃহে গমন করিলেন।

যামিনীনাথ শীঘ্রই নিদ্রামগ্ন হইলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চিন্তা-তরঙ্গে প্রমোদের মন আন্দোলিত হইতে লাগিল।

তিনি ভাবিতে লাগিলেন "এ বিপিনে এ রমণী কে? অরণ্যে এ কুসুম কেমন করিয়া ফুটিল। পৃথিবীর দুর্লভ রত্ন এখানে কেন?" এইরূপ চিন্তাতে প্রায় সমস্ত নিশা অবসান হইল। রাত্রিশেষে ক্রমে তাঁহার শ্রমকাতর নয়ন নিমীলিত হইল. তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। যামিনীনাথ যে প্রত্যূষে কখন উঠিয়া গেলেন তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না।

এদিকে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, তথাপি নীরজার পিতা তীর্থ হইতে ফিরিলেন না। নীরজা কখনও শুইয়া, কখনো বসিয়া, কখনো উদ্যানে গাহিতে গাহিতে বেড়াইয়া রাত্রি কাটাইল। প্রত্যূষে মধুময় সঙ্গীতধ্বনিতে যামিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তখনো ঘোর ঘোর, পূর্ব্বগগনে শুকতারা হাসিতেছে, শীতল মৃদু মৃদু বায়ু বহিতেছে, সেই বায়ুর হিল্লোলে সঙ্গীতধ্বনি উথলিত হইয়া গঙ্গার বক্ষ পর্য্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিতেছে। যামিনী দেখিলেন কৃষ্ণ মেঘময় আকাশস্থিত একটি তারকার ন্যায় এই আঁধার উদ্যান উজ্জ্বল করিয়া রমণী গাহিয়া বেড়াইতেছে। তাহাকে দেখিয়া যামিনী নিকটে আসিলেন। বালিকা জিজ্ঞাসা করিল "পথিক,কেমন ঘুমাইলে?" যুবা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কিছুক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া বলিলেন "তাহা আর কি বলিব।" রমণী ভুবনমুগ্ধকর সরল হাসি হাসিয়া বলিল "তবে বুঝি এখানে ভাল ঘুম হয় নাই" সেই হাসিতে মুগ্ধ হইয়া যামিনীনাথ বলিলেন "কেমন করিয়া হইবে।" বালিকা বলিল "আমি আরো ভাবিয়াছিলাম—সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর সহজেই নিদ্রা আসিবে।" যুবা আর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "নিদ্রা! ঐ রূপরাশি দেখিবার পর কি করিয়া আর নিদ্রা আসিবে।" এই কথায় রমণী ঈষৎ গম্ভীর হইল, ওষ্ঠাধর হইতে হাসির রেখা উবিয়া গেল। রমণী বলিল "রূপ আবার কি?" যুবা এই কথায় যেন আশ্বাসিত হইলেন—কি যেন আশা করিতেছিলেন, সফল হইবার আশা হইল। তিনি বলিলেন "সুন্দরি, সব কি খুলিয়া বলিব—আমার হৃদয় আর আমার নাই—ঐ——রূপ—"এই কথায় বালিকার মুখকান্তি আরো গম্ভীর হইল—সে বলিল "ওরূপ কথা আর বলিও না। আমি এক দিন পিতার সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলাম—একটি ভদ্র যুবা আমাকে দেখিয়া পিতাকে বলিল, মহাশয়ের কন্যাটি অতি রূপবতী—শুনিয়া পিতা অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিলেন—তুমি ওসব কথা আর কহিও না। তোমার সঙ্গী এতক্ষণ উঠিয়া থাকিবেন। সকাল হইয়াছে, চল দেখিয়া আসি।" এই বলিয়া বালিকা গৃহাভিমুখে গমন করিল। যুবা স্তম্ভিত ভাবে সেই খানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গমনশীল বালিকার প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বালিকা গৃহে আসিয়া সুষুপ্ত প্রমোদের শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিল, প্রমোদের ওষ্ঠাধরে ঈষৎ মৃদু হাসির রেখা, ঈষৎ ভিন্ন পল্লবযুক্ত নয়নদ্বয় ঈষৎ আবেশময়। বালিকা দেখিল

প্রমোদ কোন সুখ-স্বপ্ন দেখিতেছেন। সত্যই প্রমোদ স্বপ্ন দেখিতেছিলেন—যেন আকাশ হইতে একটি তেজোময়ী রমণী নামিয়া তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইল—তিনি আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া তাহাকে ধরিতে হাত বাড়াইলেন, "রমণী বলিল এখন না" বলিয়াই যেন সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। অমনি যুবার নিদ্রাভঙ্গ হইল। প্রমোদ দেখিলেন সত্যই তাহার শিয়রে সেই দেবীমূর্ত্তি। প্রমোদ বিস্মিতের ন্যায় তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। এই সময় যামিনী গৃহে প্রবেশ করিলেন। যামিনীনাথ দেখিলেন বিস্মিত-নেত্র প্রমোদের প্রতি রমণীর স্থির কটাক্ষ সন্নিবেশিত, সে কটাক্ষ স্নেহময়, সে কটাক্ষ মধুময়, বহ্নিপথবিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় সে কটাক্ষ রমণী সহজে উঠাইতে অক্ষম। যামিনী সে কটাক্ষে যাহা দেখিলেন তাহাতে তাহার হৃদয়ে অনল জ্বলিল। প্রমোদ যামিনীকে দেখিয়া চমকিত ভাবে উঠিয়া বসিলেন। বালিকারও এতক্ষণে কথা ফুটিল, সে বলিল "বেলা হইয়াছে," তখন প্রমোদ শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলেন। বালিকাও বাহিরে আসিয়া বলিল "এখন প্রাতঃকাল, এখন পথ চিনিয়া তোমরা স্বচ্ছন্দে যাইতে পারিবে।" যামিনী কিছু উত্তর করিলেন না, প্রমোদ বলিলেন "হাঁ, আজ আমরা এখনি যাইব, তোমাকে কাল কত কষ্ট দিয়াছি তাহার ঠিক নাই। তুমি কাল আশ্রয় না দিলে আমাদের কোন উপায়ই ছিল না, চিরকাল এঋণ আমাদের স্মরণ থাকিবে।" রমণী এই কথায় ঈষৎ লজ্জিত ভাবে বলিল—"অতিথিসৎকারে কষ্ট কি; পিতার সেবায় যেমন আমোদ, অতিথিসৎকারেও তেমনি আমোদ"

প্র। "তোমার পিতা কি কাল আসেন নাই? "তিনি তোমাকে এই অরণ্য মধ্যে রাখিয়া কি প্রকারে দূরে থাকেন—তোমার একাকী থাকিতে ভয় হয় না?"

নী। না। কখনো কখনো তীর্থে দু এক দিনের জন্য গিয়াও পিতা বেশী দিন করিয়া আসেন।"

প্র। তা তোমার ভয় হয় না?

নী। কিসের ভয়? আর পিতা চার পাঁচ দিনের বেশী তো কোথাও থাকেন না। তা ছাড়াও এখানে আমার অনেক সঙ্গী আছে। দুই একটি গরীব দুঃখী কাটুরিয়ারা এই বনে প্রায় প্রত্যহই কাট কাটিতে আসে, তাহারা ক্ষুধাতৃষ্ণা ভাঙ্গিতে প্রায়ই এই কুটীরে আসে। তাহাদের কন্যাদের সহিত আমি অনেক গল্প করি। পিতা কোথাও যাইবার সময় তাহাদের কাহাকেও এখানে রাখিয়া যান, তাহারাই গ্রাম হইতে আমার খাদ্য কিম্বা যখন যা প্রয়োজন আনিয়া দেয়।

প্র। "কই, কাল তো তাহারা কেহই আসে নাই।"

নী। কাল বিকালে তাহাদের একটি পার্ব্বণ ছিল বলিয়া তাহারা কেহই আসে নাই, আজ আসিবে এখন—ঐ যে লক্ষ্মী এসেছে।"

তাঁহারা দেখিলেন দূরে এক ষোড়শবর্ষীয়া হৃষ্টপুষ্ট কৃষ্ণবর্ণ গ্রাম্য কন্যা

আসিতেছে। প্রমোদ সে দিক হইতে নীরজার পানে চক্ষু ফিরাইয়া আবার বলিলেন " একটি কথা জিজ্ঞাসা করি—আমরা কাল এখানে ছিলাম শুনিয়া তোমার পিতা কি বলিবেন ? "

নী। "তিনি কি বলিবেন ? নিরাশ্রয় পথহারা ব্যক্তিকে আশ্রয় দিলে তিনি কি বলিবেন ? এখানে কত সময় কত পথহারা বিপন্ন কাঠুরিয়াকে আশ্রয় দিয়াছি তিনিতো কথনো কিছু বলেন নাই।" বালিকার সরলতায় প্রমোদের ঈষৎ হাসি আসিল, তিনি একটু হাসিতে হাসিতে বলিলেন " তবে আমরা চলিলাম, তোমার উপকার কথনো ভুলিব না। যদি আমাদের মত নিরাশ্রয় পথিককে কথনো আশ্রয় দেও তো তথন এই পথিকদের কথা আর এক দিন মনে করিও " বালিকা কোন উত্তর করিল না স্থির নেত্রে প্রমোদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। যামিনীকে প্রমোদ বলিলেন "তবে চল যাওয়া যাক।" যামিনী নীরজার দিকে চাহিয়া বলিলেন " তবে আসি, " এই কথা বই আর যামিনী কিছুই বলিলেন না, রমণীও ইহার কোন উত্তর করিল না, সে যেন তথন কি ভাবনা-মগ্ন ছিল। প্রমোদ আর একবার প্রশান্ত নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া সেথান হইতে গমন করিলেন।

সাগর-সঙ্গমে।

(গাথা)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মহামায়া কথা-শুনিল বিজয়,
শুনিল বিজয় আনত মুখে
শুনিল বিজয় আটকি নিশ্বাস,
বামেতর হাত চাপিয়ে বুকে।

নিস্তব্ধ বিজয়, নির্বাক বিজয়,
বিজয় পাথর-মূরতি প্রায়,
না সরে বচন, না চলে চরণ,
নয়নে কেবল বিজলি ভায়!

ক্ষণপরে মাথা তুলিয়ে বিজয়,
মহামায়া-প্রতি চাহিয়ে কয়—
(সেই সে বিজলি ঝলকে ঝলকে
পলকে নয়নে উদয় হয়—)

—"দেবী মহামায়া, লইনু বিদায়—
লতেছি বিদায় হরষ-ভরে,
তোমার কুটীর, তোমার যামিনী,
রহিল তোমারি জনম-তরে!

বিজয়ের মুখ দেখিতে হবে না,
শুনিতে হবে না সে নাম আর,
চলিলাম এই গরবের তেজে,
বিষাদের কোন ধারি না ধার।"

বলিয়ে বিজয়—সতেজ হৃদয়,
ছাড়িল কুটির পলক-পরে,
দামিনীর পানে নাহি চাহি আর
চলিল নিজেরি গরব-ভরে।

চলিল আপন গরবেরি ভরে,
যেখানে বহিছে সাগর ঢেউ,
যেখানে কাঁদিল নয়ন-লহরী
দেখিতে কভু না পাইবে কেউ!

সেই খানে আসি অভাগা বিজয়,
সেই সে বিজন সাগর-কূলে,
ভাবিয়ে হৃদয়ে দামিনীর কথা,
কাঁদিতে লাগিল আপনা ভুলে!

কাঁদিতে লাগিল খুলিয়ে পরাণ,
কাঁদিতে লাগিল অযুত ধারে,—
"আমার দামিনী, সোনার দামিনী,
চলিনু কোথায় ফেলিয়ে তারে—

হৃদয়ের ধন, সরবস্ব ধন,
মৃত-সঞ্জীবনী স্নেহের লতা,
থাক্—সুখে থাক্—আমি ত বিজয়
চলিনু—চলিনু কে জানে কোথা!

এই যে সাগর—অগাধ—অপার,
সমুখে গড়ায় গরব-ভরে—
প্রবেশি কি তায় জুড়াব হৃদয়—
জুড়াব হৃদয় জনম-তরে?"—

কহিয়ে বিজয় ভাবিতে লাগিল,
উঠায়ে প্রলয় মরম-তলে,
কখনো অনল ছুটিছে নয়নে,
আবার অনল নিভিছে জলে।

কভু মোদে আঁখি, ঊর্দ্ধে কভু চায়,
কভু বা নয়ন পড়িছে ঢুলে,
উচ্চৈঃস্বরে শেষে গভীর বিজনে
কহিতে লাগিল আপনা-ভুলে—

"কেনই মরিব, কেনই ডুবিব
অপার—অগাধ সাগর-জলে,
জনমের সাধ, জীবনের সাধ
সুর(ই) কি ফুরালো এ মহীতলে?

"নাহি কি বাসনা—নাহি কিরে আশা,
হেরিতে সেই সে দামিনী-মুখ?
নাহি কি বাসনা, নাহি কিরে আশা
কখনো জুড়িবে এ ভাঙ্গা বুক?

অয়ি চন্দ্র তারা, অয়ি বিভাবরি!
অয়ি লীলাময় শীতল বায়!
অয়ি তরঙ্গিত অতল সাগর—
দেবি বসুন্ধরে—জননী-প্রায়—

সাক্ষী করি এই তোমাদেরে সবে
বামেতর হাত হৃদয়ে রাখি—
বলিতেছে শুন অভাগা বিজয়
অনলে উজ্জ্বল করিয়ে আঁখি—

সত্য যদি আমি দামিনী-বালারে
ভালবেসে থাকি বিমল মনে—
অবশ্য আবার এই ইহলোকে
মিলিব—মিশিব তাহারি সনে—

যে প্রেমের নাম আত্ম-বিসর্জ্জন,
দেবতাই তার প্রভাব জানে,
অবশ্য তাই রে আবার—আবার—
মিলিব—মিশিব দামিনী সনে!

তবে—তবে আমি কেনই ডুবিব,
কেনই ঝাঁপিব সাগর জলে?
ছেড়েছ কুটীর—ছাড়িনে ত আশা—
লুটাবো দামিনী চরণ-তলে!"

বলিয়ে বিজয়, সতেজ হৃদয়—
রগড়ি ফেলিল নয়ন-নীর,
"দেবী মহামায়া করুণ লাঞ্ছনা,
মরমে মরম রহিল স্থির।"

সাগর বেলায় আলু থালু হোয়ে,
চলিল বিজয় পাগল পারা,
হৃদয়ে বহিছে রুধিরের ধার,
নয়নে বহিছে সলিল ধারা—

পলকে চকিতে নেহারে বিজয়
দাঁড়ায়ে রোহিণী সমুখে তার,
মথুরা-বাসিনী সেই সে রোহিণী—
চিনিতে বাকী না রহিল আর!

কথা না কহিয়ে আনত হইয়ে
বিজয় মুছিল নয়ন ধীরে,
হৃদয়ের কথা, মরমের ব্যথা
যেন না রোহিণী জানিতে পারে।

কিন্তু সে রোহিণী, ডাকিনী রূপিণী,
ভ্রমিবার নয় ভুলের ঘোরে,
সহসা যেন সে বিজয়ে হেরিল,
কহিতে লাগিল ছলনা কোরে,

"বিজয় কুমার, বিজয় কুমার,
মথুরা-নিবাসী বিজয় মম,
কেন কেন হায় সাগর বেলায়
ভ্রমিছে এমন পাগল সম?

তোমার সে রূপ কোথায় লুকালো,
আলু থালু কেন চিকুর কেশ,
কেন ছল ছল নয়ন যুগল,
কেন বাছা এই সুদীন বেশ?

নেহারি তোমায় বুক ফেটে যায়,
এ কি এ দশা বিজয় ওরে!
আয় বুকে রাখি, প্রাণ ভোরে দেখি,
বেড়াস্ নে আর যাতনা ঘোরে।"

বলিয়া রোহিণী, ডাকিনী রূপিণী,
আঁচলে মুছিল নয়ন-ধার,
হৃদয়ে বহিছে গরল লহরী,
রসনে ক্ষরিছে পীযূষ সার।

সহসা যেন রে তাড়িত-প্রভাবে,
সরিয়ে বিজয় দাঁড়ালো পিছে,
কহিল কাতরে "জননী রোহিণী,
আমারে যতন করিছ মিছে।

আমি যে আমি সে—এমনি রহিব,
যতন কেবল যাতনাময়,
মরম-বিজনে গভীর গোপনে
থাকিতেই মম বাসনা হয়।

যাও তবে দেবী, যেথা তব কায,
অভাগার কথা ভেবো না মনে,
যা হই তা হই যেথানেই রই—
নিজের এ মন নিজেরি সনে।"

"সে কি কভু হয়" কহিল রোহিণী,
"আয় বাছা আয় আমার কাছে,
আমি যে তোমার জননী সমান,
কহ রে কি জ্বালা হৃদয়ে আছে।

মথুরা ছাড়িয়ে হেথায় আসিয়ে
কাহার কুটীরে করিলে বাস?
কোথায় চোলেছ—কিসেরি কারণে
ফেলিছ অমন গভীর শ্বাস?"

এদিক ওদিক নেহারি বিজয়,
কহিল বিজয় খনেক পরে—
"দেবী মহামায়া, দেবতা সমান,
আছিলাম আমি তাঁহারি ঘরে।

কি জানি কি ভাবি মহামায়া-দেবী
কুটীরে থাকিতে দিল না আর,
দামিনী—দামিনী—উঃ—সে দামিনী—
দেখিতে পাব না শ্রীমুখ তার!

দেখিতে পাব না শ্রীমুখ তাহার,
শুনিতে পাব না মধুর স্বর,
রোহিণী—রোহিণী—থাকুক ও কথা,
চলিলাম এই তাপস-ঘর।"

ইনিয়ে বিনিয়ে কহিল রোহিণী,
আঁচলে মুছায়ে বিজয় আঁখি,
"পাগল বিজয়! এখনো যে তোর,
জ্ঞানের উদয় হোল না দেখি—

মহামায়া তোরে করেছে বারণ
প্রবেশিতে তাঁর কুটীর দ্বার?
যাক্ সে দাসিনী, যাক্ মহামায়া,
তাদের কি তুই ধারিস ধার?

দেবী মহামায়া কপটের শেষ,
ভড়ঙ্গে কেবল ভুলাতে পারে,
চপল দামিনী চপলা-হৃদয়া,
কিসের কি দুঃখ তাহারি তরে?

এস এস বাছা আমার কুটীরে,
ওদের সহিত কি তব কাজ,
প্রতাপের শোকে ভাঙ্গা এ হৃদয়,
তোরে হেরে আরো ভাঙ্গিল আজ—

ওই মহামায়া, ভাল জানি তাঁয়,
রীত দেখে পতি দিল না স্থান,
দামিনীর পিতা কেবা—কে তা জানে?
নাবালক তুমি কি দিব জ্ঞান?"

"নাবালক আমি—কিবা জ্ঞান দিবে?
রোহিণী—রোহিণী—থাক্ সে জ্ঞান,
আমার দামিনী আমারি দামিনী,
দোষেও আমার হৃদয়-প্রাণ!

চাহিনা জানিতে কিবা তার দোষ,
চাহিনা জানিতে হৃদয় তার,
ভালবাসি তারে—এই আমি জানি,
চাহিনা জানিতে কিছুই আর ! ”

“ ভাল, ভাল, ভাল, তাই যেন হ'ল ”
কহিছে রোহিণী মনের রীশে,
“ মহামায়া তোরে তাড়ায়ে যে দিল,
এত অপমান সহিবি কিসে ?

বাসুদেব-সুত মথুরা-নিবাসী,
বিজয় কুমার তুই ত সেই !
এখন কি তোর ও ছার হৃদয়ে
একটু গরব-আভাস নেই ?

আবার আবার দামিনীর নাম,
সহজে আসিছে রসনে তোর,
এতেক লাঞ্ছনা খেয়ে কি এখনো
ভাঙ্গিল না তোর ঘুমের ঘোর ?”

শুনিয়ে বিজয় চমকে অমনি,
পলকে নয়নে অনল ভায়,
আবার—আবার—তখনি আবার
নয়নে সলিল-প্রবাহ ধায়।

ঊর্দ্ধ দিকে করি নয়ন যুগল,
চাপিয়ে দুহাত উরস পরে,
কহিতে লাগিল বিজয় কুমার
গভীর মরম-বিদার স্বরে—

“ এই যে হৃদয় দেখিছ, রোহিণী,
কপালের দোষে মমতাময়,
মর্ম্মায় রুধিরে, প্রতি শিরে শিরে,
মমতা-অনল-লহরী বয়।

চেপে চেপে রাখি, আবরণে ঢাকি,
নিভাতে কতই যতন করি,
হৃদি-বিসর্জ্জন করিতেও পণ——
আপনি যখন আপন অরি।

জানি না কি আমি—বুঝি না কি আমি—
মহামায়া তেড়ে দিয়েছে মোরে,
তবুও—তবুও—ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
যেতে সাধ সেই অনল-ঘোরে।

উঠিয়ে পড়িয়ে—যাতনা সহিয়ে,
প্রতিজ্ঞা ক'রেছি কতই বার,
যাক্ মহামায়া দামিনী লইয়ে,
সে কুটীর পানে চাব না আর।

সে কুটীর পানে চাহিব না আর,
জ্বলিয়ে পুড়িয়ে হোক্ তা খাক্,
বিজয়ের তাতে কিবা এল গেল,
তাদের কুটীর তাদেরি থাক্—

কই রে তা পারি, নয়নের বারি
আপনি উথলি অমনি ধায়,
আমার দামিনী—সোনার দামিনী—
কেমনে না হেরি থাকিব তায় ?

কি ছার পৃথিবী, কি ছার জনম,
কি ছার হৃদয়, কি ছার প্রাণ,
দামিনীরে যদি দেখিতে না পেনু,
কি ছার নয়ন, কি ছার জ্ঞান !

কিন্তু—কিন্তু বলি, শুন গো রোহিণী,
সাক্ষী রাখি সব দেবতাগণে—
স্বার্থ-শূন্য যদি এ প্রণয় হয়,
আবার মিশিব দামিনী সনে।"

বলিয়ে বিজয় বিজলির প্রায়,
চলিয়ে গেল সে তাপস ঘরে,
অবাক্ রোহিণী মহামায়া কাছে,
গুড়ি গুড়ি গুড়ি আসিল পরে।

আসিয়ে দেখে যে দামিনী-রূপসী,
রূপসী আর ত নহে সে আর,
মলিন হোয়েছে নলিন বয়ান,
শীতের প্রভাত-শশীর প্রায়।

এলায়ে পোড়েছে বসন ভূষণ,
এলায়ে পোড়েছে কবরী রাশ,
নয়নে নাহিক নয়নের জ্যোতি,
শুখায়ে গিয়েছে অধর-হাস!

মহামায়া-কোলে কুসুম-বাগানে,
এলায়ে পোড়েছে কুসুম-বালা,
শরীর জ্বলিছে দাবানল তেজে,
মরমে জ্বলিছে মরম-জ্বালা।

নীরস বদন, নীরস রসন,
শূন্যে শূন্য-দৃষ্টি নয়ন দুটি,
যেখানের হাত পড়িয়ে সেখানে,
গড়ায় কুন্তল ভুমিতে লুটি।

নাহি যেন সাড়া, নাহি যেন প্রাণ,
নদীর ছায়ার প্রতিমা পারা,
বহিছে কেবল ঘন ঘন শ্বাস,
ঝরিছে কেবল নয়নে ধারা।

যাইয়ে রোহিণী হইল উদয়,
কহে মহামায়া কাতর-স্বরে—
"এসছ রোহিণী—বোস গো রোহিণী,
দেখ গো দামিনী কেমন করে!

নাহি কিছু খায়, শুতে নাহি যায়,
আপন ভাবেতে আপনি ভোর,
আপনিই ভাবে, আপনিই কাঁদে,
আপনি বেড়ায় বিজনে ঘোর!

আমারো সে নয়, নিজেরো সে নয়,
জানি না দামিনী কাহার তরে,
শুধাইলে তারে কহে না সে কথা,
আপনি মগন আপন ভাবে।"

শুনিয়ে রোহিণী কাঁপিতে কাঁপিতে,
রোষেতে জ্বলিয়ে কহিতে লাগে,
"শুন মহামায়া, না জানি বিজয়
কি ওষুধ কোরে গিয়েছে ভেগে।

কুটিল কপট বিজয় পিশাচ,
ধরিয়ে তাহারে আন'ত হেথা—
মড় মড় করি ছোলার মতন,
চিবায়ে খাইব তাহার মাথা।"

চমকি উঠিল দামিনী রূপসী,
চমকি উঠিল হৃদয় তার,
এ দিকে ও দিকে হেলায়ে নয়ন
চমকে নেহারে সকল ধার।

যে আগুন চোখে জ্বেলে উঠে ছিল,
আবার—আবার নিভিয়ে গেল,
যেখানের হাত প'ড়িল সেখানে,
নয়নের পাতা মুদিয়ে এল।

দেখিয়ে রোহিণী, কহিল অমনি,
"এস গো দামিনী আমার সাথে,
দেখিবে কতই ফুটিয়াছে ফুল,
কেমন জোছানা আজিকে রেতে।

জোছানা মাখিয়ে সাগরের ঢেউ
অদূরে নাচিয়ে বহিয়ে যায়,
বাগানে কুসুম, তারকা কুসুম
ফুটেছে সাগরে দেখিবি আয়।"

শুনিয়ে দামিনী কহে ধীর বাণি,
ঈষৎ ঈষৎ মেলিয়ে আঁখি,
"নড়িতে আমার নাহি যে শকতি,
শোভার সুষমা দেখিব বা কি!

উঠেছে চাঁদিমা—উঠুক চাঁদিমা,
বহিছে পবন—বহুক বায়,
ফুটেছে কুসুম—ফুটুক কুসুম,
হৃদয় তবুও অসাড় প্রায়!

ফাটিছে মরম—ফাটুক মরম,
নিভিছে পরাণ—নিভুক প্রাণ,
যেতেছি ভাসিয়ে—যাই না ভাসিয়ে,
ফিরাবো না তবু স্রোতের টান।

আমার—আমার—কি আছে আমার,
আছে শুধু এই শরীর খান,
যেতেছে ভাঙ্গিয়ে—যাক্ না ভাঙ্গিয়ে,
কিসের যতন—কিসেরি টান।"

মরি ক্ষতি নাই—মরণই ভাল,
কিন্তু—হা হৃদয়!—মরিলে পরে,
আর যে দেখিতে পাব না—পাব না—
সেই সে আমার———— ————"

কহিতে কহিতে দামিনীর আঁখি
আপনি যেন রে মুদিয়ে এল,
রসনা যেন রে হইল অবশ,
চেতনা যেন রে নিভিয়ে গেল।

ধরাধরি করি দামিনী বালারে,
নে গেল তাহারা কুটীর-ঘরে,
ঝর ঝর কাঁদে মহামায়া দেবী,
ধরিয়ে বালারে হৃদয় পরে।

ক্রমশঃ গভীর হইল যামিনী,
তবুও দামিনী চেতনা-হারা,
সঘনে কেবল বহে ঘন শ্বাস,
হৃদয়ে রুধির তুফান পারা।

দেখিয়ে রোহিণী ভাবে মনে মনে
"দামিনীর দশা একি রে আজ,
দেবতা জানেন ভাল ভেবে আমি
করিয়ে থাকিত সকল কাজ।

কি হবে এখানে দাঁড়াইয়ে আর,
রজনী গভীর হইয়ে এল—"
বলিয়ে রোহিণী ভাবিতে ভাবিতে
পাশের সে ঘরে শয়নে গেল।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

বীরেন্দ্র চরিতম্। শ্রীমাতঙ্গীচরণ গোস্বামী কর্ত্তৃক প্রণীত। জ্ঞান রত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত।

ইহা একখানি সংস্কৃত মহাকাব্য। এই গ্রন্থ হস্তগত হইবামাত্র আমাদের অত্যন্ত হর্ষ উপস্থিত হইল। হর্ষের কারণ এই যে, বহুদিন হইতে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়নে লোকের আর উৎসাহ ও অনুরাগ স্ফুর্ত্ত হয় না, এক্ষণে আবার দুই একটী গ্রন্থকার হিন্দু-সমাজের সৌভাগ্যক্রমে উদিত হইতেছেন। এই জন্য এই গ্রন্থখানি সাদরে পাঠ করিলাম। কবিত্ব পূর্ব্বাচার্য্যদিগের সহিত স্বর্গারূঢ় হইয়াছে, এক্ষণে যিনি ভাষার চাতুর্য্য দেখাইতে পারিবেন তিনিই সুলেখক। গোস্বামীমহাশয়ের সংস্কৃত রচনা প্রশংসনীয়, কিন্তু "বিভাবরীকাল ইবেন্দুনা খলু—"এই বাক্যটীর ন্যায় কোন কোন স্থলে রচনায় সংস্কৃতরীতির ব্যতিক্রম হইয়াছে। সুতরাং ইহা বাঙ্গলাগন্ধী পদ্য।

হেলেনা কাব্য—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। (সটীক) শ্রীআনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত। প্রথম খণ্ড, ময়মনসিংহ—ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা। দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা—রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

এই হেলেনা কাব্য দুখানি মহাকাব্য। কিন্তু আমাদের মতে এবং পূর্ব্বাপর প্রথা অনুসারে যে বিষয়ের সঙ্গে দেশীয় পুরাণ-ইতিহাসের, দেশীয় আচার ব্যবহারের, দেশীয় ভাবপ্রকৃতির কোন প্রকার নিকট বা দূর সম্পর্ক নাই, সে বিষয় মহাকাব্যের প্রসঙ্গ হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ হেলেনার মত স্ত্রীলোক—যিনি বিবাহের পূর্ব্বে দশমবর্ষ বয়স হইতে ট্রয়ের ভস্মাবশেষ কালে ষষ্টি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন আলিঙ্গনে ক্রমাগত আপনাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে মহাকাব্যের নায়িকা করা নিতান্ত অবিধেয়। মহাকাব্যের নায়ক কিম্বা নায়িকা বিশেষ বিশেষ গুণের আদর্শ-স্থল হওয়া উচিত। বিশেষতঃ যে খানে গ্রন্থকার বলিতেছেন—

" প্রমোদ উদ্যান মাঝে পুষ্পগৃহ-তলে,
দাঁড়ায়ে মলিন বেশে হেলেনা সুন্দরী—
জগতের রূপরাশি,—হায় রে যেমতি
বিন্ধ্যাচলে মহামায়া, পঞ্চবটী বনে
জনম-দুঃখিনী সীতা ; " ইত্যাদি—

সেখানে আমরা গ্রন্থকারকে কোন মতেই সাধুবাদ দিতে পারি না। প্রমোদ-উদ্যানে মলিনবেশা হেলেনার সঙ্গে " বিন্ধ্যাচলে মহামায়া " অথবা " পঞ্চবটী বনে সীতার " ভাবগত, প্রকৃতিগত, কল্পনাগত এমন কোন সৌসাদৃশ্যই নাই যাহার অনুরোধে মহান ভাবের প্রতিমাস্বরূপ " মহামায়া " অথবা ধৈর্য্য এবং সতীত্বের প্রতিমাস্বরূপ সীতার সঙ্গে আমোদপ্রিয় চপলহৃদয়া হেলেনার কোন বিষয়ে তুলনা

করিয়া তাঁহাদিগের অবনতি সাধন করা সুরুচির কায মনে হইতে পারে। যাহা হউক, গ্রন্থকার যে একজন সুমিষ্ট কবিতা-লেখক এবং বাঙ্গালা ভাষার উপর যে তাঁহার দিব্য অধিকার আছে তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি।

ভারতভৈষজ্যতত্ত্ব। প্রথম খণ্ড। শ্রীঅম্বিকাচরণরক্ষিত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা,চিকিৎসাতত্ত্ব যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৸০।

এই পুস্তকখানি আমরা বিশেষ সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলাম। দেশীয় গাছগাছড়া হইতে যে কত রোগের কত প্রকার ঔষধি পাওয়া যায় এবং তাহা কি রূপে, কি মাত্রায়, কি প্রকারে প্রস্তুত করিয়া সেবন করিতে হয় তাহা প্রদর্শন করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ধনী লোকেরা ১৬ টাকা দর্শনী, ব্রুহম গাড়ির ঘর্ঘর শব্দ, সোনার চেনের চাকচিক্য ও বিলেতী হাঁস্‌পাতালের চিকিৎসা-প্রথার মোহে যে রূপ সহসা মুগ্ধ হইয়া পড়েন, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে এ পুস্তক খানি ভাল না লাগিলেও লাগিতে পারে। কিন্তু যদি কেহ কখন দেখিয়া থাকেন পল্লিগ্রামের দীন-দুঃখীরা কি রূপ আগ্রহ সহকারে স্ত্রীর রূপার বালাবাজু অথবা খাবার পাথরবাটী পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়া গ্রাম্য বিলেতী ঔষধালয় হইতে কলিকাতার উচ্ছিষ্ট ঔষধ কিনিতে যায়, তাঁহারা এই পুস্তক পাঠে অতি দুঃখের সহিত অবগত হইতে পারিবেন যে সেই দীন দুঃখীদের কুটীরের চারিধারেই হয় ত কত প্রকার সুলভ, সহজ এবং চমৎকার ঔষধ সকল রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে।

বীর-কলঙ্ক নাটক। প্রথম খণ্ড। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র প্রণীত। কলিকাতা, বিডন যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ৸০ আনা। মহাভারতের অভিমন্যু-বধ-প্রসঙ্গটি অবলম্বন করিয়া এই বিয়োগান্ত নাটক খানি রচিত হইয়াছে। ইহার এক স্থান উদ্ধৃত করিলেই ইহার সমস্ত পরিচয় দেওয়া হইবে। সপ্তরথী-বেষ্টিত অভিমন্যু যখন তুমুল সংগ্রাম করিয়া হতবল হইয়া পড়িয়াছেন, তখন অভিমন্যুকে লক্ষ্য করিয়া দ্রোণ বলিতেছেন—

"দ্রোণ। তোমার সকল অস্ত্রই গেছে—অবশিষ্ট ঐ অসি। যদি প্রাণের ভয় থাকে ত অবিলম্বে উহা ত্যাগ কর।

অভিমন্যু। প্রাণের ভয় কার আছে তা সকলেই দেখতে পাচ্চে। আর বীরত্ব প্রকাশ কোরতে হবে না, যথেষ্ট হোয়েছে।

* * * * *

দুঃশাসন। এখন মোরতে প্রস্তুত হ।

অভিমন্যু। তথাস্তু! তা তোমাকে কষ্ট পেয়ে বোলতে হবে না। তা আমি অনেক ক্ষণ বুঝতে পেরেছি।"

মুকুট উদ্ধার। মহাকাব্য। শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় বিরচিত। কলিকাতা, সোমপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১ টাকা।

এই পুস্তক খানি একখানি রূপক মহাকাব্য। রামায়ণের সীতাহরণ, যুদ্ধ ও সীতার উদ্ধার ভাঙ্গচুর করিয়া যবন কর্ত্তৃক ভারত উৎপীড়নই এই মহাকাব্যে বর্ণিত। গ্রন্থকারের কল্পনা-প্রাচুর্য্য, রচনা প্রণালী, এবং ভাষার সৌন্দর্য্যে আমরা নিতান্ত প্রীত হইয়াছি।

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

ইতিপূর্ব্বে উন্নতির একটি সোপান নিরূপিত হইয়াছে মাত্র, এক্ষণে সেই সোপান আরোহণ করিবার প্রণালী প্রদর্শিত হইতেছে। কি সে প্রণালী তাহা যদি অতি সংক্ষেপে—এক কথায়—বলিতে হয়, তবে "সঙ্গ" এই কথাটি বলিলেই সমস্ত বলা হয়। এক জনের যাহা আছে, আর এক জনের তাহা নাই, আবার শেষোক্ত ব্যক্তির যাহা আছে পূর্ব্বোক্তের তাহা নাই—এরূপ স্থলে যদি উভয়ের পরস্পর সঙ্গ লাভ ঘটে, তবে উভয়েরই অভাব পূরণ হইয়া উভয়ই উন্নতি-সোপানে আরোহণ করিবে ইহা দেখাই যাইতেছে। প্রতি মনুষ্য যদি আপনাতে আপনি পর্য্যাপ্ত হইত, তাহা হইলে তাহার উন্নতি অন্যের সংসর্গের অপেক্ষা রাখিত না, তাহার উন্নতিরই, অপেক্ষা থাকিত না, এবং যাহা নিতান্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত—মনুষ্য পূর্ণতার পদবীতে আরূঢ় হইত।

কোন মনুষ্য যদি অল্প বয়সে কোন জনশূন্য অরণ্যময় উপদ্বীপে পরিত্যক্ত হয়, তবে তাহার নিকট কতটুকু উন্নতির প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? মনুষ্য যে এমন উন্নত জীব সে-ও ব্যাঘ্রের সংসর্গে ব্যাঘ্রীভূত হইয়াছে—এমনও মধ্যে মধ্যে শুনা গিয়া থাকে। অতএব মনুষ্যের উন্নতির প্রধান কারণ—সঙ্গ।

মনুষ্যের প্রথম সঙ্গ বিষয়ের সহিত। তদ্দ্বারা মনুষ্য কিরূপ উন্নতি লাভ করে, দেখা যাউক্। প্রথমতঃ মনুষ্য অন্যান্য জীব জন্তুদিগের ন্যায় বিষয়-দ্বারা চালিত হয়, পরে বিষয়ের অধীনতা অতিক্রম করিয়া স্বাধীন ভাব ধারণ করে। বিষয় যদি প্রথমে মনুষ্যকে বন্ধন না করে তবে পরে সে-বন্ধন ছেদন করিয়া মনুষ্য যে প্রকৃত পক্ষে মনুষ্য হইবে তাহার সম্ভাবনা থাকে না। বিষয়ের উপর প্রভুত্ব করিয়াই মনুষ্য আপন মনুষ্যত্বের পরিচয় দিতে পারে। বিষয়ের প্রতিকূলেই মনুষ্যের আত্মসত্তা পরিস্ফুট হয়। আত্মার একটা প্রতিপক্ষ চাই—বিষয়ই সেই প্রতিপক্ষ। বিষয়ের নিকট হইতে ভাব গ্রহণ করিয়া যে, আত্মা উন্নতি-লাভ করে তাহা নহে, পরন্তু বিষয়ের প্রতিকূলে আপনার ভাব আপনি উদ্দীপন করিয়াই আত্মা উন্নতি লাভ করে। বিষয়ের যে কি প্রয়োজন এখন তাহা বুঝা যাইতেছে;—বন্ধন অগ্রে, মুক্তি তাহার পরে। বিষয় আত্মার বন্ধন-কর্ত্তা, মোচনকর্ত্তা নহে; আত্মার মোচনকর্ত্তা আত্মা স্বয়ং আপনি। শুক্তির মধ্যে যেমন মুক্তা আছে, সেইরূপ বিষয়-বন্ধনের মধ্যে মনুষ্যের একটি মুক্তভাব আছে, সেই মুক্তভাবই আত্মার প্রাণ, জ্ঞানের প্রাণ। আত্মার সেই মুক্তভাব পরি-

স্ফুট হইবার জন্য একটা প্রতিপক্ষের সহিত সঙ্গ করা তাহার পক্ষে আবশ্যক, বিষয় সেই প্রতিপক্ষ।

বিষয়ের প্রভুত্ব অতিক্রম করিবার প্রথম পদ্ধতি—স্বার্থ-জ্ঞান। স্বার্থ-জ্ঞান কিনা আপনার প্রয়োজন জ্ঞান। বিষয়ের সহিত সঙ্গ করিবার প্রয়োজন কি? না তাহার বিরুদ্ধে চলিয়া আত্মা আপনার বল-পরীক্ষা ও বলসাধন করিবে। আত্মা যে একেবারেই বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ হইবে না, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণের অর্থ তাহা নহে। প্রথমে ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি নানা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া প্রকৃতি তাহাকে চালাইয়া লইয়া বেড়াইবে, তাহার পর মনুষ্য সে বন্ধন ছেদন করিয়া—প্রকৃতির চালনায় নহে কিন্তু স্বার্থবোধে—আপনার প্রয়োজন-বোধে—বিষয়-সামগ্রী ব্যবহার করিবে, এই জন্যই পৃথিবীতে তাহার জন্ম। সে প্রয়োজন কি তাহা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—বিষয়ের প্রতিপক্ষে আত্মার বল সমর্থন করা; বিষয়কে আয়ত্ত করা, বিষয়-কর্তৃক আয়ত্তীকৃত না হওয়া।

মনুষ্য জন্মিবামাত্রই তাহার স্বার্থবোধ হয় না; তখন তাহার "আমি" বোধই নাই, আমার-প্রয়োজন-বোধ কোন্‌খানে থাকিবে? তাহার পরে মনুষ্যের যখন "আমি"-বোধ উৎপন্ন হয় কোথা হইতে হয়? বিষয়-হইতে কি? বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-ব্যাপার উৎপন্ন হয় এ কথা ঠিক,—কিন্তু আমি-বোধ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের প্রতিকূল বোধ—প্রত্যক্ বোধ—তাহা কেমন করিয়া বিষয় হইতে উৎপত্তি লাভ করিবে? একই সময়ে একই কারণ হইতে দুই বিরোধী ব্যাপার কেমন করিয়া উৎপন্ন হইবে? একই সময়ে একই বস্তু হইতে আলোক এবং অন্ধকার উভয়েরই উৎপত্তি হইতেছে—একই আঘাত-প্রয়োগ হইতে একই সময়ে দুই বিপরীত-মুখীন গতি উৎপন্ন হইতেছে—ইহা কেহ দেখিয়াছে না শুনিয়াছে না কখনো সম্ভবে! বিষয়-হইতে যখন ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ উৎপন্ন হয়, তখন সেই একই সময়ে তাহা হইতে তাহার বিরোধী ব্যাপার উৎপন্ন হইবে—আত্ম-বোধ উৎপন্ন হইবে—ইহা কিরূপ কথা! এখন—আত্মবোধ যে বাস্তবিকই ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের বিরোধী পক্ষ তাহার প্রমাণ কি—এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার। যদি এমন হইত যে, ইন্দ্রিয়-ব্যাপার যতই উত্তেজিত হয় আত্মবোধ ততই উদ্দীপ্ত হয়, এবং ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের যতই উপশম হয়, আত্মবোধ ততই নরম পড়িয়া আইসে; তবে অবশ্য বলিতে পারিতে যে, আত্মবোধ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারেরই দলে; কিন্তু বাস্তবিক কি ঐরূপ হয়? ইন্দ্রিয়-ব্যাপার অত্যন্ত উত্তেজিত হইলে আত্মবোধ কমে না বাড়ে? এবং আত্মবোধের অত্যন্ত স্ফূর্তি হইলে ইন্দ্রিয়-ব্যাপার উত্তেজিত হয়, না দমনে থাকে? কোন্‌টা সত্য? এক পক্ষ প্রবল হইলে অপর পক্ষ দুর্ব্বল হয়, পরীক্ষাতে ত এইরূপই দেখা গিয়া থাকে—ইহার অন্যথা কে কবে পরীক্ষা করিয়াছে? অতএব ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের বিরোধী বোধই—প্রত্যক্ বোধই—আত্মবোধ, ইহাতে আর

ভুল নাই। তাহা যদি হইল তবে ইন্দ্রিয়-ব্যাপার যেমন বিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, আত্মবোধ—সেরূপ—বিষয়-হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইতেছে।

আত্মবোধ জন্মিয়া-অবধিই মুক্তির পক্ষপাতী। জ্ঞানের প্রথম সোপান যে, বিষয়-প্রত্যক্ষ, ইহাও আত্মার মুক্তিসাপেক্ষ—ইন্দ্রিয়-ব্যাপার হইতে কতক অংশে মুক্তিলাভ করিলে-পরেই আত্মা বিষয়কে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। দর্শন-ব্যাপার শ্রবণ-ব্যাপার প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সকল মনুষ্যের শৈশবাবস্থাতে যেমন, তাহার বয়স হইলেও তেমনি, আমিশ্র ভাবে চলিবারই কথা—পশ্বাদির তাহাই হইয়া থাকে—কিন্তু মনুষ্যের অল্প একটু বয়ঃপ্রাপ্তি হইলেই ইন্দ্রিয়-ব্যাপারকে দমন করত আমি-বোধ জন্ম গ্রহণ করে, এবং সেই "আমি"-বোধের দ্বারা ইন্দ্রিয়-ব্যাপার রূপান্তরিত হয়। আমি-বোধ অগ্রে হইলে তবেই বিষয় সকলকে আপনা হইতে ভিন্ন করিয়া প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। মনুষ্য যত দিন ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের সহিত জড়াইয়া থাকে—তত দিন তাহার আমি-বোধ থাকে না—তত দিন মনুষ্য কোনও বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। মনুষ্য যবে ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের প্রতিকূলে আপনাকে দাঁড় করায়, তখনই তাহার আত্মবোধ এবং বিষয়-বোধ উভয়ই সম্ভূত হয়; ইন্দ্রিয়-ব্যাপার বিষয়ের দলে, আর প্রত্যক্ বোধ আত্মার দলে পতিত হয়, এইরূপে দুই প্রতিপক্ষ উদ্ভূত হয়। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বিষয়-বন্ধন হইতে কতক অংশে মুক্ত না হইলে, বিষয়কে প্রত্যক্ষ করা এমন যে সামান্য জ্ঞান, তাহাও সম্ভবে না। এস্থলে এইটি মনে রাখা কর্ত্তব্য যে বিষয়ের সহিত আত্মার যোগবশতঃ নহে পরন্তু বিয়োগ-বশতই বিষয়-প্রত্যক্ষ সম্ভবে। ইন্দ্রিয়-ব্যাপার বটে বিষয়-যোগে ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহার প্রতি-যোগেই আত্মজ্ঞান এবং বিষয়-প্রত্যক্ষ উভয়ই নিষ্পন্ন হয়।

যদি ইন্দ্রিয়-ব্যাপার আত্মজ্ঞানের বিরোধী তবে তাহাতে কাজ কি? তাহাকে সমূলে নির্মূল কর না কেন—তাহা হইলে আত্মজ্ঞান খুব পরিস্ফুট হইবে! ইহার উত্তর এই যে আত্মজ্ঞানের কোন যদি বিরোধী পক্ষ না থাকে তবে সে কাহার প্রতিকূলে আত্ম-সমর্থন করিবে? ইন্দ্রিয়-ব্যাপার সেই বিরোধী-পক্ষ। ইন্দ্রিয়-ব্যাপারই যদি না থাকিল তবে তাহার বিরোধী পক্ষ কিরূপে থাকিবে—আত্মজ্ঞান কিরূপে থাকিবে? ইন্দ্রিয়-ব্যাপার আদবেই না থাকিলে আত্মজ্ঞান সম্ভবে না ইহার অর্থ আর কিছু নয়—যোদ্ধব্য না থাকিলে যোদ্ধা সম্ভবে না—এই মাত্র। এক পক্ষ না থাকিলে অপর পক্ষ থাকিতে পারে না বলিয়া তাহাদের মধ্যে যে, উৎপাদ্য উৎপাদক সম্বন্ধ, তাহা নহে; আপনার চির-বিরোধী বস্তুকে কেহ কখন উৎপাদন করিতে পারে? এ বিষয় ইতিপূর্ব্বে যথেষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছি—আবার এখানে তাহা চর্ব্বিত চর্ব্বণের প্রয়োজন করে না। তবে এইটুকু আভাস দিয়া রাখিতে চাই যে, জীবাত্মার যদি ইন্দ্রিয়-

ব্যাপারাদি কোন প্রতিবন্ধক না থাকিত তবে তাহা অপূর্ণ হইত না। পূর্ণ হওয়া এবং একেবারেই না হওয়া সৃষ্ট-বস্তুর পক্ষে উভয়ই সমান। পূর্ণ যিনি তিনি চিরকালই পূর্ণ আছেন এবং পূর্ণ থাকিবেন—সৃষ্ট বস্তু অপূর্ণ না হইলে হইতেই পারে না—সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বই অপূর্ণতা-নিবন্ধন—এবং তাহা অপূর্ণ বলিয়াই তাহার উন্নতির প্রয়োজন।

বিষয়কে জ্ঞানায়ত্ত করা, এবং বিষয়-বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া, একই কথা। জ্ঞান প্রকটন দ্বারা ইন্দ্রিয়-ব্যাপার প্রতিরোধ করত বিষয়-বন্ধন হইতে আপনাকে উদ্ধার করিলে-পর তবেই আত্মা বিষয়-সকল প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়; তেমনি আবার জ্ঞান-প্রকটন দ্বারা রিপুর উত্তেজনা প্রভৃতি মানসিকব্যাপার প্রতিরোধ করত মোহ-বন্ধন হইতে আপনাকে উদ্ধার করিলে-পর তবেই আত্মা আপনার সত্তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়। ক্রোধের প্রাদুর্ভাব সময়ে তাহার উপর যদি জ্ঞান প্রকটন কর, অর্থাৎ ক্রোধ তোমাকে বিচলিত করিতেছে এইটি সবিশেষ উপলব্ধি কর, দেখিবে যে, ক্রোধ নরম পড়িয়া আসিয়াছে। আপনার অপূর্ণতার প্রতি যদি জ্ঞান প্রকটন কর, অর্থাৎ আমি যে কি অপূর্ণ এইটি সবিশেষ উপলব্ধি কর দেখিবে যে, আত্মার অন্তরাত্মা যিনি পূর্ণ-স্বরূপ তাঁহার অবলম্বন-প্রভাবে আত্মার শূন্য স্থান পূর্ণ হইয়াছে। গ্রীক দেশীয় তত্ত্ববিত্তম সক্রেটিস্ বলিয়াছিলেন যে আমি এই জানি যে, আমি কিছুই জানি না, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞান-বিষয়ে তিনি আপনার অপূর্ণতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া পূর্ণ-জ্ঞানের অবলম্বনে জ্ঞানতৃপ্ত হইয়াছিলেন। অভাবের প্রতিকূলে ভাব প্রকটন করিয়া, অভাবের অভাব করিয়া, অভাব হইতে মুক্তিলাভ করাই—উন্নতি। রিপুর উত্তেজনায় চালিত না হইয়া—সজ্ঞান ভাবে—স্বার্থ বোধে—বিষয় ব্যবহার করিলে মনুষ্য সেই উন্নতির প্রথম সোপানে আরূঢ় হয়।

শব-চ্ছেদ।



শব-চ্ছেদ-ক্রিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রের একটী প্রধান অঙ্গ। পূর্ব্বকালে এদেশে কোন-প্রকার শব-চ্ছেদ-ক্রিয়ার প্রচার ছিল কি না, জানিবার জন্য অনেকেই উৎসুক হন। আবার অনেকেরই বিশ্বাস যে, শব-চ্ছেদ-ক্রিয়া এদেশে কস্মিন্ কালেও উদ্ভূত হয় নাই। শবচ্ছেদ করা দূরে থাকুক, ঋষিরা শব স্পর্শও করিতেন না। মৃত শরীর স্পর্শ করিলে অশুচি হইতে হয়, এমন কি মৃত-শরীর-বাহী লোকের সঙ্গে গেলেও অশৌচ হয়।

"নারং স্পৃষ্ট্বাহস্থি সস্নেহং সচেলং জলমাবিশেৎ।" যদি দৈবাৎ সরস মনুষ্যাস্থি ছোঁয়া পড়ে তবে পরিহিত–বস্ত্র–সমেত জলপ্রবেশ করিবে। এই সকল ব্যবস্থা এদেশের আধুনিক নহে, অতীব পুরাতন। সুতরাং সহজেই বুঝা যাইতেছে যে ঋষিরা শব-চ্ছেদ করিতেন না, যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, সমস্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়া গিয়া ছিলেন। তাঁহাদের বুদ্ধি-প্রভা বড়ই তীক্ষ্ণ ছিল, অনুমান–শক্তি অত্যধিক ছিল, ধ্যান-যোগে অধিক সামর্থ্য ছিল অর্থাৎ চিন্তা করিবার ক্ষমতা সর্ব্বাধিক ছিল, তৎপ্রভাবেই তাঁহারা চ্ছেদভেদ না করিয়া শারীর তত্ত্ব লিখিতে সমর্থ হইয়া ছিলেন।

এরূপ বিশ্বাস অভ্রান্ত নহে। চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে এবং যাজ্ঞবল্ক্যীয় ও বাশিষ্ঠ প্রভৃতি যোগ-শাস্ত্রে শারীর তত্ত্বের যেরূপ সত্য-শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়, সেরূপ শৃঙ্খলা ও সেরূপ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম লেখা বিনা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে সমাধা হইবার সম্ভাবনা নাই। মৃত শরীর লইয়া অস্থি শিরা স্নায়ু প্রভৃতির অনুসন্ধান করা ও প্রত্যক্ষ করার বিলক্ষণ প্রথা ছিল, পরন্তু তাহা এক্ষণকার প্রথার অনুরূপ নহে। প্রথমে মৃত দেহ কুথিত করিয়া দেখার সৃষ্টি হয়, পরে নানাপ্রকার বিশদ উপায় প্রকটিত হইয়াছে। শব-চ্ছেদ–ক্রিয়াটী এদেশে প্রথমে কি আকারে প্রবর্ত্তিত হয় তাহা বর্ণন করিতেছি।

ভগবান্ ধন্বন্তরি, সুশ্রুত প্রভৃতি ঋষিকুমারদিগকে মানব-দেহের অন্তর্বাহ্যবর্ত্তী ত্বক্, মাংস, মেদ, বসা, অস্থি, স্নায়ু, শিরা, ধমনী, অন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র প্রভৃতির আকার, প্রকার, সংস্থান, এবং তত্তাবতের কার্য্য প্রভৃতির উপদেশ সমাপ্ত করিয়া অবশেষে বলিলেন, বৎস সুশ্রুত!

"ত্বক্‌পর্য্যন্তস্য দেহস্য
যোহয়মঙ্গবিনিশ্চয়ঃ।
শল্যজ্ঞানাদৃতে নৈষ
বর্ণ্যতেহঙ্গেষু কেষুচিৎ॥
তস্মান্নিঃসংশয়ং জ্ঞানং
হর্ত্রা শল্যস্য বাঞ্ছতা।
শোধয়িত্বা মৃতং সম্যক্
দ্রষ্টব্যোহঙ্গবিনিশ্চয়ঃ॥
প্রত্যক্ষতো হি যদ্দৃষ্টং
শাস্ত্রদৃষ্টঞ্চ তদ্ভবেৎ।
সমাসতস্তদুভয়ং
ভূয়োজ্ঞানবিবর্দ্ধনম্॥"

উপরিবর্ত্তী ত্বক্ হইতে আরম্ভ করিয়া শাস্ত্রে যে কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গগত পদার্থের নির্ণয় আছে, যাহা তোমাকে বলিলাম, এ সকল শল্যজ্ঞান ব্যতীত বর্ণন করা দুঃসাধ্য। অতএব, যিনি এ বিষয়ের নিঃসংশয়জ্ঞান লাভের বাঞ্ছা করিবেন, শল্য-কার্য্যে অর্থাৎ চ্ছেদভেদাদি কার্য্যে দক্ষ হইতে ইচ্ছা করিবেন। তিনি মৃত দেহ লইয়া তাহা উত্তম রূপে শোধিত করিবেন। অনন্তর শাস্ত্রনির্ণীত পদার্থ সকল প্রত্যক্ষ করিবেন। যাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় এবং শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় তাহাই গ্রাহ্য। যাহা প্রত্যক্ষে দেখা যায় তাহাই শাস্ত্রে জ্ঞাত হওয়া যায় সত্য; কিন্তু

শাস্ত্রে দেখা এবং প্রত্যক্ষে দেখা একত্র হইলেই জ্ঞান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, অন্যথা জ্ঞানের অপূর্ণতা থাকে। অতএব বৎস, সুশ্রুত! প্রত্যক্ষ করিবার জন্য শব-শোধন-ক্রিয়া ব্যবহার করিবে। যথা—

"সমস্তগাত্রম্ অবিষোপহতম্ অদীর্ঘব্যাধিপীড়িতম্ অবর্ষশতিকম্ নিঃসৃষ্টান্ত্রপুরীষম্ পুরুষম্ অবহন্ত্যামাপগায়াং নিবদ্ধম্ পঞ্জরস্থম্ মুঞ্জবল্কলকুশশণাদীনামন্যতমেনাবেষ্টিতাঙ্গম্ অপ্রকাশে দেশে কোথয়েৎ। সম্যক্ প্রকুথিতঞ্চোদ্ধৃত্য ততো দেহং সপ্তরাত্রাৎ উশীরবালবেণুবল্কলকূচীনামন্যতমেন শনৈঃ শনৈরবঘর্ষয়ন্ ত্বগাদীন্ সর্ব্বানেব বাহ্যাভ্যন্তরাঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষান্ যথোক্তান্ লক্ষয়েচ্চক্ষুষা।*

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিক্ আছে, বিষের দ্বারা মরণ হয় নাই, দীর্ঘকাল রোগ-ভোগে মরে নাই, অবর্ষশতিক অর্থাৎ দেহটী জরাপ্রভাবে জীর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, এরূপ একটী মৃতদেহ আহরণ করিয়া উদরের অন্ত্র ও পুরীষ বাহির করিয়া ফেলিবে। বহমানা নহে অর্থাৎ স্রোত না থাকে এরূপ কোন এক নদীতে সেই শব বাঁধিয়া রাখিবে। জলে ফেলিবার পূর্ব্বে, শবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল মুঞ্জ নামক তৃণ, কি কুশ, অথবা শণ-বল্কল দ্বারা জড়াইয়া, পশ্চাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রকার নদীজলে বাঁধিয়া পচাইবে। এবম্প্রকারে পচানর নাম কোথন। এই কোথন-ক্রিয়াটী উত্তম ছায়াচ্ছাদিত অপ্রকাশ দেশেই করিবে। যখন দেখিবে, তাহা সম্যক্‌রূপে পচিয়াছে, তখন ৭ দিন অতীত না হয় অর্থাৎ সাত দিনের মধ্যেই তাহা উপরে তুলিবে। অনন্তর উশীর তৃণের কূচী (ব্রস্) অথবা অপক্ক বাঁশের ছালের কূচী প্রস্তুত করিয়া তদ্দ্বারা অল্পে

* এই স্থানে "চক্ষুষা চোপায়েন" এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। এপক্ষে চক্ষুষা উপায়েন চ লক্ষয়েৎ; অর্থাৎ চক্ষুর দ্বারা দেখিবে এবং তাহাতে উপায় প্রয়োগও করিবে, এইরূপ অর্থ হয়। ঐ পাঠ যদি যথার্থতঃ ধন্বন্তরির মুখ দিয়া নির্গত হইয়া থাকে, তবে, চক্ষুর সঙ্গে কি উপায় প্রয়োগ হইবে তাহা এক্ষণে আমরা বুঝি না। চক্ষুর শক্তিবৃদ্ধির নিমিত্ত এক্ষণে যেমন কাচ-বিশেষ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাই কি? না। না কি হাঁ—কে বলিতে পারে। সুশ্রুত এক-স্থানে কাচের উল্লেখ করিয়াছেন। "কাচে মণিময়ে তথা।" মহর্ষি গৌতম স্বকৃত সূত্র গ্রন্থে কাচের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, কাচ স্বচ্ছতা বিষয়ে চাক্ষুষ রশ্মির অনভিভাবক অথবা অপ্রতিবন্ধক। এতদ্ভিন্ন অনেক পুরাতন গ্রন্থে কাচের উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু কাচের ব্যবহার-ঘটিত কোন বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। যাহাই হউক, শারীর-শাস্ত্রে যে সকল সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম শিরাতন্ত্রর বর্ণনা আছে তাহা প্রবল দৃষ্টি ব্যতীত সহজে দৃশ্য হইবার নহে। সুতরাং বুঝাইতেছে তাঁহারা চক্ষুর দৃষ্টি বর্দ্ধনের নিমিত্ত অবশ্য কোন উপায় পরিজ্ঞাত ছিলেন।

অঙ্গে ঘর্ষণ করিবে, আর দেখিতে থাকিবে। এইরূপ করিলে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক বিশেষ বিশেষ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই চক্ষে দেখিতে পাইবে।

পূর্ব্বকালের শব-চ্ছেদ-বিধি এইরূপ, ইহাই ক্রমে বিশদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরন্তু এই শব-চ্ছেদ-বিধি কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত হয় এবং সুশ্রুত ও ধন্বন্তরি কোন্ সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তাহা উত্তম রূপ নির্ণয় হইবার নহে। তবে সন্ধান করিলে এই মাত্র নির্ণীত হয় যে ধন্বন্তরি চতুঃসহস্রাধিক বৎসরেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। যে হেতু ব্যাসকৃত মহাভারত গ্রন্থে ইহাঁর জন্মবিবরণ এবং ইহাঁর চিকিৎসা-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণান্তরে সুশ্রুতেরও পরিচয় পাওয়া যায়; ইনি একজন ঋষিকুমার, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র। সুশ্রুত গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, এই আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র প্রথমে ব্রহ্মা, প্রজাপতিকে অধ্যয়ন করান, প্রজাপতি অশ্বিনীকুমারদিগকে, পরে ইন্দ্রকে, আমি ইন্দ্রের নিকট শিক্ষা করিয়াছি, লোক-হিতের নিমিত্ত আমি আবার তোমাকে বলিতেছি। এক্ষণে বিবেচনা কর যে সুশ্রুত কত পুরাতন ব্যক্তি। এক্ষণকার ইতিহাসবেত্তাদের মত অবলম্বন করিলেও ইনি বহু প্রাচীন হইয়া দাঁড়ান। যথা—

আরবদেশীয় এক খানি ইতিহাস, যাহার নাম "আয়নুল্ অম্বা ফিতবকাতুল অত্বা"। এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে, কঙ্ক নামক এক জন ভারতবাসী পণ্ডিত ৬৯৪ শকে অলমন্সুর বাদশাহের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইনি ঔষধ ও রোগ নিরূপণ বিষয়ে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর সঙ্গে যে সকল পুস্তক ছিল তন্মধ্যে এক পুস্তক "বিহৎ সিন্দ হিন্দ্," ইহা গণিত শাস্ত্রীয় পুস্তক। অপর এক পুস্তক ছিল, তাহার নাম "সস্রদ্"

বিহৎ সিন্দ হিন্দ এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পুস্তক হওয়া অতীব সম্ভব এবং দ্বিতীয় পুস্তক খানি ঔষধ ও রোগ-নির্ণায়ক পুস্তক সুতরাং উহা সংস্কৃত সুশ্রুত গ্রন্থ হইবে।

উল্লিখিত গ্রন্থের অন্য এক স্থলে লিখিত আছে যে, ৭০৭।৮ শকে হারুন্ অল্‌রশীদ নামক বাদশাহের উৎকট' পীড়া হওয়াতে তিনি ভারতবর্ষ হইতে মঙ্ক নামক একজন বিখ্যাত চিকিৎসককে লইয়া যান। ইহাঁর দ্বারাই তিনি রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই মঙ্ক আরবদেশে মহামহোপাধ্যায় রূপে প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং আরবীক ও পারসীক ভাষাতে অনেক চিকিৎসা গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া দিয়া ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে যে সকল চিকিৎসা-পুস্তক ছিল, তন্মধ্যে "সরক" ও "সস্রদ্" এবং "নিদান" নামক পুস্তক ত্রয়ই প্রধান ছিল।

পাঠকগণ বিবেচনা করুন, সরক সস্রদ ও নিদান এই পুস্তকত্রয় চরক, সুশ্রুত ও নিদান গ্রন্থ হইবার অতীব সম্ভাবনা কি না? যদি তাহা হয়, তবে এই পুস্তকত্রয় ৬০০ শকের বহু পূর্ব্বে রচিত হইবে, সংশয় নাই।

এই সকল দেখিয়া অনুমান হয় যে,

চিকিৎসা-শাস্ত্রটী ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে আরবে যায়, তথা হইতে অন্যান্য দেশে গিয়া রূপান্তরে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত আয়ুর্ব্বেদ খানিই বর্ত্তমান সর্ব্ব-দেশীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রের আদি বীজ।

অনেকের মনে উদিত হইতে পারে, যে চিকিৎসা-শাস্ত্রটী কেবল বৈদ্যজাতিরই হস্তে ছিল। বস্তুতঃ তাহা নহে। সুশ্রুত গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে লিখিত আছে যে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যানামন্যতমং অন্বয়বয়ঃশীলশৌর্য্যশৌচাচারবিনয়শক্তিবলমেধা-ধৃতিস্মৃতিমতিপ্রতিপত্তিযুক্তং তনুজিহ্বোষ্ঠ-দন্তাগ্রং ঋজুবক্ত্রাক্ষিনাসং প্রসন্নচিত্তবাক্-চেষ্টম্ ক্লেশসহঞ্চ ভিষক্‌শিষ্যমুপানয়েৎ অতো বিপরীতগুণং নোপনয়েৎ।"

যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য সদ্বংশোৎপন্ন হয়, বয়োধিক না হয়, শীল ও শৌর্য্য গুণ থাকে, সদাচারী ও বিনয়ী হয়, কার্য্যশক্তি ও দৈহিক বল থাকে, মেধা ও স্মরণ শক্তি থাকে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব থাকে, জিহ্বা ওষ্ঠ মোটা না হয় অর্থাৎ তনু (পাতলা) হয়, বক্ত্র চক্ষু নাসিকা দন্ত বক্র না হয় অর্থাৎ যদি ঋজু হয়, যদি প্রসন্ন মন প্রসন্ন বাক্য ও প্রসন্ন চেষ্টা হয়, যদি ক্লেশসহিষ্ণু হয়, তবে ভিষক্ এইরূপ শিষ্যকে অবাধে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে দীক্ষিত করিবেন, অন্যথা করিবেন না। ইহারই পরে লিখিত আছে যে, "উপনীয়স্তু ব্রাহ্মণঃ প্রশস্তেষু তিথিকরণমুহূর্ত্তনক্ষত্রেষু" এস্থলেও ব্রাহ্মণ-শিষ্যের উল্লেখ আছে। অতএব, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণেরাই সর্ব্ব বিদ্যার আশ্রয় ছিলেন. কালক্রমে বৈদ্যনামক স্বতন্ত্র শ্রেণী বা জাতি হওয়াতে ব্রাহ্মণেরা চিকিৎসা-ব্যবসা পরিত্যাগ করেন এবং ব্যবস্থা প্রচার করিয়া দেন যে "ব্রাহ্মণং ভিষজং দৃষ্ট্বা সচেলং জলমাবিশেৎ।" ব্রাহ্মণ-চিকিৎসকের মুখ দেখিলে বস্ত্রসহ স্নান করিতে হয়। এই রহস্য দ্বারাও নির্ণয় হইতেছে যে, সুশ্রুত গ্রন্থ খানি এ দেশের অত্যন্ত পুরাতন। এমন কি মহাভারতাদি গ্রন্থ অপেক্ষাও পুরাতন।

কালীবর বেদান্তবাগীশ।

ছিন্ন মুকুল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মোহ-মুগ্ধ।

যুবকেরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন—কিন্তু অন্য দিনের ন্যায় সেদিন পরস্পরে কথোপকথন চলিল না। দুজনেই আপন মনে থাকিয়া নিস্তব্ধ ভাবেই প্রায় কাটাইল।

আশ্চর্য্য, পূর্ব্বদিনকার ঘটনার কথা লইয়া কোথা দুজনার গল্প থামিবে না—না, দুজনেই আজ নিস্তব্ধ, দুজনেই চিন্তামগ্ন। কিন্তু কেহ মনোনিবেশ পূর্ব্বক উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে দেখিতে পাইতেন যে তাহাদের উভয়ের সেই নিস্তব্ধ মুখমণ্ডল পরস্পর কেমন ভিন্ন-ভাব-ব্যঞ্জক। প্রমোদ, গম্ভীর—প্রশান্ত—যেন বহির্জগতের সহিত তাঁর কোন সম্পর্ক নাই—চক্ষে যেন দৃষ্টি নাই—মুখে প্রফুল্লতা নাই; আর যামিনীনাথের অধীর ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসে যেন অনল বহিতেছে—কখনো কখনো (কিসের ভাবে কে জানে) তাঁহার ওষ্ঠাধর আহ্লাদে কাঁপিয়া উঠিতেছে—আবার কখনো যেন কোন আশার নিষ্ফলতা ভাবিয়া ভ্রুযুগ কুঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। উভয়ের মনে-মনেই চিন্তা-স্রোত বহিয়া যাইতেছে—কিন্তু কেহই কাহারো নিকট আপন মনোভাব প্রকাশ করিতেছেন না। এক জন ভাব-প্রকাশ বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক, আর একজন ভাব-প্রকাশ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক।

এই রূপেই প্রায় সে দিনটি কাটিল। অল্প একটি একটি সামান্য কথা ছাড়া—তাঁদের কোন কথাই হইল না। দুজনের কেহই পূর্ব্বদিনকার কথা তুলিলেন না। প্রমোদের এক একবার সে কথার প্রসঙ্গ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল, তিনি সে বিষয়ের দুই একটি কথা তুলিলেন—কিন্তু তাহাতে যামিনীনাথকে নিরুত্তর দেখিয়া আপনা হইতেই আবার প্রমোদ থামিয়া গেলেন। ক্রমে সে দিনটি এক রূপে কাটিল। পরদিন তাঁহাদের কানপুর ছাড়িবার কথা ছিল—কিন্তু দুজনেই পরস্পর কি মনে ভাবিয়া সেদিনও যাওয়া বন্ধ করিয়া তাহার পরদিন যাওয়া স্থির করিলেন—কিন্তু সেই দিনও সেই নিস্তব্ধভাব তাঁহারদিগকে পরিত্যাগ করিল না। অপরাহ্নে প্রমোদ বন্ধুকে কিছু না বলিয়া, চিন্তাভারাক্রান্ত মনকে শান্তিদান করিতে, সুদৃশ্য ভাগীরথী-তীরে আগমন করিলেন। সেখানে আসিয়া দেখিলেন, পরপারেই সেই অরণ্য—সেই বনদেবীর বাসস্থান। অরণ্য দৃষ্টে প্রমোদ যেন কত কি ভাবে এক প্রকার অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ভাবিতে ভাবিতে তিনি যে সেতু পার হইয়া সেই অরণ্যের দিকে চলিতে লাগিলেন—তাহা তখন নিজেই বুঝিতে পারিলেন না। মন্ত্র-মুগ্ধ হরিণের মত তাড়িৎ-প্রভাবেই তিনি যেন পদে পদে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অরণ্যে আসিয়া তাঁহার চমক ভাঙ্গিল—কিন্তু তখন আর ফিরিয়া যাইতে পা উঠিল না—কি এক প্রবল ইচ্ছায় অভিভূত হইয়া সেই জঙ্গল মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা হইলে আবার যে পথহারা হইয়া বিপদে পড়িতে পারেন, তাহা ভুলিয়া গিয়া অনেক ক্ষণ একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যাহাকে মনে মনে খুজিতে ছিলেন, তাহাকে পাইলেন না। রাত্রে যে পথ দিয়া কুটীরে গিয়াছিলেন, অনেক করিয়া সে পথে গিয়া দূর হইতে কুটীরটি দেখিতে পাইলেন—আবার মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় দূর হইতে তাহার পানে চাহিয়াই রহিলেন—কিন্তু তাহার নিকট যা-

ইতে সাহস হইল না। একটি কেমন লজ্জার ভাবে—একটি কেমন সঙ্কোচ ভাবে তাঁহার পদ আটকিয়া গেল। ক্রমে আবার সন্ধ্যা হইয়া আসিল—কিন্তু প্রমোদের সে জ্ঞান নাই, প্রমোদ কুটীর হইতে দৃষ্টি উঠাইতে অক্ষম, প্রতিক্ষণে তাঁহার মনে হইতে লাগিল এখনি একটি দেবী-প্রতিমা কুটীর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার চক্ষুকে কৃতার্থ করিবে, পাছে দৃষ্টি ফিরাইলে সেই অবকাশে সেই প্রতিমা কুটীর হইতে চলিয়া যায়—তিনি আর দেখিতে না পান, এই তাঁর ভয়। কিন্তু সময় কাহারো মনের ভাব বোঝে না—সময় কাহারো জন্য অপেক্ষা করে না—আজ প্রমোদের মনের ভাব বুঝিবে কেন? ক্রমে সন্ধ্যা আপন আঁধারময় আবরণে চারিদিক ঢাকিয়া ফেলিল—কুটীরখানি ক্রমে প্রমোদের দৃষ্টি হইতে অন্তর্ধান হইল। তখন প্রমোদ হতাশ চিত্তে শূন্যমনে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সহসা পূর্ব্বদিনকার মত গীতধ্বনিতে আকাশ কাঁপিয়া উঠিল—প্রমোদের হৃদয়-তন্ত্রীও বাজিয়া উঠিল। প্রমোদ দেখিলেন—সেই বনদেবী দেখিতে দেখিতে তাঁহারি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন—আহ্লাদে প্রমোদের বাক্য রহিত হইল—নিস্পন্দভাবে প্রমোদ দাঁড়াইয়া রহিলেন। রমণী প্রমোদের নিকটস্থ একটি বৃক্ষতলে বসিবার মানসে আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল—কিন্তু আজও সেখানে প্রমোদকে দেখিয়া বলিল "একি, আজও যে এখানে?" প্রমোদ কি উত্তর দিবেন! আসিয়াছেন বলিয়া মনে মনে আপনা আপনি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। নীরজা আবার বলিল "কালকের মত কি আজও পথ হারা হয়ে পড়েছ? কুটীর তো নিকটেই—এস তবে বিশ্রাম করিবে।" প্রমোদ লজ্জিত ভাবে বলিল "না, আজ আমার কোন পরিশ্রম হয় নাই—আমি বেড়াতে এসেছিলাম, এখনি গৃহে যাব।"

নী। "তা হোক না—কুটীরে আজ গেলে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।" এই কথায় প্রমোদের মনের ভাব কি হইল—কি জানি—কিন্তু প্রমোদ বলিলেন "তোমাদের কুটীরে? না, না, আমি ফিরে যাই—তুমিও এই বেলা গৃহে যাও।"

নী। "কেন?"

প্র। "আঁধার হ'য়ে এসেছে—এই বিজন বনে একাকী ভয় পেলে বড় বিপদে পড়িতে পার। কিন্তু যে আঁধার হয়ে এসেছে—একাকী কি যেতে পারবে—আমি কি রাখিয়া আসিব?"

নী। "ভয় করিবে কেন। ছেলে বেলা হ'তে এই বনে আছি—এখানে আমার ভয় করে না—অমাবস্যার রাত্রেও একাকী আমি এই বনে বেড়াই। পিতা কুটীরে অনেক সময় শাস্ত্রপাঠে নিমগ্ন থাকেন—আর আমি কখনো—এই শিরীষ-তলায়, কখনো এই অশোক-তলায়, কখনো ঐ মুক্তকালতা-মণ্ডপে আপন মনে গান গাইয়া বেড়াই। পাঠ সমাপ্তে পিতা যখন ডাকেন তখন ফিরিয়া যাই। আমার ভয় করিবে কেন? এস, বরং তোমাকে আমার স্বহস্তরোপিত সব গাছ গুলি দেখাইয়া আনি।"

প্র। "তোমার পিতা ডাকিলে কি দূর হইতে শুনিতে পাইবে?"

নী। "আমি যেখানেই যাই—তা শুনিতে পাইব। এস, ঐ লতামণ্ডপ মধ্যে কেমন পাতার বিছানায় একটী বউ-কথাকওকে শুইয়া রাখিয়াছি—দেখিয়ে আনি।"

প্র। "বউকথাকওটি তোমার কি অত পোষা হইয়াছে?"

নী। "না—এটি পোষা নয়। আহা, আজ সকালে ঐ ছানাটি গাছ হ'তে উড়ে প'ড়ে গিয়াছিল—তাই তাকে অমন যত্নে রেখেছি।"

প্র। "চল, কিন্তু ভয় হয়—পাছে তোমার পিতা ডাকিলে শুনিতে না পাও।"

প্রমোদ তখন নীরজার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন—নীরজা সেই নিস্তব্ধ শৈল-গগন চমকিত করিয়া গান গাইতে গাইতে পথ দেখাইয়া চলিল—

নিঃঝুম নিঃঝুম গম্ভীর রাতে,
কম্পিত পল্লব দক্ষিণবাতে,
পেখল' সজনি—সতিমির রজনী,
অম্বরে ন চন্দ্র তারকা ভাতে,
ঝিল্লি-ধ্বনি-কৃত, নিকুঞ্জ মোদিত,
কলয়ত জাহ্নবী মৃদুল প্রপাতে।

প্রমোদের শরীর হর্ষবিহ্বল লোমাঞ্চিত হইল—প্রমোদ ভাবিলেন "এই অরণ্যটিই কেন সমস্ত পৃথিবী হইল না? এই দুইটি জীবন বই আর পৃথিবীতে জীবন রহিল কেন?" সহসা পশ্চাৎ দিকে কাহার পদ-শব্দে তাঁহার সে চিন্তা ভঙ্গ হইল—তিনি মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন—একটী সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী নীরজার নিকট আসিলেন—নীরজার তখন গান বন্ধ হইল—সন্ন্যাসী ঈষৎ তীব্র স্বরে বলিলেন "তোমাকে এত ডাকিয়া ডাকিয়া আজ উত্তর পাইলাম না কেন? আজ এত অন্যমনস্ক কিসের জন্য? আমার, আহারের সময় হইয়াছে, এস গৃহে এস—?" প্রমোদ লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলেন—নীরজাও কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল। কিন্তু নীরজা বনবালা, তাহার সে ভাব অধিক ক্ষণ রহিল না—সরল ভাবে পিতাকে বলিল "কে জানে কেমন অন্যমনে ছিলাম—তোমার ডাক আজ শুনিতে পাই নাই—পিতঃ! তুমি কি অনেক ক্ষণ হইতে ডাকছ?" কন্যার কাতরভাবে সন্ন্যাসী স্বাভাবিক নরম স্বরে বলিলেন "না, আমি বেশীক্ষণ ডাকি নাই—ও যুবাটি কে?" নীরজা বলিল "সেই যে সেদিন পথহারা হইয়া দুজন পথিক এখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, যাঁহাদের কথা আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম—ইনি তাহারি মধ্যে একজন। প্রমোদকে আমি তোমার সহিত দেখা করাইতে কুটীরে লইয়া যাইতেছিলাম।"

তখন প্রমোদ বলিলেন "মহাশয়, ইনিই সে দিন বনদেবী হইয়া আমাদের আশ্রয় দিয়াছিলেন—নহিলে এই জঙ্গল মধ্যে সমস্ত রাত কাটাইতে হইত, ইহাঁর নিকট আমরা ঋণী।"

সন্ন্যাসী বলিলেন "নীরজা সন্ন্যাসীকন্যা—অতিথি-সৎকারই উহার ধর্ম্ম। নী-

রজা কর্ত্তব্য কাজ করিয়াছে, সেজন্য তোমরা কেন ঋণী হইবে—সে যাহা হউক, আজও কি শীকার অভিপ্রায়ে আসিয়াছিলে?" প্রমোদ একটু লজ্জিত ভাবে ইতস্ততঃ করিয়া বলিল "না, আজ বেড়াইতেই আসিয়াছি।"

স। "আজও যে রাত হইয়া পড়িয়াছে—কুটীরে থাকিলে হয় না?" এই কথায় নীরজা ব্যগ্রভাবে প্রমোদকে বলিল "চল, তবে কুটীরেই চল—এত রাত্রে কি করিয়া বাড়ী যাইবে?" কিন্তু প্রমোদ ইহাতে অসম্মত হইলেন, ভাবিলেন তাহা হইলে যামিনীনাথ বড়ই চিন্তিত হইবে—সমস্ত রাত তাঁহার অন্বেষণ করিবে। সন্ন্যাসী বলিলেন "কিন্তু এত রাত্রে তোমাকে কিছু না খাওয়াইয়া আমি যাইতে দিতে পারি না—তাহা হইলে আমার নিয়ম ভঙ্গ হয়—অতিথি-সৎকারই আমার ব্রত।" এই কথায় তখন আর প্রমোদ কিছু না বলিয়া সন্ন্যাসীর সহিত কুটীরাভিমুখে গমন করিলেন। নীরজা প্রফুল্লচিত্ত বিহঙ্গীর ন্যায় আগে আগে যাইতে যাইতে গান ধরিল—

"আয় আয় আয়, কে আছিস তোরা,
মরমব্যথায় যার—
দিবস রজনী পড়িছে বিকলে,
নয়ন-সলিল-ধার॥
কাতর হৃদয়ে, কাঁদিছে যেজন,
হারায়ে বিভব মান—
হুতাশ প্রেমের হুতাশে সদাই,
জ্বলিছে যাহার প্রাণ,
কাঁদিতে হবে না, যাতনা রবেনা,
রবেনা ভাবনা-ভার,
আয় আয় আয়, কে আছিস তোরা,
খোলা এ কুটীর দ্বার॥"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—বিদায়।

গান গাইতে গাইতে নীরজা সহসা থামিল। তাহার পার্শ্বস্থ একটি বটবৃক্ষ তল হইতে হঠাৎ কোন মনুষ্যের চঞ্চল পদনিক্ষেপ-শব্দ তাহার কর্ণে যাওয়াতে সে চমকিত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইল—অমনি যেন বৃক্ষতল হইতে একটি মনুষ্যকে অপসারিত হইতে সে দেখিতে পাইল। হঠাৎ নীরজার ঐরূপ ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসান্তে সন্ন্যাসীরা কারণ শ্রবণে দুজনেই কিছুক্ষণ ধরিয়া বৃক্ষতল অন্বেষণ করিলেন—কিন্তু কিছুই না দেখিয়া নীরজার ভ্রম বুঝিয়া আবার কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। কুটীরে পঁহুছিয়া আহারান্তে সন্ন্যাসী প্রমোদকে তাহার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সকল শুনিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"কানপুরে কেন আসা হইল।"

প্র। "পূজার ছুটীতে বেড়াইতে আসিয়াছি।"

স। "কতদিন এখানে থাকা হইবে?" প্রমোদ একটু থামিয়া থামিয়া বলিলেন, "আর ৬। ৭ দিনের মধ্যে আমাদের কলেজ খুলিবে, কাজেই আর বেশীদিন এখানে থাকিতে পারিতেছি না। কালই নিশ্চয় আমাদের কানপুর ছাড়িতে হইবে। কলিকাতা যাইবার আগে আমায় আবার বাড়ী

গিয়া দুই চার দিন থাকিতেই হইবে—নহিলে—” এই সময় নীরজা বলিয়া উঠিল—“আমার বউকথাকওটি তোমাকে দেখান হইল না—তুমি কি আর আসিবে না ?” প্রমোদ এই কথায় একটু হাসিয়া তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসীও সেই কথায় একটু হাসিলেন, কিন্তু কিছু পরেই আবার সে হাসি বিষাদরূপে পরিণত হইল, সন্ন্যাসীর মুখকান্তি গম্ভীর হইয়া পড়িল প্রমোদ বালিকার পানে চাহিয়া আপন মনে মনে কথা কহিতে কহিতে অজ্ঞাত ভাবে আস্তে আস্তে বলিলেন—“এমন সরলা আর একটীও দেখি নাই”—এই কথাটি যদিও প্রমোদ অতি আস্তে বলিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসীর কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি বলিয়া উঠিলেন—“সত্য—এমন সরলা আর নাই—কিন্তু ইহার উপযুক্ত পাত্র কোথায়? যোগ্য পাত্রে অর্পণ করিয়া হরিদ্বারে যাওয়া কি আমার ঘটিবে ?”. শুনিয়া নীরজা বালা ভাব ছাড়িয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—“পিতঃ, হরিদ্বারে আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইবে না? আমি সঙ্গে যাইব।—হরিদ্বার কতদূর ?”

স। “অনেক দূর।” নীরজা এই কথায় ব্যাকুল ভাবে প্রমোদের দিকে চাহিয়া বলিল—“হরিদ্বার দূর হইলেও কি তুমি এইরূপ বেড়াইতে আসিতে ?” সন্ন্যাসী এই কথায় নীরজার প্রতি চাহিলেন—কি ভাবে এই কথাটি তাহার অন্তরতল হইতে বাহির হইল—তিনি তাহা যেন জানিতে চেষ্টা করিলেন। যে একটী ভাবে সমস্ত পৃথিবী মুগ্ধ, সমস্ত দেবগণ মুগ্ধ, যে একটি ভাবে সমস্ত জগৎ সংসার চলিতেছে, সন্ন্যাসী দেখিতে চাহিলেন—নীরজার ঐ ব্যাকুলতা সেই ভাবের অঙ্কুর কি না ? কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না, নীরজার কথায় প্রমোদ বলিলেন “হরিদ্বার কতই বা দূর ?”

নী। “না, না, ততদূর যাইতে তোমার কষ্ট হইত—না ?” প্রমোদ একটু হাসি ছাড়া ইহার উত্তর করিলেন না—সন্ন্যাসী ও কথা বন্ধ করিবার জন্য বলিলেন “নীরজ, তোকে রেখে কি আর আমি হরিদ্বার যাইব ? তোর আগে বিবাহ হউক। কিন্তু তাহা হইলেই কি যাইতে পারিব ? উঃ মায়ার কি দোর্দ্দণ্ড-পীড়ন—জানিতেছি কিছুই কিছু না—জানিতেছি চক্ষু বুজিলে সেই পরব্রহ্ম বই আর গতি নাই—জানিতেছি যে চক্ষু বুজিবার সময়ও অগ্রসর,

তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ।
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণঃ॥”

বলিয়া সন্ন্যাসী চক্ষু নিমীলিত করিলেন, দুই এক বিন্দু অশ্রুবারি তাঁহার গণ্ড বাহিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর—প্রমোদ গৃহে যাইবার নিমিত্ত বিদায় প্রার্থনা করিলেন। তখন সন্ন্যাসী, প্রমোদের পথ চিনিয়া যাইতে কষ্ট হইতে পারে বলিয়া স্বয়ং পথপ্রদর্শক হইবার ইচ্ছায় উঠিলেন। নীরজাও সঙ্গে আসিতে চাহিল, কিন্তু সন্ন্যাসী নিষেধ করিয়া বলিলেন “কাল প্রাতে আমাকে নৈমিষারণ্যে যাইতে হইবে—তোমায় খুব প্রাতে থাকিতে উঠিতে হইবে—শুইতে আর বিলম্ব করিও

না।” নীরজা ইহাতে কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু পিতার কথায় দ্বিরুক্তি না করিয়া শয়ন করিতে গমন করিল।

সেই দিন রাত্রে প্রমোদ বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, যামিনীনাথ সেখানে নাই। ভৃত্যের নিকট শুনিলেন, অপরাহ্ণে কলিকাতার এক পত্র পাইয়া বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ সেই রাত্রেই তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে হইয়াছে।

একাকী প্রমোদ সেখানে সে রাত্রি কাটাইয়া পরদিন তিনিও এলাহাবাদে বাটী যাত্রা করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—কনকলতা।

এইখানে আমরা কনকের কথা কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কনক এখন পঞ্চদশ বর্ষীয়া, কিন্তু তাহার এখনো বিবাহ হয় নাই। সুশীলা প্রমোদের, দুজনেরই বাল্যবিবাহে বিশেষ ঘৃণা ছিল বলিয়া কনকের এখনো তাঁহারা বিবাহ দেন নাই। কনক সেই বাল্যকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত ভালবাসা বই কিছুই জানে না, অপ্রকাশ্য ভাবে নীরবে চুপে চুপে হৃদয়ের নিভৃত বিজনে সুশীলা এবং ভাইটিকে লুকাইয়া লুকাইয়া ভালবাসে—তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানির সমস্তই ভালবাসায় পূর্ণ। তাঁহাদের পায়ে কাঁটা ফুটিলে সে বুক পাতিয়া দিতে ইচ্ছা করে। যতদিন প্রমোদ কলিকাতায় থাকিতেন, ততদিন অত্যন্ত কষ্টে কনকের দিন যাইত, কবে ছুটীতে তিনি বাড়ী আসিবেন সে তাহারি কেবল দিন গণিত। এবং ইহার মধ্যে ভ্রাতার জন্য মোজা গলাবন্ধ কতই বুনিত। ভাইটি আসিলে কি করিয়া তাহাকে যত্ন ও আদর করিবে, সে বিষয়ে কতই যে কল্পনা করিত তাহার ঠিক নাই। কিন্তু সে বিষয়ে তাহার কল্পনা করাই সার হইত—কনক মুখ ফুটিয়া কোন কথা দ্বারা প্রমোদকে কখনো এ পর্য্যন্ত আদর করিতে সাহসী হয় নাই, হাজার ইচ্ছা করিলেও সে তাহা পারিত না। তবে কনকের সকল কার্য্যেই, কনকের একটি ক্ষুদ্র কথাতেও তাহার মনের প্রগাঢ় স্নেহভাব প্রকাশ পাইত। কনক সর্ব্বদাই প্রমোদকে পত্র লিখিত, কিন্তু সময়াভাবে প্রমোদ কনকের সকল পত্রের উত্তর দিতে পারিতেন না। আপনার দশ খানির উত্তরে কনক দু এক খানি যাহা পাইত, তাহাতেই তাহার আহ্লাদ ধরিত না। প্রমোদ ভগিনীর সেই নিঃস্বার্থ ভালবাসা কিছুই বুঝিতেন না। তবে সর্ব্ব প্রথমে যখন বাড়ী হইতে কলিকাতায় পড়িতে আসেন, তখন প্রথম বিদেশে আসিয়া সে স্নেহের অভাব কিছু বুঝিয়াছিলেন। কলিকাতায় প্রথমে আসিয়া প্রমোদ দেখিলেন, এখানে আর তিনি খাইতে ভাল খাসেন বলিয়া কেহ যত্নে বাদাম কুড়াইয়া আনিয়া দেয় না, যত্নে তাঁহার পড়িবার বই গুলি কেহ গুছাইয়া রাখে না—তাঁহার বিষণ্ণ মুখ দেখিলে কেহ কাতর ভাবে জিজ্ঞাসা করে না, কেহ আর কাতর ভাবে তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া থাকে না—তাঁহার কষ্টে কেহ ভ্রুক্ষেপও করে না। প্রমোদ তখন

তাঁহার ভগিনীর স্নেহ বুঝিতে পারিলেন—স্নেহের অভাব কি ভয়ানক, বুঝিতে পারিলেন। আগে কত সময় কনককে কত মর্ম্মে আঘাত দিয়াছেন, বিষণ্ণ প্রমোদকে কনক কাতর ভাবে সান্ত্বনা করিতে আসিলে, প্রমোদ বিরক্ত ভাবে উঠিয়া গিয়া তাহাকে কত মর্ম্মপীড়া দিয়াছেন, আদর করিয়া খাওয়াইতে আসিলে কতবার হাত ছুড়িয়া ফেলিয়া কনককে কাঁদাইয়াছেন—তাহার ভালবাসার প্রতিদানে বিরক্তি ও তাচ্ছিল্য উপহার দিয়া তাহাকে কত কষ্ট দিয়াছেন—কাছে থাকিতে প্রমোদের তখন এ সকল কিছুই মনে হয় নাই—এখন সহসা অপরিচিতের মধ্যে আসিয়া স্নেহের অভাব বুঝিয়া প্রমোদের এই সকল বাল্য-কথা মনে পড়িল। প্রমোদের জন্য কনক কত সময় কত করিত, সেই সকল ঘটনা তখন কিছুই মনে হইত না—এখন প্রমোদের সে সকল ঘটনা অনেক মনে পড়িতে লাগিল। কি করিয়া ভ্রাতার দোষ ভ্রাতার অজ্ঞাতভাবে আপন স্কন্ধে লইয়া কনক প্রমোদকে সুশীলার নিকট নির্দ্দোষী করিত, কত সময় সেই জন্য কনক কত কষ্ট পাইত, প্রমোদের তাহা মনে পড়িল। তাঁহার মনে পড়িল এক দিন বৃষ্টির পর তাঁহারা ভ্রাতা ভগিনীতে সেই বৃষ্টির জলে উদ্যানে খেলা করিতেছিলেন, হঠাৎ বাতায়ন হইতে সুশীলা তাহা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ডাকিলেন, প্রমোদ তাঁহার নিকট যাইতে যাইতে আবার যাইতে অনিচ্ছুক হইয়া অন্য স্থানে পলাইয়া গেল, প্রমোদের পলায়নে কনক হৃষ্টচিত্তে একাকী সুশীলার নিকট গেল। কনকের সন্তুষ্টির কারণ তখন প্রমোদ বুঝিতে পারেন নাই—তাহার পর বুঝিলেন যে কনক এখন একাকী গেলে, তাহার উপর দিয়াই যাহা ঝড় বহিবার বহিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যাইবে, প্রমোদের আর কোন কষ্ট পাইতে হইবে না—এই মনে করিয়াই কনক আহ্লাদপূর্ণ হইয়াছিল। আপন পৃষ্ঠে শাস্তি লইয়া ভ্রাতাকে বাঁচাইতে পারিল বলিয়া কনকের যে প্রচুর আহ্লাদ হইয়াছিল—তাহা প্রমোদের মনে পড়িল। এইরূপ কত শত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্নেহময় ঘটনা তখন প্রমোদের মনে পড়িতে লাগিল। তখন কনকের ভালবাসা তাঁহার নিকট অমূল্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। আপনার সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে পড়িয়া প্রমোদের অনুতাপ হইতে লাগিল। ভাবিলেন—এবার বাড়ী গিয়া আর কনককে কষ্ট দিবেন না। ক্রমে দিনকতক কলিকাতায় থাকিতে থাকিতে আবার যখন কলিকাতা সহিয়া গেল, তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কনককেও ভুলিয়া গেলেন, কনকের স্নেহও ভুলিলেন—অনুতাপও ক্রমে অবসান হইল। কিন্তু কনক ভাইটিকে দেখিবার জন্য কতই ব্যাকুল হইত—সারা বৎসর তাহার জন্য কতই উৎসুক ভাবে অপেক্ষা করিয়া থাকিত, পরে ছুটীতে প্রমোদ বাড়ী আসিলে, তাহার আনন্দ ধরিত না। যে কদিন প্রমোদ বাড়ী থাকিতেন, কি সুখে সে দিন গুলি তাহার কাটিয়া যাইত তাহা বলিবার নহে। এবারও সারা বৎসর অপেক্ষা করিয়া করিয়া আশ্বিন মাস আসিল, কত ব্যগ্রভাবে

কনক প্রমোদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু অবশেষে এক দিন হতাশ হইয়া তাহার শুনিতে হইল যে প্রমোদ আপাততঃ কানপুরে বেড়াইতে যাইতেছেন, সেখান হইতে কিছুদিন পরে আসিবেন। কনক-বালিকার বড়ই কষ্ট হইল, কিন্তু কি করিবে, সহিষ্ণুতার সহিত আবার দিন গ-ণিতে লাগিল। প্রমোদ যেদিন কানপুর হ-ইতে বাড়ী আসিলেন, তাহার আর আহ্লাদ রাখিবার স্থান রহিল না, তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়টি অপরিমিত সুখে ভাসিতে লাগিল। বিশে-যতঃ প্রমোদের ভাবভঙ্গী এবারে অন্যবার হইতে স্নেহ ও মমতাময়। প্রমোদের ঈষৎ হাসি-মুখখানি এবারে এমন এক নূতন অমায়িক উজ্জল জ্যোৎস্নাময় ভাবে পরি-প্লুত, যে দেখিলে বোধ হয় তাঁহার হৃদয়ে একটি নূতন ভাবের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। কিন্তু সুখের দিন শীঘ্রই ফুরাইয়া আসে, কন-কের সুখের দিনও ফুরাইয়া আসিল। ছুটী শেষ হইয়াছে, প্রমোদের আবার কলি-কাতায় যাইবার দিন আসিয়া পড়িল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—ভ্রাতা-ভগিনী।

প্রমোদ আজ সন্ধ্যাকালে কলিকাতায় যাইবেন, তাঁহার সঙ্গে লইবার সমস্ত দ্রব্য-সামগ্রী কনক গুছাইয়া দিল। কনক তা-হার সঙ্গের ব্যাগে উদ্যানজাত কতকগুলি বাদাম পর্য্যন্ত লুকাইয়া পুরিয়া দিল, আপন হস্ত-নির্ম্মিত পশমের মোজা গলাবন্ধ ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস তাহাতে রাখিল, শেষে গোছান, হইলে পাঠ-গৃহে আসিয়া কনক বসিল। পাঠে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া একখানি পাঠ্য পুস্তক লইয়া পড়িতে গেল, শীঘ্র শীঘ্র অনেক পাত উলটাইল বটে, কিন্তু পড়িয়া পড়িয়া তাহা উলটাইল কিম্বা অশ্রুসিক্ত হওয়াতে তাহা উলটাইতে বাধ্য হইল, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারি না। কিছু পরে কনক বিরক্ত ভাবে বই-খানি মুড়িয়া অঞ্চলে অশ্রু মুছিতে লাগিল, মুছিয়া মুছিয়া আবার কি ভাবে জানি না— সেই বইখানি খুলিয়া পড়িতে গেল, এই সময় প্রমোদ সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আস্তে আস্তে তাহার নিকট আসিয়া একখানি চৌকিতে স্থির ভাবে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি পড়িতেছ।"

ক। "ভারতবর্ষের ইতিহাস।" "কই দেখি" বলিয়া প্রমোদ বইখানি হাতে লই-লেন, কিন্তু তাহাতে একবার চক্ষু বুলাইয়াই আবার সশব্দে তাহা টেবিলের উপর ফে-লিয়া রাখিয়া বলিলেন "কনক——" কনক বলিয়াই প্রমোদ থামিলেন—কি বলিতে গিয়াছিলেন আর বলিলেন না, কনক তাহা বুঝিয়া বলিল "দাদা কি? কি বলিতে ছিলে বল না?"

প্র। "না, কিছু না—জিজ্ঞাসা করিতে-ছিলাম তোর ইতিহাস বেশ মনে আছে? বল দেখি নূরজাহান কে?" তাঁহার জিজ্ঞা-সায় কনক হাসিয়া বলিল "সের আফগানের স্ত্রী—পরে জাহাঙ্গীরের রাণী হয়।"

প্র। "জাহাঙ্গীর নূরজাহানকে চিনিল কি ক'রে?"

ক। "অল্পবয়স্কা নূরজাহান আকবরের অন্দরে প্রায়ই থাকিত—সেই সময় যুবরাজ জাহাঙ্গীর তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হন।"

প্র। "আচ্ছা, আচ্ছা, তার পর সের আফগানের সঙ্গে বিবাহ হোলেও আবার জাহাঙ্গীরের রাণী হোলো কি করে?"

ক। "জাহাঙ্গীরের আদেশে সের আফগান হত হইয়া—"কনকের কথাটি শেষ না হইতে প্রমোদ বলিলেন "ছিঃ ছিঃ—জাহাঙ্গীরের প্রেম প্রেমই নয়, সে প্রেমে আত্ম-বিসর্জ্জন কই?" বলিতে বলিতে প্রমোদের মনে কত ভাব বহিয়া গেল। মনে হইল নীরজা যে তাঁহার হইবে, ইহা তো তাঁহার দুরাশা—কিন্তু তাহা কি হইবে? এ দুরাশা কি সফল হইবে? যদি না হয়—যদি নীরজা অন্যের হয় তাহা হইলে তাঁহার কি হইবে? নীরজা তাহা হইলে পর হইয়া যাইবে, যদি কখনো তখন তাঁহার সহিত দেখা হয় সে তাহার কাছে হইতে লুকাইবে, আর হয়তো কখনই দেখিতেও পাইবেন না—উঃ কি কষ্ট, ভাবিতেও তাঁহার কষ্ট হইল, প্রমোদের ওষ্ঠাধর মৃদু মৃদু কাঁপিতে লাগিল—কিন্তু পরক্ষণেই তাহা মিলাইয়া গেল, তিনি চৌকি হইতে উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন—"নূরজাহানের কখনো ছবি দেখেছিস্?"

ক। "দেখেছি। আমার ইচ্ছা হয় আমাদের অমনি একটি বেশ সুন্দর বৌ হয়। দাদা, তুমি বিয়ে করিবে না? তা হলে আমার বেশ একটী সঙ্গী হয়।" প্রমোদের প্রফুল্ল অমায়িকতায় আশ্বাসিত হইয়া কনক আজ মুক্তকণ্ঠ, তাহাকে ঈষৎ প্রগল্ভ বলিতেও আমাদের সঙ্কোচ হইতেছে না। প্রমোদ কনকের সেই সরল প্রশ্নে ধীরে ধীরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন—কি ভাবিতে ভাবিতে একটি সেল্ফের উপর, যেখানে কতকগুলি সজ্জিত পুস্তক ছিল সেইখানে আসিলেন—অন্য মনে তাহার মধ্য হইতে এক খানি বই তুলিয়া হাতে লইলেন। কনক বলিল—"দাদা তোমাকে অমন দেখছি কেন, তুমি আমাকে কি বলিতে গিয়াছিলে, কই বলিলে না?" প্রমোদ বলিলেন, "বলিতে গিয়াছিলাম সত্য কিন্তু কেন যে তোকে বলিতে গেলাম তাহা তো জানি না।" কনক মুখটি চুন করিয়া বলিল—"আমাকে বলিলে কি দোষ হয়।"

প্র। "তুই ছেলে মানুষ, তোর কাছে সে কথা বলিতে যাওয়াই পাগ্‌লামি?"

ক। "কখনো তো কিছু বলিতে এস নাই, তবে আজ যে বলিতে গেলে।"

প্র। "পাগ্‌লামি—মনের চঞ্চলতা। একাকী মনের মধ্যে রাখিয়া কেমন এক এক বার ফুটিতে ইচ্ছা হয়—কিন্তু লোক পাইনে।——কি আর বলিব——কিছুই না।——তোকে আর এক দিন পড়া শুনা জিজ্ঞাসা করিব—এখন পড়।" কনক দেখিল প্রমোদের মুখে তাঁহার সেই স্বাভাবিক চপল ভাব নাই——তিনি ঈষৎ গম্ভীর, ঈষৎ বিষণ্ণ——চক্ষের ভাব ঈষৎ আবেশময়, কথা ধীর অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক। কথা কহিতে কহিতে প্রমোদ অন্য মনে সেই সেল্‌ফস্থিত

এক একখানি বই লইয়া টেবিলে ফেলিতে লাগিলেন, কনক অন্য মনস্ক বশতঃ তাহা দেখিল না। ভ্রাতার কথায় কনক বলিল "তুমি দাদা আমাকে কোন কথাই বলিতে পার না।" কনকের মুখখানি ম্লান হইল, চোখ দুটি ছল ছল করিয়া আসিল। প্রমোদ কনকের কথায় নিরুত্তর হইয়া রহিলেন, তাহার কথা শুনিতে পাইলেন কি না তাহাও বোঝা গেল না। ক্ষণেক মৌন ভাবে থাকিয়া থাকিয়া প্রমোদ সে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহাতে কনকের বড় দুঃখ হইল, কনকের কান্না আসিল—কাঁদিয়া কিছু হাল্কা হইলে গৃহান্তরে যাইবার জন্য উঠিল, উঠিয়া সেল্‌ফের বই গুলি টেবিলে স্তূপাকার দেখিয়া সহসা তাহার যেন চমক ভাঙ্গিল, ব্যস্ত হইয়া সে বইগুলি গুছাইয়া সেল্‌ফে তুলিতে গেল।

সে বই গুলি সুশীলার যত্নের বই, বাল্যকালে একদিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে আদর করিয়া পড়িতে দিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সুশীলা তাহা অতি যত্নে রাখিয়া ছিলেন। কেহ তাহাতে হাত দিলে তিনি অতিশয় বিরক্ত হইতেন, স্বহস্তে তিনি তাহা প্রত্যহ মুছিয়া রাখিতেন। একদিন কনক আপন পড়ার বই একখানি হারাইয়া সেই সেল্‌ফে তাহা খুজিতে গিয়াছিল—তাহাতে সুশীলা তাহাকে বকিয়া ছিলেন এবং ভবিষ্যতে সেই সেল্‌ফে হাত দিতে বিশেষ রূপে বারণ করিয়া ছিলেন। সেই অবধি আর কনক তাহাতে হাত দিত না। এখন কনক তাড়াতাড়ি বই গুছাইতে যাইতেছে—এই সময় সহসা সুশীলা এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকার অমনি মুখখানি আরো শুকাইয়া গেল—চোরের ন্যায় সে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল। সেই বইগুলির ঐরূপ দুর্দশা দেখিয়া সুশীলা অতিশয় বিরক্ত হইলেন। সুশীলা স্বভাবতই কিঞ্চিৎ বাহুল্যরূপে কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন, এবং সেই অনুষ্ঠানে ত্রুটী হইলে অল্পতেই কিঞ্চিৎ কঠোর হইয়া পড়িতেন। সুতরাং তাঁহার বিশেষ বারণ সত্ত্বেও কনক উহাতে হাত দিয়াছে—তিনি ইহাতে ক্রুদ্ধও হইলেন। আপন আজ্ঞা পালিত না হইলে সুশীলা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি ভাবিলেন—"কি হইবে, সেদিন ঐরূপ করিতে গিয়াছিল—বারণ করিলাম, বিশেষ রূপে বারণ করিলাম—তবু শুনিল না। আমার কথা অবহেলা করিল—গুরুলোকের কথা অবহেলা করিল! কই, কনক ত আগে এরূপ ছিল না, এখন ইহার প্রতীকার কিরূপে করা যায়—প্রথম হইতে না শোধরাইলে ক্রমে এ স্বভাব বদ্ধমূল হইয়া যাইবে।"

সুশীলা পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, এবং মান্য করিতেন—তাঁহার দত্ত বই গুলিও সেই হেতু তিনি ভক্তিচক্ষে দেখিতেন। তিনি ভাবিলেন—কনক যদি সুশীলাকে তেমন ভক্তি করিত—তাহা হইলে তাঁহার কথা কখনই অগ্রাহ্য করিতে পারিত না। "মেয়ে ছেলের গুরুজনের প্রতি ভক্তি নাই—কি ভয়ানক কথা!" সুশীলা তাহার স্বভাব শোধরাইবার জন্য ভাবিত হইলেন—গম্ভীর

স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন উহাতে হাত দিতে আমার বারণ তাহা কি তুমি জান না। কেনই বা বারণ—ও বই গুলি কি—তাহাও আমি কি তোমাকে বলি নাই? তবুও তুমি উহাতে হাত দিলে?" কনক চুপ করিয়া রহিল—কি উত্তর দিবে। যদি বলে আমি ওরূপ করি নাই, তাহা হইলে সুশীলা আবার জিজ্ঞসা করিবেন কে তবে করিয়াছে—প্রাণ থাকিতে ভ্রাতার নাম বলিতে পারিবে না। কনক কোন উপায় না দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল। সুশীলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—তখনো কনক কথার উত্তর করিল না। একে দোষী, তাহাতে আবার এইরূপ ব্যবহার! কনকের স্বভাব শোধরাইবার পক্ষে সুশীলার সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। তিনি তাহাকে আর একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তর না পাইয়া হতাশ হইলেন। কিন্তু তবু যে হাল ছাড়া উচিত নহে—তবু যে চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে—দেখা যাক, যদি শাস্তি দিয়া স্বভাব শোধরাইতে পারেন—তিনি শাস্তি স্বরূপ বলিলেন—"আজ তোমায় একাকী খাইতে হইবে—আমাদের সহিত একত্রে খাইতে পাইবে না—এবং প্রমোদের সহিত আজ দেখা করিতে পাইবে না, সে আজ রাত্রে যাইবে—সে সময় তোমার সহিত দেখা হইবে না।" সুশীলা জানিতেন ঐ শাস্তিই তাহার শাস্তির পরাকাষ্ঠা হইবে। রাত্রে যাইবার সময় প্রমোদ সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিল "কনক আজ কোথায়? তাহাকে যে আজ অনেক ক্ষণ দেখি নাই, আমার আবার যাইবার সময় হইয়া আসিল—এখনো যে সে আসিল না।" সুশীলা বলিলেন—"সে আজ দোষ করিয়াছে—শাস্তি স্বরূপ তাহাকে বন্ধ রাখিয়াছি।" প্রমোদ শুনিয়া একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন এবং বিমর্ষ ভাবে বাড়ী হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু গাড়ীতে গিয়াই আবার সকল ভুলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—জালে হরিণী।

সন্ন্যাসী নৈমিষারণ্যে গিয়াছেন। নীরজা কুটীর সন্নিধানস্থ একটি বকুল-তলে বসিয়া, ৩০।৩২ বয়স্ক একটি কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় স্ত্রীলোকের সহিত গল্প করিতেছিল। তখন অস্ফুট জ্যোৎস্নায় বকুল-তলাটি ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়াছিল, মৃদু মৃদু বাতাস বহিতেছিল, সেই বাতাসে একটি একটি করিয়া বকুল খসিয়া বৃক্ষতল ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

নীরজা সেই ফুলরাশি মধ্য হইতে কতকগুলি ফুল হস্তে লইয়া খেলিতে খেলিতে তাহার গল্প শুনিতেছিল। স্ত্রীলোকটি তাহার ঘরকন্নার কথা—দুঃখধান্ধার কথা—তাহাদের ক্রীড়া-কর্ম্মের কথা—তাহাদের দাম্পত্য প্রণয়ের কথা—তাহার পুত্র-কন্যার কথা বলিতেছিল—নীরজা কৌতূহলের সহিত তাহা শুনিতে শুনিতে মাঝে মাঝে দুই একটি প্রশ্ন করিতেছিল। কাঠুরিয়া রমণীর নববিবাহিতা কন্যার কথা শুনিয়া নীরজা বলিল "বসু—আজ তাহাকে সঙ্গে আনিলে না কেন?" বসুমতী বলিল "সে শ্বশুর বাড়ী গেছে

মা।" এই কথায় নীরজা, ভূমি হইতে এক অঞ্জলি বকুল কুড়াইয়া বস্থর অঞ্চলে দিয়া বলিল "আহা, সে বলে ছিল তাহার স্বামী আসিলেই এবার সে এই বকুল ফুল তাহার জন্য লইয়া যাইবে—কই, সে ত আসে নাই, তুমি এই গুলি তাহাকে পাঠাইয়া দিও" বস্থ বলিল "মা—আমরা দুঃখ করে খাই—কে আবার কাল তার শ্বশুর বাড়ী ঐ ফুল দিতে যায় বল মা!" কথা কহিতে কহিতে সহসা পেচকের বিকট চীৎকারে তাহারা চমকিয়া উঠিল—নীরজা ত্রস্তে, একবার চারি দিক চাহিয়া দেখিল—বস্থ অমঙ্গলসূচক পেচক-শব্দে ভীত হইয়া "দূর দূর" করিয়া উঠিয়া বলিল "গাটা যেন চমকে উঠলো—সন্ন্যাসী মহাশয় নেই—সহজেই একাকী কেমন ভয় হয়।"

নী। "কই, আমার তো কখন ভয় হয় না—কিন্তু সহসা আমিও চমকে উঠেছি। যাক, তুমি তোমার মেয়ের গল্প কর—লহনা তার স্বামীকে খুব ভালবাসে—না?" আবার এই সময় পূর্ব্বের ন্যায় পেচক ডাকিয়া উঠিল—সেই অমঙ্গলসূচক কর্কশ স্বরে নীরজাদের গাত্র শিহরিয়া উঠিল, গল্প ছাড়িয়া নীরজা সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া পশ্চাৎ চাহিয়া দেখিল। সেই নির্ব্বাণোন্মুখ অস্ফুট চন্দ্রালোকে নীরজা দেখিতে পাইল, চারিজন লোক তাঁহাদের নিকটেই আসিতেছে—দেখিতে দেখিতে তাহারা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, নীরজা অরণ্য-পালিত হইয়াও তাহাদের সেই ভীমমূর্ত্তি, সেই কঠোর কটাক্ষ দেখিয়া কেমন শিহরিয়া উঠিল—বস্থও সভয়ে তাড়াতাড়ি উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা কে?" কিন্তু এই সময় চকিতের ন্যায় এক ব্যক্তি নীরজাকে শূন্যে তুলিয়া লইল এবং দুইজন বস্থকে গিয়া ধরিল। তাঁহারা ইহাতে চমকিত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন-কিন্তু সেই নির্জ্জন বনে সে চীৎকার কে শুনিবে? দেখিতে দেখিতে আর এক ব্যক্তি বস্ত্রখণ্ড দ্বারা নীরজার মুখ বন্ধ করিয়া দিল, তখন নীরজাকে ক্রোড়ে লইয়া অপর জন দ্রুতবেগে পলায়ন করিল। নীরজা হস্ত পদ ছুঁড়িয়া বল প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু সেই বলবান ব্যক্তির হস্ত-পেষিত হইয়া তাহা করিবারও ক্রমে তাহার শক্তি রহিল না। নীরজাকে লইয়া একজন দস্যু পলায়ন করিল—আর তিন জন মিলিয়া সেই বলপ্রকাশকারী কাঠুরিয়া স্ত্রীলোককে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল। পরে তাহারা চারিজন আবার মিলিত হইয়া, দ্রুতগতিতে জঙ্গল ছাড়াইয়া নদীতীরে উপস্থিত হইল। নদী-তীরে একখানি নৌকা প্রস্তুত ছিল, তাহাতে উঠিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল, নৌকা চলিতে লাগিল। তখন তাহারা বালিকার মুখ হইতে বন্ধন মোচন করিল, কিন্তু অনেক ক্ষণ বস্ত্র দ্বারা মুখ—নাসিকা আবদ্ধ থাকায়—বালিকা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, বস্ত্র খুলিয়া তাহারা দেখিল—বালিকা অজ্ঞান। তখন মুখে জল সিঞ্চন করিতে করিতে কিছুক্ষণ পরে তাহার জ্ঞান উদ্রেক হইল। তখন নীরজা চারি দিক চাহিয়া

দেখিল—ব্যাকুল ভাবে তাহাদের সেই ক্ষুদ্র কুটীরটি দেখিবার জন্য চাহিয়া দেখিল—কিন্তু কোথায় সেই কুটীর; তাহার পরিবর্ত্তে দেখিল সে এক অপরিচিত স্থানে অপরিচিতের মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে। তখন তাহার মনের ভাব কি হইল, বলিবার নহে। তাহার সমস্ত পূর্ব্বঘটনা নিমেষে স্মরণ হইল, বালিকা আবার চীৎকার করিয়া উঠিল, অমনি একজন হস্ত দ্বারা তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "এখন চীৎকারে কোন ফল নাই, চীৎকার করিলেই মুখ বাঁধিয়া দিব, কিন্তু ভালয় ভালয় চলিলে কিছু বলিব না" নীরজা বুঝিল, তাহারা যাহা বলিতেছে তাহা সত্য, দেখিল, দস্যুরা তাহার উপর অত্যাচার করিলে কথা কহিবার লোক এখানো কেহই নাই, তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে—এরূপ স্থলে বলপ্রকাশ না করাই কর্ত্তব্য। নিরুপায় বালিকা তখন অগাধ সমুদ্রে পড়িয়া ভাবিতে লাগিল। রাত্রি ক্রমে গাঢ়তর হইয়া আসিল—যাহারা দাঁড় টানিতেছিল তাহারা ছাড়া আর সকলে নিদ্রিত হইল—কেবল একজন মাত্র নীরজার প্রহরীরূপে নৌকার প্রকোষ্ঠ-দ্বারে রহিল, কিন্তু সেও অনেক ক্ষণ বসিয়া বসিয়া সেইথানে কাপড় পাতিয়া শুইল। কিছুক্ষণ হইলে তাহাকে নিদ্রাগত ভাবিয়া নীরজা আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিয়া নৌকার গবাক্ষে মুখ সংলগ্ন করিয়া নদীর দিকে চাহিয়া রহিল। হৃদয়ের তখন তাহার সেই ভয়ানক অবস্থা, কত যে প্রচণ্ড ঝটিকা তখন তাহার মনে বহিয়া যাইতেছিল, হৃদয়ে যে কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত, তাহা বর্ণনাতীত। কি প্রকারে এই দস্যু-হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারে, একে একে কত উপায় ভাবিল, কিন্তু কোনটাই ফলপ্রদ হইবে মনে হইল না। ক্রমে ক্রমে দেখিল, তাঁহার আশা নাই, ভরসা নাই, নিকটে পিতা নাই, এই দস্যুদের হস্তে একাকী নিরুপায়। নীরজা শিহরিয়া উঠিল, নীরজার ভাবিতেও আর শক্তি রহিল না। নীরজা তখন সেই নৌকা-গবাক্ষ হইতে নদীতে ঝাঁপ দিবার সঙ্কল্প করিয়া, প্রথমে পরীক্ষার নিমিত্ত আস্তে আস্তে তাহার উপর উঠিয়া বসিয়া পদদ্বয় নির্গত করিয়া দিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রহরী তখনো ঘুমায় নাই—সে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সকল দেখিতেছিল, সে তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া গবাক্ষের নিকট হইতে নীরজাকে টানিয়া আনিল। দস্যু-হস্ত-স্পর্শে শিহরিয়া উঠিয়া ছিন্ন লতিকার ন্যায় নীরজা সেই নৌকামধ্যে শুইয়া পড়িল। দারুণ কষ্টে অশ্রুরাশি উথলিয়া উঠিল—বালিকা অনেক ক্ষণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন দুর্ব্বল হইয়া সেই থানেই ঘুমাইয়া পড়িল।

নবম পরিচ্ছেদ—দূরে নৌকা।

শ্রান্ত ক্লান্ত, মানসিক কষ্টে অবসন্ন—বালিকা নিদ্রার ক্রোড়ে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম

ল ইতেছিল, সহসা সে নিদ্রা ভঙ্গ হইল,—কাহার কঠিন হস্ত-স্পর্শে বালিকা চমকিত হইয়া জাগিয়া উঠিল। চারি দিক চাহিয়া দেখিল সব অন্ধকারময়, ঘুমাইবার সময় নৌকায় যে আলো জ্বলিতেছিল তাহাও নিবিয়া গিয়াছে, নিস্তব্ধময় রজনীর ভয়ঙ্কর ভাব অনবরত দাঁড়ের ঝপ ঝপ শব্দে আরো বৃদ্ধি করিয়া তুলিতেছে, তাহা হইতেও ভয়ানক——তাঁহার শিয়রে বসিয়া একজন মনুষ্য তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতেছে। অন্ধকারে সেই মনুষ্যের মূর্ত্তি নীরজা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল না, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে সহসা শিয়রে মনুষ্য দেখিয়া সে চীৎকার করিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তখনি দস্যুদিগের সেই নিষেধ-বাক্য মনে পড়িল, নীরজা অমনি থামিয়া গেল। যে ব্যক্তি তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়াছিল সে মৃদুস্বরে বলিল "ভয় নাই—আস্তে কথা কহিও, আমি তোমাকে ইহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিব ঠিক করিয়াছি।" যখনি নীরজা ভাবিতেছিল তাহার আশা-ভরসা কিছুই নাই—সে অকূল পাথারে ভাসিয়াছে, তখনি রক্ষার কথা শুনিয়া তাহার যেন কিছু আশ্বাস জন্মিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা দূর হইল, সে ব্যক্তির কথায় অবিশ্বাস হইল। নীরজা সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে? এখানে যে প্রহরী ছিল কোথায় গেল? তুমি আমাকে কি প্রকারে রক্ষা করিবে?" সে বলিল "আমিই সেই প্রহরীর কার্য্যে আসিয়াছি, আমি এ নৌকার একজন দাঁড়ি—তোমার দুর্দ্দশায় দয়া হইয়াছে। আমার কথামত কাজ করিলে তোমাকে ইহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারি।" নীরজা বলিল "আমি নিরুপায়, যদি তোমার প্রতারণার ইচ্ছা থাকে তাহা হইলেও আমি মরিব, এখানে থাকিলেও আমি মরিব, এরূপ স্থলে তোমার কথাই শুনিব।—কি করিতে হইবে?" সে বলিল "এখন কিছুই করিতে হইবে না—তুমি কেবল পলায়নের চেষ্টা দেখিও না—পরে আমি কোন ভদ্রলোকের গোপনে সাহায্য লইয়া তোমাকে উদ্ধার করিব। কিন্তু যাহা বলি বিশ্বাস করিয়া কাজ করিও।" নীরজা সে কথায় সম্মত হইল, তখন দাঁড়ি সেখান হইতে গিয়া নৌকার দ্বারদেশে শুইয়া রহিল। ক্রমে দিন যাইতে লাগিল, প্রত্যহই নীরজা উদ্ধারের জন্য লালায়িত হইতে লাগিল। ক্রমে দুই তিন দিনের মধ্যে নৌকা এলাহাবাদ আসিতে লাগিল। যে দাঁড়ি নীরজাকে আশা দিয়াছিল, সে তীরে খাদ্য দ্রব্য কিনিতে নামিল, সুতরাং নৌকা তীরে লাগাইয়া অন্যেরা তাহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাঝি খাদ্য সামগ্রী লইয়া নৌকায় উঠিয়া নীরজাকে চুপে চুপে বলিল "আর ভয় নাই, কিছুক্ষণ মধ্যেই একখানি নৌকা তাহার উদ্ধারের জন্য আসিবে।" নীরজার আনন্দ ধরিল না—সে সেই আকাঙ্ক্ষিত সময়ের জন্য বড়ই অধীর হইয়া পড়িল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, একটু একটু মেঘ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সেই আঁধার গবাক্ষ হইতে তাহার উদ্ধার জন্য নৌকা আসিতেছে কি না, নীরজা

দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রত্যেক নৌকাকেই সে এই নৌকার দিকে আসিতে দেখিল। দেখিতে দেখিতে সত্য সত্যই একখানি নৌকা তীর-বেগে নৌকার নিকট আসিয়া ইহার গতিরোধ করিল, ভয়ে মাঝিরা নৌকা থামাইল, অমনি একটি ভদ্র যুবা লম্ফে এ নৌকায় উঠিয়া আসিলেন। ঘন ঘন বন্দুকের শব্দে ভীত হইয়া এ নৌকার লোকেরা তাঁহার সহিত বিবাদ করিল না—কে কোথায় লুকাইল, কে কোথায় পালাইল তাহার ঠিকানা রহিল না। সুতরাং বিনা আয়াসে যুবা নৌকামধ্যে নীরজার নিকট আসিলেন। নৌকার দীপালোকে নীরজা সেই যুবাকে চিনিতে পারিল, নীরজা দেখিল—যামিনীনাথই তাঁহার উদ্ধারকারী। যামিনীনাথও তাঁহাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন "তুমি নীরজা! এস আমার সঙ্গে এই বোটে শীঘ্র এস।" উদ্ধার হইয়া আহ্লাদে নীরজার কথা কহিবার শক্তি ছিল না—তিনি নিঃশব্দে যামিনীনাথের সঙ্গে সঙ্গে গিয়া তাঁহার বোটে উঠিলেন। তখন সে বোট আবার ছাড়িয়া দিল।

আসাম ও উড়িষ্যা।

আসাম প্রদেশ ইংরাজ রাজ্যের প্রান্তসীমাতে অবস্থিত, উড়িষ্যা বঙ্গ সাগরের উপকূলবর্ত্তী। ইহার মধ্যে প্রকাণ্ড বাঙ্গলা প্রদেশ, কিন্তু উড়িষ্যার রীতি নীতি যে রঙ্গে অনুরঞ্জিত, আসামের রীতি নীতিও অনেক পরিমাণে তদনুরূপ বলিয়া বোধ হয়। কোন্ কোন্ বিষয়ে আসামের সঙ্গে উড়িষ্যার সাদৃশ্য আছে, তাহা প্রথমতঃ পর্য্যালোচনা করিব। কোন দেশের সহিত কোন দেশের তুলনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ ভাষা, সঙ্গীত ও দেশীয় আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মের বিষয় সমালোচনা করিলেই কোন্ কোন্ স্থানে ঐক্য আছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিব। আসামের ভাষা সংস্কৃত মূলক; উৎকল ভাষারও প্রকৃতি তাহাই, কিন্তু প্রায় ইহার প্রত্যেক দেশেই এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত আছে যে, তাহার সহিত সংস্কৃত বা অপর কোন মূল ভাষার ঐক্য নাই। সেই সকল শব্দের সদৃশ শব্দ যদি অন্য কোন প্রদেশে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে কোন সময়ে যে এই প্রদেশ দ্বয়ের ঘনতর সম্বন্ধ ছিল এপ্রকার সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নহে। আসামের এবং উৎকলের কএকটি শব্দ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। পাঠকগণ ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, উক্ত ভাষা দ্বয়ে কেমন সেই সাদৃশ্য আছে।

আসামীয়া	বাঙ্গালা,	উড়িয়া।
চরই	পক্ষী	চরই
গাধোওয়া	স্নান	গাধোওয়া
বাট ১	পথ	বাট
ঔ (টঙ্গা)	টক্	ঔ
অমৃতা ২	পেঁপে	অমৃত ভাণ্ডার
দাদা	কাকা	দাদা
গছ্	গাছ	গাছ
কানিয়া	আফিং খোর	কনিয়া
থির ৩	দাঁড়ান	ঠিয়া
নেউল ৪	বেজি	নেউল
ধুয়াপাত ৫	তামাক	ধুয়া পত্র
বেয়া	মন্দ	বয়া

১। উপরে প্রদর্শিত শব্দ দ্বারা দেখা যাইতেছে, আসামের প্রচলিত শব্দ সমূহের সহিত উড়িষ্যার শব্দনিচয়ের যত যোগ আছে, বাঙ্গালার তত নাই। এমন কি, বাট, ঔ, অমৃতা, মিয়া, ধুয়াপাত, দাদা, বেয়া প্রভৃতি শব্দের অর্থ বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালীরা বুঝিতে অক্ষম, কিন্তু ইহার কোন একটী শব্দ উড়িষ্যা বা আসামের একতর অধিবাসীরা বুঝিতে পারিবে এতৎভিন্ন সঙ্গীতেও বিশেষ ঐক্য দৃষ্ট হয়।

২। যাঁহারা উড়িয়াদিগের ভজনালয়ের সঙ্গীত একবারও শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারা যদি আসামের নাম-ঘরে গমন করেন, তাহা হইলে দর্শক স্থিরসিদ্ধান্ত করিবেন, উড়িয়াদিগের ভজন-সঙ্গীত যে স্বরে যে ভাবে গীত হয়, আসামের নাম-ঘরেও তাহার অনুকৃতি আছে। আসামের প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে যেমন একটী করিয়া নাম-ঘর আছে উড়িষ্যায়ও প্রায় প্রত্যেক পল্লীতে এক একটী ভাগবৎ-ঘর আছে। আসামের লোকেরা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যার পর নাম-ঘরে গমন করে এবং নাম সংকীর্ত্তন আদি করিয়া থাকে; উৎকলের অধিবাসীরাও সন্ধ্যার পর ভাগবৎ ঘরে যাইয়া ভাগবৎ পাঠ ও নাম সংকীর্ত্তন করে।

ভাওনা। ইহা গীতাভিনয় বিশেষ। ইহা কি পরিচ্ছদ, কি রাগরাগিণী, এবং কি অঙ্গভঙ্গী সকল বিষয়েই উড়িয়া যাত্রার অনুরূপ। যিনি একবার উড়িয়া যাত্রা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি, যদ্যপি আসামের ভাওনা দর্শন করেন তাহা হইলে হঠাৎ এই ভাওনাকে উড়িয়া যাত্রা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেও করিতে পারেন। ভাওনার গীত ও পরস্পরের কথোপকথনের মধ্যে উড়িয়া ভাষার ক্রিয়াপদ এবং ছন্দের মিলন দৃষ্ট হয়।

৩য়। উড়িষ্যার প্রধান তীর্থ পুরুষোত্তম। আসামের প্রধান তীর্থ কামক্ষ্যা। এই উভয় তীর্থ স্থানের নামই নীলাচল, বোধ হয় পুরীর মন্দিরকে আদর্শ করিয়া কামক্ষ্যা, বড় পেটা এবং শিবসাগরের মন্দির প্রস্তুত হইয়াছে। পুরীর মন্দিরের গঠন-প্রণালী যেরূপ, শিবসাগরের শিবমন্দির ও কামক্ষ্যা দেবীর মন্দিরের গঠন-প্রণালীও অবিকল সেইরূপ। পুরীর মন্দিরে যেরূপ কুরুচি-প্রসূত ছবি দৃষ্ট হয়, কামক্ষ্যা দেবীর মন্দিরেও তাহার অভাব নাই।

১।২।৩।৪।৫ চিহ্নিত কথাগুলি সুস্পষ্ট সংস্কৃত মূলক সুতরাং এই কথাগুলি দ্বারা লেখকের মত ঠিক সমর্থিত হইতেছে না। ভা সং।

৪র্থ। আসামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভিন্ন অপর জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের মধ্যে বাল্যবিবাহ আছে সত্য কিন্তু তাহা নামমাত্র বিবাহ। রজোদর্শনের পূর্ব্বে নব বিবাহিত দম্পতীর পরস্পর সাক্ষাৎ করিবার বিধি নাই। যদি কোন কারণ বশতঃ উভয়ের দেখা হয়, তাহা হইলে ঐ সন্দর্শনকে মহা পাপ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। উড়িষ্যাতেও তাহাই। আসামে ব্রাহ্মণ ও কলিতা অর্থাৎ কায়স্থ ভিন্ন ইতর জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই; বিধবাবিবাহ আছে। উড়িষ্যাতে করণ— অর্থাৎ কায়স্থদিগের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই, এবং বিধবা বিবাহও নাই। কিন্তু ইতর জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে।

৫। আসামে জাতিভেদের বড় আঁটা আঁটি। যাঁহারা গোড়া হিন্দু তাঁহারা সন্তান না হওয়া পর্য্যন্ত স্ত্রীর অন্নও গ্রহণ করেন না। ভ্রাতা ভগিনী আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতির ত কথাই নাই; এবং পিতার অন্নও পরান্নের মধ্যে গণ্য। অনেক আসামস্থ গোড়া হিন্দুদিগকে স্বপাকে খাইয়াই মরিতে হয়। আবার, যাঁহারা ভক্ত, তাঁহাদের আহার আর অপর লোক দেখিতে পান না। ঘরের দ্বার আবদ্ধ করিয়া রন্ধন করা হয়, আর্দ্র বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আহার করা হয়। উড়িষ্যার কোন কোন স্থলে গোড়া হিন্দুদিগেরও এইরূপ দুর্দ্দশা। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করুন, উড়িষ্যার রীতি নীতি ও ধর্ম্ম ভাবের সহিত আসামের রীতি নীতি ও ধর্ম্ম ভাবের কতদূর সৌসাদৃশ্য আছে।

১ম। বাঙ্গালার সহিত আসাম বা উড়িষ্যার রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের ঘনিষ্ঠ যোগ নাই। কিন্তু উড়িষ্যা ও আসামের আচার, রীতি নীতি ও ব্যবহারে ঈদৃশ ঘনিষ্ঠ যোগ কেন? এখন ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম, আমি যে সকল কারণ নির্দ্ধারণ করিব, তাহার মুলে ইতিহাস অপেক্ষা অনুমানের প্রভুত্বই অধিকতর থাকিবে। যাহাদিগের ইতিহাস নাই অনুমানই তাহাদিগের ঐতিহাসিক তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা। মনুষ্যের ভ্রম পদে পদে। আমরা যে এই বিষয়ে ভ্রমে পতিত হইব না, তাহা কে বলিতে পারে। বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ যে প্রকার ইতিহাস-তত্ত্বানুসন্ধিৎসু তাহাতে আশা করা যায়, এই বিষয়ে যদি আমাদের ভ্রমও থাকে তাহা সংশোধিত হইবে এবং আসাম ও উড়িষ্যার মৌলিক সম্বন্ধ আবিষ্কৃত হইতে পারিবে?

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে আসামে বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব ছিল। তাহার পর ক্রমশঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের হ্রাস হইয়া শঙ্করদেবের সময়ে বিলুপ্ত হয়। যখন আসামে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচলিত, তখন উড়িষ্যাতেও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্ম দ্বারা এই প্রদেশ দ্বয়ের যে একতা বন্ধন ছিল না তাহা কে বলিতে পারে?

২য়। চৈতন্য যখন পুরীতে বাস করেন তখন আসামের ধর্ম্মসংস্কারক শঙ্করদেবও পুরীতে বাস করিতেন। চৈতন্যের সহিত শঙ্করদেবের সখ্যতা ছিল। চৈতন্য প্রেমিক ভক্ত ছিলেন, শঙ্কর দেবও প্রেমিক ভক্ত

ছিলেন। চৈতন্যের শিষ্যেরা ভক্তির অনুগত ও সঙ্কীর্ত্তন-প্রিয় ; শঙ্করদেবের শিষ্যেরাও ভক্তির অনুগত ও সঙ্কীর্ত্তন-প্রিয়। চৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না ; শঙ্কর দেবও জাতিভেদের সমাদর করিতেন না। চৈতন্যও কৃষ্ণ ও হরিনাম-প্রিয় ; শঙ্করদেবও কৃষ্ণ ও হরিনাম-প্রিয়। বিচার করিতে হইলে, চৈতন্য ও শঙ্করদেবের মত ও ভাবেতে অনেক ঐক্য আছে। চৈতন্যের শিষ্যের নিকট চৈতন্য অবতার ও ভক্তি-শাস্ত্র-প্রকাশক। শঙ্করদেবের শিষ্যেরাও বলেন শঙ্করদেব অবতার ও ভক্তি-শাস্ত্র-প্রকাশক। কেহ কেহ বলেন শঙ্করদেব চৈতন্যের শিষ্য, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। শঙ্করের গ্রান্থবলী বা চৈতন্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থ সমূহের মধ্যে, শঙ্কর চৈতন্য-ভক্ত বা পরম ভক্ত বলিয়া উল্লেখ নাই। ভক্তমালা—গ্রন্থে নানা দেশীয় ভক্ত ও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত আছে। কিন্তু ভক্তমালা গ্রন্থকার শঙ্করদেবের কোন উল্লেখ করেন নাই। যদি শঙ্করদেব চৈতন্যের শিষ্যই হইবেন তবে শঙ্করদেবের গ্রন্থেও চৈতন্যের নাম বা চৈতন্যের গ্রন্থেও শঙ্কর দেবের নাম উল্লিখিত থাকিবার সম্ভাবনা ছিল, তবে ইহাই হইতে পারে, উভয়েই সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক, সুতরাং ঈর্ষা * বশতঃ কেহ কাহারও প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। কিন্তু শঙ্করদেব এবং চৈতন্যদেব যে সমকালবর্ত্তী ও শঙ্করদেব যে পুরুষোত্তম তীর্থে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন, তাহার সংশয় নাই। শঙ্করদেব উড়িষ্যা হইতে আসামে আগমন করিয়া তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। শঙ্করদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের নাম মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম। আসামের অধিকাংশ অধিবাসীরাই এই ধর্ম্মাবলম্বী। বোধ হয়, শঙ্করদেবের সহিত উড়িষ্যা হইতে অনেক উড়িয়া শিষ্য আসিয়াছিল, কালক্রমে তাঁহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব বিলোপ পাইয়াছে, কিন্তু শঙ্করদেবের জন্মভূমি নওগাঁও জিলায় দুইটী গ্রাম উড়িয়া গাঁও নামে প্রসিদ্ধ। সম্ভবতঃ এই গ্রামদ্বয়ে শঙ্করদেবের উড়িয়া শিষ্যেরা বাস করিত। ইহা বলা বাহুল্য যে বৌদ্ধ দিগের মধ্যেই শঙ্করদেব স্বীয় নূতন ধর্ম্ম প্রথমতঃ প্রচার করেন, সুতরাং তাঁহাকে কেবল ধর্ম্ম প্রচার করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে হয় নাই। যাহাতে ধর্ম্মের সহিত রীতি নীতি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখন এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিলে বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না যে, শঙ্করদেব তাঁহার সাধন-ভূমি আসাম প্রদেশের রীতি নীতি সংশোধন এবং ধর্ম্মসংস্কার উড়িষ্যার অনুকরণে করিয়াছিলেন। সুতরাং মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের সহিত আসাম দেশবাসীদিগের যোগই, আসাম ও উড়িষ্যার রীতি নীতি ও ভাবের সহিত সংযোগের প্রধান কারণ।

চৈতন্যদেবের জীবনচরিত সকলেই জানেন, কিন্তু শঙ্করদেব সভ্য সমাজে অপরি-

* ইহা চৈতন্য ও শঙ্করের পক্ষে অযোগ্য বোধ হইল। ভাঃ সঃ

চিত। তাহার জন্য শঙ্করদেবের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিয়াই এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

১৩৭১ শকে আসামস্থ নওগাঁও জিলার অন্তর্গত বড়দোয়া গ্রামে শঙ্করদেবের জন্ম হয়। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কুসম্বর ভুঁয়া। শঙ্করদেব কন্দলী নামক গুরুর নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা ও ভাগবতাদি পাঠ করেন। শঙ্করদেব প্রথমতঃ পুরুষোত্তম তীর্থে গমন করিয়া তথায় দীর্ঘকাল বাস করেন। পরে বৃন্দাবন্ দর্শন করিয়া স্বীয় মাতৃভূমি আসাম দেশে আগমন করেন এবং স্বীয় ধর্ম্মমত সাধারণের নিকট প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পুস্তক ও গীত রচনা, মৌখিক উপদেশ এবং পৌরাণিক বিবরণ-সম্বলিত নাটক অভিনয় দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। সেই নাটকাভিনয়কে এদেশীয়েরা ভাওনা বলে।

শঙ্করদেব একপ্রকার বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিতে হইবে। তাঁহার উপাস্য দেবতা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ বা হরি। কিন্তু জাতিভেদের প্রতি তাঁহার বড় দৃষ্টি ছিল না। গাড়ো, কাছারৎ, কলিতা প্রভৃতি সকলকেই স্বীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। শঙ্করের রচিত ধর্ম্মপুস্তকে প্রায়ই উড়িষ্যা ভাষার ক্রিয়াপদ ও নানা প্রকার শব্দ ব্যবহার আছে। শঙ্করদেবের সহিত মাধব দেও নামক একজন শিষ্য তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন। ইঁহারা যে নিরাপদে ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। প্রথমতঃ ইহাঁরা কাছারৎ ও বৌদ্ধদিগের কর্ত্তৃক উপদ্রুত হন, পরে কতিপয় ব্রাহ্মণেরা কুচ্‌বিহারের রাজা নরনারায়ণের নিকট অভিযোগ করে, কিন্তু কিছুতেই শঙ্করদেবকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। কুচ্‌বিহারের রাজা নরনারায়ণ, শঙ্করদেবের ধর্ম্মভাব ও চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু শঙ্করদেব, অসচ্চরিত্র রাজাকে শিষ্য করিবেন না বলিয়া, নরনারায়ণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। শঙ্করদেবের প্রচারিত ধর্ম্মে নামসাধন ও নামসংকীর্ত্তন ভিন্ন আর কোন অনুষ্ঠান নাই। শঙ্করদেব শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন ; আবার চৈতন্যেরও সেই মত। শঙ্কর শিষ্যদিগকে এই প্রকার উপদেশ দিতেন, যথা—

"দেবী দেউ ন করিবা সেউ ;
গৃহেও না যাবা, প্রসাদ না খাবা, ভক্তির হব ব্যভিচার।
"এক দেউ, এক সেউ,
এক বিনা নাহি কেউ"।

দেব দেবীর সেবা করিবে না ; দেব-গৃহে যাইবে না, দেবতাদিগের প্রসাদ ভক্ষণ করিবে না, ইহা করিলে ভক্তির ব্যভিচার হইবে।

এক দেবতা, সুতরাং এক দেবতাকেই সেবা কর, এক দেব ভিন্ন অন্য কিছুই নাই।

শঙ্করদেবের বংশ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে। মাধবদেবের বংশের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ১৪৯০ শকে ১১৯ বৎসর বয়সে শঙ্করদেবের মৃত্যু হয়। রাঃ কুঃ ভঃ

কাতন্ত্র-জীবনী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কাত্যায়ন।

(ভারতী, ২য় ভাগ ৪১২ পৃষ্ঠার পর)

ভুবন-বিখ্যাত বৈয়াকরণ কাত্যায়ন-বররুচিমুনি সম্বন্ধে, আমরা এই প্রকরণে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। সর্ব্ববর্ম্মা কাতন্ত্রের কৃৎ-সূত্র প্রণয়ন করেন নাই; বিবুদ্ধিদের হিতের জন্য কাত্যায়ন তাহা প্রণয়ন করিয়াছেন; (১) এতন্নিবন্ধনই কাতন্ত্রের সহিত কাত্যায়নের জীবন-গত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে।

সুপ্রসিদ্ধ মেদিনী-কোষ-প্রণেতা মেদিনীকর এবং কাতন্ত্র-পঞ্জিকা-প্রণেতা ত্রিলোচন দাস, কাত্যায়নের অপর নাম বররুচি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (২)। সুসেন কবিরাজ, রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতি কাতন্ত্র-টীকাকার মহাত্মাগণের মতে কাত্যায়ন মুনি বররুচি-শরীর পরিগ্রহ করিয়া এই শাস্ত্র (ব্যাকরণ) প্রণয়ন করিয়াছেন। (৩)

উল্লিখিত বিভিন্ন মত গ্রহণ করিলে ইহা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে প্রতীতি হয় যে, যে কাত্যায়ন মুনির অপর নাম বররুচি। তিনিই কাতন্ত্র-কৃৎ-সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। এই কাত্যায়ন, কাত্যায়ন-বররুচি নামেই প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে অনেক কাত্যায়ন আবির্ভূত হইয়াছিলেন (১) বোধ হয় এই বৈয়াকরণ কাত্যায়নকে অন্যান্য কাত্যায়ন হইতে বিশেষ করিবার জন্য লোকে ইহার দুইটী নাম একত্র সংযোগ করিয়া "কাত্যায়ন-বররুচি"

(১) বৃক্ষাদিবদমীরূঢ়াঃ কৃতিণা ন কৃতা কৃতঃ। কাত্যায়নেন তে সৃষ্টা বিবুদ্ধিপ্রতিবুদ্ধয়ে। দুর্গসিংহ।

(২) "কাত্যায়নো বররুচৌ বিশেষে চ মুনেঃ পুমান্।" মেদিনী, ন চতুষ্কম্, শ্লোঃ ১৭৭। তর্হি কেন কৃতা ইত্যাহ কাত্যায়নেন বররুচিনা ত্রিলোচন-কৃত "কাতন্ত্র পঞ্জিকা।"

(৩) "কাত্যায়ন মুনির্ব্বররুচিশরীরং পরিগৃহ্য শাস্ত্রমিদং কৃতবান।" সুসেন কবিরাজ-কৃত "কলাপ-চন্দ্র" এবং রঘুনাথ শিরোমণি কৃত "কলাপ তত্ত্বার্ণব" দ্রষ্টব্য।

(১) দশরথ রাজারও কাত্যায়ন নামে এক মন্ত্রী ছিলেন;—"সুযজ্ঞ আর গৌতম, জাবালি কাত্যায়ন, মার্কণ্ডেয় দীর্ঘ আয়ুশালী মহর্ষি কাশ্যপ,—এই দ্বিজ ছয় জন ছিলেন রাজার মন্ত্রী বুদ্ধি বিচক্ষণ। শ্রীযুক্ত-রাজকৃষ্ণ রায় অনুবাদিত রামায়ণ বালকাণ্ড ১৮ পৃষ্ঠা। বুদ্ধদেবের এক শিষ্যের নাম কাত্যায়ন ছিল। আমাদের মতে পালী ভাষায় ব্যাকরণ প্রণেতাও এক স্বতন্ত্র কাত্যায়ন। (২য় ভাগ ভারতীর ৪১১। ৪১২ পৃষ্ঠা।)

আখ্যা প্রদান করিয়াছে (১)। এই কাত্যায়ন, পাণিনি ঋষি প্রণীত ভুবনাদ্বিতীয় ব্যাকরণের বার্ত্তিক প্রণয়ন করিয়া এতাদৃশ দক্ষতা ও বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে তাহা দেখিলে, এখনো পৃথিবীস্থ সকলকেই আশ্চর্য্য হইতে হয়। এক মাত্র পাণিনির বার্ত্তিক প্রণয়নেই ইহা নিঃসন্দেহ রূপে সপ্রমাণ হইতেছে যে কাত্যায়ন একজন অসাধারণ ব্যাকরণ-সমালোচক এবং অদ্বিতীয় বৈয়াকরণ। ইনিই পাণিনির সর্ব্ব প্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান সমালোচক। ইহার পূর্ব্বে কেহই পাণিনি-সূত্রের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই (২)। আমাদের দুর্ভাগ্য বশত এই বৈয়াকরণ-প্রধান এবং মুনিপ্রধান কাত্যায়নের জীবনী সম্বন্ধে দুই একটী অবিশ্বাস্য ও অস্বাভাবিক উপাখ্যান ব্যতীত সকলি অতীত কালীয় ঘোরান্ধকারে পর্য্যুষিত হইয়াছে।

কথাসরিৎসাগর নামক গ্রন্থে (৩) কাত্যায়ন মুনি সম্বন্ধে এই উপন্যাস লিখিত আছে,—পুষ্পদন্তক নামক একজন মহাদেবের অনুচর, পার্ব্বতীর অভিশাপে নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া, বৎস্য-রাজধানী কৌশাম্বীতে সোমদত্ত নামক জনৈক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্ম হওয়া মাত্রেই এই আকাশবাণী হয় "এই বালক শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষ (পণ্ডিত বিশেষ) হইতে নানা বিদ্যা শিক্ষা করিবে। ব্যাকরণ শাস্ত্রে লোকসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। এবং শ্রেষ্ঠ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবে বলিয়া লোক সমাজে বররুচি নামে পরিচিত হইবে (২)।"

(১) অতি পূর্ব্বকাল হইতে এদেশে এ প্রথা বিলক্ষণ প্রচলিত আছে—যথা রাম বলরাম, কখন বংশের নাম যোজনা করিয়া ও তজ্জাতীয় নাম হইতে বিশেষ করা হইয়াছে—ভৃগুরাম। এইরূপ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, কৃষ্ণার্জ্জুন ইত্যাদি।

(২) বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "পাণিনি" ১১৩ পৃষ্ঠা।

(৩) প্রথিত আছে, পূর্ব্বে কাত্যায়ন মুনি বৃহৎ কথা নামে সপ্তলক্ষ শ্লোকাত্মক গ্রন্থ রচনা করিয়া কাণভূতিকে শ্রবণ করাইয়াছিলেন *। পরে সোমদেব ভট্ট খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে অনন্ত পত্নী সূর্য্যবতীর চিত্তবিনোদনার্থ উহার সারাংশ সংকলন করিয়া "কথা সরিৎ সাগর নামক আখ্যায়িকা প্রচারিত করেন। (বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পাণিনি নামক প্রস্তাব ২২।২৩ পৃষ্ঠা)

(২) "একঃ শ্রুতিধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষাদবাপ্স্যতি। কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি॥ নাম্না বররুচির্লোকে যত্তদস্মৈ হি রোচতে। যদ্ যদ্ বরং ভবেৎ কিঞ্চিদিত্যুক্ত্বা বাগুপারমৎ॥"

* কেহ গুণাঢ্যকে বৃহৎ কথার রচয়িতা বলেন "বৃহৎকথা ভূতভাষাখ্যো গ্রন্থভেদঃ। ভূতভাষাপ্রণেতাসৌ গুণাঢ্যঃ কবিরুচ্যতে॥" (বাসবদত্তা টীকায় নরসিংহ বৈদ্যধৃত বাক্য) "ভূতভাষা কবিবৃন্দে গুণাঢ্যশ্চাপি কীর্ত্তিতঃ" উত্তরতন্ত্র।

উপন্যাস অনুসারে মলয়বান নামক পুষ্পদন্তের জনৈক বন্ধু শাপগ্রস্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে প্রতিষ্ঠান নগরে ব্রাহ্মণ কুলে জন্মিয়া গুণাঢ্য নামে অভিহিত হয়েন।

("উইলসন সাহেব কৃত" সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ১ম খণ্ড ১৬২ পৃষ্ঠা)

এই কাত্যায়ন বাল্যকাল হইতে অসাধারণ স্মৃতিশক্তি-সম্পন্ন ছিলেন। তিনি একদা কোন দৃশ্য-কাব্যের অভিনয় সন্দর্শন করিয়া তাঁহার মাতার নিকট আনুপূর্ব্বিক বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ইঁহার উপনয়ন হওয়ার পূর্ব্বেই ব্যাড়ির মুখে কোন প্রাতিশাখ্য শুনিয়া তাহা সমুদয় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। পরে বর্ষের নিকট নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়া ছিলেন এবং পাণিনিকে ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় তর্কে পরাস্ত করিয়া ছিলেন কিন্তু মহাদেবের, বিশেষ কৃপায় পাণিনিই পরে তর্কে বিজয়ী হয়েন। কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধশান্তির জন্য পাণিনি ব্যাকরণ পাঠ করিয়া তাহার সংশোধন এবং অসম্পূর্ণতা বিদুরিত করেন। কাত্যায়ন পরিশেষে মগধরাজ নন্দের মন্ত্রী হইয়া ছিলেন। (১)

মতান্তরে কথাসরিৎ-সাগরের এই গল্পটী অন্যরূপে বিবৃত আছে। তাঁহাদের মতে কথাসরিৎ-সাগরের চতুর্থ অধ্যায়ে যেরূপ উপন্যাস লিখিত হইয়াছে তাহার সারাংশ এই—কাত্যায়ন-বররুচি কাণভূতির নিকট উপকোষার সহিত আপনার বিবাহের পরবর্ত্তী ঘটনা এইরূপ বিবৃত করিতেছেন,—"বর্ষের ছাত্রদের মধ্যে পাণিনি নামে একজন অতি স্থূলবুদ্ধি ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন। এই পাণিনি বিদ্যাশিক্ষায় অপারগ হওয়াতে স্বশ্রেণী হইতে দূরীকৃত হন। তাহাতে তিনি নিতান্ত অপমানিত হইয়া হিমালয়ে যাইয়া বিদ্যালাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেন। পাণিনির কঠিন তপে তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাহাকে সমস্ত বিদ্যার নিঃশ্রেণীস্বরূপ এক খানা ব্যাকরণ অর্পণ করেন। পাণিনি এইরূপে সফলমনোরথ হইয়া প্রকাশ্য বিচারে আমাদিগকে আহ্বান করেন, এক সপ্তাহ কাল তুমুল বিচার হয়, আট দিনের দিন একটী ভয়ানক শব্দ সমুত্থিত হইয়া আমাকে এবং আমার সহযোগীগণকে একেবারে হতবুদ্ধি ও বিচার্য্য বিষয়ে দিশাহারা করিয়া ফেলে, সুতরাং পাণিনি বিজয়ী হইলেন। এই সময় হইতে পাণিনি-ব্যাকরণ, আমার এবং ইন্দ্রদত্ত প্রভৃতির ব্যাকরণের গুণাতিক্রমী হইয়া উঠে এবং আমাদের বাধ্য হইয়া পাণিনির প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়।" (১)

উল্লিখিত উপাখ্যান অনুসারে কাত্যায়নকে মগধাধিপতি সুবিখ্যাত নন্দের মন্ত্রী দেখিয়া তাঁহাকে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দির লোক বলিয়া বিবেচনা হইতে পারে।

(১) মোক্ষ মূলরের উদ্ধৃত কিম্বদন্তী।

(১) উইলসন সাহেবের "সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ" ১ম খণ্ড ১৬৯—১৭০ পৃষ্ঠা। ইহার সহিত গোল্‌ডষ্টুকরের আখ্যায়িকার কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য আছে। গোল্‌ডষ্টুকারের পাণিনি ১৮৪। ৮৫ পৃষ্ঠা।

আমরা কাত্যায়ন সম্বন্ধীয় উপাখ্যান বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের পাণিনি হইতে প্রায় উদ্ধৃত করিলাম। এই প্রস্তাবে তাঁহার "পাণিনি" নামক প্রস্তাব হইতে অনেক সাহায্য পাইব।

কেননা নন্দ সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রগুপ্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে মগধ রাজ্যের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, ভারত ইতিহাস অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত খ্রীঃ পূঃ ৩১৫ অব্দে মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই জন্যই মোক্ষমূলর কাত্যায়নকে খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দির পরার্দ্ধের লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন(১)। অধ্যাপক বোৎলিঙ্ক্ প্রায় উক্ত মতের অনুকরণ করিয়াছেন(২)। কিন্তু আমরা তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। এমন কি তাঁহারা যে "কথা সরিৎসাগরের" উপন্যাসের প্রতি বিশ্বাস করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সেই উপন্যাসই আমাদের নিকট নিতান্ত অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। কেননা, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সর্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য কাতন্ত্র (সন্ধি, চতুষ্টয় ও আখ্যাত) খ্রীষ্টের জন্মের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রণয়ন করিয়াছেন। কাত্যায়ন কাতন্ত্রে কৃৎ প্রকরণে অভাব দেখিয়াই কৃৎসূত্র বিরচন করেন। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যখন কাতন্ত্র সাধারণ্যে কথঞ্চিৎ প্রচরদ্রূপ হইয়াছিল এবং তাহাতে কৃৎসূত্রের অভাব লক্ষিত হইয়াছিল তখনি কাত্যায়ন সেই অভাব দূরীকরণ জন্য কাতন্ত্রের কৃৎসূত্র প্রণয়ন করেন। যদি কাত্যায়ন সর্ব্ববর্ম্মার কাতন্ত্র প্রণয়নের ন্যূনকল্পে ১০।১৫ বৎসর পরেও কৃৎসূত্র প্রণয়ন করিয়া থাকেন তবে তিনি প্রায় খ্রীষ্টের জন্মের সমকালে যে কৃৎসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মনে কর, কাত্যায়ন নিতান্ত বৃদ্ধ বয়সে ৮০।৯০ কি ১০০ বৎসর বয়সেও যদি কাতন্ত্রের কৃৎসূত্র প্রণয়ন করিয়া থাকেন তবে তিনি খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দি কিম্বা তদপেক্ষা ২০।৩০ বৎসরের পূর্ব্বের লোক কখনি হইতে পারেন না। সুতরাং আমরা মোক্ষমূলার অথবা বোৎলিঙ্কের যুক্তির উপর কি প্রকারে আস্থাবান হইব। এবং কথাসরিৎসাগরের উপন্যাসের উপর নির্ভর করিয়া প্রায় সার্দ্ধদ্বিশত বৎসরের পূর্ব্বকালীন মহারাজ নন্দের মন্ত্রী বলিয়াই তাঁহাকে কি প্রকারে স্বীকার করা যাইতে পারে? আমরা বেস্ বলিতে পারি কাত্যায়ন মুনি ছিলেন বলিয়াই প্রায় ৩৫০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী নন্দের মন্ত্রিত্ব পদে নিযুক্ত থাকিয়া পরে ৩৫০ বয়ঃক্রম সময়ে কাতন্ত্রের কৃৎসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন—একথা এখন কেহই সম্ভবপর বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। এখন যদি আমরা কাত্যায়নের আবির্ভাব কাল খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির প্রারম্ভ কিম্বা তাহা অপেক্ষা কয়েক বৎসর পূর্ব্ব সময় বলিয়া নির্দ্দেশ করি, বোধ হয়, তাহা হইলে নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইব না।

অনেকে আপত্তি করিতে পারেন যে, যখন রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে "অভিমন্যু, চন্দ্র এবং অন্যান্য ব্যাকরণ প্রণেতা-

(১) মোক্ষমূলার কৃত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" নামক গ্রন্থ ২৪২—২৪৩ পৃষ্ঠা।

(২) Vide Otto Boethlingk's Pánini p. xiv.-xviii.

গণকে পতঞ্জলির মহাভাষ্য স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে আদেশ করেন(১) তখন কাত্যায়ন কি প্রকারে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির লোক? কেননা বোৎলিঙ্কের মতে এই অভিমন্যু খ্রীষ্টের শত বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন(২)। পতঞ্জলীর মহাভাষ্য অবশ্য তাহারো পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে এবং যখন কাত্যায়নের বার্ত্তিকের অনেক অংশ লইয়া পতঞ্জলি প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তখন কাত্যায়নের বার্ত্তিক যে আবার পতঞ্জলির মহাভাষ্যের পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। এমত হইলে কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়েই খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দিরও অনেক পূর্ব্বের লোক হইয়া পড়েন সুতরাং আমরা উপরে কাত্যায়নের আবির্ভাব কাল যেরূপ নির্ণয় করিয়াছি তাহাতে প্রমাদ লক্ষিত হইতেছে। কিন্তু আমরা বোৎলিঙ্কের মত ছাড়িয়া অভিমন্যুর সময় নিরূপণ সম্বন্ধে মতান্তরের আশ্রয় লইলে আমাদের নির্দ্দিষ্ট কাল সম্বন্ধে আর কোন গোল থাকে না। বোৎলিঙ্কের মতে অভিমন্যু খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দের পূর্ব্বে কাশ্মীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু শাস্ত্রপ্রবীণ লাসেন প্রাচীন মুদ্রা সকল পর্য্যালোচনা করিয়া অভিমন্যুর রাজত্বকাল ৪০ ও ৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী ভাগকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৩)।

(১) এবং (২) Vide Otto Boehtlingk's Pánini p. xiv-xviii.

(৩) Indian Antiquities, vol. ii. p. 413.

গোলডষ্টুকর এবং মোক্ষমূলার লাসেনের মতকেই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন(১)। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাত্যায়ন খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির প্রারম্ভে কিম্বা তাহা অপেক্ষা কএক বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন; এখন সে কথার এইরূপ সামঞ্জস্য হইতে পারে——বাল্যাবধি কাত্যায়নের যে প্রকার অসীম বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তির বিষয়ে উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার পক্ষে ন্যূনাধিক ত্রিংশত বর্ষ বয়সে মহোদধিসম অগাধ বৈয়াকরণিক জ্ঞান লাভ করা একরূপ তুচ্ছ কথা। আমরা তাঁহার পঞ্চাশত বর্ষ বয়ঃক্রম কাল (খ্রীঃ পূঃ ৪০ কি ৫০ অব্দ) পর্য্যন্ত বার্ত্তিক প্রণয়ন সময় নির্দ্দেশ করিলাম(২)। তৎপর আর ত্রিশ বৎসর (খ্রীঃ পূঃ ৪০।৫০ হইতে ৬০।৭০ অব্দ) মধ্যে পতঞ্জলিকৃত পাণিনি—মহাভাষ্যের কাল নির্দ্দেশ করিলাম। পতঞ্জলির ন্যায় একজন জগৎবিখ্যাত মহর্ষির লেখনী হইতে যে মহাভাষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে সেই মহাগ্রন্থ খ্রীঃ পূঃ ৬০। ৭০ অব্দ হইতে ৫০ কি ৬৮ অব্দ পর্য্য ১০০

(১) গোলডষ্টুকরের "পাণিনি" ৮৫-৮৬পৃষ্ঠা। মোক্ষমূলার কৃত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ২৪৩ পৃষ্ঠা।

(২) মোক্ষমূলারের মতে কাত্যায়নের বার্ত্তিক খ্রীঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দির প্রারম্ভে বিরচিত হয়। (Müller's An. San. Lit. p. 244.) কাতন্ত্রের সহিত যে কাত্যায়নের সম্পর্ক আছে ইহা জানিলে বোধ হয়, মোক্ষমূলার এ ভ্রম করিতেন না।

বৎসরে সমস্ত ভারতে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর দেশে আসিয়া তাঁহার আদেশে প্রচারিত হইবে আশ্চর্য্য কি? কৃৎসূত্র প্রণয়ন জন্য কাতন্ত্রের সহিত কাত্যায়নের যে জীবনগত সম্পর্ক আছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে কাত্যায়ন যে খ্রীষ্টের জন্ম সময়ে জীবিত ছিলেন তৎসম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং অভিমন্যুর রাজত্বকাল নিরূপণ সম্বন্ধে যে বোৎলিঙ্ক বিষম ভ্রম করিয়াছেন তাহা একটুকু বিবেচনা করিলে সম্যক্ প্রতীতি হয়। কেননা যদি বোৎলিঙ্কের মতানুযায়ী অভিমন্যুর রাজত্বকাল খ্রীঃ পূঃ শতবৎসর পূর্ব্বে হয় তবে পতঞ্জলীর মহাভাষ্য ইহার অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে এবং কাত্যায়নের বার্ত্তিক ইহাপেক্ষাও পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে, অতএব যখন কাত্যায়ন কাতন্ত্রের কৃৎসূত্র প্রণয়ন করেন তখন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ২০০ কি ২৫০ বৎসর হইয়াছিল, ইহা কি কেহ বিশ্বাস করিবেন?

গোল্ড্‌ষ্টুকারের মত গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ কাত্যায়ন এবং মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিকে সমসাময়িক লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন(১) এবং কেহবা কাত্যায়নকে পতঞ্জলির আচার্য্য বলিয়া থাকেন (২) এ উভয় কথাই আমাদের নিকট নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। আমরা উপরে বলিয়াছি কাতন্ত্রের কৃৎসূত্র প্রণয়ন জন্য কাতন্ত্রের সহিত কাত্যায়নের জীবনগত যে সম্বন্ধ আছে তাহাতে প্রমাণ হইতেছে, যে তিনি খ্রীষ্টের জন্মের সমকালে জীবিত ছিলেন। আবার কাতন্ত্রের সহিত তাঁহার জীবনগত সম্বন্ধ থাকাতে ইহাও বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইতেছে যে তিনি খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির প্রারম্ভে অথবা তাহা অপেক্ষা কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির যে আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহা একরূপ ঠিক হইল। যখন পতঞ্জলির মহাভাষ্য ৫০ কি ৬০ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ অভিমন্যুর আদেশে তদ্দেশে প্রচারিত হয় তখন অবশ্য ঐ মহাভাষ্য ভারতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। আজ কাল মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে যদিচ কোন গ্রন্থের উৎকর্ষাপকর্ষ ৫বৎসরেই সমুদায় স্থানে নির্ব্বাচিত হইতে পারে কিন্তু পূর্ব্বকালে রত্নসম অমূল্য গ্রন্থও ৬০।৭০ বৎসরের ন্যূনে জনসমাজে সমালোচিত হইয়া তাহার উত্তমাধমতা সাধারণ্যে নির্ব্বাচিত হইত না; সুতরাং পতঞ্জলির মহাভাষ্য যে অভিমন্যুর সময় অপেক্ষা ন্যূন কল্পে ৮০।৯০ বৎসরের পূর্ব্বের গ্রন্থ তাহার সন্দেহ নাই। এবং মহাভাষ্য কাত্যায়নের বার্ত্তিকের পরকীয় গ্রন্থ হইলেও যে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির পরার্দ্ধে রচিত হইয়াছে তাহার কোন ভুল নাই(১) সুতরাং কাত্যায়ন এবং পতঞ্জলি

(১) Chamber's Encyclopædia "Katyana" এবং ঐতিহাসিক রহস্যের বররুচিশীর্ষক প্রস্তাব।

(২) Chamber's Encyclopædia vol. vii. p. 232, "Panini."

(১) কাহারও কাহারও মতে পতঞ্জলি

যে খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির অনেক সময় উভয়ে একত্র বর্ত্তমান ছিলেন তাহা স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইতেছে।

যখন উভয়েই এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন তখন কাত্যায়ন পতঞ্জলির আচার্য্য হইবেন তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি? কিন্তু কেহ কেহ একথায় আপত্তি করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন "কাত্যায়ন পাণিনির এক জন মহা প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক স্থলে পাণিনির দোষ প্রদর্শনার্থই তদীয় বার্ত্তিক প্রণীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে পতঞ্জলির ভাষ্য অন্ত-বিধ উপাদানে নির্ম্মিত হইয়াছে। পতঞ্জলি অনেক স্থলে পাণিনিকে কাত্যায়নের প্রবল আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিতে যথা সাধ্য চেষ্টা পাইয়াছেন। বস্তুতঃ বার্ত্তিক-কৃত আক্রমণ নিবারণ জন্য পতঞ্জলির মহাভাষ্য একটী সুদৃঢ় দুর্গ স্বরূপ। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলিতে গুরুশিষ্য-ভাব নিবদ্ধ থাকিলে পতঞ্জলি কদাপি কাত্যায়নের মতবিরোধী হইয়া পাণিনির পোষকতা করিতেন না। অন্তেবাসী কখনও পূজ্যপাদ আচার্য্যকে সাধারণ্যে অপদস্থ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া ঈদৃশ বিচারমল্লতা প্রদর্শন করেন না(১)। কাত্যায়নকে পতঞ্জলি সাধারণ্যে কি অপদস্থ করিলেন তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রবেশ করিল না। কাত্যায়ন পাণিনির যে সকল ভ্রম ধরিয়াছেন পতঞ্জলি শুধু তাহা অভ্রান্ত প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন; ইহা ব্যতীত তিনি কাত্যায়নকে কোন স্থলে একটুকু নিন্দা অশ্রদ্ধা বা অমান্য করেন নাই। এমত হইতে পারে, কাত্যায়ন পাণিনির যে যে ভ্রম ধরিয়াছেন তাহাতে পতঞ্জলির সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি মুনিপ্রধান পাণিনির মতকেই অধিক সারবান জ্ঞান করিয়া তাঁহার মতকেই বজায় রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। গুরুর বাক্যে এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হওয়াই বা অসম্ভব কি? মনে কর যদি তোমার আচার্য্য, মহর্ষি বেদব্যাস অথবা তৎতুল্য কোন এক জন জগৎবিখ্যাত মুনির একটী ভ্রম দেখাইয়া দেন সে ভ্রমটী প্রকৃত হইলেই তাহা তোমার নিকট ভ্রম বলিয়া বিশ্বাস হইবে? তোমার ইহা অবশ্য মনে হইবে যে মহর্ষি বেদব্যাসের কখনই ভ্রম হয় নাই—ইহা আমার আচার্য্যেরই বুঝিবার ভ্রম। যদি সেই বিষয়টী তোমার লোকসমাজে প্রকাশ করিতে হয় তবে তোমার নিজের বিশ্বাসই নানা যুক্তি দ্বারা বজায় রাখিতে যত্ন করিবে;——অন্যথা তুমি পর-মত-গ্রাহী। এমত স্থলে তোমার আচার্য্যের বাক্যে উ-

খ্রীঃ পূঃ ১৯৫-১৯২ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। (বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "পাণিনি প্রস্তাব" ১৩৭ পৃষ্ঠা) অধ্যাপক রামকৃষ্ণ গোপাল ভণ্ডারকরের মতে মহাভাষ্যের কোন অংশের রচনাকাল খ্রীঃ পূঃ ১৪৪-১৪২ অব্দ। (ঐ) ইহাদের যুক্তি যে ততদুর ঠিক নহে তাহা উপরের কথা গুলি পাঠ করিলেই সম্যক প্রতীতি হইবে।

(১) বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পাণিনি নামক প্রস্তাব ১১৫ পৃষ্ঠা।

পেক্ষা করিয়া তোমার নিজ বিশ্বাসকে লোকসমাজে প্রকাশ করিলে বলিয়াই কি আচার্য্যকে অপদস্থ করিলে? বিবেচকগণ ইহার উত্তরে অবশ্যই বলিবেন "না"। এখন মনে, কর তুমি যে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তোমার আচার্য্যের বাক্যানুসারে ব্যাসদেবের কথাকে ভ্রম বলিয়া লোকসমাজে প্রকাশ করিতে সাহসী হও নাই——পতঞ্জলিরও পাণিনির উপর সেই (ব্যাসদেবের ন্যায়) বিশ্বাস ছিল সুতরাং তিনি তাঁহার আচার্য্যের (কাত্যায়নের) কথায় পাণিনির যুক্তি ভ্রম বলিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হন নাই কেননা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস পাণিনির বাক্য বেদবাক্য তুল্য; তাঁহার বাক্যে যাহার সন্দেহ হয় তাহারই বুঝিবার ভ্রম। কথিত আছে মহাত্মা শুকদেব, তদীয় জনক মহর্ষি বেদব্যাসের যুক্তিতে সন্দিহান হওয়াতে রাজর্ষি জনকের নিকট গমন করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন (১)। তই বলিয়াই কি তিনি ব্যাসকে সাধারণ্যে অপদস্থ করিয়াছিলেন? কখনি নহে। এরূপ উদাহরণ আরো অনেক দেখান যাইতে পারে বাহুল্য ভয়ে ক্ষান্ত থাকিলাম। "কাত্যায়ন-বাক্য-সন্দিগ্ধ—পতঞ্জলি ঋষি-প্রধান পাণিনির বাক্য সমর্থন করিয়া কাত্যায়নকে সাধারণ্যে অপদস্থ করিয়াছেন" এরূপ সন্দেহ করা বাস্তবিকই বিবেচক-বহির্ভূত কার্য্য। অতএব পতঞ্জলি অনেক স্থলে কাত্যায়নের বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া পাণিনির বাক্যের প্রতিবাদ করেন নাই, কেবল এই মাত্র কথাতেই তিনি (পতঞ্জলি) কাত্যায়নের শিষ্য নহেন ইহা বলা যাইতে পারে না। যখন কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি উভয়ে অনেক কাল একত্র বর্ত্তমান ছিলেন তখন "কাত্যায়ন পতঞ্জলির আচার্য্য ছিলেন" একথায় অসম্ভব কি?

কথা সরিৎ সাগরের উপন্যাস অনুসারে কাত্যায়ন এবং পাণিনি এক সময়ের লোক। বোধ হয় এই জন্যই কোন কোন মহাত্মা কাত্যায়ন এবং পাণিনিকে সম-সাময়িক লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; (১) আমরা এ কথা লইয়া অধিক আন্দোলন করিব না—তাহাতে আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাবের (কাত্যায়নের জীবনীর) কোন অংশেরই কিছু পোষকতা করিবে না। আমরা যে উপরে কাত্যায়নের আবির্ভাব কাল খ্রীঃ পূঃ প্রথম শতাব্দির প্রারম্ভ কিম্বা তাহা অপেক্ষা কিছু পূর্ব্বের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি; কোন মহাত্মাই এমন ভাল প্রমাণ দিতে পারেন

(১) যোগবাশিষ্ট রামায়ণ দ্রষ্টব্য।

(১) মোক্ষ মূলারকৃত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য" ১৩৮, ৩০৩ এবং ২৪৪ পৃষ্ঠা, তিনি অন্য স্থলে বলিয়াছেন "যদি কাত্যায়ন ও পাণিনির আবির্ভাবের সময় এক না হয়। ঐ ১৮৪ পৃষ্ঠা।

শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রকাশিত সিদ্ধান্তকৌমুদীর "পাণিনীয়াগমকালাদি নির্ণয়" প্রস্তাবে—তিনি বলেন ব্যাড়ি (ব্যালি) পাণিনি ও কাত্যায়ন এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন।

নাই যে তাহার বলে উহার ব্যতিক্রম করিতে সাহসী হইতে পারি। কাত্যায়নের সময় সম্বন্ধে কেহই তেমন অভ্রান্ত প্রমাণ দেন নাই; (১) প্রত্যুত যিনিই কাত্যায়ন লইয়া কিছু আন্দোলন করিয়াছেন কেবল স্বীয় অনুমানের আশ্রয় লইয়াই প্রায় তাহার পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কাতন্ত্রের কৃৎ-সূত্র প্রণয়ন জন্য কাতন্ত্রের সহিত কাত্যায়নের জীবনগত সম্পর্ক থাকাতে তদীয় কালনিরূপণ সম্বন্ধে যেমন একটী প্রমাণ আবিষ্কার হইয়াছে; আমরা যত দূর জানি; তাহাতে ইতি পূর্ব্বে ঈদৃশ কোন সটীক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই—অনেকেই কাত্যায়নের আবির্ভাব-কাল-নির্ণয় লইয়া বিশেষ সন্দিহান আছেন; (২) তবে আমাদের বিশ্বাস পাণিনি কাত্যায়ন হইতে অনেক পূর্ব্বের লোক; কেহ বলেন পাণিনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৮০০ ও ৭০০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন (১)। আমাদের বিবেচনায় পাণিনি ইহা অপেক্ষাও অনেক পূর্ব্বের লোক (২)।

---

(১) শ্রীযুক্ত মণিয়ারউ ইলিয়ম্‌স্ সাহেব বলেন "কাত্যায়ন সম্ভবতঃ পাণিনির এক শত বৎসর পরে বিশ্বসংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

Indian Wisdom, p. 176. রজনী বাবুও এই মত অধিক সঙ্গত বলিয়াছেন। "পাণিনি" নামক প্রস্তাব ১১৬ পৃষ্ঠা।

(২) শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত বলেন "যদিও কাত্যায়নের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কোন বিশ্বাস্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তথাপি দৃঢ়তা সহকারে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, তিনি পাণিনির পরে ও পতঞ্জলির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন।" পাণিনি নামক প্রস্তাব ১১৬ পৃষ্ঠা। মোক্ষমূলারও যে কাত্যায়নের আবির্ভাব সময় সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন তাহা তাঁহার এই কথাতেই বুঝা যাইবে "যদি কাত্যায়ন ও পাণিনির আবির্ভাবের সময় এক না হয়"। মোক্ষমূলারের "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য" ১৮৪ পৃষ্ঠা।

(১) বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত পাণিনি নামক প্রস্তাব ৯১ পৃঃ।

(২) বাবু রামদাস সেন মহাশয়ের মতেও পাণিনি, রজনী বাবুর নির্দ্দিষ্ট কাল হইতে অনেক পূর্ব্বে আবির্ভাব হইয়াছিলেন; ৫ম ভাগ বান্ধব ৫ম সংখ্যা পাণিনি শীর্ষক প্রস্তাব দেখ।

বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়, পাণিনি যে কাত্যায়ন হইতে অনেক পূর্ব্বের লোক-সে সম্বন্ধে যে যুক্তি দিয়াছেন তাহার সারাংশ এই—কাত্যায়ন পাণিনি প্রণীত ৩৯৯২ কিম্বা ৩৯৯৩ সূত্রের মধ্যে সার্দ্ধ সহস্র অপেক্ষাও অধিক সূত্রে ভ্রম প্রদর্শন করিয়া স্বীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন চারি সহস্র বার্ত্তিক বিরচিত হইয়াছে। এই চারি সহস্র বার্ত্তিকের মধ্যে আবার ন্যূনতঃ দশ সহস্র বিশেষ স্থল পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে পাণিনির গ্রন্থে এত দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে অথচ সেই পাণিনি পূর্ব্বকাল হইতে এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণ বলিয়া গণ্য; ইহার কারণ এই যে পাণিনি কাত্যায়ন হইতে বহু পূর্ব্বের লোক। পাণিনি এত পূর্ব্বের লোক যে, তাঁহার সময় যে সকল বৈয়াকরণিক নিয়মাদি শুদ্ধ রূপে পরিগণিত ছিল কালে কাত্যায়নের সময়ে তাহাই অপ্রচলিত

কাত্যায়ন পাণিনির ব্যাকরণের বার্ত্তিক (১) ও সর্ব্ববর্ম্মাকৃত কাতন্ত্র ব্যাকরণের কৃৎ-সূত্র প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত শুক্ল যজুর্ব্বেদ সংহিতার মাধ্যন্দিন প্রাতিশাখ্য, সর্ব্বানুক্রমণী ও বৈদিক কল্প-সূত্র কাত্যায়নের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ (২)। ইহা ব্যতীত কাত্যায়ন-কৃত আর কি কি গ্রন্থ আছে জানা যায় নাই। আমরা বোধ করি কাত্যায়ন কাতন্ত্রের কৃৎ-সূত্রই সর্ব্বশেষে প্রণয়ন করেন।

মোক্ষমূলরের মতে কাত্যায়ন পাণিনির সম্পাদক এবং সমালোচক (১) তিনি বলেন পাণিনি-প্রণীত গ্রন্থ অপেক্ষাও বার্ত্তিকে (কাত্যায়নের) সংস্কৃত শাস্ত্রাভিজ্ঞতার উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে (২)। কাত্যায়নের কাতন্ত্র-কৃৎ-সূত্রের রচনা সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, সর্ব্ববর্ম্মার সূত্রের ন্যায় তাঁহার সূত্রগুলি তত সরল ভাষায় লিখিত হয় নাই। আর দুর্গসিংহ যদি বক্তব্য প্রণালীতে সূত্রের মধ্যে মধ্যে অতিরিক্ত সূত্র সংযোগ করিয়া না দিতেন তবে তাঁহার কৃতের মধ্যেও সর্ব্ববর্ম্মার অন্যান্য অংশের ন্যায় অনেক অভাব থাকিয়া যাইত।

কেহ এই কাত্যায়ন বররুচি ও "প্রাকৃত প্রকাশ" নামক প্রাকৃত-ব্যাকরণ-প্রণেতা বররুচিকে অভিন্ন লোক বলিয়া জ্ঞান করেন(৩)। আমাদের নিকট এই যুক্তি তাদৃশ প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয় না। পুরাতত্ত্বানুসারে "প্রাকৃত প্রকাশ" প্রণেতা বররুচি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতর রত্ন ছিলেন (৪)। নবরত্নের প্রতিষ্ঠাতা খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন এবং ইনি হর্ষ বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত(৫)।

ও অশুদ্ধ রূপে পরিণত হইয়াছিল। তিনি এতদুপলক্ষে গোল্‌ড্‌ষ্টুকরের নিম্নের চারিটি যুক্তি সমর্থন করিয়া বিশেষ পাণ্ডিত্য সহকারে বিভিন্ন মত গ্রহণানন্তর স্বীয় মত আরো দৃঢ় করিয়াছেন।—

১ম। পাণিনির সময়ে যে সমস্ত বৈয়াকরণিক নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহা কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত অথবা অবিশুদ্ধ হইয়া উঠে।

২য়। পাণিনির সময়ে শব্দ সমূহ যে যে অর্থদ্যোতক ছিল, তাহা কাত্যায়নের সময়ে অনেক রূপান্তরিত হইয়া যায়।

৩য়। পাণিনি-প্রযুক্ত শব্দার্থ সমূহ কাত্যায়নের সময়ে অপ্রচলিত ছিল।

৪র্থ। কাত্যায়নের সময়ে যে শব্দশাস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পাণিনির সময়ে পরিজ্ঞাত ছিল না। বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "পাণিনি" নামক প্রস্তাব ৩৪-৬৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(১) বার্ত্তিকমিতি। সূত্রেঽনুক্ত-দুরুক্ত-চিন্তাকরত্বং বার্ত্তিকত্বম্। নাগোজীভট্ট কৃত কৈয়ট-টীকা।

(২) এই কয়খানি গ্রন্থ বৈয়াকরণ কাত্যায়ন বররুচি মুনি প্রণীত কিনা তৎসম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে।

(১) মোক্ষমূলারকৃত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য" ৩০৩ এবং ১৩৮ পৃষ্ঠা।

(২) ঐ গ্রন্থ ২৪১ পৃষ্ঠা।

(৩) মোক্ষমূলার কৃত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" ১৭৬ পৃষ্ঠা।

(৪) সাহিত্য প্রবেশ (৯ম সংস্করণ)

(৫) "পাণিনি" নামক প্রস্তাব ১১৪ পৃষ্ঠা।

কিন্তু কাতন্ত্র-কৃৎসূ-ত্রপ্রণেতা কাত্যায়ন বররুচি প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচি হইতে অনেক পূর্ব্বের লোক সুতরাং এই দুই বররুচিকে অভিন্ন বররুচি বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

গোল্‌ডষ্টুকর এবং বেবের কাত্যায়নকে পূর্ব্বদেশবাসী বলিয়াছেন (১)। অধ্যাপক রামগোপাল ভণ্ডারকর মহাভাষ্যের একটী বাক্যের বলে কাত্যায়নকে দাক্ষিণাত্য-বাসী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছেন (১)। আমাদিগের নিকট পরবর্ত্তী মতই প্রামাণ্য বলিয়া বোধ হয়।

(শ্রী যাঃ——)

সাগর-সঙ্গমে।

(গাথা)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

দামিনীর সেই যাতনা নেহারি,
রজনী গভীর হইলে পরে,
ধীরে ধীরে ধীরে সেই সে কুটীরে
শুইতে রোহিণী আসিল ঘরে।

শুয়ে শুয়ে ভাবে দামিনীর কথা,
বিজয়েরও কথা কোথায় যাবে,
ভূত ভবিষ্যত উলটি পালটি
এ কথা সে কথা কত কি ভাবে।

কোথায় [illegible] তার প্রতাপ-কুমার
বিবাগী হইয়ে গিয়াছে চোলে,
কতই ভাবিছে—আপনি ভাবিছে—
আপনি ভাসিছে নয়ন-জলে।

ক্রমে ক্রমে হ'ল ঘুম আকর্ষণ,
ক্রমেতে নয়ন মুদিত হয়—
যেথানের হাত রহিল সেথানে,
মুখরা রোহিণী আর সে নয়।

---

(১) গোল্‌ডষ্টুকরের "পাণিনি ২০৫ পৃষ্ঠা।

(১) "যথা লৌকিক বৈদিকেষু" (যেমন লোকপ্রসিদ্ধ ও বেদপ্রসিদ্ধ বাক্য) পতঞ্জলি এই বার্ত্তিক লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন প্রিয়তদ্ধিতা হি দাক্ষিণাত্যাঃ। যথা লোকে বেদেচেতি প্রয়োক্তব্যে যথা লৌকিক বৈদিকেষ্বিতি প্রযুঞ্জতে (দাক্ষিণাত্যবাসীগণ তদ্ধিতপ্রিয়। লোকে এবং বেদে প্রয়োগের স্থলে ইহারা লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগ করিয়া থাকে) "পাণিনি" নামক প্রস্তাব ১১৭ পৃষ্ঠা। পতঞ্জলি কর্ত্তৃক কাত্যায়নের বার্ত্তিকের উপর এইরূপ পরিহাস দেখিয়া কাত্যায়ন যে দাক্ষিণাত্যবাসী ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রতীতি হয়।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিধবা রোহিণী
ভীষণ স্বপনে পেতেছে ত্রাস,
কণ্টকিত কায় ঘাম বোহে যায়,
আটকি পড়িছে অধীর শ্বাস।

দেখিল স্বপনে—বিকট শ্মশানে
কে যেন ধরিয়ে এনেছে তায়,
ঘোরা দ্বিপ্রহরা—অমার শর্ব্বরী,
প্রগাঢ় জলদে আকাশ ছায়।

ধূমে ধূমময় দিগন্ত ব্যাপিয়ে,
জমাট বেঁধেছে আঁধার হেন—
নিশ্বাস প্রশ্বাস টানিতে ফেলিতে,
পাঁজরের খীল আটকে যেন।

থেকে থেকে শুধু চপলা চমকে,
ঝলকে ঝলকে শ্মশান ভায়,
হেথায় জ্বলিছে চিতার আগুন,
হোথায় আলেয়া গড়ায়ে যায়।

হেথায় শিবার অশিব নিনাদ,
হোথায় গৃধিনী গরজে ঘোর,
আকাশের তলে দলে দলে দলে
উড়িছে শকুনী—তুলিছে শোর।

সুদূরে সেথায় মড়ার মাথায়
পিশাচের দল বসিয়া হাসে,
সে হাসি শবদে দিগন্ত বিদরে—
রোহিণী থমকি দাঁড়ায় ত্রাসে।

সহসা সমুখে শ্মশান-কালিকা—
—জলদ-প্রতিমা দিল যে দেখা,
ধবক ধবক জ্বলে নয়নে অনল,
লোল রসনা রুধির মাখা।

পলকে পলকে বিজলী দলকে
খরসান সেই কৃপাণ তাঁর,
তমো-তেজোময় মূরতি নেহারি
সভয়ে রোহিণী অসাড় প্রায়।

চিতার উপরে দাঁড়ায়ে কালিকা,
কহিতে লাগিলা গভীর রবে—
সপ্তসিন্ধু যেন প্রলয়ের দিনে
একত্রে গরজি উঠিল সবে—

নীরব হইল শকুনী গৃধিনী,
শৃগালের দল বিবরে পশে—
পুষ্কর-গর্জ্জনে নীরব শ্মশানে
কালিকা কহিতে লাগিল শেষে—

"তুই রে রোহিণী, মথুরা-বাসিনী,
ভাবিস কি আমি চিনি না তোরে?
ভাবিস কি আমি জানি না শুনি না
বেড়াস তুই কি পাপের ঘোরে?"

নীরব রোহিনী—নিস্পন্দ রোহিনী—
বহে না হৃদয়ে রুধীর ধার,
কৃতজোড় করে কাঁপিছে রোহিনী—
যেন সে রোহিণী নহে রে আর।

পলক না যেতে, পিছন হইতে
প্রতাপের কেশ বাঁ হাতে ধ'রে—
শ্মশান-ঈশ্বরী রোহিণী-সমুখে
ধরিল তাহারে সরোষ-ভরে—

কহিলা—"এই না বিধবা রোহিণী—
এই না বিবাগী প্রতাপ তোর?
পাপীয়সী ওরে, ইহারি না তরে
মজিলি আপনি পাপেতে ঘোর?"

"হাঁগো ওগো দেবী, নৃমুণ্ডমালিকে,
এই সে বিবাগী প্রতাপ মোর"—
কহিতে লাগিল বিধবা রোহিণী
বহিতে লাগিল নয়নে লোর।——

"এই যে বিবাগী প্রতাপ আমার,
ইহারি কারণে পাশরি সবে——
ভিখারিণী বেশে, ফিরি দেশে দেশে
সাগর-সঙ্গমে এসেছি এবে।

দাও মা গো দাও, শ্রীচরণে ধরি—
রোহিণীর দেবি মাথাটি খাও,
যুগান্তের পরে একবার ওরে
বিধবার কোলে ফেলিয়া দাও।"

যতই রোহিণী কহিতে লাগিল,
ততই কালিকা জ্বলিয়ে ওঠে,
লোল রসনা দোলে ঘন ঘন,
নয়নের কোণে আগুণ ছোটে।

কহিলা—"রোহিণী, দেখোছস্ তুই
খরসান অসি এই যে মোর—
হারি আঘাতে—একটি আঘাতে
দুখান করিব প্রতাপে তোর—

নিশাচরী ওরে, জানি আমি তোরে,
জানি তোর ওই কুটীল হৃদি—
এখনো বল্‌ছি বাঁচারে বিজয়ে—
নহিলে প্রতাপে এখনি বধি—

প্রতাপ, প্রতাপ! আমার সমুখে
বল্ দেখি তুই মনের কথা——
ভ্রমিছে বিজয় কাহার কারণে
মরমে পাইয়ে মরম ব্যথা?

বিজয়-ভগিনী বিজয়া কুমারী—
রূপে গুণে যেন কমলা প্রায়—
তুই কি চাস্‌নে রূপেতে মজিয়ে
ঘোর অপমান করিতে তায়?

তোরে কি তাহাতে বিজয় কুমার
বিশেষ শাসন করে নে শেষে—
মনের ঘৃণাতে মথুরা তেয়াগি
পশিলি প্রবাসে বিবাগী বেশে?

জানি না কি আমি, রোহিণী রাক্ষসী—
বিজয়ার প্রতি করিয়ে রিশ——
বিজনে গোপনে সরলা বাছারে
আদরের ছলে খাওয়ালি বিষ?

নির্দ্দোষী বালারে, পাপীয়সী ওরে!
কেমনে করালি গরল পান,—
আহা, সেই শোকে জননী তাহার
যমুনার জলে ত্যজিল প্রাণ!

জানি জানি আমি, বিজয় উপরে
প্রতিশোধ তোর লইতে শেষ—
বিজয়ের নামে কুরব রটনা
করিতে লাগিলি সকল দেশ।

এখনো কি তোর হয় নাই শেষ
দ্বেষ-ভরা সেই পিশাচ খেলা?
নাশিতে বিজয়ে—দামিনী বালারে—
এসেছিস্ তাই সাগর—বেলা?

দাঁড়া নিশাচরী—এর প্রতিশোধ
এখনই আমি দিব যে তোরে——
এই এ কৃপাণে বধিয়ে প্রতাপে
সঁপিব চিতার অনল ঘোরে!”

কহিতে কহিতে দেবীর নয়নে
জ্বলন্ত অনল-প্রবাহ ছোটে——
কৃপাণ আতসে বিজলি ঝলসে——
লোল রসনা দলকি ওঠে।

এলোকেশী-এলো-জটা-কেশ যেন
সরোষে বিছায় জলদ মত——
সরোষে ভীষণ চাহনী চাহিল
নৃমুণ্ড-মালার লোচন যত।

শুনিয়ে রোহিণী, দেখিয়ে রোহিণী—
পড়িল দেবীর চরণ তলে,
পাগলিনী প্রায়, অধীরে লুটায়,
ভাসায়ে চরণ নয়ন-জলে——

কহিতে লাগিল কাতর রোদনে—
“ঈশানি, কেন গো পাষাণী হেন—
বিধবা-তনয়ে বধিয়া, জননি,
বিধবার প্রাণ বধিবে কেন?

কি করিতে হবে, কহ ত্রিলোচনে,
এখনি সাধিব সকল কাজ——
বহুদিন পরে প্রতাপে আমার
নয়ন মেলিয়া হেরিনু আজ।”

বলিতে বলিতে নয়নে তাহার
ঝরিতে লাগিল অযুত ধারা,
মুখরা রোহিণী শ্মশানে লুটায়,
অসহ শোকেতে হইয়ে সারা।

শুনিয়ে ঈশানী কহে ক্রোধ-বাণী——
“চাস্ যদি ফিরে প্রতাপে তোর——
যা—তবে—যা—এই বেলা যা—
এই এ রজনী না হ’তে ভোর——

মহামায়া কাছে প্রকাশিয়ে সব
বলিবি তাঁহার চরণ ধোরে——
কহিস্ বিজয়-অবশ রটনা
কোরেছিলি তুই দ্বেষেরি ভরে’—

যা—তবে—যা—এই বেলা যা—
দামিনী-বিজয়ে মিলায়ে দে,
হেথায় জ্বলিছে দামিনী রূপসী——
তাপস কুটীরে জ্বলিছে সে।”

শুনিয়া আদেশ পাইয়ে পরাণ—
থমকে রোহিণী দাঁড়ায় সোরে—
কৃতযোড় করে কাঁপে থর থর,
ঝরঝর ঘাম পড়িছে ঝোরে।

"যা—চলে যা—" বলিয়ে কালিকা
অদর্শন হ'ল প্রতাপে লোয়ে,
সহসা লুকালো জলদ প্রতিমা——
নেহারে রোহিণী অবাক হোয়ে।

সহসা যেন রে শত শত চিতা
একাকার হোয়ে জ্বলিয়ে ওঠে,
লহরে লহরে আকাশ পাতালে
দাবানল যেন মাতিয়ে ছোটে।

সহসা যেন রে সকলি নিভিল,
আবার শ্মশান আঁধারময়,
শকুনী গৃধিনী ডাকিয়া উঠিল,
গভীর গরজে শৃগাল চয়।

অট্ট অট্ট হাস হাসে দানাদল,
ভীম নাদে ব্যোম বিদার প্রায়,
আচম্বিতে ভাঙ্গে রোহিণীর ঘুম,
নয়ন মেলিয়ে রোহিণী চায়—

পুনঃ আঁখি মোদে, পুনঃ ফিরে চায়,
এখনো ভাঙ্গেনি ঘুমের ঘোর,
"ওই যে শ্মশান,—এই যে বিছানা,
ওই যে কালিকা কুটীর মোর—

এই যে পাপীয়া গাহিছে প্রভাতী—
তবুও কেন রে শকুনী-রব
অস্ফুটো আভাসে পশিছে শ্রবণে—
আবার মিশায়ে যেতেছে সব।"

দুহাতে আবার রগড়ে নয়ন—
কট্‌মট্‌ ক'রে দুধারে চায়,
দুর্ব্বল, শিথিল, অবশ শরীরে
ঘামের শীতল লহরী ধায়।

সভয়ে রোহিণী করিল চীৎকার—
কে যেন তাহারে ফেলিল মেরে,
মহামায়া-দেবী দামিনীরে লোয়ে
আসিয়ে তাহারে যতনে ঘেরে।

উঠিল তখন জাগিয়ে রোহিনী,
থর থর থর কাঁপিছে কায়,
নীরস রসনা, স্খলিত বসনা—
ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ চোখে বিহ্বলা চায়।

"দেবী মহামায়া" কহিল রোহিণী—
"উঃ—কি স্বপন উঠিনু দেখে—
বাঁচাও বাঁচাও প্রতাপে আমার—
আনাও বিজয়ে হেথায় ডেকে।

কোন দোষ নাই সরল বাছার,
আমিই গভীর দ্বেষের ভরে
মিছামিছি তার কলঙ্ক রটিয়ে
খেদায়ে দিয়েছি তাপস-ঘরে।"

গভীর নিঃশ্বাস ফেলিয়ে রোহিণী
কহিল সকল আগের কথা,
শুনিতে শুনিতে মহামায়া দেবী
মরমে পাইল মরম ব্যথা।

উথলি উঠিতে লাগিল দামিনী,
বহিতে লাগিল হরষ ঢেউ—
"জানি জানি আমি বিজয়ের মত
আর কি জগতে আছে রে কি কেউ"।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হয়েছে প্রভাত ;—মৃদুল পবন
সাগরের সনে করিছে খেলা,
পথে ঘাটে আর নাহিক আঁধার,
আলোকিত এবে সাগর-বেলা।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা রাঙ্গা চিকন মেঘেতে
পূরব আকাশ হয়েছে লাল,
গগনে উড়িছে সাগর-কপোত,
বেলায় খেলায় হরিণী পাল।

হেথায় হোথায় বাঁধা ছিল তরী,
পাল তুলে তারা ছাড়িল সব,
মাঝিরা ধরিল সুখে সারী-গান,
বাতাসে উথলে সেই সে রব।

রোহিনীরে ডাকি মহামায়া কয়—
"যাও গো রোহিণী—হ'য়েছে ভোর,
যেথায় বিজয় তাপস-কুটীরে
ভাবিছে—কাঁদিছে যাতনে ঘোর—

আহা সে বিজয়—নিরাশ-হৃদয়,
কতই ফেলিছে নয়ন-বারি,
কতই না জানি অভিমান ভরে
ভাবিছে আমারে পিশাচী নারী—

আন' ডেকে তায়, দিব যে হেথায়
দামিনীর সনে বিবাহ তার,
চৌদ্দ বর্ষে ক'ল ব্রত উদ্‌যাপন,
সাগর-বেলায় না রব আর।"

শুনিয়া সকল—স্মরিয়ে সকল—
বিজয়ে ডাকিতে রোহিণী যায়,
এলো থেলো কেশ, পাগলিনী-বেশ,
সবেগে তাপস-কুটীরে ধায়।

এদিকে আসিয়ে দেবী মহামায়া
দামিনীরে কহে সোহাগ-ভরে,—
"আয় মা দামিনী, স্নেহের পুতলী—
আজিকে যতনে সাজাবো তোরে—

আজিকে আসিবে বিজয়-কুমার,
আজি আসিবে সে স্নেহের ধন,
আজি আমি তোরে বিজয়ের করে
সোহাগে সঁপিব ক'রেছি পণ।"

শুনিতে শুনিতে দামিনী-হৃদয়ে
রুধির-প্রবাহ মাতিয়ে ছোটে,
এ ভাব—ও ভাব—কত কি যে ভাব
একেবারে যেন উথলি ওঠে।

প্রকৃতে স্বপনে লাগিল সমর,
"সত্য কি বিজয় আসিবে ফিরে?
চিরদুঃখিনীর এই দুই আঁখি
আবার বিজয়ে দেখিবে কি রে?

সেই—সেই হাসি, মধুরিমা-রাশি,
সেই সে কেমন—কেমন ধারা,
সেই সে চপল নয়নের ছটা
হেরিব কি পুনঃ পাগল পারা?"

ভাবিতে ভাবিতে অপাঙ্গ হইতে
মৃদুল চিকন বিজলী ছোটে,
অধরে লুকানো অফুটো হাসিটি
থেকে থেকে যেন উজলি ওঠে।

কখনো আবার শরমের রাগে
ঈষৎ রাঙ্গিয়ে ওঠে সে মুখ,
চাপাচুপী, বালা, সাজে কি কখনো,
উথলি যখন উঠেছে বুক ?

সাজি সাজি আজ কুসুম ভূষণে,
দাঁড়ায় দামিনী সাগর বেলা,
বিজয়ে ডাকিতে গিয়েছে রোহিণী,
এখনো বিজয় করিছে হেলা !

"কতক্ষণ হ'ল জাগিয়ে উঠেছি—
কতক্ষণ হ'ল রোহিণী গেছে—
কতক্ষণ হ'ল এসেছি এখানে—
এখনো যে দেরী করিছে মিছে—

হোথা ছিল ভানু—দেখিতে দেখিতে
কত দূর ক্রমে উঠিল ওই—
ফুলের গহনা পড়িল শুখারে—
তবুও বিজয় আসিছে কই ?

কখন আসিবে?—ওই যে আবার
ঈষাণ কোণেতে উঠেছে মেঘ,
নিঃশ্বাস পড়ে না বাতাসের আর,
প্রশান্ত হয়েছে সাগর-বেগ।

ওড়ে না আকাশে সাগর-কপোত,
কোথায় কি জানি লুকালো সব,
বেলায় খেলায় হরিণী না আর,
থেমেছে মাঝীর গীতের রব।

এখনি উঠিবে নিদারুণ ঝড়,
ওই যে জলদ আকাশ ছায়,
থাকিয়ে থাকিয়ে ঘোর ডাকে মেঘ,
মাতিয়ে চপলা ছুটিয়ে যায়।"

*　　*　　*

*　　*　　*

দেখিতে দেখিতে ঘোর আঁচম্বিতে
উঠেছে ঝটিকা ভীষণ তোড়ে,
জল স্থল করি সাগরের ঢেউ
দাপটে বেলায় ঝাঁপায়ে পড়ে।

নিবিড় জলদে ডুবেছে তপন,
কে কোথায় যেন না জানে কেউ,
সব একাকার—জলধি-আকার,
দিগন্ত আলোড়ি ছুটিছে ঢেউ।

সাগরে অম্বরে বেঁধে গেছে রণ,
উঠিছে সাগর ভীষণ বেগে,
আকাশ হানিছে চপলার বাণ,
হুহুঙ্কারে মেঘ গরজে রেগে।

শনৈঃ শনৈঃ বহিছে বাতাস,
জলধির ফেণা আকাশে ছোটে,
হাঙ্গর মকর বেলায় পড়িয়ে
আছাড় পাছাড় খাইয়ে লোটে।

ওলট্ পালট্ হোতেছে সাগর,
উপরে উঠিছে তলার মাটি,
তলাতে ছুটিছে সাগরের ফেণা,
দাপটে ধরণী উঠিছে ফাটি।

এ ঘোর প্রলয়ে—দাঁড়ায়ে কে ওই ?—
হের, কল্পনা, হের গো ফিরে—
মথিত সাগর-উরস হইতে
আবার কমলা উঠিল কি রে ?

ওই যে দামিনী-নড়ে না চড়ে না,
চাহিয়ে তাপস-কুটীর-পানে,
ধরিয়ে একটি অশোকের ডাল,
তাকায়ে রোহেছে আপন মনে।

কে জানে কোথায় বহিছে ঝটিকা,
কে জানে কোথায় ছুটিছে জল,
কে জানে কোথায় ভাসিছে আঁচল—
ভাসিছে ফুলের গহনা-দল।

আসুক বিজয়—কহিব তাহারে
জানিয়াছি তার মমতা যত,
ওই মরমের নিভৃত বিজনে
কে জানিবে ঝড় বহিছে কত ?

দেখিতে দেখিতে, ঝাঁপায়ে জলধি
ছাড়িয়ে বালারে সবেগে ধায়,
ছাড়িয়ে সেই সে আশোকের মূল
গভীর গরজে উথলি যায়।

আবার গড়ায়ে সাগরের স্রোত
সাগরের পানে ছুটিয়া চলে,
চমকে দামিনী—সহসা কি যেন
ঠেকিল তাহার চরণ তলে!

আনত করিয়ে নলিনী-নয়ন,
আনত হইয়ে তাড়িত বলে—
দ্যাখে—বিজয়ের মৃত কলেবর
আটকি বালার চরণ তলে—

"ওই গো কি হলো"—বলিয়ে দামিনী
পড়িল মড়ার হৃদর পরে,
আবার ঝাঁপায়ে আসিয়ে জলধি
ভাসায়ে নে গেল উভয়ে পরে—

ভাসায়ে নে গেল উভয়েরে শেষে,
ভাসায়ে নে গেল কে জানে কোথা,
দামিনী-বিজয়, বিজয়-দামিনী—
রহিল কেবল কথার কথা।

আসি মহামায়া বিজন পুলিনে,
দেখিল সাগরে ভীষণ ঢেউ,
কোথায় দামিনী—কোথায় বিজয়—
কহিতে তাঁহারে নাহিক কেউ।

আপনার মনে বহিছে সাগর,
আপনার মনে স্বনিছে বায়,
দিগন্ত ব্যাপিয়ে জলে জলাকার—
মানুষের রেখা নাহিক তায়।

আপনার মনে গরজে জলদ,
চমকে চপলা আপন মনে—
ভ্রূক্ষেপ নাই—কি কোরে বিজয়
"মিলিল—মিশিল দামিনী সনে।"

পার্থিব প্রেম ও দেবভক্তি।

(জনৈক সন্ন্যাসী প্রেরিত।)

আমি কামাখ্যা; বারাণসী, প্রয়াগ প্রভৃতি সকল তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করিয়া এখন হিমাচলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। হরিদ্বারে কিছুদিন অবস্থান করিয়া গোমুখী-তীর্থ দর্শনের অভিলাষে শিখরে আরোহণ করিতেছিলাম, কিন্তু শীতের দুর্দ্দান্ত প্রভাববশতঃ গোমুখীতীর্থ দর্শন করা অদ্যাপিও আমার অদৃষ্টে ঘটিল না। আমার মত আরও অনেক বিফলযত্ন সন্ন্যাসীরা এখানে অবস্থান করিতেছেন,—সুতরাং তাঁহাদের সহবাসে আমার মনের মর্ম্মান্তিক ক্ষোভ কিয়ৎ পরিমাণে উপশান্ত হইয়াছে।—নিশা অবসান না হইতে হইতেই আমরা সকলে মিলিয়া পুণ্য-সলিলা জাহ্নবী-তীরে যাইয়া এক সঙ্গে সমস্বরে সকলে ব্রহ্মাণ্ডময়ীর মহিমা কীর্ত্তন করি, তপ জপ সন্ধ্যা আহ্নিক সমাপন করিয়া দ্বিপ্রহরের সময়ে সকলে মিলিয়া ফিরিয়া আসি,—ভোজনাদি সমাপন করিয়া সকলে মিলিয়া শাস্ত্রালাপ করি,—সকলে মিলিয়া কখনো কখনো সংসারের শূন্য আড়ম্বর, বিষয়ী ব্যক্তির প্রকৃত মূর্খতা, মান গৌরবের অসার অলীকতা এবং ধর্ম্মের অনন্ত উদারতা লইয়া তর্ক বিতর্ক করি, আবার সন্ধ্যা না হইতে হইতেই গঙ্গাতীরে যাইয়া সকলে সমবেত হই।—রাত্রি গভীর হইয়া আসিলে আবার সকলে মিলিয়া কন্দর-বাস-ভূমিতে প্রত্যাগমন করি,—সেখানে অগ্নি জ্বালাইয়া তাহার চতুষ্পার্শে সকলে বসিয়া কোন দিন সমস্বরে গান গাহি; কোন দিন শাস্ত্রালাপ করিয়া, কোন দিন আরাধনা করিয়া যামিনীর অধিক ভাগই যাপন করিয়া থাকি।—শীতের ভীষণ প্রতাপ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলেই আমরা সকলে মিলিয়া গোমুখী যাত্রা করিব। আহা, সেই উল্লাসের দিনের জন্য আমি লালায়িত হইয়া রহিয়াছি।—কিন্তু সেই অসিদ্ধ-প্রয়াস সত্ত্বেও আমি যে কি স্বর্গীয় সুখে দিন যাপন করিতেছি তাহা তোমরা অনুভবও করিতে পারিবে না।—বোধ হয় তোমরা এখনো ভাবিতেছ যে আমি অকালে পিতৃ-মাতৃ-হীন হইয়া, বিষয়বিভবে প্রতারিত হইয়া, জীবন-স্বরূপা ভার্য্যাকে অসময়ে হারাইয়া, হতাশ প্রেমে মর্ম্মপীড়িত হইয়া অদ্যাপি পার্থিব প্রভাবে পার্থিব অশ্রুজলে গণ্ডস্থল অভিষিক্ত করিতেছি। কিন্তু, হায়, তোমরা যদি বুঝিতে পারিতে যে প্রকৃত সৎসঙ্গে কি অনুপম স্বর্গসুখ ভোগ, তোমরা যদি জানিতে যে প্রকৃত দেবভক্তিতে এই হোম-ধূমের ন্যায় এই পার্থিব হৃদয় অবাধে হিমাচলের শিখর অতিক্রম করিয়া সপ্তম স্বর্গের শেষ সীমা পর্য্যন্ত উথলিয়া উঠে, তোমরা যদি জা-

নিতে সকলে সমস্বরে বেদপাঠ করিবার সময় এই পার্থিব দেহকে বিস্মৃত হইয়া, এই অস্থিচর্ম্ম-সমষ্টিকে বিস্মৃত হইয়া আপনাকে কি এক জ্যোতির্ম্ময়—আত্মার উপচ্ছায়া বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে, তাহা হইলে তোমরা আমার এই সুখের—এই সমৃদ্ধির হিংসা করিতে। দেখ, মানুষের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত হৃদয় তাহার সহগামী। কিন্তু এই হৃদয় আমরণ পরাধীন। শৈশবকালে মৃত্তিকার পুত্তলিকা লইয়া, বাল্যকালে বাল্য সখাতে অনুরক্ত হইয়া, যৌবনকালে প্রণয়ে উন্মত্ত হইয়া, প্রৌঢ়ে বিষয় বিভবের অধীনে মৃতকল্প হইয়া, বার্দ্ধক্যে দেবভক্তিতে পুনর্জীবিত হইয়া, শেষে মৃত্যুর কোমল আলিঙ্গনে অবসন্ন হইয়া পড়ে।—এই রূপে জীবনের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে, প্রত্যেক অঙ্কে মানুষ আপন বই অন্যের অধীন।—শৈশব ও বাল্য কালের কথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ভাবিয়া ছাড়িয়া দিলেও, যৌবনের প্রেমের সঙ্গে বার্দ্ধক্যের দেবভক্তির সঙ্গে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবার সম্ভাবনা। প্রৌঢ়াবস্থার বিষয়-লালসার কথা আমি এখন উল্লেখ করিব না, পরে সময় থাকিলে সে বিষয় বিবেচনা করিব।—এখন যৌবনের প্রণয় ও বার্দ্ধক্যের দেবভক্তি—এই দুয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা-স্থলে কাহার বিজয়-গান আমি গাহিব? অবশ্য আমি প্রেমকে এক তাচ্ছিল্যের নিশ্বাসে উড়াইয়া দিব না—যে প্রেমের মোহে মুগ্ধ হইয়া দেবদেব মহাদেব পর্য্যন্ত এই হিমাচলের শিখরে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন, যে প্রেমের অমোঘ প্রভাবে স্বয়ং মহামায়া কিশোর কোমল অঙ্গে বল্কল ধারণ করিয়াছিলেন, যে প্রেমের সর্ব্বজয়ী প্রতাপে পাষাণ-হৃদয় যম পর্য্যন্ত পরাস্ত হইয়া সাবিত্রীর স্বর্গীয় আলিঙ্গনে মৃত সত্যবানকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন, আমি আজ সন্ন্যাসী হইয়াছি বলিয়া সে প্রেমকে দুর্ব্বল হৃদয়ের আমোদ-লালসা মাত্র বলিতে প্রস্তুত নহি। যে কবি বলিয়াছেন যে প্রেমের একটিমাত্র অশ্রুবিন্দুতে মহাসাগর তরঙ্গিত হইতে থাকে—একটিমাত্র দীর্ঘ শ্বাসে প্রবল ঘূর্ণ-ঝটিকা বহিতে থাকে—একটিমাত্র কটাক্ষে সপ্তম স্বর্গ পর্য্যন্ত বিভাসিত হয়—সামান্য একটি স্পর্শ-মাত্রে বিদ্যুতাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে—আমি সে কবির বেদ-বাক্য শিরোধার্য্য করি। যে কবি বলিয়াছেন যে এই সমস্ত মানবমণ্ডলী নিস্তেজ জড়পিণ্ডের মতই অনন্তকাল পর্য্যন্ত থাকিত, যদি ঈশ্বর আপনার সারাংশ-স্বরূপ প্রেমের অগ্নি মানব-হৃদয়ে জ্বালাইয়া না দিতেন—যদি ভালবাসিতে এবং ভালবাসিবার প্রতিদান পাইতে মানুষকে এতদূর লালায়িত করিয়া না দিতেন—আমি সে কবির বেদ-বাক্য শিরোধার্য্য করি। আমি এ কথাও স্বীকার করি যে যৌবনের পার্থিব প্রেম বার্দ্ধক্যের দেবভক্তির এক প্রকার মহলামাত্র। যৌবনে যাঁহার হৃদয় প্রেমের উত্তপ্ত তরঙ্গে তরঙ্গিত হয় যৌবনে যিনি প্রেমের সামগ্রীর সহবাসে নাই স্বর্গসুখ উপভোগ করিতে এবং বিচ্ছেদে দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে শিখেন নাই

তিনি জীবনের কোন অবস্থাতেই দেবভক্তির চূড়ান্ত গরিমা কখনই অনুভব করিতে পারেন না। পার্থিব প্রেম এবং দেবভক্তি এক উৎস হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। সেই যে অন্য একটী স্বতন্ত্র পদার্থে সম্পূর্ণ বিলীন হইয়া যাইতে বাসনা,—অন্য পদার্থের আদরে বা অনাদরে আপনাকে চরিতার্থ বা অভিসন্তপ্ত জ্ঞান করা, সেই যে সমস্ত জগৎ সংসারে সহস্র সহস্র সামগ্রী থাকিতেও সেই একটী পদার্থের জন্য হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও লালায়িত ভাব—এ সকলই পার্থিব প্রেম ও দেব-ভক্তির সাধারণ উপাদান। কিন্তু আমরা যদি হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ শিক্ষা-প্রণালী উপলব্ধি করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাইব যে অগ্রে সুন্দর—সুন্দরতর—সুন্দরতম পদার্থের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রধাবিত হয়—এবং তাহাতে ক্রমশ উন্নতির সোপানে অগ্রসর হইতে হইতে আমরা শেষে মহান পদার্থের ভাবে লোমাঞ্চকার হইতে পারি। শৈশবকালে আমরা একটি গোলাপ ফুল দেখিয়া প্রমোদিত হইয়া থাকি, কিন্তু অভ্রভেদী পর্ব্বত-শ্রেণীর মহান ভাবে কখনই অভিভূত হইতে পারি না। বাল্যকালে আমরা কুমুদ-কহ্লারময় একটি প্রশান্ত সরোবর দেখিয়া যত দূর বিমোহিত হইতে পারিব, একটী তরঙ্গময় সমুদ্র দেখিয়া আমরা কখনই ততদূর বিমোহিত হইতে পারিব না। কিন্তু যে হৃদয় সেই বাল্যকালে সেই সরোবরের শোভা উপলব্ধি করিতে পারে নাই, সে হৃদয় কোন কালেই সেই সমুদ্রের তর্জ্জন গর্জ্জনে উচ্ছ্বসিত হইতে পারিবে না—যে হৃদয় যৌবনে ভালবাসাতে মুগ্ধ হয় নাই, সে হৃদয় বার্দ্ধক্যে দেব-ভক্তিতেও অভিভূত হইতে পারিবে না—আবার, আমরা প্রথমে প্রত্যক্ষ পদার্থে—তাহার পর প্রত্যক্ষবৎ পদার্থে—পরিশেষে আধ্যাত্মিক পদার্থে হৃদয় সন্নিবেশিত করিতে শিখিয়া থাকি। সুতরাং যিনি পার্থিব প্রেমে আপনাকে কখনো চরিতার্থ জ্ঞান করিতে পারেন নাই, তিনি কখনই দেব-ভক্তিতে হৃদয়োচ্ছ্বাস অনুভব করিতে পারেন না। এই সকল কারণেই আমি অগ্রে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছি যে, যৌবনের পার্থিব প্রেম বার্দ্ধক্যে দেব-ভক্তির মহলা মাত্র—কিন্তু এই উচ্চ পদবীতে একবার উঠিতে পারিলে, দেব-ভক্তির অসীম আমোদ একবার উপভোগ করিতে পারিলে, পার্থিব প্রেমকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। দেবভক্তির এই স্নিগ্ধকর অথচ উচ্ছ্বসিত—এই প্রগাঢ় অথচ অনন্ত-প্রসারিত আনন্দ-ভাবের সহিত পার্থিব প্রেমের উত্তপ্ত উন্মাদকর উল্লাসের তুলনা করিয়া দেখিলে বৃদ্ধ যজাতি রাজাকে মূর্খের অগ্রগণ্য বলিয়া মনে হয়। তাহা ব্যতীত, যখন ভাবিয়া দেখি যে পার্থিব প্রেম সম্যক রূপে পরিতৃপ্ত হইলেই প্রকৃতির নিয়মানুসারে ক্রমশই হ্রাস পাইতে থাকে, কিন্তু দেব-ভক্তির কখনই সম্যক পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা নাই, যখন ভাবিয়া দেখি যে পার্থিব প্রেমের পদার্থ আমার যথেষ্ট হিতাকাঙ্ক্ষী হইলেও আমাকে সকল অবস্থায় সম্যক প্রকারে রক্ষা করিতে অসমর্থ, কিন্তু আমার ইষ্ট-দেবতার কোমল অঙ্কে মস্তক রাখিয়া কোন কারণে কোন ভয়ে কখনই ভীত হইতে হইবে না, যখন ভাবিয়া দেখি যে পার্থিব প্রেমের পদার্থ হইতে আমি অকালে বিচ্যুত হইয়া আমরণ ভগ্ন-হৃদয়ে সম্ভবত কাঁদিতেও পারি, কিন্তু আমার ইষ্ট-দেবতার সঙ্গে আমি অনন্তকাল ক্রমশই ঘোর-ঘোরতর ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্মিলিত হইতেই পারিব, তখন কুমারিকা ব্রত-দীক্ষিত ইলাইসার মত আমাকেও এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয় যে কি অকিঞ্চিৎকর ধূলিসমষ্টির উপর আমি ভালবাসা স্থাপনা করিয়াছিলাম, যখন এই মর্ত্তালোকের একটি মানুষকে আমি ভালবাসিতে পারিয়াছিলাম।

শ্রীদাঃ—

ছিন্ন মুকুল।

দশম পরিচ্ছেদ—অবিশ্বাস।

পটলডাঙ্গার কালেজের নিকটে একটি বাড়ী আছে, সেই বাড়ীর একটি কক্ষে একাকী বসিয়া প্রমোদ অধ্যয়নে নিযুক্ত ছিলেন। প্রমোদ যে চৌকিতে বসিয়াছিলেন, তাহারি সম্মুখে একটি টেবিল, টেবিলের মধ্যভাগে একটি বাতি জ্বলতে ছিল এবং তাহার আশপাশ পুস্তকরাশিতে পূর্ণ হইয়া ছিল। কিন্তু একি জ্বালা? বই লইয়া পড়িতে বসিলেই মনে এত নানা প্রকার ভাবনা আসিয়া পড়ে যে, চমকিয়া ক্ষণেক পরে দেখিতে হয় যে খোলাপাতটি তেমনিই খোলা আছে, তাহার একটুও পড়িয়া উঠিতে পারেন নাই। এদিকে নিকটেই তাঁহার বি-এ পরীক্ষা; পড়িতে না মন লাগিলেই বা চলিবে কেন? পড়া হোক না হোক, সম্মুখে বই না রাখিলেও আবার মন বোঝে না। অনেক ক্ষণ হইতে একখানি বিজ্ঞান-পুস্তক লইয়া তাহাতে মাথা ঘোরাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন—কিন্তু অবশেষে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া তিনি বই খানি মুড়িয়া দূরে ফেলিলেন। হাতের কাছেই একখানি কোল্‌রিজ পড়িয়াছিল, ভাবিতে ভাবিতে সেই খানি হাতে লইলেন, ভাবিতে ভাবিতে সেই খানি খুলিলেন, প্রথমেই যে কবিতাছত্রে তাঁহার চক্ষু পড়িল—সেই ছত্র গুলি তাঁহার মনের যেন প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হইল—সেই কথা গুলি তাঁহার হৃদয়ে যেন মিশিয়া গেল, তিনি পড়িলেন "Oft in my waking dreams do I live o'er again that happy day"—তাঁহার আর পড়া হইল না। এই সময়ে এক জন ভৃত্য আসিয়া তাঁহার পড়ায় বাধা দিয়া বলিল "আপনার কাছে এক্ জন সন্ন্যাসী এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ দেখা করিতে চান।" সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া প্রমোদ চমকিত হইলেন, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ উপরে আনিতে ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, ভৃত্য বলিল "তিনি আসিবেন না, বসিবেন না, পথেই দাঁড়িয়ে আছেন, পথেই আপনার সঙ্গে কি কথা কহিয়া চলিয়া যাইবেন।" প্রমোদ কিছু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন 'তবে চল।' এই বলিয়া ভৃত্যের সহিত প্রমোদ সন্ন্যাসীর নিকট আসিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া প্রমোদ চিনিতে পারিলেন, এবং আহ্লাদের সহিত প্রণাম করিয়া বলিলেন "যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে মনেই করিলেন, তবে একবার ভিতরে এসে বসুন" সন্ন্যাসী মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "না তুমি আমার সঙ্গে একটু বিরলে এস, বিশেষ প্রয়োজন আছে" বলিয়া সন্ন্যাসী অগ্রে অগ্রে

গমন করিলেন, প্রমোদ তাঁহার অনুসরণ করিয়া গোল-দিঘীর এক নিভৃত প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন।

তখন রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। আকাশের ক্ষীণ চন্দ্র ক্ষীণালোকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত পৃথিবীকে যে অল্প পরিমাণে ঈষৎ উজ্জ্বল করিতেছিল, ক্রমে তাহাও আকাশের কোলে ডুবিয়া গিয়াছে। রজনী অন্ধকার, কিন্তু অসংখ্য অসংখ্য খদ্যোতমালা এই অন্ধকার মধ্যে নিভিয়া নিভিয়া জ্বলিতেছিল, এবং সহরের দীপমালা শ্রেণীবদ্ধ তারকারাজির মত দূরে শোভা পাইতেছিল। এই নিস্তব্ধ বিজনে আসিয়া, এই নিশার গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া প্রমোদ কহিলেন—

"কি কথার জন্য আপনি এখানে আনিলেন।"

সন্ন্যাসী তখন মেঘনির্ঘোষবৎ গম্ভীরস্বরে বলিলেন "প্রমোদ, তোমার একি আচরণ?"

সন্ন্যাসীর স্বরে—সন্ন্যাসীর কথায় প্রমোদ আশ্চর্য্য ভাবে বলিলেন "আমার কি আচরণ?" সন্ন্যাসী আবার আরো গম্ভীর স্বরে—আরো ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন "পাষণ্ড! নরাধম! আমার নীরজা কোথায়?"

নীরজা—কোথায়! সে কি কথা!! তখন বজ্র পড়িলেও প্রমোদ অধিকতর স্তম্ভিত হইতেন না। সন্ন্যাসী অধীর চিত্তে গর্জ্জন করিয়া আবার বলিলেন "আমার নীরজা কোথায়?" প্রমোদ তখন ধীরে ধীরে বিকম্পিত স্বরে প্রতিধ্বনির মত জিজ্ঞাসা করিলেন 'নীরজা কোথায়!' সন্ন্যাসী আর সহিতে পারিলেন না—এই কথায় তাঁহার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল, বিশাল নয়নে যেন বিজলী ঝলসিতে লাগিল, সরোষে প্রমোদের কণ্ঠদেশ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া কহিলেন "পামর! তুমি কি কিছুই জান না! বিশ্বাসঘাতক, আমার নীরজাকে হরণ করিয়া কোথায় রাখিয়াছিস দে, নহিলে এই দণ্ডেই তোর প্রাণনাশ করিব।" প্রমোদ কষ্টে সন্ন্যাসীর হাত ছাড়াইয়া বলিলেন "মহাশয়! আপনি কি বলিতেছেন? বাস্তবিক কি নীরজাকে তবে কেহ হরণ করিয়াছে—নীরজা—নীরজা অপহৃত?' প্রমোদের আর বাক্য সরিল না, নীরজা অপহৃত হইয়াছে এই কথাটি তাঁহার মনে এতই লাগিল যে, প্রমোদ আর আপনাকে আপনি শামলাইতে পারিলেন না, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে দেখিতে প্রমোদ মাথা ধরিয়া সেই খানেই বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসীর ইহাতে আরো সন্দেহ বাড়িল, ভাবিলেন প্রমোদের দোষ প্রকাশ পাইয়াছে এই ভাবিয়া প্রমোদের ভয়ে সহসা মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। প্রমোদের দোষের সন্ন্যাসী এই আর একটি গুরুতর প্রমাণ পাইলেন। আগে হইতেই সন্ন্যাসীর মনে প্রমোদের দোষের প্রমাণের অভাব ছিল না, প্রমোদের বিপক্ষে তিনি রাশি রাশি প্রমাণ পাইয়াছিলেন। প্রথমতঃ সে দিনকার কথাবার্ত্তায় নীরজার প্রতি প্রমোদকে অনুরক্ত বোধ হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ সন্ন্যাসী প্রমোদের প্রতি নীরজারও অনুরাগ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এমন কি, প্রমোদ চলিয়া যাইবার পরেও নীরজা পিতার

নিকট প্রায়ই তাঁহার গল্প করিত—তার পর তৃতীয় প্রমাণ, সন্ন্যাসীর নৈমিষারণ্যে যাইবার কথা প্রমোদ বই আর কেহই জানিতেন না—প্রমোদই জানিয়াছিলেন সে সময়ে নীরজা প্রায়ই একাকী একরূপ অরক্ষিতাবস্থায় থাকে—এই সব যুক্তিপরম্পরা দ্বারা সন্ন্যাসী প্রমোদকেই একরূপ দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। তাহার পরে, আবার আজ প্রমোদকে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া সন্ন্যাসীর প্রমাণসংখ্যা বাড়িল, সোনায় সোহাগা হইল, রাশি রাশি প্রমাণ মধ্যে এই একটি তিনি বিশেষ প্রমাণ পাইলেন, সুতরাং প্রমোদের দোষের বিষয়ে আর তাঁহার সন্দেহ রহিল না। তিনি উগ্রভাবে বলিলেন "নীরজাকে কোথায় রাখিয়াছ। ভালয় ভালয় ফিরাইয়া দিলে আমি সমস্ত দোষ ক্ষমা করিব, নহিলে তোমার নিস্তার নাই।" প্রমোদ কিছু শামলাইয়া উঠিয়া বলিলেন 'আপনি বিশ্বাস করিবেন না—কিন্তু নীরজা-হরণ শুনিয়া আপনার কি আমার—কাহার বেশী লাগিয়াছে জানি না।" এই কথা, এই ভণ্ডামী, সন্ন্যাসীর অসহ্য হইল, তিনি বলিলেন—"আর কেন,যথেষ্ট হইয়াছে, এখন নীরজা কোথা!"

প্র। "মহাশয়—বাস্তবিক নীরজা কোথা আমি জানিনা। আমি নিরপরাধী। আপনি তো জানেন যে আপনাদের অরণ্যে শেষ দিন যেদিন যাই, তাহার পর দিনই আমার এলাহাবাদ আসিবার কথা ছিল, আমি পরদিনই কানপুর ছাড়িয়াছিলাম, আপনার অরণ্যের সংবাদ আমি সেই অবধি আর কিছুই জানি না।"

স। অরণ্যের সংবাদ না জানিতে পার—কিন্তু নীরজা কোথায় ?" প্রমোদ দেখিলেন, সন্ন্যাসীর সেই অটল সন্দেহ ভঞ্জন করা সহজ নহে। তিনি আপন নির্দ্দোষিতার পক্ষে যতদূর বলিতে পারেন তাহার কিছুই ত্রুটি করিলেন না, কিন্তু তাহাতে সন্ন্যাসী তাঁহার নির্দ্দোষিতার প্রমাণ না পাইয়া বরং সেই অস্বীকার-বাক্যে তাঁহার ঘোর ভণ্ডামী দ্বিগুণরূপে দেখিতে লাগিলেন—প্রমোদের প্রত্যেক কথায় উত্তরোত্তর আরো ক্রুদ্ধ হইতে লাগিলেন। কোন উপায় না দেখিয়া প্রমোদ বলিলেন, "তবে যদি আমিই নীরজাকে আনিয়া থাকি, তাহা হইলে তো আমার বাড়ীতেই থাকিবে, আপনি বরং আমার বাড়ী খুঁজিয়া দেখুন।"

স। "সে খবর আমি না লইয়া তোমার কাছে আসি নাই, তোমার এ বাটীতে তাহাকে তুমি রাখ নাই, তাহা হইলে যে শীঘ্র ধরা পড়িবে, আর কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ বল ?' প্রমোদ ইহার কি উত্তর দিবেন ? রাগে, কষ্টে, হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অন্য কেহ হইলে প্রমোদের অপরিসীম রাগ হইত, রাগে কি করিতেন ঠিক নাই, কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া, নীরজার পিতা বলিয়া, রাগ হইতে কষ্টের ভাগ অধিকতর হইল। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন "তুমি যদি ভালয় ভালয় তাহাকে ফিরাইয়া দেও তো আমি তোমার সকল দোষ মার্জ্জনা করিব, নহিলে—নহিলে——" প্রমোদ আর মৌন হইয়া থাকিতে না পারিয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধগর্জ্জিত

স্বরে বলিলেন "মহাশয়, নীরজা কোথায় আমি জানি না, আমি শপথ করিয়া ঈশ্বর-সম্মুখে আপনাকে ইহা বলিতেছি, ইহাতেও যদি আপনি বিশ্বাস না করেন তো আপনার যাহা ইচ্ছা——"

সন্ন্যাসী সহিষ্ণু ভাবে প্রমোদের বাক্য শেষ পর্য্যন্ত আর শুনিতে পারিলেন না। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে দিগন্তভেদী গম্ভীর স্বরে বলিলেন "চুপ্—আর কথা কহিও না, তোমার প্রত্যেক কথায় আমার হৃদয় হইতে শোণিত-স্ফূলিঙ্গ ছুটিতেছে, নরাধম! পাষণ্ড! আজ দেখিতেছি এ হস্ত তোর রক্তে প্লাবিত হইবে, আজ দেখিতেছি নরহত্যায় এ হস্ত কলুষিত হইবে'—বলিয়া ক্রোধে অজ্ঞানবৎ প্রমোদের দিকে দুই এক পদ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দুই এক পদ চলিয়াই আবার যেন জ্ঞান হইল, তিনি সহসা থমকিয়া দাঁড়াইলেন, একবার সেই অন্ধকার আকাশ পানে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে, একবার আপনার চারি দিকে সেই আঁধারময় প্রকৃতির আঁধার মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে, মুহূর্ত্তমাত্র সময় লইয়া সেই আঁধার নৈশ-গগন কাঁপাইয়া প্রমোদকে চমকিত করিয়া বলিলেন "না নরাধম, আমি তোর অপবিত্র রক্তে হস্ত কলঙ্কিত করিব না, আমি তোকে মারিব না, তোকে মারিলে নীরজাকে পাইব না, তুই মরিলে নীরজা কোথায় কে বলিবে? না, তোকে মারিব না, মৃত্যুতে তোর মত লোকের শাস্তি হইবে না—তোকে মারিলে আমারি কলঙ্ক। আমি বিচারালয়ে লইয়া তোকে শাস্তি দিব,—পৃথিবীর এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্য্যন্ত তোর নাম—তোর দুর্নাম, তোর জঘন্য বিশ্বাস-ঘাতকতা ঘোষণা করিব, পৃথিবীর সকলে তোকে দেখিবামাত্র সর্পের ন্যায় ঘৃণা করিয়া সরিয়া দাঁড়াইবে! তোকে মারিব না, মারিলে তোর পাপের শাস্তি হইবে না" বলিয়া সন্ন্যাসী আর মুহূর্ত্তমাত্র না দাঁড়াইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সেই নিস্তব্ধ আঁধার-ময় রজনীকে কাঁপাইয়া, সেই কথা গুলি বজ্রের মত প্রমোদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন, প্রমোদ অনেক ক্ষণ ধরিয়া বজ্রাহতের ন্যায় স্তব্ধভাবে সেই খানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। যখন তাঁহার চিন্তা করিবার শক্তি জন্মিল, তখন সন্ন্যাসীর সহিত যত কথা হইয়াছিল, পূর্ব্বাপর ক্রমে মনে পড়িতে লাগিল। কি করিয়া তিনি এবিপদ হইতে উদ্ধার পাইবেন তখন ভাবিতে লাগিলেন। মন এমনি চঞ্চল, তখনি কাহারো সহিত ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু ও সকল কথা কাহাকে বলেন? সকলের নিকট আবার বলিতেও ইচ্ছা করে না। তিনি খুঁজিতে খুঁজিতে যামিনীনাথকে ছাড়া আর পরামর্শ করিবার লোক পাইলেন না। প্রথমতঃ যামিনীনাথ তাঁহার হৃদয়-বন্ধু, দ্বিতীয়তঃ যামিনীনাথও সেই অরণ্যে গিয়াছিলেন, তিনিও নীরজাকে দেখিয়াছেন, তিনি সকলই জানেন, সেই জন্য ও সম্বন্ধে তিনি যেমন ভাল পরামর্শ দিতে পারিবেন তেমন অন্য কেহ পারিবে না। প্রমোদ এই সকল ভাবিয়া সেই রাত্রেই ব্যাকুল ভাবে যামিনীনাথের বাড়ী যাত্রা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ—বিস্ময়।

যামিনীনাথ ভবানীপুরের এক জন ধনশালী যুবা। তিনি চতুর্ব্বিংশ বর্ষীয়। শরীর কিছু কৃশ, মুখাবয়ব ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে, কিন্তু বর্ণ গৌর এবং দেখিতে কুরূপ নহেন। ললাট প্রশস্ত না হউক—নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে, চক্ষু আয়ত, কিন্তু দৃষ্টি তত সরল নহে বলিয়া চক্ষুর তেমন সৌন্দর্য্য নাই। নাসিকা সুবঙ্কিম, তাহা কার্য্যতৎপরতার চিহ্ন।

মাতা ও এক বৃদ্ধা জ্যেঠতাতপত্নী এবং একটি ভগিনী ছাড়া আর যামিনীনাথের কেহই ছিল না। যামিনীর অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমের সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই অল্প বয়সে সমস্ত বিভবের অধিপতি হইয়া তাঁহার মস্তক কিছু ঘুরিয়া গিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পরেই তিনি স্কুল ছাড়িয়া দিলেন। সেই অবধি পুস্তকের সহিত তাঁহার সম্পর্ক রহিত হইল। যেমন হইয়া থাকে, কতকগুলি চাটুকার লইয়া, কতকগুলি সঙ্গী বন্ধুবান্ধব লইয়া তিনি সময় কাটাইতে লাগিলেন। তিনি ন্যায় অন্যায় যে কাজই করুন, তাহাতে কথা কহিবার কেহই নাই, তিনি যাহাই করুন চাটুকারগণ তাহাতেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতে থাকে। যামিনীনাথ যে তাহাদের অন্যায় প্রশংসা বোঝেন না তাহা নহে, তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, কিন্তু বুঝিয়াও তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট বই অসন্তুষ্ট হন না। যামিনীর হাত বিলক্ষণ দরাজ। প্রশংসা পাইবার নিমিত্ত চাটুকারদিগকে তুষ্ট করিতে, মানের জন্য বন্ধুদের কথা রাখিতে, নাম কিনিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে দান করিতে, তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না। একে পিতার অনেক ধন, তাহাতে যামিনীনাথের জ্যেষ্ঠতাতপত্নী তাঁহার পিতার পাঁচলক্ষ টাকা পাইয়াছিলেন। তাঁহার আর কেহ না থাকায় যামিনী সে টাকারও ভবিষ্যৎ অধিপতি হইবেন আশা ছিল। সুতরাং ব্যয় করিতে প্রথম প্রথম তিনি কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু এই রূপে দুই চারি বৎসরেই তিনি পিতৃসঞ্চিত ধনের অর্দ্ধেক খোয়াইয়া ফেলিলেন। কিছু দিন পরে তাঁহার সে বিষয়ে চৈতন্য হইল। তিনি দরাজ হাত ক্রমে গুটাইয়া আনিলেন, দানের মাত্রা সকলি প্রায় কমাইয়া ফেলিলেন। এখন তিনি সুবিধা পাইলে নিজে কোন বন্ধুর ঘাড় ভাঙ্গিতে পারিলেও ছাড়িতেন না।

তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে, পিতার মৃত্যুর আগে যখন যামিনীনাথ কলেজে পড়িতেন তখন প্রমোদের সহিত তাহার আলাপ হয়। তাহার পর কলেজ ছাড়িয়াও যামিনী প্রমোদকে সর্ব্বদা নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ করিতেন, সর্ব্বদাই প্রমোদের সঙ্গে দেখা করিতে যাইতেন। আসল কথা প্রমোদ, ধনবান তারাকান্তের বিষয়ের ভবিষ্যৎ মালিক, সুতরাং এখন হইতেই যামিনীনাথ তাঁহাকে আপন দলে মেশাইবার অভিপ্রায়ে ছিলেন। কিন্তু নীরজা যামিনীনাথের সহিত তাঁহার বাড়ী আসা অবধি আর প্রমোদের সহিত যামিনীর দেখা শুনা হয় নাই। যামিনীর সেই অবধি আর প্রমোদকে নিমন্ত্রণ করা, প্রমোদের বাটী

যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। প্রমোদও অবকাশ অভাবে এখানে আসিতে পারেন নাই। যদিও যামিনীর সহিত প্রমোদের নানা মতের বিভিন্নতা ছিল তথাপি তাঁহাদের কারণ ছাড়াও, দুজনের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। সুতরাং অন্য আজ প্রমোদের এত' রাত্রে এখানে পরামর্শ করিতে আসিবার ইহাও একটি কারণ। কিন্তু প্রমোদ এখানে আসিয়া শুনিলেন যামিনীনাথ বাড়ী নাই, কোথায় গিয়াছেন। তথাপি শীঘ্র আসিবেন শুনিয়া প্রমোদ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া যামিনীর বসিবার গৃহে আসিয়া বসিলেন।

যামিনীনাথের পরিচয় আর একটু বিশেষরূপ দিবার নিমিত্ত এইস্থলে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। যামিনীনাথ বড় বিদেশীয় রাজনীতি আচারব্যবহারের বিদ্বেষী ছিলেন। ভালই হোক মন্দই হোক তাঁহার তাহার প্রতি বড় ঘৃণা ছিল। এমন কি, বিদেশীয় ভাষা আর শিখিবেন না বলিয়া তিনি স্কুল ত্যাগ করিয়া আসেন। কিন্তু যে ঘরটিতে প্রমোদ আসিয়া বসিলেন সেটি সম্পূর্ণ ইংরাজি প্রথায় সজ্জিত। মধ্যে টেবিল, চতুষ্পার্শ্বে চৌকি কৌচ, তাহাতেই সর্ব্বদা যামিনী বন্ধুবান্ধব লইয়া বসিতেন। বোধ করি নীচের বিছানায় বসিলে পৃষ্ঠ-বেদনা করিত সেইহেতু সুবিধার অনুরোধে স্বদেশানুরাগী যামিনীনাথের অগত্যা কষ্টে বিদেশীয় অনুকরণ করিতে হইয়াছিল। গৃহের একটি প্রান্তে একটি লম্বা শ্বেতপ্রস্তরের টেবিল, তাহার মধ্যে একটি ফুলদানি, ফুলদানির দুই পার্শ্বে দুই খানি অ্যালবম্। প্রমোদ একাকী বসিয়া কি করেন—সেই টেবিলের নিকট একখানি চৌকিতে বসিয়া অ্যালবম্ হইতে ছবি দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন তাহাতে ইয়োরোপের সমস্ত রাজা রাণীদের ছবি আছে, সমস্ত বড় লোকের ছবি আছে। সে দেশীয় অনেক সুন্দরীগণের ছবিও তাহাতে দেখিতে পাইলেন। অ্যালবমের প্রথম তিন চারিটি পাতে ইয়োরোপীয় প্রধান প্রধান রাজাদের ছবি দেখিলেন। তাহার পরে, রাণী ভিকটোরিয়ার পর, প্রসিদ্ধা সুন্দরী ফ্রান্সের রাজ্ঞী ইয়োজিনী এবং যুবরাজপত্নী আলেক্‌জেণ্ড্রার চিত্র দেখিয়া তিনি মনে মনে তাহাদের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুখের প্রত্যেক অবয়ব গুলি বিশেষ মনোযোগ দিয়া দেখিলেন তাহার কিছুই নিন্দনীয় নাই, দেখিলেন নাসিকা চক্ষু সকলি বাস্তবিক সুগঠন। কিন্তু তবে? তবে একটির মাত্র অভাব। মুখে যে একটি সুন্দর ভাব থাকিলে সমস্ত মুখটিতে সৌন্দর্য্য আপ্লুত করে সেই ভাবটির মাত্র অভাব। কই, সে ভাবটি এ সকল চিত্রে কই? যে ভাবটি দেখিবামাত্র শরীর লোমাঞ্চিত হয়, হৃদয়ে সহসা একটি স্বপ্নময় আমোদ জন্মে, কই, সে ভাবটি ইহাদের মুখে কই? কিন্তু প্রমোদের মনের কথা প্রমোদ মনে মনেই চাপিয়া লইলেন। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সভ্যতম দেশের প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলিয়া যাঁরা বিখ্যাত, প্রমোদ কেমন করিয়া আজ স্পষ্ট করিয়া বলেন তিনি তাঁহাদের সৌন্দয্য অনুভব করিতে অক্ষম। তাঁহার কথা শুনিলে কে না সে

কথায় হাসিবে, তাঁহাকে রুচি-হীন বলিয়া কে তাঁহাকে রুচির উৎকর্ষ সাধনে পরামর্শ না দিবে? অন্যের কথা দূরে থাকুক, সেই চিত্রের সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় নিজেই লজ্জিত হইয়া প্রমোদ সে ভাবটি আপনার কাছেও চাপিয়া লইতে চেষ্টা করিয়া সে পাতটি উলটাইয়া ফেলিলেন। পর পাতে আরো দুই একটি সুন্দরীর চিত্র দেখিলেন, কিন্তু কাহারো মুখে প্রমোদ সেই একটি কেমন কেমন সৌন্দর্য্যের ভাব দেখিতে পাইলেন না—তাঁহার মনের মত সৌন্দর্য্য কোন ছবিতেই মিলিল না। একটি মাত্র জীবন্ত প্রতিমাতে তিনি সেইরূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন মাত্র, কিন্তু আর সে সৌন্দর্য্য তিনি ইয়োরোপের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সুন্দরীতেও দেখিতে পাইলেন না। প্রমোদ তখন সুপ্রসিদ্ধ সুন্দরী স্কটেদের রাণী মেরিকে দেখিবার জন্য পাত উলটাইতে লাগিলেন—সে অ্যালবমে তাহা পাইলেন না। সে খানি রাখিয়া আর একখানি খুলিয়াই তিনি মেরির ছবি পাইলেন। যে রূপে কত রাজ্যবিপ্লব ঘটিয়াছিল, যে রূপের জ্যোৎস্নাময় তরল তরঙ্গে কত উচ্চপদবীগত লোক উৎসন্ন গিয়াছিল, যে রূপের প্রশংসায় আজ পর্য্যন্ত দিক আমোদিত, সেই রূপের মোহিনী শক্তি তাহার মুখের কোন স্থলে বিদ্যমান তাহা প্রমোদ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন। সহসা আর দেখা হইল না—বীণাধ্বনিবৎ সহসা তাহার কর্ণে এই কথাটি বাজিয়া উঠিল "যামিনী বাবু"—সে স্বর প্রমোদ চিনিতে পারিলেন, সে স্বরে প্রমোদ লোমাঞ্চিত কায়ে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন তাঁহার পশ্চাতে নীরজা। সাধক তাহার আকাঙ্ক্ষিত বর পাইলে যত আহ্লাদিত না হইত, নীরজাকে দেখিয়া প্রমোদের তাহা হইল। প্রমোদের মুখ দেখিতে না পাইয়া যামিনী বোধে প্রথমে নীরজা ডাকিয়াছিল। সহসা প্রমোদকে দেখিয়া তাহার মুখেও আনন্দ বিভাসিত হইল। সেই বৃহৎ কক্ষে, একটি দীপালোক-বিভাসিত কক্ষে, দুই প্রান্তে দুইজনে নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন—উভয়ের নয়নে নয়নে স্থির দৃষ্টি সংলগ্ন হইল, উভয়ে মনে মনে মন হারাইয়া চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেকে চমক ভাঙ্গিলে নীরজা বলিয়া উঠিল "একি, এত রাত্রে তুমি এখানে?" প্রমোদ অমনি এক সময়েই প্রায় বলিয়া উঠিলেন "নীরজা, তুমি এখানে!" হঠাৎ বিস্ময় ও আনন্দ জনিত মনের বিশৃঙ্খল ভাব কিছু গোছাইয়া লইয়া কিছু পরে নীরজা তাহার দুঃখের কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বলিল। শুনিয়া এখন প্রমোদ সন্ন্যাসীর কথা বুঝিতে পারিলেন। প্রমোদ বলিলেন "যামিনী তোমাকে বাঁচাইয়াছেন, কি সৌভাগ্য! নহিলে কি হইত কে জানে?" আমি কেন যামিনীর মত সৌভাগ্যবান হইলাম না—আমি কেন তোমাকে উদ্ধার করিতে পারিলাম না।" বলিয়াই মনে মনে যেন কি ভাবের আধিক্য বশতঃ প্রমোদের কথা বন্ধ হইল—নীরজাও ইহার কোন উত্তর করিল না। কথা কহিতে কহিতে ধীরে ধীরে আপনা হইতে

প্রমোদের একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল, তাহাতে প্রমোদ আপনি চমকিয়া উঠিয়া আবার বলিলেন "তুমি এখানে আছ যদি কিছু আগে আমি জানিতাম! কিছু আগে যদি যামিনীর সহিত দেখা হইত, তাহা হইলেই আজ যখন তোমার—" এই সময় যামিনীনাথ তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, প্রমোদের মুখ অমনি রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কথাটি আর শেষ হইল না। প্রমোদের সহিত নীরজাকে দেখিয়া যামিনীনাথ বিস্মিত হইয়া ঈষৎ ক্রুদ্ধ ভাবে নীরজকে বলিলেন "একি তুমি এখানে!' নীরজা বলিল "বাবার শেষ চিঠির উত্তর আসিল কি না জানিবার জন্য বড়ই উৎসুক হইয়াছি। অনেক ক্ষণ তোমার জন্য অপেক্ষা করিয়া করিয়া তুমি এত রাত্রেও খবর দিতে অন্তঃপুরে এলে না দেখে আমি এই খানেই তোমাকে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে না আসিয়া থাকিতে পারিলাম না। এখানে আসিয়া প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে গল্প করিতেছি" যামিনী একটু বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "বাইরে কখন কে আসে—এখানে আসিবার আবশ্যক? আমি চিঠি পাইলেই তো তোমাকে বলিতে যাইতাম।" এই কথায় নীরজাও একটু বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ—দেশানুরাগ।

নীরজা চলিয়া গেল—তাহার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার কথা আর তাহাকে প্রমোদের বলা হইল না। যামিনীনাথকে বলিলেন, "ভাই, অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই। আজ এত রাত্রে দেখিয়া বিস্মিত হইও না—বড় বিপদে পড়িয়া পরামর্শ লইতে আসিয়াছি।" যামিনী ব্যগ্রতা দেখিয়া বলিলেন, "কি কি—বিপদটা কি।"

প্র। "আজ হঠাৎ নীরজার পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইলে——"

যামিনী এই কথায় ব্যগ্র হইয়া আবার বলিলেন, "নীরজার পিতা! তিনি এখানে এসেছেন।"

প্র। "হাঁ—কিন্তু নীরজা এখানে আছেন, না জানার দরুন বড় ভাই আমার ক্ষতি হয়েছে—" নীরজাকে প্রমোদ দেখিতে পাইয়াছেন দেখিয়া যামিনীনাথ হাসিয়া এই কথার মধ্যে বলিলেন,"দেখ ভাই প্রমোদ—নীরজাকে নিয়ে মহা ব্যাপার হয়েছিল—সে অনেক কথা। সে সব তোমাকে বলবার জন্য তোমার এলাহাবাদ থেকে আসার খবর পেয়ে আমি অতিশয় ব্যাকুল ছিলাম। কবে এসেছ তা কি সংবাদও দিতে নেই।"

প্র। "হাঁ—কেমন তা ঘটিয়া উঠে নাই—অন্যায় হয়েছে স্বীকার করি। আমি নীরজার মুখে সে সব ব্যাপার এখনি শুনেছি—কি ভয়ানক! যামিনী ভাগ্যে তুমি বাঁচালে!"

যা। 'আমি না থাকলে নীরজার কি দুর্দশা হোত মনে করতে আমারো বড় কষ্ট হয়।—সে যাক এখন ভালয় ভালয় তার বা-

পের হাতে তাকে দিতে পারলে হয়। এখানে যে সন্ন্যাসী এসেছেন ভালই হয়েছে। আমি যে কত পত্রই তাঁকে লিখেছি ঠিক নাই, কাজে ব্যস্ত না থাকলে—আমি এতদিন নীরজাকে তার বাপের কাছে রেখে পর্য্যন্ত আসতেম। যাক—তার পর সন্ন্যাসী তোমাকে কি বল্লেন ?" প্রমোদের সহিত সন্ন্যাসীর যে কথা হইয়াছিল তখন প্রমোদ সংক্ষেপে সবিশেষ বলিয়া বলিলেন "সন্ন্যাসী আমাকে কোন মতে বিশ্বাস করিলেন না—ইহার উপায়।" যামিনীনাথ গম্ভীর ভাবে সমস্ত শুনিয়া অবশেষে হাসিয়া বলিলেন "তুমি নির্দ্দোষী, তোমার ভয় কি—আমি আছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।"

যামিনীনাথের কথায় প্রমোদ বলিলেন "বিচারে যে আমি নির্দ্দোষ হইব সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই—তাহার জন্য ভাবি না। কিন্তু সন্ন্যাসী আমাকে মিথ্যা দোষী করিতেছেন—বিচারে নির্দ্দোষ হইলেও তাঁহার চক্ষে পাছে অপরাধী থাকি—এই ভাবনাই আমাকে কষ্ট দিতেছে। নীরজার সমস্ত ব্যাপার তাঁকে বলিলেও কি তুমি মনে কর আমাকে দোষী করিবেন ? কিন্তু তাই বা তাঁহাকে এখন কি করিয়া বলিব—তিনি কোথায় থাকেন কিছুই জানি না।" যামিনী বলিলেন "তোমার কিছুমাত্র ভাবনা নাই—ইহার প্রতীকার যাহা আবশ্যক আমি সকলি করিব। তুমি কিছুই ভাবিও না। কি আশ্চর্য্য—কি ছেলেমানুষ! এই জন্য তোমার ভাবনা! আজ কত দিন পরে দেখা—কোথায়, আমরা একটু আমোদ প্রমোদ গল্প সল্প করিব—না তোমার ভাই ঐ মিথ্যা ভাবনা! তা হবে না ভাই—আমোদ ক'রে চল আজ থিয়েটারে যাওয়া যাক।" আজ থিয়েটারে পদ্মাবতী অভিনয় হবে জান—

প্রমোদ প্রথমে অনেক আপত্তি করিয়া শেষে বলিলেন "এত রাত্রে থিয়েটারে যাব। সে যে অনেক দূর ?"

যা। "না, না, এই ভবানীপুরেই আজ একটা দলে থিয়েটার করছে—চল যাওয়া যাক, সেতো কাছেই। তুমি কিছু যদি না খেয়ে থাক তো এই খানেই এস এক সঙ্গে খাই।" প্রমোদ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন "তিনি খাইয়া আসিয়াছেন।" যামিনী তখন বলিলেন "তবে আমি খাইয়া আসি—তুমি বস, আসিয়া একত্রে থিয়েটার যাইব।" প্রমোদের থিয়েটার যাইতে বড় একটা ইচ্ছা ছিল না, সেই জন্য আরো দুই একবার ওজর করিলেন, কিন্তু যামিনী তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন "তাকি হয়—চল যাওয়া যাক, আমি শীঘ্র খাইয়া আসি" —কি করেন, প্রমোদ আর কথা কাটাইতে না পারিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন। আসল কথা, এখন থিয়েটারে যাইবার মত প্রমোদের প্রথমতঃ মনের অবস্থাই ছিল না, তাহার পর, আবার কিছু দিন পূর্ব্বে কয়েক মাস যামিনীর সহিত থিয়েটার সারকাস ইত্যাদি দেখিতে গিয়া তাঁহার ন্যায্য খরচের টাকা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিতে হইয়াছিল—এখন আপাততঃ হাতে যে টাকা আছে তাহাতে সমস্ত মাস চলিবে কি না সন্দেহ—সুতরাং কোন দিক হইতেই প্রমোদের

থিয়েটার যাইতে ইচ্ছা ছিল না।—কিন্তু যামিনীর কথায় অগত্যা স্বীকৃত হইতে হইল। যামিনী খাইয়া আসিবার পর তাহারা দুজনে থিয়েটার দেখিতে চলিলেন—যাইতে যাইতে যামিনীনাথ কিছু পিছাইয়া পড়িলেন, প্রমোদ কিছু অগ্রগামী হইয়া থিয়েটারগৃহে গিয়া বসিলেন। এদিকে যাইতে যাইতে গৃহে প্রবেশ করিবার সময় একজন কনষ্টেবলের গাত্রে যামিনীনাথের গাত্র ঠেকিল, যামিনীর মাথা তখন বড় একটা ঠিক ছিল না—বাড়ী হইতে দুই এক পাত্র তরল উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া আসিয়াছিলেন, কনষ্টেবলের গাত্রে গাত্র ঠেকিবামাত্র তাঁহার অপমান বোধ হইল, তিনি নির্দ্দোষী কনষ্টেবলকে এক ঘুসি বসাইয়া দিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যামিনীনাথ বড় দেশানুরাগী, ভালই হোক মন্দই হোক বিদেশীয় অনুকরণের নামমাত্রেই তিনি জলিয়া উঠিতেন, অথচ সুবিধার অনুরোধে ইংরাজী প্রথায় গৃহ সাজাইতে, বিলাসের অনুরোধে ইংরাজী বুট ট্রাউজার এবং মুসলমানি চাপকান পরিতে, সভ্যতার অনুরোধে হাতের পরিবর্ত্তে কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। শরীরের অনুরোধে মা ভগবতীর প্রতিও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল, এবং বন্ধুদের অনুরোধে বিলাতি মদ্যের প্রতিও তাঁহার ঘৃণা ছাড়িতে হইয়াছিল।

বিদেশীয় অনুকরণের প্রতি তাঁহার যেমন ঘৃণা ছিল—ভারতগৌরবলোপকারী বিদেশীয়গণের প্রতিও তিনি তেমনি জাতক্রোধ ছিলেন—ভারতের অস্তমিত গৌরবের দিনের জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন, এমন কি, অনেক সময় স্কুলের ছাত্রদিগকে সমবেত করিয়া আর্য্য-গরিমার পুনরুদ্দীপন বিষয়ে বক্তৃতাও দিতেন, গবর্ণমেণ্টকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি তাহাদের গালি দিয়া সংবাদপত্রে কয়েক বার লিখিয়াও ছিলেন—কিন্তু সেই গালি পড়িলে সহসা অনেকেরই তাহা প্রশংসা বলিয়া ভ্রম হইত। যাহা হোক, স্কুলের ছাত্রগণের প্রায় সকলেরই মনে তাহার প্রতি অটল বিশ্বাস ছিল—দেশানুরাগী বলিয়া অনেকের নিকট তাহার বিলক্ষণ মান ছিল। প্রমোদও যামিনীকে অত্যন্ত সৎলোক বলিয়া মনে করিতেন। তবে যামিনীর পান-দোষটি তাহার ভাল না ঠেকায় তিনি ঐ সম্বন্ধে যামিনীকে একদিন বলিয়া ছিলেন। যামিনীনাথ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি তো নিয়মিত প্রত্যহ পান করেন না, উহাতে তো তাঁহার তেমন অনুরাগ নাই, তবে বন্ধু বান্ধব মিলিয়া কখনো কখনো কদাচ পান করিতে দোষ কি? প্রমোদ তাঁহার কথায় ঠিক বুঝিয়া গেলেন। যামিনী বড় বুদ্ধিমান—কার কাছে কিরূপ বলিলে খাটিবে; কার কাছে কিরূপ করিয়া চলিতে হইবে, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন। প্রমোদের মদ্যে ঘৃণা ছিল—সুতরাং তাঁহার নিকট তিনি বড় একটা মদ খাইতেন না। প্রমোদ থাকিলে, নিতান্ত ইচ্ছা হইলেও দুই একবার লুকাইয়া লুকাইয়া সরিয়া গিয়া খাইয়া আসিতেন—কিম্বা যখন অন্য পাঁচ জন বন্ধু থাকিত, তখন এমনি কৌশল করিতেন যেন

নিতান্ত দায়ে পড়িয়া বন্ধুদের অনুরোধেই তাঁহাকে খাইতে হইতেছে। যাহা হৌক, আজ দেশানুরাগের আতিশয্যবশতঃ যবন-গাত্রে গাত্র স্পর্শ হইবা মাত্র তাঁহার অত্যন্ত অপমান বোধ হইল, তাঁহার দেশানুরাগ দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল, সেই দুরাচার যবনদিগের কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে তাঁহার আর্য্যরক্ত ফেনিত হইয়া উঠিল, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। তাঁহাকে আজ মারিয়া মরিতে হয় সেও স্বীকার, আজ তাহাকে মারিবেন, আজ তাহাকে মারিয়া ভারতবর্ষের শত সহস্র লোককে দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, ভারতের পূর্ব্বদিন আজ তিনিই ফিরাইয়া আনিবেন মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া তিনি তাহাকে এক ঘুসী বসাইয়া দিলেন। কনষ্টেবলটিও ছেড়ে কথা কহিল না, যামিনীনাথের ঘুসী শুদ্ধ সে ফিরাইয়া দিল। ক্রমে সেই কোলাহলে সেখানে লোক জমিতে লাগিল, প্রমোদও গোল শুনিয়া বাহিরে আসিলেন, বন্ধুর দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রমোদ সক্রোধে কনষ্টেবলের উপর পড়িলেন। মার খাইয়া যামিনীরও নেশা ছুটিয়াছিল, এখন সাহায্য পাইয়া তিনিও ছাড়িলেন না, বিস্তর ইংরাজি কথা বলিতে বলিতে কনষ্টেবলকে বিশিষ্ট রূপে আহত করিয়া দুই বন্ধুতে সরিয়া দাঁড়াইলেন। কনষ্টেবল তাঁহাদের চিনিত, পরদিন সে তাঁহাদের নামে অভিযোগ করিল। নালিস শুনিয়া প্রমোদ বড় একটা দমিয়া গেলেন না, কেবল কনষ্টেবলের উপর আরো একটু বেশী মাত্রায় চটিলেন। ভাবিলেন,সে নালিস না করিয়া যদি পুরস্কার প্রার্থনা করিত তো তাহার পক্ষে ভাল হইত, কিছু পাইয়া যাইত, নালিশ করিয়া আর একবার মার খাইবার সূত্রপাত করিল মাত্র। প্রমোদের কেবল একটি বিষয়ে একটু মুস্কিল লাগিল। মকদ্দামাতে তো উকীল বেরিষ্টার দিতে হইবে, এবং তাহা [illegible] অন্যান্য খরচও তো আছে, তাহার [illegible] কোথা হইতে পাওয়া যায়? কিম্বা যদি কি জানি মন্দটাই হয়, যদি কিছু দণ্ডই লাগে, তবে তো আগে হইতে তাহার জোগাড় করা চাই। তৎক্ষণাৎ দণ্ড দিতে না পারিলে তো জেলে যাইতে হইবে, এই জন্য ইহার অবশ্য আগে হইতে উপায় করা আবশ্যক। কিন্তু দণ্ড দিতে হইলেও ১০। ১২ টাকার অধিক তো আর কোন মতেই দণ্ড লাগিবার সম্ভাবনা নাই। দণ্ডের টাকার জন্য তবে ভাবনার প্রয়োজন কি, এখন উকীল বেরিষ্টারদের টাকাটা জোগাড় করিতে পারিলেই হয়, তাহা আবার আগেই দিতে হইবে, সে কিছু ২০০ শত টাকার কম কোন মতেই হইবে না। কিন্তু অত টাকা এখন প্রমোদ কোথায় পান? ইহাতেই প্রমোদ একটু চিন্তিত হইলেন, কিন্তু শেষ কোন উপায়ই না পাইয়া কনকের কাছে অগত্যা তাহা চাহিয়া পাঠাইলেন। যামিনীর নিকট ধার চাহিতে তিনি লজ্জায় কোন মতে পারিয়া উঠিলেন না। আর ধার করিলেও তো তাহার টাকা শীঘ্র শোধ দিতে হইবে, সেই তো কনকের নিকট চাহিতে হইবেই, তাহা অপেক্ষা এখন চাহোয়াই যুক্তিসিদ্ধ

ভাবিয়া প্রমোদ কনককে টাকা পাঠাইতে লিখিলেন।

—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—স্নেহের পুরস্কার।

কলি[illegible]আসিয়া অবধি প্রমোদ মাঝে মাঝে কনকের নিকট ১০।২০ টাকা করিয়া চাহিয়া পাঠাইতেন। যামিনীনাথ তাঁহাকে যেরূপ পাইয়া বসিয়াছিলেন তাহাতে প্রমোদের আপন ব্যয়েরই অর্থ কুলাইয়া ওঠা ভার হইত। ধনশালী বলিয়া প্রমোদের খ্যাতি আছে, সুতরাং তাঁহার ঘাড় ভাঙ্গিবার ইচ্ছায় যামিনীনাথ আজ থিয়াটারে চল, আজ হোটেলে খানা দেও, আজ সারকস দেখিয়া আসি, এইরূপ ধরিয়া পড়িতেন, প্রমোদেরও ধনশালী বলিয়া মনে মনে একটু অহঙ্কার আছে, তিনিও সহজে সে নামটি খোয়াইতে চাহিতেন না। লজ্জার খাতিরে যামিনী বাবুর কথাগুলি কাজেই রাখিতে হইত। সুশীলার নিকট হইতে প্রমোদ কলিকাতায় থাকিবার যে খরচ পাইতেন এইরূপ ব্যয়ে তাঁহার সে অর্থে কুলাইয়া ওঠা ভার হইত। আজ হাতে টাকা নাই অথচ যামিনী আসিয়া বলিলেন থিয়েটার যাইতে হইবে—আত্মাভিমানীদের 'না' বলিতে অপমান বোধ হয়—প্রমোদ আত্মাভিমানী, হাতে যে টাকা আছে লজ্জার অনুরোধে তাহাতে সেই দিনকার থিয়েটার দেখা চলে, কিন্তু পরে কলেজের মাহিনে চাই, অন্যান্য আবশ্যক খরচ চাই, সুশীলার নিকট চাহিলে আর অধিক টাকা পাইবার আশা নাই, কারণ সুশীলার বিশ্বাস ছিল, বেশী টাকা হাতে পাইলেই ছেলেদের স্বভাব বিগড়িয়া যায়, সুতরাং তাঁহার নিকট প্রমোদ চাহিতে পারেন না, চাহিলে টাকা দেওয়া দূরে থাকুক বরং সুশীলা প্রমোদের স্বভাবের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন। কি করেন, প্রমোদ আবশ্যক হইলেই চুপে চুপে অগত্যা কনককে পত্র লিখিতেন, কনক কষ্টে স্বষ্টে যে কোন প্রকারেই হউক প্রমোদকে টাকা পাঠাইত। কিন্তু সে টাকার জোগাড় করিতে কনকের যে কিরূপ মাথা কাটা কুটি করিতে হইত, জানিলে হয়তো প্রমোদেরও মায়া হইত, আপন খরচ বিষয়ে হয়তো তিনি সাবধান হইতেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কনক কখনো সে কষ্টের কথা প্রমোদকে বলে নাই। কনক মাসে যে ১৫ টাকা করিয়া সুশীলার নিকট হইতে জলপানী পাইত, সেই টাকাগুলি, না খাইয়া না কিছু কিনিয়া যত্নে জমাইয়া ভ্রাতার জন্য পাঠাইত, এবং তাহা ছাড়া রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া সেলাই করতঃ তাহা গোপনে বিক্রয় পূর্ব্বক টাকা গুলি ভ্রাতাকে পাঠাইত।

২০।২৫ টাকা বলিয়া যেন কনক কষ্টে স্বষ্টে ভাইকে তাহা জোগাইত, কিন্তু এবার যে প্রমোদ হিতাহিত বিবেচনাশূন্য হইয়া একেবারে ২০০ শত টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, ইহা এখন কনক কোথা হইতে কেমন করিয়া দিবে? অথচ না দিলেই নয়, প্রমোদ লিখিয়াছেন টাকা না পাইলে তাঁহাকে জেলে

ও যাইতে হইবে—কি ভয়ানক! বালিকা বেচারী তো ভাবিয়া ভাবিয়া আকুল হইল। সুশীলার নিকটেও কিছু সে টাকা চাহিবার যো নাই, তাহা আবার প্রমোদের নিষেধ। প্রমোদ জানিতেন কনকের কাছে টাকা চাহিলেই পাইবেন, এমন স্থলে আপনার মার-পিঠ এবং সেই হেতু মকদ্দমা হেঙ্গামের কথা যদি না জানাইয়াই চলিয়া যায় তো প্রমোদ তাহা আর সুশীলাকে জানাইবার ইচ্ছা করিবেন কেন? কিন্তু কনক যে কত কষ্ট করিয়া টাকা পাঠায় তাহা প্রমোদ জানিতেন না। টাকা চাহিলেই তিনি পান—তিনি কেবল এই মাত্র জানিতেন। তাহা যে কনক কোথা হইতে কেমন করিয়া কত কষ্টে জোগায় প্রমোদের তাহা ভাবিবার আবশ্যকও বোধ হইত না। তবে এক একবার কখনো দৈবাৎ যদি ঐ কথাটি মনে আসিত, যখন মনে হইত বিনা কষ্টে কনকের টাকা পাঠানোর সম্ভাবনা নাই, তখন প্রমোদ মনে করিতেন ভবিষ্যতে তিনি আর টাকা চাহিবেন না, এবার হইতে মিতব্যয়ী হইবেন, কিন্তু কিছু পরেই আবার সে কথা ভুলিয়া যাইতেন। অন্যবারের ন্যায় এবারেও প্রমোদ চাহিবার সময় ভাবিলেন এবার ছাড়া আর তিনি কনকের নিকট টাকা চাহিবেন না।

এদিকে বালিকা-কনকের আর দুঃখের সীমা নাই। কি উপায়ে সে এবার ভ্রাতাকে রক্ষা করিবে?

রাত্রি দ্বিপ্রহর, নিস্তব্ধ অন্ধকারময় পৃথিবী খদ্যোতিকা-মালায় রঞ্জিত, আর উপরে নীল অনন্ত আকাশ তারকামালায় খচিত। সেই তারা-খচিত আকাশের পানে চাহিয়া বালিকা-কনক কাঁদিতেছিল, তাহার দুঃখ সেই জানে, সে দুঃখ কাহারো কাছে বলিবার নয়, কাহারো কাছে উপদেশ জিজ্ঞাসা করিবার যো নাই, তাহার বিপদ সেই জানে। কাহারো কাছে মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে না পারিয়া বালিকা নির্ব্বাক তারাদলের নিকট হৃদয় খুলিয়া কাঁদিতেছিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা উঠিল, আবার গৃহে প্রবেশ করিল, একটী দীপের নিকট আসিয়া হস্তস্থিত একখানি পত্র লইয়া আবার পড়িতে লাগিল, পড়িল—

"ভাই কনক"

অতিশয় বিপদে পড়িয়াছি, তুমি বই আমার আর উপায় নাই। ২০০ শত টাকা কাল নিশ্চয়ই পাঠাইবে, তা না হইলে হয়তো জেলে যাইতে হইবে। কনক, এইবার ভাই তুমি আমাকে রক্ষা কর—এইবার ভাই আর একবার স্নেহময়ী ভগিনীর কাজ কর—

এইবার শেষবার—আর তোমাকে এরূপ কথা বলিব না। আর সকল কথা পরে লিখিব। তোমার স্নেহময় প্রমোদ।—

পুঃ

দেখ ভাই মাকে এ সকল কথা কিছু বলিওনা।"

প্রমোদ।

কনক কতবার চিটিখানি পড়িল, কতবার অশ্রুজল মুছিল। কি উপায়ে সে

২০০ শত টাকা প্রমোদকে পাঠাইতে পারে, কি করিয়া প্রমোদকে বাঁচাইবে, তাহার কতই উপায় খুজিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, নিরুপায় বালিকা অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই গোপনে আপনার সেলাইগুলি, এবং আপনার রেশমী ও জরীর দামী সাড়ি কয়েক খানি লইয়া, তাহার একজন বিশ্বাসী দাসীকে উঠাইয়া তাহাকে গোপনে সেইগুলি বিক্রয়ের জন্য দিল। কিন্তু বিক্রয় কবে হইবে, মনে করিলেই কিছু বিক্রয় হয় না—এদিকে আজই টাকা না পাঠাইলে নয়, তবে আপাততঃ কি করিয়া টাকা পাওয়া যায়? বালিকা ভাবিতে ভাবিতে গৃহ-বহিষ্কৃত হইয়া উদ্যানে আসিয়া হতাশ চিত্তে একটি বৃক্ষতলে আসিয়া বসিল। সহসা তাহার মুখকান্তি যেন জ্বলিয়া উঠিল। সহসা তাহার হৃদয়ে যেন আশার উদয় হইল। সেই বৃক্ষ তলে সে একখানি নোটের মত কাগজ দেখিতে পাইল। কাগজ খানি হস্তে তুলিয়া দেখিল—উহা এক শত টাকার একখানি নোট। হর্ষোচ্ছ্বাসে বালিকার হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইল, সে ভাবিল উহা ঈশ্বর-প্রেরিত, কনকের দুঃখ নিবারণ করিতেই ঈশ্বর তাহাকে তাহা দিলেন। ইহা ভাবিয়া তাহা লওয়া ন্যায়সঙ্গত কি অন্যায় তাহা আর এই সময় তাহার মনেও আসিল না। ঐ নোট লইয়া পরে সে কত বিপদে পড়িতে পারে—এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহা ভাবিল না। ঈশ্বর-প্রেরিত জ্ঞানে সে সেই নোট খানি লইয়া এবং আপন দ্রব্যসামগ্রী অর্দ্ধদামে বিক্রয় করিয়া জোড়ে তাড়ে দুই শত টাকা করিয়া সেই দিনই প্রমোদকে পাঠাইল। পাঠান হইলে তখন তাহার মনে হইল যে যদি নোটখানি আর কাহারো হয়, যদি আমাদের বাগানে কেহ হারাইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবিল তাহার এখনোতো অন্যান্য দামী সাড় সকল বিক্রয় হয় নাই। তাহা বিক্রয় হইলেই সে এই নোট কুড়াইয়া পাইবার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবে, এবং যাহার নোট তাহাকে একশত টাকা দিবে। এদিকে সেই দিনেই সেই নোট খানির খোঁজ পড়িল। সুশীলা পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাকালে উদ্যানে বেড়াইতে গিয়া সেই নোট খানি হারাইয়া আসিয়াছিলেন। অঞ্চলে তখন ঐ নোট বাঁধা ছিল। উত্তমরূপে বাঁধা ছিল না বলিয়াই হৌক কিম্বা যে কারণেই হৌক, তাহা অঞ্চল হইতে খসিয়া উদ্যানে পড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু নোটের কথা সুশীলা একেবারেই সে দিন ভুলিয়া গিয়াছিলেন। হঠাৎ পরদিন কাপড় ছাড়িবার সময় সে কথা তাঁহার মনে পড়িল। তখন বাড়ীর সমস্ত দাস দাসীদিগকে লইয়া বিলক্ষণ পিড়াপিড়ি চলিতে লাগিল। বেচারিদিগের ভয়ে প্রাণ শুকাইয়া গেল, তাহাদের ভয় যে বিনা দোষে আজ না জানি কাহাকে চোর বলিয়া ধরা হয়। এরূপ অবস্থায় যেরূপ হইয়া থাকে, সুশীলা একজন নির্দ্দোষী দাসকে তন্ত্রমন্ত্র ও ন্যায় শাস্ত্র খাটাইয়া নিশ্চয়ই দোষী বলিয়া স্থির করিলেন। সুশীলার প্রশ্নে সে ঠিক নির্ভয়ে উত্তর দিতে পারে নাই—অনেক

বার তাহার কথা বাধিয়া গিয়াছে, কথার অনেক ব্যতিক্রম করিয়াছে, সকল অপেক্ষা তাহার মুখ অধিক শুকাইয়া গিয়াছে, ইহা সকলি ত চোরের লক্ষণ—ইহা হইতে অধিক প্রমাণের কি আবশ্যক? তিনি সেই ভৃত্যকে পুলিসে পাঠাইতে সঙ্কল্প করিলেন। এ দিকে এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কনকের তো প্রাণ উড়িয়া গিয়াছিল, সে কি বলিয়া আপনার দোষ এখন স্বীকার করে, তাহাই ভাবিতেছিল—তাহার জন্য আর একজন নির্দ্দোষীর শাস্তি হইতেছে দেখিয়া সেএখন কি প্রকারে মৌন থাকিবে। কনক ভয়ে ভয়ে সুশীলার নিকটে আসিয়া মুক্ত কণ্ঠে আপনার দোষ স্বীকার করিল। সুশীলা তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি নোট লইয়া কি করিলে? আর একথা তবে এতক্ষণ বল নাই কেন?" বালিকা বলিল "আমি তাহা খরচ করিয়াছি, তাই ভয়ে বলিতে পারি নাই। কিন্তু আমি স্থির করিয়াছিলাম শোধ দেবার মত হাতে টাকা হইলেই আমি একথা বলিব এবং যাহার টাকা তাহাকে দিব।" নোট খানি কনক খরচ করিয়াছে শুনিয়া সুশীলা আরো আশ্চর্য্য হইলেন। কনক তাহার ইচ্ছামত খরচ করিবার জন্য মাসিক যে ১৫ টাকা করিয়া পাইত তাহার পক্ষে তাহাই যে যথেষ্ট, কনক ত আপনিই পূর্ব্বে সুশীলাকে বলিয়াছিল যে সে যে টাকা পায় তাহা হইতে তাহার অনেক জমে, অথচ কনক এক শত টাকা তবে কি সে খরচ করিল? তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "এক শত টাকা কিসে খরচ করিলে?" ইহার উত্তর কনক কি দিবে? তাহাকে মৌন দেখিয়া সুশীলা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কি সে খরচ করিলে?" কনক ভাবিল পায়ে ধরিয়া বলি 'আর এরূপ কর্ম্ম কখনো করিব না কিন্তু কারণ আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না'—সে ধীরে ধীরে সজলনেত্রে কম্পিত হস্তে সুশীলার পাদস্পর্শ করিল। ধীরে ধীরে অস্ফুট স্বরে "আর করিব না" এইটুক পর্য্যন্ত বলিয়াই চুপ করিল। ভয়ে লজ্জায় আর মুখ হইতে কথা বাহির হইল না। বিরক্ত ভাবে চরণ সরাইয়া লইয়া সুশীলা আরো দুই একবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু কনক সেইরূপ নিস্পন্দ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল মাত্র। সুশীলা ভাবিলেন 'কি না জানি নিন্দনীয় কর্ম্মে কনক এই টাকা ব্যয় করিয়াছে, তাই ভয়ে সে কথা বলিতে পারিতেছে না।' তিনি কনকের সমস্ত ব্যবহারে অত্যন্ত ব্যথিত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। প্রথমতঃ নোট কুড়াইয়া পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে না বলাই যে যথেষ্ট দোষ হইয়াছিল—তাহার পর আবার সেই নোট খরচ করিয়াছে—আবার তাহা অন্যায় কার্য্যে খরচ করিয়াছে, অন্যায় স্বীকার করিলে তবু হইত, তাহাও কনক করিল না, এত জিজ্ঞাসাতেও তাহা বলিল না! কনক কি গুরুতর অপরাধে অপরাধী! কয় মাস পূর্ব্বে কনক যে দোষ করিয়াছিল, এবার তাহা হইতে সহস্র গুণে গুরুতর দোষে দোষী। এবং ইহার মধ্যে আরো কত দোষ করিয়াছে কে জানে। দুইবার ধরা

পড়িল মাত্র। ধরা না পড়িলে কনক তো তাহার দোষ লুকাইয়া রাখিত! সুশীলা কনককে অসচ্চরিত্র বলিয়া জ্ঞান করিলেন। সুশীলা ভাবিলেন "কনক চোর, কনক মিথ্যাবাদী, কনকের গুরুভক্তি নাই, কনকের ঈশ্বরে ভক্তি নাই, কনক ঘোর পামর, ঈশ্বরে ভক্তির অভাবই কনকের যত দোষের মূল। ঈশ্বরে মন থাকিলে কখনই কনক অন্যায় কার্য্য করিতে পারিত না।" তাহার স্বভাব কি করিয়া ভাল করিবেন সেই বিষয়ে তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। কনকের মূর্ত্তি পর্য্যন্ত এখন তাঁহার চক্ষে কুটিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার নম্র বিষাদময় মূর্ত্তি তিনি চক্রান্ত-ভাব-পূর্ণ দেখিলেন। কনকের আন্তরিক ভাব তাহার মূর্ত্তিতে প্রকাশ পায় না---ইহাতে তাহাকে আরো গভীরতর মন্দ লোক বলিয়া স্থির করিলেন। তিনি বুঝিলেন, কনকের মাতা কনকের গুণেই তাহাকে ভাল বাসিতেন না। তাঁহার কিছুমাত্র দোষ নাই। কনককে মায়া করা সুশীলার অন্যায় হইয়াছিল। কনক 'মিট মিটে ডাইন।'

কনকের দোষের নিমিত্ত তাহাকে কি শাস্তি দিবেন তাহা স্থির করিতেও সুশীলার মুস্কিল লাগিল। অবশেষে এই আজ্ঞা করিলেন, ক্রমাগত বার দিন ধরিয়া, একাকী একটি গৃহে তাহার পাপের মার্জ্জনা চাহিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে। বার দিন সে কাহারো সহিত কথা কহিতে পারিবে না, আহারের সময় দাস দাসীরা সেই গৃহে আহার দিয়া আসিবে, রাত্রেও তাহার গৃহে আলো জ্বলিবে না। এই নিয়মে কনক সেই দিন হইতে বার দিনের জন্য কারারুদ্ধ হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—এই সে।

এ দিকে নালিসের বিচারের দিন উপস্থিত হইল। প্রমোদ ও যামিনীনাথ অন্য দুই একজন বন্ধুর সহিত আলিপুরের বিচারালয়ে যাত্রা করিলেন। আলিপুরে একজন বাঙ্গালী ডিপুটী মেজিষ্ট্রেটের নিকট বিচার হইবে। বিচার আরম্ভ হইল, আসামী ফরিয়াদী আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। উভয়ের পক্ষের লোকে উভয়ের পক্ষে যাহা বলিবার বলিতে লাগিল।

কিন্তু প্রমোদ এখন স্থিরচক্ষু, চিন্তামগ্ন, প্রমোদের কানে সে সকল কথা তখন কিছুই প্রবেশ করিতেছিল না, প্রমোদ বড় অন্যমনস্ক। প্রমোদ বদ্ধদৃষ্টি হইয়া বিচারকের পানেই চাহিয়াছিলেন, যেন বিচারককে তিনি আগে কোথায় দেখিয়াছেন, যেন সে মুখ তাঁহার পরিচিত অথচ তাহাকে চিনিতে পারিতেছেন না। তিনি তখন পার্শ্বস্থ যামিনীনাথকে বিচারকের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন তাহার নাম হিরণকুমার। অমনি সহসা তিনি বিচারককে চিনিতে পারিলেন, চিনিলেন বিচারক তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিচিত হিরণকুমার। সেই ছেলেবেলা যাহার কাছে প্রমোদ অপমানিত হইয়াছিলেন, যে ঘটনাটি তখন তাঁহার শিরায় শিরায় বিঁধিয়াছিল, প্রমোদ

ছেলেবেলা আর কখনো ওরূপ স্থলে কাঁদেন নাই,যে হিরণকুমার তাঁহাকে কাঁদাইয়াছিল—এই সেই হিরণকুমার। প্রমোদ সেই দিন কার সেই বাল্য ঘটনাটি মনের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, চিন্তাস্রোতে তখন তাঁহার হৃদয় তরঙ্গিত হইতে লাগিল, তাঁহার কর্ণে তখন কেমন করিয়া অন্য কথা প্রবেশ করিবে ; প্রমোদ কিছু সেরূপ হিংসা-স্বভাবাপন্ন নহেন, সেই ঘটনাটি মনে রাখিয়া যে প্রমোদ হিরণের প্রতি চিরশত্রুতা পণ করিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু প্রমোদ সেই প্রথম বার হিরণকে দেখিয়ামাত্র কেমন তাহাকে আর দেখিতে পারিতেন না। এক একজনকে প্রথম দেখিবামাত্র যেমন অকারণে ঘৃণা জন্মে, প্রমোদেরও হিরণের প্রতি সেই দিনকার সেই ক্ষুদ্র ঘটনাটি হইতে তাহাই হইয়াছিল। বিচারপতিকে চিনিতে পারিয়াই কেমন প্রমোদ কিছু দমিয়া গেলেন, তাঁহার সেই পূর্ব্বের স্ফূর্ত্তির ভাব তেমন আর রহিল না। কে জানে কেন তাঁহার নিশ্চয় মনে হইল তিনি মকদ্দামায় হারিবেন, তাহার কোন দোষ সপ্রমাণ না হইলেও হিরণ তাহাকে হারাইয়া দিবেন। বাস্তবিক বিচারে যামিনীর সহিত প্রমোদেরও দোষ সপ্রমাণ হইল। হিরণকুমার যামিনীর একশত এবং প্রমোদের ৫০ টাকা দণ্ড দিবার আদেশ করিলেন। এদিকে প্রমোদ তাঁহার যে দোষ সপ্রমাণ হইবে তাহাই মনে করেন নাই, তবে নিতান্তই যদি হয় তাহা হইলেও ১০।১৫ টাকার অধিক যে দণ্ড লাগিবে ইহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, সুতরাং তাঁহার নিকট এখন ২০ টাকার একখানি নোট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এখন একেবারে ৫০ টাকা শুনিয়া তিনি যেমন বিপদে পড়িলেন তেমনি হিরণের নিতান্ত অবিচার-জ্ঞানে মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধও হইলেন। তিনি ভাবিলেন হিরণ কুমার তাঁহাকে চিনিয়াই এইরূপ অবিচার করিলেন। কিন্তু বাস্তবিক হিরণ তাঁহাকে চিনিতেও পারেন নাই। যখন হিরণ তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন তখন প্রমোদ দশম বর্ষীয় বালকমাত্র, এখন এই যৌবনাবস্থায় তাঁহাকে চেনা দুষ্কর, এখন প্রমোদ তাহা হইতে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছেন। যাহা হউক তখনি তো দণ্ডের টাকা দিতেই হইবে, নহিলে তো আর উপায় নাই; অগত্যা তাহা যামিনীর নিকট ধার করিয়া প্রমোদের দিতে হইল। কিন্তু তাহাতে প্রমোদ অত্যন্ত অপমানিত মনে করিলেন, মনে মনে হিরণের প্রতি বদ্ধমূল ঘৃণা জন্মিল। ক্রুদ্ধ অপমানিত চিত্তে মনে মনে হিরণকুমারের শ্রাদ্ধ করিতে করিতে প্রমোদ যামিনীর সহিত যামিনীর বাটী আসিলেন, সেখানে অনেক ক্ষণ বসিয়া, তাহার নিকট হিরণের প্রতি অনেক ক্রোধ মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিবার পর সে ক্রোধ যেন কিছু নিবৃত্তি হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—নূতন সন্দেহ।

সেখান হইতে অপরাহ্নে প্রমোদ পদব্রজে আপন বাসস্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সচরাচর ধনাঢ্য-সন্তানেরা

পদব্রজে চলিতে যেরূপ অপমান মনে করেন, প্রমোদ তাহা করিতেন না। রৌদ্র বৃষ্টিবশতঃ বিশেষ প্রয়োজন না হইলে, সকালে বিকালে কোথাও যাইতে হইলে প্রমোদ সচরাচর প্রায়ই পদব্রজে গমন করিতেন, হাঁটিয়া যাইতে তাঁহার বিশেষ আমোদ বোধ হইত। এবিষয়ে তিনি কলিকাতার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেন নাই।

এতক্ষণে যদিও হিরণের অবিচার-জনিত প্রমোদের ক্রোধ অনেক কমিয়া আসিয়াছিল তথাপি এখনো প্রমোদের সদা স্ফূর্ত্তিময় মুখ কিছু ম্লান, কিছু চিন্তাযুক্ত। বিচারের ফলাফল জানিতে সমস্ত দিন ঔৎসুক্যে থাকা প্রযুক্ত শেষে পরাজিত হইয়া এখন যেন প্রমোদ কিছু অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, মূর্ত্তি যেন জড়তাময়, বিচারের কথা প্রমোদের মন হইতে এখনো অন্তর্হিত হয় নাই। প্রমোদ একাকী একমনে কত কি ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিলেন। অন্যান্য সকল ভাবনার মধ্যে মধ্যে এক একবার সেই বন—বনমালা-মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়ে চমকিয়া যাইতেছিল, প্রত্যেক চিন্তার সঙ্গেই সে মূর্ত্তি কোন না কোন প্রকারে যেন বিজড়িত। ভাবিতে ভাবিতে সন্ন্যাসীর সহিত সেই দিনকার রাত্রের কথোপকথনই তাঁহার অধিক মনে পড়িতে লাগিল। কি অন্যায় দোষেই সন্ন্যাসী তাঁহাকে দোষী করিতেছেন, কি করিয়া তিনি তাহার সে সন্দেহ হইতে মুক্ত হইবেন,নীরজার পিতার চক্ষে দোষী হইতে প্রমোদের অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে একবার মনে হইল "সন্ন্যাসী বলিলেন আমার নামে মকদ্দমা আনিবেন, যদি সত্যই আনেন আর যদি হিরণকুমারের নিকট তাহার বিচার হয়। কি সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে নিশ্চয়ই হিরণ আমাকে বিনা দোষে দোষী করিবে।" আবার ভাবিলেন, "কিন্তু এ ভয় বৃথা, মকদ্দমা হইলেও আলিপুরে ইহা কেন হইবে।" এইরূপ কত কি এদিক্ ওদিক ভাবিতে ভাবিতে প্রমোদ চৌরঙ্গির রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। দেখিলেন শ্যামল-দূর্ব্বাদলপূর্ণ মাঠে সুন্দর সুন্দর বালক বালিকারা খেলিতেছে, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্য একেবারে পশ্চিম প্রান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছে। প্রমোদ একবার সেই বালক বালিকাদের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন,একবার সেই অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। প্রমোদের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কত কথাই ইহা হইতে মনে চলিয়া গেল, কত ভাবনাই উদয় হইতে লাগিল। আবার তিনি যখন আর একবার সেই মাঠপানে চাহিলেন, দেখিলেন অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের হেমাভ রশ্মি সেই শ্যামক্ষেত্র প্রান্তরে জ্বলিতেছে, বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা-চূড়ায় জ্বলিতেছে, সেই মাঠ—প্রান্তগামী একজন শ্মশ্রুজটাধারী ব্যক্তির মুখে পড়িয়াছে। প্রমোদ তাহাকে দেখিয়া নীরজার পিতা বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তাহাকে দেখিয়া প্রমোদের মুখ যেন কিছু হর্ষোৎফুল্ল হইল। তিনি সন্ন্যাসীর নিকট সেই মাঠে আসিলেন। হঠাৎ প্রমোদকে দেখিয়া সন্ন্যাসীও কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু প্রমোদ বলিলেন "মহাশয়, আপনার সহিত

একটু বিশেষ কথা আছে, একটু দূরে চলুন।” নীরজার সম্বন্ধে কিছু হইতে পারে ভাবিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার সহিত মাঠের একটি নির্জ্জন প্রান্তে আসিলেন। তখন প্রমোদ বলিলেন “মহাশয়, আপনাকে আমি খুজিতেছিলাম। দেখা পাইয়া যে আমি কত সুখী হইলাম কি বলিব।” সন্ন্যাসী অধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন “আমার সহিত তোমার আবার কি কথা আছে? নীরজাকে আমায় দিতে কি তবে মনস্থ করিয়াছ।”

প্র। “আপনি আর ঐ অবিশ্বাসের কথা বলিয়া আমাকে কস্ট দিবেন না। আপনি জানেন না যে আমাকে দোষী ভাবিয়া আমার মনে কি কস্ট দিতেছেন। কিন্তু আজ আমি সেই কষ্টের শান্তি করিব, নীরজার বিষয়ে আমি যাহা জানিয়াছি তাহা আপনাকে বলিব, তাহা আপনি শুনিলে আমাকে নিশ্চয়ই নির্দ্দোষী বিশ্বাস করিবেন।” সন্ন্যাসী উৎসুক ভাবে তাহা কি জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রমোদ বলিলেন “সেদিন হঠাৎ আমি জানিয়াছি নীরজা কোথা। এবার আপনি আপনার কন্যা পাইবেন।” সন্ন্যাসী উৎসুক ভাবে বলিলেন “কোথা আছে।” প্রমোদ তখন নীরজার রক্ষার বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া যামিনীর নাম ধাম বলিয়া বলিলেন “আমি শুনিলাম নীরজার বিষয়ে যামিনীনাথ আপনাকে অনেক বার পত্র লিখিয়াছেন। আপনি তাহা না পাওয়াতেই দেখিতেছি যত গোল ঘটিয়াছে। যামিনীনাথের কাছে গেলেই আপনি সে সকল বৃত্তান্ত সমুদয় বিশেষরূপে শুনিতে পাইবেন।”

সন্ন্যাসী বিস্ময় সহকারে বলিলেন “যামিনীনাথ! যে ব্যক্তি তোমার সহিত আমাদের অরণ্যে গিয়াছিল, যাহাকে তোমার সঙ্গে নীরজা একরাত্রি আশ্রয় দিয়াছিল, তাহার নামই না যামিনীনাথ! সে বলিতেছে নীরজাকে রক্ষা করিয়াছে? রক্ষা করিলে কি সে তাহাকে তাহার পিতাকে তখনি ফিরাইয়া দিত না? সংবাদ পর্য্যন্ত কি দিত না?

প্রমোদ বলিলেন ‘মহাশয় তাঁহাকে সন্দেহ করিবেন না, তিনি আপনাকে সংবাদ দিতে ত্রুটি করেন নাই, আপনি পান নাই।’

সন্ন্যাসী প্রমোদের কথায় কোন উত্তর করিলেন না। যামিনীনাথের পরিচয় শুনিয়া তিনি চিন্তামগ্ন হইয়াছিলেন। অনেক পরে প্রমোদের কথার উত্তর স্বরূপ বলিলেন “সংবাদ দিলে আমি পাইতাম না ইহা অসম্ভব।”

প্র। ‘না মহাশয়, আপনি আবার আর একজনকে অন্যায় দোষে দোষী করিতেছেন। যামিনীনাথই নীরজার উদ্ধারকর্ত্তা।’ সন্ন্যাসী সে কথা না শুনিয়া আপন মনে প্রমোদকে বলিলেন “নীরজা কোথা, এত দিন তুমি তাহা জানিতে না?”

প্রমোদ বলিলেন ‘না”

স। “অথচ যামিনী তোমার পরম বন্ধু?’ “প্রমোদ একটু বিপদে পড়িয়া বলিলেন “মহাশয়, বন্ধু বটে, কিন্তু আমার সহিত তাঁর”—সন্ন্যাসী—প্রমোদের কথা ফুরাইতে না দিয়া বলিলেন “তোমার ও কথায় আর কিছুই বলিবার আবশ্যক নাই।

যামিনীর বাড়ী আমি এখনি চলিলাম। তাহার ও নীরজার কথা না শুনিয়া আমি নিশ্চয় একটা স্থির বুঝিতে এখন অক্ষম" বলিয়া সন্ন্যাসী যামিনীনাথের বাড়ী যাত্রা করিলেন। সন্ন্যাসী ভবানীপুরে একজন আত্মীয় ব্যক্তির সহিত নীরজার সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু নীরজার সন্ধান পাইয়া, আর সেখানে না গিয়া, যামিনীনাথের বাড়ীই যাত্রা করিলেন।

সামুদ্রানুমিতি বিদ্যা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

"প্রায়ঃ শারীরকানুবর্ত্তিনোহি
গুণাশ্চ দোষাশ্চ ভবন্তি।"

সামুদ্র বিদ্যার মত এই যে, মনুষ্যের গুণ দোষ সকল প্রায় শরীরের গঠন-ভঙ্গীর অনুরূপই হইয়া থাকে অতএব গঠন-ভঙ্গী দেখিয়া মনুষ্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী অপ্রত্যক্ষ চরিত্র সকল অনুমান দ্বারা নিশ্চয় করা যাইতে পারে। পরন্ত তাহা সহজ-সাধ্য নহে, কিছু নৈপুণ্য অপেক্ষা করে। বাল্য কালে আমরা যত "গোরা" দেখিতাম, জ্ঞান হইত সব গোরা এক রকম, কিন্তু এখন দেখি, বিলক্ষণ প্রভেদ আছে। অতএব, জ্ঞানের উন্নতি ও বহু পরিচয় ব্যতীত ব্যক্তিপুঞ্জের অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য বা গঠন-ভঙ্গীর তারতম্য বিষয়ে উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ করা যায় না; সুতরাং সামুদ্র বিদ্যায়ও পারদর্শী হওয়া যায় না। ভাদ্র মাস ২ভাগ ৫সংখ্যক ভারতীতে এতৎ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা স্মরণ করুন, দেখিতে পাইবেন, তাহাতে মাত্র প্রকৃতি-অনুমানের বিষয় লিখিত হইয়াছিল। বাহ্য আকার প্রকার ও প্রবৃত্তি দর্শনে যেমন মানবকুলের প্রকৃতি নির্ণয় হইতে পারে, সেইরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন-প্রণালী অনুসারে স্বভাব চরিত্রাদিও অনুমিত হইতে পারে। এ প্রস্তাবে তাহাই প্রদর্শিত হইবে।

অঙ্গের মধ্যে প্রধান অঙ্গ মস্তক; এই নিমিত্ত ইহাকে উত্তমাঙ্গ বলিয়া থাকে। সামুদ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই উত্তমাঙ্গ মাত্র দেখিয়াই সে কি চরিত্রের লোক, তাহা বলিয়া দিতে পারেন। তাঁহাদের মত এই যে, চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে মুখের গঠন সমাপ্ত হয়, ও ভঙ্গী-বিশেষ নিষ্পন্ন হয় সুতরাং সেই জন্যই মুখ দেখিয়া, যে যে চরিত্রের লোক তাহা জানা যায় ও বলিতে পারা যায়।

মুখের প্রথম দৃশ্য ললাট। ললাটের গঠন সম্বন্ধে সামুদ্রজ্ঞদিগের এইরূপ উক্তি আছে। যথা—

"নিম্নললাটা বধবন্ধভাগিনঃ * ক্রূরকর্ম্ম নিরতাশ্চ।

অভ্যুন্নতৈশ্চ ভূপাঃ কৃপণাঃ স্যুঃ সঙ্কটললাটাঃ।'

ললাটের গঠন সকলকার সমান নহে। ব্যক্তি মাত্রেরই ভিন্ন ভিন্ন আকারের ললাট হইলেও ললাটের গঠন সম্বন্ধে স্থূলতঃ ছয় শ্রেণী করা সামুদ্র বিদ্যার অভিপ্রেত। "নিম্নললাট" "অভ্যুন্নতললাট" "সঙ্কটললাট' 'বিষমললাট' অর্দ্ধেন্দুললাট" 'শুক্তিবিশাল।' এতদ্ভিন্ন "বিশাল' "অর্দ্ধেন্দুবিশাল' "শিরাসন্তত"* "উন্নতশিরাসন্তত' স্বস্তিকসংস্থ শিরাসন্তত' প্রভৃতি অনেক প্রকার অবান্তর প্রভেদ আছে, কিন্তু সে সমস্ত সহজে পরিচিত হইবার নহে। এক্ষণে উল্লিখিত কএক প্রকার বিস্পষ্ট-বোধ্য ললাটের বিষয় বিবৃত করা যাইতেছে।

নিম্নললাট—যাহাদের ললাট নিম্ন, তাহারা বধবন্ধনভাগী। যেহেতু তাহাদের মতিগতি ক্রূর কর্ম্মে রত। তাৎপর্য্য এই যে নিম্নললাট শ্রেণীর লোকের প্রবৃত্তি প্রায়শই কু দিকে যায়, সুতরাং হয় বধ না হয় বন্ধন ঘটনা হয়। "গ্রীবা চ হ্রস্বস্তথা ললাটঃ' হ্রস্ব বা নিম্নললাটের সঙ্গে যদি ঘাড় খাঁট হয়, তাহা হইলেত কথাই নাই। দুইটিই দুষ্টামির লক্ষণ।

"কোতা গরদান তাংপিছানি
দোনোভি বজ্জাত্ কি নিশানী।"

অভ্যুন্নত—'অভ্যুন্নতাশ্চ ভূপাঃ' যাহাদের ললাট সম্মুখ ভাগে উচ্চ [পোল] তাহারা রাজা। রাজা হউক বা না হউক, তাহাদের অন্তঃকরণটা রাজার ন্যায় বটে। তাৎপর্য্য এই যে, অভ্যুন্নতললাট ব্যক্তিদের অন্তঃকরণ প্রায় মহত্ত্ব গুণে পরিপূরিত থাকে।

সঙ্কট—"কৃপণাঃ স্যুঃ সঙ্কটললাটাঃ।' "সঙ্কট শব্দের অর্থ এস্থলে সঙ্কীর্ণ অর্থাৎ ছোট, কিংবা বন্ধুর ভূমির ন্যায় উচ্চ নীচ দোষাক্রান্ত। এই সঙ্কটললাট মনুষ্যেরা প্রায় কৃপণ হয়। কেবল টাকার কৃপণ নহে, জ্ঞান, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, উদারতা, সকল বিষয়েই কৃপণ। তাৎপর্য্য এই যে সঙ্কটললাট ব্যক্তিদের আশয় অতি ক্ষুদ্র।

বিষম—"বিষমললাটা বিধনাঃ'। "বিষম' শব্দের অর্থ এস্থলে অসম অর্থাৎ বাঁকা অথবা একপেশে গোছের উচ্চ নীচ। যাহাদের ললাটদেশটী বিষম তাহারা ধনবর্জ্জিত। বিশালতা থাকিলেও বৈষম্যদোষে তাহারা ধনবর্জ্জিত হইবে; অর্থাৎ ধন যে কি কৌশলে উপার্জ্জিত হয় তাহা তাহারা বোধগম্য করিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, বিষমললাট মনুষ্যের বুদ্ধি ধনাগমের দিকে খেলে না।

অর্দ্ধেন্দু—"ধনবন্তোঽর্দ্ধেন্দুসদৃশেন' যাহাদের ললাটের গঠন অর্দ্ধচন্দ্রবৎ বৃত্তচ্ছেদবিশিষ্ট, তাহারা ধনবন্ত। নিশ্চয় তাহাদের ধন আছে। কি সে ধন হয় তাহা এই শ্রেণীর লোকেরাই বুঝে। তাৎপর্য্য এই যে, অর্দ্ধেন্দুললাট মনুষ্যের বুদ্ধি ধনাগম পক্ষে বড় চতুর।

শুক্তিবিশাল—"শুক্তিবিশালৈরাচার্য্যতা' শুক্তি অর্থাৎ ঝিনুকের মধ্যভাগটা যেমন উন্নত ও দুই পাশ ক্রমনিম্ন, এতদাকারের

ললাটবিশিষ্ট পুরুষেরা প্রায়ই আচার্য্য অর্থাৎ বিদ্বান্, বাগ্মী, প্রতিভাশালী ও মেধাবী হন। তাৎপর্য্য এই যে, যাহাদের ললাটের গঠন শুক্তিসাদৃশ্যে উন্নত অথবা বিস্তীর্ণ তাঁহারা ধনী না হইতেও পারেন, কিন্তু তাঁহাদের পণ্ডিত্য-সদ্ভাব পক্ষে কোন সংশয় নাই।

বিশাল—"বিশালাশ্চ বুদ্ধিমন্তঃ।' ঔন্নত্যবর্জিত বিস্তীর্ণতাযুক্ত ললাট হইলে তাহার বুদ্ধিযোগ থাকে মাত্র, আচার্য্য হইবার ক্ষমতা থাকে না।

শিরাসন্তত—"শিরাসন্ততৈরধর্ম্মরতাঃ।" যাহাদের ললাট শিরাজড়িত, তাহারা অধর্ম্মরুচি লোক। তাৎপর্য্য এই যে, শিরাব্যাপ্ত ললাটীদিগের প্রবৃত্তি অধর্ম্মের দিকেই ধাবিত হয় এবং অধর্ম্ম করিতেই তাহারা ভাল বাসে।

উন্নতশিরা—'উন্নতশিরাভিরাঢ্যা স্বস্তিকসংস্থিতিশ্চ' ললাটের শিরাজাল যদি উন্নত ও স্বস্তিকতুল্য আকারের প্রতান বিশিষ্ট হয় তবে তাঁহারা আঢ্য অর্থাৎ ধনী। তাঁহাদের হৃদয়-ভাণ্ডার কোন না কোন প্রকার ধনে পূর্ণ আছে। (স্বস্তিক—বিবাহাদি মঙ্গল কার্য্যে ব্যবহার হইয়া থাকে)

ভ্রূ।

ললাটের পর ভ্রূদেশের গঠন-প্রণালী দেখিতে হইবেক। ভ্রূস্থানের গঠন-প্রণালী বহু আকারের হইলেও সামুদ্র বিদ্যা সংক্ষেপতঃ ইহাকে সাত শ্রেণী করিয়া তদ্দ্বারা বিশেষ বিশেষ ফলের অনুমান করিয়া থাকেন।

অভ্যুন্নত ভ্রূ, বিশালোন্নত ভ্রূ, বিষম ভ্রূ বালেন্দুনত ভ্রূ, দীর্ঘাসংসক্ত ভ্রূ, খণ্ডিত ভ্রূ, ও মধ্যবিনত ভ্রূ। এই কএকটী শ্রেণীকল্পনা ভ্রূরোমের রচনা-পরিপাটী অনুসারেই হইয়াছে; পরন্তু ভ্রূপ্রদেশটীর গঠনগুলি "পশ্বাদিতশ্চ বোদ্ধব্যাঃ' সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুদিগের ভ্রূস্থান দেখিয়া তদনুযায়ী কতিপয় শ্রেণী কল্পনা করিবেক এবং তদ্দ্বারা সত্ত্ব ও উৎসাহাদি গুণের অনুমান করিবেক। পরন্তু সামুদ্র শাস্ত্রে সত্ত্ব ও উৎসাহাদি গুণের অনুমান সম্বন্ধে অন্য প্রণালী অবলম্বিত আছে বলিয়া এই অংশে "পশ্বাদিতশ্চ বোদ্ধব্যাঃ' ভিন্ন অন্য কোন বিশেষ উক্তি নাই; সুতরাং কেবল মাত্র ভ্রূরোমের রচনা-পরিপাটী দেখিয়া যাহা যাহা অনুমিত হয় এস্থলে কেবল তাহাই ব্যক্ত করা যাইবেক।

অভ্যুন্নত—"অভ্যুন্নতাভিরল্পায়ুষঃ" যাহাদের ভ্রূদেশ অভ্যুন্নত, ঠিক সম্মুখ ভাগটা উচ্চ, তাহারা অল্পায়ুঃ। তাৎপর্য্য এই যে, তাদৃশ ব্যক্তিরা অদীর্ঘজীবী সুতরাং বুদ্ধি বিদ্যা অনুমান করা অনাবশ্যক।

বিশালোন্নত—"বিশালোন্নতাভিরতিসুখিনঃ।" যাহাদের ভ্রূদেশ বিশাল অথচ উন্নত, তাহারা অত্যন্ত সুখী হয়। সুখের বাহ্য উপকরণ থাকুক, বা না থাকুক, তাহাদের মন সুখসাগরে নিমগ্ন থাকে।

বিষম—"বিষমভ্রুবোদরিদ্রাঃ।" যাহাদের ভ্রূ বিষম অর্থাৎ অসমান (অসমান নানারূপ হইতে পারে পরন্তু কি প্রকারের অসমান তাহা জানি না) তাহারা দরিদ্র।

ধন থাকিলেও দরিদ্র। অর্থাৎ তাহাদের ধনতৃষ্ণা অতি প্রবল।

বালেন্দুনত—"বালেন্দুনতভ্রুবঃ সধনাঃ।" যাহাদের ভ্রূযুগল বালেন্দুতুল্য নত (বাঁকা), নিশ্চয় তাহাদের ধন আছে। উপার্জন-বর্জ্জিত হইলেও অন্ততঃ পৈতৃক ধন আছে।

দীর্ঘাসংসক্ত—'দীর্ঘাঽসংসক্তাভির্ধনিনঃ।" দীর্ঘ অথচ অসংসক্ত (যোগ না থাকা) ভ্রুতে ধনসত্তা অনুমিত হইয়া থাকে।

খণ্ড—'খণ্ডাভিরর্থপরিহীনাঃ।' খণ্ড ভ্রু ব্যক্তি অর্থহীন হয়। অর্থ শব্দে কেবলমাত্র ধন নহে। খণ্ডভ্রু ব্যক্তিরা প্রয়োজন সিদ্ধি ও ইচ্ছাপূর্ত্তি করিতেও অসমর্থ।

মধ্যবিনত—"মধ্যবিনতভ্রুবো যে তে সক্তাঃ স্ত্রীস্বগম্যাসু।" যাহাদের ভ্রুদেশ মধ্যবিনত অর্থাৎ মাঝখানটা বাঁকা, তাহারা এত কামুক যে তাহারা অগমনীয় স্ত্রীতেও গমন করিতে প্রস্তুত থাকে।

শঙ্খ।

অতঃপর শঙ্খস্থান অর্থাৎ ভ্রু ও কর্ণের মধ্যভাগটী (রগ) পরীক্ষা করিবেক। ইহার অধিক প্রভেদ নাই; উন্নতবিপুল ও নিম্ন এই দুই প্রকার মাত্র। 'উন্নতবিপুলৈঃ শঙ্খৈঃ ধন্যাঃ' যাহাদের শঙ্খপ্রদেশ উন্নত ও বিপুল তাঁহারা ধন্য। 'ধন্য' এই কথাটী সংক্ষেপে বলা হইয়াছে, অতএব বুঝিতে হইবে যে যাঁহাদের শঙ্খস্থান (রগ দুইটী) পরিপূর্ণ, তাঁহারা ধনী হইতে পারেন, মানী হইতে পারেন, জ্ঞানী অথবা সুখীও হইতে পারেন। আর যাঁহাদের শঙ্খপ্রদেশ নিম্ন (রগ খালা), তাঁহারা 'নিম্নৈঃ সুতার্থসন্ত্যক্তাঃ। পুত্র ও অর্থহীন ইহাতে সংশয় নাই। অপুত্রক না হইলেও অপুত্রকের দুঃখভাগী, ধন থাকিলেও নির্ধনের দুঃখভাগী হন।

এতৎ পরে চক্ষুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবেক। কেন না চক্ষুর গঠন ও দৃষ্টি অর্থাৎ চাউনির ভঙ্গী অনুসারে অনেক প্রকার বিশেষ বিশেষ অন্তর্গত ভাব অনুমিত হইয়া থাকে।

শ্রী কালীবর বেদান্তবাগীশ।

নর্ম্ম্যান্ জাতি ও আঙ্গ্লো-নর্ম্ম্যান্ সাহিত্য।

টিউটনিক জাতিরা রোমান রাজ্য অধিকার করুক্ কিন্তু রোমান্ জাতিদিগের সহিত না মিশিয়া থাকিতে পারে নাই। বিজিত জাতিদিগের সহিত তাহাদের আচার ব্যবহার ভাষা ধর্ম্ম সমস্ত মিশিয়া গিয়াছিল। তাহারা রোমান্ রাজ্য শাসন করিত, কিন্তু রোমান্ শাসন-প্রণালী অনুসারে শাসন করিত। রোমান্ রাজ্যে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার

হইয়াছিল কিন্তু রোমান স্বভাব রোমান প্রথা তাহাদের জাতীয় স্বভাব, জাতীয় প্রথার উপর আধিপত্য লাভ করিয়াছিল। সেই টিউটনিক জাতি কেবল ইংলণ্ডে আপনাদের জাতিত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছিল। যে কেল্টিক জাতিকে তাহারা প্রায় ধ্বংশ করিয়াছিল, তাহারা টিউটন অর্থাৎ স্যাক্সন জাতিদিগের অপেক্ষা সভ্য ছিল সন্দেহ নাই, সভ্য রোমানদের শাসনে থাকিয়া তাহারা ধৰ্ম্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল।

আবার দেখ, নৰ্ম্ম্যানেরা যখন স্যাক্সন-অধিকৃত ইংলণ্ডে আধিপত্য বিস্তার করিল, তখন তাহারা আর আপনাদের জাতিত্ব রক্ষা করিতে পারিল না—অল্প দিনেই স্যাক্সনদিগের সহিত মিশিয়া গেল, কিন্তু ইহার প্রচুর কারণ বিদ্যমান আছে। প্রথমতঃ যখন স্যাক্সনেরা ব্রিটন অধিকার করিতে আইসে, তখন তাহাদের অবস্থা পশুদের অপেক্ষা অল্পই উন্নত ছিল মাত্র, তখন তাহারা স্বার্থের জন্য নহে, রক্ত-পিপাসা-শান্তির জন্যই রক্তপাত করিত, ধ্বংস কার্য্যই তাহাদের দুৰ্দ্দমনীয় উদ্যমের ক্রীড়া ছিল। রোমানদিগের অন্তঃক্ষয়কর শাসন-ভারে দুর্ব্বল হতভাগ্য কেল্টজাতি যে তাহাদের ধ্বংসপ্রবৃত্তির সম্মুখে পড়িয়া বিনষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য নাই। কিন্তু সভ্যতর নৰ্ম্মান জাতিরা যখন ব্রিটনে পদার্পণ করিল তখন অকারণে রক্তপাত করা তাহাদের ব্যবসায় ছিল না, তখন তাহারা খৃষ্টীয় ধৰ্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, ও অন্যায় কাৰ্য্য করিতে হইলেও ন্যায়ের নামে করা তাহাদের প্রথা হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ স্যাক্সন জাতিরা আপনাদের অনুর্ব্বর দেশ পরিত্যাগ করিয়া বাস করিবার নিমিত্ত দলে দলে ব্রিটনে ঝাঁকিয়া পড়িল, কেল্টদিগের উপর আধিপত্য করা তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, দেশের অধিবাসী হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, এরূপ অবস্থায় দেশের প্রাচীন অধিবাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করাই তাহাদের স্বার্থ ছিল। কিন্তু নৰ্ম্মানেরা ব্রিটন শাসন করিতে আসিয়াছিল, ব্রিটনের অধিবাসী হওয়া তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল না, ব্রিটনের অধিপতি হওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তৃতীয়তঃ কেল্টদিগের সহিত স্যাক্সনদিগের ধৰ্ম্ম আচার ব্যবহার নীতি স্বভাব কোন বিষয়েই ঐক্য ছিল না, কিন্তু স্যাক্সন ও নৰ্ম্মানদের মধ্যে অনেক ঐক্যস্থল ছিল। ভারতবর্ষ শাসন করিবার জন্য ও এখানে বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত যে সকল অল্প সংখ্যক ইংরাজ বাস করে তাহারা নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ হইলেই আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে, আবার নূতন দল এদেশে আগমন করে, কিন্তু এরূপ না হইয়া যদি অল্প সংখ্যক শাসয়িতৃদল এদেশে চিরকাল বাস করিত, তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র দল বিশেষ প্রতিবন্ধক না পাইলে খুব সম্ভবতঃ ভারতবর্ষীয়দের সহিত মিশিয়া যাইত। নৰ্ম্মানদের সেই অবস্থা হইয়াছিল, নৰ্ম্ম্যাণ্ডি হইতে এক দল নৰ্ম্ম্যান ব্রিটনদিগকে অধীনে রাখিবার নিমিত্ত ব্রিটনে গিয়াছিল, কিন্তু তাহারা আর স্বদেশে ফিরিল না। ব্রিটন

বিজেতা যখন স্বয়ং ব্রিটনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন তখন জেতা ও জিতদিগের মধ্যে মিলন না হওয়াই আশ্চর্য্য। হিন্দু-জাতি যদি নিতান্ত সাতন্ত্র-প্রিয় না হইত, তাহা হইলে মুসলমান বিজেতাদিগের সহিত হয়ত মিলিয়া যাইত।

দূর পর্য্যন্ত দেখিতে গেলে যে জাতিই ইংলণ্ড জয় করিয়াছে সকলেই টিউটনিক বংশভূত। স্যাক্সন, ডেনিষ ও নর্ম্মান সকলেই এক জাতীয় লোক। টিউটনিক জাতিদিগের জাতিগত স্বভাব অনুসারে. নর্ম্ম্যান অর্থাৎ Northmanগণ দলে দলে তাহাদের জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া দেশে দেশে দস্যুতা করিয়া ফিরিত। এই মহা দুর্দ্দান্ত সামুদ্রিক দস্যুগণের তরণী দূর হইতে দেখিলে সমস্ত য়ুরোপ কম্পিত হইত, ভূমধ্যস্থ সাগরে এই নর্ম্ম্যান দস্যুদের জাহাজ দেখিয়া মহাবীর শার্লমেন এক দিন অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহারা অসাধারণ সামুদ্রিক ছিল, ইহাদের রক্তে Blake এবং Nilson সৃষ্ট হইয়াছিল, ইহাদেরি নিকট হইতে ইংরাজেরা সুনাবিকতার বীজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সত্য মিথ্যা জানি না, প্রবাদ আছে, ইহারা কলম্বসের বহুপূর্ব্বে আটলাণ্টিক পার হইয়াছে। পূর্ব্বকালে ফিনিসীয়গণ সামুদ্রিক ছিল কিন্তু তাহারা বাণিজ্য করিবার নিমিত্ত দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিত, অর্থ উপার্জ্জিত হইলে স্বদেশে ফিরিয়া যাইত, কিন্তু নর্ম্মানগণ আপনাদের কুজ্ঝটিকাময় অন্ধকার অনুর্ব্বর দেশ পরিত্যাগ করিয়া উজ্জ্বল, ধনধান্যশালী ইটালি ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে চির আশ্রয় গ্রহণ করে। আশ্চর্য্য এই যে যেখানেই গিয়াছে সেই খানেই তাহাদের জাতিত্ব লোপ পাইয়াছে, এখন আর নর্ম্ম্যান বলিয়া একটি জাতি নাই। যদিও নর্ম্ম্যান জাতি স্যাক্সনদের সঙ্গে মিশিয়া গেল তথাপি ইংরাজ-ইতিহাসে তাহারা ঘোরতর পরিবর্ত্তন বাধাইয়াছিল। নর্ম্ম্যানেরা না মিশিলে ইংরাজেরা এ ইংরাজ হইত কি না সন্দেহস্থল। আমরা ফ্রান্সে নর্ম্ম্যানদের উপনিবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইংলণ্ড পর্য্যন্ত তাহাদের অনুগমন করিব।

ফ্রান্সে এখন ক্লোভিস্ (Clovis) বংশোদ্ভব রাজগণ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন, ও শার্লমেন-বংশীয় রাজগণের রাজপ্রভাব জীর্ণ প্রায় হইয়াছে, এমন সময়ে উত্তর দেশীয় ক্ষুধিত পঙ্গপাল ফ্রান্সের উর্ব্বর ক্ষেত্রে ঝাঁকিয়া পড়িল। প্যারিস তখন ফ্রান্সের রাজধানী ছিল না। নর্ম্ম্যানদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ফ্রান্সের দুর্ব্বল অধিপতি, Charles রবর্টকে (Roberts the Strong) এক বৃহৎ জায়গীর দিয়া সীমান্ত রাজ্যে অধিষ্ঠিত করেন। রবর্টের পুত্র ওডোর সময়ে প্যারিস্ সেই রাজ্যের প্রধান নগরী হয়। ফরাসীরাজ তখন হয়ত সন্দেহ মাত্র করেন নাই যে তিনি বহিঃশত্রু হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য গৃহের মধ্যে শত্রু পোষণ করিতেছেন। যখন ফ্রান্স-অধিপতির রাজকীয় উপাধি ভিন্ন অন্য বড় একটা কিছু অবশিষ্ট ছিল না তখন বলীয়ান্ প্যারিসের জায়গীরপতি

তাঁহার সিংহাসনের প্রতি এক একবার কটাক্ষপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে নর্ম্ম্যানগণ প্রকৃত প্রস্তাবে ফ্রান্সের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইল। তখন ফ্রান্সের বড় দুরবস্থা। বলিতে গেলে, তখন বর্ত্তমান ফ্রান্স গঠিত হয় নাই, তখন পুরাতন ফ্রান্স জীর্ণ হইয়া পড়িতেছিল। ফ্রান্স তখন খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছিল। ভিন্ন লোক তোমার শত্রু না হইতে পারে, কিন্তু আপনার লোক ভিন্ন হইয়া গেলে সে তোমার শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। ফ্রিমেন সাহেব অতি যথার্থ কথা বলিয়াছেন যে, ফ্রান্সের প্রতি বিভিন্ন খণ্ড যদি বিভিন্ন দেশ হইয়া যাইত, তাহাদের মধ্যে যদি কোন যোগ না থাকিত, তবে সে বিভাগে ভয়ের কারণ থাকিত না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অধিরাজ্যস্বামীর ইচ্ছা তাঁহার সীমা বাড়াইয়া লন— বাহিরের শত্রু আক্রমণ করিলে জাতীয় ভাবে সকলে একত্রে মিলিত হইয়া তাহাকে বাধা দেওয়া দূরে থাকুক, সকলেই ভয় করিতে থাকে, পাছে তাহাদের মধ্যে আর কেহ শত্রুর সাহায্য লইয়া তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করে, অতএব তাহা সহজেই মনে হইতে পারে যে, আগে হইতে আমিই বে কেন শত্রু-সাহায্যের সুবিধা ভোগ না করিয়া লই!"

তখন যুরোপের অবস্থা অতি শোচনীয় ছিল। চারি দিক হইতে মুমূর্ষু অথবা মৃত রোমীয় প্রভাবের উপর শকুনি ও গৃধিনীদল ঝাঁকিয়া পড়িতেছিল। তখন দারুণ অরাজকতার কাল। সারাসীনগণ সার্ডিনিয়া ও সিসিলি অধিকার করিয়া গ্রীস্, ইটালি, ও নিকটবর্ত্তী দেশ সমূহে উপদ্রব করিতেছিল। দুর্দ্দান্ত স্ক্ল্যাভোনীয়গণ (Sclavonians) জর্ম্মনীর অধিকার হইতে বোহেমিয়া, পোল্যাণ্ড, এবং প্যানোনিয়া (আধুনিক অষ্ট্রিয়া) কাড়িয়া লইয়াছিল। তাতার জাতীয় দস্যুদল নিদারুণ উপপ্লবে সমস্ত ইটালী, জর্ম্মানী ও দক্ষিণ ফ্রান্স কম্পিত করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা এই উত্তর দেশীয় সামুদ্রিক দস্যুগণ এই নর্থম্যান নরশোণিত-পিপাসুগণ প্রচণ্ড ছিল। উপর্য্যুপরি ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তাহারা বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা যখন ইংলণ্ড আক্রমণ করিত, তখন ফ্রান্স বিশ্রাম করিত, যখন ফ্রান্স অক্রমণ করিত তখন ইংলণ্ড বিশ্রাম করিত। Charles the Baldর রাজত্বকালে ইহারা ফ্রান্সের অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিতে পারিয়াছিল। তখন চার্লস ও তাঁহার পরিবারের মধ্যে গৃহ-বিবাদ ঘটিয়া রক্তপাতে ফ্রান্স দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাজগণ অবাধ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

নর্থম্যান্ দস্যুদল ফ্রান্সে এবং ইংলণ্ডে নূতন প্রকার যুদ্ধের প্রথা অবলম্বন করিয়াছিল। নদী বাহিয়া তাহারা যে দ্বীপ পাইত, সেই স্থানেই দুর্গ নির্ম্মাণ করিত। এই দুর্গ সকল তাহাদের লোপ্ত্র দ্রব্যের ভাণ্ডার ছিল, তৎসমুদায় তাহাদের রমণী ও শিশুদিগের নিবাস-ভূমি ছিল ও পরাজয়কালে আশ্রয়স্থান ছিল। দুর্ব্বল ফ্রান্স-অধিপতি অস্ত্রের বলে তাহাদের বাধা দিতে অক্ষম ছিলেন, সুতরাং অর্থ দিয়া তাহাদের অত্যাচার

নিবারণ করিতে হইত, কিন্তু ইহাতে তাহাদের অর্থতৃষ্ণা বৃদ্ধি করা হইত মাত্র। অবশেষে Charles the Simple নর্ম্মাণ্ডি দেশ দান করিয়া তাহাদের নিকট শান্তি ক্রয় করিলেন। তাহাতে হানি হইল না, নর্ম্ম্যাণ্ডি ফ্রান্স হইতে বিচ্ছিন্ন হইল না। নর্ম্ম্যানদের ভাষা ফরাসী হইল, নর্ম্মানদের আচার ব্যবহার ফরাসী হইল, নর্ম্মান জাতি ফরাসীস্ হইয়া দাঁড়াইল, নর্ম্ম্যানদিগের অধিপতি রলফ (Hrolf) নর্ম্ম্যাণ্ডির রাজা হইলেন।

ইহার এক শতাব্দী পরে নর্ম্ম্যাণ্ডির রাজা উইলিয়ম ইংলণ্ড আক্রমণ করিলেন। এক শতাব্দী পূর্ব্বে যে জাতি অকারণে ও অন্যায় রূপে ফ্রান্সে পদার্পণ করিয়াছিল আজ তাহারাই পররাষ্ট্র ইংলণ্ড আক্রমণ করিতে চলিল। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ডেনিষ দস্যুদলের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অন্যায় কার্য্যের উপর একটা ন্যায়ের আবরণ না পরাইতে পারিলে তাহাদের লজ্জা বোধ হয়। ন্যায্য রূপে ইংলণ্ডের সিংহাসন তাঁহার প্রাপ্য বলিয়া উইলিয়ম ইংলণ্ডের দ্বারে গিয়া আঘাত দিলেন। ন্যায়কে বল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করাই যেন তাঁহার উদ্দেশ্য, এমনি একটা ভান করিলেন ইংলণ্ড-জয়ের কাহিনী আজ আর নূতন করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে না সকলেই তাহা জানেন।

শতাব্দী পূর্ব্বে নর্ম্ম্যান্রা যখন ফান্সে দস্যুতা করিত তখন লোকে তাহাদের দস্যু বলিত, শতাব্দী পরে যখন তাহারা ইংলণ্ডে দস্যুতা করিল, তখন লোকে তাহাদের বিজয়ী কহিল। কিন্তু এই এক শতাব্দীর মধ্যে নর্ম্ম্যান জাতির কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখ, দেখিবে, তাহারা সেই দুর্দ্দান্ত, বিপদ-অন্বেষী দস্যুই রহিয়াছে, কেবল ফরাসী কথা কহিতে ও ফরাসী জাতির আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। যদিও তাহারা ফরাসীদের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি নর্ম্ম্যান জাতি বলিয়া তাহাদের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল। সভ্য জাতির উপযোগী শিল্পে তাহাদের সুরুচি জন্মিয়াছে; নর্ম্ম্যান অধিকারের পর হইতে শিল্প-সমাগম-শূন্য ইংলণ্ডে শত শত সুশোভন গির্জ্জা ও প্রাসাদ নির্ম্মিত হইল। এক শতাব্দীর মধ্যে এই অসভ্য দস্যুদিগের হৃদয়ে সৌন্দর্য্য-জ্ঞান উদ্বোধিত হইল। নর্ম্ম্যাণ্ডির সমাজে বিদ্যা যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইল। ল্যান্ফ্রেঙ্কের (Lanfrenc) প্রতিষ্ঠিত বেকের বিদ্যালয় (School of Bec) তখনকার প্রধানতম বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে গণ্য হইল। বিজেতা উইলিয়মের পুত্র হেন্‌রির বিদ্বান বলিয়া খ্যাতি ছিল, তাঁহার উপাধি ছিল সুপণ্ডিত, (Beanclirk) অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের ফরাসী ভাষায় এমন ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল যে, এই হঠাৎ-সভ্য দস্যুরা ফরাসীদের মতই কবিতা ও গদ্য লিখিতে পারিত। কিন্তু তথাপি তাহাদের অন্তরে অন্তরে সেই টিউটানিক ভাব জাজ্জ্বল্যমান ছিল। সভ্যতার মূল তাহাদের হৃদয়ে গাঢ় ভাবে নিহিত হইতে পারে নাই। তাহাদের নিষ্ঠুরতার কাহিনী যদি পাঠ কর

তবে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। বিজিত ইংলণ্ডে তাহারা লোকদের পা বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিত, ও সেই নিয়শির ব্যক্তিদের ধূম সেবন করাইয়া যন্ত্রণা দিত। কখনো বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কখনো বা মুণ্ড বাঁধিয়া হতভাগ্যদের ঝুলাইয়া দিত, ও তাহাদের পায়ে জলন্ত বস্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া হইত। মাথায় দড়ি বাঁধিয়া যতক্ষণ না তাহা মস্তিষ্ক ভেদ করিত, ততক্ষণ আকর্ষণ করিত। ভেক ও সরীসৃপসঙ্কুল কারাগারে লোকদের কারাবদ্ধ করিত। ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, অগভীর ও তীক্ষ্ণ-প্রস্তর-পূর্ণ সিন্দুকে জোর করিয়া মানুষ পূরিত, এবং এইরূপে তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ করিত। অনেক ব্যারণদিগের দুর্গে rachetege নামে অতি ঘৃণ্য ও ভয়ঙ্কর দ্রব্য থাকিত, সেই যন্ত্রণার যন্ত্র কড়ি কাঠ হইতে ঝুলানো থাকিত, উহা কারারুদ্ধ ব্যক্তির স্কন্ধের উপর স্থাপিত হইত, তাহার চারি দিকে তীক্ষ্ণধার লৌহ, সুতরাং সেই হতভাগ্য ব্যক্তি বসিতে, শুইতে, ঘুমাইতে পারিত না, সর্ব্বক্ষণ তাহাকে লৌহ-ভার বহন করিতে হইত। শত শত লোককে তাহারা অনাহারে যন্ত্রণা দিত। কেবল মাত্র মৃগয়া করিবার সুবিধার জন্য বিজেতা উইলিয়ম সমস্ত হ্যাম্পষিয়র অরণ্য করিয়া দিলেন, প্রতিহিংসা তুলিবার আশয়ে সমস্ত নর্থহাম্বারল্যাণ্ড জনশূন্য করিয়া দিলেন। টাইন্ ও হাম্বারের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে নয় বৎসর ধরিয়া একটি গ্রাম বা একটি জন প্রাণী মাত্র ছিল না। নর্ম্ম্যান অত্যাচারে দেশ কত খানি জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা নর্ম্ম্যান অধিকারের পূর্ব্ব ও পরের অধিবাসী সংখ্যা তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে। পূর্ব্বে ইয়র্কে ১৬০৭ গৃহ ছিল, উইলিয়মের রাজত্ব কালে ৯৬৭ অবশিষ্ট থাকে, অক্সফোর্ডে ৭২১ গৃহ ছিল, তাহার ২৪৩ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, ডচেষ্টরে ১৭২ গৃহের ৭২ মাত্র অবশিষ্ট থাকে, ডর্ব্বিতে ২৪৩ গৃহের ১৪০ ধ্বংশ হইয়া যায়. এমন আর কত কহিব? ইংলণ্ডের নর্ম্ম্যান রাজগণ, নিজে পাত্র নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়া তাঁহাদের অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের দুহিতাদের বল পূর্ব্বক বিবাহ দিয়া দিতেন। মনোমত বিবাহ করিতে হইলে অর্থদণ্ড দিতে হইত। কাউণ্টেস অফ্ অ্যালবেমার্ল্‌কে Countess of Albimarle একটি কোমরবন্ধ দিবার কথা মনে করাইয়া না দেওয়াতে রাজা জন্ উইঞ্চেষ্টরের বিষপকে ১ টন্ মদিরা দণ্ড দিতে বাধ্য করান্। এমন কত সামান্য সামান্য বিষয়ে দণ্ড দিতে হইত। বিশেষ ব্যক্তির নামে নালিষ করিতে বা বিশেষ আদালতে মকদ্দমা উত্থাপন করিতে বা বিচারে ন্যায্য ভূমিখণ্ড পাইলে তাহা দখল্ করিতে, টাকা দিতে হইত। পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিলে প্রত্যর্থী বিচারের বিলম্ব করাইতে, কখনো বা অন্যায় বিচারের সাহায্য করিতে রাজাকে টাকা দিত। সুবিচার ও শীঘ্র বিচার পাইবার জন্য ন্যায্য বিচারাকাঙ্ক্ষী অর্থীকে আবার অর্থ দিতে হইত। স্যাক্সন্ ক্রনিকল লেখক বিলাপ করিয়া বলিতেছেন "ঈশ্বর জানেন, এই হতভাগ্য ব্যক্তিগণ কি অন্যায় রূপে পীড়িত হইতেছে। প্রথমে

তাহাদের ধন সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হয় পরে তাহাদিগকে মৃত্যুমুখে নিক্ষেপ করে। এবৎসরে (১১২৪) অতি দুষ্কাল পড়িয়াছে। গুরুভার করে ও অন্যায় ডিক্রিতে সকলেই আপনার আপনার সম্পত্তি খোয়াইতেছে।" "তাহারা (নর্ম্ম্যানরা) করে করে গ্রামের সমস্ত ধন সম্পত্তি শোষণ করিয়া লইয়া অগ্নি লাগাইয়া দেয়। ভ্রমণ করিতে বাহির হইলে দেখিতে পাইবে গ্রামে একটি লোক নাই, ভূমি আকৃষ্ট পড়িয়া রহিয়াছে। যদি দেখা যায় দুই তিনটি মাত্র ব্যক্তি অশ্বারোহণে একত্রে চলিতেছে, অমনি গ্রাম শুদ্ধ লোক তাহাদিগকে লুণ্ঠনকারী মনে করিয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যায়। লোকে প্রকাশ্য ভাবে বলিত যে, ক্রাইষ্ট ও তাঁহার Saintগণ ঘুমাইয়া আছেন।" টিউটনিক স্যাক্সন বিজেতাগণ পরাজিত শেল্‌টদিগকে যেরূপ নিষ্পীড়িত করিয়াছিল, এই ফরাসীচাকৃচিক্য-প্রাপ্ত টিউটনিক জাতিও কি পরাজিত জাতির প্রতি সেই রূপ ব্যবহার করিল না? বিজিতদের দেশে বিজেতার এরূপ অত্যাচার ঐরূপ অসভ্য ব্যবহার অনেক পরিমাণে স্বাভাবিক বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের নিজ দেশে, যেখানে চারিদিক হইতে খৃষ্টধর্ম্ম-দীক্ষিত সভ্য জাতির নেত্র পড়িয়া আছে, সেখানে তাহাদের কিরূপ ব্যবহার? বালক উইলিয়ম যখন নর্ম্ম্যাণ্ডির সিংহাসনে আরোহন করিলেন, তখন বালক-হস্ত-স্থিত রাজদণ্ডের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত নর্ম্ম্যান জাতির অন্তর্গত পশুত্ব কিরূপ প্রকাশ পাইয়া উঠিল একবার আলোচনা করিয়া দেখ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামীগণের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ বিগ্রহের ত কথাই ছিল না, কিন্তু প্রকাশ্য যুদ্ধ বিগ্রহ যতই অন্যায় হউক্ না সচরাচর তাহা বীরত্বের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, সুতরাং সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিব না; কিন্তু গুপ্তহত্যা তখন এমন মুহুর্মুহু অনুষ্ঠিত হইত, যে লোকের চক্ষে তাহার ভীষণত্ব হ্রাস হইয়া গিয়াছিল। তখন ছুরিকা ও ও বিষ, রোগ বিপত্তি প্রভৃতি পৃথিবীর অনিবার্য্য আপদের মধ্যে গণ্য হইয়া গিয়াছিল। অনেক সময়ে অজ্ঞাত কারণে অসন্দিগ্ধ-চিত্ত নিরস্ত্র অতিথিকে ভোজের স্থলে হত্যা করা হইত। বেলেমের (Belesme) অধিস্বামী উইলিয়ম ট্যালভ্যাস তাঁহার স্ত্রীর ধর্ম্মিষ্ঠতা ও সচ্চরিত্রতা হেতু বিরক্ত হইয়া গোপনে হত্যাকারী রাখিয়া গির্জ্জায় যাইবার পথে তাহাকে বিনাশ করেন; বিনাশ করিবার এমন দারুণ কারণ শুনি নাই, এমন দারুণ সময় দেখি নাই! এই দুর্ব্বৃত্ত তাহার দ্বিতীয়বার বিবাহকালে বিবাহ-সভাস্থ এক অসংশয়-চিত্ত অতিথির চক্ষু উৎপাটিত ও নাসা কর্ণ ছেদন করে। এইরূপ নীতির ঘোরতর ব্যভিচার দেখিয়া ধর্ম্মযাজকগণ, নীতির সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দিলেন। গুপ্ত যুদ্ধ বিগ্রহ, অন্যায় মনুষ্যহত্যা নিবারণের জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইল না। অবশেষে হতাশ হইয়া তাঁহাদের সংস্কারের সীমা সঙ্কীর্ণ করিলেন। কতকগুলি বিশেষ

গুরুতর পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান নিষেধ করিলেন, কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তিদিগকে সম্মান করার নিয়ম করিলেন, এবং কতকগুলি বিশেষ পুণ্য মাসে বা সময়ে যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ রাখার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু নর্ম্মাণ্ডিতে এ চেষ্টা সফল হইল না। যাজকগণ বুধবার সন্ধ্যা হইতে সোমবার প্রভাত পর্য্যন্ত সকল প্রকার ভীষণ কার্য্যের অনুষ্ঠান রহিত করিতে আদেশ দিলেন; কিন্তু নর্ম্মাণ্ডিতে ছুরিকা এতক্ষণ বিশ্রাম করিতে পারিত না, নর্ম্ম্যান্ হৃদয়ে নরকের জাগ্রত উপদেবতা এতকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে আপনাকে দংশন করিতে থাকিত, সুতরাং ইহাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। অবশেষে ক্যাম্বে্র বিষপ জেরাড এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ভূপালদিগের কার্য্য রক্তপাত করা ও যাজকদিগের কার্য্য প্রার্থনা করা। এক দল পাপ করিবে, আর এক দল তাহাদের হইয়া দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে! জেরাড অন্যান্য বিষপদিগকে ক্ষান্ত হইতে পরামর্শ দিলেন, তাহাদের কার্য্য প্রার্থনা করা, তাহাদের অনধিকার চর্চ্চা করিবার আবশ্যক কি? তিনি কহিলেন, সংস্কারের নিয়ম প্রচারিত করিলে লোকের মধ্যে কপটতা প্রশ্রয় পাইবে মাত্র। কাটাকাটির মুখ হইতে নর্ম্ম্যাণদিগকে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা করা নিতান্ত দুরাশা। নিদারুণ কার্য্য নহিলে তাহারা আমোদ পাইত না। সিংহ-হৃদয় রিচার্ডকে নর্ম্ম্যান কবি কহিতেছেন, ইহা অপেক্ষা উত্তম নৃপতির কথা কখনো কাব্যে গীত হয় নাই! এই নৃপতি ক্রুসেড যুদ্ধকালে একবার শূকর-মাংস খাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। পাচক শূকর না পাওয়াতে একজন স্যারসীন্কে কাটিয়া তাহার তাজা ও কোমল মাংস রন্ধন করিয়া ছিল। সে মাংস রাজার বড়ই ভাল লাগিল, তিনি শূকরের মুণ্ড দেখিতে চাহিলেন। ভীত-হৃদয় পাচক সভয়ে নরমুণ্ড আনিয়া উপস্থিত করিল। রিচার্ডের বড়ই আমোদ বোধ হইল, তিনি হাসিয়া উঠিলেন কহিলেন "খাদ্যের এমন সুবিধা থাকিলে দুর্ভিক্ষের ভয় থাকিবে না।" জেরুজিলাম বিজিত হইলে সত্তর হাজার ৭০০০০ অধিবাসী হত হয়। দ্বিতীয় হেনরী একবার ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বালক ভৃত্যের চক্ষু ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। রিচার্ড নগর অধিকার করিলে পর স্যারাসীন-রাজ স্যারাসীন্ বন্দীদের মার্জ্জনা প্রার্থনা করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। রিচার্ড ত্রিশ জন স্যারাসীন্ বন্দীর মাথা কাটিয়া প্রত্যেক মাথায় হত ব্যক্তির নাম লিখিয়া, রন্ধন করিয়া প্রত্যেক দূতের সম্মুখে আহারার্থে রাখিতে অনুমতি দিলেন। ও তাঁহার নিজের পাত্রে যে মুণ্ড ছিল তাহা অতি উপভোগ্য পদার্থের ন্যায় খাইতে লাগিলেন। ষাট হাজার বন্দী ক্ষেত্রে আনীত হইলে নর্ম্ম্যান কবি কহিতেছেন—

ক্ষেত্র পূরি দাঁড়াইল বন্দীগণ সবে,
দেবতারা স্বর্গ হোতে কহিলেন তবে।
"মারো মারো কাহারেও ছেড়না, ছেড়না
কাটো মুণ্ড, এক জনে কোরো না মার্জ্জনা।"

শুনিলা রিচার্ড রাজা বাণী দেবতার,
ঈশে ও পবিত্র ক্রুসে কৈলা নমস্কার।

এমন নিদারুণ আদেশ নর্ম্ম্যানদের দেবতাদের মুখেই সাজে। এ ঘটনা সত্য না হইতেও পারে, কিন্তু নর্ম্ম্যান কবি রিচার্ডের গৌরব-প্রচার-মানসেই ইহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাতে কি তখনকার লোকের মনোভাব প্রকাশ পাইতেছে না? কিরূপ ঘটনায় তখনকার লোকের হৃদয়ে ভক্তি-মিশ্রিত বিস্ময় ও বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দের উদয় হইবে তখনকার কবি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। 'রিচার্ড কোন নগর অধিকার করিলে সেখানকার শিশু ও অবলাদের পর্য্যন্ত হত্যা করিতেন। এই রিচার্ডই তখনকার লোকদের নিকট দেবতার স্বরূপ, কবিদের নিকট আদর্শ বীরের স্বরূপ বিখ্যাত ছিলেন। এমন কি এই "উনবিংশ শতাব্দীর" ইংরাজি ঐতিহাসিকেরাও হয় ত তাহাকে তৈমুর বা জঙ্গিস্ খাঁর সহিত গণ্য করিতে সঙ্কোচ বোধ করিবেন। সেনল্যাকের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ইংরাজ-সৈন্যের পরাজয়ের পর সেখানে বাণ-বিদ্ধ হ্যারল্ড ভূপতিত হন, সেই থানে বসিয়া উইলিয়ম মৃত দেহরাশির মধ্যে পান ভোজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নর্ম্ম্যানেরা যখন ইংলণ্ড বিজয় করিতে আইসে, তখন তাহাদের এইরূপ অবস্থা। স্যাক্সনেরা তখন কি করিতেছে? "স্যাক্সনেরা পরস্পর জেদাজেদি করিয়া সর্ব্বদা মদ্যপানে রত আছে; দিবারাত্রি পান ভোজনেই তাহারা অর্থ ব্যয় করিতেছে, অথচ তাহাদের বাসস্থান অতিহীন। কিন্তু ফরাসী ও নর্ম্ম্যানগণ অতি অল্প ব্যয়ে জীবন যাপন করে, অথচ দিব্য বৃহৎ গৃহে বাস করে, তাহাদের আহার্য্য উত্তম, বস্ত্র অতিশয় পরিপাটী" অর্থাৎ স্যাক্সনদের এখনো শিল্পে রুচি জন্মে নাই, উত্তেজনাময় হীন আমোদেই তাহাদের জীবন কাটিতেছে। যে দিন নর্ম্ম্যানদের সহিত যুদ্ধ হইবে তাহার পূর্ব্বরাত্রে "তাহারা সমস্ত রাত পান ভোজনে মত্ত আছে। তুমি দেখিতে পাইবে তাহারা মহা যুঝাযুঝি লাফালাফি, অট্টহাস্য ও গান বাজনায় রত হইয়াছে।" তখন স্যাক্সনরা এমন মূর্খ, অনক্ষর অসভ্য ছিল যে, নর্ম্ম্যানেরা মূর্খ স্যাক্সন যাজকদিগকে ধর্ম্মমঠ হইতে দূর করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। স্যাক্সনদের এইরূপ অতি হীন অবস্থার সময় অপেক্ষাকৃত সুরুচি ও সুসভ্য নর্ম্ম্যানগণ ইংলণ্ডে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষ্যে ইংলণ্ডে শুদ্ধ যে কেবল সুশোভন প্রাসাদ উত্থিত ও বিদ্যাধ্যাপনশীল যাজকগণের সমাগম হইল তাহা নহে, নর্ম্ম্যানদের প্রবল প্রতাপে ডেন্মার্ক ও নরোয়েবাসী দস্যুদের হস্ত হইতে ইংলণ্ড পরিত্রাণ পাইল। নর্ম্ম্যানদের আগমনে ইংলণ্ডের আরো অনেক অলক্ষিত উপকার হইয়াছিল, কিন্তু বিজিত জাতি বিজেতাদের হস্ত হইতে ন্যায় ও সুবিচারের আশা করিতে পারে না, বিশেষতঃ বিজিত জাতি যখন বিজেতাদের অপেক্ষা সভ্যতায় হীন, তখন ন্যায়ের আশা হতভাগ্যদের পক্ষে দুরাশা! সম-

যোগ্য ব্যক্তির প্রতিই ন্যায়াচরণ করাই প্রায় পৃথিবীর নিয়ম, নিকৃষ্টতরদিগকে পশুবৎ ব্যবহার করিতে লোকে অন্যায় মনে করে না; যদি তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে তবে তাহা অনুগ্রহ মাত্র। পৃথিবীতে ন্যায়ের সীমাও এমন সঙ্কীর্ণ। স্যাক্সনদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল। যদি কোন জেলায় একজন নর্ম্ম্যান হত হইত, তাহা হইলে গ্রামবাসীদের হয় হত্যাকারীকে ধরাইয়া দিতে নয় প্রত্যেককে অর্থ দণ্ড দিতে হইত, কিন্তু একজন স্যাক্সন হত হইলে বড় একটা গোলযোগ হইত না। নর্ম্ম্যান ধর্ম্মাচার্য্যগণ আসিয়া স্যাক্সন-রাজা ও তপস্বীদের কবরস্থ অস্থিরাশি অমান্যের সহিত উৎখাত করিয়া ফেলিতেন Ivo Taille-bois নিকট তাঁহার প্রজারা যথানির্দ্দিষ্ট বিনতি দেখাইতে প্রাণপণ করিত। এক হাঁটু গাড়িয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিত। তাঁহাকে যত খানি মান্য ও কর দিবার কথা, তদপেক্ষা অধিক দিয়াও বেচারীরা নিষ্কৃতি পাইত না। তিনি তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিতেন, কয়েদ করিতেন, তাহাদের পশুপালের পশ্চাতে কুক্কুর লাগাইয়া দিতেন, তাহাদের বাহনদিগের মেরুদণ্ড ও পা ভাঙ্গিয়া দিতেন। এইত অত্যাচারী, উদ্ধত, গর্ব্বিত, সভ্যতাভিমানী, বিজেতা নর্ম্ম্যান জাতি।

আমরা অ্যাঙ্গ্লো নর্ম্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিবার পূর্ব্বে নর্ম্ম্যান জাতি-চরিত্র ও তাহাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লইয়া আন্দোলন করিলাম। কিন্তু ইহা যেন কেহ অনর্থক মনে না করেন। সাহিত্য মনুষ্য হৃদয়ের ছায়া মাত্র; যে জাতির সাহিত্য আলোচনা করিবে তাহাদের চরিত্র আলোচনা যদি না কর তবে তাহা দারুণ অঙ্গহীন হইবে। এই খানে বলা কর্ত্তব্য, আমরা যে, অ্যাঙ্গ্লো নর্ম্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিতে বসিয়াছি, তাহার কারণ এমন নয় যে, অ্যাঙ্গ্লো নর্ম্ম্যান সাহিত্য অতি বিপুল, অ্যাঙ্গ্লো নর্ম্ম্যান সাহিত্য-ভাণ্ডার বহু মূল্য উজ্জ্বল মণিময়। কিরূপে ইংরাজি সাহিত্য গঠিত হইল তাহা জানিতে কাহার না ইচ্ছা হইবে? ইংরাজি সাহিত্যে ও ইংরাজি চরিত্রে নর্ম্ম্যান প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়—ইংরাজি সাহিত্যের ইতিবৃত্ত জানিবার নিমিত্তই আমরা নর্ম্ম্যান সাহিত্য আলোচনা করিতেছি।

প্রথম প্রস্তাব সমাপ্ত।

অপ্সরা-প্রেম।

(গাথা)

রজনীর পরে আসিছে দিবস,
দিবসের পর রাতি।
প্রতিপদ হোতে হ'ল পূরণিমা,
দিনে দিনে দিনে বাড়িল চাঁদিমা,
দিনে দিনে দিনে, ধীরে ধীরে ধীরে,
ক্ষয় হয়ে পুনঃ আসিল সে ফিরে
ফুরালো জোছনা ভাতি॥

উঠিল তপন উদয় শিখরে,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া সারা দিন ধোরে,
ধীর পদ-ক্ষেপে অবসন্ন দেহে,
গেল গো চলিয়া বিশ্রামের গেহে
মলিন বিষণ্ণ ভাতি!
উদিছে তারকা আকাশের তলে,
আসিছে নিশীথ প্রতি পলে পলে,
পল পল করি যায় বিভাবরী,
নিভিছে তারকা এক এক করি,
হাসিতেছে উষা সতী॥

এস গো সখা এস গো—
কত দিন ধোরে বাতায়ন পাশে,
একেলা বসিয়া সখা তব আশে,
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই
পথ পানে চেয়ে রোয়েছি সদাই—
এস গো সখা এস গো!——

সুমুখে তটিনী যেতেছে বহিয়া,
নিশ্বসিছে বায়ু রহিয়া রহিয়া,
লহরীর পর উঠিছে লহরী,
গণিতেছি বসি এক এক করি—
নাই রাতি নাই দিন!
ওই তৃণগুলি হরিত প্রান্তরে
নোয়াইছে মাথা মৃদু বায়ু ভরে,
সারা দিন যায়—সারা রাত যায়
শূন্য আঁখি মেলি চেয়ে আছি হায়—
নয়ন পলক হীন!

ওই—বরষে বাদল, গরজে অশনি,
পলকে পলকে চমকে দামিনী,
পাগলের মত হেথায় হোথায়
আঁধার আকাশে বহিতেছে বায়,
অবিরাম সারারাতি।
বহিতেছে বায়ু পাদপের পরে,
বহিছে আঁধার-প্রাসাদ-শিখরে,

ভগ্ন দেবালয়ে বহে হুহু করি,
জাগিয়া উঠিছে তটিনী-লহরী
তটিনী উঠিছে মাতি!

কোথায় গো সখা কোথা গো!
একাকী হেথায় বাতায়ন পাশে
রোয়েছি বসিয়া সখা তব আশে,
দেহে বল নাই চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রোয়েছি সদাই,
কোথায় গো সখা কোথা গো!

যাহারা যাহারা গিয়েছিল রণে,
সবাই ফিরিয়া এসেছে ভবনে,
প্রিয় আলিঙ্গনে প্রণয়িনীগণ
সকলেই আজ সুখে নিমগন
কোন জ্বালা নাহি জানে!
আমিই কেবল একা আছি পোড়ে
পরিশ্রান্ত অতি—আশা কোরে কোরে—
নিরাশ পরাণ আরত রহে না
আরত পারি না, আরত সহে না
আরত সহেনা প্রাণে॥
এস গো সখা এস গো!

একাকী হেথায় বাতায়ন পাশে,
একেলা বসিয়া সখা তব আশে,
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রোয়েছি সদাই
এস গো সখা এস গো!—

আসে সন্ধ্যা হোয়ে আঁধার আলয়ে—
একেলা রয়েছি বসি,
শ্রম হোতে সবে আসিয়াছে ফিরে,
জ্বলিল প্রদীপ কুটীরে কুটীরে,
শ্রান্ত মাথা রাখি বাতায়ন দ্বারে
নীরব প্রান্তরে চেয়ে আছি হা রে—
আকাশে উঠিছে শশি!
কত দিন আর রহিব এমন
মরণ হইলে বাঁচি রে এখন!
অবশ হৃদয়, দেহ দুরবল,
শুকায়ে গিয়াছে নয়নের জল,
যেতেছে দিবস নিশি!

কোথায় গো সখা কোথা গো!
কত দিন ধোরে সখা তব আশে,
একেলা বসিয়া বাতায়ন পাশে,
দেহে বল নাই, চোখে ঘুম নাই,
পথ পানে চেয়ে রয়েছি সদাই
কোথা গো সখা কোথা গো!—

———

(অপ্সরার উক্তি)

অদিতি-ভবন হইতে যখন
আসিতে ছিলাম অলকা-পুরে,—
মাথার উপরে সাঁঝের গগন—
শারদ তটিনী বহিছে দূরে!
সাঁঝের কনক-বরণ সাগর
অলস ভাবে সে ঘুমায়ে আছে,
দেখিনু দারুণ বাধিয়াছে রণ
গউরী-শিখর গিরির কাছে!
দেখিনু সহসা বীর একজন
সমর-সাগরে গিরির মতন
পদতলে আসি আঘাতে লহরী
তবুও অটল পারা!
বিশাল ললাটে ভ্রূভঙ্গীটি নাই,
শান্ত ভাব জাগে নয়নে সদাই—
উরস বরষে বরষার মত
বরিষে বাণের ধারা!

অশনি-ধ্বনিত ঝটিকার মেঘে
দেখেছি ত্রিদশপতি,
চারি দিকে সব ছুটিছে ভাঙ্গিছে,
তিনি সে মহান্ অতি!
এমন উদার শান্ত মুখ ভাব
দেখি নি তাঁহারো কভু।
পৃথ্বী নত হয় যাঁহার অসিতে,
স্বরগ যে জনে পারেন শাসিতে,
দুরবল এই নারী-হৃদয়ের
করিনু তাঁহারে প্রভু!

দিলাম বিছায়ে দিব্য পাখা-ছায়া
মাথার উপরে তাঁর,
মায়া দিয়া তাঁরে রাখিনু আবরি
নাশিতে বাণের ধার!

প্রতি পদে পদে গেনু সাথে সাথে
দেখিনু সমর ঘোর—
শোণিত হেরিয়া শিহরি উঠিতে
লাগিল হৃদয় মোর!

থামিল সমর জয়ী বীর মোর
উঠিলা তরণী পরে,
বহিল মৃদুল পবন, তরণী
চলিল গরব ভরে!

গেল কত দিন, পূরব-গগনে
উঠিল জলদ রেখা!
মুহু ঝলকিয়া অবশ দামিনী
দূর হোতে দিল দেখা!

ক্রমশঃ জলদ ছাইল আকাশ
অশনি সরোষে জ্বলি,
মাথার উপর দিয়া তরণীর
অভিশাপ গেল বলি!

নাবিকেরা এবে বিধাতারে তবে
ডাকিল কাতর স্বরে,
তরণী হইতে কোলাহল ধ্বনি
উঠিল আকাশ পরে!

একটি লহরী উঠেনি সাগরে
একটু বহেনি বায়—
তড়িত-চরণে অশনি কেবল
দিক হোতে দিকে ধায়!

সহসা ভ্রুকুটী উঠিল সাগর
পবন উঠিল জাগি,
শতেক উরমি মাতিয়া উঠিল,
সহসা কিসের লাগি!

সাগরের অতি দুরন্ত শিশুরা
কহিয়া অস্ফুট বাণী,
উলটি পালটি খেলিতে লাগিল
লইয়া তরণী খানি!

দারুণ উল্লাসে সফেন সাগর
অধীর হইল হেন—
ভাঙ্গে-বিভোলা মহেশের মত
নাচিতে লাগিল যেন?

তরণীর পরে একেলা অটল
দাঁড়ায়ে বীর আমার,
শুনি ঝটিকার প্রলয়ের গীত
বাজিছে হৃদয় তাঁর।

দেখিতে দেখিতে ডুবিল তরণী
ডুবিল নাবিক যারা—
বুঝি বুঝি বীর সাগরের সাথে
হইল চেতন হারা!

আকাশ হইতে নামিয়া, ছুঁইনু
অধীর জলধি জল,
পদ তলে আসি করিতে লাগিল
উরমিরা কোলাহল।

অধীর পবনে ছড়ায়ে পড়িল
কেশ পাশ চারি ধার—
সাগরের কানে ঢালিতে তখন
লাগিনু গীতের ধার।

গীত।



কেন গো সাগর এমন চপল,
এমন অধীর-প্রাণ,
তবে শুন গো আমার গান
তবে শুন গো আমার গান!

পূরণিমা-নিশি আসিবে যখন
আসিবে যখন ফিরে—,
তার মেঘের ঘোমটা সরায়ে দিব গো
খুলিয়ে দিবগো ধীরে!

প্রতি হাসি তার পড়িবে তোমার
বিশাল হৃদয় পরে,
কত আনন্দে উরমি জাগিবে তখন
নাচিবে পুলক ভরে!

তবে থামগো সাগর থামগো,
কেন হোয়েছ অধীর-প্রাণ?
দেখ তটিনী সবাই পরমাদ গণি,
মাগিছে অভয় দান—

তারা গাহিবে প্রেমের গান,
তারা কানন হইতে এনেছে কুসুম
করিতে তোমারে দান—
তারা হৃদয় হইতে শত প্রেম-ধারা
করাবে তোমারে পান!

তবে থাম গো সাগর—থাম গো,
কেন হোয়েছ অধীর-প্রাণ?

যদি উরমি-শিশুরা নীরব-নিশীথে
ঘুমাতে নাহিক চায়,
তবে জানিও সাগর বোলে দিব আমি
আসিবে মৃদুল বায়—

কানন হইতে করিয়া তাহারা
ফুলের সুরভি পান,
কানে কানে ধীরে গাহিয়া যাইবে
ঘুম পাড়াবার গান!

অমনি তাহারা ঘুমায়ে পড়িবে
তোমার বিশাল বুকে,
প্রতি উরমিরা দেখিবে তখন
চাঁদের স্বপন সুখে!

যদি কভু হয় খেলাবার সাধ,
আমারে কহিও তবে—
শতেক পবন আসিবে অমনি
হরষ আকুল রবে—

সাগর-অচলে ঘেরিয়া ঘেরিয়া
হাসিয়া সফেন হাসি

মাথার উপরে ঢালিও তাহার
প্রবাল মুকুতা-রাশি!

তবে রাখগো আমার কথা,
তবে শুনগো আমার গান,
তবে থামগো সাগর, থামগো
কেন হোয়েছ অধীর-প্রাণ?

দেখ প্রবাল-আলয়ে সাগর-বালা
গাঁথিতেছিল গো মুকুতা-মালা,
গাহিতেছিল গো গান,
আঁধার-অলক কপোলের শোভা
করিতেছিল গো পান!

কেহবা হরষে নাচিতেছিল গো
হরষে পাগল-পারা,
কেশ-পাশ হোতে ঝরিতে ছিল গো
নিটোল মুকুতা-ধারা!

কেহ মণিময় গুহায় বসিয়া
মৃদু অভিমান ভরে,
সাধাসাধি করে প্রণয়ী আসিয়া
একটি কথার তরে।

এমন সময়ে শতেক উরমি
সহসা মাতিয়ে উঠেছে সুখে,
সহসা এমন লেগেছে আঘাত
বালিকাদিগের কোমল-বুকে!

ওই দেখ দেখ—আঁচল হইতে
ঝরিয়া পড়িল মুকুতা রাশি—
ওই দেখ দেখ—হাসিতে হাসিতে
চমক লাগিয়া ঘুচিল হাসি?

ওই দেখ দেখ—নাচিতে নাচিতে
থমকি দাঁড়ায় মলিন মুখে—
ওই দেখ বালা অভিমান ত্যজি
ঝাঁপায়ে পড়িল প্রণয়ী-বুকে!

থামগো সাগর, থামগো—থামগো
হোয়োনা অমন পাগল পারা—
আহা, দেখ দেখি সাগর-ললনা
ভয়ে একেবারে হোয়েছে সারা!

বিবরণ হোয়ে গিয়েছে কপোল
মলিন হইয়ে গিয়েছে মুখ,
সভয়ে মুদিয়া আসিছে নয়ন
থর থর করি কাঁপিছে বুক—

আহা থাম তুমি থামগো—
হোয়োনা অধীর প্রাণ,
রাখগো আমার কথা
ওগো শোনগো আমার গান!!

জীবরহস্য।

উপক্রমণিকা।

আমরা এই অসীম বিশ্বের বিষয় যতই আলোচনা করি, ততই আমাদের মনে কৌতূহল ও বিস্ময় রসের আবির্ভাব হয়। পৃথিবী কিরূপে স্বস্থানে উপনীত হইল, ইহার উপাদানই বা কি এবং কত কালই বা ইহা এই ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, এই সকল বিষয় নির্ণয় করা অতি দুরূহ।

কোন যন্ত্র আপনাপনি চলিতেছে দেখিলে আমরা প্রথমেই উহার গতির কারণ অনুসন্ধান করি এবং সুবিধা হইলে ঐ যন্ত্রের এক একটি অংশ পৃথক্ করিয়া না দেখিয়া ক্ষান্ত হই না। কিন্তু পৃথিবীর সমুদায় অংশ এই রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। পৃথিবীর বিষয় জানিতে হইলে উহার অভ্যন্তরে ও উপরিভাগে যে সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় তৎসমুদয়, এবং আমাদিগের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী অপরাপর জগতের প্রকৃতি তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে হয়। এইরূপ অনুসন্ধান দ্বারা যে জ্ঞান জন্মে তদ্দ্বারা পৃথিবীর অনেক নিগূঢ় বিষয় জানা যাইতে পারে।

পৃথিবী কিরূপে এখানে উপস্থিত হইল, একথা জিজ্ঞাসা করা কখনই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ—প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের এই পৃথিবী মুহূর্ত্তমাত্রও এক স্থানে স্থির নহে। প্রত্যুত চিরকালই উহা মণ্ডলাকারে সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতেছে। এমন কি উহার গতির বেগ ঘণ্টায় ৩০,০০০ ক্রোশ অপেক্ষাও অধিক। এই অত্যাশ্চর্য্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জগৎ বৃহত্তর জগৎকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আমরা এই মাত্র জানি যে চন্দ্র প্রায় এক-মাসে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। কিন্তু সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে উহাদের উভয়ের (চন্দ্র ও পৃথিবীর) একবৎসর কাল অতীত হয়। কোন কোন গ্রহ আবার স্বীয় উপগ্রহের সহিত সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর কক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকে। সুতরাং ঐ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতে উহাদের অনেক কাল অতিবাহিত হয়। যথা—বৃহস্পতি গ্রহ (Jupiter)। এদিকে শুক্র গ্রহ (Venus) পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য্যের অধিকতর সন্নিহিত বলিয়া ক্ষুদ্রতর কক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক, অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে সূর্য্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে পৃথিবী ঈদৃশ ভয়ানক বেগে সূর্য্যের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিতেছে জানিয়াও আমরা উহার গতি অনুভব করিতে পারি না। বরং আমাদের চক্ষে উহা স্থির ও অচল বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু বাস্তবিক পৃথিবী যে ঘণ্টায় ৩০,০০০ ক্রোশ করিয়া চলিতেছে তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয়

নাই। উল্লিখিত গতি প্রতীত না হইবার কারণ এই যে আমরা ভূ-পৃষ্ঠে যাহা কিছু দেখিতে পাই, সকলই পৃথিবীর সহিত সমান বেগে ধাবিত হয়, সুতরাং ঐ গতি আমাদের উপলব্ধি হয় না।

পৃথিবী কিরূপে সৃষ্ট হইল ইহা জিজ্ঞাসা করিলে অধুনাতন জ্যোতির্ব্বেত্তারা এই কথা বলিয়া থাকেন যে উহা একদিন সূর্য্যের অংশভূত ও উহার ন্যায় উত্তপ্ত ছিল, কিন্তু কাল সহকারে তথা হইতে পৃথক্ হইয়া ক্রমশঃ শীতল ও জীবজন্তুর বাসোপযোগী হইয়াছে। তাঁহাদের মুখে ইহাও শুনা যায় যে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া নিরীক্ষণ করিলে চন্দ্রে পর্ব্বত ও উপত্যকার অবস্থান এবং মঙ্গল গ্রহে (mars) সমুদ্র, তুষার ও মেঘরাশি পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিবীর ন্যায় সৌর জগতের অন্যান্য গ্রহও সূর্য্য অথবা তাদৃশ প্রকাণ্ড কোন জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে এবং উহা হইতেই তাপও অনেক প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর পৃথিবী কিরূপ উপাদানে নির্ম্মিত এবং উহাতে মৃত্তিকা ভিন্ন অপর কোন পদার্থ আছে কি না তাহা দেখা যাউক। বস্তুত সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কি কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বকালে উহার উপর কীদৃশ জীবজন্তু ও বৃক্ষলতাদি সমুৎপন্ন হইয়াছিল এবং পৃথিবী যে অতি প্রাচীন তাহারই বা প্রমাণ কি, এই সকল বিষয় আলোচনা করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য।

পৃথিবী সৃষ্টি হইতে কতকাল পর্য্যন্ত এই ভাবে অবস্থিতি করিতেছে, ত্রিশ কি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে কেহই তাহা জানিতেন না। এমন কি তৎকালে অনেকের এই বিশ্বাস ছিল যে মানবজাতি পৃথিবীর নিতান্ত প্রাচীন অধিবাসী নহে। অনেকে আবার ইহাও জানিতেন যে মনুষ্য জন্মিবার বহুকাল পূর্ব্বে পৃথিবীতে কতকগুলি বৃহদাকার জীব সমুৎপন্ন হয়। ঐ সকল জীবের মৃত্তিকা-নিহিত অস্থিই তাহার প্রমাণ স্বরূপ। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল মহাত্মারা ইহাও বলিয়া গিয়াছেন যে পৃথিবীতে মানবজাতির আদি পুরুষ বা আদি বংশ সৃষ্ট হইবার অনেক পূর্ব্বে তথায় মৎস্য, কর্কট ও পতঙ্গ প্রভৃতি নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের অবস্থান-চিহ্ন লক্ষিত হইত। জীব-রহস্য মধ্যে ক্রমশঃ এই সকল প্রাণি ও মানবজাতির অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত করা যাইবে। কি প্রমাণানুসারে অধুনাতন পণ্ডিতেরা মনুষ্যকে পৃথিবীর অতি প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া থাকেন এবং কি রূপেই বা তাঁহারা ঐ সকল বিষয় জানিতে পারিয়াছেন, তাহাও আমরা প্রকাশ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা পাইব।

পূর্ব্বোক্ত জীবিত-ইতিহাস গুলি এক স্থান হইতে সংগ্রহীত হয় নাই। পণ্ডিতগণ নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া উহার পৃথক পৃথক অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ঈদৃশ যত্ন ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত ভূতত্ত্বজ্ঞেরা উহার সমুদায় অংশ প্রকাশ করিতে পারেন নাই, সুতরাং যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাই আমরা প্রকাশ করিতেছি।

জীবরহস্যের কতক অংশ ভূপৃষ্ঠে, কতক ভূগর্ভে, কতক বা পর্ব্বতগহ্বরে এবং অপর কতক গুলি নদী অথবা সমুদ্রগর্ভে দৃষ্ট হইয়া থাকে। নদীর নিম্নভাগ কিম্বা পর্ব্বতের মধ্য দিয়া রেলের রাস্তা প্রস্তুত করিবার সময়ও ভূগর্ভের অনেক জীবরহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। এই সকল তলবর্ত্ম এতই দীর্ঘ ও গভীর যে তন্মধ্যে সমুচ্চ মন্দির সংস্থাপন করিলেও তাহার অগ্রভাগ দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ ঐ সকল স্থান খনন করিবার সময় কর্ম্মকারকেরা যে সকল পশুপক্ষির অস্থি এবং মৎস্য, কচ্ছপ, শম্বুক ও অপর কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গের দেহাবশেষ প্রাপ্ত হয়, তদ্দ্বারা জীবরহস্যের অনেক বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। জীবের দেহাবশেষ গুলি ভূগর্ভের এতদূর নিম্নে অবস্থিত যে তাদৃশ অপরিচিত স্থানে কোন ব্যক্তি কৌতূহল পরতন্ত্র হইয়া ঐ সকল বস্তু রাখিয়া দিবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে। বরং পুরাকালে পৃথিবীতে যে ঐ সকল জীব বর্ত্তমান ছিল, তাদৃশ নিম্ন প্রদেশে উহাদের অবস্থানই তাহার প্রমাণ। উল্লিখিত দেহাবশেষ ব্যতীত ভূপৃষ্ঠের অনতি নিম্নে, ধাতু, অস্থি ও প্রস্তরনির্ম্মিত নানাবিধ অস্ত্র ও শিল্পযন্ত্র এবং মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী বিবিধ অলঙ্কার ও মৃণ্ময় পাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে ঐ সকল দ্রব্য কোননা কোন সময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত ও ব্যবহৃত হইত। এই জন্যই খাত খনন করিবার সময় ও কোন কোন পর্ব্বত-গুহামধ্যে ঐ সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হইয়া থাকে। সেই রূপ মৃদঙ্গার-খণিতেও ভূগর্ভস্থ নানা প্রকার পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। এই সকল খণির মধ্যে কোন কোনটা আবার এতই গভীর যে তিন চারি খানি বাঁশ উপর্য্যুপরি বাঁধিয়া তন্মধ্যে নামাইয়া দিলেও উহার তলদেশ স্পৃষ্ট হয় না। সুতরাং ঈদৃশ গভীরতম প্রদেশে উপনীত হইতে হইলে, কর্ম্মচারীদিগকে অনেক দূর পর্য্যন্ত মৃত্তিকারাশি ভেদ করিয়া যাইতে হয়। তখন এই মৃত্তিকারাশি স্তরে স্তরে সজ্জীভূত বলিয়া প্রতীত হয়। বস্তুত একখানি লোহিত ইষ্টকের উপর অপর একখানি কৃষ্ণবর্ণের ইষ্টক এবং তদুপরি আর একখানি শ্বেতবর্ণের ইষ্টক এই রূপে পর্য্যায়ক্রমে রাখিয়া দিলে যে রূপ দেখায় পূর্ব্বোক্ত মৃত্তিকারাশির দৃশ্যও সেই রূপ। এই স্তরগুলি কোথাও কঠিন মৃত্তিকার ন্যায়, কোথাও বালুকাময়, কোথাও কর্দ্দমসদৃশ এবং কোথাও বা কর্করবৎ আকার ধারণ করে। এদেশে কূপ খনন করিবার সময় মৃত্তিকামধ্যে এরূপ স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ, রৌপ্য ও লোহ প্রভৃতি ধাতুর খনিতেও পূর্ব্বোক্ত স্তর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেইরূপ যে সকল পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ হইতে খড়িমাটি ও মার্ব্বল নামক প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই সকল স্থান খনন করিতে করিতেও জীবরহস্যের অনেক বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে। অনেক স্থলে আবার প্রকৃতি এ বিষয়ে আমাদিগের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। সমুদ্র ও নদীতীরস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি-

শ্রেণীর উপর নিয়ত জলের প্রতিঘাত হওয়াতে তন্মধ্যে যে সকল গহ্বর নির্ম্মিত হয় সেই সকল গহ্বর ও উহাদের পার্শ্বদেশ হইতেও নানাবিধ জীবের অস্থি ও অপরাপর কঠিন আবরণ (Shells) প্রাপ্ত হওয়া যায়। এবং হিমালয় প্রভৃতি বৃহদাকার পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যেও কোন কোন স্থলে চিড় থাকাতে যে সকল স্তর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাতেও বহুবিধ জীবের দেহাবশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল নদী প্রবাহিত হইবার সময় স্থল বিশেষে গভীর খাত খনন করে, তদ্দ্বারা জীবরহস্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিষয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ এসম্বন্ধে প্রকৃতির শক্তি, মনুষ্যশক্তি অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক।

জীবরহস্যের এই সকল অত্যাশ্চর্য্য বিষয়গুলি প্রথমতঃ পাঠকগণের বোধগম্য না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যতই তাঁহারা এই সকল বিষয়ের আলোচনায় ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন ততই তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে। আমরা যে ভূমির উপর সতত বিচরণ করি, তাহার গর্ভে যে ঈদৃশ অসংখ্য জীবের দেহাবশেষ প্রোথিত আছে, ইহা সহসা কাহারও মনে উদয় হয় না। অথচ এই ভূগর্ভে যে জীবরহস্যের অধিকাংশ বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আর সংশয় নাই। বলিতে কি, রামায়ণ ও মহাভারতে যে সকল অপরূপ মনুষ্য ও পশু পক্ষী বিষয়ক রচিত গল্প শুনা যায়, ভূগর্ভে তদপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর জীব জন্তুর চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ পৃথিবীর পুরাকালীন অধিবাসিগণের দেহাবশেষ মধ্যে এমন অনেক জীবের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে যাহাদের আকার প্রকার দেখিলে রামায়ণ প্রভৃতি উপন্যাস-রচয়িতার কল্পনাশক্তিকেও হীনপ্রভ বলিয়া বোধ হয়। এমন কি তৎকালে সত্য বিষয়ও আমাদের মিথ্যা ও কল্পিত বলিয়া ভ্রম জন্মে। আমরা এক্ষণে উড্ডীয়মান সর্প, বা হস্তিপ্রমাণ বৃহদাকার পক্ষী (Roc), গগনস্পর্শী লতিকা, অথবা হোয়েল মৎস্যের ন্যায় গৃহগোধিকা, গণ্ডার বা সিন্ধুঘোটক সদৃশ জড় (Sloth), কিংবা ওকবৃক্ষের ন্যায় সমঙ্গা জাতীয় উদ্ভিদ্ ও শিয়াকুলের বনের ন্যায় শৈবাল প্রভৃতি বস্তু আর কিছুই দেখিতে পাই না, তথাপি এই সকল প্রাণী ও উদ্ভিদ্ যে পৃথিবীতে একদিন জীবিত ছিল ও অপেক্ষাকৃত অল্প সময় মধ্যে বর্দ্ধিত হইত, অনুসন্ধান করিলে এখনও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুত ভূগর্ভের অধিকাংশ স্থান ইহাদেরই দেহাবশেষে পরিপূর্ণ। একথা অনেকে কল্পিত মনে করিয়া আমাদিগকে উপহাস করিতে পারেন, কিন্তু প্যারিস্ বা লণ্ডনের কৌতুকাগারে (Meusium) প্রবেশ করিয়া দেখিলেই সে উপহাস বিস্ময়ে পরিণত হইবে। এই সকল স্থানে অনেক অত্যাশ্চর্য্য জীবের অস্থি এবং সমঙ্গা নামক উদ্ভিদের বৃহদাকার পত্র ও বৃন্ত এখন পর্য্যন্ত বিরাজমান রহিয়াছে, যাহা দেখিলে উহাদের জীবিত অবস্থার আকার প্রকারের বিশালতা এখনও কিয়ৎ পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।

জীবরহস্যের অংশগুলিকে 'খনিত' বলে। মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ঐ সকল অংশ প্রাপ্ত হওয়াতে ভূতত্ত্বজ্ঞেরা উহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সকল খনিতের মধ্যে কেবল জীবের অস্থি, মৎস্যের কাঁটা, পতঙ্গের চর্ম্ম খোলা, ও পক্ষ, এবং বৃক্ষ লতাদির প্রস্তরীভূত পত্র ও বৃন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহুকাল মৃত্তিকাগর্ভে নিহিত থাকিলেও ইহাদের পূর্ব্বের আকার প্রকার বিনষ্ট হয় না, বরং দেখিবা মাত্র ইহাই মনে হয় যেন উহারা এককালে কোন না কোন সজীব উদ্ভিদ বা প্রাণীর অংশ ছিল।

সমুদ্রতীরস্থ বালুকা ও খড়ি মাটির মধ্যে অনুসন্ধান করিলে ঐরূপ খনিত প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন সমুদ্রতীরবর্ত্তী পর্ব্বতপার্শ্বেও ঐ সকল খনিতের অভাব নাই। বস্তুতঃ যদি কেহ ঐ সকল স্থানের খনিত লইয়া নিকটস্থ পর্ব্বতগুহার লবণাক্ত জলের কীট পতঙ্গের সহিত তুলনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে খনিত মধ্যস্থ পূর্ব্বতন জীবের দেহাবশেষে এক্ষণকার সেই সেই জীবের সহিত কতদূর সৌসাদৃশ্য তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। খনিত মধ্যে কেবল জীবের বর্ণ ও মাংস লক্ষিত হয় না, কারণ জীবের মরণোত্তর ঐ দুই পদার্থের এককালে লোপ হইয়া থাকে। কিন্তু উহাদের কঠিন অংশগুলি, অর্থাৎ অস্থি ও খোলা ধ্বংশ হয় না প্রত্যুত অক্ষত ভাবে পর্ব্বত মধ্যে বর্ত্তমান থাকে ও পর্ব্বতশরীর পোষণ করে। উদ্ভিজ্জ-খনিতের ভাবও সেইরূপ। এখানে বৃক্ষ লতাদির আকার প্রকার ও কাষ্ঠতন্তু প্রায় সমভাবে বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু পত্র ও বল্কলের সবুজ রং কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না। তথাপি দেখিলেই বোধ হয় যেন কোন চিত্রকর প্রস্তরের মধ্যে উহাদিগের জীবিতাবস্থার প্রতিমা চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে।

এক্ষণে খনিত কি এবং ঐ সকল খনিত কোথায় পাওয়া যায় তাহা বুঝা গেল। এবং এই গুলি যে জীবরহস্যের প্রধান অংশ তাহাও ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহারা পৃথিবীর নানা স্থানে নানা আকারে অবস্থিত। কখন গভীর মৃদঙ্গার খনিতে, কখন গিরিশৃঙ্গে, কখন সুগভীর পর্ব্বত কন্দরে, এবং কখন বা নদী অথবা সমুদ্রের নিম্ন প্রদেশে বিক্ষিপ্ত থাকে। তীক্ষ্ণ-ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজ নিজ ধৈর্য্য ও পরিশ্রম সহকারে এই সকল স্থান অনুসন্ধান করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হইয়াছেন, তৎসমুদয়ই আমাদের শিক্ষার্থে যথাক্রমে কৌতুকাগারে (Meusium) বিন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ সকল পদার্থের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে আরব্য উপন্যাসের অদ্ভুত গল্প অপেক্ষাও অধিকতর বিস্ময়কর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আরব্য উপন্যাসের ন্যায় উল্লিখিত ইতিবৃত্তে কোন ঐন্দ্রজালিক অঙ্গুরীয় বা অলৌকিক প্রদীপের গল্প অথবা উহার আনুসঙ্গিক দৈত্যের বিষয় লিখিত নাই, তথাপি ঐ সকল ইতিবৃত্ত সত্য বলিয়া বিজ্ঞানসমাজের বিশেষ আদরণীয় হইয়াছে। প্রকৃতি স্বয়ং

ইহাদের নিয়ন্তা। এই প্রকৃতির নিয়মানুসারে কোথাও প্রকাণ্ড পর্ব্বত সকল শির উন্নত করিয়া গগন-প্রাঙ্গণ ভেদ করিতেছে, কোথাও উপত্যকার সৃষ্টি হইতেছে, কোথাও বেগবতী নদী প্রবাহিত হইয়া সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিতেছে, কোথাও খড়িমাটি ও বালুকা দ্বারা সাগরগর্ভ পরিপূর্ণ হইতেছে এবং কোথাও বা প্রাচীন গহন কানন বা সুবিস্তৃত রাজ্য ভূগর্ভে অথবা সাগরতলে প্রোথিত হইতেছে। প্রাকৃতিক ব্যাপারে অগ্নি, জল ও বায়ু এই তিনটি পদার্থই দৈত্যের ন্যায় কার্য্য করে। ইহারাই প্রকৃতির প্রধান সহায়। এবং ইহাদেরই অপ্রতিহত শক্তি প্রভাবে বহুবিধ পরিবর্ত্তনের পর পৃথিবী ক্রমে ক্রমে এই রূপ রমণীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবী যতই রমণীয় হউক না কেন ইহাতে নিত্য নূতন বিষয় আবিষ্কৃত না হইলে হয় ত ইহার প্রতি আমরা তাদৃশ মনোনিবেশ করিতে পারিতাম না। পৃথিবী যে বহুকাল পূর্ব্বে আমাদের বাসোপযুক্ত হইয়াছে ইহা এক্ষণে কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু এই বিষয়টি জানিয়াই পৃথিবী সম্বন্ধে আমাদের ঔৎসুক্য দূর হয় না। প্রত্যুত কি রূপ নিয়ম অবলম্বন করিয়া জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে সাধ্যানুসারে আমরা তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। এই রূপ অনুসন্ধান দ্বারা জগতের অনেক নূতন ও অপরিচিত বিষয় ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। জ্ঞানিগণ ইহাও স্থির করিয়াছেন যে পৃথিবীতে সচরাচর যে সকল মৃত জীবের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্ভিন্ন এমন অনেক জীব-দেহের চিহ্ন আছে যাহা আমাদের দৃষ্টি-পথে পতিত হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে পৃথিবী একটি মৃত দেহের বৃহৎ সমাধি ক্ষেত্রস্বরূপ। প্রতি পদক্ষেপে আমরা ঐ সকল মৃতদেহ বা খনিজের উপর বিচরণ করিয়া থাকি। ইহারা গৃহনির্ম্মাণের একটি প্রধান উপাদান। নগরের পথ ঘাট পরিভ্রমণ কালেও চতুর্দ্দিকে ঐ রূপ লক্ষ লক্ষ খনিজ পতিত দেখিতে পাওয়া যায়। কর্করময় পথের উপর দিয়া চলিবার সময় যে সকল গোলাকৃতি চিক্কণ প্রস্তর আমাদের পদতলে দলিত হয় ঐ সকল প্রস্তরখণ্ড যে স্পঞ্জের ন্যায় এক প্রকার সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ মাত্র, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। এই সকল কর্কর পদার্থ প্রথমতঃ খড়িমাটির খনি হইতে স্খলিত হইয়া নদী ও সমুদ্রপ্রবাহে আলোড়িত হয় ও ক্রমে ক্রমে কর্করের ন্যায় কঠিন ও মসৃণ ভাব ধারণ করে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী বালুকার উপর ভ্রমণ করিতে হইলেও রাশীকৃত ঐ রূপ কর্করের চূর্ণ আমাদের নয়নপথে পতিত হয়। এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে স্পঞ্জ নামক সামুদ্রিক জীবও পৃথিবীনির্ম্মাণের একটি উপাদান। বালকেরা যে খড়ি লইয়া পঠদ্দশায় অঙ্কপাত করে তাহাও সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ মাত্র। সেই রূপ প্রথম শিক্ষার সময় বালকগণ যে স্লেট্ ও স্লেট্ পেন্‌শিল ব্যবহার করে, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তন্মধ্যেও জীবের দেহাবশেষ লক্ষিত হয়। বস্তুতঃ ঐ সকল স্লেট ও স্লেটপেন্‌শিল যে

পুরাতন কোন সমুদ্রিক মৃতদেহময় কর্দ্দম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই।

এতদ্ভিন্ন সচরাচর ব্যবহারোপযোগী অনেক বস্তুর মধ্যে ঐ রূপ জীব বা উদ্ভিদের চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। আমরা এক্ষণে যে মৃদঙ্গার সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি উহা যে নিষ্পীড়িত উদ্ভিজ্জ পদার্থ মাত্র, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। ফলতঃ মৃদঙ্গার মধ্যে পূর্ব্বতন বৃক্ষলতাদির দেহাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। কিন্তু এস্থলে আমরা ইহার বিষয় অধিক আর কিছুই বলিতে চাহি না। যথা সময়ে ইহার পুনরুল্লেখ করা যাইবে।

এক্ষণে জীবরহস্যের উপক্রমণিকা ভাগ শেষ হইল। ইহার একটি অংশ কিরূপে সংস্থিত হইয়াছে, যথানিয়মে পর পরিচ্ছেদের মধ্যে তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইবে। পাঠকগণ দেখিবেন যে ঐ সকল পরিচ্ছেদ মধ্যে কোথায় জীবের অস্থিময় দেহাবশেষ, এবং কোথাও জীবের—বা কচ্ছপ, ঝিনুক ও শামুক প্রভৃতি কঠোরপৃষ্ঠ জীবের বৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। অবশেষে মানবজাতির প্রবন্ধে—যদিও পাঠকগণ উহাদের উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন লিখিত ইতিবৃত্ত দেখিতে পাইবেন না, তথাপি উহাদের পূর্ব্বতন সমাধি ও বাসস্থল মধ্যে প্রাপ্ত অস্ত্র শস্ত্র ও অপরাপর দ্রব্যাদির বিষয় জানিতে পারিলে, ঐ সকল ব্যক্তি যে পৃথিবীর আদিমনিবাসী ছিলেন তাহাতে আর কোন সংশয় থাকিবে না। এই সকল বিষয় অবগত হইলেই পৃথিবীর মধ্যে জীবলোকের প্রায় অধিকাংশ ইতিবৃত্ত বুঝা যাইতে পারে।

শ্রীঃ যঃ নঃ মঃ

কাতন্ত্র-জীবনী।

তৃতীয় অধ্যায়।

দুর্গসিংহ।

এখন আমরা কাতন্ত্র-বৃত্তি-প্রণেতা মহামহোপাধ্যায় দুর্গসিংহের জীবনীতে উপনীত হইলাম। বৈয়াকরণ-শ্রেষ্ঠ দুর্গসিংহ, ভারতীয় সাহিত্য আকরের একটী অত্যুজ্জ্বল এবং অমূল্য রত্ন হইলেও তাঁহার জীবনী প্রায় অতীত কালীন বহুস্তরাবরণান্তরালে

সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে। বহ্বাবরণভেদী অনু বীক্ষণ যন্ত্র প্রভাবেও এ পর্য্যন্ত কোন দূরদর্শী সেই সকল আচ্ছাদন উল্লঙ্ঘন করিয়া দুর্গসিংহের জীবনী-সীমা সন্দর্শন করিতে সক্ষম হয়েন নাই সুতরাং আমাদের সেই বুধজনাদৃশ্য জীবনী, সমীচীন রূপে পর্য্যালোচনা করা একরূপ অসম্ভব; তথাপি যথা-লভ্য প্রমাণাদির বলে সাধারণ ভাবে তজ্জীবন-বৃত্তান্ত-ঘটিত দুই একটী কথা বিবৃত করিতেছি।

কথিত আছে সুপ্রসিদ্ধ দুর্গসিংহ এক এক বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিয়া এক একটী স্বতন্ত্র নাম ধারণ করিয়াছেন; এদেশে জনশ্রুতি এই যে নামলিঙ্গানুশাসন-প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ অমরসিংহ এবং দুর্গসিংহ অভিন্ন ব্যক্তি। পুরাকালে গুণ বংশ কার্য্য প্রভৃতি কারণে মনুজগণ বহু নামে অভিহিত হইতেন এই জন্যই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কার্ত্তিক গণেশ ব্যাস বাসুদেব অর্জ্জুন সরস্বতী লক্ষ্মী পার্ব্বতী প্রভৃতি প্রকৃত ও কাল্পনিক ব্যক্তিগণের বহু নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতো গেল প্রাচীন কথা—অপেক্ষাকৃত আধুনিক লোকদেরও এবম্প্রকার বহু নাম দেখা যায়। সুবিখ্যাত চাণক্য পণ্ডিতের হেমচন্দ্র-প্রণীত অভিধানচিন্তামণিতে বাৎসায়ণ, মল্লনাগ কৌটিল্য, চাণক্য, দ্রামিল, পক্ষিলস্বামী, বিষ্ণুগুপ্ত, অঙ্গুল এই আটটী নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে (১) চাণক্য ন্যায়শাস্ত্রে বাৎসায়ণ ও পক্ষিলস্বামী এবং শব্দশাস্ত্রে কৌটিল্য নামে পরিচিত (২)। এতদ্দেশে এক ব্যক্তির বহু নামের প্রথা, বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে সুতরাং দুর্গসিংহ গুণ ও কার্য্য বিশেষে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম ধারণ করিয়া ছিলেন, একথায় আমরা আশ্চর্য্য হইতে পারি না। প্রত্যুত অনেক কারণে সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়।

দুর্গসিংহের বহুনাম সম্বন্ধে যে কেবল জনশ্রুতি শুনা যায়, তাহা নহে; তৎসম্বন্ধে বিভিন্ন স্থলে দুই একটী প্রমাণও দেখা যায়। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাত্মা দুর্গসিংহ, ব্যাকরণ শাস্ত্রে দুর্গ, নাটকে ভবভূতি (৩) আগমে নাগভট্ট এবং তর্কশাস্ত্রে কুসুমাঞ্জলি নাম ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন—

ব্যাকরণে ভবেদ্দুর্গো
ভবভূতিশ্চ নাটকে।
আগমে নাগভট্টোঽহং
তর্কেষু কুসুমাঞ্জলিঃ॥ দুর্গসিংহ। (৪)

---

(১) বাৎসায়ণো মল্লনাগঃ
কোটিলশ্চণকাত্মজঃ।
দ্রামিলঃ পক্ষিলস্বামী
বিষ্ণুগুপ্তোঽঙ্গুলশ্চ সঃ॥
(অভিধানচিন্তামণি-মর্ত্ত্যকাণ্ড)

(২) বান্ধব ৪র্থ খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ১৫৫ পৃষ্ঠা। ন্যায় শাস্ত্রে পক্ষিলস্বামীর একটী স্বতন্ত্র মত আছে। (ঐ ১৫৪ পৃষ্ঠা)

(৩) আমরা কাশীপ্রবাসী জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের নিকট শুনিয়াছি যে দুর্গসিংহ এবং ভবভূতি যে অভিন্ন ব্যক্তি ইহা কাশী অঞ্চলের অনেক লোকের মধ্যে জনশ্রুতি আছে। কতদূর সত্য জানিনা।

(৪) আগমে নাগভট্টোঽহং তর্কেষু কু-

মহামতি অমরসিংহ প্রণীত "নামলিঙ্গানুশাসন" (অমরকোষ) নামক সুপ্রসিদ্ধ অভিধানের "শ্রীকণ্ঠ" নামক টীকা বিশেষে দুর্গসিংহ এবং অমরসিংহকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তিনি বলেন—"দুর্গসিংহ নামলিঙ্গানুশাসন প্রচারান্তে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের দ্বারা "অমর" উপাধি লাভ করেন। বিদ্যা সম্বন্ধীয় কীর্ত্তির প্রভাবেই লোকে অমরত্ব লাভ করে নবরত্নের সেই রত্ন (দুর্গসিংহ) তদ্‌গুণে সুশোভিত ছিলেন :—

"দুর্গসিংহঃ প্রচারান্তে
নামলিঙ্গানুশাসনম্।
লভতে হ্যমরোপাধিং
রাজেন্দ্রবিক্রমেণ চ।
বিদ্যাকীর্ত্তিপ্রভাবে চা—
—হ মরত্বংলভতে নরঃ।
স রত্নো নবরত্নস্য
তদ্‌গুণেন সুশোভিতঃ"। শ্রীকণ্ঠ (৫)

বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী প্রণেতার মতে দুর্গসিংহ কাশিকাতে কাশিকেশ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বলেন "আলাপেতে কালাপক (আলাপচ্ছলে কলাপ ব্যাকরণ বলিতে পারে যে) দুর্গ সিংহ, যিনি কাশিকাতে কাশিকেশ ; যিনি শেষ অবতারের (কল্কি অবতারের) পূর্ব্বকীর্ত্তি স্বরূপ ; তিনিই বৈয়াকরণ রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন :—

আলাপকালাপক দুর্গসিংহঃ
যঃ কাশিকায়ামপি কাশিকেশ।
শেষাবতারঃ শ্রুতপূর্ব্বকীর্ত্তিঃ
স এষ বৈয়াকরণো হ ভূপৈতিঃ।"
(বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী)।

(৫) অমরকোষের প্রায় ৪০।৫০ খানা টীকা আছে ; অন্য কোন টীকায় এই শ্লোকটী আছে কিনা জানি না ; সমুদায় টীকা একজনে পাঠ করিতে পারে না। এবং কখন টীকা এক স্থানে পাওয়াও যায় না। আমাদের বোধ হয় শ্রীকণ্ঠ অতি প্রাচীন টীকা অন্যথা তিনি অমরসিংহের বিষয় এত পরিজ্ঞাত থাকিতেন না।

সুমাঞ্জলিঃ" পূর্ব্ব বাঙ্গালার পণ্ডিতগণের মধ্যে এই অংশটুকু প্রায় সকলেই জানেন ; পূর্ব্বের পাদদ্বয় পূর্ব্ব-বঙ্গে কেহ জানেন না কিন্তু এ শ্লোকটী যে দুর্গসিংহের বিভিন্ন-নাম বিষয়ক তাহা, তাঁহারা জানেন। সংপ্রতি পূর্ব্ব পাদ দ্বয় কাশী অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট পাওয়া গিয়াছে ; তাঁহাদের কেহ বলেন এ শ্লোকটী দুর্গ সিংহ স্বপ্রণীত কাতন্ত্রটীকাতে উল্লেখ করিয়াছেন। দুর্গসিংহকৃত কাতন্ত্রটীকা অতি বিস্তীর্ণ। সুসম্পূর্ণ ও পরিশুদ্ধ টীকা প্রায় এমন দেখা যায় না। এখন অনেকেই আবশ্যক স্থলের স্থূল স্থূল অংশ লিখিয়া রাখেন। আমরা দুর্গবোধের (দুর্গ সিংহ টীকায়) যে যে অংশ দেখিয়াছি তাহাতে আমাদের চক্ষে ঐ শ্লোকটী পড়ে নাই। কিন্তু দুর্গ সিংহের বিভিন্ন নাম সম্বন্ধে যখন সর্ব্বত্রই কিংবদন্তী শুনা যায় এবং পূর্ব্বোক্ত শ্লোকটী অংশতঃ ও সম্পূর্ণ রূপে অনেকের নিকট শুনা যায় তখন আমরা শ্লোকটীর আস্তিত্ব সম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দিহান হই না। কেহ বলেন এশ্লোকটী কাতন্ত্র-পরিশিষ্ট টীকা "গোপীনাথ" নামক গ্রন্থে নিবেশিত আছে। কেহ বলেন শ্লোকটীর আরো কয়েকটী পাদ আছে তাহাতে দুর্গসিংহের অমরসিংহ প্রভৃতি আরো কয়েকটী নামের উল্লেখ আছে।

এই শ্লোকের "কাশিকা" শব্দকে কেহ কাশী (বারাণশী) এবং কেহ কাশিকা (৬) নামক গ্রন্থ বলিয়া ব্যা করেন।

উপরে দুর্গ সিংহের বিভিন্ন মতের যত গুলি নামের উল্লেখ করা হইল তাহার প্রত্যেক নামের সময়াদির সামঞ্জস্য করিয়া যে এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিয়া উঠিতে পারি এমত সাধ্য আমাদের নাই; কেননা, নাগভট্ট, কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি নামে দুর্গসিংহ কি কি গ্রন্থ কোন্ সময়ে প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না এবং বহু যত্ন করিয়াও জানিতে পারি নাই।

দুর্গসিংহকে, ভবভূতি এবং অমরসিংহ প্রভৃতি নামে পরিচিত দেখিয়া হয় তো অনেকে বিশেষ বিস্ময়াপন্ন হইবেন এবং অনেকে হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন না——আমরা যে বিস্মিত না হইয়াছি তাহা নহে, কিন্তু দুর্গ সিংহ "ভবভূতি এবং অমর সিংহ প্রভৃতি হইতে অভিন্ন ব্যক্তি" যখন এ সম্বন্ধে ও কোন অকাট্য প্রমাণ পাই নাই তখন উল্লিখিত বিভিন্ন যুক্তির উপর পদাঘাত করিতেও ভীত হই। সুতরাং ন্যায়ের বাধ্য হইয়া আমরা উল্লিখিত বিভিন্ন যুক্তির অনুসরণ করিয়াই মহাত্মা দুর্গ সিংহের সংক্ষিপ্ত জীবনীর কথঞ্চিত আলোচনা করিব।

ভুবন বিখ্যাত নামলিঙ্গানুশাসন প্রণেতা অমরসিংহ (অমরোপাধিক দুর্গসিংহ) মহারাজ হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতর রত্ন ছিলেন (৭)। উল্লিখিত শ্রীকণ্ঠোদ্ধৃত প্রমাণ দ্বারাও এ কথার সামঞ্জস্য হইতেছে। নবরত্নপ্রতিষ্ঠাতা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিশ্বসংসারে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন সুতরাং দুর্গসিংহ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে কি পঞ্চম শতাব্দীর পরার্দ্ধে ভারতে অবতীর্ণ হয়েন। কেন না শ্রীকণ্ঠের বচনানুসারে ইহা স্পষ্টতঃ দেখা যায় যে বিক্রমাদিত্য দুর্গসিংহকে অমর উপাধি প্রদান করেন অতএব দুর্গসিংহই যে অমরসিংহের পূর্ব্বের নাম তাহার ভুল নাই; অন্যথা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক অমরোপাধি প্রদান কালে দুর্গসিংহ যে নামে পরিচিত ছিলেন শ্রীকণ্ঠের সেই নামের পরিচয় দেওয়া স্বভাবসিদ্ধ নহে। এই সকল কারণেই বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে দুর্গসিংহকৃত কাতন্ত্রবৃত্তি ও দুর্গবোধ নামক কাতন্ত্রটীকা, অমরকোষের পূর্ব্বে বিরচিত হইয়াছে; কেননা উপরোক্ত উভয় গ্রন্থ দুর্গসিংহের নামে প্রকাশিত হইয়াছে। যে সময়ে তিনি কাতন্ত্রটীকা বিচরণ করেন তখন তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ

(৬) পানিনি সংসৃষ্ট "কাশিকা বৃত্তি" নামক গ্রন্থ প্রণেতা জয়াদিত্য বলিয়া বিখ্যাত। দুর্গ সিংহ কৃত অন্য কোন কাশিকা আছে কি না জানি না।

(৭) ধন্বন্তরি ক্ষপনকামরসিংহ শঙ্কু
বেতালভট্টঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥

কাতন্ত্র-জীবনী।

তৃতীয় অধ্যায়।

(ভারতীর দ্বিতীয় ভাগ ১১ সংখ্যা ৫২৮ পৃষ্ঠার পর)

দুর্গসিংহ।

সর্ব্ববর্ম্মা এবং কাত্যায়ন-প্রণীত সূত্রগুলির অনেক স্থলে অভাব ও ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, দুর্গসিংহ বিশেষ পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্য সহকারে তাহাতে বক্তব্য-প্রণালীতে অতিরিক্ত সূত্রাবলী, ব্যাবৃত্তি ও অন্যান্য বিষয় সংযোগ করিয়া সম্পূর্ণ রূপে সংশোধন করিয়াছেন। তাঁহার কৃত বৃত্তিগুলি অতি সরল অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যিনিই দুর্গসিংহের বৈয়াকরনিক সুকৌশল সন্দর্শন করিয়াছেন তিনিই আশ্চর্য্য হইয়াছেন—তিনিই তাঁহাকে ব্যাকরণ-জগতের অপার্থিব দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন। দুর্গসিংহের ন্যায় প্রমাদরহিত সৌভাগ্যশালা বৈয়াকরণ ইদানীং ভারতে আর জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী-প্রণেতা চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য দুর্গসিংহকে "শেষ অবতারের পূর্ব্বকীর্ত্তি স্বরূপ" বর্ণনা করিয়া বাস্তবিকই স্বীয় উদারতার বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন ; এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া দুর্গসিংহকে অতিরঞ্জিত করা হয় নাই। আমাদের বিবেচনায় ভুবনাদ্বিতীয় বৈয়াকরণ কাত্যায়ণ বররুচি পাণিনি ঋষি-কৃত ব্যাকরণের ভ্রম এবং অসম্পূর্ণতা বিদূরিত করিয়া পাণিনি ব্যাকরণকে যেমন একটী জগদ্দুর্লভ অমূল্য রত্নে পরিণত করিয়াছেন, দুর্গসিংহ কাতন্ত্র সম্বন্ধে তদপেক্ষা বড় অকৃতকার্য্য হয়েন নাই। দুর্গসিংহ বৈয়াকরনিক ক্ষমতায় কাত্যায়ণের সমকক্ষতা লাভ না করিতে পারেন কিন্তু কাত্যায়ণের অব্যবহিত নিম্নের আসন দুর্গসিংহ ব্যতীত যে আর কেহ লাভ করিতে পারিবেন না তাহা একরূপ দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। এখন কথা এই যে দুর্গসিংহ কাতন্ত্রবৃত্তি এবং কাতন্ত্রটীকা বিরচনে পৃথিবীর বিস্ময় ও প্রশংসার স্থল হইয়া রহিয়াছেন। তিনি নিতান্ত অপরিণত বয়সে এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে কখনি এতাদৃশ কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন না, সুতরাং আমরা যদিও ন্যূনকল্পে ৫০।৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকাল পর্য্যন্ত দুর্গসিংহের কাতন্ত্রবিরচনে অতিবাহিত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করি তবে বোধ হয় নিতান্ত ভ্রমে পতিত হইবনা। অমর উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দুর্গসিংহ ৬ষ্ঠ শতাব্দির কোন্ ভাগে বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতর রত্ন ছিলেন তাহা এখনও কেহ ভাল করিয়া ঠিক্ করিতে পারেন নাই। তিনি খৃীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দির মধ্য ভাগেও যদি বিক্রমাদিত্যের সভায় নিয়োজিত ছিলেন ব-

লিয়া মনে করা যায় তবে তিনি যে খৃঃ পঞ্চম-শতাব্দির পরার্দ্ধ ভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

জনৈক বিচক্ষণ প্রাচ্য মহোদয় বিশেষ বিজ্ঞতা সহকারে অনেক তর্ক বিতর্কের পর, ভবভূতিকে অমরসিংহের পূর্ব্বে ও মহাকবি কালিদাসের পরে পঞ্চম খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (৮) তাঁহার এই মীমাংসা অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতকে খণ্ডাইয়া অধিক সারবান হইয়াছে। ভবভূতি নাম ধারণ করিয়া দুর্গসিংহ কোন্ সময়ে নাটকাদি প্রণয়ন করেন তাহা অবধারিত করা সহজ ব্যাপার নহে। আমাদের বোধ হয় ভবভূতি নামই তাহার সর্ব্বপ্রথম নাম; কেননা দুর্গসিংহ নাম ধারণ করিয়া তিনি কেবল কাতন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। কথিত আছে কাতন্ত্রের দুর্গম ব্যাখা, দুর্গসিংহের দ্বারা সিংহের ন্যায় সৃষ্ট হইয়া তিনি দুর্গসিংহ নাম লাভ করেন (৯)। কোন কোন টীকাকার দুর্গসিংহ নামের যে রূপ ব্যুৎপত্তির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও এ কথার পোষকতা করিতেছে (১০) সুতরাং দুর্গসিংহ নাম যে তাঁহার পিতৃ মাতৃদত্ত প্রথম নাম নহে তাহা একরূপ ঠিক হইল। ভবভূতি নামই তাঁহার প্রথম নাম হইবার এই একটী বিশেষ কারণ দেখা যায় যে ব্যাকরণ স্বরূপ তর্কবিজ্ঞানে জড়িত হইলে তাঁহার অন্তরে কাব্যের সুকোমল মনোমোহন মাধুর্য্যতার স্থান পায় না। অভ্যাস করিলে সুকোমল কুসুমকল্পনা, তীব্র কূটকল্পনা মার্গে সহজেই প্রধাবিত হয়। কিন্তু তীব্র কূটাম্বুসক্লিষ্ট বৈয়াকরনিক কল্পনাকে কুসুম-

(৮) বাবু আনন্দরাম বড়ুয়া-কৃত "ভবভূতি" নামক প্রস্তাব দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রদর্শী উইলসন সাহেব বলেন:— "ভোজপ্রবন্ধ গ্রন্থে ভবভূতির নাম উল্লেখ আছে। তাহাতে লেখা আছে যে ভবভূতি ভোজরাজার একজন সভাসদ ছিলেন। কিন্তু ভোজপ্রবন্ধের লিখিত বিষয় সমুদয় কাল্পনিক বলিয়া বোধ হয় তথাচ ইহা দ্বারা এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে ভবভূতি ভোজপ্রবন্ধ-প্রণেতার পূর্ব্বকালীন লোক। দশরূপক নামক গ্রন্থে মালতীমাধবের নাম স্পষ্ট রূপে উল্লেখ আছে এবং তাহাতে ভবভূতি, মুঞ্জ (ভোজরাজা যাঁহার উত্তরাধিকারী) নামক নৃপতির পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ লেখা আছে। ইহাতে বোধ হয় ভবভূতি খৃঃ একাদশ শতাব্দির পূর্ব্ববর্ত্তী লোক। তিনি একাদশ শতাব্দির কতপূর্ব্বে জীবিত ছিলেন তাহাও আমরা নিশ্চয় রূপে নির্দ্দেশ করিতে সমর্থ। কেননা রাজতরঙ্গিনী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে জানা যায় যে ভবভূতি কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মা (যিনি খৃঃ ৭২০ অব্দে রাজত্ব করেন) নামক নৃপতির সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইহাতে বোধ হয় ভবভূতি খৃঃ অষ্টম শতাব্দির লোক।

উইলসন কৃত "হিন্দু থিয়েটার"

(৯) কাতন্ত্র দুর্গমব্যাখ্যা দুর্গসিংহেন সূরিণা।
সিংহেব সম্বরৎ সৃষ্টা দুর্গ সিংহো ভবেৎ সচ ॥

(১০) দুর্গে বিষমে পদে সিংহেব সিংহঃ (দুর্গ সিংহঃ) কলাপ চন্দ্র ইত্যাদি।

সঙ্কাশ কোমল কাব্যকল্পনায় পরিণত করা অসম্ভব ; এ কথায় ভট্টীকাব্য-প্রণেতাই আমাদের প্রধান দৃষ্টান্তের স্থল। যদি দুর্গসিংহ নাম ধারণ করিয়া কাতন্ত্র-বৃত্তি ও টীকাপ্রণয়নের পর ভবভূতি নামে নাটকাদি প্রণয়ন করিতেন তবে তাঁহার ভদ্রোচিত হৃদয়গ্রাহী নাটকাবলী ভারতীয় কাব্যের শীর্ষস্থানে স্থান লাভ করিতে পারিত না। তিনি ভুবনবিখ্যাত কবি-পদ লাভান্তে ভুবনবিখ্যাত বৈয়াকরণ পদ লাভ করিয়াছেন একথা অসম্ভব নহে। বাস্তবিক তিনি ভবভূতি নামে নাটকাদি প্রণয়নের পরই যে, কাতন্ত্রবৃত্তি ও কাতন্ত্র-টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন—এই কথাই আমাদের নিকট অধিক সুসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ যদি তাঁহার ভবভূতি নামের পূর্ব্বে অন্য কোন নাম থাকিত তিনি সে নাম অবশ্য মহাবীরচরিত ও মালতীমাধবের প্রস্তাবনাস্থলে সূত্রধারের মুখে উল্লেখ করিতেন। দুর্গসিংহ যদি জীবনের প্রথম ভাগে ভবভূতি নামে নাটক প্রণয়ন করিয়া পরে দুর্গসিংহ প্রভৃতি নাম ধারণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উল্লিখিত প্রাচ্য মহাত্মা যে ভবভূতিকে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দির লোক বলিয়াছেন তাহা সর্ব্বাংশে অনুমোদনীয়। কিন্তু তাই বলিয়াই তিনি খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দির পরার্দ্ধের উপরের লোক নহেন। দুর্গসিংহ এবং ভবভূতি যখন অভিন্ন ব্যক্তি—সুতরাং বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ দুর্গসিংহ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দির পরার্দ্ধে বিশ্বসংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

আমরা উপরের গণনায় যদি পদস্খলিত না হইয়া থাকি তবে সর্ব্ববর্ম্মা কর্ত্তৃক কাতন্ত্রসূত্র বিনির্ম্মিত হওয়ার প্রায় কিঞ্চিদধিক ৪৫০ বৎসর পরে মহাত্মা দুর্গসিংহ কাতন্ত্রের বৃত্তি ও কাতন্ত্রটীকা প্রণয়ন করেন।

আমাদের দুর্গসিংহের নিবাস ও বংশ-পরিচয়াদি সংগ্রহ করিতে তত কষ্ট হইবে না। ভবভূতি এবং অমরসিংহ যখন দুর্গসিংহের উপনাম মাত্র, তখন তত্তৎ নামের পরিচয়াদি সংগ্রহ করিলেই দুর্গসিংহের পরিচয়াদি সংগ্রহ করা হইল।

ভবভূতি (দুর্গসিংহ) তৎপ্রণীত 'মালতীমাধব' নামক সুপ্রসিদ্ধ নাটকের প্রস্তাবনাতে সূত্রধারের মুখে এইরূপ নিজ পরিচয় দিয়াছেন ;—দক্ষিণদেশে বিদর্ভের অন্তর্গত পদ্মনগর নামে এক নগর আছে। যেখানে মহোৎসবের অগ্রগামী, পঞ্চ অগ্নির রক্ষাকর্ত্তা ধৃতব্রত, সোমরসপায়ী ব্রহ্মবাদী, চরণগুরুদিগের মতাবলম্বী, বেদের তৈত্তিরীয় অংশের উপাসক (প্রভৃতিগুণবিশিষ্ট) কাশ্যপ বংশীয় ব্রাহ্মণেরা বাস করিতেন। এই পরিবারের মধ্যে গোপালভট্ট (১১) নামক এক জন বিখ্যাত লোকের পৌত্র, এবং পবিত্রকীর্ত্তি নীলকণ্ঠের পুত্র, শ্রীকণ্ঠোপাধিরঞ্জিত ভবভূতি ছিলেন। ইহাঁর মাতার নাম জাতুকর্ণী। এই কবির নাটকা-

১১ ভবভূতির (দুর্গসিংহের) অপর নাম "নাগভট্টের" সহিত তাঁহার পিতামহের নামের সাদৃশ্য আছে।

ভিনেতৃবর্গের সহিত আজীবন সৌহার্দ্দ ছিল। (১২)

কেহ বলেন "প্রাচীন কালে বিদর্ভদেশ ভাল ভাল পণ্ডিতদিগের জন্য বিখ্যাত ছিল। ভবভূতি তদ্দেশীয় একজন অত্যুৎকৃষ্ট পণ্ডিতের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া ছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সমুদায় শাখাই অধ্যয়ন করিতে আলস্য প্রকাশ করেন নাই। তিনি অতি আশ্চর্য্য স্মরণ শক্তি ও সাহিত্য বিষয়ক অগাধ বিদ্যোপার্জ্জন জন্য শ্রীকণ্ঠ (Minarva throated) উপাধি পাইয়াছিলেন। যতদূর জানা যায়, তাহাতে বোধ হয় এ উপাধি ভারতবর্ষীয় অন্য কোন পণ্ডিত প্রাপ্ত হন নাই। এ উপাধি লাভের পর ভবভূতি উজ্জয়িনীর রাজসভায় পণ্ডিতসমাজে গৃহীত হইয়া ছিলেন। তথায় মহাকাল দেবতার নিকট তাঁহার নাটক কএক খানির অভিনয় হইয়া ছিল। (১৩)

কেহ ভবভূতির নিবাস বিদর্ভকে আধুনিক বেরার রাজ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ১৪ কিন্তু ভোজ প্রবন্ধের লিখনানুসারে ভবভূতিকে বারাণসীনিবাসী বলিয়া বোধ হয় (১৫)। ভোজপ্রবন্ধপ্রণেতার বল্লালের কালাদি সম্বন্ধে ভ্রম দৃষ্ট হইলেও যে আধুনিক লিখকগণ অপেক্ষা দেশাদির প্রাচীন নাম অধিক পরিজ্ঞাত ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ তিনি যে মালতীমাধব এবং মহাবীরচরিতের প্রস্তাবনাতে ভবভূতির নিবাস বিদর্ভের কথা পাঠ করেন নাই ইহাও সম্ভাব্য নহে। সুতরাং তিনিই যখন ভবভূতিকে বারাণসী দেশাগত বলিয়া গিয়াছেন তখন আমাদের বোধ হয় যে ভবভূতির নিবাস বিদর্ভ এবং পদ্মনগর বারাণসী অঞ্চলের কোন স্থান। কাহারও নিকট শুনা যায় দুর্গসিংহ বারাণসীনিবাসী ছিলেন। বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর "কাশিকা" যে বারাণসী নহে তাহাও একেবারে অস্বী

১২ অস্তি দক্ষিণাপথে বিদর্ভেষু পদ্মনগরং নাম নগরং। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিনো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তিস্ম। * * * তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্ত্তেনীলকণ্ঠস্যাত্মসম্ভবো ভট্টঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনো ভবভূমি নামা জাতুকর্ণীপুত্রঃ কবিনিসর্গসৌহৃদেন ভরতেষু স্বকৃতিমেবংপ্রায়গুণভূয়সীমস্মাকং অর্পিতবান্ যত্র খল্বিয়ং বাচোযুক্তিঃ (মালতী মাধব প্রস্তাবনা)

১৩ বাবু আনন্দ রাম বড়ুয়া কৃত 'ভবভূতি" নামক প্রস্তাব ২৮ পৃষ্ঠা ও তৎ সম্পাদিত বীরচরিতের ভূমিকা।

১৪ "তিনি বিদর্ভের (বেরারের) অন্তর্গত পদ্মপুর নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন।" বড়ুয়াকৃত 'ভবভূতি' এবং বাবু রাজকৃষ্ণ রায় অনুবাদিত "রামায়ণ" অযোধ্যাকাণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা।

১৫ ততঃ কদাচিৎ সিংহাসনমলঙ্কুর্ব্বাণে শ্রীভোজে দ্বারপাল আগত্য প্রাহ, দেব! বারাণসী দেশাদাগতঃ কোঽপি ভবভূতি নাম কবিঃ দ্বারি তিষ্ঠতীতি। রাজা প্রাহ, প্রবেশয়েতি, ততঃ প্রবিষ্টঃ সোঽপি সভামগাৎ। "ভোজ প্রবন্ধ" ৮৭ পৃষ্ঠা। সংবাদ জ্ঞানাকর যন্ত্রে মুদ্রিত)

কার করিবার যো নাই। দুর্গসিংহ এবং ভবভূতি যখন অভিন্ন, ব্যক্তি এবং তাঁহার উভয় অবতারের নিবাসভূমিই যখন বারাণসী বলিয়া আভাস পাওয়া যায় তখন ভোজ-প্রবন্ধের প্রমাণকে একেবারে উপেক্ষা করা যায় না, তবে দুর্গসিংহ বারাণসী নিবাসী না হইয়া প্রবাসীও হইতে পারেন।

দুর্গসিংহ, ভবভূতিজীবনে নাটকাদি প্রণয়নকালে যেমন আত্মপ্রশংসাস্পর্দ্ধী ছিলেন ১৬ দুর্গসিংহ নাম ধারণ করিয়াও সেইরূপ স্পর্দ্ধা করিতে ক্রটী করেন নাই। ইহা তাঁহার ন্যায় দেবতুল্য ব্যক্তির পক্ষে অতিরঞ্জিত না হইলেও তিনি যে আত্মগর্ব্বরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। আমাদের তাঁহার জীবনের বিভিন্ন ভাগে, শুভ্র বসনে মসীবিন্দুবৎ একটী ক্ষুদ্র চিহ্ন অঙ্কিত দেখিয়া দুর্গসিংহ এবং ভবভূতি যে অভিন্ন ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে আরো প্রত্যয় জন্মিতেছে। দুর্গসিংহ তদীয় কাতন্ত্র টীকায় একস্থলে সগর্ব্বে বলিয়াছেন—কুশাগ্রের ন্যায় সুতীক্ষ্ণ জ্ঞান বিশিষ্ট আমি এবং ভাষ্যকার যখন শব্দরূপ সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিতে পারিলাম না; তখন অন্য জড়বুদ্ধিগণ কে ১৭ অর্থাৎ দুর্গসিংহ, তাঁহার নিজের এবং ভাষ্যকারের নিকট পৃথিবীস্থ সকল লোককেই জড়বুদ্ধি বলিয়া জ্ঞান করিতেন!!! তাহার নির্দ্দেশিত ভাষ্যকার কে? জানি না। বোধ হয় পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্যরচয়িতা পতঞ্জলি কি বেদভাষ্যকার শঙ্করদেব হইবেন।

দুর্গসিংহ সম্বন্ধে আর একটী কিংবদন্তী এই—একদা বরাহমিহির প্রভৃতি বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতদের বিপক্ষে, দুর্গসিংহ একাকী কোন বিষয় লইয়া তুমুল তর্কবিতর্ক করেন। অবশেষে দুর্গসিংহ বিচারে সকলকে পরাস্ত করিয়া সভাস্থ সভ্যমণ্ডলীর নিকট সগর্ব্বে বলিয়া উঠেন "বাহু উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছি, আমি দুর্গসিংহ বাদী হইলে মহেশ্বরও এক অক্ষর জানেন না ১৮।

দুর্গসিংহের মুখ হইতে এই বাক্য বাহির হওয়া মাত্র তাহার বাহু উর্দ্ধমুখী হইয়া রহিল, ইহা শঙ্করের কোপের কারণ জানিয়া তদীয় ক্রোধ শান্তির জন্য দুর্গসিংহ তন্মুহূর্ত্তে এক অলোকসামান্য স্তব দ্বারা শঙ্করকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। শঙ্কর তখন তৎসমীপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার বাহু নামাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, "দুর্গসিংহ! বিদ্যাসম্বন্ধে আমি তোমার

---

১৬ যে নাম কেচিদিহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং,
জানন্তু তে কিমপি তান্ প্রতি নৈষ যত্নঃ।
উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা,
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলাচ পৃথ্বী॥
(মালতী মাধব)

১৭ অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ।
(দুর্গসিংহকৃত কাতন্ত্রটীকা)

১৮ উদ্ধৃত্য বাহু পরিরারটীমি
যস্যাস্ত শক্তিঃ সতু বাবদীতু।
ময়ি স্থিতে বাদিনি দুর্গসিংহে
নৈকাক্ষরং বেত্তি মহেশ্বরোপি।

নিকট একটী অক্ষরও জানি না, ইহা সত্য কিন্তু তাই বলিয়াই সভাস্থ ব্যক্তিদের নিকট আমাকে অপমানিত করা তোমার উচিত হয় নাই।"

দুর্গসিংহকে লোকসমাজে অলৌকিক বিদ্বান প্রতিপন্ন করিবার জন্যই যে উল্লিখিত কিংবদন্তীটি বিনির্ম্মিত হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

বোধ হয় বোপদেব গোস্বামীও দুর্গসিংহ এবং অমরসিংহকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া জানিতেন। তিনি কবিকল্পদ্রুম নামক ধাতুপাঠে আটজন শাব্দিকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

ইন্দ্রশ্চন্দ্রকাশকৃৎশ্না
পিশলী শাকটায়নঃ।
পাণিন্যমরজৈনেন্দ্রা
জয়ন্ত্যষ্টাদি শাব্দিকাঃ।
(বোপদেবকৃত কবিকল্পদ্রুম।

আমরা এই শ্লোকোক্ত যে ৫। ৬ জন মহাত্মাকে চিনিতে পারিলাম তাঁহারা সকলেই বৈয়াকরণ; তাঁহাদের কোষাদি গ্রন্থ নাই। বোধ হয় এস্থলে "শাব্দিক" অর্থে কেবল বৈয়াকরণগণকেই বুঝাইবে। যদি দুর্গসিংহ এবং অমরসিংহকে বোপদেব অভিন্ন ব্যক্তি না জানিতেন তবে তিনি অমর নাম কখনি এ শ্লোকে বিনিবেশিত করিতেন না, কেননা দুর্গসিংহ অমরসিংহ নাম ধারণ করিয়া কোন ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন নাই। সুতরাং এস্থলে দুর্গসিংহ অর্থেই যে দুর্গ সিংহের উপনাম অমর শব্দকে স্থান দেওয়া হইয়াছে, ইহা আমাদের বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে।

শব্দকল্পদ্রুমীয় পরিশিষ্টের অমর শব্দে লিখিত আছে, "তিনি (অমরসিংহ) কাহারও কাহারও মতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী।" আমরাও এইরূপ একটী অমূলক কিংবদন্তী জানি। অনেকে বলিয়া থাকেন যে অমরসিংহ তৎপ্রণীত নামলিঙ্গানুশাসনে সমুদয় দেবতার শীর্ষস্থানে বুদ্ধদেবের নামাবলী নিবেশিত করিয়াছেন সুতরাং অমরসিংহ বুদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন। বোধ হয় শব্দকল্পদ্রুমও ঐ জনশ্রুতির অনুসরণ করিয়াছেন কিন্তু আমরা এ কথায় সায় দিতে পারিলাম না; কেননা অমরসিংহ বুদ্ধমতাবলম্বী হইলে তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগে হিন্দু-বলিয়া পরিচয় দিতেন না (১৯)।

কেহ আপত্তি করিতে পারেন দুর্গসিংহ যদি বাস্তবিকই অমরসিংহ হয়েন তবে নামলিঙ্গানুশাসনের লিঙ্গাদিসংগ্রহ বর্গে অমরোপাধিক দুর্গসিংহ কাতন্ত্রসম্মত প্রত্যয়াদি ব্যবহার না করিয়া কেন পাণিনিঅনুযায়ী প্রত্যয়াদি ব্যবহার করিয়াছেন? একথায় বোধ হয় এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দুর্গসিংহ কাতন্ত্রে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে, কাতন্ত্র সমাজে তাদৃশ আদৃত হইয়া ছিল না। দুর্গসিংহই কাতন্ত্রে অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি দোষ বিদূরিত

(১৯) তিনি কাতন্ত্রের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকেই মহাদেবকে প্রণাম করিয়াছেন। মালতীমাধবের প্রস্তাবনায়ও একরূপ হিন্দু বলিয়াই পরিচয় দিয়াছেন।

করিয়া কাতন্ত্রের সম্মান বৃদ্ধি করেন। এক খানি গ্রন্থ ৫০।৬০ বৎসরের ন্যূনে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ ও সর্ব্ববাদীসম্মত হইতে পারে না সুতরাং দুর্গসিংহের অমর উপাধি লাভের সমকালে যে কাতন্ত্রের নাম সকলে জানিত বোধ হয় না। কিন্তু তখন পাণিনি ঋষি প্রণীত ব্যাকরণ বিদ্যার্থীগণ সকলেই পাঠ করিতেন এবং পাণিনিসম্মত বৈয়াকরণিক নিয়ম ভারতে বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল—পাণিনিঅনুযায়ী প্রত্যয়াদি প্রয়োগ করিলে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবে—দুর্গসিংহ, পাঠকদিগের সৌকর্য্যার্থেই যে নামলিঙ্গানুশাসনে পাণিনিসম্মত প্রত্যয়াদি ব্যবহার করিয়াছেন তাহার ভুল নাই। সুতরাং এই এক মাত্র কারণেই দুর্গসিংহ এবং অমরসিংহ অভিন্ন ব্যক্তি নন, একথা বিশ্বাস করা যায় না।

দুর্গসিংহ নিজ নামে এবং ভবভূতি ও অমরসিংহ নাম ধারণ করিয়া কি কি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন বোধ হয় তাহা অনেকেই জানেন। তিনি দুর্গসিংহ নামে কাতন্ত্র বৃত্তি ও "দুর্গবোধ" নামক কাতন্ত্র টীকা, ভবভূতি নামে—উত্তররামচরিত—মহাবীরচরিত ও মালতী-মাধব এই নাটকত্রয়, এবং অমরসিংহ নামে সুপ্রসিদ্ধ নামলিঙ্গানুশাসন (অমরকোষ) প্রণয়ন করেন। গুণরত্ন নামক একটী ক্ষুদ্র কবিতাপ্রবন্ধ ভবভূতিকৃত বলিয়া বিখ্যাত। অনেকে বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর লিখনভঙ্গীতে "কাশিকা বৃত্তি" নামক পাণিনি সহযোগী গ্রন্থকে দুর্গসিংহ (কাশিকেশ) কৃত বলিয়া মনে করিতে পারেন—বাস্তবিক তাহা নহে। কাশিকাবৃত্তিপ্রণেতা জয়াদিত্য বলিয়া বিখ্যাত। তর্কশাস্ত্রে কুসুমাঞ্জলি ও আগমে নাগভট্ট * নাম গ্রহণ করিয়া দুর্গসিংহ কি কি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন জানি না। কেহ বলেন সুপ্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্যের কুসুমাঞ্জলি ব্যতীত তর্কশাস্ত্রে আরও ২। ৩ মতের কুসুমাঞ্জলি আছে। উহার মধ্যে দুর্গসিংহেরও একখানা কুসুমাঞ্জলি আছে। আবার কেহ বলেন ন্যায়শাস্ত্রে দুর্গসিংহের (কুসুমাঞ্জলির) একটী স্বতন্ত্র মত আছে। কিন্তু দুর্গসিংহকৃত কোন কুসুমাঞ্জলির সহিত কিম্বা কুসুমাঞ্জলি (দুর্গসিংহ) কৃত কোন ন্যায়গ্রন্থের সহিত আমাদের এ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ হয় নাই এবং তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কেহ কৈয়টের (কৈযাট) টীকাপ্রণেতা নাগোজীভট্টকে দুর্গসিংহ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, কেননা দুর্গসিংহের অপর নাম নাগভট্ট; কিন্তু এ কল্পনা আমাদের নিকট তত সমীচীন বোধ হয় না; কারণ নাগোজী ভট্ট, ভট্টোজীদীক্ষিত প্রভৃতি নামকে আধুনিক হিন্দুস্থানী লোকের নাম বলিয়া জ্ঞান হয়। কৈয়টটীকাপ্রণেতাকে দুর্গসিংহের অনেক পরকীয় লোক বলিয়া

* কেহ নিরুক্তব্যাখ্যাপ্রণেতা দুর্গাচার্য্যকেও আচার্য্য দুর্গসিংহ বলিয়া অনুমান করেন আমরা একথার মূল জানি না; কিন্তু নিরুক্তকে আগমের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে।

বোধ হয়। আশা করি কোন বহুদর্শী পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত দুর্গসিংহের অপর নাম নাগভট্ট এবং কুসুমাঞ্জলি সম্বন্ধে সত্য আবিষ্কার এবং দুর্গসিংহ জীবনের ঐ অংশ দ্বয়ের প্রগাঢ় তিমিরে একটী দীপ প্রজ্বলন করিয়া দিবেন।

যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা নামক সেতার শিক্ষা বিধায়ক গ্রন্থের একটী স্থল দেখিয়া বোধ হয় যে দুর্গসিংহ কৃত "কালাপীয় পরিশিষ্ট" নামক একখানি গ্রন্থ আছে। যন্ত্রক্ষেত্র-দীপিকায় দুর্গসিংহকৃত একটী অতিরিক্ত সূত্র উদ্ধৃত করিয়া, উহা দুর্গসিংহ-কৃত কালাপীয় পরিশিষ্ট হইতে উদ্ধৃত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে (২০)। আমরা যতদূর জানি তাহাতে এ কথাটী সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কেননা শ্রীপতিদত্ত কৃত "কাতন্ত্র পরিশিষ্ট" ব্যতীত যে দুর্গ সিংহ কৃত পরিশিষ্ট আছে তাহা এই নূতন শুনিলাম। দুর্গসিংহ কাতন্ত্রকে কোথাও "কলাপ" বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। উক্ত গ্রন্থে যে সূত্রটী উদ্ধৃত হইয়াছে উহা দুর্গসিংহকৃত কাতন্ত্রটীকাতে অতিরিক্ত সূত্র রূপে বিনিবেশিত আছে। বোধ হয়, যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা-প্রণেতা ঐ সূত্রটী কাতন্ত্রের অতিরিক্ত সূত্র জানিয়াই কালাপী পরিশিষ্টোদ্ধৃত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক দুর্গসিংহ-কৃত যদি স্বতন্ত্র কালাপীয় পরিশিষ্ট থাকিত তবে তাহা কলাপব্যবসায়ীগণ অবশ্য জানিতেন এবং অন্যান্য টীকাকারগণও উল্লেখ করিতেন।

শুনা যায় দুর্গ সিংহ জ্যোতিষ শাস্ত্রে ও এক জন অসামান্য পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার কৃত জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থাদি ও আছে কিন্তু এ সম্বন্ধেও কোন ভাল প্রমাণ জানা যায় নাই। (২১)

দুর্গ সিংহের ন্যায় নানা শাস্ত্রে অলোক সামান্য পণ্ডিত সর্ব্ব বিষয়ে জগৎ বিখ্যাত এবং অতুলসৌভাগ্যশালী গ্রন্থকার এ

(২০) "হ্রস্বাত্ত্বাদৌতদ্ধিতে নায়ঃ। হ্রস্বাৎ পরস্য সস্য আদৌ তদ্ধিতে নাম্নো বিহিতঃ সঃ ষো ভবতি। বপুস্ ভিল ত্বং বপুষ্টং ইত্যাদি। হ্রস্বাদিতি কিং গীস্ত্বং ইত্যাদি। ইতি দুর্গসিংহকৃত কালাপীয় পরিশিষ্টে।"

রাজ শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত "যন্ত্রক্ষেত্র দীপিকা" ১৭৯ পৃষ্ঠার টীকা।

(২১) পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত "গণিত ও জ্যোতিষ বিদ্যার আবিষ্কার কাল" শীর্ষক প্রস্তাবের একস্থলে লিখিত আছে:— * * * *
আর্য্যভয় অবশ্যই আর্য্যভট্ট। প্রধান পুরাতন জ্যোতির্বেত্তা ব্রহ্মগুপ্ত ৫৫০ শকে এবং বরাহ মিহির ৫২৭ শকে জীবিত। ইহাদের পূর্ব্বকালিক বিষ্ণুচন্দ্র, ব্রাসেন, দুর্গ সিংহ। ইঁহারা সকলেই স্ব স্ব গ্রন্থে আর্য্যভট্টের নাম উল্লেখ করাতে প্রমাণ হইতেছে যে আর্য্যভট্ট চতুর্দ্দশ শত বৎসরেরও পূর্ব্বের লোক। (ভারতী দ্বিতীয় ভাগ, ২৮৩ পৃষ্ঠার টীকা) দুর্গ সিংহ যে বরাহ মিহিরের পূর্ব্বের লোক তাহার প্রমাণ কি? তাঁহার কৃত (দুর্গসিংহের) ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে কি জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে আর্য্যভট্টের নাম উল্লেখ আছে?

জঘন্য যুগে ভারতে আর কেহ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ কিন্তু এই দেবতুল্য মহোদয়কেও কোন কোন শফরীপ্রকৃতি লোক নিন্দা করিতে ক্রটী করেন নাই। হলায়ুধ নামক লক্ষ্মণসেনের জনৈক প্রিয় মন্ত্রী কাতন্ত্রগণের (ধাতুপাঠের) এক খানা টীকা প্রণয়ন করেন। তিনি ঐ গণটীকার এক স্থলে দুর্গসিংহ, সর্ব্ববর্ম্মা এবং কাতন্ত্রের প্রায় সকল টীকাকারকেই নিন্দা করিয়াছেন। দুর্গসিংহ সম্বন্ধে বলিয়াছেন "আচার্য্য দুর্গসিংহ সততই প্রলাপ বাক্য বলিয়াছেন (২২)।" হলায়ুধের ন্যায় একজন প্রসিদ্ধ মহাত্মাও যে নীচ প্রবৃত্তির আয়ত্ত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না ইহা অতীব আশ্চর্য্য। আমরা জানি যে হলায়ুধ সংস্কৃত সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত ও তিনি একজন সুপণ্ডিত— বলিতে পারি না কেন তাঁহার এবম্প্রকার মতিচ্ছন্ন হইয়া ছিল। তবে কথা এই তিনি আজীবনই প্রায় গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের অতি প্রিয় পাত্র মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া লোকসমাজে অতিশয় সম্মানিত ছিলেন। লোকে তাঁহাকে প্রায় দেবতাবৎ জ্ঞান করিত (২৩)। বোধ হয় এই জন্যই তিনি আপনাকে হিমালয় হইতেও উচ্চতর জ্ঞান করিতেন, পৃথিবীর অন্যান্য সকল লোকই তাঁহার নিকট তুচ্ছ ছিল সুতরাং তিনি দুর্গসিংহ প্রভৃতিকে যে অপদার্থ জ্ঞান করিবেন তাহা ও বিস্ময়কর নহে। কিন্তু তাই বলিয়াই তাঁহার কথাকে বেদবাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের বিবেচনায় মহাসাগরের সহিত যেমন চঞ্চলপ্রকৃতি ক্ষুদ্র স্রোতঃস্বতীর তুলনা হইতে পারে না, সেইরূপ বিদ্যা বিষয়ে দুর্গসিংহের সহিতও হলায়ুধের তুলনা হইতে পারে না। এমন কি হলায়ুধ কাতন্ত্র সম্বন্ধীয় যে যে গ্রন্থকারকে উপহাস করিয়াছেন তাঁহারা কেহও তাঁহা অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধিতে বড় নিকৃষ্ট হইবেন না। সুতরাং হলায়ুধ তাঁহাদিগকে অযথা নিন্দা করিয়া কেবল জনসমাজে আপনাকেই হাস্যাস্পদ ও পরনিন্দারূপ দোষে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

কাহারও কাহারও মতে কাতন্ত্রপরিশিষ্টপ্রণেতা শ্রীপতিদত্ত "গুরু দ্বারা যদুক্ত হইয়াছে" (গুরুণা যদুক্তং) ইত্যাদি বচন দ্বারা দুর্গসিংহের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কোন্ স্থলে একথা বলিয়াছেন তাহা আমরা এপর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া না পাইলেও একথায় সর্ব্বাংশে সন্দিহান হইতে পারি; কেন না তাঁহার লিখাতে এমন কোন প্রমাণ পাই নাই যদ্দ্বারা তাঁহাকে দুর্গসিংহের সমসাময়িক লোক বলিয়া স্বীকার করা যায়। প্রত্যুত তিনি মাঘ, ভারবি প্রভৃতি দুর্গসিংহের পরকীয় মহাত্মা

(২২) আচার্য্যো দুর্গসিংহঃ প্রলপতি সততং বুদ্ধিহীনস্ত্রিনেত্রঃ।
(হলায়ুধ)।

(২৩) গুরোর্ব্বচঃ সত্যমসত্যমন্যদ্
গঙ্গাজলং পেয়মপেয়মন্যৎ।
শম্ভোঃ পদং সেব্যমসেব্যমন্যৎ
হলায়ুধঃ পাত্রমপাত্রমন্যৎ।

গণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কারণে আমাদের শ্রীপতিদত্তকে দুর্গসিংহের শিষ্য বলিয়া প্রত্যয় জন্মিতেছে না।

কেহ কেহ বলেন বিশ্বেশ্বর বা বিল্লেশ্বর নামক কাতন্ত্রটীকাকার দুর্গসিংহের পুত্র ছিলেন এবং বিদ্যাসাগর নামক টীকাকারও দুর্গসিংহের শিষ্য ছিলেন। কিন্তু এসম্বন্ধে আমরা কোন ভাল প্রমাণ পাই নাই।

কেহ আবার কাতন্ত্রপঞ্জিকা-প্রণেতা ত্রিলোচনদাসকেও দুর্গসিংহের শিষ্য বলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন ত্রিলোচন দুর্গসিংহের শিষ্য ছিলেন বলিয়াই তাহার টীকা দুর্গসিংহের বৃত্তির উপর উদ্ধৃত করিবার রীতি নাই, কেন না তাহাতে দুর্গসিংহকে অপমান করা হয়। আমাদের নিকট এযুক্তি নিতান্তই কাল্পনিক ও অমূলক বলিয়া বোধ হয়। ত্রিলোচন তাঁহার গ্রন্থে দুর্গসিংহ অপেক্ষা অনেক আধুনিক কাদম্বরী (বাণভট্ট কৃত) জয়দেব প্রভৃতির নামও উল্লেখ করিয়াছেন ২৪। জয়দেব চৈতন্যের প্রধান শিষ্য সনাতন গোস্বামীর মতে বঙ্গাধিপতি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক (অর্থাৎ ১১০১ হইতে ১১২১ খ্রীষ্টাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারদেশে যে শ্লোকটী খোদিত ছিল তাহাতেও একথার সামঞ্জস্য হইতেছে ২৫। কোন ইতিহাসবেত্তা জয়দেবকে খ্রীঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দির লোক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২৬)। সুতরাং দুর্গসিংহ অপেক্ষা ত্রিলোচন দাস প্রায় ৬৫০ কি ১০০০ বৎসরেরও পরকীয়

(২৪) গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নশান্তি জন্য দেবতাগণকে নমস্কার করা সম্বন্ধে বলিয়াছেন "তথাহি কাদম্বর্য্যাদৌ সকল দেবতা নমস্কার সম্ভবেপ্যভিপ্রেতস্যাসিদ্ধিরুপলভ্যতে। কচিত্তু শিশুপালবধাদৌ নমস্কারমন্তরেণাপি সাধ্যসিদ্ধিরুপলব্ধেতি"।

(ত্রিলোচন)

ত্রিলোচন অন্য স্থলে কাতন্ত্র শব্দ ব্যাখ্যা উপলক্ষে জয়দেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন:——"তেন হি সূত্রব্যাখ্যায়তে নন্বীষত্তন্ত্রং জয়দেবাদিপ্রোক্তমস্তীতি আহ সার্ব্ববর্ম্মিক মিতি"।

(ত্রিলোচন দাস)

(২৫) আবুল ফজেলের মতে, লক্ষ্মণসেন খ্রীঃ ১১১৬ অব্দে বাঙ্গালার রাজা ছিলে। জয়দেবচরিতপ্রণেতা আবুল ফজেলের কথায় সন্তুষ্ট না হইয়া অনেক তর্ক বিতর্কের পর খ্রীঃ ১১২১ অব্দকে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের চরম সীমা বলিয়া অনুমান করেন ("জয়দেব চরিত" ৮ পৃষ্ঠা)। কোন কোন পুরাতত্ত্বসন্ধানীও আবুলফজেলের মতে সন্তুষ্ট না হইয়া ১১০১ হইতে ১১২১ খীষ্টাব্দ লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (Journ. A. S. B. Part I. No 111. P. 139.

লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারস্থ প্রস্তর-ফলক-খোদিত শ্লোকটীতে জানা যায় জয়দেব উক্ত রাজার পঞ্চরত্ন সভায় অন্যতম রত্ন ছিলেন। শ্লোকটী এই:——

গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি সমিতৌ লক্ষ্মণস্য চ॥"

(২৬) Hon. Montstuart Elphinstion's "History of India" Book III. chap: VI. P, 17.

লোক। এই সকল কারণেই আমরা ত্রিলোচন দুর্গসিংহের শিষ্য একথা একটুকু বিশ্বাস করিতে পারি না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি—এতদ্দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে একটি অস্বাভাবিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে সর্ব্ববর্ম্মা ও বোপদেব ভিন্ন ব্যক্তি। এ কথাটী যে নিতান্ত অমূলক তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি। অনেকে ইহাও বলিয়া থাকেন যে "দুর্গসিংহ ও বোপদেব অভিন্ন ব্যক্তি"। দুর্গসিংহ বৃদ্ধ বয়সে যখন বাণপ্রস্থ ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া তপস্যা উপার্জ্জন জন্য অরণ্যে গমন করেন তখন তাঁহার কতিপয় শিষ্য তাঁহাকে বলিলেন "প্রভো! আপনি যে কলাপ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছেন তাহা অতি বিস্তীর্ণ সুতরাং লোকের হিতের জন্য সংক্ষিপ্ত করিয়া একখানি ব্যাকরণ প্রস্তুত করুন; দুর্গসিংহ তাঁহাদের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং বোপদেব নাম গ্রহণ করিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। দুর্গসিংহ সেই সময়ে সতত ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন বলিয়া মুগ্ধবোধের উদাহরণ-স্থলে ঈশ্বরের নামাবলী প্রয়োগ করিয়াছেন। আমরা আর এই অমূলক কিংবদন্তীটী লইয়া অধিক আন্দোলন করিতে ইচ্ছা করি না। সর্ব্ববর্ম্মার জীবনীতে যে যে যুক্তির বলে ইহার অমূলকত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছি অধুনাও আমাদের প্রায় তাহাই বক্তব্য। বোধ হয় এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দুর্গসিংহ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দির পরার্দ্ধে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বোপদেব তাঁহাপেক্ষা প্রায় ৭০০।৮০০ বৎসরের পরকীয় লোক। সুতরাং দুর্গসিংহ ও বোপদেব কখনি অভিন্ন লোক নহেন।

সুপ্রসিদ্ধ দণ্ডীকে, ভোজপ্রবন্ধের লিখানুসারে ভোজরাজের সভাতে আসীন দেখিয়া অনেকে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়া অনুমান করিয়া থাকেন (২৭) এবং অনেকের বিশ্বাস দণ্ডী নিতান্ত আধুনিক লোক। কিন্তু আমরা দুর্গসিংহের জীবনীর সংস্রবে দণ্ডীর আবির্ভাব সময়ের একটি চরম সীমা পাইয়াছি। দুর্গসিংহ কাতন্ত্রের বৃহৎ বৃত্তির তৃতীয় পাদের একটি সূত্রের উদাহরণে দণ্ডীকৃত কাব্যাদর্শের একটি শ্লোকার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন (২৮) ঐ শ্লোকটী কাব্যাদর্শের প্রথম পৃষ্ঠাতেই সুস্পষ্ট রূপে উল্লেখ আছে (২৯)। ইহাতে বোধ হয় দণ্ডী খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দির পূর্ব্বের লোক। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দির কত পূর্ব্বের লোক তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ কথা নহে। কাল্পনিক ভোজপ্রবন্ধের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া অনেকেই বিষম ভ্রমে

(২৭) "জ্ঞানাঙ্কুর" প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(২৮) কাত্যায়ণ সূত্রঃ—দুহঃ কোষশ্চ। দুর্গসিংহ বৃত্তিঃ—কর্ম্মণ্যুপপদে দুহঃ কো ভবতি ষশ্চান্ত্যাদেশঃ ব্রহ্মদুঘা গোঃ। "গোগৌঃ কামদুঘা সম্যক্ প্রযুক্তা স্মর্য্যতে বুধৈঃ।

(২৯) গৌগৌঃ কামদুঘা সম্যক প্রযুক্তা স্মর্য্যতে বুধৈঃ। দুষ্প্রযুক্তা পুন গোত্বং প্রযোক্তুঃ সেব শংসতি।

(আচার্য্য দণ্ডীকৃত "কাব্যাদর্শ" ১ পৃষ্ঠা)।

পতিত হইয়া থাকেন। ভোজপ্রবন্ধের ঐতিহাসিক সত্যের উপর লক্ষ্য করা নিরবচ্ছিন্ন অহম্মুখতার পরিচায়ক।

আমরা এই স্থলে বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ দুর্গসিংহের জীবনী পরিসমাপ্তি করিলাম নানা শাস্ত্রবিশারদ দুর্গসিংহকেও হিন্দুজাতির প্রধান গৌরবের স্থল বলিতে হইবে। দুঃখের বিষয় তাঁহার জীবন বৃত্তান্তের প্রায় সকলই বিলোপ হইয়াছে। আশা করি সহৃদয় পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এই মহাত্মার জীবনী আবিষ্কার করিয়া জাতীয় গৌরব বর্দ্ধন করিতে সযত্ন হইবেন।

(শ্রী যাঃ)

প্রকৃতি এবং তাহার মূল-নিয়ম।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

উন্নতির নিয়ম।

ভারতীর ২ ভাগ ১০ সংখ্যা ৪৩৬ পৃষ্ঠার পর।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে স্বার্থজ্ঞান উন্নতির প্রথম সোপান। স্বার্থজ্ঞ মনুষ্য, বিষয়ের উত্তেজনায় নহে, কিন্তু আপনার প্রয়োজন-অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে। বিষয়-বিষয়ীর মধ্যে যে একটি প্রভেদ আছে, সর্ব্ব প্রথমে তাহা স্বার্থজ্ঞানের নিকটেই ধরা পড়ে; আমি যখন আপনার প্রয়োজন বুঝিয়া কার্য্য করি তখন সে-কার্য্যের মূলপ্রবর্ত্তকও আমি আপনি, চরম লক্ষ্যও আমি আপনি; পরন্তু আমি যখন বিষয়ের উত্তেজনা অনুসারে কার্য্য করি তখন তাহার প্রবর্ত্তক বহির্বিষয় এবং লক্ষ্য ক্ষণস্থায়ী মানসিক বিষয়,—কি? না বিষয়সুখ। আপনার প্রতি আপনার যে একটি প্রেম তাহা প্রথমাবস্থায় বিষয়সুখের সহিত জড়িত থাকে; পরে স্বার্থজ্ঞান ও বিষয়বুদ্ধি উদিত হইয়া বিষয়-শৃঙ্খল হইতে কতক অংশে আত্মার মুক্তিসাধন করে। বিষয় সকলের দোষ-গুণ পরীক্ষা করিয়া আপনার উপকারার্থে তাহাদিগকে ব্যবহার করা এ যে একটি ব্যাপার, ইহাও কতকটা আত্মার মুক্তি-সাপেক্ষ, বিষয়-মোহে একান্ত মুগ্ধ থাকিলে উহাও মনুষ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বিষয়-প্রত্যক্ষ এমন যে সহজ ব্যাপার ইহাও কতকটা আত্মার মুক্তি-সাপেক্ষ, কেননা বিষয় হইতে আপনাকে ভিন্ন করিয়া না জানিলে, বিষয়কে আপনা হইতে ভিন্ন করিয়া জানা সম্ভবে না—বিষয়-প্রত্যক্ষ সম্ভবে না। এইরূপ যখন আত্মা আপনাকে বিষয় হইতে ভিন্ন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করে তখন আপনার প্রতি তাহার যে একটি স্বভাবসিদ্ধ প্রেম আছে তাহার বশবর্ত্তী হইয়া বিষয়ের উপর আপনার কর্ত্তৃত্ব বলবৎ করিতে সচেষ্ট হয় এবং তাহাতে যে পরিমাণে সিদ্ধি লাভ করে সেই পরিমাণে মুক্তির আনন্দ অনুভব

করে। মুক্ত ভাব, অশরীরী ভাব, অমায়িক ভাব, সদানন্দ ভাব, ইহারই প্রতি আত্মার লক্ষ্য, কিন্তু সে লক্ষ্য সাধন করা এক দিনের কার্য্য নহে, এক এক ধাপ করিয়া তাহার দিকে ক্রমশ অগ্রসর হইতে হয়। স্বার্থজ্ঞান মুক্তি-সোপানের প্রথম ধাপ তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি ; কিন্তু সেই প্রথম ধাপের মুক্তিটুকুতেই আত্মা কখনই সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সেই প্রথম ধাপে আত্মা যে একটু অশরীরী ভাব লাভ করে তাহা আরো বিস্তার করিবার জন্য ব্যগ্র হয়। দম্পতি-প্রেমে যখন দুই আত্মা একাত্মা হয়, তখন আত্মার সেই অশরীরী ভাব আর এক ধাপ উচ্চে উঠে এবং পূর্ব্বে যেখানে স্বার্থ অধিষ্ঠান করিতেছিল এখন সেখানে ধর্ম্ম সিংহাসন প্রাপ্ত হয়। তোমার সম্পত্তিও যা, আমার সম্পত্তিও তা, তোমার শরীরও যা, আমার শরীরও তা, তোমার হৃদয়ও যা, আমার হৃদয়ও তা, উভয়ের মধ্যে এই যে, বিষয়-নির্ব্বিশেষ, শরীর-নির্ব্বিশেষ, হৃদয়-নির্ব্বিশেষ প্রেমের ভাব তাহা বিষয়-সুখ অপেক্ষা উচ্চতর ভাব। কিন্তু সেই দম্পতি-প্রেম ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত হইলে তবেই তাহা সাংসারিক সকল প্রকার মঙ্গলের উৎসস্বরূপ হয়—নচেৎ তাহাতে ব্যাঘাত জন্মে। নিজের স্থায়ী সুখোদ্দেশে মনকে সংযত করিয়া চালানো, স্বার্থজ্ঞান অথবা বিষয়-বুদ্ধি দ্বারাই নির্ব্বাহ হইতে পারে, কিন্তু মনুষ্যের সহিত মনুষ্যের ব্যবহারকালে, প্রখর তীব্র ব্যবহার এবং বিরস মন্দ ব্যবহার উভয় দিক্ হইতে মনকে সংযত করিয়া তাহাকে সাম্যভাবে আনয়ন করা, বাক্য মনকে সাম্য ভাবে আনয়ন করা, ভিতর বাহিরকে সাম্যভাবে আনয়ন করা, আপনার হৃদয়কে অন্যের হৃদয়ের সহিত সাম্যভাবে আনয়ন করা, এসকল কার্য্য বিষয়-বুদ্ধির অধিকারাতীত, উহা ধর্ম্মবুদ্ধিকে অপেক্ষা করে।

এই ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা দম্পতিপ্রেম নিয়মিত হইলে তাহা অশেষ কল্যাণের আকর হয়। দম্পতিপ্রেম যেমন দুই শরীরকে এক শরীর করে, দুই হৃদয়কে এক হৃদয় করে, ধর্ম্ম সেইরূপ দুই আত্মাকে একাত্মা করে। দম্পতীর একাত্ম ভাব কালক্রমে পরিস্ফুট হইলে উভয়ই অনাসক্ত চিত্তে সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হন। প্রকৃত পক্ষে আত্মা অশরীরী, কেবল প্রাণ-শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতেই আপনাকে শরীরী মনে না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না ; বিষয় হইতে আত্মা যতই মুক্ত হয়, এবং আত্মার সহিত আত্মা যতই যুক্ত হয় ততই সে আপনার অশরীরীভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়। এক দিকে যেমন বিষয়াতীত অশরীরী ভাবের প্রতি, মুক্তির প্রতি, আত্মার লক্ষ্য, অন্যদিকে সেইরূপ আত্মার সহিত আত্মার যে যোগ সেই অধ্যাত্ম-যোগের প্রতি আত্মার লক্ষ্য ; অধ্যাত্ম-যোগের প্রথম সোপান ধর্ম্ম। সংসারের মুখ্য উদ্দেশ্য ক্ষণিক সুখভোগ নহে, ধর্ম্মসাধন এবং তজ্জনিত স্থায়ী

অধ্যাত্ম সুখই সংসারের মুখ্য উদ্দেশ্য; এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রে সংসার আশ্রম-বিশেষ বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং স্ত্রীর আর এক নাম সহধর্ম্মিণী হইয়াছে; দম্পতিপ্রেমকে ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা নিয়মিত করিলে তবেই সে নামের সার্থকতা হয়, নচেৎ গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি নানা প্রকার অমঙ্গল প্রবেশ করিয়া সুখের সংসারকে অশান্তির আলয় করিয়া তোলে। কেহ মনে করিতে পারেন সৌন্দর্য্যই দম্পতি-প্রেমের নিয়ামক কিন্তু তাহা ঠিক নহে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রণয়-সঞ্চার যদিও কতক অংশে সৌন্দর্য্যকে অপেক্ষা করে কিন্তু সৌন্দর্য্য যেখানে সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলে ঠিক হয়, সে স্থান এ নহে; সুন্দর স্ত্রীপুরুষ অনেক আছে তন্মধ্যে সকলের সহিত সকলের দাম্পত্য প্রেম স্থায়ী হইতে পারে না; যাহাদের মধ্যে দম্পতি-প্রেম ধর্ম্মানুমোদিত স্থায়িত্বলাভে সমর্থ হয়, তাহাদের মধ্যেই বিবাহ বন্ধন হওয়া কর্ত্তব্য। স্বার্থ যেমন বিষয়-সুখের স্থায়িত্ব সম্পাদন করে, ধর্ম্ম সেইরূপ দম্পতি-প্রেমের স্থায়িত্ব সম্পাদন করে; কিন্তু সৌন্দর্য্য যদি দুই বিভিন্নপ্রকৃতির হৃদয়কে ক্ষণিক দাম্পত্য প্রেমের প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করে, তবে সে বিবাহ সমাজ-বিরুদ্ধ না হইতে পারে কিন্তু ধর্ম্মবিরুদ্ধ তাহাতে আর সংশয় নাই। অতএব ধর্ম্মই দম্পতি-প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সৌন্দর্য্য নহে।

পুত্র কন্যাগণের প্রতি পিতা মাতার যে আন্তরিক স্নেহ তাহা দম্পতিপ্রেমের ফল স্বরূপ, এবং তাহাদের উপরে পিতা মাতার যে কর্ত্তৃত্ব ভাব তাহা সংসার-ধর্ম্মের ফল স্বরূপ। সে যে কর্ত্তৃত্ব ভাব তাহা শারীরিক বল-মূলক নহে তাহা আধ্যাত্মিক শক্তিমূলক। আধ্যাত্মিক শক্তি কাহাকে বলে তাহা জানিতে হইলে শুদ্ধ কেবল এইটা দেখিলেই হয় যে, পুত্র কন্যার উপরে পিতা মাতার কর্ত্তৃত্ব ভাবটি কিরূপ, তাহাই আধ্যাত্মিক শক্তির আদর্শ স্বরূপ। রাজার কর্ত্তৃত্ব যদি পিতার কর্ত্তৃত্বের ন্যায় হয় তবেই বলিতে পারা যায় যে, বাহুবল দ্বারা নহে আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা তিনি রাজ্য শাসন করিতেছেন।

পুত্র কন্যাগণকে সুনিয়মে চালানো শুদ্ধ কেবল তাড়না অথবা লালনার কর্ম্ম নহে; তাহা আধ্যাত্মিক শক্তিকে অপেক্ষা করে। ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের ন্যায় পিতামাতার অধ্যাত্ম শক্তি এমনি অলক্ষিত ভাবে সন্তানগণের উপর কার্য্য করে, যে তাহারা তাহার বশে থাকে অথচ জানিতে পারে না যে বশে আছে। আজিকার কালে অধিকাংশ বালক এইরূপে শিক্ষিত হয় যেন বলই সর্ব্বস্ব,—তাহারা যেরূপ বল দ্বারা চালিত হয়, বলদ্বারা শিক্ষিত হয়, বল দ্বারা গঠিত হয়, তাহাতে করিয়া বলই কালক্রমে তাহাদের উপাস্য দেবতা হইয়া উঠে; তাহারা জগৎ সংসারে কেবল বলেরই মাহাত্ম্য অবলোকন করে, আত্মার মাহাত্ম্যের প্রতি অন্ধ থাকে, যাহার বল তাহার দিকেই গোড় দেয়,

দুর্ব্বলদিগকে বল পূর্ব্বক চালনা করে এইরূপ এক আসুরিক ভাব তাহাদের মনকে অধিকার করিয়া বসে। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্, শুনিয়াছি, অতীব শৈশব কাল হইতে প্রভূত বল পূর্ব্বক শিক্ষিত হইয়াছিলেন, হয়ত তাহারই গুণে ঈশ্বরের মঙ্গল ভাবের প্রতি কঠোর অবিশ্বাস যাবজ্জীবন তাঁহার মনকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রহিয়া ছিল—তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। পুত্র কন্যাগণের প্রতি উপযুক্ত শক্তি-চালনা করিতে শৈথিল্য করিলে আর এক দিকে তাহাদের অনিষ্ট করা হয়; তাহা হইলে, স্বভাবগুণে সকল কার্য্য হইতেছে, আত্মচেষ্টা আত্মকর্ত্তৃত্ব নিষ্ফল, এইরূপ একটি নিরুদ্যম ভাব কালক্রমে তাহাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া তাহারা একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। পরন্তু বালকেরা আধ্যাত্মিক শক্তি দ্বারা লালিত পালিত এবং শিক্ষিত হইলে কালক্রমে তাহারা আত্মার মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয়, বাহুবল অপেক্ষা অধ্যাত্ম শক্তি দ্বারা কার্য্য করিতে ভালবাসে, প্রকৃতি অপেক্ষা পরমাত্মার মহিমা অসীম বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করে। অতএব বাৎসল্য ভাবকে অধ্যাত্ম-শক্তি দ্বারা নিয়মিত করাই সর্ব্ব প্রকারে কর্ত্তব্য। আত্মার স্বকীয় শক্তি পরিস্ফুটতা প্রাপ্ত হইলে তাহা মুক্তি-পথে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়।

প্রথমে মনুষ্য স্বার্থসাধন মানসে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ধর্ম্মসাধনের জন্য প্রস্তুত হয়, পরে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিয়া সংসারের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। অর্থ, ধর্ম্ম এবং কর্ত্তৃত্ব, উন্নতি সোপানের প্রথম এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করিলে পর তবে সৌন্দর্য্য মঙ্গল এবং সামঞ্জস্য অথবা শান্তির প্রতি আত্মার লক্ষ্য যায়; ধর্ম্মসাধনের জন্য অর্থ উপার্জ্জন, এবং আত্মার শক্তিসাধনের জন্য ধর্ম্ম উপার্জ্জন যেমন আবশ্যক তেমনি আবার আত্মার সৌন্দর্য্যসাধনের জন্য, আত্মার শক্তি উপার্জ্জন আবশ্যক। ধর্ম্ম দ্বারা আত্মা পবিত্র হইলে, এবং কর্ত্তৃত্ব-সাধন দ্বারা আত্মা বলশালী হইলে তবেই তাহার অভ্যন্তর হইতে সৌন্দর্য্যের উৎস উৎসারিত হইবার পথ পায়। যাহারা ইন্দ্রিয়-সুখের দাস প্রকৃতির সৌন্দর্য্য তাহাদের জন্য নহে এবং যাহাদের আধ্যাত্মিক বল নাই আত্মা হইতে সৌন্দর্য্য উদ্গীরণ করা তাহাদের কর্ম্ম নহে,—যাঁহারা সুন্দর গীত সুন্দর কাব্য সুন্দর চিত্র রচনা করিয়া পৃথিবী শুদ্ধ লোকের মন আবহমান কাল কিনিয়া রাখিয়াছেন তাঁহাদের অধ্যাত্মশক্তি কত না ধন্যবাদের যোগ্য। উন্নতিসোপানের চরম তিনটি যে ধাপ তাহার সহিত প্রথম তিনটি ধাপের এক প্রকার প্রতিযোগিতা লক্ষিত হয়, যথা, স্বার্থের প্রতিযোগী সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মের প্রতিযোগী মঙ্গল, কর্ত্তৃত্বের প্রতিযোগী শান্তি। প্রতিযোগিতা শব্দের অর্থ এখানে প্রতিপক্ষ ভাব নহে শুদ্ধ কেবল সাম্মুখ্য ভাব মাত্র; আমি, তুমি, এ দুয়ের মধ্যে যেরূপ সাম্মুখ্য ভাব দৃষ্ট হয়, সেই ভাবটিকেই প্রতিযোগিতা শব্দে উল্লেখ করা যাইতেছে। পরার্থই

স্বার্থের প্রতিযোগী, প্রতিযোগী বটে কিন্তু তাহা বলিয়া হন্তারক নহে, পরের স্বার্থই পরার্থ সুতরাং পরার্থ স্বার্থেরই বন্ধন-মুক্ত ভাব; সৌন্দর্য্য স্বার্থ হইতে আমাদের মনকে উঠাইয়া পরার্থে লইয়া গিয়া ফেলে। আপনার প্রতি আত্মার যে একটি ভালবাসা তাহা অন্যের প্রতি যাওয়া চাই, তাহার পথপ্রদর্শক সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্য আত্মার দর্পণ-স্বরূপ, সেই দর্পণে আত্মা আপনার ভাব প্রতিবিম্বিত দেখে বলিয়াই তাহাতে প্রেম সমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারে না। অর্থের ভাব ধর্ম্মের ভাব এবং শক্তির ভাব আত্মার এই যে তিনটি আন্তরিক ভাব, এক সৌন্দর্য্যের মধ্যেই আত্মা তৎসমস্তই প্রতিবিম্বিত দেখিয়া চমৎকৃত হয়—আমার আপনার মনোগত ভাব বাহিরে মূর্ত্তিমান দেখিতেছি—কি চমৎকার! এই সে চমৎকারিতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উন্নতি-সোপানের কোন এক ধাপের ভাব তাহার পরের ধাপে বিলুপ্ত হয় না পরন্তু নবতর উন্নতর আকারে বর্ত্তমান থাকে; অতএব সৌন্দর্য্যের মধ্যে অর্থ ধর্ম্ম এবং শক্তি তিনেরই ভাব প্রকারান্তরে বর্ত্তমান আছে ইহা বলা পুনরুক্তি মাত্র। পূর্ব্বকার ঐ তিনটি ধাপ অনুসারে সৌন্দর্য্য তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, অর্থ-প্রধান, ধর্ম্ম-প্রধান এবং শক্তি প্রধান; প্রয়োজনসাধনোপযোগিতার যে একটি সৌন্দর্য্য তাহাই অর্থপ্রধান বলিয়া উক্ত হইল, একটি সুন্দর বটিকা-যন্ত্র ইহার দৃষ্টান্তস্থল; শান্তি মাধুর্য্য প্রসন্নতা প্রভৃতি ধর্ম্ম ভাবের উদ্দীপক যে সৌন্দর্য্য তাহা ধর্ম্ম-প্রধান বলিয়া উক্ত হইল, একটি সুন্দর পুষ্প ইহার দৃষ্টান্তস্থল; অটল ধৈর্য্যের ভাব, প্রভূত উদ্যমের ভাব বিশ্ববিজয়ী প্রতাপের ভাব, এসকলের যে সৌন্দর্য্য তাহা শক্তি-প্রধান বলিয়া উক্ত হইল; ঝঞ্ঝাকর্ত্তৃক রণাহূত সমুদ্র এবং গগনস্পর্দ্ধী অটল ভূধর ইহার দৃষ্টান্তস্থল। অর্থপ্রধান সৌন্দর্য্যে কার্য্যোপযোগী নৈপুণ্য এবং পারিপাট্যই বিশেষরূপে লক্ষিত হয়, ধর্ম্মপ্রধান সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যগুণ এবং প্রসাদগুণ বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়, এবং শক্তিপ্রধান সৌন্দর্য্যে ওজোগুণ বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়; কিন্তু উক্ত তিন ভাবের যে ভাবেরই প্রাধান্য হউক না কেন সৌন্দর্য্য তাহাদের একটিকেও সমূলে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; পুষ্প একটিকে দেখ, তাহার রূপ লাবণ্য, গন্ধমাধুর্য্য এবং স্পর্শলালিত্য আমাদের ইন্দ্রিয়-সুখরূপ প্রয়োজন সাধনের কেমন উপযোগী; তাহার রূপের বিশদ বিমল ভাব, সৌরভের স্নিগ্ধভাব, তাহার সুললিত স্পর্শের নম্র ভাব, প্রখর তীব্র ভাবও নহে নিস্তেজ মন্দ ভাবও নহে, পরন্তু উভয়ের মধ্যবর্ত্তী শান্ত সংযত ভাব, এগুলি ধর্ম্মভাবের কেমন উদ্দীপক, আবার তাহা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া মুকুলাবস্থা হইতে যেরূপে পরিস্ফুটিতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সেই গঠন-প্রণালী আধ্যাত্মিক শক্তির কেমন পরিচয় দেয়।

আমরা যে অন্যের সহিত বন্ধুতায় প্রবৃত্ত

হই, সৌন্দর্য্যই তাহার নিয়ামক। আমাদের আপনার মনোগত ভাব আমরা বাহিরে পরিস্ফুট দেখিতে চাই বলিয়া আমরা অন্যের সহিত বন্ধুতায় প্রবৃত্ত হই; কোন এক ব্যক্তি কোন একটি সামান্য কার্য্যেও যদি নিপুণতা প্রদর্শন করে তবে তাহার মধ্যেই আমরা আমাদের আন্তরিক অর্থ-সাধনের ভাব দেখিতে পাই, কোন ব্যক্তি যদি সামান্য আচার ব্যবহারেও শান্ত সংযত সুপ্রসন্ন ভাব প্রদর্শন করে তবে তাহার মধ্যেই আমরা আমাদের আন্তরিক ধর্ম্মের ভাব দেখিতে পাই এবং কোন ব্যক্তি যদি সামান্য কার্য্যেতেও আত্মার অটল ধৈর্য্য বীর্য্য প্রদর্শন করে তবে তাহার মধ্যেই আমরা আমাদের আন্তরিক শক্তির ভাব দেখিতে পাই;—তাই তাহা আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া বোধ হয়। বন্ধুগণের সংসর্গ যদি সৌন্দর্য্য দ্বারা নিয়মিত হয়, তাহা হইলে তাহা উন্নতির একটি প্রধান সোপান হয়। আমি যাহা করিয়াছি, করিতেছি, করিব, আমার সেই সাধনের বিষয়, আমি যদি অন্যেতে সুন্দররূপে ফলিত দেখি, তবে সেই বহিরাদর্শ আমার সাধনের পক্ষে বিশেষ সহায় হয়; এতদুপলক্ষে একটি সামান্য বিষয়কে সাক্ষী মান্য করি—মনে কর আমি সেতার বাজানো শিক্ষা করিতেছি, এবং পুস্তক দেখিয়া তাহার অনেক গুলি সন্ধান লাভ করিয়া তদনুসারে কতক দূর শিখিতে পারিয়াছি কিন্তু তথাপি আমি যে প্রকার সুন্দররূপে বাজাইতে ইচ্ছা করি ততদূর পারিয়া উঠিতেছি না; এ অবস্থায় মনে কর, কোন সুনিপুণ সেতার বাদক আমার সম্মুখে সেতার বাজাইতেছে; সে যেরূপ শান্ত সংযত ভাবে তাল মান লয় সুর সমস্তই ঠিকঠাক বাহির করিতেছে তাহাতে তাহার সৌন্দর্য্য আমার মনে নিবিষ্ট হইয়া যাইতেছে; তাহার প্রত্যেক অঙ্গুলি-ক্ষেপে আমি যেন আমার মনোগত অভিপ্রায়টি মূর্ত্তিমান দেখিতেছি সুতরাং তাহাকে আমি সাধনের আদর্শরূপে গ্রহণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না। এ যেমন দেখা গেল এমনি সাধু সঙ্গের সৌন্দর্য্যে আমাদের মন আকৃষ্ট হইলে মহৎমহৎ সাধনেরও সাহায্য লাভ করিয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইতে পারি।

সৌন্দর্য্যই বন্ধুতার নিয়ামক। ব্যক্তি বিশেষের সৌন্দর্য্য বলিবা মাত্র প্রথমেই শারীরিক সৌন্দর্য্য মনে উদয় হয়; এরূপ যে হয় তাহার কারণ আছে; আত্মার ভিতরের ভাব বাহিরে প্রতিবিম্বিত হইলে, তাহাই সৌন্দর্য্য বলিয়া আমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়; আত্মার ভাব শরীরে যেমন স্থিররূপে প্রতিবিম্বিত হয় অন্য কুত্রাপি তেমন হয় না। আত্মার কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ লক্ষণ আছে, যেমন, আনন্দ; মুখের প্রসন্নতাই সেই আনন্দের প্রতিবিম্ব স্বরূপ; যেমন, চাঞ্চল্যরহিত স্থায়ী সত্তাভাব; মুখের প্রশান্তিই তাহার প্রতিবিম্ব স্বরূপ; যেমন মনোবৃত্তি সকলের সামঞ্জস্য ভাব; মুখের আকার সামঞ্জস্যই তাহার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। কিন্তু শুদ্ধ কেবল শরীরের আকার মাত্রেই নহে, কথা-বার্ত্তায় আচার-ব্যবহারে কার্য্যে

যাহাতেই আত্মার ভাব প্রতিবিম্বিত হয় তাহাই সুন্দর বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়; কাহারো শরীরের এরূপ বিকৃত গঠন হইতে পারে যে, তাহাতে আত্মার ভাব প্রতিবিম্বিত হইবার অতি অল্পই সম্ভাবনা; কিন্তু তাহা বলিয়া আত্মা যে সৌন্দর্য্য-বিকিরণে ক্ষান্ত হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই; অন্ধ ব্যক্তি যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অভাব অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সমবেত চেষ্টা-দ্বারা পূরণ করিয়া লয়, সে ব্যক্তিও সেইরূপ না করিবে কেন? তাহার আচার ব্যবহারে কার্য্যে আত্মার ভাব প্রতিবিম্বিত হইলেই সে-তাহার সৌন্দর্য্যের নিকট শারীরিক সৌন্দর্য্য অতীব লঘু সামগ্রী হইয়া পড়ে, কেন না শারীরিক সৌন্দর্য্য নশ্বর, মানসিক সৌন্দর্য্য চিরস্থায়ী, শারীরিক সৌন্দর্য্যের উপর আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব থাটে না, মানসিক সৌন্দর্য্য আমাদের সাধন-সাপেক্ষ, ইত্যাদি নানা কারণে শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা মানসিক সৌন্দর্য্যের মূল্য অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ পরস্পরের আত্মার ভাব পরস্পরের নিকট প্রতিবিম্বিত হইলে, আত্মাসমূহের মধ্যে আবরণ ঘুচিয়া যায়, এবং অনেক আত্মা সৌহার্দ্দ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া একাত্মার ন্যায় হয়; সৌন্দর্য্যই কেবল আত্মার ভিতরকার মর্ম্ম বাহিরে উদ্গীরণ করিয়া আত্মাকে আত্মার নিকট অনাবৃত করে; আপনিটি এবং আপনারটিতে বদ্ধ না থাকিয়া আমরা যে বাহিরে প্রীতি বিস্তার করি সৌন্দর্য্যই তাহার পথ প্রদর্শক। সৌন্দর্য্যের সাংকেতিক নিমন্ত্রণে আত্মায় আত্মায় দেখা সাক্ষাৎ হইয়া উভয়ের একাত্ম ভাব পরিস্ফুট হইলে আত্মার অশরীরী মুক্তভাব আর একধাপ উচ্চে উত্থিত হয়।

সৌন্দর্য্য যে কিরূপ ভাব তাহার প্রতি আর একটু প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক্। কোন কার্য্য-বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া সচরাচর আমরা বলিয়া থাকি যে, একার্য্যের অর্থ কি? এখানে অর্থ-শব্দে অভিপ্রায় তাৎপর্য্য মর্ম্ম অভিসন্ধি ইত্যাদি বুঝায়: মনুষ্য শুদ্ধ যদি কেবল ক্ষণিক বিষয়-সুখের উত্তেজনায় কার্য্য করে তবে তাহার অর্থ অতি সামান্য বলিয়া বোধ হয় কিন্তু যখন কোন স্থায়ী সুখের উদ্দেশে কার্য্য করে তখন তাহার অর্থ তদপেক্ষা গুরুতর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, পূর্ব্বোক্ত কার্য্য অনর্থক কার্য্য এবং শেষোক্ত কার্য্য সার্থক কার্য্য বলিয়া অনুভূত হয়। এই অর্থের ভাব অর্থাৎ কার্য্য করিবার মর্ম্ম অভিসন্ধি ও তাৎপর্য্যের ভাব যতক্ষণ আমাদের আপনার ভিতরে থাকে ততক্ষণ তাহার মন্ত্রণা অনুসারে আমরা চলি বটে কিন্তু তাহার মূর্ত্তিটি আমরা সম্মুখে দেখিতে পাই না; আপনার ভিতরকার সেই যে অর্থের ভাব, যাহা অমূর্ত্ত, তাহাকে যখন বাহিরের কোন কিছুতে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাই, তখন তাহাই সৌন্দর্য্যরূপে আমাদের নিকট প্রকাশ পায়; অল্প কথায়, ভিতরকার অর্থ বা মর্ম্ম সম্মুখে মূর্ত্তিমান হইলেই তাহা সৌন্দর্য্যরূপ ধারণ করে; কোন বস্তুতে একজন যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় আর একজন তাহা পায় না কেন? ইহার

কারণ কেবল এইমাত্র যে এক জন তাহার অর্থজ্ঞ, মর্ম্মজ্ঞ, আর এক জন তাহার মর্ম্ম জানে না। মনে কর এক জন স্থূলদর্শী কৃষক এবং এক জন সূক্ষ্মদর্শী কবি উভয়েই তৃষ্ণা নিবারণার্থে কোন সরোবর-কূলে উপস্থিত হইয়াছে; কৃষক জলের অর্থ—এই শুধু জানে যে, তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ হয়,—এই পর্য্যন্ত, কিন্তু কবি জল পান করিয়া তত তৃপ্তি অনুভব করে না, যত তৃপ্তি সেই জলের ভিতরকার মর্ম্মটিতে প্রবেশ করিয়া অনুভব করে; জলের ভিতরকার যে একটি মর্ম্মরস তাহাই জলের সৌন্দর্য্য, এবং তাহাই পান করিয়া কবি পরিতৃপ্ত হয়। জলের তরলতা, স্নিগ্ধতা, দ্রবকারিতা, ইত্যাদি নানা প্রকার গুণ যে একটি মূল মর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া স্থিতি করিতেছে, সেটি কবির চক্ষেই অনাবৃত হয়। জলের সেই যে মর্ম্ম তাহা স্থলে নাই বায়ুতে নাই আকাশে নাই, তাহা কেবল জলেতেই আছে; কিন্তু জল তাহা জানে না, কবিই তাহা জানিতেছে;—ইহার অর্থ কি? অর্থ তাৎপর্য্য এবং মর্ম্মের ভাব কবির নিজের নাকি মনোগত ভাব, তাই সে ভাবকে কোন প্রকারে বাহিরে প্রতিবিম্বিত দেখিলে আপনার অমূর্ত্ত ভাবের মূর্ত্তিমান ভাব দেখিলে, কাজেই সে তাহার একটি আকর্ষণ অনুভব করে। জলের তরলতাতে মনের নির্ব্বিরোধী ভাব, জলের স্নিগ্ধতাতে মনের সন্তাপনিবারক প্রশান্তভাব, জলের দ্রবকারিতাতে অন্যকে আপনার করিয়া লইবার ভাব কবির চক্ষে প্রতিভাত হয়। রাজার প্রজাপালনের ভাব কালিদাস অচেতন বৃক্ষেতেও মূর্ত্তিমান দেখিয়া রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিয়াছেন "স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ প্রতিদিনমথবা তে সৃষ্টিরেবংবিধৈব। অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাং।" ইহার অর্থ এই—আপনার সুখে নিরভিলাষ হইয়া তুমি লোকের জন্য প্রতিদিন ক্লান্তি ভোগ কর, তা তোমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই ঐরূপ; বৃক্ষ যে সে আপনার মস্তক দ্বারা তীব্র উত্তাপ অনুভব করে, কিন্তু ছায়া দ্বারা আশ্রিত জনের পরিতাপ শান্তি করে। এইরূপ আত্মার ভিতরকার কোন নিগূঢ় অর্থ বা অভিসন্ধি, যাহা ভাল বই মন্দ হইতে পারে না, তাহা বাহিরে মূর্ত্তিমান ভাবে প্রতিভাত হইলেই সৌন্দর্য্য শব্দের বাচ্য হয়। সৌন্দর্য্য যেমন মর্ম্মের মূর্ত্তিমান ভাব, মঙ্গল সেইরূপ ধর্ম্মের মূর্ত্তিমান ভাব।

ধর্ম্ম আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের জন্য এবং ধর্ম্মসাধন আমাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের কার্য্য। একঃ প্রজায়তে জন্তুরেক এব প্রলীয়তে একোহনুভুংক্তে সুকৃতং এক এবতু দুষ্কৃতং॥ একাই মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করে, একাই মৃত হয়, এবং সুকৃতই হউক আর দুষ্কৃতই হউক একাই তাহার ফলভোগ করে। অন্তরের সেই ধর্ম্মভাবকে আমরা বাহিরে যেখানে মূর্ত্তিমান দেখি তাহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া

হৃদয়ঙ্গম করি। ভিতরের ধর্ম্ম হইতে বাহিরের অর্থ কর্ত্তৃত্ব এবং সৌন্দর্য্য ফলিত হইলে, ধর্ম্মের সেই ফলেতে ধর্ম্মকে প্রতিফলিত দেখিতে পাই, তাহাই আমরা মঙ্গল বলিয়া উপলব্ধি করি। মনুষ্যসমাজ যতই উন্নত হয় ততই তাহাতে মঙ্গলের ভাব মূর্ত্তিমান দেখিতে পাওয়া যায়; কেননা ততই উপযুক্ত লোক উপযুক্ত পদে স্থাপিত হয়, এবং লোকে যাহাতে উপযুক্ত হইতে পারে তাহার নানা দ্বার উন্মুক্ত হয়। সন্তানেরা পিতা মাতাতে মঙ্গলের আদর্শ যেমন মূর্ত্তিমান দেখিতে পায়, এমন আর কুত্রাপি নহে; তাহার কারণ এই যে, যিনি তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার উপযুক্ত তাঁহারই হস্তে কর্ত্তৃত্ব রহিয়াছে, এইটি তাহারা হৃদয়ঙ্গম করে; সন্তানের যাহাতে মঙ্গল হয় তাহা যেমন পিতা মাতার মনোগত ইচ্ছা এবং প্রাণগত চেষ্টা অন্যের সেরূপ নহে, এজন্য পিতা মাতা যেমন কর্ত্তৃত্ব করিবার উপযুক্ত অন্য কেহ সেরূপ নহে। সন্তানেরা পিতা মাতার বাহিরের কার্য্যে ভিতরের সাধু ভাব মূর্ত্তিমান দেখে বলিয়া পিতা মাতাকে ভক্তি না করিয়া থাকিতে পারে না। মঙ্গল দ্বারা ভক্তি নিয়মিত হইলেই ভক্তির যথার্থ মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। ভক্তি যদি শুদ্ধ কেবল বলের ভয় কিম্বা মায়ার প্রলোভন দ্বারা নিয়মিত হয় তবে তাহা নানা অনর্থের মূল হয়, পরন্তু মঙ্গলের অধ্যাত্ম শক্তি দ্বারা ভক্তি নিয়মিত হইলেই মুক্তি এবং অধ্যাত্ম যোগের আর এক ধাপ উচ্চ পদবী আমাদের অধিকারায়ত্ত হয়। এক মঙ্গলের মধ্যে অর্থ ধর্ম্ম শক্তি সৌন্দর্য্য সকলি কেন্দ্রীভূত হইয়া উন্নত আকার ধারণ করে, স্বার্থ অর্থ-মাত্র কিন্তু মঙ্গল পরমার্থ, ন্যায় ধর্ম্ম-মাত্র কিন্তু মঙ্গল পরম ধর্ম্ম, শক্তি ঐশ্বর্য্য মাত্র কিন্তু মঙ্গল পরম ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য দেখিতে ভাল, মঙ্গল বস্তুতই ভাল।

সৌন্দর্য্য যেমন অর্থের প্রতিযোগী, মঙ্গল যেমন ধর্ম্মের প্রতিযোগী, শান্তি সেই রূপ কর্ত্তৃত্বের প্রতিযোগী;—দেবপ্রসাদ আত্মপ্রভাবের প্রতিযোগী। মুক্তির জন্য অগ্রে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া চাই, জয় লাভ করিলে তবেই সামঞ্জস্য এবং শান্তির সহিত সাক্ষাৎকার হইতে পারে। কর্ত্তৃত্ব শক্তি কার্য্যে পরিপক্কতা লাভ করিলে তাহা অটল প্রশান্ত গম্ভীর ভাব ধারণ করে। সমস্তের মধ্যে যে একটি শান্ত সমাহিত একতান যোগের ভাব নিগূঢ়রূপে অবস্থিতি করিতেছে, তাহা যখন আমাদের আত্মার অভ্যন্তরে জাগরূক হয় তখন তাহাতে আমরা সর্ব্ব জগতের চালক অধ্যাত্ম শক্তিকে মূর্ত্তিমান দেখিতে পাই। আমাদের শক্তি পদে পদে বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমশঃ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়, কিন্তু পরমাত্মার ঐশী শক্তির কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই; তাঁহার আদেশে জগতের সমস্ত কার্য্য চলিতেছে ইহা বলিলেও তাঁহাতে বাক্য কল্পনা করা হয়,—তাঁহার নিস্তব্ধ প্রশান্ত ভাব-প্রভাবে সকলি স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে ইহাই বলা উচিত।

আমাদের সকল মনোবৃত্তির মধ্যে সাম-

স্থসা সংস্থাপিত হইলে মন নিষ্কাম প্রশান্ত হইলে, তবেই আমাদের প্রেম শৃঙ্খলমুক্ত হইয়া সর্ব্বময় এবং সর্ব্বাতীত পরমাত্মার প্রতি সমুত্থিত হয়। পরমাত্মার প্রশান্ত গম্ভীর অলক্ষিতগতি ঐশী শক্তির প্রভাবে অনর্থ অর্থে পরিণত হইতেছে, অধর্ম্ম ধর্ম্মে পরিণত হইতেছে, অশক্তি শক্তিতে পরিণত হইতেছে, কদর্য্য সৌন্দর্য্যে পরিণত হইতেছে, অমঙ্গল মঙ্গলে পরিণত হইতেছে, এই ভাবটি যখন আমাদের হৃদয়ে জাগরূক হয় তখন, আমরা অনর্থের মধ্যেও অর্থ, অধর্ম্মের মধ্যেও ধর্ম্ম, অশক্তির মধ্যেও শক্তি, কদর্য্যের মধ্যেও সৌন্দর্য্য এবং অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গল প্রচ্ছন্ন দেখিয়া কোথাও আর প্রেম বিতরণে কাতর হই না; তখনকার সে প্রেম কোন বিশেষ পরিমিত কারণকে অপেক্ষা করে না বলিয়া শাস্ত্রে তাহা অহেতুক বলিয়া উক্ত হয়; শান্তির ভাব, সামঞ্জস্যের ভাব, সত্যের ভাব, এই রূপ অমায়িক এবং অহেতুক প্রেমের নিয়ামক; এইরূপে প্রেমই প্রকৃতরূপে আনন্দ শব্দের বাচ্য। মঙ্গল অমঙ্গল সুন্দর কুৎসিত প্রভৃতি যত কিছু বিরোধী পক্ষ আছে, সকলই এক সত্যের অভ্যন্তরে নির্ব্বিবাদে অবস্থিতি করিতেছে; সত্য সকলেরই সন্ধিস্থল এজন্য সকলের মধ্যে সন্ধিস্থাপন সত্যের উপরেই নির্ভর করে; জ্ঞান বিষয় অপেক্ষা কত উচ্চ, তথাপি বিষয়ের সহিত জ্ঞানের মিল হইলেই সেই জ্ঞান সত্য বলিয়া গৃহীত হয়; যদি বিষয় একরূপ, জ্ঞান অন্যরূপ হয়, তবে তাহাই মিথ্যা বলিয়া গণ্য হয়। সকলের সহিত সকলের কোন না কোন সূত্রে মিল আছে, সেই মিলের ভাবেতেই সামঞ্জস্যের ভাবেতেই অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের লক্ষণ লক্ষিত হয়। সামঞ্জস্যের ভাব, শান্তির ভাব এবং সত্যের ভাব একই ভাব; পরমাত্মার প্রতি আত্মার যে নিষ্কাম এবং অহেতুক প্রেম, আত্মা পরমাত্মার মধ্যে আবরণমুক্ত ভাবের যে প্রশান্ত গম্ভীর অপার আনন্দ, প্রশান্ত ধ্রুব সত্যের ভাবই তাহার নিয়ামক। এক এই ধ্রুব সত্যের ভিতর অর্থ ধর্ম্ম শক্তি সৌন্দর্য্য মঙ্গল সমস্ত ভাবই অন্তর্ভূত রহিয়াছে। সত্যের অপরাজিত বল ও সহায় দ্বারাই আত্মা পরমাত্মার সহিত অধ্যাত্ম যোগে সমর্থ হয়।

ছিন্নমুকুল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

হাসি মুখে বিষাদ।

সেই অপরাহ্নে যামিনীনাথের বাটীর অন্তঃপুরস্থ উদ্যানের বৃক্ষলতাসমাকুল একটি নিভৃত প্রান্ত হইতে নীরজা বাহির হইল। নীরজার হস্তে একটি কাকাতুয়া, তাহার

সহিত কথা কহিতে কহিতে নীরজা উদাসন্ত সরসীতে নামিয়া কতকগুলি পদ্ম এবং তাহার পাতা তুলিতে লাগিল। তখন সুনীল সরসীবারি মৃদু সমীর পরশে, তলতল ঢলঢল করিয়া কাঁপিতেছিল। কাঁপিয়া কমলদল কাঁপাইয়া মৃদু মৃদু তট চুম্বন করিয়া মৃদু মৃদু শব্দ করিতেছিল। তীরস্থিত একটি কামিনী বৃক্ষের অসংখ্য ফুলরাশি হইতে কখনো দুই একটি পুষ্প বায়ুস্খলিত হইয়া, চৌদিকে বাস বিকীর্ণ করিয়া সরোবরে পড়িতেছিল, নীরজা ফুল তুলিতে তুলিতে মস্তক তুলিয়া এক এক বার সেই স্খলিত কুসুমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল, এক একবার কাকাতুয়ার সঙ্গে গান গাহিয়া গাহিয়া কথা কহিতেছিল। গাহিতেছিল

"চললো কাননে, যাইব দুজনে,
জুড়াতে হৃদয় জ্বালা।
সজনিলো আজি, ফুলে ফুলে সাজি,
কাটাব সারাটা বেলা
তরু মূলে মূলে, ফুল তুলে তুলে,
কহিব মরম কথা
গাহিব লো গান, খুলিয়ে পরাণ,
ভুলিব সকল ব্যথা
তুলিয়ে বকুলে পরাইব চুলে,
বেলায় করিব দুল
উড়ায়ে ভ্রমরে, বোঁটা ধরে ধরে
তুলিব গোলাপ ফুল
কিসের বেদনা, কিসের যাতনা,
কিসের হৃদয় জ্বালা
দেখিব আজিকে হৃদয় আঁধার
ঘোচাতে পারি কি বালা।

পদ্মপত্র এবং পদ্ম কয়েকটি তোলা হইলে গানটি গাহিতে গাহিতে নীরজা সরসী হইতে উঠিয়া সেই কামিনীতলায় আসিয়া কতকগুলি ফুল কুড়াইয়া অঞ্চলে লইল চাঁপাবৃক্ষের নিকট গিয়া নিম্নমুখী শাখা হইতে কতকগুলি চাঁপা পাড়িল, বকুলতলা হইতে কতকগুলি বকুল কুড়াইল,লতাবৃক্ষের নিকট আসিয়া কতকগুলি লতা ছিঁড়িল, শেষে কতকগুলি বেল মল্লিকা গোলাপ তুলিয়া গোলাপের কাঁটা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে গানে কাকাতুয়ার সহিত কথা কহিতে কহিতে আবার সেই বৃক্ষসমাকুল নিভৃত প্রান্তে গমন করিল।

আসিতে আসিতে গান রাখিয়া কাকাতুয়াকে কথা কহিয়া বলিল "তুই আমার সখী কেমন? তুই আমার দুঃখ বুঝিস? তোকে নিয়ে আজ আমার মনের জ্বালা জুড়াব" বলিয়া আবার গাহিতে গাহিতে সেই নিভৃত প্রান্তে গিয়া পদ্মপত্রে একটি শয্যা রচনা করিয়া সেই শয্যার চতুষ্পার্শে ফুল সাজাইয়া কাকাতুয়াটিকে তথায় শোয়াইতে গেল। নীরজার হস্ত ছাড়িয়া কাকাতুয়া তখন কুসুমশয্যায় যাইতে চাহিবে কেন? সে অনিচ্ছাপ্রকাশক স্বরে চীৎকার করত আবার তাহার হস্তে উঠিল। নীরজা তখন আবার তাহাকে সেই শয্যাতে শোয়াইতে চেষ্টা করিয়া বলিল "বেশ বিছানা হয়েছে তুই শুয়ে থাক, আমি ততক্ষণ আমার দুরীটিকে এই খানে নিয়ে আসি" কাকাতুয়া তাহার কথা বুঝিল না, সেই খান

হইতে আবার তাহার হস্তে উঠিতে গেল। অমনি নীরজা তাহাকে একটি পদ্মপত্র দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া, ছেলে ঘুম পাড়াইবার মত সেই খানে রাখিতে চেষ্টা করিল। কাকাতুয়া তাহাতে রাগিয়া নীরজার হস্তে চঞ্চু আঘাত করিল। নীরজাও তাহাতে ঈষৎ ক্রোধ দেখাইয়া কুসুম অঙ্গুলীতে ধীরে ধীরে তাহাকে মারিয়া বলিল "তুই বড় অবোধ এই খানে শুয়ে থাক" কাকাতুয়া তাহা শুনিল না, আবার তাহার হস্তে উঠিয়া আসিল। তখন নীরজা আর তাহাকে শোয়াইতে চেষ্টা না করিয়া বলিল "আহা এ বিছানা বুঝি তোর ভাল লাগলো না! কবে কাকাতুয়া আমি সেই অরণ্যে যাব বল দেখি! তাহলে তোকে কত ভাল ভাল পাতার বিছানা করে দেব, সে সব তো এখানে নাই" কাকাতুয়া তাহার আদর বুঝিয়া তাহার মুখ পানে চাহিয়া কাকাতুয়া কাকাতুয়া করিল, নীরজা বুঝিল কাকাতুয়া তাহার ব্যথায় ব্যথী। এই সময় যামিনী বাবু সমস্ত উদ্যানটি খুঁজিতে খুঁজিতে এই খানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দাঁড়াইয়া কাকাতুয়ার সহিত নীরজার গল্প শুনিতে লাগিলেন। নীরজা মুখ তুলিয়া একবার যামিনীনাথকে দেখিল একটু ছেলে মানুষের মত হাসিল কিন্তু তাঁহার সহিত কথা না কহিয়া আবার মুখ নত করিয়া কাকাতুয়ার সহিত কথা কহিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ যামিনী মৌন ভাবে থাকিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন "নীরজা এত গল্প কাহার সঙ্গে?"

নীরজা মুখ নত করিয়াই বলিল "কেন? আমার সখীর সঙ্গে?"

"কাকাতুয়া মুরী এরাই কি নীরজ চিরকাল তোমার সখী থাকিবে? আমায় কি মনের কথা খুলিবে না" বলিয়া যামিনীনাথ একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া আবার মৌন হইয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ গেল তথাপি নীরজা কথা কহিল না দেখিয়া আবার তখন আর একবার মৌন ভঙ্গ করিয়া যামিনী বলিলেন "নীরজা আমাকে আর কতদিন এরূপ যাতনা সহিতে হইবে"

নী। "কাকাতুয়াটা বুঝি ঘুমালো?—তোমার যন্ত্রণা? কেন? কি যন্ত্রণা?

যা। "কতকাল আমার মনোরথ আর অপূর্ণ থাকিবে?

নী। "এই যন্ত্রণা? আচ্ছা আমাদের অরণ্যে তো এমন বড় মল্লিকা ছিল না কিন্তু আমার বোধ হয় এর চেয়ে সে গুলি তবু ভাল।"

যা। "নীরজা আমার কষ্টে কি তোমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় না? আমার এমন জিজ্ঞাসার উত্তর পর্য্যন্ত দিলে না!"

নী। "অঁা অঁা? আমি এই মল্লিকাটি দেখতে বড় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে ছিলেম। আমাদের কুটীরের চার ধারে এত মল্লিকা ফুটতো কি আর বলব? পিতা কি আমাদের শেষ চিঠিখানি পেয়েছেন মনে কর? সে চিঠি পেয়ে উত্তর দিলে কিম্বা তিনি এলে কত দিনে এখানে পৌছবেন বল দেখি! আহা কত দিনে সেই কুটীরে গিয়ে আগেকার মত বেড়াব"

যা। "তোমার ইচ্ছার মত কাজ করিতে আমার তো বিন্দু মাত্র ত্রুটি নাই। তোমার পিতাকে যে কত চিঠি লিখেছি তাতো জান?"

নী। "আমার কি সব কথাই তুমি শুনেছ! তাহলে এতদিন কেন সেই অরণ্যে আমাকে রেখে এলে না? কাকাতুয়া আমার সঙ্গে তুই যাবি? বল্‌না? যাবিতো?" কাকাতুয়া আবার তাহার মুখ পানে চাহিয়া কাকাতুয়া কাকাতুয়া করিল। নীরজা বুঝিল কাকাতুয়া যাইবে। যামিনী বলিলেন "ছি তুমি ঐ কথাটি লয়ে আমার মনে মিছেমিছি কষ্ট দেবে? তুমি কি জাননা তোমার কথাটি রাখতে পারলুম না বলে কত কষ্ট হয়েছে! কিন্তু কি করব এমনি এখানে কাজে ব্যস্ত আছি যে কলকাতা ছেড়ে যাবার আমার একদিনের জন্যও যো নাই। কিন্তু আমি তোমাকে দস্যুদের হাত হতে রক্ষা করলুম—সুধু তা নয় তোমার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করেছি, তুমি তার পরিবর্ত্তে আমার কথার উত্তর পর্য্যন্ত দেও না?"

নী। "কথার উত্তর আবার কখন দিইনে? আহা আমার সেই হরিণটা যে কেমন ছিল, বাবা নৈমিষারণ্য হতে এনে দিয়েছিলেন। সেটি থাকলে কেমন কাকাতুয়ার সঙ্গে খেলা করিত। কিন্তু না না ভুলে গেছি, তুমি কি বলছিলে বল?"

যা। "আমার এমনি অদৃষ্ট—তোমার মনের কথা এখনো বুঝিতে পারিলাম না—আমি অভাগা—আমি দুর্ভাগা, আমার মরণই ভাল।'

নী। ওকি কথা! মরবে কেন? বলনা তোমার কি মনোরথ?

যা। কত দিন আর বিবাহ করিতে দেরি করিবে?"

নী। "আচ্ছা তুমি এ কাকাতুয়াটি কোথা পেলে?" যামিনী বিষাদার্দ্র স্বরে বলিলেন "নীরজা এই কি আমার কথার উত্তর?" নীরজা কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলিল "নানা আর আমি কাকাতুয়ার পানে চাইব না তা নইলে কেমন অন্যমনা হয়ে পড়ি এবার তুমি বল" যামিনী আবার বলিলেন নীরজা বিবাহে আর কত দেরি করিবে?"

নী। "কেন এক বৎসর?"

যা। "এক বৎসরই যে এক যুগ" নীরজা হাসিয়া বলিল "তা কি করে হবে আমি শাস্ত্রে পড়িয়াছি ১২ বৎসরে এক যুগ।"

যা। "নীরজ তুমি বড় নিষ্ঠুর, যদি বিবাহই করিবে তো এক বৎসর আবার বিলম্ব কেন"

নী। "এক বৎসরের মধ্যে নিশ্চয়ই পিতা আসিবেন তখন আমাকে লইয়া তাঁহার যাহা ইচ্ছা করিবেন, তা না আসেন তখন তোমার হইব। তুমি দস্যু হইতে উদ্ধার করিয়াছ পিতার পরেই আমি সুতরাং তোমার'

যা। "আমি তোমাকে দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করিলাম প্রত্যুপকারে তুমি আমার এই কথাটি রাখিবে না? সুন্দরি তুমি বড় কৃতঘ্ন।" নীরজার ভ্রূধনু ঈষৎ

কুঞ্চিত হইল, মুক্তাদন্তে অধর ঈষৎ চাপিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল "আমি কৃতঘ্ন! অনিচ্ছা সত্বেও তোমাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছি —আমি কৃতঘ্ন!

যা। "তোমার বিবাহে ইচ্ছা নাই, ইহাই যে কৃতঘ্নতা। এত ভালবাসিতেছি অথচ তাহার প্রতিদান নাই ইহাই তো কৃতঘ্নতা'।

নী। "কে বলিল আমি তোমাকে ভাল বাসিনা। আমার বোধ হয় পিতার নীচেই তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার সহোদর হইলেও তোমাকে ইহার অপেক্ষা ভাল বাসিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।"

যা। "এ তো সব কথার কথা। তুমি যদি সত্য সত্য আমাকে ভাল বাসিতে তাহলে এক বৎসরও কি আর বিলম্ব করিতে চাহিতে? আমি তোমার ঐ বিশাল চক্ষুর মোহন দৃষ্টি যতই দেখিতেছি ততই মনে হইতেছে একবৎসর আমার পক্ষে একযুগ।"

নী। 'কই, আমার তো তা মনে হয় না"

যা। "আমার বেলা হয় না, কিন্তু প্রমোদ হোলে হইত।"

নীরজা যদিও প্রমোদের কথা যামিনীকে কিছুই বলে নাই, তথাপি যামিনী মনে মনে সন্দেহ করিতেন নীরজা প্রমোদকে ভালবাসে। কিন্তু সে কথা কখনো তাহাকে ফুটিয়া বলেন নাই। আজ এই সব কথায়, মনের বেগভরে এই কথাটি আপনা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। নীরজাও তাহাতে বিশেষ কিছুই লক্ষ্য না করিয়া আপনার মনে বলিল

"প্রমোদ—প্রমোদ আবার কবে এখানে আসিবেন?"

যা। "প্রমোদ এখানে আসুন না আসুন তোমার তাতে কি?"

নী। "কেন? তাঁহাকে এক-একবার-দেখিতে ইচ্ছা—"

যা। "আমার সমুখে ওসব কথা বলিতে তোমার লজ্জা বোধ হোল না?"

নী। "লজ্জা! এতে লজ্জা! কেন, একি কোন দোষের কথা?"

যা। "লজ্জাহীনা! কৃতঘ্ন! আমি বুঝিতে পারিয়াছি—

নী। "আবার তুমি বলিবে আমি কৃতঘ্ন। যে আমি আজ কেবল মাত্র কৃতজ্ঞতার উপরোধেই তোমার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছি—সেই আমি কৃতঘ্ন?" বলিতে বলিতে নীরজার চক্ষুদ্বয় স্থির বিদ্যুতের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। যামিনী ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন "আমি দেখিতেছিলাম তোমার অঙ্গীকার হৃদয়ের না অধরের—"

যামিনীর কথা শেষ না হইতে হইতে এক জন ভৃত্য আসিয়া বলিল "এক জন সন্ন্যাসী আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছে।" সন্ন্যাসীর নাম শুনিয়া যামিনী চমকিয়া উঠিলেন, বুঝিলেন সন্ন্যাসী নীরজার পিতা। যামিনী তখন সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ—সংশয়।

যামিনীনাথ দেখিলেন সন্ন্যাসী নীরজার সন্ধান জানিয়াছেন, এরূপ স্থলে তাঁহার

নিকট মিথ্যা কথা কহিয়া নীরজাকে গোপন করিতে কিম্বা বলপূর্ব্বক আটকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করা আর যুক্তিসিদ্ধ নহে। বুঝিলেন সে উপায়ে অভিপ্রায় সিদ্ধি বড় দুরূহ। তিনি তখন অন্য উপায় অবলম্বন করিতে স্থির করিয়া দ্বারদেশ হইতে সন্ন্যাসীকে উপরে আনিতে আদেশ করিলেন। সন্ন্যাসী উপরে আসিলে তাঁহাকে সম্মান পূর্ব্বক বসিতে বলিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিলেন "মহাশয়, এখানে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন?" সন্ন্যাসী বলিলেন "বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া তোমাকে অগ্রেই বলা ভাল—আমি নীরজাকে লইতে আসিয়াছি।"

যা। "হাঁ নীরজা বলিয়া একটি কন্যাকে আমি দস্যুহস্ত হইতে মুক্ত করিয়া এখানে আশ্রয় দিয়াছি। কিন্তু আপনি অপরিচিত, আপনার নিকট কি করিয়া তাহাকে সমর্পণ করিব।"

স। তবে আমার পরিচয় শুন, আমিই নীরজার পিতা"

যামিনী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আপনি—নীরজার পিতা?"

স। " হাঁ আমিই নীরজার পিতা। নীরজা আমারি ন্যায়ধন। আমা হইতে তাহাকে ছিন্ন করিয়া, পাষণ্ড, আমাকে কি কষ্টই না দিয়াছিস? দিন নাই, রাত্রি নাই, রৌদ্র নাই, বৃষ্টি নাই, নীরজার অনুসন্ধান করিয়া করিয়া কোথায় না ফিরিয়াছি। মনের ব্যাকুলতায় নির্দ্দোষীকে পর্য্যন্ত দোষী করিয়া অপরাধী হইয়াছি। পাষণ্ড ইহার সমুচিত ফল তোকে পাইতে হইবে।"

যামিনী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে বলিলেন "মহাশয় কি বলিতেছেন? আমি নীরজাকে আপনা হইতে ছিন্ন করিয়াছি!"

স। "নহিলে এখানে নীরজাকে রাখিবে কেন? যদি যথার্থই দস্যুহস্ত হইতে রক্ষা করিতে তাহা হইলে তাহাকে তাহার পিতার নিকট পঁহুছিয়া না দিয়া এখানে রাখিবে কেন? পাষণ্ড, নীরজা এখনইত দস্যুহস্তগত হইয়া রহিয়াছে—কিন্তু আমিই তাহাকে উদ্ধার করিব।"

যা। "কি আশ্চর্য্য! আমার এ উত্তম পুরস্কারই বটে। কোথায় নীরজার জীবন দান করিলাম বলিয়া আপনার প্রিয় পাত্র হইব, না আপনি আমাকেই মন্দ বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন! নীরজাকে আপনার নিকট পাঠাইবার জন্য তাহাকে এখানে আনিয়া অবধি আপনাকে কানপুরে কত পত্র লিখিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই—দুর্ভাগ্য বশতঃ সেখানে না থাকায় আপনি তাহা পান নাই বোধ হইতেছে, কিন্তু তাহাতে আমি কি করিব।

স। "আমি বন্দবস্ত করিয়া আসিয়াছিলাম আমার নামে যে কোন পত্র আসুক আমি লিখিলেই যেখানে থাকি পাঠাইবে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত তো কানপুর হইতে এক খানি পত্রও ফেরত আসে নাই'

যা। "তবে কি গোল হইয়াছে কি করিয়া বলিব—কিন্তু সেই জন্য কি আপনি আমাকে দোষী করিবেন? যদি কলিকাতায় আমাকে বিশেষ কাজে ধরিয়া না রাখিত তো আমি তাহাকে নিশ্চয়ই এক দিন

নিজে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। তাহা না পারায় কাজেই আপনার জন্য অপেক্ষা করিতে হইতেছিল। যাহা হউক আমার এ উত্তম পুরস্কার বটে"। যামিনীর কথা শুনিয়া তাহার দোষের প্রতি সন্ন্যাসী বিচলিতমনা হইলেন। যামিনী তাহা বুঝিয়া আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "মহাশয়—আপনার কিসে সন্দেহ হইল আমি নীরজাকে হরণ করিয়াছি,তাহা বড় জানিতে ইচ্ছা করিতেছে। কেন না ভবিষ্যতে কাহারো উপকার করিতে গেলেও ভাবিয়া চিন্তিয়া অতি সাবধানে করিতে হইবে—কেন না উপকার করিলেও দেখিতেছি তাহার শাস্তি আছে, যথার্থই ভাল করিলে মন্দ হয়।" সন্ন্যাসী পূর্ব্ব হইতে একটু নরম হইয়া বলিলেন "যুবা পুরুষেরা সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অতি গর্হিত কার্য্যেও অগ্রসর হয়"

যা। "যদি তাহাই হইত তবে এত দিন কি আমি তাহাকে বিবাহ করিতাম না? একবার বিবাহ হইয়া গেলে তবে আপনি আর কি করিতেন? যদি ভাবেন নীরজা আমাকে বিবাহ করিতে অসম্মত বলিয়া তাহা হয় নাই—কিন্তু ভাবিয়া দেখুন—নীরজা এখন আমার সম্পূর্ণ অধীনে, তাহাকে বল পূর্ব্বক বিবাহ করিলে সে কি করিতে পারিত? নীরজা অনাথা, আমি তাহার উপর যত ইচ্ছা অত্যাচার করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন আমি তাহাকে কিরূপ যত্ন করিয়াছি" যামিনীর কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী অনেক নরম হইয়া আসিলেন। যামিনীর গৃহে নীরজাকে দেখিয়া তাহার প্রতি যে সন্দেহ হইয়াছিল অনেক কমিয়া আসিল। যামিনী আপন কথার ফল বুঝিতে পারিয়া আবার বলিলেন "মহাশয়, অন্যায় দোষে দোষী করিবেন না বরং নীরজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তাহা হইলেই যথার্থ অবস্থা সকল বুঝিতে পারিবেন।" সন্ন্যাসী বলিলেন "যদি সত্যই তুমি নীরজাকে রক্ষা করিয়া থাক—তাহা হইলে তোমাকে দোষী করা আমার অত্যন্ত অন্যায় হইয়াছে। তুমিও তো ব্রাহ্মণ—তাহা হইলে তোমার হস্তে নীরজাকে সমর্পণ করিয়া আমার এ দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিব। তুমি নীরজার উদ্ধারকর্ত্তা, নীরজা তোমারি প্রাপ্য।" শুনিয়া যামিনীর মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সবিনয়ে কহিলেন "মহাশয়, আমি বহু কষ্টে নীরজাকে উদ্ধার করিয়াছি বটে, কিন্তু আমি নীরজার যোগ্য পাত্র নহি। নীরজা যেরূপ রূপবতী ও গুণবতী তাহার উপযুক্ত পাত্র আমার চক্ষে তো পড়ে না। আমার উপর আপনি অত কৃপা করিলে আমাকে ———'

স। "আমার নিকট আর অত বিনয়ী হইবার আবশ্যক নাই। সে যাহা হউক, কিন্তু একটি বিষয় আমি এখনো মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। তুমি এবং প্রমোদ বই অরণ্যে নীরজাকে কেহই দেখে নাই—তবে যদি তোমরা হরণ করিয়া না থাক তো কে করিল? তুমি না করিয়া থাক তবে প্রমোদ করিয়াছে।"

যামিনীনাথ এই কথায় থামিয়া থামিয়া

হাত রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন "প্রমোদ! না না মহাশয় সে কি—সে কখনই না—কিন্তু প্রমোদ—প্রমোদ—না; আমার যে বিশ্বাস—উঃ তাওকি হ'তে পারে? কিন্তু——জগদীশ্বর! তুমিই জান ——মানুষের মন।" যামিনীনাথের কথার ভাবে বোধ হইল তিনি যেন ইহার কিছু জানেন—কিন্তু বলিতে অনিচ্ছুক। সন্ন্যাসী ইহাতে আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া কন্যাকে দেখিতে চাহিলেন। যামিনী নীরজাকে অন্তঃপুর হইতে এইখানে লইয়া আসিলেন। এতদিন পরে পিতা কন্যায় সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাদের মনের ভাব এখন কি হইল—তাঁহাদের কি কথা বার্ত্তা হইল তাহা অনুভবের বিষয়, বর্ণনার নহে।

—

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ—সাধু না চোর?

যামিনী এবং নীরজার সহিত কথা কহিবার পর সন্ন্যাসীর যামিনীকেও নির্দ্দোষী মনে হইল তিনি শুনিলেন যে দিন রাত্রে নীরজা অপহৃত হয় সে রাত্রে যামিনীনাথ কানপুরেই ছিলেন না।

কিন্তু যদি যামিনীনাথ নির্দ্দোষী তবে দোষী কে? প্রমোদ? যামিনীনাথের কথার ভাবে মনে হয় যেন প্রমোদ ইহার মধ্যে আছেন আবার কিন্তু নীরজার কথা মতে প্রমোদও সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কিন্তু তাহা তো হইতে পারে না দুজনের এক জনতো ইহার মধ্যে দোষী হইবেই। নীরজা বলে সে দস্যু দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল কিন্তু দস্যুরা কি লোভে নীরজাকে হরণ করিবে? তাহার গাত্রেতো কিছুই অলঙ্কার ছিল না। ধনলোভ নহিলে কেবল সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া কি দস্যুরা নীরজাকে হরণ করিবে? ইহা কি সম্ভব? তাহা হইলে যামিনী ও প্রমোদের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্ব্বেই বা কেহ তাহাকে হরণ করিল না কেন! আগে করিলে বরং তাহাই মনে হইত, ইহার পর আর তাহা মনে করা যায় না। অবশ্য কোন ব্যক্তি ধন দ্বারা দস্যুক্রয় করিয়া তাহাদের দ্বারা আপন কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছে। অন্য কোন ব্যক্তিই বা তাহা হইলে আর কে হইতে পারে? আর কেহই তো নীরজাকে অরণ্যে দেখে নাই। নীরজা ঐ অরণ্যে আছে আর কেহই তো তাহা জানিত না। এরূপ স্থলে যামিনী কিম্বা প্রমোদই দোষী। অথচ ইহাদের মধ্যে দুজনকেই আবার নির্দ্দোষী মনে হইতেছে।" সন্ন্যাসী ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না তিনি মহা সমস্যায় পড়িলেন। আপনি একাকী ইহার সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন না দেখিয়া সে দিনের জন্য নীরজাকে যামিনীর বাড়ীতেই রাখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ভবানীপুরে তাঁহার সেই আত্মীয়টির বাড়ী গমন করিলেন। আত্মীয়টি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত হিরণকুমার বই আর কেহই নহেন। সন্ন্যাসী এখানে আসিয়া হিরণকুমারকে আদ্যোপান্ত সবিশেষ বলিলেন। হিরণকুমার সকল শুনিয়া বলিলেন "আপনার কথায় আমার যামিনীকেই দোষী মনে হইতেছে" সন্ন্যাসী

বলিলেন "তাহা কি করিয়া হইবে! প্রথমতঃ যে রাত্রে নীরজা অপহৃত হয় তাহার পূর্ব্বরাত্রেই যামিনী কানপুর হইতে চলিয়া গিয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ নৌকার মাঝির মুখে নীরজার দুর্দ্দশা শুনিবার পর, তবে যামিনী আসিয়া তাহাকে রক্ষা করে" হিরণকুমার বলিলেন "আমার মনে হয় এ সকল যামিনীর চাতুরী মাত্র। যামিনী যে কি ভয়ানক লোক আপনি জানেন না, আমি তাহাকে যথেষ্ট ঘৃণা করি। মনে হয় এমন কোন কার্য্য নাই যাহা তাহার পক্ষে অকার্য্য।"

স। সত্য নাকি? যামিনীর স্বভাব কি অত্যন্ত জঘন্য? কিন্তু তাহাকে দেখিয়া তো তাহা মনে হয় না এবং নীরজার মুখেও তো তাহার প্রশংসা শুনিলাম।

হি। অনেকেই যামিনীকে চেনে না। যামিনী অনেক ছেলের মাথা খেয়েছে। বাহির হইতে তাহাকে চেনা সহজ নহে।

স। কিন্তু তাহার স্বভাব মন্দ হইলেও একার্য্যে আমার তাহাকে দোষী মনে হয় না। তাহার দোষের বিপক্ষেই সমস্ত প্রমাণ। বরং যামিনীর কথার ভাবে মনে হয় প্রমোদ ইহার মধ্যে আছে।

হি। যামিনী ঐ যে অস্পষ্ট ভাবে প্রমোদের ঘাড়ে দোষ ফেলিতে চাহিতেছে উহাতে আমার তাহাকে আরো সন্দেহ হয়। যাহা হৌক যামিনীর সহিত একবার কথা না কহিয়া আমি আরো নিশ্চয়রূপে আমার মত বলিতে পারি না। হয় তো বাস্তবিক যামিনী নির্দ্দোষী তাহার প্রতি আমি অন্ধ বলিয়া তাহাকে ভুল বুঝিতেছি।'

স। তবে সাক্ষাতই হইবে। কিন্তু যদি যামিনী বাস্তবিকই আপনি ঐরূপ ষড়যন্ত্রকারী প্রকাশ পায়, তো আমি রক্ষা রাখিব না" যামিনীকে সঙ্গে লইয়া পরদিন সন্ন্যাসী হিরণের বাড়ীতে আসিলেন। যামিনীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া হিরণের সন্দেহ আরো বৃদ্ধি হইল। হিরণকুমার যামিনীকে বলিলেন "আপনি বলিতেছেন কানপুরে সন্ন্যাসীর নামে অনেক পত্র লিখিয়াছেন কিন্তু একখানিও তবে সন্ন্যাসী পাইলেন না কেন? সমস্ত চিঠি মারা গিয়াছে ইহা অসম্ভব।

যামিনী বলিলেন "আমার কথায় অবিশ্বাস করিতে পারেন কিন্তু আমি মিথ্যা বলিতেছি না। আপনাকে বলিতে কি যে দিন মিথ্যাকথা কহিব এ জিভ কাটিয়া ফেলিব। স্বীকার করি আমি মানুষ নানা দোষে দোষী—কিন্তু আমার কোন শত্রুও আমাকে মিথ্যাকহার দোষে দোষী করিতে পারিবে না।

হি। আপনার কথায় কেবল বিশ্বাস করিতে বলা ছাড়া তবে এবিষয়ে আপনার আর বলিবার কিছুই নাই? আপনি সেই রাত্রেই হঠাৎ প্রমোদকে ছাড়িয়া কানপুর হইতে চলিয়া গেলেন কেন? দুজনে গিয়াছিলেন হঠাৎ একা চলিয়া আসিবার কারণ কি হইতে পারে?

যা। "কলিকাতায় বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ পত্র পাইয়া সেই রাত্রেই ছাড়িতে হইয়াছিল। সে রাত্রে তখনি না ছাড়িলে

একটি মকদ্দামায় আমার বিশেষ সর্ব্বনাশ হইত। ইহার পর আপনার আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?'

হি। "কলিকাতায় যদি এতই প্রয়োজন ছিল তবে এলাহাবাদে কি করিতেছিলেন? এলাহাবাদেই না আপনি নীরজাকে দুস্যুহস্ত হইতে উদ্ধার করেন?"

যা। "আপনি দেখিতেছি আমাকে নিতান্তই আদালতের সাক্ষীর মত সওয়াল করিতেছেন? কিন্তু যখন আমি এই উপকারে ব্রতী হইয়াছি যখন সন্ন্যাসীর কথায় আপনার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়াছি তখন ইহাতেও আমি কিছু মনে করিব না। শুনুন কেন কলিকাতায় আসিবার আগে আমার দুই তিন দিন এলাহাবাদে গিয়া থাকিতে হইয়াছিল; কানপুর হইতে গাড়ী এলাহাবাদে ষ্টেশনে থামিলে আমি যখন একবার প্লেটফর্ম্মে নামিলাম তখন সেইখানে আমার এখানকার একজন নায়েবের সহিত দেখা হইল। সে আমাকে দেখিয়া বলিল আমাদের একজন প্রধান সাক্ষীর বাড়ী এই এলাহাবাদে, সে আমাদের পক্ষে না বলিলে আমাদের জিতিবার সম্ভাবনা নাই, সেইজন্য নায়েব স্বয়ং আসিয়াছে এবং আমাকে ও নিজে তাহাকে বলিতে অনুরোধ করিল। কি করি এলাহাবাদে তাহার বাটী আসিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সে সেখানে ছিল না, ইটোয়া গিয়াছিল, দুদিনের মধ্যে আসিবে শুনিলাম, দুদিন সুতরাং তাহার জন্য সেইখানে অপেক্ষা করিতে হইল।'

হি। "যদি এলাহাবাদে সাক্ষীর কাছে যাওয়ার আবশ্যক ছিল তবে কেন আগে নায়েব তাহা আপনাকে লেখে নাই, কিম্বা আগে হইতে তাহার জোগাড় করে নাই।'

যা। "সেই সাক্ষী নহিলে যে হইবে না একথা আগে নায়েব জানিত না, তাহা জানিবার আগে আমাকে চিঠি লিখিয়াছিল। তাহার পর তাহা জানিবার পরে নিজে সে এলাহাবাদে আসিল এবং কি জানি তাতেও যদি কাজ না হয় তাই আমার যাইতে হইল।"

হি। "আচ্ছা কলিকাতা হতে আপনি যে পত্র পেয়েছিলেন তাতে কদিন পরে ঐ মকদ্দামা হইবে বলিয়া লেখাছিল।

যা। "৫। ৬ দিন পরে?"

হি। "তবে আপনি দুদিন এলাহাবাদে থেকে কলিকাতায় এসে, সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে মকদ্দামা বজায় রাখতে পেরেছিলেন?"

যা। "তা আর পারব না? মহাশয় আমাদের ঐ সবই কাজ, আমরা তো আর কোম্পানির চাকর নই। কিন্তু দেখুন আপনি নিতান্ত অসভ্যের মত আমাকে মিথ্যাবাদী দাঁড় করাতে চেস্টা করিছেন কিন্তু আর নয়—"

হি। "মহাশয় আর একটি কথা। যে সময় নীরজা ঠিক এলাহাবাদের ঘাটে এসে পৌঁছিল ঠিক সেই সময় আপনি কি করিতে সেই ঘাটেই গেছলেন? যামিনী সক্রোধে বলিলেন"আপনার শ্রাদ্ধ করিতে— মহাশয়—আপনার সঙ্গে আমি বাক্যালাপ

করিতে চাহিনা আপনি অতি অসভ্য" হিরণকুমার তখন যামিনী হইতে চক্ষু ফিরাইয়া সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন "ইহার কথায় মহাশয়ের কি বোধ হইতেছে ? সমস্তই তো শুনিলেন ! ভাবিয়া দেখুন সেই বৃষ্টি বাদলে নীরজা সেই খানে আসিবে তাহা না জানিলে কেন যামিনী নদীতীরে বেড়াইতে যাইবেন। অবশ্য যামিনী সেই নৌকার অপেক্ষায় ছিলেন পরে মাঝির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস যামিনী দোষী। এদিকে নীরজাকে হরণ করিয়া কোথায় লইয়া যাইতে হইবে দস্যুদের শিক্ষা দিয়া আপনি নির্দ্দোষী দেখাইবার জন্যই সে রাত্রে কানপুর ছাড়িয়াছিল। আপনি চোর হইয়াই আবার কৌশলে নীরজার রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছে" সমস্ত শুনিয়া সন্ন্যাসীর বিশ্বাস হইল যামিনী দোষী। তিনি আরক্ত লোচনে বলিলেন "যামিনী তুমি আমার সহিত চাতুরী করিয়াছ, যথার্থই তুমি দোষী ! কি ভয়ানক আমি এমন পাষণ্ডের হস্তে কন্যা অর্পণ করিতে যাইতেছিলাম" হিরণকুমার বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ যামিনীর সহিত কন্যার বিবাহ ! তাহা অপেক্ষা তো নীরজাকে জলে ডোবাইয়া মারাও ভাল। কেন মহাশয় আপনার কন্যার কি বর জোটে নাই নাকি ! প্রমোদের যদি সহস্র দোষ থাকে তো যামিনীর চেয়ে প্রমোদ সুপাত্র। বিশেষতঃ আপনি একে তাহাকে অন্যায় দোষী করিতেছিলেন তারপর আপনি জানেন, প্রমোদের সহিত বিবাহে নীরজা সন্তুষ্ট হইবে এবং প্রমোদও আপনার কন্যায় অনুরক্ত, এরূপ স্থলে তাহাকে কন্যা না দিয়া আপনি কি করিয়া এই যামিনীনাথের সহিত বিবাহ স্থির করিতেছিলেন !" হিরণের কথা শুনিয়া যামিনী মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিলেন। সকল শুনিয়া তাহার চিত্ত দমন করিয়া রাখা কঠিন হইয়া উঠিল, সরোষে বলিয়া উঠিলেন কন্যা দান সম্বন্ধে তাহার পিতা যাহা কহিবেন সহ্য হইবে, মহাশয় কথা কহিবার কে ?" হিরণকুমার ঈষৎ ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন "আচ্ছা পিতাই কন্যার যথার্থ হিতাহিত বুঝুন" কথা বার্ত্তার পর সন্ন্যাসী রোষগম্ভীর মৌনভাবে এই থান হইতে বিদায় লইয়া নীরজাকে আনিতে যামিনীনাথের বাড়ী যাত্রা করিলেন। হিরণের নিকট হইতে সন্ন্যাসীকে উঠিতে দেখিয়া যামিনীর যেন প্রাণে প্রাণ আসিল, তিনিও সন্ন্যাসীর সহিত বাটী গমন করিলেন। রাস্তায় আসিতে আসিতে তিনি বলিলেন মহাশয় আপনি উহার ঐ সকল কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে কি যথার্থই দোষী মনে করিতেছেন ?" সন্ন্যাসী মৌন ভঙ্গ করিয়া বজ্র গম্ভীর স্বরে অথচ ধীরে ধীরে বলিলেন "বাস্তবিকই তুমি দোষী তোমার কর্ম্মের দণ্ড তুমি পাইবে"

যা। "আপনি অবিশ্বাস করিলেই আমার যথেষ্ট দণ্ড হইবে—অন্য কোন দণ্ডই তাহাহইতে আমার নিকট গুরু দণ্ড নহে—আমি আর কোন দণ্ডকে ভয় করি না—যদি দোষী বিবেচনা করিয়া নীরজাকে আমায় না দেন তো তাহা হইলেই আমার দণ্ডের

পরাকাষ্ঠা হইবে—কিন্তু মহাশয় আমার কি এই শেষ পুরস্কার!

স। "পুরস্কার! তুমি পুরস্কার প্রত্যাশা কর! তুমি নীরজাকে চাও। তুমি, তুমি দস্যু, তুমি নীরজাকে চাও! বামন হইয়া চাঁদে হাত!"

যা। "আচ্ছা মহাশয় আমি দস্যু, কন্যাকে তবে প্রমোদকেই দান করুন, নির্দ্দোষ গুণবান প্রমোদকেই দান করুন, কিন্তু একটি কথা—আপনার প্রমোদের মত সহস্র গুণবান হইলেও আমার মত তাহাকে কে ভাল বাসিবে? আপনার কন্যার জন্য এমন নিঃস্বার্থ বিশুদ্ধ ভাল বাসা কে দিতে পারিবে?"

স। "তোমার প্রেম বিশুদ্ধ! তোমার প্রেম নিঃস্বার্থ?" বিশুদ্ধ প্রেমে গর্হিত কার্য্য কখনই সম্ভবে না। তোমার প্রেম প্রেম নামেরি যোগ্য নহে। রূপ-লালসাকে তুমি ভাল বাসা নামে সম্বোধন করিলে ঐ নামেরও কলঙ্ক হইবে। তোমার মত নীরজাকে কে ভাল বাসিবে? যাহাকে দিব সেই তোমা হইতে নীরজাকে ভাল বাসিবে, তোমা হইতে সকলেই সুপাত্র"

যা। "তবে তাহাই হৌক। কিন্তু আমার এই মিনতি আপনি আমাকে দোষী স্থির করিবার আগে এক বার নীরজার সহিত কথা কহিয়া দেখিবেন।" কথা কহিতে কহিতে তাঁহারা যামিনীর বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। বাড়ী আসিয়া যামিনী সন্ন্যাসীর আদেশানুসারে নীরজাকে তাঁহার নিকট আনিয়া দিলেন। তিনি আজ কন্যাকে পালকি করিয়া নিজ বাসস্থানে লইয়া যাইবার মানস করিয়াছিলেন। পালকি আসিতে যতক্ষণ সময় লাগে ততক্ষণ তিনি নীরজার সহিত বসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী যামিনীনাথের প্রতি সন্দেহ করিতেছেন শুনিয়া নীরজা বলিল, "তাহা অসম্ভব তাহা কোন মতেই হইতে পারে না, সে শপথ করিয়া বলিতে পারে যামিনী নির্দ্দোষী। হিরণকুমার নিশ্চয়ই যামিনীনাথের প্রতি অন্ধ হইয়া দোষারোপ করিতেছেন। সে কথায় বিশ্বাস করিয়া উপকারক ব্যক্তিকে দোষী করিলে ঘোর পাপী হইতে হইবে। নীরজার তাহা হইলে আজীবন কষ্ট পাইতে হইবে!" নীরজা আরো বলিল প্রমোদ যামিনীনাথ কেহই তাহাকে হরণ করেন নাই, বাস্তবিক সে দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। কেন মিছামিছি তাহার পিতা নির্দ্দোষদিগের প্রতি সন্দেহ করিতেছেন" কন্যার এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস দেখিয়া সন্ন্যাসী আপনিও আবার বিচলিত হইতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পালকি বেহারা আসিয়া বসিয়া রহিল, সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া গেল কিন্তু পিতা কন্যা কথোপকথনে মত্ত হইয়া রহিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ—দেবমন্দিরে রাক্ষস।

নীরজাকে সন্ন্যাসীর নিকট আনিয়া দিয়া যামিনী অন্য গৃহে গিয়া বসিলেন। হিরণের কথা বার্ত্তা শুনিয়া অবধি রাগে

তাহার শরীর কাঁপিতেছিল। প্রমোদের সহিত নীরজার বিবাহ! আপনি নীরজাকে না পাইলে বরং সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু নীরজা প্রমোদের হইবে ইহা তাঁহার অসহনীয়। যামিনী ইহার প্রতীকারের উপায় ভাবিতে ভাবিতে অন্য গৃহে আসিয়া বসিলেন। সকল রূপ বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি নীরজাকে বিবাহ করেন নাই বলিয়া তাঁহার এখন অনুতাপ হইতে লাগিল। এইস্থলে অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, নীরজাকে বিবাহ করিতে যামিনী যদি এতই উৎসুক তবে এত দিন তাহাদের বিবাহ না হইবার কারণ কি? কালবিলম্বে ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বিবেচনায়, নীরজাকে আপন অধীনে পাইয়াও যামিনী কেন বিবাহ করিলেন না? যামিনীর মত লোকের বল-পূর্ব্বক বিবাহে কি আপত্তি হইতে পারে?

ইহার উত্তর, যামিনীর এ বিবাহে বিলক্ষণ একটি বাধা পড়িয়াছিল। যামিনী যখন প্রথমে বিবাহের অভিপ্রায়ে নীরজাকে বাড়ী আনেন, তখন তিনি ভাবেন নাই তাঁহার ইচ্ছার উপর তাঁহার মাতা জ্যেঠাই মা কোন কথা কহিবেন। কিম্বা প্রথমে যদিই বা কিছু বলেন—যামিনী বুঝাইয়া বলিলে তাঁহাদের যে ইহাতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাহার আভাস মাত্রও তাঁহার মনে হইলে তিনি নীরজাকে এখানে না আনিয়া অন্য এক পৃথক বাড়ী ভাড়া করিয়া তাহাকে প্রথমেই সেইখানে রাখিতেন। কিন্তু বাড়ী আনিয়া বিবাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার পর তাঁহার মাতা, বিশেষতঃ জ্যেঠাই মা এ বিবাহে মহা আপত্তি তুলিলেন। নীরজা অজ্ঞাতকুলশীলা, ইহাই এই আপত্তির প্রধান কারণ। যামিনী বিশেষরূপ জেদ করাতে অবশেষে বৃদ্ধা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া বসিলেন—তাহার যে ৫ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে বিবাহ হইলে যামিনীকে কিছুই না দিয়া, যামিনীর ভগিনীকে দিয়া যাইবেন। এই কথায় যামিনী নরম হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মহা মুস্কিল লাগিল, একদিকে ধন লোভ, অন্যদিকে নীরজার লোভ, অবশেষে ধনলোভই জয়ী হইল। অতটা টাকার মায়া তিনি সহজে ছাড়িতে পারিলেন না। কিন্তু নীরজার আশা যে ইহাতে তিনি একেবারেই ছাড়িলেন—তাহা নহে—আপাততঃ বৃদ্ধা যতদিন বাঁচিয়া থাকেন ততদিন পর্য্যন্ত বিবাহ বন্ধ রাখিতে মাত্র স্থির করিলেন। বৃদ্ধা পীড়িতা, বড় জোর আর এক বৎসর বাঁচিতে পারেন—এই অল্প দিনের জন্য অগত্যা নীরজাকে পাইবার লোভ সম্বরণ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন।

অল্প দিনের জন্য তো তাঁহার বিবাহের অপেক্ষা করিতে হইল, তাহা যেন দায়ে পড়িয়া করিলেন—কিন্তু বিবাহ করুন না করুন—নীরজার সহিত মন খুলিয়া যে দুটা গল্প করিবেন তাহাও তাঁহার অদৃষ্টে বড় একটা ঘটিত না। নীরজাকে একাকী পাওয়া তাঁহার বড় দুষ্কর হইত। নীরজা অন্তঃপুর মধ্যে অন্য স্ত্রীগণের সহিত যদিও

বেশী থাকিত না,যদিও উদ্যানেই সে বেশীর ভাগ কাটাইত, কিন্তু উদ্যান ভ্রমণ কালে যামিনীর ভগিনী কিম্বা কোন না কোন দাসী প্রায়ই তাহার সঙ্গে থাকিত, সুতরাং সে সময় কিছু যামিনীর মন খুলিয়া কথা কওয়া হইত না, কাজেই কোন্ দিন নীরজা একাকী থাকে যামিনী সর্ব্বদাই ইহার সন্ধানে থাকিতেন। নীরজাকে কিছুক্ষণ একাকী পাইলেই নীরজার সহিত বিবাহের কথা পাড়িয়া তাহার মনের ভাব জানিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাহার সহিত কথা কহিয়া যামিনী দেখিলেন নীরজাও এখন বিবাহে সম্মত নহে। নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিলে সে আরো এক বৎসর সময় চাহে। যামিনী দেখিলেন জোর করিয়া বিবাহ করিতে গেলে যে কেবল মাত্র তাঁহার ধনক্ষতি হয় তাহাও নহে, নীরজার ভালবাসা নীরজার ভক্তি ও তাহা হইলে হারাইতে হয়। যামিনী ভিতরে যাহাই হউক না কেন, বাহিরে লোকের নিকট সততা-ব্যবহার করিয়া সৎ বলিয়া পরিচিত হইতে অত্যন্ত ইচ্ছা করিতেন। তিনি অত্যন্ত প্রশংসা প্রিয়, নিন্দা সহ্য করিতে পারিতেন না। এমন কি, প্রশংসার জন্য তিনি আপন লাভের অংশ কিছু পরিমাণে ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত হইতেন। নীরজা তাঁহাকে অতি সৎলোক বলিয়া জানিত, সেই হেতু তাঁহার প্রতি নীরজার অতিশয় ভক্তি ছিল, এখন বল পূর্ব্বক বিবাহ করিলে যেমন ধনক্ষতি হইবে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নীরজার সে ভক্তি ও হারাইবেন। একেবারে অত ক্ষতি স্বীকার করিতে যামিনীনাথ প্রস্তুত হইলেন না। ভাবিলেন আর কিছু দিনে যদি সকল বিষয়ে সুবিধা হয়, যদি ধনলাভও হয় এবং বালিকা আপনা হইতেই বিবাহ করে তো এই অল্প দিন ধৈর্য্য ধরাই ভাল।

অল্পদিনের জন্য অতদূর ক্ষতি স্বীকার করিয়া নীরজাকে লাভ করিতে হয় দেখিয়া যামিনী এ বিবাহ এতদিন করেন নাই, কিন্তু এখন সেজন্য তাঁহার অনুতাপ হইতে লাগিল। বিশেষতঃ দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল, নীরজাকে তিনি এখন বিবাহ করিবেন এই আশাতে সম্পূর্ণ আমোদে ছিলেন, হঠাৎ সে আশায় নিরাশ হইয়া আরো মনোক্ষুণ্ণতা জন্মিল। অতিশয় নিরাশচিত্তে ভাবিতে ভাবিতে তিনি এই গৃহে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে এক জন দ্বারবানকে ডাকিতে লাগিলেন, দ্বারবান আসিয়া যামিনীর আজ্ঞা শুনিয়া চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার সেই দ্বারবান এক জন লোক সঙ্গে করিয়া এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নবাগত ব্যক্তি গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিবার পর দ্বারবান চলিয়া গেল। তখন যামিনীনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন, কথা কহিতে কহিতে অনেকবার তাঁহার মুখে ক্রোধ লক্ষণ প্রকাশিত হইল, অবশেষে কথা সমাপ্তে সে ব্যক্তি উঠিয়া বলিল "আপনার অনেক কাজ করিয়াছি কিন্তু এ কার্য্য এ অধীন হইতে হইবে না।" যামিনীনাথের বঙ্কিম নাসাগ্রভাগ রক্তিম বর্ণ হইল, কুটীল ভ্রু যুগ কুঞ্চিত করিয়া তিনি বলিলেন

" তোমার যেমন অভিরুচি। কিন্তু বুঝিয়া কাজ করিও।" ইহার উত্তর কিছুই না দিয়া সে ব্যক্তি চলিয়া গেল, তখন যামিনী তাহার একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া কি কথা কহিতে লাগিলেন। অনেক-ক্ষণ পরে সেও চলিয়া গেল। যামিনী তখন আপন মনে একাকী বসিয়া চিন্তা নিমগ্ন হইলেন। পূর্ব্ব দিকে দুটি একটি তারা ফুটিল, যামিনীর গৃহ হইতে আকাশের এক ভাগ দেখা যাইতেছিল, যামিনী সেই ভাগে সেই তারকার পানে চাহিয়া ভাবিতে লা-গিলেন। এই সময় সন্ন্যাসী যামিনীর সহিত বিদায় লইতে এই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী আসিয়া বলিলেন "যা-মিনী, আমি নীরজাকে লইয়া চলিলাম, কিন্তু একটি কথা—নীরজার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আমি কতকটা চমৎকৃত হইয়াছি, তোমার দোষের বিষয় এখন ঠিক কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না—কিন্তু—"

যা। "মহাশয়, আমার একটি মিনতি শুনুন, আমিতো নীরজার যোগ্য পাত্র নইই, আমি যে নীরজার উদ্ধার করিয়াছিলাম তাহা আপনি ভুলিয়া যান, তাহা নীর-জাকেও ভুলিতে শেখান, কিন্তু—"

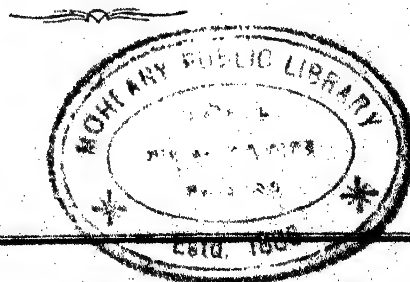
বলিতে বলিতে অধীর স্বরে সন্ন্যাসীর চরণ ধরিয়া বলিলেন "কিন্তু বিনা অপরাধে আমাকে অপরাধী মনে করিবেন না।"

স। "কি কর, যামিনীনাথ, ওঠ ওঠ"

যা। "মহাশয়, কূট তর্কে যদি সকল সপ্রমাণ হইত, তাহলে দেখুন দেখি যার পর নাই ঈশ্বরের স্বরূপ পর্য্যন্ত লইয়া এত গোল হইবে কেন? পাষণ্ড চার্ব্বাকেরা কি না বলিয়াছে? আপনিওতো শাস্ত্রজ্ঞ বিজ্ঞ পুরুষ, আপনাকে আর অধিক কি বলিব?"

স। "না। আমি এখনো তোমাকে অপরাধী বলে স্থির বিশ্বাস করি নাই। আজ আমি নীরজাকে নিয়ে চলিলাম, যদি তুমি অপরাধী না হও তো কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তোমাকেই কন্যা দান করিব।"

এই সময় নীরজা অন্তঃপুর হইতে আ-সিয়া বলিল "আমি প্রস্তুত হইয়া আসি-য়াছি, এবার চলুন।" তখন নীরজা এবং সন্ন্যাসী যামিনীর নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। যামিনী দ্বারবানকে ডা-কিয়া বলিলেন "যে ভৃত্যকে ইতি পূর্ব্বে কাজে পাঠাইয়াছি, বল আর সে কার্য্যের আবশ্যক নাই! শীঘ্র ফিরাইয়া আন।" অনেকক্ষণ পরে দ্বারবান আসিয়া বলিল "তাহাকে খুজিয়া পাইলাম না।"



জীব-জগতের ক্রমাভিব্যক্তি বিষয়ক য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মত-বিচার।

ক্রমাভিব্যক্তি-মত আমাদের দেশে নূতন নহে। সাংখ্য ও বেদান্তদর্শন এই ক্রমাভিব্যক্তি-মতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র। ঈশ্বর ৬ দিনে সমস্ত সৃষ্টি-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন—এই রূপ যাঁহাদিগের বিশ্বাস—এই রূপ যাঁহাদিগের অপূর্ণ শ্রম-কাতর ঈশ্বরের কল্পনা—সেই খৃষ্টান-সম্প্রদায় এই মতটির প্রচারে যে তটস্থ হইবেন তাহাতে আশ্চর্য্য কি! যাঁহারা মনে করেন, এই ছয় দিনের সৃষ্টিই ঈশ্বরের পূর্ণ সৃষ্টি—কিম্বা ঈশ্বর মধ্যে মধ্যে যদৃচ্ছাক্রমে এক একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারা যে ঈশ্বরের শক্তিকে বস্তুতঃ খর্ব্ব করিয়া কল্পনা করেন তাহা বলা বাহুল্য। ঈশ্বরের সৃষ্টি অপূর্ণ কিন্তু উত্তরোত্তর পূর্ণতার দিকেই অগ্রসর হইতেছে। "পূর্ণ হওয়া এবং একেবারেই না হওয়া সৃষ্ট বস্তুর পক্ষে উভয়ই সমান। পূর্ণ যিনি তিনি চিরকালই পূর্ণ আছেন এবং পূর্ণ থাকিবেন—সৃষ্ট বস্তু অপূর্ণ না হইলে হইতেই পারে না—সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বই অপূর্ণতা-নিবন্ধন—এবং তাহা অপূর্ণ বলিয়াই তাহার উন্নতির প্রয়োজন।—" (ভারতী ফাল্গুন) ঈশ্বরের সৃষ্টি স্বল্প-জ্ঞান মনুষ্য-কার্য্যের ন্যায় হইতে পারে না। আমাদিগের দৃষ্টি-পরিসর অতি পরিমিত। আমরা কোন অতীব দূর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য মনে করিলে সেই উদ্দেশ্য-সাধন-উপযোগী সমস্ত আয়োজন একেবারে পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিতে পারি না—যেমন যেমন কার্য্য উপস্থিত হয়—যেমন যেমন প্রয়োজন বুঝিতে পারি—তদনুসারে উপস্থিত-মতে তাহার বিধান করিয়া থাকি—কিন্তু ঈশ্বরের কার্য্য-প্রণালী যদি আমাদিগের কার্য্য-প্রণালীর ন্যায় মনে করি, তাহা হইলে কি ঈশ্বরের পূর্ণতাকে খর্ব্ব করা হয় না? সৃষ্টির ক্রমোন্নতিই যদি ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তিনি এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য যত কিছু আয়োজনের প্রয়োজন—তৎসমুদায় একেবারেই পূর্ব্ব হইতে সৃষ্টি-বীজ মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিয়া—সেই বিশ্ব-বীজ—নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে উন্নতি হইতে উন্নতিতে ক্রমশঃ প্রস্ফুটিত—ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন—ইহাই কি সঙ্গত অনুমান নহে? এবং এই অনুমানটি শুদ্ধ অনুমান মাত্র নহে—ইহার প্রমাণও সৃষ্টি ব্যাপারে পদে পদে দৃষ্ট হয়।

এই অভিব্যক্তি-মত আমাদের দেশে পুরাকালে প্রচারিত হয়, কিন্তু বলিতে গেলে য়ুরোপে সে দিন মাত্র ইহার প্রথম সূত্রপাত হইয়াছে। Wolff (উল্‌ফ) নামক পণ্ডিত ১৭৫৯ এই মতটি উপজনন-বাদ (Theory of Epigenesis) নামে প্রথম

প্রচার করেন। অধুনাতন য়ুরোপের অভি-ব্যক্তিবাদিগণের মধ্যে যদিও উল্‌ফ্‌কে এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া গণ্য করিতে হয়—কিন্তু Robinet, Bonnet, Geoffroy S. Hilaire, Weekel, "সৃষ্টি-চিহ্ন" নামক গ্রন্থের গ্রন্থকার, Lamarck, এবং অধুনাতন জীবন্ত বিখ্যাত গ্রন্থকারদ্বয় Darwin ও Wallace প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মতটিকে দৃঢ় বৈজ্ঞানিক পত্তনভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যে বহুল সাহায্য করিয়াছেন তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হয়।

১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে F. B. Robinet কর্ত্তৃক Amsterdam নগরেDe La Nature নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানি সে সময় এত দূর লোক-প্রিয় হইয়াছিল যে অনতিকাল মধ্যে উহার তিন সংস্কার উঠিয়া যায়। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থের স্থূলমর্ম্ম এই;—জগতের সমস্তই একটি অখণ্ড জীব-শৃঙ্খল ভিন্ন আর কিছুই নহে—অর্থাৎ জগতের সকল পদার্থেরই জীবন আছে—পৃথিবী প্রস্তর গ্রহ তারা বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী সকলই এক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত—সকলই জীবন-বিশিষ্ট—সকলেরই বোধ-শক্তি আছে—সকলই বর্দ্ধিত হয়—সকলেরই প্রবৃত্তি-বাসনা আছে—সকলেই বংশ-বিস্তার করিতে সমর্থ। তিনি বলেন—অগ্নি অতীব বুভুক্ষু ও সর্ব্বভুক (আমাদের ভাষায় অগ্নির আর এক নাম সর্ব্বভুক) —বায়ুই ইহার খাদ্য—বায়ুর অভাবে অগ্নি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। আবার বায়ুর ভক্ষ্য জল—জলের ভক্ষ্য অন্যান্য পদার্থ; এই জন্য তিনি বলেন—ধাতু-উৎস-জলে —লবণ, লৌহ প্রভৃতি অনেক প্রকার ধাতু প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বলেন,—"আমি প্রস্তর সকলের এবং প্রস্তর-আধার সকলের অঙ্কুর দৃষ্টি করিবার জন্য অনেক অন্বেষণ করিয়াছি—আমার অনুসন্ধানও তৎসম্বন্ধে বিফল হয় নাই—এমন কি—প্রস্তর ও ধাতু-সকল কি প্রকারে স্বীয় স্বীয় শরীর হইতে অঙ্কুর নিঃসৃত করে, তাহা পর্য্যন্ত আমি দেখিতে পাইয়াছি। আমি তাহাদিগের স্ত্রী-পুরুষভেদ নির্ণয় করিতে পারি নাই বটে কিন্তু তাহাতে কি?—অনেক জন্তু ও বৃ-ক্ষেরও তো এপর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষভেদ নির্ণয় হয় নাই। অবশেষে আমরা ইহাও দেখিতে পাইয়াছি, প্রস্তর এবং ধাতু-গর্ভে আবরণ-বিশিষ্ট অসংখ্য প্রস্তর ও ধাতুর ভ্রূণ-সকল নিহিত থাকে—তাহারা জন্তুদিগের ন্যা[য়] পরিবর্দ্ধিত ও পরিপোষিত হয়।"

এইরূপ বিশ্বাস-অনুসারে Robine[t] বলেন যে, সকল পদার্থই শরীর-যন্ত্র বিশিষ্[ট] —তাঁহার মতে, প্রত্যেক স্ফটিক-খণ্ড, [অ]সংখ্য আণবিক স্ফটিক শরীরের সমষ্টি মা[ত্র] এবং সমস্ত স্ফটিক-খণ্ডের যে আকার [ও] গুণ-সকল দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ই সম[ান] রূপে প্রত্যেক স্ফটিক-শরীরে আছে—এ[বং] এই প্রকারে, জীব মাত্রেই অসংখ্য ক্ষু[দ্র] ক্ষুদ্র আণবিক জীবের সমষ্টিমাত্র। প্রত্যে[ক] কুকুর আণবিক কুকুরের সমষ্টি, প্রত্যে[ক] মনুষ্য আণবিক মনুষ্যের সমষ্টি!

আবার তিনি আরও বলেন,—যে

ব্যাঙ্গাচি ক্রমশ ভেক-আকারে অভিব্যক্ত হয়—সেইরূপ ভেক পুনরায় অধোগমন করিয়া আবার মৎস্য-আকার ধারণ করে,কিন্তু বর্ত্তমান বিজ্ঞান এই প্রকার অভিব্যক্তি-মতের পোষকতা করেন না। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তি মতের অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। এক কালে য়ুরোপে আর একটি মতের প্রাদুর্ভাব ছিল। তাহার নাম "বাক্স-বন্দি" কিম্বা 'কৌটা-বন্দি'-মত (Theory of Emboitement) এই মতের মর্ম্ম এই, কাশীর কৌটাতে একটা কৌটার মধ্যে যেমন অসংখ্য কৌটা পরম্পরা থাকে সেইরূপ জীব জন্তুগণের প্রত্যেক জাতির মূল বীজের মধ্যে সেই জাতির ভাবী বংশ-পরম্পরা প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত থাকে।

এক সময় এই মতাবলম্বী অনেক লোক ছিল। এমন কি, বিখ্যাত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-বেত্তা Cuvier এই মতের পক্ষপাতী বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আবার সময়-ক্রমে এই মতটিও ধরাশায়ী হইয়া—ইহার স্থানে Wolff প্রবর্ত্তিত উপজনন-বাদ সমুত্থিত হয়। এই Wolff-প্রবর্ত্তিত অভিব্যক্তি বিষয়ক মতটির সহিত অধুনাতন মতের কতকটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—এই জন্যই Wolff য়ুরোপের বর্ত্তমান অভিব্যক্তি-মতের প্রথম পথ-প্রদর্শক বলিয়া ন্যায্যরূপে অভিহিত হইতে পারেন।

Wolff এই প্রকার মত প্রকাশ করিলেন যে,কোন শরীর-যন্ত্রের প্রথম উৎপত্তি-কালে—একটি শরীর হইতে সম্পূর্ণ আর একটি শরীর একেবারেই উৎপন্ন হয় না, পরন্তু ঐ শরীর-যন্ত্রের প্রত্যেক অঙ্গ একাদিক্রমে ক্রমশ নিঃসৃত হইয়া একটি সর্ব্বাঙ্গীন নূতন শরীরে পরিণত হয়। ফলিতার্থে এই মতটি এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, কোন জন্তু কিম্বা বৃক্ষের প্রত্যেক অংশই, পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের ফল স্বরূপ—এবং সেই অংশটি আবার নিজে পরবর্ত্তী আর একটি নূতন অংশের কারণ স্বরূপ। অতএব ইহা হইতে স্পষ্টই অনুমান হয়, যে অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া অনুসারে পরম্পরাক্রমে শরীরী জীবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অভিব্যক্ত হয়, তাহারই নাম উপজনন-প্রক্রিয়া (Epigenesis) এবং প্রত্যেক শরীর-যন্ত্র-বিশিষ্ট জীবের শরীরস্থ সমস্ত অঙ্গই সেই জীব-বিশেষের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তি হইতে নিঃসৃত হয়। এইত গেল উল্‌ফের মত। ইহার পরে Lamarck ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে আর একটি নূতন মত প্রকাশ করেন।

শরীর যন্ত্রের কোন অঙ্গ ব্যবহার করিলে পরিপুষ্ট হয়,এবং ব্যবহার না করিলে ক্ষীন হইয়া যায়, এবং কি জীব জন্তু, কি বৃক্ষলতা, উহাদের বাহ্য অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুসারে উহাদের প্রত্যেকের শরীরে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়—এই যে সর্ব্বজন-পরীক্ষিত সত্যটি, ইহারই উপর Lamarck স্বকীয় মত স্থাপন করিয়াছিলেন।

কোন প্রাণী যদি স্বজাতির অস্তিত্ব স্থায়ী করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে যে কোন নূতন অভাবের উৎপত্তি হয়, সেই অভা-

বের কোন প্রকার প্রতিবিধান না করিলে চলে না। এবং এই সকল নূতন অভাব সেই প্রাণীকে নূতন কার্য্য সাধনে এবং নূতন অভ্যাস অবলম্বনে উত্তেজিত করে। এইরূপে যে সকল অঙ্গ পূর্ব্ব-অবস্থায় বড় একটা ব্যবহারে আইসে নাই—সেই সকল অঙ্গের প্রয়োজন বর্দ্ধিত হওয়ায় অধিক চালনা হয়, এবং উহা হইতেই নূতন অঙ্গ-সকল পরিস্ফুটিত বা অভিব্যক্ত হয়। পক্ষান্তরে, যে সকল অঙ্গ অব্যবহৃত থাকে, তাহারা ক্ষীণ এবং খর্ব্ব কিম্বা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কোন প্রাণীর বাহ্য অবস্থার পরিবর্ত্তনে তাহার কতকগুলি অঙ্গ অন্তর্হিত এবং কতকগুলি নূতন অঙ্গ পরিস্ফুট বা অভিব্যক্ত হইতে পারে, এই কথাটি মানিয়া লইয়া ল্যামার্ক এই প্রকার মত প্রকাশ করিলেন যে, কোন জন্তুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন-বৈলক্ষণ্য অনুসারে তাহার অভ্যাস সকল নির্দ্দিষ্ট হয় না, পরন্তু তাহার অভ্যাস-অনুসারেই তাহার শারীরিক আকার গঠিত হয়। শত্রুগণের নিকট হইতে পলায়ন করিবার উদ্দেশে হরিণদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চটুলতা প্রদত্ত হয় নাই, পরন্তু তাহারা হিংস্র জন্তুগণের সম্মুখে পড়িয়া, তাহাদিগের কবল হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত দ্রুতপদক্ষেপে পলাইতে বাধ্য হওয়াতেই তাহাদের শরীরও ক্রমশঃ তদুপযোগী হইয়াছে। এই অভ্যাস-প্রভাবে তাহাদিগের শরীরে শুদ্ধ যে অপরিসীম চটুলতা জন্মিয়াছে তাহা নহে, পরন্তু যে সকল লঘু অঙ্গের উপর তাহাদিগের গতি-চাপল্য নির্ভর করে, সেই সকল অঙ্গও এই অভ্যাস নিবন্ধন গঠিত হয়। এই মতানুসারে, জীব জন্তু বৃক্ষ লতাদি সামান্য হইতে জটিল, জটিল হইতে জটিলতর অবস্থায় ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে। ইহার মধ্যে সামুদ্রিক জীবও উদ্ভিদ, ভৌমিক জীবও উদ্ভিদগণের পূর্ব্ববর্ত্তী—এবং এই ভৌমিক জীবও উদ্ভিদের শারীরিক আকার, সামুদ্রিক জীবও উদ্ভিদের শারীরিক আকার অপেক্ষা উন্নত।

তাঁহার মতে, সকল পদার্থের মধ্যেই ক্রমোন্নতির নিয়ম অন্তর্নিহিত আছে—এই নিয়মানুসারে অচল জড় পদার্থ হইতে প্রাণের উৎপত্তি হইল, তৎপরে প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়-বোধ অভিব্যক্ত হইল। এবং অবশেষে এই প্রক্রিয়া অনুসারেই বুদ্ধিহীন জীব বুদ্ধি-সমন্বিত হইল।

কিন্তু যখন ল্যামার্ক দেখিলেন যে নানা শ্রেণীর অসংখ্য জীব এখনও একই অবস্থায় আছে, তাহাদিগের মধ্যে উন্নতি-প্রবণতা কিছু মাত্র লক্ষিত হয় না—তখন এই আপত্তিটি খণ্ডন করিবার জন্য তিনি আর একটি অনুমানের আশ্রয় লইলেন। সে অনুমানটি এই—প্রকৃতি একটি যন্ত্র বিশেষ, ঈশ্বর প্রকৃতির উপর যে সকল নিয়ম মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, প্রকৃতি বাধ্য হইয়া সেই নিয়মানুসারেই কার্য্য করে এবং এইরূপে প্রকৃতি দেবী স্বতঃ-প্রজনন-প্রণালী অনুসারে (spontaneous generation) ক্রমাগত জীবও উদ্ভিদের অসংখ্য অসংখ্য

বীজাঙ্কুর ক্রমাগত অবিশ্রামে উৎপাদন করিতেছেন। তাঁহার মতে (monad) প্রাণী-বীজ সকল অহরহ স্বতঃ উৎপন্ন হইয়া উন্নত হইতে উন্নততর জীবে যুগযুগান্তরে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে।

ল্যামার্ক প্রচারিত মতের এই তো স্থূল মর্ম্ম। সর্ব্বশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, উরাং-উটাং জাতীয় বানর হইতে মনুষ্যজাতি অভিব্যক্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে মনুষ্যের উৎপত্তি বিষয়ক এই মতটি সর্ব্ব প্রথমে ল্যামার্কই প্রচার করেন। Infusoria কীট প্রভৃতি অতি নিম্ন শ্রেণীর জীবসকল কেন অদ্যাবধি পৃথিবীতে বর্ত্তমান, তাহারই একটা সঙ্গত কারণ দাঁড় করাইবার জন্য এবং তাঁহার প্রচারিত মতের সহিত এই ঘটনার সমন্বয় করিবার নিমিত্তই তিনি প্রকৃতির এই স্বতঃ-প্রজননী প্রক্রিয়ার কল্পনা করিয়াছিলেন। পুরাকালের Lucretius বলিতেন যে, প্রকৃতি দেবীর স্বাভাবিক কতকগুলি গর্ভ ভূতলের সহিত সূত্র দ্বারা আবদ্ধ আছে, সেই গর্ভে জীবজন্তুর অহরহ জন্ম হয়। এই অনুমানটি যেরূপ অপ্রামাণ্য, Lamarck কৃত অনুমানটিরও এ পর্য্যন্ত বিশিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এই স্বতঃ-প্রজনন-বিষয়িনী প্রক্রিয়া লইয়া Tyndal প্রভৃতি অধুনাতন পণ্ডিতগণের মধ্যে এখনও বাদানুবাদ চলিতেছে।

পৃথিবীতে অদ্যাবধি যত প্রকার জীব জন্তুর উৎপত্তি হইয়াছে, বোধ হয় তাহাদের প্রত্যেকেরই অন্তর্ভূত অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর জীব এখনও পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বিদ্যমান। অতএব পরিবর্ত্তন-নিয়মে যেরূপ নূতন নূতন জীব ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে, সেইরূপ স্থায়িত্ব-নিয়মে কতকগুলি জীব জন্তু চিরকালই পৃথিবীতে রহিয়া যাইতেছে। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এই নিয়মটির নাম (Persistence of Type) "মূল আদর্শের স্থায়িত্ব" রাখিয়াছেন। এই নিয়মানুসারে দেখা যায় জীব-ইতিবৃত্তের অতি-পূর্ব্বতন যুগ হইতে অদ্যাবধি কোন কোন জাতীয় জীবের বংশাবলী মধ্যে কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই।

অভিব্যক্তি বিষয়ক ল্যামার্কের এই মতটিও কালক্রমে লুপ্ত-প্রতিষ্ঠ হয় এবং ইহার স্থলে ৫০ বৎসর পরে Darwin প্রচারিত "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" নামক আর একটি নূতন মত সদর্পে মস্তক উত্তোলন করে। আজ কাল এই মতটির রাজত্ব চলিতেছে কিন্তু ইহারও সিংহাসন যে অটল নহে তাহার চিহ্ন এর মধ্যেই কিছু কিছু দেখা দিতেছে। এই মতটি কি —সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে। ইহা একটি সুসিদ্ধান্ত সত্য যে, সকল জীব জন্তু ও বৃক্ষলতা প্রায়ই এত অধিক সংখ্যায় সন্তান-সন্ততি উৎপাদন করে যে, তাহারা সকলই সমানরূপে পরিপুষ্ট হইতে না পারিয়া বিনষ্ট হয়। তাহাদের মধ্যে যে যত নিম্নশ্রেণীস্থ, তাহাদের সন্তান সন্ততিও তত অধিক পরিমাণে জন্মগ্রহণ করে। সেই সন্তান-সন্ততি মধ্যে

যাহারা স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ কিম্বা অন্য কোন উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন তাহারাই আত্ম-জীবন রক্ষণে সমর্থ হয় এবং অবশিষ্ট মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ইহাও একটি সর্ব্ব-জন-পরিজ্ঞাত বিষয় যে, পিতা মাতার সহিত সন্তান সন্ততির যেরূপ এক দিকে কতক অংশে সাদৃশ্য, সেইরূপ আবার কতক অংশে প্রভেদও থাকে।

অতএব সন্তানসন্ততির মধ্যে যাহারা "সর্ব্বাংশে উপযুক্ত" (best fitted) তাহা-রাই পৃথিবীতে থাকিয়া যায়। এই সন্তান সন্ততির মধ্যে যাহার যে কোন উপকারী গঠন-বৈলক্ষণ্য উৎপন্ন হয়, তাহাই কুল-পরম্পরায় প্রবাহিত হইয়া আরও বলবৎ হইয়া উঠে এবং তাহারই আনুসঙ্গিক (correlative) অন্যান্য গঠন-বৈলক্ষণ্য আপনা হইতেই অভিব্যক্ত হয়। যে সকল পরিবর্ত্তনে বাহ্য অবস্থার সহিত শরীর-যন্ত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারে, এই রূপ পরিবর্ত্তন সকল জীব-শরীরে সংঘটিত হয় এবং এইরূপে অল্পে অল্পে বংশ পরম্পরা-ক্রমে সেই সকল জীবের আকার এতদূর পরিবর্ত্তিত হয় যে অবশেষে তাহাদিগকে নূতন জাতীয় জীব বলিয়া আমরা নির্দেশ করি।

এই জাতির উৎপত্তি লইয়া য়ুরোপীয় প্রাকৃতিক ইতিবৃত্তবেত্তা পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। এক দলের মত এই যে, জীবজন্তু উদ্ভিদ্দি-গের মধ্যে যে সকল বিশেষ বিশেষ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকই ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সৃষ্টি। পূর্ব্বসৃষ্ট জীব ও উদ্ভিদগণের সহিত তাহাদের কোন যোগ নাই। আর এক দলের মত এই যে, একজাতি হইতেই আর এক জাতি অভিব্যক্তি-নিয়মে ক্রমশ উৎপন্ন হইয়াছে। কোন দুই জাতি সম্পূর্ণ রূপে পৃথক আপাতত প্রতীয়মান হইলেও তাহাদিগের উৎপত্তি-মূল একই। তা-হারা উভয়ই একটি শৃঙ্খলের অংশ মাত্র। আজকাল ডারুইন এই শেষোক্ত মতটির অধিনেতা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক না হউন কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃ-কই যে এই মতটি (origin of Species) "জাতির উৎপত্তি-মূল" নামক গ্রন্থে পরিস্ফুট রূপে ব্যক্ত এবং দৃঢ় পত্তন ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ফরাসিস্ দে-শীয় Lamarck, Geoffroy, Saint Hilaire প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই মতের প্রথম সূত্রপাত করেন। ইহাঁরা সকলেই অভিব্যক্তিবাদী। তবে, এই অভিব্যক্তি যে নিয়মে, যে প্রণা-লীতে সম্পাদিত হয়, সেই নিয়ম সেই প্র-ণালী লইয়াই তাঁহাদিগের মধ্যে মত-ভেদ দৃষ্ট হয়। ডারুইন-ই "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" মতটির প্রথম প্রবর্ত্তক। এই মতটির আজকাল এতদূর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে যে, যাতে তাতে এই নিয়মটি খাটানো হয়। এমন কি ঔষধের মধ্যে যেরূপ হলোয়ের বটিকা, তত্ত্বালোচনার পক্ষেও "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের" মতটী তদ্রূপ দাঁড়াইয়াছে। বস্তুতঃ "প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন" এই নামটী বড় শুভক্ষণে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

প্রকৃতিদেবী নির্ব্বাচন করিতেছেন এইরূপ কবিতার ভাষায় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ব্যক্ত হওয়ায় যেরূপ একদিকে লোকের চক্ষে ধূলি প্রয়োগ করিবার নিমিত্ত জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদিগের একটী উপায় হইয়াছে, সেইরূপ আর এক দিকে আসল কথাটী দৈব-যোগে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই মতের আশ্রয় লইয়া ডারুইনের কোন কোন শিষ্য নাস্তিকতা সমর্থন করেন। কিন্তু বস্তুত ইহার সহিত নাস্তিকতার কোন যোগ নাই। "প্রত্যেক জীবের পক্ষে যে কোন পরিবর্ত্তন মঙ্গল-জনক তাহাই প্রকৃতিদেবী নির্ব্বাচন করেন এবং তাহাই বংশপরম্পরা ক্রমে প্রবাহিত হয় এবং যাহা অনিষ্টকর তাহা স্থায়ী হইতে পারে না" এই যে তাঁহাদিগের মূল মত, ইহার মধ্যে ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় আস্তিকতাই ত গূঢ়রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। নির্ব্বাচন-শক্তি অন্ধ জড়ের হইতে পারে না। অতএব যে শক্তি দ্বারা এইরূপ নির্ব্বাচন-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তাহা অবশ্য জ্ঞানস্বরূপ এবং যাহা উপকারী যাহা মঙ্গলজনক একমাত্র তাহাই নির্ব্বাচিত হওয়া কোন অমঙ্গল পুরুষের কার্য্য হইতে পারে না—অতএব যে শক্তি দ্বারা এইরূপ নির্ব্বাচিত হয় তিনি অবশ্য মঙ্গলস্বরূপ। সৃষ্টি-কার্য্যের অপূর্ণতা দেখাইয়া যাঁহারা ঈশ্বরের অপূর্ণতা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন অথচ তাঁহারা যদি Darwin মতাবলম্বী হয়েন এবং ক্রমোন্নতি-নিয়মে বিশ্বাস করেন তাহা হইলে তাঁহাদিগের ও-কথা বলিবার আর অধিকার থাকে না। যেহেতু, যদি সমস্ত সৃষ্টি চিরকাল সমান ভাবেই থাকিত—যদি বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার উন্নতির শেষ সীমা হইত—তাহা হইলেই বলা যাইতে পারিত ঈশ্বরের শক্তি সীমাবদ্ধ। কিন্তু যখন উন্নতি হইতে উন্নতিতে ক্রমাগতই সৃষ্টির গতি দেখা যাইতেছে, তখন তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে। তবে, সৃষ্টি একেবারেই পূর্ণ হইতে পারে না—যেহেতু দুইটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণবস্তু একত্রে থাকা অসম্ভব। আবার, যিনি মঙ্গলস্বরূপ ও পূর্ণস্বরূপ, তাঁহার সৃষ্টি কখন চিরকাল সমানরূপে অপূর্ণ থাকিতে পারে না। ঈশ্বর পূর্ণস্বরূপ এবং মঙ্গলস্বরূপ বলিয়াই সৃষ্টির অপূর্ণতা ক্রমশঃ হ্রাস হইবারই কথা, এবং যে সৃষ্টি ক্রমাগত উন্নতি হইতে উন্নতিতে, মঙ্গল হইতে মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার কারণ কোন পূর্ণস্বরূপ এবং মঙ্গল-স্বরূপ পুরুষ হইবারই কথা। অতএব যে দিক দিয়াই দেখ, সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। যদি আমরা প্রথমে ঈশ্বরের স্বরূপ মানিয়া লইয়া সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হই—তাহা হইলেও দেখিতে পাই সৃষ্টির ক্রমাভিব্যক্তি ভিন্ন সৃষ্টির পূর্ণতা কখনই হইতে পারে না—আবার যদি সৃষ্টির প্রকৃতি এবং নিয়মের আলোচনা করিয়া ঈশ্বর-স্বরূপের সিদ্ধান্ত করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলেও দেখিতে পাই—পূর্ণস্বরূপ ঈশ্বর মূল কারণ না হইলে সৃষ্টির ক্রমোন্নতি বা ক্রমাভিব্যক্তি সম্ভবে না। অতএব আরোহ ও অবরোহ উভয় প্রণালী অনুসারেই সৃষ্টি এবং ঈশ্বরতত্ত্ব স-

ম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

যাহা হউক এই 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' নিয়মটি কি তাহা আজকাল সকলেরই ভাল করিয়া অবগত হওয়া আবশ্যক—অবসর ও স্থানাভাব না হইলে ভবিষ্যৎ সংখ্যায় এই বিষয়ের বিশেষ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

চীন।

চীন দেশের সকলই নূতন, সকলই অদ্ভুত। আর্য্য জাতীয়দিগের সহিত প্রায় তাহাদের কিছুই মিল নাই। ইউরোপে যাও, আমেরিকায় যাও, আমাদের সহিত তবু অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে, কিন্তু চীন দেশে যাও, তাহাদের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সকলই একেবারে নূতন ও অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইবে। সম্প্রতি আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান আচার্য্য মহাশয় চীন দেশে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন. তাঁহার প্রমুখাৎ তথাকার যে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করা গিয়াছে এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পর্য্যটকদিগের গ্রন্থে যাহা পাঠ করা গিয়াছে তাহা এরূপ আমোদজনক যে, ভারতীর পাঠকদিগকে সেই আমোদের অংশ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।

প্রথমতঃ 'চীন' এই শব্দের ব্যুৎপত্তি কি? এক জন অজ্ চীনবাসীর নিকট তাহাদের দেশকে চীন দেশ বলিলে কিম্বা তাহাকে চীনবাসী কিম্বা চিনেম্যান বলিয়া ডাকিলে তাহার একেবারে চক্ষুস্থির হয়! এই সম্বন্ধে রোম্যান ক্যাথলিক পাদ্রি অ্যাবে হ্যাক্ (Abe Huc) একটি গল্প বলেন। তিনি একজন চীনের যুবা রাজ-কর্ম্মচারীর নিকট য়ুরোপের বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন। চীনবাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ভাষায় আমাদের দেশকে কি বলে?" পাদ্রি উত্তর করিলেন "আমরা তোমাদের দেশকে 'চাইনা' এবং তোমাদের দেশের লোককে 'চাইনীজ' বলি। ইহাতে চীনবাসী একেবারে অবাক্ হইলেন। কিয়ৎকাল পরে তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা ঐ দুটি কথার বাস্তবিক অর্থ কি? "এত কথা থাকিতে আমাদের দেশকে এবং আমাদের দেশের লোককে 'চাইনা' ও 'চাইনীজ' এই দুই নাম দেওয়া হইল কেন? আমরা তোমাদের গৌরবান্বিত দেশের সুখী অধিবাসীদিগকে 'সি ইয়াং-জিন' বলিয়া ডাকি। 'সি' এই শব্দটির অর্থ পশ্চিম 'ইয়াং' এই শব্দটির অর্থ সমুদ্র এবং 'জিন', এই শব্দের অর্থ মনুষ্য। অতএব এই কথাগুলি একত্র করিলে "পশ্চিম সমুদ্রের মনুষ্য" এইরূপ বুঝায়। আমরা ইউরোপীয়দিগের এই নাম দিয়াছি। এবং ইউরোপের বিভিন্ন জাতিদিগের স্ব স্ব দেশে যে নাম প্রচলিত আমরা তাহারই সাধ্যমত

অনুকরণ করিয়া আমাদের ভাষায় তাহাদের নাম রাখিয়াছি! তাহার দৃষ্টান্ত Homme Faran-cais (Francais অর্থাৎ ফরাসিস্) আমরা তাহাদিগকে বলি ফু-লাং-সিন্।" ইন্ কি-লি (অর্থাৎ ইংরাজ) তাহাদিগকে আমরা "হুং-মাস-জিন্" বলি অর্থাৎ "লোহিত কেশ-বিশিষ্ট মনুষ্য'। কারণ, শোনা যায় তাহাদিগের চুল লাল। এবং "ইয়্যা-মে-লি-কিয়েন্" (Americans) তাহাদিগের আমরা নাম রাখিয়াছি 'রঙ্গিন-পাতাকা-ওয়ালা মনুষ্য" কারণ তাহাদিগের জাহাজে বিচিত্র রঙ্গের পতাকা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব দেখ আমরা এই যে সব নাম রাখিয়াছি তাহার এক একটা অর্থ আছে। সেইরূপ তোমাদেরও 'চাইনা' এবং 'চাইনীজ" এই দুই শব্দের অবশ্য কোন না কোন অর্থ থাকিবে।"

চীনের পুরাতন নাম "তিয়েন শা'; এখনও এই নামের ব্যবহার আছে। ইহার অর্থ—"কেবল স্বর্গ অপেক্ষা নিকৃষ্ট।" কিন্তু চীনেরা সচরাচর আপনাদের দেশকে "চং-কুয়ো" বলে। "চং-কুয়োর" অর্থ মধ্য রাজ্য। তবে "চীন" এই শব্দটি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল! চীনদিগের মধ্যে এই একটি রীতি প্রচলিত আছে যে, যখন যে রাজবংশ চীনে আধিপত্য লাভ করে সেই রাজবংশের নামানুযায়ী তাহারা দেশের নাম রাখিয়া থাকে। রাজা 'হন' এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগের রাজত্বকালে চীনেরা আপনাদিগকে হন্-জিন্ অর্থাৎ হনের মনুষ্য বলিয়া অভিহিত করিত। এবং যখন থং রাজ-বংশের গৌরব-সূর্য্য হন্ রাজবংশের গৌরবকে মলিন করিয়া ফেলিল, তখন আবার চীনেরা আপনাদিগকে থং-জিন্ অর্থাৎ থঙ্গের মনুষ্য বলিত। যখন মঞ্চু রাজবংশের আধিপত্য হইল তখন চীনেরা আপনাদিগকে "ৎসিং-জিন" অর্থাৎ ৎসিং-মনুষ্য বলিত। এই ৎসিং হইতে বোধ হয় চিন শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে।

চীন রাজ্যটি অতি বৃহৎ রাজ্য, বিস্তারে প্রায় পাঁচ হাজার ক্রোশ হইবে। এত বৃহৎ হইলেও, কোন বিদেশীয় লোক, কি রুস্ কি আফগান, কি হিন্দু, কি ইংরাজ, চীন গবর্ণমেণ্টের অগোচরে কিম্বা বিনা অনুমতিতে চীন রাজ্যের সীমা এপর্য্যন্ত কেহই অতিক্রম করিতে পারে নাই। একবার ম্যানিং নামক একজন সম্পত্তিশালী ও সুশিক্ষিত ভদ্র ইংরাজ চীন রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, চীন জাতীয়দিগের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে মিশিবার অভিপ্রায়ে ক্যাণ্টনে যাত্রা করেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি চীনেদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিলেন, দাড়ি রাখিলেন, এবং শ্রম-সহকারে চীন ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন। যখন বাহ্য আকার প্রকার আচার ব্যবহার ভাষায় চীনেদিগের সহিত তাঁহার কিছুমাত্র প্রভেদ রহিল না, যখন তিনি বুঝিলেন যে, বিদেশীয় বলিয়া আর তাঁহাকে কেহই চিনিতে পারিবে না, তখন উপযুক্ত সময় হইয়াছে বিবেচনা করিয়া স্বকার্য্য সাধনে উদ্যত হইলেন। এমন সময় এক জন চীনের রাজ-কর্ম্মচারী আসিয়া তাঁ-

হাকে বলিল যে, তাঁহার সঙ্কল্প প্রকাশ হইয়াছে—কেন বৃথা তিনি প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করিতেছেন—ইংরাজি ফ্যাক্টরির সীমা অতিক্রম করিয়া যাহাতে তিনি চীনরাজ্যে পদার্পণ করিতে না পারেন পূর্ব্ব হইতেই তাহার উপায় বিধান করা হইয়াছে। ম্যানিংসাহেব বলিলেন তিনি নিরীহ লোক, তাঁহার কোন দুষ্ট অভিসন্ধি নাই, তিনি কেবল চিনের লোকদিগের সহিত মিশিতে চাহেন এইমাত্র তিনি পাদ্রি নহেন, কি ধর্ম্ম কি বাণিজ্য কি রাজ্য সম্বন্ধে তাঁর কোন গূঢ় অভিসন্ধি নাই—এইরূপ অনেক করিয়া বলিলেন—কিন্তু সকলি বৃথা হইল। তৎপরে তিনি কোচিন চীনে গিয়া আর একবার এইরূপ চেষ্টা করিলেন কিন্তু সেখানেও তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। কোচিন চীনের গবর্ণমেণ্টও চীনের ন্যায় বিদেশীয়ের প্রবেশ সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক। কিন্তু সাহেব ইহাতেও হতাশ না হইয়া আবার কলিকাতায় যাত্রা করিলেন। সেখান হইতে বাঙ্গালার উত্তর সীমায় গমন করিলেন এবং ভুটান অতিক্রম করিয়া তিব্বৎ প্রদেশের সাসা নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এইবার তিনি তাতার রাজ্যের সীমা দিয়া চীনের রাজধানীতে পৌঁছিয়া তাহার বহুদিনকার মনোরথ পূর্ণ করিবেন মনে করিয়াছিলেন কিন্তু এবারও চীনের রাজ কর্ম্মচারীদিগের নিকট ধরা পড়িলেন। তাহারা চীন রাজ্য হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিতে তাঁহাকে আদেশ করিল। চীনের রাজসরকার এমনি সতর্ক যে কোন রূপে তাহার দৃষ্টিকে এড়াইবার জো নাই।

চীনের রাজতন্ত্র পিতৃ-শাসন-প্রণালী ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজাই প্রজাদিগের পিতৃ-স্থানীয়। প্রজার উপর রাজার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব। তাঁহার ইচ্ছাই নিয়ম—তাঁহার কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিবার কাহারও অধিকার নাই। তিনি তাঁহার "প্রজাদিগের পিতা মাতা।" তাঁহার একটি উপাধি "স্বর্গ পুত্র।" লোকেরও বিশ্বাস যে স্বর্গ হইতেই তাঁহার বংশের উদ্ভব। তিনি স্বর্গীয়। তাঁহার আর একটি উপাধি "পবিত্র প্রভু।" তাঁহার সমক্ষে তো প্রজাগণ সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবেই, আবার একটি প্রস্তর ফলকে "পবিত্র প্রভু" এই কথাগুলি খোদিত করিয়া তাহারা তৎসমক্ষে ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম করে। Lord Macartney যখন চীনদেশে দৌত্য কার্য্যে গমন করেন, তখন Sir John Barrow তাঁহার সমভিব্যবহারে ছিলেন। তিনি চীন সম্রাটের জন্ম-তিথি উৎসবের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলেই চীন দেশে রাজার সহিত প্রজার কি রূপ সম্বন্ধ স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হইবে। "১৭ই সেপ্টেম্বরে সম্রাটের জন্ম-তিথি উৎসব দর্শন করিবার জন্য অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে রাত্রি ৩ টার সময় আমরা যাত্রা করিলাম। প্রাসাদ-উদ্যানের প্রবেশ দ্বারের সন্নিকট একটি প্রকাণ্ড শালা ছিল—সেখানে গিয়া আমরা দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম। আমাদের জন্য ফল

চা, গরম দুধ এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী আনীত হইল। তাহার পর খবর হইল উৎসব এখনই আরম্ভ হইবে। আমরা তৎক্ষণাৎ উদ্যানে অবতরণ করিলাম। দেখিলাম সম্রাটের রাজ-শিবিরের সমক্ষে মাণ্ডারিন নামক প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারী এবং অন্যান্য বড় বড় লোক সারি সারি দণ্ডায়মান। সম্রাট্ একটি যবনিকার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইতেছে না। অথচ তিনি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অসংকোচে ও অবাধে সমস্ত তামাসা দেখিতেছেন। যেখানে সম্রাট সিংহাসনে আসীন সেই প্রচ্ছন্ন সিংহাসনের দিকে সকল লোকে আগ্রহের সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে এবং কখন্ উৎসব কার্য্য আরম্ভ হয় তজ্জন্য সকলে অধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতেছে। এমন সময় ধীরে ধীরে বাসাচ্ছাদিত ঢাক ও গভীর-কণ্ঠ ঘণ্টা সকলের গম্ভীর বাদ্য দূর হইতে শ্রুত হইল। আবার হঠাৎ সমস্ত বাদ্য বন্ধ হইয়া গেল—সমস্ত দিক নিঃস্তব্ধ হইল। আবার বাদ্য আরম্ভ হইল। আবার মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইতে লাগিল—এই সময় শিবিরের সম্মুখে কতকগুলি লোক ব্যস্ত হইয়া যাতায়াত করিতে লাগিল—বোধ হয় তাহারা উৎসবের উদ্যোগ করিতেছিল। অবশেষে কণ্ঠ-সংগীত ও যন্ত্রবাদ্য ঘোর রোলে আরম্ভ হইল। অমনি সকলে সেই প্রচ্ছন্ন ভূদেবের উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে প্রণত হইল। যে উৎসব-গান গীত হইতেছিল তাহার ধুয়া এই "হে পৃথিবীবাসী মনুষ্যগণ! তোমরা সকলে মহা প্রভুর নিকট মস্তক অবনত কর।" চীন-পৃথিবীর যত লোক বর্ত্তমান ছিল, আমরা ব্যতীত সকলেই সেই ধুয়ার পুনরাবৃত্তির সময়ে প্রতিবার ভূমিতলে প্রণত হইতে লাগিল।"

চিন সম্রাট ও তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে কার্য্যত অলঙ্ঘ্য ব্যবধান থাকিলেও—চলিত কথায় সম্রাট্ প্রজাদিগের পিতৃ-স্বরূপ। এই পিতৃ-শাসনের আবরণে চীন রাজ্যে ভয়ানক ভয়ানক অত্যাচার অবাধে অনুষ্ঠিত হয়। চীনদেশে পিতৃ-শাসন অত্যন্ত প্রবল—সন্তানের উপর পিতার সর্ব্বাঙ্গীন অসীম কর্ত্তৃত্ব। পিতা তাঁহার পরিণত-বয়স্ক পুত্রকেও যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতে পারেন—নানা প্রকারে নির্যাতন করিতে পারেন, এমন কি তাঁহাকে দাসরূপে বিক্রয় পর্য্যন্ত করিতে পারেন, তথাপি পুত্রের তাহাতে কোন কথা কহিবার জো নাই। অধিকন্তু পিতার দোষের জন্য পুত্রকে দায়ী হইতে হয়। এই পারিবারিক শাসনের আদর্শে চীনদেশে রাজ-শাসন-প্রণালী সংস্থাপিত। সম্রাট্ মন্ত্রীবর্গকে ও মাণ্ডারিন্‌দিগকে পিতৃভাবে শাসন করেন—এবং ম্যাণ্ডারিণগণ সাধারণ প্রজামণ্ডলীর পৃষ্ঠে এই পিতৃ-ভাবেই বংশ-দণ্ড অজস্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই বংশ-দণ্ডের ব্যবহার কিরূপ পরে তাহার ব্যাখ্যা করা যাইবে। পাঠক মনে রাখিবেন চীনের সম্রাট অপরাধীকে দণ্ড বিধান করেন না; কারণ, দণ্ড বিধানে হৃদয়ের কঠিনতা প্রকাশ হয়, এই কঠিনতা পিতৃ-স্নেহের বিরোধী! এই

জনা সম্রাট্ যখন সহস্র সহস্র প্রজার মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করেন তখনও তাঁহাকে দণ্ড বলা যায় না, তাহা সন্তানের প্রতি পিতার কোমল শাসন ভিন্ন আর কিছুই নহে!

ক্রমশঃ

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদের পূর্ব্বাবস্থা। শ্রীপ্যারিচাঁদ মিত্র কর্ত্তৃক প্রণীত। বাল্মিকী যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৷৷৹

সাধারণতঃ আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা বিষয়ে এত অল্প জানা আছে, এমন কি, কৃতবিদ্য দলের মধ্যেও সে বিষয়ে এত কুসংস্কার আছে যে এ রূপ পুস্তক প্রকাশের আবশ্যকতা বিষয়ে কিছু বলাই বাহুল্য।

ঋগ্বেদে প্রকাশ হইতেছে যে, স্ত্রীলোকেরা সালঙ্কৃত হইয়া উৎসব ও বিদ্যানুরঞ্জন সভাতে গমন করিতেন। মহাবীর চরিতে লিখিত আছে যে, ঋষি কন্যা ও পত্নী সকল, পিতা স্বামীর সহিত ভোজে ও যজ্ঞে গমন করিতেন। নাটকাদি পাঠে স্পষ্ট বোধ হয় যে, স্ত্রীলোকেরা নাট্যশালায় ও উৎসবে গমন করিতেন। স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য স্থানে মঞ্চোপরি বসিয়া মল্লযুদ্ধ ও বাণ শিক্ষা ইত্যাদি দেখিতেন। কি মৃগয়ায়, কি যুদ্ধস্থানে, কি শব-সৎকারে, কি যজ্ঞস্থানে, স্ত্রীলোক সঙ্গে থাকিতেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালীন দ্রৌপদী, সুভদ্রা ও উত্তরা পাণ্ডবদিগের শিবিরে ছিলেন। দ্রৌপদির বিবাহ বিষয় বিবেচনার্থে, দ্রুপদের সভায় কুন্তী উপস্থিত থাকিয়া, আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজসূয়, অশ্বমেধ ও রাজা যুধিষ্ঠিরের অভিষেকের সময়ে নারীরা উপস্থিত ছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞে নারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান ছিল ও যুবতীরা সভার মধ্যে ইতস্ততঃ বেড়াইতেন।

বিশেষ বিশেষ প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রদর্শিত হইতে পারে যে, যবনরাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হইয়া আসিয়াছিল। যে সকল প্রদেশে মুসলমানদের উপদ্রবের ততটা আশঙ্কা ছিল না, সে সকল প্রদেশে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রাদুর্ভাব ছিল। মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে স্ত্রীস্বাধীনতা এখনো জাজ্জ্বল্যমান আছে। বঙ্গদেশে যবন-উৎপাত সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ছিল, সুতরাং বঙ্গদেশই স্ত্রীলোকদের পক্ষে একটি বিশাল কারাগার রূপে পরিণত হইয়া আসিয়াছে। ইহাতে এই প্রতীতি হইতেছে যে, স্ত্রীলোকদিগকে দারুণ ভাবে অবরুদ্ধ রাখা আর্য্যসমাজের প্রকৃত অবস্থা নহে, বিকৃত অবস্থামাত্র। স্বীকার করি যে এতদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগকে অবরুদ্ধ রাখিয়া তাহাদিগকে একেবারে পূর্ব্বকালের স্বাধীনতা প্রদান করিলে তাহাতে অশুভ ব্যতীত শুভ ফল

কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ সদ্য আরোগী ব্যক্তিকে উচিত পথ্য না দিয়া একেবারে সুস্থাবস্থার স্বাভাবিক আহার দিলে তাহাতে মন্দই ঘটিবার সম্ভাবনা। স্বীকার করি যে এদেশের স্ত্রীলোকদিগকে ইউরোপীয় স্বাধীনতা প্রদান করিলে তাহাতেও অশুভ ব্যতীত শুভ ফল কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, কারণ ইউরোপীয় বাহ্য আড়ম্বরময় সভ্যতার কোন উপকরণই আমাদের আধ্যাত্মিক সভ্যতার উপযুক্ত নহে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অল্পে অল্পে আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে আমাদেরই পূর্ব্ব প্রণালী অনুসারে স্বাধীনতাতে দীক্ষিত করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। স্ত্রীলোকদিগের সনদিন কালে শ্বশুরালয়েই বাস, কিন্তু শ্বশুরালয়ে স্বামী ব্যতীত——অথবা কিশোর দেবর ব্যতীত অন্য কাহারো সঙ্গে তাহাদের কথা কওয়া দূরে থাকুক, মুখ দেখা-দেখি পর্য্যন্ত অন্যায়। অনেক স্থলে পুত্রবধূরা আপনার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর সঙ্গে পর্য্যন্ত মুক্তকণ্ঠে কথা কহিতে সমর্থ নহে। কেবল সম-শিক্ষিতা সম-বয়স্কা সম-অধীনা সঙ্গিনীদের সহিত সমস্ত দিন সহবাসে প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা কোথায়? হৃদয় ও মনের সঙ্কোচ ভাবের এরূপ পোষকতা করা অপেক্ষা আর্য্য সমাজের শোভন স্বাধীনতার অল্পে অল্পে দ্বার উদ্ঘাটন করা নিতান্তই আবশ্যক। আমরা ভরসা করি এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেই ঐ বিষয়ে একটু চিন্তা করিবেন। প্যারীবাবু এই সময়োপযোগী গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া আমাদিগের অশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

গোলাপের দৌত্য।

রাগিণী কানেড়া—তাল আড়াঠেকা।

গোলাপ যাও গো সখি প্রিয়ার সদনে,
মরমের কথাগুলি বোলো তাঁরে গোপনে।
কত আমি সেধেছি
কত আমি কেঁদেছি
তবুও পাইনি স্থান সে নিঠুর মনে।
গোলাপ যাও গো তুমি, প্রিয়ার বদন চুমি,
আমা হয়ে বোলো কথা শিশিরাশ্রু লোচনে।
কেঁদে কেঁদে আঁখি-রাঙ্গা
হৃদয়ের বৃন্ত-ভাঙ্গা
তোমারে নিশ্চয় হেরি উপজিবে দয়া মনে।
কুসুমের শিরোমণি
শোনো ওগো গোলাপ রাণি!
অবাক্ ভাষায়, আর নীরব নিশ্বাসে,
যে কাজ সাধিবে তুমি প্রিয়ার সকাশে,
শত-মুখে নারিব তা—কাতর ক্রন্দনে।
তোমার ও দশা হেরি
লইবেন হৃদে ধরি,
চুমিবেন কত আর আদরে যতনে।
সে সময়ে একবার, কথা তুলো অভাগার,
দেখিব সে নিঠুরার আছে কিনা স্মরণে।

